কাত্তিক :: ১৩৭২

কার্ত্তিক :: ১৩৭২

কার্ত্তিক :: ১৩৭২

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭২

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭২

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭২

লিলি
বিস্কুট
সকলেই
পছন্দ করেন
কয়েকটি
নামকরা বিস্কুট
থিন এরারুট
বোর্বন ক্রীম
বার্লি বিস্কুট
মল্টো
লিলি
বিস্কুটের মত বিস্কুট
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭২

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭২

সকাল সন্ধ্যায়
লিলি
বিস্কুট
না হলেই নয়।
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৩

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭২

লিলি
বিস্কুট
সকলেই
পছন্দ করেন
কয়েকটি
নামকরা বিস্কুট
থিন এরারুট
বোস্টন ক্রীম
বার্লি বিস্কুট
মল্টো
লিলি
বিস্কুটের মত বিস্কুট
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭২

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭২

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭২

VINO
MALT

সূচীপত্র—ফাল্গুন, ১৩৭২

সূচীপত্র—ফাল্গুন, ১৩৭২

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৭২

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৭২

পূজারিণী
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড	কার্ত্তিক, ১৩৭২	প্রথম সংখ্যা

'শান্তি" স্থাপনের পরে

পাকিস্তানের অভিধানে শান্তির অর্থ হইল গুপ্তঘাতক, লুটেরা ও ষড়যন্ত্রকারীর নীতি অনুসরণ করিয়া অপরের নাশ ও নিজের সুবিধা সাধনের ব্যবস্থামাত্র। সাধারণভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি অর্থেও পাকিস্তান যাহা বুঝে তাহাতেও গুপ্তঘাতক, ডাকাত ও ষড়যন্ত্রকারীর কর্মপদ্ধতি বিশেষভাবে প্রকাশ হয়। ইহা পাকিস্তানের জন্মগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির ফল এবং এই ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের পূর্বকালের রীতিনীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই পাকিস্তানের জন্ম হয় এবং তৎপরে বাড়িয়া উঠিবার প্রচেষ্টাতেও পাকিস্তান ব্রিটিশ কৃত নীতিরই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। শুধু ব্রিটিশের সাধুভাব অভিনয় সুরুচির আবরণে আরও অধিক [illegible]। বিশ্ব-মানবকে ব্রিটিশ চিরকাল বুঝাইয়া আসিয়াছে যে তাহার বাণিজ্য ও পরদেশ লুণ্ঠনের লাভ ধর্ম ও তাহা বিস্তার কার্য্যেরই পরোক্ষভাবে প্রাপ্য, ন্যায্য পাওনা মাত্র। পাকিস্তান সভ্যতা ও রুচির অভাবে ঐ একই বর্বরোচিতভাবে অনুসরণ করিতে গিয়া বিশ্বের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সত্য কিংবা সভ্যতার কোনও আভিজাত্য নাই; শুধু প্রয়োজন অনুসারে তাহা সুবিধা সাধনের কার্য্যকরী পদ্ধতিমাত্র। এই "নীতি" ধারণ করিতে হইলে যে সর্বব্যাপী সাধুতার আবরণের সৃষ্টি করিতে হয় তাহা পাকিস্তানের অভিনয় ক্ষমতার বাহিরে। স্বভাব লোভী, নীচ স্বভাব ও আত্মসম্মান জ্ঞানের অভাব যেখানে প্রকট সেখানে উচ্চ আদর্শের অভিনয় অথবা সম্ভবও হয় না। পাকিস্তান তাই পদে পদে নিজ নীচতার গহ্বরে নিজেই পড়িয়া অক্ষম ও বেকার যায়। ব্রিটিশ বা আমেরিকান নিজেদের পাপ কাটাইয়া পলায়নের পথ সুগম রাখিয়া তবে দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তারা অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিলে সরিয়া গিয়া অপর ভূমিকায় অভিনয় আরম্ভ করিতে বিলম্ব করে না।

পাকিস্তানের রাজকার্য্য আরম্ভ হইতেই নীচতা, মূর্খতা ও বর্বরতাসম্বল। গরীবের ঘর জমি ছিনাইয়া লওয়া, ধনীদের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ প্রভৃতি নীচকার্য্য করিয়া আঠার বৎসরকাল পাকিস্তানের এমনই একটা স্বভাব মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় কিংবা যুদ্ধের সম্বন্ধে আদব-কায়দা রক্ষা করিয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। আইন-কানুন মানিয়া চলা শিক্ষা-সাপেক্ষ। যদি কোনও জাতি বৎসরের বৎসর শুধু মিথ্যা আস্ফালন, চুরি, লুঠ ও পররাষ্ট্রের নিকট ভিক্ষা লইয়া জাতীয় জীবন নির্বাহ করিয়া চলে, তাহলে সেই জাতির পক্ষে বিশ্বজাতি-সভার ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইতে পারে না। পাকিস্তান

আজ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে তাহার ব্রিটিশ-আমেরিকান (ও পরে চীন) মহাজাতিদিগের তাড়াটিয়া গুণ্ডার কার্য্য করার ফলে জাতি হিসেবে আর কোনও ইজ্জত নাই। তাহার কোনও কথার কোন মূল্য নাই। তাহার সহিত কোন সন্ধি সর্ত্ত ইত্যাদিতে অপর কোন জাতির কোন প্রকার আস্থা রাখিবার কারণ নাই। এমন কি পাকিস্তান ব্রিটিশ, আমেরিকান অথবা চীনের সহিতও যে সন্ধি সর্ত্ত ইত্যাদি রক্ষা করিয়া চলিবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। অবশ্য ঐ সকল মহাজাতিদিগের কোন কথায় বা প্রচারিত আদর্শের যথার্থতা কতদূর পর্য্যন্ত ভাড়াটিয়া গুণ্ডা ও ভৃত্যদিগকে মানিয়া চলিতে হইবে তাহা বাহিরের লোকের নিকট তাহারা প্রকাশ না করিতেও পারে। অর্থাৎ এই সকল মহাশক্তিমান জাতিদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখন কি তাহা কেহ কোন সময় পরিষ্কার বুঝিতে পারে না। পাকিস্তান যে চীনের সহিত নূতন সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হইল, তাহা আমেরিকা ও ব্রিটেনের আদেশের ফল, অথবা তাহাদিগের প্রতি বিতৃষ্ণার নিদর্শন এ কথার উত্তর কে দিবে? আমেরিকা যে পাকিস্তানকে শত শত কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ করিল ও যে সরঞ্জাম সমতল ভূমিতে যুদ্ধের জন্যই বিশেষ করিয়া উপযুক্ত দেখা যাইল, সে অর্থ ব্যয় কোন্ "শত্রুর" দমনের জন্য হইয়াছিল? ব্রিটেনের পাকিস্তান-প্রীতি স্বাভাবিক কেননা পাকিস্তান সৃষ্টি করিবার কারণই ছিল ভারতের শক্তি খর্ব্ব করিবার চেষ্টা। ব্রিটেন ভারতের ঐশ্বর্য্য শোষণ করিয়াই পৃথিবীতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কারণে ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ব্রিটেনের বিশেষ অপ্রীতিকর হইয়াছিল। শোষকের বিরুদ্ধাচরণ দাসস্থানীয় লোকদের মহা অপরাধ বলিয়াই শোষকেরা মনে করে। ভারতের সেই অপরাধের শাস্তি হইল ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের সৃষ্টি। সুতরাং যেমন করিয়া হউক ব্রিটেন পাকিস্তানকে সাহায্য করিবেই, ভারতকে দমন করিবার জন্য। ইহার মধ্যে আমেরিকা কেন আসিয়া পড়িল তাহা সহজে বোধগম্য নহে। পাকিস্তান, রাশিয়ার সহিত লড়াই হইলে আমেরিকার কাজে লাগিবে বলিয়া সম্ভবত ব্রিটেন আমেরিকাকে বুঝাইয়া থাকিবে। কারণ ব্রিটেনের মিথ্যা প্রচারের মধ্যে পাকিস্তানীদিগের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা ফলাইয়া বলা একটা বড় গল্প ছিল। একজন পাকিস্তানী তিনজন ভারতীয়ের সমান ইত্যাদি। ঐ সকল গল্প শুনিয়া আমেরিকা হয়ত অনেক আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সে আশা ফলবতী না হওয়াতে ভারত ও পাকিস্তানকে আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি জাতি যুদ্ধ থামাইতে নির্দ্দেশ দিয়া পাকিস্তানকে দম লইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। পাকিস্তান কুড়ি দিনে আড়াইশতবার যুদ্ধ নিবৃত্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া নিজের সাধুতা প্রমাণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে নূতন করিয়া অস্ত্র আক্রমণ কার্য্যও চালাইয়া চলিয়াছে। তুর্ক, পর্ত্তুগাল ও অপরাপর দেশের থকলমে আমেরিকা ও ব্রিটেন পাকিস্তানকে হারান শক্তিসার হাতে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

ভারতের যুদ্ধকার্য্যে প্রয়োজনীয় কোন জিনিসই আর বিদেশ হইতে আসিতে পারিতেছে না। শুধু আমেরিকান ও ব্রিটিশ মানুষ বহু সংখ্যায় ভারতে আসিতেছে ও ভারত হইতে বিদেশে যাইতেছে। ভারতীয় পুলিশ বহু পাকিস্তানী চরদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে কিন্তু যে সকল বড় বড় গুপ্তচর ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে ভিতরে আসিয়া পাকিস্তানকে গোপনে সাহায্য করিতেছে বলিয়া বহুলোকের ধারণা, সেরূপ কাহাকেও ধরিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। আমেরিকা ও ব্রিটেন শিক্ষিত গুপ্তচর কাহাকেও ভারতে রাখে নাই হইতে পারে, কিন্তু কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ পাকিস্তানের সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও সামরিক শক্তি সংগঠন যখন ব্রিটেন ও আমেরিকার অত্যন্ত প্রিয় কার্য্য, তখন তাহার জন্য দুই দশটি বিচক্ষণ গুপ্তচর যে তাহারা পাকিস্তানের সাহায্য হেতু ভারতে রাখিবে না তাহা কে বিশ্বাস করিবে? এই কারণে মনে হয় অতঃপর ভারত হইতে বাছাই করিয়া কিছু কিছু ব্রিটিশ ও আমেরিকান জাতীয় লোককে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিলে ভাল হয়। এই সকল লোকের মধ্যে ধর্ম্মযাজক, শিক্ষক, কারখানার যন্ত্রবিদ ও পরিচালক, ডাক্তার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। ভারতীয়

পুলিশ গুপ্তচর ধরিতে খুবই তৎপর।— আমাদের মনে হয় তাহারা শীঘ্রই বহু বিদেশী গুপ্তচরকে বহিষ্কৃত করিতে সক্ষম হইবে।

পরের কথা হইল যে, ব্রিটিশ ও আমেরিকান যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র এদেশে না আসিলে উক্ত দেশীয় যন্ত্রবিদ্‌গণকে এদেশে আনিবার কোনও প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং যে পরিমাণে ব্রিটিশ ও আমেরিকান যন্ত্র সাহায্য ভারতে কমিতে থাকিবে সেই অনুপাতে ঐ দেশের কর্মীসংখ্যাও এদেশ হইতে কমাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কারণ পাকিস্তানের উপর চাপ দিবার শ্রেষ্ঠতম উপায় হইল সেই চাপ পাকিস্তানের ব্রিটিশ-আমেরিকান বন্ধুদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত করা। যত অধিক সাহায্য ঐ দুই জাতির নিকট হইতে পাকিস্তান পাইবে ততই অধিক করিয়া ভারত হইতে ঐ দুই জাতির লোক সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাকিস্তান ব্রিটেনের ভারত শত্রুতার প্রতীক এবং ভারতের সর্বপ্রকার ক্ষতির চেষ্টা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকাল করিয়া আসিয়াছে এবং করিয়া চলিবে। সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্টেরও অন্তরে অন্তরে কিছুটা রহিয়া গিয়াছে; এবং ব্রিটিশ জাতির লোকেদের উপর বিশেষ করিয়া নজর না রাখিলে ভারতের নিঃসন্দেহ মহাক্ষতি হইবে। সম্মিলিত জাতি সংঘের শান্তিপ্রিয়তার মধ্যে অনেক সময় শান্তি অপেক্ষা মতলব হাসিল করিবার আকাঙ্ক্ষা অধিক প্রবল বলিয়া লক্ষিত হয়। ইহার কারণ উক্ত জাতি সংঘের মোড়ল জাতিগুলির সুবিধা ও পক্ষপাত। আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি জাতিগুলির নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করাই রাষ্ট্রধর্ম বলিলে ভুল হয় না। সুতরাং শান্তি শান্তি করিয়া চিৎকার করিলেও ভিতরের উদ্দেশ্য দেখা যায় ঐ সকল মহাজাতিগুলির প্রাধান্য রক্ষা করা।

পাকিস্তানের ও ভারতের যুদ্ধ লইয়া যে শান্তির চেষ্টা তাহার মধ্যেও রহিয়াছে শান্তির নাম করিয়া পাকিস্তানকে সামরিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া। পাকিস্তান শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত্র সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় ঘাঁটি দখল, ভারতীয় জাহাজী মাল জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার সাহায্যে কাশ্মীর যে কোন উপায়ে গ্রাস করার চেষ্টাও চলিতেছে। ভারত অবশ্য নেহরুর ঘুম কাটাইয়া আসিয়া চোখ খুলিয়া বাস্তব সত্যের সহিত পরিচয় ও সম্বন্ধ স্থাপনে তৎপরতা দেখাইতেছে। ইহার ফলে পাকিস্তানের পক্ষে নিজ প্রতিষ্ঠা জোরাল করিয়া লইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। ভারতের জনসাধারণও সজাগ। ঢিলা আদর্শবাদ আর কেহ চাহে না। নেতাদিগের তথাকথিত মানবতাবাদের কচকচি কেহ আর শুনিতে ব্যগ্র নহে। ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় মানব নীতি ও ধর্মের কত উচ্চ শিখরে উঠিতে সক্ষম হইবে তাহা শুনিয়া কাহারও আর রোমাঞ্চ হয় না। ধর্মপ্রাণ আদর্শবাদী জননেতাগণ এখন অরণ্যে রোদন করিতেছেন। যাঁহারা কাজের কথা বলেন, দেশের আত্মমর্যাদা রক্ষার কথা বলেন; তাঁহাদিগের কথা দেশবাসী শুনিতে উৎসুক। শান্তি আমরা চাহি। কিন্তু স্বাধীনতা কিংবা রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি খর্ব করিয়া শান্তি চাহি না। ন্যায়ধর্ম অটুট রাখিয়া যাহা কাম্য তাহা ছাড়িয়া দিতে কেহই রাজী নহেন। এই সকল কথাই আজ ভারতের নূতন রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথা।

খাদ্য সঙ্কট বা বণ্টন সমস্যা

ভারতের প্রায় চাষে ব্যবহৃত একশত কোটি বিঘা জমি আছে। ইহা যদি নিয়মিত চাষ করা হয়, সার ও জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা প্রয়োজনমত ঠিক রাখিয়া, তাহা হইলে বিঘা-পিছু যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা হইতে দশ জন লোকের বাৎসরিক খাওয়ার যোগাড় হইয়া যাওয়া উচিত। ভারতের প্রয়োজন বিঘা-পিছু চার-পাঁচ জন মানুষ ও দুই-একটি গাভীও চাষের বলদ-মহিষ পোষণ। ইহা ব্যতীত আছে অসংখ্য ইঁদুর, বাঁদর, পাখী, পোকা ইত্যাদি। এক বিঘা জমি দুইবার চাষ হইলে তাহা হইতে ২০।২৫ মণ খাদ্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। মাথাপিছু বাৎসরিক দুই-

আড়াই মণ খাদ্য ধরিলে আমাদিগের হিসাব মত মানুষ ও অর্থকরী জীবদিগের খাওয়ার ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। এমন কি শতকরা দশভাগ কীটপতঙ্গ, ইঁদুর, বাঁদর ও পাখীর জন্যও দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যদি খাদ্যাভাবের কথাটা সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, চাষ ঠিকমত সকল জমিতে হইতেছে না। অথবা অপচয়ের ভাগ অত্যধিক হইতেছে। এ অবস্থায় আমরা যে উপায়ে নিজেদের খাদ্যসংস্থান করিতেছি, তাহা আমাদিগের আত্মসম্মান-হানিকর হইতেছে, কেননা শত্রু সাক্ষাৎভাবেই শত্রু হোক, বা পরোক্ষভাবেই হোক, শত্রুপক্ষ খাদ্য সরবরাহ করিবে, সে ব্যবস্থা কখনও উত্তম হইতে পারে না। এই কারণে ভারতের নিজ খাদ্য সরবরাহ নিজেকেই করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে ভারতকে যে যে স্থলে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বন্টনে গোলমাল লক্ষিত হইবে সেই সকল স্থলে ব্যবস্থা, উন্নততর করিতে হইবে। এই সকল গোলমাল বা অব্যবস্থা ও অপচয়ের বিষয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত প্রতি বৎসর কত জমি কোথায় কোথায় ও কি কি কারণে চাষ হইতেছে না তাহার পূর্ণ বিবরণ থানা অনুসারে অবিলম্বে মহকুমা দফতরে ও সেখান হইতে জেলা ও প্রদেশ কেন্দ্রে জানান বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া আদেশ দেওয়া প্রয়োজন। যে সকল খবর আসিবে তাহা সত্য কি না তাহা পুনঃ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়া নিঃসন্দেহ সত্য অবস্থা কি তাহা নির্দ্ধারণ করার ব্যবস্থা প্রয়োজন। ইহার জন্য শত শত ব্যক্তির চাকুরি সৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই। প্রতি এলাকা হইতে বিশ্বাসযোগ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনাহারিভাবে কাজ করিতে বলিলে উপযুক্ত লোকের অভাব হইবে না। এই ব্যবস্থা সরকারী চাকুরেদিগের মনঃপুত হইবে না বলিয়া মনে হয়; কিন্তু প্রদেশ সরকার যেক্ষেত্রে এমন কি দেশরক্ষা ও পুলিশের কার্য্যেও অনাচারি ব্যক্তিদিগের সাহায্য লইতে আপত্তি করেন না, সেক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত অনুসন্ধান প্রভৃতির জন্যও দেশবাসীর নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া আমরা মনে করি। সরকারী দপ্তর ও রাষ্ট্রীয় দলগুলির সহিত যাহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারাই বিশেষ করিয়া নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হইবেন বলিয়া মনে হয়। সরকারী ও রাষ্ট্রীয় দলের লোকেরা নিজ নিজ মতলবের দৃষ্টিতে সকল কিছু দেখিয়া থাকেন, সেই কারণে তাঁহারা ততটা নির্ভরযোগ্য হইবেন না বলিয়াই মনে হয়। শুধু খালি চোখে তাকাইয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে প্রায় শতকরা দশ হইতে পঁচিশভাগ জমি চাষ না হইয়া পড়িয়া থাকে। কারণ, মামলা, ঝগড়া, বর্ষাভাব, বর্ষাধিক্য, বিদেশবাস, বন্ধক ঋণ, জুলুম ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অবস্থায় আইন জারি হওয়া প্রয়োজন যে-কোন জমি চাষ করা না হইলে তাহা দেশবাসীর তরফ হইতে নিযুক্ত লোকে চাষ করিবে। তাহার খরচ প্রভৃতি কি ভাবে লেনদেন হইবে তাহার ব্যবস্থা সহজেই করা যায়। প্রথমে প্রয়োজন ঠিকঠিক খবর যথাযথভাবে সংগ্রহ করিয়া প্রদেশ সরকারের সাহায্যে সাধারণের সহিত সংযুক্ত ব্যবস্থা করা।

যে সকল জমি চাষ হয় তাহার উৎপন্ন ফসল কি ভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ মালিক কতটা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিবে ও কতটা বিক্রয় করিবে সে বিষয়ে পূর্ণ খবর পাওয়া প্রয়োজন। সার বা জলের অভাব, খরচের পয়সার অভাব প্রভৃতি খবর এলাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও উৎপাদন সঙ্ঘের নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের জানা প্রয়োজন। ইঁহারা যে সকল ব্যবস্থা ও আয়োজনের অভাবে বিঘাপিছু ফসল উৎপাদন অল্প হইতেছে দেখিবেন, সেই সকল অভাব পূর্ণ করিবেন, যথাযথ নিয়মানুসারে। থানা, মহকুমা, জেলা, প্রদেশ হিসাবে পূর্ণ চাষের ব্যবস্থা করা অবিলম্বে প্রয়োজন। শুধু বক্তৃতা করিয়া কার্য্যশেষ করিলে চলিবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতে প্রদেশ সরকারগুলিকে জানান প্রয়োজন যে তাঁহারা যদি শতকরা ২০ ভাগ অধিক ফসল উৎপাদনে সক্ষম না হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রদেশ পরিচালনের কার্য্য হইতে অপসৃত করা যাইতে পারিবে। জেলার, মহকুমার ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে ঐ প্রকারে কর্ম্ম হইতে অবসর দিবার কথা উঠান যাইতে পারে। সফলতার পুরস্কারের ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

করদাতাদিগের অর্থ অপব্যয় করিবার আর একটি পথ খুলিয়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। খাদ্য উৎপাদন অত্যন্ত লাভের ব্যবসা আজকাল। সুতরাং খাদ্য উৎপাদন ব্যবসা হিসাবে, অন্তত ব্যবসার মত করিয়া চালান প্রয়োজন। যাঁহারা উৎপাদনের সাহায্যার্থে ঋণ লইবেন তাঁহারা যথাযথ সুদ দিবেন। উৎপন্ন খাদ্যবস্তুর যে অংশ বিক্রয় করা হইবে তাহা উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিবে সরকারী-সাধারণ মিলিত খাদ্য উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় সঙ্ঘ। পরে বিক্রয় মূল্যও নির্দ্ধারিত হইবে সকল খরচ ও ন্যায্য লাভ হিসাব করিয়া।

খাদ্য উৎপন্ন হইবার পর দেখা যায় তাহা ঠিক ভাবে না রাখার ফলে অনেক খাদ্যবস্তু নষ্ট হইয়া যায়। ইঁদুর ও কীট প্রভৃতির আক্রমণে আরও অনেক খাদ্যবস্তু নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল মানব-অনিষ্টকর জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করা প্রয়োজন। ইঁদুর মারিবার ব্যবস্থা দেশব্যাপীভাবে করিলে সম্ভবত খাদ্য আমদানী করার আর প্রয়োজন হইবে না। কারণ অনুমান শতকরা দশভাগ খাদ্যবস্তু ইঁদুরে খাইয়া যায়। এই কারণে দেশের সর্ব্বত্র ইঁদুর মারিবার ব্যাপক অভিযান করা প্রয়োজন। ক্ষেত্রে ফসল থাকিতে যে সকল কীট ও পক্ষীর আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় সেই-গুলিকেও মারিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। ইহার জন্য জনসাধারণের মধ্যে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি প্রয়োজন। শুধু নেতাদিগের বক্তৃতায় কোন কাজ হইবে না। সর্ব্বসাধারণকে কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া নিজ হস্তে কিছু কিছু কাজ করিতে হইবে।

ভারতের মোট খাদ্যবস্তুর পরিমাণ ও মূল্য কত? ইহার হিসাব করা কঠিন কার্য্য। তবে এ কথা বলা যায় যে, সমগ্র ভারতের সকল ব্যক্তির সকল আয় একত্র যোগ করিলে প্রায় বাৎসরিক ১৫।১৬ হাজার কোটি টাকা মোট আয়ের আর্থিক মূল্য হইতে পারে। ভারতীয় মানুষ খুবই গরীব। এই কারণে এই মোট আয়ের প্রায় শতকরা ৭০।৮০ ভাগ খাদ্যের উপর ব্যয় হয় ধরা চলিতে পারে। অর্থাৎ মোট খাদ্যবস্তুর মূল্যের পরিমাণ বাৎসরিক ১১।১২ হাজার কোটি টাকা ধরিলে তাহা অন্যায় হইবে না। আমাদিগের চেষ্টা করা প্রয়োজন আরও ১,০০০ হাজার কোটি টাকার খাদ্যবস্তু উৎপাদন করিবার জন্য। ইহার জন্য যে জমি বা জলাশয় প্রয়োজন তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। শ্রমশক্তি লাগাইয়া দ্রব্য উৎপন্ন হইলে তাহার লাভ যে শ্রম করিবে সে যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র বিষয়টি ব্যবসায় মত করিয়া চালাইতে হইলে বহু শত কোটি টাকা ইহাতে ব্যয় হইবে। সুতরাং এই কার্য্য সাধারণের প্রচেষ্টা হিসাবে চালান প্রয়োজন। নতুবা ১২ কোটি টাকা লাগাইয়া ১,০০০ হাজার কোটি টাকার মাল প্রস্তুত হইতে পারে না। অর্থাৎ যাঁহারা এই বর্দ্ধিত খাদ্যবস্তু উৎপাদন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন তাঁহারা যথাসম্ভব নিজেদের চেষ্টাতেই কাজ চালাইয়া লইবেন। ঋণ গ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি কোনও সরকারী সাহায্য না লইয়া নিজেদের প্রচেষ্টা হিসাবে চালাইতে হইবে। তাহা না করিলে অধিক খাদ্যবস্তু উৎপাদন কার্য্য ফলবান হইবে না। অতএব ভারত ও প্রদেশ সরকারগুলির চেষ্টা নিয়ন্ত্রণের পথে না চালাইয়া জনসাধারণের মধ্যে নবপ্রেরণা জাগ্রত করিবার দিকে চালানই বাঞ্ছনীয়। অন্যথা কোন কিছুই বিশেষ হইবে না। কারণ সরকারী ধারণা অনুসারে দশ, বার কিংবা পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করিয়া যাহা উৎপন্ন করান যাইবে তাহাতে দেশবাসীর খাদ্য সমস্যা দূর হইবে না। আমদানী গম অথবা চাউল যাহা পাওয়া যায় সেই পরিমাণ গম ও ধান উৎপন্ন হইতেও পারে হয়ত। কিন্তু ভারতের খাদ্য সমস্যার সহিত সেই আমদানীর কোনও গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। তাহা শুধু শহরে লোকদের সরকারী "রেশনিং" সহজ উপায়ে চালাইবার পন্থামাত্র। আসলে যে দেশের লোক আধপেটা খাইয়া থাকে তাহা ঠিক করা ঐ উপায়ে চলে না। "রেশনিং"ও তাহার কোন প্রতিবিধান নহে। "রেশনের" চাউল ও আটা গ্রামদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসা সহজ কার্য্য নহে। জাহাজে মাল আসিলে "রেশনিং" সহজ হয়। এই কারণে জাহাজে মাল আনয়ন ভারত সরকার পছন্দ করিয়াছিলেন। খাদ্যবস্তু জমাজাত করিয়া রাখিলে হঠাৎ প্রয়োজন হইলেও তাহা খুবই সুবিধার কথা। যে দেশে দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক একটা চিরস্থায়ী প্রতীতি সে দেশে

সর্বদা বহু লক্ষ মণ গম ও চাউল ভাণ্ডারে রক্ষিত থাকিলে রাজকর্মচারিগণ শান্তিতে হয়ত রেশনিং বলিয়া শাসনকার্য্য চালাইতে সক্ষম হন। এই সকল কারণে ক্রমশঃ বহির্দেশ হইতে খাদ্যবস্তুর আমদানী প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

উপযুক্ত মূল্য দিয়া দেশের গ্রামাঞ্চল হইতে খাদ্যবস্তু আনিবার ব্যবস্থা করিলে সম্ভবত আমদানী না করিলেও "রেশনিং" চলিতে পারে। কিন্তু যদি খাদ্যবস্তু উৎপাদন এতটা বর্দ্ধিত করা যায় যাহাতে সত্য সত্যই তাহার পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে "রেশনিং" আর প্রয়োজন হয় না। এবং সেই বর্দ্ধিত হারে খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টা যদি জনসাধারণের কল্যাণার্থে সুসাধিত হইতে পারে—লাভের জন্য নয়—তাহা হইলে ঐ এক আঘাতে ক্ষুধা ও কালোবাজার এই দুই শত্রুই নিপাত হইতে পারে।

এখন দেখা যাক্ যে ভারতের মোট চাষের জমি আরও বাড়ান যায় কি না। এই বিষয়টি উত্তমরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে ভারতের আরও প্রায় ৯০ কোটি বিঘা জমি আছে, যাহাতে চাষ করা সম্ভব কিন্তু কখনও চাষ করা হয় নাই। এই সকল জমি চাষের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইলে অনেক পরিশ্রম ও কিছু অর্থব্যয় করা প্রয়োজন। বিঘাপিছু যদি একশত টাকা খরচ করা যায় তাহা হইলে এই সকল জমির সংস্কার করিতে নয় হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইতে পারে। এবং এই টাকার পরিমাণ অনায়াসে বিঘাপিছু দুই শত টাকা হারে ব্যয় হইলে বার হাজার কোটিও হইতে পারে। সে যাহাই হউক, চাষের উপযুক্ত জমির মূল্য (সেলামি) আজকাল ৫০০।১,০০০ টাকা বিঘা হইয়া থাকে; এবং তাহার খাজনাও যাহা হয় তাহাও লাভজনক। সুতরাং প্রদেশ সরকারগুলির তরফ হইতে যদি এ জাতীয় জমিগুলি অল্প মূল্যে মালিকদিগের নিকট হইতে লইয়া তাহার সংস্কার করিয়া পুনরায় চাষের জন্য বিলি করা হয়, তাহা হইলে খরচের টাকা উঠিয়া কিছু লাভও হইতে পারে। এই সংস্কার কার্য্য বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন রূপ হইতে পারে; এবং তাহার ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিবেচনা মত হওয়া প্রয়োজন। এই উপায়ে প্রতি বৎসরে যদি এক কোটি দুই কোটি বিঘা জমি চাষে লাগান সম্ভব হয় তাহা হইলে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যবস্তু উৎপাদনও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে পারে। জমি সংস্কার করিয়া বিলি করিলে যাহা লাভ হইবে সেই অর্থে গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট কারবার স্থাপন করিয়া গ্রাম হইতে শহরে চলিয়া আসা বন্ধ করা যাইতে পারে।

ভারতের কৃষি সম্পদ বৃদ্ধি করিলে তাহার আয় সহজেই দ্বিগুণ হইতে পারে। কারখানা খুলিয়া যাহা করিতে এক লক্ষ কোটি টাকা মূলধন লাগিবে, কৃষির ক্ষেত্রে সেই কার্য্য ১০।১৫ হাজার কোটি টাকাতেই হইতে পারে। এবং সেই সম্পদ বৃদ্ধির সহিত কারখানার ধোঁয়া, নিকৃষ্ট জীবনযাত্রা, চোলাই মদ্যপান ও অপরাপর চরিত্রহীনতা জড়িত না থাকাতে জাতীয় উন্নতির দিক হইতে তাহার মূল্য তুলনায় আরও অধিক প্রমাণ হইতে পারে। সকল দিক দিয়াই চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি জাতীয় মঙ্গল ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের উপযুক্ত পন্থা। যে সকল কারখানা গঠন করিলে জাতীয় জীবন পূর্ণতর হইতে পারে, সেগুলির গঠন আবশ্যক। কিন্তু শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভের খাতিরে কারখানার সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া যাওয়ার একটা ক্ষতির দিক আছে, তাহা মনে রাখা কর্তব্য।

রাষ্ট্রপতির দেশভ্রমণ

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ মহাপণ্ডিত ও তদুপরি রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানে ও বিচারে সুদক্ষ। তিনি তাঁহার বর্তমান উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ও জগতের জ্ঞানী ও গুণী মহলে তাঁহার নাম সুপরিচিত ছিল। তাঁহাকে কেহ কোন রাষ্ট্রীয়দলের সহিত কখন সংযুক্ত বলিয়া দেখিত না; এবং তাঁহার দেশ-প্রেম রাষ্ট্রীয়দলের মতলববাদের ভেজাল-বর্জ্জিত বলিয়া স্বাভাবিক আবেগপ্রসূত ও সত্য। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ সম্প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া ও সেই সকল দেশের রাষ্ট্রনেতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। এই ভ্রমণে ভারতের বিষয়ে যে সকল মিথ্যা প্রচার পাশ্চাত্যের কোন কোন মহাদেশের চেষ্টায় ও সমর্থনে সর্বত্র

সজোরে চালান হইতেছে, সেই সম্বন্ধে জগতের লোকের মত্য কি তাহা জানিবার সুবিধা হইয়াছে। জগতের লোকে জানিতে পারিয়াছে যে পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণ কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে উদ্ভূত নহে। ব্রিটেন যখন ভারতকে বিভক্ত করিয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি করে তখন যদি জনমত গ্রহণ করা হইত তাহা হইলে শতকরা ৮০ জন ভারতবাসী পাকিস্তান গঠনের বিরুদ্ধে মত দিত। কিন্তু সে সময় শুধু মুষ্টিমেয় দুই-চারিজন লোকের ইচ্ছায় ভারত বিভাগ করা হয়। কারণ কি ছিল ইহার? দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম ও মারপিট; যাহার মূলে ছিল ব্রিটিশের অর্থে পুষ্ট মুসলিম লীগ দল। ব্রিটিশের রাষ্ট্রীয় অভিধানে দাঙ্গাবাজির অর্থ যতই সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চ রাষ্ট্রনীতির সহিত মিলিত হউক না কেন, বর্ত্তমান জগতে খুনখারাবি ও লুণ্ঠন নীতি অনুসারে জগতজনের রাষ্ট্রমত চলিতে পারে না। সুতরাং পাকিস্তানী কায়দায় রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলে জগতে কোন রাষ্ট্রই নিরাপদে থাকিতে পারিবে না।

যেখানে সাম্রাজ্যবাদ চলে কিংবা উপনিবেশ স্থাপন করা হয় সেখানে বিপ্লবের স্থান আছে স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে শুধু দেশ দখল করিয়া রাজত্ব বিস্তারের কথামাত্র আছে, সেখানে গায়ের জোরে কোনও অধিকার প্রমাণ করা যায় না। তিব্বতে চীনের দেশ দখল করা অথবা পাকিস্তানের কাশ্মীর দখল করিবার চেষ্টা এই জন্য জগতজন-মতে হেয়। শুধু আমেরিকা ও ব্রিটেনের মতে তাহা শ্রেয়, কেননা উক্ত দুই মহাদেশই গায়ের জোরে ন্যায় ও নীতি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করে। আমেরিকার কালো আমেরিকানদিগের অবস্থা, অথবা অন্যান্য দেশে আমেরিকানদিগের সশস্ত্রভাবে ন্যায়ের অভিযান চালানর ফলে আমেরিকার সুনাম কিছু কিছু মেঘাচ্ছন্ন ভাবে থাকে। ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদ ও পরদেশ লুণ্ঠনের ইতিহাস সর্ব্বজনজ্ঞাত। বর্ত্তমানেও এডেনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কি করিতেছে তাহা সকলেই জানেন।

ভারত বিভাগ করিয়া যখন পাকিস্তান গঠিত হয় তখন একথা কেহ স্বীকার করিয়া লয় নাই যে, কোন স্থলে মুসলমান জনসংখ্যা অধিক থাকিলে সেই স্থলে পাকিস্তানের রাজত্ব মানিয়া লইতে হইবে। ইহা যদি স্বীকৃত হইত তাহা হইলে ভারতের বহু স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাকিস্তান এলাকা গঠিত হইত এবং পাকিস্তানেও বহু স্থলে "হিন্দুস্তান" গঠন করিতে হইত। অর্থাৎ কাশ্মীরে মুসলমান অধিক আছে বলিয়াই সে দেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে এই যুক্তির কোন মূল্য নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে পাকিস্তান ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গায়ের জোরে বিপ্লব বা জেহাদের অভিনয়ের আড়ালে কাশ্মীর দখল করিবার চেষ্টা করিত না। ঐ জবরদস্তির দ্বারা পাকিস্তান ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে, তাহার কাশ্মীরের উপর কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই। সে সময় পণ্ডিত নেহরু ব্রিটিশের প্ররোচনায় মানিয়া লয়েন যে, পাকিস্তান ফৌজ কাশ্মীর ছাড়িয়া নিজ দেশে চলিয়া যাইলে জনমত গ্রহণ করিয়া বিচার করা যাইবে যে, কাশ্মীরের অধিবাসিগণ পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে চায় কি না। কিন্তু পাকিস্তানের ফৌজ একদিনের জন্যও তাহাদিগের অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চল ছাড়িয়া নিজ দেশে ফিরিয়া যায় নাই। সুতরাং সেইভাবে জনমত গ্রহণ করাও হয় নাই। ইতিমধ্যে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানী নিয়মে শাসিত হইয়াছে; অর্থাৎ সামরিক একনায়কত্ব নীতি অনুসারে। ভারতীয় কাশ্মীরে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি প্রচলিত রহিয়াছে। সেই স্থলের লোকেরা নিজেরা নির্ব্বাচন করিয়া নিজ প্রদেশে শাসনকার্য্য চালাইয়া থাকে। তাহারা কোন সময় ভারত ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে সংযুক্ত হইবার কোনও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে নাই। বরঞ্চ ভারতে সংযুক্ত থাকিবার ইচ্ছাই তাহারা বহুবার দ্ব্যর্থবর্জ্জিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত কাশ্মীরের ভারতে যুক্ত হওয়া আইনতঃ সঠিক ভাবে হইয়াছিল একথা পাকিস্তানের জনকজাতিরাও স্বীকার করে। সুতরাং পাকিস্তানের ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের কাশ্মীরের একাংশ দখল আন্তর্জ্জাতিক আইনবিরুদ্ধ এবং সেই জুলুমের প্রতিবাদে ভারতের পাকিস্তান আক্রমণের অধিকার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। বর্ত্তমানে পাকিস্তান যে পুনর্ব্বার কাশ্মীর দখল করিতে যুদ্ধ করিয়া চেষ্টা

করিয়াছে; তাহা আরও দুর্নীতিপূর্ণ এবং সে কারণে ভারতের পাকিস্তান আক্রমণ বিশেষ করিয়া ন্যায় ও আন্তর্জাতিক আইনসঙ্গত। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের যে ব্রিটিশ আমেরিকান প্ররোচিত পাকিস্তানের দুর্নীতি-সমর্থক মনোভাব; তাহার কোনও সাফাই কোনও ন্যায় বা নীতিশাস্ত্র মতে পাওয়া চলে না। মাদ্রিদ, লিসবন অথবা লণ্ডনের যে কোন সংবাদপত্র যাহাই বলুক না কেন, ন্যায় ও সত্য তাহাতে বিপরিত পথে চলিতে পারে না।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ভারতের ও পাকিস্তানের বিষয়ে যাহা যাহা আলোচনা করিয়া জগতবাসীকে বুঝাইয়াছেন তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় অধিকারে একাধিপত্য, অথবা সামরিক শক্তি ব্যবহারে—এমন কি সেই অন্যায়লব্ধ ধর্মরাষ্ট্রীয় অধিকারও কাড়িয়া লওয়া প্রভৃতি যে সকল মধ্যযুগের রাজ্যাধিকার সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তান চলিতেছে, সেই জাতীয় রাষ্ট্রের স্থান সভ্যজগতে থাকিতে পারে না। স্বাধীনতা মানবতাকে খর্ব করিয়া শুধু গায়ের জোর দেখাইয়া কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রমাণ হয় না। ব্রিটিশ-আমেরিকান অর্থ ও অস্ত্রবল থাকিলেও পাকিস্তান পূর্বকালের বর্বর সমরশক্তির উপরে গঠিত ও রক্ষিত। ভারতে স্বাধীনতা ও মানবতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। আমেরিকা ও ব্রিটেন যে অপরাধে জার্মান জাতির অশেষ লাঞ্ছনা করিয়াছে ও আণবিক বোমা ব্যবহার করিয়া জাপানকে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে, আজ ঐ দুই মহাজাতি সেই সকল অপরাধই পাকিস্তানের বর্বরোচিত কার্যকলাপে সমর্থন করিতেছে।

সোকর্ণের স্বরূপ

বর্তমান যুগে কত অজানা লোকই যে বিশ্বের দরবারে পরিচিত হইতে চাহিতেছে তাহা গণনা করা কঠিন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে পৃথিবীর মানচিত্র ক্রমশঃ সংখ্যাবহুল হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং কোথাও কোথাও নূতন সাম্রাজ্যের সৃষ্টিও হইতেছে। এই সকল সাম্রাজ্য ও রাজত্ব বহুক্ষেত্রেই অগভীর ভিত্তির উপর গঠিত। ইহাদিগের শিকড় ইতিহাসের মাটিতে অল্পদূরই প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, এবং এই সকল রাজত্ব ও সাম্রাজ্য সামান্যমাত্র ঝঞ্জার আঘাতে পতনের লক্ষণ দেখায়। কারণ জাতি, ধর্ম, ভাষা, সভ্যতা বা কৃষ্টির বন্ধন ইহাদিগের ঢিলা ও কমজোর। সোকার্ণোর সাম্রাজ্য বা রাজ্য পরিসরে বৃহৎ হইলেও সর্বক্ষণই অপরের সাহায্য লাভের জন্য যথাতথা ধাবমান। রুশ, আমেরিকা, ব্রিটেনের কথাই নাই, চীন কিংবা পাকিস্তান হইলেও চলে। এ অবস্থায় সোকার্ণো আজ যাহার সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বন্ধুর প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করিয়া জগতজনের কান ঝালাপালা করিয়া তোলে; কাল আবার সেই বন্ধুরই সহিত শত্রুতা করিয়া সকলকে অবাক করিয়া দেয়। ভারতের সহিত সোকার্ণোর বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এইরূপ ভাবেই দেখা দিয়াছিল। ভারতের নিকট সোকার্ণো অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়া পরে চীনের প্ররোচনায় ভারতকে ইতরভাবে অপমান করিবার চেষ্টা করে। সম্প্রতি সোকার্ণোর সাম্রাজ্যে নানা প্রকার রাষ্ট্রীয় স্রোত পরস্পরবিরুদ্ধ গতিতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে বহমান হইয়া জগতবাসীজনের একটা বিস্ময়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে চীন-প্ররোচিত ও অদেশীয় অর্থ ও অস্ত্রে সজ্জিত একটা বিপ্লব আরম্ভ হইল এবং সোকার্ণোর অনেকগুলি সেনাপতির এই বিপ্লবে প্রাণহানি হইল। সোকার্ণো এই সময় গা ঢাকা দিয়া রহিয়া বিষয়টা আরও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিল। পরে শুনা যাইল যে, কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীগণ মার খাইয়া হটিয়া গিয়াছে ও সোকার্ণো আবার পূর্ণ শক্তিতে রাজত্ব করিতেছে। ইহা কি আমেরিকার সাহায্যে হইল, না রুশের? সে কথার উত্তর পাওয়া সম্ভব হইল না; কিন্তু শুনা যাইল যে, কম্যুনিষ্ট বিপ্লব শেষ হয় নাই। কম্যুনিষ্ট সৈন্যগণ মধ্য জাভাতে বাকি যুদ্ধ চালাইয়া চলিয়াছে। সোকার্ণো বোধ হয় তাহাদিগের সহিতও জড়িত আছে। সোকার্ণো জেনারেল সুহার্তকে মন্ত্রিত্ব দান করিয়া তাহাকে বিপ্লবীদিগের সহিত লড়াই চালাইতে নিযুক্ত করিয়াছে বলিয়া সোকার্ণোর দরবারের খবর।

এদিকে চীনা রাষ্ট্রদূতকে ডাকিয়া ধমকানি দেওয়া হইয়াছে, কেন চীনাদিগের রাষ্ট্রদূত নিবাসে কম্যুনিষ্ট দ্বারা নিহত জেনারেলদিগের জন্য শোক প্রকাশ করা হয় নাই। চীনা রাষ্ট্রদূত শুধু স্মিতহাস্য করে; কোনও উত্তর দেয় নাই। সোকার্ণোর পদাতিক বাহিনী ও নৌবহর তাহার তরফে লড়াই করিতেছে। আকাশ বাহিনী কি করিতেছে কেহ পরিষ্কার বলিতে পারে না। সোকার্ণো জাকার্তায় নিজ প্রাসাদে বসিয়া রাজত্ব চালাইতেছে। কে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, কেনই বা করিতেছে, তাহা কাহারও জানা নাই। সম্ভবত সকলে লড়াই করিতেছে সোকার্ণোর নেক-নজরে পড়িবার আশায়। সেই পুরাকালের রাজকন্যা যাহা বৃত হইবার জন্য যুদ্ধের মত। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সোকার্ণো মালাদান করিবে বিজেতাকে। সকলেই সোকার্ণোর প্রণয়প্রার্থী। কেহ তাহার শত্রু নহে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম সোকার্ণো বুঝি এইবার অস্ত গেল। কিন্তু দেখিতেছি তাহা নহে। সোকার্ণো সকলকে লড়াইয়া, বাচাই করিয়া, বাছাই করিয়া, সেরা যোদ্ধা পরিবৃত হইয়া নূতন আবেগে সাম্রাজ্য বিস্তারে লাগিবে। অভিজাত শ্রেষ্ঠ ও ইতরশ্রেষ্ঠের কপালের লিখন অনেক সময় একই রকম হয়। অথবা হয়ত সকলে আশা করিয়াছিল সোকার্ণো মরণোন্মুখ এবং সেই জন্যই তাহার মৃত্যু হইলেই কে রাজ্য দখল করিবে তাহা স্থির করিবার জন্য এই গোলাগুলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সময়টা ঠিক হিসাব করিয়া নির্দ্ধারিত করা যায় নাই; তাই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন নেতাগণ নিজ নিজ যোদ্ধাদল লইয়া লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু সোকার্ণো মরিল না! ইহাতে একটা বিষয় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ইন্দোনেশীয়ার সাম্রাজ্যে কখনও সম্রাটের অভাব হইবে না। রুশ হউক, চীন হউক, আমেরিকা হউক, কেহ না কেহ একটা সম্রাট খাড়া করিয়া দিবে সিংহাসন খালি হইলেই।

রোডিসিয়া

আফ্রিকায় যে সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইয়োরোপীয়গণ পরের দেশ দখল করিয়া সেই সকল দেশের লোকদের উপর প্রভুত্ব করিয়া শ্বেতপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, রোডিসিয়া সেই সকল উপনিবেশের অন্যতম। এই দেশে বর্ত্তমানে ৩৯ লক্ষ আফ্রিকান ও ২ লক্ষ ১৭ হাজার ইয়োরোপীয়ের বসবাস। বিগত চল্লিশ বৎসর কালের অধিক সময় ব্রিটিশদিগের এই উপনিবেশে আফ্রিকানদিগের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হয় নাই। তাহার জন্য ব্রিটিশগণই দায়ী। দুই লক্ষ লোক ৩৯ লক্ষের উপর প্রভুত্ব করিবে ইহাতে কোনও দোষ ব্রিটিশগণ পূর্ব্বে দেখে নাই। এখন ব্রিটিশগণ চাহিতেছে যে আফ্রিকানদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু রোডিসিয়ার শ্বেতকায়গণ সে কথা মানিতে চাহে না। ব্রিটিশদিগকে তাহারা শাসাইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবে নিজেরাই। আফ্রিকানদিগের সহিত সহযোগিতায় তাহারা বিশ্বাস করে না। ব্রিটিশগণ তাহাদিগকে বলিয়াছে ঐরূপ কার্য্য বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাদিগকে ঐভাবে স্বাধীনতা আহরণ চেষ্টা করিলে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইবে। ব্রিটিশগণ প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়াই বিদ্রোহ দমন করিবে। এই উচ্চ আদর্শের কথা বলিয়া ব্রিটেন জগতের নিকট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

এডেন

ওদিকে আরব দেশে এডেনে ব্রিটিশ শাসকগণ আরবদিগকে রাষ্ট্রিয়ভাবে দমন করিবার চেষ্টা করিয়া বিশ্ববাসীর নিকট হেয় প্রমাণিত হইতেছে। এই স্থলে সম্ভবতঃ ব্রিটেনের সাক্ষাৎভাবে আর্থিক লাভলোকসানের কথা উঠিতেছে। আমাদিগের মতে ব্রিটেনের এডেন দখল করিয়া লাভ করিবার কোন অধিকার না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ব্রিটেনের অতিবড় দুর্ভাগ্য যে ব্রিটেনের জাতীয় মহত্ত্ব কখনও শেষ রক্ষা করিতে পারে না। ব্রিটিশগণ কর্ম্মীলোক। তাহাদিগের পরস্বলুণ্ঠন অথবা পরদেশ দখল করিয়া জীবননির্ব্বাহ করিবার কোন প্রয়োজন না হইবার কথা। তাহা হইলেও ব্রিটিশদিগের জ্ঞানচক্ষু কিছুতেই পূর্ণ উন্মীলিত হয় না।

স্বর্ণ, রৌপ্য ও অপরাপর ধাতু

আন্তর্জ্জাতিক বাজারে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অপরাপর ধাতুর চাহিদা সদা বর্ত্তমান থাকে এবং এই সকল ধাতু নানান ভাবে সর্ব্ব দেশেই বিক্রয় হইতে পারে। ভারতের বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায়, প্রয়োজনের অনুপাতে, বিভিন্ন উপায়ে সেই ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রয়োজন। যুদ্ধের সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবহার্য্য তহবিলে দেশের লোক সম্ভবত স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত তহবিলের উপর দেশের অর্থসচিবের দপ্তরের অন্য প্রকার খরচের জন্য হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিলে এইরূপ দান হয়ত ততটা পাওয়া যাইবে না। শুধু যুদ্ধের সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য যদি স্বর্ণ-রৌপ্য চাওয়া যায় তাহা হইলে কি প্রকার সরঞ্জামের জন্য কত পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রয়োজন হইবে তাহা জনসাধারণকে পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দেওয়া দরকার। যথা, প্রত্যেকটি বোমারু হাওয়াই জাহাজের জন্য কতটি স্বর্ণ লাগিবে, অথবা রৌপ্য। প্রতিটি লড়িয়ে হাওয়াই জাহাজ, হাওয়াই জাহাজ মারিবার তোপ, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য তোপ, রকমারি যুদ্ধ জাহাজ, সকল প্রকার গোলাগুলী, ইত্যাদি, ইত্যাদি দেখাইয়া তাহার স্বর্ণে বা রৌপ্যে ক্রয়মূল্য বিবৃত করিলে প্রতি শহরের বাসিন্দা-দিগকে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা এই পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া দিন। ভারতে ৬,০০০ বা ততোধিক শহর আছে। তাহার জনসংখ্যা যদি দশ কোটি ধরা যায় ও সেই লোকেরা যদি ধরা যায় দুই কোটি পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করেন; তাহা হইলে মনে হয় এই সকল লোকের মধ্যে আট কোটি লোক স্বর্ণ দান করিলেও মাথাপিছু অর্দ্ধ তোলার অধিক দিতে পারিবেন না। রৌপ্য হয়ত পাঁচ দশ তোলা দিতে পারিবেন। যদি ইহাতে ৩০।৪০ কোটি তোলা রৌপ্য ও দুই কোটি তোলা স্বর্ণ সংগ্রহ হয় তাহা হইলে সেই স্বর্ণ-রৌপ্য আন্তর্জ্জাতিক বাজারে ভারতীয় হিসাবে ২৫০।৩০০ কোটি টাকার যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয়ের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। শহরের যে বাকি দুই কোটি লোক যাঁহাদের অবস্থা উন্নততর তাঁহারা অনায়াসেই অবশিষ্ট আট কোটি লোকের সমান সমান স্বর্ণ-রৌপ্য দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ভারতের এই উপায়ে ৫০০।৬০০ কোটি পরিমাণ আন্তর্জ্জাতিক ক্রয়শক্তি লাভ হইতে পারে। এই ক্রয়-শক্তি লাভ হইবে কি না তাহা নির্ভর করিবে পূর্ণরূপে দেশের লোক সরকারী লোকেদের কতটা বিশ্বাস করেন তাহার উপর। জন-নেতাদিগের নিজেদের দলের অনুচরদিগের উপর প্রভাব আছে ও ব্যবসায়ীদিগের উপরেও কিছুটা আছে। কিন্তু সেই জাতীয় লোকের সংখ্যা অতি অল্পই হইবে। সুতরাং সরকারী কর্ম্মচারী ও সাধারণের নির্ব্বাচিত লোকের মিলিত চেষ্টা নির্ভরযোগ্যতার উপর সংগ্রহ কার্য্যের সফলতা নির্ভর করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য ধার করিয়া লওয়ার চেষ্টা বৃথা হইবে বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহার ব্যবস্থা করিতে যাহা খরচ হইবে, সেই অনুপাতে কর্জ্জ যথেষ্ট পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা সঞ্চিত সম্পদ দিবেন তাঁহারা দেশপ্রেমের আবেগেই দিবেন। সুদ পাইবার জন্য দিবেন না। কারণ সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য হইতে কোনও আয় হইবে সে আশা কেহ করে না।

স্বর্ণ-রৌপ্যের কথা হইল। এখন দেখা যাক্ অপর কি সম্পদ আমাদিগের আছে, যাহার পরিবর্ত্তে আমরা আন্তর্জ্জাতিক বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিতে যাইতে পারি। প্রথমত আছে অব্যবহার্য্য "স্ক্র্যাপ" লৌহ, ইস্পাত, তামা, পিতল, সীসক, দস্তা, টিন প্রভৃতি। লৌহ, ইস্পাত সংগ্রহ করিলে অনায়াসে বহু লক্ষ টন পাওয়া যাইতে পারে। সকল কারখানার মালিকদিগকে বলিলে তাঁহারা বিভিন্ন প্রকারের "স্ক্র্যাপ" দান করিতে পারেন। এই সকল সংগ্রহ এবং ব্যক্তিগত ভাবে যে যাহা দিবেন তাহা একত্র করিলে ১০০।২০০ কোটি টাকার বিদেশী ক্রয়শক্তি আহরণ অসম্ভব

নহে। ঋণ করিবার যদি চেষ্টা হয় তাহা হইলে ভারতের বাহিরে যে সকল ভারতবাসী আছেন তাঁহাদিগের নিকট ঋণ করিলে বিদেশী অর্থে তাহা পাওয়া যাইবে। যথা, যদি ভারতের বাহিরে পাঁচ লক্ষ ভারতবাসী থাকেন ও তাঁহারা যদি সকলে মোটমাট মাথাপিছু দশ পাউণ্ড বা পঁচিশ ডলার মাতৃভূমিকে ঋণ হিসাবে দেন তাহা হইলে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড অথবা এক কোটি পঁচিশ লক্ষ ডলার পাওয়া যাইতে পারে। উপযুক্ত সুদে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে আরও অধিক টাকাও পাওয়া সম্ভব হইতে পারে।

হীরা-জহরত ভারতে যে কিছুই নাই তাহা নহে। কিন্তু যে সকল মূল্যবান বস্তু আছে শুধু ঐশ্বর্য্যশালীদিগের নিকট। তাঁহারা যদি অন্ততঃ তাঁহাদিগের সঞ্চিত হীরা-মণিমুক্তার কিছু অংশও দেশের মঙ্গলের জন্য দান করেন তাহা হইলে তাহার বিদেশে মূল্য অনেক হইবে। বড়তি-পড়তি জিনিস অনেকগুলি না দিয়া, ভাল জিনিস সংখ্যায় অল্প দিলে বিদেশে তাহার মূল্য অধিক পাওয়া যাইবে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই লোকের মনে ঐ এক কথাই জাগ্রত হইবে। এই সকল দান গ্রহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা হইবে, না বিভিন্ন প্রকারে ঐ সম্পদ অপব্যয় করা হইবে? দেশের লোকের মনে বিশ্বাস জাগাইতে হইলে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে কাহারও মনে সন্দেহ না হয় যে, এই প্রচেষ্টা অন্যথা অর্থ আদায়ের আর একটা অজুহাত মাত্র। সেই বিশ্বাস জাগাইতে হইলে আমাদিগের পুরাতন নেতাদিগের দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। যে সকল চাঁদা তোলা হইতেছে তাহার পরিমাণের কথা দেখিয়া উহাই মনে হয়। কারণ ভারতের জনসংখ্যা যদি ৪৫ কোটি হয় তাহা হইলে মাথাপিছু চার আনার মোট পরিমাণ এগার কোটি টাকার অধিক হইত। ভারতের সকল লোকের সকল বাৎসরিক আয়ের মোট পরিমাণ যদি ১৫ হাজার কোটি টাকা হয় তাহা হইলে সকলের একদিনের আয় হইবে চল্লিশ কোটি টাকার অধিক। এক ঘণ্টার আয় হইবে পাঁচ কোটি টাকা। অতএব যদি বলা যায় যে, ভারতের লোকেরা তাহাদিগের জোয়ানদিগের উপর অসীম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও টাকা দিয়া দেশরক্ষার কার্য্যে যথাযথ সাহায্য করিতেছে না তাহা হইলে সেইরূপ ব্যবহারের কারণ কি? টাকার অভাব নিশ্চয়ই নহে। নিবেদন-আবেদন কিংবা চাহিবার ব্যবস্থার অভাবে কিছুটা হইতে পারে। যাঁহারা টাকা তুলিতেছেন তাঁহাদিগের উপর ভক্তি, ভালবাসা ও বিশ্বাসের অভাবও হইতে পারে। মনে হয় এই ক্ষেত্রেও সেই প্রতিরক্ষা কার্য্যের ব্যবস্থার বেয়াড়াব সংক্রামিত হইয়াছে। অর্থাৎ যখন সেরূপ বহু নিষ্কর্মা লোক রাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের অনুগ্রহে প্রতিরক্ষা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কার্য্য পণ্ড করিয়া আসিয়াছিলেন; দেশরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ কার্য্যেও সেইরূপ মহারথী সমাগম হওয়াতে কার্য্য তেমন উত্তমরূপে হইতেছে না। সেই জন্য মনে হয় দেশবাসীর নিকট আবেদন অপরভাবে করা প্রয়োজন। অর্থাৎ জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা যাহাতে এই কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা চাই। রাজকর্ম্মচারী ও রাষ্ট্রীয় দলগুলির লোকবল যথেষ্ট মনে হইতেছে না। ইঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বসাধারণেরও ভক্তি ভালবাসাও তেমন প্রবল নহে।

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ চলে একটা নিম্নশ্রেণীর অংশীদারী ব্যবসায় মত। প্রধান প্রধান অংশীদার ও তাঁহাদিগের নিকট ঋণগ্রস্ত অথবা অপরভাবে তাঁহাদিগের তাঁবেদারীতে আবদ্ধ জাতি সকল যে ভাবে এই রাষ্ট্রীয় কারবার চালাইতেছেন তাহাতে মনে হয় কয়েকটি স্বাধীনপন্থী জাতি না থাকিলে কারবার যথেচ্ছাচারের সীমা অতিক্রম করিয়া এতদিনে দেউলিয়া হইয়া যাইত। এখনও সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের পক্ষে আমেরিকা অথবা ব্রিটেনের যথেচ্ছাচার নিবারণ করা সাধ্যের অতীত। শুধু আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাক্ষাৎ স্বৈরাচার সহ্য করিয়া চলা নহে; ঐ মহাজাতিদ্বয়ের পেটোয়াদিগের অনর্গল বর্ব্বরতাও পৃথিবীর লোকেদের মানিয়া লইতে হয়। বর্ত্তমানে বিষয়টা ভারতের নিকট অত্যন্তই প্রকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া এ দেশবাসী লোকেদের তাহা সহজে বোধগম্য হইয়াছে।

আমরা পাকিস্তানের যে সকল লুঠতরাজ ও খুনখারাবি সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছি তাহার মূল কারণ ব্রিটিশ-আমেরিকান সরকারাদি ও গোপনে নানাভাবে এই বর্ব্বর ব্যক্তিগোষ্ঠীকে জিয়াইয়া রাখিয়া ভারতের শত্রুতা করা। ব্যক্তিগোষ্ঠী অর্থে বুঝিতে হইবে পাকিস্তানের একনায়কত্বপিষ্ট জনগণের প্রভু, ইসলাম কলঙ্ক গুণ্ডার দল। পাকিস্তানের ও ভারতের জনসাধারণ এক জাতি বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। তাহাদিগের নিজেদের মধ্যে কোনও ঝগড়া-বিবাদ কোন দিন ছিল না। পাকিস্তান গঠনের মতলব মুসলমানদিগের মস্তকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথমে ঢুকায় ও পরে ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদিগের সাহায্যে ঐ মতলবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা করাইয়া ক্রমশঃ একটা এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে কিছু মুসলমান পাকিস্তান গঠন প্রস্তাবে সায় দিতে আরম্ভ করে। পাকিস্তান গঠন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের শাস্তি হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রয়োগ করে ; এবং লাভের আশায় কিছু কিছু মুসলমান ব্রিটিশদিগের সহায়তা করে। পাকিস্তান যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মানসপুত্র ইহার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। শুধু ঐ বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা কেহ কর: প্রয়োজন মনে করেন না।

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ পাকিস্তান প্রথম যখন কাশ্মীর দখল চেষ্টা করে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তখন শান্তি স্থাপনের নামে পাকিস্তানী লুণ্ঠন ও হত্যালীলার শেষ না করাইয়া তাহাদিগকে জিয়াইয়া রাখে। যুদ্ধের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া সেই রেখার অপরদিকে পাকিস্তানকে নিজ রাজত্ব বিস্তার করিয়া ১৮ বৎসর কাল পরের দেশ দখল করিয়া থাকিতে দিয়া সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ পাকিস্তানী জোর-জবরদস্তি নীতির এক প্রকার সমর্থনই করিয়া আসিয়াছে। আঠার বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া শত শতবার কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ তাহাদিগকে সেই অপরাধের জন্য তিরস্কার বা শাস্তি দিবার কোনও ব্যবস্থা করে নাই। বরং উক্ত সঙ্ঘের পাণ্ডা জাতিগুলি পাকিস্তানের সহিত বিশেষ সখ্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য শত শত কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র দিয়া তাহাদিগকে মহাশক্তিমান করিয়া তোলার ব্যবস্থা করে। ফলে আঠার বৎসর পরে পাকিস্তান বৃহত্তর পরিকল্পনায় কাশ্মীর বিজয় অভিযান আরম্ভ করে। ইহাতে তাহারা সফল হয় নাই, এবং ভারতের সহিত যুদ্ধেও প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে তাহারা পরাজিত হয়। সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার শান্তির রব তুলিয়া ভারতকে পাকিস্তান নিপাত করিতে বাধা দিল। উদ্দেশ্য শান্তি নহে ; পুনর্ব্বার ডাকাতদিগকে বাঁচাইয়া দেওয়া। ভারত এবারও জাতি সঙ্ঘের কথা শুনিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে সম্মত হইল। পাকিস্তানও পূর্ব্বের ন্যায় শান্তির আশ্রয়ে যুদ্ধের জন্য আরও উত্তমরূপে প্রস্তুত হইতেছে। তাহারা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে কাশ্মীরে ঢুকাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য পাকিস্তানের লোকেরা সর্ব্বত্র ধাবমান। মিথ্যা কথার বন্যায় জগতজনগণ বিপর্যাস্ত। ভারত এ অবস্থায় কি করিবে? সকল অন্যায় নীরবে সহ্য করিবে, না পাকিস্তানকে পুনরাক্রমণ করিয়া তাহাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া স্বদেশের নিরাপত্তা নিশ্চয় করিয়া লইবে? পাকিস্তান যুদ্ধ করিতে চাহে ও যুদ্ধ করিবেই। কাশ্মীর যদি পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা পাঞ্জাব লইবার চেষ্টা করিবে। পাঞ্জাব পাইলে সমগ্র ভারত দখল করিতে চাহিবে। এই প্রকার শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।

—]o[—

আচার্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

আচার্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকীর বৎসরে তাঁর প্রতি জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রদেয় শ্রদ্ধা জানাবার জন্য অবশ্যই আমরা তাঁকে স্মরণ করব, কিন্তু বিশেষ ভাবে স্মরণ করব তাঁর প্রতি আমাদের অপরিশোধ্য ঋণগুলির পরিমাণ করবার জন্যে। তাঁর কাছ থেকে আমরা নানা দিক দিয়ে যা পেয়েছি তার হিসাব মিলোতে বসলেই এই মানুষটির কাছে জাতি হিসাবে আমরা যে কি গভীর ঋণে ঋণী তার বোধ জাগ্রত হবে আর ওই চেতনার জাগরণই তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা তর্পণ। সুতরাং এক এক করে ওই ঋণগুলির পরিমাপ করা যাক।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নামটি বাংলা দেশে একটা প্রতিষ্ঠান বিশেষ। আমি যখনই তাঁর বিষয়ে চিন্তা করি তখনই তাঁর ব্যক্তিত্বের মৌলিকতা তথা অনন্য-পরতন্ত্রতার কথা স্মরণ করে আমার মন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ত নিশ্চয়ই বিস্ময়েও সবিশেষ অবনত হয়ে পড়ে। তিনি প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, হিন্দী বিশাল ভারত পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন, এই কথা বললে তাঁর সম্বন্ধে সামান্যই বলা হয়। ঐ পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তিনি চিন্তার ও রুচির যে বিশেষ স্বাদ-গন্ধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়ে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম তাঁর অসামান্য পরিচয়। মাসিকপত্র সম্পাদনা প্রধানতঃ একটি মামুলি কর্তব্য বিশেষ। তার মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পের এবং প্রসঙ্গক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা কথার সমাবেশ থাকলেও ওর ভিতর দিয়ে মাসিকপত্র সম্পাদককে খুব কম ক্ষেত্রেই ধরতে-ছুঁতে পারা যায়। তিনি যেন পাঠকের প্রীত্যর্থে নানা রকমারি উপকরণ এক আধারে সংগ্রহ ও উপস্থিত করেই খালাস; তাঁর ব্যক্তিত্বের আদলটি পাঠকের অনুভবের সীমার মধ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মাসিকপত্র সম্পাদকই হলেন আসলে সংগ্রাহক এবং যা আরও সমালোচনাযোগ্য বিষয়, পরিকল্পনাবিহীন সংগ্রাহক। পরিবেশিত বিষয়সমূহকে পরিব্যাপ্ত করে ও তাদের ছাড়িয়ে সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এরকম দৃষ্টান্ত অতীব বিরল।

ঐ বিরল সংখ্যক সম্পাদকদের মধ্যে বিরলতম উদাহরণ হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সাময়িকপত্র সম্পাদনা তাঁর নিকট নিছক সৌখীন কর্তব্যপালন ছিল না, ছিল না নিছক ব্যবসায়িক উদ্যোগ; পরন্তু মাসিকপত্র সম্পাদনাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জাতিগঠনের এক শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে। জাতিগঠন শুধু জাতির মানুষগুলিকে রাষ্ট্র, সমাজ ও নাগরিকত্বের বিষয়ে সচেতন করা অর্থে নয়, তাদের রুচিকে পরিশীলিত, সৌন্দর্যানুভূতিকে তীক্ষ্ণতর ও আনন্দ গ্রহণ ক্ষমতাকে সংবর্ধিত করা অর্থেও। বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়কে তিনি যেমন একদিকে চিন্তার নব নব দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি তাদের কল্পনা-বৃত্তিকেও উচ্চকিত করেছেন গভীর ভাবে। আমার নিকট আলোচ্য মহাপুরুষের এই শেষোক্ত কৃতিত্বটাই সর্বাধিক বলে মনে হয়। এই দিক দিয়ে বাঙালী জাতি যে তাঁর কাছে কি অপরিসীম ঋণে ঋণী তার পরিমাপ করা যায় না। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধের যথাস্থানে আরও বলবার অবকাশ হবে, আপাতত এই শুধু বলি যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মামুলি অর্থে মাসিকপত্র সম্পাদক ছিলেন না, মাসিকপত্র সম্পাদনার ছলে তিনি ছিলেন বাঙালী জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, জননেতা, অভিভাবক। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ তিনি বাঙালী জাতির রুচি নির্মাণ করে গেছেন, জীবনের চলার পথে তাকে অভ্রান্ত পথনির্দেশ করে গেছেন। বাঙালীর মননশীলতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা দুইই তাঁর হাতে তীক্ষ্ণতর হয়েছে। তাঁর কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ থেকে বুঝতে পারা যায় এই মানুষটির অন্তর ছিল কি বিশাল, উদার ও অমেয় জাতিপ্রেমে ভরা। মামুলি প্রশস্তি

উচ্চারণের উদ্দেশ্য নিয়ে এ সব কথা বলছি না, বলছি শুধু তাঁর ব্যক্তিত্বকে তার স্ব-স্বরূপে অনুধাবন করবার জন্যে, যাতে তাঁকে বোঝা ও বোঝানো সহজ হয়, তাঁর নিকট আমাদের ঋণের পরিমাণটি সুনিরূপিত হয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথম জীবনে ছিলেন শিক্ষাবিদ। তিনি ছিলেন এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের প্রিন্সিপাল। ইংরেজীতে সসম্মানে এম. এ. পাস করে তিনি শিক্ষক-জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষক-জীবনের পরিবেশ তাঁর প্রতিভাকে তার চতুঃসীমায় বেশীদিন আবদ্ধ রাখতে পারে নি, তিনি শীঘ্রই শিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে সাময়িকপত্র সম্পাদনার অভিমুখে ঝুঁকলেন। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ সম্পাদনা করবার আগে তিনি পর পর এই কয়টি সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছিলেন—ধর্মবন্ধু, কায়স্থ সমাচার, দাসী ও প্রদীপ। অবশ্য এর মধ্যে কোনটিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি, কিন্তু এগুলি যে তাঁর পরবর্তী জীবনের বিশিষ্ট ভূমিকার প্রস্তুতিস্বরূপ ছিল তা তাঁর উত্তরকালীন কীর্তির আলোকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। এবং এর থেকে আরও যে কথাটি আমাদের মনে জাগে তা হচ্ছে এই যে, তিনি হঠাৎ ঝোঁকের বশে শিক্ষাবৃত্তি পরিহার করে সাময়িকপত্র সম্পাদনার গণ্ডির মধ্যে পা বাড়ান নি; তাঁর এই নূতন পদক্ষেপের পশ্চাতে পরিকল্পনা ছিল, চিন্তন-মনন ছিল, ছিল সংকল্পের দৃঢ়তা। তিনি একটি বিশেষ লক্ষ্য চোখের সামনে রেখেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে এই কাজে নেমেছিলেন—হট করে অধ্যাপনা ছেড়ে দেন নি।

আমার নিকট আচার্য রামানন্দের এই পদক্ষেপের গুরুত্বের চমক আজও নিঃশেষিত হয় নি। আমি নিবন্ধের গোড়ার দিকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে মৌলিক ও অনন্যপরতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছি—কেন করেছি নীচেকার পর্যালোচনায় তার ব্যাখ্যা মিলতে পারে। যে কালে রামানন্দ অধ্যাপনার জীবিকা পরিত্যাগ করে মাসিকপত্র পরিচালনার জগতে প্রবেশ করেন সেই সময়ে মাসিকপত্র পরিচালনা কোন দিক দিয়েই আকর্ষণীয় ছিল না—না অর্থকরী দিক থেকে, না সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে। পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা তখন লোকের নিকট একটা সৌখীন ব্যাপার বলে গণ্য হ'ত এবং যারা এ জাতীয় কাজে নামতেন তাঁরা প্রায়শঃ সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত বলে লোকসমাজে গণ্য হতেন। এসব ব্যাপার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোরই সামিল ছিল, অর্থ-মর্যাদা দিয়ে যাঁরা কাজের মর্যাদা-অমর্যাদার বিচার করেন—সে রকম লোকের সংখ্যাই সমাজে বেশী—তাঁরা সাময়িকপত্র সম্পাদনা জাতীয় কাজকে বিশেষ কোন গুরুত্বই দিতেন না বললে চলে। তা ছাড়া, জীবিকা হিসাবে এ কাজ নিতান্তই অনিশ্চিত ছিল, যাঁরা এ কাজে নামতেন তাঁরা জেনেশুনেই আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে এ কাজে প্রবৃত্ত হতেন। পক্ষান্তরে, রামানন্দ যে কর্মত্যাগ করে এসেছিলেন তা তখনকার মানদণ্ডে সবিশেষ লোভনীয় একটি জীবিকা। তিনি কোন কলেজের অধ্যাপকমাত্র ছিলেন না, ছিলেন সেই কলেজের অধ্যক্ষতার সর্বোচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন। একজন উচ্চশিক্ষিত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির উপযুক্ত প্রার্থিত কর্ম। সেই বহু-বাঞ্ছিত পদ ছেড়ে কি না তিনি নেমে এলেন সাময়িকপত্রের দপ্তরের সম্পাদকপদের নড়বড়ে আসনে সমাসীন হবার জন্তে! সব ছেড়ে অকূলের নির্বাচন আর কাকে বলে! নিশ্চিত জীবিকার নিরাপত্তা বর্জন করে উদ্বেগসঙ্কুল অনিশ্চিত ভাগ্যবরণ! কিন্তু এ কাজ বৈষয়িক বিচারে যতই পরিণামবুদ্ধিহীন বলে প্রতিভাত হোক, ঐ কাজের মধ্য দিয়েই মানুষটি কোন্ ধাতুতে গড়া ছিলেন তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় এবং এক বিশিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য সম্মুখে উদ্যত রেখেই যে তিনি অনিশ্চিতের অভিমুখে লম্ফ প্রদান করেছিলেন সেটাও বোঝা যায়। শিক্ষার প্রচলিত গণ্ডীর মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রমের সাহায্যে যেমন জাতির উঠতি সন্তানদের মানুষ করা যায়, তেমনি, এ তত্ত্ব তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন, অন্য মাধ্যমের সাহায্যেও তা করা যায়, বরং আরও ব্যাপক ভাবেই করা যায়, কেননা উঠতি সন্তানদের ছাড়াও আরও বহু মানুষকে ঐ কর্মান্তরের ক্ষেত্রের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। সাময়িক পত্র-পত্রিকার পরিবেশিত বস্তু শুধু শিক্ষার্থীদেরই প্রয়োজন পূরণ করে না, তা আরও বহু, বহু মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন পূরণের কাজে লাগে। বস্তুতঃ, একটা গোটা জাতির মানুষের মনঃপ্রকর্ষ বিধানের ও তাদের কার্মিকতার জাগরণের কাজে ঐ মাধ্যম প্রযুক্ত হতে পারে, যদি পত্রিকার কর্ণধার হন উপযুক্ত ব্যক্তি ও পত্রিকার প্রচার হয়

আশানুরূপ। একটি সুপ্রচারিত পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠকসাধারণের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ঐ পত্রিকা যে সারা দেশে একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে একটা সুসংহত পরিবেশ, তা আশা করি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুসম্পাদিত ও সুপ্রচারিত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকাদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে সেই বাঞ্ছিত কাজটিই করেছিলেন দীর্ঘকাল যাবৎ। শিক্ষার ধারাকে তিনি ক্লাশরুমের ভিতর থেকে টেনে এনে সাময়িক-পত্রের পাতায় চারিয়ে দিয়েছিলেন। আর এ শিক্ষা ত শুধু মনন আর বিদ্যার্জনের শিক্ষাই নয়, তা রুচির ও পরিশীলনের শিক্ষা, সৌন্দর্যস্পৃহার জাগরণের শিক্ষা। প্রবাসী পত্রিকা পড়ে আমরা ছাত্রবয়সে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছি, বিচিত্র সাহিত্য পাঠের আনন্দ আমাদের মনে সঞ্চার হয়েছে; প্রবাসী মডার্ণ রিভিউ, বিশেষ করে প্রবাসী ছিল আমাদের নিকট বহির্বিশ্বের দিকে দু-চোখ ভরে তাকাবার উন্মুক্ত জানালা স্বরূপ। এ সব গুণ ত আছেই, কিন্তু সে সব গুণকেও ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে আর দু'টি ঋণ প্রকাণ্ড এবং অপরিশোধ্য: এক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সঙ্গে সাময়িকপত্রের মাধ্যমে পরিচয়; দুই, ভারত-চিত্রশিল্পের ধারার শিল্পীদের ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবির সঙ্গে পরিচিত হয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের পরিমার্জনার সুযোগ লাভ; এক কথায়, সৌন্দর্যবোধকে চরিতার্থ করবার সৌভাগ্য-প্রাপ্তি।

এই দু'টি ঋণের কথাই একটু সবিস্তারে বলবার জন্যে পাঠকদের অনুমতি ভিক্ষা করছি।

২

এককালে সাধনা, ভারতী ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর পৃষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত রচনাসম্ভারে পরিশোভিত হয়ে প্রকাশিত হ'ত, বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠকমাত্রেই সে খবর জানেন। সে হচ্ছে নব নব সৃষ্টিসম্ভাবনার বেগ ও প্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশের যুগ, তাঁর শক্তিসূর্য তখনও মধ্যগগন অতিক্রম করে নি। আমরা সে যুগকে পাই নি, আমরা যে কালে স্কুলের উপরের পৈঠার ধাপ অথবা স্কুলের দেউড়ি পেরিয়ে কলেজের চৌহদ্দিতে পা বাড়াবার মুখে, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সুপ্রতিষ্ঠিত সুপরিণত বিশ্ববন্দিত জগৎসভার কবি। তাঁকে আর তখন দশজন কবির সঙ্গে মিলিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পাচ্ছি না; পাচ্ছি ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির মধ্যমণি হিসাবে, জাতীয় গৌরববোধের সঙ্গে মিলিয়ে, তাঁর ব্যক্তিত্বের চারপাশে প্রতিভার পুণ্যপ্রভাময় জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করে। বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ গৌরবের ধন রূপে তাঁকে পেয়ে ও তাঁকে পূজা করে আমরা তখন ধন্য। সেই মহাদ্যুতিমান রবীন্দ্রনাথের অমূল্য রচনাসম্ভার প্রতি মাসে মাসে ধরে দিচ্ছেন রামানন্দ তাঁর সুপরিচিত প্রবাসীর পৃষ্ঠায়—এ এক অপূর্ব সংঘটন। তার স্বাদের উন্মাদনার আভাসই বুঝি শুধু দেওয়া যায়, তার সঠিক বর্ণনা করা চলে না। কোন মহাকবিকে গ্রন্থবদ্ধ ভাবে পাওয়া এক, আর তাঁকে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় খণ্ড খণ্ড ভাবে পাওয়া আর। তার একটা আলাদা বৈচিত্র্য আছে। এ বৈচিত্র্যের উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ আমরা দীর্ঘকাল অনুভব করতে সমর্থ হয়েছিলাম প্রবাসীর কল্যাণে। মনে আছে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর চিত্রশোভিত হয়ে প্রবাসীর পাতায় যখন 'শেষের কবিতা' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকল তখন অনেক মাস যাবৎ একটা অপূর্ব ঘোরের মধ্যে কেটেছে। আর কবিতার ত সে এক সারিবদ্ধ সমারোহ! প্রবন্ধ-নিবন্ধ জাতীয় অন্যবিধ রচনারও কোন অপ্রতুল নেই। এ সবই সম্ভব হয়েছিল আচার্য রামানন্দের অসাধারণ ব্যবস্থাপনাগুণে। তিনি স্বয়ং মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাই মহৎকে বৃহৎকে আকর্ষণ করবার তাঁর একটা সহজাত নৈপুণ্য ছিল। প্রবাসীর গণতান্ত্রিক আসরে তিনি বিশ্বকবির প্রায়-নিয়মিত হাজিরার ব্যবস্থা করে-ছিলেন, এ তাঁর এক মহতী কীর্তি নিঃসন্দেহে।

আর ভারতীয় চিত্রকলার সমৃদ্ধ রূপলোক সে কি নয়ন-বিমোহন সাজি সাজিয়েছিলেন তিনি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর রঙিন পৃষ্ঠায়! শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, আচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেশ্বর সেন, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়,

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সারদা উকিল, বরদা উকিল, সুনয়নী দেবী, মণীন্দ্র গুপ্ত, সুধীর খাস্তগীর প্রমুখ ভারতীয় শিল্পধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ, অর্ধপ্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কত বিভিন্ন প্রতিভাবান গুণীর ছবিরই না প্রিন্ট মুদ্রিত হয়েছে এই দুটি পত্রিকার অভ্যন্তরে বিভিন্ন সময়ে। হ্যাভেল-মন্ত্রপ্রাণিত ভারতীয় শিল্পরীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন অনেক বিশিষ্ট চিত্রীর ছবিও যুগপৎ পরিবেশিত হয়েছে একই কালে। এই গুণীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজা রবিবর্মা ও মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর। এ ছাড়া নূতন-পুরাতন খ্যাতনামা বিদেশী চিত্রকরদের অঙ্কিত কত ছবি যে ছাপা হয়েছে তার লেখাজোখা নেই।

একটি পত্রিকা-গোষ্ঠীর মাধ্যমে এত এত বিশিষ্ট চিত্রসম্ভার নিয়মিত পরিবেশিত হওয়ায় একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে। সে তাৎপর্য চোখের শিক্ষার, দ্রষ্টার অন্তরে সৌন্দর্যপ্রাণতার ক্রমিক উন্মোচনের। বস্তুতঃ প্রবাসীর চিত্র-পরিবেশনার মাধ্যমে আমাদের এই শিক্ষাই হয়েছিল কম বা বেশী পরিমাণে পাত্রভেদে। আজ অবশ্য সকল ছবির নাম স্মরণ করতে পারব না, তাদের অনেকগুলিরই রূপরেখা স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে; কিন্তু সব ভুলিয়ে সেই সব ছবি মনের ভিতর যে গভীর সম্মোহনের সৃষ্টি করেছিল তার স্মৃতি ত ভুলতে পারি না। অবনীন্দ্রনাথের বুদ্ধ ও সুজাতা, শাজাহানের স্বপ্ন, তিষ্যরক্ষিতা, তেপান্তরের মাঠের রাজপুত্র (সঠিক নাম স্মরণ নেই), গগনেন্দ্রনাথের বিচিত্র বিষয়ক আলো-আঁধারি চিত্রাবলী ও কিউবিজমের পদ্ধতিতে আঁকা অনবদ্য শিল্পরূপায়ণ, ক্ষিতীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব চিত্রাবলী, নন্দলালের ও সুরেন গাঙ্গুলীর পৌরাণিক চিত্রসম্ভার, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অশোক ও কুণাল, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর কাদম্বরী সিরিজ—বর্ণ ও রেখায় সে এক অনবদ্য ও বিচিত্র রূপসজ্জা। আমি চিত্রবিশেষজ্ঞ নই, চিত্রশিল্পের নিয়মকানুন সামান্যই জানি, তবু চিত্রপ্রেমী বলে দাবি করি। আর এই চিত্রপ্রেম প্রবাসীর দৌলতেই মনের ভিতর প্রথম সঞ্চারিত হয়েছিল, রামানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর উপলক্ষ্যে সে কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সকৃতজ্ঞে স্মরণ করি।

প্রবাসীতে যে সময়ে পরের পর এই সকল ছবি প্রকাশিত হচ্ছিল তখন ব্লক নির্মাণ বা চিত্রমুদ্রণের আদৌ সুব্যবস্থা ছিল না। চিত্রমুদ্রণের সেটি ছিল শৈশব-কাল, যখন কাঠের ব্লকই ছিল ছবির ছাপ দেবার মুখ্য নির্ভর। উপযুক্ত প্রক্রিয়ার অভাবে বর্ণিল ছবির প্রতিলিপি মুদ্রণ করা যেত না, যা পরে হাফটোন প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়। ইউ. রায় এণ্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রথম এ দেশে হাফটোন পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রমুদ্রণ-ধারার প্রবর্তন করেন। রামানন্দ এ ব্যাপারে তাঁকে প্রভূত উৎসাহ দান করেন। বছর দুয়েক আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবাসীর পরবর্তী সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃতি পরিষদ নামক এক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভায় উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে উপেন্দ্রনাথের বিবিধ কর্মকৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ব্লক নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার সবিশেষ উল্লেখ করেন। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ তথ্য পরিজ্ঞাত হই যে, এ কাজে সাফল্যলাভের মূলে রামানন্দের পরোক্ষ অবদানও বড় কম ছিল না। কাগজের উপর বর্ণিল ছবি পরিস্ফুটনের সেই প্রাথমিক যুগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যে কত দুস্তর বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যুতে ঐ ছবিগুলি পরিবেশন করতে হ'ত আজকের অবলীলায়িত সহজ মুদ্রণের যুগে তা হয়ত অবিশ্বাস্য কাহিনী বলে মনে হবে। কিন্তু তিনি কোন বাধাতেই দমেন নি, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তাঁর পত্রিকায় ছবি ছাপিয়ে গেছেন। এ কাজের পিছনে তাঁর একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল—বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের চোখের সামনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব নূতন রূপের জগৎ উদ্ঘাটিত করা আর ঐ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর সৌন্দর্যচেতনাকে আরও শাণিত করা। হ্যাভেল, কুমারস্বামী ও অবনীন্দ্রনাথের পদাঙ্কসরণে ভারতীয় তথা প্রাচ্য কলারীতির ঐতিহ্যের মূলবৃত্তি প্রমাণ করা এবং ঐ প্রমাণের সূত্রে জাতির আত্মমর্যাদাবোধ পুনর্স্থাপিত করা অবশ্যই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ নেই, তবে আমার মনে হয় এর চেয়েও মহত্তর উদ্দেশ্য তাঁকে তাঁর ঐ শিল্পপরিবেশনায় প্রবৃত্ত করেছে এবং তাঁর

সংকল্পের মধ্যে বেগ, দৃঢ়তা ও প্রণালীবদ্ধতার সঞ্চার করেছে। সেই সংকল্প উদ্দেশ্য আর কিছু নয় —জাতিগত-ভাবে বাঙালীর সৌন্দর্যের সংস্কারের অধিকতর পরিশীলন ও পরিমার্জন। সৌন্দর্যের দীক্ষায় কোন জাতির উপনয়ন সম্পূর্ণ হলে সে জাতির আর মার নেই, এটা রামানন্দ বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই তিনি শিল্পপরিবেশনায় এতদূর ঝুঁকি নেবার দায় স্বীকার করতে পেরেছিলেন।

এ কথা যে সত্য তা আরও একটি ব্যাপার থেকে প্রমাণিত হয়। তিনি শিল্পালোচনার ঢালাও ব্যবস্থা করেছিলেন প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর পৃষ্ঠায়। প্রসিদ্ধ শিল্প বিশেষজ্ঞদের দিয়ে শিল্পসম্পর্কিত রচনা লিখিয়ে সেগুলি মোটামুটি নিয়মিত ভাবে ঐ দুটি পত্রিকায় প্রকাশ ও প্রচার তাঁর সম্পাদকীয় কৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। সিস্টার নিবেদিতা, কুমারস্বামী, এইচ. এস. কাজিন্স, পার্সি ব্রাউন, স্টেলা ক্রামরিশ, ও. সি. গাঙ্গুলি প্রমুখের একাধিক শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে ঐ পত্রিকাদ্বয়ের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করেছে এবং তদ্দ্বারা পাঠকের শিল্পবোধকে তীক্ষ্ণতর করেছে। এ ঐতিহ্য শুধু মডার্ণ রিভিয়ু আর প্রবাসীরই নয়, তারও আগে থেকে এ বিষয়ে সচেতন প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন রামানন্দ। তাঁর পূর্বতন সম্পাদিত প্রদীপ পত্রিকায় বিশিষ্ট রবীন্দ্র কাব্যরসিক প্রিয়নাথ সেনের প্রসিদ্ধ ইংরেজ শিল্পসমালোচক রাস্কিনের উপর লিখিত প্রবন্ধাবলীর কথা মনে পড়ছে। অসাধারণ সেই প্রবন্ধ-নিচয়—আজকালকার পত্রপত্রিকায় এ জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না, এ আমাদের এক দুর্ভাগ্য।

॥ ৩ ॥

এতক্ষণ পর্যন্ত আচার্য রামানন্দের সম্পাদনার দিকটির কথাই বেশী বলা হয়েছে। এবারে তাঁর লেখক-ভূমিকার কথা বলব, যে ভূমিকায় তিনি একাধারে চিন্তাশীল মনীষী, সাংবাদিক, জাতীয় নেতা ও জাতির পিতৃকল্প অভিভাবক। তিনি ছিলেন মূলতঃ যুক্তিবাদী এবং স্বীয় মতামত প্রকাশে নির্ভীক। অনুগ্রহ-নিগ্রহের অপেক্ষাবিহীন তাঁর অভিমত সর্বদাই একটি মাত্র মানদণ্ডকে মান্য করত, তা হ'ল সত্য। সত্য বলে তিনি যা বুঝতেন তার প্রকাশে তাঁর লেখনী অকুণ্ঠ ও অকম্পিত ছিল। আর তাঁর এই মতস্বাতন্ত্র্য আর নির্ভীকতার জন্যই বিচিত্র বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যের আকর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পাঠকসমাজ কর্তৃক এতদূর ব্যাপক ভাবে অভ্যর্থিত ও সমাদৃত হতে পেরেছিল। খতিয়ে দেখতে গেলে, বোধ করি তাঁর জীবদ্দশায় প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ছিল সবচেয়ে বহুলপঠিত বিভাগ। এর কারণ তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য, সত্যভাষণের স্পষ্টতা, তথ্যভিত্তিকতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা। এ সব কয়টি বৈশিষ্ট্যেরই পিছনে ছিল গভীর, নানামুখী, সুবিস্তৃত অধ্যয়নের পটভূমি। সমসাময়িক কালের রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্পসংস্কৃতি সাহিত্য হিন্দু সমাজের গঠন প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তিনি অকুণ্ঠ ভাবে তাঁর মতামত প্রচার করেছেন এবং সকল বিষয়ে সত্যসন্ধতাই ছিল তাঁর বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। সম্পাদক এবং লেখক হিসাবে ত বটেই প্রকাশক হিসাবেও তিনি ছিলেন নির্ভীক। এই ক্ষেত্রে তাঁর নিঃশঙ্কতার প্রমাণ সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'India in Bondage' বইয়ের প্রকাশ ও সেজন্য রাজদণ্ড বহন ইংরেজ শাসনের সমালোচনাপূর্ণ গ্রন্থাদির প্রচারণা।

জাতিপ্রেম ছিল তাঁর গভীর, কিন্তু তা পক্ষপাতী মনোভাবের দ্বারা মলিন ছিল না। এ কথার প্রমাণ পাই এই নজিরে যে, তিনি কংগ্রেসের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একজন প্রচণ্ড সমর্থক হয়েও কংগ্রেসের দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটনে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, অপিচ যোগ্যক্ষেত্রে ইংরেজের গুণকীর্তনে অকৃপণ ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রশ্ন নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবে চিন্তা করতেন এবং ঐ সূত্রে হিন্দু সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতা, শক্তিদৈন্য, সামাজিক অসাম্যজনিত দুর্বলতা প্রভৃতি তাঁর বিশেষ মনোযোগের বিষয় ছিল। এই উপলক্ষ্যে তিনি মুসলমান সমাজের বিপথগামী অংশকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করতে দ্বিধা করেন নি, কিন্তু তা বলে ঐস্লামিক সমাজ-বিধানের গুণগ্রাহ্য দিক সম্পর্কে অনবহিত থাকবার কারণ খুঁজে পান নি। মুসলমানদের সমাজ কাঠামোর গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের তিনি বারেবারেই প্রশংসা করেছেন। বাঙালী হিন্দুর শারীরিক বলের অভাব তাঁর গভীর মর্মপীড়ার মূল ছিল এবং এ সম্বন্ধে সুযোগ পেলেই তিনি হিন্দু সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস করেছেন। বোধ হয় এই কারণেই তিনি আচার্য যদুনাথ সরকারের সঙ্গে একযোগে হিন্দু সমাজকে সামরিক শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার উপর

সমিতির জনক আরোপ করেছেন এবং ঐ ক্ষেত্রে বিবিধ প্রচার চালিয়ে গেছেন। হিন্দু সমাজের অবক্ষয়ের সমস্যা নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবে চিন্তা করতেন নানা লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে তাঁর গভীর স্বজাতিপ্রেমই শুধু সূচিত হয়। প্রত্যক্ষ রাজনীতিও তাঁর মনোযোগ-সীমার বহির্ভূত ছিল না। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি কিছুকাল হিন্দু মহাসভার রাজনীতির অভিমুখে ঝুঁকেছিলেন এবং একবার তার সর্বভারতীয় সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। কিন্তু পেশাদার রাজনীতিকের পদ্ধতি তাঁর ছিল না। হিন্দু মহাসভার অন্যান্য রাজনীতিকের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ছিল এই দিক দিয়ে যে, মুসলিম লীগ-শাসিত রাজনীতির তাঁরা সমান আপোষহীন সমালোচক হলেও ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রশ্নে তাঁদের পরস্পরের মনোভঙ্গি বিপরীতমুখি ছিল। হিন্দু মহাসভার পরিচিত নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পুনরুজ্জীবনমুখী আর রামমোহনের ভাবশিষ্য রামানন্দের দৃষ্টি ছিল সংস্কারমুখি ক্ষেত্র বিশেষে বৈপ্লবিক। তথাকথিত সনাতন ভারতীয় আদর্শের উদ্গাতার দল আর রামমোহনের ভাবধারার প্রবক্তার মধ্যে, বলাই বাহুল্য, কোন গভীর সাদৃশ্য থাকতে পারে না; এ ক্ষেত্রে আপাত-সাদৃশ্যকে অন্তরঙ্গ-সাদৃশ্য মনে করবার কোনই কারণ নেই। রামমোহনের প্রতি রামানন্দের শ্রদ্ধা কি প্রগাঢ় গভীরতাভিসারী ছিল জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁর "রামমোহন" নামীয় নিবন্ধটিতে তার পরিচয় মেলে। বস্তুতঃ গভীর শ্রদ্ধাবোধের অভিব্যক্তিই শুধু এ প্রবন্ধের একমাত্র গুণ নয়, রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যের যথাযথ পরিজ্ঞাপক হিসাবেও এ রচনার মূল্য অসাধারণ। এখানে ঐ প্রবন্ধ থেকে কতক অংশ উদ্ধার করছি লেখকের বিশ্লেষণের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বোঝাবার জন্যে :

"তাঁহার (রাজা রামমোহন রায়ের) মহত্ত্ব কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নহে; উহা সমুদয় পৃথিবী-সংসৃষ্ট। কেননা, তিনি সমুদয় মানুষের রাষ্ট্রীয় ও আত্মিক স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন; বিশ্বমানবের কল্যাণের, ঐহিক, পারত্রিক সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের আদর্শ তাঁহার প্রাণে আধুনিক কালে সর্বপ্রথমে উদিত হয়, (পুরাকালেও আর কাহারও প্রাণে ঐরূপ সর্বাঙ্গীণ আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়াছিল কি না জানি না) এবং সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, সকলের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা রাখা, মিলনের সত্যপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে, মহাদেশে মহাদেশে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোরাজ্যের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান, অধমর্ণ-উত্তমর্ণ বা ভিক্ষুক-দাতার মধ্যে আদান-প্রদানের মত না হইয়া, সমান-সমানের মধ্যে হইতে পারে; তিনি অতীতের আত্যন্তিক পারত্রিকতা (otherworldliness) ও বর্তমানের ঐকান্তিক ঐহিকতার (secularism-এর) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সেতু রচনা করিয়াছিলেন; এবং তিনি স্বদেশবাসীর ও স্বজাতির (হয়ত বা সকল মানবের) আত্মা (soul) এবং ধর্মবুদ্ধিকে (conscience) সর্বপ্রকার কৃত্রিম ও সংস্কারগত বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

ধর্ম সম্বন্ধে রামানন্দের মতামত অতিশয় উদার ছিল। অথচ তাঁর মন কঠিনের সাধনায় পরাঙ্মুখ ছিল না। যে সব ব্যক্তি বলেন যে, ধর্মের পথ অতিশয় দুরূহ হলে লোকের পক্ষে তা পালন করার অসুবিধা হয় সুতরাং সকলের জন্য সহজ ধর্মবিধি উদ্ভাসিত হওয়া আবশ্যক, তাঁদের মত খণ্ডন করে সুবিজ্ঞ লেখক লেখেন—

"যে আদর্শের অনুসরণ করা অতি কঠিন বা কতকটা কঠিন, সেরূপ আদর্শ মানুষের সম্মুখে ধরিলে অল্প লোকেই তাহার অনুসরণ করিতে পারিবে। যাহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, ধর্মের-মহত্ত্বই এইখানে যে তাহা মানুষকে দুষ্কর কাজ করিতে বলে, মহৎ আদর্শের অনুসরণে দুঃখ ও বিপদকে অগ্রাহ্য করিতে বলে। যাহা সহজ, ধর্ম যদি আমাদিগকে কেবল তাহাই করিতে বলিত, তাহা হইলে মানুষের উন্নতি হইত না।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭)

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় রামানন্দের মনটি ছিল উচ্চ আদর্শবাদীর। আর এই উচ্চ আদর্শবাদের প্রেরণা থেকেই যে তিনি যৌবনকালে সুনিশ্চিতের মায়া ত্যাগ করে অনিশ্চিত ও কঠিনের অভিমুখে ঝুঁকেছিলেন তার আভাস পাওয়া যায়।

কথা ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে, কথা কিছু নয়, কাজই হ'ল আসল। এই প্রচলিত ধারণার খণ্ডন করে সুবিজ্ঞ লেখক লিখেছেন—

"এখন আর কথা কহিবার সময় নয়, কাজের সময় আসিয়াছে"; "বাঙ্গালী কেবল বকে, কাজ করে না"; "বক্তৃতা-টক্তৃতা রাখিয়া দাও, কাজ কর;" এইরূপ অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথাগুলি ভাল কিন্তু ওগুলির মধ্যে সত্য আংশিক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। একটুও কথা না বলিয়া কোনও বড় কাজ করা যায় কি? কথা না বলিয়া কাজে প্রেরণা জন্মাইবে কেমন করিয়া? উদ্দীপনা কোথা হইতে আসিবে? কাজ যে কেন করা দরকার, তাহাও ত বুঝাইয়া দেওয়া চাই। কেমন করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহা বাক্যের দ্বারা জানান আবশ্যক। কাজ করিবার আদেশ বাক্যের দ্বারা দিতে হয়। যুদ্ধ যে একটা এতবড় কাজ, তাহাও বিনা বাক্যব্যয়ে হয় না। যাহারা খুব কর্মিষ্ঠ জাতি, তাহারা বাঙ্গালীর চেয়ে সোরগোল বেশী বই কম করে না। কিন্তু ইহা সত্য কথা যে, কেবল বকা ভাল নয়, ফাঁকা আওয়াজ ভাল নয়, কাজের চেয়ে বক্তৃতা বেশী হওয়া উচিত নয়। কথাও চাই, কাজও চাই। কোনটির পরিমাণ বা অনুপাত কিরূপ হইবে, তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে না।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১)

জড়শক্তি ও আত্মিক শক্তির কোন্‌টি কি পরিমাণ থাকা উচিত মানুষের ব্যক্তিত্বে সে সম্বন্ধে মনস্বী রামানন্দের অভিমত— "দৈহিক বা জড়ীয় শক্তিতেই কাজ হয়, বুদ্ধিবল, চরিত্রবল, আত্মিক শক্তিতে কিছু হয় না; কিংবা বুদ্ধিবল, চরিত্রবল, আত্মিক শক্তিতেই সব হয়, দৈহিক বা জড়ীয় শক্তিতে কিছু হয় না; ইহার মধ্যে কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করে না। জগতের ধর্মপ্রবর্ত্তকগণ দৈহিক শক্তিতে হীন ছিলেন না, কিন্তু যদি তাঁহারা ক্ষীণজীবী, চিররুগ্ন হইতেন, তাহা হইলে সত্য প্রচার তাঁহাদের দ্বারা হইত না! বড় বড় গ্রন্থকার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১)

ভক্তি ও সৎকর্ম্মের সম্বন্ধটি বড় চমৎকার বুঝিয়েছেন আচার্য নিচের রচনাংশে—

"যেমন কথা ও কাজের একটা অনাবশ্যক বিরোধ ঘটান হয়, তেমনি ভক্তি ও সৎকর্ম্মের মধ্যেও যেন কোন ঝগড়া আছে এইরূপ কথা মাঝে মাঝে শুনা যায়। যাহারা খুব ভাববিলাসী, তাহারা কাজের লোক না হইতে পারে। কিন্তু ভাববিলাসিতা যে ভক্তি তাহা কে বলিল? কথায় কথায় চোখে জল আসে এমন লোকেরও প্রকৃত ভক্তি না থাকিতে পারে। আবার যাঁহার চোখে সহজে জল আসে না এমন প্রকৃত ভক্তও অনেক আছেন। সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সৎকাজ করিবার শক্তি প্রকৃত ভক্তি হইতে পাওয়া যায়। কোন কাজ যে কাজের মত কাজ, ভগবানের সহিত যুক্ত না হইয়া তাহা স্থির করা কঠিন। যশের জন্য বা অন্য কোন প্রকার লাভের জন্যও অনেক সময় সৎকাজ করা হয়। তাহা সাত্ত্বিক কর্ম নহে। প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি সাত্ত্বিক ভাবে কাজ করিতে পারেন। পূজা অর্চনা ধ্যান ধারণায় বেশী সময় দিলে সৎকর্ম্মের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় কি না, তাহা বিচার্য বটে।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১)

এই উদ্ধৃতির মধ্যে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ (মহর্ষি) অনুমোদিত ব্রাহ্মধর্মোচিত আত্মসমাহিত প্রশান্ত ভক্তির আদর্শটিই যে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে তা সহজেই বোঝা যায়। বৈষ্ণবদের ও শাক্তদের কথায় কথায় পুলক-রোমাঞ্চ, ভাবসমাধি, বেদকম্প, দরবিগলিত অশ্রুসিক্ত ও ধূলিধূসরিত ভক্তির আদর্শ অপেক্ষা উপনিষদীয় আত্মসমাহিতির আদর্শটিকেই যে তিনি সমধিক মান্য করতেন তা পরিষ্কার প্রতীত হয়।

আমরা আচার্যদেবকে মূলতঃ যুক্তিবাদী তথা মনন-শীলতার প্রবক্তা লেখক বলে জানি, কিন্তু ভাবুকতাও যে তাঁর ভিতর বিলক্ষণ ছিল নীচের উদ্ধৃতি তার প্রমাণ—

"কে সুন্দর কে কুৎসিত সে বিষয়ে মানুষে মানুষে খুব মতভেদ দেখিয়াছি।...রূপটা যদি শুধু শরীরের ও বাহিরের জিনিস হইত, তাহা হইলে একই মানুষের যৌবনের রূপ প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের রূপের অপেক্ষা অধিক হইত। কিন্তু যৌবনাপগমে রূপ বাড়িয়াছে, এমন প্রসিদ্ধ কোন কোন মানুষের নাম করা খুব সহজ। স্থূলদর্শীর কাছে রূপগুণের বিরোধ আছে, সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে বিরোধ নাই। রূপ দেখিতে হইলে দ্রষ্টার সাত্ত্বিকতা চাই।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১)

উদ্ধৃতি আর নয়। যে কটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল তা

থেকেই রামানন্দের মানসিক গড়ন, চিন্তাপ্রণালী ও ভাষা-শৈলী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা মনের মধ্যে গড়ে নেওয়া সম্ভব। ভাষাশৈলী সম্বন্ধে একটি কথা। কবুল করতে আপত্তি নেই, ছাত্রাবস্থায় রামানন্দের স্টাইল আমার নিকট প্রাঞ্জল মনে হলেও কথঞ্চিৎ পরিমাণে কাঠখোট্টা বলে মনে হ'ত এবং কখনও কখনও বিস্মিত চিত্তে ভাবতাম রবীন্দ্রনাথের এত নিকট-সংস্পর্শের মধ্যে থেকেও তিনি কেন তাঁর ভাষায় আরও লালিত্যের অনুশীলন করা থেকে বিরত থেকেছেন? রবীন্দ্র-স্টাইলের প্রভাব ত কই রামানন্দের স্টাইলে চোখে পড়ে না? বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে পরে বুঝেছিলাম আমার ঐ ছাত্রজীবনের চিন্তায় ভুল ছিল। প্রথমতঃ, একজন মূলতঃ কবি আর একজন মূলতঃ যুক্তিপন্থী গদ্য-লেখকের ভাষার ভঙ্গি এক হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আপাতদৃষ্টিতে রামানন্দীয় ভাষারীতিতে যেটা লালিত্যের অভাব বলে মনে হয়, আসলে তা হ'ল তাঁর যাথাযথ্যের (precision) ফলশ্রুতি। সঠিক চিন্তা সঠিক ভাবে প্রকাশ করতে গেলে উপমা উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি যতদূর সম্ভব বর্জন করতেই হয় এবং কেবলমাত্র ভাব-প্রকাশক শব্দ সমূহই নির্বাচন করতে হয়—শব্দের বাহুল্য বা শব্দের বহুল প্রয়োগ সুষ্ঠু গদ্যরীতির বিরোধী। ভাষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টতা। তাতে যদি কমনীয়তার খানিকটা হানিও হয় তাও স্বীকার, তবু অস্বচ্ছ জটিল ভাষা গ্রাহ্য নয়। গদ্য গদ্যের চালে চলা উচিত, তাতে ধ্বনিবাহুল্য বর্জনীয়। রচনা যত সঠিক মনোভাবের প্রকাশক হবে তত তার মূল্য। বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রবাসী-সম্পাদক এই সহজ স্বচ্ছ সুন্দর গদ্য-ভঙ্গিরই পক্ষপাতী ছিলেন তাঁর চিন্তা-প্রকাশের ক্ষেত্রে। আমাদের নিকট এই ভাষাদর্শই আজ মান্য।

বিছানায় শোবার পর বাসবীর দীপকের কথা মনে পড়ল।

দীপক কি দরকারে এসেছিল তার কাছে! আর কয়েকটা দিন পরেই ত সে অফিসে যোগ দেবে। তখন ত দেখা হবেই। আবার এখন আসার কি প্রয়োজন!

সত্যি কথা বলতে কি, দীপক তার বাড়ীতে আসুক, ঘনিষ্ঠতা করুক, এটা বাসবীর ইচ্ছা নয়। দীপক সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানে না। পরে যদি কোন কারণে দীপক বিভাসবাবু হয়ে দাঁড়ায় তা হলে অন্তত কেউ যেন না বলতে পারে, বাসবীর পরিচিত, অন্তরঙ্গ লোক এমন একটা কাজ করেছে।

এত কথা ভাবল বটে কিন্তু মনে কৌতূহল জেগে রইল। দীপক কি কাজে আসতে পারে তার কাছে!

পরের দিন অফিসে গিয়ে বসতেই অনিমেষ রায় ডেকে পাঠাল।

তখনও বাসবী কাজে হাত দেয় নি। ভ্যানিটি ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছিল।

ব্যাগটা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়াল। যেতে যেতেই দেখল নিশিবাবু আড়চোখে তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

এটা নিশিবাবুর স্বভাব। কোণে বসে সারা অফিসের ওপর নজর রাখে। বিশেষ করে কে ঢুকছে ম্যানেজারের ঘরে। কে বের হচ্ছে।

বাসবী সামনে দিয়ে যেতেই হেসে বলল, কি, ডাক পড়েছে নাকি?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বাসবী উত্তর দিলও না।

সোজা ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অনিমেষ হেসে বলল, বসুন।

বাসবী বসল।

আপনি ত টাইপ জানেন, তাই না? দরখাস্তে মনে হচ্ছে যেন সে রকম কথা একটা লিখেছিলেন।

কোন পাশ করি নি। এমনি শিখেছিলাম এক বন্ধুর কাছে কিছুটা।

কিছুটা মানে কতটা? কাজ চালাতে পারবেন?

অফিসে ঢুকে পর্যন্ত ত মেশিন ছুঁই নি।

সপ্তাহখানেক যদি চেষ্টা করেন অফিসের মেশিনে?

হঠাৎ বাসবী কোন উত্তর দিতে পারল না। আচমকা এমন একটা প্রশ্ন কেন? টাইপ শিখে কি হবে? এ অফিসে ত রয়েছে ক'জন টাইপিষ্ট।

কি, পারবেন না?

বোধ হয় পারব। একটু থেমে মনে সাহস সঞ্চয় করে বাসবী জিজ্ঞাসাই করে ফেলল, কেন, টাইপ করার প্রশ্ন উঠছে কেন?

আপনাকে আমার সঙ্গে বাইরে যেতে হবে।

বাইরে! বাসবী রীতিমত বিস্মিত হ'ল।

হ্যাঁ, অফিসিয়াল টুরে।

অনিমেষ হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল। একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখল। তার পর দেশলাইয়ের খোঁজে প্রথমে টেবিল, তার পর নিজের পকেট হাতড়াল। অবশেষে ড্রয়ার থেকে দেশলাই উদ্ধার করে গোটা চারেক কাঠি খরচ করার পর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল।

এতক্ষণ বাসবী চুপচাপ বসে রইল। একটি কথাও না বলে।

তার মন কিন্তু অনেক দ্রুত অনেক কিছু চিন্তা করতে সুরু করে দিল।

এতদিন পরে বুঝি অনিমেষের মুখোসটা খসে পড়েছে। এতদিন ধরে সযত্নে আঁটা ভদ্রতার আবরণটা ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে। তাকে চাকরি দেবার এটাই উদ্দেশ্য ছিল কি না ঈশ্বর জানেন।

অনেক মেয়ের মুখে এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথাও বাসবী শুনেছে। কয়েকটা অফিস শুধু মেয়েধরা ফাঁদ। চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে, অন্নের লোভ দেখিয়ে মেয়েদের খাঁচায় পোরে। গালভরা নাম দেয়, রিসেপসনিষ্ট, পারসোনাল অ্যাসিষ্টান্ট, সেক্রেটারি। দেশে-বিদেশে কর্তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। বাইরে একটা জৌলুস থাকে, অফিসের কাজ, কিন্তু ভিতরের নরকের ছবিটা বাসবীর অজানা নয়।

তা না হলে অফিসে এতগুলো টাইপিষ্ট থাকা সত্ত্বেও, বেছে বেছে বাসবীর ওপর নজর কেন?

পলকের জন্য রুবি আর খোকনের অসহায় মুখটা বাসবীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। মা'র রিক্ত নিঃসম্বল চেহারা।

গোটা সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

বাসবী যদি অস্বীকার করে, বলে তার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়, তার ফল কি হবে সেটা তার একটুও অজানা নয়। এখন যেন মনে হচ্ছে, চাকরির একটা শর্তই ছিল, মালিক যেখানে বলবে সেখানেই যেতে হবে। তখন বাসবীর যা অবস্থা, এর চেয়ে মারাত্মক শর্তেও সে রাজী হ'ত। অনশনের বিরাট মুখব্যাদান থেকে বাঁচবার আর কোন পথ ছিল না।

আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া ত মুস্কিল।

কেন বলুন? অনিমেষ এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

আমার সংসার দেখার ত আর কেউ নেই। আমার ভাই-বোন দু'জনেই ছোট। বাজার হাট সব কিছু আমাকেই করতে হয়।

সে দায়িত্ব যদি কেউ নেয়? অফিসের একজন বেয়ারাকে আপনাদের বাড়ী ক'দিন শুতে বলব। বাজার-হাট যা করার সেই করে দেবে।

বাসবী বুঝল রজ্জুর ফাঁস ধীরে ধীরে আয়তনে ছোট হয়ে আসছে। এবার তার কণ্ঠনালী চেপে ধরবে। বাইরের বাতাস নেবার কোন উপায় থাকবে না। তিলে তিলে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে।

আমি নিবারণবাবুকে বলে দিচ্ছি। আপনি আজ থেকেই মেশিন নিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করুন।

অনিমেষের দৃঢ়কণ্ঠে যেন ফাঁসির হুকুমের সুর।

বাসবী চরম উত্তর দেবার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিল। বুঝতে পারল দু'টি চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বুকের মাঝখানে তীব্র একটা যন্ত্রণা।

পায়ের তলার মাটিটুকু সরে যাবে। অনটনের বন্যা আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে গোটা সংসার।

মুখ খোলবার মুখেই বাসবী বাধা পেল।

অনিমেষ দাঁড়িয়ে উঠেছে। হাতের দগ্ধপ্রায় সিগারেটটা ছাইদানে ফেলে দিয়ে বলল, দিন দুয়েকের বেশী লাগবার কথা নয়। জন চারেকের ষ্টেটমেণ্ট রেকর্ড করতে হবে। নিশিবাবু সঙ্গে থাকবেন। অফিসের একটা টাইপিষ্ট আমি সঙ্গে নিতে পারতাম, কিন্তু আমার সাহস হয় না।

একটু আশ্বস্ত হ'ল বাসবী। সে একলা নয়, নিশিবাবুও সঙ্গে থাকবে। অবশ্য এটা খুব একটা সান্ত্বনার কথা নয়। প্রয়োজনের সময় মনিবের মুখ চেয়ে নিশিবাবু সরে যাবে। এ ধরনের লোকরা যা করে থাকে।

কিন্তু কিসের ষ্টেটমেণ্ট? অফিসের টাইপিষ্টদের বিশ্বাস না করার হেতু?

বাসবী মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাই করল, কিসের ষ্টেটমেণ্ট?

অনিমেষ চেয়ার টেনে আবার বসে পড়ল।

ওই যে বিকাশবাবুর কেসটা। আমাদের এটর্নী বলছিলেন, ওখানে গিয়ে কণ্ট্রাক্টরদের ষ্টেটমেণ্টগুলো সই করিয়ে নিতে পারলে আমাদের পক্ষে ভাল। তারা কোর্টে আর ঘুরে যাবে না।

এইবার বাসবী কিছুটা বুঝল। স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলল। ব্যাপারটা যা ভাবছিল, অতটা মারাত্মক হয়ত নয়। মাত্র দু'দিনের ব্যাপার।

অফিসের লোকদের বিকাশবাবুর জন্য একটা সমবেদনা থাকা স্বাভাবিক। অনেকদিন পাশাপাশি বসে কাজ করেছে। কাজেই অন্য টাইপিষ্টের পক্ষে ষ্টেটমেণ্টের ব্যাপারটা তার কানে তুলে দেওয়া আশ্চর্য নয়। অন্ততঃ সারাংশও বিকাশবাবুকে জানিয়ে দিতে পারে।

বিভাসবাবুও উকিল রেখে লড়ছেন, কাজেই আমরা কি করছি, সে খবর তাঁর আগে থেকে জানাটা সমীচীন হবে না। সেইজন্যই আপনাকে এই কষ্টটুকু করতে হবে।

এতক্ষণে বাসবী সহজ হ'ল। হেসে বলল, না, না, কষ্ট আর কি। আমার মনে হয় দিন চার-পাঁচেকের মধ্যেই আমি সড়গড় হয়ে যাব।

ঠিক আছে। এই কথার জন্যই আপনাকে ডেকে-ছিলাম। আমি নিবারণবাবুর মেশিনটা আপনার টেবিলে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।

অনিমেষের কথা শেষ হয়েছিল, কিন্তু বাসবীর কথা বাকি ছিল।

কাল মেজাদেবীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

অনিমেষ বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করল না। শুধু বলল,

কি ব্যাপার, আপনার সঙ্গে খুব ঘন ঘন দেখা হচ্ছে আজকাল?

মেট্রোর কাছাকাছি দেখলাম। সঙ্গে একটি সুটপরা ভদ্রলোক।

কথা শেষ করে বাসবী আড়চোখে অনিমেষের দিকে দেখল। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার আশায়।

খুব অল্পক্ষণের জন্য অনিমেষকে যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হ'ল। তারপরই সামলে নিয়ে বলল,

অবাঙালী ভদ্রলোক ত? সম্ভবত মিষ্টার শেঠা। লোহার ব্যাপারী হলে হবে কি, মনটা নরম। স্ত্রীলোকের দুঃখ দেখতে পারেন না।

শেষদিকের কথাগুলোর ব্যঙ্গের সুর বাসবীর কান এড়াল না। কিন্তু সে আর অপেক্ষা করল না, উঠে বাইরে চলে এল।

নিজের সীটে বসতে বসতেই লক্ষ্য করল নিশিবাবু তার দিকেই চেয়ে ছিল, চোখাচোখি হতেই মুখটা নামিয়ে নিল।

বেশ কিছুক্ষণ কাজে কাটল। এক সময়ে বেয়ারা এসে টাইপ-মেশিনটা তার টেবিলের ওপর রেখে গেল।

ব্যাপারটা অফিসের সবাই একবার দেখল। কি ব্যাপার, টাইপ-মেশিন বাসবী সেনের টেবিলের ওপরে যে? টাইপিষ্ট নিবারণও অবাক হয়ে গেল।

একটু পরেই কৌতূহল দমন করতে না পেরে নিবারণ বাসবীর টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল, কি ব্যাপার বলুন ত? এ মেশিন আপনার টেবিলে এল যে?

ব্যাপার কিছু নয়। একটু একটু টাইপিং শিখেছিলাম। অনেক দিনের অনভ্যাসের ফলে ভুলে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম অভ্যাস রাখা ভাল। কখন দরকার পড়ে কিছু ত ঠিক নেই। ম্যানেজারকে বলে আপনার মেশিনটা নিয়ে এসেছি।

তাই ভাল, এতক্ষণে নিবারণের মুখে একটু হাসি ফুটল, আমি ভাবলাম, কি হ'ল রে বাবা। আজ মেশিন তুলে নিয়ে গেল, কাল বলবে আর অফিসে আসতে হবে না।

নিবারণের এ কথার বাসবী কোন উত্তর দিল না। একটা চিঠি টেনে নিয়ে, মেশিনে কাগজ চড়িয়ে টাইপ করতে সুরু করল। প্রথম প্রথম একটু অস্বাচ্ছন্দ্য, তাড়াতাড়ি হাত সরতে চাইল না, তার পর একটু একটু করে হাত ঠিক হয়ে গেল।

গোটা চার-পাঁচ চিঠি ছাপা হতে বাসববাবু এসে দাঁড়াল।

বাসবীর কোন দিকে নজর দেবার অবসর নেই। একমনে টাইপ করে চলেছে।

এ কি আরম্ভ করলেন আপনি? বেশ ত অফিসে ছিলেন আবার এই মেশিনগানের গর্জন কেন?

বাসবী হাসল, টাইপটা ভুলে যাচ্ছিলাম, আবার একটু সড়গড় করে নিচ্ছি। আওয়াজটা কি বড্ড জোর হচ্ছে?

যে গান গায়, গানের বিকট সুরও তার কানে মধুবর্ষণ করে। আপনার হয়েছে সেই অবস্থা। শব্দটা অনুভব করতে পারছেন না।

বাসবী মেশিন থেকে দুটো হাত তুলে নিল।

ঠিক আছে। এই আমি মেশিন বন্ধ করলাম। আপনি নিশ্চিন্তে কাজ করুন গিয়ে।

এখন টিফিনে যাচ্ছি। ফিরে এসে যেন দেখি মেশিনটাও আপনার টেবিল থেকে সরে গেছে, কারণ আবার কখন দুর্মতি জাগে ঠিক নেই।

বাসববাবু বেরিয়ে গেল।

ঘড়িতে একটা চল্লিশ। বাসবী টিফিনের প্যাকেটটা নিয়ে রুকার কাছে চলে এল।

বাসবী কিছু বলবার আগেই রুক্মা বলল, কি খবর, কবে অভিসার-যাত্রা সুরু হচ্ছে ?

তার মানে ?

রুক্মা হেসে বলল, এ অফিসের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে এই টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। আমি তার কর্ণধার, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন বন্ধু ? সব কিছু খবর আসে এই তারের প্রবাহে।

হেঁয়ালি ছেড়ে, কি বলতে চাও বল ?

ম্যানেজারের সঙ্গে ট্যুরে বের হচ্ছ কবে সেই খবর জিজ্ঞাসা করছি।

তার আগে কথাটা তুমি কোথায় শুনলে জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

খোদ মালিকের মুখে। ম্যানেজার কোম্পানীর সলিসিটরের সঙ্গে যখন এ বিষয়ে কথা বলছিলেন, সেই সময় কানে গেল।

বাসবী বুঝল রুক্মার কাছে কিছু লুকানো যুক্তিসঙ্গত হবে না, তাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা বেশী।

তাই সে শুধু বলল, কথাটা কিন্তু খুব গোপনীয়।

আমি বন্ধু, জানি। সেই জন্যই নিরালায় শুধু তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।

একটু থেমে রুক্মা আবার বলল, টেলিফোন অপারেটরের কি গুণ থাকা সবচেয়ে দরকার জান ?

কি ?

কান থাকবে অথচ শুনবে না।

কিন্তু আর একটা খবর বোধ হয় তোমার জানা নেই।

কি খবর ?

মিশিবাবু সঙ্গে যাচ্ছেন। কাজেই তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে অভিসারযাত্রা ব্যর্থ হয়।

ওটা সাধারণ মানুষের চোখে ধূলা দেবার কায়দাফিকির। শুধু অনিমেষ রায় আর বাসবী সেন ভ্রমণে যাচ্ছে এটা দৃষ্টিকটুও যেমন, তেমনই শ্রুতিকটু। কাজেই তল্পীবাহক থাক একজন। সব দিক বজায় থাকবে।

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। বাসবী টিফিনের প্যাকেট খুলতে খুলতে বলল, এখন পরচর্চা রেখে টিফিনে মন দাও। বেশী সময় হাতে নেই।

রুক্মা নিজের টিফিন নিয়ে বসল।

বিভাসবাবুর খবর কিছু জান ? বাসবীর গলা।

ওই যেটুকু খবর তার থেকে ঝরে পড়ে, তাই সংগ্রহ করি। শুনলাম, বিভাসবাবুও উকিল লাগিয়েছেন। উনিও লড়বেন। কোম্পানী মিছামিছি বিপদে ফেলার জন্য ওঁকে নাকি হয়রানি করছে। কাল বিভাসবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

কাল ?

হ্যাঁ, বাস থেকে নেমে বাড়ীর জন্য গোটা কয়েক সওদা করার জন্য দোকানে ঢুকেছি, দেখলাম প্রীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিভাসবাবু কি তোমাদের পাড়ায় থাকেন নাকি ?

আগে ত ছিলেন না। ইদানীং শুনলাম রয়েছেন। প্রীতি তাই বলল।

আর কি বলল ?

বলল, অনিমেষ রায় ইচ্ছা করে তার স্বামীকে বদনাম দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়। বিভাসবাবুর বিরুদ্ধে না কি একটা বিরাট চক্রান্ত চলেছে।

তাতে অনিমেষ রায়ের লাভ ?

লাভ শকুন্তলা সোম।

শকুন্তলা সোম ? বাসবী অবাক হ'ল। এ নামটা বাসববাবুর মুখে আগে শুনেছিল। বিভাসবাবু ইদানীং না কি শকুন্তলা সোমের দিকে চলেছে, সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও।

শকুন্তলা সোমের সঙ্গে বিভাসবাবুর ঘনিষ্ঠতার কথা প্রীতিদেবী জানেন ?

জানে, কিন্তু বলে দোষ শকুন্তলার, তার স্বামীর নয়।

মানে ?

মানে, শকুন্তলাই তার স্বামীর সর্বনাশের জন্য উন্মুখ। বিভাসবাবুর শকুন্তলার ওপর কোন ঝোঁক নেই।

সব জিনিষটা ধোঁয়াটে, ক্রমেই যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে বাসবীর কাছে। শকুন্তলা সোম সখের থিয়েটারে অভিনয় করে বেড়ায়। বিভাসবাবুর অভিনয়ে খুব সখ। সেই সূত্রেই দু'জনের আনাগোনা। ঠিক এইভাবে প্রীতির সঙ্গেও বিভাসবাবুর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পুরনো প্রজাপতিমন। সহজেই এক নারী ছেড়ে আর এক নারীতে আকৃষ্ট হয়েছিল। শকুন্তলাকে সন্তুষ্ট করতে

বিভাসবাবুকে অন্যায় পথে, অসৎ পথে চলতে হয়েছিল। এটাই শুনেছিল বাসবী।

অনিমেষ মায়েরও সখ্য এই শকুন্তলা সোম, এ কথা বাসবী এই প্রথম শুনল। এই প্রথম শুনল শকুন্তলাকে কায়েম করার জন্য বিভাসবাবুকে সরানো দরকার। তাই চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে অপদস্থ করার ষড়যন্ত্র চলেছে।

এই অন্যায়, এই অবিচার, এই মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য বিভাসবাবু তৈরি হচ্ছে। তার সহায় প্রীতি।

এ যুদ্ধে তেমনই অনিমেষের সহায় বাসবী। বিভাসবাবু যাতে শাস্তি পায়, পদচ্যুত হয়, তার জন্য বাসবীকে তার বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে, ম্যানেজারের নির্দেশ মত।

বাসবী যখন টিফিন শেষ করে নিজের জায়গায় ফিরে এল তখন তার মন ভারাক্রান্ত।

যে জীবন তার কাম্য ছিল, তার রূপ এমন দুর্দান্ত, এমন বিভীষিকাময় নয়। শান্ত, নিরুদ্বেগ নিস্তরঙ্গ জীবন। নিজের কষ্টার্জিত অর্থে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা। নিজের সামর্থ্য দিয়ে, শক্তি দিয়ে ভাই বোনকে ধীরে ধীরে মানুষ করে তোলা। হতভাগিনী মাকে অশান্তির আগুন থেকে রক্ষা করা।

বাস্তব পৃথিবী এত নির্মম, এত কঠিন, তা সে ভাবতে পারে নি।

কিন্তু উপায় নেই, আর সকলের মতন তাকেও সংগ্রাম করে যেতে হবে। সংসার বাঁচাতে, প্রতিপাল্যদের বাঁচাতে, নিজেকে রক্ষা করতে এ ছাড়া তার আর পথ নেই।

আদি যুগ থেকে এ সংগ্রামের সুরু। গুহামানব মানবী এমনিভাবে বাধা বিপদ তুচ্ছ করে, প্রকৃতির দুর্জয় প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। এ সংগ্রাম অস্তিত্বের জন্য। যে সবল, শক্তিমান সেই টিকেছে, আর সবাই নিঃশেষে মুছে গেছে।

আজ হয়ত সংগ্রামের হাতিয়ার বদলেছে, কিন্তু সংগ্রামের ধারা একটুও বদলায় নি। আজ যে জয়ী, যে শক্তিমান সে নয়, যে কূটনীতিক, যে বুদ্ধিমান, সেই থাকে, আর সকলে পিছিয়ে যায়। বাহু দিয়ে নয়, আজকের যুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে।

বুদ্ধির খেলায় হারলেই বাসবীকে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে হবে।

বাসবী কাজে মন দিল। বিক্ষিপ্ত, বিচলিত মনটা সংহত করার চেষ্টা করল।

একটা ফাইল নিয়ে খস খস করে নোট লিখে নিশিবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দেখুন, এ রকম লিখলে হবে? ছ মাস আগে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, আজও মাল এসে পৌঁছাল না।

নিশিবাবু ফাইলের দিকে নয়, বাসবীর দিকে চোখ ফেরাল।

সব শুনেছেন ত?

কি?

আমাদের বাইরে যেতে হচ্ছে।

বাসবী উদ্বিগ্ন চোখে এদিক-ওদিক দেখল। কথাটা কারও কানে না যায়। তার পর মৃদু কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, শুনেছি। বড় অপ্রীতিকর কাজ।

কেন? নিশিবাবু ভ্রূ তুলল।

কথাটা বলেই বাসবীর খেয়াল হয়েছিল এমন লোকের সামনে এ ধরনের কথা না বলাই উচিত ছিল। হয়ত ম্যানেজারকে গিয়ে বলে বসবে। অন্যায় অন্যায় দিক নেবেও বিভাসবাবুর পক্ষে। তার মন চায় না, বিভাসবাবুর শাস্তি হোক। সব জায়গাতেই এক হাওয়া। অন্যায় হোক, মিথ্যা হোক সহকর্মীকে সমর্থন করতেই হবে। এটাই রেওয়াজ।

বাসবী নিজেকে সামলে নিল। তাড়াতাড়ি বলল, ঘরদোর ফেলে কোথায় যাব বলুন ত? নাবালকদের বাড়ী, কে তাদের দেখাশোনা করবে? দোকান-পাটই বা কি করে হবে?

নিশিবাবু পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসল। ধূর্তের হাসি।

সে সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। গৌর ক'দিন আপনার বাড়ী থাকবে। আজ আপনি যাবার সময় গৌরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাড়ীটা চিনিয়ে দেবেন।

ব্যবস্থা পাকা। আর বাসবীর কিছু বলবার নেই। ম্যানেজার সব কথাই নিশিবাবুকে বলেছে। বলা যায় না, মতলবটা নিশিবাবুই হয়ত দিয়েছে ম্যানেজারকে।

বাসবী কিছু বলবার আগেই রুক্মা বলল, কি খবর, কবে অভিসার-পর্ব সুরু হচ্ছে ?

তার মানে ?

রুক্ম' হেসে বলল, এ অফিসের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে এই টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। আমি তার কর্ণধার, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন বন্ধু ? সব কিছু খবর আসে এই তারের প্রবাহে।

হেঁয়ালি ছেড়ে, কি বলতে চাও বল ?

ম্যানেজারের সঙ্গে ট্যুরে বের হচ্ছ কবে সেই খবর জিজ্ঞাসা করছি।

তার আগে কথাটা তুমি কোথায় শুনলে জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

খোদ মালিকের মুখে। ম্যানেজার কোম্পানীর সলিসিটরের সঙ্গে যখন এ বিষয়ে কথা বলছিলেন, সেই সময় কানে গেল।

বাসবী বুঝল রুক্মার কাছে কিছু লুকানো যুক্তিসঙ্গত হবে না, তাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা বেশী।

তাই সে শুধু বলল, কথাটা কিন্তু খুব গোপনীয়।

জানি বন্ধু, জানি। সেই জন্যই নিরালায় শুধু তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।

একটু থেমে রুক্মা আবার বলল, টেলিফোন অপারেটরের কি গুণ থাকা সবচেয়ে দরকার জান ?

কি ?

কান থাকবে অথচ শুনবে না।

কিন্তু আর একটা খবর বোধ হয় তোমার জানা নেই।

কি খবর ?

মিশিবাবু সঙ্গে যাচ্ছেন। কাজেই তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে অভিসারপর্ব ব্যর্থ হয়।

ওটা সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেবার কারসাজি। শুধু অমিতেশ রায় আর বাসবী সেম ভ্রমণে যাচ্ছে ওটা দৃষ্টিকটুও যেমন, তেমনই প্রতিক্রিয়া। কাজেই অভিভাবক থাক একজন। সব দিক বজায় থাকবে।

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। বাসবী টিফিনের প্যাকেট খুলতে খুলতে বলল, এখন পরচর্চা রেখে টিফিনে মন দাও। বেশী সময় হাতে নেই।

রুক্মা নিজের টিফিন নিয়ে বসল।

বিকাশবাবুর খবর কিছু জান ? বাসবীর প্রশ্ন।

ওই যেটুকু খবর তার থেকে ঝরে পড়ে, তাই সংগ্রহ করি। শুনলাম, বিকাশবাবুও উকিল লাগিয়েছেন। উনিও লড়বেন। কোম্পানী মিছামিছি বিপদে ফেলার জন্য ওঁকে নাকি হয়রানি করছে। কাল বিকাশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

কাল ?

হ্যাঁ, বাস থেকে নেমে বাড়ীর জন্য গোটা কয়েক সওদা করার জন্য দোকানে ঢুকেছি, দেখলাম প্রীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিকাশবাবু কি তোমাদের পাড়ায় থাকেন নাকি ?

আগে ত ছিলেন না। ইদানীং শুনলাম রয়েছেন। প্রীতি তাই বলল।

আর কি বলল ?

বলল, অমিতেশ রায় ইচ্ছা করে তার স্বামীকে বদনাম দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়। বিকাশবাবুর বিরুদ্ধে না-কি একটা বিরাট চক্রান্ত চলেছে।

তাতে অমিতেশ রায়ের লাভ ?

লাভ শকুন্তলা সোম।

শকুন্তলা সোম ? বাসবী অবাক হ'ল। এ নামটা বাসববাবুর মুখে আগে শুনেছিল। বিকাশবাবু ইদানীং না কি শকুন্তলা সোমের দিকে ঢলেছে, সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও।

শকুন্তলা সোমের সঙ্গে বিকাশবাবুর সখ্যতার কথা প্রীতিদেবী জানেন ?

জানে, কিন্তু বলে দোষ শকুন্তলার, তার স্বামীর নয়।

মানে ?

মানে, শকুন্তলাই তার স্বামীর সর্বনাশের জন্য উন্মুখ। বিকাশবাবুর শকুন্তলার ওপর কোন ঝোঁক নেই।

সব জিনিষটা ঘোঁরাটে, ক্রমেই যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে বাসবীর কাছে। শকুন্তলা সোম সখের থিয়েটারে অভিনয় করে বেড়ায়। বিকাশবাবুর অভিনয়ে খুব ঝোঁক। সেই সূত্রেই দু'জনের জানাশোনা। ঠিক এইভাবে প্রীতির সঙ্গেও বিকাশবাবুর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পুরুষের প্রজাপতিমন। সহজেই এক নারী ছেড়ে আর এক নারীতে আকৃষ্ট হয়েছিল। শকুন্তলাকে সন্তুষ্ট করতে

বিতাসবাবুকে অন্যায় পথে, অসৎ পথে চালাতে হয়েছিল। এটাই শুনেছিল বাসবী।

অমিতেশ রায়েরও লক্ষ্য এই শকুন্তলা লোন, এ কথা বাসবী এই প্রথম শুনল। এই প্রথম শুনল শকুন্তলাকে করায়ত্ত করার জন্য বিতাসবাবুকে সরানো দরকার। তাই চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে অপদস্থ করার ষড়যন্ত্র চলেছে।

এই অন্যায়, এই অবিচার, এই মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য বিতাসবাবু তৈরি হচ্ছে। তার সহায় প্রীতি।

এ যুদ্ধে তেমনই অমিতেশের সহায় বাসবী। বিতাসবাবু যাতে শাস্তি পায়, পদচ্যুত হয়, তার জন্য বাসবীকে তার বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে, ম্যানেজারের নির্দেশ মত।

বাসবী যখন টিফিন শেষ করে নিজের জায়গায় ফিরে এল তখন তার মন ভারাক্রান্ত।

যে জীবন তার কাম্য ছিল, তার রূপ এমন দুর্দান্ত, এমন বিভীষিকাময় নয়। শান্ত, নিরুদ্বেগ নিস্তরঙ্গ জীবন। নিজের কষ্টার্জিত অর্থে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা। নিজের সামর্থ্য দিয়ে, শক্তি দিয়ে ভাই বোনকে ধীরে ধীরে মানুষ করে তোলা। হতভাগিনী মাকে অশান্তির আগুন থেকে রক্ষা করা।

বাস্তব পৃথিবী এত নির্দয়, এত কঠিন, তা সে ভাবতে পারে নি।

কিন্তু উপায় নেই, আর সকলের মতন তাকেও সংগ্রাম করে যেতে হবে। সংসার বাঁচাতে, প্রতিপাল্যদের বাঁচাতে, নিজেকে রক্ষা করতে এ ছাড়া তার আর পথ নেই।

আদি যুগ থেকে এ সংগ্রামের শুরু। গুহামানব মানবী অনমিতভাবে বাধা বিপদ তুচ্ছ করে, প্রকৃতির দুর্জয় প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। এ সংগ্রাম অস্তিত্বের জন্য। যে সবল, শক্তিমান সেই টিকেছে, আর সবাই নিঃশেষে মুছে গেছে।

আজ হয়ত সংগ্রামের হাতিয়ার বদলেছে, কিন্তু সংগ্রামের ধারা একটুও বদলায় নি। আজ যে জয়ী, যে শক্তিমান সে নয়, যে কূটনীতিক, যে বুদ্ধিমান, সেই থাকে, আর সকলে পিছিয়ে যায়। বাহু দিয়ে নয়, আজকের যুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে।

বুদ্ধির খেলায় হারলেই বাসবীকে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে হবে।

বাসবী কাজে মন দিল। বিক্ষিপ্ত, বিচলিত মনটা সংহত করার চেষ্টা করল।

একটা ফাইল নিয়ে খস খস করে নোট লিখে নিশিবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দেখুন, এ রকম লিখলে হবে? ছ মাস আগে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, আজও মাল এসে পৌঁছাল না।

নিশিবাবু ফাইলের দিকে নয়, বাসবীর দিকে চোখ ফেরাল।

সব শুনেছেন ত?

কি?

আমাদের বাইরে যেতে হচ্ছে।

বাসবী উদ্বিগ্ন চোখে এদিক-ওদিক দেখল। কথাটা কারও কানে না যায়। তার পর মৃদু কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, শুনেছি। বড় অপ্রীতিকর কাজ।

কেন? নিশিবাবু ভ্রূ তুলল।

কথাটা বলেই বাসবীর খেয়াল হয়েছিল এমন লোকের সামনে এ ধরনের কথা না বলাই উচিত ছিল। হয়ত ম্যানেজারকে গিয়ে বলে বসবে। তলায় তলায় দিল দেবেও বিতাসবাবুর পক্ষে। তার মন চায় না, বিতাসবাবুর শাস্তি হোক। সব জায়গাতেই এক হাওয়া। অন্যায় হোক, মিথ্যা হোক সহকর্মীকে সমর্থন করতেই হবে। এটাই রেওয়াজ।

বাসবী নিজেকে সামলে নিল। তাড়াতাড়ি বলল, ঘরদোর ফেলে কোথায় যাব বলুন ত? নাবালকদের বাড়ী, কে তাদের দেখাশোনা করবে? দোকান-পাটই বা কি করে হবে?

নিশিবাবু পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসল। ধূর্তের হাসি।

সে সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। গৌর ক'দিন আপনার বাড়ী থাকবে। আজ আপনি যাবার সময় গৌরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাড়ীটা চিনিয়ে দেবেন।

ব্যবস্থা পাকা। আর বাসবীর কিছু বলবার নেই। ম্যানেজার সব কথাই নিশিবাবুকে বলেছে। বলা যায় না, মতলবটা নিশিবাবুই হয়ত দিয়েছে ম্যানেজারকে।

ঠিক ছুটি হবার আগে গৌর এসে বাসবীর কাছে দাঁড়াল।

চলুন দিদিমণি।

বুঝেও বাসবী না বোঝার ভান করল। বলল, কোথায়?

বাঃ, আপনার বাড়ীটা দেখিয়ে দেবেন ত।

আমার বাড়ী নয় গৌর, বাসা। একটু দাঁড়াও মুখ-হাত ধুয়ে আসি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বাসবী বাথরুম থেকে ঘুরে এল। গৌর সরে গিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল।

বাসবী সিঁড়ি দিয়ে নামতে তার পিছন পিছন নামতে আরম্ভ করল।

ফুটপাতে পা দিয়েই বাসবী দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক ল্যাম্পপোষ্টের পাশে দীপক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মনে হয় অনেকক্ষণ থেকেই অপেক্ষা করছে। রোদের তাপে তার চোখ-মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে।

বাসবী কঠিন হতে গিয়েও পারল না। ভেবেছিল তার বাড়ী যাওয়ার জন্য, এভাবে অফিসের দরজায় প্রতীক্ষা করার জন্য ভর্ৎসনা করবে, কিন্তু দীপকের মুখে বাসবী যেন নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। চাকরি পাবার আগের হতাশাকাতর অবস্থা।

কি খবর?

দীপক আড়চোখে একবার গৌরের দিকে দেখতেই সে সরে গেল। বাসবীর কাছে এসে বলল, দু মিনিট আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

ভনিতায় বাসবী বিরক্ত হ'ল। রুক্ষস্বরে বলল, কি বলবেন তাড়াতাড়ি বলুন। আমার এখনই বাড়ী ফিরতে হবে। কাজ আছে।

দীপক রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, আমার এক আত্মীয় বিজয় গুপ্ত অফিসে ফোন করেছিলেন?

হবে। উদাস কণ্ঠে বাসবী উত্তর দিল।

দোহাই আপনাদের, তাঁর একটি কথাও বিশ্বাস করবেন না। জ্ঞাতিশত্রু সবচেয়ে বড় শত্রু জানেন ত? আত্মীয়রা যে ক্ষতি করতে ইতস্ততঃ করে, এরা নির্বিবাদে তাই করে। এঁর কথায় বিশ্বাস করে যদি আমাকে অফিসে না নেন, তা হ'লে আমি ভীষণ বিপদে পড়ব।

শেষ দিকে আবেগে দীপকের গলা রুদ্ধ হয়ে গেল দুটো চোখও ছলছল করে উঠল।

আশ্চর্য, বাসবী মনে মনে ভাবল, এত সহজে পুরুষ মানুষের চোখে জল আসে! গলা কেঁপে ওঠে! এই পুরুষের যে বুকে নারী আশ্রয় খুঁজবে, সে বুক এত অল্পেই ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। বাধা-বিপদের পাহাড় ঠেলে নিজের পুরুষকারের জোরে যে পুরুষ পথ করে নেয়, এ যুগে সে পুরুষ কোথায়! ভীরু, পরাবলম্বক, চাকরিসর্বস্ব এরা, এদের কৃপা করা যায়, সহানুভূতি দেখান যায়, অবলম্বন করা যায় না।

গলাটা বাসবীর একটু কঠিনই হয়ে গেল, দেখুন, অফিস থেকে যখন আপনাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে, তখন অফিসের মর্যাদার জন্য সে নিয়োগপত্র প্রত্যাহার করা হবে না, অবশ্য যদি না আপনার নামে মারাত্মক কোন অভিযোগ আসে। কোন্ জ্ঞাতি কি বললে সে সব আমরা বিশেষ কানে তুলি না। কানে তুললে আমাদের চলে না।

কথা শেষ করে বাসবী আর দাঁড়াল না। গৌরের দিকে ফিরে বলল, চল, দেরি হয়ে গেল।

বেশ কিছুটা গিয়ে বাসবীর মনে হ'ল এতটা কঠোর হবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাসবী এমন ভাব দেখাল যেন সেই অফিসের মালিক। লোককে চাকরি দেওয়া বা কেড়ে নেওয়া যেন তারই হাতের মধ্যে। তার চেয়ে দীপককে সোজাসুজি বলে দিলেই পারত যে চাকরির ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। যা-কিছু বলবার, জিজ্ঞাসা করবার, ম্যানেজারকে গিয়ে করাই যুক্তিসঙ্গত।

অনেকগুলো ট্রাম ছেড়ে বাসবী অনেক কষ্টে একটা বাসে উঠল। মেয়েদের সীটে একটি মেয়ের পাশে একটি ভদ্রলোক বসেছিল, বাসবীকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

কণ্ডাক্টর কাছে আসতে বাসবী দুটো টিকেটের পয়সা দিতেই গৌর বাধা দিল। ভীড় ঠেলে তখন সে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দিদিমণি, আমার টিকেটের পয়সা আমি দিচ্ছি। অফিস থেকে আমায় খরচ দিয়েছে। বাসের প্রায় সব লোক একবার গৌরের দিকে, একবার বাসবীর দিকে দেখল। লজ্জিত বাসবী মুখ তুলল না।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার আগে দেখল মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাসবীকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে যেন একটু অবাকই হয়েছে।

দরজা খোলাই ছিল। বাসবী ঘরে পা দিতেই মা জিজ্ঞাসা করল, কিরে আজ টিউশনিতে যাস নি?

মা'র কথার উত্তর না দিয়ে সিঁড়ির দিকে চেয়ে বাসবী বলল, এস গৌর, ওপরে এস।

মা তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। একলা নয় বাসবী, সঙ্গে কে একজন এসেছে। অফিসের কেউ হবে হয়ত। কিন্তু এত অন্তরঙ্গতা তার সঙ্গে হ'ল কি করে।

গৌর সিঁড়ির দু এক ধাপ নীচে দাঁড়িয়েছিল, বাসবীর কথায় ওপরে উঠে এল।

মা'র দিকে আঙুল দেখিয়ে বাসবী বলল, এই আমার মা, গৌর।

গৌর হাঁটু মুড়ে বসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

সন্ত্রস্ত, বিব্রত বাসবীর মা তিন হাত পিছিয়ে গেল।

গৌর আমাদের অফিসের বেয়ারা, মা।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে গৌরকে নিরীক্ষণ করে দেখে মা অবাক।

এমন ছিমছাম, পরিপাটি ভদ্রচেহারার ছেলে অফিসের বেয়ারা! পরণে সার্ট, ধুতি, পায়ে চটি। ব্যাকব্রাশ চুল, হাতে ঘড়ি।

গৌর বলল, বাড়ী ত চিনে গেলাম, এবার আমি চলি দিদিমণি। ম্যানেজারসায়েব যেদিন থেকে বলবেন, সেদিন থেকে আসব।

এক কাপ চা খেয়ে যাও গৌর। বাসবী বলল।

গৌর হাতজোড় করল, না দিদিমণি, আর চা খাব না। আজ পাঁচ কাপ হয়েছে। তার পর বাসবীর মা'র দিকে চেয়ে বলল, যাচ্ছি মা। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। আপনি কিছু ভাববেন না। কথা শেষ করে গৌর আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

মা হতভম্ব হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

গৌর এখানে থাকবে। তাকে নিশ্চিন্ত হতে বলে গেল। এ সবের মানে কি।

তোদের অফিসের বেয়ারা কি বলে গেল রে? এখানে থাকবে কেন? আমাদের সুবিধা-অসুবিধার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি?

বলছি মা, দরজাটা বন্ধ করি আগে। রুণি, খোকন ফিরেছে ত?

না, রুণি আর খোকন ফেরে নি। নীচের মিঠুদের সঙ্গে পার্কে গেছে, সেই জন্যই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। এইবার আসবে।

বাসবী দরজা বন্ধ করতে গিয়েও করল না। মা'র কাছে সরে এসে বলল, আমি অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছি মা।

তুই? বাইরে? বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। কি শুরু করেছে বাসবী! মাকে বুঝি একটু দম নিতে দেবে না।

হ্যাঁ মা।

কোথায়?

এবার বাসবী ঢোক গিলল! ঠিক কোথায় তারও ত জানা নেই। ম্যানেজারও কিছু বলে নি, সেও জিজ্ঞাসা করে নি। আসল কথা, যেখানেই হোক, কোন দিধা নয়, যেতে তাকে হবেই।

কোথায় এখনও ঠিক হয় নি। তা ছাড়া এক জায়গাতেও ত নয়। কোম্পানীর যেখানে যেখানে কাজ সেখানেই যেতে হবে।

একলা? মা'র হতাশ কণ্ঠ।

না, না, একলা কেন হবে, আমাদের সেকশনের বড়বাবু যাবেন। ম্যানেজারও যেতে পারেন।

কবে ফিরবি?

বাসবী হেসে ফেলল, দাঁড়াও, আগে যাই, তার পর ফেরার কথা বলব।

আমাদের কি হবে তা হ'লে? এখানে কি করে চলবে?

এবারে মা'র গলা একেবারে ভেঙে পড়ল।

বাবে, সেইজন্যই ত গৌরকে নিয়ে এলাম। আমি যখন থাকব না, তখন গৌর থাকবে। তোমাদের হাট-বাজার করে দেবে, ফাই-ফরমাস খাটবে, রাত্রে শোবে এখানে।

মা আর কিছু বলল না। মনে হ'ল, সব ব্যাপারটাই

এখনও যেন তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মেয়ে বাইরে চলে যাবে। এ চাকরিতে বাইরে যেতে হবে এ কথা ত কোনদিন বলে নি। এ পাড়াতেও জানাশোনা কম মেয়ে কাজ করছে না, কেউ অফিসের কাজে বাইরে গেছে এ কথা তার কানে আসে নি।

মা'র মনে হ'ল বাসবী নিশ্চয় কিছু লুকাচ্ছে। আজকাল সে কেমন একটু অন্যমনস্ক। সব সময়েই কি যেন ভাবে। আগের মতন রুবি আর খোকনের সঙ্গে বেশী কথাও বলে না।

অবশ্য সত্যি কথা, বাসবী যা করছে, অনেক পরিবারে ছেলেও তা করে না। অফিস করছে, টাকা আনছে, তা ছাড়া সংসারের সব ঝামেলাও দরকার হলে মাথায় নিচ্ছে। কারও অসুখবিসুখ হলে বুক দিয়ে পড়ে। মাকে কোন দিকে কিছু দেখতে হয় না।

সব ভাল বাসবীর, শুধু যদি এমন অফিসে কাজ করত যেখানে কেবল মেয়েরা কাজ করে, তা হ'লে মা একটু নিশ্চিন্ত থাকতে পারত। এ ভাবে তার বুকের স্পন্দন বাড়ত না।

সবচেয়ে তার ভয় ম্যানেজারকে। তাঁর কথা বাসবীর কাছে কিছু কিছু শুনেছে। বয়স কম, রোজগার ভাল। বৌয়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ছাড়াছাড়ি হয়েছে। তা হোক, আজকাল এমন ঘটনাও অনেক শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ভদ্রলোকের বাসবীর ওপর এমন পক্ষপাত কেন? বাসবী খেয়ে যায় নি বলে, তাকে হোটেলে খাওয়াতে হবে। বাসবীর ট্রামবাসের ভীড়ে অফিস যেতে কষ্ট হয় বলে প্রায়ই তাকে নিজের মোটরে তুলে নিয়ে যেতে হবে, এই বা কেমন কথা!

আর একজনের কথা বাসবীর মা'র মনে পড়ে গেল।

এ বাড়ীর আর একজনও ত চাকরি করেছে। একদিন, দু'দিন নয়, একাদিক্রমে অনেকগুলো বছর। রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে।

মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, শরীর খারাপের জন্য বিছানা থেকে উঠতে বেলা হয়ে গেছে। অভুক্ত অবস্থাতেই ছুটতে হয়েছে অফিসে।

কই, কেউ ত কোন দিন ডেকে খাওয়ায় নি তাকে। খাওয়ার দূরে থাক, কোন সতীর্থ মুখের চেহারা দেখে কোন প্রশ্নও করে নি।

তা ছাড়া দীপকই বা কেন আসে? চাকরি পাবার পর দু'দিন এল। মেয়ে অবশ্য বলছে দীপককে সে আগে চিনত না। কোন দিন দেখে নি। যেদিন দরখাস্ত হাতে দীপক অফিসের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, সেইদিনই প্রথম দেখা।

কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। চেনা নেই, জানা নেই, একটা উটকো লোকের জন্য মানুষ এত করে না। বাসবীর সঙ্গে নিশ্চয় অনেক আগে থেকেই আলাপ। মেয়ে সে কথা গোপন করে যাচ্ছে।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রান্নাঘরে ঢুকল।

চায়ের কাপ আর রুটির থালা নিয়ে মা যখন আবার ঢুকল, দেখল, রুবি আর খোকন বাসবীর দু পাশে বসে আছে।

রুবি অনর্গল কথা বলে চলেছে আর বাসবী শুনছে।

জান দিদি, মিঠুর মামা কি রকম ম্যাজিক জানে। একটা ছেঁড়া কাগজকে চট করে টাকা বানিয়ে ফেলল। দশ টাকার নোট।

কপট বিস্ময়ে বাসবী দুটো চোখ বিস্ফারিত করল.

বলিস কি রে? ভারি মজা ত। তোর মিঠুর মামাকে বল না, আমাদের কিছু নোট দিয়ে যেতে ছেঁড়া কাগজের বদলে। বেশ একটা মোটর গাড়ি কিনব। উঃ বাসে ভীড় ঠেলে আর যেতে পারি না।

আহা, তুমি বুঝি ট্রামে-বাসে যাও? তুমি মোটরে যাও।

মোটরে?

এবার বাসবীর দু' চোখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠল.

মা তাড়া দিল, খুব হয়েছে বুড়ো ময়না, যা, ওঠ এখান থেকে। দিদিকে খেতে দে।

বারে, তুমিই ত বললে, দিদির কি মজা, ভোঁ করে মোটরে চলে যায়।

মা অপ্রস্তুত। বাসবীর অবস্থা আরও মারাত্মক। মাথা নীচু করে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

খোকন আর রুবি উঠে বাইরের ঘরে চলে গেল। দুজনেই বই নিয়ে বসবে। ওরা পড়ে, মা অন্যদিন মেঝের ওপর আঁচল পেতে শুয়ে থাকে।

আজ দিদি সকাল সকাল ফিরেছে। আজ মা দিদির সঙ্গে গল্প করবে সেটা তারা জানে।

মা কথা বলতে একটু সময় নিল। কোথায় যেন সকোচের একটা আবরণ ছিল। রুবির কথায় বাসবী কি মনে করবে কে জানে!

বাসবী খাওয়া শেষ করে চায়ের কাপ, ডিশ, রুটির থালা ধুয়ে রাখল। তার পর ঘরে ফিরে এসে বলল, বাই, সোকমটাকে একটু পড়াই সে।

থোস না। একটু জিরো। সারাটা দিন ত খাটছিস।

বাসবী বুঝল মা'র বোধ হয় কোন প্রশ্ন আছে। সে তক্তপোষের ওপর বসল।

ঠিক তাই।

একটু পরেই মা জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ রে, দীপক এসেছিল কেন?

বাসবী সোজাসুজি মা'র দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

প্রতিপ্রশ্ন করল, আচ্ছা মা, আমাদের কোন আত্মীয় আছে?

মা একটু বিব্রত হ'ল। হঠাৎ এ আবার কি কথা?

কেন, এ কথা বলছিস কেন?

বল না। বাসবী নাছোড়বান্দা।

তোর ঠাকুর্দার ত একটিমাত্র সন্তান তোর বাবা। পিসির বালাই নেই। বেঁচে থাকবার মধ্যে আত্মীয়ের মধ্যে আছে তোর রাঙা মামা, মানে আমার ছোট ভাই। সে ত সেই পুণায় থাকে। এদিকে আসেও না। চিঠিপত্রেরও যোগাযোগ নেই।

কাছাকাছি আত্মীয় নেই, আমরা বেঁচে গেছি মা।

সে কি? লোকে কাছাকাছি আত্মীয় কামনা করে। দুঃসময়ে কত বড় সম্বল।

না মা, দীপকবাবুর ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে অন্তত এক শহরে জ্ঞাতি না থাকাই ভাল।

এবার মা বিরক্ত হ'ল।

ভনিতা রেখে, আসল কথাটা বলবি ত বল। তোর হেঁয়ালি আমার বোঝার সাধ্য নেই।

শোন মা, দীপকবাবুর এক বড়লোক আত্মীয় টেলিফোন করে অফিসে জানিয়েছেন দীপকবাবুকে যেন চাকরি না দেওয়া হয়।

সে কি রে? মা নিজের গালে হাত ঠেকাল। এর বেশী কোন কথা আর বের হ'ল না।

তাই ত বলছি মা, ভাগ্যিস আমাদের কোন আত্মীয় নেই। না হ'লে আমার নামে অপবাদ একটা দিয়ে দিত, যার ফলে আমার প্রাণান্ত হ'ত। হয়ত চাকরিটাও যেত।

এ কথা বাসবীর মা মানতে চাইল না। সকলের আত্মীয়ই এক রকম হবে, তার কি মানে আছে! যদি বাসবীর একটা কাকা থাকত, তা হ'লে হয়ত এই ভাবে বাসবীকে খেটে খেটেই ম'তে হ'ত না। সংসার বাঁচাবার জন্য তাকে এমন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হ'ত না উদয়াস্ত। কাকা নিশ্চয় সংসারের ভার নিত।

কিন্তু এ সব কথা মা বাসবীকে বলল না। কি হতে পারত তা নিয়ে অযথা তর্ক করা অর্থহীন। কাকা হয়ত ভাল হ'ত, কিন্তু কাকিমা কতদিন তাকে ভাল থাকতে দিত, সেও একটা কথা। আশপাশের পরিবারে দেখতে ত বাকি নেই।

মা একেবারে অন্য কথা পাড়ল।

তাই বুঝি দীপক তোকে বলতে এসেছিল।

হ্যাঁ মা, বেচারির ভয় হয়েছিল পাছে সেই জ্ঞাতির কথা শুনে ম্যানেজার চাকরি না দেয়।

কি হবে?

কি আর হবে! আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন চাকরির চিঠি যখন একবার দেওয়া হয়ে গেছে, তখন যে যাই বলুক, দীপকবাবুকে নেওয়া হবেই। তবে অবশ্য যদি উনি অন্য কোন রকম অন্যায় করেন ত আলাদা কথা।

মা বিস্ফারিত চোখে বাসবীর দিকে চেয়ে রইল।

ক' মাস হ'ল বাসবী চাকরিতে ঢুকেছে। অফিসে সে হোমড়া-চোমড়া একজন, মাইনের অঙ্ক দেখে তা ত মনে হয় না। অথচ কেরানীবাবুরা তার কাছে আসছে অভাব-বার্তা শুনতে, চাকরির সম্বন্ধে খোদ ম্যানেজারের সঙ্গে যখন-তখন আলোচনা চালাচ্ছে। ব্যাপার দেখে মনে হয় বাসবী অফিসের প্রাণকেন্দ্র। তার মত ছাড়া যেন কোন কিছুই হয় না।

এতটা পসারিবার তার অল্পদিনের জোরে! বাড়ীর লোকটা বলত খুঁটির জোর। খুঁটির জোর না থাকলে

অফিসে কেউ পাত্তা পায় না। কেউ তার কথা শোনে না, মাইনে বাড়ে না, উন্নতি হয় না।

বাসবীর ত কোন খুঁটির জোর নেই। কি জানি অজান্তে, মা'র অজান্তে শক্ত খুঁটি বুঝি সংগ্রহ করেছে বাসবী। পাকা আশ্রয়স্থল, যার জোরে আধিপত্য চালাচ্ছে সবার ওপর।

তলিয়ে দেখলে কথাটার যে কুৎসিত অর্থ হয় সেটা ভেবেই মা শিউরে উঠল।

বাসবী মা'র মুখের দিকে লক্ষ্য করে নি। অন্য দিকে চেয়ে কি ভাবছিল। অন্য দিকে চেয়েই বলল, আমি দীপকবাবুকে খুব ধমক দিয়ে দিয়েছি মা।

ধমক। মা'র যেন বিস্ময়ের অন্ত নেই।

হ্যাঁ মা, বলে দিলাম, এ সব ব্যাপার নিয়ে আপনি আমার বাড়ী আসেন কেন? আমি কি করতে পারি। যা বলার আপনি ম্যানেজারকে গিয়ে বলুন।

মা এবার কণ্ঠস্বর নরম করল, আহা, তোর দৌলতেই চাকরিটা পেয়েছে, তাই ভয় পেয়ে আগে তোর কাছে ছুটে এসেছে।

না মা, তুমি বোঝ না। এ সব ব্যাপারে থাকতে নেই। কে কি রকমের লোক ঠিক আছে। দীপকবাবু যদি আর একটি বিভাসবাবু হয়ে দাঁড়ান ত কে সামলাবে! আমি সাত জন্মে তাকে দেখি নি। চাকরির খোঁজে এসেছিলেন, মুখ দেখে মায়া হ'ল, ম্যানেজারকে বললাম। ভদ্রলোকের বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, চাকরিটা হয়ে গেল। ব্যস, আমার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। বেশী আসাযাওয়া আমি পছন্দ করি না। হৃদ্যতা বাড়ালেই ঘাড়ে দোষ এসে পড়বে, অবশ্য ভবিষ্যতে যদি কোন গোলমাল হয়।

মা চুপ করে রইল। ইদানিং বাসবীকে বোঝাই তার পক্ষে দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন কলেজে পড়ত, তখন কেবল কলেজ আর বাড়ী, বাড়ী আর কলেজ করত। বেশী এদিক ওদিক করতই না। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকে বই খুলে বসত।

এখন বাসবী সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কোথায় যায় আর না যায় ঈশ্বর জানেন। এখন কোন প্রশ্ন করা চলবে না। মেয়ের উপার্জনে তার অন্নসংস্থান হচ্ছে। উপার্জনক্ষম মেয়েকে না মেনে উপায় নেই।

বাইরে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। রুবি আর খোকন ঝগড়া সুরু করেছে।

তুই বস বাসী, ও দুটোতে বালী-সুগ্রীবের লড়াই সুরু করেছে। একবার দেখে আসি।

বাসবী একবার ভাবল মাকে থামিয়ে সেই গিয়ে বসবে রুবি আর খোকনের কাছে। অনেক দিন তাদের পড়াশোনার খোঁজ নেয় নি। সময়ই পায় নি। আজ যখন সময় পেয়েছে তখন লেখাপড়া কেমন করছে সেটা দেখবে। কিন্তু ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। উঠতে ইচ্ছা করছে না। কথা বলতেও নয়।

হাত দিয়ে বালিশটা টেনে নিয়ে বাসবী শুয়ে পড়ল।

আঃ। পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল একটা। হোক, মলিন, শতছিন্ন শয্যা, তবু পরিশ্রান্ত দেহটা এলিয়ে দিতে খুব ভাল লাগছে।

খোলা জানলা দিয়ে কানে এল রোরুদ্যমান রুবির নালিশ। খোকন তার কানে হাত দিয়েছে, তার অন্ত অভিমান উৎসারিত হয়ে পড়ছে। মা দুজনকে ধমকাল, বোঝাল, রুবিকে বোধ হয় একটু আদরও করল।

চোখ বুজে বাসবী সব শুনল।

শুনতে শুনতে মনে হ'ল, এমন যদি হ'ত, পিছু হেঁটে হেঁটে বাসবী আবার ফিরে যেতে পারত নিজের বাল্যকালে, চিন্তাহীন, সমস্যাহীন জীবনে। নিজের দেহ যখন লোভের খোরাক হয়ে ওঠে নি, পদে পদে নিজেকে বাঁচাবার ভাবনা এত প্রকট নয়। খুশী হ'লে হাসি, ব্যথা পেলে কান্না, সব অনুভূতি সীমিত শুধু এই দু'টি অভিব্যক্তির মধ্যে। আজকের মতন কার কাছে কতটা হাসব, এ সব ভাববার প্রশ্নও ছিল না।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, হঠাৎ কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ লাগতেই বাসবী চমকে চোখ খুলল।

কে?

মা কোন উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে কপালে হাত বোলাতে লাগল।

বাসবীর মনে হ'ল সত্যিই বুঝি অনেকগুলো বছর পার হয়ে সে মায়ের কোলের সান্নিধ্য পেয়েছে।

কি, শরীর খারাপ লাগছে?

না মা, একটু ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।

ক্লান্তির আর অপরাধ কি বল। খাটুনির কি শেষ আছে। সেই কখন বেরিয়েছিল সাত সকালে, তবু বলতে নেই, আজ টিফিনেতে যাস নি, একটু আগেই ফিরেছিস।

হঠাৎ বুঝি কথাটা মা'র মনে পড়ল।

হাঁরে, বাইরে যে যাবি, সেখানে খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?

বাসবী উঠে বসল। শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। রঙ্গ শাড়ী ঠিক করে নিয়ে মা'র দিকে চেয়ে হেসে বলল, আমি ত আর একলা যাচ্ছি না। সঙ্গে অনেকেই যাচ্ছে। তাদের যা ব্যবস্থা হবে, আমারও তাই।

তবে কোথায়?

বাসবী একটু চমকে উঠল। এ কথাটা তারও মনে পড়ে নি। তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে, কিন্তু আলাদা মানে স্বতন্ত্র নয়। একই হোটেলে কিংবা একই ডাক-বাংলোর ভিন্ন কামরায়। ছিদ্রান্বেষী মানুষের অভাব অফিসে নেই। নিশিবাবুর কল্যাণে খবর সবাই ঠিকই পাবে। হয়ত একটু বেশী করেই পাবে, অতিরঞ্জিত হয়ে।

এমনিতেই ত অফিসের বাতাসে তার নামের সঙ্গে অনিমেষের নাম জুড়ে অপবাদের মেঘ জমছে। বাসবীর প্রতি ম্যানেজারের একটু পক্ষপাতিত্ব কারও দৃষ্টি এড়ায় নি। তার পর এক সঙ্গে বাইরে থেকে ঘুরে এলে অফিসে হয়ত কান পাতা যাবে না।

কৃষ্ণা বলে যে মেয়েটি তোদের অফিসে কাজ করে সেও যাচ্ছে না কি?

মা আবার প্রশ্ন করল।

না মা, সে গেলে চলবে কি করে। টেলিফোনের কাজ করবে কে তা হ'লে। আমি যাচ্ছি টাইপিষ্ট হিসাবে।

টাইপিষ্ট?

হ্যাঁ, দিন কতক টাইপ শিখেছিলাম, মা? সবাই বলেছিল, টাইপ শিখলে চাকরি পাবার সুবিধা হবে। তার পর বাবার অসুখ করতে ত সব বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে একজন টাইপিষ্ট দরকার।

অফিসে আর কেউ টাইপিষ্ট নেই?

মা'র কণ্ঠস্বর বাসবীর কানে খুব ভাল ঠেকল না। কেমন সন্দেহের মত শোনাল। মা বুঝি কিছু সন্দেহ করছে। সবাইকে বাদ দিয়ে বাসবীকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার কারণ কি।

বাসবী মার দিকে সরে বসল। সরে এসে একটা হাত মার কোলের ওপর রেখে বলল, কথাটা খুব গোপনীয় মা।'

তবে থাক, আমি শুনতে চাই না।

অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে কথাটা বলে মা তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বাসবী তাকে দু' হাত দিয়ে বেষ্টন করে ধরল।

কোথায় যাচ্ছ?

ছাড়, রান্নাঘরে আমার একরাশ কাজ পড়ে রয়েছে।

বস মা, বস, সব তোমায় বলছি।

বাসবী জোর করে মাকে আবার তক্তপোষের ওপর বসাল।

মা'র বসার ধরন দেখে মনে হ'ল তার উঠে যাবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। রান্নাঘরে জরুরী কাজ পড়ে আছে, এখনও মনে হ'ল না।

কি বলবে বল?

সেই যে বিতানবাবুর কথা তোমায় বলেছিলাম। চুরির দায়ে যাঁকে ধরা হয়েছে। তিনি মামলা লড়বেন। কোম্পানীর বিরুদ্ধে তাঁর কতকগুলো অভিযোগও আছে। কোম্পানীও সাক্ষী-সাবুদ খাড়া করছে। বিতানবাবু অনেক দিন এ অফিসে কাজ করেছেন, সহকর্মীরা সবাই তাঁর বন্ধুর মতন। কাজেই অফিসের অন্য টাইপিষ্টদের ম্যানেজার খুব বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁরা হয়ত সমবেদনা-বশত বিতানবাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষী সংগ্রহের ব্যাপারে ততটা তৎপর হবেন না, কিংবা ঠিক ঠিক সাক্ষীদের বিবৃতি টাইপও করবেন না। একমাত্র আমার সঙ্গে বিতানবাবুর কোন আলাপ নেই। আমি তাঁকে দেখিও নি কোন দিন। কাজেই এ কাজটা আমিই সবচেয়ে ভাল ভাবে করতে পারব। অন্তত ম্যানেজার তাই মনে করেন।

একটানা এতগুলো কথা বলে বাসবী হাঁপাতে লাগল। আরক্ত হ'ল সারা মুখ।

মনে হ'ল, মা যেন কথাগুলো বিশ্বাসও করল। আর যাই হোক যুক্তি আছে। পুরোনো লোকের পক্ষে এ ধরনের কাজে যে সব বাধা থাকে, নতুন লোকের বেলায় সে সব অসুবিধা থাকার কথা নয়।

একটু ভেবে মা বলল, কিন্তু এতে তোর ওপর অফিসের আর সবাই চটবে না?

চটলে আর কি করব মা। অন্যায় ত আর করতে পারব না। অফিসের হুকুম পালন করতেই হবে।

বাসবীর কণ্ঠস্বরে মা চমকে উঠল। ঠিক যেন আর একজনের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। যে কণ্ঠ আর কোন দিন কোথাও শোনা যাবে না।

সে মানুষটাও এই কথা বলত। অন্যায়,অধর্ম করতে পারব না। এতে উন্নতি না হয়, না হবে। কোন দিন লোকটা অফিসের কাজে অবহেলা করে নি। জলে, ঝড়ে, আপদে, বিপদে ঠিক সময়ে অফিস গিয়েছে। একটু এদিক-ওদিক করতে পারলে হয়ত বাড়তি টাকা অযাচিত ভাবে হাতে এসে যেত। সে পথ তার জানা ছিল। কিন্তু কর্তব্যের পথ থেকে এক চুল ভ্রষ্ট হয় নি।

কিন্তু এই কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা কি তাকে দিয়েছিল! কাঁটার মুকুট, অভাব, অনটনের জ্বালা। এ যুগে চীৎকার না করলে কিছু পাওয়া যায় না। যারা আস্ফালন করতে পারে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত চীৎকার, তাদের নির্জীব, দুর্বল বলেই সবাই ধরে নেয়।

আজ সেই একটা মানুষের জন্যই সংসারের এই হতছাড়া অবস্থা। চোখ বুজোবার সঙ্গে সঙ্গে দু মুঠো অন্নের জন্য মেয়েকে পথে নামতে হ'ল।

বাসবীও ঠিক একই ধরনের কথাই বলছে।

কি ভাবছ মা?

মা যেন অনেক দূর থেকে উত্তর দিল। অনেক দূর থেকে ইথারে ভেসে এল তার কম্পমান কণ্ঠ।

এ সব কিছু নেই বাসী।

"কি নেই মা?

এই ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, পাপ-পুণ্য।

কেন?

হ্যাঁ, জানিস না, কলিযুগে দেবতারা ঘুমায়। যারা যত অন্যায় করে, তারাই কীর্তিমান হয় বেশী। বাড়ীর মানুষটাকে দেখলি না? সারা জীবন ত কাউকে ফাঁকি দেয় নি, কোন মিথ্যাচরণ করে নি কারও সঙ্গে, অথচ ফাঁকিতে পড়ল নিজেই সবচেয়ে বেশী।

বাসবী বিস্মিত হ'ল। এ ধরনের চিন্তা যে মা'র মনকে বিচলিত করছে, তা সে ভাবতেই পারে নি।

কেন, বাবা ফাঁকিতে পড়লেন কেন?

উত্তর দেবার সময় বাসবীর গলাটা রীতিমত কেঁপে উঠল। অনেক দিন পরে বাবার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। এত দিন বাবার কথা আলোচনাই হয় নি। লোকটা ধীরে ধীরে বিস্মৃতির ধুলো পড়ে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল।

পড়ল না? সংসারের কোন সাশ্রয় করে যেতে পারল না। লোকে চাকরি করে বাড়ী-ঘর করে, টাকা জমিয়ে যায়। অথচ আজ আমাদের কি অবস্থা, তুই বল?

তর্ক করা বাসবীর স্বভাব নয়, বিশেষ করে মা'র সঙ্গে।

কিন্তু এ কথাটার একটা উত্তর না দিয়ে সে পারল না। এ কথা মেনে নেওয়া মানে, বিগত-জীবন একটা মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

সেটা বাসবী পারবে না।

একটা কথা বলব, কিছু মনে কর না মা। আমি নিজে বাইরে বের হচ্ছি। কিছু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাদের সংসারের খোঁজ-খবরও রাখি। চাকরি করে ক'টা লোক বাড়ী-গাড়ি করেছে তা ত জানি না। তাও বাবার মতন এই বয়স আয়ে। বাবা যে কিছুই করে যেতে পারেন নি, এ কথা আমি মানতে রাজী নই। বাবা আমাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে গেছেন। কিছু লেখাপড়া শিখেছি বলেই তবু নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। এটাও না হলে, কি অবস্থা হ'ত বল ত? কাগজের ঠোঙা কিংবা পরের জামা-কাপড় সেলাই করে দিন চালাতে হ'ত।

উত্তেজিত বাসবী কথাটা আর শেষ করতে পারল না।

মা আর কিছু বলল না। আড়চোখে বাসবীকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

বাসবী ঠিক তার বাপের মতন হয়েছে। অন্যায়, অসত্য সহ্য করতেও পারে না। জ্বলে ওঠে, কিন্তু সবই কি বাপের মতন হয়েছে?

বাসবীর বাপ চোখ তুলে কখন এদিক-ওদিক দেখে নি। কোন বন্ধু আগে আগে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে আসত। বাসবীর বাপকে ডেকে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করত। তখন বাসবীর বাপের মুখ-চোখের

অবস্থা কল্পনা করে হেসে ফেলা ছাড়া আর উপায় থাকত না।

সারা মুখ আরক্ত, সমস্ত শরীর ঘামে ভেজা, জিভ আড়ষ্ট, অনেক চেষ্টা করেও দু-একটার বেশী কথা বলতে পারত না, বুড়ো বয়স পর্যন্তও একই অবস্থা। এ নিয়ে বাসবীর মা কম ঠাট্টা করে নি।

বাসবী কিন্তু এত লাজুক হয় নি। এই ত অল্প দিন চাকরি করছে, এর মধ্যে পুরুষ বন্ধু বড় কম জোটায় নি। ম্যানেজার আছে, এক বাসববাবু আছে, সময় সুযোগ পেলেই থিয়েটারের গল্প করে, তার পর নিশিথবাবু। এ সব ছাড়া দীপক ছেলেটা ত ছুটে ছুটে বাড়ীতে আসে।

আরও যদি কেউ থাকে বাসবীর মা'র জানবার কথা নয়। যা চাপা মেয়ে বাসবী, যদি ইচ্ছা না হয়, একটি এদিক-ওদিক কথা বলবে না।

এই একটা ভয় মাকে অহরহ আচ্ছন্ন করে থাকে।

হঠাৎ যদি একদিন বাসবী এসে বলে, মা আমি বিয়ে করেছি। বলা যায় না, যাকে বিয়ে করেছে, তাকে একেবারে সঙ্গে করেও আনতে পারে।

বাসবী সংসার ডোবাবে না। সেটুকু কর্তব্যজ্ঞান তার আছে। হয়, স্বামীকে নিয়েই এ বাড়ীতে বাস করবে কিংবা দুজনে অন্য কোথাও উঠে যাবে। অন্য কোথাও উঠে গেলেও সে সাহায্য ঠিক করে যাবে। মাঝে মাঝে আসবে, খোঁজ-খবর নেবে।

কিন্তু কত দিন। নিজের সংসার হ'লে এ সংসারকে বাসবী ভুলে যাবে। দ্রুত নয়, ধীরে ধীরে, মন্দগতিতে।

এমনই সব আবোল-তাবোল ভাবনা। যে ভাবনার শিকড় নেই। অর্থ নেই।

আগে বাসবীর মা'র এ সব চিন্তা-ভাবনার বালাই ছিল না। মাসের শেষ দিকে একটা মানুষ উপার্জনের টাকা তার হাতে ফেলে দিত। সারাটা মাস সে টাকা দিয়ে কোন রকমে সংসার চালাতে হ'ত। চিন্তা শুধু সংসার চালাবার, আর কিছুর নয়।

এখন মানুষটা সরে যেতে নানান চিন্তার বোঝা তার মাথায়। শুধু সংসার চালানই নয়, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ। কি জানি, কোন্টা কি রকম হবে। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কি করে তাদের মানুষ করে তুলবে।

যদি বাসবী চলে যায় অন্য কোথাও। এ সংসারের কথা ভুলে যায়, তা হ'লে কি করবে! রুবি আর খোকন কি করে দু'জনকে গড়ে তুলবে।

হয়ত এ সব চিন্তা করার কোন মানে হয় না। নিজের মনকে তিক্ত, বিষাক্ত করে তোলা ছাড়া এ সব চিন্তার কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু জগৎ বড় বিচিত্র জায়গা। যা কোন দিন কেউ কল্পনাও করে না, তেমন ব্যাপার ঘটে বই কি। পেটের ছেলে পর হয়, পরের মেয়ে কাছে আসে। সাজান সংসার তছনছ হয়ে যায়।

কিন্তু চিন্তা করে কেউ কি পারে বিধির বিধান রোধ করতে। কেউ পেরেছে এ পর্যন্ত!

বড্ড খিদে পেয়েছে মা।

বাসবী আর মা দুজনেই নিজেদের চিন্তায় বিভোর ছিল, রুবির কথায় দুজনেই সজাগ হয়ে উঠল।

চল, আজ সবাই এক সঙ্গেই খেয়ে নিই। বাসী, এখন খাবি ত?

মুখের সামনে হাত আড়াল দিয়ে বাসবী হাই তুলে বলল, দাও, বড় ঘুম পাচ্ছে।

খেতে বসে দু-একটা কথা হ'ল। মা'র সঙ্গে নয়, বাসবী খোকন আর রুবির সঙ্গে কথা বলল। খোকনের স্কুলের কথা, তার লেখাপড়ার কথা।

বাসবী জিজ্ঞাসা করল, তুই বড় হয়ে কি হবি খোকন?

ভবিষ্যতটা বোধ হয় খোকনের ভাবাই ছিল, সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, ডাক্তার।

খোকনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রুবি বলল, আমি তোমার মত মেয়ে-কেরানী হব দিদি। চুলে রিবন বেঁধে রোজ বেশ ট্রামে করে অফিসে যাব।

সবাই উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল।

অপ্রস্তুত রুবি দিদির কোল ঘেঁষে বসল।

বাসবী সস্নেহে তার কোঁকড়ানো চুলের গোছা নাড়া দিতে দিতে বলল, ঠিক আছে, রুবি সেনকে কাল থেকে অফিসে ভর্তি করে নেব।

রুবি এঁটো মুখটাই অভিমান ভরে দিদির কোলের মধ্যে গুঁজে দিল।

পরের দিন বাসবী অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়াল।

ম্যানেজারসাহেব আপনাকে ডাকছেন দিদিমণি।

বাসবী আড়চোখে একবার ঘড়ির দিকে দেখল। ঠিক দশটা। এ অফিসে দশটা দশ মিনিটের মধ্যে পৌছানো নিয়ম। বাসবী আজ একটু আগেই এসেছে।

নিজের টেবিলের ওপর ভ্যানিটি ব্যাগটা রেখে বাসবী ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল।

অনিমেষের পাশে নিশিবাবু। দুজনে ফিস ফিস করে কথা বলছে।

ঢুকেই বাসবী দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এগোনো হয়ত উচিত হবে না।

অনিমেষ দেখে নি, চোখ পড়ল নিশিবাবুর।

নিশিবাবু চোখের ইশারায় অনিমেষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

অনিমেষ চোখ তুলে দেখে বলল, বসুন।

বাসবী পাশের চেয়ারে বসল।

অনিমেষ নিশিবাবুর দিকে ফিরে বলল, আচ্ছা নিশি-বাবু, ঐ ভাবেই কাজ চালিয়ে যান। যে তিনটে ফাইলের কথা বললাম, সেগুলো সঙ্গে নেবেন। পরে আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে নেব।

ঘাড় নেড়ে নিশিবাবু বাইরে চলে গেল।

মিস সেন।

এবারে অনিমেষ বাসবীর দিকে ঘুরে বসল।

বলুন।

পরশু রাত আটটায় আমরা রওনা হব। আপনি ইতিমধ্যে সব গোছগাছ করে নিন।

পরশু?

সীট রিজার্ভ হয়ে গেছে।

কিন্তু কোথায় যাচ্ছি সেটা জানতে পারি?

বাসবীর বলার অসহায় ভঙ্গিতে অনিমেষ হেসে উঠল। বলল, সর্বনাশ, সেটাই বুঝি আপনাকে বলা হয় নি? আমরা উপস্থিত যাব রাঙামাটি। সাঁওতাল পরগণার। সেখানেই আমাদের কাজ চলছিল। ব্রিজ তৈরীর কাজ। বিভাসবাবু সেখানেই ছিলেন। যাদের সাক্ষ্যের আমাদের প্রয়োজন, তারাও সেখানেই আছে।

সেখানে আমি থাকব কোথায়?

মা'র প্রশ্নটা এখনও বাসবীর মনে খোঁচা দিচ্ছে, এটুকু বোঝা গেল।

প্রচুর মহুয়া গাছ আছে সেখানে, ডাল ঝাঁকড়া একটা গাছ বেছে নিয়ে তার তলাতেই আসন পাতবেন।

উচ্চ রোলে হেসে ওঠার মুখেই অনিমেষ বাধা পেল। বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে।

সাব, বিভাসবাবুর পরিবার দেখা করতে চান।

(ক্রমশ)

বৃন্দাবনে মীরা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

[ভূমিকা : পুণায় আমাদের হরিকৃষ্ণ মন্দিরে ভজন শুনতে শুনতে ইন্দিরা দেবী প্রায়ই ভাবসমাধিস্থ হয়ে ভাবনেত্রে দেখেন—মীরা সাধুসন্ত ভক্তভক্তিমতীদের সঙ্গে কীর্তন করছেন বৃন্দাবনের একটি মন্দিরে। কখনো কখনো দেখেন—কোনো বিজ্ঞমন্য পণ্ডিত বা সন্ন্যাসী মীরাকে তিরস্কার বা শ্লেষ সুরু করেছেন, কখনো দেখেন—মীরাকে তাঁর গুরুদেব শ্রীসনাতন গোস্বামী (শ্রীগৌরাঙ্গের খ্যাতনামা শিষ্য) আশীর্বাদ করছেন সোল্লাসে। সমাধি ভাঙলে ইন্দিরা দেবী যখন ভাবমুখে সাশ্রুনেত্রে বর্ণনা করেন তিনি কি দেখেছেন, শুনেছেন, চেখেছেন, তখন অনেক সংশয়াত্মাকেও উজিয়ে উঠতে দেখা যায়, বিশেষ ক'রে যখন বলেন মীরার গোপালের বা গুরুর প্রসাদের কথা। তাঁর এই দৃষ্টি ও শ্রুতিলব্ধ কাহিনী নিয়ে ইতিপূর্বে আমি "অঘটন আজো ঘটে", "অভাবনীয়" প্রমুখ উপন্যাস লিখেছি, ইন্দিরাদেবীর দর্শন ও শ্রবণের আরো অনেক অনুলিপি দিয়েছি আমার THE FLUTE STILL CALLS গ্রন্থে।]

বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে গুরুপূর্ণিমার দিন প্রত্যুষে উৎসব। যুগল বিগ্রহের ডানদিকে মীরার গুরুদেব শ্রীসনাতন গোস্বামী ও মন্দির-পূজারী পুণ্ডরীক আসীন। তাঁদের ঠিক পাশেই মথুরার এক খ্যাতনামা পণ্ডিতম্মন্য জমিদার অজিত অপ্রসন্ন নেত্রে দেখছেন মীরার ভাবনৃত্য। মন্দিরের দুই কোণে ত্রিশ-চল্লিশ জন ভক্ত ও ভক্তিমতী সাগ্রহে শুনছেন মীরার গুরুবন্দনা :

সখী, আজ এলো শুভদিন, আয় আয়, গাই মঙ্গলগান।
মীরা "জয় গুরু জয় জয় গুরু" গায় উছলি' সাঁঝবিহান।

জানি : দোষের আমার নাই সীমা,
করি কত অপরাধ—জানি।
জানি : আমার এ মন পাপে তাপে কালো—
হীনা দীনা আমি—মানি।
তবু তরিব হেলায়, পতিতপাবন গুরু করিবেই ত্রাণ।
মীরা "জয় গুরু জয় জয় গুরু" গায় উছলি' সাঁঝবিহান।

ভয় কী আমার—যদি ওঠে গো তুফান,
পথে অমানিশা ছায়?
ছোট আমার এ-খেয়া, কূল বহুদূরে?
হোক্ না, কী আসে যায়—
যবে হরিনাম হ'ল হাল, গুরু হ'ল কাণ্ডারী মহীয়ান্?
গুরু আমার মতন কত অসহায়ে তরালো সাঁঝবিহান।

বৃথা চাঁদ বিনা নিশি, সৌরভ বিনা ফুল,
আঁখি বিনা জ্যোতি।
বিনা গুরু নিষ্ফল সাধনভজন, গুরু বিনা নাই গতি।
হরি মিলালো গুরুরে, গুরু দিল ফিরে শ্রীহরির সন্ধান।
মীরা "জয় গুরু জয় জয় গুরু" গায় উছলি' সাঁঝবিহান।

(গানের শেষে মীরা ভাবনৃত্য করতে করতে ভাবসমাধিতে করজোড়ে যুগলবিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে সাশ্রুনেত্রে "গোপাল গোপাল" ব'লে ভাবাবেশে বিগ্রহের বেদীমূলে প্রণাম করতেই পূজারী পুণ্ডরীক মীরার সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে গদগদকণ্ঠে শুধু বলে :

"মা…মা…মা…"

অজিত (রুষ্টকণ্ঠে)

ধিক্ ধিক্ হে পূজারী! বংশে তুমি নহ কি ব্রাহ্মণ?
লজ্জা নাই?—নীতিহীন ধর্মের শাস্ত্রের অবমান
করো বিপ্র হয়ে—নমি' শূদ্রবর্ণা রমণীরে—যার
জন্ম হীন শূদ্রকুলে—

পুণ্ডরীক (কানে হাত দিয়ে) ঃ

ছি ছি ! হেন পাপবাণী আর
করিও না মুখে উচ্চারণ। বৈষ্ণবীর অমর্যাদা !
কী বলিয়াছিলেন কৃষ্ণ অর্জুনেরে গেছ কি ভুলিয়া ?—
"যাহারা আমার ভক্ত—নয় পার্থ, কৃষ্ণভক্ত তারা।
তারাই আমার ভক্ত—আমার ভক্তের ভক্ত যারা।"*
আদর্শ বৈষ্ণবী মীরা, অনিন্দিতা, কৃষ্ণবিলাসিনী।
জন্ম তাঁর কলিযুগে—চিরন্তনী ব্রজগোপিকার
নিত্যবৃন্দাবনলীলা সাধিতে প্রাকৃত বৃন্দাবনে।
সঙ্গীতসাধিকা, জ্ঞানপ্রিয়া, কবি, মহীয়সী রাণী
মূর্তিমতী দেবদূতী, অহৈতুকী ভক্তির প্রতিমা—

অজিত (উত্তীর্ণ)

স্তব্ধ হও। মীরা—মহীয়সী, রাণী, আদর্শ বৈষ্ণবী !
মূর্তিমতী দেবদূতী !—ধিক্ ! দিয়েছে যে বিসর্জন
নারীর ভূষণ লজ্জা—জনতার মাঝে নিঃসংকোচে
নিরত যে নাচে গান ছিন্ন করি' অন্তঃপুরিকার
সম্রান্ত অবগুণ্ঠন !

(মীরাকে কঠিন স্বরে)

সহেছি তোমার অনাচার
বহুদিন বৃন্দাবনে। শুনেছি তোমার নানা ছলে
প্রতিদ্বন্দ্বিবাদ্যাসের বহু বক্র নিন্দা, উপহাস,
ভক্তির আতিবিলাসে খর্ব-করা জ্ঞানের মহিমা,
দুর্লভ কেলিসোল্লাসে অতুলীন উপমা-কৌশলে
মূর্খের মনোরঞ্জন-করা লাস্যভঙ্গে, মরি মরি !
দেখিতে সরলা তুমি, বিচক্ষণা মোহিনী নর্তকী !—
জানো দুর্বলতা গ্রাম্য অশিক্ষিত অতি-বিষাদীর।
তাই তো তাদের এত প্রাণপ্রিয়া তুমি, বক্ষমাঝ
অবাসিকা অনুপমা অভিনেত্রী ! করি' অনুদিত
লোভনীয়া নারীভঙ্গিমায়ী মূক মূঢ় পুরুষের
রক্তে দিয়ে দোলা হও ভক্তিছলে সর্ব-মনোরমা।
ভুলাও তাদের মন এই অলীকারে—শুধু নাম—
হরিবোল বোলে হরি দেন ধরা—অশ্রু আবিল
চেউয়ে চেউয়ে পা ভাসায়ে যে হয় উধাও—পায় কূল
অকূল পাথারে। নাই বাখ্যার সংযম শমদম
প্রত্যাহার প্রাণায়াম আসন ব্রতের প্রয়োজন ঃ
শুধু "কোথা হরি" বলি' কাঁদিলেই দেন তিনি ধরা
আত্মহারা হয়ে—শুধু কান্নার জোয়ারে বাসুদেব
দেন দেখা সাশ্রুনেত্রে দিয়ে ভক্ত-ক্রন্দনে দোসার !

(আঙুল নেড়ে শাস্তা ভঙ্গিতে)

সাবধান ছলময়ী ! মিথ্যার বেসাতি নহে আর !
গীতায় অর্জুনে কৃষ্ণ কী বলিয়াছিলেন—রেখো মনে ঃ
"তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ"—
আপ্তবাক্য সাধুবাণী শাস্ত্রের বিধান মানি' তবে
চলিবে তীর্থযাত্রায় সত্যের সন্ধানে—প্রতিপদে
দুর্বলেরে কার' দান আমাদের জ্ঞানলব্ধ জ্যোতি,
চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে—মেলি' পৌরুষের পাখা
সংসারে সাধিতে হবে জ্ঞানভক্তিকর্মসমন্বয়।

মীরা (স্নেহ ব্যঙ্গ হাস্যে)

ধন্য তুমি জ্ঞানী বলী সচ্চরিত্র হে মহাপুরুষ !
কিন্তু হায়, আমার যে নাই জ্ঞান শক্তি বিদ্যা বল,
বাক্যবিশারদ মহাপাণ্ডিত্য, কি ব্যাখ্যান-দ্যুতি।
আমি যে জানি না কারে বলে শম দম প্রাণায়াম
প্রত্যাহার, কর্মজ্ঞান ভক্তিসমন্বয়ের সংবাদ।
নাই যে আমার মহাচরিত্রের আশ্চর্য বিভূতি,
সংস্কৃতির দীপ্ত টিকা। নাই যার সত্যকারী পাখা
সে কেবল গোপালের চরণে লুটায়ে পারে তাঁরে
অনুনয় করিতে কাতরে ঃ "প্রভু, কোরো না আমায়
তোমার চরণছাড়া।" অসহায় শিশু শুধু তার
মা-র কোলে চায় ঠাঁই। কেন চায় জানে না সে, শুধু
না জেনেও জানে সে যে, শুধু এক স্নেহকোলে হয়
সকল ভয়ের নিরসন। জানি তেমনি আমিও—
আমি চির-নিরাপদ শুধু স্নেহকোলে গোপালের
যারে পিতামাতা চিরসাথী প্রিয়তম ব'লে জানি।

অজিত (সব্যঙ্গে)

তাই বুঝি পদে পদে অশ্রুভরী বাহিয়া তরিতে
চাও এই নিষ্করুণ অকূল পাথার ?

মীরা (হেসে কেঁদে)

মহাভাগ—

---

* যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ, ন মে ভক্তা স্ত তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তা হি তে নরাঃ॥

তর্কবিশারদ তুমি—বহুজ্ঞ, সুধীন। যুক্তি তব
ক্ষুরধার—লোকমুখে শুনি। তাই শুধাই তোমারে:
এ-অতল ভবার্ণব উত্তীর্ণ হয়েছে কবে কোন্
মহাবলী শুধু তার বাহুতরী বাহিয়া—এ-কালো
দিশাহীন অন্ধকারে বাসনা-তরঙ্গ কাটায়ে কে
পেয়েছে অকূলে কূল আপনার দৃষ্টির আলোয়
উচ্ছ্বসি জলের মরুভূমি? আমি নহি শাস্ত্রবিৎ।
অবলা আমার বল শুধু একজন—সে গোপাল।
অজ্ঞান আমার জ্ঞানদাতা শুধু সে—নির্দেশে যার
জানি নিত্য-অনিত্যের ভেদ। যতবারই এ-তুফানে
উত্তাল তরঙ্গ গরজায় অন্ধকারে—তরী আমি
বাহি শুধু তাঁর ম্লানিহীন প্রেমধ্রুবতারা ধরি'।
আমার ভরসা-হাল শুধু তাঁর কৃপা। আশৈশব
তাঁরি করুণার নাম বিশ্বাসের পাল তুলি' পাড়ি
দিয়েছি নিরুৎসাহের নিষ্করুণ পারাবারে। নাই
আর কোনো সম্বল যাহার তারি সহায় গোপাল।

(বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে সোচ্ছ্বাসে গান)

দাও আমারে এ-বরদান হরি,
যেন মুখে জপি—"ভগবান্ হরি",
প্রতি শ্বাসে নাম জপে প্রাণহরি,
প্রতি পলে ধরি তব ধ্যান।

কুল- ভরসা যেন না চাই হরি,
পিতা মাতা পরিজন তাই হরি,
ধন মান পাই বা না পাই হরি—দাও শরণ নিরবসান।

যেন যাকিছু আমার সঁপি তোমায়,
বঁধু, জনমে মরণে সুখ ব্যথায়,
মোর তন মন যেন বিকায় শ্রীচরণে নিরভিমান।

দাও বল—হ'তে আজ বিহীনবল,
সব হারায়ে তোমারি পায়ে শ্যামল
চাই অরূপূজায় হ'য়ে উজল হে তোমামাঝে অবসান।

দাও সেই মান নহে যে অপমান,
আমি অজ্ঞান—এই পরম জ্ঞান
আলো নিরানন্দ দুরাশীপ্রাণ একান্ত এ-বরদান।

রাখো মীরার মাথায় হাত মোহন,
আমি যেমনি হই না করো আপন,
হরি নামে এ-কণ্ঠ ভরি' এখন গাওয়াও শুধু নামগান।

[গান করিতে করিতে শেষের দিকে ভাবাবেশে পুনরায় নৃত্য। মন্দিরের মধ্যে একটা থমথমে ভাব জমাট হইয়া আসে। গানের শেষে মন্দিরের মেয়েদের মধ্যে চাপা কান্না শোনা যায়। পুরুষেরা মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া মীরাকে প্রণাম করিয়া বলে: "জয় মা…জয় মীরা মাতা…জয় জয়…]

অজিত (জোর ক'রে সব্যঙ্গে)

বৃথা করজোড়ে কর অনুনয় এ-নটীর পায়।
ভ্রান্তিবিলাসের পথে নাই শান্তি। উচ্ছ্বাসের রঙে
কালো কবে হয় আলো? মরীচিকা পানে ছুটি' কবে
কে পেয়েছে পিপাসার জল? বৃথা করো মূঢ় স্তব।

(মীরার দিকে ফিরে)

তোমার এ-অভিনয় নিপুণ। যাহারা জয়ধ্বনি
করে ভুলি' মনে তব—তাহারা কৃপার পাত্র—শিশু
সরলা কুমারী বৃদ্ধা সহজেই হয় প্রবঞ্চিত,
অনভিজ্ঞ নিরক্ষর অবোধ কৃষাণ উচ্ছ্বসিয়া
যাকিছুই ঝিকমিক করে তাকে ভেবে স্বর্ণমান,
ভুলেরে বরণ করে খাঁটি বলি' না চিনিয়া হায়!

(গভীর সুরে)

কিন্তু আর নয়! সাবধান! ছাড়ো এ-নটভঙ্গিমা,
চাতুরী মাধুরী। আর ভুলায়ো না সরল অবোধ
গ্রামবাসীদের গেয়ে মিথ্যা ভক্তিমধুর কীর্তন।
গাঁথিয়া রঙিন কথামালা কেহ পায় না সত্যেরে।
শুধু জ্ঞানালোকে পায় জিজ্ঞাসুরা নির্দিশার দিশা।
মায়ার কবল হ'তে শুধু আত্মশক্তি পারে ত্রাণ
করিতে বিমুক্ত জনে। নিষ্ফল এ-ক্রন্দনবিলাস।

মীরা (করজোড়ে)

মহাবলী জ্ঞানী ধ্যানী মহাপ্রাজ্ঞ বহুজ্ঞ শাস্ত্রীরা
অক্লান্ত পরমানন্দে পৌরুষের যে-মহিমময়
গৌরবের জয়গান ঝংকারিয়া এসেছেন—তুমি
বৃথা কেন করো তার পুনরুক্তি—বরিতে শাসন
অসহায়া অবলারে? যে-পতন আশাখা তার

অন্তরে হরবহুটকারের কেন আস্ফালন ?
পৌরুষগর্বে জ্ঞানী করেন-যে অবজ্ঞা ভক্তিরে
কে না জানে ? "ভক্তি অন্তঃপুরিকার খেলাঘর" বোধি'
জ্ঞানের দুর্গমশৃঙ্গে জ্ঞানী যে বীর্যের অভিমানে
চেয়েছেন চিরদিন সমাধিস্থ হ'তে—এ-সংবাদ
হয় নাই উৎকীর্ণ কি নানা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে ?

(মুখে সলিত ব্যঙ্গের সুর ফুটে ওঠে)

প্রবীর মহাজনের স্থূল কীর্তি রহিবে অক্ষয়
কিম্বদন্তী কাহিনীতে। বিপুল উৎসাহে নরনারী
যুগে যুগে জয়ধ্বনি করিবে তাঁদের—জানি আমি।
তবু আমি পুছি তাঁহাদের সবিনয়ে—তাঁহারা কি
পেয়েছেন সে-ভক্তির স্বাদ—যার পরে এ বিশ্বের
মিষ্টতম স্বাদও রসনায় তমসম মনে হয় ?
ভক্তের আহ্বানে যবে ভক্তাধীন তাঁহার বাঞ্ছিত
রূপ ধরি' সম্ভাষণ করেন তাঁহারে প্রিয় বলি'—
করেছেন প্রত্যক্ষ কি তাঁহারা সে-স্বপ্নেরও অতীত
অখিলরসামৃতমূর্তি—যার পরে এ-ধরায়
আর সব কান্তি মনে হয়—যেন চন্দ্রমার পাশে
জোনাকীর স্ফুলিঙ্গের সম ? আরো এক প্রশ্ন আছে ঃ
করিলে ঘোষণা তুমি প্রভু—মনোমোহিনী মায়ার
প্রবল কবল হ'তে শুধু আত্মশক্তি পারে ত্রাণ
করিতে মোহমুগ্ধেরে। কিন্তু আমি শুধাই তোমারে ঃ
মোহিনী অবগুণ্ঠিতা যবে মায়ারঙ্গে দূর থেকে
পুরুষেরে দেয় হাতছানি—জানে কি সে-মূঢ় মুগ্ধ—
অবগুণ্ঠনের তলে স্বৈরিণীর স্বরূপে কেবল
আছে দাহ নাই আলো—আছে মুহূর্তের সুখ, পরে
অন্তহীন অবসাদ ? জানে না সে, তাই বারবার
সোনার হরিণ দেখি' ছোটে তার পিছু আত্মহারা।
দেখি নাই আমরা কি—বহুবর্ষ সাধনার পরে
অপ্সরা তিলোত্তমার কণিকাপ্রসাদ তরে যেন
মহাতপস্বীও তার পায়ে দেয় তপস্যার ফল ?

অজিত (ঈষৎ বাঙ্গে)

কী বলিছ ?

মীরা

ভক্তি নারী, মায়া নারী, তাই ভক্তি পারে
মায়ারে স্বরূপে তার চিনাতে মুগ্ধেরে আবেশের
প্রেমমন্ত্রে দীক্ষা দিতে, দিতে চিরমুক্তি তার হ'তে।
সরল পুরুষ—হায়, কী জানিবে মোহিনী মায়ার—
ছলাকলা ? নারীই কেবল জানে নারীর স্বরূপ—
জানে বলি' হাবভাব-প্রসাধন-কলাকার তার।

[অজিত ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে মাথা নিচু করতেই মন্দিরে চাপাহাসির কলস্রোত ব'য়ে যায়। সে চমকে মাথা তুলে রুখেছে]

অজিত

হীন নিরক্ষর পরাশ্রয়ী লজ্জাহীন ! কে তোদের
চাটুকারবৃত্তি হ'তে মুক্তি দিতে পারে ? চিরদিন
তোরাই রাখিলি জীবে দাস করি'—যার পিছুটান
প্রতি ঊর্ধ্বগামীর হয় জিনিতে সাধনে। পরাশ্রিত
স্বভাবে যাহারা তারা কী বুঝিবে স্বাধীন চিন্তার
মহিমা জীবনে ?

(মীরাকে তীব্রকণ্ঠে)

তুমি রসনার সঞ্চালনে পটু।

(রাগের মাথায় খেই হারিয়ে)

প্রগল্‌ভ রসনা কভু ঝংকারিতে পারে না ওঙ্কার।
পারে শুধু—পূজ্যপূজাব্যতিক্রম করি' দম্ভভরে
ঝাঁপ দিতে অন্ধকূপে। তাই তুমি পাও না দেখিতে—
জ্ঞানী নয় অন্তর্মুখী ইন্দ্রিয়বিলাসী। শুধু তারি
আত্মার প্রদীপ্তি নাশে যুগে যুগে অজ্ঞান-তমসা।
জ্ঞানীই দুর্বলে দেয় বলদীক্ষা, অন্ধেরে নয়ন,
শিখায় স্বাবলম্বন। ভিক্ষাবৃত্তি আবেদন নয়
স্বভাব স্বধর্ম তার। এ-হীন জীবিকা পারো শুধু
তোমরা বরিতে ভক্তি-অভিনয়ে—সলস উল্লাসে।
আমরাই—জ্ঞানীরাই—শিক্ষাদাতা অসহায়দের,
দীক্ষাদাতা প্রভঞ্জনে তুফানতারিণী-তারাব্রতে।

মীরা (অজিতের বাগাড়ম্বরে সহাস্যে)

তারাব্রত নয় প্রভু—দম্ভব্রত করেছ বরণ
জ্ঞানের দুরভিমানে। তাই এত উপমার ঘটা
নিজেরে উপাধি দিতে। দেখায়েছ নানা উপাখ্যান
রাণার আহ্বানে মহাতর্কের তাণ্ডবে এমনিই
সুদীর্ঘ বিশেষণের উপমেয়ে আনিত বিদ্যুৎ
বাগ্মিতার সিংহনাদে। বারবার দেখেছি সেথায়—
মনে যে দুর্বল যত—গর্জনে সে প্রবল তত্তই।

কিন্তু প্রভু, প্রাণের গভীর তৃষ্ণা মিটে না কথায়।
রাণীর মহল ছেড়ে তাই আমি তরুণ চরণে
এসেছি শ্রীবৃন্দাবনে। পদব্রজে দেখেছি কত যে—
কিন্তু—কী বলিব? হায়, শুনিতে যে চায় না কিছুই,
শুধু চায় দিতে উপদেশ অহংকারে—

অজিত (ঈষৎ অপ্রতিভ স্বরে)

বলো তুমি,
কী বলিতে চাও। শুনি—ছিলে তুমি মেবারের রাণী।
এ কি সত্য কথা—কিম্বা লোকমুখে উচ্ছ্বাসী রটনা?

মীরা (হেসে)

না প্রভু, সত্যই আমি ছিলাম রাণার অভিষিক্তা
সঙ্গিনী মেবারে। শুধু গোপালের টানে ঘর ছেড়ে
বাহির হয়েছিলাম বরি' ভিক্ষাবৃত্তি—যারে তুমি
করো এত ঘৃণা। শুধু আমি জানি এককথা: দাতা
শুধু একজন, সে গোপাল। চায় যে তাঁর শরণ—
ভার তার নেন তিনি। ভিক্ষা যারা দেয় তাহাদেরো
তিনিই জোগান ধন ভিখারিণীদের ভিক্ষা দিতে।
একথা যেদিন আমি করিলাম প্রাণে অনুভব—
বরিলাম অভিসারে। একদা গঙ্গার তট বেয়ে
চলিতাম গান গেয়ে ভিক্ষায়ে নিবৃত্ত করি' ক্ষুধা,
দেখি' দিনে দিনে কত অঘটন!—পতিতোদ্ধারিণী
মৃত্যুজয়ে নানাক্ষেত্র করিয়া উর্বর শস্যরঙা
আনন্দের জ্বালিত দীপালি—কভু ফুটায়ে অঢেল
ফুল বনে উপবনে, কভু নানা ফলের সম্ভারে
করি' কৃতকৃত্য কত অবিরাম নিকুঞ্জ, উদ্যান,
কভু তীর্থ রচি' দুধারে—যেথা আসিত প্রত্যহ
নানাদেশ হ'তে নানা তীর্থযাত্রী—নরনারী শিশু—
গাহিয়া জগন্নাথের মধু নাম লভিতে মন্দিরে
প্রাণের ভাঙাহাটের দুঃখশোক-ক্ষতির পূরণ।
গঙ্গাও আমার সাথে চলিত বহিয়া গান গেয়ে—

(বলিয়াই বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ভাবাবেশে গান)

সিন্ধুবাঁশি যখন আমায় ডাকে,
উধাও আমি হই ভরম ভুলে।
কার সে-অভিসার জানি না—শুধু
জানি—বাঁশির ডাকে উঠি দুলে।

কোন্ মোহানায় মিলব—জানি না তো,
শুনি শুধু তার: "আয় আয় আয়!"
দেখে নি চোখ যারে—তলে তারি
ছায়া আমার দুরাশায় আয়নায়।

তাই তো আমার গানের তালে তালে
ধানের 'পরে ঢেউ খেলে যায় কত।
ফুল হাসে, গায় পাতারা মর্মরি':
"ঊর্মিলা! হোক সফল তোমার ব্রত।

"দৃষ্টিপারে অধরা নীলমণি
তোমার ডাকেই শুধু আসেন নেমে।
তাঁর বরণে চলো অচিন পথে,
রাধাহিয়ার সফল করি' প্রেমে।"

(অজিতের দিকে চেয়ে গাঢ়কণ্ঠে)

এ-গানে তোমার প্রাণে কোনো তারই ওঠে না কি বেজে?
চিনি না জানি না যারে—দেখি নি নয়নে যারে কভু
কেন তারে ভালোবাসি? না ভালোবাসিলে তারে কেন
রহি বদ্ধ জলাশয়? কেন ধাই অদেখা সিন্ধুর
অভিসারে আত্মহারা প্রতি প্রেম-তরঙ্গ উচ্ছ্বাস
সঁপি' তার কোলে ধন্য হ'তে যুগে যুগে? আপনার
নামরূপও লুপ্ত করি' তাহার অকূল-মুক্তি-বুকে
কামনা বাসনা কেন চায় দীক্ষা নিষ্কাম প্রীতির
ইন্দ্রিয়বিলাস ত্যজি'? কোন্ জ্ঞানদীপালোকে হয়
প্রদীপ্ত এ-রহস্য-আঁধার? করো নিত্য জয়গান
বুদ্ধির পণ্ডিত! পুছি—কোন্ বুদ্ধিমতী যুক্তি গায়:
"ভালোবেসো—আপনার সুখ তরে নয়, ভালবেসো
সব দিতে সর্বেশ্বরে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণে
জপি' এক মন্ত্র: কৃষ্ণ তরে যারা হয় সর্বহারা
সবই ফিরে পায় তারা—পার্থিব মলিন জলও যথা
আকাশেরে বাষ্প-অর্ঘ্য নিবেদিয়া লভি' মেঘবর
ফিরে পায় শুভ্র জল অঝোরে—প্রসাদে যার হয়
উর্বর ধরার মাটি। আপনার তরে যারা করে
সঞ্চয় অনিত্য ধন—নিত্যধন হারায়ে তাহারা
হয় নিঃস্ব, অকৃতার্থ। পরিণামচিন্তা পরিণামে
অশান্তিই আনে শুধু। অমৃতের পারাবারে যেন
ঝাঁপ দে যে মরে না তো ডুবি'—শুধু তটের বন্ধন
কাটিয়া প্রেমের মুক্তি লভে অহৈতুকী ভক্তিবরে।

(মন্দিরের নর-নারীদের মধ্যে সাগ্রহ অনুমোদনের

ছিল্লোল ব'য়ে যায়। অজিত তাহাদের প্রতি ঘোর
অবজ্ঞার দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে মীরার দিকে ফেরে)

অজিত

হলত আরামপ্রদ উপমায় আছে সার্থকতা।
গদ্যময় জীবনের চাপ হ'তে ক্ষণিকেরও তরে
মুক্তি দেয় কবি। তবু কথার উৎপ্রেক্ষা অলংকার
কবিতায়ই শোভা পায়। ভাববিলাসের ফেনোচ্ছ্বাস
মন্দ নয়। এ-সংসারে কোনো রসই নয় অবান্তর।

(আরো গভীর)

কেবল, রাখিও মনে—তত্ত্বজিজ্ঞাসার সাধনার
দিব্যলোকে চাই প্রজ্ঞালব্ধ ধ্যানপ্রাপ্ত ধর্মগ্রন্থের
নির্দেশ অপৌরুষেয়।

(তিক্ত মৃদুহাস্যে)

"হিয়াখানা হয় চিরদিন
সিন্ধুমুরলীর ডাকে উধাও সিন্ধুর নীলকোলে
প্রেমগানে আপনারে হারায়ে লভিতে আপনারে…
সমুদ্র নদীকে চায় বলি' নদী কলোচ্ছ্বাসে সেই
আহ্বানের প্রতিধ্বনি করি' ছোটে অবেগে বন্ধুর
মাঝে ডুব দিতে তার হারায়ে 'ঊর্মিলা'-নামরূপ"—
এ-সকলি কথা কথা কথা—তবু কবি-কল্পনার
রঞ্জিত-মায়ায় বেঁধে কনে হ'য়ে ছায়া-অনবহ
পলকের সুখ দান করি' চির-অতৃপ্তির রেশ
রাখি' দূরে হ'তে চিরতরে। লক্ষ্যহারা হ'য়ে তবু
মায়াগান-দিশাপথে ধায় যে নদীর মত হায়
অকূলে নীলমণির মুরলীর ডাক অহরহি'
হয় না বন্ধমুক্তি তার। মুক্তি জ্ঞানের সন্তান।

(পুনরায় বাগাড়ম্বর সহ)

"তবু" এই একাক্ষরে স্বস্তি দিতি নয়। এই মহা-
বেদবাক্যে চিরদিন রবারে আলোর অঙ্গীকার
তবু সেই দেয় দিশা একমেবাদ্বিতীয় ভূমার।
নিষ্ফল—ভাববিলাসী নামগান-কীর্তন-ভজন।
দুষ্ট অহংকার সংশয়ের গ্রন্থি হয় না মোচন
অন্ধজ্ঞানী ভজনাদে, মিথ্যা বিনয়ের অভিমানে।
ভগবান্ চেতনার ধীরে ধীরে করেন বিকাশ
ব্যর্থতার নাট্যমঞ্চে অভিন গর্ভাকে অভিভূত
মুক্তির মহামহিমা ছুঁদিতে উদ্ভাসি'। ত্যাগ নয়,
চাই—উপলব্ধি অনুভব। নয় মুখরতা, চাই—
সুষমার সাম্যগান। বর্ণিলরূপরসময়ী
বিচিত্রমধুরা ধরণীর কোলে আসি কি আমরা
মানবজন্মের প্রায়শ্চিত্ত সাধিবার তরে—কিংবা
শিখিতে এ-বন্ধনা, হ'য়ে তিক্ত বিরক্ত বৈরাগী
আকাশের গোপালের জয়ধ্বনি গাহিতে তাঁহার—
হোন্ তিনি শ্রীক্ষেত্রের দারুভূত প্রভু জগন্নাথ,
কিংবা পুরাণের কৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধারী হন,
অথবা শ্রীবৈকুণ্ঠের চতুর্ভুজ শান্তি-নারায়ণ।

মীরা (মৃদু হেসে)

ছায়া সাথে রণঘোষ কেন রুষ্ট প্রভু? কবে আমি
বলেছি—এ-অনিন্দিতা অশ্রুহাসি আলোছায়াময়ী
ধরারে বৈরাগী হ'য়ে না দিলে বিদায়—লোকপাল
করেন বঞ্চিত জীবে এত কৃপাস্পর্শ হ'তে তাঁর?
চতুর্ভুজ অষ্টভুজ কিংবা শতভুজ দেবতারও
আকাশ-কুসুম-ধর্ম-অভিসার করিয়া বরণ
ছাড়ি নাই আমি প্রিয় পরিজনপুঞ্জ সুখনীড়।
কেবল একটি মন্ত্র জপি—আমি শরণাগতির
সে-চির-অচিন-চেনা বন্ধুর—যে দূরে হতে ডাকে
মুরলীর স্বরে, পরে কাছে এসে অমনি মিলায়
বাজিয়ে বিজলী সম।—বিরহের বেদনারও মাঝে
সুধাস্বাদ যায়—যবে যায় জীবন-মরণ
হয় একাকার, দুঃখ-সুখ হয় ছায়াবাজি। জানি
তাঁরে প্রেমময় বলি' করি প্রেম নিবেদন তাঁরে—
শাস্ত্রের নির্দেশে নয়—প্রাণের দুর্বার প্রেরণায়
আপন ইচ্ছারে চাই করিতে ইচ্ছায় তাঁর লীন।

(অশ্রু আভাসে গাঢ়কণ্ঠে)

ভালো যে বেসেছে একবার গোপালেরে সে কেবল
চায় তাঁরে সব দিতে প্রশ্নহীন আত্মনিবেদনে
লাভ ক্ষতি হারজিৎ পরিণাম-চিন্তা পরিহরি'।
যা কিছু আমার বলি—নিবেদিয়া অর্ঘ তাঁর পায়
ধন্য হয় অকিঞ্চন। প্রেমে তার সর্বস্ব গণিয়া
ভাবে না সে একবারও কত দিয়ে কত পাবে ফিরে।
বাহিরের রাজ্যে নয়—অন্তরে সে পায় এক নব
আভাস নবরাজ্যের: অনিন্দ্য অমরাবতী রচি'
সেথায় পরমানন্দে তারি ধর্ম-প্রসাদ প্রভায়

বাহিরের দৃষ্টি শুদ্ধ হয় পূণ্য স্বতঃ চক্ষে তার।
এ নহে কবিকল্পনা ওগো অকরুণ বিচারক!
প্রেমের প্রত্যক্ষ শক্তি নয় মন-ইন্দ্রধনু-মায়া।
আমি শুধু বলি—তাঁর অভিসারে যবে ঘর ছাড়ি,
শূন্য করি মনপ্রাণ—পূর্ণ তারে করিতে সুধায়।
তাঁর প্রেমাহ্বানে যেই এক পাও হই অগ্রসর,
সেই অনুপাতে আমি ঠেলি' দূরে পিছনে রঙিন
কামনা-মহল—যেথা "আমি" রচে সিংহাসন বসি'
"তিনি" ফিরে যান হায়, অভিমান স্বর্ণলঙ্কা হ'তে।

(অশ্রুর স্বর দাবিয়ে রেখে শান্ত কণ্ঠে)

আপনার ভোগ প্রভু জেনেছি দুর্ভোগ। স্বার্থপুরে
নাই পরমার্থ। তাই যে-বিশ্বেরে তাঁরে না জানিয়া
সাগ্রহে বরণ করি প্রবৃত্তির ডাকে—পদে পদে
আশা-ভঙ্গে সে-অনিত্য বিশ্বে বাসনার বেসাতিতে
হই সর্বস্বান্ত অচিরেই। তাই গোপালেরে করি'
প্রতিষ্ঠা প্রাণের বেদিপীঠে চাই বিশ্বেরে করিতে
পূর্ণভোগ - গাহি' তাঁর কৃপায়, প্রেমের জয়ধ্বনি।

(চকিতে চোখের জল মুছে)

কহিলে তুমি হে বীর: "রূপরসবর্ণগন্ধময়ী
এ-সুন্দরী ধরণীতে আসি নাই আমরা মানুষ
মানবজন্মের প্রায়শ্চিত্ত সাধিবার তরে। শুধু,
তথাই তোমারে সুধী, রূপরসবর্ণগন্ধবাসে
কে সে পারে ভেসে যেতে প্রশ্নহীন আনন্দের ঢেউয়ে?
ইন্দ্রিয়বিলাসী ভোগ? সীমাবান ইন্দ্রধনুসম
যেন সে যে-প্রতিশ্রুতি আজ কাল ভঙ্গ করে তার!
আজ যে উৎসবাঙ্গনে উল্লাসদীপালি জ্বালি—কাল
দেখ সেথা হানা রোগ-শোক-তাপ-দৈন্য-মৃত্যুচর,
অনিবার্য নীরসতা—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অন্তে আসে
গ্লানি, অবসাদ, গাঢ়বিতৃষ্ণা—নহে কি? সত্য বলো।
যৌবনের রূপরাগ-অন্তে পায় রস কে সে-ভোগে
যৌবনে লভিত যাহা? শুধু দেখ বিচিত্র ভোগের
অভিশাপ: ইন্দ্রিয়ের ভোগশক্তি যবে অস্ত যায়
জেগে থাকে ইন্দ্রিয়লালসা—দেহে হায় কাল জরা,
হয় না বাসনা জীর্ণ! বলো দেখি—হেন পরিবেশে
ভোগের গুণকীর্তন নহে কি কবিকল্পনা—ছায়া
ইন্দ্রধনুরাগ হায় ভ্রান্তিবিলাসের মায়ালীলা?

(অতিথির চোখে চোখ রেখে)

কিন্তু ভোগছদ্মবেশে দুর্ভোগের ঘোর অভিশাপও
হয় বর—যদি প্রতি ভোগ নিবেদিয়া গোপালেরে
তাঁর করুণার স্পর্শমণি-স্পর্শে প্রতি অনুভব
রূপান্তরিত হয় তাঁর মহাপ্রসাদে। তখন
প্রতি অণিমার বুকে দেখি তাঁর মহিমা অপার;
হৃদয়ের প্রতি স্পন্দে দুলে ওঠে তাঁর নৃত্যতাল
ছন্দে যার কাটে সর্ব শোকতাপভয়ের বন্ধন।
তখনই কেবল এই বসুন্ধরা হয় কান্তিময়ী
আনন্দনন্দিনী নিত্যপ্রেমের অমরাবতী—প্রতি
প্রাণ বিন্দুকে করি' সিন্ধুর মাধুরী অন্তহীন।

(উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে)

প্রেমের অঞ্জন বিনা এ-দিব্যদৃষ্টির আশীর্বাদ
কে পেয়েছে এ জীবনে? যত যায় জপ তপ যোগ
সাধি শুধু গোপালের প্রেমে দীক্ষা লভিতে জীবনে।
সে-প্রেম অন্তরে যার জাগে সত্যাহ্বানে সে কি চায়
নিষ্ঠার ধ্যানের জপ তপের সসীম সরোবর
প্রেমের দু'কূলভাঙা অসীম আকাশগঙ্গা ছাড়ি'?
এ-প্রেম যখন জাগে—বেদনাও মনে হয় বর,
আনে সে গভীরতম চেতনার দিব্যদৃষ্টি—যেথা
নিরাশা ও দীক্ষা দুরাশায়, হয় চ্যুতি ও সোপান
ঊর্ধ্বতম অচ্যুতির, প্রশান্তির। যে পেয়েছে এই
প্রেমের অনিন্দ্য শান্তি, অকম্পিত দিশা একবার,
সে কি আর রহে শাস্ত্রী পণ্ডিতের মুখ চেয়ে প্রভু?

(সোল্লাসে গান)

সখী, আমার জীবন—মরণহরণ শ্যামল বঁধু মুরারি,
মীরা শরণ তাহার যাচে শুধু—যার মধুনাম মনোহারি।

যার চরণে নূপুর, অধরে মধুর মুরলী, চাঁচর কেশ,
যার কমল নয়ন, অমল আনন, ভুবনমোহন বেশ,
সেই ব্রজের রাখাল প্রাণের গোপাল প্রতি অন্তরচারী—
মীরা শরণ তাহার যাচে শুধু—যার মধুনাম মনোহারি।

যার মধুরা উদাস ভনি' যায় গান—অবনী আপনহারা,
যার মিলন গোকুল মথুরা অতুল, লাবণী অমৃতধারা,
যার অপার বল মরি, বিজন পীতাম্বরধারী—
মীরা শরণ তাহার যাচে শুধু—যার মধুনাম মনোহারি।

যার ধ্যান ধরে মুনি, গান করে ভক্ত, যুগে যুগে
মীরা মাতি',
জপি প্রতি শ্বাসে যার নাম বন্দনায়—অমর মরণসাথী,
শিরে শিখিচূড়া যার মীরা দাসী তার—জীবনের
কাণ্ডারী—
মীরা শরণ তাহার যাচে শুধু—যার মধুনাম বনোয়ারি।

(মন্দিরের পুরুষদের মুখে "আহা... চমৎকার... ধন্য ধন্য" উচ্ছ্বাস নারীগণের চোখে আঁচল...গান শেষ হইলে অজিত সহসা সাশ্রুনেত্রে হাত জোড় করে)

অজিত

এ কি ইন্দ্রজাল ...কে বা তুমি? আমি কোথায়? প্রাণের
কোন্ এক গূঢ় তলা ওঠে সেজে আজ—কার জাদু
অঙ্গুলি পরশে ...আমি জানি না!...কী দিব্য আলোকের
ফুল ফোটে ...আবেশের গন্ধ ছোটে!...চিত্তে ওঠে জেগে
কোন্ ভুলে-যাওয়া বাণী—বিনতির, শ্রদ্ধার, প্রেমের!
কী যেন বলিতে চাই ...সে-অধরা চকিতে লুকায়
বিদ্যুতের প্রভাসম! ...কপোলে এ-কার সুকোমল
আশিস-চুম্বনে এত স্নিগ্ধতা সর্ব অঙ্গে হায়!...
শৈশবে-হারানো জননীর স্নেহকোল পড়ে মনে!

মীরা (স্মিত হাস্যে)

নয় ইন্দ্রজাল, বৎস ...শুধু গোপালের অপরূপ
করুণা ঘটালো অঘটন: বহু-লালিত উদ্ধত
বিত্তাদৃপ্ত অভিমান লজ্জা পেয়ে আজ মাথা তার
নোয়ালো প্রার্থিয়া তাঁর প্রেমের প্রসাদ। ছিন্ন তাই
হয়েছে মুহূর্তে সংশয়ের গ্রন্থি যত।

অজিত (সবিনয়ে)

করুণার
অঘটন? কার? গোপালের? কিন্তু মা, আমার মত
বুদ্ধি পাণ্ডিত্যের অভিমানী তাঁর প্রেমের প্রসাদ
কেমনে লভিল না চাহিতে? মূঢ় অনধিকারীর
আত্মবঞ্চিত চিত্ত কেমনে পেল এ অধিকার?
কেমনে সম্ভব হ'ল অসম্ভব?

মীরা

মানুষের কাছে
[illegible]সম্ভব মনে হয়—দেবতার বরে তারই
আবির্ভাব হয়—যবে করুণার ইন্দ্রজালে খোলে
তৃতীয় নয়ন। দেখি আমরা তখন নেপথ্যের
বিদ্যুৎঝলক—যাহা চর্মচক্ষে পাই না দেখিতে।
দেবতার কৃপা যবে হাত ধরি' চালায়—আমরা
চলি শুধু এক অনির্দেশ টানে অন্ধের মতন।
দৈব কৃপা দেখে শুধু—যে পেয়েছে দিব্যদৃষ্টির।
দেখে সে তখন দিনে দিনে এক বৃন্দাবনলীলা
নিত্য নব ছন্দে সুরে প্রেমরাসমঞ্চে অন্তরের।

(সদীর্ঘশ্বাসে)

শুধু তার যদি যদি আমাদের দৃপ্ত বুদ্ধি নত হয়ে
চাহিত সে-দিব্যদৃষ্টি—ধন্য হ'ত এই দুঃখবাস।
মানস মনীষা পারে দিতে ভূলোকে ক্ষণসুখ,
জ্ঞানের আভাস, সুধাকণিকার চকিত আস্বাদ।
পরমুহূর্তেই চক্ষে দেখে সে আঁধার—পুণ্যাগারে
মনের উল্লাস লুপ্ত হয় তমসের [illegible]।
শুধু ঐকান্তিক আত্মার আবাহনে দেখা দেয়
সে-দিব্য প্রেমের প্রভা—আবির্ভাবে যার চিরতরে
লুকায় দুঃখান্ধকার।

অজিত

কেমনে সে-প্রভা ঝলকিয়া
উঠিবে মা, আমাদের মোহান্ধ মনের কারাগারে?

মীরা

শুধু চাওয়া, শুধু চাওয়া...আমরা কি চাই সে-আলোক
যার রাঙা আলোয় কাটে আঁধার নিরতিপাশ পলে?

অজিত

কাটিয়া নিয়তিপাশ কে জীবনে না চায় না সুধা?

মীরা

শুধু সুধা চাওয়া নয়—সুধা ছাড়া চাহিব না আর
কিছুই জীবনে...এই অঙ্গীকার: করিব কেবল
আরাধনা সেই প্রেমজের—যাঁর জাদুস্পর্শে হয়
বিষও সুধা, দিশাভ্রান্তও প্রেমের জ্যোতির্ময়ী দ্যুতি,
বাধা হয় আরোহণী। শুধু গোপালের আবাহনে
আশার অতীত স্বর্গ আসে নেমে হিংসার জগতে।

অজিত

শুনেছি অবতারের কত কথা পুরাণে গীতায়।
কিন্তু চর্মচক্ষে দেখি তো না, শুধু ঈর্ষা হানাহানি।

বিন্দু মহত্ত্বেরে করে প্রাণ সিন্ধুসম হিংসা দ্বেষ।
অবতীর্ণ হন তিনি আজো কি এ-বিশ্বে?

মীরা

প্রত্যুত্তরে

তাঁহার অবতরণ হয় তার মনে—যে নিরত
চায় শুধু স্পর্শ তাঁর। তাই যুগে যুগে বৎস, কাটে
অপ্রেমের নিশা প্রেমসূর্যের অরুণোদয়ে। শোনো
কাহিনী আমার তবে: নিরাশার গহ্বরে কেমনে
প্রেমের শিখরচ্যুতি অবতীর্ণ হয়েছিল তাঁর।

(বিগ্রহের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া)

মেবারের রাণী আমি শুনি তাঁর অকূলমুরলী
শ্রীবৃন্দাবনের পথে চলিলাম হবে ভিখারিণী
অসহায়া—শুধু গোপালের কৃপা করিয়া পাথেয়,
রঙিন রাজমহলে কলঙ্কিনী নাম। রহিল না
সখী বা মরমী কেহ। পথে পথে গেয়ে তাঁর নাম
দীনা রিক্তা রাজবালা গুরু সনাতনের সন্ধানে
চলিলাম পদব্রজে শুধু গোপালের ধ্যান ধরি'।

(একটু থেমে)

জয়পুরে পর্বতের কোলে লভিলাম আশ্রয়
এক গুহাগারে। উন্মুখ এক বিষাক্ত ক্ষতের
অসহ ব্যথায় মুহ্যমান হ'য়ে মুদিলাম আঁখি
পাষাণ শয্যায়। আকণ্ঠ তৃষায় মনে হ'ল বুঝি
শেষ দশা প্রত্যাসন্ন। সাধ্য নাই উঠিবার আর।
ছিল শুধু গোপালের বিগ্রহ শিয়রে। তার দুটি
কর্ণে ছিল স্বর্ণের কুণ্ডল। এক ক্রূর দস্যু করি'
আঘাত আমার শিরে সে-বিগ্রহ ছিনিয়া চকিতে
হ'ল পলাতক। আমি এতদিন শুধু সে-বিগ্রহ
করিয়া সম্বল পথে পথে ভিক্ষা করিয়া প্রত্যহ
জপিতাম এ-ভরসা: "গোপাল যাহার আছে তার
কোথা ভয়, কোথা দুঃখ, কোথা দৈন্য?"—হারায়ে আজিকে
সে-সম্বলও নিরাশায় কহিলাম কাঁদি': "অকরুণ
গোপাল! কোথায় তুমি? দিয়েছিলে কতবার সাথ,
আশ্বাস—আমারে তুমি করেছ গ্রহণ চিরতরে।
তবে এ কী পরিহাস? শেষের সম্বল এ-রিক্তার
ছিল তব মূর্তি—যারে বহুবর্ষ করেছি পূজন,
গেয়েছি কত না গান চরণে তাহার অঞ্জলে—
যে-গানের মাঝে তব বিগ্রহ সজীব হয়ে কত
প্রেমালাপ করিত আমার সাথে রজনীবিহান!
অভাগা মীরার সেই একটি সান্ত্বনা—প্রিয়তম
বিগ্রহেও তার আর নাই বুঝি অধিকার? প্রভু,
এ কেমন করুণার লীলা তব—অপূর্ব নাটক!
প্রথমাঙ্কে রাজবালা, দ্বিতীয়াঙ্কে বধূ রাজরাণী,
তৃতীয়াঙ্কে—তব মাধবাধিকা কীর্তনী গৌরবিণী,
শেষাঙ্কে চৌরধর্ষিতা সর্বহারা মুমূর্ষু বিদেশে—
নাই যেথা আত্মীয়স্বজন বন্ধু, গভীর তৃষায়
মুখে জলও দিতে নাই কেহ! শেষ অঙ্কের কি এ-ই
সার্থক সমাপ্তি রুক্মীয়া নাটিকার, ব্রজনাথ?"

(পুলক শিহরে)

সহসা অপূর্ব এক নীল জ্যোতি উঠিল রাঙিয়া
নিরাশার অন্ধকারে! কে যেন গাহিল ঝঙ্কারিয়া:

(ভাবোচ্ছ্বাসে সুর করে)

"দুঃখের দুর্যোগে যেতে হয় ভুলে এমনি কি তাঁর
প্রণয় প্রসাদ যত, দীপালির চিত্ত-চমৎকার
মহোৎসব-ঝলমল নানারঙা সুগন্ধিত মালা?
তোমার আশার আঙিনায় দিনে দিনে, রাজবালা,
কত সুর ফুল ফুটেছিল—আজ নাই কি স্মরণে?
আকাশ যখন থাকে নীলে নীল, প্রীতিকুঞ্জবনে
শোনা যায় শুধু প্রিয়জনের আনন্দকলরোল,
কোকিল পাপিয়া গায় প্রতি মধুমাসে দিয়ে দোল,
স্নেহ সখ্য মিতালির বহুরূপী মধুর সম্ভাষ,
শৈশবের মুগ্ধাবেশ, যৌবনের রাঙন উচ্ছ্বাস,
সকলি কি মিথ্যা হয়—যবে হ'তে হয় বঞ্চনার?
অতীত অতীত বলি' দাবি করো তাঁর করুণার
নূতন প্রমাণ বর্তমানে? যদি না পাও প্রমাণ
করিবে কি অস্বীকার তাঁর অন্তহীন বরদান—
জীবন তোমার যাঁর আলোর মঞ্জরি' ধীরে ধীরে
হয়েছে সার্থক ফলে ফুলে তাঁর চরণের তীরে?
'দুখে আমাদের চির-অধিকার, দুঃখের বিধান
নিষ্ঠুরতা বিধাতার'—গাহিতে কি চাও এই গান
বিদ্রোহের সুরে অকৃতজ্ঞ? সূর্য অস্ত যায় বলি'
নিরুদ্ধ অরুণের দৈনন্দিন মঞ্জুল মুরলী
হয় কি পলকে মায়া উপহাস? জীবনের আলো.

নন্দের গোপাবালা অলীক—বাস্তব শুধু কালো
অশিবের অভিশাপ ?"

(বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে গাঢ় কণ্ঠে)

তার অশরীরী আবির্ভাবে
কহিলাম আমি কাঁদি' : "না গোপাল। ব্যথার প্রলাপে
মিথ্যা ঠাঁই পায় যদি—জানো না কি অন্তরে আমার ?
দুর্বল আমার মন, তাই দুঃখশোকে বার বার
দ্বন্দ্বে পড়ে, অন্ধকার মরমে তখন ছেয়ে আসে,
কিরণের স্মৃতি হয় আবছা, বিষণ্ণ চিত্তাকাশে
ক্রূর মেঘ হানা দিয়ে নীলিমারে সত্যের তখন
করে অস্বীকার। বুঝি তাই তুমি তৃতীয় নয়ন
ফোটাতে আমা'র নাথ, সর্বহারা করিলে আমায় ?
চাহিলে পরীক্ষা বুঝি করিতে অপার করুণায়,
দেখাতে যে, বিনা কৃতজ্ঞতা, বিনা আত্মসমর্পণ
নাই মহনীয় সিদ্ধি, নাই সার্থকতা চিরন্তন ?
প্রতি রাধাহিয়া শুধু অগ্নিপরীক্ষায় অভিজাত
হয় চিরদিন। সুখ-মাধবহ রাগিনী আলাপ
ক্ষণতরে রাঙি' উচ্ছ্বাসের মেঘে অলখে মিলায়।
আত্মপরিচয় হয় শুধু আশাভঙ্গ বেদনায়।
তাই দুঃখ আসে শাপে-বর হয়ে—আঘাতে তাহার
জাগাতে সুষুপ্ত আত্মশক্তির প্রত্যয় বারবার,
প্রাণতলে ঝলকিতে প্রতিজ্ঞার নিভৃত অনল
অনন্তার দৈন্যনাশে দিতে সংগ্রামের দীপ্ত বল।
অন্তরে-প্রচ্ছন্ন দেবদ্রোহিতার সাথে করো তুমি
মুখোমুখি আমাদের—চিনাতে পাপের জন্মভূমি।
দুলাও প্রলোভনের দুরন্ত তরঙ্গে—শক্তি দিতে
দুকূল বিবর্জি' প্রেমে নিষ্কামনা-কূলে উত্তরিতে।
ক্ষমা করো অবোধেরে। আমরা যে জেনেও চাহি না,
তবেও ভজি না হায়—এ-সত্য যে জেনেও মানি না
দেখেও দেখি না, তাই শুভ করো অপার কৃপায়
ভরিতে প্রাণের পাত্র পূর্ণোজ্জ্বল তোমার সুধায়।
বেদনা দাহনে শুদ্ধ করি' টেনে নাও তুমি কাছে,
স'য়ে যাও—অন্তরঙ্গরূপে বিরাজিতে হৃদিমাঝে।
তাই এই দিও বর—দুঃখ ব্যথা যা-ই তুমি দাও
তোমার আশিস বলি' বরি যেন মাথায়। শিখাও
শরণাগতির রীতি—প্রতি মর্মে মর্মে মানবার
জাগে যেন এক চিন্তা—কেমনে তোমার রাঙা পায়
লভিব আশ্রয়। প্রতি আঘাতেরে বিধান তোমার
বলি' চিনিবার দৃষ্টি দাও, শক্তি দাও সহিবার।
যেমনি রাখিবে তুমি, তেমনি রহিতে পারি যেন,
ব্যথা পেলে যেন প্রশ্ন না করি—বেদনা দিলে কেন ?"

(মেদুর গাঢ় কণ্ঠে)

যেমনি হৃদয় হ'তে উৎসারিল প্রেমের প্রার্থনা,
পলকে পরশে কার লুপ্ত হ'ল দেহের যন্ত্রণা,
মনের অশান্তি ক্ষোভ। সব তাপ গ'লে হ'ল আলো।
দেহ মন প্রাণ ভরে বহিল আনন্দে। নিশা-কালো
রূপান্তরিত হ'ল আনন্দ-উষায়, যত কিছু
সংশয় উৎকণ্ঠা সব কেটে গেল মুহূর্তে। প্রণতি
করিয়া গোপালে তার অদৃশ্য পরশে যেন দিয়া
এক নব তত্ত্বদৃষ্টিপুলকে উঠিল ঝঙ্কারিয়া !
আমার বলি যে-মনে—রহিল না স্মরণে সে আর
প্রতি দিবা স'লে জেগে উঠিল প্রেমের অঙ্গীকার :
দুলিল অশ্রুল কণ্ঠে যেন এক স্পন্দিত সুস্বর
সুরজাগানিয়া গান—মনে হ'ল যেন কণ্ঠবীণা
আমার উঠিল বাজ' গোপালের অদৃশ্য পরশে !

(বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে সাশ্রুনেত্রে গান)

মন যে আমার বৈরী হ'ল, বশে তো হায় থাকে না সে !
কথায় কথায় আলোছায়ায় হয় আলো নই, উতলা সে !
যতই বলি : "অতীত-স্মৃতি মিথ্যে কেন ভুলিস ভোলা,
বৃন্দাবনে সে-দিনগুলি—চাঁদনিরাতে রাসের দোলা ?
গেছে যা সব গেছে, ভুলি—সে-সব শুধু স্বপ্নবিলাস :
গোকুলে সেই কৃষ্ণলীলা—কল্পকথার রঙিন উচ্ছ্বাস"—
"এই জগতই ক্ষণবসন"—ব'লে পাগল এ-মন হাসে।
মন যে আমার বৈরী হ'ল, বশে তো হায় থাকে না সে।
নয়নও যে বৈরী হ'ল, রয় চেয়ে তার আশায় আশায় !
কথায় কথায় পথ চেয়ে তার অকারণেই অশ্রু ঝরায়।
যতই বলি : "কারা গিয়ে, যায় যা আসে না আর ফিরে,
শিখিচূড়া বনমালী বরবে না রূপ যমুনাতীরে।
যা গেছে তা গেছে, পুরাকাহিনী সব মিথ্যে মায়া।
জগৎ বলে কৃষ্ণরাধার প্রেম—কবিতা, শুধু ছায়া।"
নয়ন বলে : "দেখেছি—সব রূপ হারে যার রূপের পাশে।"
নয়নও যে বৈরী হ'ল, বশে তো আর থাকে না সে।

কানও আমার বৈরী হ'ল—বাজল কোথায় কবে নূপুর!
কথায় কথায় যাই শোনে, গায়: "ঐ যে চরণধ্বনি বঁধুর!"
যতই বলি: "ভুল শুনেছিস, কোথায় কানুর নূপুরধ্বনি?
কোথায় রাইয়ের বাজল কাঁকন—কার বা পায়ের
উঠল রণি'?
নেই সেদিন আর—বাজাত সে বাঁশি যেদিন
ভালোবেসে,
ডাক শুনে যার লোক লাজ ভয় ভুল যায় সব
যেত ভেসে!"
গায় মীরা: "না, বাঁশিই হ'য়ে বৈরী ক্ষণে ক্ষণে আসে
গায় সে প্রাণে: আয় আয় তার ঠাঁই চেয়ে পায়
প্রেম-উছাসে।"

অজিত (করজোড়ে)

তারপর, দেবী?

মীরা (চমকে)

তারপর? হ'ল একাকার সব:
অতীত ও অনাগত, দুঃখ সুখ, আমি ও আমার,
জল স্থল অন্তরীক্ষ আকাশ ঝংকৃত এক নামে:
সে-ঝংকার রেশে হ'ল অবলীন সব নামরূপ।
কেমনে বর্ণিব বলো সে-অবর্ণনীয় অনুভব,
পুলক অমলনীর—অনিন্দ্য অচিন্ত্য সে-পূর্ণতা?
যেথা চাই দেখি সেই অদ্বিতীয় অখণ্ড বসন্তে!
আকাশ যেমন রাজে প্রতি অণুবুকে—মুক্তামণি
স্বতন্ত্র রহিয়া যথা একসূত্রে গাঁথা হ'য়ে করে
সৌন্দর্যের জয়ধ্বনি মালিকার সুষমাগৌরবে...
কী বলিব কেমন সে অবর্ণ্য অবতরণ—যার
স্পর্শে হয় সব দ্বন্দ্ব বিভাব খণ্ডতা ভেদজ্ঞান
অবলুপ্ত, একাকার, তবু থাকে বৈশিষ্ট্য প্রতিটি
অণুর, দলের, কণিকার। তত্ত্ব তথা ভগবান্
ধ্যাতা ধ্যেয় ধ্যান মিশে হয় এক অনির্বচনীয়
অপার্থিব নির্বিশেষ চেতনায় নির্মলিন প্রভা
অথচ সে-ঐক্যবুকে প্রতি রূপায়ণের মহিমা
থাকে অনাহত ধ্বনি ওঁকারের মন্দ্রে অকল্লোল।
পরক্ষণে হয় এক নব পর্যায়ের অভ্যুদয়:

(সানন্দে করতালি)

প্রতি বালুকণা হ'তে উৎসারিত হয় গোপালের
প্রেমের কীর্তন যেন শব্দহীন নির্ঝরকল্লোলে!
প্রতি ফুলে মধুচ্ছলে স্মিত হাসি চির প্রসন্নের!
প্রতি তৃণে ওঠে রাঙি' রূপরাগ চির শ্যামলের!
প্রতি শাখে ওঠে দুলে সুখনৃত্য সে-চিরনটের!
দেহের বেদনা—সেও গ'লে হয় আনন্দচেতনা!
সন্ধ্যার ঘনান্ধকারও আলিঙ্গন করি যেন বলে:
'আঁধারেও তোমারে যে বুকে ক'রে রাখি প্রাণেশ্বরী!
কেমনে বিচ্ছেদ হবে তোমার আমার মাঝে আর?
আজ হ'তে—অঙ্গীকার করি—তুমি আঁধারে অন্তরে
চলাচলে অণুক্ষণ পাবে প্রেম-পরশ আমার।"

(গাঢ়কণ্ঠে).

শিহরিয়া উচ্ছ্বসিয়া পুছিলাম: "গোপাল! গোপাল!
এ কি সত্য? অথবা এ তোমার নিঠুর ছলনার
অভিনব পরিহাস নবীন লীলায়? অসম্ভব
হয় কি সম্ভব? এই ভক্তিহীন ধূসর ধরায়
হয় কি অবতরণ চির-রঙ্গিলের? বলো বলো
আর একবার: তুমি সত্য আর যাবে না আমারে
ছাড়িয়া কখনো? রবে সাথী চিরদিন মিলনেশ?

(সাশ্রুনেত্রে)

সহসা ছায়ান্ধকারে ফুটিল সুনীল স্নিগ্ধ জ্যোতি,
সে আলোক ঘন হয়ে ধরিল শ্যামগোপালের
কান্ত মূর্তি। কহিল সে হাসি: "ছি ছি! ব্রজবালা হ'য়ে
করো অবিশ্বাস ব্রজরাজের মধুরী-অঙ্গীকার?
বাঞ্ছিত পরিণয়ের পরেও সংশয়ে দাও ঠাঁই?
বসন্তের আলিঙ্গনে বসুধা, বিসর্জন দ'ত'
তবু ভয় বিচ্ছেদের? প্রেমের তৃতীয় নেত্রে যার
দেখিলে যাহারে ওতপ্রোত চলাচলে—সে-জনের
রূপমাঝে অরূপের দর্শনের পরেও কি পারে
থাকিতে জাগিয়া শঙ্কা—নিঠুর বিরহ-বিচ্ছেদের?
বাগ্দানের পরেও কি গোপীহিয়া চায় অঙ্গীকার
সত্যভাষণের? এল যে অতিথি হ'য়ে জগতের
প্রতি স্পন্দে, মানসের প্রতি ভাবনায়, ধমনীর
প্রতি রক্তপ্রবাহে, প্রাণের বঁধুবরণ-আবেগে,
তার চির স্থিতিরও কি চাও শরণার্থিনী প্রমাণ?"

(চোখ বুজে)

কী বলিব বৎস, সেই অপরূপ আলাপের কথা ? —
জগন্নাথের ডাকা "প্রাণেশ্বরী" বলি' সেবিকারে,
সে-অপূর্ব সম্বোধনে দাসীর প্রাণের পেয়ে ওঠা
শুধু দাসী-অভিমানে ! অমনি রচিয়া মুখে মুখে
মধুগান গোপালের চারিধারে নেচে নেচে গাওয়া—

(গান)

তোমার আমার প্রেমের কথা বলব কাকে হায় ?
এ-অপরূপ কাহিনী কি বুঝিয়ে বলা যায় ?
অমল তুমি, মলিন আমি হরি !
ঠাকুর তুমি, অধীন আমি হরি !
দাতা তুমি, আমি ভিখারিণী,
ধাতা তুমি, আমি পূজারিণী,
তবু তুমিই বন্ধু আমার—বলব কোন্ ভাষায় !
আমি দীনা, তুমি মহান্ প্রভু !
আমার প্রাণের প্রাণ তুমি নাথ, তবু।
তুমি মহাপবন, পাতা আমি,
যেথায় লবে যাব উড়ে স্বামী !
ছিন্ন পাতার কী ঠিকানা—কারে আপন চায় ?
যুগ যুগান্তরের সাথী বঁধু !
রাঙে মীরা তোমার রঙেই শুধু,
দরদী যে সম বোঝে কি ব্যথা ?
প্রেমীই কেবল জানে প্রেমের কথা,
হার মেনে প্রেম জেতে কেন—সে-ই জানে ধরায়।

(ভাবস্থ, আপন মনে)

কী বলিব গোপাল ? তোমার কথা উৎকীর্ণ তো নয়
অক্ষরে জানিতে শব্দে। প্রেমঘন হে অবর্ণনীয় !
সুর তাল ছন্দ বাণী দীক্ষা তব সবই অপরূপ
আনন্দে সংহৃত ক'রে ধরা দেয় ইন্দ্রিয়ের লোকে
আপনারি অন্তহীন বৈচিত্র্যের পেতে সুধা-স্বাদ।
ভক্তের প্রেমমুকুরে দেখ তুমি আপনারি রূপ
করো তাকে আরাধনা তারি আরাধনার স্ফূর্তিতে।
এ-প্রেমের লীলা—সসীমের গাঁথা বরণমালিকা
অসীম বরণানন্দে—ফিরে-পাওয়া সে-আনন্দ পরে
অসীমের নিত্যানন্দে ভক্তাধীনতায়—কে পেয়েছে
তল এ-অবর্ণনীয় রহস্যের, হে অচিন্ত্য নাথ ?

অজিত (সাশ্রুনেত্রে প্রণাম করে)

দাও বর মা, যেন সে অসীমের সুধার কণিকা
আস্বাদে কৃতার্থ হই এ জীবনে। গর্বে অভিমানে
নাই ভুলিলেশ—যাহে শুধু ভ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদ,
তবু এ অভিমানীরও কাছে তাঁর অহেতুকী কৃপা
দেয় ধরা কভু কভু বিদ্যুৎছটায় কেন—বলো
কে বলিবে ? কৃপার কি পায় তল বুদ্ধির দর্শন ?

মীরা (স্মিত হেসে সনাতনকে)

জানে যে বলিতে পারে শুধু সে-ই। এবার তোমার
তার গুরুদেব, বলো।

অজিত (ঈষৎ বিস্ময়ে)

গুরুদেব জানেন কি আমি—

সনাতন (হেসে)

যাহা কিছু জানি বৎস তিনিই দেখায়ে দেন বলি'
আমি না-জানার মাঝে। তাই জানি—গোপালের কৃপা
বিস্তার করি' নাই দিল আজ প্রেরণা মীরাকে
নাশিবে দুরভিমান তব তার কল্যাণী আভায়।
তাই স্পর্শে তার তব দিব্যদৃষ্টি শ্রুতি হ'ল জাত—
যা দেখিলে যা শুনিলে ফলে তার মিথ্যা পাণ্ডিত্যের
খসিয়া পড়িল গর্ব—হৃদয়ের চাহিলে শরণ।

(গাহিলেন—সংস্কৃত স্তব)

কেশব মহাদ্ভুত হৃদয় শরণ্য ! তব বাচে সুধাম্।
পাবন বরেণ্য গুরুদেব ভুবনেশ ! কুরু পবিত্রাং সুধাম্ ॥
চরণানতোঽস্মি
শরণাগতোঽস্মি
ভুবনবন্দিতোঽসি চিরনন্দিত মহেশ !
প্রেমময় হে বিভব কুরু বরদেশ !

অজিত (সনাতনকে প্রণাম করে)

সত্য গুরুদেব ! চরণানত শরণাগত শুধু
হয় তাঁর কৃপাবন্ত। অভাজন দীন ভাগ্যহীনও
পায় তাঁর কৃপার প্রসাদ শুনি আপ্তবাক্যে প্রভু :
"তব লোচ্যমপি গুণবেকলং জন:কোটিসুকৃতৈর্ণ লভ্যতে"
যে মণির মণি কেহ পায় নি কখনো প্রতিভার
আলোয়, তপস্যাবলে, জ্ঞানে-গরিমায়—মূল্য তার—
শুধু ঐকান্তিক চাওয়া। সে-মহান্ শরণ্য হৃদয়
গড়া-যে নির্মাণে সুকোমল করুণায়। তবু হায়

আমি যে অভাজন, অযোগ্য—

সনাতন (হেসে)

ধরার বৎস, তাঁর
করুণার "যোগ্য" কেহ আছে? মনে করে যে—কৃপার
যোগ্য আপনারে—সে-ই সবচেয়ে অযোগ্য দুর্ভাগা।
কৃপা নয় যোগ্যতার পুরস্কার, অর্জিত বেতন।
কৃপা—নীলিমার নীল, কুসুমের হাসি, বনানীর
শ্যামল সুষমা, মধু-বসন্তের মলয়সৌরভ।
কৃপা নামে জননীর স্নেহের চুম্বনে, জনকের
উদার আশিসে, বন্ধু স্বজনের সৌহার্দ্যে, সতীর
পবিত্র প্রণয়ে, ভক্ত শিষ্যের সেবায়, শোণিতের
বলদাতা উদ্‌যোগে, হৃদয়ের আরাম-নিশ্বাসে,
প্রাণদাত্রী প্রকৃতির প্রতি পরিচর্যা—কৃপা তাঁর।
না-চাহিতে যাহা পাই চিনি না আমরা কৃপা বলি'
দেখেও দেখি না তাই—যোগ্যতার আস্ফালনে কেহ
করে নাই অধিকার করুণার রাজকোষ। তাই
শুনিলে শ্রবণে তুমি নাম তাঁর মুরলীমূর্ছনা
রাসরঙ্গে ভাগ্যবান্!—যে মূর্ছনা শুনিবার তরে
যোগী ঋষি তপস্বী সাধনা করে বহুবর্ষ ধরি'।

অজিত (সবিস্ময়ে)

আপনিও শুনেছেন তবে?

সনাতন (গাঢ়কণ্ঠে)

যে মুরলী যুগে যুগে
ডাকে বিশ্বজনে—তার রব পায়—যে চায় সে-ধায়।
তবু চাই শুনিতে তোমার মুখে—কে না চায় শুনি'
শ্রীবৃন্দাবনের লীলাকথা বৎস হ'তে—এ-নীরস
জীবনের ক্লান্তি নাশে?

অজিত (করজোড়ে)

গুরুদেব! যখন জননী
গাহিতেছিলেন গোপালের মধুমুরলীর গান,
অপরূপ সে-সঙ্গীতবন্যায় মুহূর্তে ভেসে গেল
আমার গর্বের শতবাঁধ মত। মুগ্ধনেত্রে আমি
রহিলাম চেয়ে অশ্রুপবিত্র নেত্রের পানে তাঁর।
সহসা তাঁহার মুখ হ'ল রূপান্তরিত—অমনি
দেহের প্রতিটি অণু তাঁর যেন মধুপের মত
জ্বলিল স্ফুলিঙ্গ-প্রভা। সেই দেবী অনলকণিকা
পুঞ্জীভূত হ'য়ে তাঁর মূর্ছার অলকে ঝলকিল
এক অপরূপ আলোঘন শিশুচরণের রূপে
নাচিল গোপাল পরে ভূমিতে। অমনি এ-হৃদয়
উঠিল শিহরি'—যবে দেবীর নৃত্যের তালে তালে
ঘেরি' তাঁর পুণ্য তনু শ্যামলের নৃত্য হ'ল সুরু।
সে-ব্রজধামের আমি দেখেছি কেবল আবছায়া
বিজলের রেখা। পাপী কেমনে দেখিবে পূর্ণকায়া
অপাপবিদ্ধের? তবু সে অনিন্দ্য দীপ্যমান্ দেহ
পরশমণির মত ইন্দ্রজাল-পরশে তাহার
করিল নির্মল পলে আমার এ-ক্লিন্ন সত্তা যেন:
শুনিলাম নূপুর শৃখলে! চর্মচক্ষে দেখিলাম
এক নব দৃশ্য।

(মীরাকে)

দেবী! বৎস আমি…কী বলিব বলো
কী সে-দৃশ্য দেখিলাম তোমারি কৃপায়: তুমি নহ
মেবারের রাজরাণী—শ্রীবৃন্দাবনের বালা তুমি,
চিরন্তনী ব্রজগোপী, যুগে যুগে আসো এ-ধরায়
গাহিতে কেবল ব্রজবল্লভের অগাধ মহিমা
নিত্যনব সুরে নিত্যে প্রণয়ের মৃদঙ্গমন্দ্রে।

তারপরে হ'ল এক মহান্ গর্ভাঙ্ক উন্মোচিত
গাহিতেছিলেন যবে মীরা মাতা কৃষ্ণের কীর্তন:
দেখিলাম অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলা—অলোকের
নিত্যরাসনৃত্য কৃষ্ণরাধা গোপগোপীরে ঘেরিয়া।
উঠিল ঝঙ্কারি' সেই নাটমঞ্চে মধুর মুরলী,
আবেগে হৃদয় গেল ছেয়ে!…কী বলিব? মনে হ'ল
এ-উষর প্রাণের অতলে যেন উঠিল মঞ্জরি'
আলোর কমল এক!…

(সনাতনের দিকে ফিরে)

গুরুদেব! ধন্য আমি লভি'
জননীর কৃপাস্পর্শ, চরণের পুণ্যধূলি তব।

(সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পরে উঠে মীরাকে সাশ্রুনেত্রে)

ক্ষমা করো মা, স্বভাবে যে দুরভিমানী কেমনে সে
হবে জ্ঞানী ব্যাখ্যানে? সে হয় আরো মূর্খ বহুপাঠে।
তাই তো সে দেখেও দেখে না হায়—বুদ্ধি-মনীষায়

হয় কি কখনো জনলাভ রণে বোধিপ্রজ্ঞা সাথে ?
বুঝেও বোঝে না—তাই পুঁথিপাঠ বর্জিত বিভার
মুক্তি মানবের।

(সনাতনকে)

তবু···একটি সংশয় মনে তবু
জাগে গুরুদেব, যদি অনুমতি হয়—

সনাতন

সসংকোচে

করো প্রশ্ন, বৎস !

অজিত

পেয়েছেন দেবী বারবার : তবু
ভজনে কীর্তনে নামমন্ত্রজপে পারি এ-জীবনে
লভিতে আমরা সেই ভূমিকা—গীতায় ভগবান্
বলেছেন যার কথা শিষ্য অর্জুনেরে : "যে-লাভের
পাশে আর সব লাভই মনে হয় ম্লান—সে-আনন্দের
আনন্দে লভিলে স্থিতি সুগভীর দুঃখ-বেদনায়ও
হয় না সাধক আর বিচলিত।" * এ কি সত্য প্রভু,
যে, শুধু মন্ত্রের নিয়মিত উচ্চারণে নামগানে
আমরা লভিতে পারি সে-দুর্লভ দর্শন—প্রসাদে
যার এ-পরম লাভ হয় আমাদের অধিগত ?
করি দিনে দিনে হায় লংঘন আমরা বিধাতার
কত না নির্দেশ স্বেচ্ছাচারে ! যেন শাস্তি কর্মফল :
হারাই আমরা দর্শনাকাঙ্ক্ষা অন্তরে আমাদের।
যে-বাসনা-কারাগার হ'তে মুক্তি চাই—করি তারে
দুর্গম দৃঢ় আরো যুক্তির কুটিল বেড়াজালে।
কুহকিনী মায়া যেন আশা, জানি—প্রলোভন তার
সোনার হরিণ হ'য়ে আসে হিয়াসীতারে হরিতে।
জানি, বুঝি, তবু পড়ি তারি সর্বনাশা ফাঁদে হায় !
শুধু নামগানে কেহ পারে কি বন্ধন ছিন্ন করি'
লভিতে বেদবাঞ্ছিত জীবন্মুক্তিরস—যার তরে
যোগী যতি মুনি ঋষি ছাড়ি' ধনজন যশোমান
প্রিয় পরিজন সুখদুখ ল'য়ে আশ্রয় দুর্গম
কান্তারে পর্বতে বনে—অর্ধাশনে কভু অনশনে—
দুষ্কর তপস্তাশেষে তবে লভে সিদ্ধি তাহাদের
গভীর নিরাশাপথে ? শুনি—বহু বরিষ্ঠ সাধক
বহু কৃচ্ছ্রসাধনের অন্তেও পায় না যাহা জেনে
কাটায় সংসারটান স্নেহাসক্তি হয় সে-উদাসী।
যেন বর—সর্বেশের পরম মিলন চিরতরে—
সত্যই কি যায় পাওয়া শুধু সহজিয়া নামজপে ?

(মীরাকে করজোড়ে)

ক্ষমা ক'রো দেবী, এই সংশয়মলিন ভক্তিহীন
নিষ্ঠাহীন দুর্ভাগারে—যে দেখি' নয়নে তোমারেও
অটল বিশ্বাসবল পায় না খুঁজিয়া প্রাণে তার,
শুনিয়া মুরলী তাঁর তবু করে জিজ্ঞাসা—

মীরা

কেমনে

আপনারে তুমি দিলে "দুর্ভাগা" উপাধি তাঁর
বাঁশি কানে শুনিবারও পরে—তাঁর দিব্য জ্যোতি
চক্ষে দেখিবারও পরে ? আরো বলো দেখি, এ-জগতে
কে কাহারে ক্ষমা করে ? শুধু আছে অপাপবিদ্ধের
ক্ষমিবার অধিকার। তিনি বলে যুগে যুগে এসে
পাপীরেও গ্লানি হ'তে করি' মুক্ত মুছাবে তাহার
অশ্রুজল ঠাঁই দেন চরণে তাঁহার—বার বার
স্খলনেরও পরে তাকে গাঢ় প্রেমে টেনে নেন কোলে—
তখন আমরা বুদ্ধিমলিন, শ্রীহীন, প্রেমহীন
জীব বলো কী সাহসে করিব বিচার দুর্বলের ?

সনাতন

সত্য। মানবের অন্তরের কুরুক্ষেত্রে চিরকাল
দৈবী ও আসুরী দুই শক্তির সংঘাত নিদারুণ
মহামারী হাহাকারে করেছে উদ্‌ভ্রান্ত মানবেরে।
শুধু আপনার বলে এ-সংগ্রামে পারে না কেহই
রহিতে অক্ষত দিখে। তাই কারুণিক নারায়ণ
চাহেন তাঁহার নামবর্মে রক্ষা করিতে জীবেরে।
কলিযুগে চাই নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস।

অজিত

গুরুদেব !
কী বলিব ? একই প্রশ্ন জাগে ফিরে ফিরে : জানি না যে
বিশ্বাস কেমনে আসে ?

সনাতন

সাধন করিয়া সংস্কারে :

---

* যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

"সাধির গুরুর বাক্য—ধরে যার অন্তর-নিহিত
ঈশ্বর-ভক্তির কুঁড়ি হয় বিকশিত ধীরে ধীরে।
যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের দীপ্ত জীবনের
শুভ্র আলোকের বাণী বহিব বলদা কেবলই
দুঃখহরা জ্যোতি বলি'।" যদি এই সরল প্রভাবে
করো অঙ্গীকার—ভক্তি' চিত্তশুদ্ধি চির-নির্মলের
আশীর্বাদে অমলিন অনুরাগ-প্রেরণায় তুমি
পারিবে চলিতে কৃষ্ণতীর্থপথে অনির্বচনীয়
প্রশান্ত আনন্দে—যার পুণ্য পরিবেশে জাগে নাম
অরুণ-আলোকে জাগে যেমন পুলক বরিবীর
তমসাবিদার মর্মে। নাম পারে দিতে এই বর—
নামজাগানিয়া গানে। নামগান-আবাহনে নামী
আসেন নামিয়া প্রাণে। দিলে তুমি উপমা কাহার।
শোনো তাই এক কারাকথিকা মীরার—তারি মুখে।

মীরা (হেসে নমস্কার করে)

না ঠাকুর ! মীরা শুধু নামেরই চারণী বৃন্দাবনে।
কথিকা কাহিনী শাস্ত্র দর্শন—সাম্রাজ্য শ্রীগুরুর।
শুনি নি কি গীতাতায় আপনারি মুখে বারবার :
"স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম ভয়াবহ।" মীরা
স্বজন কীর্তন কথিকার তার পেয়েছে প্রেরণা
যার স্পর্শে—আজ দিন তিনিই নির্দেশ জিজ্ঞাসুরে।
মীরা শুধু বৃন্দাবনে গাহিবে মাধবে সুরে তালে :

(গান)

শ্যামলের রঙে রঙেছি লো, তাঁরি রঙে শুধু এ-জীবন।
শ্যামপ্রেমে মীরা পাগলিনী গায় হরি হরি অনুখন।
জানি না তো পূজা, জানি না সাধনা,
জ্ঞান ধ্যান জপ যোগ আরাধনা,
জানি শুধু বঁধু নামে আনন্দে উছল আমার মন।
জানি না দিবস, জানি না রজনী,
আজ কি বা কাল—জানি না সজনী !
শ্যামের বিরহ জেনেছি নিশীথ, প্রভাত তার মিলন।
জানি না লো ইহকাল পরকাল,
হরষ বিষাদ সন্ধ্যা সকাল,
যে-রঙে আমারে রাঙায় নাথ সে-রঙেই করি বরণ।
লোকলাজ কুল মান পরিজন
জানি না কিছুই—গৃহ কিবা বন,
জনমে মরণে জানি আমি—চিরসাথী চিতনন্দন।
মীরা দিবানিশি করে শুধু তার মধু নামকীর্তন।

সনাতন (অজিতকে)

শোনো বৎস, তবে এক অপরূপ কথিকা মীরার—
হয়েছে যে প্রেমমণি আজ নীলমণির প্রসাদে,
অশ্রান্ত নির্ঝরে বহে যার গানে কৃষ্ণকথামৃত।

(ঈষৎ ধ্যানস্থ থাকিয়া, চক্ষু মেলিয়া শান্ত কণ্ঠে)

একদা এক হতভাগ্য রাজার রোষে দণ্ড পেল :
যাবজ্জীবন কারাগারে থাকতে হবে তার।
ছিল না তার অপরাধ অমার্জনীয়—কিন্তু যখন
অসুর রাজা উঠত ক্ষেপে—কেউ পেত না পার।

চারিদিকে পাষাণপ্রাচীরে, ঊর্ধ্বে বাতায়নের ফাঁকে
গ্রহচক্রের সমারোহ দেখতে পেত না সে।
সকাল থেকে সন্ধ্যা শুধু হুকুম তামিল করতে হ'ত
বক্ষে চেপে পুঞ্জীভূত ব্যথা কারাবাসে।

একদিন তার দৃষ্টি পড়ে শয়ন-গৃহের আঁধার কোণে :
শিথিল একটি বড় পাথর ! ছোট্ট যে তার ছুরি !
হোক্, তবু সে কাটবে দেয়াল একটু একটু ক'রে—যখন
রাত্রে হবে নিদ্রানীরব দৈত্যপাষাণপুরী।

ছোট্ট ছুরি দিয়ে কাটা একের পর এক কঠিন পাথর,
নিশুৎ রাতে ধরা পড়লে হবেই ভীষণ সাজা।
সব জেনেও মুক্তিকামী অশান্ত তবু নিরন্তরই :
"ভাঙবই আমি, ভাঙবই আমি, ভাঙবই আমি খাঁচা।"

দিনের পরে দিন অশান্ত, মাসের পরে মাস অসাড়
বৎসরান্তে হয় আরম্ভ আর একটি বৎসর।
সাতটি বৎসর হলে গত কৃষ্ণশিলার শেষ আবরণ
চূর্ণ হ'ল—মিলন যেন সাধনশেষে বর !

সাতটি বৎসর আঁধার রাতে পাথরের পর পাথর কেটে
এলো অকূল হ'তে তার মুক্তিপ্রহর তবে।
শেষ পাথরটি ছিল যখন সংলগ্ন সে-গৃহকোণে
বন্দী ছিল তেমনি বন্দী, ক্লিষ্ট অগৌরবে।

শুধু একটি পাথর ছিল অনুত্তীর্ণ বাধা সেদিন

শৃঙ্খলিত দুঃখের আর মুক্তিসুখের মাঝে।
সাতটি বৎসর হ'লে গত, শেষ পাথরটি ভাঙার আগে
বন্দী ছিল তেমনি সে, কেউ যেত না তার কাছে।

তবু মুক্তির আশায় ছিল জীবন ধ'রে বন্দী, তাই তো
পাথরের পর পাথর-কাটায় ক্লান্তি ছিল না তার।
জানত যে সে—ভাগ্য হবেই প্রসন্ন—সে ধৈর্য ধ'রে
বিবর যদি খুঁড়তে পারে প্রাচীরতলে কারার।

যেদিন সে প্রাচীরের কোণের শেষ শিলাটি চূর্ণ ক'রে
বেয়ে সে-সুরঙ্গ এল বাইরে—কেঁদে হেসে
ছুটল আকাশতলে, নদী পার হ'তে সে সাঁতার কেটে
ফিরে এল ভালোবাসার বাসন্তী স্বদেশে।

মীরা (হঠাৎ হাততালি দিয়া আত্মহারা আনন্দে)
তেমনি, নামের অসিধারে কেটে কর্মভোগের কারার
পাষাণ-প্রাচীর পায় বাসনাবন্দী মুক্তির।
মন দুদিনে—বুনলে নামের বীজ তখনই ধৈর্যশাখে
প্রেম ফলে না:—চাই একান্ত নিষ্ঠা ও নির্ভর।

(অজিতকে)

নাম পাথেয় ক'রে চলো তীর্থপথে—মরু হ'লে
পার মিলবেই সুধার মিলন আনন্দবাসরে।
গোপালের নামের জাদুতে জলবেই তাঁর নীলকরুণায়
মুক্তির আলো বন্দীব্যথার কালো গ্লানির পরে।

বন্দী থাকি আমরা নিজের বাসনারই কয়েদখানায়,
চাই না মুক্তি—যতই ঝরুক দুঃখে নয়নধারা।
তখন কৃপাময় শ্রীগুরু ইষ্ট শরণদীক্ষা দিয়ে
দেন বরদান—নামের কৃপাণ—কাটতে পাষাণকারা।

(বলিতে বলিতে মীরার গাঢ়কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে—তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। দুই গণ্ডে অবিরল অশ্রুধারা বয়। অজিত মুগ্ধনেত্রে করজোড়ে)

অজিত

কে তুমি মা এলে দিতে নামের কৃপাণ বরদান
শক্তিময়ী, ভক্তিদাত্রী, মুক্তিবরদাত্রী একাধারে?

মীরা

(গান)

জানি না তো সখী, আমি যে কী—
তোকে কেমনে বলিব বল্?
আমি যে জানি না আজো এ জীবনে—
কোথা সখী, এর তল!

হরির অধরে বাজে যে মুরলী—আমি বুঝি তার তান!
হরিনাম টঙ্কারে যে-ধনুক—তাহারি একটি বাণ।
ভক্তকণ্ঠে-উজল আমি কীর্তনঝঙ্কার।
প্রেমিক যে-হার মেনে জয়ী হয়—আমি বুঝি সেই হার!
নই নই সখী, কিছু নই আমি,
সেই সব—প্রতি-অন্তরযামী,
জানি না তো সখী, আমি যে কী—
তোকে কেমনে বলিব বল?
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে—
কোথা সখী এর তল!

আমি গোপিকার প্রেমল আঁখির অশ্রুমুকুতাদ্যোতিত,
কালো নিশাপথে চলে যে-পান্থ—
সে-পথে জোনাকি-জ্যোতি।
নাথের চরণে নিবেদিতা আমি একটি কুসুমহার,
সুখদুখময় প্রেমের বীণার একটি কম্প্র তার।
নই নই সখী, কিছু নই আমি,
সেই সব—প্রতি-অন্তরযামী,
জানি না তো সখী, আমি যে কী—
তোকে কেমনে বলিব বল?
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে—
কোথা সখী, এর তল!

বৃন্দাবনের বালা আমি মীরা—নন্দিনী মেবারের।
সাধুচরণের ধূলিকণা—দাসী শ্যামল বসন্তের।
গোপালের হাতে যে বিকালো হবে খেলার পুতুল তার,
করুণাশাখার নগ্ন একটি হিন্দোল লতিকার।
নই নই সখী, কিছু নই আমি,
সেই সব প্রতি-অন্তরযামী,
জানি না তো সখী, আমি যে কী—
তোকে কেমনে বলিব বল?
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে—
কোথা সখী, এর তল!

মীরার কণ্ঠ অশ্রু-আভাসে গাঢ় হইয়া আসে—দুটি ধারা বয় দুগাল বেয়ে। মন্দিরের নরনারী একে একে তাঁর পায়ে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করেন। অজিত ও পুণ্ডরীক সবশেষে প্রণাম করেন। ভক্ত সনাতন তাঁহাকে ধরে বেদীমূলে সন্তর্পণে বসিয়ে একদৃষ্টে তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাকেন।

(সমাপ্ত)

"এলিজাবেথ পার্লার"

আভা পাকড়াশী

বিঠুরে বদলি হয়ে এসেছি। কর্মসূত্রে আর বন্ধুত্ব সূত্রে এখন অনেকের সঙ্গে আলাপ জমে উঠেছে। তার মধ্যেই একজন হ'ল এই খান্না। সুরজিৎ খান্না। আমি অবশ্য বাংলা করেই ডাকতাম। সুরজিত ভাই। ভারী অমায়িক ভদ্রলোক। বড় চাকুরি করে। কর্মসূত্রে বেশ কয়েকবার প্রতীচ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। ওখানকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাহেবিয়ানার 'বাতিক' আছে। আপনারা যদি খান্নাকে দেখতেন তা হ'লেও এই বিশেষ কথাটি যে তার সম্বন্ধে কতখানি প্রযোজ্য এটা বুঝতেন। ওদেশের সবই উৎকৃষ্ট, সে দাড়িই হোক আর দড়িই হোক বা দৌড়ই হোক।

কিন্তু আমরা এই ছোট্ট শহর বিঠুরে বসে ওর দৌড় দেখে ত হতবাক্ হবার যোগাড়। সন্ধ্যের সময় গরমের দিনে আড্ডা বসত ব্রহ্মাবর্ত ঘাটে আর নয়ত আমার বাড়ীর লনে। আমার স্ত্রী সোনী ওরফে যাজ্ঞসেনীর হাতের দুধের সরবত যে খেয়েছে সে এদেশের বিখ্যাত লস্যিও খেতে চাইবে না। সত্যি রন্ধন-নিপুণা।

ওর সেকালের ঠাকুমার দেওয়া আদুরে নাম, আমার আধুনিক ভালবাসার ছাঁচে ঢেলে তাকে সোনী রেখেছি। তবু সে যাজ্ঞসেনীই, সেই মিষ্টি হাতের মিঠাইয়ের লোভে আমার ছোট্ট লন সরগরম। অনেক বন্ধুর সঙ্গে রোজই সুরজিত সম্বন্ধে একটা-না-একটা নতুন খবর পাচ্ছি। জানেন মণিবাবু, আজ ত সুরজিৎজী ক ট্রাক মোজেক টাইল আনিয়েছেন। মেঝেটা নতুন রকম হবে। পরদিন শুনলাম, নরটনের স্যানিটারী ফিটিংস আনা হয়েছে দিল্লী থেকে। আবার শুনছি প্লাস্টিক পেইন্ট হবে। এক-এক দেয়ালে এক-এক রং।

সোনীরও ঘরবাড়ী সাজাবার খুব সখ। আমার ছোট্ট কোয়াটারটাই ঝেড়ে-মুছে সাজিয়ে-গুজিয়ে চমৎকার করে রাখে। সুরজিত খুব প্রশংসা করে ওর রুচির। এটা-সেটা পরামর্শও দেয়। বলে, ভাবী, এই বাঁশের রোলের মানিপ্ল্যান্টগুলো ড্রয়িং রুমের দরজার উল্টোদিকে একটা তার টাঙিয়ে তাতে ঝুলিয়ে দিন, বেশ দেখাবে। —উইনডো পেনের মধ্যে দিয়ে বেশ দেখা যাবে,—এ ফুলদানিটা এখানে বসান। সোনী নিজে ফার্ণিচারে পালিশ লাগায়, সস্তার কাঁচের গ্লাসেও রং আর তুলি দিয়ে ফুল তোলে, মাটির ভাঁড়ে রং করে অ্যাশট্রে বানায়, সুতুর তার দিয়ে কাজ করে সাধারণ কাঁচের ফুলদানিও অসাধারণ করে তোলে। খুব উৎসাহ দেয় সুরজিত, বলে, খুব ভালো ভাবী, ও-দেশের মেয়েরাও এমনি। ওরাও অল্প জায়গায় থাকে কিন্তু সেটিকে সুন্দর ছিমছাম, আরামপ্রদ করে রাখে। কোন কাজ করতে ওরা লজ্জা পায় না, বা কোন কাজটাকে ছোট মনে করে না। তারপর আমায় নিয়ে পড়ে, বলে, দাদাজী আপনি কিন্তু একেবারে বেকার আদমী, খালি অফিস আর আড্ডা, বেশ আছেন। কেন, ভাবীকে একটু হেল্প করুন না? আমি তার কথা শেষ করার আগেই সুরু করতাম, এই যেমন ওদেশে করে, তাই না সুরজিত ভাই! ওঃ বেশ ত, তুমি একটি বিয়ে করে নমুনাটা একটু দেখাও না, চেষ্টা করে দেখি, শিখতে পারি না কি? ও সোনীর দিকে চেয়ে একটু হাসে।

সোনীও হেসে বলে, ফাঁস করেই দেই তবে? ও মেম বিয়ে করবে, আমাদের মত মেয়ে বিয়ে করবে না। ছিঃ ভাবী, সবাই কি আর আপনার মত হয়?

আমি চমকে উঠি, এইরে, আমার ঘরে নজর দিয়েছে? হেসে উঠি তিনজনেই।

কিন্তু এটা কি ব্যাপার? সেই সুরজিত বাড়ী-ঘর নতুন করে সারাচ্ছে, গোছাচ্ছে আর আমরা কিছুই

জানি না ? সোনীকে বলতে দেখলাম তারও বেশ মনে লেগেছে ব্যাপারটা। সুরজিত এত কাণ্ড করছে অথচ সে তার কিছুই জানে না। একলা থাকে, চাকরের হাতে খায়, কতবার কত ছলে তাকে খাবার পাঠায় সোনী, ডেকেও খাওয়ায়। সব ব্যাপারে পরামর্শ করে, আর সে কি না ? বেশ ছেলে ত ?

পূজোর সোনী গেছে বাপের বাড়ী কলকাতা, আমি খাই অফিস ক্যান্টিনে। নানা খবরে আর গল্প-গুজবে দিনগুলো মন্দ কাটে না। তবে বাড়ীটা ফাঁকা থাকায় বিচ্ছিরি লাগে। সোনীর মানিপ্ল্যান্ট শুকিয়ে যাচ্ছে, জল দিতে ভুলে যাই। বাইরের গাছগুলোয় অবশ্য পাশের বাড়ীর মালিটা একটু জল দিয়ে যায়। ড্রয়িং-রুমে সাজান ওর প্রেজেন্টেশন পাওয়া রূপোর জিনিষগুলো বিনা পালিশে দ্যুতি হারিয়ে ম্লান হয়ে গেছে। আখরোট কাঠের কাজ-করা টেবিল ধূলোয় ধূসরিত। সব কিছুর ওপরই বেশ পুরু এক পর্দা ইউ পির বিখ্যাত ধূলোর আস্তরণ। কে সাফ করবে ? আবার কোনটা করতে কি ভেঙে ফেলব ? সোনী এসে কাঁদতে বসবে। অদ্ভুত মায়া ওর সব কিছুতে। শুধু জিনিষে নয়, মানুষেও। এই আবার সোনীর কথা বলছি। নাঃ, লোকে বলে মিথ্যে নয়, আমি বোধ হয় একটু স্ত্রৈণই হব। আরামপ্রিয় মানুষ, আরামটা পুরোমাত্রায় ওর কাছে পাওয়া যায়, সেই জন্যেই কৃতজ্ঞতাবোধ আর কি। তাকে কি স্ত্রৈণই বলে ?

হঠাৎ বহুদিন পর সুরজিত এসে উপস্থিত। কি ব্যাপার, ছিলে কোথায় ?

এই ত দিল্লী থেকে আসছি।

তোমার ত বদলির চাকরি নয়। তবে ?

—না তা নয়, তবে ঐ কাজেই আর কি ! ছিঃ ছিঃ, বাড়ীর এ কি হাল হয়েছে ? আমার ভাবী কোথায় ? ঘরের লক্ষ্মী যে নেই বোঝাই যাচ্ছে। ঘরের এদিক্-ওদিক্ ঘুরে বেড়ায়।

—যাক্, তবু এতদিনে মনে পড়ল আমাদের, আচ্ছা ব্যাপার কি বল ত ? বাড়ীর ভোল্ পাল্টে ফেলেছ শুনলাম। তোমরা ত বহুদিনের পিঁচুরের বাসিন্দা ? বাজীরাওয়ের বংশধর ?

আমার দিকে ফিরে হেসে বলে,—দিমাগী করছেন দাদাজী ? ওসব ত পুরানো জমানার কথা, এখন হাল-চাল না বদ্‌লালে দুনিয়ার সঙ্গে তাল রাখব কি করে ?

আবার খবর পাই, সুরজিত সুন্দর একটা ক্রীম-কলারের মার্টার বিউইক কিনেছে। এবার ফ্রিজিডেয়ার এনেছে। ল্যাজারাসের নতুন ডিজাইনের দামী দামী সব ফার্নিচার আসছে। বাগান যা করেছে, দেখার মত। তুলনা কি ? যেন এক-একখানা আধমেরী পৌড়া ! মনের ঘাস, যেন কাশ্মীরী গালিচা, আবার তালাও বানিয়ে তাতে হাঁস ছেড়েছে। সাদা দুধের রংএর রাজ হংস। বাগানে ছোট ছোট ঘর করে, অ্যাকোয়ারিয়ম বানিয়েছে। নানান রঙের মাছ। আশ্চর্য্য ! আমায় কিন্তু কখনও যেতে বলে না সুরজিত। যারা যায় তাদের কাছেই শুনি। শুনি আর হাসি, বড়লোকের খেয়াল, আর খেয়াল না হ'লে ওসব কিনবেই বা কে ? কিছুক, সাজাক। বড়লোক, কিন্তু ছেলেটা ভাল, মিশেছে ত আমাদের সঙ্গে একেবারে ঘরের লোকের মত। সেটাও বোধহয় একটা খেয়াল হবে। তবে ও যে এত বড় লোক তা কিন্তু সত্যিই জানতাম না।

আবার এল সুরজিত।

আশ্চর্য্য হয়ে বলল,—এ কি,ভাবীকে এখনও আনেঃ নি ? কবে আসবে ভাবী ?

—কি করব বল ? তার বাবা মারা গেলেন যে ?

—ওঃ হো, বড় আফশোষের কথা ত ?

—হ্যাঁ, বয়স হয়েছিল, তবে মৃত্যুটাই দুঃখের। তা তোমার আর কি, তুমি ত আমাদের ভুলেই গেছ।

দুঃখিতভাবে ধীরে ধীরে বলে—ছিঃ দাদাজী,ও কথা বলবেন না। যাদের বেশী মনে রাখি তাদের সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারি না। এইটেই আমার দোষ।

একটু শ্লেষ করি,—মস্ত গাড়ি কিনেছ শুনলাম, তবে আবার স্কুটার কেন ?

হাসে, বলে,—দাঁড়াও ভাবী আসুক, তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যাব গাড়ি করে।

চলে যায়।

যেই শোন, দিল্লী চলেছে, কি ব্যাপার ? এদিকাবে

আসছেন। রাণী আসছেন, মালেকা আসছেন। দেখতে যাচ্ছি। সে কি যাবার ছিড়িক! ছাব্বিশে জানুয়ারী রিপাবলিক ডে। চমৎকার প্যারেড হয়, শোভাযাত্রা বেরোয়। আমাদের দেশরক্ষা বিভাগ, সলামী অস্ত্র দিয়ে সুরু করে। আকাশে জেটপ্লেন ধোঁয়ায় রেখায় প্রথমে লিখবে 'জয়হিন্দ'। তারপর সুরু হবে পদাতিক সৈন্যের কুচকাওয়াজ। এরপর বড় অস্ত্রশস্ত্রের মিছিল, কামান, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি যাবে। এরপর নৌ-বিভাগ তাদের স্মারক মডেল জাহাজ করবে সরিতে। প্রত্যেক রাজ্য নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ডেমনষ্ট্রেট করবে; এক-একটি গাড়ি যাবে। এতে থাকবে পাঞ্জাবের গ্রাম—তাদের ভাংড়া নাচ। গুজরাতের মেয়েরা, ঘোল মউছে—গার্বা নাচছে। বাঙলা দেশ—তাঁত বুনছে, লাঙল দিচ্ছে জমিতে। এমনি সব। এছাড়া প্রত্যেক স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা মার্চ করবে। ব্যাণ্ড পার্টি থাকবে। সে এক বিরাট মিছিল যাবে প্রেসিডেন্টকে সালাম জানাতে জানাতে। কত তাঁবু পড়বে, চোর পড়বে, মঞ্চ বাঁধা হবে। একমাস আগে থেকে সাজো সাজো রব পড়ে যায় দিল্লীতে। এবার আবার তার ওপর কুইন এলিজাবেথ আসছেন। সুতরাং যাবে না এরা? গরীব, বড়লোক, চাষা, ভদ্রলোক কেউ আর বাকি নেই। কুইন ইজ কামিং—মালেকা আরহি হ্যায়—এলিজাবেথ আসছেন—যাবেন না আপনি? —সঙ্গে তাঁর স্বামী ডিউক অব এডিনবারাও আসছেন! প্রত্যেকের মুখে এক কথা। শুধু ভাষার রকম-ফের।

আমি আর কোথায় যাব! এক ত বুড়ো মানুষ। আজ পর্য্যন্ত সেই বাল্মীকি মুনির আশ্রমই দেখলাম না। সীতাকে যেখানে বনবাস দিয়েছিলেন রামচন্দ্র। লবকুশ সেখানেই জন্মায়, এইসব কথা কত শুনেছি এখানে এসে অবধি। সোনীর ত খুবই ইচ্ছে ছিল যাবার—শুধু আমার জন্যই হয়ে ওঠে নি। বলতাম—কেন বাপু যাবে? মনের সমস্ত কল্পনার ছবি নষ্ট হয়ে যাবে। গিয়ে দেখবে হয়ত, ঝোপের বাগানের মধ্যে আধুনিক কালের দুঃখিনী সীতাদেবী দেহাতী মেয়ের বেশে কাতা ঠুকছেন, বাল্মীকি মুনি গোয়ালার সাজে জাব মাখছেন, চাড়ি সামছেন, আর লবকুশ ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছেন—তার মধ্যে হয়ত দেখবে ঘুঁটে-লাঞ্ছিত একটি ভাঙা মন্দির—দেখে ভক্তি চটে যাবে, পঙ্কে পা যদি দেবে। সোনী মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে হাসতে বলত—থাক মশাই, থাক। আর যেতে চাইব না, তোমার কল্পনার দৌড় এবার বন্ধ কর, আর ছুটির দিনে গরম চায়ের সঙ্গে নির্ব্বিবাদে খবরের কাগজ চর্ব্বিত চর্ব্বণ কর।

আমারও মালেকা আসছেন। তাঁর প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত রয়েছি। গরুর দুধের ব্যবস্থা করতে হবে—মহারাজিন ঠিক করতে হবে—এসেই হাতাবেড়ি ধরতে পারবেন না ত? বাড়ীটারও একটু হাল ফেরাতে হচ্ছে। এতেই খাটতে খাটতে দম বেরুচ্ছে, আবার দেশের নয়, বিদেশের মালেকা দেখতে কে যায়?

নতুন খবর, এবং বেশ চাঞ্চল্যকর খবর, এতদিনে বোঝা গেল খান্না সাহেবের এত জাঁকজমক ঠাটঠমক কেন? কিসের জন্য? কার জন্য? সান্যাল আসবে সকলে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল, ও এলিজাবেথকে নিয়ে আসবে।—সে কি? রাণী এলিজাবেথ, মালেকা, আসবেন বিঠুরে? ঐ সুরজিৎ খান্নার বাড়ীতে? তারই জন্য এত তোড়জোড়? এত প্রস্তুতি? তাই বুঝি সমস্ত বাড়ীটা ঢেলে সাজান অমন করে? গাড়ি কিনল? ঐ গাড়ি করেই আনবে না কি? আত্মীয়-স্বজন ওর অনেক আছে, কিন্তু কারুর সঙ্গেই ওর বিশেষ মিল মহব্বত নেই। কেন নেই? কেন ও একা একা ঐভাবে থাকে জিজ্ঞেস করায় বলেছিল,—দাদাজী! আমার আত্মীয়-স্বজন যারা আছে তারা চায় আমি টাকাকড়ি জমি-জায়দাদ তাদের সব দিয়ে-থুয়ে কৌপীন পরে বেরিয়ে যাই। ও ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই। একজনকে ডাকলেই দশজন জুটবে, চাচাকে রাখলে মামা ভাববে, ঐ শালাই সব হাতিয়ে নিল, তার পেছনে লেগে যাবে তাকে তাগানর জন্য। তার চেয়ে ভাল, এমনি থাকা। সব-চেয়ে বড় দোস্ত—বই। বই কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তা ছাড়া আপনে পর ভালা, আপনারা ত আছেনই। কিন্তু এটা কি ব্যাপার! হঠাৎ তার রাণী আনার ঝোঁক চাপল কেন? নাঃ, হঠাৎ ত নয়, এ ত বহুদিনের প্রস্তুতি তার। নামকরা পুরণো বংশ ওদের! তা ছাড়া বিঠুর ত ঐতিহাসিক জায়গাও, কে জানে

আসবেন হয়ত রাণী এলিজাবেথ। বাঃ, খুব প্রিমিয়েন্স পেয়ে যাবে ছোকরা। কম্বিৎকর্মা আছে, মনটা খুশীই হয়। যাক, মহম্মদ পর্ব্বতের কাছে না গেলে কি হবে, পর্ব্বত আসছে মহম্মদের কাছে। দেখা হয়ে যাবে রাণী এলিজাবেথকে। কথায় আছে, রাজ দর্শন পুণ্য। এদিকে আমার সোনা রাণীরও আসবার দিন এগিয়ে আসছে।

হাফিসে জানুয়ারী বেরিয়ে গেল। রেডিওতে তোর থেকে কমেন্‌টারী বলে গেল, শুনলাম বসে বসে, বেশ ছবির পর ছবি দেখলাম কয়েক ঘণ্টা ধরে। তার পর দিনও গেল। কই, কাগজে ত দেখছি না রাণীর ঝিঠুরে আসার প্রোগ্রাম? সারা ঝিঠুরের ইতর-ভদ্র সকলেই উন্মুখ হয়ে রয়েছে। সুরজিৎ যে খবরটি এত কষ্টে লুকিয়ে রেখেছিল তা ফাঁস করে দিয়েছে সামান্ত এক পাথর-খোদাইবালা। সে পাথরের ফলকে খোদাই করে নাম লেখে। সুরজিত তার গেটের বাইরে সেই নাম খোদাই-করা শ্বেত পাথরের ট্যাবলেট লাগাবে। ও লিখেছে, 'এলিজাবেথ পার্লার'। প্রশ্ন করল গোঁথি, অওধপ্রসাদ, মিশ্রজী, "কি ব্যাপার খান্না সাহাব, বাড়ীর নাম 'এলিজাবেথ পার্লার' কেন? এত নাম থাকতে মালেকার নাম?" এর উত্তর, "তাঁকেই ত আনতে যাচ্ছি।"

ব্যস, মেতে উঠেছে সারা ঝিঠুর, উন্মুখ হয়ে আছে যারা দিল্লী যেতে পারে নি তারা।

কিন্তু কাগজে কোন অ্যানাউন্সমেন্ট নেই। না থাক, লোকে ঘড়ি ঘড়ি গিয়ে খবর নিচ্ছে,সুরজিতের মুনিমজীর কাছে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি বলছেন,"আমি খবর পেলেই তোমাদের জানাব, খামোখাই ব্যস্ত হচ্ছ তোমরা সব।" তাঁর কাছে আমার আরও খবর মিলল। দেড় শ' টাকা মাইনের গোয়ানিজ বাবুর্চি ঠিক করে গেছে সুরজিৎ। কি রান্না করে রাখবে, সে নির্দ্দেশও দিয়ে গেছে। এ-ছাড়া বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি নেপালী আয়াও রেখে গেছে।

কাল সোনীর চিঠি পেয়েছি, আসছে সে দিল্লী থেকে। এস বাপু, আমার যতদূর ক্ষমতা গোছগাছ করে রেখেছি, এমন কি রগচু আর আমি ধরাধরি করে খাটটা এক-পাশে সরিয়ে আর একটা খাটিয়া পেতেছি। ঐ একক খাটিয়ায় আমার চলে যাবে।

মুনিমজী খবর দিলেন, আজ আসছে সুরজিৎ, এলিজাবেথকে নিয়ে আসছে। ওঃ, ঝিঠুরের রাস্তা লোকে লোকারণ্য সব কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথ আসছেন। যার যা ভাল পোশাক আছে সে পরেছে। কারুর ছেঁড়া ধুতি কিন্তু একটি নতুন কামিজ আছে, সে তাই পরেছে। কারুর তেলহীন রুক্ষ মাথা, শীতে খড়ি-ওঠা গায় শুধু একটি বেনিয়ান কিন্তু তার এক জোড়া ভাল জুতো আছে। চকচকে পালিশ করে পরে নিয়েছে সেটি। মাথায় ছেঁড়া ধুতির মুরেঠা, দাঁড়িয়ে আছে ফুলের মালা নিয়ে। এ ছাড়া ভদ্রলোকেরা আছেন, তাঁদের বাড়ীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছাপা শাড়ী পরা, পায়ে চটি মহিলারা আছেন। আর আছে প্রচুর শিশুর দল। তাদের কেউ নগ্ন, কেউ বড়দের জামা পরেছে, আবার কারুর পোশাক বেশ ভদ্র। অনেকেরই হাতে ফুলের মালা। রাস্তায় পান-বিড়ি ধূকা-মালাদের বিক্রি বেড়ে গেছে। খুব চাঠ বিক্রি হচ্ছে। খোমকলি রেউড়ির ত কথাই নেই। চাট মানে এদেশে বোঝায় এই গরম গরম ভেজে-দেওয়া আলুর চপ, কচুরি, ঘুগনি এই সব। নাম অভ, চিড়িয়া, মটর এই সব।

কাগজে অত খবর ইংলণ্ডেশ্বরী জয়পুরের পথে। চুলোয় যাক কাগজ, এখানে মুনিমজী জিন্দাবাদ। দেড় শ' টাকা মাইনের কুক রান্না করে রেখেছে—আরা আরও ফিটফাট।

—ঐ ধুলো উড়ছে—আরে আগিয়া—পৌহ-গিয়া খান্না সাহাব। জলদি আও, উয়ো আওত হ্যায়।

বিরাট কলরব। রাস্তাটা গেছে আমার অফিসের সামনে দিয়ে। জানলায় দাঁড়ালাম এসে।

এ কি? গাড়ির মধ্যে ও কে? ও যে আমার হৃদয়-রাণী সোনী দেবী, নতুন অতিথি নিয়ে বসে আছেন। এটা কি করে সম্ভব হ'ল? তাড়াতাড়ি নিজের সম্বল দ্বিচক্র-যানটির আরোহী হয়ে বায়ুবেগে হাওয়া-গাড়ির পশ্চাদ্ধাবন করলাম। জনতা হৈ হৈ করছে, আরে মালেকা কাঁহা বৈঠল বা! উয়ো ত বাঙ্গালীবাবুকা বিবি

হয়েন! অবশ্য ভুল, মালা তার আগেই ছুঁড়ে দিয়েছে। ভদ্রলোকরা বলছে, তাজ্জব কি বাত! গজব কর দিয়া।

আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম, গুজবে কান দিও না। দেখি, আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে সেই বিরাট বাটার দুইক। আমার বন্ধ মুখটা যে খুলে হাঁ হয়ে গেছে টের পাই সোনীর কথায়।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ যে? নাও, খুকিকে ধর, নামব যে আমি!

ধরলাম খুকিকে। ওই ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল গাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। মনঃক্ষুণ্ণ জনতা তখনও দাঁড়িয়ে।

মালেকা, ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের বদলে বাঙালী-বাবুর বিবিকে দেখে তারা মোটেও খুশী হয় নি। তার ওপর আরও একটা প্রশ্ন, এ ত শুধু মোটর এল, কিন্তু মোটরের মালিক কই? মালেকা না হয় না এল সই, কিন্তু মালিক গেল কোথায়। সুরজিৎবাবু কঁহা হায়? কিঁউ ভাই ড্রাইভার সাব, উয়ো কঁহা গয়ে?

সেটা আমারও জিজ্ঞাস্য। খুকিকে ছেড়ে সোনীকে ধরলাম, ব্যাপারটা বল ত? শেষে তুমি সুরজিতের গাড়ি চড়ে কি করে উদয় হ'লে?

তারও সাফ জবাব, কেন, দিল্লী থেকে।

সে কোথায় গেল? তোমার পাত্তা গেল কোথায়? এল না কেন সুরজিৎ? কেন আনল না এলিজাবেথকে?

—কোন্ প্রশ্নটার জবাব আগে দেব বল?—বল ত একটা একটা করে দেই।—ঠাণ্ডা গলার উত্তর।

ওর ধীর স্বরে আমি আরও অধৈর্য্য হয়ে উঠি, তাড়াতাড়ি বলি—আচ্ছা বাপু, আচ্ছা। এখন দয়া করে বলেই ফেল ব্যাপারটা। কেন এল না সুরজিৎ?

—আসতে পারল না তাই এল না।

আবারও তেমনি স্বরে, চেঁচিয়ে উঠি আমি—মানে?

এখানে রটিয়ে গেছে এলিজাবেথকে নিয়ে আসবে। ওহো, বুঝেছি আনতে পারল না তাঁকে, সেই লজ্জায় নিজেও এল না, না? একটু আশ্বস্ত ভাবে আগ্রহ ভরে সমর্থনের আশায় ওর মুখের দিকে চাই।

—তাই, তবে, শুধু লজ্জা নয়, তার সঙ্গে আছে তার এতদিনের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক্ষা, সোনালী স্বপ্ন আর প্রাণঢালা প্রস্তুতির অকস্মাৎ বিফলতার চরম দুঃখ। বুকটা ভেঙে গেছে বেচারার। শুধু কি এখানে এমনি করে বাড়ীঘর সাজিয়েছে? দিল্লীতেও ইম্পিরিয়াল হোটেলে স্যুইট ভাড়া নিয়েছিল, প্রতি ঘণ্টা প্রতি মিনিট ধরে অপেক্ষা করেছিল আর কল্পনার জাল বুনেছিল। আহা, সব বৃথা হ'ল বেচারীর। আমার সঙ্গে ত ঐ হোটেলেই দেখা। একজন চিল্ড্রেনস্ স্পেশালিষ্ট এসেছেন জার্মানী থেকে, উঠেছেন ঐ হোটেল ইম্পিরিয়ালে। খুকীর একটা পা কেমন মুড়ে আছে দেখছ না? ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম তাই। তক্ষুণি এরোড্রোম থেকে হতাশ হয়ে ফিরেছে সুরজিত।

ব্যস্ত ভাবে বলি, কই, আমাকে ত কিছুই লেখ নি?

তেমনি নির্লিপ্ত মুখে সোনী বলে, তুমি দুঃখ পাবে, তাই জানাই নি। দূর থেকে মানুষ যতটা খারাপ তার চেয়ে বেশী ভাবে, আর আশঙ্কায়, ভয়ে আরও অস্থির হয়। যেমন হয়েছে, সুরজিতের। উঃ, তার সেই সময়ের মুখের অবস্থা যদি তুমি দেখতে।

বিরক্ত হয়ে বলি, আঃ, কি যে এক ঘ্যানঘ্যান করছ তখন থেকে, আরে বাপু আনবে বলে'ছিল এলিজাবেথকে, পারল না আনতে, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল শুনি? এলেই পারত চলে। যত সব সেন্টিমেন্টালিটির কারবার।

ঝাঁঝের সঙ্গে মুখ বেঁকিয়ে সোনী বলে, হ্যাঁ কারবার!

তা ত বলবেই, ঐরকম মনের অবস্থায় মানুষ বলে কত কি করে বসে! ও কত আশা করেছিল, কত ব্যবস্থা করেছিল, এমন কি মেয়েটি এসে কি খাবে সে পর্য্যন্ত রান্না করতে বলে গিয়েছিল, সে যে সেই সব খেতে ভালবাসে, ওঃ, ভালবাসা বটে।

কার ভালবাসা? কাকে ভালবাসল সুরজিত?

কেন, এলিজাবেথকে।

অ্যাঁ, সে কি? রাণীকে ভালবাসে ও?

দূর! রাণী কেন হ'তে যাবে?

তবে?

এলিজাবেথ ওর ভাবী বৌ, কিঁয়াসে। তার জন্যই ত এত তোড়জোড়, বাড়ী সাজান, গাড়ি কেনা, হোটেলে দামী স্যুইট ভাড়া করা—তারপর ঘণ্টা গুণে গোণা, এই

আসছে, এই আসছে করে দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করা, শেষে আর এলই না। কি করে, কোন্ প্রাণে ওর সেই সাধ করে সাজান বাড়ীতে ও ফিরে আসে বল? কত করে ত বোঝালাম, কেঁদে ফেলেছে বেচারী। আবার কাঁদ, বুঝবে কি করে তুমি? অমন করে ত ভালবাসনি কখনও? অভিমানে চোখ ছল ছল করে সোনীর। ঘুমন্ত মেয়েকে শুইয়ে দেয় বিছানায়।

আমি আবার অধৈর্য্য হয়ে বলি, বাসি; ভালবাসি। —খুব খারাপ লাগত তুমি ছিলে না বলে, কিন্ত ও রাণী এলিজাবেথকে আনতে যাচ্ছি বলে গেল :কন?

মুখ টিপে হাসে সোনী—তোমরা তাই বুঝলে কেন? ওর দোষ? আমাদের কাছে মিথ্যে বলতে পারবে না বলেই আমাদের নিয়ে যায় নি বাড়ীতে, পালিয়ে বেড়াত আমাদের কাছ থেকে। ভেবেছিল বাড়ী আর বৌ একসঙ্গে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। তবে কথা রেখেছে, গাড়িতে প্রথমে আমায় চড়িয়েছে। চোখের জল চাপে সোনী।

বহুকষ্টে ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। সংক্ষিপ্তসারে এই দাঁড়ায়:

সুরজিত যখন লণ্ডনে থাকার সময় একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। মেয়েটি অভিজাত ঘরের; রাণীর নামে নাম। তার বাপ-মায়ের অমত থাকায় বিয়ে সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া মেয়েটি তখনও সাবালিকাও হয় নি। এতদিনের অপেক্ষায় তার সাবালিকাত্ব প্রাপ্তি হয়েছে, আর তার মা-বাবা তাদের দুই বোনকে রেখে দু'দিনের জন্ত বাইরে যাচ্ছেন, এই সুযোগে এলিজাবেথ ভারতে পালিয়ে আসবে তার প্রিয় সন্নিধানে। কোন্ প্লেনে আসবে, কোন্ তারিখে আসবে সব জানিয়ে দেয়। এদিকে ভারতেও রাণী এলিজাবেথের আগমনে ব্যাপক আনন্দের ঢেউ বইছে। আর আমাদের পিঁচুরেও 'এলিজাবেথ পার্লার' নির্মাণ করে, গাড়ি কিনে, পুকুরে হাঁস ছেড়ে প্রতীক্ষার সাগরে আশার ঢেউ তুলেছে সুরজিত।

বাবা-মা, বাইরে গেল—যথাযথ উপদেশ দিল ছোট বোনকে এলিজাবেথ যে, এই সময় আমার প্লেন ছাড়বে, তার পর মা-বাবাকে ব'লো, তার আগে নয়। ছোটবোন চোখের জলে শেষ বিদায় দিল। সুখী হবে, তাই বাধা দিল না। বরং গুছিয়ে দিল সব হাতে হাতে। চলে গেল। টিকিট কিনে জিনিষপত্র নিয়ে প্লেনে বসল।

বাবা মা যথাসময়ে ফিরে রোরুদ্যমানা কনিষ্ঠা কন্যাকে কারণ জিজ্ঞেস করায় সে ঘড়ি দেখে বুঝল দুরন্ত নিরাপদ, তখন বলল। অভিযান ব্যর্থ জেনেও নিরুপায়ের মত তাঁরা তৎক্ষণাৎ এরোড্রোমে ছুটলেন। আশ্চর্য, মেয়ে উড়ে যায় নি, উড়তে শিখেও উড়তে পারে নি। প্লেনের কল খারাপ তাই এই বিপর্যয়। ভাগ্য খারাপ; হিসেব ভুল। সাবালিকা হতে আরও তিন মাস দেরি আছে এই অছিলাতে জিনিষপত্র সমেত সেই উড়ুক্কু মেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরা। সে বেচারী কাঁদতে কাঁদতে নিজের ব্যর্থ প্রয়াসের খবর পাঠাল সুদূর ভারতের বিরহী প্রিয়কে। কিন্ত ভাগ্যটা কার খারাপ? সে বেচারী যে 'শূন্য মন্দির মোর' বলে আর ফিরেই এল না! শুনলাম অতি দুঃখে আমাদের নতুন অতিথিকে বুকে নিয়ে নামকরণ করেছে এলিজাবেথ—বাংলা করে হ'ল এলা।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতার বুকে নূতন আঘাত !

দেশের এই পরম সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যেও পূর্ব রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ শিয়ালদহ হইতে পূর্ব রেলওয়ের আঞ্চলিক (zonal) ট্রেনিং স্কুলটিকে ধানবাদে (বিহারে) অপসারিত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না ! এ-কাজ যেন আজই না করিলে দেশের এবং জাতির সমূহ বিপদ ঘটিত এবং দেশ ও জাতির পরম সর্বনাশ হইত। কিন্তু পূর্ব রেলওয়ের কর্তাদের এই অশোভন এবং অতি-ব্যস্ততার কারণ কি ? এ-বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশ যে—

পূর্ব রেলওয়ের জোনাল ট্রেনিং স্কুলটি শিয়ালদহ হইতে ধানবাদে সরাইতেই হইবে, আর তাহা করিতেও হইবে অবিলম্বে।

পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ রেলওয়ে বোর্ডের ডেপুটি ডিরেক্টরের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, (D. O. No. E. 890/2/31/TRG-DH. N dt. 2nd June. 1965) তাহাতে তাঁহাদের যুক্তি জোরদার করিবার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে এবং অনেক টাকাও খরচ করা হইয়াছে। কাজেই এখন আর পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না !

এদিকে যাহা খরচ হইয়াছে তাহার উপর আরও প্রায় দ্বিগুণ টাকা খরচ না করিলে ধানবাদে সম্পূর্ণভাবে কাজ চলিবে না। ইহার পরেও স্কুলটির সব বিভাগ সেখানে যাইবে না। লোকো বিভাগ জামালপুরেই থাকিবে, আর সিগন্যালও সম্পূর্ণভাবে ওখানে লওয়া হইবে না। স্থান নাই !

ঐ চিঠিতেই আছে, প্রায় একচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রথম পর্য্যায়ে খরচ হইতেছে। ইহাও এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, তবে শীঘ্রই হইবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে খরচ করিতে হইবে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। তাহার পরে যেহেতু রেলওয়ে বোর্ড মধুপুর হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং স্কুলটিকে ঐ ধানবাদেই স্থানান্তরিত করিতে বলিয়াছেন, সেজন্য তৃতীয় পর্য্যায়ে আরও টাকা খরচ করিতে হইবে। জানা গেল যে, মোট এক কোটি টাকারও অনেক বেশী খরচ করিতে হইবে এই তিন পর্য্যায়ের জন্য।

শিক্ষা বিভাগগুলি একে একে সরানো সুরু হইয়াছে। প্রথমেই আংশিকভাবে সরিয়াছে মধুপুরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—যাহা সরাইবার কথা তৃতীয় পর্য্যায়ে পরে, গত ১৭.৮৬৫ তারিখে সরিয়াছে কমার্শিয়াল বিভাগ—(শিয়ালদহ হইতে)। ফলে ধানবাদে আর স্থান নাই। এদিকে বোর্ডের নির্দেশ—প্রথম পর্য্যায়ে যাইবে অপারেটিং কমার্শিয়াল ও আংশিকভাবে সিগন্যালিং বিভাগ (Letter No.62/W2/Sc.3o dt-18-8-63)। তাই এখন ঠিক হইয়াছে যে কিছুদিন পরেই কমার্শিয়াল বিভাগকে আবার শিয়ালদহে ফিরাইয়া আনিয়া এখান হইতে অপারেটিং বিভাগকে ধানবাদে পাঠানো হইবে। এই অযথা ডবল খরচের জন্য দায়ী কে ?

টাকা খরচ হইবে ? 'লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন'। হয়রানি ? কে কার খোঁজ রাখে ?

ধানবাদে শিক্ষকদের পরিবারবর্গসহ থাকিতে হইবে, আর শিক্ষার্থীদের রোজ স্কুলে যোগদান করিতে হইবে।

একমাত্র শিয়ালদহের স্কুলেই গড়ে মাসে ৪১৭ জন ট্রেনিং পাইয়াছেন। শিয়ালদহে ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে ৫৬৭ জন ও মে মাসে ৫৪১ জন শিক্ষার্থী হাজির ছিলেন।

ইঁহাদের বাসস্থান হিসাবে শিয়ালদহে ২৫০ জনের

একটি বোর্ডিং আছে। খানখাদে বোর্ডিং-এর অবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল ত হইবেই না, আরও খারাপ হইবে।

এখানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে ছাত্রদের বাধ্য হইয়া আবাসিক হইতে হইবে, যাহাদের সাধ্যে কুলাইবে। কলিকাতার ছাত্রদের আবাসিক না হইয়াও শিক্ষা গ্রহণের সকল সুযোগই ছিল!

পূর্ব রেলওয়ের কর্তাদের এই খামখেয়ালির জন্ত বহু বহু অর্থ ব্যয় (অপব্যয়?) হইবে কিন্তু তাহাতে কাহার কি আসে-যায়—শ্রীশ্রীগৌরী সেন মহাশয় কর্তাদের তোগলকী অপচয়ের অর্থ যোগাইবেন!

বিগত কিছুকাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করিয়া কলিকাতা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু বিভাগ অযথা এবং অন্তায় ভাবে অন্তত্র সরান হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে আরও হইবে। ইহার কারণ কি—কে বলিবে? তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে—কর্তারা গড়া অপেক্ষা ভাঙার কাজেই বিশেষ উৎসাহী এবং পারগ।

কর্মী কর্মচারীদের অভিযোগ

হাওড়ার কথা বলিতে পারি না, তবে শিয়ালদহ ষ্টেশনের সাধারণ কর্মীরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে শিয়ালদহ ডিভিশনের উচ্চপদস্থ অফিসার—শতকরা প্রায় ৯০জনই বাঙ্গলার লোক নহেন, এবং রেলের কর্মচারীদের সহিত ইহাদের ব্যবহার প্রীতিপূর্ণ নহে। ইহাও দেখিয়াছি যে, ষ্টেশনে যখন যাত্রীদের সহিত রেলকর্মচারীদের বিবাদ-হাঙ্গামা ঘটে—সেই সময় সাহসী অফিসারগণ অকুস্থলে হাজির হওয়া ত দূরের কথা, তাঁহারা কোথায় যে থাকেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। মজার কথা এই যে—হাঙ্গামা মিটিবার পর এই অফিসারগণই কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে দ্বিধা-বিলম্ব করেন না। অফিসারদের মতে ষ্টেশন ষ্টাফ নাকি অতিশয় 'ট্যাক্টলেস'—ইঁহারা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনিবার টেক্‌নিক্ বা কৌশল জানেন না! এ-বিষয় অধিক কিছু না বলিয়া এইটুকুই শুধু বলিব যে -মারমুখি বিক্ষুব্ধ জনতার সামনে আসিয়া বীর অফিসারগণ যদি কর্মচারীদের অবস্থা আয়ত্তে আনিবার টেক্‌নিক্ হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন, ভাল হয়। ইহা করিলে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কার্য্যকরী শিক্ষাও অফিসাররাও লাভ করিতে পারেন।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিকল্পনা

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন "অভ্যুদয়" পত্রিকায় উপরি-উক্ত শিরোনামায় কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করিয়াছেন। সত্যবাবু বলিতেছেন:

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় মাঝে মাঝে বিবৃতির মাধ্যমে প্রচার করেন যে, পশ্চিম বাংলায় ভারী শিল্পের পরিবর্তে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনই অধিকতর সুসঙ্গত ব্যবস্থা এবং সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে এই ধরনের পরিকল্পনাসমূহ বিচার-বিবেচনা করিতেছেন এইরূপ আভাসও তিনি দিয়া থাকেন। বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে জনসংখ্যার বাহুল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বেকার সমস্যা সমাধানের পক্ষে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচলন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করার জন্ত তিনি ধন্যবাদার্হ।

আধুনিক পরিকল্পনার যুগে উন্নয়নের অর্থই হইল ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা—তাহাতে লোক বেকারই হউক আর যাহাই হউক না কেন,—সেদিকে লক্ষ্য দিবার মোটেই প্রয়োজন নাই—এইরূপ একটা ধারণা প্রতির অপপ্রয়াস প্রথম পরিকল্পনার সময় হইতেই লক্ষ্য করা যাইতেছিল। স্থান কাল পাত্রের কিছু বিচার নাই—যাহা কিছু বৃহৎ—তাহাই অগ্রগতির লক্ষণ ইহাই ছিল পরিকল্পনার নীতি। মুখে ক্ষুদ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেও কার্য্যক্ষেত্রে বৃহত্তের সমাদরই বেশী। তাই আমরা দেখি—বৃহৎ বৃহৎ নদী-প্রকল্প যত প্রাধান্য পাইয়াছে, ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা ততখানি অনাদৃত হইয়াছে। বৃহৎ কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্ত যত অধিক পরিমাণ অর্থব্যয় করা হইয়াছে, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি তত নজর দেওয়া হয় নাই। বরং বৃহৎ শিল্পের খাতিরে ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংসেরই প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে। বড় বড় চাউলের কল বসাইয়া ঢেঁকির সর্বনাশ সাধন ও পল্লীবাসীকে বেকার করা, সুতা ও কাপড়ের কল বসাইয়া চরকা ও তাঁতের সর্বনাশ করা, তেলের কল ও চিনির কল বসাইয়া ঘানি ও গুড় শিল্পের ধ্বংস সাধন করা ইত্যাদি বৃহৎ কর্ম ক্ষুদ্রকাজে নিযুক্ত লোকের

কেবারি বাড়ানো ব্যতীত আর কার কোন্ মঙ্গল সাধন করিয়াছে? কেহ এইরূপ কাজের সমালোচনা করিয়া প্রতিবাদ করিতে গেলে তাকে অনগ্রসর গরুর গাড়ির যুগের লোক বলিয়া হটাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের নেতৃবর্গের এতাবৎ দৃষ্টি রহিয়াছে বৃহৎ শিল্পের কর্মভূমি আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার দিকে। কিন্তু ভারতবর্ষ যে রাশিয়া বা আমেরিকা নয়, তাহার জনগণের শিক্ষা, দীক্ষা ও স্থানের অনুপাতে লোকসংখ্যা যে ঐরূপ কোন দেশের সঙ্গেই তুলনীয় নয়, সে-কথা আমরা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছি। নদী-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা দ্বারা আমরা শস্য উৎপাদন বাড়াইব বলিয়া প্রচার করিয়াছি কিন্তু কোটি কোটি টাকা জলে ঢালিয়াও এখন পর্যন্ত আমরা খাদ্যশস্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়াই আছি। কিন্তু এতদিন পরে হয়ত আমরা ঠকিয়া (ও ঠেকিয়া) শিখিতেছি তাই আজকাল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখে শুনি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার কথা ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা। পশ্চিম বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও দেখিতেছি নতুন সুরে কথা বলিতেছেন। সরকারের এই (নূতন) দৃষ্টিভঙ্গি খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ক্ষুদ্র শিল্প পরিকল্পনার কথা বলিতে গিয়া বাংলার হস্তচালিত তাঁত শিল্প ও উত্তরবঙ্গের দেশী বাঁশ শিল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি শিল্পের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই: তার মধ্যে কয়েকটি শিল্প খুব সম্ভাবনাপূর্ণ ও অপর কয়েকটি বর্তমানে প্রচলিত থাকিলেও ভবিষ্যতে বৃহৎ শিল্পের আঘাতে জীবন সংশয়াপন্ন হইবার ভাবনায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এক নূতন শিল্পের সম্ভাবনা আছে নারিকেল শিল্পে। পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মাইতেছে—নারিকেলের আমদানীও বাড়িয়াছে। কাজেই এখানে নারিকেল তৈল শিল্প খুব প্রকৃষ্ট প্রতিষ্ঠার সুযোগ রহিয়াছে। বাংলা দেশ ভক্ষ্য তৈলে ঘাটতি রাজ্য। কাজেই এখানে একদিকে যেমন সরিষার চাষ বাড়ানো দরকার, অপর দিকে নারিকেল তৈল শিল্পও প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। নারিকেল তৈল শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে নারিকেল ছোবড়াশিল্পও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। বর্তমানে এই দুইটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে আপন আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রয়োজন খানিকটা মিটিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্রই একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা পশ্চিম জার্মেনীর সহায়তায় নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ হইতে রবারযুক্ত কয়েরের গদি ইত্যাদি তৈরির আয়োজন চলিতেছে। এই কারখানার জন্য প্রচুর পরিমাণে নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ প্রয়োজন হইবে। এখন হইতে সরকারী প্রচেষ্টায় ও আর্থিক সহায়তায় নারিকেল ছোবড়ার আঁশ তৈরির ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হইলে অনেক লোকের কাজের সংস্থান হইতে পারে। সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আরও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ছোবড়ার শিল্প ভালভাবে গড়িতে গেলে তৈল শিল্পেরও প্রতিষ্ঠা দরকার। দুই পরিকল্পনা না হইলে এই কাজে সাফল্য সম্ভব নয়।

হস্তচালিত তাঁত শিল্পের প্রসারের জন্য সরকার প্রধান সুতাকল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি হস্ত-চালিত তাঁতের ক্ষেত্রে যে শক্তিচালিত তাঁতের প্রসার লাভ করানোর চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে কি হস্তচালিত তাঁতের ক্ষতি হইবে না—লোক কি তাহাতে বেকার হইবে না? কাপড়ের কলকে বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া শক্তিচালিত তাঁতে রূপান্তরিত করিলে ক্ষতি কি? কিন্তু হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে শক্তিচালিত তাঁতের অনুপ্রবেশ অনেকটা "সোনার পাথর বাটি"র মত শোনায় না কি? এইরূপ নীতিগত অসামঞ্জস্যই অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করে।

উন্নয়নের নামে আর একটি সরকারী প্রচেষ্টা মালদহে "স্পান সিল্ক মিল" বসানোর প্রস্তাব। পশ্চিম বাংলার মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশমের যে ছাটরেশম সুতা তৈরির উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায় তাহা একটা লাভজনক কল পরিচালনার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। অথচ মালদহ ও মুর্শিদাবাদে রেশমের কাটা গুটি ও ছাট হইতে সুতা কাটুনীর সংখ্যা প্রায় ২০,০০০। মালদহে ছাট হইতে সুতা পাকানোর কল—"স্পান সিল্ক মিল" বসিলে এই সমস্ত কাটুনী বেকার হইবে অথচ কলে কাজ পাইবে ঊর্ধ্ব পক্ষে ২০০ শত লোক। এমতাবস্থায় রেশমের ছাট হইতে সুতা কাটাই কল বসানোর পক্ষে কোনও যুক্তি থাকিতে পারে না—যখন সরকার সাহায্যেই সমস্ত

হাতে কাটাই করার সুযোগ রহিয়াছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রথমে তিন হাজার টাকু-সম্বলিত কল চালানোর প্রস্তাব করেন। লাভজনক করিতে হইলে উহা অন্ততঃ দুই শিফ্‌টে চালু করা প্রয়োজন। কিন্তু পর্য্যাপ্ত কাঁচা মাল পাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় এবং সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডও আশঙ্কা প্রকাশ করায় সরকারী কর্তৃপক্ষ দিনে এক দফায় কল চালু রাখার প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহাতেও আপত্তি হওয়ায়, এখন ১৫০০ টাকুর কল চালাইবার কথা বলিতেছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। উক্ত কলে লাভের সম্ভাবনা ত নাই বরং আর্থিক ক্ষতিরই সমূহ সম্ভাবনা—তথাপি রেশম শিল্পের উন্নয়নের নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐরূপ কল বসাইবার পক্ষপাতী। এদিকে হাতের সুতা কাটাইবার জন্য যে সমস্ত চরকা চালু হইয়াছে তাহাদের উৎপন্ন সুতায় প্রস্তুত কাপড়ের চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িতেছে দেশে এবং বিদেশে। তাহাতে অনেক লোকের কাজও জুটিতেছে। কিন্তু সরকারের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার" জন্য তারা উদ্‌গ্রীব! কাটুনীদের বেকার করিয়াও অলাভজনক কল বসাইতেই হইবে—নইলে তথাকথিত উন্নয়ন ব্যাহত হইবে!

ক্ষুদ্র শিল্পের উৎসাহদাতা বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি যেন এদিকে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে—যাহাতে এই সব অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী না হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে যে সমস্ত পল্লীবাসী এই ঘোরতর অর্থ সঙ্কটের দিনে অবসর সময়ে কাজ করিয়া সংসারের অভাব কিছু পরিমাণে মিটাইবার প্রয়াস করিতেছে, তাহাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইবার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ উদ্যত না হন ও সাধারণের অর্থের অপচয় করিয়া না বসেন।—

বর্ত্তমান অবস্থায় বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অতীব জরুরী এবং এদিকে কর্তৃপক্ষের সতর্ক-দৃষ্টি অবশ্যই আশা করা যায়। খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বাংলার কুটীরশিল্পের উন্নয়নে বহু মূল্যবান সাহায্য-সহযোগিতা দান করিতে পারেন। আচার্য্য রায় এবং মহাত্মা গান্ধীর সহকর্মী হিসাবে সতীশবাবু কুটীরশিল্প বিষয়ে বহু মূল্যবান জ্ঞান ও তথ্য প্রভৃতির অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অনুরোধ করিলে সতীশবাবু কখনই 'না' করিবেন না।

কেবলমাত্র রেডিওতে কুটীর এবং অন্যান্য শিল্প বিষয়ে 'টক্' প্রচার করিয়া কোন লাভই হইবে না, কাহারও, একমাত্র 'টকারের' ছাড়া। সরকারী বেতনভুক কুহ-নাহি এবং হাক-বাজা তথাকথিত এক্সপার্টরাও কাজের কাজ বিশেষ কিছুই আজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই, যদিও করদাতাদের অর্থশ্রাদ্ধ কম হইতেছে না।

সময়োচিত আবেদন

আসানসোলের 'জি. টি. রোড' সাপ্তাহিক (২২-৯-৬৫) লিখিতেছেন—

সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ইংরাজ তাড়াও

—ভারতের সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে অবিলম্বে ইংরাজ তাড়াইতে হইবে। ইহারা যে ভারতের বন্ধু নহে তাহা গত ভারত-পাক সংঘর্ষে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে ব্রিটিশ সরকারকে আমরা ভারত-বন্ধু ভাবিতাম সেই ব্রিটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর এই যুদ্ধের ভূমিকা সম্পূর্ণ ভারত-বিরোধী। সমস্ত ব্রিটিশ সংবাদপত্র একজোটে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে অবতীর্ণ হইয়াছে। এমন কি বি. বি. সি. শ্রীশাস্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়াছে। ভারতের ন্যায্য প্রাপ্য অস্ত্র যাহা নগদ মূল্যে লওয়া হইতেছিল ভারতকে কাবু করিবার জন্য সে অস্ত্র ভারতের বিপদের সময় সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেন যে সকল অস্ত্র দিয়াছে তাহা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে কি না তাহা ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে দিয়া তদন্ত করান হইয়াছে অথচ ভারত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে যে চীনের বিরুদ্ধে যে সকল অস্ত্র রহিয়াছে তাহা কখনও কোথাও ব্যবহার করা হয় নাই।

ভারতের লোকের ইংরাজকে (আর) বিশ্বাস করা কঠিন। যে সকল কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে তাহারা নিযুক্ত আছে, যে কোন সময় তাহারা ক্ষতি করিয়া দিতে পারে। যে সকল কারখানায় ইহারা প্রধানরূপে বিরাজ করিতেছে সেখানে ভেদনীতি প্রয়োগ ইহাদের একমাত্র কাজ। ইহাদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া দেশকে নিঃস্ব করা ছাড়া আর কিছু নহে।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজ না হইলে আমাদের অচল হইয়া যাইতে পারে তাহা অত্যন্ত ভ্রম। ইহারা যন্ত্র শিল্পে অত্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পী প্রমাণিত হইয়াছে। ইংরাজ ছাড়া আমাদের পরিকল্পনা আদৌ ব্যাহত হইবে না। যদি বৈদেশিক যন্ত্রবিদ্‌দের প্রয়োজন হয় তবে জাপান পূর্ব্ব জার্ম্মানী, রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়ার দ্বারস্থ হওয়া অনেক শ্রেয়ঃ।……

ইংরাজ ভারতের চিরশত্রু। ইংরাজ এখনও ভাবিতে অভ্যস্ত ভারত তাহাদের তাঁবেদার দেশ। ইহা আর কাহারও কথা নহে। স্বয়ং ভারতের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ভগ্নী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ইংলণ্ডে হাই কমিশনার থাকাকালীন তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লোকসভায় ঘোষণা করিয়াছেন। ইংরাজের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ছড়াইতে হইবে, ইহাদের ভারতে বাস ও বৃত্তি অসম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই ইহারা পলাইতে বাধ্য হইবে। ইহাতে কোন শঙ্কা থাকা উচিত নহে। ইহার নজির পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়াছে। করাচীতে মার্কিন দূতাবাস লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও আমেরিকা পাকিস্তানের কেশাগ্র স্পর্শ করে নাই। ইংরাজ বিতাড়ন এখন ভারতের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হওয়া উচিত।—

জি. টি. রোডের এই মন্তব্যে (তোড়, একটু বেশী হইয়াছে।) আমরা পুরাপুরি সায় দিতে পারিব না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই মন্তব্য প্রকাশ করিলাম এই কারণে যে, ইংরেজদের সম্পর্কে দেশের লোকের ধারণা কি হইয়াছে—তাহারই কিছু পরিচয় দিবার জন্যই। বলা বাহুল্য ইহার জন্য দায়ী ব্রিটিশ সরকার, ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা এবং বি. বি. সি.।

আমাদের দেশে এখনও এমন বহু পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ইংরেজ জাতি সম্পর্কে অতি অস্বাভাবিক এক শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করিয়া থাকেন এবং মনে করেন যে, ইংরেজ ছাড়া ভারতবর্ষের কখনও চলিবে না। দেশের যাহা কিছু শ্রেয়, কল্যাণকর এবং জাতির উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন সবই ইংরেজের দয়ার দান! এ-ধারণা যে কত ভুল তাহা এবার প্রমাণিত হইল। শ্বেতাঙ্গ হইলেও ইংরেজের মন যে অতীব 'কুকাজ' তাহাও এখন দেখা যাইতেছে!

পশ্চিমবঙ্গে—বিলাতি ব্যাঙ্ক-এর দান!

সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কলিকাতাস্থিত কয়েকটি ব্রিটিশ-ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পাকিস্তান শাখা মারফত পাকিস্থান প্রতিরক্ষা খাতে কয়েক লক্ষ করিয়া অর্থ সাহায্য দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই উদার খয়রাতি বিলাতি কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পৈতৃক তহবিল হইতে দান করেন নাই, করিয়াছেন এই ভারতীয়দের জমা টাকার আয় হইতেই। কলিকাতার বিলাতি ব্যাঙ্ক-গুলি যদি সমান ভাবে এবং হারে—ভারত-পাক প্রতি-রক্ষা খাতে টাকা দিতেন (পাকিস্তানের শাখাগুলি পাকিস্তানে এবং ভারতীয় শাখাগুলি ভারতে) তাহা হইলে হয়ত ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হইত না—কিন্তু হঠাৎ ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলির কলিকাতা শাখার কর্তারা বাঁকা পথে পাকিস্তানের প্রতি এমন আর্থিক দরদ দেখাইলেন কেন, বুঝা কষ্টকর নহে। আলোচ্য ব্যাঙ্কগুলির এই বিষম পাক্-প্রীতিতে ব্যাঙ্কের ভারতীয় কর্মচারী মহলে একটা অসন্তোষ দেখা দিয়াছে এবং কর্মচারী সংঘ কি ভাবে এই ব্রিটিশ বেয়াদবি সায়েস্তা করা যায়, সে-বিষয় নাকি চিন্তা করিতেছেন।

পাক-ভারত যুদ্ধকালে ভারতস্থিত কোন ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্থা আজ পর্য্যন্ত ভারতের পক্ষে একটিও সত্য কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে নাই—যদিও প্রত্যেকটি ইংরেজ জানে যে পাকিস্তানই গায়ে পড়িয়া এই যুদ্ধ বাধায়। কিন্তু সব কিছু জানিয়া-শুনিয়াও শ্বেতাঙ্গ সাহেববৃন্দ নীরব থাকিয়া, তলে তলে পাকি-স্তানের পক্ষে বহুপ্রকার পরোক্ষ প্রচার এবং সাহায্য ব্যবস্থাদি চালাইয়া যাইতেছেন—এমন কথা শুনা যাইতেছে। এ-বিষয় আলোচনা অন্যত্র করা হইতেছে—বর্ত্তমান নিবন্ধে আমরা এইটুকুই বলিতে চাই যে, যে-সব পশ্চিমবঙ্গবাসী (বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী) এখন ব্রিটিশের কৃপা-কণার জন্য লালায়িত এবং শ্বেতাঙ্গ মোসাহেবী করিতে পারিলে নিজেদের চৌদ্দ পুরুষকে গৌরবান্বিত মনে করে, তাহাদের সংযত সংহত হইবার সময়

উপস্থিত। এই শ্রেণীর লোকেরা যদি নিজেদের সংযত করিতে না পারে, তাহা হইলে অগত্যা দেশের অন্য লোকদেরই এই 'চিকিৎসা'-ব্যবস্থা বিধিমত প্রয়োগ করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছে ইংরেজ অন্যায় করিলে, ইংরেজই (সংখ্যায় খুবই কম) তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু এবারে দেখা গেল যে ভারতের পক্ষে সত্য কথা বলিবার মত একজনও ব্রিটিশ নাই (গ্রিগ নামক এক সাংবাদিক ছাড়া)। এমন কি পৃথিবীর সকল অন্যায় নীতি এবং ক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে-দার্শনিক প্রবর (লর্ড রাসেল) তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, সেই লর্ড রাসেলের এখন চোখে এবং মনে হানি পড়িয়াছে। আক্রান্ত ভারতের পক্ষে লর্ড রাসেল কি বলিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছেন না ?

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী-কোন্দল

কয়েকদিন (৯-১০-৬৫) পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বৃহৎ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন :

"কোন কোন কংগ্রেস নেতা দলের নাম ভাঙিয়ে দুর্নীতির সাহায্যে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করছেন। তিনি ঐ অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চান। এটাই তাঁর মতে প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের আপোষের পথে অন্তরায় বাধা।

"ধনী পুঁজিপতিদের কাছ থেকে দলের নাম করে যে চাঁদা আদায় করা হয় কোন ক্ষেত্রে তার কিছুই পার্টি তহবিলে জমা পড়ে না, কোন ক্ষেত্রে কিছু অংশ জমা পড়ে এমন সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

কতজন কংগ্রেসী এই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তা জানিতে চাওয়া হইলে অজয়বাবু উত্তর দেন—'অনেক'।

বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ, বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলার কোন কোন ঘটনা কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের গোচরে আনা হইয়াছে বলিয়াও তিনি জানান। সম্প্রতি দিল্লী সফরকালে শ্রীমুখোপাধ্যায় কংগ্রেস সভাপতিকে বলিয়া আসিয়াছেন যে, এ. আই. সি. সি'র দপ্তরে এই ধরনের অনেক অভিযোগ অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

শ্রীমুখোপাধ্যায় আরও বলেন যে—উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কোন কোন নেতা তাঁহাদের সীমাবদ্ধ রোজগার সত্ত্বেও এমন বিলাসবৈভবের মধ্যে দিন কাটান যাতে জনমনে নানা প্রশ্ন জাগে। ইঁহারা কংগ্রেসের এবং সরকারের নাম, সম্মান, মর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা ভাঙিয়ে নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসাধন করেন। এঁদের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ —রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক।

বিদেশী আক্রমণ-জনিত দুঃসময়ে রাজ্যের নেতৃত্ব জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন—এই মন্তব্য করিয়া শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন যে, এই অবস্থায় যে-কোন "সৎ ও আন্তরিকতাসম্পন্ন নেতৃত্ব" দেশপ্রেমিক জনতার ব্যাপক সমাবেশ সম্ভব করিতে পারিত।

ইহার পূর্ব্বেও এই রাজ্য-কংগ্রেস সম্পর্কে বহু প্রকার সমালোচনা এবং কুৎসিত ইঙ্গিত সংবাদপত্রে এবং সাধারণে প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেস ভাগ্যবিধাতা সবই তুচ্ছ করিয়াছেন। এমন কি এই সর্ব্বশক্তিমান 'প্রায়-পরমেশ্বর' বিধাতা পুরুষ কংগ্রেসের বি-টিম্ কলিকাতা কর্পোরেশনকেও এক অতি দুর্গন্ধময় নরকে পরিণত করিতেও দ্বিধা-সঙ্কোচ-লজ্জাবোধ করেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে যে কেহ কংগ্রেসকে কলঙ্কমুক্ত চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহাকেই কংগ্রেস ত্যাগ করিতে হইয়াছে বাধ্য হইয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ—কৃপালনী, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘ ৪৫ বছরের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীমুখোপাধ্যায় জানান যে, তিনি নিজে কংগ্রেস ছাড়িয়া যাইবেন না। তবে তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্মীদের কংগ্রেস হইতে 'দূর করিয়া' দেওয়া হইলে তিনি পরবর্ত্তী কর্মপন্থা স্থির করিবার কথা ভাবিবেন।

আমাদের মতে শ্রীমুখোপাধ্যায় অবিলম্বে তাঁহার পরবর্ত্তী কর্মপন্থা স্থির করুন, কারণ কংগ্রেসে আর তাঁহার স্থান হইবে না। কেবল তাঁহারই নহে—সৎ,

স্বাধীনচেতা এবং ভারধর্মী বিবেক-বিচারযুক্ত ব্যক্তির পক্ষেই কংগ্রেসের দ্বার রুদ্ধ হইবে।

দেশের ট্র্যাফিক আইনে বলে, 'Keep to the Right'—কংগ্রেসের ট্র্যাফিক আইনে 'Never keep to the Right' (যদি উন্নতির পথে বেশী দূর যাইতে চাও!)

অবিভক্ত বাঙলা

১৯৪৭ সালের মে মাসে—সুরাবর্দীকে লেখা মহাত্মাজীর একখানি পত্রের সারাংশ কয়েকদিন পূর্বে এক দৈনিক পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে—পত্রখানি এইরূপ:

> দেশ বিভাগের ব্যাপারে বাংলা দেশের অবস্থা যে গুরুতর আকার নিয়েছে, তা আমি স্বীকার করি। আপনি যদি আপনার কথায় পুরোপুরি আন্তরিক হন—আপনার সম্পর্কে আমার সব সন্দেহ যদি মোচন করেন এবং অহিংস উপায়ে আপনি যদি বাঙালীদের (হিন্দু ও মুসলমানের) জন্য বাংলা দেশ অবিভক্ত রাখেন, আমি তা হ'লে আপনার অবৈতনিক ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী। হিন্দু ও মুসলমানরা একে অন্যের ভাই। তাঁরা যত-দিন না ভাইয়ের মত বাস করতে আরম্ভ করছেন, ততদিন আমি আপনার বাড়ীতেই থাকব।
>
> আপনার বিশ্বস্ত
>
> এম. কে. গান্ধী

এই সময় সুরাবর্দী সাহেব তাঁহার দলীয় এম. এল.এ. মৌলভী আবদুল হাসেমের মারফৎ গান্ধীজীর নিকট এক অবিভক্ত স্বাধীন বাঙলার প্রস্তাব পাঠান। যতদূর মনে পড়ে শ্রীশরৎ বসুও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ঐ সময় তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা জাগে যে, বাঙলা বিভক্ত হইলে—পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে যাইবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব বাংলাকে শাসন করিবে এবং সর্বভাবে পদানত রাখিবে। বলা বাহুল্য, সেই আশঙ্কা আজ নির্মম বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

দীর্ঘ ১৭ বছর পরে আজ পূর্ববঙ্গবাসীদের পক্ষ হইতেই স্বাধীন পূর্ব বাংলার দাবি উঠিয়াছে এবং এই দাবি ক্রমশঃ দানা বাঁধিতেছে।

এদিকে অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র আগরতলার সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে এক "বিপ্লবী পরিষদ" গঠিত হইয়াছে এবং ঐ "বিপ্লবী পরিষদ" জন-সাধারণকে ভারতের সঙ্গে সকল প্রকার সংঘর্ষ হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, "বিপ্লবী পরিষদ" এক পুস্তিকা মারফৎ তাঁহাদের ঐ বক্তব্য প্রচার করিয়াছেন।

সংবাদে আরও প্রকাশ যে, পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুববিরোধী কিংবা পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন দমনের জন্য বহু ছাত্র ও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিপ্লবী পরিষদের ঐ প্রচার পুস্তিকাতে বলা হইয়াছে, "তথাকথিত স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের কায়েমী স্বার্থবাজরা পূর্ব পাকিস্তানে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক হানা-হানি বিস্তারে যথাসাধ্য চক্রান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা আয়ুব-চক্রকে পূর্ব পাকিস্তান ধ্বংস করিতে দিতে পারি না এবং যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা হইলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিব।"

উপরি-উক্ত সংবাদ কতখানি সত্য তাহা এখনও বলা যায় না, তবে 'ভাল খবরের ঝুটাও ভাল'।

ব্যক্তিগত ভাবে বহু পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান (বাঙালী) বন্ধুদের সহিত আলাপ-আলোচনায় তাঁহাদের মতামত উপরি-উক্ত সংবাদ যে একেবারে মিথ্যা নয় তাহা বুঝা যায়। পশ্চিমী পাকিস্তানীদের অত্যাচার-অবিচারে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু এবং মুসলমানের জন-জীবননাভিশ্বাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে না বলিয়াই পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে বাধ্য হয়। আজ আমাদের কর্তব্য কি তাহা প্রকাশ করিয়া বলার প্রয়োজন আছে কি?

সরকারী ভাবে না হউক বেসরকারী ভাবে আমরা পূর্ববঙ্গের বাঙালীদের জন্য আজ বহু কিছু করিতে পারি এবং করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। পাকিস্তান যেমন ভাবে নাগাদের ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্রাদি দান

করিয়া উকালি দিতেছে, তাহার পাল্টা আঘাত হানিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান ভাইদের অন্ত রাজ্যের সীমানার চোরাপথে সর্বপ্রকার অস্ত্রাদি প্রেরণ করা সহজ—এমন কি এই কার্য্যে প্রয়োজন হইলে 'চোরা-কারবারীদের' সহযোগিতা লাভ করাও কঠিন বা অসম্ভব হইবে না।

প্রসঙ্গক্রমে সীমান্ত গান্ধীকেও আমরা যথেষ্ট সাহায্য দান করিতে পারি, স্বাধীন পাখতুনীস্তান স্থাপনের কার্য্যে। ইহাও বেসরকারী ভাবে করা যায় এবং পশ্চিমবঙ্গও এই সাধু-উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সাহায্য দিতে পারে বাদশা খাঁকে। মোট কথা এই যে, পাকিস্তানকে যত রকমে এবং যে-ভাবে পারা যায় নাস্তানাবুদ করিতেই হইবে। 'গুলী বন্ধ' হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম সীমান্তে ক্রমাগত ছিঁচকে গুলী চালাইয়া যাইতেছে খুশী-খেয়ালমত। ইহার প্রতিরোধ করিতে হইলে অবিলম্বে আমাদেরও ইটের বদলে দু'তিন গুণ পাটকেল মারিতে হইবে। পাকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে সায়েস্তা করিতে হইলে তাহাদের পশ্চাতে চাবুক মারা ছাড়া অন্ত উপায় নাই। চোরাকে ধর্মকাহিনী শুনানো বৃথা!

'বানান-সংহার'

'যুগবাণী'তে প্রকাশ:

"—আনন্দবাজার পত্রিকা বানান সংস্কারের নামে যে কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন তাহার তাল দেখা যাইতেছে তাঁহারাই সামাল দিতে পারিতেছেন না। অসংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষর ভাঙ্গিতে হইবে—এই নিয়ম মতে পাকিস্তান পাকিসতান করিতে হয়। একদিন দেখিলাম তাহা করা হইয়াছে। পরদিন সেই যে হোঁচট খাইয়া আবার পাকিস্তান সুরু হইল সেই পাকিস্তান এখনো চলিতেছে। চন্দ্রবিন্দুও এঁদের কাছে যুক্তাক্ষর পর্য্যায়ে পড়িয়াছে এবং প্রথম পৃষ্ঠার হেডিং-এও খাঁটি খাটিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এবার চাঁদ দেখিবার অপেক্ষায় আছি। আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রণ সুবিধার জন্ত ব্যাকরণ ও বানান শিকায় উঠিয়াছে, এবার উচ্চারণও বদলাইতে হইবে।...

"পৃথিবীর কোন দেশ ভাষা নিয়া এরূপ ছেলেখেলা সহ্য করে বলিয়া শুনি নাই। ভাষাতত্ত্ববিদ এবং সাহিত্যিকের বদলে ছাপাখানার ম্যানেজার বানান ও ব্যাকরণ সুবিধামত বদলাইতে পারিবেন এই অধিকার সম্ভবতঃ একমাত্র বাঙ্গলা সংবাদপত্রেই, তাহাও উঁহার একটি মাত্র অংশের দ্বারা দাবী করা হইয়াছে।...

"ত্রিশ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় যে বানান সংস্কার করেছিলেন তাতে শব্দের 'অনাবশ্যক দ্বিত্ব' বর্জনের সুপারিশ করা হয় নি, মূলত বিকল্পে দ্বিত্ব ব্যবহারের প্রথাটিকে বিকল্প না রেখে পাকাপাকিভাবে তুলে দেওয়ারই প্রস্তাব করা হয়েছিল। কাজেই সে সব শব্দের দ্বিত্বহানির প্রশ্নই ওঠে না।

"শুনেছি, চন্দননগর সাহিত্যসভায় অধ্যাপক সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে 'গরু' শব্দের বানান 'গোরু' প্রচলিত করার জন্ত বলেছিলেন। কবিগুরু জানতে চেয়েছিলেন, কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ বৃদ্ধি হবে কি না। তাছাড়া, তিনি বলেছিলেন, সহজ করতে গিয়ে বানানের বংশ পরিচয় যেন হারিয়ে না যায়: কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা জানিয়েই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁদের বানান সংস্কার মেনে নেওয়ার ফলে 'কার্তিকে'-এর বংশ পরিচয় (কৃত্তিকা+ক) খুঁজে বের করা প্রায় সাধ্যাতীত, যদিও 'সূর্য্য' 'পূর্ব'বৎ তারা এবং 'সংগীত' বিন্দুমাত্র 'মাধুর্য' হারায় নি।...

"যেহেতু "বহু 'গঁ্যাজা'র 'ধোঁকা' খেলে 'আফ্রিকাটা' বেড়ার আড়ালে হাতে 'জাফ্রান' মাখতে মাখতে 'ফুঁকে' কেঁদে উঠল"—এরকম লিখি না, অতএব লিখব আফরিকার উগানডা, জানজিবার ও টাংগানায়িকা ভ্রমণ শেষ করে স্বদেশে ফিরে এসে এক বিরাট পার্টি দেন বোমবাই-এর রুসতমজী। ভোজসভায় প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিসটার রবার্ট শারপসটন। সভাশেষে রুসতমজী জানান যে, তিনি কলকাতার পারমানেন্ট মেসে ইসটারন রেলওয়ের লস্ট প্রপারটি ডিপারটমেন্টে সেক্রেটারির চাকরি পেয়েছেন।—এ ধরনের যুক্তি শুনলে মনে হয় যেহেতু বিবাহবাসরে মৃদঙ্গ বাজানো হয় না, অতএব শ্রাদ্ধবাসরে ঢাক বাজানোয় আপত্তি কেন?

"লণ্ডনকে লনডন পড়ার কোন যুক্তি নেই ঠিক। কিন্তু তার সপক্ষে 'বার বার'-কে বারো বারো

পড়ি না বলা নিতান্ত যুক্তিহীন। বার বার একটা শব্দ নয়—বারংবারম্ বা বারংবার শব্দকে সহজ করে লেখা হয়েছে।

"'শিকদার, মেঘনাদ অথবা বীরচন্দ্র' শব্দে যদিও ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে মধ্যাক্ষরে হসন্ত উচ্চারণ হয়, ব্যাকরণের ঐ সূত্রই তো আবার প্রায় সমান সংখ্যক বা ততোধিক শব্দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। (উদাহরণ: হলধর, গণপতি, জনগণমন, বলরাম, ভোগবতী ইত্যাদি)।

শব্দের সরলীকরণ খুবই ভাল—যদি সকলে একযোগে করেন। ছেলেমেয়েরা পাঠ্যপুস্তকে বানান দেখবে একরকম, আর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখবে আরও পাঁচ রকম। কিন্তু কোন্‌টা অনুসরণ করবে?"

স্থানাভাবের কারণে প্রবন্ধের সামান্য অংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

কেবলমাত্র আনন্দবাজারকে দোষ দিয়া লাভ নাই। অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকাও গত কিছুকাল হইতে বাঙলা শব্দের বানানে বিচিত্র কেরামতি দেখাইতেছেন। এ-বিষয়ে নদী-বিশেষের পার হইতে আগত এক শ্রেণীর লেখকই বোধ হয় পথপ্রদর্শক। এই সকল মহাশয় মহাজনদের প্রদর্শিত পথে আজ বহু লেখকই ছুটিয়াছেন!

পূর্বে আমরা পড়িতাম 'ডেলি'-পেপার, এখন পড়িতে হইতেছে 'ডেইলি'-পেপার। আগে ট্রেনে চড়িয়া ট্রেনিং লইতে যাইত বহুজন—এখন তাহাদের যাইতে হয় 'মেইল ট্রেইনে'চড়িয়া ট্রেইনিং লইতে। পূর্বকালে জামা করাইবার জন্য যাইতে হইত 'টেলার'-সপে—বর্তমানে যাইতে হইবে 'টেইলার'-সপে! কত উদাহরণ দিব? স্থানে কুলাইবে না। চিরকাল জানিয়াছি, দেখিয়াছি—'সাথে' কথাটি পদ্যে এবং কবিতায়, সদে খাপ খায়, অধুনা দেখিতে পাই, "গদ্যে (কথায় এবং রচনায়) 'সাথে'—'সঙ্গে'কে পথহারা করিয়া তাহার অবস্থা সঙ্গীন করিয়াছে!

পত্রিকা বিশেষে দেখিতেছি—'পারটিতে'বলিয়া একটি কথা, কষ্ট করিয়া জানিলাম, উহা 'পার্টিতে', শব্দের সহজ সংস্করণ। 'বানবরাজ' কি বলিতে পারেন? মান্দ্রাজের নবরূপ!—বোম্বাই এখন বম্বরূপ করিয়া হইয়াছে 'বমবাই'। 'চারচিলের লনডন ভবন' কি? 'বাউমতে' কথার মানে কি?

এ-বিষয়ে পণ্ডিতেরা সম্যক্ আলোচনা করিবেন। আমাদের এখানে নিবেদন এই-যে, দুইটি সর্বাধিক প্রচারিত বাঙলা দৈনিকের মানের বানান অবিলম্বে করা হউক (১) 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং (২) 'যুগান্তর'।

বারান্তরে আমরা নব-বাঙলার নব-বানানের আরও কিছু নমুনা দিবার চেষ্টা করিব।

'এঁরাও কি ঘুষ খান?'—মুখ্যমন্ত্রী

'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশ:

—কৃষ্ণনগর, ১১ অকটোবর—রাস্তার দু' পাশে সারি সারি পুলিশ আর মাঝখান দিয়ে চোরাকারবারীরা চাল নিয়ে যাচ্ছে। হুলিয়ার একটি অনুষ্ঠানে যাবার সময় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। হুলিয়ার এক জনসভায় তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'অন্তত পাঁচশো মণ চাল এই দিনের আলোয় পাচার হয়ে গেল, আমি দেখতে পেলাম অথচ পুলিশ দেখতে পেল না।' এই সময় জনতার মধ্যে থেকে 'শেম' 'শেম' ধ্বনি শোনা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন আরও উত্তেজিত হয়ে বলেন, এখানে জেলা শাসক রয়েছেন, পুলিশ সুপার রয়েছেন, পুলিশের বাহিনী রয়েছে তাঁরা কি অন্ধ? নিশ্চয়ই কেউ ঘুষ খায়। আমি বলব এরাও পাকিস্তানী চর। শ্রীসেন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'অবস্থা দেখে মনে হয় নদীয়ায় কোন শাসনব্যবস্থা নেই। এখন আমাকে সচেষ্ট হয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

পরে তিনি জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে ডেকে বলেন, ওই পাঁচশো মণ চাল যে করেই হোক ধরা চাই।

খবর নিয়ে জানলাম, রেশনে এ মাসে হুলিয়া অঞ্চলে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। মাথাপিছু গম মেলে ৭০০ গ্রাম হিসাবে। চাল পাওয়া যায় ১টা ৩০ পয়সা কিলো দরে, একমাত্র কালোবাজারে।—

সামান্য ব্যাপারে শ্রীসেন এত চটিলেন কেন? আজ হঠাৎ দিব্যদৃষ্টি মেলিয়া তিনি যাহা দেখিলেন বহুদিন যাবৎ তাহা ঘটিতেছে এবং মন্ত্রীমহোদয়গণ ছাড়া পশ্চিম-

বধের আর সবাই তাহা জানে, হাড়ে হাড়ে জানে। বেশীদূরে যাইতে হইবে না, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের বৃহৎ সরকারী দপ্তরখানার সিমেন্ট এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত বস্তু লইয়া প্রকাশ্যে যে লেনদেনের খেলা কতদিন ধরিয়া চলিতেছে, তাহার বিষয় কি মুখ্যমন্ত্রী কিছুই জানেন না? যদি না জানেন তাহা হইলে বলিব নিশ্চয়ই তিনি সাধু-সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষ। মানুষ যে খারাপ হইতে পারে তাহা তিনি চোখে দেখিলেও চোখের ভ্রম বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভাল লোক সকল মানুষকেই ভাল ভাবেন—এই আর কি!

আমাদের বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সাধুতা এবং বিশ্বাসপ্রবণতার পূর্ণ সুযোগ লইতেছে কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলের বিশেষ রাজ্যের ব্যবসায়ীরা। ইহারা কাতরভাবে হুজুরে নিবেদন করিল—হুজুর সরষে নাই, যে আসে উসকো দাম বড়্তো চড়া! দুঃখীর দুঃখে বেদনায় হুজুর গলিয়া গেলেন এবং সরিষার তৈলের দাম কিলো-প্রতি এক লাফে ১০০।২৫০ পয়সা বর্দ্ধিত করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার হাজার হাজার সরিষার তেলের টিন মুদির দোকানে দেখা গেল। মৎস্য, মাংস, মসলাপাতির দামও এইভাবে ধাপে ধাপে চড়িয়া আজ আকাশচুম্বী হইয়াছে!

প্রসঙ্গক্রমে একটা সত্য কথা বলায় দোষ হইবে না। দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটময় অবস্থায় সাধারণ লোক দেশের এবং জাতির স্বার্থে অসম্ভব কষ্ট এবং অবিশ্বাস্য ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, কিন্তু এই বিষম কালেও ভারতের পশ্চিম প্রান্তের এক রাজ্যের ব্যবসায়ীরা—যাহাদের ব্যবসার কেন্দ্র বড়বাজার, ক্যানিং ষ্ট্রীট, চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চলে—তাহার কালোবাজারী, মজুতদারী (বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের)—কি বিন্দুমাত্র কমাইয়াছে? দেশ যখন সর্ব্বাত্মক ত্যাগস্বীকার করিতেছে,এই মানুষরূপী নেকড়ের দল কি তাহাদের রক্ত-পিপাসা একটুও সংযত করিয়াছে? না, করে নাই। দেশের যখন সর্ব্বনাশ, তখনও তাহারা দেশের মানুষকে অনাহারে হত্যা করিয়া তাহাদের পাপের অর্থভাণ্ডার স্ফীত করিতে কোন দ্বিধা বা লজ্জা অনুভব করিতেছে না।

কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রধানমন্ত্রী দেশের লোককে এই সময় সর্ব্বস্ব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে আবেদন করেন। সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিবার আহ্বানও তিনি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কালোবাজারী মুনাফা-শিকারী হাঙর নিধনের কথা বলিতে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা যতদূর জানি, তিনি প্রকৃতই মহৎপ্রাণ এবং দেশভক্ত। মানুষকে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমাদের দেশে যাহারা সত্যকার মানুষ—তাঁহারা তাঁহার আবেদনে অবশ্যই সাড়া দিবেন। কিন্তু যাহারা মানুষ নহে, মানুষ ভেক-ধারী অর্থপিশাচ মাত্র, তাহারা প্রধানমন্ত্রীর ডাকে কর্ণপাত করিবে, এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। এমন অবস্থায় দেশের জনগণকে দুইটি ফ্রন্টে যুদ্ধ চালাইতে হইবে, একটি পাকিস্তানী ফ্রন্ট, দ্বিতীয়টি, দেশের শত্রু কালোবাজারী মুনাফাশিকারী দল!

আকা(-ঠ)শবাণী কলিকাতা

(১) বহু অভিযোগ এবং আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও আকাশবাণীর বাংলা সংবাদ প্রচারের ধারার কোন পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তারা বিবেচনা করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যে কয়জন পুরুষ এবং মহিলা ঘোষক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া (...বন্দ্যোপাধ্যায়) অন্য প্রায় সবাই সংবাদ তথা যে-কোন প্রকার রেডিও প্রচারের ক-খ-গ এখনও শিক্ষা করেন নাই কিংবা জানেন না। বাংলা শব্দের প্রকৃত উচ্চারণের কথা না হয় নাই ধরিলাম—কিন্তু ভুল তথ্য প্রচারের কি ব্যাখ্যা করা যাইবে? রাষ্ট্রপতি বলিলেন 'there are 50 millions muslims in India'—তাহার বাংলা হইল 'ভারতে ৫০ লক্ষ মুসলমানের বাস'—একবার নয়, একই প্রচারে এই ভুল দুইবার ঘোষণা করা হইল! অথচ বেতার পণ্ডিতদের কেহই এই মারাত্মক ভুল সংশোধনের কোন প্রয়োজন মনে করেন নাই! ভুলটা অবশ্য কর্ত্তাদের কাছে অতি সামান্য কারণ ৫০ লক্ষ আর ৫০০ লক্ষে (৫ কোটি)—এমন কি তফাৎ?—একজন ঘোষক ক্ষীণ-কণ্ঠ, একজনের সংবাদ প্রচার শুনলে মনে হয় কোন ছাত্র ক্লাশে রিডিং পড়িতেছে! একজন মহিলা ঘোষকের কণ্ঠ—কর্ণ বিদারী করে মর্ম্মে প্রবেশ! একজন ঘোষক আবার

সংবাদ পাঠ করেন নাটকীয় ভঙ্গিতে—আর একজনের কণ্ঠস্বর সারারাত-জাগা যাত্রার দলের নারীবেশী-পুরুষ অভিনেতার মতই। সত্য কথা বলিতে কি আকাশ-বাণীর বাঙলা সংবাদ প্রচার জোরাইট এণ্টারটেনমেণ্টের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। এই প্রচারে হাসির (বড় দুঃখের) খোরাক প্রচুর পাওয়া যাইতেছে!

(২) পল্লীমঙ্গল আসর আর নাই—ইহার কারণ বোধ হয় এই আসরের মোড়ল মহারাজের মহা-মনদের মহা-বাণী প্রচারের চোটে বাঙলা দেশের পল্লী-গুলির সর্বাত্মক মঙ্গল সাধিত হইয়াছে—অমঙ্গলের চিহ্নমাত্রও আর নাই! আসর গেল—কিন্তু মোড়ল বিরাজমান! বর্তমানে তিনি সপ্তাহে একদিন বালক-বালিকাদের একটি বিশেষ আসর পরিচালনা করেন সন্ধ্যা ৬॥ টার পর! কিন্তু এমন একটা নীরস একঘেয়ে বাজে আসরের সার্থকতা কি? সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেই একই ভাকা-কণ্ঠে "তোমাদের আসরে কে কে এসেছেন আর কে কে এসেছে"—নাম ঘোষণা (এসেছেনদের মধ্যে Constant factors কাশীনাথ, পান্নমোহন ও মতিলাল (এই তিনজন মোড়লের খাস মোসাহেব) আর মোড়ল বাবু (এঁরা সবাই "দাদু") এবং কোন একজন কথক ঠাকুর বা ঠাকুরাণী! ছকবাঁধা 'প্রেমক্লিপসন'-প্রোগ্রাম—নড়চড় নাই! (বালক-বালিকাদের স্বতন্ত্র আসর আছে—যদিও তাহার অবস্থাও একই প্রকার!) তাহা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সময় মোড়লের এই আসর ক'জন বালক-বালিকা শোনে (আর কেনই বা শুনিবে) বলিতে পারি না, তবে একবার যে শুনিবে, দ্বিতীয়বার আর সে 'ও-পথে' যাইবে না! রেডিও কর্তা এবং কর্মনিয়ন্তারা কি এই সব বিষয় কোন খোঁজ রাখেন বা এসব শ্রবণ করেন?—তাহা ছাড়া পল্লীমঙ্গল আসর যখন থাকিল না—সযোপাদে মোড়ল থাকিলেন কেন এবং কাহার হিতার্থে? (তাঁহার স্বকীয় হিত ছাড়া!)

(৩) সর্ববিদ্যাবিশারদ বাণীর বরপুত্র এই মোড়লের এখন প্রধান কাজ হইতেছে 'কৃষিকথার' প্রচার অর্থাৎ দেশের ফসল বাড়ানোর মহাব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যহ যে-ভাবে (কৃষি-কথার নামে utter nonsense) এই হাফ-হাতা থিওরেটিক্যাল চাষা-পণ্ডিত সর্বপ্রকার চাষবাসের বিবিধ তথ্যের ভীষণ গবেষণা চালাইতেছেন তাহাতে আমাদের মতে—এই বাক্যবীর চাষা-পণ্ডিতকে রাজ্য সরকারের কৃষি-বিভাগের একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়া—তেপান্তরের কোন মাঠে চালান করা একান্ত কর্তব্য। চাষের বিষয় ইঁহার বিদ্যা এত ভীষণ বিশাল এবং গভীর যে তিনি 'ক্যালো-ন্যাণ্ডেও' প্রতি বিঘায় ২৫,৩০ মণ ধান ফলাইতে পারিবেন। চাষের বিষয় কলিকাতার আকাশবাণী ভবন হইতে যে-প্রকার প্রচণ্ড প্রচার হইতেছে, তাহাতে অনেকের আশা হইয়াছে—আকাশবাণী ভবনের ছাত এবং পাশের ইডেন গার্ডেনও অচিরে শ্যামলা চাষের জমিতে পরিণত হইয়া দেশের খাদ্যাভাব দূর করিবে। তবে কেহ কেহ বলিতেছেন যে—'চাষা-পণ্ডিত' ও 'চাষী-পণ্ডিত' কি একই বস্তু? চাষী-পণ্ডিতের কথার যে মূল্য লোকে দিবে—'চাষা'-পণ্ডিতের বেলায় কি তাহা ঘটিবে? তোতাপাখীর বুলি আর মানুষের কথা কি একই জিনিষ?

বর্তমানে রেডিও আছে শহরের প্রায় ঘরে ঘরে—কিন্তু গ্রামের কয়জন চাষী সন্ধ্যাবেলা চাষা-পণ্ডিতের কৃষি-গবেষণার কথা শোনেন বা শুনিবার অবকাশ পান—জানা নাই। এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় গ্রামে যে-সব রেডিও সেট্‌ সরকার হইতে বিলি করা হইয়াছে, তাহার শতকরা ৮০টি 'ব্লক'-হেড্‌ এবং পল্লী-মোড়লদের বাড়ীতেই বিরাজ করিতেছে!!

বারান্তরে আমরা আকাশবাণীর অন্যান্য কয়েকটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। রেডিওতে সংস্কৃতির নামে কী কীর্তি হইতেছে তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়াস পাইব। কিন্তু কেহ যেন ভাবিবেন না আমরা আকাশবাণীর সবকিছুরই নিন্দা করিতেছি।

এ প্রাইস অন হিজ হেড

লেখিকা — শ্রীমতী আনা সেগার্স

অনুবাদিকা — শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়

॥ ৬ ॥

জোহান একটা পরিষ্কার করে ছাঁট-দেওয়া পিচের রাস্তায় এসে পড়ে এবং পার্কের মধ্যে দিয়ে সহরের গেট দিয়ে ঢোকে। বাজার এলাকাটা জনশূন্য, শূন্যতার জন্য সেটাকে অস্বাভাবিক বড় মনে হয়। বাজার চৌধুপির মাঝখানে কলের দোকানের ওপর দুটো লাল ছাতা দেখা যায়। তার নিজের সহরে গির্জা এবং বাজার, দোকান এবং একগাদা তালগোল পাকানো রাস্তা ও গলি জটিলভাবে ছড়ানো, কিন্তু এখানে সবকিছুই গায়ে গায়ে ঘেঁষা। দোকানে ওরা কিস্তির অংশ নিতে গররাজি হয়। কিন্তু জোহান বলে: "লোকটাকে দুই কিস্তিতে দিতে দাও না কেন। তোমাদের যদি ক্রোক করতে হয় তার চেয়ে এতে তো তোমাদের লাভ।" মালিক জিজ্ঞাসা করে: "আর পরের মাসে কি হবে?" জোহান মনে মনে ভাবে সে কল ভুগতে হবে ওকে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে বলে: "ততদিনে ওর ফসল উঠে যাবে।" "খুব জান তুমি, তখন ও দেখবে ওর কি নেই।" জোহান অধীরভাবে এপা থেকে ওপায়ে ভর দেয় এবং কাঁধ দুটো ঝাঁকায়। তারপর সে লোকটার কাছ থেকে একটা রসিদ প্রায় ও কেড়ে নেয় এবং গির্জেটা বেড় দিয়ে একটা উঁচু রাস্তায় সেখান থেকে একটা নীচু রাস্তায় দৌড়ে গিয়ে পড়ে। একটা বাড়ী থেকে দুটো পতাকা ঝুলছিল আর তার সামনে ছিল একটা খবরের কাগজের কাচের বাক্স। লোকেদের উৎপীড়িত উত্তেজিত মুখগুলো একখানা 'আমব্রিক'-এর খোলা পাতার চারপাশে ভিড় করে ছিল।

জোহান ভিড়ে যোগ দেয়, তিনটে লাইন পড়ে এবং সন্দেহপীড়িত মন নিয়ে আবার ছেড়ে দেয়। পোস্ট এণ্ড সঙ্গ-এর সাইরেন যখন গোটা ছোট্ট সহরটার মধ্যে কেঁপে কেঁপে বায় তখন সে চমকে ওঠে। কলের মালের ওদের ওখানে উপরি কাজ চলছিল। এরই মধ্যে ওখান থেকে বেরোন লোকের ভিড় পথের উপর লক্ষ্য করা যায়। বেশীর ভাগই মেয়ে, দোকান বন্ধ হয়ে যাবার আগে তাদের শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা সারতে ছুটছে। জোহানের মনে হয় যেখানে এক সিকটের মেয়েরা যাস্য ভরে দিতে পারে সে রকম ছোট্ট সহরে সে যা চায় তা খুঁজে বের করা সহজ হবে। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না তার। দুখানা রুটি হাতে যে মেয়েটি রুটি কারখানা থেকে সবে বেরোচ্ছিল হয়ত তাকে জিজ্ঞাসা করলে পারত সে। মেয়েটির খাটো কালো চুল, মুখখানা ক্লান্তিতে পাংশু। হয়ত সে সরলভাবে ওকে নিয়ে যেত তার স্বামীর কাছে, আবার হয়ত ওকে নরকেও পাঠাতে পারত। তার খোলা সবুজ রংএর জ্যাকেটের উপর যে ব্যাজটা পরা ছিল সেটা দেখতে পাচ্ছিল না জোহান।

অবশেষে জোহান একটা ছোট্ট দোকানের সামনে থামে। আসলে ওটা দোকান নয়, এককালের শোবার ঘরের জানলা, যেখানে ভ্রমণের উপযোগী নানা জিনিস ইতস্ততঃ ছড়ান ছিল—ছিল নীল সার্ট, চামড়ার বেল্ট, আবার কিসটে এবং আনটিক (শ্রমিক সঙ্ঘের ব্যাজ, কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) ব্যাজও ছিল। পিছনের দেওয়ালে আঁটা ছিল আরবাইটার-ইলুস্ট্রিয়েরটে (শ্রমিকদের প্রগতিশীল কাগজ), জোহান ঢুকতে সাহস করে না। কেউ বেরিয়ে আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত দু'জন লোক বেরিয়ে এল। দু'জনের কেউই খুব ছেলেমানুষ নয়, দু'জনেরই ছোটখাট চেহারা। একজন তার মেকানিকের কোটের উপর আনটিকা ব্যাজ পরে আছে, আর একজনের কোন ব্যাজ নেই, তার হাত রয়েছে মেকানিকের কাঁধে।

জোহান তাদের পিছনে দৌড়ল। তারা একটা সাইকেল মেরামতের দোকানের উঠোনে যায়, জোহা-

তাদের অনুসরণ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই খাটো-চুলওয়ালা মেয়েটি দোকানের পিছনকার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার ক্লান্ত পাংশু মুখে একটা বিরক্ত দৃষ্টি, হাতে দু'খানা রুটি। গোড়ায় সে জিজ্ঞাসা করে জোহান কি চায়। জোহান জবাবে বলে যে সে লাইপজিগের একজন কমরেড। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে সে ওদের সঙ্গে খাবে কি না। সেই দোকানিক, যার নাম তোল্‌ক্‌, সে বলে: "অবশ্যই ও খাবে।" অন্ত লোকটা বাড়ীতে তার স্ত্রীর কাছে যাবে ভাবছিল, অবশেষে সেও ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

তারা দোকানটা বন্ধ করে কেনাবেচার ছোট্ট জায়গাটায় বসে। সেখানে চা, টাটকা রুটি, মার্গারিন এবং মেটের সসেজ রয়েছে। সাবধানে জোহান জায়গাটার ধরনধারণ বোঝবার চেষ্টা করে। দোকানিক আগে লাইপজিগে গিয়েছিল, সে লাইপজিগের কথা জানতে চায়। জোহানকে জিজ্ঞাসা করে সে পার্টিতে আছে কি না? জোহান জানায় যে সে পার্টিতে নেই, কিন্তু পার্টিতে আছে এমন কারও সঙ্গে সে অবিলম্বে কথা বলতে চায়। দোকানিক অন্ত লোকটির কাঁধে হাত রেখে বলে: "একে বল।" তখন জোহান বুঝল এ হ'ল সেই রেগুল, যার কথা সে গ্রামে শুনেছে ইতিমধ্যে।

রেগুল জোহানকে জিজ্ঞাসা করে কি জন্যে সে এসেছে। দ্বিধাভরে জোহান কাহিনীটা বলে। চোখ দুটো তার যদিও প্লেটের উপরই ছিল তবু সে বুঝতে পারে অন্যদের মুখের ভাব বদলে যাচ্ছে, কঠিনতর হয়ে উঠছে দৃষ্টি। অবশেষে রেগুল বলে: "তোমার সাবধান হওয়া দরকার, এমনকি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেও। যাই হোক, আমাদের জন্য অনেক কিছু করতে পার তুমি।"

জোহান বলে: "আমার পক্ষে এখানে কিছু করা সহজ নয়। আমি পথে পা দিলেই সমস্ত জানলা হাট করে খুলে যায়। ওরা হাঁ করে আমার গলা পর্যন্ত দেখতে থাকে যদি একটা কথা ধরতে পারে। আমি এখানে বন্দী হয়ে আছি।"

"লোকের সঙ্গে নানা কায়দায় কথা বলা শিখতে হয়। তোমার পক্ষেও এ জিনিস শিখলে ভালই হবে, তার জন্য অসন্তুষ্ট হয়ো না। মানুষের যে পথে চলা উচিত সেই পথে তাকে চালাতে হ'লে তাদের সঙ্গে দু'ভাবে কথা বলতে পারা দরকার: প্রকাশ্যে এবং গোপনে। কোনও কোনও সময় তাদের কঠোরভাবে আঘাত দিতে হবে, আবার কোন সময়ে নরম করে বলতে হবে যেমন রুগ্ন শিশুর বেলায় করি আমরা। আচ্ছা জোহান, এবার আমায় যেতেই হবে।" রেগুল এই বলে শেষ করে: "এবার আমায় স্ত্রীর কাছ থেকে বাচ্চাগুলোকে নিতে হবে। সে গোষ্ঠ এও সঙ্গে সপ্-টুয়ার্ড কমিটিতে আছে।"

রেগুল চলে গেলে মহিলাটি খাঁকের সঙ্গে বলে: "এত যে কাজ আমরা করলাম তবু নিভারভাইলারবাখ ছেড়ে এগোতে পারলাম না।"

তোল্‌ক্‌ বলে: "আমরা প্রতি রবিবারে গ্রামে যাই। কিন্তু কদাচিৎ আমাদের গাড়ি জোগাড় হয়। আমাদের পক্ষে অত টাকা জোটান কঠিন। নাৎসীদের এখানে তিনখানা গাড়ি আছে, একখানা তাঁতখানায়, একখানা জুতোর কালির কারখানায় আর একখানা ব্রাইভাইজের। মহিলাটি উঠে গিয়ে আলো জ্বালায়। আধ-ঘুমন্ত জোহানের চোখে পড়ে ভাঙা কাটি, চাকা এবং তাদের তালপাকানো পিণ্ড। বোধ হয় অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সে উঠে পড়ে। মহিলাটি ফিরে আসে এবং বলে: "রেগুল ঠিকই বলেছে, কখনও-সখনও আমাদের জন্য কিছু কিছু করতে পার তুমি। হাজার হলেও তুমি ত একেবারে এর মধ্যে ডুবে আছ—"

জোহান যখন উঠোন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামে তখন শেষ পর্যন্ত সে অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। সহরের আলোর চকমকি কমে এসেছে। তাদের বাড়ীর সহরে যেমন আলোর ঝাঁক দেখতে অভ্যস্ত ছিল সে এখানে তেমন নয়, এখানে ঠিক যেটুকু দরকার—প্রতিটি জাগ্রত লোক-পিছু একটি করে আলো। সাদা বাজার এলাকাটা যেন যতদূর সম্ভব প্রসারিত হয়ে গেছে, বিশাল টাউন হলটা যেন নগর প্রাকারের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। ওদের সমস্ত ছাদ ছুটোতে এসে পড়েছে অস্ফুট জ্যোৎস্না।

শীগগিরই বড় রাস্তায় পৌঁছে যায় জোহান। এখান থেকে গ্রামের রাস্তা তার কাছে কেবল এক পায়ের মত। পথে আসতে তার হঠাৎ মারির কথা মনে পড়ে। সবাই ছেড়ে যাবার পরমুহূর্ত থেকে তার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল ও। এবার সে তার কথা ভাবতে পারে, সে যেন এমন একজন, যে আগামী কাল তার জন্য অপেক্ষা করবে। হয়ত সে সাদাসিধেই, তবুও ভাল, তাতে করে জীবনের ভার বহন করা সহজতর হবে। যদিও সত্যি সত্যিই দেরি হয়ে গিয়েছিল তবু বাড়িওয়ালা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বেড়ার পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য।

"দেখলে ত, শেষ পর্য্যন্ত ফিরে এল ও।"

"কি গোলমাল হয়েছে মনে করেছিলে তোমরা? আমি ত বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখে ট্রেণে পৌঁছে দিলাম।"

।৭।

ছোট মেরৎস বাবার কাছ থেকে চাষের কাজ হাতে নেবার জন্ত মাঠে গেল। লাঙলের বাঁদিকে যে ছোট্ট কুকুরটা ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করছিল সে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল আর শুয়ে পড়তে লাগল, ভাবটা যেন ছেলেটা কোনও অসদুদ্দেশ্যে এসেছে। ছোট মেরৎস সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ এবং বীয়ার নিয়ে এসেছিল, মা সেগুলোকে এক টুকরো পরিষ্কার সাদা কাপড়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। সে লাঙলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু বুড়োর সেদিন যতটুকু করার ইচ্ছে ছিল তা হয়ে গিয়েছিল, তাই সে ঘোড়াগুলোকে জোয়াল থেকে খুলতে সুরু করে। ছেলে তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয় এবং বাবাকে সাহায্য করে। আগের দিন সে আর কি দিলে ফাঁকা মাঠ পর্য্যন্ত ছড়ানো জমিটার ঘাস কেটে রেখেছিল। আস্তে আস্তে সে ঘোড়াগুলোকে হেঁকে আল পার করে ফসল কাটা, অ-চষা জমিতে ঢুকিয়ে দেয়, যদিও এ অঞ্চলে ঘোড়াকে অবাধে চরতে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না।

বাবা এবং ছেলে আলের উপর বসে। তারা শুধু পেছনে ভর দিয়ে বসেই পড়ে না, লম্বা বিশ্রাম নেবার ইচ্ছায় পিঠগুলোও টান করে দেয়। ঘোড়াগুলো অবাক হয়ে থেমে যায়, প্রায়-নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর কদমে কদমে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে। লোকগুলো স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে চোখ তুলে ঘোড়াগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। এ অঞ্চলে একমাত্র তাদের ঘোড়াই অবাধে চরতে পারে, একথা ভাবতে তাদের ভাল লাগে। যদিও বছরটা অনেকটা গড়িয়ে গেছে তবু মাটিটা গরম আছে।

হঠাৎ বুড়ো মেরৎস বলে: "শোন, তুমি আর তোমার ওই সোফি বাস্টিয়ান···ওটা বোধ হয় হবে না।"

ছেলেটা ভুরু জোড়া তোলে, কিন্তু বাবার কথায় প্রতিবাদ করে না। বরঞ্চ হেসে বলে: "ঠিক হবে বাবা, তুমি জান কবুল করতে পার।"

"কথা শোন, অবুঝ হয়ো না। আমরা মনে করেছিলাম ওরা বেশ···কিন্তু ছেলেটা রয়েছে, ওই ছুঁচে পোঁটাটা, আর মেয়েটাকে যৌতুক পর্য্যন্ত দেবে না বুড়ো—কেবল কাপড়চোপড়।"

"বেশ, তাতে কি হ'ল?" ছেলেটার দৃষ্টি শূন্য হয়ে যায়। গেল রবিবার থেকে রাত্রি-দিন যে ভাবনা তার মন জুড়ে রয়েছে সেকথা ভাবলেই তার ওই অবস্থা হয়। অ-চষা ক্ষেত থেকে ঘোড়াগুলোর অদ্ভুত আওয়াজ আসে, অদ্ভুত কোমল আওয়াজ। মুহূর্তের জন্তে ওরা কথাবার্তা ভুলে যায়, তাদের চোখে প্রায় একটা উল্লাসের ভাব ফুটে ওঠে।

ছোট মেরৎস নিজের অভ্যাসের তুলনায় খুব শান্ত ভাবে বলে: "এ বিষয়ে আমরা আর আলোচনা না করলেই পারি। যদি ওর কিছু থাকে ভালই, যদি কিছু না থাকে ত আরও ভাল।"

মেয়েটার কিছু না থাকলে সেটা আরও ভাল কিসে সে বিষয়ে ছেলেটার কোনও ধারণা ছিল না। তবে তার মনের বাসনা বোধ হয় বলছিল: খালি মাথা, একটা মাত্র বেমানান পোশাক-পরা এই মেয়েটা, যার টাকা-পয়সা নেই, কনের পোশাক নেই, আত্মীয়স্বজন নেই, সে সম্পূর্ণ তার দয়ার উপরই থাকবে। সে বলতে থাকে: "হেমন্ত শেষ হবার আগেই আমার ওকে চাই, হাঁ, তখনই চাই।"

দু'হাত দিয়ে সে একটা ভঙ্গি করে। বুড়ো সে ভঙ্গির মধ্যে মেয়েটা এবং তার নিজের মামলা'র উভয়ের পক্ষেই বিপদ দেখতে পায়। এতদিন পর্য্যন্ত তার বুদ্ধি ও শক্তি তার ছেলের চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু হাজার হ'লেও ছেলেটা যুবক।

"তুমি কি নিজে কিছু দিতে চাও? শোন, তুমি কিছু দাও, তোমার অংশ থেকে সেটা বাদ দিয়ে দেব আমি। এমনিতেও বাড়ীটা আমার বেচে দিতে হবে।"

এবার তার ছেলের অবাক হওয়ার পালা। বাজার এলাকায় কাসট্রিৎসিউভের বাড়ীটা যে বুড়ো মেরৎসএর সম্পত্তি, একথা গ্রামের লোক পর্য্যন্ত জানত না। ১৯২৩ সালে তার এ কন্দি গজিয়েছিল যখন কাসট্রিৎসিউভ হোয়াইটম্যান মেশিন কারখানার কাছে অনেক পাউণ্ড দেনায় জড়িয়ে গিয়েছিল। তখন বুড়ো মেরৎস মনে মনে মত করেছিল: সে কাস্ট্রিৎসিউভদের দোকানটা কিনে নিচ্ছে, সেই সঙ্গে দোকানের মাথাটাও। ছেলেটা জিজ্ঞাসা করে: "তা সব ছেড়ে বাড়ীটা কেন?"

বুড়ো বলে: "শুনেছ কখনও জোর-গলাকরা লোক যৌতুক চায়?"

সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে ছোট মেরেৎস জিজ্ঞাসা করে : "কিন্তু কেন ? কে ?"

"তোমার বোনের হবু বর, আর কে ? জান কি বলে লোকটা ? শুনুন বাবা, যদি আপনি চান জুইজের বর..." বুড়ো কথা বলতে বলতে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। মস্ত দাড়িটা পাকিয়ে পাকিয়ে গোল করে ফেলে এবং রিক্‌কের অনুকরণে তাতে টান দেয়।

"আমি একবার শুনিয়ে দেব রিক্‌কেকে।"

"দিতে পারবে ?"

"নিশ্চয়ই পারব। আজই করব দেখ।"

"বেশ, লাঙল দেওয়া শেষ হওয়া মাত্র আমাকে সহরে যেতে হবে। মাকটেলকে বল কাকে কাল্‌এ আমার সঙ্গে দেখা করতে, দেখি এসব বিষয়ে সে কি ভাবছে।"

বুড়ো মনে করে ব্যাপার যদি-এরকম হয় তা হ'লে এই ঘোড়া এবং ক্ষেত দেখে ছেলে আর বিশেষ পুলকিত বোধ করবে না। তখন আর 'আরও ভাল' বলবে না। গেল রবিবারে বাগিমানের বাগানের কথা তখন তাকে চটে আগুন হয়ে ফিরে ভাবতে হবে।

এবার ছেলে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, মনটা সম্পূর্ণ এতেই দেয়। "ওই রিক্‌কেটা নিজেকে মনে করেছে কি ?"

"জিজ্ঞাসা কর তাকে। ওর আরামে থাকতে ইচ্ছে। একেবারে আলসে, এ সবগুলো তাই। লোমের মধ্যে ছারপোকার মত ও আমাদের ভিতরে সেঁধোতে চায়। কেউ ত আর একটা বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিতে চায় না।"

ছোট মেরেৎস হেসে ওঠে : "উনি ওঁর কাঁপা লাঠি সোনার তালে ভরতে চান। ওই হতভাগাটা ভাবে কি জান ? আমি যদি পাটাতনের উপর দিয়ে হেঁটে চাষীর মেয়ে বিয়ে করি..."

হেসে উঠে পড়ে। বুড়ো হৃষ্ট মনে তার দিকে চায়। মজার ব্যাপার এই যে, যদিও এই আলোচনা ফলবতী হয় নি তবু এর থেকে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ফিরে আসে। ছোট মেরেৎস্‌এর বাড়ী পৌঁছতে দশ মিনিট লাগে। বাগানে রিক্‌কে তার বোনকে সাহায্য করছিল একটা কাপড় মেলার দড়ি টাঙাতে। সেখানে এসে হাজির হয় সে।

"শুভ সন্ধ্যা রিক্‌কে। হাতে একটু সময় আছে ?" বোনের বাগদানের পর থেকে ছোট মেরেৎস তার ভাবী ভগ্নিপতির সঙ্গে একটা কথাও বলে নি। রিক্‌কে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে, ভাবী স্ত্রীর ভাইকে দেখলে তার সব সময়েই এমনি হয়।

"দেখ রিক্‌কে তুমি কেবল রবিবারে এখানে আস, এক-আধবার হপ্তার মধ্যেও আসা উচিত তোমার—প্রাম এবং ময়দা-মাংসর পিঠে, ময়দা-মাংসর পিঠে আর প্রাম।"

রিক্‌কে জুইজের আশায় উদ্বিগ্ন ভাবে এদিকে-ওদিকে চায়। তারপর আবার ছোট মেরেৎস-এর মোটা নাক-কালচে খুঁতনি এবং ঘাম ও গরমে ফোলা মুখখানার দিকে চোখ ফেরায়। ছোট মেরেৎস মাষ্টারের বিবর্ণ বিকৃত মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ তাদের দৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ফেটে পড়ে। মৃদুস্বরে মাষ্টার জিজ্ঞাসা করে : "যাহোক, তুমি বলতে চাও কি ?"

"আমি বলতে চাই বিয়ের দাবিদাওয়ার কথা।"

"বিয়ের দাবিদাওয়া ? আমি তোমার বাবাকে বলেছি আমাদের হাজার মার্ক দিতে, যাতে আমাদের সমস্ত মেরামত হয়ে যায়, যাতে..."

এক মুহূর্তের মধ্যে ছোট মেরেৎসের মনের ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের মত খেলে যায় : হে ভগবান, লোকটা এক হাজার মার্কে বিক্রি হ'তে চায়। এই ব্যাপার! প্রকাশ্যে সে বলে : "এ অঞ্চলে কনের বাপকে শুধু বিয়ের জন্যই অত খরচ করতে হয়।"

"আমি জানি।" সান্ত্বনার স্বরে বলে মাষ্টার, "বলতে গেলে আমি নিজেও এ অঞ্চলেরই লোক। এ সব ঝামেলা না করে আমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতাম..."

"জুইজে !" ছেলেটা ডেকে ওঠে।

জুইজে ওদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ায়। আজ তার পরণে চাষীমেয়ের পোশাক, মাথায় রুমাল বাঁধা।

"শোন জুইজে, তোমার নিশ্চয় ইচ্ছে যে ভালমত একটা বিয়ের উৎসব হোক, যেমন এ অঞ্চলের রেওয়াজ।"

অবাক হয়ে জুইজে বলে : "তা ত বটেই।"

হঠাৎ ওর ভাইয়ের দৃষ্টি আবার শূন্য হয়ে আসে, কারণ নিজের কি আশা করা উচিত সে-কথা মনে পড়ে যায়। ওর ইচ্ছে ছিল মাষ্টারকে একহাত নেওয়ার। কিন্তু তার বদলে সে পুলকিত ভাবে বলে : "তা ত বটেই আমাদের মত ঘোড়া বিয়ে হবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"ঠিক কিসের জন্যে তুমি গ্রামে ফিরে এলে ?"

"সে আমি বুঝিয়ে বললেও তুমি বুঝবে না।"

"হাঁ, আমি বুঝব।"

"যখন তুমি জমিতে চাষ দাও তখন ভাবতে থাক

একদিন ঐ জমির তলায়ই তোমার চিরনিদ্রা হবে। এটুকু অন্ততপক্ষে তোমারই সম্পত্তি, সবটাই তোমার।"

"সবটাই তোমার বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও? তাছাড়া এ ত আদৌ তোমার নয়।"

"আমি তোমাকে বলেছিলাম যে তুমি বুঝবে না। একজন লোকের নিজস্ব বলে কিছু থাকা প্রয়োজন। তার সম্পত্তি দিয়েই তৈরী তার সত্তা। শেষ পর্যন্ত কার জন্য করছে একথা না জানতে পারলে কেউ কাজ করতে পারে না।"

জোহান জিজ্ঞাসা করে: "তা হ'লে আমি কি তোমার জন্যে ভাল করে কাজ করছিনে?"

চমকে ওঠে ওর দিকে তাকায় বাস্তিয়ান। তার আধ-বোজা চোখের চাহনিতে ছিল বিস্ময়, এমন কি ভয়ও। "আমি তা বলি নি, তুমি কাজের মানুষ।" তাদের সামনে টেবিলের উপর কতকগুলো ছোট ছোট যন্ত্রপাতি পড়ে ছিল। তারা সেগুলো পরীক্ষা করছিল ও মেরামত করছিল। তোমা শিস্ দিচ্ছিল, ছেলেটা দেশলাইয়ের বাক্সে পেরেক সাজাচ্ছিল। মেরামতি কাজে জোহান ছিল ওস্তাদ। দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। কার যেন পা ঠোকার শব্দ সিঁড়িতে। পায়ের চাপে কিছু গুঁড়িয়ে গেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি কড়কড়ে আওয়াজ, তিনটি কণ্ঠস্বর, দরজার সজোরে করাঘাতের শব্দ। কেউ "ভিতরে আসুন" বলবার আগেই দরজা খুলে গেল। হতভম্ব হয়ে বাস্তিয়ান, জোহান এবং বাচ্চারা অনধিকার প্রবেশকারীদের দিকে তাকায়।

আসলে বাস্তিয়ানের চমকাবার কোনও কারণ ছিল না, তাই সে শুধু মাথা নাড়ে। চকচকে জুতো, চামড়ার বেল্ট, কড়কড়ে পায়ের শব্দ এবং এই কণ্ঠস্বরের মালিকদের মুখ তার পরিচিত। তারা হ'ল পটিদিনের ও ক্রিষ্টিয়ান ডুকেন এবং ডুকেনের সাহায্যকারী কঠোর পরিশ্রমী কোরেসলিন। তারা চাঁদার বাক্স ঝনঝনাচ্ছে।

পটিদিনের ডুকেন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাহিল চাহনি আর নেই। কসলকাটার শেষ মাসে সে বেশ শক্ত সামর্থ্য হয়ে উঠেছে। আগের মত ফাঁক পেলেই সে অহঙ্কার সন্দেহভরা চোখে লক্ষ্য করে দাদাকে। ডুকেন এ ঘরে প্রথম ঢুকল—এই সুযোগে সে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে দেয় টেবিলের উপরকার যন্ত্রপাতিগুলোর উপর।

সঙ্গে আনা ইস্তাহারগুলো টেবিলের একটা খালি কোণে সাজিয়ে রেখে কোরেসলিন বলে: "বাস্তিয়ান, ন্যাশনাল সোশিয়ালিস্টদের নির্বাচনী তহবিলে পঞ্চাশ কেনিশ্ চাঁদা দাও। আমি জানি তোমার পক্ষে দেওয়া কষ্টকর। কিন্তু চিন্তা করে দেখ, কাকে দিচ্ছ তুমি। দিচ্ছ এডল্ফ্ হিট্লারের হাতে। সেখানে সৎকাজে লাগবে। এর বিনিময়ে তিনি তোমার ছেলেমেয়েদের জমি পাইয়ে দেবেন, রুটি দেবেন।"

উদ্‌ভ্রান্ত একটা হাসি চেপে যায় বাস্তিয়ান। যখন সে হাসে জোহান তাকে প্রায়ই ফিরে আসার আগে এই রকমই দেখাত তাকে। "আরে বাপু, আমার যদি বাড়তি পঞ্চাশ কেনিশ থাকত তা হ'লে এক্ষুনি ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কিনে ফেলতাম।"

কোরেসলিন বলতে থাকে: "তুমি যদি অর্থ না দিতে পার অন্ততপক্ষে এক ঘণ্টা সময় দাও। তা দেবে, কি বল? কথা দাও।"

বাস্তিয়ানের হাসি থেমে গেছে এবার। সে অস্বস্তি অনুভব করে। সে যদি কথা দেয়...তবে ত কথা দিয়ে দেওয়া হ'ল। সে যদি না দেয় তা হ'লে তার জানা দরকার এই তিনজনের পিছনে ঠিক কতগুলো পরিবার আছে গ্রামের। সে ত্রস্তচকিত দৃষ্টিতে জোহানের দিকে তাকায়।

কোরেসলিন বাস্তিয়ানকে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, ঠিক এই মুহূর্তে সে জোহানের দিকে ফিরে বলে: "তুমি নিশ্চয়ই আসছ, ওকে তোমার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস।"

কোরেসলিন ও জোহান পরস্পরের দিকে তাকায়। হয়ত তারা দু'জনেই সে সময়ে এক কথাই ভাবছিল; তুমি দেখছি ঠিক আছ, তোমার চাউনি আমার ভালই লাগছে। প্রথমে জোহানের বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে, কিন্তু চট করে সামলে নেয় সে। ইচ্ছা থাক বা না থাক এমনভাবে তারা পরস্পরের দিকে চায় যেন তাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ আছে। ডুকেন চাঁদার বাক্স ঝনঝনিয়ে নীরবতা ভঙ্গ করে। ডুকেনের পাশে পাশে যেঁষা চোখের তীক্ষ্ণ চাহনিতে অস্বস্তি বোধ করে বাস্তিয়ান। কে জানে ছেলেটা তার কোনও রকমে ক্ষতি করতে পারে কি না? একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে দশটি কেনিশ বের করে এবং মুঠো দিয়ে চাঁদার বাক্সে গলিয়ে দেয়। ওরা ধন্যবাদ জানিয়ে এবং "হাইল" ব'লে চিৎকার তুলে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করে।

জোহান ও বাস্তিয়ান নিজের নিজের আসনে ফিরে আবার কাজ শুরু করে। দীর্ঘ নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করে বাস্তিয়ান:

"তুমি কি মনে কর এতে কিছু হবে?"

"তোমার কি মত?"

"আমার মনে হয় না কিছু হবে।"

"তুমি দশ কেনিশ দিলে কেন?"

"নিজের অবস্থা আরও জটিল ক'রে তুলতে চাইনে বলে।"

ছেলে তিনটে ভহেখলিনের ওখানে গেল। কিন্তু ওদের আসতে দেখেই ভহেখলিন স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেয় ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্ত। ভহেখলিনের বৌ একখানা বড় কাপড়ে জড়িয়ে রেখেছিল বাচ্চাটাকে। কাঙখানা এমনভাবে আড় করে রেখেছিল যাতে চলার সময়েও বাচ্চাটা দুধ খেতে পারে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দরজা খোলে সে। তাড়াতাড়িতে চোয়াল দুটো এক করতে তার কষ্ট হয়, তাই সে বিড়বিড় ক'রে অস্পষ্টভাবে বলে: "কেউ বাড়ী নেই।"

কোয়েসলিনের উজ্জ্বল মুখে আতঙ্ক ও বিরক্তি দেখা যায়। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায় ওরা।

নিকলাজের বাড়ীতে গেলে তার মা আস্তাবল থেকে চেঁচিয়ে ওঠে: "সময় নেই। আমাদের নিকলাস ব'লে গেছে তোমরা আসবে। রান্নাঘরের টেবিলের উপর দশ কেনিশ আছে। যদি নিতে হয় তবে নিয়ে যাও, হাঁ, নিতান্ত নিতে হ'লে নাও।"

তারা আলগাইয়ারের কাছে যায়। যখন তারা ঘরে ঢোকে পুরো পরিবারটাই টেবিলের কাছে বসেছিল। তাদের ঢুকতে দেখে পাউল লাল হয়ে যায়। তার মা ও বোনও লজ্জা পায়। আলগাইয়ার অবশ্য শান্তভাবেই বলে: "কিছু করতে পারব না। আমি গরীব মানুষ, আমার কিছু নেই। তা ছাড়া আমার ছেলেকে ত তোমরা পেয়েছ, তাই নয় কি?"

কুবেল বলে: "ওকে পাবার আগে অবশ্য তুমি আমাদের যথেষ্ট বেগ দিয়েছ।"

কোয়েসলিন কুবেলের জামার হাতায় টান দিয়ে বলে: "ছেড়ে দাও।"

আলগাইয়ার জবাব দেয়: "আমি বুড়ো মানুষ, রাজনীতি আমার জন্ত নয়। আমি তোমাদের পক্ষেও না, বিপক্ষেও না।"

কোয়েসলিন বলে: "চলতি প্রবাদটা জান নিশ্চয়ই: যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে।"

আলগাইয়ার জিভটা গালে লাগায়। মজার ব্যাপার এই যে, তাকে দেখে মনে হয় সে যেন বলছে: "দেখ বাপু, আমি ঠিক তাইই বলতে চাই।"

"হাইল, পাউল, কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

পাউল ক্ষীণস্বরে জবাব দেয় "হাইল" এবং লজ্জায় আরক্তিম হয়ে যায়। তার কমরেডরা দরজার ওপারে চলে গেলে বাড়ীর লোক কি বলবে তা ভেবে শঙ্কিত হয় সে। কিন্তু একমাত্র মা-ই অবাক হয়, বাবা শুধু জিভটা গালের মধ্যে ঘোরাতে থাকে, বলে না কিছুই।

ছেলে তিনটে রিকজের কাছে যায়। "হের রিক্‌কে, ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্টদের নির্বাচনী তহবিলে দু-এক মার্ক চাঁদা দিন।"

"পারব না ভাই। তোমরা জান, কেন।"

"হের রিক্‌কে, আমরা কথা দিচ্ছি, এ ঘরের বাইরে কেউ টের পাবে না।"

একটা অসুবিধার সামনে পড়ে যায় রিক্‌কে। যদি ওদের কিছু দেয় তা হ'লে আজ ক্ষতি হ'তে পারে। যদি কিছু না দেয় ত কাল ক্ষতি হ'তে পারে। অবশ্য একটা ব্যাপার ঠিক, আজকের কথা আজ।

"অন্ত সময়ে এস ভাই। মনে ক'রো না কিছু। তাছাড়া মাসের পনের তারিখের পর সরকারী কর্মচারীর হাতে আর বাড়তি কিছু থাকে না। শুভসন্ধ্যা, হাইল।"

তারা মেরৎস্‌এর সঙ্গে দেখা করতে যায়। দরজায় টোকা দেবার আগেই ছোট মেরৎস মাঠের রাস্তা দিয়ে ছুটে আসে। "দাঁড়াও, দাঁড়াও, কষ্ট ক'রে বাবার সঙ্গে আর দেখা না করলেও পার।"

"কিন্তু তুমি?"

"বিয়ের পরে। বিয়ের পরে আমি তোমাদেরই লোক হব। তখন আমি নিজের কর্তা নিজে। সে বিয়ের পর।"

তারা চলে যায়। প্রথম যে বাড়ীটায় তারা ঢুকেছিল সেখানে লোকে তখনও দিনের আলোয় কাজ করছিল। রাস্তার মাঝামাঝি যখন তারা পৌঁছল লোকে তখন রাত্রির আহার সুরু করেছে। শেষ বাড়ীতে চাষী-বৌ ইতিমধ্যে ঘুমন্ত বাচ্চাদের বিছানায় শোয়াতে সুরু করেছে।

॥ ২ ॥

সরাইখানার চৌমুণির সামনে দাঁড় করান বড় দুটো ট্রাক এবং রাইভাইন-এর নিজের গাড়ির চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল মেয়েরা ও বাচ্চারা। পুরুষ ছিল অল্প কয়েকজনই। কারণ তাদের বেশীর ভাগ ছিল সরাই-খানার ভিতরে। বাকীরা দেখা দিতে চায় না। বিরাট একটি স্বস্তিকামার্কা পতাকা দরজার সামনে ঝুলছিল। পতাকার নীচের দিকটা মাটি ছুঁয়ে ছিল এবং উপর দিকটা উঁচিয়ে ছিল ছাদের উপর দিয়ে। তিনটি পতাকা

পোঁতা হ'ল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসা গ্রামের রাস্তা সচকিত হয় সশব্দ আওয়াজে। গ্রামের এই হঠাৎ পরিবর্তনে বিস্ময়ে গোল হ'য়ে ওঠে বাচ্চাদের চোখ, বিরাট ক্রশচিহ্নগুলিকে তাদের মনে হয় যেন উদ্যত বাহু, এক্ষুনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, গলা টিপে ধরবে।

সরাইওয়ালা প্রথমে তার নিজের ঘরের দিকে যাবার দরজার ছিটকিনি খুলতে রাজি ছিল না—কিন্তু ব্রাইতাইজ তাকে দু'মার্ক দিয়েছিল। ব্রাইতাইজ এসেছে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়, সভা শুরু হবার পনর মিনিট আগে। গ্রাম সম্পর্কে তার বক্তৃতায় কি বলা দরকার তার মূল কথাগুলো কোয়েসলিন তাড়াতাড়ি ওকে বুঝিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে চোখ তুলে সে তাকায় সরাইখানার বৈঠকখানার দিকে, সেখানে কয়েক সারি চেয়ার সাজানো আছে। বৈঠকখানায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না। প্রস্তুতি তার নিখুঁত। পতাকা, পোষ্টার, ইস্তাহার, পত্রবাদের চাঁদা সংগ্রহ—এর মাধ্যমে লোকের মধ্যে একটু সাড়া পড়েছে। আজ সন্ধ্যার স্লোগান: "জার্মান চাষীকে কে সাহায্য করে?" বক্তা বাছা হয়েছে সহর থেকে আসা ব্রাইতাইজ এবং বটৎসেনবাখের ৎসিম্রিশকে। বেশীর ভাগ চাষীই লোকযাত্রার মত কালো পোশাক পরে এসেছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা ছেলেরাই ঘরের বেশীর ভাগ ভ'রে দিয়েছিল। চাষীরা এসেছিল কৌতূহলের বশে, দেখেশুনে চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাদের, এই দুঃসময়েও যখন ছেলেদের ভাল জামাকাপড় এবং শক্ত জুতো যোগাতে পেরেছে তখন এদের পিছনের শক্তি নিশ্চয়ই বিরাট। এই দৃশ্য দেখে কিছু লোক ভাবতে থাকে: পরে অনেক কাজে দিতে পারে এমন কিছু থেকে তাদের ছেলেদের সরিয়ে রাখা সুবিবেচনার কাজ হবে কি না! সভায় মেয়েরা বিশেষ আসে নি। নিকলাসের ভাবী স্ত্রী এসেছে আর জুকেলের বোন এবং ধাত্রী মারিয়াম জাইজেল। দু'বছর আগে সহর থেকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা নিয়েছে মারিয়ান। তা ছাড়া একেবারে দৈবাৎ মদপেষাওয়ালার স্ত্রী এসে হাজির হয়। অন্যরা তার কাছ থেকে সরে যায় এবং কি ঘটছে বুঝবার আগেই কে একজন হয় ইচ্ছে ক'রে না হয় আকস্মিকভাবে তার গায়ে বীয়ার ঢেলে ফেলে।

জুকেল ব্রাইতাইজের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। প্রথমে এই সভার জন্য ভয় ভয় করছিল তার। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারের জন্য ব্রাইতাইজ নিজেই এসেছে। জুকেল জানে এ লোকটি পাশে থাকলে তার কোনও ক্ষতি হবে না অন্ততপক্ষে। কোয়েসলিনের সঙ্গে আলোচিত কথাগুলো ব'লে শান্তভাবে সে স্থানীয় চাষীদের অভিনন্দন জানায়। সে ভাল ক'রেই বুঝতে পারছিল যে চাষীদের কয়েকজন হাসছে। বৃদ্ধ মেরৎস্-এর দাড়ি কৌতুকে নাচছিল। জুকেলের মনের মধ্যে একটা চিন্তা ঝলক দিয়ে যায়: বিয়ের জন্যে আমার সরমিষর থেকে কি ও জিনিষপত্র অর্ডার দেবে?

ব্রাইতাইজ তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে আসে। প্রতি সন্ধ্যায় সে তার গাড়ি করে একপ্রান্ত থেকে অপর-প্রান্ত পাড়ি দেয়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ওরা সংক্ষিপ্ত ক'রে ঠিক করে নিয়েছিল যাতে ক'রে প্রতি সন্ধ্যায় অন্ততঃ পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সভায় সে বলতে পারে। বিশ বছর দুগ্ধ সমিতিতে থাকায় সে লোকের সঙ্গে আলাপ করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনী প্রচারের শুরুতেই অবশ্য সে দুগ্ধ সমিতির কাজে ইস্তফা দিয়েছে। বাঁহাতের উপরের অংশে গুলী লাগায় তার হাতখানা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেজন্যে বক্তৃতার সময় সে শুধু বাঁহাতখানাই নাড়ে। আলোচ্য বিষয়ের মূল কথাগুলো বোঝাবার জন্য থেকে থেকে ডানহাতের মুঠি দিয়ে সে টেবিল ঠোকে। ঠিক ওই একই রকম করবে পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে। যতবার সে টেবিলে ঘা দেয় চমকে ওঠে চাষীরা। আলোচ্য বিষয়গুলো যেন পেরেকের মত গেঁথে যায় তাদের মাথায়। বক্তৃতা শেষ হ'লে হাত তোলে ব্রাইতাইজ এবং ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে যায় বাইরে। নীরবতার মধ্যে মোটর স্টার্ট দেবার গর্জন শোনা যায়, তারপরেই আওয়াজ ওঠে "হাইল"।

বটৎসেনবাখের চাষী ৎসিম্রিশ দাঁড়িয়েছিল তার কমরেডদের পিছনে। কোণ থেকে ঠেলেঠুলে সামনে আসে সে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওর ক্ষমতার আঁচ পায় তারা। ৎসিম্রিশ ছিল গোলাকার এবং ভারী গড়নের। চুল তার একেবারে খাটো ক'রে ছাঁটা, রগের উপর শুধু ছুটো লাল ছাপের মত দেখায় এখন। তার শরীরের বিরাট বর্তুলের উপর বসান একটি ক্ষুদ্র বর্তুল, সেটি তার মাথা। মুখখানা এমন কিছু নয়, তবে হাঁদামার্কা নয়, বরং শুধু ধূর্ততার চেয়ে আর কিছু বেশী আছে ওর মুখে।

ৎসিম্রিশ তার হাতের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার প্রসারিত হাতের আঙুলগুলো টেবিলের উপর উপুড় করে ছড়ান রয়েছে। পাশে পাশে ঠাসা ছোট চোখ দুটো চেয়ারের সারির উপর ঘোরাফেরা করছিল মশার ঝাঁকের মত—এদিক থেকে ওদিক, উপর থেকে নীচে। এক একটি মশা যেন এক একজনের এক

কোঁটা ক'রে রক্ত শুষে নিচ্ছিল। এবার সে চাষীদের উদ্দেশ্যে বলে :

"গোস ওবারডাইলারবাখের মানুষ, গোস ওবারডাইলারবাখের ফোলক্সগেনোসেনরা (জনসাধারণের কমরেড বা সাথী, নাৎসী পার্টির সদস্যদের সম্বোধনের এই ছিল কায়দা)। বোধ হয় তোমরা ভাবছ বুড়ো ৎসিল্লিগটা আমাদের কাছে কি চায়? ও আবার এখানে কি করছে? ওকে ত আমরা চিনি, ও আর এমন কি বলবে যা নতুন কথা। আচ্ছা বেশ! কেন ৎসিল্লিগ এখানে দাঁড়িয়েছে, কেন সে এডলফ্ হিটলারের পোশাক গায়ে চড়িয়েছে, কাজের শেষে ঘরে ফিরে গিয়েও সে ঘরে থাকে নি কেন? ভাবনার কথা, তাই নয়? ৎসিল্লিগ কেন এস. এতে যোগ দিল? হাঁ, কেন?

"কেন, তা বলি : ৎসিল্লিগ নাৎসীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, কারণ এরকম চলতে পারে না। সে নাৎসীদের দলে যোগ দিয়েছে কারণ ঘরে তার চারটি ছেলেমেয়ে, সবাই ক্ষুধার্ত, এভাবে চলতে পারে না। কারণ সে একজন জার্মান চাষী, হাঁ, ৎসিল্লিগ জার্মান চাষী ব'লে আর তারা ওর জমির সর্বনাশ করেছে ব'লে।

"শত্রুরা যা ফেলে গেছে, দেশের মধ্যে থেকে ইহুদিরা আবার তার রস নিংড়ে শুষে নিচ্ছে। আগে সে একবার বন্দুকে কাঁধ দিয়েছিল, এখন আবার সে বন্দুক ঘাড়ে নিয়েছে। যাদের বন্দুক নেই তাদের অন্ততঃ ফসল তোলা কাঁটা আছে, জার্মান গ্রাম থেকে ইহুদি এবং লাল জানোয়ারগুলোকে খেদিয়ে দূর করার পক্ষে ওগুলো কিছু মন্দ হাতিয়ার নয়।

"একটু আগেই তোমরা মূল কথাগুলো শুনেছ, যার মানে হ'ল এডলফ্ হিটলার আমাদের ঘর গুছিয়ে নিতে বলেছেন। আর ৎসিল্লিগ তোমাদের বলতে চায় : এতদিন পর্যন্ত উল্টো লোককে দেনা শোধ দেওয়া হচ্ছে, এখন আমাদের দেখতে হবে যাতে ঠিক লোকেরা তাদের প্রাপ্য পায়। যারা ভাল ভাল কথা বলতে পারে তারা নয়, যারা গরীব মানুষ তারা। আর আমাদের সকলের জমি জড়ো করলে যা জমি হয় তার চেয়েও বেশী জমি যারা আত্মসাৎ করেছে, অথচ যাদের জমির সঙ্গে সম্পর্ক শুধু চোখের, তাদের শীগগিরই জমিকে চিনতে হবে হাত দিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে এবং পিঠভাঙা পরিশ্রম করে। আমার কথা বিশ্বাস কর। জার্মান জমির উপর দিয়ে বিরাট এক লাঙল চ'লে জমির নতুন সীমানা ঠিক ক'রে দেবে। দেখে নিও আমার কথা ফলে কি না।

"তোমরা যদি তোমাদের উপার্জন বংশধরদের জন্য রেখে যেতে চাও, যদি চাও যে সেগুলো ইহুদিদের কবলে না পড়ে, যদি ঋণের বোঝা কমাতে চাও, যদি জমি, বলদ ও যন্ত্রপাতি চাও, যদি চাও যে তোমাদের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে উঠুক তবে দেখো যেন ৎসিল্লিগ যে জামা পরেছে সেই সার্ট তোমাদের গায়েও ওঠে। হাঁ, এই সার্ট।"

সে টেবিলটা সরিয়ে দেয়, সার্টের সামনেটা পাকড়ে ধ'রে টান মারে। জিনিসটা যেন ব্রোঞ্জের তৈরী ব'লে মনে হয়। ৎসিল্লিগ একটা লম্বা নিঃশ্বাস নেবার মত ভঙ্গি করে। তখন চাষীদের কয়েকজন সামনের দিকে ঠেলে এগোয়, অন্যরা ফিসফিস করে কথা বলতে সুরু করে, দরজার কাছে একটা গোলমাল লেগে যায়। ঘোড়া যেমন পা ছোঁড়ে তেমনি ক'রে শূন্যে লাথি মারে ৎসিল্লিগ। হাতের উপর ভর রেখে সে কথা বলতে থাকে, শরীরটা থাকে স্থির, নিশ্চল।

চাষীরা আড়ষ্ট ও নির্বাক হয়ে বসে ছিল। কোনও পূর্বাভাস না দিয়েই হঠাৎ বক্তৃতা শেষ করে ৎসিল্লিগ, গান গেয়ে ওঠে ছেলেগুলো। এ যেন গুডফ্রাইডের মত, চাষীদের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণ নেমে যায়। ৎসিল্লিগ চেঁচিয়ে ওঠে "হাইল". হঠাৎ স্থগিত হয়ে যায় সভা। অপেক্ষমান গাড়িগুলোর দিকে ছুটে যায় ছেলেগুলো। চাষীদের নিঃশ্বাস ফেলবার আগেই গাড়িগুলো ভর্তি হ.য় যায় এবং রওনা দেয়। গ্রামের ভিতর থমথম করে একটা উত্তেজনা।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্র স্মৃতি

শ্রীকিরণবালা সেন

'পুণ্যস্মৃতি' বইখানি একটি ভক্তহৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি-স্বরূপ। বইখানি পড়লে বোঝা যায় কত সহজভাবে সীতা-দেবী গুরুদেবকে জেনেছেন, কত সহজে এই মহাপুরুষের মহিমা অন্তরে উপলব্ধি করেছেন। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি দ্বারা তিনি গুরুদেবকে পরম আত্মীয়রূপেও পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে যখন সীতাদেবী প্রথম দেখেন তখন তাঁর বাল্যকাল। বয়স মাত্র চার-পাঁচ বৎসর। তখন থেকেই তাঁর মনে এই মহাকবি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

শিশুরা পরম আগ্রহে রূপকথা-উপকথা শুনে থাকে। রূপকথার মনোমুগ্ধকর কাহিনী আর রাজা-রাজপুত্রদের অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা শিশুদের মনকে মুগ্ধ করে। রাজাদের সেই অপরূপ রূপ কল্পনায় ছিল ছোট্ট মেয়েটির। সেদিন যখন শুনলেন দু'জন রাজা তাঁদের বাড়ীতে এসেছেন—ছুটে গেলেন দেখতে। সুন্দর কালো রঙের পোশাক-পরা রবীন্দ্রনাথকে দেখলেন, আর দেখলেন বলেন্দ্রনাথকে। তাঁদের অসামান্য রূপ দেখে যেমন মুগ্ধ হলেন, তেমনি বিস্মিত হলেন। এখনকার রাজাদেরও যে এত রূপ হতে পারে তা জানা ছিল না।

পরে বয়সের সঙ্গে গুরুদেবের সাহিত্যের সঙ্গেও ক্রমশঃ পরিচয় হতে লাগল। পশ্চিমে এলাহাবাদে যখন থাকতেন, তখন প্রবাসীতে গুরুদেবের নানা লেখা বের হ'ত, পড়তেন। তখন 'গোরা'র যুগ—মাসের পর মাসে আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন ক্রমশঃ-প্রকাশ্য এই লেখার জন্যে। কিছুকাল বাদে পশ্চিম ছেড়ে তাঁরা বাংলা দেশে এলেন—গুরুদেবের জন্মস্থান কলকাতায়। এখানে এসে গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় গভীর হতে লাগল। সভাসমিতিতে, নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতেন, পাঠ শুনতেন। নিজেদের গৃহেও তাঁকে মাঝে মাঝে পেয়েছেন। গুরুদেবের কণ্ঠে গানের পর গান শোনবার সৌভাগ্যও তাঁদের হয়েছে।

গুরুদেব অনেক গান ত পরেও রচনা করেছেন। তাঁর কণ্ঠে গান এলে একটার পর একটা আসতেই থাকত দেখেছি। এক-একবারে এক-এক ঝাঁক গান তৈরি হয়ে যেত। এত গান সৃষ্টি হ'ত কিন্তু তিনি নিজের গানের সুর ভুলে যেতেন। বিস্মৃতি থেকে রক্ষার জন্য তখনই অন্যের কণ্ঠে সেই সুর তুলে দিতেন। যাঁরা তাঁর গানের সুর ধরে রাখতে পারেন এমন দুই-একজন এই সময়ে প্রস্তুত থাকতেন, কখন ডাক আসে গান শেখবার। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, রমা কর, শৈলজা মজুমদার, শান্তিদেব প্রভৃতি। গুরুদেবের গান সময় নির্বাচন করে আসত না—যখন-তখন দিনে-দুপুরে এমন-কি রাত্রেও তখনই তাকে সেই গান শেখাতে হ'ত। তবে পুরনো দিনের গানের সুর ঠিক মনে থাকত। যখন নিজে গান শোনাতেন—সেই আগের গান গাইতেন—সে সুর ভুল হ'ত না। অনেক সময়ে ত এইসব গান শোনাতেন। যেমন 'অন্তরে দেহ আলো' 'তবু মনে রেখ', 'বড় বেদনার মত'। আরো অনেক গান এরকম গাইতেন। সেই সুর আজো যেন কানে জেগে আসে।

যখন যেখানে কবির কণ্ঠে যে গান শুনেছেন প্রায় সব গান সীতাদেবীর মনে গাঁথা আছে। তাই কোন্ গান কোথায় শুনেছেন তাও লিখেছেন—যেমন, 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি'—আরো অনেক গানের কথা লিখেছেন।

একবারের কথা লিখেছেন, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের তখনকার বাসস্থান মেয়ো হাসপাতালের উপরের প্রকাণ্ড ছাদের কথা—সেখানেও কবির গান শুনেছিলেন। সেই প্রকাণ্ড ছাদটির কথা আমারও মনে আছে। গঙ্গার একেবারে উপরেই এই বিশাল ছাদটি। সুন্দর একটি মনোরম সন্ধ্যায় সেখানে গিয়েছিলাম সেনশাস্ত্রীর সঙ্গে গুরুদেবেরই কোনো পড়া উপলক্ষে হয়ত।

সীতাদেবী গুরুদেবের প্রতিদিনের ঘরোয়া জীবনের কথাবার্তা, চালচলন সহজভাবে অতি সুন্দর করে লিখেছেন যা পড়লে আশ্চর্য বোধ হয়। মনে হয় না এ রকম লেখা কিছু কষ্টসাধ্য, কিন্তু সহজ নয় মোটেই। গুরুদেবের সান্নিধ্যে বাস করেছেন অনেকদিন—কিন্তু এই সহজভাবে দেখা আর তা সহজভাবে লেখা। শুধু সেই সময়েরই নয়, বহু পূর্ব থেকেই তাঁর এই সাধনা। সীতাদেবীর লেখা

পড়তে এত ভালো লাগে যে পড়তে পড়তে সেই কালে মন চলে যায়।—যেকালে আমিও ছিলাম।

শুধু রবীন্দ্রনাথকেই যে দেখেছেন তা নয়; শান্তিনিকেতনের তখনকার পারিপার্শ্বিক চিত্রও দেখতে পাই তাঁর লেখায়।। তাঁর আশেপাশের লোকজন প্রতিবেশী সকলের দিকে দৃষ্টি ছিল। অধ্যাপকদের বাড়ী বাড়ী যেতেন—তাঁদের বাড়ীর সকলের সঙ্গেই সখ্যতা ছিল। আত্মীয়তা বন্ধুত্ব স্থাপন হয়েছিল সকলের সঙ্গে।

এখনকার মত বিরাট সংসার ত তখন ছিল না। এই শান্তিনিকেতনে সেই স্বল্পসংখ্যক অধ্যাপকদের বাড়ী আর প্রতিবেশী সকলে মিলে আমরা এক পরিবারের মতই ছিলাম। তাই সীতাদেবী লিখছেন—

"তখনকার দিনের শান্তিনিকেতনে ছাত্র, অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথের পরিবারভুক্ত অনেকে, আমাদের মত স্বল্প বাসিন্দা দু-চার জন, সকলে মিলিয়া যেন একটি বিরাট পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাহাকেও পর বলিয়া মনে হইত না। সকলের সুখে দুঃখে সবাই অংশ লইতে ছুটিয়া যাইত।

"রবীন্দ্রনাথ যেন এই বিরাট পরিবারের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। তাঁহার প্রতি একান্ত ভালোবাসাই ছিল আমাদের মিলনের সূত্র।"

তখনকার দিনের নেপালবাবু, সন্তোষবাবু, বিধুবাবু, দিনেন্দ্রনাথ, বড়মা, কত আর নাম লেখা যায়—সকলেরই চিত্র সুন্দর ফুটে উঠেছে ওঁর লেখায়। আমরাও বাদ পড়ি নি, ইতিহাসে স্থান পেয়েছি আমরাও। সীতাদেবীর লেখা পড়তে পড়তে সেই কালে মন চলে যায়। সেই কালের পুঁটি পণ্টু প্রতিদিনের কথা মনে পড়ে মন উদাস হয়ে যায়। তখনকার দৈনন্দিন জীবনের মধুর দিনগুলির স্পষ্ট ছবি মনে ভেসে আসে। তাই এই বইখানি সেই যুগের মূল্যবান একটি ইতিহাস বলা যায়। এই বইখানি পড়লে আগামী-কালের লোকেরা তখনকার দিনের সহজ সুন্দর আনন্দের পরিবেশটি কল্পনা করতে পারবেন মনে করে আনন্দ পাই।

গুরুদেবকে নিয়ে পারুলবনে যে বেড়াতে যাবার কথা লিখেছেন—সেদিনটির কথা আমারও মনে আছে। সেদিন সন্ধ্যায় পারুলবনের ধারে সতরঞ্চি পেতে সকলে বসেছিলেন। ঘাসের উপরেও অনেকে বসেছিলেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনটিতে বসে অনেকে গান করলেন। গুরুদেব স্বয়ং অনেক গান গেয়েছিলেন। গুরুদেবের অত্যন্ত অনুরোধে সেন-শাস্ত্রীও একটি হিন্দী গান গেয়েছিলেন। পরদিন সীতাদেবী তাঁর বাবাকে বলছেন—'ঠাকুর্দা কাল কী সুন্দর গান গাইলেন। কিন্তু ঠানদির কি কাণ্ড—একটুও ইচ্ছা ছিল না যে ঠাকুর্দা গান করেন।' বাস্তবিকই আমার ইচ্ছা ছিল না—এত ভালো ভালো গাইয়েদের মধ্যে—আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যেখানে গাইছেন, সেখানে তিনি কি গাইবেন, তাই আমার আপত্তি ছিল। ফিরলামও সেদিন আমরা সকলে হেঁটে। গুরুদেব সেই সময় খুব হাঁটতে পারতেন আর দ্রুতই হাঁটতেন। গুরুদেব সারা পথ গান গাইতে গাইতে এসেছিলেন—সে কথা আমার ঠিক ভালো মনে নেই। আমার তিনটি শিশুই আমাদের সঙ্গে ছিল, তাদের নিয়েও সকলের কি আনন্দ! সেদিনকার ভ্রমণের আনন্দ এখনও মনে আছে।

সীতাদেবী প্রথম যেবার শান্তিনিকেতনে আসেন সেবারের কথা মনে আছে। সীতাদেবীর লেখাতে তখন-কার দিনগুলি আরও স্পষ্টভাবে মনে আসে। তাঁরা যে নিচু বাংলায় ছিলেন, শান্তাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সে-কথা মনে আছে। গুরুদেব সর্বদা ওঁদের কাছে যেতেন, খোঁজখবর নিতেন দেখেছি। এই অতিথিদের যখন কিছু পড়ে শোনাতেন তখন আমাদের ঘরকন্নার বিশেষ কোন বাধা না থাকলে আমরাও শুনতে যেতাম। তখনকার শান্তিনিকেতন আকারে এত বৃহৎ ছিল না আর আমরা মেয়েরাও সংখ্যায় বেশী ছিলাম না! তাই এই অতিথি কয়েকটিকে পেয়ে আমরাও সে কয়দিন খুব আনন্দে ছিলাম।

একবার মন্দিরে যাবার পথে শাড়ী খুঁজতে সীতাদেবীরা 'নূতন বাড়ী'তে আমাদের ঘরে এসেছিলেন। আমি তখন নাকি আমার শিশুদের নিয়ে একটু বিব্রত ছিলাম। সে-কথা বেশ মজা করে লিখেছেন। আমার বিলম্ব হবে মনে করে তাঁরা তখন অন্যান্য অধ্যাপকদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ালেন। সেখানে ছোট্ট শান্তিদেব ঘোষকে দেখে মুগ্ধ হলেন। কালো পাথরে খোদাই-করা সুন্দর পুতুলের মত শিশুটি। পরে তাঁরা মন্দিরে গেলেন। আমরাও গেলাম।

সব সময়েই যে গুরুদেব গুরুগম্ভীর আলোচনা করতেন তা নয়। হাসি-ঠাট্টা রসিকতায় তাঁর কথাবার্তা সরস থাকত। তাই সীতাদেবী লিখেছেন, "অল্পবয়স্কদের সঙ্গেই যেন তাঁহাকে সবদা আনন্দ বেশী দিত। ছেলেমেয়েরাও তাঁহাকে পাইয়া বসিত। দেবতাকে মানুষ যেমনভাবে ভক্তি করে ও ভালোবাসে, সেই ভক্তি ও ভালোবাসা মানুষ হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই পাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু দেবতার মত দুরধিগম্য ছিলেন না।"

তাঁদের কলকাতায় ফেরার দিন এল সেবার। পতীর

যান্ শান্তিনিকেতন ছেড়ে গেলেন। সেদিনের কথা লিখেছেন—

"আগেকার জীবন হইতে কেমন করিয়া যেন অনেকখানি দূরে সরিয়া গেলাম। নূতন একটি দৃষ্টি খুলিয়া গেল, যেন উপনয়নের পর দ্বিজত্ব লাভ করিলাম। চোখে দেখার ও কানে শোনার জগতের উপর হইতে একটি অদৃশ্য যবনিকা উঠিয়া গেল। অন্তরালে যে নিত্যসুন্দর আর একটি জগৎ আছে তাহারই পরিচয় নানাভাবে নানারূপে হৃদয়ের দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল।"

তার পরেও কলকাতায়ও দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনায় বাধা হয় নাই।

মাঝখানে শান্তিনিকেতনে তাঁরা দুই বছর এসে বাস করেছিলেন।

গুরুদেব যেখানে থাকতেন তার কাছেই একটা বাড়ীতে সীতাদেবীরা থাকতেন।

গুরুদেবের সাহচর্যে এখানে বাস করবার দিনগুলি যে কত আনন্দে তাঁদের কেটেছে বুঝতে পারা যায়। কাছাকাছি বাড়ী ছিল। লিখেছেন—"বাড়ি বসিয়াই সারাদিন তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত। ক্রমাগত লোক আসিতেছে একের পর এক দেখা করিতে, প্রণাম করিতে, পরামর্শ লইতে।" গুরুদেবকে প্রায় সর্বদাই দেখতে পেতেন—উষাকালেও কতদিন দেখেছেন গুরুদেবকে তাঁর উপাসনার আসনে। তাঁর কথা, তাঁর প্রতিদিনের আচরণ, তাঁর বেশভূষণ এমন সুন্দর করে লিখেছেন—যেন প্রতিদিনের নৈবেদ্য সাজান।

গুরুদেব ত কতই বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিলবার কোন বাধা ছিল না।

এই লেখাতে গুরুদেবকে আমরা যেন দেখতে পাই। সেই সব দিনের ছবিও ভেসে ওঠে যেন চোখে। কখনও তিনি গান গেয়ে শোনাচ্ছেন, কখনও পড়ে শোনাচ্ছেন। সীতাদেবী লিখেছেন—

"তখনকার দিনের কথা যখন স্মরণ করি, তখন এই ভাবি যে কখনও ত তাঁহাকে কাহারও অনুরোধ, উপেক্ষা করিতে দেখি নাই। সে যতই ক্ষুদ্র, যতই অর্বাচীন হোক না কেন। তাঁহার যেন শ্রান্তি-ক্লান্তিও ছিল না। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অম্লান বদনে এক আসনে বসিয়া গান গাহিয়াছেন, গল্প করিয়াছেন, কবিতা পাঠ করিয়াছেন।"

লিখেছেন—

"মর্মরনির্মিত মূর্তির মত একই ভাবে বসিয়া থাকিতেন। সহজভাব গ্রহণ করিয়াও সকল দিক দিয়াই তিনি যেন মনুষ্যত্বের ক্ষুদ্র সীমানার বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই সামান্য জিনিসগুলি হইতে বোঝা যায়।"

সীতাদেবী খুব অল্প বয়স থেকেই লিখে আসছেন—তিনি সুলেখিকা। তাঁর কত গল্প, কত উপন্যাস—সেকথা সকলেই জানেন। এখনো তাঁর গল্প বের হয়। পড়তে ভাল লাগে। গুরুদেব তাঁর বইয়ের প্রশংসা করতেন।

গুরুদেবের লেখার বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য করেছেন সীতাদেবী। লেখা কপি করতেন, তর্জমা করতেন। প্রথমে জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিখানি নকল করে সীতাদেবী প্রেসে দিতেন, যাতে আসল লেখাটি পরিষ্কার থাকে। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিখানি সেরেছে গুরুদেব সীতাদেবীকে দিয়েছিলেন। এখনও সেখানি তাঁর কাছে আছে লিখেছেন।

'অচলায়তন'-এর মূল কপি লেখা করাবেন গুরুদেব ইচ্ছা করেছিলেন। বহু কয়েকদিন রিহার্সালও দিয়েছিলেন দেহলী বাড়ীর উপরে—মনে আছে। শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নাই। 'মালতী'র পার্টের বিষয়ে সীতাদেবী লিখেছেন—"মালতীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি, তিনি অতিশয় ভালোমানুষ, অমন বাঁকানো-বাঁকানো কথাগুলির ঠিক সুর তাঁর মুখে আসিত না।" এটা ঠিক কথাই। গুরুদেব সীতাদেবীকে বেছে ধরেছিলেন মালতীর পার্ট করতে, মনে আছে। সেই ভালোমানুষটি তখন এই আমিই ছিলাম। সে কথা ভাবতে মজা লাগে।

ক্যাম্পি ক্লেনের কথাও খুব মনে আছে। সে ভারি মজার হয়েছিল। গুরুদেব ও রামানন্দবাবু ছাড়া পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল সেখানে। সাজসজ্জার কথা ত সীতাদেবীই লিখেছেন সুন্দর করে। প্রতিমা দেবী বেশ হয় ইরানী মেয়ে সেজেছিলেন। মনোরমা ঘোষও সেজে ছিলেন, আরো কেউ কেউ। সেদিন সন্ধ্যার আগে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল মনে পড়ে। তবে তখন বৃষ্টি ছিল না।

তখনকার খোয়াই মনে পড়ে। চীপ সাহেব কুঠির কথাও মনে হয়। আমরাও বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছি কত সময়ে। সভাবে কুলগাছের জঙ্গলে কত কুল পড়ে থাকত—তা খাওয়া যেত। এখন কেউ কল্পনাও করতে পারবে না তখনকার চীপ সাহেবের কুঠি। সেখানে এখন কত প্রতিষ্ঠান, কত বড়ো বড়ো সব বাড়ী তৈরি হয়েছে। এই সব জায়গা এখন এত কাজে লেগেছে দেখে আনন্দ হয়।

১৯১১ সালে গুরুদেবের জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে

হয়েছিল। সেখানেও সীতাদেবীরা ছিলেন। শান্তি-নিকেতনে সেদিনের বর্ণনা সুন্দর দিয়েছেন। পত্রপল্লবে ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত একটি মাটির বেদির উপরে তাঁহার আসন প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানে জন্মোৎসবের সময় গুরুদেব গিয়ে বসেছিলেন। এই আসনের পরিকল্পনা সেনশাস্ত্রীর—মনে আছে। তিনি তাঁর ছাত্রদের দিয়ে করিয়েছিলেন। এই কথায় মনে পড়ছে—নন্দলালবাবু যখন এলেন তাঁকেও ঐ ধরনের পত্রপল্লবে পত্রপুষ্পে সজ্জিত আসনে বসিয়ে সংবর্ধনা করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনাও সেনশাস্ত্রীর ছিল।

সেকালের শান্তিনিকেতনের ইতিহাস এই বইটিকে বলা চলে। সে-যুগের সহজ আনন্দের ঘরোয়া পরিবেশের চিত্রটি সুন্দর ভাবে মনে জেগে আসে বইখানি পড়লে। সীতাদেবীর লেখা এখানে আর একটু দিয়ে শেষ করি। তখনকার দিনের কথায় গুরুদেবের কথা লিখেছেন—

"তখনকার দিনে তাঁহাকে কাছে পাইলেই কৃতার্থ হইতাম। নিজেদের হৃদয়-মন ভরিয়া উঠিত। আমরা যে কি অমূল্য সম্পদ বিনামূল্যে পাইতেছি তাহা ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতাম কি না জানি না। আলো, বাতাস, আকাশের নীলিমা না চাহিয়া না জানিয়াই মানুষ যেমন করিয়া পায়, তেমনি করিয়াই তাঁহার স্নেহ, তাঁহার সান্নিধ্য পাইয়াছি। ইহার যে কোনদিন অবসান হইতে পারে সে কল্পনাও করি নাই।"

এই কথা আজ আমাদেরও।*

---

* শ্রীসীতাদেবীর পুণ্যস্মৃতি। সংস্করণ ২২ শ্রাবণ ১৩৭১। সচিত্র। মূল্য দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯, বা ১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯।

মুখর অতীত

পুষ্পদেবী, সরস্বতী

(১)

এই ত সেদিনের কথা। হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার। ন মাসীর বিয়ের ঠিক হয়েছে। খবর পেয়ে আমরা আনন্দে দিশাহারা। শুধু বাবা যেন বড্ড চিন্তান্বিত হলেন। বললেন, কি জানি কি বুঝলেন ওঁরা। মায়ার কি বিয়ের বয়েস হয়েছে? পেট থেকে ন বছর। আট বছরও পোরে নি, ও কি শ্বশুর ঘর করতে পারবে? তার সৎ শাশুড়ী! বাবা চিরকালই অদ্ভুত মানুষ। সব বিষয় বড্ড গুরুত্ব নিয়ে ভাবা স্বভাব। মা'র আনন্দের অবধি নেই, বোনের রাজার বাড়ী বিয়ে হচ্ছে।

বেণশ্রির পার্কে বেড়াতে গিয়েছিল ন মাসী। সেখানে দেখেই রাজা তাকে পছন্দ করেছেন। কেষ্টনগরে প্রচুর জমি ঘিরে আমাদের বাড়ী। গরুর গাড়ি করে বাগানের তরি-তরকারি পাঠানো হ'ল ন মাসীর বিয়ের জন্যে। আমরা যখন পৌঁছলাম বর তখন এসে গেছে। ফুল দিয়ে সাজানো মস্ত ময়ূরপঙ্খী করে বর এসেছে। ওমা, ন মাসীকে যেন চেনা যাচ্ছে না! ছিটের ফ্রকপরা ন মাসীকে আজ হীরের গয়না আর লাল বেনারসী প'রে যেন রাণীর মত দেখাচ্ছে! রূপ অবিশ্যি ভগবান রাণীর মতই দিয়েছিলেন ন মাসীকে। আমার তখন কোট-বুট-পরা অপরূপ সাজ। মাঘের দারুণ শীতে যে বতামা পরি নি এইই রক্ষে! ন মাসী আমার চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড়। ভারি ভাব ছিল দু'জনে। চণ্ডীর পুঁথি কোলে ন মাসী বসেছিল। ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে, রাণু! এলি তুই? দেখ, কত পুতুল এসেছে তত্ত্বে। সব সোনার গয়না পরা। আটটা পুতুলের চারটে তোর, চারটে আমার। মেজ মাসীমা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। এখন উঠিস নি মায়া! উঠতে নেই। ওসব পুতুল ফেরৎ দিতে হবে তোর শ্বশুর বাড়ীতে, ও থেকে রাণুকে দিস নি। কে শোনে কার কথা? শুধু পুতুলই নয়, রূপোর চেয়ার-টেবিল, সেলাইয়ের কল, পেয়ালা-প্লেটের সব ভাগ হয়ে গেছে তক্ষুণি। চিরকাল ন মাসী ঐ এক ধরনের মেয়ে। নিজের বলে কিছু ওর নেই। একবার ওর বসন্ত হয়। আমাদের সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা হয়েছিল। ও চুপি চুপি লজেন্স খাইয়েছিল আমায়। তাও সেখা লবেঞ্চুষ। যেটা ভাল লেগেছে সেটাই কাগজে মুড়ে রেখেছে আমার জন্যে। ফলে যা হবার হ'ল। বসন্ত থেকে রক্ষা পেলাম না সে যাত্রা। জরি-ভেলভেটের পোশাক-পরা পুতুলের দল মস্ত কাঁচের বাক্সে শুয়ে আছে।

এমনি পুতুল দেখেছিলাম জে. কে. বিশ্বাস মশায়ের মেয়ে প্রতিভার। বিশ্বাসমশাই ছিলেন বাবার খুব বন্ধু। যার নামে আজ শিশু মহলে প্রতিভা মেমোরিয়াল নাম হয়েছে। তখন যশোরে জে. কে. বিশ্বাস পোস্টেড। বাবা কি জানি কি কাজে যশোর গেলেন। আমি গেলাম বাবার সঙ্গে। আমায় প্রতিভাদের বাড়ী রেখে বাবা কাজে গেলেন। প্রতিভার এমনি এক বাক্স পুতুল ছিল। আর ছিল বেবী প্রতিভার মত একজন মা। আজও সেই নতুন ঢঙের শাড়ী পরা আর সবুজ ভেলভেটের চটি পরা সুন্দরী তরুণীর চেহারা আমার চোখের ওপর জ্বল জ্বল করে ভাসছে। ভারি অবাক লেগেছিল তাঁর খস খস করে ইংরিজী লেখা দেখে। বলছি সেটা চল্লিশ বছর আগের কথা। বেশী লেখাপড়া করার তখন রেওয়াজ ছিল না। অথচ মানুষটির কোমলতার অবধি ছিল না। প্রতিভাকে —আমাকে পুতুল খেলায় যখন মগ্ন হঠাৎ গাড়ির হর্ণ শুনে প্রতিভা চেঁচিয়ে উঠল, খোকা এসেছে! খোকা এসেছে! বলে। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, তবে যে শুনলাম প্রতিভার আর ভাই-বোন নেই, তবে আবার খোকা এল কোথা থেকে? ও মা! এ যে দিব্যি দাড়িগোঁফওলা খোকা। জে. কে. বিশ্বাস মশায়ের যে কি সৌম্য শান্ত চেহারা ছিল যে না দেখবে সে বুঝবে না। বাবাকেই প্রতিভা খোকা বলত। শিখেছিল ঠাকুমার কাছ থেকে। জে. কে. বিশ্বাস মেয়েকে বলতেন মামণি। তাঁর কলকাতার বাড়ীর

নাম "মামণি"। দার্জিলিং-এর বাড়ীর নাম মামণি, পুরীর বাড়ীর নাম মামণি। সেই মামণি মারা গেল হার্টের অসুখে। কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেলেন বিধান মশায়। অন্ধ হয়ে তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে রইলেন। অনেক আগেই স্ত্রী হারিয়েছিলেন। সব সম্পত্তি দান করলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে—প্রতিমার নামে। নিজের নাম নিঃশেষে মুছে দিয়ে চলে গেলেন প্রতিমাকে চিরস্মরণীয়া করে।

ন মাসীর বিয়েতে একমাস ধরে উৎসব চলল তার শ্বশুর-বাড়ীতে। আজ যাত্রা, কাল পালাগান, পরশু কবির লড়াই। তার পর অপেরা। খাওয়া-দাওয়া ত আছেই। তবে মুস্কিল ছিল এই যে, ন মাসীকে দেখতে যেতে কেউ চাইত না। ভারি কড়াকড়ি বন্দোবস্ত ছিল তাদের বাড়ীর; হয়ত ছোটমামা গেছে দেখতে, সরকারের কাছে আগে এত্তেলা পাঠাতে হবে। সরকারের পাহারাদারি! সে বললে, "বসুন ঐ বেঞ্চিটায়। রাজা বাহাদুর উঠলে খবর পাঠাব।" ছোটমামা বাড়ীর আদুরে ছেলে, তাল কলার; বারান্দার পাতা বেঞ্চিতে বসে থাকতে তার খারাপ লাগত। তবু ন মাসীর কথা ভেবে এ সব মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল, সরকারের টনক আর নড়ে না।

তাদের বাড়ীর সবই অদ্ভুত! ফোন থাকত একটা কাচের আলমারির ভেতর চাবি দেওয়া। ফোন বেজেই চলেছে—বেজেই চলেছে, কেউ ধরত না। ছোটমামা থাকতে না পেরে বলে ফেলেছিল, এ কি সরকার মশাই; ফোনটা ধরুন না? চাবি নেই বুঝি? তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সরকার বলেছিল; থাকলই বা চাবি, কেন ধরব? আমরা কি কারুর কেনা চাকর? আমাদের যখন দরকার হবে আমরা ফোন করব। এই মনোভাবটা ছিল সে বাড়ীর মজ্জাগত। যখন দরকার হবে তোমাকে মাথায় তুলে নাচবে তারা। যে মুহূর্তে দরকার শেষ হয়ে যাবে, সাধারণ ভদ্রতাও ভুলে যাবে তারা। এইটেই না কি রাজা-রাজড়ার কায়দা!

কায়দা আরও ছিল। যাক, কপাল ভাল ছোটমামার। ন মাসীর ভাশুর হঠাৎ বেরুলেন। বাড়ী থেকে জুড়ি-গাড়িতে উঠতে গিয়ে ছোটমামাকে দেখে বললেন, কি ব্যাপার, সাহেব যে? কখন আসা হ'ল? বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে? ওরে কেষ্ট, কেষ্ট, বাবুকে ভেতরে গিন্নীমার কাছে নিয়ে যা। এই কেষ্ট নামেও বিভ্রাট! যাকে কেষ্ট বলা হ'ল তার আসল নাম বলরাম। হঠাৎ নাম পরিবর্তন হওয়ায় সে সব সময় সাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। রাজা বাহাদুরের চাকরের নাম কেষ্ট, কেষ্ট বলে ডাকা তাঁর অভ্যেস। তিনি মাইনে দেবেন, তিনি চাকর রাখবেন, তাঁর যা খুশী বলবেন। কেষ্ট দেশে গেছে, বদলি দিয়ে গেছে তার মামাকে। সে কি বড়বাবুর দোষ? তার নাম বলরাম হোক, সুভদ্রা হোক, তিনি কেষ্টই বলবেন। তাই এই বিপত্তি। ছোটবাবুর চাকরের নাম হরি। সেও একবার তার শ্বশুরকে বদলি দিয়েছিল। শ্বশুরকে হরি নামেই সাড়া দিতে হ'ত! চাকর শুনতে পাক বা না পাক, বুঝতে পারুক বা না পারুক, তাতে ছোটবাবুর কিছু এসে-যায় না। তিনি ডাকতেন হরে—ওহে হরে—ওরে ব্যাটা হরে। তখন অন্য কেউ এসে হরের শ্বশুর মিছিরলালকে বলবে কি হে! ছোটবাবু ডাকছে শুনতে পাচ্ছ না? এই হ'ল চাকর তত্ত্ব।

যাক, তার পর বলরাম ওরফে কেষ্টর সঙ্গে ছোটমামা চললেন অন্দরে। প্রথমেই ন মাসীর শ্বশুরের ঘর। ভারি মজার মানুষ। অনেক রকমের সিরাপ সাজান তাঁর ঘরে। কেউ গেলেই বলবেন, বল, কি সিরাপ খাবে? যে যা বলবে তাই দিতে পেরে তাঁর ভারি আনন্দ। যে-সব সিরাপ পাওয়া যায় না তাও রেখেছেন। পুরোনো হয়ে রং, গন্ধ সব বদলে গেছে তার। খেতে যেন ফিনাইলের মত। তবু তাই ঢক ঢক করে খায় ছোটমামা। ন মাসীকে দেখার আশায়। কিন্তু হায় কপাল! অনেক কষ্টে ন মাসীর শ্বশুর যোগাড় করেছেন তাকে। আর ছাড়েন? বলেন, "অত ব্যস্ত কেন? শোনো গল্প, সে ভারি মজার কাণ্ড!" —আসলে ঐ বদ্খদ সিরাপ খাবার ভয়ে কেউ আসে না তাঁর ঘরে। আজ নতুন কুটুম্বকে হাতের কাছে পেয়েছেন, আর ছাড়েন? জানেন যত অসুবিধেই হোক না, কিছু বলতে পারবে না মুখ ফুটে। বলেই চললেন, আর ত, সাহেব ব্যাটাদের ভোজ দিতাম। এক একটা ভোজে পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা খরচ হ'ত। তারা এক একটা ডিপ্লোমা দিত, ঐ দেখ কত টাঙান রয়েছে! এই দরিদ্র দেশে বোকা ধনীর স্থূলতম নির্বোধিতার সাক্ষ্য সেই ডিপ্লোমার কাগজগুলো দেখে হাড় জ্বলে যেত ছোটমামার। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। ন মাসীর শ্বশুর বলেই চলেছেন। সেবার সোনার ছড়ি গড়িয়ে দিলাম পচিশ জনকে, ভারি খুশী তারা। এখানে সাহেব বলে, হিসেবে কি বলে লেখা হবে? সাহেবদের ঘুষ আবার দেওয়াইনি কি না? বললাম, লেখ গিন্নির গয়না। গিন্নের; বুড়িকে তাবিজ করে গোঁজে তা যেন ভদ্রলোক। কম তোয়াজ করতে হয়েছে? ঐ যে সেবার সেই মেয়েটা লাট-সাহেবকে গুলী করতে যাচ্ছিল? আমি আর সেজকাকা

ছিলাম সেখানে। যেই না গার্ড দিয়ে তার হাত চেপে ধরেছে আমি পেছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। রায়বাহাদুর টাইটেল ত তাই থেকেই পেলাম। শুধু তাই কেন? সেবার যখন যুবরাজ কলকাতায় আসেন, আমাদের বাড়ীর মেয়েরাই ত তাঁকে বরণ করেছিল। মেহেরা জাজিমের নাম শোন নি? দু'বোন তারা এ বাড়ীর দু' বৌ হয়েছিল। বাসরে বর এসেছে, আর বৌরা গান গাও, গান গাও বলে তাকে জ্বালাচ্ছে। বর ছিল ভারি পাকা, সে বললে, আগে আপনারা বলুন আপনাদের কি নাম? ওরা দু'বোন বললে মেহেরা আর জাজিম। আর কনের নাম ছিল আঙ্গুর। তার পর যেই বলেছে বরকে যে আপনার কি নাম? বর বললে, "কাবলীওলা"। বাসরে হাসাহাসি পড়ে গেল। সেই মেহেরা জাফরান রংএর বেনারসী পরে যুবরাজকে বরণ করছিল। আমাদের বাড়ীর বৌ দেখে তখন যুবরাজের মাথা ঘুরে গেছে। ওদের ত সায়া-সেমিজ পরার রেওয়াজ নেই। এ বাড়ীতে ওসব ম্লেচ্ছ কাণ্ড চলবে না। খালি গায়ে সব ক্রেপের বেনারসী পরে গেছে। এধার টানে ত ওধার খসে এই অবস্থা, কোমরে হীরের চন্দ্রহার তাতে রাজার মুকুটের ছাপ। হীরের বাহার দেখে যুবরাজ সেই ছাপ ধরে দেখতে লাগল। মেহেরা ত লজ্জায় জড়সড়। কিন্তু তার আগেই যা হয়ে গেছে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন পাথরের পুতুল। তার আগের ঘটনা শোনার জন্যে ছোটমামা অবাক হয়ে চায়। সেই চোখে নজর পড়ায় বলেন, শোন, একটা ভারি বাচাল বৌ ছিল আমাদের। নাম পদ্মমালা। ভারি ঠ্যাঁটা সে। সে বলেছিল কেন? তাওর মামাশ্বশুর জ্যেঠার জল চাইলে দেবার আইন নেই আমাদের, চন্দ্র-সূর্য্যি দেখতে পায় না আমাদের মুখ, সদরে ছেলে মাথা ঘুরে পড়লে যাবার হুকুম নেই আমাদের, আমরা কেন ঐ সায়েবদের মধ্যে যাব? যেই না বলা, আমি বাবা বেরং মানুষ, বললাম, এত বড় আস্পর্দ্ধা, গুলী করব হারামজাদীকে।

তা গুলী করতে হ'ল না, নিজেই বিষ খেল মেয়েটা। কি কাণ্ড বল ত? বাড়ীতে লাট অতিথি আসছে, দেশ বিদেশ থেকে বাজনা-বাদ্যি আনিয়েছি। মোড়ে মোড়ে ইলেকট্রিকের তোরণ। ব্যাণ্ড, ব্যাগ-পাইপ, সানাই। তার মধ্যে তিনি বিষ খেয়ে পড়ে রইলেন। বাড়ীর সব ভয়ে কাঠ। আমার সেজকাকা বললেন, খাজনা ঘরে পুরে তালা দাও ওকে। যুবরাজ চলে গেলে যা হয় ব্যবস্থা হবে। কি আর ব্যবস্থা? এক তোড়া মোহর পেয়ে ডাক্তার ব্যাটা কলেরা বলে সার্টিফিকেট লিখে দিল। ঐ ধরনের বিয়েই ত কবি হেমচন্দ্র লিখেছিল—

"আর এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণ চাপ
শিবের বিয়ে নয়কো ইহে ধরবে নাকো সাপ।

* * * *

বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিসে তার?"

তোমরা পড় নি ইস্কুলে? বেটা আকাট মুখ্যু ত! পেছনের খিড়কি দিয়ে বৌ পাচার করা হ'ল। তবে অমন সুন্দর বৌ ত আর আমাদের বাড়ীতে ছিল না। যুবরাজ দেখল না, এই-ই দুঃখু। দেখত ত তাক লেগে যেত যুবরাজের। নাম ছিল পদ্মিনী, আমরা পদ্মমালা বলতাম। মানুষ হয়ে জন্মেছে যখন মরবেই। আর তা ছাড়া কথায় বলে ভাগ্যিমানের বৌ মরে, যুবরাজকে বরণ করে মরলে কি দোষ হ'ত? যত সব হাড়-হাবাতে কাণ্ড! এখানে বাড়ীর বৌদের আদর শুনে চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে ছোটমামার। আরে না বসে থাকলে আরও কত গাত্র-দাহকর কাহিনী শুনতে হবে। উসখুস করতে থাকে ছোটমামা। তখন আবার ডাক পড়ে কেষ্টর। অ্যাই ব্যাটা কেষ্ট! যা না, বাবুকে অন্দরে নিয়ে যা না। কেষ্ট পাশে দাঁড়িয়েই ছিল। আসুন বাবু! বলতেই ন মামীর শ্বশুর বললেন, এস বাবা এস, যখনই সিরাপ খেতে ইচ্ছে হবে এস—কথা কয়ে বড় সুখ পেলাম।

ছটো ঘর পেরুতে না পেরুতে মেজকর্তার সঙ্গে দেখা। বুড়ো হয়েছেন তবু কি বিক্রম! বাঘের মত পায়চারি করছেন। ছোটমামাকে দেখে বললেন, তুমি কে হে? অন্দরে যাচ্ছ যে বড়? কেষ্ট বলে, নতুন বৌদির দাদা হন, বড়বাবু অন্দরে পাঠালেন। সে কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে বলেন, খোকনের পৈতেয় আসনি যে বড়? কে খোকন, কবে পৈতে, কিছুই জানে না ছোটমামা। ভয়ে ভয়ে বলে শরীরটা ভাল ছিল না। বস, বলে একটা চেয়ার দেখিয়ে দেন মেজকর্তা। বলেন, এলে না ত! দেখতে শুধু মিষ্টি করিয়েছিলাম তেত্রিশ রকম। লুচি সাত রংএর। খাক্ ব্যাটারা কত খাবে! সেদিনে এলে না তুমি, আজ বলা নেই কওয়া নেই চুপ করে চড়ে বসলে কুটুমবাড়ী। ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এটিকেট কিছুই জান না দেখছি। বাবু সে ওধারে সাহেবদের সব খানাপিনা কেলনারে অর্ডার দিয়ে ছিলাম। সে এক এলাহি ব্যাপার। সাত দিন রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চলে নি। রাস্তা বন্ধ লুচি-সন্দেশের ঠোঙায়। হঠাৎ মুখ ফসকে ছোটমামার বেরিয়ে পড়ে, কাঙালী খাওয়ালেন না কেন? ভীষণ চটে ওঠেন মেজকর্তা। বলেন, কি কাঙালী ঢুকবে আমার বাড়ী? সব কটা দরোয়ানের চাকরি যাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা! রাজার বাড়ীর আদব-কায়দাই আলাদা। তার পর বলেন, বল, কি খবর?

বোনকে দেখতে এসেছ? কি খাবে বল? খাও মা, বোন ত পালাচ্ছে না। যে মাংস চাও এখনি খাইয়ে দোব। ঐ দেখ, সব আগে করে ঘিএ ভিজান আছে। শোন তবে গল্প। আমার ন কাকার সঙ্গে ও বাড়ীর ছোটবাবুর লাগল তর্ক। এক দিন কথায় কথায় মুখ থেকে বেরিয়ে গেল দাঁড়াও তোমায় শকুনির মাংস খাওয়াব। তার পর কত দিন কেটে গেছে, ও বাড়ীর ছোটবাবু সব ভুলে গেছে কিন্তু ন কাকা ঠিক তাকে আছে। একদিন ন কাকা ছোটবাবুকে গিয়ে বললেন, কাল তুমি আমার বাড়ী খাবে, অনেক দিন একসঙ্গে খাওয়া হয় নি। পরদিন খুব সাজানো ঘরে দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসল। সুক্তো ডালনা খেয়ে যেই মাংস একগাল মুখে দিয়েছেন, ন কাকা বলল, খাসা।—হরে, এ থালা নিয়ে যেতে বল ঠাকুরকে। ছোটবাবু ত অবাক! নকাকা বললে, এটা শকুনির মাংস, মনে আছে সেই খাওয়াব বলেছিলাম? তার পর দু'জনের হো হো হাসি। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান মেজকর্তা। ছোট-দাদা বলেন, তার পর আবার ভাত খেলেন ছোটবাবু? মেজকর্তা বলেন, কেন খাবে না? নেমন্তন্ন বলে এসেছে, বাড়ীতে যে হরিমটর এদিকে। খাবে কি? আবার গম্ভীর হন। মেজকর্তা বলেন, এর পরই দুজনে দার্জিলিং যান। ন কাকা আর ফেরে নি জান? কেউ কেউ বলে ছোটবাবু না কি সেই রাগে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল পাহাড় থেকে। তাবই ত ওদের বংশের রাগ ভারি খারাপ। সেবার একটা চাকরের ওপর রেগে তাকে বন্দুক নিয়ে তাড়া করেন ছোট-বাবু। চাকর না হয় একটা মরল। কিন্তু খুনের দায়ে যদি ছোটবাবুর ফাঁসি হয়, তাই ছোটগিন্নি তাকে জালার ভেতর পুরে রেখে দিয়েছিলেন সাত দিন। তাঁদের ঘরে জালায় পোরা থাকত দিনের বেলা। রাত্তিরে বের করে দিতেন। দিনে জালার ওপর চালুনি চাপা থাকত নিঃশ্বাস ফেলার জন্যে। ঐ ছোটবাবুর যখন অসুখ, চাকরদের ওপর রাগ করলে চাকরদের সামনে দাঁড় করান হ'ত। তবে রেগেই যেত মারতেন তাদের। ছোটদাদার চোখ ত তখন শিকেয় উঠেছে বাড়ীর ঐতিহ্য শুনে। এবার কি দয়া হ'ল মেজকর্তার, বললেন, যাও যাও, বোনকে দেখে এস। নিয়ে যা রে কেষ্ট, পিসীমার কাছে। বোনকে খবরে দিও এ বাড়ীর কথা, যা-তা বাড়ীর বৌ নয় সে—সাত জন্মের ভাগ্য থাকলে তবে এ বাড়ীর ছেলের গলায় মালা দেয় সে মেয়ে। গলার মাহাত্ম্য স্মরণ করে গলা খাঁকারি দেন একবার।

ন মাসীর সেই অবাক-হওয়া সরল মুখের ছবি বারে বারে মনে পড়ে ছোটদাদার—সে একবার বলেছিল, "জান ছোড়দা, মানুষের আত্মা ঠিক কাঁটাল-কোয়ার মত। তবু লাল টুকটুকে তার রং। আর যেই মানুষ পাপ করবে, মিথ্যে কথা বলবে, মানুষের মনে কষ্ট দেবে, অমনি সেই কাঁটাল-কোয়া একেবারে নীল হয়ে যাবে।" তার এই অভিনব অধ্যাত্মবাদ শুনে সেদিন ছোটদাদা হেসেছিল। আজ কি জানি কেন দু'চোখ ভরে জল এল তার।

এবার পিসিমার পালা। বজ্জাত মেয়ে মানুষ যারা হাতে না মেরে ভাতে মারে—সেই দলের লোক। মুখে বলেন এস বাবা, এস। বাবা-মা সব ভাল আছেন ত? ওরে হরিদাসী, বামুনদিদিকে খাবার আনতে বল। এই তোমার বোনের কথাই হচ্ছিল। কোন সহবৎ নেই ত। আচার-আচরণ কিছুই জানে না। কালকে দোকান থেকে মিষ্টি দিয়ে গেছে—বললাম তুমি ভিজে কাপড়ে আছ ত? ওগুলো ভাঁড়ারে তোল। ছোটদাদার অবাক চোখ দেখে বললেন, কাল যে ওর বাসন দেখার পালা ছিল—ঘাটে বাসন মাজবে ক্যাওরা মা। শিদু ঝি এনে বৌএর হাতে দেবে। সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু দেখে দেবে এঁটো আছে কি না। তাই চান করে ভিজে কাপড়ে থাকতে হয়। নইলে ত সব অশুদ্ধের এঁটো হয়ে যাবে। তা ভোম-ভোকলার ঘর ত নয় বাবা? বাটিই পড়ে তিনশ, গেলাস আশি-নব্বইটা, আশি-নব্বইটা থালা। তা ছাড়া জল খাবারের বাসন ত আছেই। ও মা, তা ভাঁড়ারে ঢুকে চোখ চানাবড়া! পান্তুয়া আর রসগোল্লা সব ঠেকিয়ে রেখেছে। আমি ত কপাল চাপড়ে মরি। হ্যাঁ বাবা, ভাজা মিষ্টি এঁটো জানে না? বড়ির এঁটো খবরের কাগজের এঁটো এ সব কি আবার কলেজ-ইস্কুলে পড়ে শিখতে হয়? আমি বললাম, ও হারামজাদী, করেছিস কি? ভাগ্যে মেজকর্তার কানে যায় নি? জানলে গুলী করে মারত অমন বৌকে। হঠাৎ দেখেন বামুনদি খাবার এনেছে। পেছনে চাকর হাঁটা ফুলের পশমের আসন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে "আসুন বসুন" লেখা। ছোটদাদা বলে, মোটে খিদে নেই। কিন্তু পিসীমা নাছোড়বান্দা। বোধ হয় মনে ইচ্ছে, খেতে বসিয়ে যত ইচ্ছে গালমন্দ দেবেন বাপ-চোদ্দপুরুষ তুলে। বলেন সে কি হয়? কুটুমের ছেলে শুধু মুখে ফিরবে? যাও বস। ও ঠাকুর, দুটো লোয়াই দিয়ে যাও ভাপে মাছের। মাংসের ইষ্টু দিয়ে যাও। ও কেষ্ট, চন্দ্রপুলি আনতে ভুলিস নি মিষ্টির দোকানে। শক্তিগড়ের ল্যাংচা দুটো দিস। সেজ বৌএর বাপের বাড়ী থেকে তত্ত্ব এসেছে কাল। ল্যাংচাগুলো তাদেরই ছিল। তবে কাপড় যা দিয়েছে, ম্যাড়মেড়ে গামছা। তা আমার ভাগ্যি ভাল, তত্ত্বের লোক তখনও খাচ্ছে। সতি ধোপানী কাপড় দিতে এল। তাদের সামনেই তাকে দিয়ে দিলাম কাপড়টা, বললাম,

যে, পুরোনো কাপড় চেয়েছিলি তাই কুটুমবাড়ী থেকে তোর পরার মত কাপড়ই দিয়েছে। তুইই পরিস। আবার তাদের ঝিএর বাক্যি কত? আমি ত গামছা পরেছিলাম? সে বেটি বলে কি না আপনার গামছার চেয়ে খারাপ? হ'ত আমাদের বাড়ীর ঝি ত তার চোদ্দ-পুরুষের নাম ভুলিয়ে দিতাম। ডোম-ডোকলার বাড়ীর ঝি-চাকর আদব-কায়দা জানবে কোত্থেকে? দিচ্ছিলাম সব তত্ত্ব ফিরিয়ে। কিন্তু মেজকর্তার তক্ষুণি হুকুম হয়ে গেছে রাত্রে শুধু শক্তিগড়ের ল্যাংচাই খাব, আর মিষ্টি দিস্ নি আমায়। মেজকর্তার সব ভাল, শুধু বড় খুঁতখুঁতে। নইলে শাসন করতে বাড়ীতে ঐ একটি মানুষই না এখনও আছে। ছোটমামার গলায় তখন চন্দ্রপুলি আটকে যায়। বলে, আর খেতে পারব না। পিসীমা শোনেন না। অনেক উঁচু থেকে শ্বেতপাথরের বাটিটা ঠুকে বসিয়ে দেন। বলেন, খাও বাবা, খাও। রাবড়ি অর্ডার দিয়ে করানো। ছোটমামা অবাক হয়ে দেখে পাথর বাটিটা ভাঙে নি। বোধ হয় এ বাড়ীর বৌদের মত আঘাত পেয়ে পেয়ে তারা আঘাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এবার এসে দাঁড়ায় একটি ন দশ বছরের মেয়ে, ন মাসীরই সমবয়সী হবে—হেসে বলে, ঠাকুমা, আমার সেই কবিতাটি শুনবে? মুখস্থ হয়ে গেছে। স্নেহে বিগলিত হন পিসীমা। বলেন, বল, দিদি বল। উঠে বসে হাঁটুগেড়ে নানা অঙ্গ-ভঙ্গি করে রবীন্দ্রনাথের অভিসার কবিতা আবৃত্তি করে মেয়েটি। পিসীমা বারে বারে বলেন, শুনেছ বাবা, ঠিক গোপাল উড়ের মত লেখা। তা ওরা বলে না কে এক রবিঠাকুরের লেখা! লোকের বাড়ী বাঁধতে বাঁধতে কত লিখেছে দেখ—ঠাকুর দেবতা সন্ন্যাসী ফিট লিখেছে! হ্যাঁ বাবা, তোমাদের বাড়ীতে না কি ওর ছবি আছে, তোমার ন মাসীর ঘরে? আবাগী সেদিন বলছিল। আমি ত মুখে হাত চাপা দিতে পারি না। পরপুরুষের সঙ্গে ছবি তুলে আবার ঘটা করে কেউ বলে বেড়ায়? ডুবে ডুবে জল সবাই খায়, শিবের বাবাও জানতে পারে না। ওর আবার সব বলে বেড়ান চাই। ছোটমামা আর থাকতে পারে না। বলে, উনি ঋষিতুল্য মানুষ, আমরা ওঁকে গুরুদেব বলি। এবার হেসে ওঠেন পিসীমা। বলেন, যেমন ভাই তেমনি বোন। অমন গুরু ঢের দেখা আছে আমার। একজন গুরু কুলবধূর কানে মন্ত্র দিয়েছিল "তুমি রাধা আমি শ্যাম" জান ত? ছোটমামার কেমন মনে হয় মাসী ত এই মেয়েটিরই বয়সী, তার বেলা শাসন এত কঠিন কেন? এবার ছোটমামা উঠে পড়ে। চাকর রূপোর গাড়ু করে হাতে জল দেয়, তোয়ালে দেয়। পিসীমা ডেকে বলেন, যা, নতুন বৌএর ঘরে নিয়ে যা। নতুন বৌকে সুপুরির চুপড়ি দিয়ে বসিয়ে দিস। প্রকাণ্ড দালান পেরিয়ে যায় ছোটমামা। আশ্চর্য হয়ে দেখে বাড়ীতে একটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ কারুর ছবি নেই। শুধু হীরের আংটি-পরা বড় বড় দাম্ভিক পুরুষদের সার সার ছবি। মুখের ও গোঁফের কাটের, ও টেরি কাটার শুধু প্রভেদ। এক একবার মনে হয় এ কি গোঁফের বিজ্ঞাপন, না আংটির বিজ্ঞাপন বোঝা যায় না। দু-একটা নামাবলী গায়ে দেওয়া বুড়ীর ছবি মাঝে মাঝে আছে বটে, তবে ঘোমটায় তাদের মুখ ঢাকা, হাতে জপের মালা, বোঝা যায় মেয়েদের ঐ বিশেষ ভঙ্গিটাই এদের পছন্দ কিংবা ঐ বয়েস ছাড়া ছবি তোলার মেয়েদের রেওয়াজ নেই। হঠাৎ একটি বিশেষ দৃশ্য চোখে পড়ে ছোটমামার, বিরাট লোমশ এক পুরুষ একটি ছোট ছেলের হাত ধরে নাচছে, আমাতে মনুতে—এই হচ্ছে কোরাস। এদের বাড়ীর এই একটি ভঙ্গি সকলেরই আছে—এরা যা ইচ্ছে করবে, কারুর খাওয়া-দাওয়ায় তাতে ছেদ পড়বে না। হঠাৎ কানে যায় খনখনে ঝিয়ের গলা—অ মেজবৌদি, তুমি রাতে ভাত খাবে, না ময়দা খাবে? ছোটমামার চোখের সামনে ভাসে কতকগুলি বৌ এক-গা গয়না পরে থাবা থাবা ময়দা তুলে খাচ্ছে। কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে ছোটমামার। ততক্ষণে ন মাসীর ঘরে পৌঁছে গেছে ছোটমামা।

ক্রমশঃ

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

প্রতিরক্ষা ও খাদ্যনীতি

কাশ্মীরকে উপলক্ষ্য করে ভারতের ওপর পাকিস্তান যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হামলা সুরু করেছে তার ফলে কয়েকটি মূল বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা পরিমাণে বাস্তবতা অনুসারী হ'তে সুরু করেছে এটা ভরসার কথা। এই মূল বিষয় ক'টির মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেশের খাদ্যপরিস্থিতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি সম্পর্কিত। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাকিস্তানী হামলাজনিত সঙ্কটের অবস্থায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে আশু স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধন যে অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে এই প্রশ্নটি নতুন করে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের চেতনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োগ ও রূপায়ণের প্রথম পর্য্যায় থেকে সুরু করে বারংবার আমাদের রাষ্ট্রনেতারা দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনে আশু স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধন যে একান্ত জরুরী একথা মুখে বলেছেন বটে কিন্তু পরিকল্পনা রচনা ও তাহার প্রয়োগ প্র:চষ্টায় এই মূল সিদ্ধান্তটি আজ পর্য্যন্ত কখনোই সম্পূর্ণ এবং বাস্তব স্বীকৃতি লাভ করে নি। আমাদের সরকারী খাদ্যনীতির প্রধান বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বিদেশ থেকে আমদানী-করা খাদ্যশস্যের উপরে। বস্তুতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী "পি এল ৪৮০ আইন অনুসারে গম আমদানী না হ'লে দেশে খাদ্যসঙ্কট যে অধিকতর ভয়াবহ আকার ধারণ করত এটা প্রায় সুনিশ্চিত। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে এবং বিশেষ করে পরিকল্পনা রূপায়ণের ধারায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধনের মূল এবং জরুরী প্রয়োজনটি যদি সম্পূর্ণ, সার্থক এবং সক্রিয় স্বীকৃতি পেত তা হ'লে অন্ততঃ ইতিমধ্যে বর্তমানের আনুমানিক ঘাটতি পূরণ করে দেবার মতন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সাধন করা অসম্ভব হবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না।

খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতির পরিমাণ

সম্প্রতি প্রচারিত সরকারী হিসাব অনুযায়ী (সম্প্রতি প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণেও এই হিসাবটি প্রচারিত হয়েছে) বর্তমানে দেশের সমগ্র মূল চাহিদার তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতির মোট পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগ মাত্র। অর্থাৎ বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রতি প্রাপ্ত-বয়স্কের জন্য দৈনিক ১৬ আউন্স খাদ্যশস্য বরাদ্দের হিসাবে, মাত্র ২৯.২ দিনের খাদ্যাভাব। কিন্তু এইটুকু সামান্য ঘাটতির জন্য আমাদের বহু বৎসর ধরে আমেরিকান সরকারের বদান্যতার উপরে নির্ভর করে থাকতে হয়েছে। বস্তুতঃ সরকারী ঘাটতির হিসাব সম্পূর্ণ বাস্তব বলে স্বীকার করা চলে না। এই প্রসঙ্গে পূর্বের একটি আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে, বর্তমান উৎপাদনের ভিত্তিতেও আমাদের মূল ভোগচাহিদা সম্পূর্ণ মেটান সম্ভব, অধিকন্তু উদ্বৃত্ত আর কিছু থাকে না! কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। প্রথমতঃ, দেশে উৎপন্ন সমগ্র পরিমাণ খাদ্যশস্য (cereals) আনুপাতিক পরিমাণে সকলের ভোগচাহিদা মেটাবার জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন মোটামুটি চাহিদার সীমান্তবর্তী (marginal in relation to domand) হওয়ায় খাদ্যশস্য বণ্টন ব্যবস্থা এভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেওয়া প্রয়োজন যে, তার ফলে ক্রয়-ক্ষমতার প্রাধান্যের উপরে যেন খাদ্য সংগ্রহে তারতম্য না ঘটতে অবকাশ পায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত দুইটির আনুষঙ্গিক আরো একটি প্রয়োজন একান্তই জরুরী, সেটি এই যে, মোটা এবং মিহি উভয় পর্য্যায়ের খাদ্যশস্য মিলিয়ে দেশবাসীর খাদ্যের মোট উপাদান প্রস্তুত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই তিনটি বিষয়ে উপযুক্ত ও সার্থক আয়োজন প্রয়োগ করলে আমাদের বর্তমান উৎপাদন পরিমাণের মধ্যেও দেশের সমগ্র মূল চাহিদা মোটামুটি মেটান অসম্ভব নয়। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই যে, দেশে মোট খাদ্যশস্য যতটুকু উৎপন্ন হচ্ছে তার সবটুকুই ভোগ-ব্যবহারে লাগাবার ব্যবস্থা করা জরুরী। এর মধ্যে সামান্য অংশও যদি জোতদারদের বা ব্যবসায়ীর লুকোন মজুতে গিয়ে ওঠে তবে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং তার সুযোগ নিয়ে মুনাফাবাজগোষ্ঠী কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টির সুযোগে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রভূত অতিরিক্ত এবং অন্যায় মুনাফা করবেন। এই কারণে সরবরাহের ওপরে সম্পূর্ণ সরকারী অধিকারও একই সঙ্গে একান্ত জরুরী।

র‍্যাশনিং ও সরকারী সংগ্রহ ব্যবস্থা

যুদ্ধের বিষয় পাকিস্তানী হামলা সুরু হবার পর থেকে সরকারী মহলে এ বিষয়ে সচেতনতা ও তৎপরতার লক্ষণ

দেখা যাচ্ছে। বর্তমান প্রতিরক্ষা সঙ্কট নতুন করে সুরু হবার সামান্য কিছুদিন পূর্বেই এই মূল বিষয়টি সম্বন্ধে যথাসম্ভব সরকারী দায়িত্ব এড়িয়ে চলবার দিকেই ঝোঁক বেশী ছিল বলে দেখা গেছে। স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে, ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনের অব্যবহিত পরে অল ইণ্ডিয়া ফুড সাবকমিটির নয়াদিল্লীর অধিবেশনের মাত্র পাঁচ দিন পরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সাব-কমিটির প্রায় সবগুলি মূল সুপারিশই বাতিল করে দেওয়া হয়। যথা, সাবকমিটি সুপারিশ করেন যে, অবিলম্বে ৩ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ অধিবাসীর সকল শহরে খাদ্যশস্য সরকারী বণ্টন নিয়ন্ত্রণের অধীন করে নিতে হবে এবং ক্রমে এই নিয়ন্ত্রণ ১ লক্ষ অধিবাসীর শহরগুলিতেও চালু করতে হবে। মুখ্য-মন্ত্রী সম্মেলনে স্থির হয় যে, আপাততঃ র‍্যাশনিং ব্যবস্থা মাত্র ১০ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ অধিবাসীর শহরগুলিতেই চালু করা হবে (এই পর্য্যায়ের শহর সমগ্র দেশে মাত্র ৮টি), অন্য শহর-গুলিতে র‍্যাশনিং চালু করবার ঝুঁকি নেবার মতন প্রস্তুতি এখন সরকারের নাই। তা ছাড়া অন্য একটি প্রধান কারণেও র‍্যাশনিং ব্যবস্থার ব্যাপকতর দায়িত্ব গ্রহণে মোটামুটি মুখ্য-মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই বিভিন্ন কারণে খুব আগ্রহশীল ছিলেন না। যে-সকল রাজ্যে খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত (surplus) উৎপাদন হয়, সে সকল রাজ্য সরকারগুলি প্রয়োজন নাই বলে র‍্যাশনিং প্রবর্তন করতে রাজী ছিলেন না; আবার যে সকল রাজ্যে উৎপাদন-ঘাটতি, সে সকল রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সরকার সরবরাহের অনিশ্চয়তা, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা, এই সকল নানাবিধ কারণে র‍্যাশনিং-এর ঝুঁকি নিজেদের ঘাড়ে নিতে খুব ভরসা পাচ্ছিলেন না। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী ভরসা করে কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতা এলাকায় পূর্ণ র‍্যাশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন এবং এ পর্য্যন্ত তার ফলাফল মন্দ হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা এর দ্বারা সমাধান হয় নাই সত্য কিন্তু কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতা এলাকার সকল অধিবাসী অন্ততঃ যে তাঁহাদের চাল, চিনি ও গমের তোলচাহিদা মোটামুটি ভালভাবেই এবং নির্দিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত উচিত মূল্যে মেটাতে পারছেন এটা কেবল সম্ভব হয়েছে এই র‍্যাশনিং প্রবর্তনের ফলে।

কিন্তু র‍্যাশনিং ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে উপযুক্ত ও পরিপূরক সংগ্রহ ব্যবস্থাও একান্ত জরুরী। এই বিষয়ে পূর্বে ত বটেই, এমন কি বর্তমানের সঙ্কটজনক অবস্থা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ও অধিকাংশ রাজ্য সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট বলে মনে হয় না। ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া উদ্বৃত্ত-উৎপাদক রাজ্যগুলির এলাকার মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় মজুদের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করবেন—বর্তমান বৎসরে এই সংগ্রহের পরিমাণ অন্ততঃ ২০ লক্ষ টন চাউল হবে এমন হিসাব করা হয়েছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান সঙ্কটাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের ভূমিকা আরও প্রসারিত করা হবে। কিন্তু সর্বাত্মক সংগ্রহ-ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজনীয়তা এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের চেতনায় ধরা পড়েছে কি না এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা সঙ্কট নতুন করে দেখা দেবার ফলে পূর্ণ র‍্যাশনিং ব্যবস্থা অবিলম্বে, অর্থাৎ আগামী ফসল ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল ১ লক্ষ অধিবাসীর সংখ্যা পর্য্যন্ত সকল শহরেই পূর্ণ র‍্যাশনিং চালু করবার সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছে। কিন্তু পরিপূরক সংগ্রহ-ব্যবস্থা ব্যতীত র‍্যাশনিং চালু রাখা সম্ভব নয়। এই মূল বিষয়টি সম্বন্ধেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার একটা অগ্রণী (pioneer) এবং সবল (bold) নীতি ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন। স্থির হয়েছে যে, আগামী ফসল উঠবার সময় থেকেই একমাত্র রাজ্য সরকার বা তাঁদের নির্দ্ধারিত প্রতিনিধি ব্যতীত কোন চাষী তাঁদের উদ্বৃত্ত ধানের ফসল আর কাউকে বেচতে পারবেন না; চাউল কলগুলির সমগ্র উৎপাদন রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট মূল্যে বেচতে হবে; কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ছোট আকারের চাউল কল (husking machines) ব্যতীত অন্য কেহ ধান থেকে চাউল প্রস্তুত করবার লাইসেন্স পাবেন না; অর্থাৎ চাউলের ব্যাপারে বেসরকারী বাণিজ্য একেবারে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই নূতন ফসল উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের অধিকাংশ শহরাঞ্চল এবং সব কটি শিল্পাঞ্চলে পূর্ণ র‍্যাশনিং প্রবর্তন করবার আয়োজন করেছেন। এইরূপ পরিপূরক সংগ্রহ-ব্যবস্থা ব্যতীত এই ব্যাপক র‍্যাশনিং ব্যবস্থা যে সার্থক ভাবে চালু রাখা ক্রমে অসম্ভব হয়ে উঠবার আশঙ্কা তাহা সহজেই অনুমেয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাব করেছেন যে, আনুমানিক ফসলের হিসাব থেকে আশা করা যায় যে, বর্তমান বৎসরে ১৪ লক্ষ টন চাউল চাষীর নিজস্ব তোলচাহিদা মিটিয়ে সরকারী সংগ্রহের জন্য পাওয়া যাবে। রাজ্যের দুটি বৃহৎ অঞ্চলে র‍্যাশনিংয়ের জন্য মাসিক প্রায় ৪০,০০০ হাজার টন, অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় ৪,৮০,০০০ টন চাউল প্রয়োজন হবে। রাজ্যের অন্যান্য ঘাটতি এলাকায় তোলচাহিদা অনুযায়ী

সরবরাহ চালু রাখবার জন্ত এবং মডিফায়েড র‍্যাশনিং ব্যবহার জন্ত আরও আন্দাজ ৭৫০,০০০ টন চাউল প্রয়োজন হবে। এই রাজ্যের আনুমানিক ১৪ লক্ষ টন বিক্রয়যোগ্য চাউলের মধ্যে সরকারী সংগ্রহ-ব্যবস্থার দ্বারা অন্ততঃ ১২ লক্ষ টন চাউল যদি সরকারী মজুদে সংগ্রহ হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের দ্বারা ৫ লক্ষ টনের ঘাটতি মেটাবার আয়োজন করতে হবে।

বস্তুতঃ কেবল মাত্র একটি রাজ্য সরকার দ্বারা নিজ রাজ্য এলাকার মধ্য থেকে সর্বাত্মক সংগ্রহ ব্যবস্থার দ্বারা খাদ্য-শস্যের সরবরাহ ও মূল্য সমস্যা সমগ্র দেশের জন্ত সমাধান হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সকল রাজ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মতন চাউল ও গম শুধু নয়, বাজরা, জোয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মিহি ও মোটা খাদ্যশস্য সর্বাত্মক ভাবে সংগ্রহ (total procuremont) করবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন; এবং প্রত্যেক র‍্যাশন-বিস্তৃত এলাকাতেই সরকারী র‍্যাশনিং সংস্থার মাধ্যমে আনুপাতিক পরিমাণে ও নির্দিষ্ট মূল্যে এ সকল প্রকার শস্য বণ্টনের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। উদ্বৃত্ত-উৎপাদক রাজ্যগুলিতে সংগৃহীত শস্য থেকে রাজ্যের নিজ ভোগচাহিদার উপরে যে পরিমাণ শস্য উদ্বৃত্ত থাকবে সেটি ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার হাত দিয়ে কিংবা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের মজুদের জন্ত সংগৃহীত হওয়া দরকার। এই মজুদ থেকে ঘাটতি রাজ্যগুলির ঘাটতি মেটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া এই মজুদে অতিরিক্ত সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে এই অতিরিক্ত সঞ্চয় থেকে অজন্মা বা অন্যান্ত দুর্বৎসরের সময়ে এর থেকে দেশের নিম্নতম ভোগচাহিদা যথাসম্ভব সম্পূর্ণ পরিমাণে মেটান সম্ভব হতে পারে। একমাত্র এই ভাবেই বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানীর ওপরে আমাদের বর্তমানের একান্ত নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি সম্ভব হতে পারে!

আমেরিকা ও ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য আমদানী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাদ্যশস্য আমদানীর আমাদের প্রধান ভরসা ছিল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। একে ত আমেরিকার গম উৎপাদন থেকে প্রভূত পরিমাণ রপ্তানি-যোগ্য উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের পাব্লিক ল' নং ৪৮০-এর বিধান-সম্মত গম আমদানী করতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করবার প্রয়োজন হত না। এই আমদানীর মূল্য আমরা ভারতীয় অর্থে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আমেরিকান সরকার এই মূল্যলব্ধ অর্থ এদেশে মজুত রাখতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। যাই হোক, এ ভাবে আমদানী-করা গম দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে খাদ্যশস্যের একটি বিরাট জরুরী মজুদ (buffer stock) সৃষ্টি করা হবে, যা থেকে ফসলের দুর্বৎসরে দেশের লোকের নিম্নতম ভোগচাহিদা কোনক্রমে মেটান সম্ভব হয়, এই ছিল উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত এই জরুরী মজুদ সৃষ্টি করা হয় নাই। গত বৎসর আশাতিরিক্ত চাউল ও গমের ফসল ওঠা সত্ত্বেও এবং গত ১২ মাসে প্রভূত পরিমাণ বিদেশী গম আমদানী হওয়া সত্ত্বেও, আমদানী গম মজুদ করা সম্ভব হয় নি। ফুড কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার প্রধানাধ্যক্ষের একটি সম্প্রতি প্রচারিত বিবৃতি অনুযায়ী, এর প্রায় সবটাই জাহাজের খোল থেকে সরাসরি ভোক্তার হাঁড়িতে চালান হয়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি দেশের খাদ্য উৎপাদনের উপরে তাঁদের সরাসরি অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার কোন প্রয়াস করেন নি। ফলে খাদ্যশস্য সরবরাহের উপরে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর কায়েমী অধিকার পুরোপুরি বলবৎ রাখতে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সুযোগে এঁরা সরবরাহে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে খাদ্যশস্যের বাজারে বারংবার একটা মূল্যসঙ্কট জীইয়ে রাখবার প্রয়াস করছিলেন। ফলে খাদ্যশস্যের মূল্যসঙ্কটটিকে আপাততঃ যথাসম্ভব নিরসন করবার প্রয়োজনে আমদানী-করা শস্য সরকারী জরুরী মজুদে তুলে রাখবার অবকাশ ঘটছিল না। এই দিক দিয়ে আমদানী শস্য আমাদের খাদ্য-পরিস্থিতিতে একটা গুরুতর স্থান অধিকার করে ছিল।

এই ধরনের আমদানীর উপরে নির্ভরশীলতা দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব স্বস্থতাসূচক নয়। বিদেশী মুদ্রা ব্যয় না করেই এই শস্যটুকু পাওয়া যাচ্ছিল বলেই যে এতে আশঙ্কার কোন কারণ থাকবে না এমন চিন্তা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক। পি. এল. ৪৮০ অনুযায়ী গম আমদানীর যে পরিপূরক ভারতীয় মুদ্রার অর্থ (counter-part funds) এদেশে আমেরিকান সরকারের হাতে মজুদ হচ্ছে, তার পরিমাণ ক্রমেই অত্যন্ত বেশী হয়ে উঠছিল। এই মজুদ তহবিল থেকে আমেরিকান সরকার কতকগুলি নির্দিষ্ট ভারতীয় প্রয়োগে প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্য অবশ্য করে আসছিলেন, এবং এর থেকে কিছু অর্থ আরও কতকগুলি নির্দিষ্ট সমাজসেবক প্রয়োগেও ব্যয় হচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই তহবিলের সঞ্চয় এত বেশী হয়ে গেছে যে, এটাকে আর বেশী বাড়তে দেওয়া খুব সুযুক্তির কাজ হবে না।

এ ত গেল বিষয়টির একটা বিশেষ এবং সাধারণ দিক। অন্যদিকে বর্তমান ভারত-পাকিস্তান বিরোধের আবহাওয়ায়, এবং এই বিরোধ সম্পর্কে আমেরিকান সরকারের

পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত—এই অবস্থায় আমেরিকার ওপর খাদ্যশস্যের আমদানীর জন্ত নির্ভর করে থাকা খুব সুবুদ্ধির পরিচায়ক হবে না। নিরাপত্তা পরিষদের আলাপ-আলোচনা ও প্রস্তাবাদি সম্পর্কে দেখা গেছে যে, পাকিস্তান প্রথম ভারতের ওপর হামলা সুরু করা সত্বেও ইঙ্গ-আমেরিকার রাষ্ট্রনায়করা বর্তমান বিরোধের জন্ত ভারতকেও সমভাবে দায়ী করবার প্রয়াস করেছেন এবং করে চলেছেন। পাকিস্তানের আবদার অনুযায়ী বর্তমান যুদ্ধবিরতির সর্তটির সঙ্গে পাকিস্তানের ইচ্ছামতন তথাকথিত কাশ্মীর সমস্তার রাজনৈতিক মীমাংসার জন্ত চাপ দেবার চেষ্টা করছেন। এই অবস্থায় ভারতকে পি এল ৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করার সঙ্গে কিছুটা যে রাজনৈতিক চাপ অনিবার্য্য ভাবে যুক্ত হয়ে থাকবে তার আশঙ্কা অমূলক নয়। কিন্তু এরূপ চাপে. ভারত নমিত হবে না, হতে পারে না এবং তার ফলে খুব সম্ভব এই শস্য আমদানীও বন্ধ হয়ে যাবে। স্মরণ থাকা সম্ভব যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিশরের গম রপ্তানী বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্র সরকার অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

উৎপাদন উন্নতি

অতএব আমাদের প্রথম থেকেই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন যাতে আমদানীর উপরে আমাদের বর্তমান নির্ভরশীলতা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের খাদ্যশস্যের বর্তমান উৎপাদন মানের মধ্যেও কতকগুলি ব্যবস্থা সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে আমরা তার মধ্যেই দেশের ন্যূনতম ভোগচাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারি। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়, কেননা আমাদের বর্তমান উৎপাদনমান কেবলমাত্র ন্যূনতম ভোগচাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট। দুর্বৎসরের বা অন্যান্য আকস্মিক ঘটনার জন্ত কোন উদ্বৃত্ত আমাদের নাই। আমরা সময় থাকতে নানা কারণে কোন উদ্বৃত্ত জরুরী মজুদও সৃষ্টি করে রাখি নাই, অতএব আমাদের অবিলম্বে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করতেই হবে। কেননা যুদ্ধ এমন একটা অতিপ্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার ফলে খাদ্যশস্যের চাহিদা অনিবার্য্যভাবে বৃদ্ধি পায়। আর বর্তমান ভারত-পাকিস্তান বিরোধের যে সহজ ও আশু সমাধান হবে এমন সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এই অবস্থায় আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনে আপ্রাণ প্রয়াস এখন থেকেই যে প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর সর্বাত্মক প্রয়াসের ফলে যে খাদ্যশস্য উৎপাদন দুই-এক বৎসরের মধ্যেই অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ বাড়ান সম্ভব সেটাও সত্য।

সরবরাহের উপর সরকারী অধিকার প্রতিষ্ঠা

কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই যে দেশের খাদ্যপরিস্থিতি সুস্থ অবস্থায় পৌঁছবে এমন আশা করা ভুল হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি অবশ্যই একটা জরুরী ও মূল (fundamental) প্রয়োজন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাতে করে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বণ্টনের উপর সম্পূর্ণ সরকারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মুনাফাবাজ ও কালোবাজারীদের এই বস্তুটির উপর তাদের যথেচ্ছ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারা যায়, সে ব্যবস্থা না করলে মূল রোগ থেকে মুক্তি পাবার কোন আশা নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় এবং বর্তমানে তাঁরা এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োগের আয়োজন করছেন সেটাই একমাত্র সুবুদ্ধিসূচক সর্বভারতীয় সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগের উদাহরণ হওয়া উচিত। খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে তাদের বর্তমানের শক্তিশালী স্থান থেকে সরাতে না পারলে উৎপাদন-উন্নতি যতই সাধিত হউক না কেন, খাদ্যমূল্য সঙ্কট থেকে কোন কালে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা নেই।

আশ্চর্য দ্বীপের রহস্য

("সুইস্ ফ্যামিলি রবিন্‌সন্")

[illegible] চলেছিল দক্ষিণ সাগরের ঢেউয়ের উপর দিয়ে [illegible] গতিতে। অসীম নীল সাগর চারদিকে [illegible] অনন্ত আকাশের বুকে। শুধু এই আর [illegible] মাথায় ফেনার মুকুট। [illegible] কাটিয়ে [illegible] যেন সগর্বে [illegible] করছে [illegible] মাঝে মাঝে [illegible] বাধা [illegible] ছিন্নভিন্ন [illegible] হয়ে যাচ্ছে।

জাহাজখানি প্রকাণ্ড। বহু যাত্রী আর লোকজন [illegible] পৃথিবীর নানাস্থানে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে [illegible] সকাল থেকেই যাতায়াত। সাগরের সব পথঘাটই [illegible] চেনা জানা। তাই পাইলট টান্ডেল [illegible] তিনি জাহাজ একটু বেগেই চালাচ্ছেন।

যাত্রীর দল সমস্ত জাহাজখানিকে যেন ক্রীড়াক্ষেত্রে [illegible] করেছিল। প্রকাণ্ড ডেকের উপর জোরজোরে [illegible] তাস খেলছে, কেউ গান গাচ্ছে, কেউবা [illegible] সাগরের অনন্ত সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা [illegible], কেউ ছবি আঁকছে, কেউ গীটার বাজাচ্ছে। [illegible], খেলাধুলা নিয়েই যাত্রীদের সময় কাটছে বেশ ভাল।

নানারকমের, নানাশ্রেণীর যাত্রী। তাঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক, সাংবাদিক, ডাক্তার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলোয়াড়, সামাজিক মিশুকে ভদ্রলোক, ইঞ্জিনীয়ার, গল্পবাগীশ, গল্পলেখক, অধ্যয়নশীল গ্রন্থকীট, নাট্যকার, সঙ্গীতশিল্পী, [illegible]শিল্পী, দেশ-পর্যটক, চিত্রকর প্রভৃতি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যতদিন তাঁরা সকলে জাহাজে আছেন, কেউ পরস্পরের সঙ্গে প্রাণখোলা ভাবে মিশতে একটুও দ্বিধা করেন নি। সকলেই যেন পরস্পরের কত দিনের বন্ধু।

ব্যবসায়ীর দল তাঁদের পণ্যদ্রব্যগুলি নিরাপদে জাহাজের খোলের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। কয়েকজন শিকারী তাঁদের শিকারের উপযুক্ত প্রচুর গুলীবারুদ বন্দুক নিয়ে সেই জাহাজে যাচ্ছেন আফ্রিকায় শিকারের উদ্দেশ্যে। একদল মিশনারী ধর্ম-যাজক অনেক জোড় প্যান্ট, কামিজ, জুতা, টুপি, ছাতা নিয়ে কোন এক দেশের আদিম অধিবাসীদের খ্রীষ্টান করে তাদের সাজাবার উদ্দেশ্যে সেই জাহাজে রওনা হয়েছিলেন। এঁরা সব, সকালে বিকালে নিজের নিজের কেবিন ছেড়ে ডেকে এসে হাওয়া খেতেন ও পরস্পরের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন। ক্রমে এমন অবস্থা হ'ল যাতে জাহাজের মধ্যে সকলেই যেন এক পরিবারভুক্ত আত্মীয়-পরিজন হয়ে পড়লেন। ডেকের উপরেই মেয়েরা গান গায়, ছেলেরা গীটার বাজায়, আবার কেউ বা কমিক অভিনয় করে।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে এক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী চারটি ছেলে নিয়ে সেই জাহাজেই কোন একদেশে আত্মীয়ের বাড়ী যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক খুব অমায়িক, তাঁর স্ত্রীও সেই রকম মিশুক। চার ছেলের মধ্যে বড় যে তার নাম ফ্রিজ, মেজ ছেলের নাম আর্নেস্ট, সেজ ছেলের নাম জ্যাক আর ছোট ছেলের নাম ফ্রান্সিস্। ছেলেগুলি সর্বদা ডেকের উপরেই খেলাধুলা, ছুটোছুটি করত তাদের বয়সী অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কর্তামশাই ছেলেদের খবর বড় একটা রাখতেন না, শুধু গিন্নী মাঝে মাঝে খাবারের

সময়ে এসে ধমক দিয়ে তাদের কেবিনের মধ্যে ফিরে যেতেন।

জাহাজের খোলে ব্যবসায়ীদের কয়েকটা গরু, ভেড়া, ছাগল, গাধা, শূকর, মুর্গী ও হাঁস ছিল। মাঝে মাঝে তাদের চীৎকার শোনা যেত ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু জাহাজের খালাসীরা এমনিই নিয়মতান্ত্রিক, যে যাতে সে শব্দে আরোহীদের কোন বিরক্তি না জন্মে, তারা তার বিশেষ ব্যবস্থা সর্বদা করত।

জাহাজ বেশ চলছিল অকূল সমুদ্রে। সকলেই বেশ আনন্দে ও আরামে দিন কাটাচ্ছিলেন. দিনের আলোয় সমুদ্রের যে সৌন্দর্যই দেখা যাক না কেন, রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্রের শোভা আরও বিস্ময়কর হয়ে উঠত। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আলোর ঝিলিক দেখতে পাওয়া যেত। আকাশের কোটি কোটি তারকা অকাতরে যেন অন্ধকার ঢেউয়ের বুকে আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখত। জাহাজের গতি রাত্রিকালে মন্থর। আরোহীরা মৃদু দোলনে দুলতে দুলতে ঘুমের ঘোরে কত মধুর স্বপ্ন দেখত। শুধু জাহাজ চলার একটা একটানা বস্ বস্ শব্দ ও মাঝে মাঝে বাঁশীধ্বনি। বিশেষ দরকার ছাড়া গভীর রাত্রে যাত্রী-জাহাজে বাঁশী বাজানো না কি নৌ-বিভাগের আদেশে এক রকম বন্ধ। যাত্রীরা যাতে পরমসুখে নিদ্রা যেতে পারেন, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

সকালের সূর্য দিগন্তে দেখা দিতেই আবার জাহাজের ডেকে কলরব পড়ে যেত। প্রভাতের রৌদ্র উপভোগের জন্য অনেকেই কেবিন ছেড়ে ডেকে এসে হাজির হতেন। কেউ কেউ প্রাতরাশ খেয়ে আসতেন, কেউবা ডেকের উপরেই প্রাতরাশ খেতেন। যাত্রীদের সঙ্গে খালাসী ও জাহাজের কর্মচারীরাও বেশ বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছিলেন। অনেক সময় ছেলেমেয়ের দল কাপ্তেনের কেবিনে সমুদ্রের গল্প শুনতে যেত। এইভাবে চলতে চলতে জাহাজ দক্ষিণ সাগরের মাঝখানে এসে পড়ল।

সেদিনটার সকাল থেকেই আকাশের রঙ কেমন-যেন ঘোলাটে হয়ে গেল। একটা গভীর থমথমে ভাব আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। জাহাজের কর্মচারীরা ও খালাসীর দল ব্যস্তসমস্ত হয়ে গম্ভীর মুখে চলাফেরা করতে করতে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন। কাপ্তেন সাহেব দূরবীণ হাতে তাঁর ঘরের জানালায় বসে চারদিকে কি যেন লক্ষ্য করছিলেন।

স্কটল্যাণ্ডের কর্তাটি একজন বুড়ো খালাসীকে প্রশ্ন করলেন—"ব্যাপারখানা কি বল ত? তোমাদের মধ্যে এ রকম চাঞ্চল্য এল কেন?"

বুড়ো খালাসীটি উত্তর দিল, "মনে হয়, একটা ভয়ানক দুর্যোগ ঘটবে। আকাশের গতিক ভাল নয়।"

এবার ঘন ঘন আকাশের রঙ বদ্লাতে লাগল। হাল্কা রঙ থেকে অনেকটা গাঢ় রঙে দাঁড়াল। কাপ্তেনের চিন্তাও বেশ বেড়ে উঠল, তিনি খালাসীদের ও অন্যান্য কর্মচারীদের ডেকে গম্ভীরমুখে কি যেন বললেন।

একজন প্রবীণ যাত্রী বললেন, "ব্যাপারটা ত ভাল বুঝছি না, দক্ষিণ সাগরের ঝড় যে অতি ভয়ানক!"

এক অধ্যাপক মশাই বললেন, "তা' ছাড়া দক্ষিণ সমুদ্রের বহু স্থান, বহু দ্বীপ এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। ছোট-বড় পাহাড়ে এই সমুদ্রের তলদেশ আচ্ছন্ন। একটু পথভ্রষ্ট হলেই জাহাজের পক্ষে সর্বনাশ!

এবার আকাশের রঙ বদলে গিয়ে একেবারে যেন পাটলবর্ণ হয়ে গেল আর বাতাসের বেগও খুব তীব্র হয়ে উঠল। কাপ্তেন ও কর্মচারীরা সকলে মিলে যাত্রীদের নিজের কেবিনে যেতে বিশেষ অনুরোধ করলেন। ডেক প্রায় শূন্য হয়ে গেল। সকলের মুখেই একটা আতঙ্কের ভাব।

সাগরের বুকে ঢেউ এবার উত্তাল হয়ে পড়ল। বাতাস আরও তীব্র হয়ে উঠল। আকাশের কালো মেঘগুলো যেন ওলটপালট খেতে লাগল। এবার কাপ্তেন বিপদসঙ্কেত বাঁশী ঘন ঘন বাজাতে লাগলেন। দূর থেকে একটা অতি প্রচণ্ড শব্দ যেন এগিয়ে আসতে লাগল। এবার আর রক্ষা নেই, সাইক্লোন আসছে, দক্ষিণ সমুদ্রের সাইক্লোনের তুলনা নেই—সমুদ্রের প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখে সকলের প্রাণ দারুণ ভয়ে শিউরে উঠতে লাগল। জাহাজ টলতে টলতে চলল।

প্রচণ্ড বেগে এবার সাইক্লোন এসে পড়ল। সেই ভীষণ আঘাতে জাহাজ কাঁপতে কাঁপতে এমন টলতে লাগল যে স্থির হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব। বড় বড় ঢেউ জাহাজের উপর এমন ভাবে আছড়ে পড়তে লাগল যে মনে হ'ল জাহাজ বুঝি সে আঘাতে গুঁড়ো হয়ে যাবে! ডেকের উপর ঢেউয়ের দল যেন লাফিয়ে উঠে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়! জাহাজের বিপদসঙ্কেত বাঁশী ঘন ঘন বাজছে, আর খালাসী ও কর্মচারীর দল মহাভয়ে ছুটোছুটি করছে। সমুদ্রের বুকে জাহাজ যেন নাচতে লাগল। প্রচণ্ড ঝড় জাহাজের ডেকের উপরের অনেক জিনিষই যেন টেনেহিঁচড়ে ছিঁড়ে সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কেবিনের মধ্যেই যাত্রী দল তখন চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে ক্যাপ্টেন ও কর্মচারীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও জাহাজ সামলাতে পারছেন না। ক্যাপ্টেনের মুখে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। তিনি তাঁর সহকারীকে বললেন, "জাহাজ দেখছি বিপথে চলে এসেছে। আমি ত প্রতিমুহূর্তে এক ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা করছি।"

সহকারী বললেন, "ঝড়ের বেগে জাহাজের গতিও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। কোথায় গিয়ে যে ধাক্কা খাবে কে জানে!"

ঝড় আরও বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রেরও দেখা গেল আরও এক ভয়ঙ্কর মূর্তি। এবার পাহাড়ের মত ঢেউ উঠছে আর ঘূর্ণির মত জাহাজকে ঘোরাচ্ছে আর নাচাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় জাহাজ কাৎ হয়ে হয়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন যেন হতাশ হয়ে পড়লেন।

এবার আবার ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বর্ষণ সুরু হ'ল। সে যে কি ভয়ানক বৃষ্টি তা ভাষায় বোঝানো যায় না। সেই ভয়ানক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে জাহাজ তীব্রবেগে ছুটে চলেছে এক নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে। কোন্ দিকে যে জাহাজ যাচ্ছে, ক্যাপ্টেন বা কর্মচারীরা কেউ ঠিক করতে পারছেন না। জাহাজের যন্ত্রপাতি সব বিকল হয়ে গেছে। শুধু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে জাহাজ নিজেই যেন ছুটে চলেছে এক অজানা পথে।

হঠাৎ একটা ভয়ানক শব্দে জাহাজ যেন থর থর করে কেঁপে উঠল আর কাৎ হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন তখন বিপদের বাঁশী ঘন ঘন বাজিয়ে সকলকে জানিয়ে দিলেন, জাহাজকে আর বাঁচানো গেল না, জাহাজ ধাক্কা খেয়েছে এক জলমগ্ন পাহাড়ের সঙ্গে।

তখন আর্তনাদ করতে করতে কেবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল যাত্রীর দল। জাহাজে যে কয়খানি বোট ছিল সেগুলিকে তখনি দড়িদড়া কেটে নামানো হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে যে যেমনি পারলে তাতে চড়ে বসল। ক্যাপ্টেন গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, "আগে স্ত্রীলোক ও শিশুগুলিকে বোটে তোলা হোক"—কিন্তু প্রাণরক্ষার জন্য স্ত্রীলোক আর শিশু ছাড়াও সকলে লাফিয়ে বোটে উঠে পড়ল।

এবার পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ এসে কাৎ-হওয়া জাহাজের উপর আছড়ে পড়ল। সে অবস্থায় যারা বোটে উঠতে পারে নি তারা সে ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের ধাক্কায় উত্তাল সাগরের মাঝখানে ছিটকে পড়ল।

চারদিকে আর্তনাদ ও কোলাহলের মধ্যে যাত্রী-বোঝাই বোটগুলিও ঢেউয়ের বুকে কোথায় যে মিলিয়ে গেল কে জানে! শেষ অবস্থা দেখে ক্যাপ্টেন ও খালাসীর দলও যে যে-ভাবে পারলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য বড় বড় কাঠ ও তক্তা আঁকড়ে ধরে সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এদিকে সকলে কেবিন ছেড়ে পালালেও পূর্বোক্ত সুইস্ দম্পতি ও তাঁদের চার ছেলে একটি কেবিনে আটকে পড়ে রইলেন। তার কারণ হ'ল এই যে, ছোট ছেলে ফ্রান্সিস্ কখন ছেলেমানুষি করে ভিতর থেকে কেবিনের দরজায় তালা লাগিয়ে চাবি বন্ধ করে দিয়েছিল। হয়ত তার শিশুসুলভ বুদ্ধিতে সে ভেবেছিল, কেবিনের দ্বার তালাচাবি বন্ধ করলে সেই দারুণ ঝড়-বৃষ্টিতে তারা নিরাপদ থাকবে। কিন্তু এখন কেবিন ছেড়ে পালাবার সময়ে সে চাবিটা যে কোথায় রেখেছে সেটা ঠিক করতে পারলে না। এদিকে টানাটানিতে দরজা খুলতে না পেরে সকলে মিলে আর্তনাদ ও চেঁচামেচি করতে লাগল। এতে যে সময় কাটল, তখন জাহাজের সকলে বোটে চেপে জাহাজ ছেড়ে চলে গেল।

জাহাজের গায়ে ঢেউয়ের আঘাত এবার যেন কমতে লাগল। ঝড়ের কানফাটানো শব্দও যেন অনেকটা কমে এল। জাহাজ কিন্তু তেমনি কাৎ হয়েই আছে, ডুবে যায় নি।

ঝড় আরও কমে গেল। ঢেউয়ের শব্দও আর বেশী শোনা গেল না। কাৎ-হওয়া জাহাজের কাঁপুনিও তখন আর নেই। এবার কর্তামশাই অনেক খোঁজাখুঁজি করে কেবিনের এককোণে চাবিটা দেখতে পেলেন। তিনি তখন দরজার তালা খুলে স্ত্রী ও চার ছেলেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। জাহাজ কাৎ হয়ে থাকাতে সকলের চলাফেরা করতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, সমুদ্রের অবস্থাও শান্ত, ঝড়ের দাপট আর নেই, তখন তাঁরা হতাশ মনেও একটু বল পেলেন। দুর্যোগ রাত্রির অবসানে তখন আবার দিনের আলো ফুটে উঠছিল, সেই আলোতে তাঁরা দেখলেন, দুটো ডুবন্ত পাহাড়ের মাঝখানে জাহাজ ঝড়ের বেগে এমন ভাবে আটকে গেছে যে তার আর নড়ন-চড়ন নেই।

প্রভাতের আলো আরও ফুটে উঠল। সমস্ত দুর্যোগ কেটে গিয়ে আবার পূর্বদিগন্তে সূর্যের মুখ দেখা গেল। সমুদ্রের বুকে আর সেই উত্তাল ঢেউ নেই। সমুদ্র এখন শান্ত-স্থির। বাতাসে ঝড়ের বেগ নেই, সামুদ্রিক পাখীগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।

কাৎ-হওয়া জাহাজের উপর দিয়ে অতি কষ্টে চার-

দিকে খোঁজ করেও ছেলেদের বাবা কোন লোককে দেখতে পেলেন না। মা-ও আতিপাতি খুঁজে দেখলেন, কিন্তু কৈ, কারুর ত সন্ধান নেই।

সূর্যের আলোয় বাবা দেখতে পেলেন যেখানে সমুদ্রে জাহাজ আটকে গেছে, তার অল্প দূরেই ডাঙা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি তখনি ছেলেদের ও তাদের মাকে সেই ডাঙা দেখালেন। বাবা বললেন, ওটা নিশ্চয়ই একটা দ্বীপ, ওখানে যে বনজঙ্গল ও ছোট পাহাড় রয়েছে সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দ্বীপটাতে নিশ্চয়ই কোন লোকজন নেই, তা না হ'লে তারা ঠিক জাহাজ দেখে ছুটে আসত দ্বীপের তটে ও ভিড় করে দাঁড়াত সেখানে।

বাবা, মা ও ছেলেরা অনেকক্ষণ সেই দ্বীপের দিকে চেয়ে রইল। দ্বীপটি খুব বেশিদূরে নয়, সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সেখানে। আর যেখানে জাহাজ আটকেছে, সেটা একটা ছোট উপসাগরের মত, সমুদ্রের বড় ঢেউ নেই সেখানে। জল অনেকটা শান্ত, আর গভীরও তেমন নয়। তখন সকলে মিলে পরামর্শ করলে এ অবস্থায় জাহাজে আটকে থেকে লাভ কি? তার চেয়ে সামনের ঐ দ্বীপেই যাওয়া ভাল। কারণ, আবার যদি ঝড় আসে বা কোন কারণে আটকানো জাহাজ খুলে যায় তবে জাহাজ নিশ্চয়ই সমুদ্রে ডুবে যাবে, তখন আর বাঁচবার কোনই উপায় থাকবে না।

নিদারুণ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সকলে তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে জাহাজে খাবার খুঁজতে বেরুল। সকলের খুব খিদে পেয়েছিল। মা তখন জাহাজের ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে দেখেন, সব কিছুই আছে সেখানে, তবে বহু জিনিস সমুদ্রের জলে নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি খুঁজে খুঁজে কিছু রুটি, মাখন, ডিম, জেলি নিয়ে এলেন ও কাৎ-হওয়া ডেকের উপর কোনরকমে বসে সকলে মিলে প্রভাতসূর্যের কিরণে প্রাতরাশ সম্পন্ন করলেন।

বাবা-মা ও ছেলেরা তখন খুঁজে দেখতে লাগলেন ছোট বোট বা কাঠের বড় তক্তা পাওয়া যায় কি না। একটু খুঁজে দেখবার পর তাঁরা পেলেন জাহাজের পিছন-দিকে একখানা বড় ত্রিপল-ঢাকা ছোট বোট। হয়ত রাত্রির অন্ধকারে সেই ভীষণ বিপর্যয়ের মাঝখানে প্রাণ বাঁচানোর বিশৃঙ্খলতায় এই ত্রিপলঢাকা ছোট বোটটি কারুর নজরে পড়ে নি, বা জাহাজের কর্মচারীদের মনে আসে নি।

সেই ছোট বোটটি দেখে বাবা বললেন, "এও দেখছি ভগবানের অসীম করুণা। যাই হোক, যেকালে বোট পাওয়া গেছে, তখন সকলে মিলে একবার সামনের দ্বীপটা দেখে আসা যাক।

বাবা তখন বোটটির বাঁধন খুলে ধরাধরি করে নিয়ে এসে সমুদ্রের জলে তাকে নামিয়ে তার উপরে সকলে উঠে বসে দাঁড় বাইতে লাগলেন। উপসাগরের শান্ত জলের উপর দিয়ে বোট ভেসে চলল দ্বীপের দিকে।

দ্বীপের একটা স্থান বেছে নিয়ে তাঁরা বোট ভিড়ালেন সেখানে, তারপর আগে বাবা নামলেন, তারপর মা ও ছেলেরা। দ্বীপের সেখানে ছোট-বড় পাথর থাকাতে নামবার কোন অসুবিধাই হ'ল না। বোটটিকে একটা বড় পাথরের সঙ্গে বেঁধে রেখে তারা এগিয়ে চললেন দ্বীপের মধ্যে।

চমৎকার দ্বীপটি। চারপাশে নানা গাছের বন। তার মধ্যে নারিকেল, তাল, বাদাম, আতা, পেয়ারা, নাসপাতি, জাম, খেজুর, কলা, ডুমুর প্রভৃতি যথেষ্ট গাছ রয়েছে। তা ছাড়া লাউ, শশা, বুনো আঙুরের লতাও দেখতে পেলে তারা। বাবা কয়েকটা চারা গাছের কাছে গিয়ে বললেন, "এগুলো আলু, শালগম, গাজরের গাছ।" আর একটু যেতেই তারা দু'একটা কমলালেবু ও বাতাবি লেবুর গাছও দেখতে পেলে।

মা হেসে বললেন, "আরও হয়ত অনেক রকম ফলের গাছ আছে এখানে। আমরা এখানে আশ্রয় নিলে বোধ হয় খাবার কষ্ট হবে না।"

বাবা বললেন, "তা ছাড়া পাখী ও বুনো হাঁসও যথেষ্ট রয়েছে দেখা যাচ্ছে।" তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে গেল তাদের পায়ের শব্দে।

ছেলেরা ততক্ষণে কিছু পাকা কলা, বাদাম, আতা, পেয়ারা ও জাম সংগ্রহ করে এনেছে। একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর বসে সকলে মিলে সেগুলি খেয়ে নিলে।

মা বললেন, "কিন্তু জল কৈ? সমুদ্রের নোনা জল খেয়ে ত এখানে থাকা যাবে না।"

বাবা বললেন, "এ দ্বীপে পাহাড় যেকালে আছে, ঝরণাও সম্ভবতঃ আছে। খুঁজে দেখা যাক।"

ছেলেরা একটু খুঁজতেই একটা ছোট ঝরণার সন্ধান তারা পেলে। তারি সুমিষ্ট পরিষ্কার জল তার। তখন সকলে মিলে খোঁজ করতে লাগল পাহাড়ের মধ্যে কোন ছোট গুহা পাওয়া যায় কি না, যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে।

পাহাড়টি ছোট, কিন্তু খাড়াই না হওয়ায় উঠবার

কোন কষ্ট নেই। পাথরের উপরে পা রেখে রেখে সহজেই উঠা যায়। সেইভাবে তারা পাহাড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু কৈ? কোন গুহাই তাদের চোখে পড়ল না।

হঠাৎ পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় গিয়ে তারা খুবই আনন্দিত হ'ল। চমৎকার একটি গুহা রয়েছে সেখানে। গুহার সামনে একটা চ্যাপ্টা চওড়া পাথর পাহাড়ের গায়ে আড়ভাবে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন সেটা সেই গুহারই বারান্দা। গুহার সামনে অতখানি চওড়া পাথর থাকাতে বাইরে বসে বেশ রৌদ্র উপভোগ করা যায় এবং চারপাশের ও নিচের সমস্ত দৃশ্য দেখা যায়। তারা সকলে সাবধানে গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। আগে বাবা, তারপর মা ও পিছনে ছেলেরা। গুহাটি বেশ বড়। বড় ছেলে ফ্রিজ হঠাৎ বলে উঠল, "আরও একটা গুহা যেন পাশে দেখতে পাচ্ছি।"

"কৈ? কোথায়?"—বলে সকলে ফ্রিজের মুখের দিকে চাইল। ফ্রিজ তখন দেওয়ালের গায়ে একটা বড় ফোকর দেখিয়ে বললে, "এইটা দিয়ে বোধ হয় ভিতরে আর একটা গুহায় যাওয়া যায়।" মনে হচ্ছে যেন আর একটা গুহা আছে।"

সকলে তখন সেই ফোকর দিয়ে দ্বিতীয় গুহায় প্রবেশ করল। সে গুহাটি প্রথম গুহার চেয়ে একটু অন্ধকার। তবে প্রথম গুহার আলোয় ভিতরে অস্পষ্টভাবে সব কিছু দেখা যায়। বাবা বললেন, "ভালই হ'ল ছটো গুহা হ'লে আমাদের চলবে। এ গুহাটিও মন্দ নয়।"

হঠাৎ মেজছেলে আর্নেষ্ট বলে উঠল—"বাঃ রে! এই গুহার কোণের দিকে এ বড় গর্তটা কিসের?"

মা সাবধান করে দিলেন—"গর্তের মধ্যে যাস্ নি যেন!" কিন্তু ততক্ষণে আর্নেষ্ট, ফ্রিজ, জ্যাক্ ও ফ্রান্সিস্ সেই গর্তের মধ্যে পরম উৎসাহে ঢুকে পড়েছে। তখন বাধ্য হয়ে বাবা ও মাকেও তাদের পিছনে-পিছনে যেতে হ'ল।

গর্ত দিয়ে এবার যে গুহাটিতে যাওয়া গেল, সেটি বেশ বড়। আশ্চর্যের বিষয়, সেই গুহার দক্ষিণ কোণে ছাদের কাছাকাছি ছটো পাথর ফাঁক হয়ে থাকাতে দিনের অল্প আলো সেই গুহায় ঢুকে কিছুটা তাকে আলোকিত করেছে। সুতরাং গুহার মধ্যে প্রায় সব কিছু দেখা যাচ্ছিল।

মা বললেন—"তা হ'লে পাশাপাশি তিনটে গুহাই পাওয়া গেল। এ রকম পাশাপাশি গুহা যে পাব তা স্বপ্নেও ভাবি নি।"

বাবা বললেন—"সবই মঙ্গলময় ভগবানের দয়া। তা হলে আজই সেই ভাঙা জাহাজ ছেড়ে এ গুহা তিনটিতেই আশ্রয় নেওয়া যাক্।"

ফ্রিজ ও জ্যাক পরম উৎসাহে পরামর্শ করছিল যে প্রথম গুহাটি হবে তাদের বসবার ও খাবার ঘর, দ্বিতীয়টি হবে তাদের শয়ন ঘর ও তৃতীয়টি হবে ভাঁড়ার ঘর ও রন্ধনশালা। তা ছাড়া মা ও বাবা যেভাবে বলবেন সেই মতই ব্যবস্থা হবে। কেননা তৃতীয় গুহার ছাদের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে পারবে।

এবার বাবা বললেন—"গুহার সামনে পাহাড়ের নীচে যে সমতল ভূমিখণ্ড রয়েছে ওখানে কিছু একটা করা যেতে পারে! এখন চল, জাহাজে ফিরে গিয়ে দরকারী জিনিষপত্র সব আনা যাক।"

সকলে তখন বোটে করে আবার জাহাজে ফিরে এল। আর একবার সকলে মিলে সমস্ত জাহাজ খুঁজে দেখলে কেউ কোথাও আছে কি না। কিন্তু কাকেও দেখতে পেলে না তারা।

তখন কি কি জিনিষ দ্বীপে নিয়ে যেতে হবে তার একটা ফর্দ করতে লাগল তারা। মা বললেন—"এ সব জিনিষই ত যাত্রীরা ফেলে গেছে। আমরা যদি সেগুলি না নিই তা হ'লে সমুদ্রের জলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া এখনও জাহাজে কয়েকটি গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, শূকর, মুর্গী, হাঁস রয়েছে। ওগুলিকেও নিয়ে যেতে হবে।

ফ্রিজ তখন একটা ফর্দ করতে বসল। ফর্দটি এই ভাবে দাঁড়াল—

জাহাজের ভাঁড়ার ঘরের বড় বড় টিন ভর্তি তেল মশলা ময়দা চিনি বিস্কুট চা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষ ও একটা যাঁতা। রন্ধনের জন্য তৈজসপত্রাদি, তৌত ও জল রাখবার বড় ড্রাম।

মিশনারীদের সঙ্গের যাবতীয় সমস্ত প্যাণ্ট, জামা, জুতো, ছাতা, টুপি, গেঞ্জি প্রভৃতি।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গের বিছানার চাদর, গালিচা, বালিশ, তোষক, তোয়ালে, লেপ প্রভৃতি ও নানা প্রসাধনের দ্রব্য, এবং আয়না, চিরুণী, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ-সুতা প্রভৃতি।

শিকারী দলের সঙ্গে থাকা ছয়টি দামী শক্তিশালী বন্দুক, ছয়টি রিভলভার, শিকারের বড় ছুরি ছয়টি,

শক্তিশালী টর্চ দুটি, তীর-ধনুক ভর্তি বাক্স, কিছু ব্যাগ দুটি, কুঠার তিনখানা।

জাহাজের ভাঁড়ারঘর থেকে কালো তেলের পিপা কয়েকটি।

জাহাজের ডেক থেকে ডেকচেয়ার, ছোট ছোট টেবিল।

কাপ্তেনের ঘর থেকে একখানা মানচিত্র, বাতিদান, একটা ঘণ্টা, কয়েকটা পর্দা, চকমকি পাথর, একটা কম্পাস, একটা দূরবীন, একটা ঘড়ি ও গোটা কয়েক লণ্ঠন। তা ছাড়া ডাক্তারের ঔষধপত্রাদি ও চিকিৎসা-ব্যবহার্য কতকগুলি ঔষধ, কয়েক বাণ্ডিল অয়েল ক্লথ ও চামড়ার বর্ষাতি। জাহাজের খোল থেকে কয়েকটি বড় বড় গামলা ও কয়েকটা দড়িদড়ার বাণ্ডিল, বড় পালের অংশ, ত্রিপল, টুকরা কাঠ ও তক্তা। তা ছাড়া নর্তকদলের একটি গীটার, ব্যাঞ্জো ও একটি ছোট সেতার ড্রাম।

ইঞ্জিন ঘর থেকে প্রচুর কয়লা।

তা ছাড়া অস্ত্রঘর থেকে পাওয়া গেল করাত, বাটালি হাতুড়ি, স্ক্রু, পেরেক, তুরপুণ প্রভৃতি।

বাবা হেসে বললেন—"বাবাঃ জাহাজখানাই নিয়ে যাচ্ছ দেখছি। কিন্তু খুব দরকারী ছাড়া সব জিনিস ত ভিতরে ঢুকাতে হবে না।"

ক্রিফ বললে, পাহাড়ের মধ্যে আরও গুহার সন্ধান দেখতে হবে।"

ঠিক হ'ল বাবা ও মা সেই গুহা তিনটি ব্যবহারোপযোগী করে সাজিয়ে নেবেন আর প্রত্যহ তিনবার করে চার ভাই মিলে জাহাজ থেকে জিনিসপত্র বোটে করে নিয়ে যাবে।

জিনিসপত্র ঠিকমত সব নিয়ে যেতে সপ্তাহখানেক কাটল। গুহা তিনটি একরকম করে সাজানো হ'ল।

(দুই)

একদিন পাহাড়ের তলার কাছে হঠাৎ একটা বড় গুহা আবিষ্কৃত হ'ল।

আবিষ্কার করার কথা নয়, ঘটনাচক্রে আবিষ্কার হয়ে গেল।

একটা বড় পাথর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পাহাড়ের গায়ে। একদিন প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। তার সঙ্গে ঝড়। সকলে গুহার মধ্যে বসে বসে দ্বীপের উপর প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলা দেখছিল। হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ এল পাহাড়ের তলদেশ থেকে। সকলে ভয়ানক চমকে উঠে দেখলে সেই বড় খাড়া পাথরখানা নড়ে উঠে হুড়মুড় করে পড়ে গেছে। বোধ হয় বৃষ্টির জলে মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় ভারকেন্দ্র ঠিক রাখতে না পেরে সেই পাথর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি।

বৃষ্টির বেগ একটু কমলে সকলে ছুটে নীচে নেমে গেল। যেখানে পাথরখানা ছিল, সেখানে একটা গুহার মুখ দেখা গেল। টর্চ জেলে সকলে সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। এতদিন বড় পাথরখানা গুহার মুখে থাকায় সেখানে-যে কোন গুহা আছে এ কথা কেউ ভাবতেই পারে নি। এখন সকলে দেখলে গুহাটি বেশ বড়।

বাবা বললেন, "ভগবান দেখছি নানাভাবে আমাদের উপর দয়া দেখাচ্ছেন। আলানি তেলের পিপা, কয়লার স্তূপ, বড় বড় গামলাগুলো, টুকরো কাঠ, তক্তা, পাল, ত্রিপল ও দড়াদড়ির বাণ্ডিল কোথায় রাখা হবে সে কথা ভাবছিলাম। এখন দেখছি এই গুহাটি আমাদের একটি চমৎকার ভাঁড়ারঘর হবে।

সকলে পরম উৎসাহে গুহাটি ব্যবহারোপযোগী করতে লেগে গেল। তারপর যে-সব জিনিস সেখানে রাখা যেতে পারে সেগুলি সেখানে সাজিয়ে রাখা হ'ল।

পাহাড়ের নীচে ছোট্ট নদীটির তীরে যে সমতল ভূমিখণ্ড ছিল, সেখানে স্থির হ'ল গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, মুর্গী, হাঁস প্রভৃতি রাখবার জন্য লম্বা লম্বা চালা তৈয়ার করতে হবে। চারভাই কাজে লেগে গেল। চালা ক'টি তৈয়ার করতে ও সেই ভূমিখণ্ডের চারদিকে কাঠের খুঁটি সমান করে কেটে পাশাপাশি রেখে কাঠের পাঁচিল দিতে একমাসের উপর লেগে গেল। ওরা নাম দিলে তার পশুশালা। একটা কাঠের গেটও তৈয়ার করলে ওরা। এবার পাহাড়ের উপরের প্রথম গুহাটির সামনে যে পাথরের বারান্দার মত ছিল, ক্রিফ, আর্নেষ্ট, জ্যাক ও ফ্রান্সিস জাহাজ থেকে কাপ্তেনের ঘরের সামনের কাঠের রেলিং কেটে এনে সেখানে চারপাশে লাগিয়ে দিয়ে চমৎকার একটি বারান্দার সৃষ্টি করলে। সেখানে প্রতিদিন সকালে-বিকালে বাবা মা ও চারভাই মিলে বসে নানা বিষয়ের আলোচনা করত। এক একদিন ক্রিফ গীটার, আর্নেষ্ট ব্যাঞ্জো ও জ্যাক সেতার ড্রাম বাজাত আর ছোট ছেলে ফ্রান্সিস তার মায়ের শেখানো গান গাইত। সময়ে সময়ে তাদের বাবা ও মা এই ঐকতানে

যোগ দিতেন। তখন গানের আসর বেশ সরগরম হয়ে উঠত।

১নং গুহাটি বসবার ঘর ও খাবার ঘর হওয়াতে মা বেশ যত্ন করে সেটিকে সাজিয়েছিলেন। টেবিল, চেয়ার, ডিশ, প্লেট কাঁটা চামচের কোন অভাব ছিল না। চায়ের সরঞ্জামও সব ঠিক-ঠিক ছিল। জাহাজ থেকে গোটা চারেক গদি-আঁটা ইজিচেয়ারও রাখা হয়েছিল সে-ঘরে।

২নং গুহাটি ছিল শোবার ঘর। সেখানে জাহাজ থেকে আনা তোষক গদি লেপ চাদর দিয়ে চমৎকার সব বিছানা পাতা ছিল। প্রত্যেকের শিয়রে একটা করে বাতিদান রাখা হয়েছিল।

৩নং গুহাটি রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর। সেখানে রান্নাবান্নার সব কিছু জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছিল মায়ের নির্দেশে।

এই ৩নং গুহার পাশের একটা দিকে পাথরের একটা বড় কার্নিশ ছিল। সেই কার্নিশ দিয়ে দেখলে পাহাড়ের তলদেশের বনভূমি পর্যন্ত দেখা যেত। আর তার দেওয়ালের পাথর ফুঁড়ে একটা ক্ষীণ ঝরণার ধারা সেই কার্নিশ দিয়ে নীচে ঝরে পড়ত। অনেক ভেবেচিন্তে মা সেই দেওয়ালের কতকাংশ নিয়ে একটা ছোট কাঠের পার্টিশন করলেন। সেটি একটি ছোট ঘর হ'ল। এই ঘরটিকে তিনি বাথরুম রূপে ব্যবহার করবার নির্দেশ দিলেন।

চমৎকার সব ব্যবস্থা। ব্যবহারের জিনিস সব হাতের কাছেই আছে। বাবা, মা ও চারছেলে এই আশ্চর্য দ্বীপের রহস্যময় পরিবেশে একরকম সুখেই দিন কাটাতে লাগলেন।

কাজকর্মের চাপ এবার অনেকখানি কমে এল। তবুও ওরা সকলে মিলে বোটে চেপে আর একবার জাহাজে গেল। সেখানকার স্মৃতি একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মত ওদের মনের উপর চেপে বসেছিল। আরও কিছু দরকারী জিনিষ পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে ওরা জাহাজের খোলে নেমে যেতেই হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। যাত্রী শিকারীদের সঙ্গে দুটো শিকারী কুকুরও ছিল। তারা শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় জাহাজের ডগ-কেনেলে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সাইক্লোনে যখন জাহাজের চরম দুর্দশা, তখন কেমন করে না-জানি তারা ডগকেনেল থেকে বেরিয়ে ভয়ে একটা বড় খালি লোহার পিপের মধ্যে ঢোকে। জাহাজের দোলনে ভারী পিপেটা কি রকম করে গোজা হয়ে উল্টে পড়ে আর তারা সেই পিপের নীচে চাপা পড়ে আটকে যায়। সুতরাং প্রথম দিকে জিনিসপত্র আনবার সময়ে জাহাজের বিরাট খোলের এক প্রান্তের সেই লোহার পিপেটার দিকে কেউ লক্ষ্য করে নি। দরকারী জিনিষপত্র আনবার পর নূতন ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা করতে বাবা, মা ও ছেলেরা এতই ব্যস্ত ছিল যে তারা আর জাহাজে যায় নি। এদিকে প্রাণরক্ষার তাগিদে কুকুর দুটো প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলাঠেলি করে কোনরকমে সেই পিপে আবার একটু কাৎ করে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু লোকশূন্য জাহাজে তারা বাধ্য হয়েই পড়ে রইল। চারপাশে অকূল সমুদ্র, তবু সেই ভাঙা জাহাজ তাদের কতকটা আশ্রয়। সে আশ্রয় ছেড়ে তারা যাবেই বা কোথায়? জাহাজের খাদ্যদ্রব্যের কয়েকটা ইঁদুর ও জাহাজের খোলের মধ্যে জলের সঙ্গে আসা মাছগুলি খেয়ে কোনক্রমে তারা প্রাণ বাঁচিয়েছে। এখন এদের ছ'জনকে দেখে তারা ছুটে এল। অনেকদিন মানুষের মুখ দেখে নি। তাই মানুষ দেখে লেজ নাড়তে নাড়তে তারা এদের চারপাশে ঘুরে-ফিরে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। ফ্রান্সিস তখন তার পকেট থেকে খানকয়েক বিস্কুট তাদের দিকে ছুঁড়ে দিতেই তারা আনন্দে সেগুলি খেয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এসে তার প্যান্ট চাটতে লাগল। তখন সকলে সেই নির্জন দ্বীপে প্রয়োজন হতে পারে ভেবে কুকুর দুটিকে ফেরবার সময় সঙ্গে করে দ্বীপের ঘরে নিয়ে গেল। দুটো শিকারী কুকুর আসাতে ওদের পশুশালার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ওরা কুকুর দুটোর ওপরেই ছেড়ে দিলে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মা যেতেন পশুশালায় দুধ ও ডিম আনতে। তারপর ডিমসিদ্ধ, রুটি ও চা তৈরী করে কর্তাকে ও ছেলেদের ঘুম থেকে তুলতেন। তারা হাতমুখ ধুয়ে প্রাতরাশ খেয়ে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ত কাছাকাছি কোথাও শিকারে।

সেদিন ফ্রিজ বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরিয়েছে আর জ্যাক একগাছা ছিপ নিয়ে খালি পায়ে নদীর ধারে একটা উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়ে মাছ ধরতে বসে গেছে। হঠাৎ জ্যাক আর্তনাদ করে উঠল। তার সে আর্তনাদ শুনে তার বাবা তখনি একটা কুড়ুল নিয়ে ছুটলেন জ্যাকের কি হয়েছে দেখতে। তিনি গিয়ে দেখেন একটা প্রকাণ্ড সামুদ্রিক কাঁকড়া কখন নদীপথে এসে অতর্কিতভাবে জ্যাকের পায়ের আঙুল কামড়ে

ধরেছে। বাবা ছুটে এসে কুড়ুলের এক ঘায়ে কাঁকড়াটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। জ্যাক উদ্ধার পেল বটে কিন্তু মরা কাঁকড়াটাকে নিয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে একেবারে গুহাঘরে মায়ের কাছে এসে হাজির! মাকে কাঁকড়াটা দেখিয়ে জ্যাক বললে—"দেখ মা, কি চমৎকার কাঁকড়া, এর একটু সুপ করে দিয়ো, আমি রুটি দিয়ে খাব।"

মা বললেন—"একটাতে কি হবে রে! আরও গোটা কয়েক নিয়ে আয় না।"

জ্যাক বললে—"খুঁজে দেখতে হবে মা,—আচ্ছা আমি চললাম,—যদি পাই নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।"

এই বলে জ্যাক একটা মোটা থলি নিয়ে তখনি বেরিয়ে গেল।

নদীর ধারে ধারে ঘুরে সে আর কাঁকড়া পেল না। আর একটু দূরে প্রায় সমুদ্রের কাছাকাছি যেতেই তার নজরে পড়ল অনেকগুলো কাঁকড়া একটা ছোট ডোবার মধ্যে রয়েছে। জ্যাক কৌশল করে তাদের অনেক-গুলোকে ধরে থলিতে পুরে ফেললে, তারপর মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে থলি হাতে নিয়ে মায়ের কাছে ছুটে চলল।

মা অতগুলো বড় বড় কাঁকড়া দেখে খুবই খুশী। তিনি বললেন—আজ শুধু পেট ভরে কাঁকড়ার সুপ আর রুটি। একটা নতুন জিনিষ পেটে পড়বে।

সন্ধ্যার আগে সকলে ফিরে এসে কাঁকড়ার খবর শুনে খুব আনন্দিত হ'ল। সেখানে সকলে খুব পরিতোষ-সহকারে রাত্রিভোজ শেষ করল।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খেয়ে ফ্রিজ বন্দুক নিয়ে শিকারে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরে এল একটা নতুন ধরনের জন্তু শিকার করে।

বাবা বললেন—"এর মাংস খুব উপাদেয় হবে মনে হচ্ছে।"

মা বেশ যত্ন করে রান্না করলেন। সকলে সেই জন্তুর সুস্বাদু মাংস খেয়ে খুবই আনন্দিত হ'ল।

সকালবেলা থেকেই ওদের নানান কাজ। কাজের যেন আর অন্ত নেই। পশুশালার কাজ মিটতে না-মিটতেই ওরা যায় ফলের বাগানে। বাগান ওরা বনের খানিকটা অংশ ঘিরে নিয়েই করেছিল। সেখানে পেয়ারা, নাসপাতি, খেজুর, নারিকেল, তাল, পেঁপে, আতা, বাদাম প্রভৃতি গাছ ছিল। ফলের বাগান থেকে কিছু ফল কুড়িয়ে নিয়ে এসে চারভাই মায়ের কাছে রাখত। মা সেই ফল কেটেকুটে ডিসে সাজিয়ে খ' খাবারের সঙ্গে দিতেন।

ফ্রিজ সাধারণতঃ আর্নেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে শিং যেত। জ্যাক ও ফ্রান্সিস দু'জনে মিলে মাছধরা, প খরা প্রভৃতি কাজে থাকত। একদিন সকালে জ্যাক ফ্রান্সিস ফলের বাগানে গিয়ে দেখে কোথা থে একদল বানর এসে তাদের বাদাম গাছের উপরে আছে। বাদাম পাড়তে দেবে না, অথচ দাঁত খিঁ মারমুখো হয়ে আছে। ব্যাপার দেখে তখন জ্যাক তা তাড়াবার জন্য ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়তে লাগল। 1 এর ফল হ'ল একরকম ভালই। বানরেরা তখন প ঢিল ছুঁড়তে লাগল বাদাম ফল দিয়ে। তাতে র রাশি বাদাম ওদের কাছে জড়ো হ'ল। তখন জ্যাক ফ্রান্সিস সেই বাদামগুলো ঝুড়িতে তুলে নিয়ে ও গুহাবাড়ীতে ফিরে এল। সকলে ঘটনা শুনে ত হেসে অস্থির।

একদিন চারভাই মিলে শিকারে গেল। সে দুই বুনো হাঁস মেরে ওরা ফিরছিল বনের মধ্য দিয়ে হঠাৎ একটা তীব্র গুঞ্জনধ্বনি শুনে ওরা আশ্চর্য হ চারদিকে তাকাতে লাগল। এই সময়ে ফ্রিজ বললে "নিশ্চয় কাছে কোথাও মৌমাছির চাক আছে, গুঞ্জন মৌমাছিদের। তখন তারা খুঁজতে খুঁজে একটা বিরাট মৌচাক দেখতে পেলে। ফ্রিজ বললে "কেউ কাছে যেও না, ওদের তাড়িয়ে মধু সংগ্রহ করা হবে।" এই বলে ফ্রিজ কতকগুলো শুকনো পা মৌচাকের নীচে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ীতে এসে বা ও মাকে এ খবরটা দিলে। বাবা বললেন—"বে মৌমাছি বড় বিষাক্ত, ওদের কাছ থেকে সর্বদা দূ থাকবে। এখন একটা বালতি আর একখানা কম্ব নিয়ে চল, মধু পাওয়া যায় কি না দেখতে হবে।"

সকলে একটু দূর থেকে দেখলে আগুন ও ধোঁয়া মৌমাছির দল মৌচাক ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আ প্রকাণ্ড মৌচাক থেকে টপ টপ করে মধু মাটিতে ঝ পড়ছে। বাবা তখন নিজে একটা কম্বল সর্বাঙ্গে জড়ি বালতি নিয়ে মৌচাকের দিকে গেলেন আর সাবধা যেখানে মধু ঝরে পড়ছিল সেখানে বালতিটা রে তাড়াতাড়ি সরে এলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এক বালতি মধু হ'ল। তখ আবার সেই রকম কম্বল গায়ে দিয়ে বাবা গেলে মধুর বালতি আনতে।

মধু নিয়ে ফেরার পর সকলে মনের আনন্দে সেই মধুর সঙ্গে রুটি মাখিয়ে বেশ পরিতোষ সহকারে মধ্যাহ্ন ভোজ সম্পন্ন করল। জাহাজ থেকে আনা কতকগুলো খালি শিশির মধ্যে মা সেই মধু ভর্তি করে রাখলেন।

একটা জিনিষের অভাব ওরা খুবই বোধ করছিল, সেটা হ'ল একটা ঠেলাগাড়ি। এই ঠেলাগাড়ি থাকলে ওদের পক্ষে জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে আসা খুব সহজ হ'ত।

জ্যাক বললে—"এ আর শক্ত কাজ কি? তক্তা জুড়ে জুড়ে গাড়ি সহজেই করা যেতে পারে।"

ফ্রান্সিস বললে—"কিন্তু চাকা? চাকা পাবে কোথায়?"

এ সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন বাবা। তিনি বললেন—"জাহাজে দড়িদড়া জড়াবার জন্যে যে কাঠের তৈরী গোল গোল চাকা আছে, সেগুলো ত এখনও জাহাজে পড়ে আছে। সেগুলো দিয়ে ত চমৎকার গাড়ির চাকা হয়।"

বাবার কথা শুনে ওদের উৎসাহ বেড়ে উঠল। তখনি চার ভায়ে আবার চলে গেল বোটে চেপে জাহাজে। প্রায় আটটা সেই রকম দড়িদড়া জড়াবার কাঠের চাকা নিয়ে ওরা ফিরল। বাবা বললেন—"এতেই চমৎকার চাকার গাড়ি হবে।"

দিন তিনেক পরিশ্রম করে চার ভাই দু'খানা চাকা লাগিয়ে একটা ঠেলাগাড়ি করলে। বাকি দু'খানা চাকা ওরা রেখে দিলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তারপর সেই ঠেলাগাড়িতে সামনের দিকে লম্বালম্বিভাবে দু'খানা সোজা কাঠ লাগিয়ে সেটা টানা-গাড়িতে পরিণত করলে ও পশুশালা থেকে একটা গাধা এনে তাতে জুড়ে দিয়ে চমৎকার একটা মালবহা গাড়ি হ'ল। এমন কি সেই গাধায় টানা গাড়িতে চড়ে ওরা অনেক দূর পর্যন্ত বেড়িয়ে আসতে লাগল।

মা বললেন, "আমাদের তহাঘরের নিচে একটা ফুলের বাগান করলে কেমন হয়?"

ফ্রান্সিস তখনি লেগে গেল মায়ের আদেশ পালন করতে। অবশ্য জ্যাকও তার সঙ্গে যোগ দিল। বনের মধ্যে যে-সব ফুল দেখতে চমৎকার ও বেশ বড় বড়, তাদের চারা তুলে এনে ওরা মাটিতে সারি সারি পুঁতে ফেললে আর সকাল-সন্ধ্যায় সেই চারাগাছে জল দিতে লাগল। ক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই তহাঘরের ঠিক নিচেতেই চমৎকার একটি ফুলের বাগান হ'ল।

একদিন চার ভাই বনের মধ্যে গিয়ে দেখে নদীর তীরে এক জায়গায় লম্বা লম্বা লাঠির মত কি একরকম গাছ হয়ে রয়েছে। একটা লাঠি-গাছ তারা ভেঙে নিয়ে এল বাবাকে দেখাবার জন্যে। বাবা সেটা দেখে হেসে বললেন, "আরে, এ যে আক দেখছি। কোথায় পেলে এ গাছ? নিয়ে এস কিছু এই আক।"

চার ভাই তখন তাদের গাড়ি নিয়ে গেল আক আনতে। অনেক আক দেখে বাবা খুব খুশী হলেন, তিনি বললেন, "এই আকের রস থেকে গুড় আর চিনি মিছরি হবে। প্রথমে আক ছেঁচে নিয়ে দু'জনে দু'পাশ থেকে চেপে ধরে দড়ির মত পাক দাও, তা হ'লে রস ঝরে পড়বে।" মা তখন একটা বালতি আনলেন ও ওরা যেমন যেমন ছেঁচা আক পাক দিয়ে রস বার করে মা তখনি বালতি ঠিক করে নিচে বসিয়ে দেন। এইভাবে আকের রসে বালতি ভরে গেল। বাবা তখন কাঠ-কুটোর আগুনে সেই রস জাল দিলেন। ক্রমে রস গাঢ় হয়ে গুড় হয়ে গেল। গরম পাতলা গুড় সকলে রুটির সঙ্গে বেশ আনন্দের সঙ্গেই খেলে। তারপর বাবা গরম পাতলা রস একটা থালায় রেখে সেই থালাটা ঠাণ্ডা জলে বসিয়ে দিলেন। ক্রমে দেখা গেল জমাট বাঁধতে বাঁধতে রস ক্রমশঃ মিছরির দানাতে পরিণত হয়েছে। আরও ঠাণ্ডা হলে তখন সেই মিছরি শিশির মধ্যে রাখা হ'ল।

এইভাবে তারা নিত্যনূতন জিনিষের সন্ধান পেতে লাগল। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তারা এক জায়গায় একটা বেতের বন দেখতে পেলে। সেই বেত তারা কিছু কেটে নিয়ে এল। মা সেই বেত দেখে মহাখুশী হয়ে বললেন—"ভালই হ'ল, আমার অবসর সময়ে বেতের জিনিষ তৈরী করব।"

এই বলে মা সেদিন থেকে বেতের ঝুড়ি,ব্যাগ প্রভৃতি অবসর সময়ে বুনতে লাগলেন। একটা বেতের মাচাও তৈরী হ'ল কিছু জিনিষপত্র রাখবার জন্য। তা ছাড়া মা বেতের খুব সরু কাজ দিয়ে চমৎকার চটি জুতো তৈরী করতে জানতেন, তিনি সেইরকম কয়েক জোড়া চটি জুতোও তৈরী করলেন। তা ছাড়া মোটা মোটা বেত দিয়ে পশুশালার মধ্যে বেড়া দেওয়া হ'ল। পশুশালার পশুদের কয়েকটি বাচ্চা হয়েছিল। সেই ছোট ছোট বাচ্চা বেড়ার গণ্ডীর মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়াত। পশুশালার দ্বারের কাছে চেয়ারে বসে বাবা তাদের খেলা দেখতেন ও তাদের তত্ত্বাবধান করতেন।

এক এক দিন ফ্রিৎস ও আর্নেস্ট বুনো হাঁস, সারেস প্রভৃতি পাখী শিকার করে আনত। মা তাদের চমৎকার রোষ্ট তৈরী করে দিতেন। মধ্যাহ্ন-ভোজে ও রাত্রি-

দুটো ভাল জলের ঝরণা আবিষ্কৃত হ'ল। একস্থানে টম্যাটোর জঙ্গল দেখা গেল। বাবা বললেন, "এই টম্যাটো থেকে চমৎকার সস্ হবে। কিছু সঙ্গে নাও।"

ফ্রান্সিস্ ব্যাগ ভর্তি করে টম্যাটো তুলে নিলে। তারপর আবার সকলে মিলে চলতে লাগল। মাঝখানে আর একটা ছোট পাহাড় তাদের নজরে পড়ল। সেখানে একটা ছোট গুহায় দুটো ভাল্লুকের বাচ্চা তারা দেখতে পেলে। কুকুর দুটো ভাল্লুকের বাচ্চা দেখে খুব ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। জ্যাক কুকুর দুটোকে না সামলে রাখলে হয়ত তারা ভাল্লুকের বাচ্চার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। বাচ্চা দুটোকে গুহায় রেখে হয়ত তাদের মা কোথাও শিকারে গেছে। বাবা বললেন, "বাচ্চার জন্যে ভাল্লুকী মা হয়ত এখনি ফিরে আসবে। তখন তার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হবে।"

ফ্রান্সিস্ তখন ছুটে গিয়ে বাচ্চা দুটোকে কোলে তুলে নিলে। পশমের বলের মত ছোট্ট বাচ্চা। চোখ মিট্ মিট্ করে এদের দিকে চেয়ে আছে। ভয় বলে কোন কিছু যেন ওদের মনে নেই। তারা বেশ নির্ভয়ে ফ্রান্সিসের কোলে রয়েছে।

একটু পরে হঠাৎ বনের মধ্যে যেন একটা শব্দ হ'ল। সকলের দৃষ্টি সেদিকে যেতেই তারা দেখতে পেলে ভাল্লুকী ছুটে আসছে।

বাবা বললেন, "মায়ের প্রাণ ত বটে, হলেই বা পশু। ফ্রান্সিস্, তুমি বাচ্চা দুটোকে নামিয়ে দিয়ে এখনি সরে এস। দরকার নেই অনর্থক রক্তপাতে।"

ফ্রান্সিস বাচ্চা দুটোকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে তখনি ছুটে সরে এল। সকলে তখন একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপার দেখতে লাগল।

ভল্লুকী ছুটে এল বাচ্চাদের কাছে। তারপর তাদের সর্বাঙ্গ শুঁকে দেখতে লাগল কোথাও কিছু আঘাত লেগেছে কি না, তারপর সকলের দিকে 'রণং দেহি' মূর্তিতে এগিয়ে আসতে লাগল।

বাবা বললেন, "গুলী ছুঁড়ে মারবার দরকার নেই, কুকুরেরাই ওটাকে তাড়াবে।"

সত্যিই হ'ল তাই। ভল্লুকীকে এগিয়ে আসতে দেখে কুকুর দুটো এমন ভীষণ ঘেউ ঘেউ করে ডেকে যেতে লাগল যে ভল্লুকী আর এগিয়ে আসতে পারল না। সে সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে দু' হাতে বুক চাপড়াতে লাগল আর চারদিকে থুথু ছিটিয়ে দিতে লাগল।

বাবা বললেন, "ভাল্লুকদের যুদ্ধের পূর্বে এই ধরনের আস্ফালন হয় বলে বইয়ে পড়েছি। যাক, আমরা সরে পড়ি। অনর্থক একটা লড়াই করে আর কি হবে।"

ভল্লুকী কুকুরের ডেকে-আসা দেখে আর এগিয়ে এল না। ধীরে ধীরে থপ্ থপ্ করতে করতে আবার বাচ্চাদের কাছে ফিরে গেল। তারপর তাদের তুলে নিয়ে তার বাসস্থান সেই গুহার দিকে চলে গেল।

বেলা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছিল। ঝরণার ধারে একটা বড় বাদাম গাছের তলায় বসে সকলে মিলে খাবারের ব্যাগ বার করে তার মধ্য থেকে রুটি, মাখন, চিনি, ডিম সিদ্ধ, কলা প্রভৃতি নিয়ে ভাগ করে খেতে লাগল। ঝরণার জল বেশ সুস্বাদু। তারা পেট ভরে ঐ সব খাবার খেয়ে নিলে।

বাবা বললেন, "অনেকক্ষণ আমরা আমাদের গুহাঘর ছেড়ে এসেছি। তোমাদের মা একলা আছেন। কুকুর দুটোও আমাদের সঙ্গে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। এবার ফেরা যাক্।"

জ্যাক ততক্ষণে পেন্সিল ও কাগজ নিয়ে তাদের গন্তব্যপথের ম্যাপ এঁকে নিয়েছিল ও যে যে জিনিষ দেখেছিল তার একটা ফর্দ করছিল। ইচ্ছামত নূতন নূতন নামও দিচ্ছিল স্থানগুলির। যেমন, 'ভল্লুকী-গুহা', 'ঝর্ণা-আসর' প্রভৃতি।

ওরা সকলে যখন তাদের গুহাঘরে ফিরে এল, তখন সন্ধ্যা হতে কিছু বাকী। মা খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন ওদের দেরি দেখে। এখন সকলকে ফিরে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওদের জন্যে কফি তৈরী করতে বললেন। প্রকাণ্ড মাছটা দেখে মা খুব খুশী হলেন।

খিদেও খুব পেয়েছিল ওদের। মা রেঁধে রেখেছিলেন মাংসের কারি। তার সঙ্গে যোগ হ'ল গরম গরম মাছ ভাজা। ফ্রান্সিস পদ্মফুল দিয়ে বসবার ঘরটি তাড়াতাড়ি সাজিয়ে ফেললে। মা বললেন, "কাল ঐ টম্যাটোর সস্ তৈরী করব।" জ্যাক ও আর্নেষ্ট বেছে বেছে কয়েকটা পাকা টম্যাটো নিয়ে নুন-মরিচ দিয়ে তখনি এক রকম চাট্‌নি করে ফেললে।

খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সকলে। তাই, বারান্দায় বসে গল্পগুজব ও গীটার বাজানো ছাড়া গোশালায় কাজ বা পোলাবাড়ীর কাজ ওরা কেউ করতে চাইল না। সন্ধ্যার আগেই মা গোশালা থেকে এক বালতি গরুর দুধ আনলেন। ঠিক হ'ল, রাত্রে সেই দুধের ক্ষীর খাওয়া হবে রুটির সঙ্গে।

রাত্রিটা কাটল মন্দ নয়। খুব ভোরে উঠে বাবা

নিজেরা সমতলভূমিতে একটু বেড়াতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল সমুদ্রের তীরের কাছে কি যেন একটা কালো রঙের বিরাট জন্তু ছটফট্ করছে।

তিনি তখনি ছুটে এসে সকলকে জাগিয়ে তুলে বন্দুক ও কুকুর নিয়ে সমুদ্রতটে গেলেন। তখন বেশ ফরসা হয়েছে। সকলে দেখলে কোথা থেকে একটা বিরাট তিমি মাছ সেখানে এসে জলে-ডোবা পাহাড়ের সরু খাঁজে দৃঢ়ভাবে আটকে গেছে। সেটা না পারছে এগিয়ে যেতে, না পারছে পিছিয়ে আসতে। ঠিক যেন খাঁচি-কলে ইঁদুর পড়ার মত তার অবস্থা। তার লেজের ঝাপটে চারপাশে জল ছিটকে পড়ছে আর কতকগুলো সামুদ্রিক পাখী তার চারপাশে উড়ে উড়ে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছে। এক একবার তিমির মাথার উপরের ছিদ্র দিয়ে জলের ধারা উৎসের মত উপরে উঠছিল। সকলে আশ্চর্য হয়ে তিমির অবস্থা দেখছিল। কুকুর দুটোও ভয়ানক চীৎকার সুরু করে দিলে।

বাবা বললেন, "তিমিটা যেভাবে পাহাড়ে আটকে গেছে, তাতে ওর পক্ষে উদ্ধার পাওয়া খুবই কঠিন। আমরা ওর কাছে গেলে কি জানি হঠাৎ ওর লেজের ঝাপটায় আমাদের শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। তার চেয়ে অপেক্ষা করে দেখাই যাক্-না কেন, তিমিটার অবস্থা কি হয়।"

সারাদিনের মধ্যে তিমিটা বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেল না। পরদিন সকালে সকলে সেখানে গিয়ে দেখে তিমিটা মরে গেছে। তখন বাবা বললেন, "তিমির মাংস খুব সুস্বাদু। এস্কিমোদের খুব প্রিয় খাদ্য তিমির মাংস। অবশ্য আমরা সেটা কখনও খাবার সুযোগ পাই নি। এখন যেকালে পেয়েছি, তখন খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে যাওয়া যাক্। আর দু'দিন পরে তিমিটা পচে গেলে ওর দেহ থেকে প্রচুর চর্বি পাওয়া যাবে, যাতে আমাদের রাঁধবার তেলের অভাব হবে না।"

ফ্রিস তখন তিমির পেটের কাছ থেকে খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে একটা ব্যাগে পুরে বাড়ীতে নিয়ে এল। বাবা তখন মাকে বললেন, "এই তিমির মাংস দুর্লভ জিনিষ। শোনা যায় তিমির পেটের মাংসই অতি নরম ও উপাদেয়। তুমি এই মাংসের ভাল কিছু একটা রান্না কর।"

মা বললেন, "বেশ, আমি এই মাংসের প্রেভি চপ্ করে দিচ্ছি। রুটির সঙ্গে খেতে ভালই লাগবে।"

রাত্রে আহারের সময়ে প্রেভিভতি সহযোগ প্রেভি চপের সঙ্গে রুটি খেতে খেতে সকলে তিমি-মাংসের অপূর্ব্ব স্বাদের কথা বার বার বলতে লাগল। ফ্রান্সিস ও আর্নেষ্ট ত দু' প্লেট করে তিমি-মাংস খেয়ে ফেললে। মা খেতে খেতে বললে, "এমন সুস্বাদু মাংস সত্যই দুর্লভ।"

বাবা এবার বললেন, "আমরা দক্ষিণদিকে অনেকটা জায়গা ঘুরে দেখে এসেছি। কাল চল আমরা পশ্চিম-দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসি। কাল সকালেই আমরা যাত্রা করব। কুকুর দুটোও সঙ্গে থাকবে।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

•—[•]—•

কুলুর প্রাণ-প্রবাহ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দু'টি দিন কাটল কুলুতে।

বেশ লাগছিল। তবু এক সময়ে মনে হ'ল, একই দৃশ্য-পটের সামনে যেন অনেকক্ষণ রয়েছি—সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের আবেগটুকু ক্রমশঃ মন্থর হয়ে আসছে, ম্লান হচ্ছে পটভূমিকা ; ঈষৎ ক্লান্তি বোধ করছি।

কেন এমনটা হল? এখানে সৌন্দর্য্য-দাক্ষিণ্যে প্রকৃতি ত সর্বক্ষণই উদার। আকাশ কিংবা দিকসীমা কোনটাই কৃপণ নয়। তবে কেন প্রথম দর্শনের চমৎকারিত্ব এত শীঘ্র ফুরিয়ে আসছে? প্রথম দর্শনের চমৎকারিত্ব বুঝি মোহসঞ্জাত। নূতন দেশ, প্রকৃতির শোভা অথবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যত রম্য ও যত লোক—যত কৌতূহলই সঞ্চার করুক—যে পর্য্যন্ত এরা দৃষ্টির আয়নায় ভাসবে—ততক্ষণ সীমার রূঢ় স্পর্শকে পরিহার করতে পারবে না। দৃষ্টির সঙ্গে অন্তরের যোগসাধন না হলে এই ব্যাধির উপশম নাই। এই যোগসাধন হ'ল প্রাণবন্ধন। আদি বীজকণা—কর্ষ-এষণা। তা থেকে অঙ্কুর কাণ্ড শাখাপত্র ফুলফল—সব মিলিয়ে একটি মহীরুহ—একটি প্রাণের প্রকাশ। কত অনুরাগের চিহ্ন এই প্রাণ-প্রবাহের অন্তরালে। রূপ-চেতনা রস-চেতনা আত্মিক-চেতনার কত না ধারা! এই সব চৈতন্যের ধারাপথ দিয়ে এগিয়ে এসে মানুষ এক বিরাট মহিমময় সত্তাকে আবিষ্কার করে পরম অনুরাগে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করে। যে ভূমিতে ঘটে এই অঘটন—সে ভূমি তার কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী। তার সৌন্দর্য্য কোন কালেই ম্লান হয় না, তাকে ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই আর ওঠে না।

এই কুলু উপত্যকায় মাঝে মাঝে তেমন ঘটনা ঘটে থাকে। একদা এক কলা-রসিক বিদেশী এসেছিলেন এখানে। তাঁর দৃষ্টিতে ছিল সৌন্দর্য্য-পিপাসা, মন ছিল শিল্প-সচেতন। কুলুর শৈল-প্রকৃতি মুগ্ধ করল তাঁকে। গিরীমন্দ্র হিমালয়ের অগাধ সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুব দিল। গভীর রসসিন্ধু ছেড়ে সেই মন আর স্রোতে ভেসে যেতে চাইল না—নাগারে রয়ে গেলেন বিখ্যাত রুশ চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক। তাঁর দেহান্ত হ'ল এই সৌন্দর্য্য-সাধনার ক্ষেত্রে। পরিবারটি আজও রয়ে গেছে নাগারে।

মানালির যেমন পরিবারের ইতিহাসও অনুরূপ। এঁদের কোন এক পূর্বপুরুষ সামরিক বিভাগে কাজ করার সময় এদিকে বেড়াতে আসেন। প্রথম দৃষ্টিপাতেই প্রেম—সুন্দরী মানালি তাঁকে আকর্ষণ করল। সেই আকর্ষণের বেগ পরবর্তী পুরুষেও মন্দীভূত হ'ল না, মানালির একাংশে একটি শান্তরসাস্পদ তপোবন রচনা করে ওঁরা রয়ে গেলেন। ওঁদের আপেল বাগান আর অতিথিশালার খ্যাতি আজ বহুদূর ব্যাপ্ত।

এই দৃষ্টান্ত আধুনিক কালে কেন, দ্বাপর যুগ থেকে চলে আসছে। সে কথা যথাস্থানে বলব। এখন কুলুকে ভাল লাগার আরও যে উপকরণগুলি রয়েছে তাদের পরিচয় সংক্ষেপে দিয়ে রাখি।

কুলুতে ঘাঁটি ফেলে দশ-বিশ মাইলের পাহাড়গুলি ঘুরে আসার সুযোগ রয়েছে। যাঁরা এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় দুর্গম দুরারোহ গিরিশিখরে উঠে হিমবাহকে অভ্যর্থনা জানান, কিংবা যাঁরা তাঁবু ঘোড়া পথিপ্রদর্শক নিয়ে নিবিড় অরণ্য ভেদ করে এক একটি মন্দির, অধিত্যকা, ঐতিহাসিক চিহ্নগুলি দেখে বেড়াতে ভালবাসেন অথবা দুর্গম গিরিসঙ্কট যাঁদের প্রতিনিয়ত হাতছানি দিয়ে ডাকে—কুলু উপত্যকা তাঁদের মনোভিলাষ পূরণের সর্তগুলি নিয়েই যেন সৃষ্টি হয়েছে। কত যে দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে এই উপত্যকায় ছড়িয়ে!

কুলুর বিপরীত দিকের শৈল-চূড়ায় বিজ্লী মহাদেবের মন্দির এমনি একটি স্থান। প্রায় চার হাজার ফুট চড়াই ভাঙলে মন্দিরে পৌঁছবে। এক আশ্চর্য্য শিবমন্দির। পাঁথনির মালমশলা ছাড়াই বড় বড় পাথর সাজিয়ে তৈরী হয়েছে এটি। মন্দির-শীর্ষের পতাকা-দণ্ডটির উচ্চতা চল্লিশ হাতের কম নয়। এই সুউচ্চ দণ্ডের মাধ্যমেই প্রতি বছরে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। সে নাকি দেবতার আশীর্বাদ। আমরা যাকে অভিশাপ বলে ভয়ে শিউরে উঠি—ওরা তাতেই পায় দেবতার শুভকামনার ইঙ্গিত। ওই উন্নত দণ্ড ঘনবর্ষার মেঘমণ্ডল থেকে আকর্ষণ করে নেয় বিদ্যুৎপুঞ্জকে—অমনি দেবতার আশীর্বাদ নেমে আসে বজ্রপাতের রূপ ধরে। সেই আঘাতে মন্দিরের ভিতরের লিঙ্গমূর্ত্তি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে

যায়। পুরোহিত সেই টুকরোগুলো সংগ্রহ করে পূর্বের আকারে জুড়ে দিয়ে তার উপরে লাগান ছাতুমাখনের প্রলেপ। প্রতি বছর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে বলে এঁর নাম বিজলী মহাদেব। মহিমাও তাঁর ওই একটি কারণে। এই অভিযানে ঘোড়া ও পথিপ্রদর্শক নিলে ভাল হয়, পরিশ্রম এবং পথ হারানোর দায়িত্বও তাতে লাঘব হয়।

এদেশের মাছকরা মাছ হ'ল ট্রাউট। কেমন করে ডিম ফুটিয়ে এদের বংশবৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়েছে—তা দেখতে হলে আর একটু এগিয়ে আসতে হবে কাত্‌রাইনে। কিন্তু নদী পার হয়ে আরও এক ধাপার দুই চড়াই ভেঙে নাগারে পৌঁছলে প্রকৃতি নূতন একটি ছবি তুলে ধরবে সামনে। সেই ছবি দেখে চিত্রশিল্পী রোয়েরিক এইখানে স্থায়ীভাবে রয়ে গিয়েছিলেন জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত। জায়গাটা কুলুর চেয়ে ঠাণ্ডা—শৈল-সঙ্কুল অরণ্যভূমি-গুলিও রমণীয় বিচরণ ক্ষেত্র। এরই মধ্যে রয়েছে জারি মন্দির, যোগীঋষির আশ্রম ভূমি। কথিত আছে, বনমধ্যস্থ এই জারি মন্দির থেকে পাহাড়ের তলদেশে এক সুড়ঙ্গ-পথ চলে গেছে পার্ব্বতী উপত্যকা পর্য্যন্ত। সেই উপত্যকায় মণিকরণ নামে একটি জনপদ আছে—আর আছে বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণ। কথিত আছে, জারির কোন যোগীপুরুষ প্রতিদিন গিরি অভ্যন্তর ভাগের এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ওই উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে আসতেন। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে সুড়ঙ্গপথটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

কুলু থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে আর একটি অরণ্য-ছায়ানিবিড় গ্রাম হ'ল কাইসধর। এই গ্রামে 'গুজর'রা বাস করে। এরা প্রতিদিন দুধ, মাখন, সব্জি ও ডিম নিয়ে কুলুর বাজারে বেচতে আসে। ওই গ্রামে যেতে হলে মাত্র দু' মাইল পথ চড়াই ভাঙতে হবে—বাকি আট মাইল পথ সুগম অরণ্যভূমির মাঝখান দিয়ে। বৈচিত্র্য হিসাবে এই ভ্রমণ-পর্বও কম লোভনীয় নয়।

আরও একটি অদ্ভুত জনপদ রয়েছে এই অঞ্চলে—দুর্গম দুরারোহ সুউচ্চ গিরি-প্রাচীর-ঘেরা দেশ। সেই জনপদের দেবতা হলেন 'জামলু'। মতান্তরে অশেষ অধ্যাত্ম শক্তিধর এক দানব। জনপদটির নাম মালানা। দেবতা 'জামলু' এর মালিক। এই রাজ্যের যাবতীয় ভূসম্পত্তি সবই দেবতার; যতকিছু নিয়মকানুন দেবতার নামে প্রচলিত; স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্য যত সম্পদ—সবই জমা থাকে দেবভাণ্ডারে। ভারতবর্ষে বহু দেব-মন্দিরে যেমন একটি সছিদ্র লৌহ সিন্দুক বা দানপাত্র থাকে, দেবদর্শনার্থীরা তাঁদের সামর্থ্য মত স্বর্ণ অলঙ্কার মণিমাণিক্য স্বর্ণ-রৌপ্যখণ্ড সেই ছিদ্রপথে প্রণামীস্বরূপ জমা দিয়ে থাকেন—এখানেও অবিকল সেই ব্যবস্থা। তফাতের মধ্যে এই দানপাত্রটা লোহার বা কাঠের সিন্দুক নয়, এবং আকারে আয়তনে একটু অভিনব বস্তু বলে কল্পনাযোগ্য নয়। প্রকাণ্ড একটা ঘরই সেটা—চারিদিকে পাথরের নিশ্ছিদ্র দেওয়াল তুলে একেবারে ছাদশুদ্ধ দিয়ে গাঁথা। ঐ ছাদটিতে এক মাত্র ছিদ্রপথ—যতকিছু প্রণামী ওই ছিদ্রপথ গলিয়ে ঘরের ভিতরে চালান করা হয়। জনসাধারণের কাজে অর্থের প্রয়োজন ঘটলে পুরোহিত ওই ছাদের ফুটো দিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে চলে যান। তাঁর দু' হাতের মুঠোয় যা ধরে—মণিমুক্তো, টাকাকড়ি, সোনা বা রূপোর গহনা আর বাসনপত্র দু' হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে আসেন পুরোহিত। এই দেব-ধনভাণ্ডার না কি সোনা-রূপো, মণিমুক্তা, টাকাকড়িতে পরিপূর্ণ।

এই গ্রামের অধিবাসীরা 'জামলু'র প্রজা—চাষবাসের শস্যাদি দেবতার নামে যৌথখামারে জমা হয়। এই যৌথখামার থেকেই গ্রামবাসীদের ভরণপোষণ চলে। যদি কোন বিদেশী এই গ্রামে গিয়ে পড়েন, দেবতার অতিথি বলেই তিনি গণ্য হন: এবং গ্রামের কর্তারা অর্থাৎ দেবতার প্রতিনিধিস্থানীয়রা দুধ, খাবার ও জ্বালানী কাঠ দিয়ে অতিথি সৎকার করেন। বাইরের জগতের সঙ্গে এই গ্রামের যোগাযোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। বনজ ওষধিপত্র ও বৃক্ষমূল হ'ল এখানকার একমাত্র পণ্যদ্রব্য, যার মারফৎ বাইরে থেকে অর্থাগম হয়ে থাকে। এইটুকু ছাড়া বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সর্বসম্পর্ক রহিত হয়ে বছরের পর বছর ধরে স্বয়ংশাসিত এই জনপদে বাস করছে এরা।

এই দেবতা নিজের রাজ্য ছেড়ে কখনও বাইরে যান না, অন্য দেবতার কাছে নতি স্বীকারও করেন না।

কুলুর প্রধান দেবতা হলেন রঘুনাথজী। এখানকার বাৎসরিক উৎসবে এই উপত্যকার সমস্ত দেবতাই এক সঙ্গে মিলে প্রধান দেবতা রঘুনাথজীকে সম্মান প্রদর্শন করেন। 'জামলু' কিন্তু এই উৎসবে যোগদান করেন না।

বয়সের ভার চেপেছে যাঁদের শরীরে এই সব সঙ্কট-সঙ্কুল পার্বত্যপথ ও অরণ্যভূমি আর এই সমস্ত বিচিত্র কাহিনী তাঁদেরও মনকে টানে বই কি। একটি তাঁবু, একটি ঘোড়া আর একজন পথিপ্রদর্শক নিয়ে তাঁদেরও কেউ কেউ দুঃসাহসিক ভ্রমণ-পিপাসা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। যাঁরা বলেন, মোহবন্ধন ঘরেরই জিনিস—পথ

উদাসী বৈরাগীর বিচরণক্ষেত্র হিসাবে তাঁদের একটু পরখিল রয়েই যায়। পথের একটি মুখ গৃহ-সীমানায়, অন্যপ্রান্ত অরণ্য গিরি তথা নদী সমুদ্রকে স্পর্শ করে আছে। বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তি দু'টি ক্ষেত্রেই সঞ্চিত রয়েছে ভালবাসার মধু। গৃহ যদি গৃহীর মোহবন্ধন রচনা করে—পথও তেমনি উদাসীনকে করে আকর্ষণ। বৈচিত্র্য-প্রয়াসী মনের গতি সর্বদা ত একমুখে থাকে না। এখানে এই দেবভূমি হিমালয় উপত্যকার আকর্ষণ কি কম! এর তুষার চূড়ায় দেওদার অরণ্যে বক্রগামিনী বিপাশার রণরঙ্গকৌতুকে পদযাত্রার প্রতিটি ক্ষণেই ত জীবনপাত্র ভরে উঠছে রস-আনন্দ ধারায়। যে কবিসত্তা মানবমনের গভীরে সুপ্তিমগ্ন, হিমালয়ের কোলে আসা মাত্রই সে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সে-জীবনে তখন নূতন প্রভাতের আবির্ভাব। প্রকৃতি মানুষের হাতে কলম তুলে দিয়ে কবিতা লেখায় কি না জানি না, কিন্তু প্রকৃতির অকৃপণ দানেরই ফল—কবিতা। এই হিমালয়ের কোলে বসে ঋষির আদিকাল হতে কত কবিই ত মানব-কল্যাণ বাণীর মালা গেঁথে গেছেন কবিতায়। কালজয়ী কবি-কৃতি না পেলে সমস্ত মানবগোষ্ঠীর অন্তরের ভাষাকে তাঁরা ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন কোন্ শক্তিতে? মহাভারত-স্রষ্টা সেই মহাকবির কথা পৃথিবীর কোন্ মানুষ না জানে!

দুর্গম পথে বিচরণ করার শক্তি ছিল না—যানবাহনের কল্যাণে যতটুকু এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, ততটুকু এগিয়েছিলাম।

কুলু থেকে মানালির পথটি আরও চমৎকার। পথটি কলোচ্ছ; বনবিস্তৃত শৈলস্তরের পিছনে তুষারধবল হিমবাহিনী বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে, বিপাশা অতিশয় কলোচ্ছলা, এবং বক্রগামিনী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পথের সমরেখায় প্রবাহিতা। ভূমির সঙ্গে, বনের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা বড় বেশী। কোথাও একটি আপেল বাগান, কোথাও বা গমের ক্ষেতকে আপন শাখাবাহু বেষ্টনে বন্দী করে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। আপেল বনে এখন ফুলের শোভা নাই—শাখায় শাখায় অজস্র গুটি ধরেছে, গমের শীষগুলিতে ঘি রঙ মাখানো, গম পেকেছে। এক একটি বাঁক ঘুরে এক একটি নূতন ছবির প্রকাশ। কোথাও উপত্যকা বহুদূরে প্রসারিত, অরণ্য-জটিল প্রান্তর কোথাও বা দুর্ভেদ্য। কোনখানে পাহাড় ঝাঁপিয়ে পড়েছে পথের উপরে—পাহাড় বেয়ে পড়ছে জলধারা, পথ জলপ্লাবিত। ওপারের গিরিগাত্রে শাদা বহুধারায় দাগ, বরফ গলেই নামছে ধারা। এত কাছে বরফ গলার দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম। পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ শীর্ষবিন্দুতে তৃণ-সন্ধানী অজযূথ অবলীলায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে শীর্ষান্তরে, মাঝে মাঝে জনবসতি চিহ্ন। আর চারিদিকের পাহাড়ের ফ্রেমে-আঁটা ছবির সাইজ প্রতিটি বাঁক বদলের সঙ্গে সঙ্গেই নূতন আকার নিচ্ছে। বাসের সুখাসনে বসে, পাহাড় প্রান্তর নদী অরণ্য আকাশ আর হিমবাহকে মিলিয়ে যে সব ছবি তৈরি হচ্ছে তার পাতা উল্টে যাচ্ছি। প্রতিপদে নূতন রেখা, নূতন ভঙ্গি—নবতর বর্ণবিন্যাস। বিরাট একটা চলচ্চিত্রের মিছিল চলেছে আমাদের দু'পাশ দিয়ে।

দশ-বারো মাইল আসার পর গাড়িটা প্রবলবেগে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁক ঘুরল। পথের দু'ধারে ধুলো উড়ল প্রচুর—ছবির দেখা ঝাপসা হ'ল। পীচ-বাঁধানো পাকা সড়ক শেষ হ'ল—এবার কাঁচা পথে ঝাঁকুনি দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বাস ছুটেছে! মস্তবড় একটা ছাগল-ভেড়ার পাল পড়ল সামনে। গাড়ির গতি কমল। রাখালেরা সেগুলিকে জড়ো করল একটা পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল বাস।

তারপর প্রকাণ্ড একটা মাঠের ধারে এসে থামল বাস। একদল তিব্বতী উদ্বাস্তু কাঁধে মাথায় মোট-ঘাট চাপিয়ে ছুটে এল। সামনের ওই মাঠ জুড়ে পড়েছে ওদের তাঁবু। সংখ্যায় ওরা হাজারের কাছাকাছি। এমনি কয়েক হাজারকে দেখেছি মানালিতে—মানালির উপকণ্ঠে। পাইন বনে তাঁবু ফেলে বাস করছে—দলে দলে ঘুরছে পথে। ওরা তিব্বত থেকে পালিয়ে এসেছে দলাই লামার সঙ্গে, আশ্রয় নিয়েছে ভারতবর্ষে। মানালির নির্জন অরণ্য-পরিবেশ ওদের কলরবে আজ মহিমাভ্রষ্ট। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত বুট জুতো, সর্ব অঙ্গে শীতের পোশাক—কাঁধে-কোমরে মোটা কম্বল জড়ানো, মাথায় কোণ-তোলা বিচিত্র টুপি, পিঠে এলানো বেণী, কানে পাথরের দুল, গলায়-হাতে পুঁতির মালা, কাঁধে পিঠে হাতে নানা ধরনের মোটঘাটারি—দুপুরের খররৌদ্রে রাজপথে দলে দলে টহল দিয়ে ফিরছে। এরা বাস্তুত্যাগী, দুঃস্থ, দয়ার পাত্র সন্দেহ নাই—তবু মনে হয়েছে মানালির অম্লান প্রকৃতি-সৌন্দর্যে কালো রঙ ধরেছে।

বাস থামতে দেখে অনেকগুলি উদ্বাস্তু তাদের মালপত্র নিয়ে ছুটে এল। ভেবেছিলাম, বাস যখন কুলু থেকেই ভর্তি হয়ে চলেছে, তখন এদের তুলে নেবে না। যেমন যোগিন্দর নগর থেকে মণ্ডি-কুলুর পথে দেখেছিলাম। ওদিকের বাস সার্ভিসে ওই নিয়ম বলবৎ দেখেছি। এ

বাসটা আর এক কোম্পানীর। কোন মানুষের সঙ্গে এদের অসহযোগ নাই, সর্ব্ব অবস্থাতেই অত্যন্ত উদার। সুতরাং প্রতিটি আসন পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও ওরা বাসে উঠতে পারল। বসবার সুবিধা ত ছিলই না, দাঁড়ানোও মুশকিল, কারণ বাসের ছাদ নীচু। তখন এর-ওর-তার পায়ের তলায় ভিড় জমিয়ে বসল। দুয়োরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইল দু'চার জন। এতক্ষণ যে বিচিত্র ছবিগুলি আমাদের যাত্রাপথে সৌন্দর্য্যের মোহজাল বিছিয়ে দিয়েছিল, তা হঠাৎই মুছে গেল। আমার পাশেই বসল এক প্রৌঢ়া তিব্বতী মেয়ে—কোলের উপর প্রকাণ্ড একটা কাঠের পাত্র আঁকড়ে ধরে। তার কোন দিকেই মনোযোগ ছিল না, সেই কালো মসৃণ পাত্রটিকে লম্বা পোশাকে ঢাকা দিয়ে দু'হাতে চেপে ধরে সাবধানে বসে রইল।

আমার এ পাশে বসেছিল মানালির এক যুবক। সে এতক্ষণ ভাঙা হিন্দীতে দু'পাশের পাহাড়-পর্ব্বতের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিল আমাকে। দূরে তুষার-গলা পাহাড়ের দিকে আঙুল উঁচিয়ে জানাচ্ছিল—এখন ত পাহাড়ের কালো দেখা যাচ্ছে, বরফের চারধারে কাটা দাগ। রোদের তেজ বাড়ছে বলে বরফ গলছে তাড়াতাড়ি। পক্ষকাল আগেও এই পাহাড়গুলো ছিল নীরেট সাদা।

তার কথার মাঝেই বাসটা ভীষণ ঝাঁকানি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। আমরা এ-ওর গায়ে হেলে পড়লাম। প্রৌঢ়া তিব্বতী মেয়ে তার কোলের পাত্রটিকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরল—সেটি যেন পরম নিধি।

পাত্রের উপর মেয়েটির অতিরিক্ত মমতা লক্ষ্য করে মানালির যুবকটি জিজ্ঞাসা করল, ওটায় কি আছে?

প্রৌঢ়া হাসিমুখে বলল, ছাং।

অর্থাৎ এদের পরম বন্ধু, যা নাকি উৎসব ব্যসন থেকে শ্মশান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রগামী সহচর। নিজের হাতে তৈরি এই দেশী মদটি না হলে এরা একদণ্ডও থাকতে পারে না। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও বাস্তুহারা মেয়ে-বন্ধুকে সঙ্গ ছাড়া করে নি, বাসে উঠেও বুক দিয়ে আগলে রেখেছে।

লক্ষ্য করলাম আরও একটি জিনিস—দুর্য্যোগময় মেঘের তলায় দাঁড়িয়েও এরা প্রসন্নমুখ। দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাঁবু, আর ছেঁড়া শীতবস্ত্র, হিমকণাবাহী বায়ুর আক্রমণ থেকে এদের বাঁচাতে পারে না, তবু এদের দৃষ্টিতে ভয় অথবা ক্লেশের চিহ্ন নাই। এরা সর্ব্বস্ব হারিয়েও সর্ব্বশূন্য নয়।

বাস আকণ্ঠ বোঝাই, তবু আরও দু'-একজন যাত্রী হাত তুলতেই দাঁড়িয়ে গেল। ওরাও উঠল—ঠেলেঠুলে বসল ভিড়ের মধ্যে। একটি অতিশয় সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী যুবতী মেয়ে কোথায় আশ্রয় নেবে ইতস্ততঃ করছিল। একটি যুবক তার জোড়া হাঁটুর আসনে চাপড় মেরে রসিকতা করল, ইচ্ছে হ'লে এখানে বসতে পার।

ঘাড় দুলিয়ে হেসে বললে, বসই না।

যুবকের এই ধৃষ্টতায় আমরা ত অবাক। বাসের অপর যাত্রীরাও ইঙ্গিতপূর্ণ হাস্য বিনিময় করল। যুবতীও একটুকাল থমকে কি যেন ভাবল। তার পর শব্দ করে হেসে উঠে ওর হাঁটুর আসনেই বসে পড়ল। এবার চারিদিকে হাসির রোল উঠল—রসাল মন্তব্য শোনা গেল। আমার পাশে-বসা ছাং-বাহিকাও হেসে মাথা নেড়ে যুবতীকে কি যেন রসের কথা বলল। যুবতী মেয়ে ত হেসে কুটিপাটি। তার পর যুবকের সঙ্গে অসঙ্কোচে হাসিকৌতুক চালিয়ে যেতে লাগল। সে-সব কথা আমরা বুঝলাম না। পথের ওধারের খাদে বিপাশা তখন নুড়ি-পাথরের বাধা ঠেলতে ঠেলতে আরও প্রগলভা কলোচ্ছলা হয়ে উঠল। এ পাশে যুবতী মেয়ের হাসির সুরে নদীর সুরটা মিলে যাচ্ছিল আশ্চর্য্য ভাবে। পাথরের বাধা ঠেলে বিপাশার জল স্ফটিক স্বচ্ছ, সমাজ-নিয়মের গণ্ডিমুক্ত মেয়েটির মনও কি তেমনি নির্ম্মল?

কুলু থেকে মানালির দূরত্ব তেইশ মাইল। বাস ছেড়েছিল সাড়ে ন'টায়—মানালিতে পৌঁছল সাড়ে এগারোটায়। এইখানেই বাসের যাত্রা শেষ—পথও শেষ। তার পরে পাহাড় অরণ্য আর নদী মিলে পথকে দুর্ভেদ্য করেছে। অবশ্য পায়ে-চলা সরু পথ হিমালয়ের শিরা-উপশিরার মত সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। হাজার হাজার বছর থেকে বহু পথিকের পদচিহ্নের রেখায় সুচিহ্নিত। এখন পাহাড় কাটিয়ে নতুন নতুন পথ তৈরি হচ্ছে—জীপ চলবে, ট্রাক চলবে। সম্প্রতি মানালি থেকে রোহালা পর্য্যন্ত যে পথটা তৈরি হয়েছে, ওটাতে মাইল সাতেক পর্য্যন্ত বাস চলাচল করছে। তার পর আরও দু' মাইল দুস্তর পথ ভাঙতে পারলে রোহ্‌টাং পাসে পৌঁছানো যায়। অনেকখানি পথ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। সেই যাত্রার স্বাদই নাকি আলাদা। উত্তর-মেরু অভিযানের মত রোমাঞ্চকর, উত্তেজনাপূর্ণ—এ কথাও শুনেছি কারও কারও মুখে। রোহ্‌টাং থেকে আরও খানিক উঠলে পাওয়া যায় ব্যাসকুণ্ড। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, কুমায়ুন অঞ্চল ছাড়াও বেদব্যাস এই অঞ্চলে তাঁর যোগাসন পেতেছিলেন। তাঁরই নামের

স্মৃতি বহন করছে শৃঙ্গ, আর গিরিগাত্রচ্যুত নদী। বিয়াস তা হ'লে ব্যাসদেবের নামেরই অপভ্রংশ!

থাকুক অনুমান—। রূপসী মানালি আসছে এগিয়ে সমস্ত মন এখন দৃষ্টিসীমার বিন্দুবদ্ধ হয়েছে। মানালি পৌঁছে আবার ভাল আশ্রয়স্থান সংগ্রহে মন দিলাম। সেই উদ্দেশ্যে এলাম ট্যুরিষ্ট আপিসে। কুলুর অফিসার বলেছিলেন, অ্যালুমিনিয়াম কুঁড়ে পেয়ে যাবে। এখানকার অফিসার বললেন, অন্ততঃ দু' সপ্তাহ আগে তার আশা নাই। বেননদের অতিথিশালায় স্থানাভাব। ফরেষ্ট আপিসের বাংলোতে বা পি. ডব্লিউ. ডি'র ওখানেও জায়গা নাই। সুতরাং ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট এ তরি।

মানালি জায়গাটা সত্যিই খুব ছোট, হোটেলের চল হয় নি। আমাদের মুখে ছায়া নামল।

সেটা লক্ষ্য করলেন অফিসার। একজন লোককে ডেকে বললেন, পাঞ্জাবীদের বাসাবাড়ীটায় কোন ঘর খালি আছে কি না দেখ ত। আর না থাকে ফিরে এসে এঁদের জন্যে তাঁবুর ব্যবস্থা করে দেবে।

আমার পানে ফিরে বললেন, যান—সঙ্গে যান ওর। ঘর পেয়ে যান, ভাল। না হ'লে তাঁবুর ব্যবস্থা করে দেব। শীতের দেশে বাইরে পড়ে থাকতে ত পারবেন না, ব্যবস্থা একটা যা হোক করে দিতেই হবে।

আশ্বস্ত হলাম। যেমন করে হোক এখানে রাত্রিবাস করতে পারব।

পাঞ্জাবীদের ভাড়াবাড়ীতেই ঘর পেয়ে গেলাম। সবে তৈরি হয়েছে কাঠের বাড়ী, বিদ্যুৎ আলোর সাজসজ্জা সম্পূর্ণ, শুধু আলোর সংযোগ এখনও ঘটে নি। জলের কলও নেই। শহরেই নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে যে ঝরণা নামছে—সেই যোগায় পানের জল। কেনাছড়ার জল বিয়াসের নালা থেকে নিতে হবে। প্রত্যেক ঘরের সংলগ্ন শৌচাগার, স্নানঘর। স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি ফ্ল্যাট যেন! ব্যবস্থা ভালই। তবে—

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বললেন, আলোর ব্যবস্থা আমরা করে দেব। লণ্ঠন কিংবা হ্যাজাক্ যা খুশি নেবেন। আর ভারি দিয়ে জল আনিয়ে দেব। দুটো বালতি দেব জল রাখবার জন্য।

এই দোতলা বাড়ীটার সামনেই ভদ্রলোকের একখানা দোকান আছে। ব্যবসাদার মানুষ—এদিকে যাত্রীর আসাযাওয়া বাড়ছে দেখে বাড়ীখানা তৈরি করিয়েছেন। এক একখানা কামরার ভাড়া দৈনিক পাঁচ-সাত-দশ টাকা। নীচে উপর মিলিয়ে আটখানা ঘর। তিনতলাতেও ছাদের চূড়ার নীচেটা ঘিরে আশ্রয়স্থান হয়েছে। সেখানেও একসঙ্গে বিশ-ত্রিশ জন থাকতে পারে। তবে শুয়ে বসে থাকলেই সেটা সম্ভব। মাথা খাড়া করে চলবার উপায় নাই—এতটাই নীচু তার ছাদ। কাঠ এদিকে প্রচুরই মেলে, দামেও সস্তা, ঘর-তৈরির মজুরিও কম। যে কোন ব্যবসাদারের পক্ষে এই সুবিধা না নেওয়াই ভুল।

এই বাড়ীর গা ঘেঁষে রয়েছে একটা পাঞ্জাবী হোটেল। ভাত রুটি মাংস পেঁয়াজের তরকারি আর ছানার ডালনা ওরা নাকি ভালই রাঁধে। আমাদের ওসব চলবে না। সঙ্গে ষ্টোভ আছে, রান্নার কাজটা কোনরকমে চলে যাচ্ছে।

ওই হোটেল ছাড়া চায়ের দোকান আর রেষ্টুরেণ্ট আছে—আছে ছোটমত একটি হালুই-এর দোকান, সেখানে টুকিটাকি ভাজাভুজি জিলাপি দুধ আর দই পাওয়া যায়।

এখানে ভালমত পথ একটাই—বেননদের আপেল বাগানের ধার দিয়ে ফরেষ্ট আপিস আর পি.ডব্লিউ.ডি'র বাংলো ডাইনে রেখে কার্লিং ছুঁই দিয়ে ঢালুতে নেমেছে। তার থেকে অনেকগুলি সরু কেঁকড়া বার হয়েছে। সেগুলো কাঁচা পথ, আঁকাবাঁকা, উঁচু-নীচু, শিরা-উপশিরার মত পাহাড়ের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বৈকালে বেড়াতে বেড়াতে সেই পথের শেষ প্রান্তে এসেছিলাম—উদ্দেশ্য হিড়িম্বা-মন্দির দর্শন। কিন্তু পথে জনমানবের দেখা নাই। মন্দিরটা কোন্ দিকে কে তার হদিশ দেবে! অবশেষে বোঝা মাথায় একজন পাহাড়ীকে উপর থেকে নামতে দেখে শুধোলাম মন্দিরের কথা।

মন্দির? লোকটা হাসল একটু। পিছন ফিরে অদূরে দেওদার বনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, ওই যে, থোড়া দূর।

উঁচুমত একটা পাহাড়ের গায়ে বন ত দেখলাম—ওই বনের মধ্যে মন্দিরটা আত্মগোপন করে আছে এও বুঝছি। মন্দিরটা এমন কিছু বড় নয় যে, চুড়োটা বনের মাথা ছাড়িয়ে দৃশ্যমান হবে, কিন্তু এই বনময় পাহাড়ের দিকে দু' তিনটি পথ গেছে—কোন্টি ধরলে যথাস্থানে পৌঁছতে পারব! পাহাড়ের রাস্তাগুলোই যে গোলকধাঁধার মত। যেটা ধরে লক্ষ্যে পৌঁছবার আশা করা যায়, সেটা লক্ষ্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়। উপরের পথ খানিক দূর এসে নেমে যায়—এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে এনে ফেলে।

খানিকটা এমনি ঘোরাফেরা হ'ল বই কি। ভাগ্যক্রমে একজন বাঙালী ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে গেলাম।

জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন, মন্দিরটা কাল দেখেছি বটে—ওই রকমই একটা বনের মধ্যে। কিন্তু আমরা ত এইদিক দিয়ে যাই নি। বেননদের গেষ্ট-হাউস থেকে একটুখানি এগিয়ে মাঝামাঝি একটা পথ ধরেছিলাম মনে হচ্ছে।

বললাম, ঠিক জানেন—ওই বনের মধ্যেই মন্দির আছে?

উনি বললেন, মনে ত হচ্ছে ওই বনটাই। কিন্তু এদিক দিয়ে যাবার ঠিক পথটা ত আপনাকে বলতে পারব না—আমরা উঠেছিলাম অন্যদিকের পথ দিয়ে। পাহাড়ের পথগুলো ভারি গোলমেলে। এই যে সামনের পথটা দেখছেন ওপরে উঠেছে, একটু এগিয়েই হয়ত দেখবেন আর একটা দিকে নেমে গেছে। তার চেয়ে এক কাজ করুন, ওই বনের নীচের পাহাড়ের ধার দিয়ে সোজা চলে যান। পাহাড়ের মাথাটা যেখানে বনসমেত শেষ হয়েছে, সেই মুখে যে পথটা উপরে উঠেছে—সেইখান থেকে উঠে যাবেন। ওই ধারেই বেননদের আপেল বাগানটা দেখতে পাবেন।

মন্দিরটা কি খুব বড়?

না—না। বনের মাঝখানে এমন ভাবে লুকিয়ে আছে—কাছে না গেলে চিনতেই পারবেন না মন্দির বলে।

ওঁর নির্দেশিত পথে অনেকখানি নেমে এসে বনের পাদদেশে পৌঁছলাম আমরা।

আলোচনা

"বাংলা ভাষায় অ্যাটম চিন্তা"

—পরিমল গোস্বামী

আশ্বিনের প্রবাসীতে এ-কে-ডি লিখিত, আমার আনন্দবাজারে প্রকাশিত "বাংলা ভাষায় অ্যাটম চিন্তা" বিষয়ে আলোচনা পড়লাম। এ-কে-ডির লেখা আমি যত্নের সঙ্গে পড়ি এবং তাঁর লেখা আমার ভাল লাগে। তাই আমার সম্পর্কে তাঁর প্রশংসা ও আমার বক্তব্যের সমর্থন আমাকে খুশি করেছে। তবে চ একটি কথা আমার মূল লেখায় যা দুর্বোধ্য বোধ হয়েছে তার যথাসম্ভব কৈফিয়ৎ দিচ্ছি।

হাইড্রোজেন অক্সাইড জলের একটি অণু। ব্যাপক অর্থে অন্য অণুও বোঝাতে পারে, কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। আমি বলতে চেয়েছিলাম অণুর একটি উপাদানকে যার অণু তার নামে চালানো হয় না। অর্থাৎ হাইড্রোজেন থেকে বোমা তৈরী হলে তাকে জলীয় বোমা বলা চলে না। সাধারণ পাঠককে এইটে বোঝাতে চেয়েছিলাম। এ-কে-ডি লিখেছেন অ্যাটমকে যাঁরা অণু বলেন তিনিও এভাবে চিন্তা করেন না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, তিনি কোন চিন্তাই করেন না। আণবিক শক্তিতে বোমা হয় না—আমার আরও খুলে লেখা উচিত ছিল "তোমরা যাকে আণবিক বোমা বল তা হয় না।"—পটকা থেকে টি-এন-টি বোমা সবই ত আণবিক ব্যাপার। কিন্তু তাকে ত আণবিক বোমা (বা মোলিকিউলার বম্) বলা হয় না।

আমার মূল অভিযোগ পরমাণুকে অণু বলার বিরুদ্ধে। সেইটে মনে রেখে পড়তে হবে ঐ লেখাটি। তবু অস্পষ্টতার সামান্য অভিযোগ থাকলেও সেজন্য আমি দুঃখিত।

ঝরে-পড়া-বকুলের গন্ধে

শ্রীস্বাতী ঘোষ

মমতাজের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল ক্রীক্-রোডে, আমার বন্ধু পার্থপ্রতিমের বাড়ীতে। পার্থ ছিল আর্টিষ্ট। ওর ব্যবহার, ওর কথা বলা, এমন কি ওর চেহারাটাও ছিল পুরোপুরি আর্টিষ্টিক। ওর ওই উদাসকরা চেহারাটা নিয়ে ওর বান্ধবীমহলে আলোচনার অন্ত ছিল না। মমতাজ ওর সেই বান্ধবীমণ্ডলেরই অন্যতম একজন। ওরা দু'জনে বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রী হলেও দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। আর সে বন্ধুত্ব শেষপর্যন্ত পরিণত হয়েছিল পরিণয়বন্ধনেই।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় প্রথম দিনটার কথা। সেদিন পার্থ নিয়ে গিয়েছিল আমাকে ওর বাড়ীতে ওর স্টুডিওটা দেখাতে। পার্থ জানত আমি ওর আর্টের খুব ভক্ত। ওর 'ফাল্গুনচাঁদ'গুলোর প্রতি ছিল আমার অসীম শ্রদ্ধা। বিশেষতঃ ওর সেই 'মাদার্ ইন্ মিজারি' মূর্তিটা আমার কাছে যে কি রহস্যময় সৌন্দর্য নিয়ে এসেছিল, সে ও খুব ভালভাবেই জানত। তাই প্রায়ই ও টেনে নিয়ে যেত আমাকে ওর বাড়ীতে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা ক'রে বলতাম, তুমি যে আমাকে এ ভাবে তোমার বাড়ীতে নিয়ে যাও, লোকে দেখলে কি বলবে বল ত?

ও হাসত, জবাব দিত, লোকে কি বলে আমি তা নিয়ে কোনোদিনই মাথা ঘামাই না ঊর্মি। অতএব—

বাধা দিয়ে কৌতুক করতাম, বলতাম, কিন্তু আমারও ত ভয় করতে পারে। তোমার মত এমন আর্টিষ্টিক চেহারা আর আর্টিষ্টিক মনের একটি মানুষের বাড়ী যাওয়া ত আমার পক্ষেও বিপজ্জনক হ'তে পারে! কে জানে যদি কিছু দিয়ে ফেলি তোমায়—হয়ত আমার কৌতুকের মধ্যেও ফুটে উঠত আরো গভীর কোনো না-বলা সুর।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে স্তব্ধ হয়ে থেকে আশ্চর্য গভীর কণ্ঠে পার্থ জবাব দিত, ঊর্মি, তোমার-আমার বন্ধুত্বে কোনো গ্লানি নেই জেনো। শুধু লোকের ভয়ে ঘাবড়ে আমি কখনো তোমাকে দেখি না। কৌতুক-উজ্জ্বল-কণ্ঠে শুধু হেসে উঠতাম। এমনি ক'রেই ও আমাকে জোর ক'রে ওর বাড়ীতে নিয়ে যেত। সেদিনও ঠিক এমনি ভাবেই নিয়ে গিয়েছিল আমায় ওর নতুন তৈরী 'স্টুডিও' দেখাতে। আর সেদিনই সেখানে বিলীয়মান সূর্যের রক্তিম আভায় যে মমতাকে দেখলাম, সেই মেয়েটিই পার্থের শিল্পের প্রেরণা, মমতাজ। ওর স্টুডিওতে বসেছিলাম একা। দেখছিলাম ওর ভাস্কর্য-গুলির অপূর্ব শৈলী, নিখুঁত সজীবতা। ওর 'মাদার্ ইন্ মিজারি'র অনবদ্য মহিমা যেন দীপ্ত হয়ে আছে। আসন্ন রক্তের পূর্বাভাস চারিদিকে, তারই মাঝে যে জননী মহিমাদীপ্ত দুই চোখে নিশ্চিন্ততার পরম আশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে সন্তানের অসহায় ও ভয়কাতর মুখের দিকে, সে জননী বুঝি জগতের সেরা জননী। যার তুলনা মেলে না। তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলাম মূর্তিটার দিকে। চমক ভাঙল একটি সুমধুর কণ্ঠস্বরে, 'বসিয়ে রেখে চলে গেছে ত পার্থ! দেখুন ত কি কাণ্ড!!' পার্থর 'মাদার ইন্ মিজারি'র ওই অপরূপ, ওই মহিমা-দীপ্তা কি জীবন্ত হয়ে আমার সামনে দাঁড়াল। 'ক অপূর্ব ওই চোখ! কে এই অপরূপা!!

আমাকে এমন অবাকবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওই অনবদ্যমুখশ্রীতে খেলে গেল কৌতুকের এক ঝলক আলো! চোখের দৃষ্টিতে ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বলল অপরূপা, আমার নাম মমতাজ। শাজাহানের বিবি মমতাজ ব'লে সন্দেহ জাগছে না কি, ভাই?

ওর আত্মসচেতনতা যেন ওর কথার মধ্যে মধুময় হয়ে উঠল। এবারে সহজবোধ ফিরে পেয়ে বললাম, শা-জাহানের মমতাজও বোধ হয় আপনার মত এত সুন্দরী ছিলেন না!

খিলখিলিয়ে হেসে মেয়েটি আমার পাশে ব'সে পড়ল। দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলল, না ভাই, আমি কিন্তু ওসব 'আপনি'র বন্ধন মানতে পারব না। আমাকে 'তুমি' বলতে হবে।

অবাক হয়ে আবার তাকালাম, মেয়েটির চেহারার চেয়েও কি সুন্দর ওর স্বভাব! বললাম, বেশ, তাই হবে! কিন্তু তুমি কি পার্থর—

বাধা দিয়ে মমতাজ ব'লে উঠল, স্বপ্নরাজ্যের রাণী! ও কুইন্ অফ্ মাই হার্ট!

অপার মুগ্ধতা নিয়ে বললাম, শিল্পী পার্থর জীবনের শিল্পও এমন সার্থকসুন্দর জানতাম না। হি ইজ্ রিয়্যালি এ জিনিয়স্!

পার্থ এলে প্রচুর অনুযোগ করলাম। বললাম, বেশ ছেলে ত তুমি পার্থ! তোমার এমন অমূল্য আবিষ্কার-টিকে তুমি লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দিয়েছ, চুরি হ'য়ে যাবার ভয়ে নাকি?

গভীর আত্মপ্রসাদ ও পরিপূর্ণ প্রশান্তির হাসি নিয়ে পার্থ বলল, আমার আবিষ্কার, আমারই, চুরিই বা হবে কেন শুনি?

মমতাজের উচ্ছলিত হাসি ওর কথাটার সত্যকে যেন দৃঢ় ক'রে তুলল।

এইভাবে ওদের দু'জনের ছোট সংসারটিতে আমি হয়ে উঠলাম নিয়মিত অতিথি। প্রতি সন্ধ্যায় ওদের ক্রোভ্-রোমের ছিমছাম্ সুন্দর বাড়ীর ড্রইংরুমে বেজে উঠত পার্থর পিয়ানো, অথবা শোনা যেত মমতাজের মধুর কণ্ঠ। আমি ছিলাম তার প্রাত্যহিক শ্রোতা। মমতাজ আর পার্থর নিবিড় ভালবাসা আমাকে ওদের সংসারের অনেক কাছে এনে দিল।

কিন্তু ভুল মানুষ করে। আমিও বোধ হয় সেই ভুলই করেছিলাম। ভুল করেছিলাম নীলাদ্রিকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে। নীলাদ্রি ছিল আমার পরিবারের এক বিশিষ্ট বন্ধু। অনেকদিনের আলাপ ওর সঙ্গে আমার। তাই আমাদের মধ্যেও গ'ড়ে উঠেছিল একটি নিবিড় বন্ধুত্ব! সেই সূত্রেই ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম মমতাজ-পার্থর সান্ধ্য-আসরে। আলাপ করিয়ে দিলাম মমতাজের সঙ্গে। মমতাজ তার উচ্ছলিত মাধুর্যে মুহূর্তে আপন ক'রে নিল নীলাদ্রিকে।

তারপর কত মধুর সন্ধ্যা কেটেছে নীলাদ্রির মমতাজের সান্নিধ্যে। মমতাজ আমাকেও যেমন আপন ক'রে নিয়েছিল, নীলাদ্রিকেও তেমনিভাবেই কাছে টেনে নিয়েছিল ওর সহজাত ভালবাসা দিয়ে। পার্থের প্রতি ওর অসীম ভালবাসার চিহ্ন ছিল ওর আর পার্থর ছোট্ট সংসারটির সর্বত্র। কিন্তু নীলাদ্রি দিল সেই চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন ক'রে। মমতাজের ব্যবহারে ছিল একটা উচ্ছলতা। যাতে আপাতদৃষ্টিতে তাকে প্রগল্‌ভা ক'রে তুলত। আর ক'রে তুলত মোহময়ী। পুরুষ নীলাদ্রি ভুল করেছিল তাতেই। পার্থর অপরিসীম বিশ্বাসের কোন মর্যাদাই সে দিতে পারল না। তাই একদিন সব-কিছুর ওলটপালট দেখতে হ'ল আমাকে আমার নিজের চোখেই।

নীলাদ্রি আর আমার বন্ধুত্বের কথা পার্থ ও মমতাজের অজানা ছিল না। তাই সাদরে ও সাগ্রহে ওরা ডেকে নিয়েছিল ওকে ওদের সান্ধ্যমজলিশে। প্রায় প্রতিদিনই কাটত আমাদের কথার খেলায়, গল্পে আর নানা আলোচনায়। কোনো কোনোদিন কাটত মমতাজের সুরেলাকণ্ঠে ডুবে গিয়ে। এমনি একটি দিনে নীলাদ্রির চোখে দেখলাম সর্বনাশের ছায়া। মমতাজের প্রগল্‌ভ মাধুর্য দিচ্ছে তার সস্নেহ প্রশ্রয়। অনুভব করলাম, বিপদ আসন্ন! কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না ওদের। দিনের পর দিন গেছে, এক পা এক পা ক'রে এগিয়েছে নীলাদ্রির মন। ফেরাতে পারি নি ওকে। তবু থেকে থেকে অজানা ভয়ে কেঁপে উঠেছি। পার্থ!! কি হবে ওর? ওর শিল্পীমন যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে!! মমতাজ যে ওর সকল সৃষ্টির প্রেরণা!!!

তাই একদিন সব সঙ্কোচ, সমস্ত দ্বিধা বিসর্জন দিয়ে দাঁড়ালাম নীলাদ্রির মুখোমুখি। বললাম, এ তুমি কোথায় নামছ নীলাদ্রি। ফেরাও তোমার মন!! ভ্রূকুটির কুঞ্চনে বিরক্তি ফুটিয়ে বলল নীলাদ্রি, কিসের নামা? সুন্দরের পূজা করাকে তুমি নামা বল? হেসেছিলাম সেদিন। বলেছিলাম, সুন্দরের পূজা!! নিজের মনকে প্রশ্ন করেছ তুমি? জানো তুমি, তোমার মন ঠিক কি চায়?

উদ্ধত স্বরে ও বলেছিল, জানি বৈ কি! আমার মনকে আমার চেয়ে বেশি কি তুমি জানো?

তর্কে কোনো ফল নেই বুঝেছিলাম। দুঃখ পেয়েছিলাম শুধু আসন্ন সর্বনাশটাকে এড়াতে পারলাম না ব'লে! মর্মাহত হয়েছিলাম, শুধু একটি নবীন সংসারের অপমৃত্যু দেখব ব'লে!!

কিন্তু তখনও জানতাম না আরো কত বিস্ময় অপেক্ষা ক'রে আছে আমার জন্য। নীলাদ্রি আমার কাছ থেকে ক্রমশঃ স'রে গেছে অনেকদূরে। আমিও আর কোনো-দিন ফেরাতে চাই নি ওকে। পার্থর বাড়ীতে গেছি মমতাজ আর পার্থর অতিথি হয়ে, নীলাদ্রি থেকে গেছে আমার অপরিচিতের ভূমিকায়। প্রথম প্রথম সামান্য সৌজন্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সে পরিচয়। ক্রমশঃ সেটুকুরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, পার্থ বা মমতাজ কোনোদিনই এ নিয়ে কোনো অনুযোগ করে নি। মমতাজকে দেখেছি পার্থর অনুপস্থিতিতেই হয়ে উঠেছে প্রগল্‌ভা, উচ্ছলা। কিন্তু পরে দেখেছি পার্থর

উপস্থিতিও হয়ে গেছে ওর কাছে নিতান্ত গৌণ। আরো পরে দেখেছি শিল্পী পার্থ হয়ে গেছে আরো উদাস, আরো অন্যমনস্ক, কী একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ভারে আরো অবসন্ন। নিজের ষ্টুডিওতেই কেটেছে তার অবসরের অধিকাংশ মুহূর্ত। তার বেদনার সাক্ষী হয়েছে ষ্টুডিওর ওই প্রাণহীন মূর্তিগুলো। আর বুঝি আমিও ছিলাম তার গোপন বেদনার নীরব সাক্ষী।

অন্যদিকে বেজে উঠতে শুনেছি নীলাদ্রির পিয়ানোর চটুল ছন্দ আর তার সঙ্গে মমতাজের কণ্ঠের উচ্ছল গান। ঐ আসরেরও নীরব দ্রষ্টা হয়ে ফিরে এসেছি আমি। তারপর ধীরে ধীরে মুছে গিয়েছি ওদের সান্ধ্য-আসর থেকে।

তারপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। অতীতের স্মৃতি বেদনাদায়ক ব'লেই ভোলার চেষ্টা করেছি। জানতে চেষ্টা করি নি নীলাদ্রি-মমতাজের জীবনের শেষ পরিণতি কি হয়েছে। জানতে চেষ্টা করি নি, তবু জেনেছিলাম মমতাজ পার্থর ডিভোর্স বিল পাশ হয়ে গেছে। আরো জেনেছিলাম, নীলাদ্রির সঙ্গেই সংসার পেতেছে মমতাজ। পার্থকে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পাই নি ওকে। বিশাল পৃথিবীর জনারণ্যে কোথায় ও হারিয়ে গেছে কে জানে!

কিন্তু আবার বিস্ময় এল আমার জীবনে। অতর্কিতে দেখা হ'ল পার্থর সঙ্গে পথে। প্রথমটায় চিনতে পারি নি ওকে। গত দশ বছরের দীর্ঘ-সময়ের ছাপ পড়েছে ওর দেহে। একটু ভারিক্কি, একটু গাম্ভীর্যের ছাপ। তার সঙ্গে একটা প্রশান্তি।

আমাকে দেখেই চিনেছিল ও। বলেছিল, কয়েক-দিন ধ'রে তোমার মনে হচ্ছিল ঊর্মি। কি খবর তোমার? নিজের খবর জানালাম। জানতে চাইলাম ওর খবরও। ও নিয়ে গেল আমাকে ওর কর্মস্থলে। একটি ছোট আশ্রম। অনেকগুলি কচিমুখের সমাবেশ সেখানে। পার্থ ওদের আঁকা শেখায়, পড়ায়ও। সেই সঙ্গে দেখাল পার্থ, ওর নিজের ছোট্ট ঘরখানি, যেখানে ওর শিল্পসত্তার স্বাক্ষর। ওর সৃষ্টির অধিকাংশই শিশু-মুখের প্রতিকৃতি। নানা বয়সের নানা কচিমুখের হাসি-কান্নার মেলা। কয়েকটি শিশু এসে পার্থকে নানাভাবে উত্যক্ত ক'রে তুলল। প্রশান্ত হাসির মাধুর্যে পার্থ তাদের সমস্ত আবদার নির্বিবাদে সহ্য ক'রে গেল। অবাক হয়ে দেখলাম পার্থর পরিবর্তন। না-পাওয়ার বেদনা কোথাও নেই। যা পেয়েছে তাই বুঝি সে অঞ্জলি ভ'রে নিয়েছে। যা পায় নি তার জন্যে বুঝি ওর এতটুকু হাহাকার নেই।

বললাম, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এদের নিয়েই তোমার জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে পার্থ!

হাসিভরা মুখে তাকাল পার্থ ওদের দিকে। দু'একটিকে কাছে টেনে নিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে বলল, ঠিক বলেছ তুমি ঊর্মি। এরাই আমার জীবনকে সার্থক ক'রে দিয়েছে। আজ আমার কোনো দুঃখ নেই; কোনো বেদনা নেই। আমার বুক ভরেরে সমস্ত শ্রদ্ধা-টুকু ওকে সেদিন দিয়ে এলাম। 'আবার আসব' এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পথে নামলাম আবার।

ভাদ্রের প্রচণ্ড রোদ্দুর মাথার ওপর। পিচগলা রাস্তা বেয়ে চলেছি, অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা পেলাম একই দিনে আর একটি চেনামুখের। কানায় কানায় পূর্ণ ছিল আমার মন, তবু মুহূর্তে কি একটা অজানা অনুভূতিতে ভ'রে উঠল। নীলাদ্রিকে দেখে কেমন যেন একটা বিদ্বেষ জাগল মনে। দারিদ্র্যক্লান্ত, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত নীলাদ্রি চেহারাতেই যেন ফুটে উঠেছে পরাজয়ের গ্লানি, অনুশোচনার দাহ। পার্থর মতই এগিয়ে এসে বলল নীলাদ্রি, চিনতেই পারছ না মনে হচ্ছে। খবর কি তোমার বল।

সহজভাবেই নিজের খবর দিলাম। বললাম, এবার তোমার খবর বল।

ও বলল, মমতাজকে মনে আছে তোমার?

বললাম হেসে, আছে বৈ কি। ওকে কি ভোলা যায়? একটা মস্তবড় নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে ও বলল, এখন কিন্তু আর ওকে চিনতে পারবে না। দোষ আমারই ঊর্মি। আমি পারলাম না ওকে সুখী করতে।

বিস্মিতমুখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, ও তোমার কাছেই আছে ত?

মুখ নীচু ক'রে নীলাদ্রি বলল, তা ছাড়া আর যাবে কোথায়? জানতে ইচ্ছে করছিল নীলাদ্রিকে দিয়ে মমতাজের জীবন কতটা সার্থক হয়েছে, কতটা পূর্ণ হয়েছে। বললাম তাই, আমাকে নিয়ে যাবে না তোমার সংসার দেখাতে?

ম্লান, বিষণ্ণ হাসি হেসে নীলাদ্রি বলল, সংসার! বেশ, চল, আমার সংসার দেখবেই চল। নিয়ে এল নীলাদ্রি আমাকে ওর বাড়ীতে। ছোট্ট একতলা বাড়ীর দেড়খানা ঘরে ওদের সংসার। পাঁচঘর ভাড়াটের সঙ্গে বাস। বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না, নীলাদ্রির মত লোক বাস করতে পারে মমতাজের মত মেয়েকে নিয়ে এইরকম একটি জঘন্য পরিবেশে। দেখা হ'ল

মমতাজের সঙ্গে। অবাক বিস্ময়ে ভাবলাম, এই কি সেই মমতাজ? কোথায় সেই স্বাস্থ্য? কোথায় সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য? জরাজীর্ণ বস্ত্র পরিধানে কঙ্কালসার কে ঐ রমণী? কয়েকটি শীর্ণকায় শিশু খেলা করছিল আশে-পাশে। নীলাদ্রি ডাকল তাদের। আমাকে বলল, এরা আমাদের সন্তান। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল আমার, পার্থর গড়া সেই মূর্তিটির কথা। সেই, 'মাদার্ ইন্ মিরাজ' মূর্তিটার কথা। যে মমতাজকে কল্পনা ক'রে পার্থর সেই অনবদ্য শিল্পে অপরূপা রমণীর সৃষ্টি, সে মমতাজকে কি আজকের এই মমতাজের মধ্যে কিছু-মাত্র পাওয়া যায়! অভাব আর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম-ক্লান্ত, কতকগুলি অসুস্থ, অনাহারী সন্তানের জন্মদাত্রী, এই কি পার্থর সেই মমতাজ? নিদারুণ বেদনায় তাতে মূক হয়ে গিয়েছিল আমার মুখের ভাষা। ওরই মাঝে মমতাজ ও নীলাদ্রি যথাসাধ্য আপ্যায়নের চেষ্টা করল। কিন্তু আমার চোখে লুকোনো রইল না ওদের জীবনের অশান্তি। চেষ্টাকৃত সহজতা সহজেই ধরা পড়ল আমার চোখে। বিদায় নেওয়ার আগে মমতাজকে বললাম, জান, আজই দেখা পেলাম পার্থর।

আশ্চর্য ব্যাকুল ব্যগ্রতা ফুটে উঠল ওর চোখে। বলল, কেমন আছে ও? আমার কথা কি একেবারেই ভুলে গেছে?

মনে পড়ল, মমতাজের কথা পার্থ একটিবারও তোলে নি। কিন্তু মমতাজের এ কি ব্যগ্রতা। যাকে দুঃখ দিয়ে একদিন চলে এসেছিল সে তারই স্মৃতির আসরেও আসন পাততে চাইছে! জানতে চাইছে ওকে পার্থর মনে আছে কিনা! ইচ্ছে করল বলি, তোমাকে ভুলেই ও সুখে আছে মমতাজ। ও ওর জীবনের পরিপূর্ণতা পেয়েছে!

কিন্তু কেন জানি না, মমতাজের ব্যগ্রব্যাকুল চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারলাম না কিছুই। শুধু বললাম, তোমাকে ভোলা কি ওর পক্ষে সম্ভব মমতাজ?

মমতাজের ক্লান্ত, শুষ্ক দৃষ্টিতে জ্বলে উঠল অনাস্বাদিত আনন্দের আলো। তারপর নেমে এল বন্যার বেগে অশ্রুধারা, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ও বলল, আমার হাত দু'খানি ধ'রে, ওকে আঘাত দেওয়ার শাস্তি আজ আমি চরম ক'রে পাচ্ছি ঊর্মি। ওর সঙ্গে দেখা হ'লে বোলো ওর মমতাজ ওরই আছে, আর ওরই থাকবে চিরকাল। মূক-বেদনায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুখ তুলে দেখলাম ও চলে গেছে। ধীরে ধীরে পথে নামলাম। মনে মনে বিশ্লেষণ করতে চাইলাম, এ মিথ্যার আশ্রয় আমি কেন নিলাম আর কেনই বা মমতাজ এই প্রতিশ্রুতি দিল? পার্থর কাছে এ প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্যই ত আজ নেই জানি। কিন্তু আমার মিথ্যা যে মর্মীয় হয়ে উঠল। একটি ভেঙে-পড়া মন, ঝরে-পড়া জীবন আবার ফিরে পাবে তার নতুন উদ্যম, এই মিথ্যাকেই কেন্দ্র করে, যেটুকু হয়ে থাকবে ওর বাকি জীবনের সঞ্চয়, পাথেয়। মনটা অপূর্ব প্রসন্নতায় ভ'রে উঠল আমার।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব সমিতি, আসানসোল

সভাপতি
বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য
ব্রজকান্ত গুহ
কার্য্যকরী সভাপতি
ডঃ অঞ্জলি রায়
অধ্যক্ষা আসানসোল উইমেন্স্ কলেজ

কার্য্যালয়
লিপি পত্রিকা অফিস
রাহা লেন,
আসানসোল
ফোন ৩৪১৭

সাধারণ সম্পাদক
শ্রীঅনাদি নাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকালীপদ সিংহ
শ্রীসত্য কর্মকার

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

নিয়মাবলী

(১) রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ—৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৫

রচনা পাঠাইবার ঠিকানা:—

(ক) শ্রীসত্যকালী মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, বি, বি, কলেজ, আসানসোল, পোঃ—আসানসোল, জেলা—বর্দ্ধমান।
অথবা, (খ) শ্রীকালীপদ সিংহ, ৮নং থার্ড এভিনিউ, ইডলিন লজ, পোঃ—আসানসোল, জেলা—বর্দ্ধমান।
অথবা, (গ) শ্রীসত্য কর্মকার, লিপি কার্য্যালয়, রাহা লেন, পোঃ—আসানসোল, জেলা—বর্দ্ধমান।

(২) রচনা বাংলা অথবা ইংরাজী ভাষায় লিখিতে হইবে।

(৩) রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ভাবে লিখিতে হইবে। প্রতিযোগী রচনার নকল রাখিবেন, কারণ উহা ফেরৎ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।

(৪) সমিতির বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৫) প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়—

(ক) উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য—

"মানুষ রামানন্দ"

বর্দ্ধমান বাঁকুড়া জেলার উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে কোন শ্রেণীর এবং বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণকে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীগণকে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের অভিজ্ঞান পত্র সহ রচনা পাঠাইতে হইবে। রচনায় সর্ব্বাধিক ৩০০০ (তিন হাজার) শব্দ ব্যবহার করা চলিবে।

(খ) ডিগ্রী কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণের জন্য—

"সাংবাদিক রামানন্দ"

সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের অভিজ্ঞান পত্রসহ রচনা পাঠাইতে হইবে। রচনায় সর্ব্বাধিক ৩০০০ (তিন হাজার) শব্দ ব্যবহার করা চলিবে।

(গ) সর্ব্বসাধারণের জন্য—

"সমাজ-সেবী রামানন্দ"

রচনায় সর্ব্বাধিক ৪০০০ (চার হাজার) শব্দ ব্যবহার করা চলিবে। প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

(ক)		(খ)		(গ)	
১ম পুরস্কার মূল্য	৭৫৲	১ম পুরস্কার মূল্য	১০০৲	১ম পুরস্কার মূল্য	১২৫৲
২য় " "	৫০৲	২য় " "	৬০৲	২য় " "	৭৫৲
৩য় " "	২৫৲	৩য় " "	৪০৲	৩য় " "	৫০৲

শ্রীসত্যকালী মুখোপাধ্যায় সভাপতি
শ্রীকালীপদ সিংহ সম্পাদক
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহঃ সম্পাদক
} আসানসোল রামানন্দ শতবার্ষিক অনুষ্ঠান উপসমিতি।

বিঃ দ্রঃ—প্রবন্ধ লিখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে নিম্নোক্ত গ্রন্থের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

(ক) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীশান্তাদেবী প্রণীত (খ) পুণ্য স্মৃতি—শ্রীসীতাদেবী প্রণীত (গ) প্রবাসী স্বর্ণবার্ষিকী—স্মারক গ্রন্থ (ঘ) পুরাতন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্র।

স্মৃতির বিড়ম্বনা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

বরষা-ঘন রাতি কোথাও নেই সাড়া, ঝরিছে বারিধারা অবিশ্রাম,
প্রদীপ-নেভা ঘরে বাতাস ঘুরে মরে, আঁধার রজনীর দ্বিতীয় যাম,
যূথীর মৃদু বাসে কি স্মৃতি ফিরে আসে, —কি যেন বিরহের আঘ্রাণ,
বাহিরে কেয়াবন শিহরে শন্ শন্, জানিনা মেঘপানে কি কথা কয়!

একেলা আছি শুয়ে, কাঁপিছে বাতায়নে বিজলী-চমকের ইন্দ্রজাল,
সকল বাধা টুটি' নয়নে ওঠে ফুটি' প্রণয়-স্মৃতি-ভরা অতীত কাল,
দীর্ঘ জীবনের সোপান গেছে পেঁপে কত-যে প্রেমিকার হাস্যমুখ,
কত-যে অভিমান প্রণয়-অবসান কত-যে বিচ্ছেদে দীর্ণ বুক!

কাজল মেখে হেরি কত-যে এলোচুল, চকিত আঁখি কত প্রেমবিধুর,
পত্র-মর্মরে ধ্বনিছে অন্তরে, কত যে প্রেমিকার কণ্ঠস্বর।
কত যে মৃদুহাস বাসরদয়িতার আজিও ধরে বুকে পুলকময়,
উজল নদীতটে শুনি যে চায়ানটে কাঁকন বাজে কার রণাৎকন্!

প্রণয় নিবেদন কোথাও লভিয়াছি, কোথাও হেরিয়াছি রুক্ষতার,
কোথাও রোষভরে ভ্রুকুটি থরে থরে, ললাটে ফুটিয়াছে বাহিতার!
সারাটি জীবনের দীর্ঘ পথ বাহি' কত-যে প্রেমস্মৃতি মৃতপ্রায়,
[illegible] আঁধার-ঘন-রাতে সহসা কোথা হতে প্রাণ যে পায়!

প্রেমিক কবি, হায়, কোথায় পাবে প্রেম? কবিতা আজি তব ছন্দহীন,
নারীর প্রেমে গড়া স্বপ্ন গেছে টুটে, ছিন্ন তারে তবু বাজাও বীণ্,
যে ফুল ফুরায়েছে জীবন-পথে-পথে আর কি পাবে কবি, মূল্য তার?
বরষা-ঘন রাতি সেইটি স্মৃতিরে রচিছে ইতিহাস ব্যর্থতার!

মহাভারত

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

স্বাধীন ভারত মায়ের ভারত মোদের ভারতবর্ষ ।
ভালে হিমাচল সুনীল সাগর করিছে চরণ স্পর্শ ॥
প্রথম সূর্যের এ আর্যভূমি মহাওঙ্কার মন্ত্রে ।
অমৃত পুত্র তোমরা সকলে শোনাল অমর মন্ত্রে ॥
মানুষের মাঝে মানুষ এসেছে জীবনের মহাবাণী ।
তমসার পারে পরম পুরুষ আমরা রয়েছে জানি ॥
সেই আঁধিয়ার ভেদ করে সবে আসিবে জ্যোতির্ময় ।
মহা অম্বরে ধ্বনিয়া উঠিবে জয় মানুষের জয় ॥
মাভৈঃ মন্ত্র শুনেছি আমরা জেনেছি তাঁদের কাছে ।
অজর হয়ে দেশমাতৃকা আজিও দাঁড়িয়ে আছে ॥
(আজ) নতুন সজ্জা পরেছে জননী দৃপ্ত সে দশভুজা ।
রক্ত জবার অঞ্জলি দিয়া করিব তাহার পূজা ॥
হৃদে হৃদে আজ মন্ত্রোচ্ছলে শোন বাজিতেছে জয়ডঙ্কা ।
গর্জি উঠেছে মহাভারতের শঙ্খ নাশিয়া শঙ্কা ॥
দুর্বার আজি ভারতের বীর দুর্দম রণবীর্যে ।
মহাবিক্রমে করে সংগ্রাম চির উন্নত শির সে ॥
টলমল ঐ কাঁপে ধরিত্রী অরাতি কাঁপিছে ত্রাসে ।
রক্তসূর্য উঠেছে আকাশে অন্ধ-আঁধার নাশে ॥
মহাভারতের এ রণক্ষেত্রে তারা যে সব্যসাচী ।
পাঞ্চজন্য মহাহুঙ্কারে তাহারা উঠেছে নাচি ॥
অদ্ভুত আজি অস্ত্র তাদের বজ্র সে বিভীষণ ।
দমন করিতে শত শত্রুর হুঙ্কার ও গর্জন ॥

দিকে দিকে ঐ প্রলয় ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ চিৎকার ।
পিঙ্গল ঐ ধূর্জটি জটা উড়িছে দুর্নিবার ॥
ধিয়া ধিয়া থৈ নাচে মহাকাল ডমরু ডিমি ডিমি ।
মন্থন করে কোন মন্দার জলধির জল-ঊর্মি ॥
সমর-সাগরে ওঠে গরল ফুলে আছাড়িয়া মরে ।
পাশবিকতার দানব মরে আজি পাশুপত শরে ॥
বিচারবিহীন দানব আজিকে লুটিছে ধরণীতলে ।
অহঙ্কারের শেষ অঙ্কে…ডুবিল সাগর জলে ॥
অমৃত পাত্র হাতে উঠে আসে ভারতের মহাপ্রাণ ।
কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী গাহে সাম্যের গান ॥
ভারতই দিয়াছে আদিকাল হ'তে মানুষের অধিকার ।
বিজয় মন্ত্রে সে ভারত করে নতুন অঙ্গীকার ॥
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ খ্রীষ্টান পার্শী মুসলমান ।
একই সঙ্গে পাশাপাশি ভারতের সন্তান ॥
এক প্রাণ মোরা একই আকাঙ্ক্ষা, মিলিত মোদের বাহু ।
ভারত আকাশে দেখিয়াছি মোরা বহু কলঙ্ক রাহু ॥
অতীত আমরা অক্ষয় মোরা অনন্ত দীপশিখা ।
ললাট ফলকে চির উজ্জ্বল বিজয় বহ্নি-টিকা ॥
মৃত্যুরে মোরা তুচ্ছ করেছি সত্যেরে মহীয়ান ।
সে সত্য করে স্বদেশের তরে চির স্বাধীনতা দান ॥
এই স্বাধীনতা মহান-মন্ত্রে মন্ত্রিত প্রাণ-হর্ষ ।
স্বাধীন ভারত : মায়ের ভারত মোদের ভারতবর্ষ ॥

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ইয়েমেনে শান্তি

তিন বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলার পর আরব রাষ্ট্র ইয়েমেনে শান্তি ফিরে এসেছে। তিন বছর আগে কর্ণেল সালালের নেতৃত্বে হঠাৎ ঐ রাজ্যে এক সামরিক অভ্যুত্থান হয়। অভ্যুত্থানকারীদের প্রচণ্ড আক্রমণে ইয়েমেনের ইমামের প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং বিদ্রোহীরা দাবী করেন যে, ঐ ভাঙা প্রাসাদের নীচে ইমাম (রাজা) চাপা পড়ে নিহত হয়েছেন। কর্ণেল সালাল ইয়েমেনের শাসন-ক্ষমতা দখল করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু কয়েক দিন বাদেই জানা যায় যে, ইমাম নিহত হন নি, এবং প্রাসাদ আক্রান্ত হওয়ার সময়েই তিনি গোপন পথে ছদ্মবেশে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান। ফলে ইয়েমেনের রাজ-অনুগতরা নতুন অনুপ্রেরণা পায় এবং তারা সালালের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে তাদের প্রধান সমর্থক ও সহায় হন সৌদী আরবের রাজা। কর্ণেল সালালের সমর্থনে এগিয়ে আসেন প্রেসিডেন্ট নাসের। ষাট হাজার মিশরী সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে আসে ইয়েমেনে। ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মিশর-সৌদী আরবের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট নাসের ও সৌদী আরবের রাজা ফৈজলের মধ্যে ইয়েমেনের ব্যাপারে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় কোন পক্ষই খুব বেশী কৃতকার্য হতে পারে নি। সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে স্থির হয়েছে—ইয়েমেন থেকে তিন মাসের মধ্যে ষাট হাজার মিশরী সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে এবং রাজভক্তরাও অস্ত্র সংবরণ করবে। তারপর ইয়েমেনে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে যাতে কর্ণেল সালাল বা ইমাম কেউ থাকবেন না। এবং ঐ সরকারের তত্ত্বাবধানে ইয়েমেনে যে গণভোটের ব্যবস্থা হবে তাতেই স্থির হবে ইয়েমেন সাধারণতন্ত্রী থাকবে কি আবার রাজতন্ত্রে ফিরে যাবে।

পৃথিবীর যে কোন দেশের বিরোধের নিষ্পত্তি যদি শেষ পর্যন্ত এই ভাবে দেশের জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তাতে শুধু যে প্রকৃত নিষ্পত্তি হয় তাই নয়, জনগণের অনর্থক দুর্ভোগও অনেক কমে।

সিঙ্গাপুর স্বাধীন

ক্ষুদ্র দ্বীপ উপনিবেশ সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার সঙ্গবিচ্ছেদে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৩ সালের ৩১শে আগষ্ট মালয়, সিঙ্গাপুর ও উত্তর বোর্ণিওর দুটি ব্রিটিশ উপনিবেশ সারাওয়াক ও সাবাকে নিয়ে মালয়েশিয়া গঠিত হয়। সুতরাং মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সিঙ্গাপুরের অবস্থান দু'বছরও পূর্ণ হয় নি। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লীকুয়ান ইউ ও তাঁর দল পিপলস একশন পার্টি বরাবর সিঙ্গাপুরকে মালয়ের অঙ্গীভূত করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই ভাবেই তাঁরা সিঙ্গাপুরের জনমত গড়ে তোলেন। কিন্তু সিঙ্গাপুরকে মালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান খুব উৎসাহী ছিলেন না। তার কারণ সিঙ্গাপুরের চীনা সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ২২৫ বর্গমাইল ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপটির প্রায় সতর লক্ষ লোকের মধ্যে চোদ্দ লক্ষ চীনা, বাকী তিন লক্ষেরও বেশী ভাগ মালয়ী। ও দিকে মালয়ের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক চীনা, মালয়ী ও ভারতীয়রা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হলে তবেই চীনাদের চেয়ে সংখ্যায় কিছুটা বেশী হয়। এই অবস্থায় শুধু সিঙ্গাপুর মালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলে ঐ রাজ্যে চীনারা অনেক বেশী একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হ'ত। এই কারণেই টুঙ্কু মালয়ের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের সংযুক্তির পূর্ব সর্তরূপে উত্তর বোর্ণিওর তিনটি ব্রিটিশ উপনিবেশ ঐ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান এবং ব্রিটিশ সরকারও তাতে সম্মত হন,

যদিও তিনটি উপনিবেশের অন্যতম রূপেই শেষ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার যোগদানে স্থির থাকে।

কিন্তু মালয়, সিঙ্গাপুর, সারাওয়াক ও সাবা নিয়ে যে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গঠিত হয় তাতে সিঙ্গাপুরের পক্ষে যে কেন দু'বছরের বেশী টেঁকা সম্ভব হল না তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয় নি। তবে যেটুকু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে থাকার ব্যাপারে সিঙ্গাপুরের যতটা আগ্রহ ছিল, যুক্তরাষ্ট্রে সিঙ্গাপুরকে রাখার ব্যাপারে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান ততটা আগ্রহী ছিলেন না। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লীকে তাই চোখের জলের মধ্যে মালয়েশিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ মেনে নিতে হয়।

স্বাধীন হওয়ার পরেও সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এ বিচ্ছেদ সাময়িক, আবার সিঙ্গাপুর একদিন মালয়েশিয়ার সঙ্গে মিলিত হবে। এবং যতদিন তা না হবে ততদিন তার জন্য প্রস্তুতিই হবে সিঙ্গাপুরের জনগণের প্রধান কাজ। আজকের দিনে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ নগরীর পক্ষে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-রূপে টিঁকে থাকা বা আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব কাজ। সুতরাং মালয়েশিয়ার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের ভুল বোঝাবুঝির অবসান যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর উভয় স্থানেই বহু ভারতীয়ের বাস এবং উভয়েই ভারতের বিশেষ মিত্র রাষ্ট্র। সে কারণে তাদের সদ্ভাব ও সমৃদ্ধি ভারতবাসী মাত্রেরই কাম্য।

গ্রীসে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট

গত ১৫ই জুলাই গ্রীসের পঁচিশ বছর বয়স্ক তরুণ রাজা কনষ্টান্টাইন সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী জর্জ পপান্ড্রিউকে পদচ্যুত করার পর গ্রীসে যে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট ও রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দেয় আজ পর্যন্ত তার কোন মীমাংসা হয় নি। রাজা অনেককে দিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু পার্লামেন্টের সমর্থনের অভাবে তাঁদের কারও চেষ্টা সফল হয় নি।

রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর উপর পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী পাপান্ড্রিউর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাই নাকি রাজা কনষ্টান্টাইনের ক্ষোভের কারণ। গ্রীসের সৈন্যবাহিনী রাজ-অনুগত। কিন্তু পাপান্ড্রিউ নাকি সেখানে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে রাজ্যে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে একনায়কতন্ত্র কায়েমের ষড়যন্ত্রে মেতেছিলেন এবং এ ব্যাপারে নাকি কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ-বিরোধী শক্তি পাপান্ড্রিউর সঙ্গে হাত মেলান। কিন্তু পাপান্ড্রিউ ও তাঁর সহকর্মীরা রাজার ঐ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তবে যে পক্ষেরই অভিযোগ সত্য হোক না কেন, গ্রীসের রাজা ও পার্লামেন্টের বিরোধটা এখন প্রকৃতপক্ষে সৈন্যবাহিনী ও রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধ হয়ে দাঁড়িয়েছে যার মীমাংসা খুব সহজে হবে না। রাজা ও সৈন্যবাহিনীর আঁতাত যতদিন অটুট থাকবে ততদিন গ্রীসে পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে।

পি মিত্র

অতি প্রাচীন কালে যে সকল খেলাধুলার প্রচলন ছিল মুষ্টিযুদ্ধ তার মধ্যে অন্যতম। আধুনিক কালে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, লন টেনিস প্রভৃতি যে সকল খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাদের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয় কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের কয়েক সহস্র বছর পেছনে চলে যেতে হবে। সেই প্রাচীন যুগে যখন সমরাস্ত্র ও সমরায়োজন এত উন্নত ও ব্যাপকতা লাভ করে নি। যখন যুদ্ধের জয়পরাজয় ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্যের ওপর নির্ভর করত তখনও মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন ছিল। তখন হয়ত মুষ্টিযুদ্ধ অন্য কোন নামে অভিহিত হ'ত। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় মুষ্টিযুদ্ধ তার নিজের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার পরই মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তির স্থান ছিল। সে কালের গ্ল্যাডিয়েটরদের পক্ষে মুষ্টিযুদ্ধের কলা-কৌশল জানা অপরিহার্য ছিল।

বর্তমান কালে অনেকে মুষ্টিযুদ্ধকে আইন করে বন্ধ করে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁদের মতে এই খেলায় পৈশাচিকতার মাত্রাই অধিক। খেলাধুলা থেকে মানুষ নির্মল আনন্দ লাভ করে, কোন পৈশাচিকতা মানুষকে নির্মল আনন্দ দিতে পারে না। মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে এটাই যদি অন্যতম কারণ হয় তবে এর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রি ষ্টাইল কুস্তি, রাগবী, ক্রিকেট, ফুটবল ও বুল ফাইটিংও বন্ধ করে দিতে হয়। কারণ রাগবী ও ফুটবলেও লোকের হাত-পা ভাঙে, ক্রিকেটেও খেলোয়াড় জখম হয়, এবং বুল ফাইট মানেই ত সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করা। এ সব খেলার প্রচলন যদি বন্ধ না হয় তবে মুষ্টিযুদ্ধই বা কেন অকারণে নির্বাসিত হবে। রাজার খেলা ক্রিকেটে কি পৈশাচিকতা নেই? লারউড, লিণ্ডওয়াল, হল, গিলক্রীষ্ট, গ্রিফিথ এদের বল যখন কামানের গোলার মতন ব্যাটস্‌ম্যানকে আক্রমণ করে, আঘাত করে, হাসপাতালে শয্যাশায়ী করে, তার ভেতর কি পৈশাচিকতার পরিচয় নেই। সেখানে যদি নতুন নতুন নিয়ম প্রবর্তন করে খেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তবে মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রেই বা হবে না কেন?

বর্তমানে মুষ্টিযুদ্ধ দু' ভাগে বিভক্ত, পেশাদারী ও অপেশাদারী। পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের সঙ্গে অপেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের অনেক প্রভেদ। সম্প্রতি মুষ্টিযুদ্ধে কয়েকজন মুষ্টি-যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন সত্য, তবে তার অধিকাংশই অবশ্য পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে। এখানে কোন লড়াই দশ রাউণ্ড পর্যন্ত আবার কোন লড়াই ১৫ রাউণ্ড পর্যন্ত, সেক্ষেত্রে অপেশাদারী লড়াই মাত্র ৩ রাউণ্ডেই শেষ হয়। পেশাদারী লড়াই-এর পুরস্কার বিরাট অঙ্কের টাকা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের জয়মাল্য একবার যার গলায় ওঠে, ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিতে অর্থের অভাব তার আর থাকে না। কিন্তু অপেশাদারী লড়াইতে পুরস্কার কাপ, মেডেল, শীল্ড প্রভৃতি। কাজেই অর্থের জন্য এখানে কেউ প্রাণ বাজি রেখে লড়ে না।

মুষ্টিযুদ্ধকে বন্ধ করে দেবার কোন প্রয়োজন পড়ে না, যদি পেশাদারী লড়াইকে আরও একটু বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আইন-কানুনের আওতায় আনা যায়।

অনেকে একথা প্রশ্ন করেন যে, মুষ্টিযুদ্ধের কোন উপকারিতা আছে কি না। মানুষের জীবনধারণের পক্ষে কয়েকটা অপরিহার্য প্রবৃত্তি আছে, যেমন শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করা, আহার গ্রহণ করা, তেমনি শরীরচর্চাও অপরিহার্য; সুস্থ সবল ভাবে প্রাণধারণ করতে গেলে শরীরচর্চা ছাড়া উপায় নেই। তবে শরীরচর্চার ভেতর অনেক রকম ভেদ আছে। কেউ বল খেলে, কেউ সাঁতার কাটে, কেউ দৌড়-ঝাঁপ করে। এগুলো সবই নিজ নিজ পছন্দের ওপর নির্ভর করে; তেমনি যার পছন্দ সে মুষ্টিযুদ্ধ করবে অথবা কুস্তি

বেঙ্গল এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আন্তঃ কলেজ মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বিনয় সরকার ও অসীম মজুমদার লড়াই এর একটি দৃশ্য। পিছনে শ্রী পি. এল রায়কে দেখা যাচ্ছে।

করে নিজ শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখবে। এ ছাড়াও মুষ্টিযুদ্ধের আরও আকর্ষণ আছে। মানুষকে আনন্দদানের পক্ষে মুষ্টিযুদ্ধ একটা অতি চমৎকার 'স্পোর্টস' এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই খেলাটির যথেষ্ট সমাদর ছিল আমাদের দেশে, কিন্তু ক্রমশঃ তা কমে আসছে ও সামগ্রিক ভাবে দেশে মুষ্টিযুদ্ধের মান কমে গেছে। এই ক্রমাবনতি উপলব্ধি করেই ভারতীয় অপেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ সংস্থা একেবারে স্কুল থেকে এর সংহতি সাধনের চেষ্টা করছেন। স্কুল ও কলেজে প্রতিযোগিতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই খেলার প্রসারতার চেষ্টা হচ্ছে এবং যথেষ্ট সাড়াও পাওয়া গেছে। সম্প্রতি বেঙ্গল এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের পরিচালনায় ও স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচারের তত্ত্বাবধানে আন্তঃ-স্কুল ও আন্তঃ-কলেজ মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের এই প্রতিযোগিতাটি নানারকম বাধাবিপত্তির ভেতর অনুষ্ঠিত হলেও অংশগ্রহণকারী এবং দর্শকদের ভেতর যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় তা অত্যন্ত আশাপ্রদ। স্কুলের ছাত্রদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেও বক্সিং ফেডারেশন সিংহলের সঙ্গে একটি স্কুল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। এ বৎসর ভারতীয় স্কুল দল সিংহল সফর করে সিংহলী দল আবার পাল্টা সফরে ভারতে আসবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে যদি এই রকম প্রতিযোগিতা করার ব্যবস্থা করা যায় তা হলে আমাদের দেশে মুষ্টিযুদ্ধের মান যে আবার বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা এক প্রবল সংকটাকারে দেখা দেওয়ায় সব সময়ে এরকম সফর সম্ভব হয়ে উঠছে না। সেক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে যদি প্রতিযোগিতার সংখ্যা বাড়িয়ে ছাত্রদের অধিক সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করানো যায় তবে তার সুফল অচিরেই পরিলক্ষিত হবে। বছরে একটা কি দুটো লড়াইতে অংশগ্রহণ করে আর সমস্ত বছর বসে থেকে কোন মুষ্টিযোদ্ধাই উচ্চমানে পৌঁছতে পারবেন না। এর জন্যে প্রয়োজন বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন সংস্থা ও সকল রাজ্যের সক্রিয় সহযোগিতা। কোন একটা মাত্র ক্লাব বা সংস্থার একার পক্ষে এ ভাবে একটা খেলাকে

উক্ত প্রতিযোগিতার আন্তঃ স্কুল বিভাগে বাবুল দাস ও গৌরাঙ্গ দাসকে লড়িতে দেখা যাইতেছে।
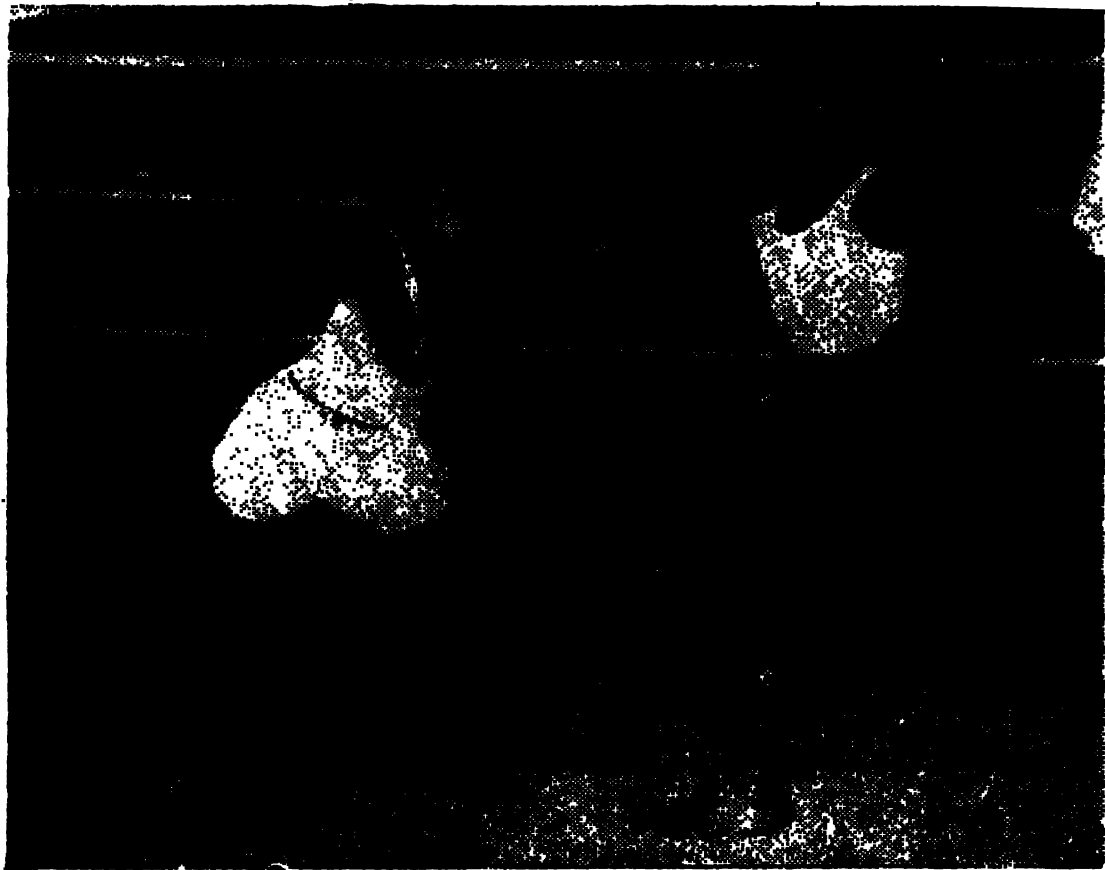
বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রগামী দেশগুলোতে সরকারী এবং সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতারই খেলাধুলা প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা বহু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে, ফলে তাদের সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা দুই-ই বৃদ্ধি পায়।

* * * *

মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ করে দেবার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন এটা যে একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আগামী মার্চের মাসে লাস ভেগাসে বিশ্ব হেভি ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ন ক্যাসিয়াস ক্লে ও প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ফ্লয়েড প্যাটারসনের ভেতর বিশ্ব খেতাবের জন্য লড়াই হবে। ক্লে, না প্যাটারসন কে জয়ী হবে এই নিয়ে আজ দিকে দিকে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এ লড়াইটা এখন অনেকটা ধর্মের জন্য লড়াই বলা যেতে পারে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ক্যাসিয়াস ক্লে কিছুদিন আগে হঠাৎ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং 'ব্ল্যাক মুসলিম' সংস্থার সঙ্গে হাত মেলান। কিন্তু প্যাটারসন তাঁর ক্রিশ্চান ধর্ম আঁকড়ে পড়ে আছেন। ব্ল্যাক মুসলিমরা বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে নিগ্রোদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি, ক্যাসিয়াস ক্লেও সেই দলে। কিন্তু প্যাটারসন নিগ্রো হওয়া সত্ত্বেও এই পন্থার পক্ষপাতি নন। তিনি বলেন, ব্ল্যাক মুসলিমরা আমাদের প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করছে। ক্যাসিয়াস ক্লেও সেই ঢাকে কাঠি দিয়েছেন। তাই তিনি চান ক্লে-কে হারিয়ে বিশ্ব খেতাব কেড়ে নিয়ে সেই প্রচার বন্ধ করে দিতে। দেখা যাক এ লড়াইতে কে জয়ী হয়। প্যাটারসন যদি জয়ী হন, তবে এ জয় তাঁর পক্ষে খুবই তৃপ্তিকর হবে সন্দেহ নেই।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ | দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্বেত ও কৃষ্ণ আমেরিকানের যুদ্ধ

কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকায়, লস্ অ্যাঞ্জেলিস শহরে, শ্বেত ও কৃষ্ণ আমেরিকানদের মধ্যে একটা ভীষণ মারপিট হয়। ইহাতে ঘরবাড়ী ও দোকানপাট জ্বালাইয়া লুঠ করিয়া বহু সম্পদ নষ্ট করা হয়। গাড়ি ধ্বংস করা, খুন-জখম প্রভৃতি অপরাধ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতে থাকে। ১৮ বৎসরের কম বয়সের ৫০০ শতাধিক বালক-বালিকা গ্রেপ্তার হয়। খুন-জখম হয় প্রায় ১০০০ হাজার লোক। মোট গ্রেপ্তার হয় প্রায় ৪০০০ হাজার লোক। ২০১টি বাড়ী সম্পূর্ণ জ্বালাইয়া-পুড়াইয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় ও ৫৩৬টি বাড়ী লুঠ ও কিছু কিছু ধ্বংস করা হয়। ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। আমেরিকানদিগের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল ও জাতীয় উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা বলেন যে, শ্বেত আমেরিকানদিগের অবিচার ও অত্যাচারের ফলেই কৃষ্ণ আমেরিকানগণ এই ভাবে লুঠতরাজ, খুন-জখম ও শহর জ্বালাইয়া দেওয়া আরম্ভ করে। তাহারা দেখে যে এই অতি-সমৃদ্ধ জাতির অন্তর্গত হইয়াও গায়ের রং শ্বেত না হওয়ার জন্য কৃষ্ণ আমেরিকানদিগের অবস্থা দাসজাতির মতই। উত্তম স্থানে থাকিবার অধিকার, শ্বেতকায়দিগের সহিত এক স্কুলে পড়া, এক হোটেলে খাওয়া-থাকা, এক গাড়িতে যাত্রীহিসাবে ভ্রমণ করা প্রভৃতি অনেক কিছুই কৃষ্ণকায়গণ করিতে পারে না। তাহারা যেন অস্পৃশ্য জাতি ও তাহাদিগের সহিত ছোঁয়াছুঁয়ি যেন শ্বেতকায়ের পক্ষে মহা অপমানজনক ব্যাপার। আমেরিকান শ্বেতকায়গণ যদিও পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাতির লোকদিগকে সাম্য ও মৈত্রী শিক্ষা দিয়া বেড়ান তাহা হইলেও তাঁহাদিগের নিজের দেশে তাঁহারা কৃষ্ণকায় আমেরিকানদিগের প্রতি অতি জঘন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। লস অ্যাঞ্জেলিসের জাতি ও বর্ণ লইয়া খুন-খারাবি, লুঠপাট ও শহর ধ্বংসের খেলা আমেরিকানদিগকে নিজ দোষ দেখিতে শিখাইয়াছে। ইহাতে কোন সুফল হইবে কি না তাহা পরে বুঝা যাইবে।

টাকার ব্যাপার

ভারতবর্ষে যদি কাহারও ঘরে এক লক্ষ টাকা থাকে তাহা হইলে তাহাকে লক্ষপতি আখ্যা দিয়া একটা সমাজের উচ্চশিখরে বসাইয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। এক লক্ষ টাকা মাত্র কুড়ি হাজার ডলার, অথবা সাড়ে সাত

হাজার পাউণ্ড। ঐ পরিমাণ অর্থ আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানী কিংবা জাপানে কিছুই নহে। এক কোটি টাকা থাকিলে ক্রোড়পতি হয়। অর্থাৎ সে ঐশ্বর্য্য কল্পনার অতীত। কিন্তু ক্রোর টাকা মাত্র কুড়ি লক্ষ ডলার। আমাদিগের দেশে বৃহৎ বৃহৎ কারবারের আয় (লাভ নহে) শত কোটি বা দুইশত কোটি হইলে সেই সকল কারবার যে কি অসম্ভব ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া গণ্য হয় তাহা বলাই যায় না। আমেরিকার একটি প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায় যে, এক দুই সহস্র কোটি টাকা আমদানী হয় এরূপ কারবার সে দেশে কত শত আছে। কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

নাম	কারবার	বাৎসরিক মোট বিক্রয়	বাৎসরিক নেট লাভ
১। জেনারেল মোটর্স	মোটর গাড়ির	১৬৯৯৭০৪৪০০০ ডলার	১৭৩৪৭৮২০০০ ডলার
২। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল	পেট্রোল প্রভৃতি	১০৮১৪৬৬১০০০ ,,	১০৫০৫৫৫০০০ ,,
৩। ফোর্ড মোটর	মোটর গাড়ির	৯৬৭০৭৬৬০০০ ,,	৫০৫৬৪২০০০ ,,
৪। জেনারেল ইলেকট্রিক	ইলেকট্রিক কলকব্জার	৪৯৪১৩৫৯০০০ ,,	২৩৭০৩৩০০০ ,,
৫। সোকোনি মোবিল অয়েল	পেট্রল প্রভৃতির	৪৪২২৩৮৬০০০ ,,	২৯৪১৬০০০০ ,,
৬। ক্রাইসলার	মোটর গাড়ির	৪২৮৭৩৪৮০০০ ,,	২১৩৭৭০০০০ ,,

এক শত আমেরিকান কারবারের আয়ের অনুপাতে একটি তালিকা করিয়া দেখান হয় যে কোন কারবারের আয় কত অধিক। জেনারেল মোটরসের প্রায় সতের শত কোটি ডলারের বাৎসরিক বিক্রয় ও লাভ হয় এক শত চুয়াত্তর কোটি ডলার। ভারতের সকল লোকের ও কারবারের সমবেত আয় বৎসরে ১৬।১৭ হাজার কোটি টাকা মাত্র। ডলারের হিসাবে ৩।৪ হাজার কোটি ডলার। অর্থাৎ শুধু জেনারেল মোটর্সের বাৎসরিক আয় ভারতের সমগ্র জাতীয় আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক! আমেরিকার প্রথম এক শতটি কারবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম আয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্র্যাণ্ডস খাবার জিনিসের কারবারের। এই কারবারের বাৎসরিক বিক্রয় হয় ৬১৪৫৫৫০০০ ডলারের খাদ্যদ্রব্য। লাভ হয় বৎসরে ২৩৬১০০০০ ডলার। অর্থাৎ বিক্রয় টাকায় ৩০০২৭২৫০০০ (তিন শত কোটি সাতাশ লক্ষ পঁচিশ হাজার)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আমেরিকার প্রথম এক শত কারবারের মধ্যে আয়ে নিম্নতমটির বাৎসরিক বিক্রয় ভারতের বৃহত্তম কারবারের আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। লাভ যাহা হয় তাহাও প্রায় ভারতের বৃহত্তম কারবারের তুলনায় অধিক। মনে হইতে পারে যে আমেরিকাবাসিদিগের আয় খুবই অধিক সুতরাং তাহাদিগের সহিত ভারতের তুলনা করা উচিত নহে। তাহা হইলে দেখা যাউক অপর দেশের কারবারগুলির আয় ও লাভ কি প্রকার।

নাম	দেশ	কারবারের বর্ণনা	বাৎসরিক বিক্রয়	বাৎসরিক লাভ
১। রয়াল ডাচ/শেল	হলাণ্ড-ব্রিটেন	পেট্রল প্রভৃতি	৬৮১৪১৪৪০০০ ডলার	৫৮০১৫৩০০০ ডলার
২। ইউনিলিভার	ব্রিটেন-হলাণ্ড	খাদ্য-তৈল-সাবান প্রঃ	৪৭২৭৭৯২০০০ ,,	১৭৫৪৭৩০০০ ,,
৩। আই. সি. আই	ব্রিটেন	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	২০১৬৫৬০০০০ ,,	১৬১২৮০০০০ ,,
৪। ফিয়াট	ইটালি	মোটর গাড়ি প্রভৃতি	১৪৫২৭৯৪০০০ ,,	২৪৫৫০০০০ ,,
৫। সিমেন্স	জার্ম্মানী	বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি	১৬৩৬০০০০০০ ,,	৫৬৫৫০০০০ ,,
৬। হিতাচি	জাপান	,, ,,	১১৬৭৯৬১০০০ ,,	৩৬১৪২০০০ ,,

এই জাতীয় এক শতটি কারবারের তালিকায় মেক্সিকো, ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, ক্যানাডা, সুইডেন, বেলজিয়াম, লুকসেমবার্গ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের নাম দেখা যায়। জাপানের ১৪টি কারবার ঐ উচ্চ শ্রেণীতে পড়ে। ব্রিটেনের কারবার ঐ তালিকায় পঁচিশ বার উল্লিখিত হইয়াছে। জার্ম্মানীর উনিশ বার। এক শত বা ততোধিক শতকোটি ডলার অর্থে বুঝিতে হইবে পাঁচ শত হইতে কয়েক হাজার কোটি টাকার কারবার। লাভও দেখা যায় সেই

অনুপাতে এত অধিক যে, ভারতীয় কারবারের তাহাদিগের নিকটে আসিবারও কোন আশা এখনও দেখা যায় না এই সকল কারবারের কর্মী যাহারা তাহাদিগের বেতন প্রভৃতিও ভারতের শ্রমিকদিগের তুলনায় অনেক অধিক। ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে কোনমতেই বলা যায় না। কেন হইতেছে না তাহা জাতীয় ভাবে আলোচ্য। সে চেষ্টা হইতেছে না বলিয়াই মনে হয়। মিলিত ভাবে দারিদ্র্য দুঃখভোগ চেষ্টাই আদর্শ বলিয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

স্বর্ণ ঋণ

ভারত সরকারের বিদেশের অর্থের খুবই অভাব দাঁড়াইয়াছে। চা- পাট, লা, চিনি, খনি ও জঙ্গল হইতে আহরিত দ্রব্যাদি, বস্ত্র, রেশম ও অন্যান্য রপ্তানির মাল বিক্রয় করিয়া ভারতের পূর্ব্বকালে যাহা বিদেশে জমা হইত এখন তাহা হইতে অধিক রপ্তানি হয়। কিছু কিছু কলকব্জা, যথা সেলাইয়ের কল, বৈদ্যুতিক পাখা, বাইসিক্‌ল্‌, লৌহ-ইস্পাতের জিনিস প্রভৃতি। ইহার ফলে পূর্ব্ব হইতে ভারতের বিদেশী অর্থ আয় কিছুটা বাড়িয়াছে; কিন্তু ভারতের বরাবরই অনেক টাকা বিদেশে কর্জ্জা করিয়া কলকব্জা ক্রয় করিতে হইত এবং বর্ত্তমানে আমেরিকা ও ব্রিটেনের ভারতকে অর্থাভাবে দমন করিবার চেষ্টার ফলে কর্জ্জা করিয়া বিদেশী ক্রয়শক্তি-আহরণ অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। ভারত কিন্তু অর্থাভাবের চাপে আমেরিকা ও ব্রিটেনের আজ্ঞাবহ হয় নাই। উক্ত দেশগুলিকে ভারত বুঝাইয়া দিয়াছে যে, তাহাদিগের নিকট সাহায্য না পাইলে, ভারত বিদেশে সকল প্রকার দ্রব্য ক্রয় করা কমাইয়া দিয়া নিজ অবস্থা বুঝিয়া আর্থিক পরিকল্পনা ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবে। অপর পক্ষে ভারত ইউগোস্লাভ, চেক, রুমেনীয়, রুশীয়, জাপানী ও পূর্ব্ব জার্ম্মান সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া বিদেশের অর্থের অভাব অনেকটা ঠিক করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের বিদেশে দ্রব্য ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। কারণ সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন যাহা তাহা অর্থাভাবে পূর্ণ না করিয়া দেশরক্ষার কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এবং অনেক কারখানার জন্য কলকব্জা ক্রয় সামরিক কারণে অতি আবশ্যক। এই সকল কারণে ভারত সরকার সাধারণের নিকট স্বর্ণ ঋণ গ্রহণ করিবার আয়োজন করিয়াছেন। এই ঋণ স্বর্ণে লওয়া হইবে ও স্বর্ণে শোধ করা হইবে। উপরন্তু প্রতি ১০ গ্রাম স্বর্ণের জন্য বাৎসরিক দুই টাকা সুদ দেওয়া হইবে এবং গহনা ভাঙা-গড়ার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভরি-পিছু তিন টাকা এককালীন দেওয়া হইবে। ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা সাধারণের পক্ষে লাভজনক। কারণ, গহনা বা স্বর্ণ জমা রাখিলে কোনই আয় হয় না। স্বর্ণ ঋণ দিলে পনের বৎসর পরে প্রতি দশ গ্রামে ত্রিশ টাকা আয় হইবে। এই ঋণের পত্র বাবহারে ব্যাঙ্কের নিকট টাকা পাওয়া যাইবে, সুতরাং জমা-করা স্বর্ণ ব্যবসায়ে এই উপায়ে লাগান চলিবে বলিয়া ধরা যায়। যে সকল লোক লুকান লাভের টাকা স্বর্ণে পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা সেই স্বর্ণ ভারত সরকারকে ঋণ দিলে লুকানো "কালো" টাকা "সাদা" টাকা হইয়া যাইবে। অর্থাৎ স্বর্ণ ঋণে স্বর্ণ দিয়া পনের বৎসরের ঋণপত্র ক্রয় করিলে সকল দিক দিয়াই ঋণদাতার লাভ হইবে।

ঋণদাতাকে ভুলিয়া এখন জাতীয় দিক দিয়া স্বর্ণ ঋণ দিবার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা বিচার করা যাউক। পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ ও চীনের ভারত আক্রমণের হুমকি শুধু ভারত সরকারের উপর আক্রমণ ও হুমকি নহে। প্রত্যেক ভারতবাসীর বুঝা প্রয়োজন যে, সেই আক্রমণ তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের উপরে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছিল এবং চীনের বর্ব্বরতা যেমন ভারত সরকারের পক্ষে অপমানকর তেমনি প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেও চূড়ান্তভাবে সম্মানহানিকর। পাকিস্তানের আক্রমণ সফল হইলে প্রত্যেক ভারতবাসীর লুকান ও প্রকাশ্য-ভাবে রক্ষিত অর্থ ও ঐশ্বর্য্য পাকিস্তানের কবলে গিয়া পড়িত। যাঁহারা ভাবেন যে ভারত সরকার তাঁহাদিগের রক্ষাকার্য্য যেমন করিয়া হউক করিবেনই, তাঁহাদিগের মনে রাখা উচিত যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় জোয়ানগণ নিজেদের

আমাদিগের দেশে কিছু কিছু শিক্ষিত লোক আছেন যাঁহারা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার আদর্শ ভুল বুঝিয়া সেই সভ্যতা-সংশ্লিষ্ট বহু আবর্জনা তুলিয়া আনিয়া সেগুলিকে সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন। এই সকল লোককে পরলোকে বনে পাঠাইয়া দিলে দেশের অনেক উপকার হয়। ইঁহাদিগের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সতীদাহ প্রথা আইনত বন্ধ হইয়া গিয়াছে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে। তাহার বিষয়ে স্বপক্ষে-বিপক্ষে কিছু বলিবার অবকাশ নাই। বলিলে বিপক্ষে বলিবারই অনেক কিছু পাওয়া যাইতে পারে। বাল্যবিবাহ নিষেধ, স্ত্রীশিক্ষা নিবারণ, বিধবা বিবাহ বেআইনী করা প্রভৃতির স্বপ্ন যাঁহারা দেখেন তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে এরূপ কিছু চেষ্টা করিলে দেশবাসী তাঁহাদিগকে মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, উল্টা গাধায় চড়াইয়া দেশের বাহির করিয়া দিতে পারে।

প্রধান সেনাপতি ও অপরাপর সেনাপতি

খবরের কাগজে দেখা গিয়াছে যে, ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল চৌধুরী ও প্রধান বিমান সেনাপতি অর্জুন সিংহকে ভারত সরকার পদবিবৃদ্ধি দিয়া ফিল্ড মার্শাল করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা যে অপূর্ব রণকৌশল দেখাইয়াছেন ও সাহসের সহিত ভারতের যোদ্ধাদিগের মধ্যে অতুলনীয় শৌর্যবীর্য জাগ্রত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তির অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়া পাকিস্তানের উৎকৃষ্টতর অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদলকে পরাভূত করিয়া দেশ ও দেশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, এই পদবিবৃদ্ধি তাঁহাদের সেই অদ্ভুত কীর্তি ও অতি-বিস্ময়কর যুদ্ধক্ষমতার পুরস্কার। ইঁহাদিগের নির্দেশে যে সকল সেনানায়ক [illegible] যুদ্ধক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়া পাকিস্তানের দম্ভ ও দর্প চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে পদবৃদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত করা হইবে। আমাদিগের এ বিষয়ে কিছু বলিবার নাই। মানুষের কর্তব্য, ত্যাগের ও আদর্শের গৌরব তাহার নিজস্ব। ফুলের পাপড়ি যেমন রং লাগাইয়া দিলে অধিক সুন্দর হয় না, সরকারী আখ্যাতেও তেমনি কাহারও গৌরব বৃদ্ধি হয় না। তবে অবশ্য [illegible]। ভারত সরকার ইতিপূর্বে এই সকল উপাধি ও আরও অনেক লোককে দিয়াছেন। এই সকল লোকের মধ্যে রাজকর্মচারী, বাণিজ্য ক্ষেত্রের কর্তা, গায়ক, কবি, শিক্ষক ও অপরাপর নানা রকম লোক আছেন। জেনারেল চৌধুরী ও এয়ার মার্শাল অর্জুন সিংহ ঠিক সেই ধরনের লোক নহেন। ইঁহারা [illegible] কোটি কোটি নরনারীর প্রাণ, মান ও সম্পদ রক্ষা করিয়াছেন। যুদ্ধে জয়লাভ ও [illegible] তুলনীয় নহে। [illegible] রক্ষাও এক জাতীয় কার্য নহে। সুতরাং যোদ্ধার অলঙ্কার ও [illegible] ভূষণ এক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। জেনারেল চৌধুরীকে ফীল্ড মার্শাল করিলে ভাল হইত। ইঁহার সমতুল্য যোদ্ধা বর্তমানকালে ভারতে কেহ জন্মায় নাই বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই; সুতরাং এবিষয়ে অধিক আলোচনা না করাই উচিত।

ভারতকে সভ্য করিয়াছি

“নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে” কথাটি অতি সত্য। ইংরেজীতে বলে “কুকুর ডাকিলে তাহাকে ডাকিতে দেওয়াই ভাল”। কিন্তু আজকাল পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং কেহ কিছু বলিলে লোকে বক্তার কুলপরিচয় না জানিয়া অনেক সময় কথাগুলি বিশ্বাস করিয়া ফেলে। সেইজন্য নীচজনের কথা মিথ্যা হইলেও তাহার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন হয়। শুধু নিছক গালাগালিরও প্রত্যুত্তর দরকার হইতে পারে। ব্রিটেন ও আমেরিকা বহুদিন হইতেই ভারতের বিরুদ্ধবাদ সমর্থন করিয়া বহু মিথ্যার প্রচলনে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। যদিও পূর্বকালে বহু ব্রিটিশ ও আমেরিকান গুণীজনে ভারতকে জানিবার ও [illegible]

করিয়া পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের আদর ঐ সকল দেশে বিশেষভাবে হইয়াছিল। ভারতীয় কৃষ্টি-পরিচায়ক গ্রন্থাবলী যে সকল বিদেশী জ্ঞানীজনের চেষ্টায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাঁহাদিগের মধ্যে জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, ব্রিটিশ, আমেরিকান, রুশিয়ান ও জাপানী পণ্ডিতদিগের কথা উল্লেখযোগ্য। ভারতের ইতিহাসও বহু বিদেশী পণ্ডিত চর্চা করিয়াছেন ও তাহার বিভিন্ন যুগের বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন। সকল তথ্য যথাযথভাবে একত্র করিলে দেখা যায় যে, ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতা সকল দিক দিয়া অতি উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা ভারতে অতুলনীয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। নগর ও নগরের পথঘাট, জলসরবরাহ, জল-নিষ্কাশন, নগররক্ষা, শান্তিরক্ষা, দুষ্টের দমন, দুর্ব্বলের রক্ষণ, প্রভৃতি সকল কার্য্যই উত্তমরূপে হইত। জ্ঞানচর্চ্চা, সঙ্গীত, বাদ্য নৃত্য অভিনয়, সাজসজ্জা ইত্যাদি উচ্চস্তরেরই ছিল। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, গণিত, রসায়ন, খনিজ ধাতু ও মিশ্র ধাতুর ব্যবহার, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, জীবজন্তুর সুপ্রজনন, কৃষিকার্য্য, গোপালন, দ্রব্যগুণ ও ভেষজ চর্চ্চা ও অপরাপর বহু বিদ্যায় ভারতীয়েরা পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি হইতে উন্নততর ছিলেন। নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ করিয়া ও সম্প্রদায়িক্যবশত আত্মাভিমানিতা দোষে দুষ্ট হইয়া ভারতীয়েরা যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষতা হারাইয়া ফেলেন ও বর্ব্বর জাতি সকলের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতে থাকেন। এই সকল বর্ব্বর জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি শুধু লুঠতরাজ করিয়া ভারত ত্যাগ করে এবং কোন কোন জাতি এদেশে রাজত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে। সভ্যতা ও কৃষ্টি এই সকল জাতির বিশেষ কিছু ছিল না এবং যাহারা এদেশে অনেক দিন থাকিয়া যায় তাহারা ক্রমশঃ ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই অন্তরে তৃপ্তি লাভ করিতে আরম্ভ করে। মোগলদিগের সভ্যতা প্রধানত ভারতীয় ছিল। উপরে উপরে কিছু ফার্সীভাবও ছিল কিন্তু তাহা ভারতীয় কৃষ্টির সহিত এমন করিয়া মিলিয়া যায় যে তাহার মধ্যে বৈদেশিক ভাব প্রায় কিছুই ছিল না। সুতরাং ভারতীয় মুসলমানদিগের যেরূপ রক্ত ভারতীয়, তেমনি তাঁহাদিগের সভ্যতা ও কৃষ্টিও ভারতীয়। তাঁহারা কোন একটা ভিন্ন জাতির লোক নহেন ও যে সকল পাকিস্তানী অকারণে অসভ্যতা করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে যে, মুসলমানগণ ভারতীয় নহেন, তাহাদিগের কথাগুলি মিথ্যাবাদীর নীচতাপ্রসূত মতলবি আওয়াজ মাত্র। ভুট্টোর আমেরিকায় বসিয়া "ভারতীয়দিগকে আমরা এক হাজার বৎসর ধরিয়া সভ্যতা শিখাইয়াছি" প্রভৃতি কথার মূল্য কি তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ভুট্টো নিজে এক হাজার বৎসর ধরিয়া গুরুমহাশয়ের নিকট কামমলা খাইলেও সভ্য হইবে না ইহা স্থির নিশ্চয়। উপরন্তু ভুট্টোর পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই ভারতবাসী। এই অবস্থায় ভারতীয়দিগকে গালি দিলে সেগুলি ভুট্টোর নিজেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের উপর গিয়া পড়িবে। পাকিস্তানী বলিতে আমরা অপর এক জাতি বুঝি না। পাকিস্তান অপর একটি রাষ্ট্র যেটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ ভারত হইতে চলিয়া যাইবার সময় নিজেদের (ও আমেরিকানদিগের) আস্তানা হিসাবে গঠন করিয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের জনসাধারণ অল্পশিক্ষিত ও দরিদ্র। তাহাদিগকে শোষণ করিয়া যাহারা সেই রাষ্ট্রে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিয়াছে তাহারা মানবশত্রু এবং স্বদেশদ্রোহী। এই সকল পাপাত্মাদিগের মধ্যে ভুট্টোর নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান যুগে যাহারা অর্থ ও প্রভুত্বলাভের জন্য যে কোন পাপ করিতে প্রস্তুত ভুট্টো তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান পাপী।

নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনার অধিকার

সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের কি কি বিষয়ের আলোচনা করিবার অধিকার আছে তাহা লইয়া কো[illegible]াই উঠিতে পারিত না যদি না, পাকিস্তানিগণ নিজেদের মিথ্যার বোঝা সকল ঘাটে নামাইবার চেষ্টা করিত। পরিষদ সংগঠিত হইয়াছিল যুদ্ধ থামাইবার জন্য। তাহার আলোচনার অধিকারও যুদ্ধ বন্ধ করিবার

কথা ও ব্যবস্থা লইয়া এবং তাহার নির্দেশ দিবার অধিকারও যুদ্ধ বন্ধ করিবার সম্বন্ধে। অর্থাৎ কোন আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইলে পর নিরাপত্তা পরিষদ বলিতে পারে "যুদ্ধ বন্ধ কর"। তৎপরে আলোচনা হইতে পারে যে কোথায় কি ভাবে কাহারা থাকিতে পারিবে অথবা কাহাকে কোথা হইতে সরিয়া যাইতে হইবে, এই জাতীয় কথার। যুদ্ধ কেন আরম্ভ হইল এবং যাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদিগের কোন ন্যায্য উপলক্ষ্য ছিল কি না প্রভৃতি কথার আলোচনা নিরাপত্তা পরিষদ করিতে পারে না। কে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল এবং কে শান্তি স্থাপনের পরেও যুদ্ধ-বিরতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে এই সকল কথা নিরাপত্তা পরিষদ বলিতে পারে ও আলোচনাও করিতে পারে। সুতরাং দেখা যায় যে, পাকিস্তানের যে কাশ্মীর দখল করিবার একটা (কাল্পনিক) অধিকার আছে বলিয়া আমেরিকা, ব্রিটেন ও পাকিস্তানে প্রচার চলিয়া আসিতেছে সে কথার আলোচনা নিরাপত্তা পরিষদে হইতে পারে না। যেখানেই মুসলমানের সংখ্যাগুরুত্ব আছে সেখানেই পাকিস্তান রাজ্য চালু হইবে একথাটি পাকিস্তানের কষ্ট-কল্পনার কথা। ইহার মধ্যে আইনের অথবা ঐতিহাসিক কোন সত্য নিহিত নাই। ভারতবর্ষে মুসলমান মাত্র শতকরা ২৫ জন ছিলেন ১৯৪৭ খ্রীঃ অব্দে। কিন্তু সেই ভারতবর্ষই ভাগ করিয়া এক দিকে পাকিস্তান গড়া হইল। সুতরাং সংখ্যাগুরু বা লঘু সে-কথা ইহার মধ্যে নাই। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব ছিল বলিয়া ইংরেজ ভারত যেমন খুসী কাটিয়া ভাগ করিয়া দিয়াছে। কাশ্মীর ভাগ করিবার বা দান করিবার অধিকার ইংরেজের ছিল না। সুতরাং কাশ্মীর কোন ভাবেই পাকিস্তানে সংযুক্ত হইতে পারিত না।

যদি বলা হয় যে কাশ্মীরের অধিকাংশ লোক মুসলমান, সুতরাং তাহা পাকিস্তানে যুক্ত হওয়া ন্যায্য। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, ন্যায়ের কোন নীতিতে ঐ জাতীয় কথার কোন মূল্য হয় না এবং রাষ্ট্রনীতি বা আন্তর্জাতিক আইনে ঐরূপ যুক্তি ন্যায্য বলিয়া মানে না। আফ্রিকার লোকেদের সংখ্যাগুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক ও জাতিগত সকল অধিকার থাকা সত্ত্বেও শ্বেতকায়গণ তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করে। তিব্বত দখল করিয়া চীন সেই দেশের সকল অধিবাসীর উপর রাজত্ব করিতেছে। স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এর লোকেদের স্বাধীনতা নাই। পাকিস্তান শ্বেত আফ্রিকান, চীনা ও ইংরেজের পদলেহন করিতে ঐ কারণে লজ্জা অনুভব করে না। ভারতেও ৬ কোটির অধিক মুসলমানের বাস কিন্তু তাহাদিগকে সকল রাষ্ট্রীয় অধিকার পূর্ণভাবে দেওয়া আছে; কারণ ভারত ধর্ম দেখিয়া অধিকার বণ্টন করে না। পাকিস্তানের এক কোটি অমুসলমানের প্রথমত কোন মান-সম্ভ্রম বা ঐ দেশে থাকিবার অধিকার নাই। প্রায় ৫০ লক্ষ লোককে পাকিস্তান অদ্যাবধি অত্যাচার ও লুঠ মারপিট বেইজ্জত করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া পালাইতে বাধ্য করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে পাকিস্তানের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইলে কোনও অন্যায় কথা হয় না। কোনস্থানে মুসলমানদিগের বাস বলিয়া সেই স্থানের উপর পাকিস্তানের কোন দাবি আছে একথা কোনও ন্যায়বান লোক মানিবে না। পাকিস্তান যে-সকল কথা বলিয়া নিজের দাবি পেশ করিবার চেষ্টা করে সে-সকল কথার মধ্যে ক্রমাগত প্লেবিসাইট বা জনমতের কথা বলা হয়। অপর দেশের লোক যদি কোন বিষয়ে জনমত জানাইতে চাহে, তাহা পাকিস্তানের গুপ্তচর, গুপ্তসেনা ও মিথ্যা প্রচারের জন্য করিতে হইবে একথা কেহ মানিবে না। কাশ্মীরে যাহা আছে তাহা ভারতের তথা কাশ্মীরের নিজস্ব কথা। পাকিস্তান বা নিরাপত্তা পরিষদের সেই সকল কথা উঠাইয়া আলোচনা করিবার কোনও অধিকার নাই এবং থাকিতে পারে না। আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীনের আন্তর্জাতিক গুপ্ত অভিপ্রায়সকলের ভারবাহী গর্দভ হিসাবে পাকিস্তানকে সম্মিলিত জাতি সংঘে গিয়া বারবার ডাক ছাড়িতে হইবে এবং বিশ্ববাসীকে, বিশেষ করিয়া ভারতের জনগণকে, সেই ডাক শুনিয়া তাহার জবাব দিতে হইবে, ইহা কোন ন্যায়ের কথা নহে। পাকিস্তান নিজ দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে অপর দেশে অনুপ্রবেশ চেষ্টা করিলেই তাহাদিগের মঙ্গল। কারণ আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীন সকল সময় উপস্থিত থাকিয়া পাকিস্তানকে রক্ষা না করিতেও পারে।

কাজ করে তাহাদিগের জ্ঞান অধিকক্ষেত্রেই কষ্ট-কল্পনার কথা মাত্র। যাঁহারা ধর্মপ্রচার, বাণিজ্য, চিকিৎসা বা অপর কিছু করেন তাঁহাদিগকেও ভারতের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। সর্বক্ষেত্র হইতে ব্রিটিশ বিদায় হইলে ভারতের মঙ্গল।

খাদ্যসঙ্কট

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ও পাকিস্তান গঠিত হওয়ায় অনেক উত্তম চাষের জমি পরহস্তগত হইয়াছে বলিয়া যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে না। বিগত কয়েক বৎসর ভারত বিদেশ হইতে অনেক খাদ্য আনাইয়া এই খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিয়াছে; কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তান-বন্ধু আমেরিকা ভারতকে চাপ দিবার জন্য খাদ্য সরবরাহে নিরুৎসাহ ভাব দেখাইতেছে। ইহাতে ভারত আমেরিকাকে জানাইয়াছে যে কম খাদ্য জুটিলেও ভারত আমেরিকানদিগের হুকুম তামিল করিতে প্রস্তুত নহে। এই কারণে ভারত সরকার নানান উপায়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই কার্য্য সকলের নিজের কার্য্য এবং ইহাতে সর্ব্বসাধারণের যোগ দেওয়া অবিলম্বে কর্তব্য। যেখানে জলের ব্যবস্থা আছে সেই সকল স্থানে এক কাঠা জমি থাকিলেও তাহাতে কিছু-না-কিছু লাগান প্রয়োজন। ডাল, শিম, বরবটি, আলু, পেঁয়াজ, শাক, মটর, ছোলা, যব, গম, লাউ, কুমড়া, পটল, ঝিঙা, লেবু অথবা যাহা এই সময়ে লাগান যায় তাহাই লাগান চাই। এই কার্য্যে সকলে হাত লাগাইলে নানা প্রকার খাদ্যবস্তু উৎপাদিত হইয়া আমেরিকান গমের অভাব দূর করিবে। যেখানে পুকুর আছে সেখানে সেই সকল জলাশয় পরিষ্কার করিয়া তাহাতে মৎস্য ছাড়া দরকার। এখন ছোট ছোট মৎস্য ছাড়িলে সেগুলি পাঁচ-ছয় মাস পর হইতেই কাজে লাগিবে। এই কার্য্য গ্রামদেশের প্রবীণদিগের মিলিত চেষ্টা থাকিলে সফল হইবে। যাঁহারা হাঁস-মুরগী পালন করিতে অনিচ্ছুক নহেন তাঁহারা বাড়ীর ছাদেও মুরগী রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। খাইবার অভ্যাস কিছু কিছু পরিবর্তন করিলেও লাভ আছে। যথা, আটার সহিত লাল আলু বা অপর তরকারি মিলাইয়া রুটি বানাইলে আটা বাঁচান সম্ভব হয়। যব ভাজাইয়া তাহা সিদ্ধ করিলে ভাতের মত খাইতে হয়। চালের সহিত মিলাইয়া লইলে পরিমাণে বাড়ে কিন্তু বিশেষ স্বাদের পার্থক্য হয় না। চাউল ও আটা না খাইয়া অপর খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ অসম্ভব নহে। এই বিষয়ে সকলের নিজ নিজ রুচি অনুসারে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

নিরাপত্তার আয়োজন

পাকিস্তানের সহিত সংঘাত যদিও স্বাধীনভাবে হইতে পারিত তাহা হয় নাই, ইহা ভারতের জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর হইয়াছে। পাকিস্তানের শক্তি অতি শীঘ্র খর্ব করিয়া দিবার গৌরব ভারতের সেনাপতি ও সেনাদিগের। তাঁহারা নানা প্রকার অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের শৌর্য্য দিয়া সেই সকল অভাব দূর করিয়া লইয়া যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া ভারতের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে এই যুদ্ধজয় একটি গৌরবময় অধ্যায় যোগ করিয়াছে। পাকিস্তানের এই যুদ্ধে পূর্ণ পরাজয়ই ঘটিত, যুদ্ধ যদি তাহার শেষ পরিণতি অবধি চলিতে দেওয়া যাইত। কিন্তু পাকিস্তানের সকল অপরাধ ঢাকা দিয়া পাকিস্তান-বন্ধু আমেরিকা ও ব্রিটেন যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন যখন পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চয় বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। যতক্ষণ জয়ের আশা ছিল ততক্ষণ কিন্তু এই শান্তির চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। সে যাহা হউক, পাকিস্তানকে ছাড়িয়াও ভারতের অপর শত্রু আছে। চীন ভারতকে আক্রমণ করিতে পারিলে ছাড়িবে না। এই কারণে আমাদিগের প্রতিরক্ষার কার্য্যে ঢিলা দিলে চলিবে না। বড় বড় সহরে বোমা বর্ষণ হইলে বহু লোকের প্রাণ যায়; সেই জন্য

২

যুদ্ধ ঘটিলে উচিত সহরগুলি হইতে যথাসম্ভব নারী ও শিশুদিগকে বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া। দুঃখের বিষয়, এইদিকে কেহ মন দিতেছেন না। বড় বড় সহরের বাসিন্দাদিগের উচিত, যুদ্ধ হইলে একটা দূরে গিয়া থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া রাখা। অল্পব্যয়ে বাহিরে ছোট ছোট গৃহ নির্ম্মাণ ব্যবস্থা করিতে পারিলে আরও উত্তম হয়। সেই সকল গৃহ যুদ্ধ না হইলেও ছুটির সময় গিয়া থাকিবার কার্য্যে লাগিয়া যায়। সহর ত্যাগ করিয়া কত শীঘ্র কিভাবে লোকে বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে তাহারও পরিকল্পনা স্থির হইয়া থাকা প্রয়োজন। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিলে বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ হয়।

স্বাধীনতা রক্ষা

স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য বহু বাঙ্গালী একসময় প্রাণ দিয়াছিলেন। আরো অনেক অধিক সংখ্যায় তাঁহারা কারাবরণ করিয়াছিলেন। বালেশ্বরে, চট্টগ্রামে ও অপরাপর ক্ষেত্রে বাংলার সন্তান দেখাইয়াছিল যে সে প্রাণ দিতে পারে, যুদ্ধকর্ম্ম ও বীরত্ব তাহার মধ্যে পূর্ণরূপেই আছে। প্রথম মহাযুদ্ধে বহু বাঙ্গালী বিভিন্ন সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিলেন। ফ্রেঞ্চ ফরেন লীজন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে সকল জাতি যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগের সৈন্যদলেও বাঙ্গালী যোদ্ধা অনেক সংখ্যায় ছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী যোদ্ধাগণ বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীতে দলে দলে যোগ দিয়াছিলেন। পদাতিক দলেও অনেকে ছিলেন। পূর্ব্ব সীমান্তে চীন আক্রমণের সময় অনেক বাঙ্গালী বীর আত্মদান করিয়াছিলেন ও কয়েকজন সেনাপতি অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য উল্লিখিত হইয়াছিলেন। পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে পদাতিক ও বিমান বাহিনীতে অনেক বাঙ্গালী প্রাণ দিয়াছেন, গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন ও নির্ভয় সাহসে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রথম যুগে বাঙ্গালী স্বাধীনতা পাইবার জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। এখন স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য যুগে যুগে আত্মদান করিতে হইবে। খাটে শুইয়া বহুদিন রোগভোগ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বিলাপ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় কোন গৌরব বা শত্রু-নিপাত করিতে গিয়া মরণালিঙ্গনের মাদকতা নাই। সৈন্যদলে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য এত উত্তমরূপে গড়িয়া উঠে যে তাঁহাদিগের রোগভোগের সম্ভাবনা অল্পই থাকে। যুদ্ধের উন্মত্ত আবেগে অগ্রসর হইতে গিয়া কোন কোন বীরের মৃত্যু হইতে পারে; কিন্তু সে মৃত্যু বীরপুরুষের প্রাণে অপরূপ পুলক জাগাইয়া দেয়। বীরের নিকটে মৃত্যু প্রিয় এবং শ্রেয়। যুদ্ধ করিতে যাঁহারা যান তাঁহাদিগের মধ্যে অল্পলোকেরই মৃত্যু হয়; কিন্তু মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার আনন্দ ও গৌরব সকলেই পাইতে সক্ষম হন।

আফ্রিকা

আফ্রিকার আদিম মানবের উপর তথাকথিত সভ্য মানবের অত্যাচার পুরানো কথা। শত শত বৎসর ধরিয়া "সভ্য" মানুষ আফ্রিকার নরনারীর উপর যে অমানুষিক বর্ব্বরতার অভিযান চালাইয়া আসিয়াছে তাহার কলঙ্কময় কাহিনী মানব ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা পঙ্কিল করিয়া রাখিয়াছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি বিষয়টি বুঝিতে সাহায্য করে :—

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
কালো অবগুণ্ঠনের তলে
আছিলে অপরিচিতা তব প্রতিবেশিনীর কাছে।
রূপদোদ্ধত ইয়োরোপ
দস্যু বেশে গিয়েছিল দীপহীন তোমার প্রাঙ্গণে—
তোমার বক্ষের 'পরে চালায়েছে রথ,

যেখানে বেদনাভরা মানব হৃদয়
তরুচ্ছায়ে ছিল প্রসারিত।
সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করেছিল অন্ধকারে
নির্লজ্জ অমানুষিকতা।
অশ্রু তব রক্ত-সাথে মিশে
ভাষাহীন ক্রন্দনের পথ
দিয়েছে পঙ্কিল করি—
দস্যুপদপাদুকার তলে
অশুচি কর্দম সেই
চিরচিহ্ন দিয়ে গেছে তোমার দুর্ভাগ্য ইতিহাসে॥

আজ আবার রোদেশিয়ার "স্বাধীনতা" প্রচেষ্টার ফলে আফ্রিকার আদিম মানবকে বহু অপমান ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া রোডেশিয়া এখন সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে। অর্থাৎ সংখ্যালঘু কৃষ্ণকায়দিগের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য তাহারা রাষ্ট্রনীতি-বিরুদ্ধ কোন দুর্নীতি তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া দুই লক্ষ শ্বেতকায় ৩২ লক্ষ আফ্রিকানের দমন ও শোষণ ব্যবস্থা করিবে। ব্রিটেন অসহায়! সম্মিলিত জাতি সংঘের দরবারে নালিশ পেশ করিয়াছে!

প্রাচীন ভারতে সাম্য প্রচেষ্টা

অনেকের ধারণা যে জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণদিগের উচ্চ পদমর্য্যাদা ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে সকলেই অকাতরে মানিয়া লইয়া চলিতেন। পরে মুসলমানদিগকে দেখিয়া, তাহাদিগের অনুকরণে ভারতবাসীরা সমাজে সাম্য ও মৈত্রী আনয়ন চেষ্টা করেন। এই জাতীয় কথা, যাহারা বলেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্ত্তিত হইলে পর ও তৎপূর্ব্বেও ব্রাহ্মণদিগের সমালোচনা ও তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার লইয়া ব্যঙ্গ করা ভারতীয় সাহিত্যে অনেকস্থলেই দেখা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায় ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণা গ্রহণ, সোম রস পান ও অতি-ভোজন দোষ আছে বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রয়োজন হইলে বহিষ্কৃত করা যাইতে পারে। অশ্বঘোষ লিখিত বজ্রসূচীতে ব্রাহ্মণদিগের সমালোচনা আছে দেখা যায়। বৌদ্ধযুগে চার বর্ণের উল্লেখ করিলে প্রথমে ক্ষত্রিয়ের নাম করা হইত। ক্ষত্রিয়দিগের প্রভাব যে সময়ে ও স্থানে প্রবল থাকিত সেই স্থান ও কালে ব্রাহ্মণদিগকে দমন করিয়া রাখা হইত এবং ব্রাহ্মণ প্রবল হইলে ক্ষত্রিয়ের দমন হইত। পরশুরামের উপাখ্যান এই জাতীয় দ্বন্দ্বের উপরেই গঠিত। মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে যে সকল যবন, শক ও পহ্লব প্রভৃতি বিদেশীরা ভারতে আসিত তাহারা হিন্দুজাতির অন্তর্গত হইয়া যাইত। ক্ষত্রিয়দিগের রীতিনীতি অনেকটা পরিবর্ত্তনশীল ছিল। বৈশ্যদিগের বহু সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা বৌদ্ধযুগে প্রচলিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইবার কথাও বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানে রহিয়াছে। সুতরাং মুসলমান আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই জাতিভেদের ও ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্যের প্রতিকার চেষ্টা হিন্দু সমাজে হইয়া আসিয়াছে। বৌদ্ধযুগে জাতিভেদ প্রায় লোপ পাইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃ প্রচলন হইলে পরে বৌদ্ধদিগের অবস্থা খারাপ হয়। পূর্ব্ববঙ্গে বহু বৌদ্ধ মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। ইহার কারণ তাহারা পূর্ব্ব হইতেই জাতিভেদ না মানিয়া চলিত এবং আচার-ব্যবহারেও তাহারা সনাতন হিন্দুদিগের মত ছিল না। মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবার অন্য কারণ তাহারা কিছু দেখিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

নারী প্রগতির কথা

প্রাচীন ভারতে নারীদিগের স্থান খুবই উচ্চে ছিল। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী, খনা প্রভৃতি মহামানবীদিগের নাম পৃথিবী সভ্যতার ইতিহাসে লিখিত হওয়া উচিত। গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের বিদ্যার ক্ষেত্রে ভারতের নারীদিগের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরাপর সভ্যতায় ঐরূপ তুলনীয় রমণী কাহাকেও দেখা যায় না। ভাস্কর্য্যে নারীদিগের কার্য্যের বিবরণ মন্দির নির্ম্মাণ শিল্পের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যন্ত্রসঙ্গীতের দেবী বীণাপাণি ও যন্ত্রসঙ্গীতে, কণ্ঠসঙ্গীতে, নৃত্যে ও অভিনয়ে ভারতীয় নারীদিগের স্থান অতি উচ্চেই ছিল। মুসলমান আগমনের পরে মুসলমানদিগের অনুকরণে অবরোধ প্রথা হিন্দুগণ উত্তর ভারতে অবলম্বন করেন এবং নারী প্রগতি ইহাতে বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। মধ্যবিত্ত সমাজে বয়নশিল্প প্রভৃতি নারীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু অবরোধ প্রথা ইত্যাদি সমাজে বাধার সৃষ্টি করায় ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান মুঘল যুগের সময় হইতে অবনত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে বলা চলে যে, সভ্যতা ও সামাজিক উন্নতির দিক হইতে ভারতে মুসলমান আগমনের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কুফল ফলিয়াছিল। বর্ত্তমান ভারতে নারীদিগের অধিকার পুরুষদিগের সহিত সমান সমান। নারীগণ সর্ব্বকার্য্যে যোগদান করিতে পারেন। শিক্ষায়, কর্ম্মকুশলতায় ও রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ক্ষেত্রে ভারতনারী পুরুষদিগের পশ্চাতে পড়িয়া নাই। পাকিস্তানে সেরূপ কথা বলা যায় না। নারীদিগের প্রতিষ্ঠা ভারতের তুলনায় অনুন্নত। অবরোধ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থার অভাব, পুরুষদিগের বহুবিবাহের অধিকার ইত্যাদি নানা প্রকার নারী-প্রগতি-বিরুদ্ধ অবস্থা পাকিস্তানে লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত পূর্ব্ব পাকিস্তানে নারী-স্বাধীনতা কিছু অধিক আছে এবং তথাকার নারীগণ শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অগ্রগামিনী। মানব সভ্যতার বিচারে নারীদিগের মর্য্যাদা, স্বাধীনতা ও প্রগতির কথা বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক। এই দিক দিয়া দেখিলে পাকিস্তানের অবস্থা অনুন্নত এবং ভারত তথা ভারতবাসী কাহারও পাকিস্তানের নিকট শিখিবার বিশেষ কিছু নাই।

সংস্কৃত ভাষা

ভাষার ভাবপ্রকাশ ক্ষমতা দিয়া ভাষার গুণ বিচার হয়। কথার অর্থ যদি স্থির নির্দ্দিষ্ট হয় এবং নূতন নূতন ভাব সমন্বয় করিলে যদি শব্দ ও ব্যাকরণ উপযুক্ত হয় তাহা হইলে ভাষার ঐশ্বর্য্য অসীম ও চিরস্থায়ী হয়। সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সমৃদ্ধি ও ব্যাকরণ-মাহাত্ম্য অতুলনীয় এবং সেই কারণে এই ভাষাকে প্রাচীনগণ দেবভাষা আখ্যা দিয়াছিলেন। এখনও যদি এই ভাষা যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহার ব্যবহারে সকল কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে এবং ভাব প্রকাশের জন্য এই ভাষার সমকক্ষ অপর ভাষা নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতগণ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা ও সেই সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টিকলার চর্চ্চা আরম্ভ করেন। ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, কাব্য ও বিভিন্ন বিষয়-সংক্রান্ত শাস্ত্রাবলী এই দেবভাষা ও ইহার ব্যাকরণের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতগণের মতে সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন ভাষার লেখনে ধ্বনি সংক্রান্ত নিখুঁতভাব লক্ষিত হইত না। গ্রীক, ল্যাটিন বা আরব ভাষার লেখন পদ্ধতি উপযুক্ত শব্দ ও ধ্বনিজ্ঞাপক অক্ষরের অভাবে উচ্চারিত ধ্বনি স্থির নির্দ্দিষ্টভাবে লেখায় ব্যক্ত করিতে পারিত না। সংস্কৃত জ্ঞান ও সংস্কৃত অক্ষরমালার সহিত পরিচয়ের ফলে Phonetics বা ধ্বনিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টি একান্তভাবে সংযুক্ত। প্রাকৃত ভাষাগুলি ও তাহার সাহিত্য ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কারণে সংস্কৃত ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া ভারতের কোন ভাষা বা সাহিত্য চর্চ্চা চলিতে পারে না। বর্ত্তমানে যেভাবেই ভারতীয় সভ্যতার অন্তরের সং-জ্ঞাত হইবার চেষ্টা হইবে, সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ সর্ব্বাগ্রে সেই ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িবে। সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, নাটক, গল্পসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে ভারতের যে অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এবং নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে ভারত কৃষ্টির ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল জাতির সমকক্ষ ছিল। যে সকল সামরিক জাতি ভারতের উপর মধ্যযুগে আক্রমণ করে, তাহারা প্রধানত লুঠপাট করিয়া নিজেদের লালসা চরিতার্থ করিত। মন্দির ভাঙ্গা, পুস্তকাগার জ্বালান প্রভৃতি সভ্যতা-বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য তাহারা প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের কোনও উপকার তাহাদিগের দ্বারা হয় নাই। তাহার কারণ উচ্চাঙ্গের সভ্যতা ও কৃষ্টি তাহাদের ছিল না।

বাঙালীর সাহিত্য-সাধনায় শেক্সপীয়ার

শ্রীমীরা রায়

বাঙালী জাতির ভাবপ্রবণতা দোষ যতই থাকুক না কেন, এর গুণগ্রাহিতা ও রসবেত্তা চিত্তের সর্বাধুনিক পরিচয় পাওয়া গেছে শেক্সপীয়ার তর্পণে। পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির সঙ্গে ভারতে তথা বাংলা দেশে শেক্সপীয়ার জন্ম চতুর্থ শতবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে, বাঙালী তার সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সর্বাধিকভাবে শেক্সপীয়ারের স্মৃতিপূজা করে এসেছে। শুধু আজ বলে নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক তরী বেয়ে শেক্সপীয়ারের এদেশে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই অনন্ত-কীর্তি পুরুষকে বাঙালীর রসপিপাসু চিত্ত সাদরে গ্রহণ করেছে নিজের অন্তরে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে ও জাতীয় সংস্কারের প্রতিটি অনুশীলনে। সাহেবী কুর্তা গাউন ছেড়ে শেক্সপীয়ার বাঙালীর সাহিত্যের ভোজসভায় বাঙালীর ধুতিচাদরে বাঙালীরই একজন হয়ে আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন, সংবর্ধিত হয়ে গেছেন, বাংলার সাহিত্য-জীবনে অভ্যাগতভাবে মিশে গিয়েছেন। তাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন প্রথম এদেশে তাঁর পরিচয়-পত্র নিয়ে এল তখন বাংলার সাহিত্য-চাকের মৌমাছির দল অবিলম্বে তাঁর রসভাণ্ডারে গিয়ে হানা দিল।

প্রায় দুশো বছর আগে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার বাণিজ্য সম্পদ পূর্ণ করে নিতে এল বাংলায়, তখন তার লেনদেনের কারবারে নিয়েও গেল যেমন প্রচুর, দিয়েও গেল ততোধিক পরিমাণে। সে-যুগ বাংলা সাহিত্যে নব জাগরণের যুগ—এ জাগরণের হোতাগণ প্রবল হৃদয়াবেগে উজ্জীবিত ছিলেন, এবং এই হৃদয়াবেগের দৃঢ় অনুভূতি দিয়ে তাঁরা বিভিন্নভাবে শেক্সপীয়ার চর্চা করে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করে গিয়েছেন। তৎকালীন সাহিত্যিক ও সাহিত্য-পিপাসুগণ তাঁদের সেই হৃদয়াবেগের সব অনুভূতি খুঁজে পেয়েছিলেন এই মহাসাহিত্যরথীর প্রবল আবেগসম্পন্ন সাহিত্য-সৃষ্টিতে। ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগে—সাহিত্যে নব-জাগরণের কালে, শেক্সপীয়ারের আবির্ভাব ঘটে। এই সময়কার সাহিত্য মানবতার জয়গান ও স্বীকৃতিতে নবোন্মেষে আত্মপ্রকাশ করেছিল—মানবীয় হৃদয়বৃত্তির প্রবল প্রতিক্রিয়ার আবেগে সাহিত্য জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, শেক্সপীয়ারের সাহিত্য সাধনায়ও এর প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। এই প্রাবল্যের জোয়ারে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ভাবাবেগসম্পন্ন বাঙালী-চিত্তও প্লাবিত হয়েছিল। ইংরাজ জাতিকে আমরা প্রথম জানলাম তাদের বাণিজ্যিক সংস্থার মাধ্যমে, ভারতের সভ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনায় অলক্ষ্যে তার বৈশ্যবর্ণের অবস্থিতি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। ইংরাজ তার ভাব-ভাষায় নতুন করে জন্ম দেয় সে-যুগের নব্য ভারতীয় সমাজে। ইংরাজকে জানবার আগ্রহে বাঙালী ইংরাজী শিখল এবং এইভাবে শেক্সপীয়ারও ক্রমে ক্রমে বাঙালীচিত্তে প্রবেশ করলেন।

পরবর্তী যুগে শাসকের জাতি হিসাবে ইংরাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় তথা বাঙালীসমাজ একান্ত আপনার করে গ্রহণ করেছিল, এর মধ্যে পরাধীনতার দাসত্ব বৃত্তিটা যতটা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল সাহিত্য-শিল্পের ভাবানুভূতি ও রসগ্রাহিতা চিত্তের উৎকর্ষতা। নানা জায়গায় নাট্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাঙালী শেক্সপীয়ারের কীর্তিকে ব্যাপ্তিতে বরণ করল। বাঙালীচিত্ত বরাবরই নাট্যপিপাসু, এই নাট্যশালার সিংহদ্বার দিয়ে শেক্সপীয়ার অতি সহজেই আপামর বাঙালীহৃদয়ে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কলেজে ইংরাজ অধ্যাপকগণ বাঙালী ছাত্র দ্বারা প্রায়ই শেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয় করাতেন এবং বাঙালী ছাত্রদের শেক্সপীয়ারের রচনাগুলো কলেজ-পাঠ্য হিসাবে অধ্যয়ন করানো হত। বাংলার ছাত্রজীবনে শেক্সপীয়ার সাহিত্য মুখ্যস্থান দখল করল এবং ছাত্র-সমাজে ও সাধারণের মাঝে তাঁর নাটকের নাট্যানুষ্ঠানের বহুল প্রচলনে সেযুগে শেক্সপীয়ার চর্চা প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হতে লাগল। এজন্য দেখা যায় বাংলার

সাহিত্যক্ষেত্রে শেক্সপীয়ারের সনেট ও অন্যান্য রচনাগুলি অপেক্ষা নাটকগুলোর সমধিক চর্চা হয়ে এসেছে, এদের ভাবসম্পদ অভিনয়ের আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বস্তরের জনগণের অন্তরে পৌঁছে গিয়েছে।

শেক্সপীয়ার সাহিত্যানুসন্ধানীর কাছে বিশেষ কোন যুগের বা বিশেষ কোন শ্রেণীর নন, তিনি সর্বযুগের মানুষ এবং সমস্ত শ্রেণীর মানুষের একটি সর্বপ্রবৃত্তিসম্পন্ন পরিপূরক রূপ, দেশ কাল পাত্রের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে মহাকবির এই সনাতন রূপটি বাঙালী আবিষ্কার করে তার সাহিত্যোপাসনার উপাস্য দেবতার অন্যতম আসনে চির প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে—এর সমুজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে বাংলা সাহিত্যে ক্রমিক শেক্সপীয়ার অনুশীলনে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়ারের বিশিষ্টতা উল্লেখ করে বলেছেন, 'শেক্সপীয়ারে একটা উচ্চ দর্শন-শিখর আছে, যেখানে থেকে মানব-প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।' ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হিন্দু কলেজের ছাত্ররা মার্চেন্ট অফ ভেনিসের কয়েকটি দৃশ্য অভিনয় করে, অধ্যাপক রিচার্ডসন শুধু অভিনয় করিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর অপূর্ব অধ্যাপনার গুণে শেক্সপীয়ার সাহিত্য গোটা ছাত্রসমাজে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুধু অধ্যয়ন-জগতেই শেক্সপীয়ার বন্দী হয়েছিলেন, মূলত ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর রচনার ব্যাপক অনুশীলন আরম্ভ হয়। গোড়ায় ছাত্ররা নিছক পাঠ্যানুশীলনের জন্য শেক্সপীয়ার অনুবাদ করত, এ বিষয়ে ছাত্ররাই সর্বপ্রথম অগ্রণী হন। তাঁরাই প্রথম Tempest-এর বঙ্গানুবাদ করেন। এইভাবে পরবর্তী শেক্সপীয়ার চর্চার যুগের সূচনা হয়। ইংরাজ লেখক চার্লস্ ল্যাম্ব্ শেক্সপীয়ারের মূলরচনা থেকে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন, বাংলাভাষায় প্রথমে সেগুলির অনুবাদ চলতে থাকে। তবে বাংলাভাষায় শেক্সপীয়ারের রচনাগুলি বঙ্গানুবাদ অথবা ভাবানুবাদ যাই করা হ'ত, সেগুলিকে নাম, ধাম, পাত্র-পাত্রী, দেশ কাল পরিবেশ ইত্যাদিতে বাঙালিয়ানা ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলি সম্পূর্ণ এদেশীয় করে তুলে প্রকাশ করা হ'ত, খাঁটি ইংরাজ-তনয়া বাঙালী বধূর সজ্জায় অন্নপূর্ণা হয়ে সাহিত্যভোজে রস বিতরণ করতেন—সে রসে বিলাতী মাদকতার ঝাঁঝ ছিল না, ছিল দেশী মিষ্টতার মনোরম আবেশ। বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষই সর্বপ্রথম শেক্সপীয়ারের রচনার ভাবানুবাদ করে বাংলা নাটক রচনা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী চর্চার ব্যাপকতা লাভ করায় বহু সাহিত্যিক শেক্সপীয়ারের সাহিত্য রচনার ওপর অনুশীলন আরম্ভ করেন। এই সময়কার সকল নাট্যকারদের ওপর শেক্সপীয়ারের প্রভাব গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই দেখা যায় মধুসূদন, গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ শেক্সপীয়ারের প্রভাবমুক্ত নন। এই ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই শেক্সপীয়ার বাংলা সাহিত্যে স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন।

বাংলা সাহিত্যে শেক্সপীয়ারকে নিয়ে বাংলার বিদগ্ধ-মহল যেভাবে আলোচনা বা চর্চা করে গেছেন তার ভাব ও ধারা বিচার করতে গেলে দেখা যায় এই সাহিত্য-চর্চা তিন শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি এবিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, 'মোটামুটি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর (শেক্সপীয়ারের) যোগাযোগ তিনভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম মহাকবির রচনার অনুবাদ, দ্বিতীয় মহাকবির উপর রচনা, তৃতীয় মহাকবির রচনার প্রভাবে প্রভাবিত রচনা'। খ্যাতনামা বা অখ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ কেউ কেউ শেক্সপীয়ার রচনার যথার্থ বঙ্গানুবাদ করেছেন, কেউ কেউ আবার মূল রচনার মূলগত ভাব বজায় রেখে পাত্রপাত্রী, দৃশ্য স্থান কাল ইত্যাদি সব কিছুর পরিবর্তন করে বঙ্গজন-চিত্তোপযোগী বাংলা নাটক রচনা করে গেছেন। মহাকবির প্রভাবে সে-যুগের শক্তিশালী নাট্যকারগণ যেসব নাটক রচনা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান চরিত্রের উপাদান পেয়েছেন কিংলিয়ারের চরিত্র থেকে, ক্ষীরোদ-প্রসাদ 'ভাগাবাজী' নাটক রচনা করেছিলেন শেক্সপীয়ার রচনার ভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে, গিরীশচন্দ্র ম্যাকবেথের যথার্থ বঙ্গানুবাদ করে বাংলা নাটক রচনা করেন এবং মধুসূদন সর্বপ্রথম শেক্সপীয়রীয় রীতি অনুসরণ করে তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটকে, মধুসূদনের পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী নাটকে শেক্সপীয়ার অনুসৃত সুগভীর ট্র্যাজিক বেদনা থেকে উদ্ভূত শোক ও অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনের কলাকৌশল বাংলা নাটকে নব্যপথের দিশারী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন বাংলা নাটকে যে পাশ্চাত্য ভাবধারার আমদানী করেছিলেন তার বহুলাংশ শেক্সপীয়ারের নাট্যাবলীর রচনাদর্শের অনুপ্রেরণাসমূত। শেক্সপীয়ার তাঁর সব নাটকে প্রধানতঃ সর্বপ্রকার মানবিক চেতনার স্বীকৃতি দান করে এসেছেন, সকল ধর্মের সার কথা এই যে,'মানুষকে' স্বীকার করা এর সার্থক রূপ যেমন সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্য-জগতে

মাধ্যমে তেমনি বাংলা নাটকেও মাইকেল এই ভাবধারার প্রথম আমদানী করলেন মূলতঃ শেক্সপীয়ারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়ার রচনার Comedy of Errors-এর ভাবানুবাদ বাংলায় প্রকাশ করেন 'ভ্রান্তিবিলাস' নামে বাংলা নাটক লিখে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এর জন্ম হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়ারের নাটকের মূলগত ভাব বজায় রেখে আর সব কিছু পরিবর্তন করে এটিকে একটি নিছক বাংলা নাটক হিসাবে জন্ম দিয়েছিলেন, এর জন্য মূল নাটকের humourous tone অর্থাৎ ব্যঙ্গাত্মক রসের আমদানী কিছু ব্যাহত হয়নি। বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত উক্তি ভবিষ্যৎ পাঠক-সমাজের কাছে দিয়ে গেছেন। শেক্সপীয়ার পঁয়ত্রিশখানা নাটক রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন এমন নহে, এ পর্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে। বাংলায় শেক্সপীয়ার চর্চায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শেক্সপীয়ারের সিম্বেলিন অবলম্বনে রচনা করেন 'সুশীলা বীরসিংহ' নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থ বঙ্গানুবাদ করেছেন জুলিয়াস সীজার নাটকের। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গানুবাদ অথবা ভাবানুবাদ উল্লেখযোগ্য কিছু করেননি কিন্তু শেক্সপীয়ারের সাহিত্য রচনার ব্যাপক আলোচনা, কবিবন্দনা, তাঁর উদ্দেশ্যে কাব্যরচনা ইত্যাদি করে শেক্সপীয়ারের সঙ্গে বাঙালী-চিত্তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনায় এক নব্য ধারা প্রবর্তন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ এক কথায় শেক্সপীয়ারের বিরাটত্বকে সহজ সরলভাবে বর্ণনা করেছেন, 'শেক্সপীয়ারে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষকে নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেক্সপীয়ার তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অনাবৃত করে দিয়েছেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে হঠাৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্ছে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে কেবল মুক্তাদন্তগুলিকে বিকাশ করছে না, কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মত অবাধে বয়ে আসছে…তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শন-শিখর আছে, যেখান থেকে মানব-প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।' শেক্সপীয়ারের রচনার মধ্যে কোন একটা তাঁর বিশেষত্ব খুঁজে বার করা কঠিন এইজন্য যে, তাঁর সেটা অত্যন্ত বৃহৎ ও ব্যাপক। তাঁর রচনাশৈলীতে বিশেষ কোন সমাজদর্শন খুঁজে বার করা কঠিন, কারণ তাঁর রচনায় পাত্রপাত্রী নির্বিশেষে সমদর্শিতা গুণ সর্বত্র পরিস্ফুটমান, শেক্সপীয়ারের এই মহত্তম প্রতিভার সম্যক্ উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ উপরি উক্ত মন্তব্য করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় ম্যাথু আর্নল্ডএর একটি উক্তি স্মরণ করে ঐ মন্তব্য করতে নিঃসংশয় হয়েছিলেন—

"For the loftiest hill who to the star
uncrowns his majesty,
Planting his steadfast footsteps in the sea,
Making the heaven of heavens his
dwelling place…

শেক্সপীয়ারের এই ভাবেরই বাংলারূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কৈশোরে তিনি তাঁর অধ্যাপকদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, কিন্তু ঐ রচনাটি হারিয়ে যাওয়ায় পরবর্তী যুগে এটির কোন সাহিত্যিক অবদান হিসাবে স্বীকৃতি নেই। শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কবির বাণী এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"ইউরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়-প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া স্বরূপে রেনেসাঁসের যুগ আসিয়াছিল, শেক্সপীয়ারের সমসাময়িক কালের নাট্য-সাহিত্যে সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা।" শেক্সপীয়ারের রচনায় কবি 'হৃদয়াবেগের প্রাবল্যই' খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু শেক্সপীয়ারের রচনার যুগোত্তীর্ণ মানবিক আবেদন ও মহাকবির লোকোত্তর বিশিষ্টতা, এবং বাংলা নাট্য সাহিত্যে শেক্সপীয়ারের রচনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রবীন্দ্রনাথের কাছে অনস্বীকার্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে যে শেক্সপীয়ার রচনায় 'হৃদয়াবেগের প্রাবল্য'ই শুধু খুঁজে পেয়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে গভীর জীবনদর্শন জ্ঞানলাভ করবার পর তাঁর সেই সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে, তিনি মহাকবির প্রগাঢ় প্রজ্ঞার সম্যক্ উপলব্ধি করে সমগ্র ভারতবাসীর মুখপাত্র হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন—

"যেদিন উদিলে তুমি বিশ্বকবি দূর সিন্ধু পারে
ইংলণ্ডের দিক প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে ভেবেছিল তুমি বুঝি তার
কেবল আপন ধন··)

তারপর ধীরে ধীরে অন্তরের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছ দীপ্ত জ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া ; তাই হের যুগান্তর শেষে
ভারত সমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেল কুঞ্জে তব জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।"

ঠাকুর পরিবার ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন বাংলার যশস্বী সাহিত্যরথী শেক্সপীয়ার চর্চা করে গেছেন অথবা তাঁর প্রভাব স্বীয় রচনায় পরিস্ফুট করে গেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম অগ্রাধিকার দাবি করতে পারে। বঙ্কিমের কাব্যধর্মী রোমান্টিক সাহিত্য-চিন্তা শেক্সপীয়ারের মধ্যযুগীয় রোমান্টিক ভাবকল্পনার রসে পুষ্টিলাভ করেছিল। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার মধ্যে দেখতে পাই। প্রকৃতিপালিতা মিরাণ্ডাকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার আরণ্যক জীবনকে রূপায়িত করেছিলেন। শেক্সপীয়ারের প্রভাব বঙ্কিমের এ রচনায় সুস্পষ্ট। শেক্সপীয়ার সেই যুগোপযোগী যে অতি-প্রাকৃত শক্তি ও ঐশী রহস্যের কল্পনাশ্রয়ী সংযোজন ক্ষমতা তাঁর নাটকে সন্নিবেশিত করেছিলেন, অনুরূপ কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্য-সৃষ্টি বঙ্কিমের রচনাশৈলীর অন্যতম সম্পদ। প্রকৃতি মানবচারণে যে কাব্যরূপের বসসঞ্চার করে শেক্সপীয়ারের এই ভাবধারাই বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার বন্য জীবনে এক মহাবিষাদময় কাব্যের সৃষ্টি করে। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়ারকে ভারতীয় কাব্য-কলার বিচারে সমালোচনা করতে গিয়ে ভারতের অন্যতম কবি কালিদাসের সঙ্গে শেক্সপীয়ারের তুলনামূলক যে আলোচনা করেছেন সেটিও বঙ্কিমের শেক্সপীয়ার চর্চার ওপর এক বিশেষ আলোকপাত করে।

অন্যান্য শেক্সপীয়ার অনুরাগী বাঙালী সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কাব্যের ছন্দের মধ্য দিয়ে বাংলায় রোমিও ও জুলিয়েটের অনুবাদ করেছেন এবং নামধাম পরিবর্তনে সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে টেম্পেষ্ট নাটকটির বাংলায় রূপান্তর করেন নলিনী বসন্ত নামে। নাট্যকার ও কবি গিরীশচন্দ্র ঘোষের ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ একটি সার্থক রূপায়ণ, বাংলার রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটি প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আগে অল্প সংখ্যক ইংরাজী-জানা ব্যতীত সাধারণ লোক শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, কিন্তু এই শেক্সপীয়ার রচনার ভারতীয়করণ, বঙ্গানুবাদ তাঁর রচনার নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদির দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণ অতি ঘনিষ্ঠভাবে মহাকবিকে লাভ করেছিল—এদেশের স্থান-কাল পাত্র-পাত্রীদের দিয়ে শেক্সপীয়ারের ভাব ও কাহিনীর মিলন-প্রচেষ্টাই বাঙালীর শেক্সপীয়ার সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রবীণ বাঙালী সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কয়েকটি শেক্সপীয়ার রচনার বঙ্গানুবাদ করে বর্তমান শতকের শেক্সপীয়ার তর্পণকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি As You Like It-এর বঙ্গানুবাদ করেন 'মনের মতন' নামক নাটকের মধ্যে, Measure for Measure এর অনুবাদ করেন 'রীতিমত' নামক নাটক লিখে, মার্চেণ্ট অফ ভেনিসের এবং সিম্বেলিনের যথার্থ বঙ্গানুবাদ করেন এবং Two Gentlemen of Verona-র অনুবাদ করেন 'ভেরোনার ভদ্রযুগল' নাটক লিখে। এই সব খ্যাতনামা লেখকগোষ্ঠী ছাড়াও বহু অখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শেক্সপীয়ার তর্পণে বিন্দু বিন্দু বারিসিঞ্চন করে গেছেন। মার্চেন্ট অফ ভেনিসের বণিক প্রথম একটি পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে শেক্সপীয়ার আবির্ভাবের সূচনা করে সেটির প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক হরচন্দ্র ঘোষ ভাবানুবাদ করেন 'ভানুমতীর চিত্তবিলাস' নামে নাটক লিখে এবং রোমিও ও জুলিয়েটের ভাবানুবাদ করেন 'চারুমুখ চিত্তহরা' নাটক রচনা করে। হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর রচনাবলীতে তৎকালীন ভারতীয় ভাব বজায় রাখতে গিয়ে শেক্সপীয়ারের মূল রচনা থেকে বহু পরিবর্তন করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু অখ্যাতনামা সাহিত্যিক শুধুমাত্র শেক্সপীয়ার অনুবাদ বা ভাবানুবাদ রচনা করেই এযুগে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপরিচয়ের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে দেখতে পাই দেবেন্দ্রনাথ বসু অ্যাণ্টনী ক্লিওপেট্রার ও ওথেলোর অনুবাদ করেন, গোবিন্দ রায়, অলস ওয়েল দ্যাট এণ্ডস ওয়েল-এর অনুবাদ করেন এবং নগেন্দ্র চৌধুরী হ্যামলেটের অনুবাদ করেন। এঁর এই নাটক তৎকালীন মঞ্চে খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বেশীর ভাগ সাহিত্যিকগণ শেক্সপীয়ারের ভাবানুবাদ রচনা করেন অথবা তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নাটক রচনা করেন, বঙ্গসাহিত্যে এঁদের উদাহরণ রয়েছে ভূরি ভূরি। যেমন চন্দ্রকালি ঘোষ কুসুমকুমারী নাটক লেখেন সিম্বেলিন অবলম্বনে, নগেন্দ্র চৌধুরী, গিরীশ ঘোষ ও প্রমথ বসু হ্যামলেটের ভাবানুবাদ করেন, ম্যাকবেথ অবলম্বনে ধীরেন্দ্রনাথ পাল লেখেন 'অমর', হরলাল রায় লেখেন 'রুদ্রপাল', নগেন্দ্রনাথ বসু লেখেন 'কর্ণবীর'

নাটক। ম্যাকবেথের যথার্থ বঙ্গানুবাদ করেছেন—যথাক্রমে আশুতোষ ঘোষ, মুনীন্দ্র ঘোষ, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ কিংলিয়ার-এর অনুবাদ করেন। এই নাটকটির অনুবাদের এই একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়। বাঙালীর সবচেয়ে প্রিয় নাটক মার্চেণ্ট অব ভেনিসের অনেকে অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ করেছেন—এঁদের মধ্যে আশুতোষ ঘোষ, সুশীল চট্টোপাধ্যায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন এবং প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন বসু কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন এই নাটকটির ভাব অবলম্বনে। কিন্তু সাধারণ মাইটস্ট্রীম অবলম্বনে সতীশ চট্টোপাধ্যায় জাহানারা নাটক লেখেন এবং নীলরতন মুখোপাধ্যায় লেখেন শরৎশশী নাটক। ওথেলো ও অ্যাণ্টনী ক্লিওপেট্রার মূলভাব নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তারিণীচরণ পাল এবং মনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে সুরসুন্দরী, ভীমসিংহ, ও রুদ্রসেন নাটক রচনা করেন। যোগেন্দ্র-নারায়ণ রায় মূল রোমিও ও জুলিয়েটের কিছু অদল-বদল করে বঙ্গানুবাদ করেন। নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় টেম্পেষ্টের রূপান্তর করেন এবং কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও পশুপতি ভট্টাচার্য টুয়েলভথ নাইটের বঙ্গানুবাদ করেন—কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এরই ভাব অবলম্বনে সুশীলা চন্দ্রকেতু নামে একটি নাটক লেখেন। উইণ্টার টেলস-এর অবলম্বনে রাণী ভুমালিনী নাটক লেখেন বনদাচরণ মিত্র। এ ছাড়া মূল শেক্স-পীয়ার থেকে সহজ করে কিশোর পাঠ্য হিসাবে ল্যাম্ব যে শেক্সপীয়ারের রচনা প্রকাশ করেন সেগুলিরও বঙ্গানুবাদ করেছেন বহু বাঙালী সাহিত্যিক—এই ভাবে শিশুচিত্তের সঙ্গেও শেক্সপীয়ারের সহজ সরল ভাবে পরিচয় ঘটেছে।

শেক্সপীয়ারের নাটকগুলি ছাড়াও তাঁর সনেট-গুলির ধারাবাহিক ভাবে অনুবাদ-সংকলিত গ্রন্থ ও তাঁর এই জন্ম চতুর্থ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিগণ শেক্সপীয়ার সনেটের প্রায় শতাধিক কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে সুধীন দত্ত, জীবানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মণীন্দ্র রায়, বুদ্ধি দাস, ও সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত শেক্সপীয়ারের জীবনী পর্যালোচনা করে মৌলিক রচনা প্রকাশ করেছেন। ঊনবিংশ শতকের এবং বিংশ শতকের বহু খ্যাতনামা বাঙালী মনীষী শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য পরিবেশন করেছেন সেগুলি সময়ে সময়ে তাঁদের পরিচয়ে বিদেশী হলেও বাঙালীর অন্তর্জগতে মহাকবির স্থানের মর্যাদা নিরীক্ষণে মহামূল্যের স্বীকৃতি বহন করছে। স্বামী বিবেকানন্দ মহাকবিকে ভারতীয় নাট্যসাধনার সংস্কৃতিবাহক হিসাবে বলেছেন :

"There is not least likeness between the Aryan and Greek dramas, rather the dramas of Shakespeare resemble to a great extent the dramas of India. So the conclusion may also be drawn that Shakespeare is indebted to Kalidasa and other Indian dramatists.

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন :

He is not primarily an artist, a poetical thinker or anything else of the kind, but a great vital creator and intensely though written marked limit a seer of life. His art itself is life arranging its forms in its own surge and excitement. His development of human character has a sovereign force.

শেক্সপীয়ার যে মানব জীবনগাথার সার্বভৌমত্ব লাভ করেছিলেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ এই উক্তি করেন। শেক্সপীয়ারের সাহিত্যে অনবাহু-ভূতির আবেগ এবং প্রাণচাঞ্চল্য ও মানব জীবনের স্বচ্ছ-সহজ গতি বাংলার মনীষী বিদগ্ধগণ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ জনগণের চিত্তেও গভীরভাবে আবেদন জাগিয়েছিল। বাঙালীর সর্বশ্রেণীর মধ্যে শেক্সপীয়ার চর্চার এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে শেক্সপীয়ারের এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্য-সমাজে পরিচয়—কিন্তু স্বচ্ছ অনুভূতির দৃষ্টিপাতে তাঁকে দেখা যায় সকল প্রকার সাহিত্যিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে। কবি ও নাট্যকার সত্তার পিছনে শেক্সপীয়ারের মানবসত্তা ব্যক্তির লীলাখেলার মাঝে ব্রহ্মের অবস্থিতির মত সমপর্যায়ে ক্রিয়াশীল—বিচারের স্পর্ধা তাঁর এই নৈর্ব্যক্তিক রূপকে ধরতে অপারগ হয়ে ফিরে গিয়েছে হতদর্প সমালোচকদের ভাব ও ভাষার বৈভেদ খুলিতে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাই বলেছেন :

"We may search all his dramas in vain what actually his poetical as also his religious views had been and the remark that "critics have found reasons for thinking

him a Catholic, an Anglican, a Puritan, a free thinker but a conflict of their opinions only shows how well the dramatist kept his secret' holds perfectly true. This just and tolerant view of human events and characters constitutes one of the most remarkable peculiarities of the mind of Shakespeare."

শেক্সপীয়রের সাহিত্যিক সত্তার শাশ্বত রূপটি বাংলার জানৈক গুণী মহল সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—শেক্সপীয়র স্মৃতিচারণায় এর পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙালী সমাজে শেক্সপীয়রের ওপর সমালোচনা গ্রন্থগুলো তাঁর সাহিত্য দর্শনে বিশেষ সহায়স্বরূপ হয়েছে, কিন্তু তাঁর বঙ্গানুবাদ ও ভাবানুবাদগুলি সবক্ষেত্রে সার্থক প্রতিপন্ন হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে অপটু অনুবাদকের হাতে পড়ে শেক্সপীয়রের মূল নাটকগুলি আমূল পরিবর্তিত হওয়ায় নাটকের অন্তর্নিহিত রূপটি বিকৃত ভাবে অথবা রুচির অভাব নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়েছে। অনুবাদকরা অনেক সময়ে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডী নাটকের কমেডীতে রূপান্তর করেছেন, আবার কোন কোন অনুবাদ ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের বিধিনিষেধগুলি আরোপ করেছেন, কোন নাটকে প্রারম্ভিক গান, প্রস্তাবনা, বিদূষক ইত্যাদি সংস্কৃত নাটকের প্রযোজ্য রীতিনীতিগুলিও সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে নাটকের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ত হয়ই নি, উপরন্ত শেক্সপীয়রের নাটক সংস্কৃত নাটকের বেড়াজালে বন্দী হয়ে তার নিজস্ব সব গুণ হারিয়ে ফেলেছে। এ যাবৎ যতগুলি বাংলা নাটক শেক্সপীয়রের ভাব আমদানী করেছে, তার মধ্যে বাংলা ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটকগুলির মধ্যেই তাঁর প্রভাব সুষ্ঠু ও সংহত ভাবে বিস্তার লাভ করেছে। কারণ শেক্সপীয়রের নাটকের উদাত্ত পরিবেশ, চরিত্রের বলিষ্ঠতা, ট্র্যাজেডীর সীমাহীন গভীরতা, মর্মবেদনার উচ্ছ্বাসের ভাব-ব্যঞ্জনা বাংলার ঐতিহাসিক রোমান্সধর্মী নাটক সার্থকভাবে আত্মস্থরীণ সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

বাংলা নাটকে ট্র্যাজিক রসসৃষ্টির মূলে রয়েছে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডীর প্রভাব। বাংলা মিলনাত্মক নাটকে নানা কাহিনী-উপকাহিনীর সংযোজন-রীতি শেক্সপীয়রের কমেডীর নাটকের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগের নাট্যকারগণের মধ্যে মন্মথ রায়, যোগেশ চৌধুরী, শচীন সেনগুপ্ত, জলধর চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি খ্যাতনামা নাট্যকারগণও সম্পূর্ণ শেক্সপীয়রীয় ভাবধারামুক্ত নন। তবে বহুলাংশে তাঁদের রচনার দৃষ্টিভঙ্গি যুদ্ধোত্তর কালের পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর নাটক রচনা রীতিনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এখানে মধ্যযুগীয় শেক্সপীয়রের ভাবধারার গতি বেশ কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু দেশকাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে যে সব-কালের সর্বযুগের এক সার্বজনীন মানবিক আবেদন মিলনাত্মক বা বিয়োগাত্মক নানাবিধ সংঘাতের মধ্য দিয়ে শেক্সপীয়রের রচনার মধ্যে জেগে রয়েছে তা চিরদিনই রসপিপাসু-চিত্তে সাহিত্যের খোরাক যুগিয়ে যাবে। এইখানেই শেক্সপীয়রের সৃজনীপ্রতিভার অমরত্ব। তিনি সর্বকালের মনুষ্যজীবনের মনুষ্য হৃদয়ের কবি—দেশ-কালের গণ্ডী পেরিয়ে জগতের মানুষ অন্তরের আর্তি পূরণের সন্ধানে এই মানবদরদী কবির কাছে, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির কাছে পরম সান্ত্বনা খুঁজে পাবার জন্য ছুটে যাবে। মানব হৃদয়ের গভীরে প্রবেশের ক্ষমতা না থাকলে সার্থক চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়, মানব জীবনের প্রতি সুগভীর সহানুভূতিবোধ না থাকলেও চরিত্র কখনও সজীব হয়ে ওঠে না। শেক্সপীয়র এই সব দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলেই আজও তাঁর নাটক বাস্তবতার রূপ নিয়ে জীবন্ত হয়ে বেঁচে আছে। মানবচরিত্রাবলোকনের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে শেক্সপীয়র বাঙালী তথা বিশ্বের প্রতিটি চিত্তে জাজ্বল্যমান হয়ে জেগে রয়েছেন। এ যুগের অন্যতম শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর শেক্সপীয়র তর্পণ-এর সঙ্গে আমাদেরও আজ বক্তব্য 'সাহিত্যে মর্ম দৃষ্টি, জীবনের বিস্ময় মহিমার স্বতঃস্ফূর্ত অনায়াস উপলব্ধি ও দিব্য প্রতিভার রঞ্জনরশ্মিতে উহার রহস্য গভীরে চকিত অনুপ্রবেশ—এইগুলিই শেক্সপীয়রের কবিসত্তার শাশ্বত গুণ। এগুলি যদি জীবনে ফিরিয়া না আসে তবে শেক্সপীয়র পূজা নিছক অতীত চারণায় পর্যবসিত হইবে।' শেক্সপীয়রের সাহিত্য-সাধনার মৌলিকত্বটুকু গ্রহণ করে জাতীয় সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা রয়েছে বঙ্গসাহিত্যের উত্তর-সাধকদের হাতে।

হিসেব

শৈবাল চক্রবর্তী

বৌ ওখানে আর ও এখানে। দু'টো শরীর আলাদা আলাদা জায়গায়। দিনের শেষে সারেঙ্গী যখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয়, মড়ার মত পড়ে থাকে দড়ির খাটিয়ায় তখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। সারাদিনের খাটনির পর এই আরাম। সেই সময় ওর দেশের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে ধানক্ষেত, গরুবাছুর আর বৌয়ের কথা।

ওদিকে গ্রামের বাড়ীতে তার বৌ তাদের সদ্য-হওয়া বাচ্চাটাকে বুকে চেপে দিন-দুপুরে স্বামীর কথা ভাবে। এখুনি ঘাটে গিয়ে ময়লা জামা-কাপড় কেচে নিতে হবে। রান্না সারল সে এইমাত্র। তাওর এই কাছারিতে বেরুল, শাশুড়ী দাওয়ায় বসে ভাত আর কচুর তরকারি খাচ্ছে। এখন একটু অবসর। কি ভাগ্যি ছেলেটা ঘুমোলো!

দু'জনে দু'জায়গায় একে অপরকে চেয়ে পড়ে থাকে। সারেঙ্গীর বিয়ে হয়েছে মোটে দেড় বছর। ছোট ঘরটায় বৌকে নিয়ে থাকা অসম্ভব সারেঙ্গী ভাবে।

সারেঙ্গী একজন পিওন। তার বাড়ী কটকের জাজপুরে।

বৌটাকে মা'র কাছে রেখে সে চাকরি করে কলকাতায়। তার মাইনে আর মাগ্‌গী ভাতা মিলিয়ে সে পায় সাতানব্বই টাকা। এখানে তার অফিসের তিন বাবুর জন্যে রান্নাবান্না করে দেয় সে, তাই তার খাওয়াটা এমনিতে হয়ে যায়। শোবার জন্যে, থাকবার জন্যে সারেঙ্গী আলাদা ঘর পায় নি; ঘুপসি রান্নাঘরের এক পাশে একটা চৌকিতে সে শোয়। চৌকিটা বাড়ীওলার কাছ থেকে মাসিক দু'আনা ভাড়ায় সে পেয়েছে। ধরতে গেলে তার থাকা-খাওয়ার খরচ ওই দু' আনাই।

এত বড় সুবিধে ক'জনের ভাগ্যে জোটে? বরাবরই সারেঙ্গী যেখানে চাকরি করে সেখানে এই রকম ব্যবস্থা করে নেয়। কলকাতায় সে বাগচী সাহেবের বাড়ীতে রান্না করত, খেত। শ্যামনগরে থাকার সময় ক্যাশিয়ার নগেনবাবু আর রমেন মজুমদার একসঙ্গে থাকত, সারেঙ্গী সেখানে থাকত, রান্না করত। তখন অবশ্য তার বিয়ে হয় নি। অফিসের অন্য পিওনরা ওর এইভাবে যুক্তে থাকা নিয়ে ওকে টিপ্পনি কাটে। বলে, শালা, বেশ আছিস তুই। মাগনিতে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছিস। যা মাইনে পাস পুরোটা বৌয়ের গর্তে দিস।

সারেঙ্গী হেসে বলে, তোরাও তা কর না। বারণ করেছে কে তোদের। তোরা যে বাঙালী; ভদ্রলোকের ছেলে, রেঁধে খেলে যে জাত যাবে তোদের।

সে কথা সত্যি। যে যার নকড়ি যাই বলুক, অপরকে রান্না করে দেওয়া দূরে থাকুক, ওরা নিজেরাই রেঁধে খেতে পারে না। ওদের চাল-চলন একেবারে অন্য রকম। ওরা চারদিনের বেশী এক জামা-কাপড় পরে না। ওদের বেশভূষা প্রায় বাবুদের মতন। বরং তারাপদবাবু কি পালবাবুর মত ওরা কেউ তালি-দেওয়া জামা পরে না। ন' কড়ি এবার পঞ্চান্ন টাকা দিয়ে একটা কোট করিয়েছে।

যে, নকড়ির বাড়ীতেও অভাব। যে'র বাবা পেনসন পায় অল্প কিছু টাকা। যে কায়ক্লেশে তিরিশ টাকার বেশী মা'র হাতে তুলে দিতে পারে না। সেই নিয়ে তার মা কত দুঃখ করে। ছোট বোনটার বিয়ের বয়স হয়ে গেছে অনেককাল। এখন যে বায়না ধরেছে সে নিজে বিয়ে করবে।

ন'কড়ির অবশ্য চাকরি ছাড়া অন্য-রকম আয় আছে। তার মামার শিয়ালদায় হুকাবের দোকান আছে। ন'কড়ি সেখানে সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে বসে। দরকার পড়লে বড়বাজারে গিয়ে মালও গস্ত করে আনে সে। তার জন্যে মামা মাসে মাসে তাকে কিছু দেয়। সামান্য হলেও বাঁধা মাইনের ওপর গোটা একটা উপরি আয় তো

বটে। কলকাতা শহরে কেঁদে-ককিয়েও দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার করতে পারে না এরা অথচ মাড়োয়ারী-ভাটিয়ারা এই কলকাতাতেই লাখ লাখ টাকা কামিয়ে লাল হয়ে যাচ্ছে। বাবে আজব দুনিয়া! যার কপালে আছে সে পয়সা কুড়িয়ে কুলতে পারছে না,আর যার নেই সে পেটে দেবার জন্যে খুঁটে খুঁটে দুটো দানাও জোটাতে পারছে না। ন'কড়ি অবশ্য বাইরে জল মারে। বিড়িতে টান মেরে বলে, 'ও তো আমারই দোকান। মামা বলেছে ক'দিন পরে তোকে দিয়ে দেব দোকানটা।' কিন্তু ওর মামা যে একজন মহাধাড়ি লোক সে কথা দে, হালদার, সারেঙ্গী কারো জানতে বাকী নেই। ওরা সবাই দল বেঁধে নয় আলাদা আলাদা মামার দোকানে জিনিস কিনতে গিয়েছে। পাকা ব্যবসায়ী ওর মামা, তালপাখা নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে হাসিমুখে ওদের কাঠের বেঞ্চিতে বসিয়েছে, কুশল জিজ্ঞেস করেছে কিন্তু দামে এক পয়সা কম করে নি। বরং সারেঙ্গী বলেছিল যে লুঙ্গিটা ওর মামা চার টাকায় নিয়েছিল সেটা কলেজ স্ট্রীটে সাড়ে তিন টাকায় পাওয়া যায়। ন'কড়ি মামার সম্বন্ধে অফিসে খুব লম্বা-চওড়া বক্তৃতা মারে। ওর মামা না কি বারুইপুরে বাড়ী করেছে, দোতলা বাড়ী। এক-তলায় ভাড়াটে আছে, দোতলায় তিনটে ঘরে দুটো পাখা। সে একবার গিয়ে দেখে এসেছিল কেমন ওর মামার বাড়ী। বারুইপুরে একতলা বাড়ীর ওপরে টিনের চাল, এখনও টিউবওয়েল বসে নি। ও দেখেছিল ন'কড়ির মামী পুকুরে বাসন মেজে কাঁকালে করে জলের ঘড়া আর মাজা বাসন নিয়ে আসছে। সব গুল! সব গুল! যে টিফিনের সময় রঘুর দোকানে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করছিল। ন'কড়ি তখন বাধুর সাহেবের টিফিন-কেরিয়ার খুলে খাবার সাজাচ্ছিল। শালা এতও গুল দিতে পারে! আবার বলে কি না ওকে সব কিছু লিখে দিয়ে যাবে! নিজের চোখে দেখে এলাম মামার একগণ্ডা ছেলেপুলে। তোকে সব লিখে দিলে ওরা কি আঙুল চুষে থাকবে? নিজের ছেলেপুলে থাকতে তোকে সম্পত্তি লিখে দিতে যাবে কোন্ দুঃখে রে?

কিন্তু ওদের তুলনায় সারেঙ্গীর সচ্ছলতা অনেক বেশী, দুঃখও কম নয়। সারেঙ্গী কোনদিন চার পয়সার মুড়ির সঙ্গে এক টুকরো শশা চিবোয় কিংবা গোটা দুয়েক তেলেভাজা কচুরি খেয়ে চুপচাপ থাকে। কিন্তু যে কি ন'কড়ির তাতে হয় না। যে দুধের গেলাসে পাঁউরুটি ডুবিয়ে খায়, বলে, 'মা বলেছে পয়সা চাই না বাবা, তুই শরীরটা ভাল কর।' ন'কড়ি দাসবাবুর দেখাদেখি রঘুর কাছ থেকে বাকীতে কাটলেট খায়।

সারেঙ্গী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। দেশে তার খানিকটা ধানী জমি আছে তা থেকে মণ কুড়ি ধান পাওয়া যায়। তার বুড়ো কাকা আর দাদা সে সব দেখাশুনো করে। সংসারের খরচ মিটিয়ে বিক্রি করার মত ধান আর থাকে না। সারেঙ্গীর ইচ্ছে আরও পাঁচ বিঘের মত জমি কেনা আর সেই জমির ধানটা প্রতি বছর বিক্রি করা। কিন্তু পাঁচ বিঘে জমি মানে ন'শো টাকার ধাক্কা! আর ন'শো টাকা জমানো যে এখনকার দিনে কি তা সারেঙ্গী হাড়ে হাড়ে জানে। খরচ বাড়ছে দিন দিন, জিনিসের দাম কাল যা ছিল আজ তার চতুর্গুণ। একটা এক টাকার নোট ভাঙালে খুচরোগুলো আর চোখে দেখা যায় না। মাসে তিরিশটা করে টাকা জমাবে ভেবেছিল সারেঙ্গী, কিন্তু কুড়ির বেশী কিছুতেই রাখা যাচ্ছে না। তা-ও ক'মাস আগে এই বাচ্চাটা হওয়ার সময় কতকগুলো টাকা ডাক্তারের হাতে গিয়ে পড়ল। বৌটার সে-সময় অসুখ করল। জমানো টাকার অর্ধেক তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেরিয়ে গেল হুস্ করে। বিল করলে অফিস থেকে টাকাগুলো পাওয়া যাবে হয়ত, কিন্তু সে ত এখন ছ' মাস। গভর্ণমেণ্টের গাড়ি বড় ঢিমে চলে।

হিসেব করে করে আর পারে না সারেঙ্গী। হিসেব ছাড়া এখন বাঁচা যায় না। দিনে হিসেব করে পা গুণে গুণে চলতে হয়, রাত্রে শুয়ে শুয়ে হিসেব করতে হয় কাল কি খাওয়া হবে আর কি করে হবে! হিসেবের পোকাগুলো, টাকা-পয়সা সিকি আধুলি সব কিলবিল করতে থাকে মাথার ভেতর। জীবনে সুখী হতে গেলে সারেঙ্গী বুঝেছে পয়সার দিক থেকে সচ্ছলতা থাকা চাই। এ তার অভ্রান্ত জ্ঞান। যার সঞ্চয় বলতে কিছু নেই সে বাঁচে কোন্ ভরসায়, রাত্তিরে ঘুম আসে তার কি করে সারেঙ্গী ভেবে পায় না। কি করে ভবিষ্যতে দুর্দিন

ভেবেছে বলে দু'টো পয়সা বাঁচাবে, জমি কিনবে, গরু কিনবে—আরও কম খরচে বাঁচতে পারবে, কোন কায়দায় রাত্রে অন্ধকার ঘরে মশা মারতে মারতে পাখা টেনে বাতাস করতে করতে সারেঙ্গী ভাবে আর ওই ভাবেই তার অর্ধেক রাত কাবার হয়ে যায়। মশারিটা ছিঁড়ে গেছে, গেরো দিয়ে দিয়ে আর চলে না। রাত্রে অনিদ্রার ওই এক কারণ। আলো নিভে গেলেই ভন ভন করে মশা ঢুকে পড়ে। একটা মশারি কেনা দরকার। সারেঙ্গী ভেবেও ছিল কিনবে কিন্তু দোকানে গিয়ে দাম শুনে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ষোল টাকা নিতান্ত মামুলী মশারির দাম! ষোল টাকা! দু'খানা দশ টাকার নোট ভাঙাতে হবে! একটা পুরো যাবে আর একটা খোঁড়া হয়ে থাকবে। বাকী চারটে টাকাই কি আর থাকবে? ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে দেখতে না দেখতে। দরকার নেই,সারেঙ্গী বেরিয়ে এসেছিল দোকান থেকে। পকেটে হাত দিয়ে নোটগুলোকে স্পর্শ করে বাইরে এসে অনেক ভাল লেগেছিল তার। বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়েছিল—টাকাগুলো হাতছাড়া হয় নি। সবল পদক্ষেপে রাস্তা পেরিয়েছিল সে। সমস্ত শহরটায় ফাঁদ পাতা রয়েছে; তার মাইনের টাকাগুলো ভুলিয়ে-ভালিয়ে কেড়ে নেওয়ার জন্যে দোকানগুলোর এত সাজ, এত আলো। চোখ বুজিয়ে রাস্তা চলতে পারলে ভাল হয়। এর চেয়ে গ্রাম ভালো, সেখানে আলো অনেক কম আর এত প্রলোভন নেই। ইচ্ছে করলে নিজের ঘরে চুপচাপ পড়ে থাকা যায় কিন্তু শহরে সে উপায় নেই, এখানে আলো আর উৎসবের উল্লাস লোককে ঘর থেকে টেনে বার করে। পাশের বাড়ীর লোক, কি রাস্তার চলা মানুষ-জন দেখে ভাল-মন্দ জামা-কাপড় পরতে ইচ্ছে করে, দোকানে সাজানো মনোলোভা খাবার দেখলে জ্বালা পেটেও খিদে পায়। কি বিচ্ছিরী ফাঁদ পাতা রয়েছে এই শহরময়! পার্কে গিয়ে বসে থাকলেও বাদামভাজা কি আইসক্রীমওয়ালারা এসে বিরক্ত করে। সারেঙ্গী বুঝতে পারে বেঁচে থাকা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। আগে দোকান-বাজার করা একটা ফুর্তির ব্যাপার ছিল, বাসে-ট্রামে এত ভীড় ছিল না কিন্তু এখন টাকা ফেললেও সর্ষের তেল কি চিনি পাওয়া বেশ ভাগ্যের ব্যাপার। আর বাসের পাদানিতে জায়গা পাওয়াও হয়েছে বেশ দুষ্কর। ঘণ্টা দুয়েক সময় হাতে না নিয়ে বেরুলে কিছুতেই সময় মত অফিসে এসে পৌঁছুনো যায় না। অফিসে পৌঁছেই ক্লান্ত লাগে, তখন থেকেই ঘুম পায়। অফিসে ঘুমোনোর ব্যাপারে সারেঙ্গীর বদনাম আছে। টুলে বসে সে ঢোলে, অফিসার ঘণ্টি বাজালে সে শুনতে পায় না। আগে সে মালহোত্রা সাহেবের পিওন ছিল কিন্তু মালহোত্রা এখন রিপোর্ট করে তার জায়গায় অন্য পিওন নিয়েছে। যে এসেছে মালহোত্রার কাছে। মালহোত্রা ঘণ্টি বাজাত, 'চাপরাসী' বলে ডাকত কিন্তু সাড়া পেত না। কে সাড়া দেবে? সারেঙ্গীর তখন অল্প অল্প নাক ডাকছে। যে আর দ'কড়ি ওকে দেখে হাসত। এই সব দেখে নগেন্দ্র-বাবু বড়বাবুকে বলে-কয়ে সারেঙ্গীকে সেকশনে বদলী করিয়ে দেয়। বড় হলঘরের সেকশনে বসে বাবুর দল, সেখানে আর অফিসারের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকার আশঙ্কা নেই। বাবুরা গল্প করছে, পিওন ঘুমোচ্ছে, কে কাকে কি বলবে? বাবুরা তাদের বাড়ীতে বৌ'রা কি বলেছে এই সব রসের গল্প করছে পান চিবুতে চিবুতে। মাসের দশ-বারো তারিখ অবধি এই উৎসাহের ভাবটা থাকে, তার-পর ছবিটা বদলে যায়। কেমন একটা ঝিমুনো ভাব সমস্ত সেকশনে, পঁচিশ তারিখের পর থেকে অনেক কেরাণী বাবু যেন বোবা-কালা হয়ে যায়। আবার পয়লা তারিখে মাইনে পকেটে পুরে সবাই চাঙ্গা হয়ে ওঠে ক'দিনের জন্যে। এ দৃশ্য বরাবর দেখছে সারেঙ্গী। কেশববাবু ত মাইনে পেয়ে দু'চারদিন অফিসেই আসে না। বুড়ো টাক-পড়া বনস্থান মিত্তির ফোকলা দাঁতে হেসে বলেন, 'হচ্ছে, ফুর্তি হচ্ছে! গলদা চিংড়ি আর বেনারসের ল্যাংড়া চলছে এখন। আক্কেলও নেই। মাসের শেষে সেই ত বাপু কলমী শাক আর কুমড়োর ঘ্যাঁট চালাবি....।'

রাখহরিবাবু লেজার বন্ধ করে বলেন, 'খেতে দিন, খেতে দিন, ক'টা দিন যদি একটু ভাল-মন্দ না খায় তবে আর বেঁচে থেকে লাভটা কি বলুন দিকি? এই ত খাওয়া-দাওয়ার বয়স।'

—না, তা না, খাক না যত খুশী। বনস্থান মিত্তির ডিবেটা টেবিলে ঠুকে বলেন, তবে এই মাসের শেষে

কাবলেওলার হাতে-পায়ে যখন ধরাধরি করে তখন খুব খারাপ লাগে আর কি।

—আর তাই করবেটা কি, রাধাহরিবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, যা মাইনে পায় তাতে ভাতেভাত খেলেও পনের দিনের বেশী চলে না।

সারেঙ্গী এসব কথা শোনে আর মনে মনে হাসে। তার মাসের প্রথম শেষ নেই। সারেঙ্গীর মন বলে এখন দুনিয়াটাই বাড়তি খরচের দিকে ঝুঁকছে। পয়সার যেন মা-বাপ নেই, লোকে পকেট থেকে তাড়া তাড়া করকরে নোট ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে আর দোকানীগুলো সেগুলো দিয়ে আরও ভাল করে তাদের দোকান সাজাচ্ছে, এখান-ওখান থেকে ঝকমকে নানা জিনিষ নিয়ে আসছে। ফলে, এইভাবে দিন দিন দোকানদারী বেড়েই চলেছে। সারা কলকাতা, কলকাতা কেন, সারা দুনিয়াটা একদিন মস্ত বড় একটা দোকান হয়ে যাবে সারেঙ্গী ভাবে। খালি ভাল ভাল খাবার, রং-চংয়ে কাপড়, স্নো, পাউডার, অদ্ভুত অদ্ভুত খেলনা পাওয়া যাবে সেই দোকানে। সেদিন মাঠ পুকুর নদী নালা কিছুই থাকবে না। লোকে খালি এক দিক দিয়ে জিনিস কিনবে আর এক দিক দিয়ে বেরুবে। দোকানটার নাম হবে গোলকধাঁধা এণ্ড কোং।

—কি, সারেঙ্গী ঘুমোচ্ছ নাকি? ব্রজবিলাসবাবুর ডাকে সারেঙ্গীর চটকা ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি সিধে হয়ে বসল সে। ফাইলে চোখ বুলোতে বুলোতে ব্রজবিলাসবাবু বললেন, রাতে ঘুমোও নি না কি? এ্যাঁ?

—বড় গরম পড়ে, সারেঙ্গী লজ্জা পেয়ে বলে, তার ওপর যা মশা…।'

—যাও দেখি নীচে, ঐ যে বিধবা মেয়েছেলেটি পান নিয়ে বসে, তার কাছ থেকে আমার নাম করে একটা পান নিয়ে এস ত। আর একটু মোহিনী মশা,…আমার নাম করবে, বুঝলে?

পয়সা হাতে নিয়ে টুল ছেড়ে সারেঙ্গী চলতে আরম্ভ করল। ব্রজবিলাসবাবুর শালা অধরবাবুও এই অফিসে স্টোর ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, দূর থেকে সারেঙ্গীকে আসতে দেখেই অধরবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চোখ পিট পিট করে কয়েকবার তার দিকে তাকিয়েই হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকলেন।

—কি বলছেন? অধরবাবু টেবিলের কাছে এসে সারেঙ্গীকে বলল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপাস্বরে অধরবাবু বললেন, 'আমি যে কথাটা বলেছিলাম তার কি হ'ল?'

সারেঙ্গী অবাক হ'ল। বলল, 'কোন্ কথাটা বলুন ত?'

—আঃ, অধরবাবু চাপা গলাতেই বিরক্তির ভাব দেখালেন। সেকশনের অনেকেই তখন টিফিন করতে গেছে, ধারে-কাছে কেউ নেই, তবু ফিস ফিস করে গলা নামিয়ে অধরবাবু বললেন, 'আরে, সেই যে সেদিন বললাম…,' বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ঠেকিয়ে একটি পরিচিত মুদ্রা করে বললেন 'বুঝতে পেরেছ?'

ঘাড় তুলে সারেঙ্গী বলল, ও। খুব একটা গরজ নেই তার অধরবাবুর সঙ্গে কথা বলতে।

—দিচ্ছ ত? গোটা পঞ্চাশেক টাকা এবার আমাকে দিতেই হবে, বুঝেছ?

—কোথায় পাব বাবু? সারেঙ্গী এবার কাতর ভঙ্গি করল। আমরা গরীব মানুষ। একসঙ্গে পঞ্চাশ টাকা বার করে দেওয়া কি সম্ভব আমাদের পক্ষে?

—খুব সম্ভব, খুব সম্ভব। অধরবাবু তার কাঁধে চাপ দিলেন। টাকা-পয়সা ত তোমাদের কাছেই থাকবে। তোমাদের ত বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন নেই, মেয়ের জন্তে গান শেখার মাষ্টারও রাখতে হয় না তোমাদের। তোমাদের পঞ্চাশ টাকা থাকবে না ত কি আমাদের থাকবে?

সারেঙ্গী চুপ করে থাকে।

—কি? কি ভাবছ?

—না, এই বড়বাবুর পান নিয়ে আসতে হবে।

—তা আন না বড়বাবুর পান, কে বারণ করছে তোমায়, নিয়ে এস। কিন্তু ভায়া, আমার কথাটা মনে রেখ একটুখানি। আর শোন, অধরবাবু এবার আরও কাছে এলেন, তোমায় যা বলেছিলাম তাই দেব, ঐ টাকায় দু' আনা।

টাকায় দু' আনা! সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে

সারেঙ্গীর মাথায় কথাটা ঘুরপাক খেতে লাগল। হ্যাঁ, কথাটা অধরবাবু একদিন তাকে বলেছিলেন বটে। সুদে টাকা ধার দেওয়া একেই বলে। সারেঙ্গী এ জিনিসের নাম শুনেছে। তাদের অফিসে মাহাতো বলে একটা গোঁফওলা বিহারী দারোয়ান আছে, সে না কি এই কাজ করে। অফিসের অনেক বাবুই লুকিয়ে তার কাছ থেকে টাকা ধার করে, মাইনের দিন সুদ-সুদ্ধ সে টাকা মাহাতোকে ফিরিয়ে দিতে হয়। আবার পনের-ষোল তারিখ থেকে টাকা ধার নেওয়া চলে। মাইনের টাকাতে সংসার চলে না কারোই, তাই লুকিয়ে-চুরিয়ে সবাইকেই গোঁফওলা মাহাতোর সামনে হাত পাততে হয়। মাহাতোর দয়ার শরীর, সে কাউকে ফিরিয়ে দেয় না। শুধু এই অফিসেই নয়, সারেঙ্গী শুনেছে মেটেবুরুজের চটকলেও বহু কুলী মাহাতোর কাছ থেকে টাকা নেয়। সেখানে সুদের হার আরও চড়া, টাকায় দু' আনা আর হপ্তায় হপ্তায় পেমেন্ট। চটকলের কুলীগুলো মদ খায়, নিয়মিত স্ফূর্তি না করলে ওদের চলে না, তাই যে কোন রকমে হোক ওরা টাকার যোগাড় করবেই। ট্যাঁকে পয়সা আর হাতে মদের গেলাস না থাকলে ওরা দুনিয়া অন্ধকার দেখে। মাহাতো ওদের সেই অতি-আবশ্যক স্ফূর্তির খোরাক যোগায় আর হপ্তা ঘুরে গেলে আসলের ওপর তার সুদ আদায় করে। মদ-খাওয়া ভোঁতা-বুদ্ধি কুলীগুলো মাঝে মাঝে মাথার ঠিক রাখতে না পেরে তাকে মার-ধোর করে কিন্তু মাহাতোর সেটা গা-সহা হয়ে গেছে। কেননা যত দিন যাচ্ছে টাকা তার ডবল তিন ডবল হয়ে ফিরে আসছে। প্রতি হপ্তায় আর মাসে তার বাড়তি পুঁজির কথা চিন্তা করেই মারের জ্বালা ভুলতে পারে মাহাতো ব্যাপারটা এই ভাবেই, চিন্তা করে সারেঙ্গী।

পানওয়ালী বিধবা মেয়েছেলেটার কাছে এসে পড়েছে সারেঙ্গী। পান আর মোহিনী বিড়ি নিয়ে আবার পেছনে ফিরল সে। এই বিধবার ছেলেটি এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। তাকে তাদের অফিসে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে সে এখন থেকে সবার হাতে-পায়ে ধরে রেখেছে। আর্জি শুনে বড়বাবু বলেছিলেন, দেখি কি করতে পারি, আজকাল লোক ঢোকানো বড় শক্ত। অধরবাবুকে ছোট কেরানী করে ঢোকাতে যে কি কষ্ট হয়েছিল তা নিশ্চয় এখনও মনে আছে তাঁর। এ পরীক্ষা দাও, সে পরীক্ষা দাও, টাইপ কর, তার পর ইন্টারভিউ দাও চারজন বাঘা অফিসারের সামনে। বড়বাবুর কালঘাম ছুটে গিয়েছিল ক'দিন। স্কুল ফাইনাল পাশ-করা ছেলেটাকে পিওন করে ঢোকানোর জন্যে বিধবাটা এখন থেকে ধরাধরি করছে, অথচ যে সারেঙ্গী কষ্টেস্টে নিজের নামটুকু সই করতে পারে না সে আজকে পিওনের কাজ করছে সাত বছর। স্কুল ফাইনাল পাস ছেলের পক্ষে এখন কেরানীগিরি পাওয়া আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতন। কেরানীর চাকরির জন্যে এখন বি. এ. এম. এ পাস গভীর বিদ্বান ছেলেরা এসে লাইন লাগাচ্ছে। অথচ পুরনো আমলের কেরানীবাবুদের কারও এত বিদ্যে নেই। রাধহরিবাবু ত ম্যাট্রিকটাও পাস করতে পারেন নি।

বিধবা মেয়েছেলেটির বড় কষ্ট। সারেঙ্গী দু' একদিন ওর কাছে বসেছে, সখ করে পান খেয়েছে একটা-আধটা। মেয়েটা তখন দুঃখ করেছে ওর কাছে। ভাসুরের বাড়ীতে থাকে, সেখানে রান্নার কাজ করতে হয়, তার বদলে সেখানে মায়ে-পোয়ের খাওয়াটা জুটে যায়। আজ চার বছর সে বিধবা হয়েছে তার পর থেকে এই রকমই চলছে। ভাসুর বলে দিয়েছেন যে ঘর থেকে টাকাকড়ি তিনি কিছু দিতে পারবেন না, ছেলেকে পড়াতে হয় ত সে ব্যবস্থা নিজে কর। তাই ঘরের বৌকে লজ্জা ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে পানের খুড়ি নিয়ে বসতে হয়েছে। কলকাতায় দয়ার শরীর, এখানে অনেক লোকই করে খায়। দয়াময়ী-ই বা পারবে না কেন? দয়াময়ী জানে যে আধা-ভদ্রঘরের বৌ হয়ে রাস্তার মাঝখানে বসে দুনিয়ার লোকের হাতে পান সেজে তুলে দেওয়া তাকে সাজে না কিন্তু এ-ও জানে যে, তার ছেলেটাকে মানুষ করতেই হবে। ওর মরা বাপটার খুব ইচ্ছে ছিল যে, ছেলেটা লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক।

—ও ভালমানুষের ছেলে, দয়াময়ী সারেঙ্গীকে কাছে ডেকে বলেছিল, তোমায় একটা কথা বলি। একটা

উবগার করবে তুমি আমার ? (উপকারকে ও উবগার বলে।) বড়বাবুর জন্তে নিমকি বিস্কুট, চা আর পান দিতে এসেছিল সারেঙ্গী, এমন সময় বিধবা মেয়েটা তার কাছে এই কথা পেড়ে বসল। 'বল না কি বলবে', একটু ভয়ে ভয়েই বলল সে। বেশীর ভাগ লোকই এখন টাকা ধার চায়, তাই মাসের এই শেষটা অভাবী লোকদের এড়িয়ে চলে সারেঙ্গী। 'বাবুদের বলতে লজ্জা করে,' মেয়েটি ঘোমটা টেনে দিয়ে একটু হেসে বলল, 'কিন্ত তোমাকে বলতে আমার কোন লজ্জা নেই। কেননা তোমরা আমার দুঃখু বুঝবে।' 'বল না কি ব্যাপার,' সারেঙ্গী গম্ভীর গলায় মাথা নীচু করে বলল, সে চিন্তিত, তার মনটা অস্থির। তার চোখে ভাসছিল তার স্যুটকেশে জামা-কাপড়ের নীচে রাখা নতুন আর ময়লা চোদ্দখানা দশ টাকার নোট। গত এগার মাসে না খেয়ে রক্ত জলকরা, এই শহরের লোভ আর লালসা থেকে ছিনিয়ে-আনা তার সারাজীবনের সঞ্চয়। সারেঙ্গী জানে যে সবার চোখ তার এই জমানো টাকার দিকে। কেউ কষ্ট করবে না, টাকা হাতে পেলেই খরচ করে ফেলবে আর দরকার হলেই হাত পাতবে তার কাছে, ইনিয়ে-বিনিয়ে অভাবের কাঁদুনি গাইবে। বাঃ, বেশ মজা! মামার বাড়ীর আবদার!

তেমনি গম্ভীর কালো মুখ সারেঙ্গীর। রাজ্যের চিন্তা যেন তার মাথায়। আস্তে ঠোঁট ফাঁক করে বলল, 'বল কি বলবে, আমার তাড়া আছে।' তার মাথা ঝিমঝিম করছিল। 'বড়বাবু হয়ত খুঁজছে আমায়।'

—বলছি গো, বলছি। বলব বলেই ত ডেকেছি তোমায়। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতন। পানের ঝুড়িটা সরিয়ে রেখে সারেঙ্গীর আরও কাছে সরে আসে বরাঙ্গী। ফিস্‌ফিস্‌ করে তার কানে কানে কি বলে আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে যেন সাপে তার পায়ে ছোবল মেরেছে।

—না, না, ও আমার দ্বারা হবে না। হাত নেড়ে বলে ওঠে সে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে থাকে তার। তুমি কি ভেবেছ আমায়?

—কি হ'ল? বরাঙ্গী অবাক। তার ফরসা মুখ বিস্ময়ে যেন আরও সাদা। সারেঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

—না, কিছু হয় নি। হবে আবার কি? বলি, দশের উপকার করাই কি আমার কাজ? আমার নিজেরই দিন চলে না—

হন হন করে পা চালাল সারেঙ্গী। তার এই কঠিন প্রত্যাখ্যানের ভাষা শুনে বরাঙ্গীর মুখ কি রকম ফ্যাকাসে হয়ে গেল তা দেখবারও ধৈর্য ছিল না তার। নিজের টুলে বসে ঘামতে ঘামতে সারেঙ্গী ভাবল কি সাংঘাতিক মেয়েছেলে! এমন কথা ভাবতে পারল কি করে? মুখের আলাপ ছাড়া আর কিছু নয়, দুম করে কি না একশটা টাকা চেয়ে বসল? হোক না তাদের বিচ্ছিরি অসুখ আর ছেলের পরীক্ষা, তবু সারেঙ্গীকেই জোগাতে হবে সে টাকা? ছি ছি। বিরক্তিতে সারেঙ্গীর সারা মন ভরে উঠল।

আলমারি থেকে ফাইল নিতে এসেছিলেন অধরবাবু কিংবা ওটা একটা ছুতো। সারেঙ্গীর পেছনটিতে দাঁড়িয়ে মিহি গলায় বললেন, 'শ্যামসুন্দর, ও বাবা শ্যামসুন্দর, আমার কথাটা মনে রাখিস বাবা। ভুলিস নি যেন। তা হ'লে বড় বেমক্কা হবে। কালো মুখখানা আরও কালো করেন অধরবাবু। সে আর ন'কড়ির মুখে সারেঙ্গী শুনেছে যে অধরবাবু রেস খেলে, জুয়োর আড্ডায় যায়। রেস খেলা যে খারাপ এ কথা কে না জানে? কিন্ত রেস খেলা পাপ হ'লেও তাতে প্রচুর পয়সা। আর যাতে পয়সা তাতে ত লোকের নেশা, টান থাকবেই। রেস খেলতে গেলে পয়সা প্রচুর নষ্ট হয়। আবার মাঝে মাঝে উপায়ও হয়। সবই ভাগ্যের ব্যাপার! কিন্ত অধরবাবুকে দেখে মনে হয় এখন কিছুদিন তাঁর লোকসানের বরাতই চলছে। দিন দিন চোখের কোলে কালি পড়ছে আর গাল দুটোও যেন চুপসে আসছে। যার-তার কাছে হাত পেতে পেতে এখন এমন অবস্থা করেছেন অধরবাবু যে চরম অপমান করলেও কারও সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারেন না তিনি। তবু টাকা তাঁর চাই। যে করে হোক।

বাড়ী ফিরে এসে সারেঙ্গী ভাবতে থাকে মানুষের

নানা দুঃখের কথা আর ভাবে তার নিজের কর্তব্য কি? বেঁচে থাকার এত জ্বালা যে মনে হয় মরে গেলেই বোধ হয় সর্বসুখ। দয়াময়ীর স্বামীটা মারা গেছে তাকে পথে বসিয়ে, সে এক জ্বালা, পথে বসে পানের দোকান দিয়েছে মেয়েটা, এখন ছেলেটাকে বড় করা, তাকে খাওয়ান-পরান সে আর এক জ্বালা। ছেলেটাকে ইস্কুলে পড়িয়ে এখন তার পরীক্ষার কি জমা দেওয়া, সেটাও জ্বালা ছাড়া আর কি? সারা গায়ে সদাসর্বদা অশান্তির কাঁটা বিঁধছে যেন খচখচ করে। একবার অধরবাবু আর একবার পানওয়ালীর মুখটা ভেসে উঠল তার সামনে। অদৃশ্য দাঁড়িপাল্লায় হিসেবের বাটখারা চাপিয়ে দু'জনকে মাপতে লাগল সারেঙ্গী। একশ টাকা দয়াময়ীকে দিলে তার 'উবগার' হবে সত্যি কিন্তু পান বেচে সে পয়সা কতদিনে সে শোধ করতে পারবে সে আর এক কথা। হয়ত সারেঙ্গীকে পান খাইয়েই টাকাটা শোধ করতে চাইবে। আর টাকায় দু' আনা সুদ হলে পঞ্চাশ টাকায় মাসে ছ' টাকা চার আনা। এটা মুফত লাভ। ঘোড়াবাজি মারতে পারলেই এ টাকাটা টুপ করে তার পকেটে পড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই ছ' টাকা চার আনা তার মূলধনের সঙ্গে যোগ হবে। তার পর এই লাভটা খাটালে আরও লাভ, মানে টাকায় টাকা আনবে আর কি। সারেঙ্গীর মনে পড়ল মাহাতো তাকে বলেছিল যে বছর খানেকের মধ্যে এমন হবে যে, মূলধনে আর হাত দিতে হবে না। সুদস্য সুদ তস্য সুদের হিসেব করতে করতেই রাত ভোর হয়ে যাবে, টাকা আদায় করতে গিয়ে উত্তম-মধ্যম পড়লেও তখন আর গায়ে লাগবে না। এ ছাড়া অল্প সময়ে টাকা বাড়ানোর আর কোন উপায় নেই। এই নির্ভুল পন্থা।

সারা রাত্তির নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে সারেঙ্গী। সেই অবস্তিকর আধো ঘুমের মধ্যে সে এক স্বপ্ন দেখে। ঠিক স্বপ্ন নয়, একটা দৃশ্য। সিনেমার ছবিতে যেমন ভেসে উঠে তেমনি। রেসের মাঠে ঘোড়া ছুটছে, সারেঙ্গী দেখতে পায়—অধরবাবু এক পাশে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছেন, কেন না তাঁর ঘোড়া বাজী জিতেছে। অধরবাবু হাসছেন, পানের রসে তাঁর মুখটা লাল। ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো নয়, সারেঙ্গী দেখল আনকোরা নতুন নোট সব ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে! সে আর অধরবাবু আকুল হয়ে সেই নোট কুড়োচ্ছে! অধরবাবু বলছেন, 'কুড়োও, সারেঙ্গী কুড়োও, এ ভগবানের দান। আমার লাভ মানেই তোমার লাভ।' সারেঙ্গী কুড়োতে লাগল। নোট যেন ফুরোবে না। শরীরটা নুইয়ে ধুলোমাখা টাকা কুড়োতে কুড়োতে ক্লান্ত হয়ে সারেঙ্গী একবার চোখ তুলে দেখল : রেসের মাঠের রং সবুজ, তার যে জমি কেনবার ইচ্ছে, অবিকল সেই জমির মতন।

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী

কমলা দাশগুপ্ত

১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর (বাংলা ১২৯৬ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ) মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার মোহবনী গ্রামে, মতান্তরে মেদিনীপুর শহরের অদূরবর্তী হবিবপুর গ্রামে ক্ষুদিরাম বসু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু। তিনি ছিলেন নাড়াজোল রাজার তহশীলদার। মাতা লক্ষীপ্রিয়া দেবী। ক্ষুদিরামের তিনটি দিদি ছিলেন। বড়দিদির নাম অপরূপা দেবী। ক্ষুদিরামের জন্মের আগেই দাসপুর থানার হাটগাছিয়া গ্রামের অমৃতলাল রায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

জন্মের পর ক্ষুদিরামকে তাঁর বড়দিদি তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে কিনে নেন, তাই নাম তাঁর ক্ষুদিরাম। ছয় সাত বছর বয়সের সময় ক্ষুদিরামের মাতা পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর অপরূপা দেবী নিরাশ্রয় ক্ষুদিরামকে নিজের কাছে নিয়ে যান। দিদির বাড়ীতে থেকে ক্ষুদিরাম প্রথমে তমলুকের হ্যামিলটন স্কুলে এবং পরে মেদিনীপুরের কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। তিনি পড়াশুনায় বিশেষ ভাল ছাত্র ছিলেন না। দুরন্ত বালক দুষ্টামির জন্য খুব শাস্তি পেতেন। তিনি পড়ার চেয়ে খেলা করতে এবং দুঃসাহসিক ও সৎসাহসের কাজ করতে বেশী ভালবাসতেন।

একদিন একটি ছাত্র রহস্য করে ক্ষুদিরামকে বলে—দেশের জন্য মরতে পারিস্? ক্ষুদিরাম দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—পারি।

—মরবার সাহস রাখিস্ ত সত্যেনবাবুর কাছে যা (কাসীর সত্যেন)।

ক্ষুদিরাম সত্যেন বসুর কাছে গিয়ে বলে—আমি দেশের জন্য মরতে পারি।

দৃঢ়তা দেখে সত্যেনবাবু তাঁকে বিপ্লবী কাজের জন্য তৈরী করতে থাকেন ও দলে গ্রহণ করেন। সত্যেন বসু ছিলেন 'যুগান্তর' নামক বিপ্লবী দলের সভ্য। তিনি মেদিনীপুরে তাঁতশালা খুলেছিলেন। এখানে ৩০টি বালক থাকত—তারা নিজেরাই রান্না করে খেত আর তাঁতের কাপড় বোনার কাজ করত। এখানে গীতা পড়ানো হ'ত, ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের জীবনী ও অন্যান্য বই পড়ান হ'ত। ক্ষুদিরাম এখানে এসে আশ্রয় নিলেন এবং দিদির বাড়ী পরিত্যাগ করলেন ১৯০৫ সালে।

খুব উৎসাহের সঙ্গে তিনি প্রাচীর ডিঙ্গান, ছাদ থেকে লাফ দেওয়া, লাঠি-ছোরা খেলা, রিভলবার ছোঁড়া অভ্যাস করতে থাকেন। স্বদেশী আন্দোলনের কালে বিলিতী জিনিস পোড়াতেন, লবণের নৌকা ডুবিয়ে দিতেন, বিলিতী কাপড়ের গাড়ি লুঠ করতেন।

১৯০৬-৭ সালে কাঁসাই নদীতে বন্যা হয়। ছুটলেন ক্ষুদিরাম রণ-পা নিয়ে। এক বৃদ্ধ ও তাঁর বিষয় সম্পত্তি তিনি মরণ পণ ক'রে রক্ষা করলেন। কোথাও আগুন লাগলে, কলেরা-বসন্তের প্রাদুর্ভাব হ'লে তিনি এগিয়ে যেতেন।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে মারাঠা কেল্লায় একটি শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে ক্ষুদিরাম "সোনার বাংলা" নামে একটি পুস্তিকা বিলি করতে থাকেন। সেটি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও গালাগালিতে পূর্ণ ছিল। বিলি করবার সময় পুলিস তাঁকে ধ'রে ফেলে। ক্ষুদিরাম ঘুঁষি শিখছিলেন। তিনি পুলিসকে ঘুঁষি মারতে মারতে পালিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পালিয়ে থেকে আবার ধরা দেন। গভর্ণমেন্ট তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক মামলা আনে। মোকদ্দমা সেশানে যায়। কিন্তু তাঁর অল্প বয়সের জন্যই গভর্ণমেন্ট মামলা উঠিয়ে নেয়।

১৯০৭ সালে পুজোর সময় তিনি দিদির বাড়ী যান। কালীপুজোর সময় কৃষ্ণপক্ষের এক সন্ধ্যায় ক্ষুদিরাম ডাক-হরকরার মেলব্যাগ ছিনিয়ে নেন। সেই রাত্রেই আট মাইল জলকাদা ভেঙে গোপালগঞ্জে ট্রেনে চ'ড়ে মেদিনীপুর চ'লে যান। গুপ্ত সমিতির টাকার প্রয়োজন ছিল।

মিঃ কিংসফোর্ড ছিলেন কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে 'নবশক্তি' পত্রিকাকে একবার, 'যুগান্তর'কে তিনবার এবং

'বন্দেমাতরম্'কে একবার বিচার করেন এবং অভিযুক্তদের অনেককেই কঠোর শাস্তি দেন।

এইরূপ একটা মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিপিন পালকে ছয় মাসের সাজা দেন কিংসফোর্ড। এই বিচারের রায়দানের দিনে আদালতে যে ভীড় হয় তা দমন করবার জন্য কিংসফোর্ড ব্যাটন চার্জ করার আদেশ দেন। জনতার উপর ব্যাটন চার্জ করা হয়। বালক সুশীল সেন ইওরোপীয় সার্জেন্টের ব্যাটনের মার খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সার্জেন্টকে প্রহার করতে করতে 'বন্দেমাতরম্' চীৎকার করতে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধেও মামলা হয়। ঐ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডই ১৪ বছরের বালক সুশীল সেনকে ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন। সেদিনই আলিপুর জেলে নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাতে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সুশীল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করতে থাকেন। লোকে গাইল—"বেত মেরে কি মা ভোলাবে, আমি কি মা'র সেই ছেলে? মার খাবে জীবন চ'লে বন্দেমাতরম্ ব'লে।"

বিচারক কিংসফোর্ডের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি বেড়াতে বের হ'লেও ছেলেরা হাততালি দিত, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত, ভেংচি কাটত, বন্দেমাতরম ব'লে চীৎকার করত। তিনি কলকাতায় আর টিঁকতে না পেরে মজঃফরপুরে বদলী হন।

বিপ্লবী নেতারা গোপনে স্থির করেন কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডই উচিত শাস্তি। একদিকে অপরাধীর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন, অন্যদিকে দেশবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস আনা প্রয়োজন ছিল যে অত্যাচারীকে আমরা শাস্তি দিতে পারি এবং ক্ষমতা রাখি।

এই কাজের জন্য নির্বাচিত হ'লেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী।

প্রফুল্ল চাকী উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার বিহার গ্রামে ১৮৮৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর (বাংলা ১২৯৫ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ চাকী, মাতা স্বর্ণময়ী দেবী।

১৯০৪ সালে তিনি রংপুর জিলা স্কুলে পড়তে চলে যান এবং 'বান্ধব সমিতি'তে যোগ দেন। সেখানে শরীরচর্চা ক'রে তিনি শরীরকে সুগঠিত ও মজবুত ক'রে তুলেছিলেন। 'বান্ধব সমিতির সেবা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রফুল্ল ও তাঁর বন্ধুরা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে রোগীর সেবা ও মৃতের দাহ করতেন।

জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় উত্তরবঙ্গে বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন। পরে তিনি স্বামী মহেশ্বরানন্দ হন। বিপ্লবী ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তীও প্রফুল্লর ওপর প্রভাব বিস্তার করেন।

রংপুরে কার্লাইলের সার্কুলার প্রচারিত হয় যে, রাজনৈতিক সভায় যোগদান করলে ছাত্ররা শাস্তি পাবে। রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্রের দল এই সার্কুলার অমান্য করে—তাদের মধ্যে প্রফুল্ল একজন। প্রত্যেক ছাত্রকে এক টাকা ক'রে জরিমানা করা হয়। না দিলে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হবে। দুইশত ছাত্রের মধ্যে প্রায় দেড়শত ছাত্র জরিমানা দিলেন না এবং তাঁরা বহিষ্কৃত হন—প্রফুল্লও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। বহিষ্কৃত ছাত্রদের নিয়ে উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ জাতীয় বিদ্যালয় গঠন করেন। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমেও শরীরচর্চা, সেবাবৃত্তির অনুশীলন ও গীতাপাঠ প্রভৃতি করা হ'ত।

১৯০৫ সালে 'যুগান্তর' নামক বিপ্লবীদের মুখপত্রের মধ্য দিয়ে কলকাতার বিপ্লবীদের সঙ্গে রংপুরের বিপ্লবীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৯০৬ সালে রংপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে প্রফুল্ল চাকী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনা করেন।

১৯০৬ সালে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ রংপুর আসেন—পরিচয় হ'ল প্রফুল্লর সঙ্গে। বিপ্লবী কাজের অর্থসংস্থানের জন্য রংপুর স্টেশনে ডাকগাড়ি লুঠ করার পরিকল্পনা করা হয়—দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেন প্রফুল্ল তাঁদের একজন। কিন্তু এই পরিকল্পনা সফল হয় নাই।

১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে দলের নির্দেশে প্রফুল্ল কলকাতা চ'লে আসেন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে।

১৯০৮ সালে তাঁর উপর নির্দেশ আসে অত্যাচারী ও স্বদেশীদের দণ্ডদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে নিশ্চিহ্ন করার।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রফুল্লকে ১৫ গোপীমোহন দত্ত লেনে নিয়ে যান ও তাঁর ব্যাগে বোমা দিয়ে দেন। তারপর তাঁকে নিয়ে বারীন ঘোষ ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে গিয়ে হেমদাস ও ক্ষুদিরামের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে তাঁরা প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামকে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে দুজনকেই মজঃফরপুর পাঠিয়ে দেন। দুজনকে তাঁরা তিনটে পিস্তল দিয়ে দেন।

দুজনেই মজঃফরপুর পৌঁছে কিশোরীমোহন ব্যানার্জির ধর্মশালায় ওঠেন। ক্ষুদিরাম নাম নেন দুর্গাদাস সেন এবং প্রফুল্ল নাম নিলেন দীনেশচন্দ্র রায়।

ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের বাংলোর কাছেই এই ধর্মশালা। কিংসফোর্ডের গতিবিধির উপর ও তাঁর গাড়ি ক'রে ক্লাবে যাতায়াতের উপর তাঁরা নজর রাখতে থাকেন।

৩০শে এপ্রিল ১৯০৮ সাল। সেদিনও তাঁরা কিংসফোর্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন। যথারীতি নিজের ফিটনে উঠে কিংসফোর্ড ক্লাবে যাবার পরই প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম প্রস্তুত হয়ে মস্ত বড় একটা গাছতলায় অপেক্ষা করতে থাকেন।

গাড়িটার বাড়ী ফেরার আওয়াজ টের পেয়েই তাঁরা দেখেন অবিকল সেই গাড়ি, সেই ঘোড়া। গাড়িটা যখন তাঁদের খুব কাছে আসে তাঁরা বোমা ছোঁড়েন। গাড়ি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং আগুন ধ'রে যায়। তৎক্ষণাৎ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দুইজন ছুটে চললেন। তাঁরা জানলেনও না যে কিংসফোর্ডের বদলে মিসেস্ কেনেডি ও তাঁর কন্যা মিস্ কেনেডি নিহত হয়েছেন। ক্ষুদিরাম ওয়াইনি ষ্টেশনের দিকে ও প্রফুল্ল সমস্তিপুরের দিকে ছুটতে থাকেন খালি পায়ে।

ক্ষুদিরাম সারারাতে চব্বিশ-পঁচিশ মাইল দৌড়াবার পর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ওয়াইনি ষ্টেশনে পৌঁছে এক জায়গায় ব'সে পড়েন এবং জল খেতে চান। কিন্তু জল পান করা আর তাঁর হ'ল না। মুখের কাছে জল তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখেন দু'জন পুলিশ আসছে। তৎক্ষণাৎ পিপাসার জল ফেলে রেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কনস্টেবল জিজ্ঞেস করে, কোথা থেকে আসছেন? ক্ষুদিরাম বলেন, বাঁকীপুর থেকে আসছেন, তেজপুর যাবেন।

পুলিশের কেমন সন্দেহ হয়। একজন পুলিশ তাঁর ডান হাতখানা ধ'রে ফেলে। ধস্তাধস্তির সময় ক্ষুদিরামের একটা ভারী পিস্তল পড়ে যায়। ক্ষুদিরাম পকেট থেকে ছোট পিস্তলটা বাঁ হাত দিয়ে বার করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্লান্ত ক্ষুদিরাম আর পারলেন না। ১লা মে, ১৯০৮ সাল, সকাল প্রায় ৯টায় ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পর তাঁর পকেটে ৩০টা কার্টিজ, তিন-খানা ১০ টাকার নোট, কয়েকটা খুচরা পয়সা এবং টাইম টেবলের কয়েকটা কাগজ পাওয়া যায়।

পুলিশের কাছ থেকে গভীর দুঃখের সঙ্গে ক্ষুদিরাম জানলেন কিংসফোর্ড মারা যান নি—তার বদলে দুটি নিরপরাধ শ্বেতাঙ্গ মহিলা নিহত হয়েছেন।

ওদিকে প্রফুল্ল চাকী সারারাত্রি হেঁটে সমস্তিপুর পৌঁছান। সেখানে নতুন কাপড় ও জুতো কিনে পরে নেন। মোকামাঘাটের টিকিট কিনে উঠে বসলেন ট্রেনের ইণ্টারক্লাসে। সেই কামরাতেই উঠলেন সিংভূমের পুলিশ সাব ইন্সপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জি। প্রফুল্লর সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক আলোচনা এমনভাবে করতে থাকেন যেন তিনিও একজন স্বদেশী। প্রফুল্ল তাঁকে নিজ মতাবলম্বী মনে ক'রে ভুল করলেন।

মোকামাঘাট এসে গেল। নন্দলাল টেলিগ্রাম ক'রে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেন প্রফুল্লকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করবার।

ট্রেন থেকে নেমে প্রফুল্ল নন্দলালের জিনিষপত্র নিজের কাঁধে বহন করেন। প্রফুল্ল হাওড়ার টিকিট কিনে প্লাটফর্মের দিকে যাচ্ছেন এমন সময় নন্দলাল একজন কনেস্টবলকে হুকুম দেন—ওকে গ্রেপ্তার করো।

প্রফুল্ল চীৎকার করে ওঠেন—তুমি বাঙালী হয়ে আমায় গ্রেপ্তার করিয়ে দিচ্ছ? তিনি দৌড়াতে থাকেন।

এদিকে ষ্টেশনে তখন বহু পুলিশ গুপ্তভাবে রয়েছে। একজন পুলিশ তাঁকে প্রায় ধ'রে ফেলেছিল। প্রফুল্ল তাঁকে ধস্তাধস্তি করেন। তৎক্ষণাৎ পিস্তল বার ক'রে তিনি প্লাটফর্মের অন্যদিকে চ'লে গেলেন।

আর একজন কনেস্টবল এসে পড়ল। প্রফুল্ল গুলী ছুঁড়লেন—লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল। আগের কনেস্টবল আবার তাঁর দিকে আসতে থাকে। পুলিশের ব্যূহের ভিতর থেকে প্রফুল্লর পালাবার আর উপায় রইল না।

জীবিত থাকতে শত্রুর হাতে ধরা দেবেন না এই ছিল তাঁর আবাল্য শিক্ষা ও পণ। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পিস্তল দৃঢ়হাতে ধ'রে নিজের শরীরে দু'টি গুলী করেন। একটি গলায়, অন্যটি মুখ ও মস্তিষ্ক ভেদ ক'রে চ'লে যায়। প্রাণহীন দেহ তাঁর ধরায় লুটিয়ে পড়ল। তারিখ ২রা মে, ১৯০৮ সাল।

প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তারকারী পুলিশ ইন্সপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জীকে কলকাতা সার্পেন্টাইন লেনে ১৯০৯ সালের ৯ই নভেম্বর বিপ্লবীরা গুলী করে নিহত করেন। এই বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হন নাই।

ক্ষুদিরাম কোর্টে প্রফুল্লর মৃতদেহ সনাক্ত করা সত্ত্বেও পুলিশ নিশ্চিত হ'তে পারে নাই। প্রফুল্লর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্পিরিটের মধ্যে ডুবিয়ে কলকাতা পাঠান হয়। কটো প্রফুল্লর মা স্বর্ণময়ী দেবী সনাক্ত করবার পর পুলিশ নিশ্চিত হয়।

মস্তক সনাক্ত হবার পর তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা দেহ পাবার জন্ত প্রার্থনা করেন কিন্ত ইংরেজ তাঁর মস্তক বা দেহ কিছুই দেয় নাই। বর্তমানে ক্রী-স্কুল ষ্ট্রীট নামে যে রাস্তা আছে সেখানে পুলিশ প্রফুল্লর মস্তক প্রোথিত করে।

প্রফুল্লর আত্মীয় ও বন্ধুগণ খরস্রোতা করতোয়া নদীর তীরে তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ ক'রে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

ওদিকে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায় মজঃফরপুরে। ট্রেন প্লাটফর্মে আসামাত্র গাড়ির ভিতর থেকে কিশোর ক্ষুদিরাম চীৎকার করেন—বন্দেমাতরম্। প্লাটফর্মের ভীড় গলা ছেড়ে চীৎকার ক'রে ওঠে—বন্দেমাতরম্।

ট্রেন থেকে নেমে এলেন প্রশান্তবদন ক্ষুদিরাম।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সমর্থক স্টেটসম্যান লিখেছিলেন—

" . . The Railway station was crowded to see the boy. A mere boy of 18 or 19 years old he looked quite determined. He (the escorting police officer) come out of a first class compartment with the boy who walked all the way to phaeton, kept for him outside, like a cheerful boy who knows no anxiety . . . On taking his seat the boy lustily cried, Bandemataram. . . ."

ক্ষুদিরামের মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল, দীপ্ত। দুইদিকে দুই জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের মাঝখানে বসলেন বালক ক্ষুদিরাম ফিটনে। ফিটন গেল ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের জেরায় ক্ষুদিরাম সমস্ত স্বীকার করেন। সমস্ত অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নেন—বোমা তিনিই ছোড়েন। দীনেশ অর্থাৎ প্রফুল্লকে তিনি চেনেন। তাঁরা মনে করেছিলেন কিংসফোর্ডই গাড়িতে আছেন। তাঁর বদলে দুইজন মহিলার মৃত্যু হওয়াতে তিনি খুবই দুঃখিত হন।

পরে ম্যাজিষ্ট্রেট উডম্যানের কাছে প্রফুল্লর মৃতদেহ সনাক্ত করেন।

১৯০৮ সালের ৮ই জুন মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের বিচার আরম্ভ হয়—বিচারক মিঃ কার্ণডফ্।

ক্ষুদিরাম কোর্টে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। কোর্টে তাঁর উকীল সতীশ চক্রবর্তী ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞেস করেন—কাউকে কি তোমার দেখতে ইচ্ছা হয়?

—হ্যাঁ, আমার জন্মভূমি মেদিনীপুরকে দেখতে ইচ্ছা করে। দিদি আর তাঁর ছেলেমেয়েদেরও দেখতে ইচ্ছা করে।

—তোমার মনে কোনরকম দুঃখ আছে?

—না, কিছু না।

—জেলের মধ্যে তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে?

—খারাপ নয়। খাবারটা খুব খারাপ লাগে, তাই শরীরটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। একটা নির্জন কুঠুরীতে আমাকে দিনরাত বন্ধ করে রেখে দেয়, শুধু স্নানের সময় ছাড়া। খবরের কাগজ বা বই পড়তে দেয় না, পেলে বড় ভালো হ'ত।

—তোমার মনে কোনো ভয় হয় কি?

হাসিমুখে ক্ষুদিরাম উত্তর দিলেন—"ভয় হবে কেন? আমি কি গীতা পড়ি নি?

—তুমি ত আগেই অপরাধী ব'লে স্বীকার করেছ!

—কেন স্বীকার করব না?

সতীশবাবু বলেন,—"ক্ষুদিরাম, ভগবানকে স্মরণ রেখো।"

জজ কার্ণডফ ক্ষুদিরাম বসুকে ফাঁসীর হুকুম দেন।

ফাঁসীর হুকুম শুনে ক্ষুদিরাম মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

আশ্চর্য হয়ে জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হ'ল, তা তুমি বুঝতে পেরেছ?"

হাসিমুখে ক্ষুদিরাম উত্তর দিলেন—"বুঝেছি।"

মুখে কোন চঞ্চলতা নেই।

তিনি বললেন—যদি আমাকে অনুমতি দেওয়া হয় তা হ'লে কি ক'রে বোমা তৈরী করা হয়েছিল তা শুনিয়ে যাই।

জজ হুকুম দিলেন—আসামীকে জেলে নিয়ে যাও।

ফাঁসীর হুকুমের পর ক্ষুদিরাম গীতা, রামকৃষ্ণের উপদেশ, মহাভারত, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী শেষবারের মতো পড়েন।

ফাঁসীর আগের দিন তিনি তাঁর উকিল কালিদাস বসুকে বলেন—রাজপুত মেয়েরা যেমন নির্ভয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন করতেন আমিও তেমনি নির্ভয়চিত্তে প্রাণ দেব।

১১ই আগষ্ট ১৯০৮ সাল। অতি ভোরে উঠে ক্ষুদিরাম স্নান ও প্রার্থনা করেন। তারপর নিয়ে যায় তাঁকে বধ্যভূমিতে।

মরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে দৃঢ়পদে ক্ষুদিরাম চলেছেন এগিয়ে। ভোর ৬টা। হাসিমুখেই তিনি ফাঁসীর দড়ি গলায় তুলে নিলেন।

শিখা। দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁট। খাপখোলা তরবারির মতন প্রীতি দৃপ্তভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

অনিমেষবাবু, কোনঠাসা করলে একটা নিরীহ জন্তুও ফিরে দাঁড়ায়। দাঁত দেখায়। মানুষ সভ্য জাত, এতটা পারে না। নিজেকে বাঁচাবার অধিকার সকলের আছে বৈ কি। প্রবলের কাছে দুর্বলের এ উদ্যম হয়ত বারবার পরাজিত হয়, কিন্তু তবু শক্তিহীনও যুদ্ধে যাবার আগে বাধা দেয়, প্রাণপণ শক্তিতে আত্মরক্ষা করে।

তবে টাকা দেবার প্রার্থনা নিয়ে আপনি কেন এসেছেন প্রীতিদেবী! অন্যায়ভাবে বিভাসবাবু যদি অভিযুক্ত হয়ে থাকেন, তা হ'লে যেখানে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয়, শেষ উত্তর সেখান থেকে পাওয়াই ভাল, তাই নয় কি?

মুহূর্তে প্রীতি যেন নিভে গেল।

মৃদু কণ্ঠে বলল, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার যেখানে হয় বলে আপনার ধারণা, আমার কিন্তু মনে হয় সেখানেও অর্থের খেলা। সবলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। যাক, এ সব নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। তর্ক করতে আজ আমি আসি নি। আমি এসেছি সংসার বাঁচাতে। আমি এসেছি আমার সন্তানকে বাঁচাতে।

সন্তান বাঁচাতে?

কথাটা অনিমেষের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ, তাই। আজ যদি আমার স্বামী বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন, তা হ'লে তাঁর জেল হবে। আমার ছেলের পরিচয় হবে সে চোরের সন্তান, জেলখাটা দুর্বৃত্তের সন্তান। সকলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। তার সহপাঠীরা আঙুল দিয়ে দেখাবে, স্কুলের শিক্ষকরাও তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে। তার ভবিষ্যত বলে কিছু থাকবে না। সমাজের ওপর, সংসারের ওপর দারুণ একটা ঘৃণা নিয়ে সে বাড়তে থাকবে। সেই জীবন্মৃত অবস্থা থেকে তাকে আমি বাঁচাতে চাই। যদি আমার প্রস্তাবে আপনারা সম্মত হন, তা হ'লে আমার স্বামী, সন্তান, সংসার সব অটুট থাকবে।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। পাখার বাতাসে কাগজ ওড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

প্রীতিই কথা বলল। দুটো হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, নমস্কার, দিন কুড়ি পরে আপনার কাছ থেকে খবর নেব। ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।

প্রীতি যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁচের দরজাটা কাঁপতে লাগল।

বাসবী এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতন বসেছিল। হাত-পা নাড়তেও ভুলে গিয়েছিল। তবু অনুভবে বুঝতে পারল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা জমেছে।

একটু একটু করে যেন তার চেতনা ফিরে এল।

আস্তে আস্তে বলল, আমি উঠি এবার।

অনিমেষ কোন কথা বলল না। একদৃষ্টে টেবিলের ওপর রাখা কাগজগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। বাসবীর কথা তার কানে গেছে, এমন মনে হ'ল না।

বাসবী আর দাঁড়াল না। দরজা ঠেলে বাইরে চলে এল।

বাইরে একেবারে স্বাভাবিক অবস্থা। ম্যানেজারের কামরার ঝড়ের কোন চিহ্ন বাইরে নেই। এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, এ কথা কেউ জানে না। সবাই মাথা নীচু করে কাজ করে চলেছে। এমন কি বেয়ারাগুলোও চুপচাপ যে যার টুলে বসে আছে।

বাসবী নিজের চেয়ারে বসে হাত নেড়ে বেয়ারাকে ডাকল। বেয়ারা কাছে আসতে এক গ্লাস জল চাইল।

ঢক ঢক করে পুরো গ্লাসটা শেষ করে রুমাল দিয়ে মুখটা মোছবার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো কানে এল।

আরে, নামকরা অভিনেত্রী, মুখস্থ-করা সংলাপ, ওদের কথাই আলাদা।

এ ধরনের কথা সারা অফিসে একটি লোকই বলতে পারে। অথচ সেই লোকটির দিকে চোখ ফিরিয়ে বাসবী অবাক হ'ল।

বিপিনবাবু একমনে ফাইল পড়ছে। আশপাশের কোন কিছুর দিকে নজর আছে এমন মনে হ'ল না।

বাসবী কোন প্রশ্ন করল না। চিঠির স্তূপ টেনে নিয়ে কাজে মন দিল।

কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে ভাবতে লাগল। পরশু যাত্রা করতে হবে। রাত আটটায়। গন্তব্যস্থানের নাম রাঙামাটি। আপাতত বাসবী এইটুকুই জানে।

এর আগে সে আর কোনদিন কলকাতা ছেড়ে বাইরে যায় নি। একদিনের জন্যও নয়। আশেপাশে এক-মাইল দূরেও নয়। বাসবীদের কোন আত্মীয়-স্বজনের নাম

কখনও সে শোনে নি। এক মামা বুঝি আছে পুণায়, কিন্তু বাসবী তাকে কোনদিন দেখে নি। মামা সম্ভবত বাসবীকে ছোটবেলায় দেখে থাকবে।

কলেজের সহপাঠিনীরা প্রায় প্রত্যেক ছুটিতে বাইরে যেত। কেউ সমুদ্র-সৈকতে কেউ পর্বত-শিখরে। কেউ বা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সব জায়গায়। ফিরে এসে চমকপ্রদ সব গল্প বলত। ফটো দেখাত। বাসবী গল্প শুনত, ফটো দেখত।

এ নিয়ে তার মনে ক্ষোভ হয়ত ছিল, কিন্তু সে ক্ষোভ সে কোনদিন প্রকাশ করে নি। নিম্ন মধ্যবিত্ত বংশের মেয়ে। অনেকের তুলনায় অনেক আগেই সে সংসারকে চিনতে শিখেছিল। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-বেদনা।

সে এটুকু বুঝেছিল, তাদের মতন লোকের সংসারে ভ্রমণ একটা বিলাসিতা।

সেই ভ্রমণ করার সুযোগ একদিন পরে তার জীবনে এসেছে, কিন্তু তবু বাসবী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে পারছে না।

প্রথম বাইরে যাবার সময় আনন্দের সঙ্গে ভয়ের মিশেল থাকে বৈকি। আলোকের পাশাপাশি শিহরণ। কিন্তু এ ভয় নয়, সে শিহরণও নয়।

নিছক আনন্দের জন্য এ ভ্রমণ নয়, সেটা ভেবেই বাসবী চকিত হ'ল।

অফিসের চেয়েও মারাত্মক কাজ তাকে অনুসরণ করবে। বিকাশবাবুর সর্বনাশের সোপান তৈরি করা। অবশ্য সে অন্যায়, কিন্তু সে নিরুপায়। বিকাশবাবুর যদি শাস্তি হয়, সব যদি জানাজানি হয়ে যায়, তা হ'লে প্রীতির সন্তাপ থেকে সেও নিষ্কৃতি পাবে না।

বাসবী মাথা নাড়ল। এ ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবার আর কোন উপায় নেই। চাকরির বন্ধনের সঙ্গে এ বন্ধন জড়িত।

নিশিবাবু টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

নিবারণের টেবিল থেকে মেশিনটা এনে একটু হাত দিন না। কিছুটা রপ্ত হয়ে নিন, যাতে কাজের সময় আটকায়।

বাসবী কোন উত্তর দিল না।

নিশিবাবু তবু দাঁড়িয়ে রইল।

কাজ থামিয়ে বাসবী মুখ তুলল।

কিছু বলবেন?

না, বলছিলাম, এই মেশিনটাই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি তা হ'লে? এটাতেই যখন আপনি প্র্যাকটিস করছেন।

বাসবী বুঝল এটা একটা সমস্যাই নয়। শুধু অন্য কথা বলার ভূমিকা মাত্র। নিশিবাবু আরও কিছু বলতে চায়।

তাই হ'ল।

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে নিশিবাবু বলল, সম্ভবত আর আপনার অফিসে আসার দরকার নেই, জিনিস-পত্র গোছগাছ করতে হবে ত?

এবার বাসবী কথা বলল।

আচ্ছা, কি কি জিনিস সঙ্গে নিতে হবে বলুন ত?

নিশিবাবু বুঝি এমন একটা প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে নিয়ে বাসবীর সামনে বসে পড়ল।

একটা সুটকেশ নেবেন জামাকাপড়ের, আর বিছানা নেবেন। মশারি নিতে ভুলবেন না। সবে জঙ্গল সাফ করা হচ্ছে কি না, দারুণ মশা।

হ্যাঁ, আর একটা কথা, জলের কুঁজো সঙ্গে নেবেন ট্রেনের জন্য।

কুঁজো বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। আপনারা বরং নিয়ে যাবেন, তৃষ্ণার্তকে জল দিতে নিশ্চয় আপনাদের আপত্তি হবে না।

নিশিবাবু হাসল, বাঃ আপনি থাকবেন লেডিজ কামরায়। আমরা আপনার তৃষ্ণার জল যোগাব কি করে?

এতক্ষণে বাসবী একটু আশ্বস্ত হ'ল। সে মিথ্যাই এতক্ষণ ভয় পাচ্ছিল। ট্রেনে যখন আলাদা কামরায় যাবে, তখন থাকার ব্যবস্থাও পৃথক হবে। কোন অসুবিধা হবে না। শুধু অফিসের কাজের জন্যই তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এ সহজ সত্যটা কেন যে সে বার বার বিস্মৃত হয়।

আর ওখানে থাকার ব্যবস্থা?

বাসবী জিজ্ঞাসা করে ফেলল।

কি জানি, সেটা ম্যানেজার সাহেব বলতে পারবেন। তিনিই লেখালেখি করছিলেন। আমার ওপর টিকেট কেনার ভার ছিল, সে কাজ আমি করেছি।

টিকেট কেনা হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। শিশিবাবু যাড় নাড়ল।

বাসবী কথা বলতে গিয়েই থেমে গেল।

ম্যানেজারের বেয়ারা এসে শিশিবাবুর সামনে দাঁড়িয়েছে।

সাহেব ডাকছেন।

শিশিবাবু উঠে সাহেবের কামরার দিকে চলে গেল।

বাসবী আবার ফাইলে মন দিল।

মন কিন্তু ফাইলে আবদ্ধ রইল না। আবোল-তাবোল চিন্তার মেঘ মনের আকাশে উঁকি দিতে লাগল।

দীপক যখন এ অফিসে যোগ দেবে, তখন বাসবী থাকবে না। সম্ভবত চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে খুঁজবে। কাতর দৃষ্টি মেলে দেখবে তার শূন্য চেয়ারের দিকে।

অবশ্য বাসবী যে কলকাতায় নেই, এ কথা জানাবার সহকর্মীর অভাব হবে না। শুধু এই খবরটুকুই নয়, কাউ হিসাবে আরও বেশী কিছু শোনাবে। রং চড়িয়ে, কল্পনার ফুলি ঝুলিয়ে মুখরোচক এক কাহিনী।

বাসবীকে নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ম্যানেজার সঙ্গে নিয়েছেন। এর বেশী তারা বলবে না। রহস্যের অন্ধকারে কিছু আবৃত থাক। বুদ্ধিমান যে তার বোঝার কোন অসুবিধা হবে না।

দীপকও বুঝবে। এর আগে বহুদিন সে স্বচক্ষে দেখেছে বাসবীকে ম্যানেজারের মোটর থেকে নামতে। এ ঘনিষ্ঠতাটুকু তারও হয়ত নজর এড়ায় নি।

যাবার দিন বাসবী অফিস কামাই করল না: বেলা দুটো নাগাদ বাড়ী চলে গেল। গৌরকে বলে গেল যে ছুটি হ'লেই যেন সে বাসবীর বাড়ীতে চলে যায়।

অনিমেষ বলে দিয়েছিল, ট্রেন সাড়ে আটটায়। বার্থ রিজার্ভ করা আছে। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আটটা পনেরোর মধ্যে হাওড়া পৌঁছাতে পারলেই যথেষ্ট।

কিন্তু সাতটা বাজতেই বাসবী চঞ্চল হয়ে উঠল। জীবনে এই প্রথম বিদেশ-যাত্রা। ট্রেনে প্রথম রাত কাটাবে। রোমাঞ্চে, পুলকে, কিছুটা বা ভয়েও তার পক্ষে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠল।

সাতটা পনেরো হতেই বাসবী গৌরকে ডেকে ট্যাক্সি আনতে পাঠাল।

মা সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। স্যুটকেশ গুছিয়ে দেওয়া থেকে, বিছানা বাঁধা পর্যন্ত।

ট্যাক্সির কথা শুনে অবাক হয়ে গেল।

হ্যাঁ রে বাসী, তোর ম্যানেজার মোটর পাঠাবে না ?

বাসবী হাসল, না না, মোটর পাঠাবেন কেন ? তিনি নিজেই হয়ত ট্যাক্সিতে যাবেন।

ট্যাক্সিতে ? মা আশ্চর্য গলায় প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, তিনি নিজে মোটর চালান ত, কাজেই মোটর ফিরবে কি করে।

বিকাল থেকে রুবি আর খোকন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি আসবে. মোটঘাট নিয়ে দিদি বেরিয়ে যাবে, তারা দেখবে।

তাদের জীবনেও এই প্রথম। এ বাড়ী থেকে কাউকে বাইরে বেড়াতে যেতে তারা দেখে নি। বাবা এত বছর চাকরি করেছেন, তাঁকেও একদিনের জন্য নয়।

তাদের কৌতূহলের আরও একটি ব্যাপার ছিল।

বাড়ীতে নতুন একটি লোকের আমদানী হয়েছে। যে ক'দিন দিদি না ফেরে, সেই দেখাশোনা করবে। তত্ত্বাবধায়ক।

ইতিমধ্যেই গৌর দু'জনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে। নিজের দেশ নবদ্বীপের পোড়ামাতলার মেলার কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করে।

কিন্তু তবু দিদি না থাকলে রুবি আর খোকনের ভাল লাগবে না। দিদি কবে ফিরবে কে জানে। সকাল থেকে দিদি এত ব্যস্ত রয়েছে যে কথাটা তাকে জিজ্ঞাসা করার অবকাশই পাচ্ছে না। সব সময়ই মা সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে।

দু' একবার রুবি চেষ্টা করেছিল, মা ধমক দিয়ে উঠেছে, এখন বিরক্ত কর না রুবি। রাজ্যের কাজ পড়ে আছে।

রুবি পায়ে পায়ে খোকনের কাছে ফিরে এসেছে। মনমরা হয়ে। দিদি কবে ফিরবে সে কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, দিদি কোথায় যাচ্ছে, তাই তারা জানে না।

দশ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল।

বাবার ফটোতে প্রণাম সেরে, মা'র পায়ের ধুলো নিয়ে, রুবি আর খোকনকে আদর করে বাসবী সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

গৌর আগেই বিছানা আর স্যুটকেশ নামিয়ে নিয়ে গেছে।

খুব সাবধানে থেকো মা। নিজেকে বাঁচিয়ে চ'লো।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মা'র সতর্কবাণী কানে যেতেই বাসবী চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে দেখল মা সিঁড়ির মাঝ-বরাবর নেমে এসেছে। দু'টি চোখ জলে ভরা। আবেগে ওষ্ঠাধর থরথরিয়ে কাঁপছে।

তুমি ওপরে যাও মা। আমার জন্ত কোন ভয় নেই।

কথাগুলো বলতে গিয়ে বাসবী বুঝতে পারল, তারও চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

এ ভাবে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে কোথাও যাওয়া এই প্রথম ত বটেই, কিন্তু এই মুহূর্তে বাসবীর আরও মনে হ'ল, এরা বড় অসহায়। বাড়ীর মানুষটা চলে যাবার পর মুখের গ্রাসের জন্তও বাসবীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। বিপদে, বিপাকে সম্বল এই বাসবী।

একটা সামান্ত বেয়ারার ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে কি করে বাসবী নিশ্চিন্ত হবে।

ট্যাক্সি ছাড়বার আগে পর্যন্ত বাসবী গৌরকে অনেক উপদেশ দিল। সংসার সম্বন্ধে, সংসারের মানুষগুলোর বিষয়ে।

ওপর দিকে চেয়ে দেখল বারান্দার পর পর তিনজন। মা, রুবি আর খোকন। বাসবী মুখ তুলতেই রুবি ছোট হাতটা দোলাল।

ভীড় কাটিয়ে দ্রুতবেগে ট্যাক্সি অপেক্ষাকৃত নির্জন এলাকায় চলে এল। একটু পরেই অবারিত ময়দান। এক পাশে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ, অন্তদিকে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ। হু হু করে বাতাস বইছে। সেই বাতাসে বাসবীর চোখের জল শুকিয়ে গেল।

অদ্ভুত একটা কথা মনে এল। যদি বিয়েই হ'ত বাসবীর, তা হ'লে ত এ সংসার থেকে তাকে সরে যেতে হ'তই। অবশ্য সে স্বামীকে বোঝাত যে এদের নিঃসহায় অবস্থায় রেখে কোথাও সে যেতে পারবে না। যাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু এমন যদি হত, স্বামী বদলী হ'ত বিদেশে। তার সঙ্গে যাওয়া ছাড়া বাসবীর গত্যন্তর থাকত না। তা হ'লে সংসারের কোন একটা ব্যবস্থা করে যেতেই হ'ত তাকে। মা'র চোখের জল, ভাই-বোনের ম্লান মুখ তার পথরোধ করতে পারত না।

বাসবী সোজা হয়ে বসল। আঁচল দিয়ে দুটো চোখ মুছে নিল। যত আবোল-তাবোল চিন্তা মগজে বাসা বেঁধেছে। এ ভাবনার হাত থেকে বাসবীর নিস্তার নেই।

ট্যাক্সি যখন বাসবীকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে গেল তখন আটটাও বাজে নি। খুঁজ করে বাসবী টিকেটটা নিশিবাবুর কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিল। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট। মেয়েদের কামরায় সংরক্ষিত আসন।

সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম। বাসবী খোঁজ নিয়ে জানল গাড়ি এখনও প্ল্যাটফর্মে আসে নি। আসবে আরও পনের মিনিট পর।

মালপত্র নিয়ে বাসবী প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চের ওপর বসল। বইয়ের ষ্টল থেকে একটা মাসিক পত্রিকা কিনেছিল। সারা রাত ঘুম নিশ্চয় হবে না। জীবনের রোমাঞ্চকর এমন এক প্রথম অভিজ্ঞতাকে ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেবে না। জানলার ধারে বসে বসে দেখবে। অন্ধকারে পরিষ্কার কিছু দেখা যাবে না। চাঁদিনী রাত কি না বাসবীর জানা নেই। জ্যোৎস্নার ইশারা না থাকলেও ক্ষতি নেই, অন্ধকারে গতির বেগে অপূর্ব এক উন্মাদনা আছে। হাতে মাসিকপত্র নিয়ে, বিনিদ্র রজনী কাটাবে বাসবী সেই উন্মাদনা উপভোগ করতে করতে।

আরে, কতক্ষণ?

বাসবী চমকে মুখ ফেরাল।

পিছনে নিশিবাবু। তার পিছনে কুলির মাথায় মোট-ঘাট।

আমি একটু আগেই এসে পড়েছি।

পরে আসার চেয়ে আগে আসাই ভাল। আমিও যেখানে যেতে হয়, একটু আগেই আসি।

নিশিবাবু তার চিরাচরিত রসিকতা করল। তারপর পিছনের কুলিকে স্যুটকেশ আর বিছানাটা নামিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে বাসবীর পাশে বসে পড়ল।

অনিমেষবাবু আসেন নি?

নেহাৎ কিছু একটা বলা দরকার এই ভাবেই বাসবী কথাটা বলল।

নিশিবাবু দুটো চোখ কুঁচকে মুচকি হাসল। শব্দহীন

হাসি। আড়চোখে বাসবীর দিকে দেখতে দেখতে বলল, আসবেন, আসবেন, ম্যানেজার সাহেব ঠিক সময়ে আসবেন। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী, গাড়ি ছাড়ার পাঁচ-দশ মিনিট আগে এসে পৌঁছবেন। আপনি উতলা হবেন না।

শেষ কথাটায় বাসবী লজ্জিত হ'ল। দু'টি গাল আরক্ত। কিছুক্ষণ মুখ তুলে চাইতেই পারল না। নিশিবাবুই কথা বলল।

হাতে ওটা কি পত্রিকা?

পত্রিকাটা বাড়িয়ে দিয়ে বাসবী মৃদু গলায় বলল, পাদপ্রদীপ।

সিনেমার কাগজ?

বাসবী ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ।

মাপ করবেন, ও সব কাগজের রস গ্রহণ করতে পারব না। সিনেমার সঙ্গে আমার দশ-বার বছর কোন সম্পর্ক নেই। বন্ধুবান্ধবদের মুখে শুনি ওই পর্যন্ত। আপনি বুঝি এ সব বই খুব পড়েন?

না, না, বাসবী দ্রুততালে মাথা নাড়ল, আমারও এ সব বিষয়ে কোন শখ নেই। নেহাৎ ট্রেনে পড়বার মতন কিছু একটা দরকার, তাই একটা কিনলাম।

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে গভীর অপরাধবোধ বাসবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। পত্রিকাটির মূল্য দশ আনা। বাসবীদের সংসারে এই দশ আনার দাম কম নয়। একটা রাতের শখের জন্য এ অপব্যয় অর্থহীন।

সব অভিনেত্রীদের চটকদার জীবনী থাকে ওই সব কাগজে, তাই না? কেউ বঁটি পেতে কুটনো কুটছে, কেউ বাটনা বাটছে, কেউ ভাত রাঁধছে। এই সব গৃহলক্ষ্মী সিরিজের ছবি।

হঠাৎ থেমে নিশিবাবু সুর করে বলে উঠল, হায় বিধি, দেখিলাম কত কালে, কালে। পতিও পদ্মিনী হ'ল সিনেমা জার্নালে।

নিশিবাবু যেন বদলে গেছে। অফিসের গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়েছে। বাসবী তার সেকশনের কনিষ্ঠা কেরাণী নয়, যেন আবাল্য সহচরী।

নিশিবাবু হয়ত আরও কিছু বলত কিন্তু পারল না। ধূম উদ্গীরণ করতে করতে লৌহদানব এগিয়ে আসছে। শব্দে চারদিক মুখরিত করে।

প্ল্যাটফর্মের সবাই মোটঘাট নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাসবীও উঠে দাঁড়াচ্ছিল, নিশিবাবু হাত নেড়ে বারণ করল।

আহা হা, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমাদের সীট ত রিজার্ভড। গাড়ি থামুক, তারপর উঠলেই হবে।

গাড়ি থামল।

প্রথমে নিশিবাবু, তার পিছনে বাসবী, সবচেয়ে শেষে দু'জন কুলি।

একটু এগোতেই বাসবীর কামরা পাওয়া গেল।

নিন, এবার উঠে পড়ুন। নিশিবাবু বাসবীকে নির্দেশ দিল।

বাসবী উঠে বসল। তারপর কুলি।

বাইরে দাঁড়িয়ে নিশিবাবু বলল, বিছানাটা একেবারে পেতে ফেলুন। গাড়ি ছাড়লেই শুয়ে পড়বেন। আমি আমার জায়গাটা দেখে আসি।

সীটের ওপর বাসবী বিছানাটা পাতল, তারপর শিশুসুলভ কৌতূহল নিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। দু' জনের শোবার ব্যবস্থা আছে। মাথার ওপর ছোটো পাখা। অনেকগুলো আলো। উঠে গিয়ে বাসবী একবার বাথরুমটা দেখে এল। বাথরুমের আয়নায় নিজের ছবিটা প্রতিফলিত হ'ল। বেশ ঝকঝকে, তকতকে দেখাচ্ছে তাকে।

বাসবী বিছানার ওপর এসে বসল। কোন দিন কি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চেপে এভাবে দূরদেশে রওনা হবে। খোকন আর রুবি এখানে থাকলে বিস্ময়ে তাদের মুখচোখের কি অবস্থা হ'ত, কল্পনা করেও বাসবীর হাসি পেল।

হ্যাল্লো, মিস সেন।

আচমকা কণ্ঠস্বরে বাসবী বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

ঠিক জানলার ওপারে, প্ল্যাটফর্মের ওপর অনিমেষ রায় দাঁড়িয়ে। হাতকাটা সিল্কের সার্ট, গাঢ় রঙের প্যান্ট। হাতের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। কান্তিমান পুরুষ অনিমেষ। এই পোশাকে যেন তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

কতক্ষণ এসেছেন?

বাসবী ইতিমধ্যে একটু ধাতস্থ হয়েছে। বিছানার ওপর বসে বলল, অনেকক্ষণ। ট্রেন স্টেশনে ইন করারও আগে।

মার্ভাস ইয়ং লেডি। অনিমেষ সহাস্তে বলল।

নিশিবাবুও এসেছেন।

কতকটা যেন আত্মদোষ খালনের জন্তই বাসবী বলল। তাৎপর্য, শুধু সেই সময়ের অনেক আগে আসে নি, অফিসের নিশিকান্ত সরকারও এসেছেন।

অনিমেষ নিজের কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, এখনও মিনিট পনের বাকি। আমি একেবারে পাশের কামরাতেই রয়েছি। মাঝে মাঝে স্টেশনে নেমে আপনার খবর নেব।

বাসবীর খুব ইচ্ছা হ'ল নেমে একবার ফার্স্ট ক্লাশটা দেখবে। সেটা নিশ্চয় ইন্দ্রভুবনের সমতুল্য। দ্বিতীয় শ্রেণীই যদি এত ভাল হয়, তা হ'লে প্রথম শ্রেণীর বিলাস-বৈভব, সজ্জা-উপকরণ কত উঁচু পর্যায়ের তা সে কল্পনাও করতে পারল না।

কিন্তু নামতে পারল না। লজ্জা এসে বাধা দিল। অনিমেষ সরে গেছে জানলা থেকে। ধারে-কাছে ওকে দেখা গেল না। জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্ম। চেনা মানুষকেও চেনবার উপায় নেই।

তা ছাড়া একটি স্থূলকায়া মহিলা কামরায় উঠছে। পিছনে শিশুর মিছিল।

বাসবী বিছানার ওপর পা তুলে বসল। বসে বসে গুনল। এক, দুই, তিন, চার। তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে। পিছনে একটি প্রৌঢ়ও উঠল। কিছুক্ষণ হুড়-তাড়া নিয়ে চেঁচামেচি। তারপর ছেলেদের ধমক। মুহূর্তে কামরাটা সরগরম হয়ে উঠল।

প্রৌঢ় বিছানা পেতে দিয়ে, ট্রাঙ্ক দুটো সীটের তলায় ঢুকিয়ে নেমে গেল। ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে দুটো সীটে পাশাপাশি করে শুয়ে পড়েছে।

মহিলাটি ঘোমটা খুলে বালিশের তলা থেকে পানের বাটা বের করে দুটো খিলি মুখে পুরল। তারপর কুতকুতে চোখ দিয়ে বাসবীকে জরিপ করতে করতে বলল, আপনার কোন্ স্কুল?

প্রশ্নটা বাসবীর ঠিক বোধগম্য হ'ল না।

কিছু বললেন? বাসবী প্রতি-প্রশ্ন করল।

বলছিলাম, আপনার কোন স্কুল? কোথায় পড়ান?

বাসবী কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, আমি ত পড়াই না কোথাও।

নিজের শাড়ী সামলে মহিলা আমলা দিয়ে মুখ মোছ করে পানের রসটা বাইরে ফেলে বলল, আপনি মাষ্টারনী নন?

না, আমি অফিসে চাকরি করি।

অ, বেড়াতে চলেছেন বুঝি? কতদূর যাবেন?

বাসবী উত্তর দিতে গিয়েই বাধা পেল। আবার জানলায় অনিমেষ রায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ট্রেনে ঘুম হয় আপনার?

বাসবী হাসল, কি জানি ট্রেনে ত কোন দিন রাত কাটাই নি। কি করে বলব।

এই কাগজটা রাখুন। ঘুম না হ'লে চোখ বোলাতে পারবেন। খাবেন কিছু?

বাসবী ঘাড় নাড়ল, না, আমি রাতের খাওয়া শেষ করেই এসেছি।

কোল্ড ড্রিংক?

না।

অনিমেষ সরে গেল।

নিজের কামরার দিকে চোখ ফিরিয়েই বাসবী অপ্রস্তুত হ'ল।

শুধু মহিলাই নয়, ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে।

কথা মহিলাই বলল।

ওই ভদ্রলোকের সঙ্গেই বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি?

কথাটা এমন কিছু মারাত্মক নয় কিন্তু মহিলার বলার ধরনে, শ্লেষের স্পর্শে কথাটা যেন নতুন রূপ নিল।

বাসবী একটু দৃঢ়কণ্ঠে বলল, না, কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি না। অফিসের কাজে যাচ্ছি। ও ভদ্রলোক আমাদের অফিসের ম্যানেজার।

তার উত্তরের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য না করেই বাসবী অনিমেষের দেওয়া পত্রিকাটা তুলে নিল। ইভস্ উইকলি। পাতায় পাতায় মেয়েদের জীবনের নানা সমস্যার কথা থেকে শুরু করে আধুনিকতম সাজপোশাকের বিবরণ। এ পত্রিকা বাসবীকে বিশেষ আকৃষ্ট করবে না। এ সাজপোশাকের নাগাল পাওয়া তার সাধ্যাতীত। বাসবীর মনে হ'ল, আজকাল আর মেয়েদের আলাদা করে কোন সমস্যা নেই। পুরুষ আর নারীর সমস্যা মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে।

কারণ পুরুষের এলাকায় মেয়েরা আসতে আরম্ভ করেছে। তাদের জীবনের কমনীয় দিক, গৃহস্থালীর দিক প্রায় নিশ্চিহ্ন।

হঠাৎ হেঁচকা টানে বাসবী সচেতন হ'ল। ট্রেণ চলতে সুরু করেছে।

হাতের পত্রিকা ফেলে বাসবী জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল।

আলোকিত মহানগরী তার হাজার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা নিয়ে চোখের সামনে থেকে অপসৃত হচ্ছে। প্ল্যাট-ফর্মের কোলাহল ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল। লৌহদানবের চাকার আর্তনাদ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

বাইরে অন্ধকার। আকাশে তারার দীপ্তিও নেই। ছোট ছোট শহরতলী দ্রুতবেগে পশ্চাদপসরণ করছে।

খুব ভাল লাগছে বাসবীর। এই ভাবে সব কিছু পিছনে ফেলে নক্ষত্রবেগে ছুটে চলা। ত্রুটি-বিচ্যুতি, রাগ-অনুরাগ সব পার হয়ে।

ছোট একটা স্টেশনে ট্রেণ থামল। বাসবী জানলা দিয়ে উঁকি দিল। অনিমেষ বলেছিল মাঝে মাঝে খবর নেবে। এক পাল লোক এদিক থেকে ওদিকে ছুটোছুটি করছে।

না, কেউ এল না। গাড়ি চলতে সুরু করল।

বাইরে থেকে কামরার মধ্যে বাসবী দৃষ্টি ফেরাল। গভীর নিদ্রার রাজ্য। কোলের ছেলেটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে মহিলা নিশ্চিন্ত-নিদ্রা যাচ্ছে।

পরিপূর্ণ সংসারের ছবি। এই রকম একটা জীবনই কি বাসবীর কাম্য ছিল? তিলে তিলে বেদ সঞ্চয় করে এমনি হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। অগণিত সন্ততি দিয়ে সুখে-দুঃখে মেশানো জীবন। কৃচ্ছ্রসাধন নয়, বাইরের উত্তেজনা নয়, নিস্তরঙ্গ তোলীর জীবন।

বালিশটা টেনে নিয়ে বাসবী শুয়ে পড়ল।

রাত কত, ঠিক খেয়াল নেই।

গোলমালে বাসবী বিছানার ওপর উঠে বসল। প্রথমে ঘুমচোখে ঠিক কিছু বুঝতে পারল না। কয়েকজনের চ্যাঁচামেচি। কুলির চীৎকার।

একটু একটু করে সব পরিষ্কার হ'ল। মহিলা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে নেমে যাচ্ছে। নীচে প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সেই চীৎকারে সব কিছু সরগরম করছে।

বাসবী বাইরে চোখ ফেরাল।

ছোটখাট একটা শহর। রাস্তার দু' পাশে জোরালো বাতির সার। রিক্‌শা আর ট্যাক্সির শব্দ। একটু দূরে আকাশের পটভূমিকায় অনেকগুলো উদ্ধতবাহু কারখানা দেখা যাচ্ছে। কোন একটা নতুন গড়ে-ওঠা শিল্পনগরী।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। পাণ্ডুর চাঁদের রশ্মি। সাধারণ জিনিসও মায়াময় বোধ হচ্ছে।

নামবার মুখে মহিলা একটু দাঁড়াল।

চলি ভাই। আপনি ওভাবে জানলা খুলে শোবেন না। এ পথে প্রায়ই চুরি-ডাকাতি হয়। দরজাটা বন্ধ করে দিন।

বাসবী দ্রুত হাতে জানলাগুলো বন্ধ করে দিল।

এবার বাসবী একেবারে একলা। কামরা খালি। মাঝপথে আবার কেউ উঠবে কি না কে জানে।

বাসবী উঠে দাঁড়িয়ে অনেক চেষ্টার পর দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

বালিশে মাথা দিয়ে বাসবী শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু ঘুম এল না। হাজার এলোমেলো চিন্তায় মস্তিষ্ককোষ আচ্ছন্ন করে ফেলল।

কিছু বলা যায় না। খবরের কাগজে প্রায়ই ট্রেণে চুরি-ডাকাতির খবর বের হয়। বাসবীর কাছে তস্করের আকর্ষণীয় কিছু নগদ নেই। না অর্থ, না অলঙ্কার। কিন্তু এ সব ত পরের কথা। কিছু না পাওয়ার আক্রোশে একটা মানুষের প্রাণনাশ করা দুর্বৃত্তদের অসাধ্য নয়।

নিজের কথা বাসবী যতটা না ভাবল, তার চেয়ে বেশী ভাবল তার অবর্তমানে সংসারের কথা। গোটা সংসার একেবারে তছনছ হয়ে যাবে। মা'র সাধ্য নেই কোন রকমে ধ্বংসের হাত থেকে এতগুলো প্রাণীকে বাঁচাবার।

বাসবী মনের মধ্যে সাহস আনল। আসল ভয়ের চেয়েও ভয়ের কল্পনা, ভয়ের চিন্তাটাই আরও মারাত্মক।

বাসবী উঠে একবার বাথরুমটা দেখে এল। বাথরুমের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে হাসি পেল। আলুথালু বেশ। ঘুম-ঘুম চোখ। খোঁপা খুলে পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। কপালের ওপর চুলের গুচ্ছ। বিকালের সযত্ন প্রসাধন নিশ্চিহ্ন।

ঠিক এমনই সময় অনিমেষ যার সামনে এসে দাঁড়াবে

বাসবী লজ্জায় মুখ লুকোবার জায়গা পেত না। সেই অবস্থা স্মরণ করেই বুঝি বাসবী শাড়ীর আঁচলে মুখ ঢেকে নিজের বিছানায় ফিরে এল।

জানলার কবাটের শব্দ হতেই বাসবী ধড়মড় করে উঠে বসল।

বেশ বেলা হয়েছে। জানলার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে কামরার মধ্যে। গাড়ি নিশ্চল হয়ে রয়েছে।

বাসবী তাড়াতাড়ি জানলাটা তুলে দিল। দিয়েই বিব্রত হ'ল।

প্ল্যাটফর্মের ওপর অনিমেষ দাঁড়িয়ে। পাশে বয়ের হাতে চায়ের সরঞ্জাম।

খুব ঘুমাতে পারেন ত আপনি! কাল রাত্রে বার চারেক খোঁজ করে গেছি। জানলা বন্ধ ছিল।

আপনার সঙ্গিনী নেমে গেলেন কখন?

ততক্ষণ বয় জানলা দিয়ে ট্রেটা এগিয়ে দিয়েছে। সাবধানে সেটা ধরে রাখতে রাখতে বাসবী বলল, আপনি চা খাবেন না?

আমার হয়ে গেছে। চা খেয়ে আপনি তৈরী হয়ে নিন। এর পরের স্টেশনই রাঙামাটি। অবশ্য এখনও চব্বিশ মাইল।

অনিমেষ সরে গেল। বাসবী উঠে মুখ-হাত ধুয়ে আবার এসে বসল বিছানায়। শুধু চা নয় তার সঙ্গে পাঁউরুটি আর ডিম।

আর একবার বাসবীর বাড়ীর কথা মনে পড়ে গেল। রবি আর খোকনের কথা। তাদের প্রাতরাশের নিত্য ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

চা পান শেষ হবার আগেই আবার দরজায় ধাক্কা।

জানলা দিয়ে বাসবী মুখ বাড়িয়ে দেখল।

শিশিবাবু। পরনে হাফ শার্ট আর লুঙ্গি।

বাসবী দরজাটা খুলে দিতেই শিশিবাবু লাফিয়ে ভিতরে ঢুকল।

আপনার চা খাওয়া হয়ে গেছে?

কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বাসবী বলল, হ্যাঁ। কি ব্যাপার, গাড়ি ছাড়বার পর কাল থেকে ত আপনার দেখাই নেই।

শিশিবাবু হাসল।

খোদ মালিক দৌড়-ঝাঁপ করছেন, আমি এসে আর কি করব।

মালিক কথাটা শিশিবাবু কি অর্থে ব্যবহার করেছিল, ঈশ্বর জানেন, কিন্তু বাসবী লজ্জায় অধোবদন হ'ল।

দিন, ট্রেটা নীচে রাখুন। আমি আপনার বিছানাটা বেঁধে দিই। একটু পরেই গাড়ি ছাড়বে। একবার ছেড়ে দিলে, সেকেণ্ড কামরায় বসে যেতে হবে আমাকে।

আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি যখন খুলতে পেরেছি বাঁধতেও আমি পারব।

শিশিবাবু এবার শব্দ করে হাসল। ছটো চোখ কুঁচকে।

খোলা আর বাঁধা কি এক কথা! খুলতে সবাই পারে, কিন্তু বাঁধতে পারে ক'জন?

আবার বাসবী আরক্তিম হ'ল।

কথা না বাড়িয়ে বাসবী চায়ের ট্রেটা সীটের নীচে রেখেছিল।

কি-ই বা বিছানা। তালি দেওয়া বালিশ, শতছিন্ন চাদর, আর পাতলা একটা তোষক। শাড়ীর পাড় দিয়ে শিশিবাবু মিনিট কয়েকের মধ্যেই বেঁধে ফেলল।

বিছানার বাণ্ডিলটা একপাশে সরিয়ে রেখে নামতে নামতে বলল, এর পরের স্টেশন রাঙামাটি। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। অনেকক্ষণ ট্রেন থামবে। একটা কুলি ডেকে জিনিস নামিয়ে কামরার সামনে অপেক্ষা করবেন।

শিশিবাবু নেমে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন ছাড়ল।

জানলার পাশে বসে বাইরে মুখ বাড়িয়েই বাসবী অবাক। একেবারে নতুন দৃশ্যপট। ঝোপঝাড় পুকুর বিল উধাও, তার বদলে লাল মাটির দেশ। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়। টেলিগ্রাফের তারে তারে রংবেরংয়ের পাখীর দল। মাঝে মাঝে নিটোল যৌবন সাঁওতালি মেয়ে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে চলেছে। বাংলা দেশের পেলবতা নেই, কঠিন সৌন্দর্য কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। দুর্বার এক আকর্ষণ মনকেও টানে।

হঠাৎই বাসবীর খেয়াল হ'ল।

এর পরের স্টেশন রাঙামাটি। শাড়ী-জামা বদলে

আসবার জন্ত তৈরী হয়ে নেওয়া দরকার। এভাবে অনভ্যস্ত কোনখানে নতুন জায়গায় আসা যায় না।

বাসবীকে কুলি ডাকতে হ'ল না। গাড়ির গতি মন্দীভূত হতেই একটা কুলি দরজার হাতল ধরে লাফ দিয়ে উঠল।

মোট ত মোটে দু'টি। বিছানা আর একটা স্যুটকেস। সেগুলো কুলিকে দেখিয়ে দিয়ে বাসবী দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

মাঝামাঝি ষ্টেশন। গোটা কয়েক দেবদারু আর বন-ঝাউয়ের জটলা। প্ল্যাটফর্ম বোঝাই পাথরের নুড়ি। রোদ উঠলেও ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। মন না হোক, দেহ স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

বাইরে সার সার সাইকেল রিক্সা। কতগুলো মাল-বোঝাই লরিও রয়েছে।

প্রথমে অনিমেষ তার মাঝখানে বাসবী, একেবারে পিছনে নিশিবাবু। তিনজনে তিনটে সাইকেল রিক্সাতে উঠল। মালপত্র সমেত।

অনিমেষই নির্দেশ দিল।

নতুন পুলের কাছে।

চিকনগাছি। রিক্সাচালক সঠিক হবার জন্ত জিজ্ঞাসা করল।

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। সম্মতিসূচক।

দুপাশে ক্ষেত। দূরে দূরে গ্রাম। মাঝে মাঝে জল জমে ছোট ছোট পল্বলের সৃষ্টি হয়েছে। অবাক বিস্ময়ে বাসবী চেয়ে চেয়ে দেখল।

ইটকাঠে সঙ্কীর্ণ গলিপথে হাঁটতে অভ্যস্ত বাসবী এমন অবারিত মাঠ আর আকাশ এর আগে আর প্রত্যক্ষ করে নি। পদে পদে যান মোটর কণ্টকিত পথের পরিবর্তে এমন প্রশস্ত যানবাহনহীন সড়ক বাসবীর কল্পনাতীত।

মাথায় ঝাঁকা নিয়ে পথচলতি দু-একজন মেয়ে-পুরুষ দেখা গেল। বাসবী তাদের দেখে যত না অবাক হ'ল, তারা বাসবীকে দেখে যেন বিস্মিত হ'ল আরও বেশী। দাঁড়িয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে রইল তার দিকে।

পথ বোধ হয় দু' মাইলেরও বেশী। অন্তত বাসবীর তাই মনে হ'ল।

হঠাৎ কানে জলস্রোতের শব্দ যেতেই বাসবী এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল।

একটু দূরে একটা পাহাড়ী নদী সগর্জনে বয়ে চলেছে। অপরিসর নদী, কিন্তু দুর্বার স্রোত। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনার ফুল। ওপারে মাথাউঁচু এক পাহাড়।

অর্ধসমাপ্ত একটা পুলের কাঠামো দেখা যাচ্ছে। এদিকের ভুঁইতে প্রচুর লোহালক্কড় জড় করা।

সাইকেল রিক্সা বাঁক ঘুরতেই বাসবীর চোখে পড়ল পাশাপাশি গোটা তিনেক বাংলো প্যাটার্ন বাড়ী। এখানে-ওখানে কতকগুলো লোক ঘোরাফেরা করছে।

সাইকেল রিক্সার মিছিল দেখে লোকগুলো এগিয়ে এল।

ওরই মধ্য থেকে একটি বাঙালী ছেলে অনিমেষের কাছে এসে দাঁড়াল।

আসুন স্যর।

অনিমেষ তার নেমে দাঁড়াল।

থাকবার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি তিনটে ঘরের কথা লিখেছিলেন, মাঝখানের বাংলোটা খালি আছে।

অন্ত দুটোয় লোক আছে?

এদিকেরটা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের লোক রয়েছে আর ওপাশেরটা খালি আছে, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের আসবার কথা আছে।

ঠিক আছে, চল।

অনিমেষ ছেলেটির পিছন পিছন এগোতে লাগল।

ইতিমধ্যে নিশিবাবু সাইকেল রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে মালপত্র নামিয়ে নিয়েছে। ওখানকারই কুলিরা জিনিসগুলো মাথায় তুলে নিল।

চলুন। নিশিবাবু বাসবীর দিকে ফিরে বলল।

উঁচু-নীচু পথ। নুড়ি ছড়ান। প্রচুর শব্দ করে সবাই এগিয়ে চলল।

অনিমেষ আর নিশিবাবু বাংলোর দিকে রওনা হ'ল, কিন্তু বাসবী দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝপথে।

অনেকখানি বালির চড়া। মেয়ে-পুরুষ কুলির দল নুড়ি মাথায় সার সার চলেছে। দু একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে তদারক করছে।

একটু দূরে প্রবল বেগে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। ওপারে দীর্ঘদেহ গাছের সার। ঘন সবুজ। দু'টি চোখ ভরে বাসবী এ দৃশ্য দেখল। চোখ ফেরান যায় না, এমন অবারিত সৌন্দর্য থেকে। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ। ইট কাঠ পাথরের স্তূপে হতদৃষ্টি মানুষের পক্ষে এ সবের মূল্যই আলাদা।

আপনাকে ম্যানেজার সাহেব ডাকছেন।

বাসবীর মন অতীন্দ্রিয় জগতে লুপ্ত ছিল, পিছনে কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ফিরে দেখল।

সেই ছেলেটি এসে দাঁড়িয়েছে।

বাসবী মুখ ফেরাতে ছেলেটি তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করল।

যাচ্ছি।

বাসবী চলতে শুরু করল। ছেলেটি সরে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। সরে যাবার প্রয়োজনও নেই। বারান্দায় অনিমেষ রায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখান থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে বাসবী বারান্দায় উঠে এল।

কি ব্যাপার, কবিতাটবিতা লেখার অভ্যাস আছে না কি?

অনিমেষ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল।

কথাটা যে পরিহাস সেটা বুঝতে বাসবীর অসুবিধা হ'ল না। তবুও সে না বোঝার ভান করে বলল, কবিতা?

যেভাবে তন্ময় হয়ে পিনারি দেখছিলেন, তাই ত মনে হচ্ছিল। কিন্তু ভুলে যাবেন না আমরা যে কাজের জন্য এখানে এসেছি, সে কাজটা নিছক গদ্যময়।

বাসবী আর কিছু বলল না। অনিমেষকে পার হয়ে এগিয়ে গেল।

কাঁধে গামছা, সারা দেহ তৈলসিক্ত নিশিবাবু সামনের ঘর থেকে বের হচ্ছিল, বাসবীকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

ঐ যে কোণের ঘরটা আপনার। সঙ্গে বাথরুম আছে। স্নান সেরে ফেলুন। একটু পরেই হোটেল থেকে খাবার দিয়ে যাবে।

বাসবী কোন উত্তর দিল না। কোণের ঘরে ঢুকে পড়ল।

ছোট একটা খাট। পাশে ড্রেসিং টেবিল, এদিকে একটা টেবিল, চেয়ার, আলনা। খাটের নীচে একটা পাপোষ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর।

ক'দিন আপনার একটু অসুবিধা হবে।

বারান্দা থেকে নিশিবাবুর গলা শোনা গেল।

দাঁতে দাঁত চেপে বাসবী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিশিবাবুর কি ধারণা শহরে বিরাট একটা অট্টালিকায় বাসবী থাকে। হাত-পা ছড়িয়ে অপর্যাপ্ত জায়গা নিয়ে তার দিন কাটে। অফিসের চাকরি শুধু ছলনা। লোক-দেখান বিলাসিতা।

নিশিবাবু জানে না, জানা সম্ভব নয়, যে ঘরে বাসবীর রাত কাটে সে ঘর এ প্রকোষ্ঠের চারভাগের এক ভাগ। এত আসবাব, এত আলো-বাতাস বাসবীর কল্পনারও অতীত।

আর একবার বাসবী যখন চোখ তুলে দেখল, তখন নিশিবাবু বারান্দা থেকে সরে গেছে।

দরজা-জানলা বন্ধ করে বাসবী কাপড় বদলাল। বিছানাটা খুলে খাটের ওপর পাতল, তারপর সস্ত-কেনা তোয়ালেটা হাতে ঝুলিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

স্নান যখন প্রায় শেষ, তখনই বাসবী শুনতে পেল দরজায় ঘনঘন করাঘাত। বাসবী একটু বিরক্তই হ'ল। নিশ্চয় নিশিবাবুর কাজ। লোকটির কাণ্ডজ্ঞান একটু কম।

বেশবাস সংযত করে দরজাটা খুলেই বাসবী একটু পিছিয়ে গেল। নিশিবাবু নয়, উর্দিপরা হোটেলের বেয়ারা।

মাপ করবেন, বেশবাস গোসল করছিলেন, জানতাম না। আমি ভাবলাম জার্নি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

বাসবী বলল, কি ব্যাপার?

আপনার চা। সাহেব বললেন বাইরের বারান্দায় দিতে। সেখানেই দিয়েছি।

এক মিনিট, আসছি।

বেয়ারা চলে যেতে বাসবী দ্রুত হাতে প্রসাধন সেরে নিল, তারপর তোয়ালেটা আলনায় ঝুলিয়ে রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

গোল টেবিলের দু' পাশে দুটো চেয়ার। একটাতে বসে অনিমেষ মনোযোগ দিয়ে ফাইল পড়ছে, আর একটা খালি। টেবিলের ওপর ট্রেতে চা আর জলখাবার।

বাসবীর চটির শব্দ হ'তেই অনিমেষ মুখ তুলে দেখল। কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে উঠল, বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনায় আপনি বিকশি, কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!

বাসবী লজ্জায় সঙ্কোচে আরক্তিম হয়ে উঠল।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল। লজ্জা কাটিয়ে কোন রকমে বলল, আর একটা চেয়ার দরকার যে।

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না, নিশিবাবু সোজা হোটেলে চলে গেছেন। আপনি আমাকে আগে এক পেয়ালা চা দিন। আমি রীতিমত ক্লান্ত

বাসবী খুব সাবধানে চা ঢালল। রুটিতে জ্যাম মাখাল। ডিমের ডিসটা এগিয়ে দিল। খেতে খেতেই বাসবী ভাবল, এই বড়লোকদের প্রাতরাশ। এই খেয়ে তারা উপবাস ভঙ্গ করে। এর মধ্যে কত মধ্যবিত্তের সারা দিনের আহার লুকোনো ঠিক আছে হিসাব করে বাসবী বলতে পারে, প্রায় আড়াই গুণ, এই নিয়ে জ্যাম খাব বল সে বার তিনেক খাচ্ছে। এই রাজকীয় চা পানের পাশাপাশি বস্তীতে পোড়াকটির সঙ্গে হাতল ভাঙা কাপে চা সেবনের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কাপটা হাত দিয়ে সরিয়ে অনিমেষ চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, এবারে আমাদের অফিসের কাজ শুরু হবে। জন দুই কন্ট্রাক্টরকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। আমার ঘরে আপনার মেশিনও এনে রাখা হয়েছে। প্রশ্ন উত্তরগুলো ঠিকমত আপনি টাইপ করে নেবেন, বুঝেছেন?

বাসবী ঘাড় নাড়ল।

তারপর স্টেটমেন্টের তলায় কন্ট্রাক্টরদের সই নিয়ে নিলেই পাকা কাজ হবে। ওরা পরে আর উল্টোপাল্টা কিছু বলতে পারবে না।

বাসবী কিছু বলল না। উঠে দাঁড়াল।

দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, নিশিবাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। বগলে ফাইল দু' পাশে দুটি লোক। দু'জনেরই পরনে সম্ভ্রান্ত ইংরেজী পোশাক।

নিশিবাবুও আসছেন, চলুন আমরা তৈরী হয়ে নিই।

অনিমেষ একটু এগিয়ে হাত দিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিল। বাসবী যাতে স্বচ্ছন্দে ঘরে ঢুকতে পারে।

বাসবী ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল।

পাশাপাশি দুটো ঘর। একটায় সোফা কৌচ সাজানো। এককোণে একটা টেবিলের ওপর টাইপ মেশিন। সামনে একটা চেয়ার। মেশিনে কাগজ পরানো। টেবিলের এক পাশে প্লাস্টিকের কৌটায় পিন, ক্লিপ, রবার।

আর একটা ঘরে খাটের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে।

বাসবী মেশিনের সামনে গিয়ে বসল।

বাইরে থেকে একটানা গানের গুঞ্জন ভেসে আসছে। মেয়েকুলিরা কাজের সঙ্গে সঙ্গে গান ধরেছে। কাজ আর গান ওরা কেমন মিশিয়ে নিতে পেরেছে। বাসবীর কাছে কাজ শুধু কাজ। নীরস বোঝা টানা। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে। সংসারের মুখে রসদ যোগাবার একমাত্র পন্থা। নিজেকে নিংড়ে নিঃশেষ করে রক্ত-বিন্দুর পরিবর্তে কিছু কাঞ্চন-মুদ্রা।

গালে হাত দিয়ে বাসবী ভাবতে বসল।

অনিমেষ ভিতরে ঢোকে নি। চৌকাঠে অপেক্ষা করছিল। নিশিবাবুর সঙ্গে পাঞ্জাবি ভদ্রলোক দু'জন ঢুকতেই হাত বাড়িয়ে তাদের সঙ্গে করমর্দন করল। সমাদর করে তাদের ভিতরে এনে বসাল। তারা বসতে, অনিমেষ একটা হাত বাসবীর দিকে প্রসারিত করে বলল, আমার সেক্রেটারি, মিস সেন।

ভদ্রলোক দু'জন দাঁড়িয়ে উঠে কপালে হাত ঠেকাল।

অপ্রস্তুত, বিব্রত বাসবী দাঁড়িয়ে কোন রকমে হাত দুটো জোড় করে বুক-বরাবর তুলল।

ইনি মিষ্টার সিং। ইনি মিষ্টার কাপুর।

অনিমেষ পরিচয় সম্পূর্ণ করল। এতক্ষণ পরে বোধ হয় অনিমেষের নিশিবাবুর দিকে নজর পড়ল।

হাত বাড়িয়ে কোণের আর একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, আপনি বসুন নিশিবাবু।

শাড়ীর আঁচল দিয়ে বাসবী নিজের কপালের কল্পিত ঘাম মুছে নিল। তাকে সেক্রেটারি বলে অনিমেষ কেন পরিচয় দিল? অফিসের কনিষ্ঠতমা কেরাণী। শুধু এখানকার, এই কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে করবার জন্য টাইপ-মেশিনের সামনে কয়েকদিন হাত দুরস্ত করতে হয়েছে।

পরে পরে টাইপ করার ব্যাপারে হয়ত অসুবিধাতেই পড়তে হবে।

একেবারে যে ঘুরল না বাসবী এমন নয়। এমন একটা পরিচয় দিয়ে অনিমেষ নিজের আভিজাত্য বজায় রাখল। আনকোরা এক কেরানীকে সঙ্গে করে এনেছে, এক বাংলোয় পাশাপাশি স্থান দিয়েছে, এমন একটা ব্যাপার একটু দৃষ্টিকটু, মর্যাদাহানিকর। তাই অনিমেষ বোঝাতে চাইল যে ম্যানেজারের সঙ্গে তার সেক্রেটারি এসেছে। একান্ত সচিব। যেটা স্বাভাবিক, যেটা ন্যায়সঙ্গত।

বিকাশ হালদারের ব্যাপারে একটা গোলমাল হয়েছে আপনারা ত জানেন।

হ্যাঁ, জানি বৈ কি। আপনাদের অফিসে খবর আমরাই দিয়েছিলাম।

বাসবী সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করে যাচ্ছিল, অনিমেষ হাত তুলে বারণ করল।

এখন নয়। যখন টাইপ করতে হবে, আমি বলে দেব আপনাকে।

অপ্রস্তুত বাসবী দুটো হাত কোলের ওপর রেখে চুপচাপ বসে রইল।

বেয়ারা আবার ঘরে ঢুকল। ট্রে'র ওপরে দু'কাপ চা। অভ্যাগতদের জন্য।

চা পান শেষ হ'তে আবার কাজের কথা শুরু হ'ল।

এবার অনিমেষ বাসবীকে টাইপ করতে ইশারা করল।

বিকাশ হালদার রীতিমত অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। তার হাতে টাকা না ছোঁয়ালে কোম্পানীর কোন টাকা সে ছাড়ে নি। এমন কি কুলিদের পাওনা থেকেও নিজের কমিশন কেটেছে। আর কন্ট্রাক্টরদের ত নাজেহালের একশেষ। বিকাশবাবুকে ডিঙিয়ে কোন কিছু করবার উপায় ছিল না। ফলে, কাজ আটকে যাচ্ছিল, দু' মাসের কাজ ছ' মাস লাগছিল। তাও প্রথম প্রথম কন্ট্রাক্টররা কিছু মনে করে নি। ভেবেছিল, কাজ করতে হ'লে দু' এক পয়সা ছাড়তে হয়। সব জায়গাতেই এই রেওয়াজ। কিন্তু ক্রমেই বিকাশবাবুর লোভের হাত বেড়ে উঠল। প্রতি কথায় কেবল টাকা। তার ওপর আরো সব নানা রকমের গোলমাল।

কি রকম? অনিমেষ টান হয়ে বসল।

মিষ্টার সিং আর কাপুর পরস্পরের দিকে দেখল। ভাবটা যেন, কথাটা বলা উচিত হবে কি না।

কি গোলমাল বলুন?

অনিমেষ নাছোড়বান্দা।

কাপুর আড়চোখে একবার বাসবীর দিকে দেখল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, ওই স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত ব্যাপার।

যাই হোক সব আমার জানা দরকার। দৃঢ়কণ্ঠে অনিমেষ বলল।

একটি মহিলা মাঝে মাঝে আসতেন বিকাশ হালদারের কাছে। থাকতেনও দু' একদিন।

তিনি যে বিকাশবাবুর স্ত্রী নন, কি করে জানলেন?

কাপুর একটু বিব্রত হ'ল, তারপরই সামলে নিয়ে বলল, স্ত্রী নয়, ধরন-ধারণ দেখে বেশ বোঝা যায়। আমরা খবর নিয়ে জেনেছিলাম, মহিলা বুঝি অভিনেত্রী। ষ্টেজে অভিনয় করে থাকেন।

এবার অনিমেষ আসল কথা বলল।

আমরা বিকাশবাবুর নামে কেস করছি। সে কেসে আপনারা সাক্ষ্য দিতে রাজী?

সিং আর কাপুর দু'জনেই এক সঙ্গে ঘাড় নাড়ল, নিশ্চয়, যেটা সত্যি কথা, সেটা বলব, তাতে আর ভয় কিসের। ও সব চরিত্রের লোক আপনাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর।

ঠিক আছে, অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, আপনারা দয়া করে বিকেলে একবার আসবেন, আমার সেক্রেটারি ষ্টেটমেন্ট তৈরি করে রাখবে, তাতে আপনারা সই করে দেবেন। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, প্রতিষ্ঠানের অমর্যাদা করে এমন কাউকেই আমরা ক্ষমা করব না।

কাপুর আর সিং অভিবাদন করে বেরিয়ে গেল। নিশিবাবুও তাদের সঙ্গ নিল।

অনিমেষ বাসবীর দিকে ফিরল।

মিস সেন, আপনি তা হ'লে ষ্টেটমেন্টটা ফেয়ার কপি করে রাখবেন। বিকালে ওরা এসে সই করে দেবে।

অনিমেষও বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাসবী একেবারে একা।

কথাবার্তা খুব দ্রুতগতিতে হ'লেও বাসবী সব কিছু টাইপ করে উঠতে পারে নি। তা ছাড়া সিং আর কাপুর

দু'জনের ইংরাজী উচ্চারণের ব্যাপারে বাসবী বার বার হোঁচট খেয়েছিল। অথচ লজ্জায় কাউকে কিছু বলতেও পারে নি।

কাজেই অনেক জায়গায় বাদ পড়ে গেছে।

এখন উপায়! ডাক ছেড়ে বাসবী কাঁদতে আরম্ভ করল। সামনের কালো মেশিনটা যেন যন্ত্র নয়, বাসবীর দুর্ভাগ্যের দেবতা। এত দিনের টিঁকিয়ে রাখা চাকরিটা এইবার শেষ হবে।

গালে হাত দিয়ে বাসবী চুপচাপ বসে রইল।

কি হ'ল, কাগজপত্র তুলুন এবার। নতুন জায়গা, ঘুরে-টুরে দেখে আসুন।

চমকে বাসবী মুখ তুলল।

দরজার মুখে নিশিবাবু এসে দাঁড়িয়েছে।

অবসন্ন কণ্ঠে বাসবী বলল, ভীষণ মুস্কিলে পড়েছি।

মুস্কিল? কিসের মুস্কিল?

নিশিবাবু পায়ে পায়ে ভিতরে এসে বাসবীর কাছে দাঁড়াল।

দেখুন না, অনেকগুলো কথা টাইপ করে উঠতে পারি নি। কিছু উচ্চারণও বুঝতে পারি নি। অথচ আজ দুপুরে ষ্টেটমেণ্ট টাইপ করে রাখতে হবে।

বাসবী বুঝতে পারল, অনেক চেষ্টা করেও নিজের গলা স্বাভাবিক করতে পারল না। ভয়, উৎকণ্ঠা, হতাশা কণ্ঠস্বরে সব কিছুর মিশেল।

এই কথা! নিশিবাবু হাসল। সশব্দে। তারপর বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ওদের সব কথা নোট করে নিয়েছি। কেউ আমাকে এ কাজ করতে বলে নি, কিন্তু আমি নিজেই ভাবলাম, দু'জনে লিখে নেওয়াই ভাল। ষ্টেটমেণ্টের ব্যাপার। পুলিশ কেসের হাঙ্গামা হবে, কাজেই কোন কথা উল্টোপাল্টা না হয়। পরে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নেব। কাজেই দুপুরবেলা আমার নোট আমি পড়ে যাব, আপনি মিলিয়ে নেবেন।

সেই মুহূর্তে নিশিবাবুকে বাসবীর দেবদূত বলে মনে হ'ল। তার একটা হাত চেপে ধরার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বাসবী বহুকষ্টে দমন করল। সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, অনিমেষ রায় যদি হঠাৎ ঘরে ঢোকে, এ দৃশ্য দেখে তার পক্ষে চমকে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

বাসবী নিজেকে সংযত করে শুধু বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

নিশিবাবু বাইরে যেতে যেতে বলল, আসুন, বাইরে আসুন। আপনার কাঁচা বয়স, এসব পাহাড়, নদী, গাছপালা আপনাদের ভাল লাগবার কথা।

কাগজ গুছিয়ে বাসবী বাইরে এসে দেখল, নিশিবাবু ধারে-কাছে কোথাও নেই। বারান্দা ফাঁকা।

বাসবী এগিয়ে একেবারে বারান্দার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

অনিমেষ রায় একেবারে নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বালির ওপর। নদীর কূলে। যেখানে কুলিরা মাল টানছে। লোহার খুঁটি পুঁতছে।

রোদ উঠেছে, কিন্তু তাপ খুব বেশী নয়। ঝির ঝিরে বাতাস বইছে, গাছে পাতায় কাঁপন জাগিয়ে।

সিঁড়ি বেয়ে বাসবী নেমে গেল। নদীর ধারে যাবার বাঁধানো সড়ক নেই। মাটি কেটে কেটে ধাপ করা হয়েছে।

খুব সাবধানে ধাপে ধাপে পা ফেলে বাসবী নেমে গেল। মুঠো মুঠো সোনালী বালি পায়ের ওপর এসে পড়ল। শাড়ীর আঁচলে। কোমল স্পর্শের অনুভূতি।

একেবারে কাছে আসতে অনিমেষের চোখ পড়ল।

আসুন, আসুন, অনিমেষ আবাহনের ভঙ্গিতে বলল, এইখানে আমাদের পুলের কাজ হচ্ছে। কিছুটা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। কোন গোলমাল যদি না হয়, তা হ'লে ছ' মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ পুলটা হয়ে যাবে।

এই নালাকে বাঁধবার জন্য এত তোড়জোড়?

বাসবী জলস্রোতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল।

নালা! অনিমেষ উচ্চহাস্য করে উঠল। খোলা জায়গায় সে হাসির আওয়াজ দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল।

মেয়ে-কুলিরা পর্যন্ত থমকে দাঁড়াল সে হাসির শব্দে। দু'জনের মুখের দিকে দেখল। কি বুঝল কে জানে। মুখ টিপে হেসে আবার কাজে মন দিল।

অনিমেষ কয়েক পা এগিয়ে এল বাসবীর দিকে।

তখনও তার মুখে চাপা হাসির চিহ্ন। বলল, বর্ষাকালে এই নালার চেহারা দেখলে আপনি আতঙ্কে শিউরে উঠবেন। ওই বাংলোর সিঁড়িগুলো ডুবে যায়। এই

পুলটা তৈরি হ'লে লোকের খুব সুবিধা হবে। মোটর, লরী এদের অবশ্য একশো চুয়ান্ন মাইল ঘুরে যেতে হবে না।

বাসবী অনিমেষের কথাগুলো শুনল, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল নদীর কূলে।

কি নাম নদীটার?

তার নাম হয়ত একটা আছে, জানা নেই। এখানকার লোকরা বলে খাড়ুই।

বাসবী কোন কথা বলল না। একদৃষ্টে শেকলা জলস্রোতের দিকে চেয়ে রইল। শীর্ণকায়া, কিন্তু প্রাণচঞ্চলা বেগবতী।

যে ভাবে কাজ চলছে, মনে হয় ছ'মাসের আগেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। মডার্ণ এন্টারপ্রাইজের কাজ বেশ ভাল। আমাদের আরও কতকগুলো কাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেষ করেছে। বিহার গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করতে বড় দেরি হয়।

দোহাই আপনার, বাসবী দু' কানে আঙুল দিল, ইট কাঠ সুরকির হিসাবটা এখন বন্ধ থাক। চোখ ভরে প্রকৃতিকে একটু দেখতে দিন।

অনিমেষ নিঃশব্দে হাসল। বাসবীর দৃষ্টির অনুসরণ করে কিছুক্ষণ ওপারের নিবিড় শ্যামলিমার দিকে দেখল, তারপর চোখ ফিরিয়ে বলল, প্রকৃতি চোখই শুধু ভরায়, পেট ভরাতে হ'লে, ইট কাঠ সুরকির হিসাবের মধ্যেই থাকতে হয়।

হয়ত একটা কথার কথা। নিছক কিছু একটা বলবার জন্যই অনিমেষ বলেছিল, কিন্তু বাসবী চমকে উঠল।

কর্তব্য, কর্তব্য আর কর্তব্য। হাজার কর্তব্যের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে দেহ আর মন বাঁধা। পরিত্রাণ নেই। গোটা একটা সংসারের ভার বাসবীর ওপর। তার অনুপস্থিতিতে বাড়ীতে কত অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে, তার ঠিক নেই।

এখানে ত বাসবী আনন্দেই রয়েছে। এরই মধ্যে দু'বার চা-পান হয়ে গেল। একটু পরে হোটেল থেকে আহারের ব্যবস্থা হবে। আরামপ্রদ প্রকোষ্ঠে বাস। কাজের চাপ আর এমন কি বেশী।

প্রকৃতির অফুরন্ত সম্ভারের দিকে চেয়ে চেয়ে বাসবী বুঝি নিজের অতীতকে ভোলার চেষ্টা করতে, নিজের অসহায়কে অতিক্রম।

বাসবী ফিরে এল নদীর কূল থেকে।

এ কি, চললেন?

হ্যাঁ, ইট-কাঠের হিসাবের মধ্যে ঢুকি। প্রকৃতি ত পেট ভরাবে না। স্টেটমেন্টটা ভাল করে টাইপ করি।

বাসবীর পাশে পাশে অনিমেষ চলতে চলতে বলল, আপনি বড্ড সিরিয়াস ধরনের মেয়ে, মিস সেন।

আমরা কম সিরিয়াস হ'লে কোথায় তলিয়ে যাব ঠিক আছে। পৃথিবীতে পাঁক আর চোরাবালির ত অভাব নেই।

একটু এগোতেই দেখতে পেল হোটেলের বেয়ারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের দ্রুত আসবার জন্য ইঙ্গিত করছে।

যাক, ঠিক সময়েই আমরা ফিরেছি। আহার্য প্রস্তুত।

আবহাওয়া একটু তরল করার চেষ্টা করল অনিমেষ।

বারান্দার ওপরই খাবার দেওয়া হয়েছে। দু'পাশে দুটো চেয়ার। দু'জনের বন্দোবস্ত।

নিশিবাবু আসবেন না? চেয়ার টেনে বসতে বসতে বাসবী জিজ্ঞাসা করল।

নিশিবাবু হোটেলে খেতে গেছেন। তিনি কোনবারই আমার সঙ্গে খেতে চান না। এর আগেও দু' একবার দেখেছি।

কেন?

বোধ হয় তিনি মনে করেন ম্যানেজারের সঙ্গে কেরাণীর একসঙ্গে বসে খেলে, একজনের জাত যায়।

সে জ্ঞান ত আমারও থাকা উচিত।

স্ত্রীলোকরা এ সব রীতি-নীতির ঊর্ধ্বে। তা ছাড়া আপনার পক্ষে এত কষ্ট করে হোটেলে গিয়ে খাওয়াটা সমীচীন হ'ত না। নিন, তর্ক থাক। আহারে মন দিন।

অনিমেষ দু' হাতে কাঁটা-চামচ তুলে নিল।

বাসবী সাবধানে কাঁটা-চামচ সরিয়ে রাখল। অনিমেষের দিকে চেয়ে বলল, মাপ করবেন, এসব ব্যাপারে আমি কিন্তু একটু সেকেলে। আদিম পদ্ধতিতেই সুরু করি।

অনিমেষ কথা বলল না। শুধু হাসল।

খাওয়া শেষ হতে অনিমেষ বলল, যান, এবার কিছুক্ষণ

বিশ্রাম। বিকেলের আগে আপনি স্টেটমেণ্টটা তৈরী রাখবেন।

মাথা নেড়ে বাসবী নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অনিমেষ নিশ্চয় এখন তার ঘরে বিশ্রাম করবে। তা হ'লে বাসবী টাইপ মেশিনে কি করে কাজ করবে? কথা ছিল, নিশিবাবু নিজের নোট দিয়ে সাহায্য করবে বাসবীকে!

শরীরটা বেশ ক্লান্ত। পথশ্রম আর উদ্বেগ। একটু শুতে পারলে বেশ ভাল হ'ত। বাসবী বিছানার ওপর নিজের দেহ ঢেলে দিল।

চোখের পাতা দুটো তন্দ্রায় একটু বুজে এসেছে, এমন সময় দরজায় করাঘাত।

ধড়মড় করে বাসবী উঠে পড়ল।

কে?

আমি।

নিশিবাবুর গলা।

অন্য সময় হ'লে বাসবী মনে মনে হয়ত একটু বিরক্ত হ'ত। এভাবে তন্দ্রার ঘোর কেটে যাবার জন্য। কিন্তু এই সময় সে নিশিবাবুকেই কামনা করছিল। হাতের কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি ছিল না।

আসুন, আসুন।

বাসবী চৌকাঠ-বরাবর এগিয়ে গেল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝি?

পান চিবাতে চিবাতে নিশিবাবু প্রশ্ন করল।

না, না, ঘুমাই নি। এমনই শুয়েছিলাম বিছানায়। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

আমার কথা? নিশিবাবু বিষম খেল, তার পর সামলে নিয়ে বলল, আমার কথা মানুষ ভাবে? আমার স্ত্রী আমার মতে যমের অরুচি।

এই প্রথম নিশিবাবু নিজের স্ত্রীর উল্লেখ করল।

সে কি, আপনার স্ত্রী আপনাকে এই কথা বলেন?

আরও কত কথা বলেন। এ যুগের মেয়ে আপনারা, এ সব বুঝবেন না। পান খাবেন?

নিশিবাবু তার হাত প্রসারিত করে দিল। হাতে পানের খিলি।

আজ কোন বিষয়ে বাসবী আপত্তি করবে না। নিশিবাবু বিষ দিলেও বোধ হয় বাসবী অম্লানবদনে গ্রহণ করবে।

পানের খিলিটা নিয়ে বাসবী বলল, কিন্তু স্টেটমেণ্ট টাইপ করার কি হবে? ও ঘরে ত ম্যানেজার বিশ্রাম করছেন।

ব্যস্ত হবেন না, আমি সব ব্যবস্থা করেছি।

নিশিবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা কুলি টাইপ-মেশিনটা মাথায় করে এসে দাঁড়াল। একটা ছোট চৌকির ওপর বাসবী স্যুটকেসটা রেখেছিল, সেটা নামিয়ে রেখে, তার ওপর মেশিন রাখার নির্দেশ দিল।

মেশিনের সামনে বাসবী। পাশে ফাইল হাতে নিশিবাবু।

বাসবী বিস্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেকটি কথা নিশিবাবু ঠিক তুলে নিয়েছে। একটুও বাদ দেয় নি।

আশ্চর্য ত! আপনি সং হাতে সবটা লিখেছেন?

সর্ট হ্যাণ্ড জানলে আর এই মাইনের এই অফিসে পড়ে থাকি। নিশিবাবু হাসতে হাসতে বলল।

টাইপ শেষ হ'তে নিশিবাবু একবার পড়ে নিল তার পর বলল, ঠিক আছে। রেখে দিন কাগজটা আপনার কাছে। কণ্ট্রাক্টারদের সই হয়ে গেলে, আমাকে দিয়ে দেবেন।

বাসবী ঘাড় নাড়ল।

আমি চলি। নিশিবাবু বাইরে যেতে গিয়েই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার পর পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল, আসুন স্যর, ভিতরে আসুন। মিস সেন জেগেই আছেন।

ক্রমশঃ

•—[•]—•

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(৪) শেষের গান

সাধক কমলাকান্ত :

যুগপৎ কালীসাধক এবং শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতারূপে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নাম রামপ্রসাদের পরেই মনে আসে। স্বরচিত সুমধুর শ্যামাসঙ্গীতের গায়ক কমলাকান্ত সাধক কমলাকান্ত নামে বাংলা দেশে সুপ্রসিদ্ধ। শক্তি-সাধকদের মধ্যে রামপ্রসাদের সঙ্গে যেমন কমলাকান্তের নাম সুপরিচিত আছে, তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাঁদের দু'জনের জীবনে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। দু'জনের নামই বাঙালীর হৃদয়ে আজও সঞ্জীবিত রয়েছে তাঁদের রচিত শক্তিভাবের গানের জন্যে।

সঙ্গীতের ভাবের দিকে কমলাকান্তকে অনেকাংশে রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারী বলা যায়। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে অবদানের অব্যবহিত পরেই কমলাকান্তের আবির্ভাব। রামপ্রসাদের যখন মৃত্যু হয়, কমলাকান্তের সে-সময় বাল্যকাল। রামপ্রসাদের অপূর্ব কালীসাধন-সঙ্গীত তখনও বাংলার মাঠে-ঘাটে লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হচ্ছে। রামপ্রসাদের গান তখনও পল্লী বাংলার সঙ্গীতজগতে জীবন্ত শক্তি। ভাগিরথীর পূর্বদিকের হালিসহর থেকে পশ্চিমতীরের অম্বিকা কালনার দূরত্ব বেশি নয়। বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনা গ্রামে কমলাকান্তের জন্ম। কালনার কাছেই মাতুলালয় চান্না গ্রাম, যেখানে তাঁর জীবনের বেশির ভাগ কেটেছিল। সে-সব প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে যথাস্থানে। এখানে তাঁর সঙ্গীতের বিষয়ে আরও কিছু উল্লেখ করা যায়।

রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের অসাধারণ জনপ্রিয়তার যুগেই কমলাকান্তের আবির্ভাব। কিন্তু একই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত তাঁর গীতাবলী স্বকীয় মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এখানেই সঙ্গীতরচয়িতা কমলাকান্তের বৈশিষ্ট্য। বাংলা গানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও এক স্মরণীয় গৌরব। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ, তা প্রাচীন বাংলা গানেরও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যেমন গভীর তেমনি মধুর ভাবের তাঁর সেইসব গান। যথা—

(রাগসিন্ধু—তাল পোস্ত)

মজিল মোর মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
শ্যামাপদ নীলকমলে—কালিপদ নীলকমলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তেরি মনে আশা পূর্ণ এতদিনে,
সুখদুঃখ সমান হ'ল, আনন্দসাগর উথলে॥

কিংবা পরবর্তীকালে যে গানখানি গাইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যন্ত ভালবাসতেন—(কালাংড়া, চিমা, তেতালা)

আদর করে হৃদে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখো আমি দেখি আর যেন মন কেউ না দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সেও যেন মা বলে ডাকে॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রী যেখো, তারে নিকট হতে দেও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখো, খুব যেন সাবধানে থাকে॥

কমলাকান্তের মন ভাই,
আমার এক নিবেদন দরিদ্র পাইলে ধন,
সেও কি অযতনে রাখে॥

তাঁর রচনাশক্তির উদাহরণ স্বরূপ আরো কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যায়। যেমন—

(ভূপালী, অদ্ধা তেতালা)

অনুপমা রূপ অনুপ শ্যামা তনু,
হেরি মদন মূরছায় রে।
সজল কাদম্বিনী জিনিয়ে কুন্তল
তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায় রে॥ …

(ভাটিয়ারি, খেমটা)

নব সজল জলদ কায়,
কাল রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়॥ …

(সিন্ধু কাফি—চিমা তেতালা)

আপনারে আপনি দেখ যেও না রে মন কারু ঘরে।
যা' চাবে এইখানে পাবে খোঁজ নিও অন্তঃপুরে।
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ মন উচাটন হয়ো নারে॥…ইত্যাদি

সাধক কমলাকান্ত রচিত শ্যামাসঙ্গীতের গায়ন-রীতির সঙ্গে রামপ্রসাদের গানের পার্থক্য লক্ষণীয়। রামপ্রসাদের বেশির ভাগ গান যেমন বাউলের ধরনে তাঁর নিজস্ব সুরে গাওয়া হয়ে থাকে, সাধক কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীতগুলি তা নয়। কমলাকান্তের অনেক গানই টপ্পা অঙ্গে ও বিভিন্ন রাগে গাওয়া হয় এবং বাংলা টপ্পা সঙ্গীতের আসরে তাঁর সেসব গান সাম্প্রতিক কালেও পরিবেশিত হ'তে শোনা গেছে। বাংলা টপ্পাঙ্গ গানের ট্র্যাডিশনের সঙ্গে কমলাকান্তের অনেক শ্যামাসঙ্গীত জড়িত আছে ঘনিষ্ঠভাবে। যেমন, 'মজিল মোর মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে' গানখানি। এমন দৃষ্টান্ত আরো আছে।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। কমলাকান্তের এই সব গান কি প্রথম যুগে, অর্থাৎ তাঁর জীবিতকালে টপ্পা অঙ্গে গাওয়া হ'ত? সাধক স্বয়ং কি টপ্পার ধরনে তাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলি গাইতেন সেকালে? কমলাকান্তও রামপ্রসাদের মতন স্বরচিত গানের সুর-সংযোজক এবং প্রথম গায়ক। বিগত যুগের বাংলা দেশে গান রচনা, সুরযোজনা ও গায়নের মধ্যে আধুনিক কালের মতন এমন শ্রম-বিভাগ দেখা যেত না। অর্থাৎ সঙ্গীতজ্ঞ গায়করাই গান রচনা করতেন এবং নিজের রচিত গানে নিজে সুরারোপ করে গাইতেন। যুগে যুগেই অনেক সময় গান রচনা করতেন তাঁরা। সঙ্গীতের প্রক্রিয়ার মধ্যেই গান রচিত হয়ে যেত। কমলাকান্তের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং প্রথম জীবনে সঙ্গীতচর্চা করতেন তাঁর এক আত্মীয় কেনারাম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কমলাকান্তের সঙ্গীত-শিক্ষার বিষয়ে আর কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রশ্ন এই যে, তিনি স্বয়ং কি তাঁর শ্যামাসঙ্গীত টপ্পার ধরনে গাইতেন, না পরবর্তীকালের শিক্ষিতপটু গায়করা তাঁর গান টপ্পা অঙ্গে গাইতেন আসরে?

কমলাকান্তের পক্ষে টপ্পার ধরনে গানগুলি গাওয়া একেবারে অসম্ভব না হলেও অসাধারণ বলতে হয়। কারণ কমলাকান্ত (জন্ম: ১৭৭০।৭২ খ্রীঃ) তাঁর শ্যামা-সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন উনিশ শতকের শেষ দশকে। সেই সময়টিই বাংলা টপ্পাগানের আদিযুগ। বাংলার দুই আদি টপ্পাচার্য (বাংলা টপ্পা রচয়িতা ও গায়ক) নিধুবাবু ও কালী মীর্জা উনিশ শতকের শেষ দশকেই বাংলার আসরে মনোমুগ্ধকর টপ্পা গান পরিবেশন করতে আরম্ভ করেন। নিধুবাবু ছাপরা থেকে অবসর নিয়ে এবং রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষাতে বাংলায় ফিরে আসেন ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং তখন থেকেই তাঁর স্বরচিত ও স্বকণ্ঠে গীত বাংলা টপ্পা গানের কলকাতার আসর বসে, শোভাবাজারের বটতলার আটচালাতে। নিধুবাবুর অন্তত ১২ বছর আগে কালী মীর্জা পশ্চিমাঞ্চল (কাশী, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী) থেকে সঙ্গীত বিদ্যালাভ করে বাংলা দেশে (তাঁর জন্মস্থান হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায়) ফিরেছিলেন। কালী মীর্জার (প্রকৃত নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) পরে বর্ধমান রাজদরবারে অবস্থান করবার কথা জানা যায় মহারাজা তেজচাঁদের পুত্র কুমার প্রতাপচাঁদের পৃষ্ঠ-পোষকতায়। সাধক কমলাকান্তও সেসময় বর্ধমানের রাজসভায় সভাপণ্ডিত এবং প্রতাপচাঁদের গুরুরূপে ছিলেন, মহারাজা তেজচাঁদও তাঁকে আচার্যতুল্য সম্মান করতেন। এই সমস্ত তথ্য থেকে মনে হয় যে, কমলাকান্ত স্বয়ং যদি তাঁর শ্যামাসঙ্গীত টপ্পা অঙ্গে গেয়ে থাকেন, তা হলে কালী মীর্জার সঙ্গে কোনরকম সাঙ্গীতিক যোগা-যোগের ফলে হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, বাংলা দেশে টপ্পাচর্চার সেই প্রথম যুগ এবং এবিষয়ে দু'জন আদি আচার্য নিধুবাবু ও কালী মির্জার মধ্যে প্রথমোক্ত জন কলকাতাতেই সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। সুতরাং কমলাকান্তের সঙ্গীতে টপ্পার স্পর্শলাভ হয়ে থাকলে তা কালী মির্জার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের ফল হতে পারে। আর যদি পরবর্তীকালের টপ্পা গায়ক সমাজ কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত নিজেরা টপ্পা অঙ্গে গঠিত করে থাকেন, সেকথা আলাদা।

তবে এও একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, রামপ্রসাদের গান গায়কেরা টপ্পা অঙ্গে আসরে শোনান নি। প্রসাদী গান বেশীর ভাগ তাঁর নিজস্ব সাদামাঠা প্রসাদীসুরেই সকলে গেয়ে থাকেন। কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত যে টপ্পার ধরনে গাওয়া হয়ে থাকে, এই ট্র্যাডিশানের মূলে হয়ত কমলাকান্ত নির্দিষ্ট সুরের ও ঢং-এর ধাঁচটি থাকতে পারে।

সে যা হোক, গায়ক বলে তাঁর কালে যথেষ্ট জন-প্রিয়তা ছিল কমলাকান্তের। যেমন শক্তি-সাধক, পণ্ডিত ব্যক্তি ও গান রচয়িতা, তেমনি গায়করূপেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর মাধুর্যময় ভাবাভাবের গান তিনি প্রাণের গভীর আবেগে যখন গাইতেন, তা ভক্ত এবং সাধারণ সব শ্রোতারই মন স্পর্শ করত, এমন প্রসিদ্ধি আছে। তাঁর বন্ধু ও পরিচিত সবাই তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন, তাঁর গুণপনা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত পল্লী বাংলার দূরে-দূরান্তে।

কমলাকান্তের স্বকণ্ঠে তাঁর নিজের গান শ্রোতাদের

মনে কিরকম সাড়া জাগাত, সে বিষয়ে কিছু কিছু জনশ্রুতি আছে এবং তা গল্পকথা নয়। যেমন সেই ডাকাতদের কথা। সাধক কমলাকান্তের গান শুনে তাদের মনের ওপর কেমন রেখাপাত করে আর তাদের কি ভাবান্তর হয়, সে এক নাটকীয় ঘটনা। কোন কোন গ্রন্থেও তার বিবরণও উল্লেখ পাওয়া যায়। 'শ্রীশ্রীকালী কুণ্ডলিনী' বইয়ের মধ্যেও দস্যুদের সেই আক্রমণ করতে আসা, তারপরে কমলাকান্তের ভক্তিভাবের গানের প্রভাবে তাদের মন পরিবর্তন ইত্যাদির বর্ণনা আছে :

> সঙ্গীত শুনিয়া দস্যু নির্দয়হৃদয়,
> নির্দয়তা পরিহরি মানিল বিস্ময়।
> বলাবলি করে সবে বিস্ময়ে ডুবিয়া,
> কার ধনরত্ন মোরা নিতেছি লুটিয়া।
> ....
> এমন ভক্তের অর্থ লুণ্ঠন করিলে,
> দুর্গতি সাগরে মগ্ন হইব সকলে।

ঘটনাটি ঘটেছিল সেই ওড় গাঁয়ের কুখ্যাত ডাঙায়। বর্ধমান জেলার তালিত স্টেশন থেকে দেড় ক্রোশ পশ্চিমে ওড় গাঁয়ের ডাঙা, ডাকাতির জন্যে গোটা অঞ্চলটিতে যার নাম জানতে কারুর বাকি নেই। এমন ভীষণ ডাকাতের উপদ্রব তখন এ তল্লাটে অন্য কোথাও শোনা যেত না। সেই ওড় গাঁয়ের ডাঙার কাছেই চান্না গ্রাম, যেখানে থাকতেন এবং সাধন-ভজন করতেন সাধক কমলাকান্ত। চান্নায় যাতায়াত করতে গেলে অনেক সময় ওড় গাঁয়ের ডাঙা পার হ'তে হ'ত। তাই সেদিক দিয়ে চান্না গ্রামে যাওয়া-আসার কথায় একটি প্রবাদের সৃষ্টি হয় এ অঞ্চলে : 'যদি গেল চান্না ঘরে উঠল কান্না।'

একদিন সেই ওড় গাঁয়ের ডাঙার ওপর দিয়েই কমলাকান্ত চান্নার দিকে ফিরছেন। শিষ্যবাড়ী থেকে আসছেন, হাতে গুড়ের কলসী। রাত বেশ হয়েছে তখন। নির্জন নিস্তব্ধ পথঘাট থম্‌থম্ করছে। তিনি শুধু চলেছেন একা। হঠাৎ ঝুপি থেকে একদল ডাকাত তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

কমলাকান্তের সেসময় তরুণ বয়স। তখনো বিখ্যাত হন নি। অনেকেই তাই চিনত না তাঁকে। পথিক দেখলেই দস্যুরা যেমন তাড়া উপদ্রব করতে আসত, তাঁকে একা আসতে দেখেও তেমনি এসে চড়াও হ'ল।

তিনি তাদের দেখে বললেন,—'তোমাদের নেবার মতন সম্বল আমার কিছুই নেই।'

'সবাই অমন বলে'। —হাতের অস্ত্র দেখিয়ে ডাকাত সর্দার জানালে, 'ভালয় ভালয় না দিলে একেবারে শেষ করে দেব।'

'আমার কথা বিশ্বাস করো, আমি মিথ্যা বলছি না।'

ডাকাত হুংকার দিয়ে বললে, 'তা হ'লে মরবার জন্যে প্রস্তুত হও।'

কমলাকান্ত তখন তাকে বললেন, 'ভাই, একবার শুধু মায়ের নাম করতে দাও। তারপর মেরে ফেলো।'

ডাকাতরা প্রায় সকলেই কালী-ভক্ত হ'ত। এক্ষেত্রেও তাই। তাদের সম্মতি পেয়ে কমলাকান্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, প্রাণস্পর্শী একটি শ্যামাসঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করলেন :

> আর কিছুই নাই শ্যামা, মা তোর কেবল চরণদুটি রাঙা।
> শুনি তাও নিয়েছে ত্রিপুরারি দেখে হলাম সাহস ভাঙা।

সে ডাকাতের দল কখনও এমন কালীস্তুতি শোনে নি। তারা রীতিমত আকৃষ্ট হয়ে শুনতে লাগল কমলাকান্তের গান :

> জ্ঞাতিবন্ধু সুত দারা সুখের সময় সবাই তারা,
> বিপদকালে কেউ কোথাও নাই
> ঘরবাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙা।
> নিজগুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখ,
> নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া,
> সেসব কথা ভূতের সাঙা।
> কমলাকান্তের কথা মাকে বলি মনের ব্যথা,
> আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা
> জপের ঘরে রইল টাঙা।

শ্যামাসঙ্গীতটি যখন শেষ হ'ল, তখন বোঝা গেল যে সেই দস্যুদের দলপতির তা অত্যন্ত ভাল লেগেছে। অন্য ডাকাতদেরও সেই অবস্থা। তারপর সর্দার বললে, 'ঠাকুর, আর একটি গান শোনাও, বেশ গলা তোমার।'

কমলাকান্ত তখন গাইতে লাগলেন :

> তোমার ভাল চিন্তা সদা করি গো তোমার নিকটে।
> দুখে থাক সুখে থাক জেনেছি, যে আছে লিখন ললাটে।
> বারে বারে স্মরণ করি মা, আমার এই কর্ম বটে।
> কিন্তু দীন দেখে যদি দয়া কর, তবে দীন দয়াময়ী
> নামটি বটে।

গান শুনে দলপতি কালীর উদ্দেশে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে কমলাকান্তকে আবার অনুরোধ করলে, 'ঠাকুর, আর একখানি এমনি গান হোক।'

সাধক তখন তৃতীয় গান আরম্ভ করলেন :

> জয় জয় শ্যামা মার নিকটে,
> মা মোর জগতির গতি বটে।

যার যে বাসনা মনেরি কামনা
সেখানে সকলি ঘটে।
অন্ন পুণ্য ভরা সাজিয়ে পসরা,
এনেছ ভবের হাটে।
কার রাজ্য লয়ে আনন্দিত হয়ে
রাখন্ত করিবে পাটে।
আছে একজনা লইতে খাজনা
জমি যে বিকাবে লাটে।
কমলাকান্ত কি ভাবনা ভাব
দাঁড়ায়ে নদীর তটে।
দেখ দুকূল পাথার না জান সাঁতার
তরণী নাই যে ঘাটে।

এই অপূর্ব ভক্তিভাবের গান সাধকের মধুরকণ্ঠে শুনে কালী-ভক্ত দস্যুরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। যাঁকে হত্যা করবার জন্যে তারা খানিকক্ষণ আগে ধরেছিল, তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করলে, তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল ভাবের আবেগে।

কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীতের সঙ্গে এমনি সব কাহিনীর শ্রুতি-স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাঁর গান গাইবার প্রসঙ্গে জনশ্রুতি আছে যে, তিনি ভাবে বিভোর হয়ে অতি আন্তরিকতার সঙ্গে গাইতেন এবং তা শ্রোতাদের মন সহজেই স্পর্শ করত। দস্যুদের মনে সেজন্যেই তা এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল সেদিন।

বর্ধমান জেলার গঙ্গাতীরের বর্ধিষ্ণু গ্রাম অম্বিকা কালনায় কমলাকান্তের জন্ম। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ১২ ক্রোশ দূরবর্তী চান্না গ্রামের মাতুলালয়ে তাঁর বাস আরম্ভ হয়। খানা নামে রেলষ্টেশন থেকে সওয়া ক্রোশ উত্তরে চান্না। এখানে শুধু কমলাকান্তের প্রথম জীবন, অর্থাৎ মহারাজ তেজচাঁদের দরবারে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত, কাটে তা নয়। তাঁর সাধক জীবনের (এবং সঙ্গীত জীবনেরও) সঙ্গে চান্না গ্রামের পরিবেশ অনেকখানি সংশ্লিষ্ট। বিশেষ এ গ্রামের বিশালাক্ষী মন্দির, তাঁর সাধনার পীঠস্থান। খড়ে (বা খড়েশ্বরী) নদীর দক্ষিণ দিকে সেই বিশালাক্ষীর মন্দির, চান্না গ্রামের ঈশান কোণে। কমলাকান্তের সাধন-ভজন এবং সিদ্ধিলাভের সঙ্গে এই মন্দিরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বিশালাক্ষীর পুণ্য অঙ্গনে সাধকের অনেক শ্যামাসাধনের সঙ্গীত ভক্তির আবেগে রচিত হয়েছে।

যে আত্মীয়ের সঙ্গে কমলাকান্ত প্রথম জীবনে সঙ্গীত চর্চা করতেন বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাও সম্ভব হয় চান্না গ্রামে। আর যে গুরু গাঁয়ের কথা বলা হয়েছে, তা হ'ল চান্নার উত্তরে নদীর অন্য পারে আড়াই ক্রোশ দূরে।

ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চান্না গ্রামের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে রামপ্রসাদের হালিশহরের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্যের কথা মনে আসে। অর্থাৎ চান্নাতেও শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই গোষ্ঠীরই বসবাস ছিল, সেজন্য এখানকার ধর্মীয় ভাবলোকে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণার প্রকাশ দেখা যায়। কমলাকান্ত কৃষ্ণপ্রেমের বিষয়েও গান রচনা করেছিলেন রামপ্রসাদের মতন। কমলাকান্তের গানের যে সংগ্রহ পুস্তকটি সবচেয়ে প্রামাণিক সেই 'সাধক কমলাকান্ত-কৃত শ্যামাসঙ্গীত'-এর মধ্যে তাঁর রচিত ২৪টি কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক পদ আছে। বইখানির বিষয়ে আরও কিছু জানবার কথা পরে উল্লেখ করা হবে।

এখানে চান্না গ্রামের গৌরবের কথায় আর একজন স্মরণীয় পুরুষের নাম করা যায়, যদিও তাঁর সঙ্গে সাধক কমলাকান্ত কিংবা সঙ্গীতপ্রসঙ্গের কোন সম্বন্ধ নেই। তিনি হলেন বাংলার আদিতম সশস্ত্র বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চান্নায় জন্মলাভ ক'রে তিনি গ্রামখানিকে ধন্য করেছেন। তাঁর পরিণত জীবনের স্মৃতিও চান্না গ্রামে রক্ষিত আছে অন্তরালের ছটায়। প্রথম যৌবনে তিনি দুর্বার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামরিক শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানীর ছদ্মবেশে 'যতীন্দ্র উপাধ্যায়' নামে সুদূর বরোদার সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সেখানে নানা বিভাগের কাজ আরম্ভ করে পদোন্নতির ফলে শেষ পর্যন্ত হন মহারাজার শরীর-রক্ষক। মহারাজার একান্ত সচিব যুবক অরবিন্দ ঘোষের সাহায্যে তিনি যেমন বরোদার সেনাবাহিনীতে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি তিনিই অরবিন্দকে রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেন এবং বাংলা দেশেও নিয়ে আসেন। শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে সরলা দেবীর নামে পরিচয়পত্র নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বাংলায় আসেন ১৯০২ খ্রীঃ এবং ব্যারিষ্টার পি. মিত্র (প্রমথনাথ মিত্র) প্রভৃতির দ্বারা সদ্য-স্থাপিত অনুশীলন সমিতির সঙ্গে পরিচিত ও তার অন্তর্ভুক্ত হন। পরে দলাদলির জন্যে দল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নিরালম্ব স্বামী নামে সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করলেও বিপ্লবী আন্দোলন থেকে মনে-প্রাণে বিচ্ছিন্ন থাকেন নি। বাঘা যতীন প্রমুখ একাধিক নেতৃবৃন্দ সেজন্যে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন কোন কোন

সময়ে, বিশেষ বালেশ্বরে যাবার পূর্বে। চান্না গ্রামের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক এই ছিল যে, তাঁর জননী তাঁকে ইচ্ছা মতন দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেই অনুসারে যতীন্দ্রনাথ চান্নার শ্মশানের পাশে আশ্রমে বাস ক'রে যেতেন।

আগেই বলা হয়েছে, কমলাকান্ত অম্বিকা কালনা গ্রামে জন্মলাভ করলেও ছেলেবেলা থেকেই চান্নায় বাস আরম্ভ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও জননীর সঙ্গে বাস করতে আসেন মাতুলালয়ে। তারপর তাঁর যৌবনকাল থেকে শক্তির উপাসনা ও সাধনা, সঙ্গীত-চর্চা এবং সঙ্গীতরচনা সমস্ত পর্বের সঙ্গেই চান্না গ্রামের পরিবেশ বিজড়িত। তাঁর প্রায় ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত কমলাকান্ত এই গ্রামে অধিষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যুও ঘটে এখানে। তার কিছুদিন আগেই ভট্টাচার্য মশায়ের জননীরও মৃত্যু হয়েছিল। তাই শোনা যায় যে, দামোদরের তীরে শ্মশানে সেই সহধর্মিনীর জলন্ত চিতার সামনে বসে কমলাকান্ত উর্দ্ধনেত্রে গান গেয়েছিলেন পরম বিশ্বাসে :

কালী সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন,
রাখবি কি না রাখবি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয়, তার সৃষ্টিছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন যোটেনা,
গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচ্‌ল না তাঁর সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুঃখে রাখ সুখে রাখ করব কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে পরেছি,
আর মুছতে কি পারি সাধের ফোঁটা॥
জগৎ জুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার
ইহার মর্ম জানবে কেটা॥

চান্নায় বাস করবার সময়ে কালীসাধক, পদকর্তা, গায় এবং পণ্ডিতরূপে কমলাকান্তের খ্যাতি রটে যায়। তাঁর কথা জানতে পারেন বর্দ্ধমান-রাজের দেওয়ান রঘুনাথ রায়। গঙ্গাতীরের বড়চুকু গ্রাম চুপীর সন্তান রঘুনাথ রায়ের প্রসিদ্ধি শুধু বর্দ্ধমানের দেওয়ান হিসেবে নয়। তিনি বিশেষ ক'রে স্মরণীয় হন গীত-রচয়িতা এবং গুণী গায়করূপে। সঙ্গীতচর্চার জন্যে তিনি উত্তরকালে বর্দ্ধমানের দেওয়ানী পদ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের সঙ্গীতশিক্ষা সম্ভব হয়েছিল বর্দ্ধমান-রাজ তেজচাঁদের আনুকূল্যে। রঘুনাথের পিতার আমল থেকেই তাঁরা বর্দ্ধমান দরবারের দেওয়ান থাকায় রাজ-পরিবারের বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং রাজ-পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেন। রঘুনাথের সঙ্গীতপ্রতিভা দেখে মহারাজ তেজচাঁদ পশ্চিমাঞ্চল থেকে ওস্তাদ আনয়ন করে রঘুনাথের রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করেন, ফলে রাগ-সঙ্গীতে কৃতবিদ্য হন রঘুনাথ।

বাংলার সঙ্গীত ক্ষেত্রে, বিশেষ সঙ্গীতরচনার বিষয়ে, রঘুনাথের একটি ঐতিহাসিক অবদান আছে ব'লে প্রকাশ। তিনি সর্বপ্রথম চার তুকের গান বাংলা ভাষায় রচনা করেন। তা ছাড়া তিনি বাংলায় সম্ভবত আদি খেয়াল-গায়ক ছিলেন, এমন প্রসিদ্ধি আছে। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'গীত-সূত্রসার' থেকে জানা যায় যে, রঘুনাথ চার তুকের বাংলা খেয়াল গাইতেন। রঘুনাথের আগে আর কেউ বাংলা খেয়াল গাইতেন বলে শোনা যায় নি এ যাবৎ। শ্যামা ও কৃষ্ণ বিষয়ে রঘুনাথ বহু গান রচনা করেছিলেন এবং বিগত যুগের অন্যান্য বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞদের মতন তিনিই ছিলেন সেসব সঙ্গীতের সুর-সংযোজক ও গায়ক।

যা হোক, রঘুনাথ কমলাকান্তের পরিচয় পেয়ে তাঁকে মহারাজ তেজচাঁদের সঙ্গে পরিচিত করেন। তেজচাঁদ সাধকের গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বর্দ্ধমান দরবারের সভাপণ্ডিতরূপে বরণ ক'রে নেন এবং তাঁর জন্যে বাসগৃহ দান করেন কোটালহাটে। সে হ'ল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

সেই থেকে কমলাকান্ত চান্নার পাট তুলে দিয়ে কোটালহাট নিবাসী হয়েছিলেন। তাঁর সমাধিও আছে কোটালহাটের বাড়ীটিতে। জীবনের শেষ ১১ বছর তিনি এখানে অধিষ্ঠান করেন।

তাঁর মৃত্যুকালে যে গান গাইবার প্রসঙ্গটি বর্ণনা করবার জন্যে তাঁর জীবন-কাহিনীর অবতারণা, তারও ঘটনাস্থল কোটালহাটের বাসস্থানটি। সে বিবরণ দেবার আগে কমলাকান্তের বিষয়ে আর কয়েকটি তথ্য জানাবার আছে।

১৮২০ খ্রীঃ মৃত্যু হয় সাধক কমলাকান্তের। তাঁর রচনা মৃত্যুর আগে কিছুই প্রকাশিত হয় নি, অনেক পরে তা মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর রচনা বলতে শুধু গান নয়। 'সাধক রঞ্জন' নামে তাঁর রচিত একটি পুঁথিও পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর একশ বছরেরও পরে তা প্রকাশিত হয় (১৯২৫ খ্রীঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে। বসন্তরঞ্জন

রায় ও অটলবিহারী ঘোষ 'সাধক রঞ্জনে'র সম্পাদনা করেছিলেন।

তাঁর গানের প্রথম সংকলন ১৮৫৭ খ্রীঃ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন বর্দ্ধমানের সঙ্গীতজ্ঞ মহারাজা মহাতপচাঁদ, মহারাজা তেজচাঁদের পোষ্যপুত্র।

কমলাকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে রক্ষিত একটি হস্তলিখিত পুঁথি থেকে মহাতপচাঁদ 'সাধক কমলাকান্ত কৃত শ্যামাসঙ্গীত' নামে ১২৬৪ সালের ২২ ভাদ্র প্রকাশ করেন, কলকাতার ভাস্কর যন্ত্রে (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৭)। এই পুস্তকটিই কমলাকান্তের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে প্রামাণিক সংগ্রহ। তবে কমলাকান্ত রচিত সমস্ত সঙ্গীত এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারণ কমলাকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে প্রাপ্ত যে পুঁথি থেকে এই সংকলন প্রকাশিত হয়, তার বাইরেও সাধকের রচনা হয়ত থাকতে পারে। আত্মভোলা ভাবুক সাধকের সমস্ত গানই কি পুঁথিগত হয়েছিল?

আর একটি কথা। বইখানির যদিও নামকরণ করা হয়েছে 'সাধক কমলাকান্ত কৃত শ্যামাসঙ্গীত', কিন্তু এতে কমলাকান্ত রচিত আগমনী ও বিজয়া এবং কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ের গানও আছে। প্রকাশিত গানের মোট সংখ্যা হ'ল—২৬৯। তার মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত ২১৩, আগমনী ও বিজয়া ৩২ এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সঙ্গীত ২৪টি।

গানগুলির প্রত্যেকটিতে স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগ উল্লেখ করা আছে, কিন্তু সঞ্চারী নেই। প্রথম গানটি আছে—(পরজ, জলদ তেতালা) 'বাবার বয়স নবীন। আমি এমন মেয়ে সবরে প্রবীণ।'...

বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর এই সংস্করণ থেকে ১৮৮৫ খ্রীঃ কলকাতার শ্রীকান্ত মল্লিক 'কমলাকান্ত পদাবলী' প্রকাশ করেন। পদাবলীর সংখ্যা ওই ২৬৯। বসুমতী কার্যালয় প্রকাশিত 'কমলাকান্তের পদাবলী'-তে স্থান পেয়েছে ৩০টি গান।

তা ছাড়া, কয়েকটি সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থেও সাধক কমলাকান্ত রচিত পদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথা, 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'তে (১৮৮৫ খ্রীঃ প্রকাশিত) ২৬টি, 'বাঙালীর গান'-এ (১৯০৫ খ্রীঃ প্রকাশিত) ৮০টি, 'সাধক সঙ্গীত'-এ ২০৮টি গান, ইত্যাদি।

এইভাবে বৃহত্তর বাঙালী সমাজে পরবর্তী কালে কমলাকান্তের গীতাবলী পুস্তকের সাহায্যে প্রচারিত হয়েছিল।

এখন তাঁর মৃত্যুকালে গান গাইবার প্রসঙ্গ। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয় বছর পঞ্চাশেক। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁর মুখে মুখে একটি গানের কলি রচনা ক'রে গাইবার কথা শোনা যায়। তা ছাড়া, ঘটনাটির বিবরণ আছে (মহাতাপচাঁদের পোষ্যপুত্র আফতাব চাঁদের পোষ্যপুত্র) তার বিজয়চাঁদ প্রকাশিত সত্য-ভিত্তিক নাটিকা 'কমলাকান্ত'র মধ্যেও। (নাটিকাটি চার অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং শেষের দৃশ্যটিতে কমলাকান্তের জীবনের শেষের গানটি গাইবার বর্ণনা আছে)।

ঘটনার বিবরণ এইরকম পাওয়া যায়। কোটালহাটের সেই বাড়ীতে তখন কমলাকান্ত মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন। জীবনে আর কোন আশা নেই। তাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত জেনে মহারাজা তেজচাঁদ কমলাকান্তের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

মুমূর্ষু কমলাকান্তের ঘরে তাঁর শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন তেজচাঁদ।

কমলাকান্ত তাঁকে দেখে বসতে ইঙ্গিত করলেন এবং তিনিও বসলেন। সাধক তখন ক্ষীণ কণ্ঠে গুন গুন করে গাইছিলেন তাঁর প্রিয় শ্যামাসঙ্গীতটি—মজিল মোর মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।...

তাঁর বিদায় সময় বুঝে তেজচাঁদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—কি ভট্টচায, তুমি ত চললে। কেবল এই বুড়োটা (অর্থাৎ মহারাজ নিজে। তখন তাঁর বয়স ৫৩ বছর, কিন্তু সেকালে ওই বয়সে নিজেকে বুড় বলাই রীতি ছিল। এখনকার দিনে ওকথা বড় একটা উচ্চারণ হতে শোনা যায় না, ও বয়সে অনেকেই যুবক সেজে থাকেন) পড়ে রইল। তোমার কি গঙ্গাতীরে যাবার ইচ্ছে? ব্যবস্থা করব?

কমলাকান্ত কথার উত্তর না দিয়ে একটি পদ রচনা ক'রে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করলেন তেজচাঁদের কাছে। মন্দিরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে, বুকে হাত রেখে তিনি তেমনি ধরে তাঁর একনিষ্ঠ শ্যামাভক্তির সেই গান গাইলেন:

কি যাবাই কেন গঙ্গাতীরে যাব,
আমি কালো মায়ের ছেলে হয়ে
বিমাতার কি শরণ ল'ব?...

সেই তাঁর শেষ গান এবং শেষ কথা।

রমজান খাঁ:

বিখ্যাত টপ্পা-শিল্পী রমজান খাঁও জীবনের শেষ ক্ষণে গান গেয়েছিলেন, জানা যায়। কাউকে শোনাবার জন্যে নয়, কোন আসরেও পরিবেশন করা নয়। বস্তুতে সেদে

…-দেবতার উদ্দেশ্যে সুর-সাধকের তা অন্তিম …াঞ্জলি।

…তায় রমজান খাঁর সঙ্গীতজীবনের নানা কথা, তাঁর …র আসরের বিচিত্র সব কাহিনী, বাংলা দেশে তাঁর …গুলীর মাধ্যমে টপ্পা অঙ্গের গানের প্রসার লাভ …খাঁ সাহেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গান গাইবার …ন ইত্যাদি 'সঙ্গীতের আসরে' পুস্তকে দেওয়া …হ। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে শুধু তাঁর মৃত্যুকালের …র্ণনা করা হবে পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে।

…মজান খাঁর বয়স আশী পার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু … বিশেষ ভাঙে নি। যে রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হয় …ও তিনি বিশেষ অসুস্থ ছিলেন না এবং বিকালেও …ড়ি ঘুরে এসেছেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে। এমন …ও শরীরে কোন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি। রাত্রের …র করবার পরে শুয়েছেন অন্য দিনের মতন।

…ত হয়েছে। পরিবারের সকলেও ঘুমিয়ে পড়েছেন। …নিক পরে রমজান হঠাৎ তাঁর বড় মেয়েকে নাম ডাকলেন। মেয়ে কাছে এসে দাঁড়াতে তাকে …ন—আমায় বসিয়ে দে।

…রকম তিনি আগে কখনও বলেন নি, বিনা সাহায্যেই …া করেছেন গতকাল পর্যন্ত।

…শ্চর্য বোধ করলেও মেয়ে তাঁকে হাত ধরে তুলে বিছানায় বসিয়ে দিলে, তাঁর দু'পাশে দু'টি বালিশ রেখে দেওয়া হ'ল

এইভাবে বসবার পর তিনি মেয়েকে বললেন—একতারাটা এনে দে।

দেয়ালে একটা একতারা টাঙানো থাকত। কখনও তাতে তেমন হাত দিতেন না। এখন সেইটি চাইলেন। তারপর একতারাটি হাতে পেয়ে তার সুর ঠিক করে নিয়ে আরম্ভ করলেন গান।

এত রাতে একতারা বাজিয়ে গানও তিনি বড় একটা গাইতেন না।

তা ছাড়া, সেই রাতে বিছানায় বসে তিনি যেভাবে গান গাইতে লাগলেন, তত ভাল ক'রেও তিনি নাকি শেষ বয়সে অনেক সময় গাইতেন না। অথচ কাউকে শোনাবার জন্যেও গাইছেন না। তন্ময়, আত্মহারা হয়ে তিনি গাইতে লাগলেন, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল ভাবাবেগে।

খানিকক্ষণ এইভাবে গাইবার পর তিনি গান থামিয়ে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর ঘুমিয়ে পড়লেন যেন।

মেয়ে তখন তাঁকে ডাকতে লাগল—বাপজান, বাপজান।

কিন্তু রমজানের সে ঘুম আর ভাঙল না। (ক্রমশঃ)

—:০:—

ঐক্য

[illegible]

লেখিকা — শ্রীমতী [illegible]

অনুবাদিকা — শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দালদের একটা প্রচার গাড়ি বটৎসেনবাথের পথে বমরেম ছেড়েছে ৎসিজিশের লোকেরা এ খবর দেওয়াতেই দরজার কাছে গোলমালটা হয়েছিল। অল্পক্ষণ চলার পরেই ৎসিজিশ ট্রাক থামানর হুকুম দেয়। ওদের যেটা সবচেয়ে ভাল গাড়ি সেটা চালাচ্ছিল ভাটিখানার ড্রাইভার। ৎসিজিশ ও তার কয়েকজন সঙ্গী গাড়ি বদলে সেটায় গিয়ে ওঠে। বাকি দু'টি গাড়িকে পিছনে ফেলে ওরা দ্রুত এগিয়ে যায়! বটৎসেনবাথ ছাড়বার একটু পরেই এবং মিলে পৌঁছানর আগেই ওরা দেখতে পায় ওদের দিকে দ্রুত অগ্রসরমান গাড়িটাকে। ঠাসা ট্রাকটার মধ্যে দুটো লোককে মুখের আদল দেখেই চিনে ফেলে ৎসিজিশ। একজন হ'ল রেণেল—ওরই মত ছোট করে চুল ছাঁটা, আর তার প্রতিবেশী ইবসুট্ট—যার চোখ সে ছুরি মেরে উপড়ে ফেলেছিল, এখনও সেখানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

ইবসুট্ট ছিল এই অঞ্চলে গুটিকতক লোকের মধ্যে একজন যে, বহুকাল ধরে দালেদের মূল ঘাঁটি আগলে ছিল। সে ছাড়া আর বিশেষ কেউ ছিল না বললেই চলে, কয়েকজন ছিল শহরের কাছে নিভারডাইলারবাথে আর কিছু ছিল বমরেমে, যেখানে বাদির খাদগুলো ছিল।

খাদগুলো বন্ধ হয়ে যাবার পর ইবসুট্ট তার শ্বশুর-বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে এদিকে চলে আসে। গোড়ার চাষীদের কাছ থেকে যে প্রত্যক্ষ বিরূপতার সম্মুখীন হয়েছিল প্রশান্ত আমুদে ধৈর্যের দ্বারা তাকে শমিত করে সে। ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করে চাষীরা। তারা জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করে, বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। ৎসিজিশকে সে মোটা এবং বুদ্ধিহীন মনে করত, তার সঙ্গে অল্প গুটিকতক বাক্যের বেশী বিনিময় হয়েছে কি না সন্দেহ। এক বছরে তাদের যা-কিছু কথা হয়েছে তাতে রুক্ষতাও ছিল না, বিরূপতাও ছিল না।

তার পর ৎসিজিশ নাৎসী হয়ে গেল—মনে হ'ল যেন রাতারাতিই। অন্ততঃ সিদ্ধান্ত নেবার আগে পর্যন্ত ৎসিজিশের মন কোন্ খাতে বইছিল তা ইবসুট্টের জানা ছিল না। তার কাছে এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। যে ৎসিজিশ ছিল গোমড়ামুখো এবং চুপচাপ ধরনের সরাই-খানায় তাকে পাগলের মত এবং রাগে আত্মবিস্মৃতভাবে কথা বলতে দেখে অবাক হয়ে যায় সে। ইবসুট্ট তাকে লক্ষ্য করে একটা কথা বলেছিল। তাতে যে কিছু দোষ করার চেষ্টা ছিল তা তার মনে হয় নি। কিন্তু ৎসিজিশ তার উপর পড়ে হিংস্রভাবে ছুরি মেরেছিল তাকে।

মনে মনে ৎসিজিশ ভেবেছিল ইবসুট্ট আর গ্রামে পদার্পণ করবে না। কিন্তু ইবসুট্ট নিজের কমরেডদের শুধু হাসপাতাল থেকে তাকে নিয়ে আসতেই বলে নি, আবার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চোখে সে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দালেদের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তব্যাপী পরিক্রমায়।

সংঘর্ষের মুখোমুখি দুই ট্রাকের দুই দল যখন পরস্পরের পরিচয় বুঝতে পারল তখন বুকের ভিতরটা ধকধক করে উঠল তাদের। মুহূর্তের জন্ত মনে হ'ল যেন এক চুলের তফাতে ট্রাক দুটো পরস্পরকে পার হয়ে যাবে, ঘটনাটা ওখানেই চুকে যাবে কয়েকদফা চিৎকার চেঁচামেচির পর। কিন্তু ট্রাক দুটো যখন পরস্পরকে পার হয়ে যাচ্ছে ৎসিজিশ হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে ছোট্ট হালকা ইবসুট্টকে কোমর ধরে তুলে নেয়। কমরেডরা তাকে ধরে রাখতে পারে না, কারণ টানাটানিতে দেহটা হয়ত দু-আধখানা হয়ে যেত।

ৎসিজিশ ইবসুট্টকে উঁচু করে ধরে থাকে, তার পর ট্রাকটা পুরোদমে চলতে চলতে ধপ করে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়।

লালেদের ট্রাকটা পিছনে ফেরে। ৎসিলিশদের গাড়ি পথ আটকে দাঁড়ায়। সকলে লাফিয়ে পড়ে, যেন এক্ষুণি পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মনে হচ্ছিল যেন রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে, এমন সময় রেভেল হঠাৎ ডেকে ওঠে, "ৎসিলিশ, ৎসিলিশ!"

রেভেলও ৎসিলিশের মতই ছোটখাট। কিন্তু বিনা আয়াসে গলা তুলতে পারত সে। এই মুহূর্তে তার বিপুল দলের কাছে কিছুটা দুর্বল দেহটাকে যেন একটা হেঁয়ালি মনে হয়।

তখন ৎসিলিশও ওই রকম জোরালো গলায় উত্তর দেয়, তাতে অবশ্য কেউ অবাক হয় না। সে বলে: "হাজির।"

মুহূর্তের অন্ত ছেদ পড়ে, পরস্পরের কাছে পৌঁছয় ওরা। রেভেল চেঁচিয়ে বলে: "তিনটি প্রশ্ন আছে ৎসিলিশ।"

"বলে ফেল।"

যে যার লোকেদের সামাল দিয়ে রাখে। তাড়াতাড়ি ইবস্টুকে তুলে নেওয়া হয়। তার তখন জ্ঞান নেই, তবে নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। এবার সম্পূর্ণতা নীরবতা বিরাজ করে। সময় তখন সন্ধ্যা আটটা থেকে নটার মধ্যে, দেখতে পাবার পক্ষে যথেষ্ট আলো রয়েছে। কালো মাটিতে ছড়ানো টুকরো টুকরো কেতে কাটা ফসলের গোড়াগুলোয় যেন একটা বাস্তব ঝলক দেখা যায়, এ যেন সমাসন্ন শরতের পূর্বাভাষ। হেড লাইট জালিয়ে অন্ত ট্রাক দুটোকে আসতে দেখা যায় এবার। কারও কাছে কোনও আদেশ না পেয়ে থেমে অপেক্ষা করতে থাকে তারা। এবার রেভেল ও ৎসিলিশ পরস্পরের দিকে এগিয়ে যায়, লড়াই-এর উদ্দেশ্যে নয়, মানুষ হিসাবে পরস্পরকে আরও স্পষ্ট করে দেখবার জন্ত।

অপ্রত্যাশিতভাবে ৎসিলিশের মুখে একটা বিষাদের আভাস লক্ষ্য করে রেভেল। পরবর্তীকালে অনেক সময়ে ভেবেছে সে এই আশ্চর্য ঘটনাটির বিষয়ে। সে বলে: "আমাদের গ্রাম বটৎসেনবাখে তোমরা এবং আমরা 'একযোগে চেষ্টা 'করেছিলাম যাতে খামারের মালিক প্রায়েভেজ, ফসল ঝাড়াই-মাড়াই কল ব্যবহারের কি কমায়। আমরা কি ঠিক করেছিলাম?"

আশ্চর্য হয়ে রেভেলের দিকে তাকায় ৎসিলিশ। কথাটা ভেবে দেখে সে বলে: "হাঁ, আমরা ঠিক করেছিলাম।"

রেভেল বলে চলে: "নিভারভাইলারবাখে আলব্রেসট্ট অফিস্-এর খামার বেদখল করার বিরুদ্ধে আমরা এবং তোমরা এক সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম কি?"

ৎসিলিশ তার বিশাল মাথাটা নোয়ায়, যেন একচক্ষু দৈত্যের মত সে তার হ্যাণ্টা চৌকো কপাল দিয়ে রেভেলকে আরও ভাল করে দেখতে পাবে। তারপর বলে: "হাঁ, সেটাও ঠিক ছিল।"

রেভেল বলতে থাকে—তার প্রতিটি বাক্য এবার আগেকার চেয়ে অনেক মৃদু, অনেক কোমল—"এবার শেষ কথা, বুধবারে বটৎসেনবাখে তোমাদের একটা সভা আছে। আমাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দাও।"

"তা এখন তোমায় দিতে পারব না, তোমায় অপেক্ষা করতে হবে।"—জবাব দেয় ৎসিলিশ।

"কবে পর্যন্ত?"

"মঙ্গলবার পর্যন্ত।"

রেভেল বলে: "বেশ।" পিছন ফিরে ট্রাকে এসে ওঠে সে।

"ওকে যেতে দাও।" চেঁচিয়ে বলে ৎসিলিশ। মাটিতে থুতু ফেলে সে ট্রাকে গিয়ে ওঠে।

॥ ৪ ॥

যখন ডক্ষেখলিন কাঠের জোগাড়ে বেরিয়ে গেল তার স্ত্রী তখন পোশাক-পরিচ্ছদ পরেই আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। গলায় বড় বড় শব্দ তুলে বাচ্চাটা নড়ে-চড়ে উঠতেই প্রসারিত হাতের একটা আঙুল দিয়ে সে দোলনায় দোল দিতে লাগল। তার পরই সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু একটু পরেই বাইরে থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল: মৃগান, মৃগান।

সে লাফিয়ে উঠল, কিন্তু লোকটা আগলে ফেরে নি। তার অবিশ্রান্ত ডাক শুধু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওর কানে। ভয়ের চোটে তার বুক থেকে দুধ ঝরতে সুরু করে, জামাটা ভিজে যায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটাকে

তুলে দিতে হবে তার। তার মুখ এমন অভিব্যক্তিশূন্য ছিল যাতে সেই পাণ্ডুর মুখে নারীসুলভ কোনও ভাব দেখা যেত না। কিন্তু এখন তার মুখে নতুন এক ভাব দেখা দিল। নৈরাশ্যের একটা রেখা তার ভ্রূযুগলকে বিচ্ছিন্ন করে দিল, শেষ পর্যন্ত যেন সম্পূর্ণ হ'ল তার মুখখানা। জামার বোতাম খুলে ফেলল সে। ছেলেটা যেন একটা ছোট্ট চাষী, গায়ের রং লাল, ছোট ছোট লোমে ভর্তি শরীরটা আর গলাটা ভাঁজে ভর্তি। মুঠো মুঠো এমন জোরে বরকমা যেন মাটি থেকে শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত নিংড়ে নেবে। মায়ের বুক থেকে শেষ ফোঁটাটুকুও চুষে নেবার জন্য যেন এগিয়ে আছে জোয়াল জোড়া। এমন কি বাচ্চাটাকেও ভয় করে ও। বুকটা খুলে দেয়। শেষ বারের মত তার নৈরাশ্য রূপান্তরিত হয় ধৈর্যের অভিব্যক্তিতে।

বাচ্চাটার দুধ খাওয়া শেষ হয়েছে। মুহূর্তের জন্য সে জোলনার দিকে চেয়ে থাকে ঠিক আর পাঁচটা মায়ের মতই। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। চ্যাপ্টা কপালের পিছনে একটা অস্বস্তিকর ব্যথা কিলবিল করে ওঠে। শেষ বাচ্চাটির জন্মের পর থেকে যখনই সে জোর করে কোন চিন্তা করতে চায় তখনই তার মাথার যন্ত্রণাটা আরও বেড়ে ওঠে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত চিন্তাটা ঠিকই ফুটে ওঠে—দেখা দেয় সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ রূপে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মনের অনুজ্ঞা সে মেনে নেয়। নীচু হয়ে জুতো পরে নেয় চটপট। নানা রঙে রঙীন সুতোর এপ্রনটার উপর অয়েলক্লথের আর একটা চাপিয়ে নেয়।

সকালবেলা বেরোবার আগে স্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল: "কি? তুমি এখনও মাঠে আসবে না?" সে জবাব দিয়েছিল: "আমাকে আগে কাপড় ধোবার কাজ করতে হবে।"

সে তার সার্ট ও এপ্রন কষে বেঁধে নেয় এবং একটা রুমালে চুলগুলো শক্ত করে বাঁধে। যখন সবে দরজা দিয়ে পা বাড়িয়েছে তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল দু'জন প্রতিবেশিনী। তারা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে: "কি খবর?" ওকেও ঠিক তাদেরই মত দেখায়। পরচালার নীচে একটা গামলায় ভেজান ছিল ময়লা কাপড়গুলো। একখানা কাঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে-থাকা কাপড়গুলোকে সাবান-জলের মধ্যে ঠেলে দেয় ও। মুহূর্তের জন্য সে গামলাটার দিকে চায়—যেমন করে চেয়েছিল দোলনা-খানার দিকে। শরীরের মধ্যে একটা ব্যথা উঠে ওর পেট থেকে হাঁটু পর্যন্ত নেমে যায় যেন আসন্ন পীড়নের প্রতিবাদে। প্রথমে সে চেয়েছিল কয়েকটা ধোয়া কাপড় নিংড়ে খালি বালতিটায় ফেলতে। পরে ভেবে একটা ভাল ব্যবস্থা বের করে ও। গোটা গামলাটাই চালের নীচ থেকে ঘরের পাশ দিয়ে পাম্পের কাছে ঠেলে নিয়ে যায়। এই চেষ্টায় বুকখানা তার ধড়ফড় করে ওঠে। সে একটু অপেক্ষা করে। বাচ্চাটার জন্যে যেমন ভয় পেয়েছিল, নিজের হৃৎপিণ্ডটার জন্যেও তেমনিই ভয় পায় সে।

শরীরের সমস্ত ভার দিয়ে হাতলটা চেপে ধুয়োর নলটা ভর্তি করে নেয় ও। সাধারণতঃ সে কাপড় কাচার দিনে ঘর ও আপেল গাছের মাঝখানে একটা তার বেঁধে দিত। সেদিকে চোখ তুলে চেয়েছিল ও। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেই খালি জায়গাটায় যেন একটা মরীচিকা ভেসে ওঠে—এক গাদা কর্সা কাপড়—সাদা, নীল, লাল, নানা রঙের পতাকার মত হাওয়ায় উড়ছে, যেমন সানন্দ, তেমনি নির্মল। তার দুর্বল এবং ক্রমশঃ ভেঙে-পড়া মন দিয়ে নয়, কিন্তু অন্তর দিয়ে সে বুঝতে পারে যে এই ভেজান কাপড়গুলো কখনও হাওয়ায় উড়বে না, যে কাজ করতে সে যাচ্ছে সে এমন কাজ যা কেউ কোনও দিন শেষ করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও সে নীচু হয়, ওপরে যে দুটো কাপড় ছিল—সে দুটো তার স্বামীর সার্ট—সেগুলোকে সে পরিষ্কার জলে ডুবিয়ে দেয়। পিঠ খাড়া করে দাঁড়াবার ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু সে বুঝেছিল যে একবার খাড়া হবার এবং নীচু হবার মত শক্তি তার নেই। তাই আবার নুয়ে পড়ে সে, কোনক্রমে নলটায় ঠেকা দিয়ে বসে যায়। ইতিমধ্যে তার সারা শরীর ভিজে উঠেছিল এক চটচটে তরল পাঁকলায়—ঘাম, রক্ত, দুধ—অনেক মূল্যবান পদার্থের সংযোগে তৈরি সে পাঁকলা।

বাড়ী এবং আপেল গাছের মধ্যে সে কত চোখ বোলায়, সে দৃষ্টি প্রায় দুর্ভের মত। ভাবটা যেন ওখানে

কেউ লুকিয়ে বসে আছে, বেরিয়ে আসতে পারে যে কোনও সময়ে। কিন্তু এল না কেউ। এ যেন সেই ছেলেবেলার মত—যখন অজ্ঞাত বাচ্চাদের সঙ্গে সে লুকোচুরি খেলত। তারা কিন্তু তখন নিজেদের লুকিয়ে ফেলত না, দৌড়ে পালাত ওকে বোকা বানাবার জন্য। আবার সে ধোয়া আরম্ভ করে—বাচ্চাদের শনিবারের পোশাকগুলো। ওগুলো উপরেই পড়েছিল, সবই ত ছিল অগোছাল অবস্থায়।

এইবার এল আসল নোংরা কাপড়—লাল এবং দাগে ভর্তি ·পাঁজুকের বাঁধে ন্যাকড়াগুলো। তার মা ছিলেন খোঁড়া, কোনও বোন ছিল না এবং প্রতিবেশীরাও কেউ সাহায্য করে নি। আর টাকা খরচ করে কোনও লোক রাখতে রাজি হয় নি তার স্বামী, হয়ত তার এমনিতেও সে রকম বাড়তি টাকা নেই। তাই ধোয়া-কাচা তার নিজেরই করতে হ'ত। একটা টুকরো তুলে নিয়ে ঘষতে সুরু করে সে। কাপড় কাচার তক্তার উপর রেখে ব্রাশ দিয়ে ঘষে, মলটার এবড়ো-খেবড়ো দিকটায় ঘষে, গামলার পাশের পাথরটায় ঘষে। কিন্তু দাগগুলো একটুও ওঠে না, এমন কি গোড়াকার টুকরোটারও নয়। সেগুলো শুধু উঠতে চায় না তাই নয়, হঠাৎ মনে হয় তার বাড়িতে, ঘর ও আপেল গাছের মাঝখানের দেওয়ালে ও শূন্যে সমস্ত জায়গাটাই লাল-কালো দাগে ভর্তি হয়ে গেছে। আবার সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ভ্রূ কুঞ্চিত করে। বাড়ী ও আপেল গাছের মাঝখানে একটা বিষাদভরা দৃষ্টি মেলে ধরে—যেন ভগবানকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে এবার হস্তক্ষেপের সময় হয়েছে তাঁর। গাছের নীচু ডালগুলোর দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে। সবুজ চকচকে আপেলগুলোও যেন তার দিকে ফিরে চায়। একটা চিন্তা তার মাথায় খেলে—সে ঘরে ফিরে যাবে, বিছানায় শুয়ে পড়বে। কিন্তু তার মনটা বুঝতে পারছিল যে ব্যাপারটা অত সোজা নয়, কাজটা তার হবে না, কিন্তু না করেও উপায় নেই। তারপর দীর্ঘ একটা সময় কেটে গেল—না কি তারপর কম সময়? আসলে তিনটে ঘণ্টা কাটল প্রায়।

হঠাৎ বাড়ীর সামনে গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ এবং 'সুসান, সুসান' চিৎকার শোনা গেল। সে চমকে ওঠে। কাঁধ এবং জঙ্ঘোড়া কাঁপতে থাকে, মুখখানা পাণ্ডুর হয়ে ওঠে। তার অস্পষ্ট মনটা অর্ধোস্ফুট চিন্তারাশিতে ভরে ওঠে, কয়েক মুহূর্তের জন্য অনেকগুলো ছোট ছোট ভয় তাকে বড় রকমের একটা বিভীষিকার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত রাখে। তার স্বামী গিয়েছিল কাঠের জোগাড়ে, মাঠে যাবার পথে কিছু গরম খাবার সঙ্গে নেবার জন্য বাড়ীর দরজায় থেমেছে। মেয়েটা দৌড়ে রান্নাঘরে যায় এবং নোংরা ডিসগুলোর ভিতর আলু পেষবার যন্ত্রটা খুঁজতে থাকে। তার স্বামী অপেক্ষা করছিল দেউড়িতে। অধীর হয়ে সে আঙুল মটকাচ্ছিল আর গোড়ালি ঠুকছিল। মেয়েটা আজ সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে স্বামী সম্পর্কে ভয়টাও যেন তার মরে গেছে। লোকটা এদিকে গাড়িতে ফিরে যায় এবং চেঁচাতে থাকে "সুসান, এস, কাঠগুলো নামাও। আসতে পারলে, নাকি না?"

রান্নাঘরে চুল্লীর পিছনে পা রাখার টুলের উপর আলু ভর্তি একটা পাত্র হাঁটুর মাঝখানে চেপে ধরে আলু পিষছিল সুসান।

বাইরে লোকটা তার নাম ধরে চেঁচাতে থাকে, কারণ সে জানত যে সুসান যেখানেই থাক না কেন যতক্ষণ তার আপন ভারবহনের ক্ষমতা থাকবে ততক্ষণ তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে পারবার শক্তি আছে ওর গলার স্বরের। সুসান জানত সে শেষ সীমায় পৌঁছেছে, তবু আদেশ শুনতে হবে তাকে। আবার ভর্তি হয়ে উঠেছে তার বুক। হয়ত এক্ষুণি যদি বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাওয়াত তবে বিকেল পর্যন্ত সব ঠিক থাকবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছে সে। লোকটা চেঁচিয়ে বলে: "ধর না কেন, বেশীক্ষণ সময় যাবে না তোমার।"

মেয়েটা গরুটার পাশে দাঁড়িয়েছিল, হাতখানা রেখেছিল গাড়ির জোয়ালের উপর। তাতে কুঁজো পশুটার পিঠখানা ধরে গিয়েছিল—গোড়াবিহীন মালিকের গরুর মত। পিছিয়ে আসে মেয়েটা, চাষীটা কাঠগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে থাকে। মাঠে ফিরে যাবার তাড়া ছিল। কাঠ বওয়ায় এ কাজটা তার কাছে বিশেষ

কিছু নয়, কিন্তু মেয়েটার পক্ষে এ এক কঠোর পরিশ্রম—যা তার জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে পারে। কাঠ লোকার জন্ত হাত দুটো তার আগে-পিছে করতে থাকে যেন জীর্ণ ভেঙেপড়া হাওয়া কলের পাখার মত। ছোটর আগের ছেলেটারও রক্তবর্ণ লোমশ চেহারা, একেবারে তার বাপের মত, এমন কি গলার ভাঁজগুলো এবং ভাঁজভরা ঘাম পর্যন্ত বাপের মত। সে কাঠগুলো টেনে টেনে ফেলতে থাকে পরচালার তলায় যেখানটায় আগে কাপড় কাচার গামলাটা ছিল।

তার পর রওনা হয়ে যায় ওরা, গরুটা বাপ-ছেলে আর গাড়িটাকে টেনে নিয়ে চলে। ভুলে যাওয়া কিছু একটা মনে পড়ে যায় লোকটার, আদুল মটকে সে পিছনে ফিরে চায় বৌকে ডাকবার জন্ত। মেয়েটা বোঝবার চেষ্টা করে ওকে কি করতে বলছে—তাকে কাঠের আড়িনায় যেতে হবে—সেখানে কিছু একটা ছেড়ে এসেছে লোকটা, নয় সেখানে কেউ অপেক্ষা ক'রে আছে যাকে কোনও খবর দিতে হবে।

বাচ্চাটা এখন প্রবল জোরে অবিশ্রাম চিৎকার করতে সুরু করে। এক প্রচণ্ড শক্তি সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে অনেক জোরে তার বুকে মোচড় দেয়। এ শক্তি তার নিজের নয় কারণ সে এখন মারাত্মকভাবে দুর্বল। এ শক্তি যেন তাকে ভেদ করে ছুটে যাচ্ছে। কাঠের আড়িনা খুব বেশী দূরে নয়, বড় জোর পনের মিনিটের পথ। সাধারণতঃ তার মন ছিল ছোটখাট চিন্তার পক্ষেও নিতান্ত অপরিসর, এখন কিন্তু বিনা চেষ্টায় দুটো পরিষ্কার চিন্তা ফুটে ওঠে সেখানে। হয় জঙ্গলে যাবে, ফিরে এসে বাচ্চাটাকে খাওয়াবে, কাপড় ধোবে, দিনের রান্না করবে, দুধ দোয়াবে, ছেলেমেয়েদের শোয়াবে, গরুগুলোকে খাবার দেবে, তিল বোনে এবং আবার বাচ্চাটাকে খাওয়াবে—নয়ত দৌড়ে পালাবে, আর ফিরবে না।

কিছুক্ষণের জন্ত সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে যেমন ভাবে দুটোই ভাবতে পারছে তেমনি দুটোই করতে পারবে। যা হোক সে দৌড়ে ঘরে গেল, পোশাকটা আঁটসাঁট করে নিল এবং মাথায় একখানা রুমাল বেঁধে ফেলল। গ্রামের পথে হাঁটবার সময় তিন-চারবার দরজার আড়াল থেকে বা বেড়ার পিছন থেকে লোকে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে: "কেমন আছ?" মৃদুস্বরে সে জবাব দেয়: "এই চলে যাচ্ছে" এবং "ধন্যবাদ।" এই প্রথম গলিটার ভয় করে না তার। যখন থেকে সে বড় হয়েছে এবং সকলের নজ'র পড়েছে ব'লে বুঝতে পেরেছে তখন থেকে এই প্রথম গলি দিয়ে একলা হেঁটে যাবার সময় সে ভয় পায় না। এখন তার মনে হয় সে নিজেই যেন স্থির হয়ে আছে, আর ঘরবাড়ী, গোলাঘর, বেড়া—এরাই যেন ছুটে পার হয়ে যাচ্ছে তাকে।

মেয়ৎসএর বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছানর পর সে পাহাড়ের দিকগার রাস্তাটায় পা দেয়। কাঠের আড়িনার কথা একেবারে ভুলেই যায়, সিধে দৌড় দেয় বনের দিকে। পা দুটো দ্রুত ফেলতে থাকে। সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হবার সময়ও একটু তলানি জমে থাকে, কিন্তু এখন আর সেটুকু বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই।

একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ে সে। গাছের কাটা গুঁড়িগুলোর মাঝখানের জমিটা বুনো চারাগাছে ঢাকা। বসে পড়ল সে। যেখানে বসল সেখান থেকে নীচু নীচু পাহাড়গুলোর থেকে উপত্যকা পর্যন্ত নেমে যাওয়া পথখানিকে দেখা যায়। তার পায়ের নীচ থেকে ওধারের পাহাড়গুলোর তরঙ্গায়িত রেখা পর্যন্ত সমগ্র উপত্যকাটায় গভীর এক শ্যামল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। পাহাড়গুলোতেও ইতস্ততঃ ছড়ানো গাছ, পাতাগুলি তাদের ইতিমধ্যে পিঙ্গল হ'তে সুরু করেছে। মধ্যদিনের স্বর্ণরশ্মির চুমকি-বসান জাল সমগ্র দৃশ্যপটকে আবৃত করেছিল এমন এক আলোয় যা স্পষ্ট অথচ চোখ ধাঁধান নয়। নদীর অপর পারে আলোর ঔজ্জ্বল্য প্রখরতর, আলো ওখানে পরিণত হয়েছে এমন এক দীপ্তিতে যা দুই তীরের বাড়ীগুলোকে, নদীতে ভেসে-চলা নৌকা দু'খানিকে সুখ ও সন্তোষের স্পর্শ দিয়েছে।

মেয়েটা দু'চোখ দিয়ে নদীস্রোতকে অনুসরণ করে। উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা আরও হেঁটে যায়। ছোট্ট একটা পাহাড়ী ঝোরার কাছে আসে। ঝোরাটার জল গতিপথ থেকে সরে গিয়ে একটা ফাঁপা গাছের গুঁড়ির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। মেয়েটা আর একবার বসে পড়ে।

এখান থেকেও নদীটা দেখতে পাচ্ছিল সে, আগের চেয়ে আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। সেই সঙ্গে গ্রামের একটা অংশকেও দেখা যাচ্ছিল। অনতিদূরে কোনও একটা বাড়ীর পিছনে একটা কাপড় ধোবার গামলা পড়ে ছিল, কোনও একটা ছাদের তলায় কাঁদছিল একটা শিশু। ওই শিশুটির সঙ্গে ওর বুকের ততটুকু বা ততখানিই সম্পর্ক ছিল যতটা ছিল তার ভ্রূযুগলের মাঝখানের রেখাটার সঙ্গে নদীটার। তার অস্ফুট মনের মধ্যে সে একটা খুঁটির সন্ধান করে যে ভাবে জলাভূমিতে শক্ত একটু জমির সন্ধান করে, মানুষ। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু হঠাৎ একগোছা চারা আঁকড়ে ধরে তার মুঠি, তার পর অবশেষে সেও একটা কিছুর সন্ধান পায়। এক পরদেশীর শান্ত-ধূসর চোখের সামন্ত আলো, তার বাবার খামারের এক সহকারীর। সহাস্যে ও সেদিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তার দু'বাহু আলিঙ্গন করল ওকে। দু'খানি মুখের মাঝখানের পবিত্র অন্ধকারও তার চোখ দু'টির আলো নেভাতে পারে নি। এ পৃথিবীতে ওর জন্য ওই একটি মাত্র আলোই জ্বলে উঠেছিল।

নিজেকে একটু তুলে ধরে ও। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে সামন্ত আলোর এই পরিবেশে প্রতীক্ষা করে যতক্ষণ পর্যন্ত আবার সব কিছু শূন্যে না মিলিয়ে যায়। আবার নিজের শরীরকে অনুভব করে সে, অনুভব করে যন্ত্রণাক্লিষ্ট তার বর্তমান সত্তাকে। কেমন করে নদীতে পৌছবে সে? হঠাৎ একটা চিন্তা তার মাথায় আসে, গভীরভাবে অনুসরণ করবার মত একটা চিন্তা। পাশেই তার কাঁপা গুঁড়ির ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে জলধারা, গভীর নয়, কিন্তু দ্রুত প্রবহমান। জলে হাত ডোবায় সে, বরফের মত হিম তার চামড়া ভেদ করে। কাৎরে উঠে তাড়াতাড়ি এপ্রনে হাত মোছে সে, তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জুতো জোড়া টেনে খুলে নেয়, কারণ জুতো জোড়ার জন্যও দুঃখ হয় তার। অবশেষে এপ্রন খোলে, খুলে ফেলে জুতোরটাও। কারণ তাদের জন্যও মমতা হয়। ওর ধারণা শরীরের চাইতে পোশাকের দাম বেশী। কার্টটা ভাঁজ করে পায়ের উপর ধরে, উরু দুটো দিয়ে সেটাকে চেপে ধরে, তার পর গাছের গুঁড়ির মধ্যে গলে যায়। এক নিমিষের মধ্যে আটকে যাওয়া জল তার মাথার উপর ওঠে। তার পর জলের কর্দমাক্ত স্রোত বইতে থাকে তার মুখ ও বুকের উপর দিয়ে নতুন অভ্যস্ত গতিপথে। কারণ নিজের দেহটা সম্পূর্ণ প্রলম্বিত করে নীচের দিকে ঠেলে রেখেছিল সে। তার অকর্মণ্য পা দুটো নিয়ে নদী পর্যন্ত যেতে আধঘণ্টা লেগে যেত। এখানে মরবার জন্য তার প্রয়োজন শুধু ধৈর্যের—আর ওই একটা জিনিসের অভাব তার কোনও দিনই ছিল না।

বিকেলবেলায় যখন চাষী ঘরে ফিরল, বাচ্চাটা তখন চিৎকার ক'রে ক'রে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, মুখখানা নীল। বৌও ঘরে নেই। তখন কয়েক টুকরো ডাকড়ার সলতে পাকিয়ে সেটাকে অবশিষ্ট দুধটুকুতে এবং গরুর খাবারের পাত্রে পড়ে থাকা ক্যানে ডুবিয়ে দিল। বাচ্চাটা তাই চুষে নিল পেট ভরে, কারণ ও নিতান্তই বাচ্চা এবং যে কোনও প্রকারে হোক বাঁচতে চায়। তার পর সে যখন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে লোকটার মনটা হাল্কা হয়ে যায়, খুশী হয়ে ওঠে সে। তার পর যখন বড় ছেলেগুলো রাতের খাওয়া শেষ ক'রে খুঁত খুঁত করে ঘুরতে লাগল আর বৌও ফিরল না, তখন সে বুঝল যে বহু বছর ধরে গোপনে যে আশা সে পোষণ করে আসছিল আজ অবশেষে তা পূর্ণ হ'ল। কিন্তু সে বুঝল যে এমন কিছু সে চেয়েছিল যা অবর্ণনীয় বিভীষিকায় ভরা। আর তার স্বপ্ন সফল হবার মাঝখানে পৌঁছে মনে হ'ল যে কোনও লোকের পক্ষে এমন বিভীষিকাময় ভাবনা পোষণ করা কল্পনাতীত, আর সে নিজেই একাজ করেছে। এই অনুভূতিকেই সাধারণতঃ অনুতাপ ব'লে বর্ণনা করা হয়। কাজেই শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বাসই করল না যে এ রকম ভয়ানক ইচ্ছা কখনও সে পোষণ করেছিল। আর তাই তার ইচ্ছাপূরণ হওয়াকে সে হাল্কা ভাবে ও শান্ত মনে উপভোগ করতে সমর্থ হ'ল। জীবনের গতিপথে ভেসে আসা যে কোনও অন্য ঘটনা—যেগুলোকে মানুষ কোনও না কোনও উপায়ে কাজে লাগায়, তার মতই এটাও সে গ্রহণ করল।

পরশু বিকেলে বৃষ্টি নামল। স্রোত মেয়েটাকে

তাদিয়ে পাহাড়ের পা দিয়ে নদীর কিছুটা কাছাকাছি নিয়ে ফেলল। যে লোকটা তার জুতো ও এপ্রন দেখতে পেল সে আর কিছু দেখবার জন্য চারধারে চাইতে ভয় পেল এবং কাছাকাছি কোনও মৃতদেহ না দেখে সে খুশীই হ'ল।

কাঠের আঙিনায় ভেহেথলিন যে নতুন রুটকাটা ছুরিটা ফেলে এসেছিল তার সঙ্গে ও জিনিসগুলোও নিয়ে এসেছিল নিকলাজ্। চলে যাবার আগে ওই ছুরিটার জন্যই ভেহেথলিন ডাক দিয়েছিল বৌকে। বন থেকে গ্রামের রাস্তা বেয়ে আসতে আসতে সকলকেই জিনিষ-গুলো দেখিয়েছিল নিকলাজ্। জিনিসগুলো দেখতে পেয়ে চাষীটার সমস্ত শরীরে যেন তড়িতাঘাত বয়ে গেল। লোকটা এমন জোরে মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছিল যে দাঁতগুলো তার কড়মড়িয়ে উঠল, সে শুধু হাত দুটো মুঠো করতে এবং প্যান্টের বোতাম লাগাতে সক্ষম হ'ল। মনটাকে কিন্তু আনন্দে নেচে ওঠা থেকে সে নিবৃত্ত করতে পারল না। লোকটা চমকে ওঠে এবং হাঁক টানে। কি বলতে হবে বুঝতে না পেরে সে বলে: "ভিতরে এস।"

বয়সে বড় লোকটা তার সামনে বিব্রত হয়ে পড়ায় নিকলাজ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার বয়স চব্বিশ বছর, সে লম্বা ও রোগাটে। বিপুল একটা শক্তি ছিল তার মধ্যে, সে শক্তি আবদ্ধ নয়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবহমান। ওকে ভিতরে আসতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে অনুতাপ করে ভেহেথলিন। যা হয়ে গেছে তাকে সামলে নিতে বাধ্য হয়ে সে বলে: "বস"। চেয়ারের পায়ার সঙ্গে লম্বা পা দুটো জড়িয়ে রাখে নিকলাজ্। হাত-খানা সে টেবিলের উপর রাখে। যে কোনও কারণেই হোক টেবিল ঢাকাটা এক জায়গাটায় গুটিয়ে রাখা হয়েছিল, সেখানকার পালিশকরা জায়গাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে অনুভব করতে থাকে সে। এই বিপুল বিব্রততার মধ্যেও ভেহেথলিন এই ভেবে বিরক্ত হয় যে এই বাইরের লোকটার পিছনটা তার চেয়ারকে ক্ষইয়ে দিচ্ছে, যেন তার বদলে মেঝেতে বসাই উচিত ছিল নিকলাজের।

লোকটার মনে এখন আর কোনও আনন্দ নেই— দুঃখও নেই, আছে শুধু অস্বস্তি। সে বলে: ভাব ত, ভাব দিকি একবার।" নিকলাজ জবাব দেয়: "কিই বা বলব?" খালি মেঝেতে ঠক করে ওঠে ভেহেথলিনের গোড়ালি। আধবোজা চোখে যুবকটির মুখের দিকে চায় সে, তার মধ্যে দেখতে পায় সমস্ত গ্রামের ধূর্ত ও শোকসন্তপ্ত মুখ। ওরা ঠিক সেই কথাই ভাবছিল, এই মুহূর্তে যা ভাবছিল গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা যাদের ভিড়ে কাপড়গুলো দেখাতে দেখাতে এসেছিল নিকলাজ। যদি এই ঘটনা থেকে কোনও উত্তরাধিকারও লাভ হয়ে থাকে, তা সে এক টুকরো ভাল জমিই হোক, কি একটা নতুন বাড়ীই হোক, কিংবা এমনি কি একটা নতুন ঘোড়াই হোক—তবু কি পোড়া কপাল! পোড়া কপাল অবশ্য সব সময়েই পোড়া কপাল, মানুষকে চিরকালের জন্য দেগে দেয়। কিন্তু অপর পক্ষে এজন্যে জমিটা চাষ না করা, কি নতুন বাড়ীতে উঠে না যাওয়া, কিংবা গরুর বদলে নতুন ঘোড়ায় জিন না পরান হ'ল মূর্খতা।

বয়সে বড় লোকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যুবকটি তার মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরায়। ও মুখে আর নতুন কিছু দেখার নেই। গদিওয়ালা যে লোকাটার চাষীর ছোট ছেলে শোবার দরুণ দাগ ধরেছে সেইটার দিকে এবং ঘড়ি ও দেরাজগুলোর দিকে তাকায় নিকলাজ্। ভেহেথলিন এই আসবাবপত্রগুলো নিয়ে এসেছিল বিয়ের সময়, যখন বিয়ের প্রকাশ্য গোভাযাত্রা উপহারের বস্তু হবার ভয় জেগেছিল তার মনে। তার পূর্ব-পুরুষদের চেয়ে তার সম্বন্ধেই বেশী জানত গ্রামের লোকেরা। নিকলাজের তীক্ষ্ণ এবং কুকুরের মত সন্দেহাকুল দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ভেহেথলিনের চোখ।

এ বছরেই বিয়ের কথা নিকলাজের। তার পাত্রী পছন্দ করা হয়ে গিয়েছে। তাইতেই সে অপরের সম্পত্তির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে, বুঝতে পারে তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত আনন্দ ও বেদনাকে। তার ভাবী কনে সত্যিই ভাল মেয়ে, পরিবার ভদ্র, ক্ষেতের অবস্থাও অনুকূল। মেয়েটির পা অতিরিক্ত ছোট হবার দরুন সে একটু হেলেদুলে চলে, কিন্তু মুখখানা তার ভরাট ও উজ্জ্বল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এ কথা ঠিক যে, সে যদি কোনও মেয়ের জন্য ঘুর ঘুর করতে চাইত, তাকে

সবলে ধরে নিয়ে শস্যক্ষেতে পড়তে চাইত, আহা, তা হ'লে ওই মেয়েটিকে নিত না। না, ওটিকে নয়।

তার নিজের এই ঘোর বিপদের মধ্যেও বয়স্ক লোকটি যুবকটিকে হঠাৎ চোখ বন্ধ করতে দেখে আশ্চর্য হয়। তার পর তার মনে পড়ে যুবকটির এই বছরেই বিয়ে হবে, এবং কার সঙ্গে হবে। তাদের জমির অবস্থাও অনুকূল, পাত্রপাত্রীও পরস্পরের মানানসই. তা মোটামুটি বেশ। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় নিকলাজ্। চাষীটা বলে: "একটু অপেক্ষা করবে? আমি তোমার সঙ্গে যাব। ওকে খুঁজতে হবে আমায়।" আর এখনই শুধু সত্যিকারের ভয় তাকে পেয়ে বসে।

গ্রামের কেউ মেয়েটাকে খুঁজে পায় নি, পেয়েছিল বনরক্ষকরা। সুতরাং জেলা শহর বিস্ত্রিৎসের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই তার মৃতদেহ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানেই রেজিষ্ট্রি করা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে গিয়ে মেয়েটাকে তার স্ত্রী বলে সনাক্ত করার সময় পাবার অনেক আগেই স্তেফান এ সব কথা জানতে পেরেছিল।

ইতিমধ্যেই প্রতিবেশীরা তার বাড়ীতে এসে গিয়েছে। মরা মেয়েটা যে সব কাজ শেষ করে যায় নি তা এখন অনেক সাহায্যকারী ভাগাভাগি করে নিয়েছে। অনুসন্ধিৎসুরা দেরাজ, বিছানা, সোফার গদির মধ্যে হাতড়ায়। বাচ্চাদের দেখাশোনা হয়, খাবার তৈরি হয়ে যায়। বাড়ী এবং আপেল গাছের মধ্যে কাপড়-গুলো উড়তে থাকে, আর এবার ওগুলো সত্যিই কাপড়, মরীচিকা নয়। মেয়েটা নিজেই ছিল আসলে বাধা। এখন সব কাজই নিয়মমাফিক চলতে থাকে। মৃতরা হয়ত ভারমুক্ত হ'তে পারে কিন্তু জীবিতরা পারে না।

(ক্রমশঃ)

কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু : শতবর্ষ

হারাধন দত্ত

উনবিংশ শতক বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবময় অধ্যায়। বহু-প্রতিভা তার বহু বিকীর্ণ রশ্মিচ্ছটায় এযুগের সাহিত্যকে আলোকিত করেছে। যুগন্ধর কবি-মনীষার সোতাধারা এই সব উজ্জীবন লগ্নকে মুখরিত করেছিল। কিন্তু সকলের কথা আমরা মনে রাখি নি। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বাঙালীর স্মৃতি থেকে মুছে গেছেন। কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু এমনই একটি প্রায়-বিস্মৃত নাম। নিত্যকৃষ্ণ রবীন্দ্র সমসাময়িক এবং পুরাপুরি উনিশ শতকের কবি। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীর এই শুভ মুহূর্তে একটি সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচয় বক্ষ্যমাণ রচনার উদ্দেশ্য।

নিত্যকৃষ্ণ অত্যন্ত স্বল্পায়ু। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এই স্বল্পায়ু জীবন দুঃখ, দারিদ্র্য ও হাহাকারের মধ্যে অতি-বাহিত হয়। তবু এই বেদনাদীর্ণ দারিদ্র্যমলিন জীবন-খানি আমাদের সাহিত্যের জন্য উৎসর্গিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেজন্যই এ জীবন উপেক্ষিত হবার নয়। সাহিত্য-সাধনায় তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা তথা সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি ইতিবৃত্ত প্রয়োজন। এতাবৎ স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কেউ সে কাজ করেছেন বলে জানা নেই। এই অত্যল্পকালের মধ্যেই কবির পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত এক প্রকার অগোচর হয়ে পড়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে তাঁর যে কথঞ্চিৎ দান—তা বিস্মৃতিযোগ্য নয়।

১৮৬৫ সালে নিত্যকৃষ্ণের জন্ম। রাধানগর নামক কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁদের নিবাস। সেখানেই তাঁর পিতৃদেব অবস্থান করতেন। তাঁর সমগ্র ছাত্র ও কর্ম-জীবন কলকাতাতেই অতিবাহিত হয়। কর্মজীবনে বাদুড়বাগানের বৃন্দাবন মল্লিক লেনের এক জীর্ণ বাসা-বাড়িতে তিনি অবস্থান করতেন। খাটাল ষ্টীমার যোগে তিনি প্রায়শ কলকাতা ও রাধানগরের মধ্যে যাতায়াত করতেন। তাঁর জীর্ণ বাসাবাটীর ভয়াবহ অবস্থার কথা তাঁর ডায়েরীর দু'এক স্থলে চাক্ষুষ করা যায়। তিনি এক-স্থলে লিখেছেন—"বাড়ীওয়ালী ব্রাহ্মণী তাঁহার ভ্রাতার পত্নীস্থলাভিষিক্তা তাঁহা ভাগিনীটির সহিত কলহে যেরূপ দক্ষতা, মাস কাবার হইতে না হইতে ভাড়ার টাকাটি আদায় বিষয়ে যেরূপ আগ্রহান্বিতা, তাহার গৃহাধিষ্ঠিত এই গরীব ভদ্রসন্তানের সুবিধান্বেষণে সেরূপ নহেন। বর্ষাকালটায় বাড়ীখানায় একপ্রকার ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হইয়াছে। কবে এই কবিত্বপূর্ণ মস্তকের উপর নামিয়া আসিয়া উহার সমস্ত কল্পনারাশি পঙ্কভূতে মিশ্রিত করিয়া দেয়। এমনই গৃহের অবস্থা।" নিত্যকৃষ্ণ কলিকাতা মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠানে তিনি এনট্রান্স হ'তে এম. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৮১ ও ১৮৮৩ সালে নিত্যকৃষ্ণ প্রথম বিভাগে এনট্রান্স ও এফ. এ. পাশ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৮৮৯ সালে মেট্রোপলিটন কলেজ হতে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। কৃতিছাত্র হিসাবে বিদ্যালয় ও কলেজে তাঁর সুনাম ছিল। পাঠ-সমাপনান্তে তিনি হুগলী জেলার কোন্নগর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। এই পদে কর্মাধিষ্ঠিত থাকাকালীন ১৯০০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি একটি মাতৃহারা শিশুপুত্র রেখে যান। নিত্যকৃষ্ণের মৃত্যুর আগেই তাঁ'র পত্নী দুটি শিশুপুত্র রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁদের প্রথম পুত্রটিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্রের নাম পঞ্চানন বসু। ইনি India Govt.-এর Finance Department-এর অধীনে দীর্ঘকাল চাকুরিরত থেকে সম্ভবতঃ দিল্লী নগরীতে অবসর জীবন যাপন করছেন। নিত্যকৃষ্ণের দু'জন সহপাঠী জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আই-সি-এস ও প্রমথনাথ কর এটর্নী, দীর্ঘজীবন লাভ করে সাফল্য অর্জন করেন। নিত্যকৃষ্ণের জীবন অতীব দুঃখের।

নিত্যকৃষ্ণ ইংরাজী-বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর 'সাহিত্যসেবকের ডায়েরী' পাঠ করলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ডায়েরীর পৃষ্ঠায় দেশী-বিদেশী শাশ্বত সাহিত্য আস্বাদনে গভীর আনন্দের পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি উনিশ-শতকের বাংলা সাহিত্যে একাধারে কবি, সমালোচক, গল্পকার ও নিবন্ধলেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অকাল-মৃত্যু তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে খণ্ডিত করে। তিনি স্বর্গত সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রের নিয়মিত লেখক

ছিলেন। এছাড়া জন্মভূমি, নব্যভারত, প্রদীপ, সাধনা প্রভৃতি সাময়িক পত্রে গদ্য-পদ্য লিখতেন। নিত্যকৃষ্ণের সাহিত্যিক বন্ধুগণের মধ্যে সুরেশ সমাজপতি, অক্ষয়কুমার বড়াল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জলধর সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সমাজপতি মহাশয় তাঁর গৃহে 'সাহিত্যের বৈঠকের' ব্যবস্থা করেছিলেন। নিত্যকৃষ্ণ সে বৈঠকের প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অত্যল্পকাল মধ্যে ঐ আসর লুপ্ত হয়। সাহিত্য পরিষদ মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ১৩০১ সালের ১৯শে কার্তিক তারিখে তিনি পরিষদের নিমন্ত্রণ লাভ করেন। পরে পরিষদের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থসংখ্যা বেশি নয়। তিনখানি মাত্র। মায়াবিনী (কাব্য—১২৯২), প্রেমের পরীক্ষা (গদ্যনাটক—১২৯৭), ভবানী (গল্প—১৩১৬)। এ কখানিই প্রকাশিত গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থখানি তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। এই গল্প প্রথম বর্ষের সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যতম রচনা, 'সাহিত্যসেবকের ডায়েরী'। এটি ১৮ই পৌষ, ১৩০০ সাল থেকে ১৩০১ সালের ৬ই পৌষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের ডায়েরীমূলক রচনা। কবির মৃত্যুর পর কবিবন্ধু সুরেশ সমাজপতি মহাশয় তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩১০ (বৈশাখ-চৈত্র), ১৩১১ (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়-শ্রাবণ) ১৩১৩ (বৈশাখ-কার্তিক), ১৩১৪ চৈত্র, ও ১৩১৫ সালের (বৈশাখ-আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র), এই সংখ্যাগুলিতে ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। কিন্তু এই রচনা আজও গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় নি। বর্তমান লেখকের মতে এই রচনা নিত্যকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই রচনা বাংলার সমালোচনা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এখানে তিনি সাহিত্যের রাসরসিক সমালোচক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। 'সাহিত্যসেবকের ডায়েরী', দেশী-বিদেশী শাশ্বত সাহিত্যে তাঁর সুগভীর অধিকার তথা নিখুঁত রসবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। আবার এই রচনার পৃষ্ঠায় তাঁর ব্যক্তিমানসিন—পত্নী-বিরহকাতর পুত্রস্নেহাতুর—ব্যর্থ-জীবনের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁর অনেক কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ, গদ্য-পদ্য রচনা বিক্ষিপ্ত আছে। এই রচনাগুলি আজও একত্রিত ও সংকলিত হয় নি। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় প্রদানকালে তাঁর অগ্রন্থিত বহুবিধ রচনার কথা স্বাভাবিক ভাবেই স্মরণে আসবে।

নিত্যকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতকের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত কবি। কবি বিহারীলাল আত্মগতপ্রবণ গীতি-কবিতার যে স্বরণ্য ধ্বনি তুলেছিলেন—সেকালের অনেক কবির মত নিত্যকৃষ্ণও এই পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তদুপরি ইংরাজী কাব্য সাহিত্য, বিশেষ করে ইংরেজী রোমান্টিক কবিতা তাঁর নখদর্পণে ছিল। শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস্, কোলরিজ প্রভৃতির কবিতাবলির সঙ্গে তাঁর আত্মিক পরিচয় ছিল। অতিবাল্যেই গান গাইবার অভিলাষে তিনি ছোট ছোট গীত রচনা করতেন। সুন্দর কবিতার সাক্ষাৎ পেলে সেগুলি আবৃত্তি করতেন। কবিতা ও গান তাঁর প্রিয় হয়ে পড়ে। যখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র, সে-সময় ওয়ার্ডসওয়ার্থের Excursion কবিতার প্রথম সর্গ পাঠ করে, তাঁর প্রাণ নূতন ভাব-গৌরবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মাইকেল ও হেমচন্দ্রের কবিতার সঙ্গে অচিরে পরিচিত হয়ে পড়েন। রাজকৃষ্ণের 'অবসর সরোজিনী' কিছুদিন তাঁর মনপ্রাণ হরণ করেছিল। নিত্যকৃষ্ণ বিহারীলালের পূর্বেই ঈশ্বর গুপ্তের পরমার্থ-বিষয়ক কবিতা ও মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা, আত্ম-বিলাপ, ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা দু'টিতে বাংলা গীতি-কবিতার মন্ত্র শ্রবণ করেছিলেন। সমকালীন প্রধান কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তিনি সাগ্রহে পাঠ করতেন। নিত্যকৃষ্ণের ডায়েরীতে দেখি, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির সমালোচনা করছেন। তাঁর ডায়েরী রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কথাই প্রমাণ করে। কিন্তু নিজ কবিতা রচনায় তিনি রবীন্দ্রপ্রভাবিত ছিলেন না। এ বিষয়ে নিজস্ব কবিদৃষ্টিই ছিল তাঁর অবলম্বন। তিনি রবীন্দ্র-কবিতার বহুবিধ ক্রটিও সমালোচনাচ্ছলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন—"কোন কোন সমালোচক 'মায়াবিনী'কে রবীন্দ্রের ছাঁচে ঢালা বলিয়াছেন। ছাঁচটী বাস্তবিকই রবীন্দ্রের কি না, সেকথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। বস্তুত কবি বিহারীলালই বর্তমান রোমান্টিক যুগের প্রবর্তয়িতা। আমি তাঁহার 'সারদামঙ্গল' পাঠ করিয়া এবং কয়েকজন কবির কবিতা আলোচনা করিয়াই Romantic পদ্ধতিতে দীক্ষিত হই, রবীন্দ্রনাথ, অধরলাল, অক্ষয়কুমার, রাজকৃষ্ণ রায় ইঁহারা অনেকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিহারীলালের কাব্যশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় কেবল পুস্তকগত। 'সারদামঙ্গল' পাঠের পূর্বে রবীন্দ্রের কোন কবিতাই পাঠ করি নাই। রবীন্দ্রের পূর্বে, অধরলালের, 'নলিনী' পাঠ করিয়াছিলাম। তবে একথা বলিতেছি না যে, 'মায়াবিনী' রচনার আগে রবীন্দ্রের

একটি কবিতাও পড়ি নাই। যখন ফার্ষ্ট আর্ট পড়ি, আমার সহাধ্যায়ী যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় পুরাতন, 'ভারতীর', কয়েক সংখ্যা আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। তাহাতে রবীন্দ্রের নাম ছিল না বটে। কিন্তু তাঁহার কবিতা ছিল। সেই দু'একটি কবিতাই পড়িয়াছিলাম।" (সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩১৫)। কবি নিজেই তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাবের কথা অস্বীকার করেছেন। ডায়েরীর অন্যস্থলে তিনি স্পষ্টই বলেছেন—বিহারীলাল ও ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণ তাঁর সাহিত্য-জীবনের আদিগুরু।

নিত্যকৃষ্ণের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ মাত্র একখানি। মায়াবিনী ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। বন্ধু সমাজপতি তাঁর কবিতার একখানি সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশের বাসনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে নিত্যকৃষ্ণ ডায়েরীতে লিখেছেন—'সু-চন্দ্র আমার কবিতাবলী হইতে একখানি সংগ্রহ পুস্তক বাহির করিবার প্রস্তাব করিতে-ছিলেন। সম্প্রতি ইহাতে আর কোন আগ্রহ নাই। কারণ বাংলা দেশে এখনও কবিতার আদর করিতে শিখে নাই।" (সাহিত্য—শ্রাবণ, ১৩১৫)। বাস্তবিকই পত্র-পত্রিকার ধূসর পৃষ্ঠায় তাঁর বহুবিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি আজও সংকলিত হতে পারে নি। নিত্যকৃষ্ণ আপন জীবনেই তাঁর সাহিত্যিক অসফলতার দিকটি অনুভব করেছিলেন। মায়াবিনী প্রকাশের একাদশ বর্ষ পরেও কবি হতাশা নিরাশা, নিষ্ফলতা ও সাহিত্য-জীবনে ব্যর্থতার জন্য হাহাকার করেছেন। তথাপি নিত্যকৃষ্ণ যথার্থ কবি। তাঁর সাহিত্যবোধ ও রুচি ছিল উন্নত ও পরিমার্জিত। প্রকৃত কবিত্ব ও সৌন্দর্যের আধার কোন গ্রন্থ বা ক্ষুদ্র রচনা পেলেও তিনি বিলক্ষণ উল্লাসের সঙ্গে তা উপভোগ করতেন। উনিশ শতকে বাংলা কবিতায় যে নবতম লক্ষণ সূচিত হয় কবি সে পদ্ধতিকে বরণ করে-ছিলেন। হৃদয়ের গূঢ়তম ভাবরাশি, রহস্যময়ী প্রকৃতির গভীরতম কাহিনী প্রকাশ করতে গেলে এই নব্য পন্থা তাঁর কাছে অধিকতর উপযোগী ঠেকেছিল। কিন্তু সাধারণ পাঠকের প্রতি লক্ষ্য রেখে কবি পুরাতন ও নবীন প্রথায় সম্মিলন ঘটাতে চেষ্টা করেন। সহজ ও সরলতাকে তিনি পছন্দ করতেন। তাঁর মতে—"ভাব বা চিন্তা যতই রহস্যময়ী হউক না কেন, তাহার প্রকাশ করিবার কালে তাহাকে যতদূর স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করিতে পারি, তাহাই বাঞ্ছনীয়।" (সাহিত্য—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১)

গত শতকে নূতন জ্ঞান ও নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে নব্য কবিবৃন্দ অপরিমেয় খাদ্যের সন্ধান পেয়ে পুলকিত হয়ে ওঠে। কবি-চিত্তের রসকল্পনায় নূতন জ্ঞান-সম্পদের উত্তেজনা ও উৎসাহ জাগ্রত হতে দেখা যায়, নবলব্ধ জ্ঞানের উগ্র অধীরতা কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়। নিত্য-কৃষ্ণের যে কবিতা আমরা লাভ করেছি—তা ঐ নবলব্ধ জ্ঞানের বক্তৃতামাত্র নয়, কিংবা বিহারীলালে আত্মভাব-নিমগ্নতার কাছেও তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন নি। বিহারীলালে আত্মভাব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। নিত্যকৃষ্ণে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সতত বাসনা লক্ষিত হয়।

একদিকে বংশাগত বাঙালী সংস্কার এবং তদবিরোধী যুগপ্রভাব— এই উভয়ের অসামঞ্জস্য কবিচিত্তে এক আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়। বাহিরের জীবনে নিত্য-কৃষ্ণ সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত ও গৃহী। ঘর-সংসারের মমতা, আত্মীয় ও বন্ধুপ্রীতি, রক্ষণশীল মনোবৃত্তি এ সবই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। নিত্যকৃষ্ণ খাঁটি বাঙালী— তথাপি তাঁর কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে একটি দুস্তর ব্যবধান ছিল। নিত্যকৃষ্ণের কবিজীবনে যত ও কল্পনা, হৃদয় ও মনোবৃত্তি, প্রেম ও সংশয় নিরবচ্ছিন্ন হয়ে আছে। জীবনে কাব্যাভিনয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বিহারীলালের মত ভাবভোলা বা রবীন্দ্রনাথের মত অনাসক্ত আর্টিষ্ট নহেন। সমাজ সংসারের পূর্ণ দাবি মিটিয়ে তিনি নিজের জন্য একটি নিঃসঙ্গ ভাবরাজ্য সৃজন করেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই বিষ রসই তাঁর কাব্য-প্রেরণার উৎস। মধ্যবিত্ত বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ-প্রেম-বিরহ-শোক-বাৎসল্য এগুলিই তাঁর কবিতার উপজীব্য।

গৃহলক্ষ্মী বঙ্গনারীর কল্যাণমূর্তি তাঁর কবিতার অন্ত-তম বাণী। উনিশ শতকের শেষভাগে অধিকাংশ বাঙালী কবি নারী-মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হন। জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রহরে বাঙালী বিশেষ করে তার গৃহলক্ষ্মীর প্রতি সচেতন হয়। রঙ্গলালের তিনখানি কাব্যে—মধুসূদনের বীরাঙ্গনা ও মেঘনাদবধে এই নারীবন্দনা। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী', সুরেন্দ্রনাথের মহিলা, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারে নারীস্তোত্রের আধিক্য। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাকাব্যগুলি, এমন কি শরৎচন্দ্রের গল্প কাহিনীগুলিতে নারী চরিত্রের রহস্য ও অপার বিস্ময়-বোধ পাঠককে চকিত করে। নিত্যকৃষ্ণের খণ্ড কবিতা-গুলি বহুলাংশে নারী বন্দনায় মুখর। এদিক থেকে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের সহধর্মী, তবে সুরেন্দ্রনাথের তত্ত্বনির্ভরতার বাহুল্য নিত্যকৃষ্ণের কবিতায় অনুপস্থিত। অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর সামঞ্জস্য অধিক। নিত্যকৃষ্ণে আবেগ সংহত, ভাব গাঢ়বদ্ধ,ভাষা শিথিলতা-বর্জিত ক্লাসিকপন্থী।

দুঃখবাদ নিত্যকৃষ্ণের কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর খণ্ড কবিতাগুলিতে একটানা দুঃখস্রোত প্রবাহিত হয়েছে। দারিদ্র্য রোগ শোক মৃত্যু প্রভৃতির স্পর্শে এসে খাঁটি দুঃখবাদীর মত সর্বদাই দুঃখকষ্টকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন আদর্শ জীবন যাপন করতে কিন্তু নৈরাশ্যের কৃষ্ণছায়া তাঁর স্বল্পায়ু জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। জীবনযুদ্ধে তাঁর হৃদয় রক্তাক্ত হয়েছিল। শুধু আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বই নয়—নিজ জীবনের suffering এই দুঃখবাদকে প্রশ্রয়দান করেছিল। কিন্তু এই দুঃখবাদ প্রতীচ্যের nihilism বা বিনাশবাদ নয়। এ দুঃখ হিন্দুর দুঃখ। হিন্দুর দুঃখবাদে আশা-ভরসা ও সান্ত্বনা আছে। নিত্যকৃষ্ণের দুঃখ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দান করে না। এ দুঃখ জীবনকে বীতশ্রদ্ধ করে না। নিত্যকৃষ্ণের দুঃখ সর্বশেষে জীবনের মালিমার মাঝে একটা বিমল জ্যোৎস্না জাগাইয়া রাখে। কবি বলেছেন :

প্রয়াণের পথশেষে পশিনু যখন,
দেখিনু সম্মুখে সিন্ধু গরজে ভীষণ,
পথের সম্বল নাই, না জানি সাঁতার,
ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা মৃত্যু অন্ধকার।
আকাশ পাতাল ভেবে আইল ভাবনা,
বৃশ্চিক দংশন সম শতেক বেদনা।
সাত পাঁচ ভেবে শেষে পড়িনু কাঁদিয়া,
কহিনু সান্ত্বনাভরে মনেরে স্মরিয়া,
আর বৃথা পরিতাপে কি হইবে ভাই,
অকূল পাথারে এবে বা করে গোঁসাই।
—(নির্ভর)

নিত্যকৃষ্ণের কবিতার প্রধান বিষয় দুঃখবাদ। সেই দুঃখের বাণী তাঁর বহু কবিতার উপজীব্য।

স্বাধীনতা অভিমানী শ্রেষ্ঠ নর আমি—
আমি শুধু রবো কিগো কাঁদিতে কাঁদিতে ?
এ চির বসন্তে আমি—হায় দুরদশা।
আমি কি পুষিব প্রাণে অনন্ত বরষা ? (বিলাপ)

সমস্ত জগৎ যখন বসন্ত-লাবণ্যে বিমোহিত—তখন কবির হৃদয়ে অপার বেদনা—

শত বুকে শত মুখ করিয়া বিকাশ
ধরণী রাণীর বুকে ধরে নাক হাস।
আমিই বঞ্চিত শুধু সুখ নাহি পাই,
বুকভরা ব্যথা নিয়ে পুড়ে আমি যাই।
ধরায় বসন্ত ফিরে আসে বার বার
প্রাণের বসন্ত ফিরে আসিবে না আর।
(বিলাপ)

কবির চিত্ত আশা ও সংশয়ের আবর্তে বারে বারে দ্বন্দ্বমুখর—সেখানেও ব্যর্থতার হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

তবে কি কিছুই আর নাহিক উপায়
বৃথা মোর বৃথা এ জীবন ?
একটু যে আলো নিয়ে উঠিনু ফুটিয়া
তাও মোর যাবে অকারণ। (নীরব সাধনা)

দুঃখের কবি নিত্যকৃষ্ণের বিষাদমাখা মুখখানি পাঠকের চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠে, যখন পড়ি

গেল উষা, গেল পাখী, গেল গীতগান
কেন নাহি গেল এ জীবন। (জীর্ণতরু)

কবির প্রত্যাগত, ফুল, বৃথা আকিঞ্চন প্রভৃতি কবিতায় তাঁর দুঃখ-উদ্বেল হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি পাঠক হৃদয়কে বেদনারসে পরিপ্লুত করে। নিত্যকৃষ্ণ করুণ-রস সৃষ্টিতে পারদর্শিতা দেখায়। তাঁর চৈতন্যের দেহত্যাগ, কাবুলির জয়, ফুলবধূ, বিরহী প্রভৃতি কবিতা-পুষ্পগুলি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। কবি নানা রসের, নানা বিষয়ের কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অনেকগুলি কাহিনী কবিতা আছে। সেখানেও তাঁর উন্নত রসদৃষ্টির পরিচয় আছে। যথা, উষা, গোতামরী তাঁর উৎকৃষ্ট কাহিনী-কবিতার নিদর্শন। তাঁর বহু কবিতায় বাঙালী ঘরের সুন্দর ও মোহময় চিত্র অবলোকন করা যায়। 'বঙ্গের গৃহস্থালী' কবিতাটিতে বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের মধুর চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। পল্লীপ্রেম, বাৎসল্য, বিরহ এ সমস্ত ভাববস্তু অবলম্বন করে তিনি উনিশ শতকীয় বাংলা গীতিকাব্যে অনেক কবিতা কুসুম উপহার দিয়েছেন। এখানে উদ্ধৃতি প্রাচুর্যের দ্বারা এই আলোচনাকে অনর্থক দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না। নিত্যকৃষ্ণ অতি সার্থকতাবেই বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছেন। বর্ণস্ হ'তে অনূদিত একটি কবিতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করছি—

অয়ি অয়ি প্রাণপ্রিয়ে !
কেমনে কঠিন হিয়ে
কোথা কোন সুখস্বর্গে ভ্রমিছ এখন ?
কোথা পুন রচিয়াছ শান্তিনিকেতন ?
লুণ্ঠিত মৃত্তিকাপরে
বেদনা ব্যথিত স্বরে
হেথায় প্রেমিক তব করে হাহাকার,
সে রোদন শ্রবণে কি পশে না তোমার ?
(স্বর্গবাসিনীর প্রতি)

তাঁর জীবনতার, সংবাদ, সাধ, এইরূপ আরও কয়েকটি অনুবাদ কবিতা। বাংলায় সনেট রচনায় মধুসূদনের পর অনেকেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। সনেট রচনায় নিত্যকৃষ্ণের অবদানের কথা আজ উপেক্ষিত। অথচ নিত্যকৃষ্ণের সনেটগুলি বাংলা সাহিত্য জগতে হীরকখণ্ডের মত উজ্জ্বল, সেগুলির দীপ্তিচ্ছটা প্রতি কবিতার সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে। কঠোর নিয়মের মধ্যে তাঁর সনেটগুলির বন্ধনশক্তি ও সুন্দর ভাব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এখানে একটি সনেট উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

> কে আছে অবনী হেন অবনীমাঝারে ?
> হেরি নিত্য বিদলিত পদ পদতলে
> স্বর্ণভূষণাদি মাগো ! তব অঙ্গদলে
> শতকোটি শিশু কার করে হাহাকার ?
> কিন্তু যদি জন্মদাত্রী জননী আমার
> আজিও এ বক্ষ মোর উল্লাসে উথলে
> যদি, কীর্তিরাশি তোর ; প্রেমপুণ্যবলে
> আজিও অন্যের তুই গর্ব বসুধার।
>
> যে মহিমা শৈলশিরে, রাজ রাজেশ্বরী,
> আছিল বসিয়া, দেবভোগ, সে বিভব
> আর লভিয়াছে কেবা এ মোর ভুবনে !
> কি ছার সম্পদ-সুখ ? চঞ্চল লহরী
> কালসিন্ধুনীরে যথা নশ্বর সে সব !
> অনশ্বর স্বর্গ মাগো তোর ও চরণে।
>
> (বঙ্গলক্ষ্মী)

নিত্যকৃষ্ণের কবিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণের কথা এখানে উপস্থিত করা গেল মাত্র। কেবলমাত্র তাঁর 'মায়াবিনী' কাব্যই নয়, বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর বহু কবিতার মধ্যে নিত্যকৃষ্ণের স্বকীয় কবিতাচর্চার রসমধুর বহুবিধ উপাদান বিধৃত হয়ে রয়েছে। ঊনবিংশ শতকে বাংলা গীতি-কবিতার সাধনায় নিত্যকৃষ্ণের অবদান প্রাচুর্যে মণ্ডিত নয়। তৎসত্ত্বেও তাঁর এই অতি সংক্ষিপ্ত সাধনায় মৌলিকত্বের নিদর্শন আছে। নিত্যকৃষ্ণের কবিতায় কোন অনুকরণ নেই—এটি তাঁর প্রধান গুণ। তিনি পুরাতন সুরে আপনার দুঃখের গান গাহেন নি। জীর্ণ ব্যবহৃত কুসুম আহরণ করে তিনি কাব্য-সুন্দরীর পূজা করেন নি। তাঁর গীত-রাগিণী অপূর্ব ও অভিনব। তাঁর কবিতা পুষ্পগুলি সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুমহারে গ্রথিত। সৌন্দর্য-সাধনায় তিনি ইংরেজ কবিদের প্রতিস্পর্ধী। তাঁর কবিতার ভাষা সংযত, গদ্যধর্মী, ভাবসংহত ও বস্তুনিষ্ঠ। নিত্যকৃষ্ণের কবিতার মূল লক্ষণ এগুলিই।

ঊনবিংশ শতকে বাংলা গদ্যশিল্পে নিত্যকৃষ্ণের নৈপুণ্য স্মরণযোগ্য। সাধু, ভাবগম্ভীর ও কবিত্বময় গদ্য রচনায় নিত্যকৃষ্ণ অপূর্ব প্রাণশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর ছোট গল্পের গ্রন্থ ভবানী, মনোচ্ছ্বাস-ময় গদ্যকাব্য, 'প্রেমের পরীক্ষা' ও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত 'সাহিত্যসেবকের ডায়েরী, ঊনিশ শতকীয় বাংলা গদ্য রচনার সার্থক নিদর্শন। গল্পগুলির ভাবসাম্য, বিষয়-বৈচিত্র্য এবং style পৃথক আলোচনাযোগ্য। তাঁর অন্যান্য গদ্য রচনাগুলি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় আবদ্ধ আছে। 'প্রেমের পরীক্ষা'র, বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন —"প্রেমের পরীক্ষায় যাহা শেষ, মায়াবিনী কাব্যে তাহারই আরম্ভ। সুতরাং কাব্যমোদীদিগকে উভয় গ্রন্থ একবার মিলাইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধিধারী একজন যুবক সুহৃদ গ্রন্থকারের নিকট নিজ জীবনের যে রহস্য বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই মনোচ্ছ্বাস রচিত হইল।" প্রেমের পরীক্ষা, জীবন রহস্যমূলক গদ্যকাব্য। প্রকৃতির অনন্ত রহস্যলোকের কথা কবিত্বময় বাকভঙ্গিতে বাণীরূপ দিয়েছেন। "এই নিশীথ আকাশতলে, জনশূন্য অরণ্যানী মধ্যে, তারকার স্তিমালোকে একাকী বসিয়া রহিয়াছি। সম্মুখে বৃক্ষপত্রের বিনিঃসৃত ক্ষীণ জ্যোৎস্নাকিরণ রেখাশ্রেণী বায়ুবেগে কেমন সুন্দর নৃত্য করিতেছে! অদূরে সমুদ্রাভিলাষিণী স্রোতস্বিনী হইতে অব্যক্ত মধুর কি আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে! দূরে তরুশীর্ষ সংস্পর্শে গগনাঙ্গনে, নৈশ পাপিয়ার প্রাণোন্মাদকারী সঙ্গীত নিনাদের উদ্ভ্রান্ত হৃদয় বিকম্পিত করিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে মেঘলোকে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতেছে! অনন্ত-লীলাময়ী তুমি প্রকৃতি!"—প্রেমের পরীক্ষা। পৃ. ২৭.

—নিত্যকৃষ্ণের গদ্যরচনায় তাঁর কবিত্ব সঞ্চারিত। দুঃখের কবি নিত্যকৃষ্ণের ব্যর্থ জীবনের হাহাকার বিরহ-বেদনা—এক ভাবগম্ভীর দার্শনিকতায় তাঁর গদ্য রচনার কলেবর পরিপুষ্ট করে রেখেছে। জীবন, প্রকৃতি এবং গূঢ় নিয়তি-লাঞ্ছিত মানবজীবনের অপার রহস্য তাঁর গদ্যরচনাকে মাঝে মাঝে রস-উদ্বেল করে তুলেছে। এই প্রকার ভাবনামূলক গদ্যরচনার কতিপয় অংশ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করছি। এই গদ্যরচনার মধ্যে নিত্যকৃষ্ণের কবিপ্রাণের আকূতিই প্রবল।

"আজ পূর্ণিমা কিন্তু জ্যোৎস্নার দর্শন নাই। বর্ষার অন্ধকারে চাঁদের শোভা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমার জীবনের অবস্থাও কি ঠিক এইরূপ নহে? এই মেঘদুর্গত যৌবন কুঞ্জে বসিয়া আমি কেবল একটা বিষাদ স্মৃতির অর্চনা করিতেছি। আশার দিগন্তবিহারীমন্দ সমীর, প্রেমের স্নিগ্ধ অনন্তহীন কিরণজাল, উৎসাহের উন্মাদকর পুষ্পসৌরভ, সকলই যেন কোথায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর অপর পার্শ্ব হইতে গোধূলির অস্ফুট আরতিধ্বনি কোন দেবমন্দির ভেদ করিয়া কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। আমারও প্রাণের ভিতর, হৃদয়ের অতি নির্জন প্রদেশে, এইরূপ একটা অস্ফুট মঙ্গলধ্বনি মাঝে মাঝে শ্রুতিগোচর হয়। অন্তর-রাজ্য আকুল হইয়া উঠে। হায়! কে আমাকে বলিয়া দিবে এ কিসের সঙ্গীত, কোথা হইতে আসিয়া এই দীন সংসার পথিকের প্রাণে প্রবেশ করিতেছে। এ কি সেই বিশ্ব-দেবতার চিরোচ্চারিত আহ্বান রব? এ কি সেই নিখিল জগতের নিরন্তরোত্থিত মহত্ত সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি? এ সঙ্গীত, এই গভীর কলতান কি একবার ভাল করিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না? আমরা হতভাগ্য স্বকৃতিশূন্য মানব, এই মর্ত্যধামে কেবল ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি। এই নিত্য-দুঃখময় জীবনের মুহূর্তমাত্র সেই মঙ্গলগীতি শ্রবণ করিয়া জীবন কি সার্থক করিতে পারি না?"

(সাহিত্যপাঠকের ডায়েরী। সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ-১৩১১।)

মায়াবিনী'র কবি গদ্যরচনাতেও দুঃখের কবি। অনিত্য মানবজীবনের ভাবনায় কবি আত্মমগ্ন হয়ে লেখেন—

"আজ এই সন্ধ্যাকাশতলে বসিয়া মানবজীবনের অনিত্যতার কথা ভাবিতেছি। এ বিষয়ে জড়জগৎ আমাদের অপেক্ষা কত সৌভাগ্যশালী। মাথার উপর এই যে নভোমণ্ডল কত কাল ধরিয়া কত জীব সমাজের উত্থান-পতন দেখিয়াছে—কত সুখের মনোল্লাস, কত দুঃখের আর্তনাদ, সখিসিঞ্জে হাস্যকৌতুক, বিরহিজের দীর্ঘশ্বাস, উহাদের চক্ষের উপর দিয়া হাওয়ার ন্যায় চলিয়া গিয়াছে। অথচ উহারা আপনাদের মধ্যে কোন পরিবর্তনই অনুভব করে নাই—অসীম আকাশবক্ষে সাতটি সহোদরের মত অনন্তকাল বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে কলনাদিনী ঐ ভাগীরথী, কত শত সহস্র অভাগা-অভাগিনীর জীবনগ্রন্থি, জীবনসর্বস্ব ঐ শূন্য জাহ্নবীর তটে চিতাগ্নির মত ছিন্ন ও অপহৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উহার ত বিরাম নাই। সেই কলনাদ, সেই ভাটাজোয়ার, সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাস।"

(সাহিত্যসেবকের ডায়েরী। সাহিত্য, চৈত্র-১৩১০।)

নিত্যকৃষ্ণের মৃত্যুরহস্যের ধ্যানমূলক রচনার কিয়দংশ এখানে উপস্থিত করা গেল—তাঁর ডায়েরীতে এরূপ কবিত্বপূর্ণ রচনার নিদর্শনের সাক্ষাৎ মেলে—

"আজ আমি মৃত্যুর সর্বজনত্রাসহ ভীষণ মূর্তির কথা ভাবিতেছি। এই স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাত কিরণরাশি, সন্ধ্যাকাশের এই প্রশান্ত রক্তিমাভা, পত্রপুষ্পগ্রহতারা-সমন্বিত বিশ্বের এই বিচিত্র লীলা—মৃত্যুর করাল গহ্বরে—সেই অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করিলে, এই সকলই ত অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার দয়া মায়া মমতা কিছুই নাই, সে সৌন্দর্যের মহত্ত্ব বুঝে না, সৌকুমার্যের সেবা করিতে জানে না, অসহায় নিরাশ্রয়, শিশুর স্বভাব সরল মুখমণ্ডল দেখিয়া, তার প্রাণ পবিত্র-অপবিত্র, সুন্দর-অসুন্দর, প্রীতি-অপ্রীতি সকলেরই সমান গতি। হে মৃত্যু! তাই আজ নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে তোমায় জানাইতেছি, সংসারে চিরসুকুমার অনন্তসৌন্দর্যাধার পদার্থগুলি লইয়া গিয়া তুমি কোথায় রাখিয়া দাও? আমার এই হৃদয়-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া তুমি কত রত্নই অপহরণ করিয়া লইয়াছ। আমার সেই আজন্ম স্নেহময়ী জননী, দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ সহোদর, নিত্য-আকাঙ্ক্ষিত সেই সব প্রিয়জন তাহাদিগকে তুমি কোথায় রাখিয়া দিয়াছ! আমার প্রেমের জীবন-প্রতিমা সেই প্রণয়িনী, আমার প্রেম-প্রাণ-জগৎ—সকলের অধিক সেই অতি সুকোমল প্রশান্ত শিশুটিকে, তুমি কোন শিরিষ-পুষ্পপেলব তল্পশয্যায় শায়িত করিয়া রাখিয়াছ।"

—সাহিত্যসেবকের ডায়েরী। সাহিত্য। আশ্বিন-১৩১১

নিত্যকৃষ্ণ মহত্ত্ব গৌরবে অমরজীবনের কামনা করেছিলেন। কিন্তু শোক-দুঃখ-দারিদ্র্যে তিনি সে কাম্যজীবনে উন্নীত হ'তে পারেন নি। ব্যর্থ জীবনের হাহাকার তাঁর কবিতা ও গদ্য প্রায় সকল রচনাকে আচ্ছন্ন করেছে।

"এই দুর্লভ মানবজীবনটা কি অকারণেই কাটিয়া গেল? এমন নিষ্ফল জন্ম আর কেহ কখনও পাইয়াছে কি না, সন্দেহ। চিরদিন কেবল স্মৃতির উত্তপ্ত ভস্মরাশি বক্ষে বহন করিয়া বেড়াইতেছি। যে কাজে, যে উদ্দেশ্যে হাত দিতে যাই, কিছুতেই সফল হইতে পারিতেছি না। দেখিতেছি কত লোক এই সংসারে আসিয়া নিজ নিজ

নির্দিষ্ট কর্তব্য নীরবে সাধন করিয়া, নীরবে জগতের চরণে বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের কাহারও হৃদয়ে আমার মত এই বিশ্বগ্রাসী দুরাশার উদয় ও কখনও হয় না। আমি যাহা পাই—তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি না কেন? মাটির জীব আজীবন মৃত্তিকাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না কেন?"

—সাহিত্যসেবকের ডায়েরী। সাহিত্য, চৈত্র-১৩১৪।

নিত্যকৃষ্ণের গদ্যরচনা কিরূপ—উদ্ধৃত অংশগুলিই তার প্রমাণ। তাঁর গদ্যরচনাগুলি বিশুদ্ধ সাধু রীতিতে লিখিত। শাশ্বত জীবন ভাবনাই তাঁর রচনাগুলির প্রাণ। রচনা কোনস্থলেই শিথিলবদ্ধ নয়। উচ্চ ভাবুকতা ও কবিত্ব তাঁর রচনাগুলিকে অনন্যগৌরবে মণ্ডিত করেছে। বক্তব্যগুলি সহজ ও স্পষ্ট। মাঝে মাঝে সংস্কৃত সন্ধিযুক্ত শব্দ ব্যবহার নিত্যকৃষ্ণের ভাবনাকে গাঢ়বদ্ধ করেছে। 'সাহিত্যসেবকের ডায়েরী' আজও গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় নি। অন্ততঃ এই রচনার জন্য তিনি চিরকাল বঙ্গসাহিত্য-পূজিত থাকবেন। তাঁর 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী',—জীবনের দিনলিপি হলেও একাধারে কাব্য, সমালোচনা, দর্শন ও জীবনস্মৃতি। এই রচনাতেই তাঁর কবি ও রসিক মনের স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ। সাহিত্যের বহুবিধ মণিমুক্তায় এই ডায়েরীর ভাণ্ডার পূর্ণ। সাহিত্যসেবকের ডায়েরী, ঊনিশ শতকীয় বাংলা গদ্যসাহিত্যে নিত্যকৃষ্ণের অম্লান অবদান। তাঁর ডায়েরীর এই রচনাগুলি অচিরে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত। নিত্যকৃষ্ণের অকাল বিয়োগ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নিত্যকৃষ্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও মন্মথনাথ সেন ১৩০৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা সাহিত্যে দু'টি কবিতায় শোকাশ্রু বর্ষণ করেছিলেন। তাঁর অন্যতম সুহৃদ কবি অক্ষয়কুমার বড়াল একটি সনেট কবিতায় বন্ধুকৃত্য করেছিলেন। কবিতাটি বড়াল কবির 'শঙ্খ' (১৯১০) কাব্যের অন্তর্গত হয়েছিল। ১৩০৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাহিত্যে' কবিবন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় লিখেছিলেন—"প্রতিভাশালী কবি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প হইলেও বঙ্গসাহিত্যে বরণীয়। হায়! মধ্যগগনে উপনীত হইবার পূর্বেই সেই প্রতিভারবি অস্তমিত হইল।" এ আক্ষেপ নিতান্তই বন্ধুকৃত্য নয়—নিত্যকৃষ্ণের সাহিত্যিক প্রতিভাবিচারে সমাজপতির এই উক্তি আজও সত্য বলে প্রতীয়মান হবে।

•—[•]—•

শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমার বৈজ্ঞানিক নয়নের দৃষ্টি যে সুতীক্ষ্ণ—জানি।
এই জীবনের উন্মাদনা মাতায় তোমায়—এও জানি।
যন্ত্রবুদ্ধি তোমার জানি প্রসারিত হয় পেয়ে বর
যন্ত্রশিষ্ট তান্ত্রিকতার—জানি ওগো প্রতিভাধর!
সেই গর্বে গাও: "ঋষিরা পেতেন দেখা মহাকাশে
কয়টি হাজার গ্রহতারা—তবু তাঁদের শিষ্যেরা সে-
একটু দেখার জয় পেয়ে হায় জ্যোতিষী নাম দিত তাঁদের!
দিশারি ছিলেন না তাঁরা—তবু সবাই তাঁদের পায়ের
প্রসাদ পেয়ে ধন্য হ'ত। অতিভক্তি, বোকা, পাগল!
বৈজ্ঞানিকে গায় না অন্ধ-ভক্তি-ভজন বাজিয়ে মাদল।
জ্যোতিষ ত নয় জ্ঞানদর্শন—এতটুকু দেখে ব্যোমে
পায় জ্যোতিষী তথ্য না জানের—অজ্ঞানদের মতিভ্রমে।
ধ্যান? দূর! যা ফোটে ধ্যানে তার কোথা অবজেকটিভিটি?
ঘুম পাড়িয়ে মনকে ধ্যানী ধরেন যে-সেই তার টিকিটি।
যান্ত্রিকতার তান্ত্রিক যে বিজ্ঞানী সে-ই—স্রষ্টা মহান্।
উধাও গতির সেই সারথি, বিশ্বপতি তাই বিজ্ঞান।"

ব্যঙ্গনিপুণ তুমি, জানোও অনেক কিছু—জানি না কি?
কিন্তু এ-সব দেখেশুনে কি শান্তি পাও—বলবে তা কি?
কোথায় কত লক্ষ তারা ছিটিয়ে আগুন ছুটে চলে—
আঁক ক'ষে পাও দিশা? কিন্তু কোথায় কল্পতরু ফলে
যার বরে অশান্ত ক্ষুধা মেটে প্রাণের—তার সংবাদ
চায় প্রাণ আমার, তাই পুছি: ভাই, পারো কি তার দিতে প্রসাদ?
যে-ঋষিকে "মতিভ্রান্ত" নাম দিলে বিজ্ঞান-বিধানে
সে যে-দিক নির্দেশ সেই কল্পতরু—আর্ত জানে।

দুঃখীরা আনন্দ পেত, ঘুচ্‌ত ভয়ের কালো নিশা।
অন্ধকারের বাসিন্দারা পেত শান্তির আলোদিশা।
এমন ঋষি ধ্যানী আজো জেগে এ-গ্রাম দুনিয়াতে—
মন্ত্রে যাঁদের মরম ব্যথায় আকাশ থেকে কৃপা নামে।
আকাশে বন্‌ বন্‌ ঘোরা—ডিগ্‌বাজি খেয়ে ফিরে আসা,
গণক হয়ে গুণে বলা—কোথায় অমুক গ্রহ বাসা
বাঁধবে কবে কার টানে—চাঁদের ও-পিঠের ছবি-নেওয়া—
নীহারিকা ধূমকেতুর রেসকোর্সের খবর দেওয়া—
সাবাস জোয়ান! তবু শুধাই—জেনে এ-সব হাবিজাবি
কি লাভ হবে—যদি নিজের মনেরি তাই না পাই চাবি?
প্রাণের হাওয়ার অবোধ্য ঝোঁক জেগে কেন আমায় পাকে?
আজ টানে যার ঘর ছাড়ি—কাল পালাই কেন ছেড়ে তাকে?
যার উপকার করি—কেন হয় কৃতঘ্ন, ভেবে মরি!
আজ যে-ঢেউয়ে উঠি নেচে, কাল কেন সে ডোবায় তরী!
পরের ঘরের অন্ধি-সন্ধি জানা শক্ত নয়—মানি তা:
"কিন্তু করি বাস যে-ঘরে ভিত্‌ কেমন হায় তার—জানি না—"
বলতে বলতে হঠাৎ কেন যায় নিভে সুখের দেয়ালি?
পায়ের নিচের মাটিও কেন হয় সহসা চোরাবালি!
সবার উপর, যদি বুকে সাধছে যে রূপকায়াকে
মিলিয়ে দিয়ে এক নিমেষে হয় কেন হায় ম্লান ছায়া সে?

এ-সব অভিজ্ঞতাই তোমার হয়েছে শিক্ষা বার বার।
শুধাই তোমায় তাই—বিজ্ঞান কি সমাধান দেয় এ-ধাঁধার—
পড়লে পাকে হয় কি মনে—মুনি-ঋষির চেয়ে তোমার
(অণু ভেঙে তারা জেগে) বুদ্ধি হ'ল আরো উদার?
আবেগ হ'ল আরো গভীর? প্রাণ-পিয়াসার সুধা উছল?
তথ্যসারের আঙিনে কি উঠ্‌ল ফুটে চিত্তকমল?

বলবে তুমি: "শক্তির লক্ষ্য শক্তিই কেবল, আর কিছু নয়;
প্রয়োজনের হক কাটা? ছিছি! সেই তো আদর্শের পরাজয়।
জ্ঞানের জেলে কি জাল ফেলে—মাছ-কচ্ছপ কুটে খেতে?
ধেৎ! চায় সে তাদের শুধু রূপ-ওজনের খবর পেতে।
বিজ্ঞান চায় করতে জড়ো তথ্য শুধু ধরাতলে—
যে-তত্ত্বের ঠিক দিয়ে সে জ্ঞানতত্ত্বের কথা বলে।"
"তাই—" তুমি গাও—"চলছি কোথায়, উপনীত হই বা কোথায়—

জানতে আমি চাই না আরো—উড়ি কেবল গতির নেশায়।
"অসাধ্যসাধনী আমি : যে-ভয়ে জীব কেঁদেই সারা,
সেই শঙ্কা জয় ক'রে সেই সাম্রাজ্যে দিই পাহারা।
বীর আমি—দিই ডুব সাগরে মুখোস্ প'রে : বৈজ্ঞানিকী
বর্ম প'রেও অচিন্ ব্যোমে দুঃসাহসে ছুটি নি কি ?"

বন্ধু ! মানি—এ-নেশারও, এ-বীর্যেরও অর্থ আছে :
পায় নি সুধার স্বাদ যে-ভ্রমর উধাও হবেই মধুর পাছে।
বলি না তাই—দুঃখ মিছেই। বলি কেবল—আর এক ঘোরা
আছে অপেক্ষায় আমাদের—দিশা পেলে যার বিভোরা
হয় দুর্মতি, বিষ ভুলে যায় সে-পুণ্য প্রদক্ষিণে
যে-সাধনায় মরতরাও পায় বরাভয় দিনে দিনে।
তাই বলি ভাই, রাখতে মনে : বৈজ্ঞানিকী গবেষণায়
দেহসুখের পেলেও দিশা, পায় না প্রজ্ঞা সন্ধানী হায়—
যার পারানি পেলে তবেই মরণসিন্ধু পার হওয়া যায়,
কালো ব্যথাও যার আলোতে ঝলকে ওঠে প্রেমের প্রভায়।
নৈলে নিছক গতির নেশায় ধাও যদি বীর হুহুকারে
শেষের দিনে ধ্রুবতারা জ্বলবে না অকূল পাথারে,
মনে হবেই এ-জগৎকে পরিক্রমা করার চেয়ে
জগন্নাথকে পরিক্রমা শ্রেয় প্রেমের ভজন গেয়ে।
না চাইলে সে-পরিক্রমা বলবার নেই আমার কিছু—
এই ছাড়া যে, ঋষিরা চান উধাও হ'তে তাঁরই পিছু।
যাঁর আলোতে ভুবন আলো, যাঁর কান্তির কণা চুমি'
অসুন্দরও হয় সুন্দর, শ্যামল হয় মরুভূমি।
এ-অঘটন চক্ষে দেখেই গান তাঁরা তাই যুগে যুগে :
"বৃন্দাবনের প্রেমের বাঁশি বাজে আজো বুকে বুকে।"

বন্ধু, সে-সুর এতই সূক্ষ্ম— কান না দিলে যায় না শোনা,
শুনতে যে চায় দেখতে সে পায়—কে সে করে আনাগোনা
দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলাতে—নয় নয় তাই সে কল্পনা—
নীলকরুণা যার প'লে হয় প্রেমমধুরা কলস্বনা।
তাঁকে পেলেই সব পাওয়া যায়—সব লীলা হয় পূর্ণ তবে :
গতি স্থিতি অশ্রু হাসি—সফলতার মহোৎসবে।
বন্ধু, তাঁকে না পেয়ে যে জ্ঞানীর, বীরের ভঙ্গি করে
মুক্তামণির মুকুট প'রে—হারিয়ে সে পথ ঘুরে মরে,

তাই জানতে পারে না হায়—জন্ম ধরায় জানতে যাঁকে,
যাঁর প্রণয়ের হাতছানি দেয় তৃণ তরু ফুল প্রতি বাঁকে।
বাসলে ভালো তাঁকে তবেই চিত্তে রসের ঝর্ণা ঝরে,
নিখিলে যা কিছু আছে সব থেকে তাঁর মধু ক্ষরে।
শুধুই তথ্য করলে পুঁথি হয় না সে তো তত্ত্ব গ'লে,
অবান্তরে ঘুরপাকে প্রাণ কেঁদে মরে ধরাতলে।
মর্ত্যে তবু পায়ঃ সে আশী, কিন্ত যেমনি ঠাকুর পাঠান
তাঁর দেবদূত—চড়ার কূলে—সাজিয়ে বিদ্রোহের বিষাণ।
ফুল পরশে তার কাঁটা হয়, বাগানও হয় শ্মশান, বাদে
সাম্য নাদে কুরুক্ষেত্র বিজ্ঞানেরি আশীর্বাদে।

জানলে তাঁকে অঘটনের মিছিল চলে; ঘোর দুরাচার
হয় মহাভাগ, কাঁটায় ফোটে গোলাপ, নিশাও গায় গান উষার;
তুচ্ছতম কর্মও হয় অর্ঘ্য পূজার নিবেদনে;
বিরহও হয় মধুর মিলন-স্মৃতির কুঞ্জবনে।
জানলে তাঁকে ইন্দ্রজালের রুদ্ধ সর্বতোরণ খোলে,
অভাজনও হয় মহাজন, ছায় কালো জল হেমকমলে।
নামজপও হয় আরাধনা মন্ত্র-উহন উচ্চারণে,
বেদনাও হয় সাধনা ধ্যান করি' সে-চিরন্তনে।
পরশমণির কৃপায় খাদও হয় যে সোনা—জানে না কে?
মমতা শিউরে উঠে ভজন হয় ভক্তিরাগে।
বেসুরাও হয় সুরেলা, লুকোচুরিও প্রেমের খেলা।
মৃন্ময় চিন্ময় হয়ে রোজ সাজায় মহানন্দ-মেলা,
নয় এ কথার কথা, তাঁকে দেখেছি যে চর্মচোখে—
অরবিন্দ হয়ে যিনি ফুটেছিলেন পঙ্কলোকে।
বজ্রাগ্নিতে অমরণীর ফুল মরণের শঙ্কাশাখে:
দেবদূতের মধ্যে দিয়েই ছোঁয় যে অধম দেবতাকে।
জীবন ধন্য হয়—যদি হয় আত্মদানে তাঁকে জানা:
নাস্তিক জ্ঞান ভ্রান্তিবিলাস—মরীচিকা যার নিশানা।

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৭২ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৫

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার'—বিষময় ফল ?

বিবিধ মহল হইতে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও কলিকাতা এবং অন্যান্য নানা অঞ্চলের অত্যাবশ্যকীয় কলকারখানা এবং প্রতিষ্ঠানে—যাহাকে বলে 'ভাইটাল ইন্‌ষ্টলেশন'—এমন কি অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ কারখানা, পুলিশ বাহিনী, জাহাজ-ষ্টীমার চলাচল, পোর্ট কমিশনার প্রভৃতি সংস্থার কাজে বহু বহু পাকিস্তানীকে নিযুক্ত রাখিতে কোন দ্বিধা বা আশঙ্কাবোধ আমাদের নেহরু-মোহাচ্ছন্ন শাসকবর্গ এ যাবৎ করেন নাই। কিন্তু আজ ভারত-পাক যুদ্ধ বাধিবার ফলে বোধ হয় কর্ত্তাদের মোহনিদ্রা কিঞ্চিৎ বিঘ্নিত হইয়াছে! বিবিধ ভারতীয় সংস্থায় পাকিস্তানী নিয়োগের কারণ-স্বরূপ কর্ত্তারা বলিতেন—পাকিস্তানী কর্ম্মী এবং মিস্ত্রীরা কাজ ভাল জানে এবং করেও (নিজ দেশের প্রজাদের উপর কি অপূর্ব দয়া এবং বিশ্বাস!)। কিন্তু এই কাজ জানা পাকিস্তানীরা যে ভারতের বিপদ কালে এবং পাকিস্তানের প্রয়োজনে আমাদের 'কাজে'ও নামিতে জানে সে-বোধ কর্ত্তাদের এতদিন হয় নাই!

বিলম্ব হইলেও মন্দের ভাল যে কর্ত্তাদের আজ চেতনা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গত দু-তিন মাস হইতে পাকিস্তানী 'ভূতোর' অর্থাৎ ভারতে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত ভূতদের সম্পর্কে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন—অর্থাৎ পাকিস্তানী ভূত তাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় কাজে এবং ভাইটাল ইন্‌ষ্টলেশনে প্রায় পাঁচ হাজার পাকিস্তানী নিযুক্ত ছিল—এবং ইহাদের 'প্রায়' সকলকেই বরখাস্ত করিয়া অন্তরীণ করা হইয়াছে। কলিকাতার জল অঞ্চলে জাহাজের কাজে নিযুক্ত যাহারা, তাঁহাদের শতকরা ৮৫ জনই পাকিস্তানী—ইহাদেরও না কি সরানো হইয়াছে—এবং এখনো হইতেছে। বহুদিন পূর্ব্বে পাকিস্তানী জাহাজীদের বিদায় দিবার জন্য কলিকাতায় প্রবল আন্দোলন হয়—কিন্তু তৎকালীন ভারত-প্রধান নেহরুজী ইহা করিতে দেন নাই এই আশঙ্কায় যে, ইহাতে তাঁহার 'ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা'র অঙ্গে আঘাত লাগিবে। 'ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা' এবং 'জাতি-নিরপেক্ষতা' যে এক বস্তু নহে—এই সুস্রজন-বোধগম্য সামান্য ব্যাপারটা হয়ত মহান নেহরুর বিরাট-বিশাল বিশ্ববিস্তৃত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই!

কিন্তু এখনও একটা মহা সমস্যা বিদ্যমান। পশ্চিমবঙ্গে আজও প্রায় ৫০ হাজার পাকিস্তানী রহিয়াছে—তাহাদের চলাফেরা এবং ক্রিয়াকর্ম্মের উপর, প্রখর না হইলেও, সাধারণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার কোন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ আজ পর্য্যন্ত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। একথাও অনেকে জানেন যে, কলিকাতার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত বস্তিগুলিতে এক শ্রেণীর সংখ্যালঘু ভারতীয় নাগরিক বেশ কিছু সংখ্যক পাকিস্তানীকে মিথ্যা পরিচয় দিয়া আশ্রয় দান করিতেছে। পুলিশ মহলের এ সংবাদ অজানা থাকিবার কথা নহে। কিন্তু কোন্ গোপন কারণে এ-বিষয় সরকারী কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই বা হইতেছে না—তাহা বেসরকারী লোকের পক্ষে বলা সহজ নহে। দেশের এই আপৎকালেও যদি সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তবে তাহাকে নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি বলা যায়?

পশ্চিমবঙ্গস্থিত ব্রিটিশ কার্ম্মের পাক্-প্রীতি—

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্তত যত ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থা আছে এবং ইহাদের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বহু পাকিস্তানীকে, সব কিছু জানিয়া-শুনিয়াও, কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। এই সকল পাকিস্তানী কর্ম্মচারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম ছাড়াও বিবিধ প্রকার ভারত-বিরোধী অপকর্ম্মে লিপ্ত আছে (সকলে না হইলেও অনেকেই)—এমন সন্দেহ অমূলক নহে। এই সকল পাকিস্তানী কর্ম্মচারীদের প্রতি ইংরেজ প্রভুদের প্রেম এবং দয়া একটু অত্যধিক—ইহাই দেখা যায়। দেশের স্বাভাবিক শান্ত

অবস্থায় এ-বিষয় হয়ত কিছু না বলিলেও চলে, কিন্তু বর্তমান সঙ্কটকালে ব্রিটিশ, তথা মার্কিণ ব্যবসায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অ-ভারতীয় কর্মীদের উপর পুলিশী দৃষ্টির রূপা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। উপরি উক্ত দেশের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে—পশ্চিম পাকিস্তানের অফিসার শ্রেণীর বহু কর্মচারীও আছে বলিয়া প্রকাশ, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব অঞ্চলের। বলা বাহুল্য, যোগ্য বাঙ্গালী কর্মপ্রার্থী থাকিতেও বিদেশী প্রতিষ্ঠানে ইহাদের স্থান বিশেষ হয় না। নামকাওয়াস্তে দু-একজন বাঙ্গালী হয়ত ভাগ্যক্রমে এখানে প্রবেশাধিকার পায়। অবশ্য সামান্য বেতনভোগী বাঙ্গালী কেরাণিরা এই সব প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায়। এবার আশা করা যায় যে, রাজ্য সরকার বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির বিদেশী কর্মী-কর্মচারীদের সম্পর্কে যথাযোগ্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিবেন অবিলম্বে। আর একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। ব্রিটিশ এবং মার্কিণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্তবিধ সংস্থার বহু ইংরেজ এবং মার্কিণ কর্মচারী পাকিস্তানের পক্ষে নানা প্রকার ভারত-বিরোধী তৎপরতার সহিত জড়িত আছেন, বিশেষ করিয়া গোপন প্রচার এবং গোপনীয় সংবাদ-পাচার ব্যাপারে। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ, বিশেষ করিয়া আই-বি খুবই দক্ষ বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে—বর্তমান অবস্থায় এই বিভাগের কর্মচারীরা তাঁহাদের খ্যাতি আরও বৃদ্ধি করিবার অবকাশ যথেষ্ট পাইবেন বলিয়া মনে হয়।

এ-দিক আর ও-দিক

পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের অন্যান্য স্থানে পাকিস্তানীরা কোথাও নির্য্যাতিত হয় নাই—তাহারা নিরাপদে, আরামে এবং সুখেই আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে কি দেখা যায়?

আজ পর্য্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের নিকট হইতে বিশেষ কোন সরকারী সংবাদ এখানে পাওয়া যায় নাই। তবে বেসরকারী সূত্র হইতে যে সকল খবর পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সর্বত্র পাকিস্তানী নাগরিক হউক, বা না হউক সকল হিন্দুকেই নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যে সকল হিন্দুকে কম শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের গৃহ হইতে বাহিরে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দু নাগরিকদের নালিশ জানাইবার কোন স্থান নাই। আয়ুবশাহী সরকারের দাপটে পূর্ব পাকিস্তানে আইন আদালত সব কিছুই মৃত।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অত্যাচারে ভীত হইয়া গত কয়েক বছরে প্রায় ৯ লক্ষ হিন্দু পাকিস্থানী নাগরিকও পশ্চিমবঙ্গে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাকিস্তানের পাশপোর্ট লইয়া হিন্দুরা চলিয়া আসার পর তাঁহারা আর পাকিস্তানে ফিরিয়া যান নাই।

ভারতে পাকিস্তানীরা এখনও যে মানবীয় ব্যবহার এবং সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহার সহিত দানবীয় পাক-সরকারের বর্বরোচিত ব্যবহারের কোন তুলনা অসভ্য সমাজেও পাওয়া শক্ত—অসম্ভব।

আমরা এমন কথা কখনই বলিব না যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের উপর নির্বিচারে কোন প্রকার অন্যায় অথবা বিধি-নিষেধ আরোপিত করা হউক, কারণ আমরা ইহা জানি এবং বিশ্বাস করি যে বাঙ্গালী মুসলমানদের দেশপ্রেম এবং দেশের জন্য ত্যাগ কোন অংশে অন্যদের অপেক্ষা বিশেষ কম নহে। আজ পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের একযোগে কর্মপদ্ধতি স্থির করিতে হইবে। কিন্তু এ-রাজ্যে বসবাস করিয়া যাহারা—হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, মার্কিন, চীনা যেই হউক—দেশের বিরুদ্ধে পাক-শয়তানের হইয়া গোপনে কাজ করিতেছে, তাহাদের সমূলে উৎখাত করিতেই হইবে। এবং এই পবিত্র কাজে দেশকল্যাণকামী হিন্দু মুসলমানকে সংঘবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে।

কলিকাতার পাক-ডেপুটি হাই কমিশনারের প্রতি আবার বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, যেমন ঢাকাতে আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনারের উপর করা হইতেছে। পাকিস্তানের শাসকবর্গ একটি মাত্র যুক্তি গ্রাহ্য বলিয়া মনে করে। এবং সে যুক্তি হইতেছে পৃষ্ঠদেশে সবুট লাথি।

চা-বাগিচায় বিদেশী (ইংরেজ) ক্রিয়াকলাপ

কিছুদিন পূর্বে আসামের সীমান্ত এলাকায় একটি চা-বাগানের জনকয়েক বিদেশী ম্যানেজার শ্রেণীর অফিসার ভারতরাষ্ট্র-বিরোধী কার্য্যের জন্য ধরা পড়ে। ইহাদের সম্পর্কে আসাম সরকার চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন—কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। ভাল কথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলাতে এখনও বহু ব্রিটিশ মালিকানার চা-বাগান আছে এবং এই সকল চা-বাগানের ইংরেজ অফিসারদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি রাজ্য সরকার কোন প্রকার সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন

মনে করেন কি না জানা নাই, অথচ ইহারাও যে ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নহে তাহা বহু ঘটনায় প্রকট হইয়াছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ভারতে যে-সব বিদেশী প্রচুর অর্থোপার্জনের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতেছে পূর্ণ মাত্রায়, তাহাদের দেশবিরোধী কাজ সহ্য করা হইবে না এবং তাহাদের ভারত হইতে বিতাড়িত করিতেই হইবে। এই মনোভাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া সেইমত কাজও করিতে হইবে।

কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে বহু ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশী সাংবাদিক এবং 'ভ্রমণকারী-বেশে' গুপ্তচর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অবাধে। গত তিন চার মাসে এই শ্রেণীর বিদেশীদের তৎপরতা বিশেষ ভাবে দেখা যাইতেছে। বিদেশী সাংবাদিকের দল ত ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার রূপ জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। ভারতের সম্পর্কে সত্য কথা গোপন রাখিয়া ইহারা পাকিস্তানের পক্ষে অবাধ মিথ্যার বেসাতি ফেরি করিতে কোন লজ্জাবোধ করে না, এবং এই মিথ্যাবাদী বিদেশী রিপোর্টারদের প্রেরিত সংবাদাদি বিদেশী সংবাদপত্রগুলি—মিথ্যা জানিয়াও সাড়ম্বরে প্রচার করিতেছে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া! এই শ্রেণীর বিদেশীদের সম্পর্কেও রাজ্য সরকার কালবিলম্ব না করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া সকলেই আশা করে। ইহারা যাহাতে আন-সেনসার্ড কোন কিছু বাহিরে না পাঠাইতে পারে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া আজ একান্ত প্রয়োজন।

খড়্গপুরে পাকিস্তানী নাগরিক (গুপ্তচর ?) ধৃত—

বিগত ২২শে অক্টোবরের সংবাদে জানা যায় যে, স্থানীয় পুলিশ একজন পাকিস্তানীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই ব্যক্তি গত চার বৎসর আত্মপরিচয় গোপন করিয়া কলাইকুণ্ডার বিমান ঘাঁটির অফিসারদের ব্লকে 'ভৃত্যে'র কাজে নিযুক্ত আছে। এ-বিষয় তদন্ত চলিতেছে। কিছুকাল পূর্বে পাকিস্তানী বিমান কর্তৃক কলাইকুণ্ডার বিমান ঘাঁটি আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে এই ব্যক্তি জড়িত থাকিতে পারে এমন সন্দেহও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভাবে পরিচয় গোপন রাখিয়া কত হাজার পাকিস্তানী পশ্চিমবঙ্গের সাহেব-সুবাদের কাজে নিযুক্ত আছে তাহা সঠিক বলা না গেলেও ইহাদের সংখ্যা যে খুবই বেশী তাহা সহজে অনুমেয়। আমাদের দেশে এখনও এমন বহু 'দেশী' সাহেব আছেন, যাঁহাদের পাকিস্তানী মুসলমান খানসামা-বাবুর্চি না হইলে চলে না। বলা বাহুল্য এই ভাবে কর্ম-নিযুক্ত পাকিস্তানীরা প্রায় কেহই বাঙালী নহে, কারণ বাঙালী মুসলমান খানসামা-বাবুর্চি দেশী-বিদেশী কোন সাহেবের বাড়ীতে কাজকাম করে না, কারণ ইহারা ঠিক 'কুলীন' নহে! কলিকাতার যে-সব এলাকায় সাহেব এবং 'সাহেব'-বাবুদের বাস, সেই সব এলাকায় খোঁজ লইলে এমন বহু অবাঙালী এবং অভারতীয় মুসলমান বাবুর্চি, খানসামা, বেয়ারা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যাইবে, যাহাদের 'প্রদত্ত' পরিচয় নাম-ধাম 'সত্য' নহে। ইহাদের মধ্যে পাক্-চরও যে বেশ কিছু সংখ্যক আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য—আমরা নব-নিযুক্ত লোকেদের কথাই বলিতেছি। যাহারা এখানে এবং একই গৃহে ১৫ ২০ বছর ধরিয়া খানসামা, বাবুর্চি, বেয়ারার কাজ সন্তোষজনক ভাবে করিতেছে—তাহাদের সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ না থাকাই সম্ভব।

বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দিতে এবং সতর্ক থাকিতে হইবে সেই সব অবাঙালী (এবং খুব সম্ভবত অভারতীয়) মুসলমান গৃহ ভৃত্যদের উপর যাহারা বিগত দু-তিন বৎসর কলিকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, ইছাপুর এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে সাহেব এবং 'সাহেব' বাবুদের গৃহে খানসামা, বাবুর্চি এবং বেয়ারার চাকরি গ্রহণ করিয়াছে মিথ্যা পরিচয় দিয়া।

পুলিস এ-বিষয়ে গোপন তদন্ত করিয়া একটি রেজিষ্টারে উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিদের তালিকা রাখিতে পারে। এমন কি নব-নিযুক্ত সকল শ্রেণীর ভৃত্যাদির নাম-ঠিকানা, চাকরিতে নিযুক্ত করিবার পূর্বে পুলিসকে অবশ্যই জানাইতে হইবে—এমন নির্দেশও সরকার হইতে দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করি, বিশেষ করিয়া বিদেশী সাহেব-সুবাদের উপর এই বিধান অবিলম্বে প্রয়োগ করা দরকার। এইরূপ করিলে এখানের দরিদ্র বাঙালী মুসলমানদেরও কিছু কল্যাণ হইতে পারে, যাহার ফলে বাঙালী বেকারদের সংখ্যাও সামান্য কিছু কমিবে।

আলোচ্য প্রসঙ্গটি হয়ত অনেকেই হালকা ভাবে লইবেন—কিন্তু তাহা ঠিক হইবে না। ব্যাপারটি সত্যই গুরুতর। অনেকেই হয়ত জানেন গত মহাযুদ্ধের পূর্বে নাৎসী জার্মানীর একজন নেতা এবং হিটলারের বিশ্বস্ত সহকর্মী 'রিবেনট্রপ' লণ্ডনের একটি বিখ্যাত হোটেলে সামান্য বেয়ারা জাতীয় কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া বহু গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক গোপন সংবাদ জার্মানীতে প্রেরণ করেন, যাহার ফলে যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর গ্রেট ব্রিটেন প্রায় ধ্বংসের মুখে উপনীত হয়।

"চাউল বাড়ন্ত"

সংবাদে প্রকাশ :

শ্রীরামপুর, ২২শে অক্টোবর—শ্রীরামপুর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খোলাবাজারের চাউল উধাও হইয়া গিয়াছে। হুগলী জেলার শস্যভাণ্ডার তারকেশ্বর-হরিপাল-সিঙ্গুর ইত্যাদি স্থানেও চাউল বাড়ন্ত ; ফলে সাধারণ মানুষ গোলাসিদ্ধ এবং ছাতু খাইতেছে। আরামবাগ অঞ্চল হইতে খবর পাওয়া যায় যে, সেখানেও চাউল প্রায় নাই। রেশন এলাকা বহির্ভূত এইসব এলাকায় চাউল উধাও হওয়ার ফলে মানুষ অনাহারে রহিয়াছে। খোলা-বাজারে যদি কোথাও চাউল বিক্রী হয় তাহার সের ১-৮০ পয়সা হইতে ২-৫০ পয়সা। ইহার উপর হোটেলেও ভাত পাওয়া যাইতেছে না, ফলে যাহারা হোটেলের উপর নির্ভরশীল তাঁহাদের অবস্থাও শোচনীয়।

এবার দেখুন—

ব্যারাকপুর, ২২শে অক্টোবর—সম্প্রতি এতদঞ্চলে খাদ্য-সঙ্কট এত প্রবল হইয়াছে যে, মানুষ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ব্যারাকপুর ও মধ্যমগ্রাম বাজারে চাউল প্রতি কে-জি ২-২০ পয়সা হইতে ২৫০ পয়সা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। খোলাবাজারে তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। গরীব লোকেরা বিনকাপা মগুল সমবায় কর্তৃক বিলিকৃত দুধ লইবার জন্য কাতারে কাতারে লাইন দিতেছে। তাহাও ১-৫০ কিলোর কম পাওয়া যায় না।

তারপর—

তারকেশ্বর, ২২শে অক্টোবর—সরকার খাদ্য সমস্যা সমাধান করিবার জন্য যে পরিমাণে কার্য্যতঃ কঠোর হইয়াছেন, সেই পরিমাণে চোরাবাজারী ও মজুতদারেরা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করিতেছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন সম্প্রতি নদীয়ায় যে ভাষণে চোরা-বাজারী ও ঘুষখোরদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার পরেই এ অঞ্চলের বাজার হইতে রাতারাতি চাউল উধাও হইয়াছে। এখন দাম ১-৬০ হইতে ১-৮০ ১-৯০, যাহার যা খুশী তাহাই লইতেছে। সাধারণ ক্রেতাদের আজ মর্মন্তুদ অবস্থা! মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে বি ডি ও, অঞ্চল পঞ্চায়েত, তীনার ও দোকানে দোকানে ধরনা দিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন চোরাবাজারীরা গলা কাটিতেছে।

পুরুলিয়া, ২৩শে অক্টোবর—পুরুলিয়ায় অত্যন্ত বেশী চাউলের সঙ্কট চলিয়াছে। রেশনের (আংশিক) দোকান-গুলিতে চাউল সরবরাহ প্রায় নাই, খোলাবাজারেও চাউল দুষ্প্রাপ্য। স্থানীয় সরকারী গুদাম হইতে সম্প্রতি ৮ হাজার কুইন্টাল চাউল পাঠানো হইয়াছে নদীয়া জেলায়। আরো দুই হাজার কুইন্টাল চাউল প্রেরণেরও নাকি ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে স্থানীয় এলাকার চাউল সঙ্কট আরও তীব্র হইয়াছে। মফঃস্বল অঞ্চলে সরকার কিছু পরিমাণ তাজা চাউল মজুত রাখিয়াছেন। চাউলের অভাবে জনসাধারণের মনে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়িতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বহু স্থান হইতেও ভীষণ খাদ্যাভাবের সংবাদ আসিয়াছে। যথা—

উলুবেড়িয়া শহর এবং গ্রামাঞ্চলে সাধারণ লোক আজ প্রায় অনশনের মুখে। খোলাবাজারে চাউল নাই, কালোবাজারে চাউলের দাম ২ টাকা কেজি! ক্রেতারা চাউল ক্রয়ের জন্য সুদূর গ্রামাঞ্চলে যাইতেছে। রেল-ষ্টেশনেও অনেককে থলি হাতে অপেক্ষা করিতে দেখা যায়। জেলা-ভিত্তিক কর্ডন ব্যবস্থা জোরদার করার ফলে চোরাপথে চাউল আমদানী প্রায় বন্ধ। হাওড়া জেলা ঘাটতি অঞ্চল। এই জেলার কোন কোন অংশে ধান উদ্বৃত্ত হয়। কিন্তু স্থানীয় লোকের হস্তক্ষেপে উদ্বৃত্ত চাউল ঘাটতি অঞ্চলে আমদানী করা আজ অসম্ভব। এমন কি ক্রেতাদের চাউলও জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। ৭৪৲ টাকা মণ দরে চাউল কেনা শতকরা ৮০ জনের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই অনেক পরিবারে আজ অনশন শুরু হইয়াছে। পূর্ব্বে চাউলের পরিবর্তে অনেকে আটা-ময়দা খাইতেন কিন্তু বাজারে এখন তাহাও পাওয়া যাইতেছে না। এদিকে রেশন দোকান-গুলি হইতে যে পরিমাণ চাউল-গম দেওয়া হইতেছে তাহাতে একজনের দু'দিন চলে। কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে সপ্তাহে চাউল-গমের বরাদ্দ কমাইতেছেন। গ্রামাঞ্চলে ইউনিট পিছু কেবলমাত্র আধ কেজি গম বরাদ্দ হইয়াছে। ভয় যে আর কিছু দিন পরে হয়ত গম বা চাউল কিছুই পাওয়া যাইবে না।

মুর্শিদাবাদের খবরে জানা যায় যে, ঐ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার কয়েকটি থানায় মানুষ চাউল এবং কেরোসিন তেলের জন্য হাহাকার করিতেছে। বাজারে কেরোসীন তেল নাই। চাউল কালোবাজারে ৩ টাকা কেজি বিক্রয় হইতেছে। থানা অঞ্চলগুলি আংশিক রেশনের অন্তর্ভুক্ত। রেশনে যে পরিমাণ চাউল পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। মাথাপিছু সপ্তাহে ৪০০ গ্রাম চাউলের বেশী

হয়। এদিকে জনসাধারণকে ক, খ, গ, শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—ক শ্রেণী ছাড়া খ ও গ শ্রেণী চাউল হইতে বঞ্চিত। চাউল উদ্বৃত্ত হইলে 'খ' শ্রেণী মধ্যে মধ্যে পায়। গ শ্রেণীকে কেবলমাত্র চিনিতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা হইতে আজ বঞ্চিত। (কোন অপরাধে?)

তারকেশ্বর অঞ্চলের সংবাদে জানা গিয়াছে যে—মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় বাজারে চাউল নাই বলিলেই হয়। যে সামান্য পরিমাণে চাউল পাওয়া যায়—তাহা কালোবাজারে এবং অত্যধিক মূল্যে ১৬০ হইতে ২৲ টাকা কেজি! এই অঞ্চলে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লোক সংশোধিত রেশনের মাধ্যমে চাউল-গম সামান্য পরিমাণ পাইতেছেন। বসিরহাট মহকুমার খবরে প্রকাশ যে সম্প্রতি সরকারী গুদামে চাউলের ঘাটতি পড়ায় গত দু'চার সপ্তাহ যাবৎ মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম চাউল এবং ২৫০ গ্রাম গম দেওয়া হইতেছে—ইহাতে সাধারণ লোকের অবস্থা কি—বেশ বুঝা যায়। বীরভূম হইতে সংবাদ আসিতেছে, যে পূজার পর হইতেই পল্লী অঞ্চলে চাউলের তীব্র অভাব প্রকট হইয়াছে। বর্দ্ধিত মূল্যেও লোকে চাউল পাইতেছে না, ফলে শহরের চাকুরিজীবী এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র চাষী এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অবস্থা বিষম। অথচ বীরভূমে চাউলের অভাব হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এখানে কর্তৃপক্ষের অবিবেচনাপ্রসূত খাদ্যনীতি, জেলার প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, অবাধে জেলার বাহিরে ধান-চাউল চালান এবং সীমান্ত এলাকায় চোরা-পাচার প্রতিরোধে ব্যর্থতাই বীরভূম জেলায় এই বিষম চাউল সঙ্কটের কারণ। কেবল চাউলই নহে—অন্যান্য প্রায় সর্বপ্রকার নিত্যভোগ্য সামগ্রীর মূল্যও সাধারণ জনের আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে!

একদিকে খাদ্যশস্যের বিষম অভাব—অন্যদিকে সরকারী অবহেলা, অব্যবস্থার ফলে—কলিকাতা বন্দরে বেশ কিছু দিন হইতে অনেক গম পচিতেছে। ১৯৬৩ হইতে যে গম বন্দরে গুদামবন্দী হইয়া আছে—পোর্ট কর্তৃপক্ষের বহু তাগিদ সত্ত্বেও তাহা খালাস করা হয় নাই—ফলে আজ ঐ গম অখাদ্যে পরিণত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে এ-রাজ্যের বহু পুলিস-থানাতেও আটক চাউল শত শত বস্তা নষ্ট করা হইয়াছে, পুলিসের দোষে নহে, কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেই।

এদিকে দেশের লোককে যখন এই বিষম সঙ্কটকালে সর্বপ্রকার কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের আদেশ, আজ্ঞা, অনুরোধ জানান হইতেছে—ঠিক সেই সময় বিশেষ এক শ্রেণীর চোরাকারবারীর দল পশ্চিম বাঙলা হইতে জনগণকে বঞ্চিত করিয়া গোপন পথে পূর্ব্ব পাকিস্তানে এখনও চাউল-গম পাচার করিবার পুণ্যকর্মে লিপ্ত আছে! এই চোরা-চালানের পথটি নাকি এই প্রকার: বর্দ্ধমান হইতে চাউল নদীয়া জেলার চাকদহ হইয়া বনগ্রামে আসে এবং তাহার পর বনগ্রাম-গাইঘাটা দিয়া ঐ চাউল বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর এলাকার মধ্য দিয়া পাকিস্তানে যশোহর জেলায় পাচার হইতেছে।

সংবাদে প্রকাশ, পাক-সরকারের পূর্ণ সক্রিয় সহযোগিতায় এই চোরা-চালানী কারবার চলিতেছে। প্রধানত পূর্ব্ব পাকিস্তানে পাক-ফৌজের জন্যই এই চাউল যাইতেছে, পূর্ব্ব বাঙলার বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের ভোগের জন্য নহে।

উপরি উক্ত সংবাদগুলি কিছু দিন পূর্ব্বের হইলেও এখনও অবস্থার উন্নতি কিছু হয় নাই বরং অবনতিই হইয়াছে। এ-রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল হইতেও—এমন কি কলিকাতার নিকটস্থ কয়েকটি স্থান হইতে হয় 'চাউল নাস্তি', আর না হয় চাউলের বিষম মূল্যবৃদ্ধির সংবাদ আসিয়াছে। রাজ্য সরকার এই অবস্থায় সাধ্যমত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু চাউল ব্যবসায়ী—এমন কি ছোট ছোট দোকানীরাও যদি অবস্থার সুযোগ লইয়া মানুষ মারিয়া মুনাফা লুটিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে একা রাজ্য সরকার সহজে অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিবেন কি? এই বিষম সঙ্কটকালে মানুষকে খাদ্যাভাব হইতে বাঁচাইবার সহজ উপায়—দু-চারজন কালোবাজারী এবং মজুতদারী চাউল ব্যবসায়ীকে সোজাসুজি খাটের মধ্যে বন্দী করিয়া, তন্নীলার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 'চাউল-লীলা'ও শেষ করা! এই দাওয়াই-এর কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। বিদেশে বহু স্থানে এই দাওয়াই প্রয়োগ সবিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে।

পাক পাটের বদলে ভারতীয় চাউল?

পূর্ব্ব পাকিস্তানে পাটের বর্তমান মূল্য ১৫৲।১৬৲ টাকা মণ। কিন্তু ঐ পাট চোরাপথে পশ্চিমবঙ্গে আসিলেই উহার মূল্য দাঁড়ায় ৪০।৫০৲ টাকা মণ। এই তারতম্যের পূর্ণ সুযোগ লইতেছে এ-রাজ্যে বসবাসকারী বিশেষ এক শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর তথাকথিত ব্যবসায়ী। ভারতীয় চাউলের সঙ্গে পাকিস্তানী পাটের বিনিময়ে যে মুনাফা আসিতেছে তাহা আকাশ-প্রমাণ।

এবং যে-সকল ব্যবসায়ীর নিকট এই পৃথিবীতে একমাত্র কাম্যবস্তু 'অর্থ'—তাহারা নিজের দেশবাসীকে অন্ন বঞ্চিত করিয়া টাকা লুটিতে যে কোন দ্বিধা, লজ্জা, সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এ-বিষয়ে আরও বহু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মনে একমাত্র প্রশ্ন জাগিতেছে এই যে—সরকার হইতে এত কড়া ব্যবস্থা সত্ত্বেও সীমান্ত এলাকা দিয়া পাকিস্তানের সহিত চোরাকারবার কেমন করিয়া সম্ভব হইতেছে? রাজ্য সরকারকে এ-বিষয়ে দোষী বলা চলে না, কারণ যতদূর জানি সরকার এ-রাজ্যে খাদ্য সমস্যা সমাধানের সর্বাত্মক প্রয়াস করিতেছেন, কিন্তু সরকারী ব্যবস্থাদি যাঁহাদের মাধ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, গলদ সেই 'তাঁহাদের' মধ্যেই থাকা সম্ভব। শুনা যাইতেছে, রাজ্য সরকার চোরাচালান বন্ধ করিবার জন্য এই কারবারের 'মধ্যমণি'দের সন্ধান করিতেছেন। একজন সন্দেহযুক্ত 'কুলীন চোরাকারবার-বিশারদ' বর্তমানে রাজ-অতিথি-রূপে বাস করিতেছেন। এই সূত্রে হয়ত ইঁহাদের হেড অফিস অর্থাৎ মহাকর্তাদিগের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য মধ্যপথে কোন নেতা যদি সন্দেহে-ধৃত এই মহাশয়ের পক্ষে ওকালতী সুরু করেন, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে বলা কঠিন। কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছেন যে ইতিমধ্যেই তদারকী না কি সুরু হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে চাউল পাচার—কোন্ পথে?

এই বিষম সঙ্কটকালে জনগণকে সর্বভাবে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনে আহ্বান আবেদন জানান হইতেছে এবং ইহাতে দেশের সাধারণ মানুষ অকুণ্ঠ সাড়াও দিতেছে। কিন্তু এই সময় এক দল চোরাকারবারী এ-রাজ্য হইতে চাউল-গম-চিনি প্রভৃতি খাদ্যসম্ভার পূর্ব্ব পাকিস্তানে চালান করিতেছে। মুখ্যমন্ত্রীর হুমকিতে হয়ত কিছু কাজ হইয়াছে, কিন্তু কুলীন সদাগরনিষ্ঠ চোরাকারবারীর দল খুব যে দমিত হইয়াছে তাহা মনে না করিবার কারণও আছে। মাত্র কয়েক দিন পূর্বের এক খবরে জানা যায় যে বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে চাউল ইটিণ্ডা সীমান্ত দিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে গোপন পথে পাচার হইতেছে। এই চালানী পথের যতটুকু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা এই প্রকার:

বর্দ্ধমান হইতে চাউল নদীয়া জেলার চাকদহ হইয়া বনগাঁর আসে। তাহার পর বনগাঁ-গাইঘাটা হইয়া চাউল বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানা এলাকা দিয়া পাকিস্তানের যশোহর জেলায় ঢুকিতেছে। গোপালপুরের ঘাট ও ইছামতী পার হইয়া স্বরূপনগর এলাকা দিয়াও পাকিস্তানে ঢুকিতেছে।

আরও জানা গিয়াছে, উক্ত এলাকা বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানা এলাকার নদন ঘাটে প্রচুর চাউল জমা করা হয়। সেখান হইতে চোরাকারবারীর দল নৌকা বোঝাই করিয়া খড়ে ও অজয় নদ দিয়া গঙ্গা বাহিয়া চূর্ণী নদীর ভিতর দিয়া রানাঘাটে যাইতেছে। সেখান হইতে টেম্পো বোঝাই চাউল সোজা মদনপুর হইয়া তেঁতুলিয়া ঘাট। তাহার পর ইছামতী নদী পার হইয়া বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানা এলাকার বিলবল্লীর মধ্য দিয়া বিথারী ও হাকিমপুর মারফৎ সোনাই নদী পার হইয়া পাকিস্তানে যাইতেছে। সোনাই নদীর অপর পারেই পাকিস্তান।

এখানে বলা দরকার যে সোনাইকে যদিও নদী বলা হয় কিন্তু আসলে এটি স্বল্পরিসর খাল মাত্র। পারাপার হওয়া সহজসাধ্য।

সরকারী সতর্কতা সত্ত্বেও যে চোরাকারবার বিশেষ কতকগুলি অঞ্চলে চলিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে চোরাকারবার বন্ধ করিবার কি কোন উপায় বা পথ নাই?—আছে, যদি স্থানীয় লোক এবং ভারপ্রাপ্ত পুলিস তাহাদের কর্তব্য পালনে সত্যই তৎপর হয়। এই অনাচার বন্ধ করিতে হইলে জনসাধারণকে তাহাদের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত করিবার পুলিসী অপচেষ্টাও বন্ধ করা দরকার এবং এই সব আইনের মারপ্যাঁচ জনসাধারণের উপর প্রয়োগ না করাই ভাল। 'দমদম' দাওয়াই যে কি প্রকার কার্য্যকর তাহা ত এখন প্রমাণিত সত্য। আর একটি কথা—পশ্চিম ভারতের বিশেষ শ্রেণীর পাগড়িধারী তথাকথিত সাধু, সরল নির্লোভ এবং সাত্ত্বিক ব্যবসায়ীদের প্রতি আর একটু কড়া দৃষ্টি দিতে দোষ কি?

বিপদের নিশ্চিত সম্ভাবনা!

দেশের খাদ্যাভাব এবং খাদ্যসমস্যা লইয়া আরও বহু কথা বলা যায় কিন্তু বর্তমানে তাহা না করিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—সাধারণ মানুষকে প্রত্যহ অন্তত এক বেলার মত ক্ষুধার অন্ন দিতেই হইবে। কৃচ্ছ্রসাধন, দেশের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম আর সাধারণ লোক কম করিতেছে না এবং

প্রয়োজনে আরও করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু বিত্তবানেরা কি সম পরিমাণে দেশের জন্য, জাতির স্বাধীনতা রক্ষার কারণে যথোচিত কর্তব্য পালন করিতেছেন? এ-প্রশ্নের জবাব বিত্তবানেরা নিজেদেরকে নিজেরাই দিবেন। যাঁহারা প্রত্যহ নিয়মিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পাইতেছেন, নিজেদের পরিবার-বর্গকে দিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রজনকে 'কম খাও, আরও কম খাও, চাউল-গম না পাইলে ইহা খাও উহা খাও' উপদেশ দান করা কষ্টকর নহে। মানুষ নিজে হয়ত অনাহারে অর্দ্ধাহারের ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু চোখের সামনে অসহায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির অনাহার-যন্ত্রণা কতদিন সহ্য করিতে পারে বা পারিবে? দেশের সঙ্কটকালে যদি আরও গুরুতর সঙ্কটের বিষম সম্ভাবনা প্রতিরোধ করিতে হয়, দেশকে জনবিক্ষোভ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া খাদ্য সমস্যার একটা সমাধান করিতেই হইবে। উপরের লোক ফেলিয়া-ছড়াইয়া খাইবে আর নিচের লোক শুষ্ক মুখে বিষণ্ণ বদনে তাহাই দেখিতে থাকিবে—ইহা অধিক কাল চলিতে পারে না, কোন দেশে চলে নাই। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া এখনই সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার—ক্ষুধার্ত মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, বিচার-বুদ্ধিও লুপ্ত হয়।

কর্তব্যপরায়ণ কলিকাতা কর্পোরেশন!

মাত্র কয়েকদিন পূর্বের খবরে প্রকাশ যে, কলিকাতা পৌরসভার প্রায় ৩ কোটির অধিক টাকা অনাদায়ী পড়িয়া আছে। একমাত্র বাড়ীর কর বাবদই অনাদায়ী টাকার অঙ্ক ২ কোটি ২৮ লক্ষ। ইহা ছাড়া, লাইসেন্স বিভাগের ৩৫ লক্ষাধিক টাকা এবং আইন বিভাগের ৩৮ লক্ষাধিক টাকা বছরের পর বছর অনাদায়ী পড়িয়া আছে।

১৯৩৯ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত আইন বিভাগের হাতে ২৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ী ছিল। সেই অনাদায়ী টাকার অঙ্ক আজও কমে নাই। এখন হইয়াছে ৩৮ লক্ষ টাকা। এই অনাদায়ী টাকার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ টাকা তামাদি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, আইন বিভাগ টাকা আদায়ের জন্য যথাসময়ে মামলা রুজু করেন নাই। কিংবা মামলা রুজু করিলেও মামলা পরিচালনার তদারকীর অভাবে টাকা তামাদি হইয়াছে। টাকা আদায়ের জন্য মামলা করা উচিত ছিল অথচ পৌর কর্তৃপক্ষ করেন নাই এরূপ কেসের সংখ্যা প্রায় দু' হাজার।

বাড়ীর কর বাবদ অনাদায়ী টাকার অঙ্ক—২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। তাহা ছাড়াও সাপ্লিমেন্টারী বিল বাবদ এবং কলেকশন বিভাগ হইতে অন্যান্য বিলের ভুল সংশোধনের জন্য যে বিল অ্যাসেসমেন্ট বিভাগে পাঠান হইয়াছে সেই সব বিলের টাকার অঙ্ক প্রায় ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা।

বিশ্বস্ত সূত্র হইতে আরও জানা গেল যে, অনেক বিভাগ এখনও ঐ বিভাগের চূড়ান্ত খসড়া রচনা করেন নাই। এমন কি টাকা আদায়ের জন্য কোন প্রস্তাবও এখন পর্য্যন্ত পৌরসভায় পেশ করা হয় নাই। সম্প্রতি পৌরপিতারা তহবিলে টাকা নাই বলিয়া হাঁক-ডাক সুরু করিয়াছেন, কিন্তু পৌর-কর্তৃপক্ষ স্পেশাল কমিটির সুপারিশটি এখনও কার্য্যকরী করিতে সময় পান নাই!

কলিকাতা কর্পোরেশন বা পৌরসভা বলিতে আমরা বর্তমানে শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়কে বুঝি, কারণ তথাকথিত পৌরপিতাগুলির 'সুপ্রীম-ফাদার' হইতেছেন শ্রীঘোষ! কিন্তু 'গোষ্ঠী পিতার' কর্তব্য তিনি কি সামান্য পরিমাণেও পালন করিতেছেন? অবশ্য একজ তাঁহাকে দোষ দিব না, কারণ অতুল্যবাবু এখন অত্যন্ত জরুরী বহু কর্তব্য পালনে সর্ব সময় অতি ব্যস্ত রহিয়াছেন। দেশরক্ষা হইতে সুরু করিয়া দেশ হইতে ইংরেজ-বাণিজ্য বিতাড়নের গুরু কর্তব্যতার এখন শ্রীঘোষের বিশাল বিপুল স্কন্ধে!

কিন্তু কলিকাতাবাসীরা অর্থাৎ করদাতাদের জীবন যে এদিকে নাসিকাগতপ্রাণ! বছর বছর খাজনা বৃদ্ধি ঠিকই হইতেছে এবং সেই সঙ্গে এই একদা-প্রাচ্যের-গৌরব কলিকাতা শহরে যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত, প্রভৃতি রোগের সঙ্গে নূতন আপদ ফাইলেরিয়া হাজির হইয়াছে, অথচ ফাইলেরিয়ার মশা মারিবার জন্য কামানের ব্যবস্থা থাকিলেও কামান দাগিবার লোক নাই!

রাজ্য সরকার অনেকগুলি ছোট ছোট পৌরসভা বাতিল করিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতা পৌরসভার প্রতি রাজ্য সরকারের এত স্নেহ মায়া মমতা কেন? তবে কি ইহাই সত্য যে কলিকাতা পৌরসভা রাজ্য কংগ্রেসের কি-পীঠ?

মনে রাখা দরকার যে, অনাচারেরও একটা শেষ সীমা আছে মানুষের।

অ-সভ্যদের 'সভ্য' করিবার সরকারী প্রয়াস—

একটি সংবাদে জানা গেল যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কলিকাতা পৌরসভার মিটিংগুলিকে সংযত, ভদ্র করিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন। পৌরসভার সভ্যদের সংযত ও ভদ্র করিবার জন্য যে-সকল ব্যবস্থা করা হইবে, আশা করি সেই সব ব্যবস্থায় সভ্যদের বেয়াদবীর জন্য তাঁহাদের কর্ণ-মর্দনের কোন নির্দেশ থাকিবে না। এই ক্ষেত্রে এইরূপ নির্দেশ বেকার—কারণ কথিত-কর্ণদের কর্ণ মর্দন করিতে হইলে, তাহার পূর্বে 'কর্ণ-সাফাই' করিতে হইবে। ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তবে পরবর্তী নির্বাচনে কেবলমাত্র সুকর্ণযুক্ত প্রার্থীরাই পৌর-পিতা হইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন—ইহা বিধিবদ্ধ হইলে, তখন প্রয়োজনে কর্ণ-মর্দন চলিতে পারিবে।

জাতির সংহতির জন্য 'লিঙ্ক্'-ভাষা কি সত্যই প্রয়োজন?

ইহা আজ প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'হিন্দী' রাজভাষা বলিয়া বিধিবদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও আজ বিপদের সময় সমগ্র ভারত এক অপূর্ব সংহতির অনন্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। ইহার পর আশা করি হিন্দীকে সিংহাসনে বসাইবার অপচেষ্টা আর হইবে না। কিন্তু কয়েকদিন পূর্বে গৌহাটিতে প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ আবার কেন 'লিঙ্ক্ ল্যাঙ্গুয়েজের' (Link Language) প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিলেন বুঝিলাম না। দেশের এই অবস্থায় মরা ভূতকে খোঁচাইয়া তুলিবার কি দরকার? ভারতে লিঙ্ক্ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি রহিয়াছে। ইংরেজ তাড়াইবার প্রয়োজন হয়ত আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরেজি ভাষাকেও কি তাড়ান খুব বেশী প্রয়োজন? ইংরেজকে গালি দিবার জন্য অন্তত ইংরেজি থাকা একান্ত প্রয়োজন। আশা করি প্রধানমন্ত্রী ভাষা-বন্যা তুলিয়া জাতীয় সংহতিকে ভাসাইয়া দিবার কোন ইচ্ছা পোষণ করেন না।

——*

অন্য কোনোখানে

রণজিৎকুমার সেন

ইকনমিক্সে এম-এ পাশ করে যখন সারা ডালহৌসী স্কোয়ার ঘুরেও প্রসূন সুবিধে মতো কিছু একটা চাকরির সংস্থান করতে পারল না, তখন জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে সে স্পষ্টই অনুভব করল যে, এ সংসারে কোথাও আর তার মুখ দেখাবার জায়গা নেই।

বন্ধু সুশান্ত বলল: 'এত সেন্সিটিভ হ'লে কি চলে! পৃথিবীটা ত বইয়ের পৃষ্ঠা নয়, কঠিন মাটি; তাতে ঠোক্কর খেয়ে খেয়েই পা শক্ত হয়। আমার হয়েছে, তোরও হবে।'

কিন্তু তাতেও কি খুব একটা প্র্যাক্টিক্যাল হ'তে পারল প্রসূন? পারল না। সে রকম ধাতই নয় তার।

সেদিন সুশান্তই কি একখানি ইংরেজি দৈনিক এনে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাটা মেলে ধরল প্রসূনের সামনে, বলল: 'নাগপুরের একটা নামকরা ফার্মে হিসেব-পত্রের ভালো কাজ জানা একজন অনার্স গ্র্যাজুয়েট চায়, সেই সঙ্গে মালিকের বাড়ীতে রেসিডেন্সিয়াল টিউটার হিসেবেও তার থাকবার সুবিধে আছে; মাইনে আড়াই শো থেকে সাড়ে সাতশো। আজই এ্যাপ্লাই করে দে, অনার্স গ্র্যাজুয়েটের জায়গায় একজন এম. এ. পেলে ওরা এম. এ.-কেই আগে কনসিডার করবে।'

কথা রাখল প্রসূন। নিজের কোয়ালিফিকেশন জানিয়ে সেদিনই এ্যাপ্লাই করে দিল নাগপুরের যোগ-মাহিন্দর এ্যাণ্ড কোম্পানীতে। বলল: 'তোর দৌলতে কাজটা যদি হয়ে যায় ত বর্তে যাই, নইলে এ বেকারত্ব আর সহ্য হচ্ছে না।'

উত্তরে কিছু একটাও না বলে তার মুখের উপর কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নীরবে উঠে গেল সুশান্ত।...

এরপর দেখতে দেখতে প্রায় সপ্তাহ দু'তিন কেটে গেল, কিন্তু নাগপুরের কোনো চিঠি নিয়ে পিয়ন এসে প্রসূনের দরজায় দাঁড়াল না। এতকাল চেষ্টা করে কলকাতার আশা সে ছেড়েই দিয়েছিল, এবারে বুঝি নাগপুরও ছাড়তে হয়! নিজের মধ্যে একেবারেই দমে গেল প্রসূন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন ইন্টারভিউয়ের চিঠি এসে হাজির। নাগপুর যি-এম এ্যাণ্ড কোম্পানীর চিঠি। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ বুঝি এক টুকরো আলো ঝলকে উঠল প্রসূনের চোখ দু'টিতে।

সুশান্ত বলল: 'যাতায়াতের খরচায় তোর টান পড়বে জানি, এই নে টাকা; চাকরিটা পেয়ে গেলে শোধ ক'রে দিস।'

পারে ত সুশান্তকে এবারে জড়িয়ে ধরে প্রসূন। মনের কথা কোনোদিন খুলে বলতে হ'ল না তাকে, কেমন যেন আগে থেকেই সব বুঝে ফেলে।

সঙ্গে যে হোল্ডঅল আর স্যুটকেশ যাবে, তাও সুশান্তই ব্যবস্থা ক'রে দিল।

কিন্তু বিপত্তি ঘটল প্রসূনের ট্রেনে উঠতে গিয়ে। প্ল্যাটফর্মের দরজায় গিয়ে সে পৌঁছাতে-না-পৌঁছাতেই ট্রেনটা চলতে সুরু করল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে কোনোরকমে যে কম্পার্টমেন্টটায় সে উঠে পড়ল, সেটা বিশেষ ভাবেই মেয়েদের। প্রথমটা বুঝতে পারে নি প্রসূন, কিন্তু বেডিং আর স্যুটকেশটা কোনো রকমে সিটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে বসতে যেতেই একদল মেয়ের হাসির রোলে তার চমক ভাঙল। কিন্তু তখন আর নেমে যাবার কোনো পথ নেই। গাড়িটা ততক্ষণে স্পীডে চলতে সুরু ক'রেছে।

যে মেয়েরা একটু আগে হেসে উঠেছিল, তাদের মধ্যেই দু'একজন এবারে কিছুটা সিরিয়াস হয়ে উঠল। বলল: 'আপনি কি কানা যে কম্পার্টমেন্ট চিনে উঠতে পারেন নি? অনেক গুণ্ডা ডাকাত আজকাল আপনার মতো এ রকম ভদ্রলোকের মুখোস এঁটে ঘোরাঘুরি করে। সামনের ষ্টেশনে যদি আপনি নেমে না যান ত আমরা পুলিস ডাকব।'

প্রসূন বলল: 'আপনাদের কি ক'রে বোঝাব যে আমি ও রকম কোনো শ্রেণীর লোক নই। নিতান্তই প্রাণের তাগিদে গাড়িটা ধরবার জন্যে দৌড়ে এসে বা উঠে পড়েছি। কিছু মনে করবেন না, পরের ষ্টেশনেই আমি অন্য কম্পার্টমেন্টে চ'লে যাব।'

কিন্তু তাতেও থামতে চায়না মেয়েরা। তাদের কেউবা

আঠারো-বিশ-বাইশ, কেউবা পঁচিশ-ত্রিশ, উপরন্তু কেউই কুৎসিতদর্শনা নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রৌঢ়া একটি বিধবাও ছিলেন। প্রদ্যুম্নের অবস্থা দেখে তাঁর যেন কেমন মায়া হ'ল। ভদ্রমহিলা নিঃসন্তান। প্রদ্যুম্নকে কাছে ডেকে এক টুকরো জায়গা ক'রে দিতে দিতে বললেন: 'তা কোথায় চলেছ বাবা, বল ত?'

কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে প্রদ্যুম্ন বলল: 'যাচ্ছি একটা চাকরির ব্যাপারে।' তারপর মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: 'আপনি অবিকল আমার মাসীমার মতো দেখতে. আপনাকে মাসীমা ব'লেই ডাকি, কেমন?'

আপত্তি না জানিয়ে মহিলাটি বললেন: 'ওদের কথায় তুমি যেন রাগ ক'রো না বাবা। দিনকাল ত ভালো নয়, তাই—। নইলে তুমি এ গাড়িতে আমাদের সঙ্গে ব'সে যাবে, তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে?'

শুনে মণিকা অর্থাৎ যে-মেয়েটি ইতিপূর্বে বেশী মুখিয়ে উঠেছিল, বলল: 'মাসীমাকে পটাতে চেষ্টা ক'রে লাভ নেই, সামনের ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালে এক মিনিটও এ কম্পার্টমেন্টে যেন আর থাকবেন না।'

দ্বিতীয় মেয়েটি অর্থাৎ সর্বাণী কি মনে ক'রে যেন এতক্ষণে অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছিল, চাপা গলায় বলল: 'আঃ—যথেষ্ট হয়েছে, এবারে থামত মণি।'

মণিকা এবারে কিছু একটাও আর না ব'লে ঘুরে, অন্য মেয়েদের দিকে মুখ ক'রে বসল।

দু'টি আপন বোন। সর্বাণী বড়, মণিকা ছোট। দিন দশেক কলকাতায় মাসীর বাড়ীতে কাটিয়ে একেবারে মাসীকে নিয়েই নাগপুরে ফিরছে। কার মুখে যেন একবার ট্রেণে গুণ্ডা-ডাকাতের অতর্কিত আক্রমণের কথা শুনেছিল মণিকা, সেই থেকে দূর পথের ট্রেণে যাতায়াতে তার কিছু ভয় ছিল। আর সেই ভয় থেকেই এতগুলো মেয়ের মধ্যেও প্রদ্যুম্নের উপর তার এই অতর্কিত আক্রমণ।

মাসী ব্যক্তিটি কিন্তু ততক্ষণে আবার কথালো হয়ে উঠেছেন প্রদ্যুম্নের সঙ্গে। তাঁর মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে মাঝে মাঝে যে কথাটি জাগছিল, তা হচ্ছে—তাঁর খোকন যদি বেঁচে থাকত, তবে প্রদ্যুম্নের মতই এত বড়টি হ'ত। কিন্তু খোকন তাঁর গোটা ভবিষ্যতের মুখে ছাই দিয়ে দু'বছরেরটি হ'তে-না-হ'তেই চোখ বুজে চ'লে গেল। তারপর থেকে দেওর-ভাসুরের সংসারে তিনি একেবারে একা। ভাবতে গিয়ে কম্পার্টমেন্টের অন্য মেয়েরা যখন প্রায় নিদ্রাক্রান্ত, তখনও দু'চোখে ঘুমের কিছুমাত্র জড়তা নেই বিধবা মহিলাটির অর্থাৎ মনোরমার।

হু হু শব্দে ট্রেণ ছুটে চলছিল। কিন্তু পরের ষ্টেশনেই প্রদ্যুম্ন নেমে প'ড়তে পারে নি, মনোরমার সঙ্গে গল্পে গল্পে গাড়িটা আবার তার স্বাভাবিক স্পীডে চলতে শুরু ক'রে দিয়েছিল। এম্‌নি ক'রে আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর ঘাটশিলা ষ্টেশনে এসে তবে সে এ কম্পার্টমেন্ট ছেড়ে অন্য কামরায় গিয়ে কোনরকমে নিজের জন্যে একটু জায়গা ক'রে নিতে পারল। তারপর কেমন ক'রে কোথা দিয়ে যে সারাটা রাত এবং পরের দিন সারাটা বেলা কেটে গেল, বুঝতে পারল না প্রদ্যুম্ন।

বিকেল নাগাদ গাড়ীটা এসে নাগপুর ষ্টেশনে দাঁড়ালে কোনদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে সোজা সে ষ্টেশনের বাইরে এসে একটা সাধারণ হোটেল খুঁজে নিয়ে সেখানেই উঠে পড়ল দিন দু'য়েকের ব্যাপার, অসুবিধের কোনো কারণ নেই।

হলও না বিশেষ অসুবিধে। সহরটার সঙ্গে নিজেকে খানিকটা অভ্যস্ত ক'রে নিতেই প্রায় পুরো একটা বেলা কেটে গেল প্রদ্যুম্নের। কিন্তু কাটল না শুধু মন থেকে তিনটি নারীর স্মৃতি: লেডিজ কম্পার্টমেন্টের সেই সর্বাণী, মণিকা আর মাসীমা মনোরমা। জীবনে কোন দিন ঘর থেকেও বেরোতে হয় নি, তাই এমন পরিস্থিতিতেও পড়তে হয় নি কখনও। কোন মেয়ের কাছে অপমান সহ্য করাও জীবনে তার এই প্রথম। জীবিকার জন্যে জীবনকে বুঝি এম্‌নি ক'রেই অপমান সহ্য ক'রে ঘুরে মরতে হয় এক কম্পার্টমেন্ট থেকে আর এক কম্পার্টমেন্টে! কিন্তু যাঁকে মাসীমা ব'লে মনে হয়েছিল, তিনি মাসীমার মতই স্নেহ-প্রবণা। ভুল ক'রে ফেলেছে সে তাঁর ঠিকানাটা জিজ্ঞেস না ক'রে; কলকাতায় ফিরে এসে কোনদিন তবে হয়ত 'মাসীমা' বলে ডেকে উঠতে পারত তাঁর কাছে!

কিন্তু এ চিন্তায় বেশীক্ষণ কাটল না প্রদ্যুম্নের। যতক্ষণ পারল, ষ্টেশন রোড, গান্ধী মার্গ, এ্যাসেম্‌ব্লি হাউস, কোর্ট আদালত আর চাঁদমারী দেখে কাটিয়ে দিল, তারপর পড়ন্ত বিকেলে ইন্টারভিউর চিঠির নির্দিষ্ট ঠিকানার উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল।

রেলওয়ে কোয়ার্টার্স ছাড়িয়ে একটু দূরেই বোস-ম্যাকিন্নন এ্যাণ্ড কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এস. বোসের মাঝারি দিতল বাড়ী। তাঁর সঙ্গেই সাক্ষাৎকার। গিয়ে বেল টিপতেই বয় এসে দরজা খুলে দিল।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞেস করল: 'বোস সাহেব বাড়ী আছেন?'

তাঁকে বসতে ইঙ্গিত ক'রে বয় বলল: 'আছেন, আপনার কি নাম বলব, বলুন।'

প্রদ্যুম্ন বলল: 'বল যে কলকাতা থেকে প্রদ্যুম্ন মিত্র তাঁর চিঠি পেয়ে দেখা ক'রতে এসেছে।'

ঘর এবারে পাখার সুইচ টিপে দিয়ে পর্দা-ঝোলানো দরজার আড়ালে চ'লে গেল।

মিনিট পনেরো কেটে যাবার পর পায়ে স্লিপারের শব্দ তুলে যিনি এসে এ ঘরে প্রবেশ করলেন, চেহারা এবং স্বাস্থ্যে মিলিয়ে তিনি দিব্যকান্তি পুরুষ। মনে মনে তাঁকেই ঘোষ সাহেব ধ'রে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে যুক্তকর কপালে তুলে নমস্কার জানাল প্রসূন।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে এবারে নিজের চেয়ারে ব'সে প'ড়ে ঘোষ সাহেব মানে শেখর ঘোষ বললেন, বসুন।

এবারে পুনরায় চেয়ারে বসে প'ড়ে পকেট থেকে ইন্টারভিউয়ের চিঠিটা বার ক'রে তাঁর হাতের সামনে এগিয়ে ধরল প্রসূন।

সেদিকে লক্ষ্য ক'রে মিঃ ঘোষ বললেন: 'চিঠিটা অবিশ্যি আমিই ইস্যু ক'রেছিলাম। আড়াইশ' ক্যাণ্ডিডেটের মধ্যে পাঁচজন বাঙালীর নাম পেলাম; দেখলাম—আমরা যে রকম কোয়ালিফিকেশন চেয়েছি, তার চাইতে এক ডিগ্রী আপনি উপরেই আছেন। মনে মনে আমার এই ইচ্ছেও ছিল যে, পোস্টটা অন্ততঃ কোন বাঙালী পাক। তাই আপনার কোয়ালিফিকেশন অনুসারে আপনাকে সুযোগ দিতে আমার আপত্তি নেই। হয়ত মিঃ মাহিন্দরও আমার সঙ্গে এগ্রি করবেন। কিন্তু আমরা অবশ্যই কাজের স্পেশালিটি চাইব।'

প্রসূন বলল: কাজে যোগ না দিয়ে কি ক'রে তার পরিচয় দিই তার, বলুন? আমাকে যদি দয়া ক'রে চান্স দেন, তবে—'

বাধা দিয়ে শেখর ঘোষ বললেন, 'না, না, দয়ার কি আছে? আমাদের লোকের প্রয়োজন, আপনারও কাজের দরকার; এখানে কাজ সম্পর্কে আপনার কিছু একটা মিনিমাম আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং পেলে আমরা অবশ্যই আপনাকে চান্স দেব। তা ছাড়া আমি নিজে বিশেষ ক'রে বাঙালী চাচ্ছি এই কারণে যে, আমার বাড়ীতেই তার রেসিডেন্সিয়াল টিউটারশিপ বাঁধা থাকবে; সুতরাং বুঝতেই পারছেন—'

ইতিমধ্যে হাতে ক'রে বাবার তামাকের পাইপটাকে নিয়ে এসে ছোট মেয়ে বলল: 'পাইপটাকে তুমি উপরের ঘরের টেবলেই ফেলে এসেছিলে।' তারপর প্রসূনের দিকে দৃষ্টি যেতেই অবাক বিস্ময়ে ব'লে উঠল: 'সে কি, আপনি এখানে?'

প্রসূনও এবারে ভালো ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কোন রকমে বলল: হ্যাঁ, আমি মানে—তা—আপনিই বা এখানে—'

কিন্তু কথা শেষ হ'ল না। শেখর ঘোষ বললেন: 'মণিকা যে আমারই ছোট মেয়ে, ওর টিউটারশিপের কথাই ত বলছিলাম।'

মণিকা বলল: 'জানো বাবা, কি সাংঘাতিক লোক ইনি! ট্রেনে আমাদের লেডিস কম্পার্টমেন্টে এসে উঠে পড়ে আর নামতে চায় না। আমি বকুনি দেওয়ায় তবে নেমে যান।'

এবারে শেখর ঘোষ কিছু একটা বলার আগে মাথা নীচু ক'রে প্রসূন বলল: 'আমার সময় এরকম একটা গোলযোগই হয়েছিল।' তারপর একটুকাল থেমে বলল: 'তা হ'লে মাসীমাও এ বাড়ীতেই আছেন?'

শেখর ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন: 'মাসীমা মানে?'

মণিকা বলল: 'আমাদের মাসীমা। তাঁর সঙ্গে ইনিও দিব্যি মাসীমা পাতিয়ে নিয়ে সাঁইথিয়া পর্যন্ত আমাদের গাড়িতেই কাটিয়ে দিলেন। একটা স্বাভাবিক লজ্জাবোধও যদি থাকে!'

শেখর ঘোষ বললেন: 'ছিঃ, ও কি কথা! আমার চিঠি পেয়েই উনি এখানে এসেছেন। প্রসূন মিত্র, ইকনমিক্সে এম. এ.। ভাবছি, তোকে পড়াবার জন্যেই ওঁকে আমার অফিসের চাকরিটা দেব কি না!'

এতক্ষণে প্রসূন মনে মনে বুঝল—কেন ঘোষ সাহেব বাঙালী ক্যাণ্ডিডেটের উপর প্রেফারেন্স দিচ্ছিলেন। কিন্তু চাকরিটা হ'লেও এ মেয়েকে পড়ানো তার পক্ষে সম্ভব কি না, সেটা চিন্তার বিষয়।

ইতিমধ্যে মণিকা হঠাৎ ব'লে উঠল: 'ওঁর কাছেই আমাকে পড়তে হবে? তবেই হয়েছে বাবা!' ব'লে এক মিনিটও আর অপেক্ষা না ক'রে দ্রুতপায়ে পুনরায় বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

শেখর ঘোষ বললেন: 'আচ্ছা প্রসূন বাবু, আজ এ পর্যন্তই তবে কথা থাক। কাল দুপুরে আপনি আমাদের স্টেশন রোডের অফিসে আসুন. মিঃ মাহিন্দরের সঙ্গেও কথা হবে। দেখা যাক, আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যায় কি না!'

এবারে তাঁর সামনে থেকে উঠে এসে মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মাথাটাকে হাল্কা করে নিতে চেষ্টা করল প্রসূন, তার পর সোজা হোটেলের দিকে পা বাড়াল।

ভাগ্য ভাল যে, কষ্ট করে নাগপুরে আসাটা তার ব্যর্থ হ'ল না, চাকরিটা সে পেয়ে গেল। সামান্য দু'একটা প্রশ্নোত্তরের পর তার হাতে টাইপ-করা এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দিয়ে মিঃ মাহিন্দর তাকে তার কাজের চার্জ বুঝিয়ে দিলেন।

কিন্তু হোটেলে যে স্বাধীন ভাবে নিজেকে ভাল করে গুছিয়ে রেখে প্রসূন, তা আর হ'ল না। শেখর ঘোষ বললেন: 'মণিকা বি. এ. পড়ে, আমার বাড়ীতে থেকে ওকে পড়াবার উদ্দেশ্যেই মাষ্টারের জন্যে ঘরের আলাদা প্রতিষ্ঠান রেখেছি। আমি চাকরকে বলে দিচ্ছি, হোটেলে আপনার যা যা জিনিষ আছে, বাড়ীতে নিয়ে এসে আপনার ঘর গুছিয়ে রেখে।'

আপত্তি করবে যে প্রসূন, এমন অবকাশ পেল না। বরং মাথা নিচু করে বিনীত কণ্ঠে বলল: আমাকে আপনি করে বলে মিছামিছি লজ্জা দেবেন না আর।'

শেখর ঘোষও সেদিন থেকে 'তুমি'তেই নেমে এলেন।

তাঁর পারিবারিক পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে কিন্তু সময় লাগল না প্রসূনের। সেই তুলনায় ছাত্রী হিসেবে তার সামনে এসে সহজ হয়ে বসতে মণিকার কিছু সময় নিল।

এক সময় তাকে হিড় হিড় করে টেনে এনে সর্বাণী বলল: 'ও যখন আপনার কাছে পড়তে বসতে চায় না, তখন আমাকেই আপনি পড়ান।'

প্রসূন বলল: 'আমি শুনেছি, আপনি ফিলোসফিতে এম. এ.। এতদিন বোনের ভারটা যদি আপনি নিজের হাতে নিতেন, তবে আর মিছামিছি আমাকে এভাবে—'

কথা কেড়ে নিয়ে সর্বাণী বলল: 'বিপদে পড়তে হ'ত না, এই ত? কিন্তু আপনার ঘোষ-মাহিন্দর এ্যাণ্ড কোম্পানীর চাকরিটা বোধ করি তবে কোন মধ্যপ্রদেশ-বাসী পেয়ে যেত! তাতে কি আপনার কিছু সুবিধে হ'ত?'

জবাব দিতে গিয়ে এবারে থামতে হ'ল প্রসূনকে।

মণিকা বলল: 'ট্রেনে আমার ব্যবহারের জন্যে আপনি আমার উপর রাগ করে থাকেন নি ত?'

এবারে মুখে স্মিত হাসি টেনে প্রসূন বলল: 'না, না, রাগ করে থাকব কেন? তুমি ও রকম রেগে না উঠলেই বরং অস্বাভাবিক হ'ত।'

মণিকা বলল: 'আমার রাগটা দিদির কিন্তু ভাল লাগে নি।'

প্রসূন এবারে মনে মনে বলল: তার ভাললাগার জন্যে কি অনুরাগেই ছিল?' হেসে বলল: 'বোধ করি মাসীমারও না, তাই না ঘাটশিলা অবধি মোটামুটি একটি আশ্রয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তা মাসীমার পায়ের ধুলো নেবার সুযোগ পাব ত এক-আধবার?'

সর্বাণী বলল: 'আপনি মণিকে নিয়ে বসুন, আমি গিয়ে মাসীমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

—এমনি করেই এ বাড়ীতে দিন পনেরো যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, টের পেল না প্রসূন। হঠাৎ তার মনে হ'ল—এসে অবধি সুশান্তকে কিছু একটাও খবর না জানিয়ে খুব অন্যায় করে ফেলেছে সে। বলতে গেলে সুশান্তর জন্যেই যে তার এই চাকরি। সুশান্তর কাছে তার ঋণ কি কম? সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় ঘটনা জানিয়ে একটা পোষ্টকার্ড ড্রপ করে দিল সে সুশান্তকে।

দিন চলতে লাগল।...

এক সময় শেখর ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন: 'হাউ ডু ইউ ফিল? কেমন লাগছে এখানে?'

লজ্জানম্রকণ্ঠে প্রসূন বলল: 'মন্দ কি!'

মণিকা এসে বলল: 'মাসীমা আর ঠিক গুণে ছটি দিন আছেন এখানে। যাবার আগে তাঁর ইচ্ছে—রামটেকটা ঘুরে দেখে যান। আপনি চলুন না আমাদের সঙ্গে, মাষ্টারমশাই?'

শেখর ঘোষ বললেন: 'বেশ ত, যাও না প্রসূন, ঘুরে দেখে এস; ভাল লাগবে। নাগপুরে এলে কেউ রামটেক না দেখে যায় না। অনেকে জব্বলপুর আর ধুঁয়াধার অবধি গিয়ে মার্বল রক্স দেখে আসে।'

কৌতূহলবশেই রাজী হয়ে গেল প্রসূন। ছেলেদের মধ্যে সে একা, বাকী সর্বাণী, মণিকা ও মনোরমা।

গিয়ে দু'চোখ জুড়িয়ে গেল প্রসূনের। উঁচু টিলার উপর দিয়ে গাড়ি চলবার রাস্তা চলে গেছে; কাছে-দূরে ধান আর বজরার ক্ষেত। মার্বল রক্সে ঘেরা রামসাগর, আরও উঁচু পাহাড়ের উপর রামচন্দ্র ও কবি কালিদাসের মন্দির। মন্দির আর দীঘি-সাগরে ঘেরা রামটেক। যতক্ষণ না সন্ধ্যা নামল, ছুটোছুটি করে বেড়াল সকলে। মাঝে মাঝে প্রসূন পিছিয়ে পড়লে মনোরমা যত না তাড়া দিলেন, তার চাইতে বেশী তাড়া দিল সর্বাণী; বলল: 'কষ্ট হ'লে বলবেন, আর চড়াই-উৎরাই করব না।'

—'না, না, কষ্ট কেন হবে? ভালই লাগছে। চলুন, এগোই।' বলে আবার চড়াইয়ের পথ ধরল প্রসূন। তার পর রামচন্দ্রের মন্দিরে প্রণাম সেরে মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: 'আপনি চলে যাচ্ছেন জেনে ভাল লাগছে না মাসীমা।'

মনোরমা বললেন: 'তোমাকে এ বাড়ীতে এভাবে পাবার পর আমারও কেবলই মনে হচ্ছে—তোমাকে না দেখলে এরপর আমারও ভাল লাগবে না। কলকাতায় গিয়ে অবিশ্যি যেন আমার ওখানে যেয়ো, যাবার আগে ঠিকানা দিয়ে যাব।'

যা চেয়েছিল প্রসূন, তাই হ'ল।

যথাদিনে তাঁকে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল সর্বাণী আর প্রসূন। গাড়ি চলে গেলে ফাঁকা প্লাটফর্মে কিছুক্ষণ তারা স্থির হয়ে দাঁড়াল। সর্বাণী বলল: 'যাবার আগে মাসীমা আমাকে কি বলে গেল, জানেন? বলে গেল আপনার দিকে লক্ষ্য রাখতে।'

হেসে প্রসূন বলল: 'তা হ'লে এখন থেকে তাই রাখবেন?'

সর্বাণী বলল: 'ভাবছি, যে মাসীমা পুরো ছুটো দিনও আপনাকে কাছে পেকে ভাল করে দেখল না, সে কেমন করে আপনাকে এতখানি স্নেহের চোখে দেখল?'

প্রসূন বলল: 'মা-মাসীদের কাছে দূর বলে কিছু নেই, সবই কাছের। দূরকেও তাঁরা কাছের দৃষ্টি দিয়েই দেখেন।'

—'তাই বুঝি?' বলে মুখ টিপে হেসে সর্বাণী বলল: 'চলুন, এবারে ফিরি।'

—'চলুন।' বলে এবারে প্লাটফর্মের বাইরে পা বাড়াল প্রসূন।

এর পর আরও কিছুকাল কেটে গেল।

এত দিনে হঠাৎ নিজের মধ্যে কেমন যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মণিকা অনুভব করল—প্রসূনের কাছে তার নিজের চাইতে তার দিদি অনেক বেশী কাছের। এ বাড়ীতে থেকে শুধু পড়ান ভিন্ন মণিকাকে আর প্রয়োজন পড়ে না প্রসূনের, কিন্তু সর্বাণীর ব্যবস্থা বা উপস্থিতি ছাড়া প্রসূনের কোন প্রয়োজনই মেটে না। কাছে ডেকে কথা বলতেও দিদি, কোন কাজে বেরোতেও দিদি। দিদি এতখানি আচ্ছন্ন করে আছে তার মাষ্টারমশাইকে যে, মণিকার সেখানে নতুন করে প্রবেশের পথ নেই। কিন্তু কেন নেই? কার জন্যে বাবা এখানে আলাদা এ্যাকোমডেশন দিয়েছেন মাষ্টারমশাইকে? কার জন্যে?

হঠাৎ এক সময় নিজের পড়ার টেবল ছেড়ে উঠে গিয়ে দাঁড়াল সে সর্বাণীর ঘরে, বলল: 'তুমি মাষ্টারমশাইকে ভালবাস, খুব ভালবাস, ভীষণ ভালবাস, তাই না দিদি?'

নিজের মনে বসে বসে কি যেন একটা করছিল সর্বাণী, কথা শুনে বোনের মুখের দিকে চোখ দুটোকে তুলে বলল সে।—'কি করে বুঝলি?'

মণিকা বলল: 'বুঝেছি তোমার চোখ দেখে, তোমার প্রতিদিনের আচরণ দেখে। কিন্তু প্রসূনবাবু ত আমার মাষ্টারমশাই, আমার জন্যেই বাবা তাঁকে এখানে এনেছেন। তাঁকে তুমি ভালবাসবার কে?'

এবারে আরও কিছুটা সোজা হয়ে উঠে বলল সর্বাণী, বলল: 'মণি, এ তুই কি বলছিস মণি?'

—'যা ঘটছে, যা তুমি ঘটিয়েছ, তাই বলছি। কিন্তু তুমি তাঁকে এভাবে কেড়ে নেবে, তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।' বলে এক মুহূর্তও আর দাঁড়াল না মণিকা, ছুটে পুনরায় নিজের পড়ার টেবিলে এসে বইগুলোকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে উপুর হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ভালবাসবার মত তারই কি মন নেই, না কারুকে ভালবাসার মত তার বয়স হয় নি?

পরদিন বেড়াতে যাবার নাম করে প্রসূনকে গিয়ে সে বলল: 'আজ আর পড়তে মন বসছে না, চলুন আজ আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন মাষ্টারমশাই।'

প্রসূন বলল: 'তোমার বাবা বকবেন না?'

এবারে সহসা নিজের মধ্যে কেমন যেন অসহনীয় হয়ে উঠল মণিকা, বলল: 'কেন, এই যে দিদি আর আপনি দু'জনে দু'জনকে এত ভালবাসেন, তাতে ত কই বাবা বকেন না, আর আমাকে নিয়ে—'

বাধা দিয়ে প্রসূন বলল: 'দিদি সম্পর্কে বোধ করি তুমি তোমার নিজের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ মণিকা! তুমি না বুদ্ধিমতী!'

—'কিন্তু মন বলেও আমার একটা পদার্থ আছে। সেই মনটাকে ইচ্ছে করলেই আপনি ডিঙিয়ে যেতে পারেন না।' বলে একটুকালও আর অপেক্ষা না করে কান্নার বেগ সামলাতে সামলাতে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল মণিকা।

অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল প্রসূন। ভালবাসার জগতে এ আজ তার কোন্ খেলা সুরু হ'ল? আর এ খেলার পরিণামই বা কি?

কিন্তু মনে মনে কিছু একটা পরিণামের রেখা নিজে থেকেই ইতিমধ্যে এঁকে নিয়েছিল সর্বাণী। বোনকে তার ভয় নয়, তার লজ্জা। এ সংসারের বড় মেয়ে হয়ে জন্মে ছোট বোনের কাছে সে নির্লজ্জ হবে কেমন করে? জীবনে এতদিনে সে একটি পুরুষকেই ভালবাসতে পেরেছিল, সে প্রসূন। কিন্তু নিজের দিকে লক্ষ্য করে দেখল—ভাগ্য তার প্রসন্ন নয়। তাই বিলাসপুর গার্লস কলেজের যে প্রফেসারীর চাকরিটা ইতিপূর্বে সে হাতে পেয়েও নেয় নি, এবারে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করে একদিন বিলাসপুরেই রওনা হয়ে পড়ল সর্বাণী। যাবার আগে মণিকাকে কাছে ডেকে শুধু বলল: 'প্রসূনবাবু তোরই রইলেন, আমি চললাম।'

কিন্তু সত্যিই কি প্রসূনকে পেল মণিকা?

সেতারের যে তারটা বাজলে তবে সব তার বাজে, সেই তারটা যেদিন থেকে এ বাড়ীতে বাজা বন্ধ হ'ল, সেদিন

থেকে প্রসূন বুঝি নিজেকে আর নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না।

মণিকা বলল: 'দিদি চলে গেছে, তাই বুঝি আপনি এমন গোমরামুখ হয়েছেন? কেন, আমি কি কেউ নই, আমাকে কি একটুও ভাল লাগে না আপনার?'

—'কেন লাগবে না!' প্রসূন বলল: 'চল, কাল তোমাকে নিয়ে অনেক ঘুরে বেড়াতে যাব।'

খুশীতে নিজের মধ্যে বুঝি একবার নেচে উঠল মণিকা।

কিন্তু পরের দিন যখন সে প্রসূনের ঘরে এসে দাঁড়াল, দেখল ঘর ফাঁকা, প্রসূন নেই। কোথাও খোঁজ করেও তাকে পাওয়া গেল না।

শেখর ঘোষ ব্যাপারটা কিছুই জানতেন না। এবারে খোঁজ নিতে গিয়ে নিজের টেবিলেই একটা খামে মোড়া চিঠি পেলেন প্রসূনের। লিখেছে—'আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে চাকরি দিয়েছিলেন, সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নেই। কিন্তু মণিকাকে পড়াবার দায়িত্ব আমি আ নিতে পারছি না, তাই চলে যাচ্ছি। অফিসের চাক'রটা আর পোষাবে না মনে করে এই সঙ্গেই রেজিগনেশন লেটা গেঁথে দিলাম। আমার যা-কিছু অপরাধ ক্ষমা করবেন।'

চিঠিটা মণিকার কাছেও আর লুকোনো রইল না। এ পর সে যে ভাল করে বাবার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবে, সে সুযোগ আর হ'ল না। বিস্ময়ে শেখর ঘোষে চোখ দুটো তখন স্থির হয়ে আছে। চোখের পাতা একটু নড়ছে না।

ধীরে ধীরে তাঁর সামনে থেকে প্রথমে ঘরের চৌকাঠ, তার পর চৌকাঠ পেরিয়ে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল মণিকা।

এ্যামেচার পুরুত

শ্রীপ্রভাতকুমার মিত্র

মানুষ কখনো একক ও নিরবচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে পারে না। এই একাকিত্ব ও নিরবচ্ছিন্নতা দূর করার জন্যেই তাকে সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে হয়। জীবনে নিরবচ্ছিন্নতার দুঃসহ জ্বালা থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্যেই উৎসব, অনুষ্ঠানের সৃষ্টি। প্রত্যেক ধর্মের, প্রত্যেক জাতেরই বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান আছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি অনেক সময় জাতীয় উৎসবের পর্যায়ে পড়ে। বাংলার ও বাঙালীর জীবনে শারদোৎসব বা দুর্গোৎসব জাতীয় উৎসব বলেই পরিচিত। যদিও বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ, তথাপি সব পার্বণ বা উৎসবের গুরুত্ব সমান নয়। এখানে এক একটি পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসব-অনুষ্ঠান হয়। দুর্গাপুজোর সঙ্গে তারা-পুজোর পার্থক্য শুধু আয়োজনেই নয়, বৈশিষ্ট্যেও। যদিও প্রকারান্তরে উদ্দেশ্য আমাদের একই। উভয় পুজোর ভেতর দিয়ে আমরা মহাশক্তিরই আরাধনা করি। মহাশক্তিই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে আমাদের কাছে প্রকটিত হন। তিনি কখনো শ্যামা, কখনো ছিন্নমস্তা, আবার কখনো অসুরনাশিনী দুর্গা। বর্তমান প্রসঙ্গে এই ধর্মীয় উৎসবের কোন অন্তর্গভীর আলোচনা বা আধ্যাত্মিক তথ্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ না করে উৎসব আয়োজনের অপর দিকটা অর্থাৎ হাল্কা দিকটা, যেখানে আরাধনাকে উপলক্ষ্য করে অনুষ্ঠানের বাহুল্যটাই চোখে পড়ে, সেই সম্বন্ধেই দু-চার কথা বলব। এরই সঙ্গে এবারের দুর্গা ও কালী প্রতিমার কয়েকটা ছবি প্রকাশিত হ'ল।

পণ্ডিতদের মতে এবার দেবীর আগমন ও গমন যাতেই হয়ে থাক না কেন আমরা দেখেছি দেবীর এবার টেম্পোতে আগমন ও বিচিত্র বাদ্যসম্ভারে শোভাযাত্রায় শোভিত করে নদীতে গমন। ফল—অনাভাব, মহামারী ও ব্ল্যাক আউট। এবার দেবীর আগমন সম্বন্ধেও অনেক সন্দেহ ছিল। শেষ পর্যন্ত দেবী সপরিবারে এসে পৌঁছতে পারবেন কি না বা এলেও ঠিকমত রাস্তা চিনে নিজ নিজ পুজোমণ্ডপে এসে পৌঁছতে পারবেন কি না। কারণ, একে যুদ্ধের দৌলতে

শারদা মূর্তিতে শারদীয়া উৎসব
বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন

মৈত্রী সঙ্ঘ—কালীঘাট

মিলনী সঙ্ঘ—ঠাকুর পুকুর

দেশে ব্ল্যাক আউট তার পৌর সংস্থার দয়ায় রাস্তায় স্থানে স্থানে ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের গর্ত, যার কোন একটার কবলে পড়লেই পুজোমণ্ডপের পরিবর্তে হাসপাতালের বিছানায় হওয়া অসম্ভব ছিল না। পথে-ঘাটে অবশ্য সিভিল ডিফেন্সের লোকেরা পায়জামা, বুশশার্ট মাথায় প্লাস্টিকের হেলমেট ও হাতে টর্চ নিয়ে অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রয়োজন হ'লে মাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মা হয়ত সপরিবারে এসে পৌঁছতে পারতেন না, কারণ গণেশের যা ছিরি তাতে ছত্রী সৈন্য বলে ভুল করার সম্ভাবনা যে একেবারে ছিল না তা নয়। এদিকে কার্তিকের আবার লড়াই-এর শখ আছে বলে সকলেই জানেন, ফলে তাঁর পক্ষেও এমার্জেন্সী কমিশনের হাত এড়িয়ে ভাল ছেলের মতন গুটি গুটি মায়ের সঙ্গে এসে পৌঁছতে পারতেন বলে মনে হয় না, আর লক্ষ্মী সরস্বতীকে হয়ত ফার্স্ট এইড ট্রেনিং-এর জন্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ত। শেষ পর্যন্ত মাকে হয়ত শুধু বাহনটাকে সম্বল করেই বাপের বাড়ী আসতে হ'ত। যাই হোক, ভালয় ভালয় পুজোর ঠিক কয়েকদিন আগেই ব্ল্যাক আউট উঠে যাওয়াতে মায়ের বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি, তবে পাড়ার সার্বজনীন পুজোর উদ্যোক্তাদের বেশ একটু ফাঁপরে পড়তে হয়েছিল। পুজোর ঠিক আগেই যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় এবং বিরতির কোন সম্ভাবনা না থাকায় সার্বজনীন পুজোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত পাড়ার Ever Green Professional Organiser-দের একান্ত ইচ্ছা এবং কেবল মাত্র তাঁদের will force-এর জন্যেই কালো মেঘ কেটে গিয়ে পরিষ্কার দিনের আলো দেখা দিল। উদ্যোক্তারা আবার সব উদ্যমে লেগে গেলেন। পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তোলা, প্যাণ্ডেল বাঁধা সবই সুরু হ'ল। ব্ল্যাক আউটের সময় যে সব ওয়ার্ডেনদের ভয়ে কথা বলা যেত না, বাড়ীর কোন রন্ধ্র দিয়ে একটু আলো বেরুলে যাদের ধমকানির চোটে প্রাণ যেত, আজ তারাই চাঁদার জন্যে অনুনয়-বিনয় করছে। দেখলে বিশ্বাসই হয় না যে এরাই দু'দিন আগে ধমকে বলেছে, "এই যে মশাই, কেন আলো বেরুচ্ছে, দাঁড়ান মজা দেখাচ্ছি।" বলা বাহুল্য এ মজার চোটে আপনার প্রাণ অতিষ্ঠ। যাইহোক সময় অল্প হলেও চাঁদাপত্তর সব ঠিকই উঠল। এবার গোড়া থেকেই অন্যান্য খরচ-খরচা অন্যবারের তুলনায় কমিয়ে ফেলে অধিকাংশ উদ্যোক্তাই চাঁদার টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দেবেন। কাজেই চাঁদার সঙ্গে প্রতিরক্ষার টাকাটাও পাড়াপড়শির কাছ থেকে তুলে নেওয়া হ'ল। পুজোর খরচ-খরচাও কমিয়ে ফেলা হ'ল, প্রতিমার বদলে শুধু বাহন-গুলিকে এনেই মণ্ডপে বসানো হ'ল। উদ্যোক্তারা বললেন,

দর্জিপাড়া কাশীঘোষ লেন
সার্বজনীন শ্যামাপূজা

'খেয়ালী সঙ্ঘ' (সপ্তবিংশতি বর্ষ)
হরমোহন ঘোষ লেন, বেলিয়াঘাটা
কলিকাতা-১০

বেহালা নন্দনা পার্কের শ্যামাপূজা

ঠাকুর-দেবতারা অতীত থেকেই পুজো নিতে ভালোবাসেন, তাই তাঁদের আর না এনে প্রতিনিধি হিসেবে বাহনগুলোকে এনেছি, তাতে কাজও হ'ল, খরচও কমানো গেল। মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই কারণ আবার কবে ব্ল্যাক-আউট হবে বলা যায় না ত। অবশ্য এখানে বলতে আপত্তি নেই যে, কিছু খাতে খরচ কমলেও কিছু কিছু খাতে খরচ অনেক বেড়ে গেল। মাইক ও ব্যাণ্ড-পার্টির যথারীতি বায়না হ'ল। সপ্তমীর দিন ভোরবেলা মাইকে শুনলাম একটা গান হচ্ছে, যার সারমর্ম এই—প্রেমিক প্রেমিকাকে টেলিফোন করছে—'হ্যালো কে খুঁচি'। তারপরই গান "তোমার বাবাকে ধরব, তবু তোমায় বিয়ে করব।" প্রেমিকা বললেন, "না-না-না ওকথা বোলো না, বোলোনা বাবা ভীষণ বদরাগী", সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকের উত্তর—"কি বললে তোমার বাবা বদরাগী। তবে জেনে রেখো আমিও লালাবাজারের দাগী"। এরপর অবশ্য আরও অনেকগুলো কলি ছিল, আমি শুধু একটু নমুনা দিলাম। সপ্তমীর ২ দিন, অষ্টমী ও নবমী ত কাটল ঐ সকল সব গান শুনে। শেষ পর্যন্ত বিজয়া দশমী এল। সকালবেলাই বিসর্জনের আয়োজন হ'তে লাগল। সন্ধ্যেবেলা দেখি গ্যাসের আলো আর ব্যাগপাইপের বাজনার চোটে পাড়া গম গম করতে লাগল। পাড়ার ছেলেরা ড্রেন-পাইপ প্যান্ট পরে ব্যাগপাইপের জগঝম্প বাজনার সঙ্গে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে আর হাত-পা ছুঁড়ে সে কি কদাকার নাচ! শুনলাম, ওটা না কি 'জানোয়ার' ড্যান্স, নতুন বেরিয়েছে। সত্যি, নাচের সঙ্গে নামের মিল রেখে তারিফ করতে হয়। এক পুজো কাটতে না কাটতে আর এক পুজো হাজির। দুর্গাপুজো কাটতে না কাটতেই কালীপুজোর প্রস্তুতি শুরু। দুর্গাপুজোর বাজনার জয়, কালীপুজোর বাজীর জয়। ভরসা এই যে, কালীপুজো একদিনের ব্যাপার কিন্তু আজকাল কোন কিছুর হাত থেকেই সহজে রেহাই পাওয়া যায় না। পাজির দৌলতে কালীপুজোও একদিনের গণ্ডি পেরিয়ে দু'দিনের পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই বাজী ফোটানোর মেয়াদও দু'দিন পেরিয়ে চার দিনে পৌঁছিয়েছে। পাড়ার একটু বয়স্ক ছোকরারা যদিও কথা বললে শোনে কিন্তু কুচে কুচে অ্যাটমিরারা বড় সাংঘাতিক। কথা শোনা ওদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। দুষ্ট লোকের আঙুলের ফাঁকে পটকা রেখে আগুন দেবার হুলাহল ওদের এখন থেকেই, বড় হ'লে বোধ

হয় রাস্তার লোককে ধরে বগলে দো-দমা চেপে ধরে আগুন দিয়ে দেবে।

বাড়ীর ঠিক সামনেই বিরাট মণ্ডপ বেঁধে প্রতিমারই একটা পুজোর ব্যবস্থা হয়, এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি তবে বিশেষ অসুবিধের ভেতর পুজোর আয়োজন করায় কয়েকটা ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের অনেক অসুবিধেয় পড়তে হয়। প্রথমত, পুরোহিত সমস্যা। আধুনিক কালে আর কেউ পুরোহিতের কাজকে পেশা বলে গ্রহণ করতে চাইছেন না। পুরোহিতের ছেলে এখন ডাক্তারী অথবা ইঞ্জিনীয়ারিং-এর দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে, নিদেন পক্ষে ইস্কুল মাষ্টারী বা অফিসের কেরাণীর পদও গ্রহণ করছে কিন্তু পুরোহিতের পেশা কেউই গ্রহণ করছেন না। বর্তমানে যাঁরা এ কাজে আসছে তাঁরা অধিকাংশই এ্যামেচার পুরুত। এ্যামেচার মা ভাববেন না যে তাঁরা বিনে দক্ষিণেয় পুজো করে। দক্ষি তাঁরা ঠিকই নেয়, তার উপরিও পাওয়া যাচ্ছে। ত এ্যামেচার এই অর্থে যে এটা তাঁদের পেশা নয় আমাদের বাড়ীর সামনে যে পুজোটা হয় তার পুরোহিত এ্যামেচারের পর্যায়ে পড়ে। সকলেই জানেন যে কালী পুজো রাত্তিরের পুজো, এ পুজো করতে গেলে সমস্ত দি উপোস করে থাকতে হয়। এ পুরোহিতও সকালটা অনে কষ্টে উপবাসে কাটান কিন্তু সন্ধ্যের সময় অবস্থা চরমে ওঠে পুজোমণ্ডপের কাছেই এক রেস্তোরা। ছিল, ওখান থে

সালকিয়া "অগ্রদূত" পরিচালিত সার্বজনীন শক্তিপূজার প্রতিমা

(২)

ন'মাসী কি একটা সেলাই করছিল। ছোটমামাকে দেখে ছুটে উঠে এল। পায়ের মলের জোর আওয়াজ শুনে সে চমকে উঠল, ও কি গো ছোট বৌদি? পায়ের আওয়াজ যে সদরে পৌঁছল! মেজকর্তা শুনলে যে ঢেঁটোর কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতবে তোমায় তখন দেখো। বলে সুপুরির চুবড়িটা হাতে ন'মাসীকে বলল তাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে সুপুরি ক'টা কেটে রেখ—পিসীমা বলেছে। মেজবাবুর পানের সুপুরি ফুরিয়েছে, এক্ষুণি পান সাজতে বসবে মেজবৌমা। কাতর চোখে ছোটমামার দিকে চেয়ে ন'মাসী বলে, কখন এলে ছোটদা? বাবা, মা ভাল আছে? ছোটমামা ন'মাসীর মাথায় অভ্যেস মত হাত দিতে গিয়ে হাতে গয়নার খোঁচা খায়। মাথাভর্তি টায়রা, ক্লিপ, পাশ চিরুণী, খোঁপায় সোনার জাল। তার মধ্যে ন'মাসীর মাথা অবধি হাত পৌঁছনো কঠিন। বলে, কেমন আছিস বুড়ী? উত্ত পায় না। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে আঁচলটা মুখে জড়ি ন'মাসী সুপুরি কাটছে। ঝি বলে, কি করে কথা বল বাবু? থুতু ছিটকে সব সুপুরি যে এঁটো হয়ে যাবে তাম্বুর খাবে ত? বৌ-এর মুখবন্ধ করার এই অভিন কল্পিতে অবাক হয়ে যায় ছোটমামা। ঝি দাঁড়িয়ে থাকে সামনে। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে বলে, এবার যা কেমন? ভালো আছিস ও? ম্লান মুখে মাথা নাড় ন'মাসী। ফেরার পথে ছোটমামার কেবল মনে হ আলিপুরের জেলের ছবি। শুধু খাওয়া আর খাওয় মানুষের মন নেই, হৃদয় নেই, শুধু বাড়ীর পুরুষদের পে ভরানোর তদ্বিরে অতগুলো প্রাণী যেন হিমসিম খাচ্ছে

মনে পড়ে মেজমামীর বাপের বাড়ীর কথা। সে আবা এক অদ্ভুত বাড়ী। মস্ত বড় লোক, সাহেব কোম্পানী মুৎসুদ্দির বাড়ী। কিন্তু বাড়ীতে বীভৎস কাণ্ড! ভাবলে পায়ের কাঁটা শিউরে ওঠে। আপিস থেকে বাবুরা সটা চলে যায় হোটেলে। চপ-কাটলেটের সঙ্গে প্রচুর ম খায়। খেয়ে খেয়ে বেঁহুশ হয়ে পড়লে হোটেলের বয় আর গাড়ীর কচুয়ান সহিসে মিলে পাঁজাকোলা ক তাদের গাড়ীতে তুলে দেয়। বাড়ীর ছোট ছেলেরা ব বাপ কাকার সঙ্গে মদ খাওয়া শিখতে যায়। প্রথ বিয়ার থেকে ধাপে ধাপে উঠবে। সারারাত গিন্নী হিমসিম খেয়ে যেত বমি পরিষ্কার করতে করতে ভোরবেলা কর্তারা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। জাগতে জাগতে ন'টা। তারপর গঙ্গাস্নান আহ্নিক করে যখ খেতে যেতেন ষোড়শোপাচারে খাবার চাই। মুখ থেকে পারেস। যদি পান থেকে চুন খসত—গিন্নীদে উঠতে বেলা হওয়ার রুটিকম্বিত রান্নার দোষ বলে কুড়ুল হাতে কর্তারা রান্নাঘরে ধাওয়া করতেন। কুড়ুল দিয়ে উনুন ভেঙে রান্নাঘরকে শৌচাগার করে তাঁরা না খে অফিস চলে যেতেন। আর ফিরতেন কচুয়ানের ঘাড়ে চেপে। সেই বাড়ীর মেয়ে মেজমামী। সামান্য ত্রুটিতে কি ভয়ই পেত। একদিন জল গড়াতে গিয়ে মাটি কুঁজো ভেঙে ফেলেছিলেন তিনি। তারপর বাড়ীময় খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষে দেখা গেল বৌ দরজা পাশে লুকিয়ে আছে। জা-কে দেখে কেঁদে বলেছিল, কি হবে দিদি? আমি যে কলসী ভেঙে ফেলেছি। যদি জানতে পেরে আমায় আপনার দেওর মারে? বাড়ীম

হাসাহাসি পড়ে গিয়েছিল আর মেজমামার কি লজ্জা ওকথা শুনে! বড় মামীমা যখন বললে, তাই না কি ঠাকুরপো? হাতের কাছে পেলে চড়টা-চাপড়টা চালাও না কি?' দাঁড়াও, আজ বাবাকে বলে দেব। দাদা-মশাই ছিলেন খাঁটি মানুষ। মানুষ যে মানুষের ওপর নির্দয় হতে পারে একথাটা যেন বুঝতেই পারতেন না। সত্যিকারের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। সেই কাঠের খড়ম আর ভসর কাপড়-পরা তাঁর ছবি আজও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে। সবাই তাঁকে ডাকত শাস্ত্রী-মশাই বলে। পাড়ায় কোন বাদ-বিসম্বাদ হলে দাদা-মশায়ের বিচার সবাই শ্রদ্ধাভরে মেনে নিতেন। ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। পাঁচ মেয়ের মধ্যে ন'মাসী ছিল তাঁর প্রতিচ্ছবি। ঘোর-প্যাঁচ কিছু বোঝার মত মন তার ছিল না। সে ছিল সরলতার আনন্দ-প্রতিমা। সেই বহুসন্তানবতী মেয়ের পক্ষে এ বাড়ীর হালচাল বোঝা সহজ নয়।

ন'মাসীর সেজ ভাসুর ছিলেন আবার এক খেয়ালী মানুষ। তাঁর ঘর যেন মিউজিয়াম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো টেবিল ছিল তাঁর। তাতে নেই হেন জিনিস নেই। বিরাট মোটা ছিলেন তিনি। তাই চেয়ারে বসে ঘরের কোণ অবধি আয়ত্ত করবার নানা কলকৌশল রপ্ত করেছিলেন তিনি। যে কাছে যেত তাকেই দেখাতেন। যেমন প্রকাণ্ড চুম্বক দেওয়া একটা লাঠি ছিল তাঁর ঘরের কোণে। একটি আলপিন পড়ে থাকলেও চেয়ার থেকে না উঠে তিনি সেটি কুড়ুতে পারতেন। টেবিলে নানা রং-এর কালিভরা নানা জাতের ফাউনটেন পেন এমনি আরও বিস্ময়কর বস্তু ছিল। লেখারই নানা প্রকার সাজ-সরঞ্জাম। আমি তখন খুবই ছোট, তবুও আমার মনে হয়েছিল আলপিন না হয় কুড়ুলেন কিন্তু দু'পাতা লিখতে পারবেন কি? পিন-আপ করবেন কি করে?

সেবার দার্জিলিং গিয়ে দেখা ন'মাসীর সেজ জা'র সঙ্গে। আমি রোজই বেড়াতে যাই। একদিন তাঁর বাড়ী গিয়ে বললাম, কই, আপনাকে ত বেড়াতে দেখি না? তিনি বললেন, বেরুব কি করে বলো? রোজ তিনশো পান সাজতে হয়, সুপুরি কাটতেই সময় যায়। আমি বললাম, ঝিয়েদের দিয়ে সেন না কেন? তিনি বললেন, ওর হাতে কিনকিনে বাত। তা ছাড়া সুপুরি বাড়ীর বৌরা কাটে, ওদের কাটবার কথা নয়। বললাম, কাটা সুপুরি আনান না কেন? বললেন, রাজবাড়ীতে ওটা চলে না। একজন ঝি দেখলাম জানলাবেটে বড়ি দিচ্ছে। আমি বললাম, সর্বনাশ! এই ঘোর বর্ষায় বড়ি শুকুবে কিসে? সে বলল, কেন ইষ্টোভে শুকুব? তার ওপর সেই সর্বনেশে পিসশাশুড়ী সঙ্গে এসেছেন বৌকে সামলাতে। যাতে বিদেশে এসে স্বাধীনতা পেয়ে বৌ কোন বেচাল না করে ফেলে। একদিনও ন'মাসীর জাকে বেড়াতে দেখলাম না। বুঝলাম না এ বেড়াতে আসার অর্থ কি? প্রায়ই দেখতাম মোসাহেব-পরিবৃত হয়ে ন'মাসীর ভাসুর বেড়াতে যাচ্ছেন। আবার দেখতাম রিকশায় বসে পিসীমা সেই বড়ি-দেয়া সোহাগিনী দাসীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, বাড়ীতে শুধু বন্দিনী সীতা। একদিন শুধু থাকতে না পেরে জিগ্যেস করে-ছিলাম, আপনাদের পিসিমাকে আনলেন না কেন? ম্লান-মুখে ন'মাসীর মেজজা বলেছিলেন, আমি কি আনা-না-আনার মালিক? তা ছাড়া ঝোলের আলু-ডালনার আলু ভাগ করে দেবে কে তা হ'লে? ন'মাসীর মুখে শুনেছি ঐ আলু ভাগ করে দেওয়া নাকি ভীষণ ব্যাপার। মেজকর্তার সঙ্গে পিসীমারও না কি মাঝে মাঝে লাঠালাঠি লেগে যেত। কিন্তু আলু ভাগ? পিসীমা না থাকলে ডালনার আলু, ভাজার আলু, চচ্চড়ির আলু, সুক্তোর আলু গোছ করে কোটার ভঙ্গি বলে দেবে কে? আমার মাথায় প্রায়ই দুষ্টুবুদ্ধি আসত। দেখি না একবার ভাজার আলু ডালনায় আর ঝোলের আলু চচ্চড়িতে দিয়ে। কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয় তাতে? ভাজার আলুই কি সহজ? একটা বড় নৈনিতাল আলু চার চাকা কি পাঁচ চাকা হবে। এককড়া ঘিয়ে ছাঁকিয়ে ভাজলে তবে তা সেদ্ধ হবে। সেই হ'ল লুচির ভাজা। আবার ভাতের সঙ্গে যে আলু ভাজা, তা হবে কাগজের মত পাতলা কলুদ-নুন মাখিয়ে সর্ষের তেলে ভাজা হবে কড়কড়ে করে। এই যেমন একালে পটেটো চীপ্‌স তোমরা খাও। কেজানে ওদের বাড়ী কি পিসীমা আছে? নইলে অমন আলু কোটে কে? আমার নাতনী সেদিন বলছিল ও-আলু কোটার নাকি যন্ত্র বেরিয়েছে। তবেও বা, এই যন্ত্রগুলি যদি আগে বেরুত। অনেক সংসার ঐ দজ্জাল পিসীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেত। আবার ঝোলের আলু হ'ল লম্বা ভাবে চার টুকরো, ডালনার আলু ডুমো ডুমো আট টুকরা, আর সুক্তর আলু সরু সরু ফিরে ফিরে কোটা। এখন কথাইত দাও চাকরের হাতে তোমরা এক রকমের আলুই খাচ্ছ। গলায় কি বাধে না? ঐ তরকারি কোটা নিয়ে কি কাণ্ডই হত। তখন কত বৌ কেঁদে বালিশ ভেজাত কত বৌ কেঁদে অনাহারে থাকত তার খোঁজ কে রাখে?

একদিনের কথা মনে পড়ে, ন'মাসীর বাড়ী দুর্গোৎসব হবে। ওরা আবার বৈষ্ণব কি না? সব নিরামিষ ভোগ,

অথচ ছুঁড়িরা আসছে। ঝাঁক দেখার দরকার। এঁচড়ের পাহাড় এসেছে। নতুন ক'টি বৌ কুটতে বসেছে এঁচড়। তোমরা ভাবছ অত সুন্দরী বৌরা হাতে এঁচড়ের কষ লাগলে দাগ তুলবে কি করে? তখন ওসব ভাবনা ছিল না বরদের। ঐ কষমাখা আঙুলে কমল হাতের রক্তচূড় পরিয়ে সাজিয়ে নিত তারা। হবে না কেন, অত পান সাজার কলেই ত তাদের নখ পর্যন্ত ক্ষয়ে, বেঁকে-চুরে যেত। তবু কি পান না সাজলে উপায় আছে? না ঝি দিয়ে পান সাজানো চলত? অথচ ঐসব বড় বড় জমিদার বাড়ীতে যা পান খরচ হত, আজকালকার দিন হ'লে ওরই একটা .কোণে একটা পানের দোকান বসে যেত অনায়াসে। থাক ওসব কথা। যা বলছিলাম—সেই এঁচড় কোটার বিপত্তি বৌরা ভেবেছে—অত এঁচড় কুটতে হবে, তাড়াতাড়ি কুটে রাখাই ভালো। তাই দু'দিনে তাকে কুটে রেখেছে ডালনার মতন করে। ব্যস্‌! আর যায় কোথা! পিসীমা ঝাঁপিয়ে পড়লেন বীর-বিক্রমে। বললেন, ও চোখখাগিরা! এ কি করেছিস? আজ হবে এঁচড়ের দমপোক্ত! এ যে ডালনার মত কুচিয়ে রেখেছ?

বাড়ীময় হৈ চৈ পড়ে গেল, প্রায় বিপদ্‌জনক সাংঘাতিক ঘটনার মত। আজকের দিনে যদি পিসীমার মাথার ঠিক না থাকে তবে সব সামলাবে কে? এখনও আমি তাই ভাবি পিসীমার মাথাটা ওরা আরকে ভিজিয়ে রাখল না কেন? এখন সংসার চলছে কি ক'রে? ঐ ক'শিশি আচার, ক'শিশি বড়ি আমসত্ত্ব, আর কাঁথা করে তাঁরা যে বীর বিক্রমে ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী নিয়ে সারাজীবন বাড়ীর গৌরবের বিজ্ঞাপিকা হয়ে রাজত্ব করে গেলেন, তা ত আজ সরোজ নলিনী মহিলা সমিতি অনায়াসে জোগান দিচ্ছে।

(৩)

সমানে ব'কে যাচ্ছেন পিসীমা। "বারে বারে মহিমকে বললাম ঐ টোল-তোকুলাদের ঘরের মেয়ে আনিস নি। সে ত শুনলে না? কোথায় টুলো পণ্ডিত, কোথায় ঘটিচোরা ভিখুটি তাদের ঘর থেকে মেয়ে এনে তুলল রাজবাড়ীতে। হ'ল তেমনি। দিলে বংশের মুখে চুনকালি! ও'দের বাড়া জন্মে পাত পড়েছে কারুর? ওরা কি জানে অতিথজনের মান করতে? আর এই সব ছুঁড়িরা ঐ এঁচড় মুখে দিয়ে ছি ছি করবে না? শ্বশুর-হাসিতে দেশ ভরে যাবে না?" ঘোমটার আড়ালে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ে পদ্মনয়নাদের। কত পরীক্ষায় পাশ করে রূপের জোরে যারা এ বাড়ীর বৌ-পদ পেয়েছে, তারা ঠাকুরকে ডাকে, বল মা ঠাকুর ে মন্তরটা যাতে ছোট এঁচড় জুড়ে বড় করা যা বড় টুকরো থাকলে ছোট করে কুটত তারা। কি ছোটকে ত আঠা দিয়ে বড় করা যাবে না জুড়ে। সদি ঠাকুর রক্ষে করলেন তাদের। তবে স্বর্গের ঠাকুর ন ভিয়েনের ঠাকুর। সেই হরিচরণ ঠাকুর এগিয়ে এ পিসীমাকে বলল, অ খুকী, দাও না কুচনো এঁচড়। সব ে করে ডালিকাবাব বা কোপ্তা ক'রে দোব তা হ'লেই হবে। কর্তাবাবু থাকতে ডালিকাবাবই ত হ'ত বাপের নামের জপে বা বাপের আমলের বুড়ো ঠাকুে জপে বা খুকী নামের মাহাত্ম্যে জানি না, পিসীর মন গা নামল। পিসী বলল, তা না হয় হ'ল কিন্তু ওদেরও সহবৎ শিখতে হবে। না শেখে আমার বাপ-ঠাকুরের মুখে চুনকালি দেবে ওরা?

ন'মাসার শাশুড়ীও কিন্তু নীরব ছিলেন না। ত শিল্প-কলা বাড়ীময় ছড়ানো। ঐ যে দেয়ালে পেঁচ ছবি টাঙানো, সে কিন্তু পেঁচা নয়—শেয়াল। তল বর্ণমালার অমূল্য বাণী লেখা—ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ও টক ডাহাতা বাড়ীময় কার্পেটে চৌকো চৌকো মুখের ে ঠাকুরের ছবি যার প্রত্যেকটা ছবি। প্রত্যেক ঘে টাঙানো সবই ন'মাসার শাশুড়ীর ঐ যে কালিয়দমনে ছবি দেখে মনে হচ্ছে পাহাড়ের ওপর শ্রীকৃষ্ণ গ চরাচ্ছেন, তা কিন্তু নয়। সাপের মাথায় নাচছেন তিনি পাছে আমাদের মত নির্বোধরা বুঝতে না পারে তা তলায় ত রকমের পশমে কালিয় দমন লেখা। এ রক শিল্প তাঁর বাড়ী জুড়ে। মাথার বালিশে লেখা, "যা পাখা বোলো তারে সে যেন ভোলে না মোরে।" এ প যদি তোমরা তার ন'মাসার শাশুড়ীর লেখা—তবে ছু হবে। তখনকার দিনে ত মেয়েদের ইস্কুলে পড়া রেওয়াজ ছিল না, ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা শুধু এর কথা ও কাছে—ওর কথা এর কাছে লাগিয়ে দিন কাটাত সে ছড়া শুধু কথা শোনানর ছড়া। যেমন বৌদিকে বল হল "কাছে শোয় কানে কয় তার কথা না রদ হয় কিংবা,—"জানি না শুনি না দেইক ঘরে

এ তিন জনকে দেবতা হারে"

কাজেই সেই পেট থেকে ন' বছর গোণা আসলে আ বছরের বৌ-এর জানিনা বলার উপায় রইল না। আ যত কষ্টই শাশুড়ী দিক না, স্বামীকে কিছু বলার জন্য তারা পেত না। তাছাড়া দেয়ালে টাঙানো

"পিতুরপ্যাধিকা মাতা গর্ভধারিণী পোষণাৎ"

বাক্যটি সর্বদা স্বামীদের ওপর তার অমোঘ ক্ষমতা প্রয়োগ করত। প্রায় সব স্বামীই ফুলশয্যার রাতে তার স্ত্রীকে বোলত "তুমি আমার মাকে সুখী করো।" আর সেই ব্যর্থ প্রয়াসে বহু মেয়ের জীবন শেষ হয়ে যেত। যত ভাল জিনিষই করো না কেন মার মত হয় নি বলে স্ত্রীর সব আনন্দকে ধরাশায়ী করবার একটা বীরত্বজনক আনন্দ স্বামীরা বড় একটা হাতছাড়া করতেন না।

"সংসার সাম্রাজ্য মাঝে অন্তঃপুর রাজধানী,
সেখানের সিংহাসনে রমণী তাহার রাণী।
সংসার সুখের হয় স্বরগেতে পরিণত,
নারী যদি কায়মনে পালেন রমণী ব্রত।"

এখনকার মেয়েরা হলে ঠিক বলত রমণী ব্রত কাকে বলে? সত্যি কথা বলতে কি ওটা হ'ল বধূদের বাক্‌-সংযম। যত ইচ্ছে কড়া কথা বলো না, তাদের উত্তর দেওয়া চলবে না। তাতেও রক্ষা নেই, "দশ হাত কাপড়ে যাদের কাছা নেই", এই মোক্ষম কথাটা বলে তাদের দাবিয়ে রাখা হ'ত।

আজকালকার মেয়ে হ'লে তক্ষুণি রাস্তায় মারাঠী মেয়েদের দেখিয়ে বলত, অনায়াসে অমনি কাছা আমরাও দিতে পারি যদি তোমরা ঘোমটার বহর কমিয়ে দাও আমাদের। ঐ সব এঁচড়ে-পাকা ননদরা শুধু বৌদেরই নাস্তানাবুদ করেই ছাড়ত না, ভাইদেরও রীতিমত আগলে বেড়াত যাতে বৌ-এর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ না হয়। দুপুরে তাদের ছুটির দিনে তাদের খাটে শুলে ঘুমিয়ে পড়া বা বৌদিকে নিয়ে বাঘবন্দী খেলতে বসায় তাদের স্ফূর্তি ছিল না।

প্রায়ই লেখাপড়াজানা পুরুষদের আর বর্ণপরিচয়-পড়া মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হ'ত। এই অসাম্য তাদের জীবনে বহু বিষময় ফল উদ্গীরণ করত, যার জের চলত দীর্ঘকাল ধরে। তবে স্বামীরা নিজেদের বাহাদুরির আনন্দে ও স্ত্রীকে পদানত রাখার আনন্দে এতই মশগুল হয়ে থাকতেন যে, ইচ্ছে করেই যেন সে বিষয়ে উদাসীন থাকতেন।

বিয়ের জন্যে কনেদের খেলনা পুতুলের সঙ্গে একটা করে বই দেওয়া হ'ত। ফুটো ফুটো গর্ত করা, যাতে সহজে ছেঁড়া যায়। তাতে এক নং, দু নং করে ছাপান চিঠি থাকত। বর এক নং চিঠিটা দিলে এক নম্বর মিলিয়ে কনের বাড়ী থেকে তার মা-মাসীরা খামে ভরে জামাইকে পাঠিয়ে দিত। এতে শাশুড়ীরা লজ্জিত হ'ত না, আর হলেও তখনকার শাশুড়ীদের জামাইদের কাছে বেরুতে হ'ত না এই একটা সুবিধে ছিল। একটি ছোট ছেলে বা মেয়ের মাধ্যমে শাশুড়ী-জামাইয়ের বাক্য-বিনিময় চলত। কথাগুলি প্রায়ই সে শিশুর পক্ষে অত্যন্ত গুরুপাক হ'ত। কিন্তু সে বিষয় শাশুড়ী বা জামাই কেউই মোটে সজাগ হতেন না।

ন'মাসীর শাশুড়ীর হাতের শিল্পকলার সবচেয়ে বেশী পরিচয় পেতেন গৃহবিগ্রহ দামোদর। জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গরমে পশমের কোট ও মাফলার পরে তিনি মুখে অমায়িক হাসি বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকতেন। নেহাৎই 'পাথরের ঠাকুর' নইলে গরমে পাগল হয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতেন নিশ্চয়। আরও বুনতেন ক্রচেট সুতোর বোনা কয়করে বালিশ-ঢাকা মাথায় দিয়ে শোবার জন্যে। শোয়া সুখকর হ'ত কি না জানি না, তবে শোবার চোখ ধাঁধার মত তা বোধ হয় ছেলেদের মনে সর্বক্ষণ মায়ের অস্তিত্ব জানিয়ে দিত। মনে মনে স্ত্রীকে আজীবন অবিশ্বাস ও শাসন করার মন্ত্র জপতেন তাঁরা। সুন্দর জিনিসকে বহু পরিশ্রম করে অসুন্দর করায় তাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। সাদা ধপধপে তোয়ালেতে লাল কালো নক্সা কেটে তা যোরাল করে তুলতেন।

তবু তাঁর নিজের ঘরে একটি লাল তুলোর বেড়াল করে তলায় নাম লেখা ছিল নিস্তারিণী দেবী। নিস্তারিণী দেবী তাঁরই নাম অবিশ্যি, বেড়ালটির নয়।

সেকালে নামের খুব বাহার ছিল। যেমন ধর, প্রবোধ-কুমারী, মোহিতকুমারী, সন্তোষকুমারী, পরিতোষকুমারী ইত্যাদি। সব সময় কুমারী শব্দ না বললে পুরুষ বলে ভ্রম হত। আবার পুরুষের মধ্যেও আশাতরু, উষাতরু, মায়াতরু, সুধাতরুর অভাব ছিল না। এই এক তরুর দল ছিলেন ভীষণ মোটা আর কালো, তাতে ছিল বেশ জমকালো গোঁফ। ছোটমামার বন্ধু এঁরা। দাদা-মশাই এঁর বন্ধুর ছেলে। ছোটমামা খুব মজা করে কথা বলতে পারত। বলল, ভবতোষ কাকা যেই ডাকলেন, আশা ঊষা সুধা সব কোথা গেলি রে? তখন মনে মনে তরুণীর আশা করেছিলাম পরে এল ইয়া ইয়া গোঁফ।

হ্যাঁ, ছবি যে এদের ঘরে ছিল না তা নয়: একটি কোনও বৌএর দুইমিং কষ্টুম্ পরা ছবি। আর একটি বৌ-এর মিলিটারী পোষাক-পরা বন্দুক হাতে ছবি। হঠাৎ এ ছবি দু'টি কি করে হলঘরে এল বা সদরে টাঙানোর উপযুক্ত মনে হ'ল জানি না। আর একটি যুগল ছবি ছিল। এক ভদ্রলোক থাক থাক টেরি কেটে মোম দিয়ে গোঁফ পাকিয়ে হাতে কাঁচের বেলোয়ারী ছড়ি নিয়ে বসে আছেন। আর তার পাশে আপাদ-

মস্তক গয়নায় ঢাকা তাঁর স্ত্রী। এটি হচ্ছে বাড়ীর মেয়ে-জামাই অর্থাৎ অধুনা পিসেমশাই ও পিসীমার ছবি। আর দুইখিং কট্টর-পরা ছবিটি কোনো বাবুর শালাজের। শালাজের সঙ্গে রঙ্গরস করার অধিকার মানুষের শাশ্বত। তাই জমিদার বাড়ীতে তার চলন প্রচুর। বড় তাদের মত যে, ভাসুর তার ছায়া মাড়ালে মহাপাপ। বাপের জন্য যে মাথাখওর তাঁর ত্রিসীমানায় যাবার উপায় নেই। কিন্তু অবাধ স্বাধীনতা নন্দাই-এর বেলা বা স্বামীর চেয়ে দেড় বছরের ছোট নিজের চেয়ে দশ বছরের বড় দেওরের বেলা। বন্দুক ঘাড়ে করা মেয়েটি বাড়ীর বড়কর্তার মেয়ে। যে মেয়ে অভিসার কবিতা আবৃত্তি করল তারই দিদি। যেহেতু সে এ বাড়ীর মেয়ে, তার ছবি সদরে টাঙানোর দোষ নেই। কারণ ওকে বিবস্ত্র অবস্থায় শিশুকাল থেকে চাকর সরকার নায়েব দেখে আসছে। তিল তিল করে যে সে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে—তা ওদের চোখে পড়ে না। একটা গল্পের বইয়ে পড়েছিলাম এক বামুনের গরুর একটি ছোট্ট বাছুর ছিল। বামুনের ভারি সখের ছিল বাছুরটি। রোজ বামুন তাকে কাঁধে করে বেড়াতে বেরুত। ক্রমে ক্রমে বাছুরটি মস্ত বড় গরু হয়ে গেল, কিন্তু বামুনের যে অভ্যাস তাই একদিন বামুন সেই মস্ত গরু কাঁধে করে চলেছে। এক চাষী বললে, ও কি ঠাকুর, তুমি একটা গরু কাঁধে করে চলেছ কেন? তখন বামুনের খেয়াল হল সত্যিই বাছুরটি কবে গরু হয়ে গেছে তার খেয়াল হয় নি। তেমনি অভ্যেসের বশে তারা এমন অনেক কাজই করত যা দর্শন-মনোহর নয়, বরং দৃষ্টিকটুই বলা যায়। কিন্তু সত্যি সত্যি বুঝে তারা করত না। তাই ছবির সাগর-যাদের পোশাকের সঙ্গে নাকছাবিটা আর বিলিতাবী পোশাকের সঙ্গে টায়রা আর নোলকটা যে খুলে রাখা উচিত ছিল সেটা অত খেয়াল হয় নি কারুর।

৪

এর পর বিভ্রাট বাধলো ন'মাসীর ছেলে হবার সময়। দারুণ বর্ষা। মাঠে-ঘাটে জল থই থই করছে। এরই মধ্যে বৌ-এর ছেলে হবার সময় হ'ল। দাদা-মশাই ন'মাসীকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তাঁর কাতর অনুনয়-বিনয়-ব্যর্থ হ'ল। ব্যর্থ হ'ল বড়-মামা ছোট মামার সদরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে পিসীমার গালাগালের সঙ্গে রূপোর বাসনে লুচি-সন্দেশ খাওয়ার কষ্টকর অধ্যায়। ব্যর্থ হ'ল শাল দোশালার মহল পেরিয়ে সুপুরি কাটায়ত ন'মাসীকে দেখা। তাঁরা মত করলেন না বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাতে, এই প্রথম বংশধরকে তার মামার বাড়ীতে ভূমিষ্ঠ হ'তে দিতে। মেজকর্তা বললেন, যা বলছেন সবই সত্যি। কিন্তু ওসব মেয়েলি ব্যাপারে পিসীমা যা বলবেন তাই হবে। এসব ব্যাপারে আমরা কখনও কিছু বলি নি। পিসীমা তাঁর কোটরগত চক্ষু কপালে তুলে বললেন, তোমরা যে অবাক করলে বাছা! যোম বিয়োবে, সে আবার একটা বলে বেড়ানর মত কথা? এই ত তোমাদের ভাইপোও কত আদরের ছেলে আমাদের। ও যেদিন হ'ল বা ক-পক্ষীতে টের পেয়েছিল কি? রাতে ব্যথা উঠল, বৌ হাধিকেন নিয়ে গেল গোলবাড়ীতে। ওর ত যমজ হয়েছিল। রাতে হ'ল দুটো। সকালে পেলে একটা, আর একটা ছুঁচোয় নর্দমার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছল। সকালে খবর গেল সদরে কত তোপ পড়ল, নহবৎ বসল, কত কাণ্ড! দলে দলে হিজড়ে এল, নাচল, জংলা বেনারসী শাল দোশালা বকশিস নিয়ে গেল সকলে। তা বলে বিয়োন নিয়ে হৈ হৈ পুরুষে, এ ত বাপের জন্মে শুনি নি। হ্যাঁ, করেছিল বটে জামাই। বিয়ে করব না করব না করে বুড়ো বয়েসে বিয়ে করেছিল। সে আবার অন্যের ডাক্তার ছিল—যেমন গরু-ঘোড়ার ডাক্তার হয় না? তেমনি অন্যের ডাক্তার। মানুষের নয়। সেই ডাক্তার জামাই এসে হুজুগ তুলল যে "আপনাদের ও গোলবাড়ীতে আমার জামাই হবে না।" কেন কি অপরাধ হল গোলবাড়ীর? না ওখানে কারুর ছেলে হয় নি? কিন্তু বাড়ীর কর্তারা কবে গোল বাড়ীতে গেছে বল? সেই যা জন্মের সময়। আর যতদিন পাইখানায় বসতে শেখে নি, ওখানে পাইখানা যায় ছেলেমেয়েরা। দীর্ঘকাল ঐ ব্যবহারের ফলে ঘরের সিমেন্ট বলে বস্তু নেই। যেখানে ইটের কোকরে বট-অশথের সঙ্গে ছুঁচো চামচিকের আড্ডা হয়েছে। আর মেঝের জায়গায় জায়গায় ময়লা জমে কৃমি থুক থুক করছে। এইটে হচ্ছে না কি দোষের। সেই ঠোঁট-কাটা জামাই বলেছিল, "ও ত মশাই নরককুণ্ড, ওখানে আমার ছেলে হ'তে আমি দেব না। নিয়ে যাব আমার স্ত্রীকে।" গোল কাণ্ড তার বাড়ীতে মা-বোন বলতে কেউ নেই। আচার-বিচার করবে কে? ঠাকুরের ষষ্ঠি কি কম? বাদরে সেঁকরে তাপরে এ সব করবে কে? মেয়েটির খোয়ারের অন্ত থাকবে না, তবু জামায়ের জেদই রইল। ইস্কুল বাড়ীর দোতলায় প্রসব হ'ল মেয়ে। আবার এমনি

বেহারা জামাই—এক বাক্স চুরি-কাঁচি বিলেতি ফুলো সব এনে দিয়েছিল নিজে। হ্যাঁ, ছেলেটা হয়েছিল বটে সুন্দর, যেন কলের মরদার ফুলকো লুচি। থাক্ বাবা সে সব অলেচ্ছ কাণ্ড, তা ছাড়া আমাদের কত সাধের বংশের বংশধর আসছে, তার দায়-দায়িত্ব আমাদের। ঘড়ায় ঘড়ায় ঘরে ঘরে তেল বিলুব গ্রামে। ছেলের সমান সন্দেশের পুতুল বিলুব ঘরে ঘরে। ষষ্ঠীপুজোয় সোনার হাঁড়ি গড়িয়ে দেব। নিয়ে যাবার কথা মনেও এল না তোমরা। মামারা বিফল হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু দারুণ বর্ষা। গোলঘরে ছেলে হবার উপায় নেই। ঘর জলে ভেসে গেছে। শেষে অনেক বুদ্ধি করে উঠোনের মধ্যে মাচা করে ন'মাসীর আঁতুর হ'ল। শুনেছি, বাঁশের খুঁটি বেয়ে জোঁক উঠছে, কেঁচো উঠছে, তারি মধ্যে একুশ দিন থাকতে হয়েছিল তাকে। ন' মেসোমশাই ছাতের কোকরে চোখ পেতে বসে থাকতেন ন'মাসীর খবর জানার আশায়, তার বেশী এগুবার সাহস হত না। উপায় নেই কিছু করার। সন্তানের জন্মের সঙ্কটকালে জন্মদাতা বাপের কিছু করণীয় নেই। থাকলে লজ্জার অবধি থাকবে না। মা-বোন গায়ে থুতু দেবে—বলবে বোয়েশ ভেড়ো—সে যে ভারি লজ্জার কথা! যাক, তবু শেষ রক্ষে হ'ল—ন'মাসীর আঁচল সাহরে ভরে উঠল। বড় বড় মুক্তোর মালা, হীরের আংটি, শাল দোশাল বকশিস পেয়ে ঢুলীর দল নেচে ফিরল।

তবু গেল না ভোটার জল, সময়ে দুটো গরম ভাত বা অতবড় ধকলের পর একটু নরম বিছানায় বিশ্রাম পায়নি। ছেঁড়া চ্যাটাড়ির বেড়ালঘেরা ঘরে চট আর চ্যাটাই দিয়ে বিছানা—খড়ের বালিশে শুয়ে ন'মাসীর কষ্টের সীমা নেই। সেই কষ্ট শতগুণ হয়ে বিঁধল নিরুপায় বাপ তাই বাপকে। কিন্তু উপায় কি! মেয়ে রাজবাড়ীর বৌ, হীরের বালা মতির মালা পরার দাম তাকে দিতে হবেই। নীরবে চোখ মুছলেন দিদিমা। এর পর থেকে আমাদের বাড়ীতে আর আসে নি ন'মাসী।

প্রসবের আগেও কম ধকল যায় নি তার। অনবরত আচার আর তেলেভাজা খাওয়ানর জ্বালায় বেচারার পেলের অসুখ হয়েছিল। তার ওপর আদরের অত্যাচারের সীমা ছিল না। ও সময় না কি পাথর খেলে পাথর হজম করে মেয়েরা। আর মেয়ে দুখানা বাজারের কচুরি কুচুরি খেতে পারবে না? রাতে নিয়মিতই লুচি বা হয়ে তার জন্যে ঢাকাই পরোটা খাজা রাবড়ির বন্দোবস্ত হ'ল। গলায় গলায় অম্বল নিয়ে মরসম অবস্থায় ঢাকাই পরোটা আর খাজা খাওয়া যে কি কষ্টকর তা নিশ্চয় বলে বোঝাতে হবে না। অথচ না খেলে বিঁধে বিঁধে বাক্য-বাণ ছাড়বেন—কেন বাপু খাচ্ছ না? শেষে না বাপী ছুদবে আমায়। বলবে, যদি পোয়াতি বৌটাকে খাওয়াতেই না পারবি তবে আদর করে রাখা কেন? কখনও বা ন'মাসীর ভাসুরদের বলে বাইরের বাড়ী থেকে চপ-কাটলেটও আসত। আর যাই কর, না খেলে রক্ষা নেই। খণ্ড প্রলয় বেধে যাবে তা হ'লে। হয়ত বিকেলে একপেট কড়াইশুঁটির কচুরি, মালপোয়া খেয়ে উঠেছে ন'মাসী, এমন সময় ভাসুরঝি একবাটি পাঁঠার ঘুগ্‌নি এনে বলল, ঠাকুমা বলেছে তোমায় খেতে। তখন তা না খেলে পিসীমা আর ঠাকুমাতে হাতাহাতি বেধে যাবে। ঠাকুমা বলবে, বলি তোর বয়কে কে পেটে ধরেছে? আমি, না ঠাকুরঝি? লোকে উপরোধে ঢেঁকি গেলে আর তুই শাশুড়ীর মান রাখতে গিয়ে একবাটি ঘুগনি খেতে পারিস না? কতকষ্টে ঐ প্যাজের রাবা বেঁটেছি আমি? গা আমার পাক দিয়ে দিয়ে ওঠে, তবু শুধু ঐ বোয়ের মুখ চেয়ে নিজে হাতে ঘুগনি রাঁধলাম আমি। এই ভুবনপুরের কোন্ পোয়াতি আছে যে আমার হাতের ঘুগনি খায় নি? আমার কত সাধের কোলপোঁছা ছেলে, তার পোয়াতি বৌকে যদি একটু ঘুগনিও না খাওয়াতে পারলাম ত আমার বেঁচে থেকে লাভটা কি? এর চেয়ে আমার মরণই ভাল। ওধারে পিসীমা সুর ধরেছেন, আমার আর কি বল, ওদের মুখ চেয়েই বাঁচা। বাতের ব্যথায় নড়া চড়া ছিঁড়ে পড়ছে আমার। তবু আমি চুপী পাকাচ্ছি একবাটি পায়েস বোয়ের পাতে ধরে দেব বলে। তা এই অবেলায় ঘুগনি খেয়ে পায়েস কি আর সে মুখে করবে? যতই হোক শাশুড়ী আগে, না পিস্‌শাশুড়ী আগে? এমন সময় মেজ-মা বলেন, অ ছোটবৌ, তোর ভাসুর তোর প্যাটিস এনেছেন নিজে হাতে করে কেলনার না কারপোর থাস্ দুখানা। এমনি আদরের অত্যাচারের ফলে ছেলে জন্মালই লিভারের দোষ নিয়ে; ডাক্তাররা বললেন, খুব সাবধান, এ ছেলে বাঁচলে হয়।

আর একটা কথা বলা হয় নি, সে হ'ল সাধ খাওয়া। সাধ খাওয়ান চলল সারা ন'মাস ধরে। রাবণের গুষ্টি ওরা, আজ এদের বাড়ী, কাল ওদের বাড়ী চলল সাধ খাওয়া। সারা মাসধরে ঝোল-ভাতের মুখ দেখে নি সে। সেই পোলাও-মাংস, চপ-কাটলেট, মাছের কালিয়া, পটলের দোর্মা—রোজই তার পুনরাবৃত্তি। কোথাও রূপোর বাসন, কোথাও শ্বেতপাথরের বাসন—এই-ই শুধু

পরিবর্তনের মধ্যে। এর মধ্যে একদিন ন'মাসীর মাসী নেমন্তন্ন করেছিল, সেখানেও সেই মাংস-পোলাও। মায়া বলেছিল লক্ষীটি মাসীমা, আমায় দুটি ঝোল ভাত দাও। ওসব খাবার দেখলে গা বমিবমি করে আমার। মাসীমাও বলেছিলেন, গা বমিবমি ত এখন করবেই মা। কত সাধ ক'রে তোর জন্যে রাঁধলাম, মুখে দিবি না? ম্লান হেসে মায়া বলল তবে দাও। ভাবল একটা দিনের জন্যে আর কেন মাসীর মনে কষ্ট দিই। যা হোক দু'টি নেড়ে-চেড়ে উঠে পড়ল।

তারপর বাপের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে বলল, মাগো, তোমার হাতের ঝোলভাত খাব। দিদিমা মাছের ঝোল-ভাত করে দিলেন। বহুদিন বাদে তৃপ্তি করে খেল মায়া। কিন্তু বাদ সাধল ক্যান্ত ঝি, সে পেছন পেছন, পেটপুরে পোলাও-মাংস খেয়ে সন্দেশ রাবড়ী দিয়ে পেট ভরিয়ে, ছিছিক্কার করল রাজবাড়ীতে এসে,—"একটা দিনের তরে সোহাগ করে নিয়ে গেছিস মেয়েকে তা দিলে ধরে এক ব্যঞ্জন ভাত! আমাদের ঘরেও যে ওর সঙ্গে দুটো ডাল্নাচুড়ি, একটু পায়েস ক'রে দেয় গো—! এক-নাগাড়ে ন'মাস ধরে ঐরকম বাড়ী বাড়ী সাধ খাওয়ান চলল। তার সঙ্গে বাড়ীতে শাশুড়ী আর দিদ্‌শাশুড়ীর যত্নে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হ'ল মায়ার। "বউ মরলে ক্ষতি নেই—'বেঁচে থাকুক চুড়োবাঁশী' শত শত মিলবে দাসী।" কিন্তু বলতে পারবে না যে বৌকে যত্ন করে খাওয়ান হয় নি। প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে মায়া যে প্রাণটুকু হারায় নি এই-ই শুধু রক্ষে।

হ'ল না ইউরিন পরীক্ষা, হ'ল না ব্লাডপ্রেসার দেখা শুধু হ'ল জানান দেওয়া। গোলাপী নামে যে দাই নাড়ী কাটবে ছেলের ডাকে ডাকা হ'ল একদিন। ডাকে ডাকার এক বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে। গেরস্ত ঘরের বৌ সে, তাকে রাস্তা থেকে নাম ধরে ডাকার উপায় নেই। বাইরে থেকে বলে আসতে হবে তোমাদের বৌকে অমুক বাড়ীতে একবার পাঠিয়ে দিও ত। রাত-বিরেতে ব্যথা উঠলে তাকে রাস্তা থেকে নাম ধরে ডাকলে তার মান হানি হবে।

সেই গোলাপী দাই এল। তার কোঁচড়ে কিছু চাল আর একটা টাকা সয়ার করে ঢেলে দিল পোয়াতি, আর সে ছুটে কোনদিকে না চেয়ে চোঁ-চাঁ ছুট দিল। এই সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে গোলাপী সোজা পথে যায়। তা হ'লে সোজা পথে আসবে ছেলে। এই সব গোপন নিগূঢ় তত্ত্ব জানে ক'জন ডাক্তার? গোলাপীকে ত চোখেই দেখে নি তারা? তাই আজ ঘরে ঘরে সিজারিয়ানের ঘটা। যত সাহেবী কাণ্ড! এরই নাম জানান দেওয়া অর্থাৎ সহজ কথায় দাইকে এনগেজড করা হ'ল।

(৫)

ছেলে জন্মালই জিভারের দোষ নিয়ে। কিন্তু সেকথা শুধু বাড়ীর মেজকর্তা, বাড়ীর মেয়েদের বলে লাভ কি? তা ছাড়া খোকা ত এখন মেঁলেদের রান্না খাবে না। পিসীমা মনের সাধে ন'মাসীকে ঝাল খাওয়াতে লাগলেন। ঝাল মানে হচ্ছে গাওয়া ঘি-এ গোলমরিচের গুঁড়ো—চুমুক দিয়ে খেতে হবে—নইলে নাড়ী শুকুবে কি করে? একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের ভদ্রমহিলা (তিনি এখন ইউরোপবাসী) বলেছিলেন তাঁর বোনকে আমাদের মেয়েদের আবার নাড়ী কি, বল? ঐ একটি নাড়ীই ত আছে? (অর্থাৎ সন্তান ধারণের নাড়ী) শুনে বোনের চক্ষু কপালে উঠল—মেয়েদের শরীরে হার্ট, লাংস-ষ্টমাক, কোলন, এ্যাপিণ্ডিকস প্রভৃতি যে কিছুই নেই এমন সরস তথ্য তার জানা ছিল না। রাজবাড়ীর মনতত্ত্বও তাই। সেই বেড়াল বাঁধা পদ্ধতি—। এক বাড়ীতে পুজো হচ্ছে, এমন সময় একটা বেড়াল অনবরত মিউ মিউ করে জ্বালাতন করছে। সবাই বিব্রত, পাছে ঠাকুরের ভোগে বেড়ালটা মুখ দেয়। তখন তাকে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হ'ল। কিন্তু তারপর থেকে নিয়ম হ'ল বাড়ীতে কোন পুজো হ'লেই যেখান থেকে হোক একটা বেড়াল ধরে এনে বেঁধে রাখতে হবে। কেন যে বেড়াল বাঁধা হয়েছিল এ কারণ নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

অব্যাহত খাদ্যসঙ্কট

খাদ্যসঙ্কট ক্রমেই জটিলতর আকার ধারণ করতে সুরু করেছে। কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্ত কোন একটা স্থায়ী এবং সার্থক সমাধানের দিকে খুব বেশী একটা অগ্রসর হ'তে চলেছে বলে দাবি করা চলে না। গত মাসে আমরা এই প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে উৎপাদন বৃদ্ধি এই সম্পর্কে একটা অত্যন্ত জরুরী এবং মূল প্রয়োজন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই যে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সুস্থ অবস্থায় পৌঁছবে এমন আশা করা ভুল হবে। খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বণ্টনের ওপর সম্পূর্ণ সরকারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করে কালোবাজারী মুনাফাবাজদের এই বস্তুটির ওপর যথেচ্ছ অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার ব্যবস্থা করতে না পারলে এই সঙ্কট থেকে স্থায়ী ভাবে মুক্তি পাবার কোনই আশা নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মূল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন বলে মনে হয় এবং এই বিষয়ে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের ওপর সার্বভৌম সরকারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করার যে সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সার্থক প্রয়োগের যে আয়োজন করেছেন সেটাই একমাত্র সুযুক্তি-সূচক সর্বভারতীয় সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগের উদাহরণ হওয়া উচিত।

ভোগচাহিদা

কেবলমাত্র গত বৎসরের ফসলের হিসাব থেকেই এ ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হবে। সরকারী হিসাব মতন গত ফসলের খাদ্যশস্যের (cereals) মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ কোটি টন; এর মধ্যে চাউলের ফসলের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টন ও গমের ফসল ১ কোটি ২০ লক্ষ টন। এর ওপর পি এল ৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা থেকে এবং অন্যান্য চুক্তি অনুযায়ী ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে মোট ৬০ লক্ষ টনের বেশী গম গত বারো মাসে আমদানী হয়েছে। অর্থাৎ গত বৎসরের ফসল এবং আমদানী শস্য মিলিয়ে দেশে মোট ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ছিল। বর্তমান সরকারী নির্দেশ মতে প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক ১৬ আউন্স বরাদ্দ অনুযায়ী দেশের মোট ভোগচাহিদার পরিমাণ হওয়া উচিত ৭ কোটি টন। ১৯৬১ সনের আদমসুমারীর হিসাব অনুযায়ী দেশের লোক সংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ৯১ লক্ষ। বার্ষিক ২.৪% হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে বর্তমানে দেশের লোকসংখ্যা ৪৯ কোটি ১৮ লক্ষ হওয়া উচিত। এর মধ্যে ০ থেকে ৮ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ২১.২% এবং ৬৫ বৎসর ও ঊর্দ্ধ বয়স্কদের সংখ্যা ২.৯%। ৯ থেকে ৬৪ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ৭৬%। ৯ থেকে ৬৪ বৎসর বয়স্ক৷ ৭৬% অর্থাৎ ৩৭ কোটি ১৮ লক্ষ লোকের জন্য দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাবে ৬ কোটি টন এবং বাকি ০ থেকে ৮ এবং ৬৫ বৎসর ও ঊর্দ্ধে বয়স্ক ২৪% অর্থাৎ ১২ কোটি লোকের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ ৮ আউন্স দৈনিক বরাদ্দ হিসাবে প্রায় ১ কোটি টন খাদ্যশস্য বাস্তবিক ভোগের জন্য প্রয়োজন। অর্থাৎ মোট ৭ কোটি (70 million) খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। এ ছাড়া অনিবার্য অপচয় ও বীজ-শস্যের জন্য ভোগচাহিদার আরও ১০%, অর্থাৎ আরও ৭০ লক্ষ টন (7 million) প্রয়োজন। গত বৎসরে সরকারী হিসাব অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টন (79 million) এবং আমদানীর পরিমাণ ৬০ লক্ষ (6 million) টন, মোট ৮.৫০ কোটি (85 million) টন। উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী আমাদের মোট বাস্তব চাহিদার পরিমাণ যদি ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টন হয়, তবে গত বৎসরের মোট উৎপাদন এবং আমদানী মিলিয়ে যে সাকুল্য সরবরাহ ছিল, তা থেকে আমাদের অন্ততঃ ৮০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত মজুদ থাকবার কথা। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু বাজার সরবরাহে সঙ্কটজনক ঘাটতি এবংতজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। এই ঘাটতি যে মুনাফাবাজ ব্যাপারী এবং/কিংবা সচ্ছল ভোগদারেরা সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মূল্যমানের ওপর এই কৃত্রিম ঘাটতির প্রতিফলন কতটা হয়েছে তা নিম্নোক্ত হিসাব থেকে বোঝা যাবে:

	১৯৬৪ সেপ্টেম্বর	১৯৬৪ ডিসেম্বর	১৯৬৫ মার্চ	১৯৬৫ সেপ্টেম্বর	১৯৬৫ নভেম্বর
মোটা সিদ্ধ					
চালের খুচরা দর	১·১০	·৮৫	১·০০	১·৫০	২·৩০
মিহি সিদ্ধ					
চালের খুচরা দর	১·২০	১·০০	১·১০	১·৭৫	২·৫০
মিহি আতপ					
চালের খুচরা দর	১·২৫	১·০০	১·১৫	২·০০	২·৭৫

(উপরোক্ত বাজার দর কলকাতার রেশন-বিধৃত এলাকার সংলগ্ন অঞ্চলে বলবৎ ছিল এবং আছে।)

মজুদ শস্য

অতএব যেমন একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত এবং বণ্টন নিয়ন্ত্রণের আয়োজন করা জরুরী, তেমনি লুকোন মজুদ আবিষ্কার ও সরকারে বাজেয়াপ্ত করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। পূর্বোক্ত হিসাব থেকে আন্দাজ করা যাবে যে, মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ যদি সরবরাহ ঘাটতির আনুপাতিক সংখ্যা সূচিত করে তবে ১০০% মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে অন্ততঃ ভোগচাহিদার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সরবরাহ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে; অর্থাৎ মুনাফাবাজদের অধিকারে অন্ততঃ আড়াই কোটি টন খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে। অবশ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবার পর অল্প অল্প করে এই শস্য বাজারে আসছে কিন্তু এই উচ্চ-মূল্যমান বজায় রাখবার প্রয়োজনেই ঘাটতি যাতে চলতে থাকে, মাত্র সেই পরিমাণ সরবরাহই ধীরে ধীরে বাজারে আসতে দেওয়া হচ্ছে।

এই মজুদ আবিষ্কার ও সরকারে বাজেয়াপ্ত করবার দিকে কোন প্রয়োগের লক্ষণ আজও দেখা যায় নি। আমরা মাঝে মাঝে সরকারী নেতাদের বাণী থেকে শুনতে পেরেছি যে মজুদদারেরা য'দ তাঁদের মজুদ শস্য বাজারে না ছাড়েন তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হবে। এমন কি গত বৎসরের শেষ ভাগে কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্দেশ্যে একটি জরুরী অডিন্যান্সও প্রবর্তন করেন, কিন্তু তার সার্থক প্রয়োগের কোন চেষ্টা এ পর্যন্ত দেখা যায় নি। জরুরী ভারতরক্ষা আইনের বলে অবশ্য কিছু সংখ্যক লোককে প্রায়ই গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে, তার হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন বড় খাদ্যশস্য ব্যাপারী বা মজুদদার ধরা পড়েছে এবং কোন বৃহৎ মজুদ আবিষ্কৃত হয়ে সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে এমন সংবাদ পাওয়া যায় নি।

এটা খুবই স্পষ্ট যে, এদিকে আজ পর্যন্ত যে কোন সার্থক প্রয়োগ অবলম্বিত হয় নি, তার একমাত্র সম্ভাব্য কারণ, এই যে কোন কারণে সরকার-পক্ষ এই শক্তিশালী মুনাফাবাজ গোষ্ঠীকে ঘাঁটাতে সাহস পান না। কেহ কেহ এরূপ অভিযোগ করে থাকেন যে, এই সকল বৃহৎ ব্যাপারীদের অনেকেই কংগ্রেস দলের শক্তিশালী সভ্য এবং কংগ্রেস সরকারের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট। এমনও হওয়া সম্ভব যে শ্রীগুলজারীলাল নন্দের দাবি সত্বেও সরকারী প্রশাসনিক আয়োজন এখনও এমন কলুষলিপ্ত (corrupt) এবং অসহায় (inefficient) যে এ বিষয়ে সার্থক প্রয়োগ রচনা করবার দায়িত্ব বহন করতে তাঁদের সামর্থ্য অত্যন্ত ক্ষীণ। কারণ যাই হোক, এটা খুব স্পষ্ট যে সরকার এই বিষয়ে কোন প্রকার চেষ্টা থেকে সম্পূর্ণ বিরত রয়েছেন। কিন্তু এও অনস্বীকার্য যে এই দিকে সার্থক প্রয়োগের ব্যবস্থা না ক'রে দেশকে খাদ্য-মূল্য তথা সরবরাহ-সঙ্কট থেকে মুক্ত করা কোন প্রকারেই সম্ভব হবে না।

খাদ্যশস্যে সরকারী অধিকার

সম্প্রতি তাঁর কলকাতা সফরের সময় কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর এ রাজ্যে খাদ্যশস্য ব্যবসাটিকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত করবার সিদ্ধান্তটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, তাঁর উদাহরণ অন্যান্ত রাজ্য সরকারগুলির অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু এই উদাহরণের উপরে ভিত্তি করে একটা সুষ্ঠু, সুসমঞ্জস (integrated and balanced) সর্বভারতীয় খাদ্যনীতি রচনার কোন অভিলাষ বা আভাস এখনও দেখতে পাই না। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে উৎপাদক বা ব্যাপারী বা খাদ্যশিল্পগুলির মজুদের একটা আবশ্যিক অংশ সরকারী সংগ্রহের জন্ত দাবি করা হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি, মনে হয়, কেবলমাত্র সম্প্রতি গৃহীত বণ্টন-নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্তের পরিপূরকমাত্র, দেশজোড়া খাদ্যসঙ্কটের একটা সামগ্রিক এবং স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। আমাদের দেশের ওপর পাকিস্তানী হামলা নূতন করে শুরু হবার পূর্বে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে আপাতত কেবলমাত্র ১০ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ অধিবাসীর শহরাঞ্চলগুলি ব্যতীত অন্ত কোথাও র‍্যাশন প্রবর্তন করবার

চেষ্টা করা হবে না এবং ফুড কর্পোরেশনের সীমিত ভূমিকার বাইরে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ে আর কোন প্রকার সরকারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করা হবে না। পাকিস্তানী হামলা-জনিত যে সঙ্কটাবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার ফলে অনিবার্য ভাবে পূর্ব সিদ্ধান্তের রদবদল করবার প্রয়োজন জরুরী হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের মানসিকতার যে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, সাময়িক যুদ্ধবিরতি সত্বেও একটা স্থায়ী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে অনেক দিন লাগবে। বস্তুতঃ বর্তমান সঙ্কটাবস্থা যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে থাকবে সে বিষয়ে দেশের সরকারী ও বেসরকারী উভয় পক্ষই নিশ্চিত। এই অবস্থায় আবহাওয়ার খাদ্যসঙ্কটের একটা অতিরিক্ত গুরুত্ব অনুভব করা অনিবার্য। তাই একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি বণ্টন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ভোগচাহিদার সুষ্ঠু পূরণের প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠেছে। এই কারণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখ থেকে দেশের সকল ১০ লক্ষ অধিবাসীর শহরগুলিতে র‍্যাশনিং চালু করা হবে এবং এই বণ্টন-বিধি ক্রমে, আগামী ১লা মে তারিখ পর্যন্ত ৩ লক্ষ অধিবাসীর সকল শহরে বিস্তৃত করে দেওয়া হবে। ক্রমে এবং আরো পরে এই পূর্ণ র‍্যাশনিং ১ লক্ষ পর্যন্ত অধিবাসীর সকল শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

এই সিদ্ধান্তের প্রয়োগের ফলে শেষ পর্যন্ত দেশের ৪৯ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৯·৮ কোটি লোকের খাদ্যশস্যের চাহিদা সরকারী বণ্টনালয় থেকে মেটান হবে। কিন্তু বর্তমানে এই ভাবে মাত্র ১·৭ কোটি লোকের চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করা হবে এবং ক্রমিক গতিতে এবং নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে ৪·৩ কোটি লোকের ভোগচাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ বর্তমান সরকারী বরাদ্দ হিসাবে ১০ লক্ষ লোকের শহরগুলিতে র‍্যাশনিং চালু রাখার জন্য আপাততঃ ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য হলেই সঙ্কুলান হবে এবং ভবিষ্যতে এই র‍্যাশনিংয়ের এলাকা ৩ লক্ষ অধিবাসীর শহরগুলিতে বিস্তৃত, হলে ৬০-৬২ লক্ষ টন শস্যের প্রয়োজন হবে। কিন্তু এই র‍্যাশন বিস্তৃত এলাকা অতিক্রম করে আরো ৪৪·৭ কোটি লোকেরও অন্নের সমস্যার কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। বর্তমান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিকল্পিত সরকারী প্রয়োগে দেশের এই বৃহত্তম জনসংখ্যার জন্য কোন ব্যবস্থার আয়োজন নাই। এই সিদ্ধান্তের একাধিক কারণ থাকতে পারে। যথা, এই শহরগুলিতে চাহিদার ঘনতা এত বেশী, যে, সরকারী চিন্তায়, ইহার ফলে সমগ্র দেশের খাদ্যশস্য সরবরাহ ও মূল্যমানের ওপর অনিবার্য ভাবে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। র‍্যাশনিংয়ের দ্বারা এই এলাকাগুলিকে আলাদা করে দিয়ে (cordon off) খাদ্যশস্যের বাজারগুলিকে এই চাপ থেকে রক্ষা করা যেতে পারবে; দ্বিতীয়তঃ, সরকারী চিন্তায় মনে হতে পারে যে, এই অবশিষ্ট ৪৪·৭ কোটি লোকের মধ্যে মোটামুটি প্রায় সাড়ে ৩৯ কোটি লোক চাষী পরিবার নিয়ে গঠিত এবং তাঁদের খাদ্যশস্যের ভোগচাহিদা মেটাবার জন্য কোন সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। সম্প্রতিকার একটি হিসাবে আমরা পূর্বের একটি আলোচনায় দেখিয়েছি যে, দেশের সমগ্র চাষী পরিবারের মধ্যে মোটামুটি মাত্র এক-পঞ্চমাংশ (২০%) উদ্বৃত্ত চাষী, অর্থাৎ এঁরা নিজেদের ভোগচাহিদা মিটিয়ে, একটা বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তাংশ উৎপন্ন করেন; আরো প্রায় এক-দশমাংশ (১০%) তাঁদের নিজেদের ভোগচাহিদাটুকু মাত্র মেটাতে সমর্থ, কোন বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন এঁরা করেন না। বাকী সকল চাষীই যা উৎপাদন করে থাকেন তার দ্বারা তাঁদের ভোগচাহিদার কিঞ্চিদধিক বৎসরে ৬ মাস থেকে ৯ মাস পর্যন্ত পূরণ সম্ভব হয়, বাকীটা তাঁদেরও বাজার থেকে কিনে খেতে হয়। অর্থাৎ যদি চাষী জনসংখ্যার ৩০% বাদ দিয়ে বাকী ৭০% গড়ে বার্ষিক নিজ ভোগ-চাহিদার অর্দ্ধেক পর্যন্ত নিজেদের উৎপাদন দিয়ে মেটাতে সমর্থ হন বলে ধরে নেওয়া যায়, তা হ'লে চাষী পরিবারদের ওপরেও খাদ্যশস্যের সরবরাহে ঘাটতি এবং আনুপাতিক চাপ শহরবাসীদের সঙ্গে সমভাবেই, অন্ততঃ ২৭·৫৭ কোটি লোকের ওপর বর্তাবে। অতএব কেবলমাত্র শহরাঞ্চলে র‍্যাশনিং প্রবর্তনের ফলে বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের কোন সামগ্রিক ও স্থায়ী সমাধান আদৌ সম্ভব হবে কি না গভীর সন্দেহের বিষয়। একমাত্র সমগ্র খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ের ওপর সরকার যদি সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন ও সার্থক প্রয়োগ করতে সমর্থ হতেন, তবেই হয়ত সমাধানের পথ খোঁজবার একটা আশা হ'ত। আমরা পূর্বেও বলেছি এবং বর্তমান প্রসঙ্গে আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি, যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাদ্যসমস্যা সমাধানকল্পে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বর্তমান অবস্থায় সেটিই একমাত্র পন্থা, তবে তাঁর প্রয়োগ সার্থক ভাবে প্রযুক্ত হয়ে বর্তমান সঙ্কটের অন্ততঃ আংশিক সমাধান করতে সমর্থ হবে কিনা সেটা নির্ভর করবে কয়েকটি বিভিন্ন ব্যবস্থার উপরে—(১) সৎ এবং নির্ভরযোগ্য খাদ্য-সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, (২) কেন্দ্রীয় সরকার কতটা পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহের ঘাটতির নির্দিষ্ট অংশ পূরণ করবার প্রতিশ্রুতি বাস্তবপক্ষে পালন করবেন, (৩) কতটা পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার উদ্বৃত্ত উৎপাদক রাজ্যগুলি থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহে সাহায্য পাবেন। তদুপরি কতটা পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্বের মজুদ খাদ্যশস্যের চোরাকারবার বন্ধ করতে পারবেন—তারই ওপর নির্ভর করবে শ্রীপ্রফুল্ল সেনের বর্তমান প্রশংসনীয় পরিকল্পনা ও প্রয়োগের সার্থকতা ও সাফল্য।

সুসমঞ্জস (Integrated) সর্বভারতীয় খাদ্যনীতি

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমরা পূর্বেও বলেছি এবং বর্তমানে পুনরায় তার পুনরাবৃত্তির ও আলোচনার গভীর তাগিদ বোধ করছি। সেটি খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে বর্তমানের আঞ্চলিক মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির অপসারণ ও তাহার স্থলে একটি সুসমঞ্জস সর্বভারতীয় নীতি রচনা ও প্রয়োগের একান্ত ও জরুরী প্রয়োজনীয়তা। আগেই অঙ্কের দ্বারা দেখাতে প্রয়াস করেছি যে, সমগ্র দেশে এবং সকল প্রকার খাদ্যশস্য (cereals) নিয়ে আমাদের দেশের এখন যা মোট শক্তপক্কতা বার্ষিক উৎপাদন, তাতে আমাদের মূল ভোগচাহিদা সঙ্কুলান হবার কথা, যদিও উদ্বৃত্তের পরিমাণ যৎসামান্য মাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ভোগচাহিদা যদি আমরা কেবলমাত্র চাল ও গম জাতীয় মিহি শস্য দিয়ে মেটাতে চেষ্টা করি তাহলে সঙ্কুলান হবার কোন আশা নেই। আমরা দেখেছি যে আমাদের বর্তমান লোকসংখ্যা হিসাবে এবং অনিবার্য অপচয় ও বীজশস্যের জন্য মোট ভোগ চাহিদার পরিমাণের ১০% বরাদ্দ ধরে নিলে বর্তমানে আমাদের খাদ্যশস্যের ভোগচাহিদার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭.৭ কোটি টন। বর্তমান বৎসরে (১৯৬৪-৬৫ ফসলের) আমাদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৮.১ কোটি টন। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের শক্তপক্কতা মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় মোটামুটি প্রায় ৭.৫ কোটি টন। বর্তমান বৎসরে মিহি শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল—চাউল ৩.৩ কোটি টন, গম ১.২ কোটি টন; মোট ৪.৫ কোটি টন। ব্যক্তিগত ভাবে গরীব জনসাধারণের উন্নতি না হলেও মোটামুটি পরিকল্পনা প্রয়োগের ফলে দেশের আর্থিক খানিকটা উন্নয়ন অবশ্য হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন-মানে কোন উন্নতি না ঘটলেও ভোগচাহিদার বিবর্তনে তার খানিকটা প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ফলে চাল ও গমের ভোগচাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরবরাহ যখন চাহিদার তুলনায় অল্প এবং যখন নির্দিষ্ট বরাদ্দ বণ্টন ভোগচাহিদাকে সীমিত করে রাখা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে, তখন সকল প্রকার শস্য মিলিয়ে খাদ্যশস্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ ভোগ-চাহিদা মেটাবার আয়োজন করা একান্ত জরুরী। তা ছাড়া মোটামুটি খাদ্যশস্য উৎপাদনে কোনো কোনো রাজ্য ঘাটতি উৎপাদক, অর্থাৎ রাজ্যে ন্যূনতম ভোগচাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়; কোনো কোনো রাজ্য বা উদ্বৃত্ত উৎপাদক। কিন্তু এই ঘাটতির সমগ্র ভোগচাহিদা এবং উৎপাদন সামগ্রিক ভাবে সমগ্র দেশের জন্য একটা একক সমষ্টি বলে জ্ঞান করা উচিত। বর্তমান আঞ্চলিক মনোভাবে এবং ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্রের নির্দেশে এবং নেতৃত্বে সকল রাজ্যে খাদ্য-সমস্যার সমাধানের রূপ ও প্রয়োগ একই রকম হওয়া কেবল যে বাঞ্ছনীয় তাহা নয়, একান্ত প্রয়োজন। এটি না হওয়া পর্যন্ত সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

সরকারী ঔদাসীন্য

কিন্তু সমস্যাটির গুরুত্ব যত গভীরই হোক না কেন, আমাদের বর্তমান শাসন-কর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রয়োগবিধি ইত্যাদি সব কিছু মিলে এই সম্বন্ধে তাঁদের গভীর ঔদাসীন্যই সূচিত করে। তাগিদ যতই জরুরী হয়ে আসুক না কেন, তাঁরা কেবল দেশের লোককে কষ্ট করবার উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন, কোন সার্থক প্রয়োগের দিকে তাঁদের কোন নজর নেই। সমস্যাটি গভীর এবং জটিল এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু এর বর্তমান জটিলতার জন্য বর্তমান সরকার নিজেরাই বিশেষ ভাবে দায়ী। কেহ কেহ অভিযোগ করেন যে সাধারণ নির্বাচনের খরচের বেশীর ভাগ অর্থটাই শাসন ক্ষমতারূঢ় দলের হাতে এসেছে খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে, ভবিষ্যতেও ক্ষমতার গদীতে কায়েমী হয়ে থাকতে হলে এঁদেরই বদান্যতার উপর নির্ভর করতে হবে। বর্তমান জটিল খাদ্য-সমস্যাটি তাই ক্ষমতাসীন দলের তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি স্বেচ্ছাকৃত প্রতিদান। এই অভিযোগ যদি আংশিক ভাবেও সত্য হয় তবে ত ভয়ের কথা। যাই হোক সমস্যা সমাধানে সরকারী প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সার্থকতা-বর্জিত রয়েছে বলে দেখতে পাই। সমস্যা জটিল বলে সমাধান সম্ভব হবে না এ অজুহাত অচল। এ দায়িত্ব পালন করতে যদি বর্তমান সরকার—এবং এটি একটি জাতীয় সঙ্কট এবং একমাত্র সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতেই এর সমাধান সম্ভব বলে আমরা সরকার বলতে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকেই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি—অসমর্থ হন তবে তা সরল ভাবে স্বীকার করে ক্ষমতার গদী ত্যাগ করে তাঁদের সরে আসা উচিত। তা হলে বিকল্প সরকার কে বা কারা গঠন করবেন বা চালাবেন সে দায়িত্ব তাঁদের নয়। স্থানান্তরে এই বিষয়ের আরও আলোচনা প্রয়োজন হতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করি।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্মরণে

(১৮৮৫-১৯৫৪)

শ্রীকালিদাস নাগ

মনীষী সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সেকালের 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়্যু'তে (শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত) তাঁর কবিতা ও সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরে প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু তাঁর জীবন-ব্যাপী সাধনার ফল 'A History of Indian Philosophy' বৃহৎ চার খণ্ডে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বলে বাঙালী এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিককে প্রায় ভুলতে বসেছে। অথচ রামানন্দ ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর কন্যাদের গভীর যোগ হয়েছিল, তাই রামানন্দ শতবার্ষিকীর বছরে তাঁর কথা বাঙালী জনসাধারণকে মনে করিয়ে দিতে চাই।

১৮৮৫ সালের ১০ই আশ্বিন (October, 1885) সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কর্ম্মস্থল কুষ্টিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এবং তিনি Surveyor-এর কাজ করতেন, তাই এত ভাল ইংরেজী ভাষা শিখতে পারেন। তার আগে তাঁর পিতামহ কবীন্দ্র দাশগুপ্ত পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল জেলায়, গৈলা গ্রামে বিখ্যাত সংস্কৃত অধ্যাপক ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ বৈদ্য হিসাবে শুধু দেশসেবা করেন নাই—স্বোপার্জ্জিত অর্থে একটি সংস্কৃত কলেজ (কবীন্দ্র কলেজ) প্রতিষ্ঠা করে জনশিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত সেই কলেজটি চলেছিল এবং সে কলেজের ছাত্ররা বিনা খরচে শিক্ষা এবং গ্রাসাচ্ছাদন হিসাবে বৃত্তি লাভ করত।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পৈতৃক ধারা অনুসরণ করে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির জন্য আজীবন সাধনা করে গেছেন। বাঙালী সেকথা চিরদিন স্মরণ রাখবে আশা করি। শৈশবকাল থেকেই সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার অদ্ভুত বিকাশ দেখা দিয়েছিল। জনসাধারণ শুধু নয়, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনারায়ণ পরমহংস ও প্রভু জগদ্বন্ধু প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁকে দেখতে আসতেন এবং Theosophical Society Hall-এ বালক সুরেন্দ্রনাথকে টেবিলের উপর বসিয়ে প্রশ্নোত্তর সভা করা হ'ত। তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তায় উদ্ভাসিত ভাষণে মুগ্ধ হয়ে জনসাধারণ তাঁকে 'খোকা ভগবান' বলে ডাকত। প্রথমে তিনি ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের মত ভারতগৌরবদের স্কুলে শিক্ষা সুরু করেন এবং পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে সংস্কৃত ও বিজ্ঞানাদি পাঠ গ্রহণ করেন। পারিবারিক বৈদ্যশাস্ত্র চর্চার ফলে তাঁর কীমিয় বিদ্যায় (Chemistry) এমন অনুরাগ হয় যে, উক্ত বিদ্যার অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ক্লাসে না থাকলে পড়াতেন না। পরে কৃষ্ণনগর ত্যাগ করে তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯০৮ সালে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত ব্যাকরণে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য দেখে বিজ্ঞ অধ্যাপকরাও বিস্মিত হন এবং সেকালে মনীষীপ্রবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। গৌতমীয় ন্যায়-শাস্ত্রে (Logic) তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল এবং ন্যায় দর্শন থেকে অন্য নানা ভারতীয় দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনসাধনায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিখে গিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় এম. এ. পাশ করে আবার দর্শনশাস্ত্রে তিনি ১৯১০ সালে দ্বিতীয় এম. এ. উপাধি লাভ করেন এবং দুইবার তাঁকে State Scholarship দিয়ে বিলাত পাঠাবার কথা হয় কিন্তু পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলে তিনি সে বৃত্তি গ্রহণ না করে রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন। (১৯১০-১১) এবং শেষে চট্টগ্রাম কলেজে স্থায়ী অধ্যাপক রূপে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনার কাজ করেন। সেই সময়ে ভারতীয় শিক্ষায় প্রাজ্ঞ Lord Ronaldshay চট্টগ্রামে আসেন, এবং তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন উৎসাহী ছিলেন যে, মাসিক তিনশত টাকা বৃত্তি দিয়ে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার গঠনে সাহায্য করেন। সুরেন্দ্রনাথ যখন কেম্ব্রিজ থেকে তাঁর হিন্দু-দর্শনের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন, সেই ১৯২২ সালে তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেন যে, বিলাতের শ্রেষ্ঠ

বিদ্যার্থীদের মত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীও লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে গেছেন শিক্ষা প্রসারের জন্ত।

আমরা তাঁর বিরাট গ্রন্থাগারে তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে মণীন্দ্র নন্দীর কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা বহুবার শুনেছি। পনেরো হাজারের উপর ছাপা বই এবং অমূল্য হস্তলিখিত পুঁথি—যা পরে কাশী বিশ্ববিভালয়ে তিনি দান করে গেছেন—এখন জাতীয় সম্পদ হয়ে রয়েছে। ১৯২০-২২ সালে তিনি ইয়োরোপে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য মণীষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতীয় দর্শনকে বিশ্বদর্শনের পর্য্যায়ে তুলে ধরেছিলেন। Dr. Mc Taggart-এর সঙ্গে গবেষণা করে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি রূপে প্যারিসে International Congress of Philosophyতে (যার সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক Henri Bergson) যোগদান করেন। সেই সময়ে আমিও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তাই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুদিন আমার গভীর সংযোগ হয়েছিল। প্যারিসে সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভারত-প্রত্যাগত রুশ দার্শনিক অধ্যাপক সেরবাটস্কী (Tcher-batsky) সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় দর্শন চর্চা করে আপ্যায়িত হন। তাঁর রচিত নির্ব্বাণ সম্বন্ধে গ্রন্থ বৌদ্ধদর্শনে প্রামাণ্য গ্রন্থ হয়ে আছে।

১৯১৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Griffith পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২০ সালে D. Phil উপাধি তিনি লাভ করেন। ১৯২৪ সালে International Philosophical Congress বসে Italy-র Naples শহরে এবং ১৯২৬ সালে আমেরিকার Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ে। Harvard থেকে Chicago প্রভৃতি ১২টি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে তিনি দেশের মুখোজ্জ্বল করেন। ১৯২৫ সালে Leningrad Academy of Sosince তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু সরকারের অনুমতি না পেয়ে রুশ নিমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ ও ১৯৩৯ এই তিন বছর Visiting Professor রূপে সুরেন্দ্রনাথ Rome, Milan, Breslan Konigsberg (Kant-এর বিশ্ববিদ্যালয়), Berlin (Hegel-এর বিশ্ববিদ্যালয়) এবং Boran, Cologne, Zurich, Paris, Warsaw (Poland) এবং England-এও বহু বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন।

১৯৩৬ সালে International Congress of Science বসে Rome শহরে এবং Rome বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে Honorary D. Litt উপাধি দেন। তাঁর বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ "Vanishing Lines" এক কবি সম্মিলনীতে সমাদৃত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও সরোজিনী নাইডুর কবিতাও পঠিত হয়েছিল। ইংরেজ সমালোচক Laurence Binyon লিখেছিলেন যে, সুরেন্দ্রনাথের সেই কবিতাগুলি প্রকাশিত না হ'লে সাধারণের ক্ষতি হবে। কিন্তু এখনও ভারতে সেগুলি প্রকাশিত হয় নি। পুরাতন 'প্রবাসী' ও অন্ত বাংলা পত্রিকা সন্ধান করলে তাঁর অনেক রচনা পাওয়া যাবে।

পোলাণ্ডে যাবার সময় আমার ছাত্র ডাঃ হিরণ্ময় ঘোষাল সুরেন্দ্রনাথের সাহচর্য্য লাভ করেন এবং দেখেন যে, University of Warsaw তাঁকে তাঁদের Academy of Sciences-এর Honorary Fellow পদে বরণ করেন। সেই সময়ে Royal Society of Literature, London তাঁকে Fellow পদে বরণ করেন।

এইভাবে বাংলার অধ্যাপক, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ঐতিহাসিকরূপে দেশবিদেশে সম্বর্দ্ধনা লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে অত্যধিক পরিশ্রমে এই সময় থেকে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ১৯৫৪ সালে ৭০ বছরের আগেই লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রী ও স্ত্রী শ্রীমতী সুরমা দাশগুপ্তার ভবনে তিনি দেহত্যাগ করেন। সুরমাদেবীর প্রাণস্পর্শী রচনাটি অবলম্বন করে মনীষী সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশবাসীকে এই সংবাদগুলি দিলাম।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

১ম খণ্ড Cambridge University Press 1922, পুনর্মুদ্রণ ১৯৩২-৫৭। এই প্রথম খণ্ডে তিনি তাঁর মূল বক্তব্যগুলি প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে এক খণ্ডে সর্ব্ব দর্শনের ইতিহাস লেখা তাঁর ইচ্ছা ছিল কিন্তু সম্ভব হয় নি ছাপা ৫০০ পাতায় শেষ করেন বেদ উপনিষদ থেকে বৌদ্ধ জৈন কপিল ও পাতঞ্জল সংহত যোগ। পরে ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা, শঙ্কর বেদান্তর ভূমিকা করে শেষ করেছেন।

২য় খণ্ড : দশ বছর পরে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। সাংখ্য ও বেদান্ত, যোগ বশিষ্ঠ আয়ুর্বেদ দর্শন ও ভগবদ্‌-গীতা শেষ করেছেন ৬২০ পাতায়। এই গ্রন্থে তাঁর শিষ্য-স্থানীয় অধ্যাপক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও জানকীবল্লভ ভট্টর সঙ্গে কন্যা দেবীর সাহচর্য্যের উল্লেখ দেখি।

৩য় খণ্ড, ১৯৩৯। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে শেষ হয়

তৃতীয় গাইকোয়াড় ভূপতিকে উৎসর্গ করেছেন। তার মধ্যে পঞ্চরাত্র ও দ্রাবিড় দেশের Arvars এবং বিশিষ্টা-দ্বৈত যমুনাচার্য্য রামানুজাদির সুবিস্তার আলোচনা দিয়ে সুরু করে নিম্বার্ক বিজ্ঞানভিক্ষু লোকায়ত চার্বাকাদি নাস্তিকদেরও আলোচনা আছে (৬১৪ পৃঃ)।

৪র্থ খণ্ড (দ্বৈত তত্ত্ব), ১৯৪৮ প্রকাশিত। মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা। মধ্ব সম্প্রদায় দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বের আলোচনা ও বল্লভ চৈতন্য জীব গোস্বামী ব্যাসদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ও চৈতন্য ভক্তদের দর্শন দিয়ে শেষ। ১৯৪৮ (Aug) মাসে ভূমিকা লেখার মধ্যে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সুরমা দাশগুপ্তের উল্লেখ আছে।

৫ম খণ্ড, ১৯৬৫ জুন মাসে তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী সুরমা দাশগুপ্ত লক্ষ্ণৌ তাঁর তথ্য-মূলক স্মৃতিকথা সমেত প্রকাশ করেন। দক্ষিণ ভারতের শৈব-সিদ্ধান্ত বীর শৈব প্রভৃতি থেকে পুরাণাদির নূতন ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু ৩০০ পাতায় সব শেষ করা সম্ভব হয় নি। এখনও বাকী আছে উত্তর ভারতীয় শৈব দর্শন, ব্যাকরণ-দর্শন, তন্ত্র-দর্শন এবং অলঙ্কার শাস্ত্র দর্শন মিলিয়ে বাকী কয় খণ্ডে শেষ হবে জানা নাই, কিন্তু সুরমাদেবীকে ভারত-রাষ্ট্র ভার দিয়েছেন শেষ করতে।

প্রায় ২০০০-৩০০০ পাতায় ছাপা এই বিরাট গ্রন্থ যেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভারতীয় দর্শনের 'বিশ্ব-কোষ' রচনা করে গেছেন তাই সারা ভারতে বিশেষ করে বাংলা দেশের কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রাপ্য।

তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থ শীঘ্র সম্পূর্ণ হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

সুপ্রভাত! কেমন আছেন?

প্রভাত পড়িয়ে তখন মাথার ওপরে সূর্য··কাজেই মাথা আর বড় ঠাণ্ডা নেই। তবু উত্তর একটা দিতে হ'ল, বললাম, খুব ভাল আছি।

—চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। আমিও তাই বলি। খুব ভালই ত আছি আমরা ভাল থাকব না ত কে থাকবে? প্রয়োজন আমাদের কতটুকু? কিন্তু আমরা চাই প্রচুর···শুধু 'দাও দাও' রব। কুবেরের ঐশ্বর্য দিয়েও আমাদের তৃপ্তি নেই।

—হাঁ, খুব মনে পড়েছে তার, সেদিন যে বাড়ীটার কথা বলেছিলেন···দেখলাম মন্দ হবে না। আপনি ঠিক যেমনটি চান বাঃ, আপনার পছন্দ আছে মশায়! আমি ত এই কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেললাম দেখলাম ত অনেক, কিন্তু আপনার মত এমন পরিষ্কার দৃষ্টি খুব কমই দেখেছি। নিয়ে ফেলুন, দামেও খাটো হবে।

জানি, লোকটার কোনও কথাই সত্যি নয়। এমনি বহুবার বহু কথা সে বলেছে এবং এমনি অনেক সন্ধান দিয়ে কিছু টাকাও সে বারকয়েক নিয়ে গিয়েছে। তবু বললাম, দেখুন চেষ্টা করে।

—ঐ বাড়ীটার দিকে নজর আছে মল্লিক-বাড়ীর মেজকর্তার। লোকটা টাকার কুমীর। তবু গাড়িই কিনে চলেছে। দশখানা গাড়ি মশাই! একদিন বলেছিলাম, দশখানা গাড়ি দিয়ে কি করবেন মল্লিকমশায়, পাছা ত সেই একখানাই।

কথার উত্তর না দিয়েও দেখেছি, লোকটা অনর্গল বকে যায়—নিঃশব্দে কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, যাকে বলে অসহায়ের মতন, তার অজস্র মিথ্যা-ভাষণ আমাকে শুনতে হ'ল।

সত্যি কথা বলতে কি, বাড়ী কিনবার মত টাকা আমার নেই। আগ্রহ আছে কিন্তু সামর্থ্য নেই। আগ্রহ কার না থাকে। সবাই চায় নিজস্ব একটা মা' গুঁজবার জায়গা। চায় ত মানুষ অনেক, কিন্তু ক' তার পায়!

তবু কেন জানি না, লোকটা আমাকেই মে ঠাওরালে! তবু মজেন মনে করা নয়—আমাকে দি সে বাড়ী কেনাবেই। যত বলি, আমার টাকা কোথ মশাই! তত লোকটি বিনীত কণ্ঠে বলে, কি বলেন!

দেখলাম, আর বলে হবে না, পালাতে হবে। ে সুযোগই খুঁজছি, লোকটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল বললে, না-হয় নাই কিনলেন···সময়ে-অসময়ে দু-চ টাকা আপনার কাছ থেকে নিয়েছি বলে, হয়ত দাঁড় আপনার সঙ্গে কথা বলবার যোগ্য নই—এতটা দূ নাই বা ভাবলেন!

পালাতে গিয়েও পালাতে পারলাম না। যে বললাম টাকার জন্যে নয়, আমার একটু কাজ আছে;

খুব মনে পড়েছে মশায়! দেখলেন, বৃথা সময় অপব্যয় কখনও হয় না—হয়ত আপনার লাভ হ'ল ; কিন্তু দেখছেন, কারও না কারও উপকারে লেগে গে একটা মনি-অর্ডার করতে হবে ফর্মটা নিয়ে ঘুরছি, ক অভাবে লেখা হয় নি···হঠাৎ আপনার কলম দেখে ম পড়ে গেল, আর বোধ হয় সময়ও নেই—

পকেট থেকে কলমটা বের করে দিলাম।

—বাঃ, চমৎকার পেন ত! Parker 51? এ কলম বের করেছিল মশাই!

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনি-অর্ডারের ফ লিখতে লাগল। হঠাৎ একটা বাস আসছে দে লোকটা ছুটে গেল—এই রোখকে! চলন্ত বাসে লোকটা উঠে পড়ল।

বাসটা চলে গেলে খেয়াল হ'ল, আমার কলম!

*   *   *   *

অনেক দিন পরে দেখা। চিনতে পারলাম, সেই লোকটি। তবে এবারে ভোল বদলেছে। প্রায়ই দেখি—আপনারাও দেখেছেন। যাকে বাগবাজার থেকে বালিগঞ্জ অর্থাৎ শহরের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই দেখা যায়,

যার পরণে শান্তিপুরে ধুতি, গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে কালো পাম্প-শু আর হাতে 'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট'-এর টিন,

সে সাহিত্য-সভাতেও আছে, রাজনীতির দলাদলিতেও আছে, বড়লোকের মজলিশে এবং সরকারী দপ্তরখানায় যার সমান খাতির,

তাকে নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। লম্বা, গৌরবর্ণ লোকটি, যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে যাকে সকলেই চেয়ে চেয়ে দেখে। যাকে জানেন না এমন কোনও সম্ভ্রান্ত লোক নেই, যে আছে সর্বঘটে। গ্রাণ্ড হোটেলে 'ডিনার পার্টি'তেও আছে, কফি-হাউসের বৈঠকী-বিশ্রম্ভালাপেও আছে।

থিয়েটার-মহলে, সিনেমা-রাজ্যে অবাধ পাসপোর্ট যার। নটীদের নিয়ে রসিকতাও করে, আবার নাট্য-পরিচালনায় উপদেষ্টা হিসেবেও যাকে আহ্বান করা হয়।

ট্রাম-বাসেও দেখেছি, যে একাই কথা বলে চলেছে। যাত্রীরা নীরব শ্রোতা।

লোকটির পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। জানে না, এমন বিষয়বস্তু নেই। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনাও করতে শুনেছি, আবার রাজনীতির কূট তর্ক নিয়েও একটা সমাধানে পৌঁছুতেও তাকে দেখেছি। আইনষ্টাইন কবে কি বলেছেন এবং সেই মতবাদকে কে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে এও যেমন তার নখদর্পণে, তেমনি প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্য থেকে আজকের সাহিত্য কোথায় এসে ঠেকেছে তার খবরও সে অনর্গল মুখে মুখে বলে যেতে পারে।

এই অসাধারণ লোকটিকে জানবার কৌতূহল কার নেই। কিন্তু তাকে জানা যায় না। আর জানা যায় না বলেই লোকটা সকলের বিস্ময়।

সবচেয়ে বিস্ময় লাগে, যখন দেখি বড়লোকের তোষামোদ করে তাকে জীবিকা অর্জন করতে হচ্ছে। তোষামোদ একটা বৃত্তি—প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি যা চলে আসছে। এই 'জল উঁচু জল নীচু' দলের আর যাই থাক, তার 'কালচার'-এর বালাই নেই। কিন্তু এই লোকটি? এর 'কালচার'কে ত অস্বীকার করা যায় না!

কিন্তু অপূর্ব এই লোকটি! তার এই নতুন ষ্টাইল নিয়ে—সেই গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পাম্পশু আর হাতে 'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট'-এর টিন নিয়ে সে এই শহরে ত কাটিয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু লোকটা করে কি?

এ প্রশ্ন অনেকের মনেই আসে। এই 'প্লেন লাইফ-ষ্টাইলে' বসবাস করতে হলে যে-অর্থের প্রয়োজন, সে-অর্থ কি আসে বড়লোকের তোষামোদ করে?

পথে দেখা হয়, বড় ইচ্ছে করে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করি।

বন্ধু বললেন, এ সব তোমরা বুঝতে পারবে না। তবে ও একটা বিদ্যা—কলা হিসেবে শিক্ষা করতে হয়। প্রেমের অভিনয় করতে দেখেছ? তোমাকে জানতে দেবে না, কতবড় মিথ্যে তার মধ্যে লুকোনো আছে।

ঐ লোকটি যার কথা তুমি জানতে চেয়েছ, সে সারাটা জীবন ধরে শুধু নিজেকেই প্রচার করেছে। আজকের যুগে এই পাবলিসিটি হ'ল সবচেয়ে বড় জিনিস। এই পাব্লিসিটির জোরে মানুষ হ'তে পারে না এমন কিছুই নেই। বড় সাহিত্যিক হ'তে হ'লেও এই পাব্লিসিটিই করে মানুষকে রাজা উজীর—এই পাব্লিসিটিই দরকার। এই পাব্লিসিটি করে মূর্খকে পণ্ডিত, মহাপুরুষ হতে গেলেও চাই এই পাব্লিসিটি পাব্লিসিটির জোরেই দশ-কে নয়, দিনকে রাত্রি করা যায়। ওকে প্রয়োজন সরকারী দপ্তরখানাতেও, আবার প্রয়োজন বড় বড় মহাজনদেরও। ও বেশ এসেছে উপকারীর মধ্যমণি হয়ে। কোন্ অসাধ্য-সাধন করতে হবে, সে তার সঠিক রাস্তা দিয়ে অতি নিরাপদে তাকে বের করে দেবে। উপকারী ব্যক্তি তাকে একটা মোটা অংশ সেলামী দিয়েও লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করে। গভীর জল থেকে কি করে মাছকে টোপ মেরে নিতে হয় সে বিদ্যা জানে মাছরাঙা।

কিন্তু চতুর লোকের পা-ও মাঝে মাঝে খানায় পড়ে। লোকটি একটা বড় রকমের লেন-দেন করতে গিয়ে ধরা পড়ল।

লক্ষ লোকের চোখের সামনে দিয়ে লোকটাকে তারা কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল। সেই আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, পরনে শান্তিপুরে ধুতি, পায়ে পাম্প-শু আর হাতে 'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট'-এর টিন।

বিদেশের কথা

ঝড়ের আবর্তে ইন্দোনেশিয়া

শ্রীঅমর রাহা

"তোমরাই হচ্ছ আমাদের হৃদয়ে বীর। আমরা বিশ্বাস করি সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী," বললেন জেনারেল আবদুল হারিস নাসুতিয়ান হয়জন নিহত জেনারেলদের শবাধারকে উদ্দেশ্য করে। প্রায় দশ হাজার লোক ভিড় করে রয়েছে চারদিকে এবং নিজে এসেছেন ক্রাচের পর ভর করে। তা ছাড়া নাকি তাঁর পাঁচ বছরের কন্যা নিহত হয়েছে ঐ হত্যাকারীদের দ্বারা।

ঘটনা ঘটল ৩০শে সেপ্টেম্বর। কর্ণেল উনতুং প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর রক্ষীবাহিনীর একাংশ নিয়ে 'দখল' করলেন ক্ষমতা, আর জীবন বিপন্ন বলে বিমানবাহিনীর একাংশের সহায়তায় জাকার্তা হতে সুকর্ণকে নিয়ে যাওয়া হ'ল হালিম বিমান বন্দরের নিকট। এই হালিম বিমান বন্দরের কাছে না কি পি-কে-আই গরিলা বাহিনীর শিক্ষা দিচ্ছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না এই ক্ষমতা, নাসুতিয়ান দলছুটরা পূর্ণ ক্ষমতা দখল করল। উনতুং পালিয়ে গেলেন এবং পরে ধরা পড়লেন। তাঁকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কারা কারা ছিল আমার জড়। ৩০শে সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থানের শেষ হ'ল।

ছাত্ররা বেরিয়ে পড়ল জাকার্তার রাস্তায়। তাদের দাবী হ'ল 'আইদিতকে হত্যা কর', 'কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী কর'। একদল সৈন্যদলের সামনেই জ্বালিয়ে দিল কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস। শুধু তাই নয়। এই সময় আর একদল ছাত্র এগিয়ে গেল মার্কিন দূতাবাসের দিকে এবং তাদের ধ্বনি হচ্ছে : 'মার্কিন দেশ দীর্ঘজীবী হউক'। অন্যদিকে আর একদল ছাত্র ধ্বনি করে এগিয়ে চলল যে CIA সাহায্য করছে কমিউনিষ্টদেরকে।

একথা সত্য যে, ত্রিশ লক্ষ সদস্যের কমিউনিষ্ট পার্টি ইন্দোনেশিয়ার নানা স্তরে তার প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তা হ'তে সৈন্যবাহিনীও বাদ যায় নি। এবং কি করেই বা তা সম্ভব। চাষী-মজুর এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব থাকলেই সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা স্তরে সে প্রভাব পড়বে বা থাকবে। তবে প্রশ্ন হ'ল, কতটা পরিমাণে উনতুং অভ্যুত্থানে কমিউনিষ্টদের সমর্থন ছিল? সামরিক বাহিনীর অভিযোগ হ'ল যে, পি-কে-আই বেশ ভালভাবেই উনতুং অভ্যুত্থানে জড়িয়ে ছিল। একথা সত্য বলে মনে হয়, কারণ শোনা যায় যে, এই অভ্যুত্থানের বেশ কিছুদিন পূর্ব হতেই নেতৃস্থানীয় কমিউনিষ্ট সদস্যদেরকে বাড়ীতে শুতে মানা করা হয়েছে এবং এদের মুখপত্র উনতুং অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়েছে।

'নাসাকম'-নীতি কার্যকরী করার দরুন নাকি কমিউনিষ্টরা বেশ শক্তিশালী হয়ে পড়ছিল। নাসুতিয়ান দল এ সুনজরে দেখছিল না। আবার সৈন্যবাহিনীর একাংশ এবং সুকর্ণর মধ্যে যেন একটা চাপা বিরোধ বিরাজ করছিল বহুদিন ধরে। প্রকাশ পেল সেদিন যখন নিহত সেনানীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সুকর্ণ নিজে উপস্থিত হলেন না, আর অন্যদিকে যখন পরের দিন বোগরে প্রেসিডেন্টের গ্রীষ্মাবাসে মন্ত্রীসভার সভা আহ্বান

করলেন তখন জেনারেল নাসুতিয়ান উপস্থিত হলেন না। অথচ উপস্থিত ছিলেন দু'জন কমিউনিষ্ট সদস্য এবং বিমানবাহিনী জেনারেল ওমর দানী। জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ও কমিউনিজম সমন্বয় নীতি, অর্থাৎ 'নাসাকম' আজ এমন অবস্থায় এসেছে যখন কেউ কাউকে মিত্র বলে গ্রহণ করতে পারছে না।

সমস্যা সামরিক বাহিনীকে সমর্থন জানান, না কমিউনিষ্টদেরকে। এই সমস্যার সমাধানের পর নির্ভর করবে সুকর্ণ আজ কতটা সক্ষম। কারণ সামরিক বাহিনী পূর্ণভাবেই নাসুতিয়ানের কমিউনিষ্ট-বিরোধী জেহাদ শুরু করেছে।

সুকর্ণ কি করবেন তা এখন কিছু কিছু পরিষ্কার

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ

ওদিকে নাসাকম-স্রষ্টা সুকর্ণর সমালোচকরা বলে: সুকর্ণ এখন বৃদ্ধ। যদিও সেদিনও সাতজন চীনা ডাক্তার সর্বক্ষণ সঙ্গে রয়েছে সুকর্ণর, তবুও তাঁকে দেখলে মনে হয় না যে, সে এখন অতি বৃদ্ধ ও অসুস্থ। তবে অসুস্থ তিনি নিশ্চয় কারণ ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় তিনি ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের আহ্বান জানালেন পাকিস্তানকে সমর্থন করতে। প্রসঙ্গত বলা ভাল চীনারাও সমর্থন জানিয়েছে পাকিস্তানকে এবং এর জন্ত গোলাগুলি ও হাজারী চীনাদেরকে বিদায় দিয়েছে। এখন সুকর্ণর কাছে হচ্ছে। তিনি প্রধানতঃ ঝুঁকে পড়বেন সামরিক বাহিনীর 'পর। হয়ত প্রয়োজনবোধে আরও ঝুঁকে পড়তে হবে। কারণ নানাবিধ। প্রথম প্রশ্ন আসে যে কি কারণে তিনি ধর্মকে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আনতে চেষ্টা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদকে লড়তে হলে ধর্মকে প্রয়োজন হয় না, যেমন হয় না শোষকশ্রেণীকে হটানর প্রয়োজনে। তা ছাড়া, সেদিনকার বান্দুং সম্মেলনের সুকর্ণর এ-ধারায় চলার পেছনে এমন কিছু আছে যা সুধী সমালোচকের গবেষণার বস্তু হ'তে পারে। প্রসঙ্গতঃ এখানে হয়ত

উল্লেখ করা যায় সেদিনকার সুকর্ণ-ঘোষিত সংবাদ। তাঁকে নাকি আমেরিকানরা বেশ কিছু ডলার ঘুষ দিতে চেয়েছিল! সংবাদ আশ্চর্যজনক। কিন্তু, প্রশ্ন ওঠে যে কেন এবং কি সাহসে মার্কিন স্বার্থ প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে ঘুষ দিতে চেয়েছিল? বন্ধু-বন্ধুকে ঘুষ দিয়ে কিনতে চায় তা বোঝা যায়, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টকে— !

অর্থনৈতিক দিক থেকে ইন্দোনেশিয়া বেশ কিছু অসুবিধা ভোগ করছে। দেশের অর্থনীতি হ'তে সামরিক দপ্তর বেশ এক থাবা তুলে নিচ্ছে। আবার দ্বৈত অর্থনীতি থাকার দরুন আভ্যন্তরীণ বাজার প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির নিয়ম এড়াতে পারছে না। ফলে পণ্যদ্রব্যের দাম ঊর্দ্ধমুখী, অন্যদিকে রয়েছে নানা বিরোধ। এদিকে সুকর্ণ কিছুই করতে পারেন নি। সমস্যা সমস্যাই রয়ে গেছে—সমাধান বোধ হয় কিছুরই হয় নি।

এর মানে এ নয় যে নাসুতিয়ান পরিচালিত নীতি ইন্দোনেশিয়াকে সুস্থ পথে চলতে সাহায্য করবে, যেমন অবশ্য করবে না আইদিত পরিচালিত নীতি। যদি আইদিত-দল সত্যই গুণগত দিক হ'তে সফল হ'ত এবং তাঁর বর্ত্তমান নীতি সঠিক হ'ত তবে ইন্দোনেশিয়া এমন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ত না। এখন যা হয়েছে তা দেখে মনে হয় দেপোর মারে দই।

তিন হাজার দ্বীপের ১০৫,০০০,০০০ অধিবাসীরা নতুন এক ঝড়ের আবর্তে পড়ল। এমন করে এই ঝড় এল যা বিশ্ববাসী বুঝতেই পারল না যে এর উৎস কোথায়। নানা জল্পনা-কল্পনা, নানা অভিযোগ। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে জোড়া-তালির দীনতা। ইতিহাস বলবে কবে আসবে জীবনের স্বচ্ছতা।

অনিবার্য্য কারণবশতঃ বিশ্বসাহিত্য এই সংখ্যায়
প্রকাশিত করা গেল না, আগামী সংখ্যা
থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(তেত্রিশ)

ইতিমধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটে গেল। গিন্নীমা প্রায় আগের মতই সমস্ত দেখাশুনা আরম্ভ করেছেন। বাইরে থেকে অবশ্য ঠিক আগের মতই, কিন্তু ভিতর থেকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় আগের সেই জোরটা যেন কমেছে। সবই আগের মত খোঁজখবর নেন, হুকুমও দেন, কিন্তু হুকুমের মধ্যে যেন প্রাণ নেই।

এই অবস্থায় মালতী প্রস্তাব করলে, জমিদারী, দোকান, সমস্ত একবার হিসাব-নিকাশ করা হোক। অনেকদিন হিসাব-নিকাশ হয় নি। একবার হওয়া দরকার। আমরা বুঝতে পারব ভিতরের অবস্থাটা কি।

মালতী গিন্নীমার কাজে কখনও হস্তক্ষেপ করে না; কিন্তু গিন্নীমা বুঝতে পারেন, তার একটা চোখ এদিকে রয়েছে। আড়াল থেকে সব বিষয়েই সে যথাসাধ্য খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করে।

হিসাব-নিকাশের কথাটা সে আগেও একবার তুলে-ছিল। গিন্নীমা রাজি হন নি এবং তার ধমক খেয়ে মালতীও চুপ করে গিয়েছিল। এবারের প্রস্তাবটা শুনেও তিনি একবার চোখ তুলে তার দিকে চাইলেন। ভাসা-ভাসা চোখ। দৃষ্টিতে আগের সেই দীপ্তি নেই। সেই কাঠিন্যেরও অভাব।

আশ্চর্য, এবারে তিনি আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, করাও। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার পরে সামলাতে পারবে?

মালতী দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, পারব।

কিসের জোরে বললে সেই জানে। গিন্নীমা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন। শেষে শান্ত কণ্ঠে বললেন, করাও।

সর্বত্র হুকুম চলে গেল হিসাব-নিকাশের জন্যে খাতা তৈরি করতে। সর্বত্র সাজ-সাজ পড়ে গেল। তহবিল তছরূপ সর্বত্রই হয়েছে। একথা সবাই জানে। গিন্নীমাও যে না জানেন তাও নয়। অথচ দীর্ঘদিন হিসাব-নিকাশের কোন কথা ওঠে নি। আজ কেন উঠল তাই ভেবেই সবাই অবাক হয়ে গেল। বড় কর্মচারীরা পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠল। এ হুকুমটা আসলে কার? গিন্নীমার? না পিছনে বৌরাণী আছেন? কিন্তু বৌরাণী ছেলেমানুষ। বড় কর্মচারীদের চটাবার সাহস কি তাঁর হবে? কি জানি বাবা একালের লেখাপড়া-জানা মেয়ে, অসম্ভব কিছুই নয়।

হরেকৃষ্ণ শুষ্ক মুখে রামকিঙ্করকে ডেকে বললে, দেখ ত বাবা কি কাণ্ডটা! এখন এই এতদিনের হিসাব-নিকাশ, সে কি সোজা কথা! দোকান বন্ধ রেখে তা হ'লে তাই করতে হয়।

কথাটা শুনে রামকিঙ্করও কম অবাক হয় নি। এর পিছনে যে বৌরাণী আছেন, তাতেও তার সন্দেহ রইল না। কিন্তু বৌরাণীর এত সাহস কি করে হ'ল? তাঁর পিছনে কে আছেন? মনোহর ডাক্তার? কিন্তু মনোহর এ সবের কি বোঝে?

মুখে হরেকৃষ্ণকে সে বললে, কি আর করা যায়? যাঁদের কারবার তাঁরা ত হিসাব-নিকাশ করবেনই। এতদিন করেন নি সেইটাই আশ্চর্য।

হরেকৃষ্ণ বললেন, সেই কথাই ত ভাবছিলাম। খাতা যারা রাখে, মোটা টাকার ব্যাপার, হিসাবে কিছু গরমিল থাকবেই। কি বল, অভাবে পড়ে দরকারের সময় কিছু কিছু তহবিল তছরূপ হওয়াও বিচিত্র নয়। গিন্নীমা সব জানেন, এটাও নিশ্চয় জানেন। জানেন বলেই বোধ হয় কাউকে বিব্রত করতে চান নি। আজ হঠাৎ সে চেষ্টা কেন?

—গিন্নীমার মনের কথা কে বলবে বলুন? কিছু একটা তিনি ভেবেছেন নিশ্চয়। তাঁর অমতে ত আর হচ্ছে না।

হরেকৃষ্ণ বললে, কিছু বলা যায় না রাম। আমার সন্দেহ গিন্নীমার অমতেই বোধ হয় হচ্ছে।

এ সন্দেহ রামের মনেও যে ওঠে নি তা নয়, শুধু বললে, তাঁর অমতে কি কিছু হওয়া সম্ভব?

সেও বটে। রাশ এখনও তাঁর হাতে। বিরাট ব্যাপার।

বৌরাণীর পক্ষে এত বড় ব্যাপারের হাল ধরতে যাওয়ার সাহস হবে না।

হরেকৃষ্ণ বললে, আমার আর একটা কি কথা মনে হয় জান?

—কি কথা?

—গিন্নীমা বোধ হয় অবসর নিচ্ছেন। খোকাবাবু সম্পত্তির সমস্ত হিসাব-নিকাশ বৌরাণীকে বুঝ-পড়িয়ে দিয়ে বোধ হয় তিনি অবসর নেবেন।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল: বলেন কি? বলতে গেলে তাঁর শ্বশুরের আমল থেকেই তিনি সব দেখাশুনা করছেন। এতদিনের সম্পর্ক চুকিয়ে অবসর নেওয়া কি সহজ কথা?

—সহজ কথা নয় জানি। সহজ কথা হ'তও না যদি বাবু হঠাৎ মারা না যেতেন। গিন্নীমা যত শক্তই হন, বাইরের থেকে যত শক্তই বোধ হোক না কেন, মা ত।

এই অনুমান রামকিঙ্করের সম্ভবপর মনে হ'ল। বললে, আপনি একবার গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করুন বরং। বললেন এত তাড়াতাড়ি হিসাব-নিকাশ সম্ভব নয়।

হরেকৃষ্ণ বললে, সম্ভবপর নয় ত নিশ্চয়। গিন্নীমার কাছে যেতেও হবে। কিন্তু এর পেছনে যদি বৌরাণী থাকেন, তা হ'লে কাজ কিছু হবে বলে মনে হয় না।

ফল হ'লও না।

গিন্নীমা পরিষ্কার বলে দিলেন, খিনু এখন সাবালক হলেন, কাজেই আমাদের দায়িত্ব এখন অনেক বেশী। দোকানই বল, আর জমিদারীই বল, অবস্থাটা পরিষ্কার হওয়া ভাল।

হরেকৃষ্ণ শুক মুখে ফিরে এল। রামকিঙ্করকে নিভৃতে ডেকে ব্যাপারটা বললে। আশ্চর্য এই যে, যে রামকিঙ্করকে সে এক সময় শত্রু বলে মনে করত, এখন তাকেই ছাড়া বিশ্বাস করবার কাউকে পাচ্ছে না।

শুনে রামকিঙ্কর বললে, এখন উপায়?

হরেকৃষ্ণর মাথায় উপায় কিছু আসছিল না। করুণ কণ্ঠে বললে, উপায় তুমিই বল। আমার মাথায় কিছু আসছে না। তার ওপর আজকেই বাড়ী থেকে চিঠি পেলাম ছোট ছেলেটার কঠিন অসুখ। পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার। না কোবরেজ, না ডাক্তার। কি হচ্ছে ভগবান জানেন।

কথাটা পাছে রামকিঙ্কর বিশ্বাস না করে সেজন্যে আস্ত চিঠিখানাই তাকে দেখালে।

বোঝাই যাচ্ছে, কথাটা বানানো নয়। হিসাব-নিকাশের কথা ওঠার আগেই লেখা।

রামকিঙ্কর বললে, এক কাজ করুন হরেকেষ্টবাবু।

—কি কাজ?

—এই চিঠিখানা নিয়ে আপনি এখনই গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করুন। আর রাত্রের ট্রেণেই বাড়ী চলে যান।

হরেকৃষ্ণ মাথায় অনেক বুদ্ধি রাখে কিন্তু হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে এমনই হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যে সহজ ব্যাপারটাও তার মাথায় আসছিল না। সে যেন একটুখানি আলোর রেখা দেখতে পেল। কিন্তু সেই ক্ষীণ রেখাটুকুও তখনই দপ করে নিভে গেল।

বললে, সে আর ক'দিনের মামলা বাবা। পাঁচদিন, সাতদিন, দশদিন। তারপরে ত ফিরতে হবে।

কথাটা মিথ্যা নয়।

একটু ভেবে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, দেশে আপনার জমিজমা কিছু আছে?

—তা তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে।

—তা হ'লে আমি বলি কি, আর নাই ফিরলেন।

দুঃখের মধ্যেও হরেকৃষ্ণ হেসে ফেলল: তাতেই কি বাঁচোয়া আছে? হুলিয়া করে টেনে আনবে না।

রামকিঙ্কর ভেবে বললে, সেটা যাতে না করে পাঁচজনে মিলে সে চেষ্টা করা যাবে। একটু সময় পেলে অনেক কিছু করা যায়।

ভাবাবেগে হরেকৃষ্ণ লাফিয়ে উঠে রামকিঙ্করের গলা জড়িয়ে ধরলে: পারবে বাবা? তোমার একশো বছর পরমায়ু হোক। তুমি রাজা হও। আমাকে বাঁচাও বাবা।

বলেই স্ত্রীলোকের মত ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

এই লোকটির উপর রামকিঙ্করের আক্রোশ কম ছিল না। কিন্তু এখন লোকটির অবস্থা দেখে তার মনে দয়া হ'ল। অনেক রকম সাহস ও আশ্বাসের কথা বলে সে তাকে গিন্নীমার কাছে পাঠিয়ে দিলে।

খবরটা শুনে গিন্নীমা কিছুক্ষণ ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। মনে হ'ল তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি বাঁকা হাসিও যেন খেলে গেল। হরেকৃষ্ণের বাড়ীর চিঠি পড়েও তাঁর বিশ্বাস হ'ল কি না বোঝা গেল না।

জিজ্ঞাসা করলেন, কখন যাবে?

—রাত ন'টায় একখানা গাড়ি আছে। আপনার অনুমতি পেলে সেইটেতেই যাব ভাবছি। আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

বলে আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করলেন, কবে ফিরবে?

হরেকৃষ্ণ বললে, ছেলেটা একটু ভালোর দিকে এলেই চলে আসব। আট দিন, কি ধরুন দশ দিনের মাথায়।

—তাই এস। এলে হিসেব-নিকেশ হবে। ছেলের অসুখ বলার ত কিছু নেই।

বলে গিন্নীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এতক্ষণ পরে বোধ হয় তাঁর নিজের ছেলের কথা মনে পড়ল।

হরেকৃষ্ণ দ্রুতপদে দোকানে ফিরে এল। এবং ছুটি মঞ্জুরির কথাটা রামকিঙ্করকে জানিয়ে বোঁচকা বেঁধে দেশে রওনা হ'ল।

সুবল জিজ্ঞাসা করলে, পালাল ?

রামকিঙ্কর বোধ হয় হরেকৃষ্ণের আগের বারের দেশে যাওয়ার কথা ভাবছিল। সেবার তার নিজেরই অসুখ হয়েছিল। এবারের অসুখটা তার ছেলের।

অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলে, হ্যাঁ।

বিরক্ত ভাবে সুবল বললে, তুমি এতও পার ·

সারদার সঙ্গে একবার দেখা হলে ভাল হ'ত। কিন্তু এখন তাকে পাওয়া অসম্ভব। কাল সকালেও না। দেখা পাওয়া যেতে পারে সেই কাল বিকেলে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য-ধারণ অসম্ভব।

সারারাত্রি রামকিঙ্করের চোখে ঘুম এল না। বড় বাড়ীর ঘটনাগুলো কেবল মনে মনে বিশ্লেষণ করতে লাগল। কিন্তু বড় বাড়ীর বড় ব্যাপার। তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছুন রামকিঙ্করের মত সামান্য লোকের কাজ নয়।

সকালে চিন্তিত ভাবে রামকিঙ্কর গদিতে এসে বসল। হরেকৃষ্ণ চলে গেছে কিন্তু তার জায়গায় কে কাজ করবে সে হুকুম এখনও আসে নি। তা নিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে প্রবল গবেষণা আরম্ভ হয়ে গেছে।

সুবল রামকিঙ্করকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, আর ভেবে কি হবে তোমার ওপরেই ভার পড়বে সে ত জানা কথা। ক্যাশ-বাক্সের সামনে গিয়ে বসে পড়।

বলতে বলতেই গিন্নীমার কাছ থেকে তলব এল তখুনি দেখা করবার জন্যে।

হা হা করে হেসে সুবল বললে, হ'ল ত? গরীবের কথা সত্যি হ'ল ত? যাও, গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করে হুকুম নিয়ে এস। আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রামকিঙ্কর চলে গেল। গিন্নীমা ঠাকুরদালানেই বসে ছিলেন, যেমন নিত্য বসে থাকেন।

রামকিঙ্কর গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হরেকেষ্ট চলে গেছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল রাত্রেই।

—দোকানের কি হবে ?

—আপনি যেমন হুকুম করবেন।

—এর আগের বার ত তুমিই ওর কাজ চালিয়েছিলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা হ'লে এবারেও তাই করবে। আট দশ দিনের মধ্যে ফিরবে বলে গেছে, এ ক'টা দিন তুমিই চালাও।

এমন সময় সামনের উঠোন দিয়ে সারদা হনহন করে বাইরে গেল। রামকিঙ্করের দিকে ফিরেও চাইলে না। কিন্তু রামকিঙ্করের বুঝতে বাকি রইল না মোড়ের মাথায় সারদা তার জন্যেই অপেক্ষা করবে। সে তখনই উঠলে না। আরও দু'চারটে কথার পর গিন্নীমাকে প্রণাম করে বললে, আমি তা হ'লে উঠি। আপনার হুকুমের জন্যে দোকানের সবাই অপেক্ষা করে আছে।

—যাও।

রামকিঙ্কর বেরিয়ে এসে দেখলে, মোড়ের মাথায় সারদা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে দেখে বললে, অনেক খবর আছে। বিকেলে আমার ঘরে আসবেন।

রামকিঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, ততক্ষণে আমার পেট ফুলে ফেটে যাবে। এখনই চল তোমার ঘরে যাই।

সারদা হেসে ফেললে: পেটে দড়ি বাঁধুন। এখন আমার এক মুহূর্তও সময় নেই, তা আপনার পেট ফুলুক আর ফাটুক।

সারদা চলে যাচ্ছিল।

সকাতরে রামকিঙ্কর বললে, একটুখানি সংক্ষেপে বলে যাও খবর ভাল কি মন্দ।

চলতে চলতে সারদা মুখ ফিরিয়ে ফিক্‌ করে হেসে বললে, সব কথা বিকেল বেলায় জানতে পারবেন। পারেন ত এক ঠোঙা মিষ্টি হাতে করে যাবেন।

—মিষ্টি!

—হ্যাঁ। ভাল খবর হ'লে খাওয়াতে হবে না ?

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে রামকিঙ্কর দেখলে, সারদা দেউড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চিন্তিত মুখে রামকিঙ্কর দোকানে ফিরল। মনের মধ্যে আনন্দের একটা আমেজ আছে কিন্তু সে খুব গভীরে।

দোকানের কর্মচারীরাও রামকিঙ্করের পথের দিকে চেয়ে

চিন্তিত মুখে বসে আছে ব্যাপারটা কি হ'ল শেষ পর্যন্ত জানবার জন্যে।

রামকিঙ্কর ফিরতেই সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল: কি হ'ল, কি হ'ল?

রামকিঙ্কর গম্ভীর ভাবে বললে, কিছুই বুঝলাম না।

—তার মানে?

—ভেতরে ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে মস্ত বড় একটা পরিবর্তন আসন্ন।

—মস্ত বড় একটা পরিবর্তন!

—তাই মনে হচ্ছে।

সবাই নিঃশব্দে নিজের নিজের পথে চিন্তা করতে লাগল।

সুবল একটা কথা বেশিক্ষণ চিন্তা করতে পারে না। বড় বাড়ীর বড় ব্যাপার সম্বন্ধে তার আগ্রহ কম। তার পৃথিবী এই দোকানটা। তার আগ্রহও এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বললে, তুমি বাপু দোকানের কি হ'ল তাই বল। আমি ওসব মস্তবড় পরিবর্তনের ধারধারি না।

রামকিঙ্কর বললে, দোকানের কি হবে?

—কে ম্যানেজার হ'ল জানতে চাই।

—আট-দশ দিন বাদে হরেকেষ্টবাবু ফিরবেন। সেই পর্যন্ত দেখাশুনার ভার আমার উপর। তার পরে কি হবে জানি না।

—আর যদি হরেকেষ্টবাবু না ফেরে?

—তা হ'লে কি হবে জানি না।

আর একজন সুবলকে ভরসা দিয়ে বললে, ভাবছ কেন? তা হ'লেও কিছু একটা হবে। এত বড় একটা দোকান ত আর উঠে যাবে না। আমাদের খাস-জল কে খাবে?

সবাই হেসে উঠল।

রামকিঙ্কর লোহার সিন্দুকটা খুলে খাতার সঙ্গে তহবিলটা মিলিয়ে নিলে।

সুবল জিজ্ঞাসা করলে, ঠিক আছে?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, ঠিক থাকবে না কেন? ভদ্রলোক নিজের হাতে মিল করে রেখে গেছেন।

একটা চুমকুড়ি কেটে সুবল বললে, হুঁ হুঁ বাবা, ভদ্রলোকটিকে ত চেন। কাঁচাখেগো দেবতা। তোমার কাছেই উপকার নেবেন, আবার তোমাকেই ডোবাবেন, এ উনি সহজে পারেন।

—তা পারেন।

সবাই সমর্থন করল।

রামকিঙ্কর বললে, সাপ যে সাপ, যখন মানুষের সঙ্গে এক কাঠের উপর বানে ভেসে চলে তখন সেও মানুষকে কামড়ায় না।

সবাই আবার হেসে ফেললে।

[ক্রমশঃ

মধু

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মধুর সহিত পরিচয় ঘটে নাই এমন লোকের সন্ধান মেলা ভার। মানুষ সভ্য হইবার পর হইতেই মধুর নানাবিধ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। অসভ্য অবস্থাতেও মধুর সন্ধান পাইয়া মানুষ উহা খাদ্য রূপে ব্যবহার করিত। গো-মহিষাদি পালন করিয়া উহাদের দুগ্ধ পান করিতে শিখার পূর্বেই মানুষ মধু আহরণ করিয়া খাইতে শিখিয়াছে। অগ্নি আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ মৌচাক আবিষ্কার করে। ফল-মূল ব্যতীত মধুই মানুষের প্রাচীনতম খাদ্য ও পানীয়।

প্রথমে গন্ধে, পরে রঙে আকৃষ্ট হইয়া মৌমাছিরা ফুলের নিকট যায় এবং উহার রেণু সংগ্রহ করে। প্রায় দশ হাজার রকমের গাছ হইতে মৌমাছিরা ফুলের রেণু সংগ্রহ করিয়া থাকে। সেই সকল রেণু হইতে কি করিয়া যে মৌমাছিরা মধু প্রস্তুত করে তাহা সভ্য জগতের কেহ ত জানেই না, অন্য কোন প্রাণীও তাহাদের সহজ বুদ্ধির সাহায্যে এ কাজ করিতে পারে না। মধুতে যে "ডেক্সট্রোজ" এবং 'লেভুলোজ' আছে তাহার বিষয় অনেক কিছুই বৈজ্ঞানিকেরা জানিলেও কৃত্রিম মধু তাঁহারা এখনও প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পূর্বেই প্রতি কর্মী মৌমাছি তাহার নিজের ওজনের পাঁচশত ভাগ মকরন্দ বা পুষ্পরস মৌচাকে লইয়া যায়। তাহারা বোধ হয় সহজাত বুদ্ধিতেই জানে—যেটুকু মধু প্রস্তুত করিতে হইবে অন্তত তাহার তিনগুণ মকরন্দ প্রয়োজন। ছোট চায়ের চামচের এক চামচ মধু প্রস্তুত করিতে একটি মৌমাছিকে দুই হাজার ফুলের নিকট যাইতে হয়। এক পাউণ্ড মধু প্রস্তুত করিতে তাহাকে কমপক্ষে সাঁইত্রিশ হাজার বার ফুলের কাছে যাতায়াত করিতে হয়। একটি মৌচাকে গড়ে বৎসরে একশত পাউণ্ড মধু উৎপন্ন হয়। এই একশত পাউণ্ড মধু প্রস্তুত করিতে মৌমাছিকে মোটের উপর প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল পথ উড়িয়া যাইতে হয়। দুই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে যত পথ চলিতে হয়, ইহাতে মৌমাছিকেও তত পথ উড়িয়া যাইতে হয়। একটি ফুল হইতে একটি মাত্র মাছি প্রায় অর্দ্ধগ্রেন মকরন্দ নিষ্কাশন করে।

ত্রিপত্র-বিশিষ্ট একপ্রকার গাছের ফুল হইতেই সাধারণতঃ মধু প্রস্তুত হয়। যে দশ হাজার প্রকার ফুলের রস হইতে মধু প্রস্তুত হয়, সে সকল গাছই মানুষের প্রায় জানা। সুগন্ধি ফুলের রস হইতে যে মধু উৎপন্ন হয় সে মধু সুগন্ধযুক্ত হয় বটে, কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট নয়। পীতবর্ণ পুষ্পপ্রদ উদ্ভিদ (Dandelions), জাফ্রান এবং কুসুম বিশেষ বৃক্ষের ফুল হইতে মধু প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কাশফুল জাতীয় বৃক্ষ, গম জাতীয় বৃক্ষ, বাবলা জাতীয় গাছ, গোপাদপ, "ব্লুবেরিজ" বা নীলজাম, 'সোনার ছড়' বা "গোলডেন রড", বন্য "র‍্যাস্পবেরিজ", "ব্যালক্যালকা", পাইন গাছ প্রভৃতি গাছের ফুল হইতে যথেষ্ট পরিমাণ মধু উৎপন্ন হয়। এক প্রকার বকগুল্ম হইতে যে মধু উৎপন্ন হয়, তাহার রঙ গাঢ় হলুদ বর্ণের। ক্লোভার জাতীয় ফুল হইতে যে মধু প্রস্তুত হয় তাহা বিবর্ণ স্বর্ণমণির ন্যায়। মৌমাছিরা ফুল বাছিয়া বাছিয়া মধু সংগ্রহ করে না। সুতরাং যে প্রদেশে যে ফুলের প্রাচুর্য, সেই প্রদেশে সেইরূপ মধু উৎপন্ন হয়।

প্রাচীন গ্রীসে 'হিমেটাস্' পর্বত হইতে মধু সংগৃহীত হইত। সেখানে 'থাইম্' বৃক্ষের ফুল হইতে যে মধু প্রস্তুত হইত তাহার একটি বিশিষ্ট গন্ধ ছিল। মধ্যযুগে "ম্যালটেস্টেস" মধু ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কমলালেবুর ফুল হইতে এই মধু প্রস্তুত হইত বলিয়া ইহার একটা বিশিষ্ট গন্ধ ছিল। আজও এই মধুর বেশ চাহিদা আছে। ফ্রান্সের 'নার্বন' প্রদেশে 'সেনফোয়েন' ফুল হইতে শ্বেত বর্ণের দানাযুক্ত এক প্রকার সুগন্ধি মধু প্রস্তুত হয়। বিলাসী সমাজে এই মধুর প্রচলন খুব বেশী। জার্মানীর 'ব্ল্যাক ফরেষ্ট' দেবদারু জাতীয় গাছ হইতে নিঃসৃত এক প্রকার আঠাল পদার্থ সংগ্রহ করিয়া মৌমাছিরা এক রকম অদ্ভুত মধু প্রস্তুত করে। বন্য "র‍্যাস্পবেরি" হইতে যে মধু প্রস্তুত হয় তাহার রঙ মরকত মণির ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং উহার মিষ্টতার মধ্যে কেমন একটা রুক্ষতা আছে। 'ব্যালক্যালকার' মধুর স্বাদও কেমন উগ্র।

"অ্যাম্ব্রোসিয়া" পুষ্প হইতে সংগৃহীত অমৃতময় মধু বিরল। প্রাচীন গ্রীসের কবি ও ঐতিহাসিকেরা ঐ মধুর অনেক গুণগান করিয়াছেন। পূর্ব নেপালে পাহাড়ের গায়ে এক প্রকার "রোডোডেনড্রন" ফুল হয়, তাহা হইতে মৌমাছিরা যে মধু প্রস্তুত করে তাহা বিষাক্ত। উহা পানে শরীরে বিষক্রিয়া হইয়া জীবন বিপন্ন হইতে পারে।

ভারতের উত্তরে হিমালয় প্রদেশ ফুলের রাজ্য। কত প্রকার ফুল যে সেখানে ফুটিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক প্রকার মৌমাছিরও সেখানে দেখা পাওয়া যায়। বস্ত মধু ত পাওয়াই যায়। দার্জিলিং প্রদেশে চা-বাগানের সাহেবেরা সখ করিয়া মৌমাছি পুষিত, এবং সেই সকল পোষা মৌমাছির মধু নিজেরাই ব্যবহার করিত। আলমোড়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমে মৌমাছির চাষও চলিয়াছে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি মৌমাছির চাষ (Apiary) করিতে চান আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামিজী তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। আশ্রমে যে মধু উৎপন্ন হয় তাহা হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিক্রয় করা হয় না. বাঙ্গলার সুন্দরবনেও অনেক স্বাভাবিক মৌচাক হয়, এবং সেই সকল চাক হইতেও অনেক মধু সংগৃহীত হয়। মধুর চাহিদা অনুযায়ী মৌমাছির চাষের ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। স্বাধীন ভারতের জনকল্যাণী সরকারের সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

মধুর উল্লেখ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থেও পাওয়া যায়। বেদ ও বাইবেলের অনেক স্থানে মধুর কথা আছে। প্রাচীন গ্রীসে মধুর প্রচুর ব্যবহার ছিল। দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (Democritus) এবং মহাবীর আলেকজাণ্ডার (Alexander the Great) তাঁহাদের মৃতদেহ মধুতে প্রোথিত করিয়া রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। মিশরের অনেক কবর খনন করিয়াও মধুর পাত্র পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি প্রায় ৩,৩০০ বৎসরের পুরাতন। ভারতের ত কথাই নাই। এমন পূজার্চনা বা সামাজিক অনুষ্ঠান নাই যেখানে মধুর প্রয়োজন হয় না। কবিরাজ মহাশয়েরা বহু প্রাচীনকাল হইতেই নানা প্রকারে মধু ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

মধু-বিশেষজ্ঞরা মধুকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। এক প্রকার মধু গাঢ়, রুক্ষ, উগ্রগন্ধী; উহা ব্যবসায়ের জন্যই সংগৃহীত হয়, এবং উহা অধিক পরিমাণেই পাওয়া যায়। আর এক প্রকার পাতলা সুগন্ধ ও সুস্বাদু মধু। উহা খাদ্য ও পানীয় হিসাবেই ব্যবহৃত হয় এবং উহা তত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় না।

বিশুদ্ধ মধুতে পাওয়া যায়—পোটাসিয়াম, লৌহ, তাম্র, 'ম্যাঙ্গানিজ', 'ফস্‌ফরাস', 'প্রোটিন', খাদ্যপ্রাণ, 'এন্‌জাইমিজ' এবং স্বাভাবিক শর্করা বা চিনি। এই সকল উপাদানের মধু পান করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা অতি দ্রুত রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়। অন্যান্য খাদ্য বা পানীয়ের মত মধুকে পাকস্থলীতে জার্ণ হইয়া রক্তস্রোতে মিশিতে হয় না। এই কারণেই বোধ হয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অধিকাংশ ঔষধই মধুর সহিত পান করিবার বিধি আছে—যাহাতে ঔষধটি সরাসরি রক্তস্রোতে মিশিয়া শীঘ্র কাজ আরম্ভ করিতে পারে।

বিশুদ্ধ মধু কোন প্রকারেই জীবাণু বা বীজাণু দুষ্ট হইতে পারে না। বিশেষ ক্ষতিকর কোন জীবাণু বা বীজাণু বিশুদ্ধ মধুর মধ্যে কোন প্রকারে পড়িলে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। মধুর ইহা একটি অসাধারণ গুণ। রামায়ণ-মহাভারত পাঠে জানা যায় যুদ্ধ-শিবিরে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত এবং ক্ষত চিকিৎসায় উহার ব্যাপক ব্যবহার হইত। মধুপানে শিশু এবং অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের দেহে ক্যালসিয়ামের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। সেই কারণে মধু পানে অত্যন্ত শিশুর দাঁতগুলি দৃঢ় ও সুন্দর হইয়া ওঠে। শরীর সুগঠিত ও বলবান হয়। ইহা বালক-বালিকা ও বয়স্ক লোকদিগের ক্লান্তি দূর করিয়া শরীরে তেজ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। মধুমেহ (Diabetes) রোগীর পক্ষে মধুপান পুষ্টিকর কিন্তু শর্করা তাহার পক্ষে মারাত্মক।

শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে মধু উৎকৃষ্ট। ইহার মিষ্টতা চিনির দ্বিগুণ। হিন্দু জাতির জাতকর্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত সকল সংস্কারেই মধুর প্রয়োজন হয়। মধুর উপকারিতা প্রাচীন ভারতে বিশেষরূপে জানা ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। আধুনিক রাশিয়াতে মধুর উপকারিতা প্রচার করা হইতেছে এবং মধুর ব্যবহারও সেখানে বাড়িতেছে। ভারতই কেবল পিছাইয়া পড়িল।

খেলাধূলার আসরে

পি. মিত্র

ভারতের অন্যতম ও সেরা ফুটবল প্রতিযোগিতা আই. এফ. এ. শীল্ডের ভাগ্য গতবারের মতন এবারও দু'টি ক্লাবের মর্জির ওপর এবং আই. এফ. এ'র কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করছিল। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীল্ড ফাইন্যালের প্রথম দিনের খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হবার পর এ খেলাটির পুনরনুষ্ঠান সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় সৃষ্টি হয়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ক্লাব দু'টির এবং কর্মকর্তাদের শুভবুদ্ধির ফলেই এ বছরের শীল্ডের ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে উঠে এবং যুগ্ম বিজয়ীর বন্ধ্যা দশা থেকে মুক্তি লাভ করে। পুনরনুষ্ঠিত খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল এক গোলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ক্লাবকে পরাজিত ক'রে ১৯৬৫ সালের শীল্ড বিজয়ীর আখ্যা লাভ করে। আই. এফ. এ. শীল্ডে যোগদান করার জন্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু খ্যাতনামা দল কলকাতায় আসত। উদ্যোক্তা, খেলোয়াড়, পরিচালক সকলের সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই প্রতিযোগিতার নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আই. এফ. এ. শীল্ড লাভ করা যে কোন দলের পক্ষেই অত্যন্ত কৃতিত্বের ও গৌরবের বস্তু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধুনা ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই প্রতিযোগিতাটি প্রায় জরাজীর্ণ ও অন্তিম দশায় এসে পৌঁছেছে বলা যায়। বর্তমানে এর আকর্ষণ অনেক কমে গেছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ দলগুলি নানা কারণে এখন আর এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চায় না এবং শীল্ড খেলা এখন প্রায় স্থানীয় একটা প্রতিযোগিতার পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ যার অন্যতম কারণ। অনেকের ধারণা, মাঠের ভেতর যে খেলাটা হয় সেটা খেলার প্রহসন মাত্র। আসল খেলা মাঠের বাইরেই হয়। বহিরাগত দলগুলির সে সব আটঘাট না জানা থাকায় প্রায়ই দুর্নীতি-চক্রে বলি হতে হয়। ফলে কেউ আর এখন এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চায় না। ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতা—তার বুকের ওপরই এ রকম অনাচার চলতে থাকলে ফুটবল কবরস্থ হতে অধিক বিলম্ব হবে না। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে, ফুটবলের মান ঊর্দ্ধে রাখতে হলে, উদ্যোক্তা, পরিচালক ও সর্বোপরি ক্লাবগুলিকে যথেষ্ট উদারতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে, তবেই এই প্রতিযোগিতাটি আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্যথায় নয়।

• • •

গত মাসে টোকিওতে ডেভিস কাপের খেলায় ভারত ৪—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে আন্তঃ-আঞ্চলিক ফাইন্যালে স্পেনের সম্মুখীন হয়। দল হিসেবে স্পেন যথেষ্ট শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথমে স্থির হয় ভারত ও স্পেনের খেলা কলকাতায় হবে। কিন্তু ভারতের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে স্পেন আসতে রাজি হয় না। ফলে ডেভিস কাপের চ্যাম্পিয়ন অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যস্থতায় স্পেনেই খেলার স্থান স্থির হয়। ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশনও অনেক টালবাহানার পর স্পেনেতেই খেলতে রাজি হয়। স্পেনে খেললে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা (প্রায় এক লক্ষ টাকা) পাওয়া যাবে এবং সেই টাকার প্রতিশ্রুতিতেই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দল স্পেনে খেলতে যায়। ভারতীয় দলের প্রথম দুর্ভাগ্য এটাই সূচিত। একে স্পেন শক্তিশালী দল, তার পর নিজ দেশে ক্লে কোর্টে ভারতের বিরুদ্ধে খেলা—স্বভাবতই তাদের মনোবল প্রচুর বেড়ে গেল। পক্ষান্তরে ভারতীয় দলের পক্ষে কলকাতায় সাউথ ক্লাবের সেন্টার কোর্টে খেলার পরিবর্তে ক্লে কোর্টে খেলার ব্যবস্থা হওয়ায় প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। স্পেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল ভালই ফলাফল প্রদর্শন করেছে বলব। রমানাথন কৃষ্ণন ও ভারতের ২ নম্বর খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জী একটা করে সিঙ্গলসে জয়লাভ করেন। ডাবলসে জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিৎলালের জুটি স্পেনীয় জুটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবতারণা করেন। স্পেনীয় জুটি সান্তানা ও আরিলাকে এই খেলায় জয়লাভ করার জন্য যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। সিঙ্গলস ও ডাবলসে জয়দীপ মুখার্জী অপূর্ব ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করেন। স্পেনের মাটিতে ভারত যথেষ্ট উচ্চ ক্রীড়ামানের পরিচয় রেখে এসেছে। ভারতের মাটিতে এ খেলা হ'লে ফলাফল হয়ত ভারতের অনুকূলেও যেতে পারত।

লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের পরিচালনায় এশীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছে। ভারতে এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ এই প্রথম—কাজেই উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবুও সুষ্ঠু ভাবেই প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের জন্যে একটি নতুন হল নির্মাণ করা হয়েছে। এবারকার প্রতিযোগিতার দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ বিভাগে ভারত, জাপান, হংকং, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিংহল ও নেপাল যোগদান করে। সাধারণ বিভাগের খেলায় অর্থাৎ ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রিটেনের খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করেন। আমেরিকার খেলোয়াড়

ভারতের ১নং খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণাণ

স্পেনের ১নং খেলোয়াড় ম্যানুয়েল সান্তানা

সোভিয়েত রাশিয়ার অনুশীলনরত কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড়
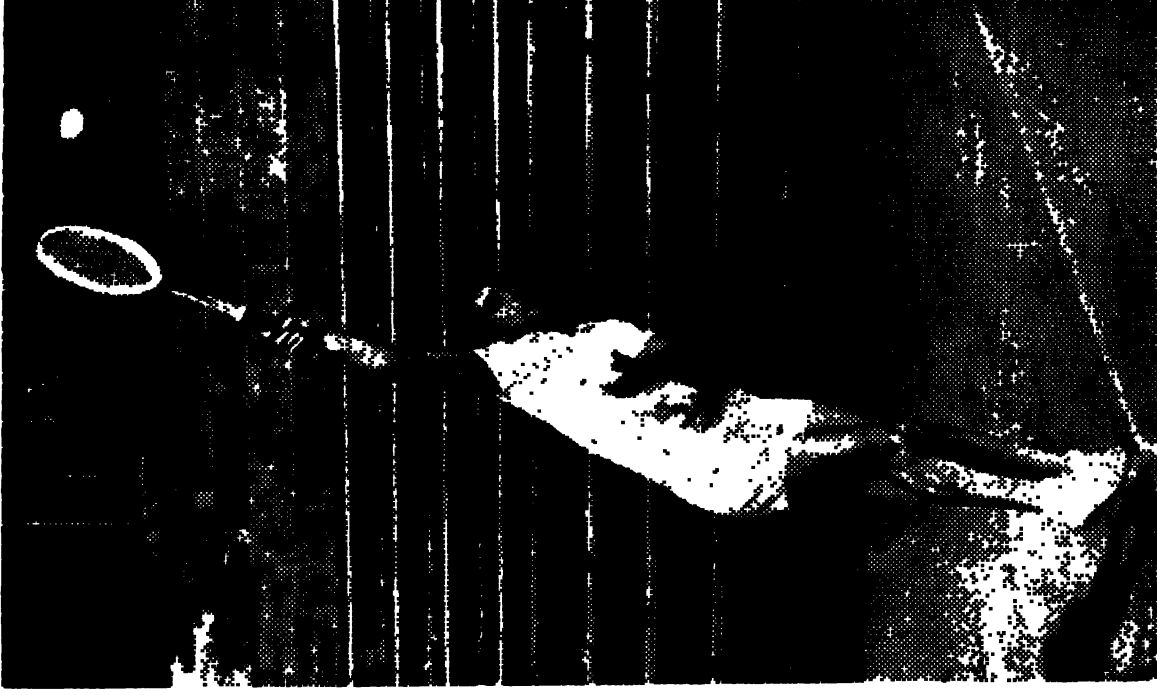
দ্যুতি হালদ্যারের অংশগ্রহণ করার কথা ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি আসবেন না বলে জানান। দলগত চ্যাম্পিয়ন-শিপের সেমিফাইনালে ভারত মালয়েশিয়ার কাছে পরাজিত হয়। ফাইনালে মালয়েশিয়া থাইল্যাণ্ডকে পরাজিত করে এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে টুকু আবদুল রহমান গোল্ড কাপ লাভ করে। ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় নান্দু নাটেকার এবার বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। সিঙ্গলসের খেলায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন নি, কেবল মাত্র ডাবলসের খেলাতেই অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের পক্ষে সিঙ্গলসে খেলেন সুরেশ গোয়েল ও দীনেশ খান্না। গোয়েল তাঁর সুনাম অনুযায়ী ভালই খেলেন। তরুণ ও উদীয়মান দীনেশ খান্না তাঁর খেলায় অপূর্ব ক্রীড়াশৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি যদি ঠিক মতন একাগ্রতা বজায় রাখতে পারেন ও আন্তরিকতার সঙ্গে অনুশীলন করে যেতে পারেন তবে তাঁর পক্ষে বিশ্ব পর্য্যায়ে পৌঁছানো খুব একটা অসম্ভব বলে মনে হয় না।

এরই মধ্যে তিনি ব্যাডমিণ্টন জগতে যথেষ্ট বিস্ময় সৃষ্টি করে প্রভূত সুনামের অধিকারী হয়েছেন। প্রথম আবির্ভাবেই বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের পেছনে ফেলে এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সিঙ্গলসের বিজয়মুকুট মাথায় পরেছেন। উল্লেখযোগ্য যে দীনেশ খান্না এর আগে কোন শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় ট্রফিও লাভ করেন নি। ফাইনালে তিনি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় নম্বর খেলোয়াড় থাইল্যাণ্ডের সাংগব রত্নোস্বনকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন। এবং ফাইনালে উন্নীত হবার পথে জাপানের যোশিনরি ইতাগাকি ও ভারতের সুরেশ গোয়েলকে পরাজিত করেন।

* * *

সম্প্রতি ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সোভিয়েত রাশিয়ার একটি ফুটবল দল এক মাসের জন্যে ভারত সফর করছে। এই দলটি চারটি আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ের খেলায় এবং দশটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ের প্রথম খেলায় অর্থাৎ প্রথম টেষ্ট ম্যাচে দিল্লীতে সোভিয়েত দল ভারতীয় দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করে।

রবিবার ১৪ই নভেম্বর সফরকারী দলটি কলকাতায় দ্বিতীয় টেষ্টে ভারতীয় দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। এইদিন উভয় দলের হতাশব্যঞ্জক খেলা দেখে অধিকাংশ দর্শকই মনঃক্ষুণ্ণ হন।

রাশিয়ান দলটিও দর্শক মনে কোন রেখাপাত করতে পারে নি। তবে খেলোয়াড়দের শারীরিক পটুতা, তীব্র গতি ও বল আদান প্রদানের চটুলতা লক্ষণীয়। ভারতীয় দলে অধিকাংশ নবীন খেলোয়াড় থাকায় কোন সময়েই তারা তাল রেখে উঠতে পারে নি। এই অবস্থা দেখে ভারতীয় দলের আগামী দিনের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

কুহেলির মায়া
শিল্পী : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৭২

তৃতীয় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশভক্তি

দেশভক্তির প্রকৃত অর্থ ও আয়তন কি তাহা লইয়া মতবিরোধ হওয়া অসম্ভব নহে। সুনীতি, পরহিত ও কোন ধর্ম্মবিশেষের সত্য অর্থ লইয়াও ঐ প্রকার তর্কের সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ যাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও বাহিরের কর্ম্মচেষ্টা যাহাই হউক না কেন, তাহার মনে জগতের নিকট নিজ ইচ্ছা ও কর্ম্ম অতি উচ্চাদের বলিয়া প্রমাণ করিবার আগ্রহ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ কোন লোকই নিজের মতবাদ অথবা সেই মতবাদের বাহিক প্রকাশকে অপরের চক্ষে ছোট বলিয়া দেখাইতে চাহে না। অপরে তাহাকে ছোট বলিলে দোষ অপরের হয়। নিজের গুণ কখন খর্ব্ব হয় না। সুতরাং দেশভক্ত লোক যদি ভক্তি না দেখাইয়া ভুক্তির চেষ্টাতেই অধিক তৎপর হয়েন তাহা হইলে সে কথা বলিলে "দেশভক্ত" মহলে বক্তার মান-ইজ্জত থাকিবে না। কারণ যাহারা নিজ স্বার্থকে দেশের স্বার্থ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে এ কথা কিছুতেই বুঝান সম্ভব হয় না যে প্রকৃত দেশভক্তির অর্থ দেশের মঙ্গলকে নিজের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের সহিত এক করিয়া লওয়া। যাহার মধ্যে স্বার্থপরতা প্রবল তাহাকে কেমন করিয়া বুঝান যাইবে যে স্বার্থত্যাগের মধ্যেই দেশভক্তির বীজ নিহিত থাকে? যে ধর্ম্মের নামে হত্যা ও লুণ্ঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে তাহাকে কি মানান যায় যে সে সত্যধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়া অধর্ম্মের পথে চলিতেছে? দেশভক্ত সেই ব্যক্তি যে দেশের জন্য নিজের সকল স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক স্বার্থ অনেকবার ত্যাগ করিয়া দেখাইয়াছে যে তাহার মধ্যে সত্য দেশভক্তি অনাহত রহিয়াছে। ইহাও তাহাকে পদে পদে দেখাইয়া চলিতে হইবে যে ক্ষুদ্রায়তন ত্যাগের পরিবর্ত্তে সে বৃহদায়তন কোন স্বার্থসিদ্ধি করিবার প্রকাশ্যে বা গোপনে চেষ্টা করিতেছে না। কেননা দুই দিনের জন্য জেলে যাইয়া যদি কেহ আঠার বৎসর রাজার হালে বসবাস করিতে পারে তাহা হইলে তুলনামূলক ভাবে তাহার বিশেষ লাভ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। আবার যাঁহারা জেলে না গিয়া অথবা চাকুরি ও ব্যবসায় ক্ষতি না করিয়া শুধু অনায়াস অর্জ্জিত সদংশে দেশভক্তির খ্যাতি অর্জ্জন করেন, তাঁহাদিগের লাভ পূর্ব্বাপর সমান ওজনে বজায় থাকিয়া যায়। পূর্ব্বে প্রভুভক্তি ও পরে দেশভক্তির পুরস্কার পাওয়া শুধু বস্ত্রপরিবর্ত্তনের উপরেই নির্ভর করে। অবশ্য ভিতরে ভিতরে

উপযুক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন হয়। তাহাও পারস্পরিক সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া ও কখন কখন মূল্য ধরিয়া দিয়াও সুসিদ্ধ হয়। বহু দেশভক্ত দেখা যায় যাঁহারা কখন দেশের জন্য কোন স্বার্থত্যাগ করেন নাই কিন্তু দলে ভিড়িয়া নিজেদের মর্য্যাদাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। সে সকল কথা ছাড়িয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে এখন এই দেশে যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাদিগের মনের মধ্যে প্রকৃত দেশভক্তি সদাজাগ্রত আছে কি না। কারণ দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নকল দেশভক্তদিগকে অবিলম্বে সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। এই জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাহারও হস্তে দিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে সেই ব্যক্তির চরিত্র কি প্রকার। চরিত্রদোষ বলিতে সাধারণভাবে যাহা বুঝায় তাহা না হয় বাদ দেওয়া যাইল; কারণ সে দোষ একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার অন্তত কিছুদূর অবধি। কিন্তু যদি কোন লোক গোপনে বা প্রকাশ্যে নিজের বা নিজের আত্মীয় ও বন্ধুজনের সুবিধার জন্য দেশবাসীর স্বার্থের হানি করেন তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে তখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে বিদায় করা অবশ্যকর্ত্তব্য। দেশবাসীর স্বার্থহানি নানান ভাবে হইতে পারে। আর্থিক ক্ষতি ত আছেই। তাহার উপরে রহিয়াছে অনুপযুক্ত ও অকর্ম্মা লোককে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা। বর্ত্তমানে যে দেশের মঙ্গলকর বহু কার্য্যই যথাযথভাবে ও যথাসময়ে হয় না, তাহার মূলে আছে পক্ষপাত দোষ। অমুকের বন্ধু বা তমুকের পুত্রদিগকে আপিস-দপ্তরের বাহিরে না পাঠাইয়া দিলে এ দেশের মঙ্গল কখনও হইতে পারে না। অর্থাৎ এখন রাষ্ট্রপতির কর্ত্তব্য, রাষ্ট্রশক্তি যে যে ক্ষেত্রে যাহার যাহার হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে; সে সকল ব্যক্তির পূর্ণ পরিচয় পাইবার চেষ্টা করা। ইহার জন্য বিশ্বস্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় দলের সম্পূর্ণ বাহিরের লোক দরকার। তাহা না হইলে আবর্জ্জনা পরিষ্কার ও দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হইবে না।

চীন ও পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে যে সকল বীর ও মহাত্যাগী দেশভক্তগণ প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষার জন্য ইহা বিশেষ করিয়া প্রয়োজন যে দেশের কোন ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা প্রকটভাবে যাহাতে বর্ত্তমান না থাকিতে পারে। নিজ নিজ সুবিধার জন্য যাহারা জনসাধারণের ক্ষতি করে, তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের বাহিরে নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের দলপতি ব্যক্তি কেহ কেহ আছে বলিয়া মনে হয়। ব্যবসাদার আছে বহুসংখ্যক এবং অসংখ্য আছে আমলাবাহিনীর মধ্যে। একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে একবার সরকারী চাকুরি পাইলে আর সে চাকুরি যাইতে পারে না, অবসর পাইবার পূর্ব্বে। এই ধারণা ভুল প্রমাণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন এবং অকর্ম্মা ও অসৎ চাকুরেদিগকে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা শীঘ্র শীঘ্র করিলে কর্ম্মকুশল লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত বেতনে কর্ম্মে বহাল করিলে কাজও হইবে এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রও ক্রমশঃ লোপ পাইতে আরম্ভ করিবে। ইহা করিতে হইলে দেশবাসীর মধ্যে একটা নবজাগরণের প্রয়োজন। অতঃপর যে নির্ব্বাচন-সময় সম্মুখে দেখা যাইতেছে তাহাতে দেশবাসীর উচিত হইবে বিশেষ করিয়া দেখা, যাহাতে অধর্ম্মের ও অসত্যের জয় না হয়। কোন রাষ্ট্রীয় দলই এখন নির্দ্দোষ ভাবে গঠিত নহে। সকল দলকেই দোষমুক্ত ভাবে দেশবাসীর সম্মুখীন হইয়া নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে হইবে। নির্ব্বাচনের সময় আমাদিগকে দেখিতে হইবে যাহাতে উপযুক্ত লোকের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ ন্যস্ত হয়। কারণ তাহা হইলে সেই সকল লোকই দেশের সকল ঘাঁটি হইতে দুর্নীতি ও অন্যায়ের অপসারণ সম্ভব করিতে পারিবেন। দেশভক্তি ও কর্ম্মের মুখোস পরিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করা তখন আর চলিবে না।

চাউল কোথায় যায়?

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার বিধান সভায় অথবা অন্য কোন শাসন-সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানে একটা অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে কোন একজন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হাওড়া হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া সেই চাউল পাকিস্তানে চালান

করিয়াছেন। ইহাতে খুব একটা গোলযোগের সূত্রপাত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হইল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। যদি পাকিস্তানে চাউল চালান হইয়া থাকে চোরাই ভাবে, তাহা হইলে সেই অপরাধের জন্ত কোন শাস্তি কেহ পাইয়াছে কি না সে কথা জানিবার অধিকার আমাদিগের সকলেরই আছে। বিষয়টার কিন্তু সংসদে অবতারণা হইয়া থাকিলেও পরে আর কেহ তাহার আলোচনা করিতেছে না। অর্থাৎ কথা চাপা দিবার লক্ষণ ইহার মধ্যে দেখা যাইতেছে। কথাটা কি তাহা হইলে সত্য? প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের দরবারের ওমরাহদিগের কর্তব্য বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া ফেলা; যাহাতে জনসাধারণের মনে কোন সন্দেহ না থাকে।

বিহারে বহুলোকের বিশ্বাস যে ব্যবসায়ীগণ উক্ত প্রদেশের চাউল ক্রয় করিয়া তাহা নেপালের ভিতর দিয়া তিব্বত বা চীনে পাঠাইতেছে। ইহা আরও আতঙ্কের কথা, এবং ইহার মধ্যে কোন সত্য আছে কি না তাহা জানিবার অধিকারও দেশবাসীর আছে। কিন্তু এই কথাটাও শুধু গুজবের মতই উঠিয়া আবার থামিয়া গিয়াছে। ইহার ভিতরে আসল কথা কি তাহা জানা প্রয়োজন। কারণ এই সকল জনরবের কতকটা অংশ অন্তত সত্য হইতে পারে; এবং তাহা যদি হয় তাহা হইলে সেই সকল খাদ্যসামগ্রী চুরি ও চালান বন্ধ করা দেশের বর্তমান অবস্থায় ভারতরক্ষার জন্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

কয়েকদিন পূর্বে আবার গুজব শুনা যাইল যে বীরভূম হইতে লরি বোঝাই করিয়া চাউল পূর্ব দিকে যাইতে দেখা যাইতেছে। এই চাউল না কি কোন বিশেষ উপায়ে অপর দেশে রপ্তানি করা হইবে। এই সকল কথা ভারত, বিশেষ করিয়া বাংলা সরকারের খাদ্য নিয়ন্ত্রণের বদনাম করিবার জন্ত মিথ্যা প্রচারও হইতে পারে; কিন্তু সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও মনে হয় যে কথাগুলি সত্যও হইতে পারে। সুতরাং এই সকল ঘটনার মূলে কি রহিয়াছে তাহা বিশেষ অনুসন্ধানের সাহায্যে নির্ণয় করা প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রে আমাদিগের খাদ্য পরিস্থিতি এরূপ যে প্রায় দুই কোটি লোকের অনাহারে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে এবং সরকারী খাদ্য সংগ্রহ এমন ভাবে চলিতেছে যাহাতে আশার আলোক কোথাও দেখা যাইতেছে না; সেখানে দেশ হইতে খাদ্যবস্তু বাহিরে চালান করা দেশ-শত্রুতার চূড়ান্ত, সন্দেহ নাই। যদি কোন লোক লাভের জন্ত এই কার্য্য করে তাহা হইলে সেই লোকের বা লোকদিগের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা না করিলে এই সকল মহাপাপের শেষ হইতে পারে না। ট্রেনে-বাসে চাউল লইয়া যাইবার অপরাধে যে সকল ব্যক্তিদিগকে মাঝে মাঝে পুলিস গ্রেপ্তার করে তাহারা অল্পবুদ্ধি গরীব লোক। তাহারা যে চাউল বিক্রয় করে তাহা তিব্বত বা পাকিস্তানে চালান হয় না। দেশের লোকই সেই চাউল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়। পুলিস বড় বড় অপরাধের নাগাল না পাইয়া অথবা পাইলেও "কানা চোখে দুরবীন লাগাইয়া" সেই সকল অপরাধ দেখিতে না পাইয়া নিজেদের অবসর অতিবাহনের জন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ দমনে আত্মনিয়োগ করেন বলিয়া যে বিশ্বাস সাধারণের মনে সদাজাগ্রত; তাহা ভুল প্রমাণ করিতে হইলে কিছু কিছু বড় অপরাধ দমন করা প্রয়োজন হয় এবং করিলে দেশেরও মঙ্গল।

সংগ্রহ ও বণ্টন

খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন লইয়া যে সকল দ্বন্দ্ব, কোলাহল, জালজুয়াচুরি, মিথ্যা প্রচার ও বহুমুখী পাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সম্যক আলোচনা প্রয়োজন হইলেও অপ্রিয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা বলেন যে সরকারী ব্যবস্থা ইচ্ছাকৃত ভুলের উপর গঠিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে আমরা বলিব যে মূলতঃ সরকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা দেশের মঙ্গলের জন্তই করা হইয়াছে। এখন সরকারী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত লোকজনের মধ্যে অনেক ঘুষখোর, স্বার্থপর ও

হীনচরিত্রের লোক থাকাতে সরকারী ব্যবস্থা সর্ব্বদাই ছিদ্রবহুল ভাবে রচিত হইয়া যায়। রচিত বলার অর্থ এই যে ব্যবস্থাগুলি প্রায়ই শুধু লিখিত অবস্থায় থাকিয়া যায়, কার্য্যত অনেক কিছুই ভিন্নরূপ ধারণ করে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সরকারী ব্যবস্থায় সেই দোষই দেখা যায়, যাহার ফলে বহু কার্য্যই দেশ বা প্রদেশের পরিচালকগণ করিতে পারেন না। এই অক্ষমতা বিষয়ে ইংরেজদিগের প্রবাদ আছে : To bite off more than one can chew; অর্থাৎ কামড় দিয়া মুখে লইয়া চিবাইয়া খাওয়ার ক্ষমতার অভাব। কোন কাজই লিখিত পরিকল্পনা হইতে কার্য্যে পরিণত হইতে সময়, ক্ষমতা, সাধনা, সাধু চেষ্টা, পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন হয়। এবং পদে পদেই নির্ভরশীল ও বিশ্বাসযোগ্য মানুষ না থাকিলে কার্য্য পণ্ড হইয়া পরিকল্পনা বৃথাকল্পনায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং বৃহৎ ব্যাপারের সুসমাধান করিতে হইলে "মানুষ" লাগে এবং মানুষ না থাকিলে চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। কর্ম্মক্ষমতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা কোন আদর্শবাদেরই উপজাত বস্তু নহে। সুতরাং উপযুক্ত মানুষ প্রয়োজন হইলে অনেকক্ষেত্রে গোষ্ঠীর বাহিরে অনুসন্ধান করিতে হয়। যেক্ষেত্রে বিষয়টা দেশের বহুলোকের জীবন-মরণের সমস্যার সহিত জড়িত, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দল বা আমলাতন্ত্রের অধিকার-অনধিকার-ভেদ দিয়া তাহার সুব্যবস্থা সম্ভব হইবে না। রাষ্ট্রীয় দলপতিদিগকে আমরা বলি যে সাধারণের নিকটে সাহায্য লইয়া কার্য্য করিতে শিখুন। নতুবা যদি লোকে না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে সেই সকল মৃত্যুর জন্য ঐ দলপতিদিগকেই জনমত অপরাধী সাব্যস্ত করিবে। এতবড় একটা সম্ভব-অপরাধের বোঝা নিজেদের স্কন্ধে চাপাইয়া রাখিবার কোনও আবশ্যকতা আছে কি? কি লাভের আশায় এই ঝুঁকি বহিতে চাহেন তাঁহারা?

বাংলার নেতৃত্ব সঙ্কট

বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসের আরম্ভে বাংলার নাম সর্ব্বত্র স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই বাংলা ভারতকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইত। রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শুধু কয়েকজনের নাম করিলেই বুঝা যাইবে যে বাংলা জাতীয় জীবনের বহুক্ষেত্রেই কেমন করিয়া যুগপ্রবর্ত্তনে সহায়তা করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় উন্নতির ক্ষেত্রে আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহাদিগের সহিত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছিলেন সেই বহুসংখ্যক মহাত্যাগী দেশমাতার বীর সন্তানদিগের অমর কীর্ত্তির মধ্যেই বাংলার রাষ্ট্রীয় অবদান নিহিত রহিয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব্বের ইতিহাসে দেড়শতাধিক বৎসর বাঙ্গালীর নাম জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই ক্রমাগত অতি স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার পরে জাতীয় জীবনের ধারা বহুভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর পথে চলিতে আরম্ভ করিল। এক এক প্রদেশে এক এক প্রকার রাষ্ট্রীয় গতি ও গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়া জাতীয় জীবন বিষময় হইয়া উঠিতে লাগিল। কর্ম্মের ও জীবনাদর্শের প্রেরণা অভাবে হৃতগতি হইয়া বহমান জীবনশক্তিকে সর্ব্বত্র নিশ্চল পঙ্কিলতা-দোষে দুষ্ট করিয়া তুলিল। এই অবস্থায় বাংলার জনগণের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির চরমে পৌঁছাইতে আরম্ভ করিল। উন্নত চরিত্র ও কর্মী মানুষের স্থান রাষ্ট্রীয় ও অপরাপর ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনের অপ্রশস্ত প্রান্তে ঠেলিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। সৎ স্বভাব ও কর্ম্মক্ষমতার অভাব দল পাকাইয়া মিথ্যা প্রচারের সাহায্যে মিটাইবার ব্যবস্থা হইল। নির্ভরশীল, বিশ্বাসযোগ্য ও আত্মসম্মান জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ নিজেদের মান নিজেদের হস্তে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে সরিয়া

যাইতে লাগিলেন। জাতীয়তা ও সংঘবদ্ধতার ক্রমবিকাশে উত্তম ও শ্রেয়ের উপলব্ধি না হইয়া অধম ও হেয়ের উপদ্রব উৎকটভাবে ব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার মঙ্গল হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। প্রধান কারণ হইল জাতীয় জীবনের উপর বাহিরের টান। বহু দূর দূরান্তরের আদর্শ, মতলব, ফন্দি ও শোষণ প্রচেষ্টা বাংলার জীবনে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার ফলে আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ক্ষতি হইল সর্বাধিক। এবং সেই বাঙ্গালী-বিরুদ্ধ কার্য্য-কলাপের জের শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি অপরাপর ক্ষেত্রেও পৌঁছাইল। এই সকল বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা করিলে অনর্থক কলহবিবাদের সূচনা হইবে। লাভও বিশেষ হইবে না। যথা, যদি ভারত কোন বিদেশী শক্তির সুবিধার জন্য ইচ্ছা করিয়া বা ভুলক্রমে বাংলার কোন ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার প্রতিকার বাংলার রাজ্য সরকার করিতে পারে। গরীব বাঙ্গালী তাহা করিতে পারে না। অথবা যদি ভারতের অপর প্রদেশগুলি বাংলা বা বাঙ্গালীর ক্ষতির কারণ হয় তাহা হইলেই বা গরীব বাঙ্গালী তাহার প্রতিকার কি করিয়া করিতে পারে? আবার সব কিছুই হইতে পারে যথাযথ নেতৃত্ব থাকিলে। কিন্তু নেতা কে হইবে তাহা যদি নেতৃত্বগুণ দিয়া বিচার করা সম্ভব না হয়; বাহিরের লোকের মতলবসিদ্ধির ফন্দি অনুসারে স্থির করা হয়; তাহা হইলে নেতাদিগের স্বরূপ নেতৃত্বগুণহীন হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলার যুবশক্তি ও জনবল সে নেতৃত্বের অনুসরণে চলিতে রাজি না হইতেও পারে। বর্তমানকালে মনে হয় যে বাংলার রাজদরবার বাঙ্গালীর প্রাণের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না। ইহার জন্য বাঙ্গালীদের মধ্যে কিছু কিছু লোক দায়ী বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বাংলার নেতাদিগেরও দায়িত্ব ইহাতে আরও প্রগাঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। নেতাগণ যদি নেতৃত্বগুণ ব্যক্ত করিতে অক্ষম হন তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে উচিত হইবে সরিয়া দাঁড়াইয়া অপর নেতাদিগকে চেষ্টা করিতে দেওয়া, যাহাতে বাংলার দেশবাসীগণ একপ্রাণ হইয়া দেশের উন্নতির জন্য কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। বাংলার কথা ভুলিয়া অপর আগ্রহে মাতিয়া থাকিলে চলিবে না। বিশেষ করিয়া যদি সেই সকল আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ বাংলার পক্ষে ক্ষতিকর হয়। এখন সময় আসিয়াছে বাংলার ভবিষ্যৎ বিচার করিয়া চলিবার ও জাতীয় আদর্শ সংরক্ষণ ও পূর্ণ উপলব্ধির জন্য প্রাণ দিয়া কর্মে লাগিয়া যাইবার।

জীবন ধারণের কথা

দুই কিলো চাউল-আটা যদি পাওয়া যায় প্রতি সপ্তাহে তাহা হইলে দিনে এক পোয়া প্রমাণ ঐ জাতীয় খাদ্য জুটিল বলা চলে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা কমও জুটিতে পারে; এমন কি নাও জুটিতে পারে কিছু, অন্তত সাময়িকভাবে। সরকারী তরফের কর্তাদিগের নিকট এমন কথা শুনা গিয়াছে এবং কখন কখন কোথাও কোথাও "র‍্যাশনিং" থাকা সত্ত্বেও খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই চিন্তা করা ভাল যে খাদ্যাভাব ঘটিলে মানুষ কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ছোলা, মটর, ভুট্টার দানা প্রভৃতি পিষাইয়া আটার সহিত মিশাইয়া খাইলে তাহা মুখরোচক ও পুষ্টিকর হয়। লাল আলু, মূলা, শাঁখআলু প্রভৃতি দিয়াও ঐ প্রকারে রুটি, পুরি প্রভৃতির পরিমাণবৃদ্ধি করা যায়। ইহার মধ্যে ছোলা, মটর, ভুট্টার দানা, কাঁঠাল বীজ, কাঁচকলা (শুখান) প্রভৃতি কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়, যাহাতে সাময়িক খাদ্যাভাব ঘটিলে সেই সকল খাদ্য ব্যবহার করা যায়। চাউল-আটা বর্জ্জন করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্তব্য। যাঁহাদিগের অর্থাভাব নাই, তাঁহারা অধিক ফল, দুধ, ডিম, মাংস, মাছ প্রভৃতি খাইলে বাঁচান চাউল-আটা দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প আয় যাঁহাদের, তাঁহাদের সুবিধা হইতে পারে।

বঙ্গ উপসাগরে এত মৎস্য আছে যে ব্যবস্থা করিয়া ধরিয়া লইলে সেই মৎস্য দিয়া বাংলার বহুলোকের জীবন ধারণ সম্ভব হইতে পারে। ইহার কথা বলিলেই রাজদরবারে ডেনমার্ক, জাপান কিংবা হলাণ্ডের নিকট জাহাজ ও জাল কিনিবার কথা উঠে। এবং বিদেশী মুদ্রার কথা। কিন্তু ভারতের সমুদ্রতীরে সর্বত্র যে সকল মৎস্যজীবী বাস করে ও মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে এবং নিজেরা খায়, তাহাদিগের সাহায্যে কেন সামুদ্রিক মৎস্য সরবরাহ হইবে না তাহা উচ্চস্তরের ওমরাহগণ বিচার করিতে নারাজ মনে হয়। কেননা প্রচুর অর্থব্যয় ও বিদেশের সহিত কারবার না করিলে সকল কথাই 'ছোটকথা হইয়া দাঁড়ায়। গরীব দেশের লোকের উচিত নিজেদের গরিবানা মানিয়া চলা। ঐশ্বর্য্য ও শক্তির ক্ষেত্রে কষ্ট-কল্পনা ক্ষতিকর হওয়াই সম্ভব। যাহা আছে তাহা লইয়াই চলা ভাল।

ব্রিটিশ সম্বন্ধে সাবধানতা

ব্রিটিশ জাতীয় লোকেরা ভারতের পরমবন্ধু বলিয়া কেহই বিশ্বাস করেন না। ইহার কারণ ব্রিটিশের ভারত দখল ও শাসনের কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিখিত আছে। প্রথমে বাণিজ্য করিবার জন্য এদেশে আসিয়া পরে ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ ভারতের বিভিন্ন রাজন্য, জাতি ও গোষ্ঠির মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত লড়াইয়া শক্তিহীন করিয়া দিয়া ভারত অধিকার করিয়া বসে ; সে কাহিনী সর্বজনবিদিত। বাণিজ্য বিস্তারের জন্য কেমন করিয়া ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতীয় শিল্পী ও কারিগরদিগকে অত্যাচার-জর্জরিত করিয়া ক্রমশঃ অক্ষম করিয়া ফেলা হয়, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে অঙ্গহীন করিয়া দেওয়া হয়—সে সকল নির্ম্মম বর্ব্বরতার বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সিপাহী যুদ্ধের পরে কেমন করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যগণ গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া দোষী-নির্দোষী নির্ব্বিচারে সকল জোয়ান ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং বড় বড় সহরে রাজপথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষের শাখায় শাখায় শত শত ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়া ঝুলাইয়া রাখে তাহারও উল্লেখমাত্র করিলেই যথেষ্ট। আরও নিকটে রহিয়াছে স্বদেশী যুগে বালকদিগকে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ অপরাধে বেত্রাঘাতের কথা, যুবকদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বরফের উপর বসাইয়া রাখা, নখ ও চুলের মধ্যে সূচীবিদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দেওয়া, শান্তিপূর্ণ সভার উপর লাঠি চালান, জালিয়ানওয়ালাবাগে অযথা গুলী চালাইয়া বহু নরনারীকে হত্যা করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভারত লুণ্ঠন করিয়া বহু ঐশ্বর্য্য নিজ দেশে লইয়া যাওয়া, শাসনের নামে বৎসরে বৎসরে শত শত কোটি টাকা আত্মসাৎ করা, সাধারণের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, সেতু, সহর, গৃহ, প্রাসাদ, কেল্লা প্রভৃতি অত্যুচ্চ-মূল্যে গঠন করিয়া নিজ জাতির লোকেদের লাভের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি ঐ ভারত সাম্রাজ্য গঠন ও উপভোগের আর এক অধ্যায়। স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠিলে ভেদনীতির সুপ্রতিষ্ঠার জন্য জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা ইত্যাদি সকল বিষয় অবলম্বনে ভারতীয়দিগের ঐক্যনাশ করিবার চেষ্টা,হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা করান এবং শেষে ভারত বিভাগ করিয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি, ব্রিটিশ কারসাজির চূড়ান্ত নিদর্শন।

ব্রিটিশের ভারত শোষণ, দমন ও ক্রম অবনতি চেষ্টার এখনও শেষ হয় নাই। তাহারা এখনও শত শত অকর্ম্মা ও দুষ্কর্ম্মপরায়ণ লোককে এদেশে রাখিয়া নিজ দেশের পুষ্টি সাধনের ও ভারতের ক্ষতির ব্যবস্থা করিতেছে। এই সকল ব্রিটিশ জাতির লোকের মধ্যে অধিকাংশই কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহে, শুধু জ্ঞানের অভিনয় করিয়া অর্থলাভে তৎপর। এবং যাহাতে ভারতে ব্রিটেনের মাল অধিক বিক্রয় হয় তাহার চেষ্টাও ইহাদিগের চেষ্টা। ব্রিটেনের কলকব্জা অপর দেশের কলকব্জা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নহে এবং তাহার মূল্যও তুলনামূলকভাবে অধিক। তাহা হইলেও, পণ্ডিত নেহরুর যুগ হইতেই ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ ও কলকব্জার খাতিরে ভারতের বহু সহস্র কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। এই সকল ব্রিটিশ জাতির লোকের মধ্যে অনেকে ভালবাসার খাতিরে কিংবা নিজ

জাতির মোড়লদিগের প্ররোচনায় অল্পবিস্তর পাকিস্তানের গোয়েন্দার কাজও করিয়া থাকে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষাভাষী লোকেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিবার চেষ্টাও ইহারা করিয়া থাকে। এই সকল কারণে আমাদিগের কর্তব্য ক্রমশঃ এবং যত শীঘ্র সম্ভব ব্রিটিশ চাকুরে লোকেদের ভারত হইতে সসম্মানে বিদায় করিয়া দেওয়া। ইহাদিগের মধ্যে কে অধিক ভারত-বিদ্বেষী তাহা বিচার করা বিশেষ কঠিন হইবে না। যাহারাই নিজ কর্তব্য অবহেলা করিয়া অথবা কর্তব্যকার্য্য করিয়াও অবসর সময়ে এই রূপ দুরভিসন্ধিমূলক ক্রিয়াকলাপে আত্ম-নিয়োগ করে সেই সকল ব্যবসাদার বা বাণিজ্য-বিশারদদিগকে শীঘ্র শীঘ্র স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ ব্যতীত অপর জাতীয় লোকও এই সকল গোয়েন্দার কাজকর্ম কখন কখন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আমেরিকান আছে বেশ কিছু। তাহাদিগের অন্যতম উদ্দেশ্য শাসকদলের সহিত সখ্যতা স্থাপন চেষ্টা এবং সেই সূত্রে নিজেদের মতলব সিদ্ধি চেষ্টা করা। ইহাদিগকেও আমেরিকায় ফেরত পাঠাইলে দেশের মঙ্গল হইবে।

স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন

ব্রিটিশ আমলে গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন বলিয়া সচল ও কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে। কৃষি, পশুপালন, মৎস্য উৎপাদন, বৃক্ষরোপণ, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণ, গ্রামের শিল্পকলা, কারিগরি ও অপরাপর পেশা লাভজনকভাবে চালাইবার আয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে উপরের রাজকর্মচারীদিগের কোন সাক্ষাৎ দায়িত্ব ছিল না বলিলেই চলে। রাজস্ব আদায় ঠিকমত পূর্ণরূপে হইলেই কার্য্য শেষ হইল বলিয়া ধরা চলিত। খাদ্যাভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ যাইলেও রাজদরবারে তাহারও মাথাব্যথা হইত না। ব্রিটিশ রাজত্বে গ্রামের ভারতবাসীগণ ক্রমশঃ অভাবের শেষ সীমা অতিক্রম করিয়া দুর্দ্দশার চরমে পৌঁছিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর রাষ্ট্রীয় নেতাগণ গ্রামের জন্য নানা প্রকার উন্নতি প্রচেষ্টার পরিকল্পনা আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমানে অন্ততঃ নামে শাসনতন্ত্র কর্তৃক মনোনীত ২,১৯,৮৯৪টি গ্রাম পঞ্চায়েৎ ভারতবর্ষের গ্রামগুলির আর্থিক ও অন্য প্রকার উন্নতির ব্যবস্থা করিবার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। যথার্থ অবস্থা কি আমরা জানি না। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কার্য্য করিবার শক্তি ও সামর্থ্য কতটা তাহাও জানি না। সম্ভবত উপরওয়ালারা দেশের বাস্তব উন্নতির সকল উপকরণই পূর্ণরূপে ব্যয় করিয়া গ্রামের মোড়লদিগের হাতে আর কিছুই পৌঁছিতে দিবার অবস্থা রাখেন না। যাহা হউক এখন আইনতঃ গ্রামের উন্নতি হইতে পারে তাহাই একটা আশার কথা, যদিও শুধু ভাবিলে আদর্শ উপলব্ধি কষ্টসাধ্য। এখন, ঐ সকল গ্রামের পঞ্চায়েৎ উপযুক্ত হস্তে আছে এবং যে যে পঞ্চায়েতের মোড়লদিগের বিশ্বাস যে তাঁহারা খাদ্য উৎপাদন, অর্থাৎ কৃষি, পশুপালন, মৎস্য সরবরাহ প্রভৃতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়াইতে পারেন তাঁহাদিগের উচিত হইবে জেলার উচ্চতম রাজকর্মচারীর মারফতে এই কার্য্যের জন্য মাল-মশলা পাইবার জন্য আবেদন করা। আবেদন করিলে কতটা সাহায্য তাঁহারা পাইবেন তাহা দেখিয়া বিচার করা চলিবে যে বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে এই দেশের লোকের জীবন ধারণ করা সম্ভব হইবে কি না। দুই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তে যদি এক হাজার টাকা সাহায্য করা হয় তাহা হইলে ব্যয় হইবে কুড়ি কোটি টাকা। ইহাতে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ কোটি টাকার খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি হইতে পারিবে। অর্থাৎ যে সকল লোকের খাদ্যাভাব ঘটিবে তাহাদিগের কিছু ভাগ লোকের খাদ্য ব্যবস্থা ইহাতে হইতে পারিবে। আর লাভ হইবে এই যে, বুঝা যাইবে গ্রাম পঞ্চায়েতের যথার্থ মূল্য শুধু লোক দেখাইবার একটা সাজান ব্যাপার মাত্র না; ইহার মধ্যে কোন সত্যকার প্রাণশক্তিও আছে।

উৎপাদন ও আমদানির কথা

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে খাদ্যবস্তু উৎপাদন ও আমদানির সংখ্যাচর্চ্চা করিলে দেখা যায় এই বিষয়ের সত্যকার অবস্থা কি প্রকার। খাদ্য আমদানি হয় শুধু চাউল ও গম-আটা। অন্য সকল ফসল যাহা হয়, যথা জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, যব, ছোলা, ডাল ইত্যাদি, তাহা গম ও চাউলের সহিত সহযোগে ভারতবাসীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সকল প্রকার শস্য মিলাইয়া দেখিলে ভারতবর্ষে মোট শস্য উৎপাদিত হইয়াছিল :

১৯৫৫—৫৬	খ্রীষ্টাব্দে	৬৬৮৫০০০০	টন ইহার মধ্যে ছিল চাউল	২৭৫৫৭০০০	টন	ও গম	৮৭৬০০০০	টন
১৯৬০—৬১	,,	৮০৯৭০০০০	,, ,,	৩৪১৯৮০০০	,,	,,	১০৯৯২০০০	,,
১৯৬১—৬২	,,	৮১০৯৭০০০	,, ,,	৩৪৮০৪০০০	,,	,,	১২০৬৯০০০	,,
১৯৬২—৬৩	,,	৭৮৪৪৮০০০	,, ,,	৩৩১৯৪০০০	,,	,,	১০৮২৯০০০	,,
১৯৬৩—৬৪	,,	৭৯৭৩০০০০	,, ,,	৩৬৪৮৯০০০	,,	,,	৯৭০৮০০০	,,

অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে মোট খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট হয় নাই। চাউলের উৎপাদন ততটা খারাপ হয় নাই, গমের তুলনায়। গম উৎপাদন বেশ কমই হইয়াছিল দেখা যায়। আমদানির সংখ্যাচর্চ্চাতে দেখা যায় যে :

১৯৫৬	খ্রীষ্টাব্দে	চাউল	৩৩০০০০	টন ও গম	১১২৩০০০	টন আমদানি হয়
১৯৬১	,,	,,	৩৮৪০০০	,,	৩০৯২০০০	,, ,, ,,
১৯৬২	,,	,,	৩৯০০০০	,,	৩৬৫০০০০	,, ,, ,,
১৯৬৩	,,	,,	৪৮৩০০০	,,	৪০৭৩০০০	,, ,, ,,
১৯৬৪	,,	,,	৬৪৫০০০	,,	৬২৬১০০০	,, ,, ,,

চাউলের মোট আমদানির পরিমাণ দেশজাত চাউলের শতকরা আন্দাজ ২ ভাগ মাত্র হইয়াছিল। গম আমদানি করিতে হইয়াছিল দেশজাত গমের পরিমাণের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক। মোট শস্য আমদানি হইয়াছিল দেশে জাত শস্যের পরিমাণের তুলনায় শতকরা আন্দাজ ৮ ভাগ। মোট জমি যাহা চাষ হইয়াছিল তাহা হইতে দেখা যায় যে, গমের চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস হয় নাই কিন্তু ফসল সেই অনুপাতে অল্প হইয়াছিল। ইহাতে গমের অভাব ঘটে ও আমদানির দ্বারা সে অভাব দূর করা হয়। গমের সহিত জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, যব ভুরি প্রভৃতি শস্য মিলাইয়া বন্টন করিলে শুধু গমের তুলনায় আটা প্রায় আড়াই গুণ হইয়া যায়। যুদ্ধের সময় সকল আটাই মিশাল শস্য পিষিয়া প্রস্তুত করা হইত। এখন কি করা হয় তাহা আমরা জানি না। মনে হয় যে শস্য মিশাইয়া পিষাণ হয় না। যদি তাহা না করা হয় তাহা হইলে গম অথবা গমের আটা যাহা দেওয়া হয় তাহা কমাইয়া তৎপরিবর্ত্তে মিশাল শস্য-পিষাণ আটা অনেকাংশে দিলে গম আমদানি কম করিলেও চলিতে পারে। পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানে ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি খাওয়া প্রচলিত আছে। সুতরাং গমের আটার পরিবর্ত্তে ঐ সকল শস্য সেই অঞ্চলে খাওয়ান চলিতে পারে। র‍্যাশনিং বা খাদ্যবন্টন নীতির মূল কথা হইল মাথাপিছু সপ্তাহে দুই কিলো চাউল-আটা দেওয়ার ব্যবস্থা। অর্থাৎ বৎসরে ১০৪ কিলো বা শিশু ও অন্যান্য যাহারা র‍্যাশন গ্রহণ করেন না তাহাদিগের হিসাব হইতে বাদ দিলে চাউল-আটার মোট পরিমাণ অনুসারে টনে লোকজনের খাদ্য আছে ধরা হয়। এই হিসাবে, গম ও চাউল ব্যতীত অপরাপর শস্য ধরা হয় না। এবং সেই সকল শস্যের মোট পরিমাণ প্রায় গম-চাউলের মোট পরিমাণের সমান সমান। ঐ সকল শস্য শহরের ও

কারখানা কেন্দ্রের বাসিন্দাদিগের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নহে। পাওয়ার কোন ব্যবস্থাও নাই। এই ব্যবস্থা করিলে খাদ্যাভাব আরও কিছু কমিয়া যাইতে পারে। ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এই কারণে যে, কোন কোন প্রদেশের জমিতে ঐ সকল শস্য চাষ হয় না। সেই সকল প্রদেশের লোকে শুধু চাউল ও কতকটা গমের উপর খাওয়ার সংস্থান করে। সারা ভারতে খাদ্যের সম-বন্টনরীতি চালিত হইলে সকল প্রকার শস্যের হিসাব করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত হইবে। চাউল চাষের জমিতে অপরাপর শস্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় ফসল হিসাবে চাষ করাও বিশেষ প্রয়োজন। ভারতে সমগ্র ভূখণ্ডের আয়তনের অর্দ্ধেকে চাষ ও খাদ্য উৎপাদন হয়। অপর অর্দ্ধেকে হয় না। এই অংশে পশুপক্ষী পালন ও কোথাও কোথাও মৎস্য উৎপাদন হইতে পারে। প্রায় বহু কোটি বিঘা জমিতে চাষ সম্ভব, কিন্তু হয় না। খাদ্য সংস্থানের ব্যাপারে পশুপক্ষী মৎস্যের কথা প্রথমে দেখা প্রয়োজন। চাষের জমি বাড়ানও বিশেষ প্রয়োজন।

বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য

পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার বলি। দেশরক্ষা ও দেশের এবং জাতির আর্থিক উন্নতি অপরে করিয়া দিবে আশা করা ভুল এবং আত্মসম্মান-বিরুদ্ধ। কোন প্রকারের বক্তৃতা, প্রদর্শনী বা অভিনয় করিয়া যথার্থ আত্মত্যাগ বা কর্ম্মের সাধনার অভাব পূর্ণ করা যায় না। যুবকগণ যদি দলে দলে যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, অল্পবয়স্কা নারীগণ যদি আহতের শুশ্রূষা করিতে শিক্ষাগ্রহণ করেন, নারীরা যদি যথাসাধ্য সোনার গহনা দিয়া স্বর্ণবণ্ড ক্রয় করেন ও সকলে যদি পূর্ণ মাত্রায় দেশরক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ ও দানের জন্য প্রস্তুত হন, তাহা হইলে বলা যাইবে বাঙ্গালী নিজ কর্ত্তব্য করিতেছে কি না। তাহা না হইলে যদি পাঞ্জাবী, গুর্খা, মারাঠা প্রভৃতির হস্তে যুদ্ধের ভার থাকে; মাড়োয়ারী, ভাটিয়া ও চেট্টির হস্তে থাকে সকল কারবারের কার্য্য, বিদেশের নিকট ঋণ করিয়া ও ভিক্ষা চাহিয়া দেশ শাসন, রক্ষা ও পরিচালনা সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর পক্ষে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকাই উত্তম পন্থা।

আর যে সকল অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী আছে, যাহারা বিদেশীর সহিত প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উৎসুক ও সেই আশায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া নিজেদের তথাকথিত আদর্শ প্রচার চেষ্টা করে, তাহাদিগের ন্যায় ঘৃণ্য জীবদিগের কথা আলোচনা করিতেও আমাদিগের লজ্জা হয়। এই সকল ব্যক্তির স্থান আমাদিগের দেশে না থাকাই উচিত। ইহাদিগকে কি উপায়ে দেশ হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া যায় তাহা আলোচ্য। অধর্ম্মের পথে চির প্রতিষ্ঠিত থাকাও জাতীয় ভাবে লজ্জাকর। কিন্তু আমরা যে ভুল ১৭-১৮ বৎসর ধরিয়া করিয়াছি তাহা ঠিক করিয়া লইতেও কিছু সময় লাগিবে। সকলের সমবেত চেষ্টা থাকিলে তাহা সম্ভব হইবে। এখন বাঙ্গালীরা নিজ চেষ্টায় বাংলা দেশকে সুপ্রতিষ্ঠার দিকে লইয়া যাইতে পারিলে তবে অপর কথা বলিবার অধিকার প্রাপ্তি হইতে পারে।

বাংলার গ্রামে গ্রামে বা কোন কোন গ্রামে পঞ্চায়েৎ রাজ চলিতেছে বলিয়া প্রচার। এই সকল পঞ্চায়েৎ কোথাও কি কোনও গ্রামের সকল জমি চাষের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে? অথবা সকল জলাশয়ে মাছ ছাড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছে? কিংবা ফলের গাছ লাগাইয়াছে ও বেকার লোকের কাজের সুবিধা করিয়া দিয়াছে? যদি ঐ জাতীয় কোন-কিছু না করিয়া থাকে তাহা হইলে গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা কোন্ কাজ হয়? বাংলা সরকারের যদি কোন গ্রামোন্নতি বা খাদ্য উৎপাদন কার্য্য পঞ্চায়েতের সাহায্যে করাইবার আয়োজন হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই আয়োজনের বিবরণ সাধারণকে জানাইলে লোকের মনে বাংলা সরকারের উপর আস্থা বৃদ্ধি হইতে পারে।

বাংলা দেশে যে সকল ব্যবসায়ী নানান উপায়ে বাংলার জনসাধারণকে ঠকাইয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া

থাকে সেই সকল ব্যবসায়ীর প্রবঞ্চনা-কার্য্য বন্ধ করিবার জন্ত বাংলা সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন? যথা, ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা করিলে অথবা সৎ ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগের ব্যবসা আরও প্রসারিত করিতে দিলে, অসৎ ব্যবসায়ীগণ ক্রমশঃ বাজার হইতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা করিলে অসৎ ব্যবসায়ীরা যে রাষ্ট্রীয় দলপতিদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। বাংলার অবনতির মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অসৎ লোকের সাহায্য গ্রহণ। এ দোষের জন্ত আজ বাংলার জনসাধারণ সর্ব্ববিধ ভাবে অভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে বাংলার যে উচ্চস্থান ছিল তাহাও আর নাই! ইহার কারণ কৃষ্টির ক্ষেত্রে বিকৃত রুচি ও অপরাপর ক্ষেত্রে অযোগ্য লোকের বা কষ্টকল্পিত আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ। শিক্ষা, কৃষ্টি, শিল্পকলা, সাহিত্য, অর্থ ও রাষ্ট্রনীতি; সকল কিছুতেই বাংলার একটা বিশুদ্ধ সংস্কৃতির অবিলম্বে প্রয়োজন!

শস্যবর্জ্জিত খাদ্য

ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যবস্তু আমদানি করিবার অক্ষমতা প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে! এই বিষয়ে যে সকল চেষ্টা চলিতেছে তাহার মধ্যে উচ্চস্তরের রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিরা বর্ত্তমানে যাহারা না খাইয়া মরিতে পারে তাহাদিগের খাইবার ব্যবস্থা অপেক্ষা ৪র্থ আর্থিক পরিকল্পনার অন্তে যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে সেই আলোচনা অধিক প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় একটি ভোজনালয় চালিত করিয়াছেন, যেখানে চাউল-আটা-বর্জ্জিত খাদ্য পরিবেশন করা হইতেছে। ইহা খুবই উত্তম কথা। যদি লোকে চাউল-আটার পরিবর্ত্তে অপর খাদ্য খাইতে অভ্যাস করে তাহা হইলে আটা-চাউল যাহা বাঁচিবে তাহাতে অনেকের খাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু এই সকল বদলি-খাদ্য শুধু খাইলেই চলিবে না; এইগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে হইবে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি কলিকাতার বাহিরে দুই-দশটি গ্রামে যাইয়া সেখানের লোকেদের কোলা, লাল আলু, মটর, ভুট্টা প্রভৃতি অবিলম্বে চাষ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন ও অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাজকর্ম্মচারীগণও স্ব স্ব এলাকায় ঐ প্রকারে বদলি-খাদ্য উৎপাদন আরম্ভ করাইয়া দেন তাহা হইলে সুফল হইবে বলিয়া মনে হয়। খাদ্য চার-পাঁচ বৎসর পরে পাওয়া যাইলে বর্ত্তমানের অনাহার মৃত্যু নিরোধ সম্ভব হইবে না। বাংলার সর্ব্বত্র জলাশয় সংস্কারকার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। যে সকল মৎস্য শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে সে জাতীয় মৎস্য এই সকল জলাশয়ে ছাড়া আবশ্যক। এক কথায় নানা প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা এখন হইতেই আরম্ভ না হইলে এবং ৩।৪ মাসের মধ্যে তাহা লোকের হাতে না আসিলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার সমাধান হইবে না। যাঁহারা খাদ্যবস্তু পাইতেছেন তাঁহাদিগের উচিত হইবে কিছু কিছু সেই খাদ্য হইতে জমাইয়া রাখা। কারণ, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে কোনও সময় সাময়িকভাবে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। সেইরূপ ঘটিলে নিজেদের নিকটে কিছু কিছু খাদ্যবস্তু থাকিলে সাময়িক অভাবে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। এক মাস না খাইতে পাইলে মানুষের মৃত্যু সম্ভব, কিন্তু মানুষ অর্দ্ধাহারে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে।

চীন ও পাকিস্তান

কোন কোন জাতীয় জীব আছে যাহারা কখনও নিজের হিংস্রভাব ত্যাগ করিতে পারে না এবং যাহাদিগের উপর কোন সময় কোন বিষয় বিশ্বাস করা নিরাপদ হয় না। চীন ও পাকিস্তানের নেতাদিগের বিষয়ে বলা যায় তাহারা ঐরূপ ভাবেই নির্ভরযোগ্য নহে। তাহাদিগের সহিত বহু আলোচনা করা যাইতে পারে কিন্তু

তাহাদিগকে বিশ্বাস করা কখনও বুদ্ধির কার্য্য হইবে না। তাহারা যাহা বলিবে বা যাহা করিবার অঙ্গীকার করিবে তাহার কোন কিছুরই কোন মূল্য নাই বলিয়া ধরিতে হইবে। এই দুই জাতিরই পিছন হইতে ছুরি মারা অভ্যাস এবং ইহাদিগের সহিত কার্য্যকলাপে এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে।

শ্রেণীহীন সমাজ

ভারত স্বাধীন হইলে পর সর্ব্বত্র সাম্যবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের পরিকল্পনা হয়। কিন্তু সাম্যবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং পুরাতনকালের শ্রেণী বিভাগ কিছু কিছু উঠিয়া গিয়া থাকিলেও নূতন নূতন বহু শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। আফিসে, দপ্তরে ও কারখানায় শ্রেণীবাহুল্য হইয়া এমন অবস্থা হইয়াছে যে মানুষ মানুষের সহিত সোজাসুজি বন্ধুত্ব করিতেও পারে না; পাছে "ছোট জাতের" সহিত ঘনিষ্ঠতা করার ফলে মর্য্যাদাচ্যুত হইতে হয়। রাজধানীর রাস্তাগুলিতে "গ্রেড" অনুসারে লোকে বাস করে। পূর্ব্বকালে যে বিদ্বান সর্ব্বত্র সম্মানিত হইবার রীতি ছিল, আজ আর তাহা নাই। ঐশ্বর্য্যের আস্ফালন ও রাজদরবারের লোকেদের সহিত ঘনিষ্ঠতা দিয়া মানুষের পদমর্য্যাদা বিচার হয়। এবং এই নূতন পদ্ধতিতে বহু শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। পদমর্য্যাদার অহঙ্কার মানব সমাজে সাম্যবাদ স্থাপনের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন কি উপায়ে সাম্য স্থাপিত হইতে পারে তাহার চিন্তাও কেহ করিতেছে না।

একচেটিয়া ব্যবসা

ভারত সরকারের আমলা মহলে সমাজতন্ত্রের যে চিত্র ভারত জনসাধারণের জন্য আঁকিয়া সর্ব্বত্র দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, তাহাতে স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্রের প্রধান সহায় হইল আমলা-পরিচালিত দপ্তরগুলি। ঐ দপ্তরগুলি যে সকল নিয়ন্ত্রণবিধি বহুচিন্তা করিয়া রচনা করে ও পরে সেইগুলি নিয়োগ করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রা অতি সহজ ও সরল করিয়া দেয়; সেই সকল নিয়ন্ত্রণবিধির রচনা ও প্রয়োগের মধ্যে এবং আমলাদিগকে উচ্চ সম্মান দিয়া (সিংহ) আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিলেই ভারত জনসাধারণের স্বাধীনতা চূড়ান্ত হইতে পারিবে। সম্প্রতি একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর যে অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ভারতে কয়েকটি ব্যবসায়ীগোষ্ঠি আছে যাহারা নিজেদের সমবেত প্রচেষ্টায় কয়েকশত কোটি টাকা মূলধন একত্র করিয়া বিভিন্ন প্রকার ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। এই সকল গোষ্ঠির কার্য্যের ফলে ভারত সরকারের বহু অর্থ রাজকর হিসাবে পাওয়া সম্ভব হয় এবং জনসাধারণের সহস্র সহস্র লোকের কর্ম্ম সংস্থানও হয়। এই সকল গোষ্ঠির দ্বারা সাধারণের কি কি ক্ষতি হয় তাহা এখন অবধি পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় নাই। একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের কথা যে সকল দেশের অনুকরণে আমাদিগের দেশে উঠান হইয়াছে সেই সকল দেশের তুলনায় আমাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য কারখানা প্রভৃতি কিছুই নহে বলিলেই হয়। অর্থাৎ অপর কারখানাবহুল দেশের লোকেরা কারখানাজাত অবস্তু-ব্যবহার্য্য বস্তু ক্রয়ের জন্য নিজেদের মোট খরচের বার আনা অংশ ব্যয় করিয়া থাকেন। আমরা নিজেদের মোট খরচের বার আনার অধিক অংশই কারখানার বাহিরে উৎপন্ন বস্তু ক্রয়ে ব্যয় করি। সুতরাং জনসাধারণের কোন মহাক্ষতির কার্য্য একচেটিয়া ব্যবসায় দ্বারা ভারতবর্ষে এখন হয় না বা অদূর ভবিষ্যতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমলাতন্ত্রের একাধিপত্যে এই সকল বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠি কোন বাধা দেয় কি না আমরা বলিতে পারি না।

সম্ভবত আমলাদিগের কোন অসুবিধা হয় ইহাদিগের দ্বারা; নতুবা ইহাদিগকে দমন করিবার প্রয়োজন হইবে কেন?

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ব্যবসাদারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা চালাইয়া থাকে। ইহাদিগকে বাঁচাইয়া সবল করিয়া তুলিবার কি চেষ্টা ভারত সরকার করেন, তাহা আমরা জানি না। ইহাদিগের মধ্যে বহু ব্যবসায়ী ভারত সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের ধাক্কায় ব্যবসা গুটাইয়া রাস্তায় বেকার অবস্থায় ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়। যাহারা রাস্তায় বসিয়াই কোন ক্ষুদ্রায়তন ফেরির কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহারাও "হকার নিয়ন্ত্রণের" ধাক্কায় রাস্তা হইতে সম্ভবত জলে নামিতে বাধ্য হইবে। আসল কথা হইল এই যে বড় বড় কথার আবরণ সৃষ্টি করিয়া যদি কেহ বা কাহারা নিজেদের অধিকার ও শক্তি আরও প্রবল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সাধারণের উচিত সেই আধিপত্যের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার ব্যবস্থা করা। বিগত কয়েক বৎসর হইতেই দেখা যাইতেছে যে কংগ্রেসী রাজ ক্রমশঃ একচেটিয়া ও সর্ব্বব্যাপ্ত শাসন এবং জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ অধিকার আহরণ চেষ্টা করিতেছে। ইহা কোন পরিকল্পনার ফল অথবা শুধু আমলাতন্ত্রের প্রসার প্রচেষ্টার উপজাত বর্দ্ধনীয় কুফলমাত্র তাহা বিচার করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। একটা উচ্চস্তরের "কমিশন" বসাইয়া দেখা উচিত যে ভারতে ক্রমশঃ আমলাগোষ্ঠী অধিক হইতে অধিকতর ভাবে প্রবল হইয়া দেশবাসীর স্বাধীনতার হানি করিতেছে কি না। সরকারী ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতেই বা দেশবাসীর কোন সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি হইতেছে? যে দেশের বার আনা লোক বার আনা প্রায় বেকার ও সকল প্রকার অভাবের অতলে নিমজ্জিত, সে দেশের কোথায় কাহার দুই পয়সার ব্যবসায় আছে তাহা চার পয়সা খরচ করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন কোথায়? ঐ চার পয়সা যদি আমলাদিগের বেতন, ভ্রমণ ও ভাতায় ব্যয় হয় তাহা হইলে অবশ্য আমলাদিগের কিছুটা লাভ হইতে পারে।

"...ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জ্জনে ধ্যানধারণার সময় নয়—সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে।...আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয়পবন স্পর্শে যেমন শীতার্ত তরুর প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয়—রণভেরী শুনিলে যেমন বীর-হৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে তেমনি একটা নূতন সাড়া পড়িয়া গেল।...আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাই না—ঐ স্বরাজ-গড় গড়িতে—স্বরাজতন্ত্রের প্রজা হইতে—আমার প্রাণ সদাই আনচান।"—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—"স্বরাজ", ১৩০৭—

("উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" হইতে উদ্ধৃত।)

ক্ষুদ্র আন্দামানের ওঙ্গী

শ্রীবিমলচন্দ্র রায় ও শ্রীতুষারকান্তি নিয়োগী

ক্ষুদ্র আন্দামান—ওঙ্গীদের শৈশবের ক্রীড়াঙ্গন, যৌবনের লীলাকুঞ্জ, বার্দ্ধক্যের বনতীর্থ—আজও আছে ঠিক বঙ্গোপসাগরের অশান্ত ঘূর্ণী আর অশ্রান্ত ঊর্মিঘাত সহ্য করে; হাতে হাত মিলিয়ে তার জীবন-সংগ্রাম সমগ্র আন্দামান দ্বীপের সঙ্গে। পোর্টব্লেয়ার থেকে মাত্র ৬৪ মাইল দক্ষিণে যেতে হবে ক্ষুদ্র আন্দামানের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষদের দেখা পেতে হ'লে। ভারত সরকারের অধীন এই আন্দামান নিকোবরের রাজধানী হ'ল পোর্টব্লেয়ার—যার সঙ্গে ওঙ্গীদের লীলানিকেতন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ডানকান প্যাসেজের জলক্রীড়ায়। ছোট দ্বীপটির মাত্র ২৬ মাইল দৈর্ঘ্য আর ১৬ মাইল প্রস্থ—সবশুদ্ধে দ্বীপটির আয়তন মাত্র ২৯০ বর্গমাইল। বিষুব-অঞ্চলের উষ্ণ আর্দ্র বনভূমি—উপকূলের বালুকাবেলা আর অভ্যন্তরে গভীর বনারণ্য। সেই জঙ্গলাকীর্ণভূমিতে বিচরণ করলে ইতি-উতি দেখা যাবে বন্যশূকরের উজ্জ্বল-দৃষ্টি, কানে আসবে পিরপিটির উদ্যত পলায়নতৎপরধ্বনি—বিচিত্র সরীসৃপের বিসর্পিল গতিভঙ্গি আর হাজারো রকমের পক্ষীকাকলীতে বন হবে মুখর। আবহবিজ্ঞানীদের রিপোর্ট তল্লাশ করেও ওঙ্গীদের দ্বীপটিকে ভালোভাবে জানা যায় নি—তবে পোর্টব্লেয়ারের আশপাশের রিপোর্টে পাওয়া গেছে বাৎসরিক ১৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত; দ্বীপের তাপ ওঠানামা করে ৮২ ডিগ্রী ফারেনহাইট থেকে ৭৯ ডিগ্রী ফারেনহাইটের মধ্যে। জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ ও আর্দ্র এবং সারা বছরে এর বিশেষ কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

এমনি এক ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে ওঙ্গীরা। আমরা দেখব যে বনভূমিকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর একটি অতি প্রাচীন কোম ওঙ্গীদের জীবনবৃত্ত ও সংস্কৃতি আবর্তিত। বন যে ওদের কেবলমাত্র খাদ্য-আহরণশালা তাই নয়—তাদের জীবন ও কর্মের ভরকেন্দ্র এই সবুজ বন, ওদের জীবনবৃত্তির নিয়ন্তা, ওদের ধর্মবোধের পীঠস্থান।

শরীর লক্ষণে মনে হয় ওঙ্গীরা নিগ্রোবেদের জীনবীজ-ধারী। খর্বাকায়, চওড়া কপাল মানুষগুলোর দেহ-কাঠামোতে আছে আনুপাতিক সুষমা। গায়ের রঙ ওদের ঘন কালো, চুলগুলো কোঁচকানো কোঁচকানো, এক এক থাকে বেড়ে ওঠে। ওঙ্গীদের মধ্যে কোন কোন মেয়ের পশ্চাৎভাগ একটু বেশী পরিমাণে চর্বীস্ফীত থাকে, যাকে নৃতত্ত্বের ভাষায় বলা যায় "ষ্টিয়াটোপাইগ্যা" বা স্ফীতনিতম্ব।

ওঙ্গীদের জীবনায়নের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে ওদের সঙ্গে সভ্য-জগতের পরিচয়ের সম্পর্কে দু'-চারটে কথা স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়। সম্ভবত সভ্যজগতের সঙ্গে ওঙ্গীদের প্রথম পরিচয় ঘটে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, জি.এফ. আলেকজাণ্ডারের মাধ্যমে। তারপর থেকে গবেষক এবং পর্যটক হিসাবে অনেকেই এ দ্বীপে এসেছেন আর চেষ্টা চলেছে ওদের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে তোলার। ১৮৮০ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে পোর্টম্যান বেশ কয়েকবার এ দ্বীপটি পর্যবেক্ষণে যান এবং তাঁরই আনুকূল্যে ওঙ্গীদের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারাও আর হিংস্র থাকে না ভিন্‌-দেশীয়দের প্রতি। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান নৃতত্ত্ববিদ ভন ইকস্টেড এই দ্বীপে যান। ১৯৪৮ সাল থেকে ওঙ্গীদের সম্পর্কে গবেষণার জন্য ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে গবেষক দল প্রেরিত হচ্ছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় আজও ওঙ্গীদের সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হওয়া যায় নি। অবশ্য এর একটা প্রধান কারণ ভাষাগত পার্থক্যের জটিলতা। আন্দামানী ভাষা সমূহের এক শাখায় পড়ে ওঙ্গীদের কথ্যভাষা, যার সঙ্গে ভারতীয় ভাষাসমূহের কোন একটিরও মৌলিক কোন যোগ নেই এবং ওঙ্গীদের দু'চারটি শব্দ শুনে মনে রাখা ছাড়া এখনও সমস্ত ওঙ্গী শব্দাবলী তথাকথিত পণ্ডিত সমাজের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয় নি। আর ওঙ্গীদের ভাষা বোঝে এমন অনুবাদকও পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করে দু'একটি ওঙ্গীকে দু'চারটে হিন্দী শব্দ শেখান গেছে কিন্তু তাতে গবেষণার কাজে খুব সুবিধা হয় না। এছাড়া আর কোনও ভারতীয় ভাষার শব্দ ওঙ্গীদের জানা নেই। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত ভাষাগত

সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান না হচ্ছে ততদিন ওঙ্গীদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া অসম্ভব। ওঙ্গীদের লোকসংখ্যা-সম্পর্কিত এযাবৎ যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গেছে তাও সব সময় ঠিক নয়। বর্তমানে ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র ছবি নিয়ে যে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তা হ'ল ১৫০ জন। এই ১৫০ জনের জীবনধারের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা

ওঙ্গীদের খাদ্যসরবরাহের উৎস জঙ্গলাভূমি এবং উপকূলবর্তী সমুদ্র, ছোট ছোট খাঁড়ি ইত্যাদি। কৃষি বা অন্য কোন খাদ্য-উৎপাদন প্রণালী সম্পর্কে ওদের কোন ধারণা নেই। ওঙ্গীদের জীবনধারণের প্রক্রিয়াকে মোট কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) বৃক্ষমূল, কন্দমূল, নানাজাতীয় ফলমূল ও মধু-সংগ্রহ।

(খ) সমুদ্র এবং খাঁড়ির কাছাকাছি মৎস্যশিকার।

(গ) বনভূমিতে বন্যবরাহ শিকার।

জঙ্গল থেকে বিভিন্ন রকমের ফল, কন্দমূল এবং মধু সংগৃহীত হয়ে থাকে। এর মধ্যে বন্য কাঁঠাল, মধু এবং কন্দমূল সাধারণতঃ সংগৃহীত হয় স্ত্রীলোকদের দ্বারা। এই কাজ তারা করে একখণ্ড লৌহ-শলাকা দিয়ে। ছোট আন্দামানে জংলা কাঁঠালগাছের ছড়াছড়ি এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রচুর পরিমাণে কাঁঠাল পাওয়া যায়। লম্বা একটা বাঁশের মাথায় একটা লোহার হুক লাগিয়ে গাছ থেকে পেড়ে আনা হয় ফল। বর্ষাকালে যখন খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় তখন তাদের মূলত নির্ভর করতে হয় শুধু শুকনো কাঁঠালের বীচি এবং মধুর উপর। কেবলমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া বছরের প্রায় সব সময়ই মধু সংগ্রহ হয়। মৌচাকে হাত দেওয়ার আগে ওঙ্গীরা একজাতীয় গাছের পাতা চিবিয়ে লালার মত রস বার করে। তারপর তা গায় মেখে নেয়, মুখের ভেতর থুথুর আকারে সেই রস রাখে—মৌচাকে হাত দেওয়ার সময় থুথু করে সেই রস ছিটিয়ে দেওয়া হয়। রসের উৎকট গন্ধে মৌমাছিরা পালাতে উদ্যোগী। তারপর মধুসংগৃহীতা একটি ধারালো ছুরি দিয়ে মৌচাক কেটে রস সংগ্রহ করে একটা কাঠের পাত্রে তা সঞ্চয় করে রাখে। এই জাতীয় গাছের নাম ওঙ্গীভাষায় "টঙ্গিবাগে", এবং "ঠেবটিলেবে"।

মাছ ছাড়া নানাপ্রকার জোয়াণারকে এবং কচ্ছপ শিকার ওঙ্গীদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। হাতে তৈরী ছোট ছোট জাল দিয়ে ওঙ্গীমেয়েরা মাছ ধরে থাকে। আর পুরুষেরা তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করে মাছ। তীরের মুখ লোহার তৈরী এবং অত্যন্ত ছুঁচলো। অগভীর সমুদ্রেও মাছ ধরতে পুরুষদের বিশেষ পারদর্শিতা দেখা যায়। দিনে-রাতে উভয় সময়ই কচ্ছপ শিকারের আয়োজন চলে। কাঠওয়ালা ডিঙ্গিনৌকা নিয়ে (Canoe fitted with ontriger) ওরা কচ্ছপ শিকারে বেরোয়—যেই কচ্ছপ দেখা যায় অমনি ওঙ্গীদের কোঁচ (হারপুন) তীব্রভাবে ছুটে গিয়ে বিদ্ধ করে কচ্ছপের শক্ত চামড়া, তারপর তাকে টেনে তোলা হয় নৌকায়। ওঙ্গীভাষায় কচ্ছপের নাম "নারেলাবে"। জঙ্গলে কেবলমাত্র শূকর শিকার হয়। বর্ষাকালে শূকর শিকারে নানা অসুবিধা হয়। শূকর শিকারে কুকুরের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক এবং এই শিকারের জন্যই প্রত্যেক পরিবারের অধীনে বহুসংখ্যক কুকুর থাকে। শূকর শিকারে সাহায্যকারী কুকুরের দল পুরস্কার পায় শূকরের মাংসের ভাগ প্রভুদের সঙ্গে একসঙ্গে ভোগ করে। শূকর শিকারের প্রক্রিয়া খুব একটা জটিল কিছু নয়। একদল শিকারী ওঙ্গী সমবেতভাবে বনে প্রবেশ করে—সঙ্গে থাকে তীর, ধনুক, বর্শা আর সাহায্যকারী কুকুরের দল। তারপর কুকুরগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয় গভীর বনে; তারপর তারা গন্ধ শুঁকে শুঁকে শূকরের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং যখন তাদের পাত্তা পায় তখন সমবেতভাবে তাড়িয়ে নিয়ে শূকরকে একজায়গায় কোণঠাসা করে ফেলে। তারপর শিকারীদের তীর শূকরকে বিদ্ধ করে। শূকর শিকারে শুধু যে পারদর্শিতার প্রয়োজন তাই নয়, এই সঙ্গে প্রয়োজন ধৈর্য ও সময়ের।

ওঙ্গীরা সাধারণত দু'টি থেকে পাঁচটি পরিবার একত্র হয়ে ছোট ছোট দলে চলাফেরা করে। আহার্য আহরণের সুবিধার জন্য ওঙ্গীরা কোনও একটি স্থানে বেশীদিন একসঙ্গে থাকতে পারে না। প্রত্যেক দলের জন্য নির্দিষ্ট একটা বিচরণভূমি আছে, যাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক ওঙ্গীর শিকার-সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যা শিকার বা সংগ্রহ করে তার সম্পূর্ণ অধিকার তার নিজের এবং পরিবারের প্রত্যেকেই তার ভাগ পায়। কিন্তু যখন সেই দলের কোন ব্যক্তির খাদ্যের পরিমাণে স্বল্পতা দেখা যায় তখন তাকে অন্য পরিবার থেকে খাদ্যসরবরাহ করা হয়। শিকারের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটার ব্যাপক প্রচলন আছে। যখন একটি শূকর ধরা পড়ে তখন কেবলমাত্র একটি পরিবারই

যে তার ভাগ পায় তা নয়, বরং সাধারণ বাসনিবাসের (communal hut) সকলেই সেই শূকরের মাংসের ভাগ পেয়ে থাকে। অন্য খাদ্যের বেলাতেও সেই একই জাতীয় সহযোগী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

খাদ্য এবং পানীয়

ওঙ্গীদের খাদ্যতালিকাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ফলমূল, কন্দমূল এবং মাছমাংস, কচ্ছপ ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে বীজ, নানাজাতীয় ফলমূল; দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে মাছ মাংস শামুক কচ্ছপ ও তার ডিম, কাঁকড়া ইত্যাদি। এ ছাড়া মধু ওঙ্গীদের একটি প্রয়োজনীয় এবং প্রধান খাদ্য।

ওঙ্গীরা আগুনের ব্যবহার সম্পর্কে অজানা হলেও অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কোন নিজস্ব পদ্ধতি ওদের জানা নেই। ইদানীং সভ্য সমাজের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তারা দেশলাইয়ের ব্যবহার শিখেছে। কিন্তু সব সময় দেশলাই পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকায় ওরা একটা বিশেষ কায়দায় আগুন জ্বালিয়ে রেখে দেয়। যখন একদল একস্থান থেকে অপরস্থানে যাতায়াত করে তখন তারা তাদের সঙ্গে একখানা জ্বলন্ত কাঠ রাখে যাতে করে সব সময়ের জন্য প্রয়োজনমত ওর থেকে আগুন সংগ্রহ হ'তে পারে।

প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য একটি নির্দিষ্ট সমবায় গৃহ আছে এবং সেখানে একটি অগ্নিকুণ্ড সব সময়ের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়, যার থেকে গোষ্ঠীর রান্নাবান্না সম্পন্ন হয়। আবার প্রত্যেক স্বতন্ত্র পরিবারের জন্যও ছোট ছোট কুঁড়ে আছে, সেখানেও ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা থাকে তাদের প্রত্যেকের খাদ্য প্রস্তুতির জন্য।

গাছ থেকে পাড়া নানারকম ফল ওঙ্গীরা খেয়ে থাকে। পাকা কাঁঠাল পাকা হ'লে তারা সেইভাবেই গ্রহণ করে আর বীচি তারা খায় সিদ্ধ করে। শূকরকে মারার পর তার নাড়ীভুঁড়ি বার করে নেওয়া হয় এবং তারপর সমস্ত শূকরের দেহটাকে ঝলসে নেওয়া হয়। শূকরের চামড়া প্রথমে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়, তারপর তা খণ্ড খণ্ড করে কেটে নেওয়া হয়। কচ্ছপ খাবার আগেও এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মাছ, নানাপ্রকার সামুদ্রিক শামুক ইত্যাদিকে খাবার সময় পিত্ত ইত্যাদি ফেলে দেওয়া হয়।

"রান্না" অর্থে আমরা যা বুঝি তা ঠিক ওঙ্গীরা করে না। ওদের রান্না মানে সিদ্ধ করা বা অল্প সেঁকে নেওয়া। সিদ্ধ করার জন্য বিশেষ পাত্রের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে ওঙ্গীদের মধ্যে মৃৎপাত্র তৈরির কোন বিশেষ পদ্ধতি চালু না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, এক সময় ওরা মৃৎপাত্রের নির্মাণ এবং ব্যবহার জানত। আজকাল প্রত্যেক ওঙ্গী পরিবারেই নিজস্ব ব্যবহারের ধাতুপাত্র দেখা যায়—এ ব্যাপারটা ঘটেছে সভ্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে। প্রায় সমস্ত রকমের খাদ্য-বস্তুই সিদ্ধ করে নেওয়া হয়—তবে মাছ শামুক ইত্যাদি ঝলসে নিলেও চলে; ঝলসে নেওয়া হয় কাঁচা কাঁঠাল, নানা কন্দমূল ইত্যাদিকেও সময় সময়। শামুক ইত্যাদি সিদ্ধ করে খায়—কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভাব হ'লে

স্ত্রী-পুরুষ এবং শিশু—ওঙ্গী পরিবার
(ভারতীয় নৃতত্ত্ববিভাগের সৌজন্যে)

সেঁকে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। শূকর এবং কচ্ছপের মাংসকে বিশেষ পদ্ধতিতে সেঁকে নেওয়া হয়। শূকরের মাংস তৈরী করার জন্য ওঙ্গীরা এক জায়গায় গর্ত খোঁড়ে—যার মধ্যে থাকে আগুনের ব্যবস্থা। সেই গর্তের ওপর বিশেষ রকম পাথর রাখা হয়—ঐ পাথরগুলোর নামই রান্নার পাথর (Cooking Stone)। সেই পাথরের ওপর একপ্রকার গাছের কাঁচা পাতা রেখে মাংসখণ্ডগুলি সাজিয়ে রাখা হয় এবং তার ওপর আবার সেই পাতা

চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। এখন সমস্ত পাথরের ওপর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এইভাবে রেখে দিতে হয় ৩।৪ ঘণ্টা; এবং মাটি সরিয়ে প্রস্তুত মাংস বার করে দেওয়া হয়। মধু এবং শূকরের চর্বি ওঙ্গীদের কাছে অত্যন্ত উপাদেয়। ওঙ্গীরা মধু খায় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আর মাংস রান্নার সময়ই শূকরের চর্বি খায় অত্যন্ত উৎসাহভরে।

সাধারণতঃ মেয়েরাই রান্নাবান্নার কাজ করে, তবে একাজে পুরুষের সাহায্যও তারা যথেষ্ট পায়। কিন্তু রান্নার জন্য শূকর এবং কচ্ছপ ইত্যাদি মাংস খণ্ড খণ্ড করে কাটা, হাড়গোড়, পিত্ত ইত্যাদি বার করে ফেলা, এই সব কাজ পুরোপুরি পুরুষের। ওঙ্গীদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখা যায়। ওঙ্গীরা কোন খাদ্যদ্রব্যেই নুন ব্যবহার করে না। ওরা সাধারণতঃ দিনে দুবার খেয়ে থাকে। একবার প্রাতরাশ আর একবার সূর্য্যাস্তের পর পেটভরে খাওয়া। ওঙ্গীরা যখন শিকার বা খাদ্যসংগ্রহের জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাত্রা করে তখন তারা তাদের সঙ্গে রান্না খাদ্য নিয়ে যায়—তা থেকেই দুপুরের খাওয়া সবাই সেরে ফেলে। ওঙ্গীরা কোনপ্রকার মাদক-দ্রব্যের সঙ্গে পরিচিত নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, চোরাকারবারীরা নানা ছলছুতোয় চেষ্টা করছে ওদের মধ্যে সস্তা মদ এবং আফিমের নেশা চালু করবার। শাসককর্ত্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না করলে অদূর ভবিষ্যতে এই মাদকদ্রব্য ওঙ্গীদের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার ওপর বিস্তর ক্ষতি করবে।

প্রত্যেক সাধারণস্থান নিবাসের আছে নির্দ্দিষ্ট জল সরবরাহ কেন্দ্র। ২।৩ ফিট নীচু গর্ত্ত থেকে জল সংগৃহীত হয়ে থাকে। সেই জল বাঁশের নলে অথবা কাঠের ডোঙায় ভরে রাখা হয়।

সভ্য-জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে ওঙ্গীদের মধ্যে এখন তামাকের প্রচলন হয়েছে। বর্ত্তমানে ওঙ্গীদের কাছে বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদির বেশ চাহিদা। ১৮৫৮র কারাবাস স্থাপনের পর আন্দামানবাসীরা এই বস্তুগুলির ব্যবহার দেখে এবং তাদের মারফৎ ওঙ্গীরা এসবের সঙ্গে পরিচিত হয়।

দৈনন্দিন জীবন

ওঙ্গীদের দৈনন্দিন জীবনও অত্যন্ত সরল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ছোটছোট ওঙ্গীনিবাস প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। গতরাতের ভুক্তাবশিষ্ট কিছু প্রাতরাশ হয়ে যায়। পুরুষেরা সাধারণত শিকারের অন্বেষণে এবং স্ত্রীলোকেরা যায় ফলমূল সংগ্রহের জন্য। যদি স্বামী শিকারের দলে চলে যায় তবে তার স্ত্রী অন্যান্য সহগামিনীদের সঙ্গে কন্দমূল শামুক, ফল সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে। তা না হ'লে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বনজ উদ্ভিদ ফল মধু সংগ্রহের জন্যে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। যদি দিনের খাদ্য সংগ্রহ থাকে তবে কিছু পরিবার সাধারণ ওঙ্গীনিবাসে থাকে। যারা বনে না যায় তারা দিন কাটায় কুঁড়েতে, সময় ব্যয় করে ধনুক, তীর, বর্শার ফলা, জাল ইত্যাদি তৈরী করে। অপরাহ্ণে আবার ঘরে ফেরবার পালা। রাত্রের খাবারদাবার তৈরী করার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে ওঙ্গী গৃহকামিনীরা। শূকর শিকার করে আনা হ'লে পুরুষরা সেটাকে ছাড়াতে, কাটতে ব্যস্ত থাকে। দিনের এই সময়টা বিশেষতঃ সাধারণ নিবাসগৃহ অত্যন্ত কর্মমুখর হ'য়ে ওঠে। অবশ্য বিকেলে অনেকে নিকটবর্ত্তী খাঁড়ি, ছোট নদী ইত্যাদিতে মাছ ধরতেও যায়। রাত্রের আনন্দ উৎসবের প্রয়োজনে মেয়েরা রঙ তৈরী ও শরীরে সেই রঙ ব্যবহার করার জন্য ব্যস্ত থাকে। সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে ওদের খাওয়ার পালা শেষ। তারপর একখণ্ড কাঠের আগুনের চারপাশে ঘিরে বসে ওরা—দেখা যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ওঙ্গী মানুষগুলি গল্পগুজবে মেতে আছে। কোথাও হ'চ্ছে নানা ধরনের হাল্কা গল্প, কোথাও জমে উঠেছে শিকারের কাহিনী। আনন্দঘন একটি পরিবেশ। সাধারণস্থান নিবাসের মধ্যে একটা উঁচু কাঠের চৌকি জাতীয় এক প্রকার বিছানায় তাদের শোবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। কখনো সন্ধ্যায় সময় নাচের মহড়া চলে, ভেসে আসে বাতাসে ওঙ্গীদের কণ্ঠসংগীতের রেশ। তখন ওরা সবচেয়ে হাসিখুশী, সবচেয়ে প্রাণচঞ্চল।

গ্রীষ্মকালে ওঙ্গীরা মোটামুটি যাযাবর—কখনো এক-স্থানে তারা থাকতে চায় না। কিন্তু বর্ষাকালে তারা কোন একটা বিশেষ স্থানে বেশ কিছুদিন বাস করতে বাধ্য হয়। বছরের এই সময়টা প্রত্যেক পরিবারই বাস করে সাধারণস্থান নিবাসে। এই সময় মৎস্যশিকার, পশুশিকার, খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারে তেমন তোড়জোড় দেখা যায় না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের আগমন এই সময় কচিৎ ঘটে এবং জীবনগতি এসময় হয় অত্যন্ত মন্থর এবং একঘেয়ে।

বাসস্থান

আগেই বলেছি ওঙ্গীরা প্রায় অর্দ্ধযাযাবর। জীবন-যাত্রা ওদের অনেকখানি প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর

পরিবর্তনশীল, ওঙ্গীদের বাসস্থানের মধ্যে দু'টি বিশেষ ভাগ আছে। কিছু বাসস্থান আছে, যা দীর্ঘকালীন বাসযোগ্য করে তৈরি করা হয়। এগুলিকে বলে সাধারণ স্থান নিবাস (communal hut)। অন্য এক প্রকার স্বল্প-কালীন নিবাসস্থল জঙ্গলের কাছে শিকার ও সংগ্রহ ইত্যাদির জন্যই নির্মিত হয়। সাধারণস্থান নিবাসকে ওঙ্গীদের ভাষায় বলে 'বেরা'। সমুদ্রের তীর-ঘেঁষে কখনো দ্বীপের ভেতর দিকেও এই জাতীয় নিবাসগৃহের সারি দেখা যায়। যখন ওই নিবাসস্থল তৈরি করা হয় তখন প্রথমে দেখে নেওয়া হয় যে নিকটে উপযুক্ত পানীয় জল সরবাহের সুবিধা আছে কি না। তা না হ'লে জলাভাবে গরমের সময় ওঙ্গীদের অসম্ভব কষ্ট পেতে হয়। সাধারণস্থান নিবাসগুলি সাধারণত গোলাকার এবং ঘরগুলির ব্যাস সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৩৫ ফিট। ঘরগুলি দেখতে অনেকটা মৌচাকের মত, প্রত্যেক ঘরের মাঝখানে ১৫ থেকে ২০ ফিট উঁচু একটা করে শক্ত খুঁটি থাকে। আর চালের ভর থাকে মাঝখানের খুঁটির থেকে সামান্য ছোট আর ক'খানা খুঁটির ওপর। চাল ছাইতে লাগে বেতের পাতার মাদুর। চালকে যথা-সম্ভব নীচু করে প্রায় মাটির সঙ্গে স্পর্শ করে দেওয়া হয়, আর চারদিক ঘেঁষে থাকে ছোট দরজা। ঘরের ভেতরে ১½ থেকে ২½ ফিট উঁচু কয়েকটা মাচা বানান হয়। মাচাগুলির ওপর বেতের কঞ্চি দিয়ে দেওয়া হয়। এই মাচায় হয় ওঙ্গীদের শোয়ার ব্যবস্থা। ঘরের মাঝে থাকে প্রত্যেক পরিবারের ব্যবহার্য্য অগ্নিকুণ্ড। কখনও তার ওপর একখানা পাটাতন পেতে মাংস-মাছ ইত্যাদি তাজা রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও প্রত্যেকটি সাধারণস্থান নিবাসে এক থেকে তিনটি পরিবারের বাস-স্থান নির্দিষ্ট হয় তবু প্রত্যেকটি গৃহেই বাসস্থানের আনুপাত জনসমষ্টির চেয়ে অনেক বেশীই হয়। এর কারণ, প্রায়শই প্রতিবেশী পরিবার-পরিজনের আগমন হয়ে থাকে। কিন্তু মে থেকে অক্টোবর মাসের বর্ষার দিনগুলিতে তারা সবাই নিজের নিজের নিবাসগৃহেই বদ্ধ থাকে। বর্ষা ছাড়া, নভেম্বর-এপ্রিলের দীর্ঘ শুষ্ক মাসগুলিতেও তারা গৃহে আবদ্ধ থাকে। আর মার্চের অতিশুষ্ক দিনগুলিতে তারা স্থান নেয় স্বল্পকালীন নিবাস-গুলিতে। স্বল্পকালীন নিবাসগৃহ ওঙ্গীদের ভাষায় 'কোরেল' (korale) নামে পরিচিত। কোরেল আবার দু'জাতির আছে—একজাতের ঘর আছে, বেশ খোলা-মেলা, ওপরে চাল নেই; আর একজাতের ঘর আছে যা বেশ মজবুত, ওপরে তাদের শক্ত চালও দেওয়া থাকে। ওই জাতীয় স্বল্পমেয়াদী আবাসগৃহ তৈরি করবার সময় তারা সাধারণত দ্বীপের অভ্যন্তরে কোন বিশেষ সুরক্ষিত স্থানকে নির্বাচন করে—কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালে কোরেলকে বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কোরেল নির্মাণের প্রথম স্তরে কতকগুলি মাটিউচ্চ বেতের প্লাটফর্ম তৈরি করা হয় এবং সেগুলোকে গোল করে এমনভাবে সাজান হয় যে মাঝখানের একখণ্ড জমি বেশ খোলা থাকে। এ জাতীয় কোরেলগুলি খুব মজবুত নয়। আর একজাতীয় কোরেল আছে যেগুলির গঠন মজবুত এবং স্থায়িত্বও দীর্ঘদিনের। এই কোরেল-গুলির ওপর বেতের পাতার চাল ছাওয়া হয়, যাকে ঠেকিয়ে রাখা হয় কতকগুলি শক্ত কাঠদণ্ডের ওপর—ওই চাল ওঙ্গীদের বৃষ্টি ও সূর্য্যতাপ থেকে রক্ষা করে। সাধারণত কাঁঠাল যখন প্রচুর পরিমাণে হয় সেই সময় ওঙ্গীরা কোরেলে থেকে সুবিধামত কাঁঠাল সংগ্রহে

ওঙ্গী সাধারণ স্থাননিবাস
(ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

তৎপর হয়। যতদিন না কাঁঠাল সংগ্রহের কাজ শেষ হয় ততদিন একদল লোক দিন মাস নির্বিশেষে কোরেলে বসবাস করে।

প্রত্যেকটি ওঙ্গীনিবাসের এক বৃহৎ অংশ কুকুর দলের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কুকুরদের থাকার অন্য কোন স্বতন্ত্র স্থান নেই। ওঙ্গীপ্রভুদের সঙ্গে নির্বিবাদে তাদের শিকারসঙ্গী কুকুরগুলিও শয়নকক্ষে স্থান পায়।

ভ্রমণ এবং পরিবহন সমস্যা

খাদ্য আহরণের জন্য, এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে, এক আবাস থেকে অন্য আবাসে ঘুরে বেড়ান ওঙ্গীদের জীবনযাত্রার প্রধান অঙ্গ। ভ্রমণের সময় ওরা প্রয়োজনীয়

যাবতীয় জিনিসপত্র, বেতের ঝুপড়ি অথবা কাঠের ঝোলায় ভরে পেটের সঙ্গে বেঁধে চলাফেরা করে। প্রত্যেক শিশুকে পিঠের সঙ্গে বেঁধে মাল বওয়ার মত নিয়ে যাওয়া হয়। জিনিসপত্র এবং শিশুদের বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করে। বেতের কঞ্চি দিয়ে তৈরি হয় ঝুড়ি—ঝুড়িগুলির নীচের দিকটা গোলাকার এবং উপরটা মোচার মত। কঞ্চিগুলিকে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ওঙ্গীরা সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি তৈরী করে থাকে। ঝোলাগুলি তৈরি হয় বিশেষ এক-জাতীয় গাছের ডাল বা গুঁড়ির মধ্যভাগকে কুঁদে-কুঁদে ফাঁপা করে। এই গাছের নাম ওদের ভাষায় 'ঠারে'। ওঙ্গীরা যখন ছোট ছোট খাঁড়িপথে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ঘুরে বেড়ায় তখন তাদের প্রধান যানবাহন হ'ল একপ্রকার ডিঙি নৌকা। এই জাতীয় নৌকায় মাছধরা এবং কচ্ছপ শিকারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এক-জাতীয় বিশেষ গাছ যাকে ওদের ভাষায় বলে কুয়ালুলু বা টাবে বা ঠোঁটাকোলা থেকে এই জাতীয় ডাঙি নৌকা (Canoe) তৈরি হ'য়ে থাকে। এগুলি লম্বায় হয় সাধারণত ১৫ থেকে ২০ ফিট আর চওড়ায় হয় ৫½ থেকে ৭½ ফিট। গাছের গুঁড়ি কেটে তার ওপরদিক এমনভাবে কুঁদে ফেলা হয় যাতে করে মাঝখানটা হয় ফাঁকা। নীচের দিকটা থাকে সামান্য গোলাকার অথবা অন্ততঃ চ্যাপ্টা, দু'ধারে যে ভার থাকে তাতে নৌকা উল্টে যায় না। সাধারণতঃ এক একটি ডিঙীতে পাঁচ থেকে ছয় জনের স্থান হয়—কিন্তু কচ্ছপ শিকারে ৩ জনের বেশী লোক নেওয়া হয় না। উপকূলবর্তী সাধারণ নিবাসগুলি পরিভ্রমণের সময় ওঙ্গীরা নৌকার মধ্যে মালপত্র নামিয়ে রেখে নিজেদের ভারমুক্ত করে।

পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলংকার ব্যবহার

প্রায় সমস্ত প্রাচীন আদিবাসীদের মত ওঙ্গীরাও শারীরিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান নয়। স্নান ইত্যাদি ওদের ধাতে সয় না। কেবলমাত্র গরম-কালে ধারেকাছে ছোট খাঁড়ি বা নালা ইত্যাদি থাকলে সেখানে গিয়ে গা-হাত-পা ধুয়ে আসে। ওঙ্গীরা মাসে সাধারণত একবার কেশবিন্যাস করে। কেশবিন্যাস কথাটা বিশেষ একধরনের চুলকাটার অর্থে ব্যবহার করছি—এই কাজটি পুরোপুরি মেয়েদের। মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে মাথার শেষ কিনারা থেকে ওরা চুল ছেঁটে ফেলে—চুলকাটার যন্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত হয় একজাতীয় বোতলভাঙা ধারাল কাঁচ। একবার মাথা কামানর জন্য ওই জাতীয় ২-৩ খানা ভাঙা কাঁচের প্রয়োজন হয়।

ওঙ্গীদের পোশাক-পরিচ্ছদের স্বল্পতা সহজলক্ষ্য। পুরুষদের কেবলমাত্র একখানি কটিবস্ত্র হলেই চলে আর স্ত্রীলোকেরা কটিবস্ত্রের সঙ্গে বেল্টের মত বেতের পাতায় তৈরী ট্যাসেল কোমরের নীচে ঝুলিয়ে দেয়। ২॥৩ ফিট লম্বা এবং প্রায় ৩ ইঞ্চি চওড়া একখণ্ড কাপড় পুরুষদের পোশাকের কাজ করে—এইজাতীয় কটিবস্ত্র ব্যবহার ওদের মধ্যে খুব বেশীদিন চালু হয় নি। স্ত্রীলোকদের পোশাক এখনও পুরোপুরি পুরানো ধরনেরই আছে। শিশুরা সাধারণতঃ উলঙ্গই থাকে। কিন্তু ৩-৪ বছরের মেয়েদের ছোট-আকারের বেতের দড়ি দিয়ে যোনিদেশ ঢেকে রাখতে দেখা যায় আর ৬-৭ বছরের ছেলেরা একটুকরো কটিবস্ত্রও পরে থাকে। রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওঙ্গীরা একজাতীয় পামগাছের ছাতা ব্যবহার করে। কাণ্ডর ধার ঘেঁষে ছোট ছোট পামপাতা তুলে তা থেকে ছাতা বানানো হয়। পাতাগুলোকে সেলাই করলে ছাতাগুলোর আকার হয় পাখার মত। যে গাছ থেকে ছাতার পাতা সংগ্রহ হয় তার নাম টমেয়োয়ে।

শরীরের নানাস্থানে রঙ ব্যবহারে নানা শিল্পকর্ম করা ওঙ্গীদের একটি প্রিয় কাজ। সাধারণতঃ তিন প্রকারের রঙ ওঙ্গীরা শরীর-সজ্জায় ব্যবহার করে থাকে। যেমন (১) ওয়াকলা—বন থেকে সংগৃহীত একজাতীয় সাদামাটি (white clay) জলের সঙ্গে মিশিয়ে একজাতীয় প্লেট তৈরি হয়। সামান্য কিছু মাটি নিয়ে তা হাতের তালুতে রেখে তার সঙ্গে মেশান হয় থুথু বা লালা—তারপর তা রঞ্জকদ্রব্যে পরিণত হয়। সেই রঞ্জকদ্রব্যে বিচিত্র সজ্জা হয় দেহের ও মুখের। মাথার খুলি বা শরীরের অন্য কোন স্থানে একজাতীয় রঞ্জকদ্রব্য ব্যবহৃত হয় না। মিশ্রিত রঙ দিনেরাতে সব সময়ই ব্যবহৃত হয়। এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে, পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে শরীর রক্ষা পায়। ছোট আন্দামানের জঙ্গলগুলোতে যত রাজ্যের মাছির উৎপাত। ওয়াকালা মাছি উৎপাত থেকে রক্ষা করে। (২) ওয়েগেলো (red clay)। জঙ্গলে পিঙ্গলবর্ণ একপ্রকার ভেজা মাটি পাওয়া যায়। ওয়েকালার মত এর প্রস্তুত-প্রণালী। ব্যবহারও হয় ওয়েকালার মতই। তবে ওয়েগেলো দেহের প্রায় সব স্থানেই মাখান হয়ে থাকে। আলজে (Red ochre) —লোহিত গৈরিক একজাতীয় রঙ। জলের পরিবর্তে শূকর, কচ্ছপ অথবা ডুগঙের চর্বি মিশিয়ে এই জাতীয় রঙ তৈরি হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ এই রঙ দিয়ে লেপা হয়—মাথায়ও মাখা হয়। রঙ ব্যবহারের

সুবিধার জন্য ওরা চর্বির বেশী অংশ বার করে নেয়। জ্যামিতিক নিয়মে ছোট ছোট নকশারেখার সাহায্যে ওদের শরীরসজ্জা হয়ে থাকে যদিও এই নকশের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

রঞ্জনদ্রব্য তৈরি এবং তা দিয়ে দেহ শিল্পিত করার সবটুকু কৃতিত্বই স্ত্রীলোকদের। সাধারণধাম নিবাসের কেউ মারা গেলে দেহে ওই জাতীয় চিত্রশিল্প করা নিষিদ্ধ। ব্যক্তিগত অলংকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল একজাতীয় দড়ি, গাছের ছাল বা পাতার পাতা এবং ডেণ্টালিয়াম শামুকের হার।

ছোট বড় বেতের তাল দিয়ে অলংকার তৈরি হয়। বেতের একদিকটায় থাকে দণ্ডোত্রিয়ামের চামড়া এবং বেতটাকে বেঁকিয়ে ছকোনায় গাছের ছালের সুতো দিয়ে বাঁধা হয়। গোলাকার বেতটির মাঝে মাঝে সুতো জড়িয়ে দেওয়া হয়। সুতোকে ভিজিয়ে নেওয়া হয় লাল গেরুয়া মিশ্রণে। গাছের ছাল বা পাম পাতা দিয়ে জ্যামিতিক আকারের নানা প্রকার অলংকার তৈরি হয়। একে কোমরে গলায় পরা হয়। তৃতীয় প্রকারের অলংকার হার—যা ডেণ্টালিয়াম শামুক থেকে তৈরি হয়, তার ব্যবহার খুব বেশী নয়। এই শামুকগুলোকে সুতোয় বেঁধে মালার আকারে গলায় পরা হয়, বাহুতে পরা হয়। মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে অলংকার ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া ওঙ্গীরা শবানুষ্ঠানে মানুষের হাড়ের গাঁঠের একজাতীয় অলংকার ব্যবহার করে।

বিবাহ

ওঙ্গীদের মধ্যে বহুবিবাহ অপ্রচলিত—ওরা একপত্নী তথা একস্বামীতেই সন্তুষ্ট থাকে। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিধবা অথবা বিপত্নীক স্ত্রীপুরুষের পুনর্বিবাহ যুক্তিসংগত; অবশ্য বিধবার পক্ষে উপযুক্ত স্বামী সংগ্রহ করা সমস্যার ব্যাপার। বয়ঃসন্ধির প্রায় পর থেকে ওঙ্গী মেয়েদের বিবাহ হতে পারে; পুরুষের পক্ষে বিবাহের সাধারণ বয়ঃমান ১৬ থেকে ১৮। অবশ্য স্ত্রীপুরুষের বয়ঃপার্থক্য বিবাহে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কোন অবিবাহিত যুবক সহজেই বয়স্কা বিধবা নারীর পাণিগ্রহণ করতে পারে। ঠিক একই ভাবে কোন যুবতীর পক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশী বয়সের কোন বিপত্নীক পুরুষকে বিবাহ করা অসম্ভব নয়।

ক্ষুদ্র আন্দামানে বিবাহ ব্যাপারে একটা মজার আচার প্রচলিত আছে। প্রকৃত বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে পুরুষ বা ছেলেটিকে একবার বিবাহের অভিনয় করতে হয়—বিয়ের আগে ছোটখাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অপর কোন নারী বা পুরুষকে বিবাহ করতে হয়। এই জাতীয় বিবাহ আচার অনুষ্ঠিত হয় টনগিরি অনুষ্ঠানের পূর্বে (male initiation rite)। ছেলেটির পিতামাতা একজন বিবাহিত পুরুষ অথবা অবিবাহিত মেয়েকে পছন্দ করে ছেলেটির কনে হিসাবে। তারপর একটি নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় সাধারণনিবাসগৃহে ছেলের পিতামাতা

ওকেলেরো, আগনে ইত্যাদির দ্বারা স্ত্রীলোকের দেহসজ্জা
(ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

আত্মীয়স্বজন সমবেত হয়। কুঁড়ে আলোকিত হয় অনেকগুলি কেরোসিনল্যাম্পের আলোয়। ছেলেটি একটি বিছানার ওপর বসে আর কনেকে বসতে দেওয়া হয় একটু দূরে অপর একটি বিছানার ওপর। একজন বয়স্ক-লোক তারপর ছেলেটিকে উঠে গিয়ে তার কনেকে অথবা কনে-পুরুষের হাত ধরতে বলে। ছেলেটি বক্তার উপদেশ অনুসারে কনের হাত ধরে তার বিছানায় নিয়ে আসে। ছেলেটি বিছানার ওপর বসলে কনে তার কোলের ওপর বসে তাকে আলিঙ্গন করে। কিছুক্ষণ পরে কনে যায় তার বিছানায় ফিরে এবং রাত্রে বরকনে পরস্পর পরস্পরের বিছানায় ঘুমোয়। পরের দিন সকালে এবং সন্ধ্যায় বর তার কনেকে নিয়ে যায় তার আত্মীয়স্বজনদের কাছে। সত্যবিবাহিতা স্ত্রী আত্মীয়দের কোলের ওপর কিছুক্ষণ বসে এবং আত্মীয়েরা তাকে করে আলিঙ্গন। ছেলেটিও একইভাবে আত্মীয়দের করে আলিঙ্গন। ছেলে তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে মজচেবে (আমার স্ত্রী) এবং মেয়ে তার স্বামীকে সম্বোধন করে মজিচেবে (আমার স্বামী) বলে। এই বিবাহ কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক—যৌনকেন্দ্রিকতার কোন লক্ষণ এর মধ্যে প্রকাশ পায় না।

প্রকৃত বিবাহে স্ত্রীনির্বাচনের কাজ ছেলে নিজেই করে। সে বিভিন্ন সাধারণস্থান নিবাস এবং কোয়েল-গুলো ঘুরে ঘুরে বিবাহযোগ্যা কন্যা অথবা বিধবা নারীর সংস্পর্শে আসে। যখন পছন্দমত মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায় তখন মেয়ের বাপ মা তার আত্মীয়দের কাছে বিবাহের কথাবার্তা তোলা হয়। বিবাহে মেয়ের দিক থেকে সম্মতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—যদি মেয়ের মত থাকে তবেই বিবাহের দিনস্থির হয়। মেয়ের মত ছাড়া বিবাহ অসম্ভব। ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে ইটালীয় গবেষক চিপরাণী এ সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন:

"অনেক সময় মেয়ের সম্মতি না নিয়েই মেয়ের বাপ-মা বিবাহের দিন স্থির করে থাকে। যখন দেখা যায় যে মেয়ে ছেলেকে পছন্দ করছে না তখন সর্বসমক্ষে ছেলেকে স্বামী হিসাবে অস্বীকার না করে মেয়েটি বনের অন্তরালে আত্মগোপন করে। এই জাতীয় একটি ঘটনা আমার চোখে পড়েছে। বিবাহের তোড়জোড় সবই ছিল প্রস্তুত এবং বর তার নানা বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে, যারা বেশ দূর থেকে বিবাহে যোগদান করতে এসেছিল, আনন্দে বনের মধ্যে খোলা জমিতে বসে অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যা নামল ঘন আঁধার করে। খবর এল—মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর ১৫দিন মেয়ের কোন হদিশ পাওয়া যায় নি।" সাধারণতঃ বিবাহ অনুষ্ঠান পালিত হয় মেয়ের সাধারণস্থান নিবাসে। প্রকৃত বিবাহের আচার অত্যন্ত সাধারণ এবং আনুষ্ঠানিক বিবাহের সঙ্গে আচারগত বিশেষ পার্থক্য নেই। তবে প্রকৃত বিবাহের রাত্রে বরকনে একই বিছানায় শোয়—যৌন-সম্পর্কেরও প্রশ্ন জড়িত প্রকৃত বিবাহের মধ্যে। পরদিন বরকনে আনুষ্ঠানিক বিবাহের মত সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে আলিঙ্গন করে। বিকেলে স্ত্রী স্বামীর দেহে নানা প্রকারের রঙ মাখায়, রঙ তৈরী হয় লাল আর সাদা মাটি দিয়ে। মেয়েটির গায়ে-মুখেও নানাজাতীয় চিত্রমূর্তির ছোপ পড়ে—তবে দেহে চিত্রচর্য্যার অধিকার কেবল মেয়েদেরই আছে, পুরুষেরা এ কাজ করে না। তারপর স্ত্রী এবং পুরুষ মেডোজিনামের সুতো এবং চামড়া দিয়ে তৈরি একপ্রকার হাড় যথাক্রমে কোমরে এবং গলায় পরে। আত্মীয়স্বজনরাও এই উপলক্ষ্যে নানা প্রকার অঙ্গসজ্জা করে এবং রাত্রে তারা যোগ দেয় নাচের উৎসবে। পরের দিন বর তার সত্যবিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে তার শিবালয়ে ফিরে আসে।

সমাজ সংগঠন

উপাদানের অপ্রাচুর্য্যের জন্য ওঙ্গীদের সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাবের স্পষ্ট ছবি পাওয়া কষ্টকর। এর একটা মূল কারণ (যা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে) ভাষাগত বৈষম্য। সুতরাং একটা সাধারণ আলোচনা মাত্র করা যেতে পারে। একটি ওঙ্গীপরিবারে প্রধানত স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানসন্ততির স্থান। মোট ৩৩টি পরিবারের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে প্রত্যেক পরিবারের সংখ্যা ৩·১৫ জন। এই সব পরিবারের বেশ বড় অংশে (৩৮·২%) দেখা যায় যে তারা সন্তানহীন। এ ব্যাপারের পশ্চাতে দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা এবং জীবনধারণের কষ্টপূর্ণ পরিস্থিতি। অনেক ওঙ্গীনারীরই গর্ভ হয় না। নানারকম স্ত্রীরোগ থাকার ফলে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকসম্মত চিকিৎসার অভাবে সন্তানধারণের ক্ষমতা ও সন্তান-উৎপাদনের শক্তি ওদের কম। আর শিশুমৃত্যুর হারও ওদের মধ্যে বেশ বেশী।

বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে যায় বাপের বাড়ী ছেড়ে। এখন থেকে নারীর প্রকৃত বাসস্থান স্বামীর ঘর। শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্তির এবং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতামাতার সঙ্গেই বসবাস করে। তবে অনেক

সময় দেখা যায় যে কিশোর বয়সের ছেলেরাও যুবকদের মত স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে বসবাস করে। পিতাই পরিবারের কর্তা এবং পরিবারের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তারই ওপরে—খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারে মৎস্যশিকার, কচ্ছপ-শিকার পশুশিকার, নানাজাতীয় ফলমূল সংগ্রহ তাকে করতে হয়। অবশ্য স্ত্রীলোকেরা মৎস্যশিকারে পুরুষদের কাজে নানাভাবে সাহায্য করে—সাহায্য করে ফলমূল সংগ্রহে সহভাগিনী হয়ে। মাছধরার জাল তৈরি করে মেয়েরা, নানাজাতীয় শামুক ও চুনোমাছ ইত্যাদি শিকার ও সংগ্রহে স্ত্রীলোকদের তৎপরতা সহজেই চোখে পড়ে। তাই নারীর স্থান ওঙ্গীসমাজে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—নারী ওঙ্গীসমাজজীবনে একটি সচল সত্তা।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত মনোরম। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রেম, স্নেহ এবং বোঝাপড়ার ব্যাপারে আন্তরিকতা সহজলক্ষ্য। স্বামী স্ত্রীকে তার ঘরগৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করে নানাভাবে—কাঠ জল আগুন প্রভৃতের সামগ্রী যোগান দিয়ে। মধু সংগ্রহ ইত্যাদি কয়েকটা কাজ স্ত্রীপুরুষের যৌথস্পর্শে সম্পাদিত হয়। সন্তানের প্রতি ওঙ্গীদের স্নেহভাব লক্ষ্যণীয়। ওঙ্গীসমাজে সন্তানের বিশেষ মূল্য আছে এবং সন্তানসন্ততির পিতামাতা হিসাবে ওঙ্গী স্ত্রীপুরুষের বিশেষ গর্ব আছে। ছোট-বেলা থেকেই ওঙ্গী শিশুরা মাতাপিতাকে নানাভাবে সাহায্য করতে শেখে। তাই তারুণ্যে তথা যৌবনে উপনীত হবার পূর্ব্বেই ওঙ্গীরা শিকারে, মাছধরায়, মধু-সংগ্রহে বিশেষ চৌখস হয়ে ওঠে; একই দৃষ্টান্ত ছোট মেয়েদের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে—ছোট বয়স থেকে মায়ের কাজগুলোতে সাহায্য করতে শিখে ওঙ্গী মেয়ে। সন্তানসন্ততির রক্ষণ-পালনে পিতামাতা উভয়েরই থাকে যৌথ দায়িত্ব।

যদিও সমগ্র ওঙ্গী জনসমষ্টি কয়েকটি বিশেষ দলে বিভক্ত, তথাপি প্রকৃতপক্ষে পরিবারই ওঙ্গীসমাজ জীবনের মৌলভিত্তি। তাদের আত্মীয়স্বজনের সম্বোধনের বিচারে এই ব্যাপারটা ধরা পড়ে। পিতা, মাতা, পুত্র-কন্যা সম্বোধনের রীতিটা অবশ্য সার্ব্বজনীন; কিন্তু কোন ব্যক্তির পিতার দিক দিয়ে আত্মীয়তা থাকলে সম্বোধনের ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষ বিশেষে প্রত্যেকের প্রতি দু'টি শব্দ প্রযোজ্য। ছোট-বড়র মধ্যেও শব্দগত বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। তবে আত্মীয়তার নৈকট্য না থাকলে সে পার্থক্য মানা হয় না। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ওঙ্গীদের পারস্পরিক সম্পর্ক (kinship) গোত্রতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না।

শবানুষ্ঠান

কোন ওঙ্গীর মৃত্যু হ'লে তাকে সাধারণনিবাসে তার বিছানার নীচে পুঁতে ফেলা হয়। অবশ্য যদি সে তার আবাসের থেকে দূরে কোথাও মারা যায় তবে নিকটবর্ত্তী "কোরেলেই" তাঁকে কবর দেওয়া হয়। শিকার করবার সময় বনে অথবা সাপের কামড়ে অথবা গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু হ'লে তার দেহ কুঁড়েতে বয়ে আনা হয় অথবা কোরেলে নিয়ে আসা হয় কবর দেবার জন্য। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হ'লে সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর তার নিকট-আত্মীয়স্বজনের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়। তারা সবার কুঁড়েতে একত্রিত হয় এবং জলভরা চোখে শোকপালন করে। মৃতের পা দুটো বুকে আধশোয়া অবস্থায় সমুদ্রের দিকে মুখ করে কবর দেওয়া হয়। তারপর কিছুদিন সেই সাধারণস্থান নিবাস পরিত্যক্ত থাকে। পরে কবর থেকে দেহটা তুলে তার নিকট-আত্মীয়েরা মৃতের চোয়ালের হাড় দিয়ে তৈরী একরকম মালা পরে। যতদিন না শবানুষ্ঠান শেষ হয় ততদিন লোহিত-গৈরিক (অলয়ে) রঙ দিয়ে শরীরসজ্জা করা হয় না। কোন রকম আনন্দ অনুষ্ঠানে সেই আত্মীয়স্বজনরা যোগ দিতে পারে না। মৃতের চোয়ালের হাড় কবর থেকে তুলে আনার তিন-চারদিন পর মৃতের আত্মীয়স্বজনরা তাদের দেহ আবার লাল রঙ দিয়ে সাজায়। সন্ধ্যায় পুরুষেরা কুঁড়ের ভেতর আপন আপন বিছানার ওপর বসে, মেয়েরা নাচে, গান গায়। মাঝে মাঝে নাচ-গানের মধ্যে বিরতি হয় এবং মেয়েরা তাদের স্বামীদের আলিঙ্গন করে এবং তারপর আবার চলে নাচ-গান। যতক্ষণ না মেয়েরা ক্লান্তি বোধ করে ততক্ষণ এইভাবে নাচগান ও আলিঙ্গনের পালা চলে। তারপর পুরুষেরা উঠে মেয়েদের জায়গা নেয় বিছানায়—পুরুষেরা সুরু করে নাচ, সুরু করে আলিঙ্গন স্ত্রীদের—চলে নাচ-গান পুরুষদের শ্রান্তি আসা পর্য্যন্ত। এই আচারের শেষ হয় সূর্য্যোদয়ে, শেষ হয় শবাচার অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ।

অনিমেষ ঘরে ঢুকল।

পরনে পাজামা আর ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি। শিথিল বেশবাস। চোখ-মুখ দেখে মনে হ'ল, একটু বোধ হয় ঘুমিয়েও নিয়েছে।

আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালাম কিন্তু বোধ হয়।

না, না, চেয়ার ছেড়ে বাসবী উঠে দাঁড়াল, এতক্ষণ স্টেটমেন্টটা নিশিবাবুর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম।

স্টেটমেন্টটার জন্যই এসেছি। দিন, হাতের কাছে গল্প-উপন্যাসের বই যখন নেই, তখন বসে বসে স্টেটমেন্টটাই পড়ি।

অনিমেষ হাসল।

বাসবী ভাবল, একবার বলে যে তার কাছে একটা মাসিক পত্রিকা আছে। ট্রেনে সময় কাটাবার জন্য সেটা কিনেছিল। সেটা বসে বসে অনিমেষ পড়তে পারে।

কিন্তু কি ভেবে আর বলল না। এটুকু বুঝতে অসুবিধা হ'ল না যে অনিমেষের হালকা কিছু পড়ার ইচ্ছা থাকলে, তার পক্ষে যোগাড় করা অসম্ভব ছিল না। অফিসের কাজে অনিমেষ বাইরে এসেছে, এখন অফিসের কাজই করতে চায়।

বাসবী টাইপ-করা স্টেটমেন্টগুলো অনিমেষের হাতে তুলে দিল।

স্টেটমেন্টগুলো হাতে করেও অনিমেষ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তার মনের ভাবটা বুঝতে পারল বাসবী। সে একটু বসতে বললে, থাকতে বললে, অনিমেষ চেয়ারে পা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ে। অফিসের কাজ হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে একটু গল্পগুজব করে। লঘু কথাবার্তা।

কিন্তু বাসবীর বড় ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। একটু বিশ্রামের তার বড় প্রয়োজন। কলকাতায় সারাটা দিনই কাজের বোঝায় কাঁধে চাপানো। নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। অবসর যাপনের কথা ত কল্পনাই করতে পারে না। সুযোগ যখন এসেছে, তখন বাসবী একটু বিশ্রাম করতে চায়।

হয়ত অনিমেষ বুঝল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, চলি, আবার বিকালে দেখা হবে।

অনিমেষের পায়ের শব্দ বারান্দায় মিলিয়ে যেতেই বাসবী আস্তে আস্তে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল। আর হয়ত কেউ আসবে না। কিন্তু নিশিবাবুকে বিশ্বাস নেই। খোলা দরজা পেলে পা টিপে টিপে চলেও আসতে পারে।

অফিসের গম্ভীর, স্বল্পবাক মানুষটা এখানে এসে অনেক বদলে গেছে। সাহচর্যের হাত প্রসারিত করে দিয়েছে। অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করারও চেষ্টা করছে। এতটা বাসবী আশা করে নি।

বাসবী খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে দু'চোখের পাতা বুজে আসছে। পরিশ্রান্ত, অবসন্ন দেহটা শান্তি চায়।

খুট। খুট। খুট।

স্বপ্নের মধ্যে একটা শব্দ। একটু একটু করে আওয়াজ দ্রুততর।

বাসবীর ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসল বিছানার ওপর। উঠেই অবাক হয়ে গেল। কাঁচের জানলায় আগুনের স্পর্শ। সমস্ত কাঁচগুলো লাল হয়ে উঠেছে।

আঁচলে মুখটা মুছে নিয়ে বাসবী দরজা খুলল। নিশিবাবু কিংবা অনিমেষ। এ ছাড়া আর কে হবে।

কিন্তু দু'জনের কেউ নয়। বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁধে তোয়ালে নিয়ে।

আপনার চা দিয়ে দেব?

কয়েক মুহূর্ত বাসবী কোন কথা বলতে পারল না। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল। আকাশে আগুন জ্বালিয়ে সূর্য বিদায় নিচ্ছে। তার অস্তরাগের ছটা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের বুকে, গাছে, পাতায়, রাঙা মাটিকে আরো রক্তাভ করে তুলে সারা পৃথিবীকে এক অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে।

Glorious sunset.

কথাটা কানে যেতেই বাসবী মুখ ফেরাল।

অনিমেষ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কি অপূর্ব বলুন ত? শহরে ইঁট কাঠ লোহার আড়ালে ধোঁয়ার আবরণে এ সৌন্দর্য কোথায় যায়।

অনিমেষ এই মুহূর্তে যেন কবি হয়ে উঠল। ইঁট কাঠ লোহা নিয়েই কারবার, ফাইলের পাতায় পাতায় তারই হিসাব-নিকাশ, তবু সে সব পার হয়ে অনিমেষের মন বুঝি আর এক জগতের রূপ-পিপাসায় বিভোর।

কিন্তু বাসবীর ভুল ভাঙল।

এ সৌন্দর্য-পিপাসাও সাময়িক। শ্মশানবৈরাগ্যের সামিল।

তারপরই অনিমেষ বলল, আসুন, চা খাওয়া যাক।

বাসবী হেসে ফেলল। মুখ টিপে, খুব মৃদু হাসি।

তার হাসিটা অনিমেষের চোখ এড়াল না।

কি হাসলেন যে?

এই নৈসর্গিক শোভা দেখার পরই আপনার স্থূল খাদ্যের কথা মনে পড়ল?

খাদ্য?

না হয়, পানীয়।

আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে অনিমেষ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ও সবের পরমায়ু ক্ষণেকের। দেখুন, এর মধ্যেই আকাশের হোলিখেলা শেষ। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। রূপ বদলাচ্ছে পৃথিবী। কিন্তু দেহের ক্ষুধা অনন্ত। তৃপ্তির পরেই তার অতৃপ্তি।

কি ভেবে অনিমেষ কথাটা বলল জানে না বাসবী। হয়ত কিছু ভেবেই নয়। নিতান্ত কথার জন্যই কথা বলা।

কিন্তু অনিমেষের দিকে চোখ ফিরিয়ে বাসবীর অস্বস্তি লাগল।

আবছা অন্ধকার। পাহাড়ের পিছনে সূর্যের শেষ রশ্মিরেখাও নিশ্চিহ্ন। কিন্তু সেই তরল অন্ধকারে অনিমেষের দুটো চোখে জোনাকির দীপ্তি।

বারান্দার অপর প্রান্তে চায়ের টেবিল পাতা হয়েছে। দু' পাশে দুটো বেতের চেয়ার। মুক্ত-বারান্দার সিলিং থেকে একটা বাতি ঝুলছে। ম্লান দীপ্তি।

সেইদিকে পা চালাতে চালাতে বাসবী বলল, আপনার কথাই শিরোধার্য। চায়ের টেবিলেই মন দেওয়া যাক।

দু'জনে দুটো চেয়ারে বসল। শুধু চা নয়, তার সঙ্গে মাখনমাখানো রুটির টুকরোও আছে। বড় মর্তমান কলা।

বাসবী টি-পট থেকে চা ঢালল। অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করে চিনি মেশাল। তারপর নিজের কাপ আর প্লেট নিজের দিকে টেনে নিল।

আয়েস করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবল, এই আমুহোসেনী দিন শেষ হবার আর দেরি নেই। তারপর বাড়ী ফিরে হাতল-ভাঙা কাপে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দিতে হবে শুকনো হাতে-গড়া রুটির সঙ্গে।

ঠিকই বলেছে অনিমেষ। বাসবীরও তাই মত। ক্ষুধাই সত্য, আর সব অনিত্য, নশ্বর।

এখানে এসে খুব লাভ হ'ল না মিস সেন।

অনিমেষ চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে দূরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল।

এ কথার তাৎপর্য বাসবী ঠিক বুঝতে পারল না। এখানে আসার আগে অনিমেষ কি অনেক কিছু আশা করেছিল? সেটা না পেয়ে তার মন ভেঙে গেছে?

অনিমেষই বলল।

এ স্টেটমেন্টগুলো আমাদের খুব কাজে লাগবে না।

কেন?

এই সব কন্ট্রাক্টর ত আমাদেরই লোক। আদালতের ধারণা হবে এরা আমাদের খুশী করার জন্য আমাদের সপক্ষে বলছে। নিতাইবাবু যে টাকা নিয়েছেন তার চাক্ষুষ কোন প্রমাণ নেই। এমন কোন লোক, যে কোন পক্ষেরই নয় অর্থাৎ নিরপেক্ষ, এগিয়ে এসে বলবে যে নিতাইবাবুকে

অন্যায়ভাবে টাকা নিতে দেখেছে। কাজেই বুঝতেই পারছেন পণ্ডশ্রম।

মনে মনে বাসবী খুশীই হ'ল। সে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু অহরহ প্রার্থনা করেছে যেন বিভাসবাবুর কোন ক্ষতি না হয়। তা হ'লে সে ক্ষতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে সে অপরাধী হয়ে থাকবে। অফিসের লোকেরা নিশ্চয় তার ওপর দোষারোপ করবে। এভাবে একজন সতীর্থের সর্বনাশ করতে এগিয়ে আসা তার পক্ষে খুবই অন্যায়।

কিন্তু কেউ বুঝতে চাইবে না, এছাড়া তার আর অন্য পথ ছিল না। মধ্যবিত্ত ঘরের চাকরি-নির্ভর মেয়ের অন্নদাতার নির্দেশ অবহেলা করলে যে পরিণতি হয়, তা ভাবতেও বাসবী শিউরে ওঠে।

তা ছাড়া বাসবীর মন এখন অফিসের কথায় নেই।

নীচে যেখানে উচ্ছল জলধারাকে বন্দী করার ষড়যন্ত্র চলেছে, সেখানে মজুর-মজুরণীরা আগুন জেলে গোল হয়ে বসে গান গাইছে। গানের ভাষা বাসবীর জানা নেই, কিন্তু বায়ুস্তরে ভেসে আসা সুরের মূর্ছনা অপূর্ব সুন্দর মনে হচ্ছে।

বাসবী চেয়ার ছেড়ে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াল।

একটু পরেই বুঝতে পারল অনিমেষ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কি দেখছেন?

দেখছি না কিছু। শুনছি, ওদের গান শুনছি।

ভারি চমৎকার ওদের জীবন, তাই না। সারাটা দিন পরিশ্রম করে, সন্ধ্যাবেলা আমোদে মাতে, তারপর এক সময়ে ছোট ছোট কুঁড়ের ভিতর কেমন নির্বিবাদে ফিরে যায়। সঞ্চয় নেই বলেই হারাবার আশঙ্কা নেই। অতীত ওদের কাছে অর্থহীন, ভবিষ্যত চিন্তার সীমানার ওপরে। ওদের মুহূর্ত শুধু বর্তমান দিয়ে গড়া।

অনিমেষের কথা শেষ হ'তেই বাসবী হাসল।

কি হাসলেন যে?

এও আপনার এক ধরনের শ্মশানবৈরাগ্য।

শ্মশানবৈরাগ্য?

তা ছাড়া আর কি। শহরের বিলাসিতা থেকে সরে এসে কর্মহীন অবকাশে এ ধরনের চিন্তাবিলাস সময় কাটাবার পক্ষে ভালই। কিন্তু সত্যি বলুন, গাড়ি, মোটা মাইনের চাকরি, অজস্র বৈভবের উপকরণ ছড়ানো জীবন ছেড়ে ওদের জীবন গ্রহণ করতে আপনি সম্মত?

এবার অনিমেষ হাসল, যদি বলি রাজী, তা হ'লে নিশ্চয় আপনি আমায় টানতে টানতে ওদের মাঝখানে নিয়ে যাবেন না?

ওদের মাঝখানে নিয়ে গেলেই আপনি ওদের মধ্যে মিশে যেতে পারবেন না। ট্রেনের কামরা দিয়ে দূরের গ্রাম দেখে তারিফ করার মতন, ব্যবধান রেখে ওদের জীবনযাত্রার প্রশংসা করছেন সেটা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হচ্ছে না।

আপনি বুদ্ধিমতী, কিন্তু মাঝে মাঝে আকাশকুসুম দিয়ে মালা গাঁথতে ভাল লাগে না?

কি জানি, আমার ত মনে হয়, সে সময়টা বাড়তি একটা টিউশনি করলে প্রাণ বাঁচে।

বাসবীর কথায় অনিমেষ উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল। হাসতে হাসতেই বলল, যাক, আপনাকে বাইরে না নিয়ে এলে আপনার এ রূপের সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ পেতাম না।

বাসবী শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বলল, কথার আতসবাজী জ্বালানো বন্ধ রেখে, তার চেয়ে চলুন নীচে ওদের কাছে একটু ঘুরে আসি।

দাঁড়ান, টর্চটা নিয়ে আসি। অন্ধকার রাতে সঙ্গে আলো থাকা ভাল।

ঘরের মধ্যে থেকে টর্চটা নিয়ে অনিমেষ যখন বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তখন বাসবী সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমেছে।

একেবারে অন্ধকার নয়। একটি, দু'টি করে তারা ফুটছে আকাশে। অবশ্য তার দীপ্তি পৃথিবীর বুকে যে পরিমাণ আসছে, তাতে আঁধারও ঘুচছে না, আলোও ফুটছে না। তবু, সান্ত্বনা, আকাশ নিষ্প্রদীপ নয়।

অনিমেষ বাসবীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল তারপর টর্চের আলোর বৃত্তে নামতে শুরু করল।

অপরিসর পথ। যেতে যেতে বারবার গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। দু' একবার অনিমেষের হাতটাও বাসবীর বাহু স্পর্শ করল। বাসবী ধরে নিল এ স্পর্শ

অনিচ্ছাকৃত। ট্রামে, বাসে, হাটে, বাজারে হাজার বার পরপুরুষের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির মতন, এ সবই আকস্মিক। এর পিছনে প্রাণের স্পর্শ নেই বলেই উত্তাপ নেই, শিহরণও নেই।

বাসবী আর অনিমেষ মজুরমজুরনীদের কাছে যেতেই তাদের গান থেমে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল অতি দ্রুত তারা দেশী মদের বোতলগুলো লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

সর্দার এসে সেলাম করে অনিমেষের সামনে দাঁড়াল।

কোন হুকুম আছে হুজুর?

না, না, অনিমেষ মাথা নাড়ল, তোদের গান খুব ভাল লাগছিল, তাই শুনতে এলাম।

সর্দার ফিরে দলের লোকের কাছে বোধ হয় অনিমেষের কথাগুলো তর্জমা করে দিল। সবাই আর দ্বিরুক্তি না করে গান সুরু করল।

সর্দার ছুটো বেতের মোড়া এনে বাইরে পেতে দিল। বাসবী আর অনিমেষ দু'জনে বসল।

একটা গান শেষ হতেই বাসবী বুঝতে পারল, এ গানে প্রাণের স্পর্শ নেই। এতক্ষণ এরা নিজেদের আনন্দে গান করছিল, কিন্তু এখন গাইছে তারিফ কুড়োবার আশায়। মালিককে শোনাবার জন্য। সেই জন্য সুরের সে স্বাচ্ছন্দ্য আর নেই, স্বতঃস্ফূর্ত ঝঙ্কারের ইতি।

অনিমেষও বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝল।

উঠে দাঁড়িয়ে বাসবীকে বলল, চলুন, আমরা যাই এখান থেকে। আমরা মূর্তিমান বিঘ্ন, সেটুকু আশা করি বুঝতে পারছেন।

বাসবীও উঠল।

অনিমেষ পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে সর্দারের হাতে দিল।

অন্ধকার অনেকটা তরল। দূরে অরণ্যের ফাঁকে রূপোর আভা। চাঁদ উঠছে।

উঁচু-নীচু পায়ে-চলা পথ। দু'পাশে ছোট ছোট ঝোপ। মাঝে মাঝে বাতাসে বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।

কিছুটা এগিয়ে বাসবী দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক পিছনেই অনিমেষ আসছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করল, কতদূর যাবেন?

অনিমেষ দাঁড়াল। বলল, বেশীদূর যাবার সাহস নেটেই নেই। চাঁদিনী রাতে শুনেছি মাঝে মাঝে নাকি ভালুক বের হয়।

সর্বনাশ।

বাসবী পিছিয়ে এসে একেবারে অনিমেষের বুকের কাছে দাঁড়াল। ভয় পাচ্ছিলো।

অনিমেষ একটা হাত রাখল বাসবীর কাঁধে। হাসতে হাসতে বলল, নাতে। সহরাবন সব উজাড় হয়ে গেছে ব্রিজ তৈরীর কল্যাণে, কাজেই এদিকে ভালুক আসার কোন সম্ভাবনা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হন।

এবার বাসবী লজ্জিত হ'ল। আচমকা ভয় পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। সংবিৎ ফিরে আসতে খেয়াল হ'ল, অনিমেষের হাতটা তখনও তার কাঁধে রয়েছে। ভালুকের থাবার মতন।

নিজের শরীরটা একটু বেঁকিয়ে বাসবী হাতটা সরিয়ে দিল। মনে হ'ল, অনিমেষও যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে দু'জনে পাশাপাশি চলল, অথচ কোন কথা হ'ল না।

পায়ের কাছে জলস্রোতের শব্দ।

নিস্তব্ধতা বাসবীর ভাল লাগছিল না। কিছু একটা বলার অপেক্ষা সে করছিল কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিল না।

এবার বলল, দেখুন, কি সুন্দর ঝর্ণা।

পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে ঝরণাটা তরল রূপার স্রোতের মতন মনে হ'ল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ বলল, আসুন, এখানে একটু বসা যাক।

একটা বড় কালো পাথরের চাতাল। দু'জনে বসল। মাঝখানে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে।

প্রকৃতির এই অনাবিল সৌন্দর্যের মাঝখানে বসেও বাসবীর মন নিজের অপরিচ্ছন্ন, দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারে ফিরে গেল।

এতক্ষণ ভাইবোন দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা জেগে বসে আছে। হয় জানলার ধারে, কিংবা বাবার প্রতিকৃতির সামনে।

সংসারের ভবিষ্যতের চিন্তা ত আছেই, এ ছাড়া মা'র সকল ভয়-ভাবনার কেন্দ্র বাসবী। সংসারের সব ভার মাথায় তুলে নিয়েছে বটে। উদয়াস্ত পরিশ্রমও করছে,

কিন্তু বাসবী নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে ত। সৎপথে থেকে, নিজের দেহমনকে পবিত্র রেখে পারবে উপার্জনের অন্ন সংগ্রহ করতে!

এই বাইরে খাওয়ার ব্যাপারেও মা'র মন নিঃসন্দেহ, দ্বিধাহীন নয়। কি জানি কি করবে বাসবী। বাসবীর দেহ, তার মন, তার বয়স সবই ষড়যন্ত্র করতে পারে বাসবীর বিরুদ্ধে। পৃথিবীতে দুর্জনের অভাব নেই। লোভের পথ অসংখ্য। একবার ভুলিয়ে গেলে, শুধু বাসবীই নয়, গোটা সংসার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আশ্চর্য, বাসবীকে মা বিশ্বাস করে না, কিন্তু বাসবী কোনদিন কি বিশ্বাসহীনতার কাজ করেছে!

কথাটা মনে হ'তেই বাসবী চমকে উঠল।

এই চন্দ্রালোকিত রাত্রে নির্জন পরিবেশে এভাবে ধ্যানেশ্বর অনিমেষ রায়ের পাশাপাশি বসে বসে গল্পগুজব করা এটাও বাসবীর অফিসের কাজের অঙ্গ? নিজের চাকরির উন্নতির জন্য ঊর্ধ্বতন অফিসারের মনস্তুষ্টিবিধান করে চলেছে।

কিন্তু এ মনোরঞ্জনের ত সীমা নেই। এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে নামতে হবে।

অনিমেষ রায় এখনও কোন গর্হিত আচরণ করে নি সত্য কথা, কিন্তু মাঝে মাঝে তার দু'চোখে লোভের স্ফুলিঙ্গ দেখে নি বাসবী? একটু শিথিল হ'লে, পুরুষমানুষের আবরণের মধ্য থেকে লালসার তীক্ষ্ণ নখর আর দংষ্ট্রা যে কোন মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, এ বয়সে এটুকু বোধ বাসবীর নিশ্চয় আছে।

বাসবী দাঁড়িয়ে উঠল।

চলুন, ওঠা যাক। অনেক রাত হয়েছে।

অনিমেষ হাত-ঘড়ি দেখল।

কি আর এমন রাত। মাত্র নটা কুড়ি। এখানে বসতে আপনার ভাল লাগছে না?

সব ভাল লাগাকে প্রশ্রয় দিতে নেই ভার।

কথাটা আচমকা বাসবীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু সে সঙ্গতি রাখল তার সম্বোধন করে, যা সে সচরাচর করে না।

এই একটি সম্বোধনই যেন পার্থক্যের দুস্তর ব্যবধানটা প্রকট করে তুলল।

একটু বুঝি মনক্ষুন্ন হ'ল অনিমেষ। মৃদু কণ্ঠে বলল, চলুন।

যেতে যেতে বাসবী আবার বলল।

মেয়েদের খিদের কথা বলতে নেই, কিন্তু এ বাধা বোধ হয় অফিসের মেয়েদের জন্য নয়। কারণ তাদের দৌড়ঝাঁপ যা কিছু এই খিদেকেই কেন্দ্র করে। তাই বলছি ভীষণ খিদে পেয়েছে।

অনিমেষ হাসল। মাপা হাসি নয়, সহজ, সরল হাসি।

আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমার অনেক আগেই এ কথাটা ভাবা উচিত ছিল। আপনার বলার আগে।

অনেকক্ষণ কোন কথা হ'ল না। ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকির রোশনাই। ঝিল্লীর অর্কেস্ট্রা। সাবধানে পথ দেখে দেখে দুজনে চলতে লাগল।

মজুরদের ঘরের সামনে আর আগুন জ্বলছে না। গানের শব্দও নেই। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত কতকগুলো মানুষ অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে। ভোরে উঠেই পরিশ্রম শুরু হবে। মনে হ'ল, এই পৃথিবীতে বুঝি কেউ জেগে নেই। চরাচর সুষুপ্ত। শুধু দু'টি প্রাণী অনন্তকাল ধরে পাশাপাশি এই ভাবে হেঁটে চলেছে।

দু'টি অসুখী আত্মা।

মনে মনে বাসবী বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল।

বাসবী অসুখী কারণ দারিদ্র্য-জর্জর। যে বয়সে লোকে সংসার সাজিয়ে বসে পরম নির্ভরযোগ্য মানুষটিকে নিয়ে, সেই বয়সে জীর্ণ সংসারের হাল ধরে সে বিপর্যস্ত হচ্ছে। নিজের কথা ভাববার, নিজের দিকে চোখ ফেরাবার তার অবকাশই নেই।

অনিমেষও কি অসুখী?

আপাতদৃষ্টিতে মানুষটাকে অসুখী মনে না হ'লেও, তার ব্যক্তিগত জীবনের যেটুকু পরিচয় বাসবী পেয়েছে, তাতে তাকে খুব সুখী মনে করারও কোন হেতু নেই। তার জীবনে যেন্দাদেবী একটা বুভিত কভের মতন সব কিছু দুর্বহ করে তুলেছে।

দু'জনে বারান্দায় উঠে এল। বাইরে হোটেলের বেয়ারা অপেক্ষা করছে।

অনিমেষ হুকুম দিতেই সে আহার্য আনতে চলে গেল।

খুব ক্লান্ত লাগছে বাসবীর। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বারান্দায় বসে পড়ল। অনিমেষ ঘরের মধ্যে ঢুকল।

এই মায়াময় পরিবেশ মুছে গিয়ে আবার শহরের কুৎসিত কঙ্কালটা জেগে উঠবে। চীৎকার, ট্রাম-বাসের ঘর্ঘর, সভ্যজীবনের সহস্র উৎপাত।

এইটুকুই শান্তি। এই বিশ্রাম, এই রাজসিক ব্যবস্থা, এই মনের বিলাস।

বাসবী বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ অনিমেষের আহ্বানে চমকে উঠল।

আসুন।

বাসবী উঠে দাঁড়াল, তারপরই খেয়াল হ'ল অনিমেষের কামরাতেই দুজনের খাবার দিয়েছে বেয়ারা।

আহারের সময়ও বিশেষ কথা হ'ল না। অনিমেষের এই মৌনতায় বাসবী অস্বস্তি বোধ করল। কিছু একটা অনিমেষ বলুক। নিজের কথা, বাসবীর কথা না হোক, অফিসের কোন কথা।

কিন্তু অনিমেষ কিছুই বলল না।

মনে হ'ল সে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। মসৃণ কপালে অনেকগুলো আঁচড়।

একেবারে ওঠার মুখে অনিমেষ কথা বলল।

আমরা কালই কলকাতায় ফিরে যাব।

কালই?

কথাটা বলেই বাসবী লজ্জিত হ'ল। এভাবে কথাটা বলা তার মোটেই উচিত হয় নি। ফিরে যেতে বুঝি কোন আগ্রহ নেই বাসবীর? এই অনীহার একটা মারাত্মক অর্থ হ'তে পারে, অনিমেষ সেটাই ভাবল কি না, কে জানে।

এখানে থাকা মানে অনিমেষের নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য। তাই বুঝি কামনা করছে বাসবী।

অনিমেষ মনে মনে কি বুঝল ঈশ্বর জানেন, কিন্তু মুখে বলল, হ্যাঁ, এখানকার কাজ ত শেষ হয়ে গেল। অফিসে অনেক দরকারী ফাইল পড়ে আছে। তা ছাড়া এ ব্যাপারটা নিয়েও আমাদের সলিসিটরদের সঙ্গে একবার আলোচনা করতে হবে।

বাসবী আর কথা বাড়াল না। উঠে পড়ল।

বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে বাসবী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিশিবাবুর ঘরে বাতি নেই, কিন্তু বাইরে থেকে অবারিত চাঁদের আলো এসে পড়েছে। লোকটাকে অস্পষ্ট দেখা গেল। শুধু একটা কাঠামো। বোধ হয় জানলার কাছেই চেয়ার নিয়ে বসে আছে।

বেড়িয়ে ফিরলেন? ভাল, ভাল, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেড়ানো ভাল। তার ওপর এমন চাঁদের আলো।

কথা শেষ করে নিশিবাবু অদ্ভুত শব্দ করে হাসল। নিশাচর পাখীর কণ্ঠের অনুকরণে।

বাসবীর মনে হ'ল, শিরায় স্নায়ুতে, মজ্জায় আদের প্রবাহ। দু'কানে কে যেন উত্তপ্ত গলিত সীসা ঢেলে দিল। চোখের সামনে থেকে অমল জ্যোৎস্নার দীপ্তি কে যেন মুছে নিল। অন্ধকারের বন্যা। অতল, অপার।

দুর্নিবার বেগে কে যেন বাসবীকে টেনে এক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিয়ে চলেছে।

আপাতনিরীহ এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত সব দাহ, সব গরল বাসবীকে অবশ, নিশ্চেতন করে দিল।

আর দাঁড়াল না বাসবী। প্রায় ছুটে নিজের কামরায় এসে ঢুকল।

আবার সেই কলকাতা। বেহমন কর্মের শৃঙ্খলে বাঁধা। একই সহকর্মীর দল, ফাইলের রাশ, বেয়ারা চাপরাশী।

দিন কতক খোকন আর রুণি দিদিকে ঘিরে রইল। দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতার স্বাদ পাবার আশায়। একটু দূরে না-শোনার ভান করে মাও দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর দু' একদিন পরেই সব পুরোনো হয়ে গেল। বাসবী যে বাইরে কোথাও গিয়েছিল এ কথা সে নিজেই ভুলে গেল।

অফিসে শুধু একটি নতুন চেহারার সাক্ষাৎ মিলল। বাসবীর কাছে অবশ্য সে নতুন নয়। এ অফিসে নতুন।

দীপক গুপ্ত।

তাকেও বাইরে পাঠানো হবে। বাইরে পাঠানোর জন্যই তাকে নেওয়া হয়েছে এ অফিসে, কিন্তু অনিশ্চয়তার জন্য উপস্থিত কর্তৃপক্ষরা তাকে বাইরে পাঠাবে না।

অফিসেই রাখবে। গোলমাল একটু স্তিমিত হয়ে গেলে, তারপর দীপক বাইরে যাবে।

দীপকের আসন একেবারে হলের মাঝখানে। বাসবী যেখানে বসে সেখান থেকে দীপককে দেখা যায় বটে, কিন্তু কথাবার্তা বলা যায় না। দু'জনের কেউ সে চেষ্টাও করে না।

দীপক যে বাসবীকে খুব সমীহ করে চলে, সেটা তার আচার-আচরণেই বোঝা যায়। এ ভাবটা আরো বেড়েছে বাসবী অনিমেষের সঙ্গে বাইরে থেকে ঘুরে আসবার পর।

চোখাচোখি হ'লেই দীপক সসম্ভ্রমে দুটো হাত বুকে ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

মনে মনে বাসবী হাসে। কয়েকবার তাকে অনিমেষের মোটর থেকে নামতে দেখে ভুল করেছিল, আবার এখন ভাবছে, অফিসের কাজে যখন ম্যানেজারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়, তখন চাকরিটা নিশ্চয় উচ্চ-পদস্থদের কাছাকাছি পর্যায়ের।

তেমনি কিছুদিন পরেই বাসববাবু এসে দাঁড়ান। একেবারে টেবিলের সামনে।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিস সেন।

বাসবী আশ্চর্য হ'ল। হঠাৎ এভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার হেতু। নাকি বাসববাবুও পরিহাস করছে।

ধন্যবাদ কেন বলুন ত?

দীপক ভদ্রকে এ অফিসে ঢুকিয়েছেন বলে।

এবার বাসবীর সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল দু'টি ঠোঁট।

বাসববাবুও বিদ্রূপ করছে। এ লোকটার সম্বন্ধে এক-দিন বাসবীর ভুল ধারণা ছিল। ভেবেছিল বয়সের দোষে ভদ্র, ছোটখাটো দিকে বুঝি তার নজরই পড়ে না। কিন্তু দীপককে এ অফিসে ঢোকাবার মূলে যে বাসবী এ সংবাদ ঠিক সংগ্রহ করেছে। বলা যায় না, হয়ত দীপকই বলেছে কথাটা।

বাসববাবুর পরের কথাতেই কিন্তু বাসবীর ভুল ভাঙল।

ভদ্রলোকের চমৎকার চেহারাটা। অভিনয় করতে পারেন কি না জানি না। জিজ্ঞাসা করতে হবে। না পারলেও ক্ষতি নেই। তালিম দিয়ে নেব। তারপর যে কোন ক্লাব একেবারে লুফে নেবে।

বাসববাবু সশব্দে হেসে উঠল।

এখন হাসার পক্ষে কোন অসুবিধা নেই, কারণ অফিস খালি। বেশীর ভাগ লোকই টিফিন করতে বেরিয়েছে।

কেবল কোণের দিকে নিশিকান্ত সরকার বসে আছে ঘাঁটি আগলে। আর একটু দূরে পার্টিশনের মধ্যে আছে রুকা।

হাসতে হাসতেই বাসববাবু বেরিয়ে গেল।

খাবার প্যাকেটটা হাতে করে বাসবী রুকার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রুকা টিফিন খেতে শুরু করে নি। বাসবীর জন্যই বোধ হয় অপেক্ষা করছে।

বাসবীকে দেখে হেসে বলল, বড় আঁটুনি, ফস্কা গেরো।

মানে?

মানে, সলিসিটররাও খুব জ্বালা দিতে পারছেন না।

কিসের জ্বালা?

বাঃ, যার জন্য ম্যানেজারের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে এলে স্টেটমেন্ট টাইপ করার ছুতোয়।

তোমার মুখে আগুন।

বাসবী খাবারের প্যাকেট খুলতে আরম্ভ করল।

সলিসিটর মিষ্টার বাসু বললেন, প্রমাণ করা একটু দুরূহ, কারণ কণ্ট্রাক্টররা যে কোম্পানীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা বলছে না, তার কোন প্রমাণ নেই। টাকার অঙ্কটা খুব বেশী নয়, আপোষে মিটমাট করে ফেলাই উচিত সেই কথাই বললেন।

রুটি চিবোতে চিবোতে বাসবী বলল, ম্যানেজারের তাই মত।

তাহ'লে এত ছুটোছুটি করার হেতু?

ভেবেছিলেন বিভাসবাবুর বিরুদ্ধে হাতে-নাতে কিছু প্রমাণ পাবেন। কোন চিঠি বা চিরকুট। কিন্তু কণ্ট্রাক্টররা কিছুই দেখাতে পারে নি। তাছাড়া, কোম্পানীর নিয়মমত আগে রসিদ সই করে তারপর টাকা দিতে হয়, আর টাকা সবই ক্যাশ, চেক নয়, কারণ কুলি-মজুরদের দিতে হবে। সই-করা রসিদ রয়েছে, কাজেই টাকা পায় নি কোর্টে একথা প্রমাণ করা শক্ত হবে।

তা হ'লে বিভাসবাবু এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

বিতানবাবু ভয় পাবেন কেন? তিনি কি একবারও এসেছেন এ অফিসে?

তবে?

ভয় পেয়েছেন বিতানবাবুর স্ত্রী প্রীতি দেবী। সন্তানের ভয়, মর্যাদাহানির ভয়। সে কথা একদিন তিনি স্পষ্টই বলে গেছেন। তাঁর ভয় ছেলের জন্ত। বিতানবাবু জেলে গেলে ছেলের সহপাঠীরা ছেলেকে চোরের ছেলে, অপরাধীর সন্তান বলবে, এটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

খাওয়া শেষ করে রুমা জলে চুমুক দিল, তারপর রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলল, সলিসিটর অবশ্য বলেছেন একটা কেস ফাইল করে দিতে, তা হ'লে হয়ত বিতানবাবু সাবধান হয়ে একটা মিটমাট করার চেষ্টা করতে পারে।

বাসবী জোরে হেসে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাই তুলল। বলল, যাক গে, আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে দরকার নেই।

বেশ, তবে আদার কথাই শোনাও।

তোমার নিজের কথা বল।

আমার কথা আর কি, রুমা হাসল, ভিন্ন জায়গায় দরখাস্ত ছেড়েছিলাম, কোন উত্তর নেই। আমাদের বরাতে কিছু হবার নয়।

ও কথা কি বলা যায়! ভগবান যখন দেন, ছপ্পড় ফুঁড়ে দেন শুনেছি।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বাসবী বলল।

ঠিকই শুনেছ। ছপ্পড়ের ফাঁকফুকুই থেকে যায়, তার মধ্য দিয়ে বর্ষার ধারাপাত হয়।

দু'জনেই হেসে উঠল।

বাসবী বাইরে চলে এল। টিফিন প্রায় শেষ। দু' একজন কেরাণী চেয়ারে এসে বসেছে। তখনও কাজ শুরু হয় নি। গালগল্প হচ্ছে।

পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে বাসবী নিজের চেয়ারে এসে বসল।

বসার একটু পরেই দীপক এসে দাঁড়াল।

খুব ব্যস্ত আছেন?

দীপক কোনদিন টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায় না। মুখোমুখি কথাও বলে না এমন ভাবে।

বাসবী একটু মুস্কিলে পড়ল, কিন্তু নিরুপায়। কথার উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকাও সম্ভব নয়।

তাই বলল, না, এখনও কাজ শুরু করি নি। কি, বলুন?

আজ ম্যানেজার আমাকে ডেকেছিলেন।

বাসবী কিছু বলল না, শুধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল দীপকের দিকে।

ম্যানেজার বললেন এতদিন একটু অসুবিধা ছিল বলে বাইরে পাঠানো সম্ভব হয় নি।

এবার আমাকে বাইরে পাঠানো হবে। বেঙ্গলুরে যে হাসপাতাল হচ্ছে কোম্পানীর, সেখানে। জানেন, বাইরে যাব, ভাবতেও এত আনন্দ হচ্ছে। কোনদিন আমি এ শহরের বাইরে যাই নি।

এক নিশ্বাসে দীপক কথাগুলো বলে গেল। সারা মুখে শিশুর সারল্য।

দেখতে দেখতে বাসবীর হাসি পেল। দীপকের এ ছেলেমানুষী নিঃসন্দেহে পরম উপভোগ্য। কিন্তু হাসতে গিয়েও বাসবী হাসল না। পারল না হাসতে। অনেক-গুলো চোখ এদিকে চেয়ে রয়েছে। এ অন্তরঙ্গতারও হয়ত একটা কদর্থ করবে।

বাঃ, তবে খুব খুশী হ'লাম। খুব মন দিয়ে কাজ করবেন। বিশেষ করে টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব সাবধান।

বাসবীর কথা শেষ হবার আগেই দীপক ঘাড় নাড়ল।

ম্যানেজারও ঠিক এই কথাই বলছিলেন। সত্যি, টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করা ইজ্জৎ নাড়াচাড়া করার সামিল। একটার সঙ্গে আর একটা ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোম্পানীর ক্ষতি আমার দ্বারা কখনও হবে না, অন্তত জানত।

দীপক থেমে গেল। তার বোধ হয় নিজেরই মনে হ'ল, একটু অতিরিক্ত কথা বলছে। অফিসের মধ্যে এত কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।

দীপক দ্রুতপায়ে নিজের সীটে ফিরে গেল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথাটা বাসবীর মনে এল।

দীপকের সংসারের চিত্র সে দেখেছে। সে সংসারে দীপকই একমাত্র কর্মঠ। দীপক যদি বাইরে চলে যায়, তা হ'লে সংসারের লোকগুলো অসুবিধায় পড়বে।

কথাটা মনে আসতে বাসবী একটু চিন্তিত হ'লো বটে কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। দীপকের সংসারের কথা ভাববার দায় তার নয়। যদি কিছু ব্যবস্থা করতে হয়, দীপকই করবে।

বাসবী ছাড়া বাসবীর সংসারের অবস্থা আরও ভয়াবহ। অথচ বাসবীকে অফিসের এক বেয়ারার ওপর নির্ভর করে, সংসারের সব ভার দিয়ে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল। তার সংসারের জন্ত কেউ চিন্তা করে নি।

কাজ করতে করতে মাথা তুলতেই বাসবী দেখতে পেল।

অনিমেষের ঘরের সামনে প্রীতিদেবী দাঁড়িয়ে। ভিতরে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষা করছে।

কলম নামিয়ে বাসবী চুপ করে বসে রইল।

খুব ক্লান্ত আর বিষণ্ণ মনে হচ্ছে প্রীতিদেবীকে। স্বামীর বিপদে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মাত্র আজ দুপুরে দুজনার সঙ্গে কথা হয়েছে। এর মধ্যে কোম্পানী নিশ্চয় বিকাশবাবুকে সাসপেনশনের চিঠি পাঠায় নি। আর পাঠালেও সে চিঠি পেয়ে এত শীঘ্র প্রীতিদেবীর আসাও সম্ভব নয়।

একটু পরেই বেয়ারা এসে প্রীতিদেবীকে কামরার মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল।

ফাইল সরিয়ে বাসবী এদিক-ওদিক দেখল। না, সহকর্মীরা যে যার কাজে ব্যস্ত। কেউ মুখ তুলে দেখছে না। বাসবীর মতন এমন অনাবশ্যক কৌতূহল কারও নেই।

একটা ফাইল হাতে করে বাসবী উঠে পড়ল।

কোন অছিলায় ম্যানেজারের কামরায় যাওয়া সম্ভব নয়। বাইরের লোক থাকলে ভিতরে ঢোকা অনুচিত।

বাসবী ফাইল নিয়ে নিশিবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

নিশিবাবু গভীর মনোযোগ দিয়ে কতকগুলো সংখ্যা যোগাচ্ছিল, বাসবী একটু ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বলল, প্রীতিদেবী এলেন।

নিশিবাবু মুখ তুলল না। মাথা নীচু করেই বলল, আসা-যাওয়া নিয়েই ত সংসার।

হঠাৎ এমন একটা দার্শনিক সত্য নিশিবাবুর অন্তরে কেন আলোড়ন তুলল, বুঝতে পারল না বাসবী। তার মনে হ'ল কথাটা বোধ হয় ভাল করে নিশিবাবুর কানে যায় নি।

বাসবী সামনের চেয়ারে বসে পড়ে বলল, বিকাশবাবুর স্ত্রী এসেছেন ম্যানেজারের কামরায়।

এবার নিশিবাবু মুখ তুলল। দুটো চোখ কুঁচকে হাসির একটা ভঙ্গি করে বলল, দেখেছি। তাই ত বললাম আপনাকে। এখন কত আসা-যাওয়া দেখব। বেলাদেবী গেলেন, প্রীতিদেবী এলেন। আসার ত সবে শুরু।

নিশিবাবু বাসবীর চোখের ওপর চোখ রেখে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বাসবী উঠে পড়ল।

এ লোকটাকে কোন বিশ্বাস নেই। বাসবীর সঙ্গে ম্যানেজারের অন্তরঙ্গতার কথাও হয়ত সবাই বলবে। বিদেশে নৈশভ্রমণ কাহিনীর ইতিবৃত্ত।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বাসবী চুপচাপ বসল।

এখনও প্রীতিদেবী কামরার ভিতরেই রয়েছে। বের হয় নি। অনেক কথা হয়ত বলবার আছে। স্বামীর এমন বিপদে স্ত্রী ভারসাম্য হারাবে, এ ত জানা কথা।

তবু একটা অস্বস্তিতে বাসবীর অন্তর ভরে গেল। সব কথা অনিমেষের বলবার কি দরকার। পাশের কামরায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর রয়েছেন, তাঁর কাছে প্রীতিদেবীকে ত অনায়াসেই পাঠিয়ে দেওয়া যায়। যা কিছু করার তিনিই করবেন।

নিজের মনের চেহারাটা দেখেই বাসবী শিউরে উঠল। এ কি সব আবোল-তাবোল কথা সে ভাবছে। নিশিবাবুর সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই। দু'জনের চিন্তাই এক খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। অনিমেষের কামরায় আর একজন স্ত্রীলোক ঢুকেছে বলে, তার এত অস্বস্তি কেন?

এর নামই ত ঈর্ষা।

ছি, ছি, নিজের অজান্তেই বাসবী মাথাটা নাড়ল, তারপর দৃঢ় হাতে চিঠির গোছা সামনে টেনে নিল।

ডাক এল অফিস ছুটি হবার মুখে।

বেয়ারা এসে বাসবীর সামনে দাঁড়াল। ম্যানেজার সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বেয়ারার পিছন পিছন বাসবী অনিমেষের কামরায় এসে ঢুকল।

টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত ফাইল, চিঠিপত্র, চেকবই। কলমটা খোলা পড়ে রয়েছে ব্লটিং প্যাডের ওপর।

অনিমেষ চেয়ারটা ঘুরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

দরজার শব্দ হতেই মুখ ফিরিয়ে বলল, বসুন।

বাসবী বসল। সামনের চেয়ারে।

প্রীতিদেবী এসেছিলেন। বিভাসবাবুর স্ত্রী।

বাসবী দু'চোখে কৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল। কণ্ঠে বিস্ময়ের প্রলেপ মাখিয়ে বলল, আজ?

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল।

বাসবী নিজের দুটো হাত কোলের ওপর জড় করে রেখেছিল, হাত দুটো টেবিলের ওপর রাখল।

সব কিছু শোনার আগ্রহে বাসবী চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু মুখচোখের ভাবে কোন উৎকণ্ঠা ফোটাল না।

কলমটা তুলে নিয়ে অনিমেষ কাগজে দু'একটা আঁচড় কাটল, তারপর বলল, একটা আপোষ মীমাংসা করতে চান।

বাসবী কিছু বলল না। শুধু অনিমেষের দিকে চেয়ে রইল।

অনিমেষই বলে গেল।

টাকাটা মাসে মাসে শোধ দেবার কথা বলছেন। প্রীতিদেবী নিজেই শোধ দেবার চেষ্টা করবেন বলে মনে হ'ল, কারণ মাস তিনেক সময় তিনি চাইছেন, তারপর থেকে মাসে মাসে কিস্তি দিয়ে যাবেন।

প্রীতিদেবী নিজেই শোধ করবেন? বাসবী প্রশ্ন করল।

তাই ত মনে হ'ল। তিনি বললেন, আবার তিনি মঞ্চে ফিরে যাবেন। অনেকদিন সরে এসেছেন এ জীবিকা থেকে, তাই আবার যোগাযোগ করতে কিছু সময় নেবে, তাই মাস তিনেক সময় চান।

কি বললেন আপনি?

আমি আর কি বলতে পারি। বললাম ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ করে, সলিসিটরের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে পরে খবর দেব।

বিভাসবাবু আসছেন না কেন?

সাক্ষী স্ত্রী থাকার অনেক সুবিধা। তাঁকে সামনে খাড়া করে নিজে নেপথ্যে রয়েছেন।

পাতিব্রত্য নিয়ে অনিমেষ পরিহাস করছে কি না বাসবী ঠিক বুঝতে পারল না।

অনিমেষই আবার কথা বলল, অবশ্য বিভাসবাবুকে একবার এ অফিসে পায়ের ধুলো দিতেই হবে। প্রীতি-দেবীর সর্তে যদি আমরা রাজী হই তা হ'লে প্রীতিদেবী আর বিভাসবাবু দুজনকেই চুক্তিপত্রে সই করতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলল না।

বাসবী ভাবল অনিমেষ হয়ত আরও কিছু বলবে, কিন্তু অনিমেষ বলল না। পেনটা হাতে নিয়ে টেবিলের ওপর ঠুকতে লাগল।

এক সময়ে বাসবী বলল, আমি উঠি তাহলে।

উঠবেন? আমার একটু দেরি হবে। দেখুন না, একগাদা কাগজ পড়ে রয়েছে। গোটা কতক চেক রয়েছে সই করার।

বাসবী উঠে দাঁড়াল। অনিমেষও এখন উঠবে কি না এমন প্রশ্ন সে একবারও করে নি। হয়ত বাসবী বসে আছে দেখে অনিমেষ ভেবেছে বাসবী তার সঙ্গে যেতে চায়। এক মোটরে। তাই দেরি হওয়ার কৈফিয়ৎ দিল।

বাসবী দরজা ঠেলে বাইরে চলে এল।

অফিস ফাঁকা। কেবল মিশিবাবু ফাইলে মুখ গুঁজে কাজ করছে।

বাসবী নিজের সীটের দিকে এগিয়ে আসতে একবার শুধু মুখ তুলে দেখল। অল্পক্ষণের জন্য।

দিন দশেক পর।

ভীষণ কাজের চাপ পড়েছে। এক সঙ্গে প্রায় ছ-সাত জায়গায় কোম্পানীর কাজ শুরু হয়েছে তার হিসাব-নিকাশ, আয়ব্যয়ের ফিরিস্তি। তার ওপর অডিটররা এসে বসে আছে সাতদিন ধরে। খাতাপত্র ধরে টানাটানি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মারাত্মক প্রশ্ন।

বাসবীর অবস্থা কাহিল। মোটা মোটা খাতা নিয়ে ছোটাছুটি করে নাজেহাল হয়ে গেল। একটা ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয় ত আর একটা ঝঞ্ঝাট এসে জোটে।

দিনের কাজ শেষ হ'তে সন্ধ্যা হয়ে যায়। শুধু সুবিধা

এই যে, ছাত্রীর পরীক্ষা শেষ, এখন নিয়মিত হাজিরা দিতে হয় না।

ক্লান্ত, অবসন্ন দেহটা টেনে টেনে বাসবী ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন পিছন থেকে কার গলা শোনা গেল।

মিস সেন।

বাসবী মুখ ফিরিয়ে দেখল। জনতার অবিচ্ছিন্ন প্রাচীর। ওখানের কাউকে দেখতে পাবার কথা নয়। বাসবী এদিক-ওদিক দেখল, তারপরই চোখে পড়ে গেল।

দীপক গুপ্ত। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বাসবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে এগিয়ে এল।

আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

কি ব্যাপার?

ব্যাপার কিছু নয়, কাল দেওঘর চলে যাচ্ছি। গোছ-গাছ করে নেবার জন্য আজ ছুটি ছিল। কি আর গোছ-গাছ? আধময়লা বিছানা আর ভাঙাচোরা একটা বাক্স। সকালেই সব ঠিক করে নিয়েছি। তাই ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। আবার কতদিন পরে দেখা হবে।

শেষদিকের কথাগুলোয় কারুণ্যের স্পর্শ। বাসবী অভিভূত হ'ল।

পাঁচটার একটু আগে থেকে অপেক্ষা করছি। আপনার বের হ'তে এত দেরি হ'ল?

অডিটরদের ঝামেলা চলছে। আজকাল অফিস ছাড়তে আমার রোজই দেরি হচ্ছে।

এবার দীপক একটু এগিয়ে এল। হয়ত ইচ্ছা করে নয়, ভীড়ের চাপে। বলল, আপনি এখনই বাড়ী চলে যাবেন?

তরঙ্গসঙ্কুল জনস্রোতের দিকে সভয়দৃষ্টি ঘুরিয়ে বাসবী বলল, যাবার ত ইচ্ছা আছে, কিন্তু যাই কি করে বলুন ত? আজকের ভীড়টা যেন একটু বেশী মনে হচ্ছে।

ময়দানে একটা সভা ছিল। সেই সভা এইমাত্র ভাঙল, তাই ভীড়টা বেশী।

তা হ'লে? বাসবীর কণ্ঠ দ্বিধাকম্পিত।

দীপক যেন এমন একটা প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিল। তাড়াতাড়ি বলল, আসুন, কার্জন পার্কে একটু বসি। ততক্ষণে ভীড়টাও কমে যাবে।

এছাড়া গত্যন্তরও নেই। এত নির্জীব লাগছে বাসবীর যে ভীড়ে ঠেলাঠেলি করতে আর ইচ্ছা করছে না। তার চেয়ে কোথাও বসে কালক্ষেপ করতে পারলে মন্দ নয়। কিন্তু কার্জন পার্কে নয়। হাটের মাঝখানে সকলের দ্রষ্টব্য না হয়ে একটু দূরে কোথাও যাওয়াই ভাল। সহকর্মীর দল এই পথেই যাওয়া-আসা করবে। তাদের দৃষ্টি-পথে পড়ার ইচ্ছা বাসবীর নেই।

সেই কথাই বাসবী দীপককে বলল।

এখন ত ট্রামে-বাসে উঠতে পারার কোন আশা দেখছি না। চলুন, কোথাও বসি গে। তবে কার্জন পার্কে নয়, কোলাহল থেকে দূরে কোথাও চলুন।

Far from the madding crowd?

হাসতে হাসতে দীপক জিজ্ঞাসা করল।

এ প্রশ্নের বাসবী কোন উত্তর দিল না। এ প্রশ্ন কোন উত্তরও প্রার্থনা করে না।

বাসবী চলতে শুরু করল। কার্জন পার্কের পাশ কাটিয়ে রাস্তা পার হয়ে রাজভবনের ফুটপাথে গিয়ে উঠল।

দীপকই বলল, বেশ চলুন, ইডেন গার্ডেনে গিয়ে বসি।

বাসবী মাথা নাড়ল, না, ইডেন গার্ডেনে নয়, একেবারে গঙ্গার ধারে।

গঙ্গার ধারও জনবিরল নয়। জেটিতে জেটিতে লোকের জটলা। তবু বসবার জায়গা আছে। একজনের নিশ্বাসের সঙ্গে আর একজনের নিশ্বাস জড়িয়ে যায় না। শান্তিতে কথা বলা চলে।

বাসবী একটা লোহার ঢিপির ওপর বসল। সামনে অনেকগুলো কাঠ জড়ো করা ছিল। বোধ হয় জেটি মেরামত হচ্ছিল, তারই কাঠের স্তূপ।

দীপক তার ওপর বসল।

বলুন এবার আপনার কথা। অফিস কেমন লাগছে? বাসবী রুমাল দিয়ে ঘামের বিন্দু মুছতে মুছতে বলল।

অফিস খুবই ভাল লাগছে। যাঁদের সঙ্গে কাজ করি, তাঁরাও খুব সহানুভূতিশীল, তাছাড়া ম্যানেজারও চমৎকার লোক। কাল আমাকে ডেকে অনেক উপদেশ দিলেন।

উপদেশ?

হ্যাঁ, বিশেষ করে টাকাপয়সার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে বললেন। লোভ সর্বগ্রাসী, কাউকে সে রেহাই

দেয় না। তার প্রাণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। চন্দ্রে গ্রহণ হ'লে সে ছায়া এক সময়ে সরে যায়, কিন্তু দুর্নামে একবার কলঙ্ক পড়লে তাকে মালিন্যমুক্ত করা অসম্ভব। ঠিকই বলেছেন কথাগুলো, তাই না।

বাসবী একটু অন্যমনস্ক ছিল। সব কথাগুলো তার কানে যায় নি। মাঝগঙ্গায় স্টিমারের ঢেউয়ের ধাক্কায় একটা নৌকা বেসামাল হয়ে পড়েছিল, তার দৃষ্টি ছিল সেই দিকে, তবু মাথা নেড়ে বাসবী দীপকের কথায় সায় দিল।

কি আশ্চর্য জানেন, বাড়ী ছেড়ে এই প্রথম বাইরে যাচ্ছি, অথচ বাড়ীর লোকেদের জন্য তেমন মন কেমন করছে না, কিন্তু আপনার অভাব খুব মনে পড়বে।

একেবারে আচমকা। দীপকের মুখ থেকে এমন ধরনের কথা বের হতে পারে এ যেন আশার অতীত।

অন্ধকারে দীপকের মুখটা দেখা যাচ্ছে না। একটা জাহাজের কাঠামোর ছায়ায় এদিকটা অন্ধকার। সব পুরুষই বুঝি এক। সুযোগ পেলে নিভৃত অবকাশে সঙ্গিনীকে একই রকমের কথা বলে।

কিন্তু এ সবে বাসবী ভোলে না। আঘাত-পাওয়া মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। অনেক দুর্যোগ বাঁচিয়ে তাকে চলতে হয়। লোককে এড়ানো যায় না, প্রয়োজনে মিশতে হয় তাদের সঙ্গে, কিন্তু সীতার মতন নিজের চারদিকে গণ্ডী এঁকে নিতে হয়। তার বাইরে গেলেই দশাননের কামনার খোরাক হবার সম্ভাবনা।

কিছুক্ষণ কোন কথা হ'ল না। গঙ্গায় জোয়ার আসছে, তারই কলধ্বনি।

বাসবী বলবার মতন কোন কথা খুঁজে পেল না।

একটু পরে দীপক বলল, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

বলুন।

মাঝে মাঝে যদি চিঠি দিই, উত্তর দেবেন?

এবার বাসবী চমকাল। পায়ে পায়ে অতি সন্তর্পণে দীপক এগোচ্ছে। ধূর্ত শ্বাপদের মতন।

ব্যাপারটাকে এগোতে দেওয়া বিপজ্জনক। এ সব নেশার শুরু আছে, শেষ নেই। যেখানে শেষ, সেখানে সর্বনাশ।

বাসবী উঠে পড়ল, উঠতে উঠতেই বলল, মাপ করবেন, চিঠি লেখা একদম আমার হাতে আসে না। এতক্ষণে ভীড় কমে গেছে। যাওয়া যাক।

বিবর্ণ, পাংশু মুখ পিছনে ফেলে বাসবী এগিয়ে গেল। একটু পরেই বুঝতে পারল পিছন পিছন দীপকও আসছে। রাস্তা পার হবার সময় দীপক পাশে এসে দাঁড়াল।

ইডেন গার্ডেনের কাছাকাছি দীপকের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না।

বাসবী দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখে কিছু বলল না, কিন্তু ভাবল, এর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির প্রশ্নই বা উঠছে কেন? ভুল বোঝবার জন্যও যে অন্তরঙ্গতার প্রয়োজন, সেটুকু ঘনিষ্ঠতা দু'জনের মধ্যে নেই।

আপনাকে চিঠি দিতে চেয়েছিলাম, কারণ আপনার চিঠিতে হয়ত বাড়ীর সঠিক খবরটা পেতাম। আমার বাড়ীর অবস্থা ত দেখেই এসেছেন স্বচক্ষে। যেমন বাপের অবস্থা, তেমনই মায়ের। কে কাকে দেখে ঠিক নেই। বাড়তি বোঝা হিসাবে রয়েছে বিধবা বোন। মাস মাস আমি টাকা ঠিক পাঠিয়ে যাব, কিন্তু বাড়ীর সব কে কেমন থাকে তার খবর আমি পাব না। মা-বাবার শরীর খারাপ হ'লেও তারা সে-কথা আমায় লিখবে না। বিদেশে থাকা ছেলের কাছে কোন বাপ-মা'ই ঠিক খবর পাঠায় না। ভাবে, ছেলের দুশ্চিন্তা বাড়বে। সেইখানেই আমার ভয়। তাই চেয়েছিলাম কারও কাছ থেকে যদি বাড়ীর আসল খবরটাও মাঝে মাঝে পেতাম।

এবারও বাসবী কোন কথা বলল না। দীপকের কথার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারল না। কি বলতে চায় দীপক! বাসবী অফিসের পর মাঝে মাঝে তার বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ-খবর করে দীপককে চিঠি লিখে জানাবে। তা কি সম্ভব!

বোধ হয় বাসবীর মনের সন্দেহ তার চোখ-মুখেই প্রকাশ পেয়ে থাকবে। একটু পরেই দীপক আবার বলল, অফিসের কোন বেয়ারাকে পাঠিয়েই খবরটা নিতে পারবেন। বেয়ারারা ত চিঠি বিলি করতে নানাদিকে যায়। তাছাড়া অনন্ত বেয়ারা আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকে। সে চেনে আমাদের বাড়ী।

একবার বাসবীর ঠোঁটের ডগায় কথাটা এল।

তাই যদি হয়, তা হ'লে অনন্ত বেয়ারাই ত বাড়ীর খবর দীপককে লিখে জানাতে পারে, কিন্তু বাসবী নিজেকে সংযত করল। সব কিছু শালীনতার গণ্ডীর মধ্যে থাকাই শ্রেয়।

তাছাড়া বাসবীর নিজের বাড়ীর কথাটা মনে পড়ে গেল। সে নিজে যখন বাইরে গিয়েছিল, তখন অফিসের বেয়ারা গৌরকে বাড়ীতে মোতায়েন করে রেখেছিল, কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্য। দীপককে অনেকদিন এখন বাইরে থাকতে হবে। বাড়ীর লোকেদের জন্য উদ্বেগ থাকাই স্বাভাবিক।

এত কথা বাসবী ভাবল বটে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না।

কয়েক পা এগিয়েই বাসবী বলল, একটু তাড়াতাড়ি চলুন দীপকবাবু, নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

দীপক এগোল না। দাঁড়িয়ে পড়ে বলল।

আপনি যান। আমি বাবার জন্য একটা ওষুধ কিনে নিয়ে যাব।

বুঝতে পারল বাসবী, দীপক একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিছুটা অপমানিত বোধ করাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু বাসবী নাচার। সকলের মনোরঞ্জন করে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভীড় অনেক কম। বাসবী ট্রামে গিয়ে বসল।

কিছুটা চলার পরই মনে হ'ল এতটা রুক্ষতার কোন প্রয়োজন ছিল না। খোঁজখবর নিয়ে চিঠি লেখা সম্ভব নয়, এ কথাটা ভালভাবে, ভদ্রভাবে অনায়াসেই বলা চলত।

কিন্তু মধ্যবিত্ত মেয়ের জ্বালা অনেক। বিশেষ করে যাদের সংসারের চৌকাঠ পার হয়ে অনাত্মীয় পরিবেশে আনাগোনা করতে হয়। একটু অতর্কিত হলেই বিপদ। তাই স্বাভাবিকভাবে নিজেদের ঘিরে রুক্ষতার বর্মের সৃষ্টি করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

দরজার গোড়াতেই মা'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

উদ্বিগ্ন, অস্থির চিত্ত। ক্রমাগত বারান্দা আর ঘর করছে।

কি রে, তোর এত দেরি হ'ল?

মা'র পাশ কাটাতে কাটাতে বাসবী বলল, অফিসে ভীষণ কাজের চাপ পড়েছে। ক'দিনই পড়েছে, আজ একটু বেশী।

বাসবী মিছে বলল না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারল, মিছে বললেই একটা অবিশ্বাসী দৃষ্টির মুখোমুখি পড়তে হ'ত।

বাইরে সুবিধাবাদীদের চক্রান্ত, ঘরে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। মধ্যবিত্ত চাকুরে মেয়েদের জীবন সীমিত এ দু'টির মধ্যে।

সংসার তাদের ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। উপার্জন চাই, অন্ন চাই, সংসারের ক্ষুধা মেটাবার হাজার উপকরণ। কিন্তু সেই আহার্য সংগ্রহ করতে একটু যদি পদস্খলন ঘটে, তা হ'লে সংসারের রক্তচক্ষুই সবচেয়ে বেশী প্রকট হয়।

ঘরের মধ্যে খোকন আর রুবি পড়তে বসেছে।

খোকন পড়ছে কিন্তু রুবি খোলা বইয়ের ওপর ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

বাসবী হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা রেখে রুবির কাছে বসল।

হ্যাঁরে রুবি, পড়ছিস না ঘুমাচ্ছিস?

রুবি চোখ খুলে দিদিকে দেখে হাসল, তারপর দেহভার দিদির ওপর ছেড়ে দিয়ে বলল, অনেকক্ষণ ধরে পড়েছি দিদি, এখন ঘুম পাচ্ছে।

তারপর কি মনে হ'তে বাসবীকে নিরীক্ষণ করে দেখে বলল, অফিসে স্কুলের চেয়েও বেশী পড়ায়, না দিদি? সেই কোন্ সকালে গিয়েছ, আর এখন এলে।

উত্তরে বাসবী রুবির নরম দুটো গাল সস্নেহে টিপে দিল।

মা এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়াল।

রাত্রে খাবি ত?

মা'র গলার স্বর এখনও বেশ গম্ভীর।

মা'র বোধ হয় ধারণা এত রাত অবধি মেয়ে নিশ্চয় একলা বাইরে থাকে নি। সঙ্গে কেউ ছিল। ম্যানেজারের সঙ্গে মেয়ের যে পরিমাণ হৃদ্যতা, একসঙ্গে বাইরে যায়, মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করে এক গাড়িতে, কাজেই রাত্রের খাওয়াটা ম্যানেজারের সঙ্গে কোন হোটেলে সেরে আসাও বিচিত্র নয়।

মা'র মনের ভাব বাসবী সবই বুঝল। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করতে, প্রতি-প্রশ্ন করতে মন চাইল না।

হেসে বলল, খাব না ত কি? দাঁড়াও বাথরুম থেকে ঘুরে আসি, তারপর সবাই একসঙ্গে বসব।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাসবী দেখল, সার সার আসন পাতা হয়েছে। রবি আর খোকন বসে পড়েছে। মা পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

নিজের আসনটা সরিয়ে নিয়ে বাসবী রবির পাশে বসে পড়ল।

খেতে খেতে ইচ্ছা করেই বাসবী অফিসের কথা তুলল।

উঃ, ক'দিন অফিসে যা খাটুনি চলেছে, আর পারছি না।

মা রুটি ছিঁড়ছিল, আড়চোখে বাসবীর দিকে চেয়ে দেখল।

কি জানি মেয়ের মতিগতির কথা কিছুই বলা যায় না। চাকরিটা ছেড়ে দিলেই সর্বনাশ। এতগুলো প্রাণী তা হ'লে বেঘোরে মারা যাবে।

আজকালকার মেয়েদের মনের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। এই ত বাসবী লেখিকার মেয়ে। আজই না হয় সংসারের হাল ধরেছে, কিন্তু কি করছে, কোথায় যাচ্ছে, কিছু জানবার উপায় নেই। মেয়ে নিজের খেয়ালে চলেছে।

কিছু কিছু কথা মা জানতে পেরেছে। বাসবী বলে নি, বলেছে অফিসের বেয়ারা গৌর। যখন বাসবী বাইরে গিয়েছিল, গৌর এ বাড়ীর তদারক করত, তখন গৌরের সঙ্গে অফিসের দু'একটা কথা বাসবীর মা'র হয়েছে।

গৌরই বলেছে।

দিদিমণির খুব উন্নতি হয়ে যাবে মা।

যাবার সময় গৌর বাসবীর মাকে শুনিয়েছে।

হবে উন্নতি? মা একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।

নির্ঘাৎ হবে। ম্যানেজার সায়েবের সঙ্গে যে খুব দহরম-মহরম। কথায় কথায় তিনি দিদিমণিকে ডাকেন। এই যে অফিসে এত লোক রয়েছে, কিন্তু বাইরে যাবার সময় ম্যানেজার সায়েব ঠিক দিদিমণিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

গৌর ভেবেছিল মেয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির সংবাদে মা খুবই উৎফুল্ল হবে, কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। মা'র মুখে আষাঢ় মেঘের অন্ধকার নেমে এসেছিল।

দীপকবাবুকে তোমার মনে আছে মা?

বাসবী, আচমকা প্রশ্নে মার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।'

কে দীপকবাবু?

ওই যে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন মিষ্টি নিয়ে।

মা নয়, খোকন উত্তর দিল।

তুমি যার চাকরি করে দিয়েছিলে দিদি?

বাসবী হাসল, দূর, তোর দিদির কাউকে চাকরি করে দেবার ক্ষমতা আছে না কি?

কি হয়েছে সে দীপকবাবুর?

মা বলল।

দীপকবাবু অফিসের কাজে বাইরে চলে যাচ্ছেন।

ম্যানেজারের সঙ্গে?

মা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

না, না, ম্যানেজারের সঙ্গে কেন? একলা যাচ্ছেন। তাঁকে বাইরেই থাকতে হবে এখন থেকে।

বাসবীর মনে হ'ল তার মা'র দুটো চোখ যেন জ্বলে উঠল। অল্পক্ষণের জন্যও। হয়ত ভাবল, ম্যানেজারের সঙ্গে বাইরে যাবার জন্য শুধু তার মেয়েরই ডাক পড়ে। অফিসের এত লোক থাকতে বেছে বেছে ম্যানেজার এই কনিষ্ঠ কেরাণীকেই সঙ্গী করে। ব্যাপারটা অফিসের পিয়ন-বেয়ারাদেরও চোখে পড়েছে।

হ্যাঁরে, তোদের ম্যানেজার আর বাইরে যাবে না?

বাসবীর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাটি আর গ্লাসটা থালার ওপর রেখে উঠতে যাচ্ছিল, মা'র আচমকা প্রশ্নে বসে পড়ল।

প্রশ্নটা যে খুব নিরীহ নয়, সেটা বোঝবার বয়স বাসবীর হয়েছে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে, একদিন মার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রশ্নের কাঁটা যাতে নির্মূল হয়। কিন্তু পারে নি। অবশ্য কাদা ঘাঁটার সাধ তার হয় নি।

এবারেও নিজেকে সংযত করে বলল, কি করে জানব মা? ম্যানেজার কবে কোথায় যাবে সে কি আমার জানবার কথা। অফিসের কাজ পড়লেই বেরোবে। মাসে একবার করে বাইরে ত যায়ই।

বাসবী উঠে পড়ল। যেটুকু বলেছে, তাতেই মা'র বুঝতে পারা উচিত। প্রতি মাসে ম্যানেজার বাইরে বের হয়, তাই বলে প্রতি মাসে বাসবীকে সঙ্গে যেতে হয় না। একবার যে ম্যানেজারের সঙ্গিনী হয়েছিল, তাতে অফিসের যথেষ্ট স্বার্থ জড়ানো ছিল।

এমন কাজ অফিসের আর কারও দ্বারা হয়ত হ'ত না।

সোজা বাসবী বিছানায় গেল না। বারান্দায় এসে বসল। একটা মাদুর পাতাই ছিল। মা বোধ হয়, এখানে বসেছিল।

পাড়ায় অনেক বাড়ীতে বাতি নিভে গেছে। মধ্যবিত্ত পাড়া। কালকের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার জন্যই সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। দু' একটা বাড়ী থেকে রেডিওর গান ভেসে আসছে। খুব অস্পষ্ট: শুধু রেশটুকু কানে আসছে, কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না।

কিছু বলা যায় না, ওই সব অন্ধকার বাড়ীর কোটরে কোটরে বাসবীর মতন চাকরিসর্বস্ব মেয়েও নিশ্চয় আছে। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে, দেহের শুচিতা বাঁচিয়ে, মনের রুচি বিসর্জন দিয়ে সংসারের জন্য অন্ন সংগ্রহ করে চলেছে। তাদের অভিভাবকরাও এমনই সন্দেহের ভ্রূকুটি ফুটিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করছে। সন্দেহের বোঝা চাপিয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলছে। কিন্তু তাদের সংগ্রহ করা কাঞ্চনখণ্ড নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে গ্রহণ করছে।

কি রে, শুবি না?

মা এসে দাঁড়িয়েছে।

বাসবী মুখ ফিরিয়ে দেখল।

ঘরের আলো এসে মা'র শরীরে পড়েছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সেই আলোতে বাসবীর দেখতে কোন অসুবিধা হল না।

কাপড়ের দু-তিন জায়গায় তালি দেওয়া। হলুদের দাগে, ময়লায় পরিধেয়র স্বস্বরূপ নিশ্চিহ্ন।

মার দীন, কাঙালিনী রূপটা আলো-অন্ধকারে যেন প্রকট হয়ে উঠল।

মা, তোমার কাপড়ের এমন অবস্থা বল নি ত আগে?

বাসবীর কণ্ঠে অভিমানের সুর।

মা তাড়াতাড়ি আলোর আওতা ছেড়ে অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। কাপড়ের দৈন্যদশা যেন মেয়ের চোখে না পড়ে।

আমতা আমতা করে বলল, কেন, কি আর এমন ছিঁড়েছে। আমার এতেই চলে যায়। বাইরে ত আর বের হ'তে হচ্ছে না আমাকে। বাড়ীর মধ্যে একটু ছেঁড়া-খোঁড়া পরে থাকলে দোষ হয় না।

তোমার আর কাপড় নেই?

আছে একটা।

সেটার অবস্থাও বোধ হয় এরই মতন?

না, না, মা প্রতিবাদ করল, সেটা এত ছেঁড়া নয়। সে, রাত অনেক হয়েছে। শুবি চল। কাল ত আবার সাত-সকালে ওঠা আছে।

বাসবী আর আপত্তি করল না। নিজেরও খুব ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হচ্ছে। বিছানায় নিজেকে সমর্পণ না করতে পারলে নিস্তার নেই। কাল শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে পড়বে।

কিন্তু শুতে যাবার আগে বাসবী প্রতিজ্ঞা করল, কাল অফিস-ফেরৎ মা'র জন্য এক জোড়া থান কিনে আনবে। সব কাজ ফেলে।

দরকার হ'লে টিফিনের সময় বেরিয়ে পড়ে কোন দোকানে চলে যাবে। আজকাল অফিস পাড়াতেও অনেক কাপড়ের দোকান হয়েছে।

তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে এসেছিল। ঘুম আসবার আগে একবার দীপকের কথা মনে হ'ল। কাল থেকে আর দীপককে দেখতে পাবে না অফিসে। দীপক বাইরে চলে যাবে।

দায়িত্বপূর্ণ কাজ, বিশেষ করে বিভাস হাজরার গোলমালের পরে এ কাজের গুরুত্ব যেন অনেক বেড়ে গেছে।

দীপক যদি অন্যায় করে, পয়সা নিয়ে কোন গোলমাল, তা হ'লে পরোক্ষভাবে বাসবীও জড়িয়ে পড়বে, কারণ এ অফিসে দীপককে আনার জন্য সেই দায়ী।

অবিনাশ রায় উপদেশ দিয়েছে। মনে হয় না, দীপক এ ধরনের কোন কাজ করবে। সবাই বিভাস হাজরার নয়। মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি তাকে টেনে নীচে নামাতে পারে না।

বাসবীর ঠোঁটের প্রান্তে হাসি ফুটে উঠল। বিদ্রূপের হাসি।

শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি থাকলেই মানুষ মহৎ হয়, সাধারণের ওপরে, এরকম মনে করারও কোন হেতু নেই। সে পরিচয়ও বাসবী পেয়েছে।

অনিমেষকে দেখেছে। দীপককেও দেখল। একটা ব্যাপারে এরা সবাই সুবিধাবাদী। একটু নির্জনতা, নারীদেহের সান্নিধ্য, তারপর তারা জ্ঞান হারায়। সংস্কৃতির নির্মোকটা খসে পড়ে আদিম মানুষের লালসার বীভৎস রূপটা প্রকট হয়ে ওঠে।

বাসবী চোখ দুটো টিপে পাশ ফিরে শুল।

আবার শুরু হ'ল নিস্তরঙ্গ জীবন। অফিস আর বাড়ী এই দুই প্রান্তে জীবনের মাকু সীমিত হল। দীপক নেই। ওর চেয়ার-টেবিল সরিয়ে রাখা হয়েছে। অডিটরদের কাজ শেষ। হিসাবপত্রের পুঁথি গুটিয়ে তারা ফিরে গেছে। বাসবী একটু হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পেয়েছে।

অনিমেষ সতত ব্যস্ত। এর মধ্যে সে আর বাসবীকে ডাকে নি। তার সঙ্গে চোখাচোখি হয় নি। কৃষ্ণা সাতদিনের ছুটি নিয়েছে। তার জায়গায় অনীশবাবু কাজ করছে।

মাঝে মাঝে শুধু বাসববাবু বাসবীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমাকে আপনার মনে আছে ত?

এ-ই বাসববাবুর কথা বলার ভঙ্গি। একটু নাটকীয়, কণ্ঠ সতেজ, সহজ।

বাসবী উত্তর দেয় নি। শুধু হেসেছে।

এবার কিন্তু ছাড়ছি না। এবার আপনাকে যেতেই হবে।

নিশ্চয় যাব। আপনি আমাকে দিন দুয়েক আগে খবর দেবেন।

বাসব হেসে উঠেছে, দিন দুয়েক কি? আপনাকে আমি সাতদিন আগে খবর দেব। এবার রথমহলে 'দুই পুরুষ' হচ্ছে। অবশ্য এখনও মাস দুয়েক দেরি! তবে আগে থেকে জানিয়ে গেলাম অন্য কোন কাজ হাতে নেবেন না।

বাসবী ঘাড় নাড়ল, ঠিক আছে।

আর একবার টিফিনের সময় ফাইল-বগলে মহীতোষবাবু এসে দাঁড়ান।

এই যে মা-লক্ষ্মী, কেমন আছ বল?

এই একটি লোককে দেখলে বাসবীর সত্যি ভাল লাগে। ভাল লাগার ভান করতে হয় না।

ভাল আছি। আপনি?

আমি? এই যে দেখ না রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ছুটছি ফাইল নিয়ে। এই আমার ভাল থাকা। যেদিন হাত থেকে ফাইল খসে পড়বে, সেদিন অর্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ার মতন, আমারও শেষ অবস্থা জানবে।

মহীতোষবাবু প্রায় অফিসের ছাদ কাঁপিয়ে হেসে উঠল। কোণে বসা নিশিবাবু পর্যন্ত চমকে মুখ তুলল।

শোন, রাধা বিশেষ করে তোমায় যেতে বলেছে একদিন। সপ্তাহের ছটা দিন কি অবস্থায় থাক তা ত জানি। এক রবিবার চলে এস আমার বাড়ীতে। সকাল বেলা আসবে, সারাদিন থেকে সন্ধ্যাবেলা ফিরে যেও। এক সঙ্গে বসে শাকভাত খাওয়া যাবে।

বাসবী ঘাড় নাড়ল, ঠিক আছে এক রবিবার নিশ্চয় যাব। সকালে না যেতে পারি, বিকালে একবার চেষ্টা করব।

মহীতোষবাবু আরও দু' একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ অফিসের ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল।

সর্বনাশ, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। অফিসারকে পেলে হয়। চলি মা।

মহীতোষবাবু দ্রুত বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকালেই ঘটল ব্যাপারটা।

অফিসে আসতে বাসবীর একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। মাঝপথে ট্রামের তার ছিঁড়ে এক বিপত্তি। এমন জায়গায় দুর্ঘটনা হ'ল, যেখানে নেমে বাসে ওঠা প্রশ্নের অতীত। অসহিষ্ণু, অধৈর্য এক রাশ মানুষের চেঁচামেচি করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

অফিসের সিঁড়িতে পা দিতে গিয়েই বাসবী থেমে গেল।

অগণিত চলমান জনস্রোত। ফুটপাথে পা রাখাই

স্থুল। সকলেই সমস্বরোগে ছুটছে। কিন্তু কোলাহলও উত্থিত হচ্ছে।

তার মধ্যেই কথাটা বাসবীর কানে এল।

মুখ ফিরিয়ে দেখতে দেখতেই খোঁজ মিলল।

রাস্তা পার হবার জন্ত প্রীতি দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে অকালবৃদ্ধ, জরাজর্জর দেহ যে পুরুষটি দাঁড়িয়ে আছে, সেই যে বিতান হালদার এ বিষয়ে বাসবীর কোন সন্দেহ রইল না।

প্রথমে ক্ষিণ ক্ষিণ করে নারীকণ্ঠ, তারপর পুরুষের স্বর।

ও, এই বুঝি ম্যানেজারের পেয়ারের মেয়েটা।

এত আলো, এত কোলাহল, চারদিকে জীবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস, তবু যেন বাসবীর মনে হ'ল বিরাট একটা তুলি দিয়ে কে তার সামনে থেকে সব কিছু মুছে দিল। সামনের জগৎ বিবিক্ত কালিমায় আচ্ছন্ন। নিশ্বাস নেবার মতন কোথাও একটু বাতাস নেই।

(ক্রমশঃ)

নাম-না-জানা-ফুল

অধ্যাপিকা বাসন্তী চক্রবর্ত্তী

মধ্যাহ্নের তপ্ত দাবদাহে চারিদিক করিতেছে ধূ ধূ ;
ধরিত্রীর বুকে যেন কোনখানে নাই শ্যামলতা ;
জীবনের অমিত-লাবণ্য স্পর্শ ! রুক্ষ এই কর্কশ
মৃত্তিকা, তাই—অন্তরাতে ধরেছে কঠিন বুকে ।
রুক্ষতার দাবদাহ ; তার বুকে—করেছে আঘাত
বেদনায় ; ঐ ফাটা বুক যেন তাহারি প্রকাশ !
হেনকালে চলি পথে—আমি যে পথিক,
অন্যমনে……। চলিয়াছি, পা রাখিয়া
ঘাসে ঘাসে ;—বুঝি নাতো প্রাণ তারো
আছে ; সেও তো করিছে পান এ বিশ্বের
জীবন-মৃত্যুর এই অমৃত-প্রবাহ ! তাই বুঝি
হঠাৎ পড়িল চোখ ক্ষুদ্র এক ফুলের উপরে ।
অকস্মাৎ দেহে-মনে খেলিল স্পন্দন—এ তো
নহে ঘাস ফুল ! তার সঙ্গে আছে মোর
নাড়ির বন্ধন—আবাল্যের ? তবে এ যে দেখি,
গোলাপী রঙের—'নাম-নাহি-জানা' এক
অপূর্ব সুন্দর ফুল । ক্ষুদ্র দেহ ঘেরি বহিছে
অসীম লাবণ্যময় দ্যুতি—। এই রুক্ষতার
বক্ষ ভেদ করি, ঘাসে ঘাসে উঁকি মারি
রহিয়াছে মাঠময় ; তারাদল যথা ফুটি
থাকে অনন্ত গগনবুকে । ক্ষুদ্র তারাদল,
করিছে ঘোষণা অনন্তকালের তরে
আবাহন গীতি । নহে এ তো তার সমতুল ;
পায় নাই বিধাতার আশীর্বাদ দীর্ঘকাল ধরি
গাহিবার অমর গীতিকা । কিন্তু দেখিলাম,
তার সীমিত এ জীবন-প্রবাহে আনিয়াছে
বয়ে, অসীম কালের বার্তা ? এই তার
ক্ষুদ্র জীবনের পাতাপাতে রচিয়াছে
সে তো এক অনুপম কাব্যগাথাখানি ।
তার সৌম্য স্নিগ্ধ কান্তিখানি—যে
লাবণ্য আনিয়াছে বয়ে, এই রুক্ষ ধরণীর
বুকে ;নহে তাহা ক্ষুদ্র অতিশয় ।
যে অমৃত মাধুরী ও করিতেছে দান
প্রাণপণে ;— যদিও এ দিন হলে গত
যাবে ঝরি, ঐ ক্ষুদ্র দলগুলি ;
স্তিমিত হইবে ধীরে ঐ তুচ্ছ জীবন
প্রদীপ ;—তথাপি এ ক্ষণিক মাধুর্যরূপে
আছে তার, জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা ।
বিধাতার আশীর্বাদ লয়ে, যে তুচ্ছ
জীবন সে যে লভিয়াছে হেথা ;—তার
বিনিময়ে, দিয়ে গেল—অমিত লাবণ্যময়
তার নবীনতা ! ক্ষুদ্র এই জীবনের
কণামাত্র এই দান নহে তুচ্ছ অতিশয় ।
এই কথা মনে ভাবি, তার তুচ্ছ জীবনের
ক্ষুদ্র এই বাণীটিরে,—রাখিলাম মোর
এই ক্ষুদ্র বাণীটুকুতে ধরিয়া—এই
মোর শেষ অর্ঘ্য—'নাম-নাহি-জানা'
সেই ক্ষুদ্র ফুল তরে ।

একটি ডিম

শ্রীক্ষিতি মুখোপাধ্যায়

এখনও অজাত আমি।
বন্দীদশা ডিম-কারাগারে
কাটিবার আরো আছে বাকি।

প্রাণী নেই,
শুধু আছে প্রাণ।
আর চঞ্চলতা
বাধা পেয়ে ডিমের প্রাচীরে
চিত্র আঁকে
কতো হিজিবিজি
শত্রুর কতো শতনাম

নিজ-দেহ-উষ্ণতায় যাবে
যেবা চায় দিতে মোরে
আলোর সন্ধান
মুক্ত হয়ে একদিন
তারই নাম, তারই রূপ দিব আঁকি।

তারই চিত্র কল্পনায় আমি
যার বিবরণ
পুঁথি-পড়া বিদ্যা দিয়ে
রচনায় রত
কোনো মূর্খ অতীব নন্দন।

দীর্ণ হবে কবে এই ডিমের দেয়াল?
কতো দেরি নবীন উষার?
তাই নিয়ে জল্পনায় রত

আমাদের কেউ কেউ
স্বল্প-দক্ষিণার জ্যোতিষীর মতো,
তিথি, ক্ষণ,
সব বলে দেয়।

প্রতীক্ষার গ্লানিবোধে
কিংবা প্রয়োজনে
মন্ত্র কোনো নাই।
যন্ত্র আছে
ইনকিউবেটর।
সেই যন্ত্রে সর্বস্ব যার
সেই আমি বলি কুক্কুটিরে
করো ব্যবহার।

ডিমের ছাদের নিচে
কতো প্রাণ
কতো রূপ
কলরব করে
স্বপ্ন রচে নব দিগন্তের।

কে বলিতে পারে?
হয়ত ইহাই শেষ ডিম-মণ্ডূকের।
আরেক পৃথিবী
চিরদিন থেকে যাবে অচেনার দেশা।
হয়তো ডিমের দেয়াল
চূর্ণ হবে কোনো এক ক্ষুধিতের লোভে।
কণামাত্র শৈশবের সাথে
পাকচক্রে লীন হবো অগস্ত্য বাবার।*

---

*একটি জার্মান কবিতার অনুসরণে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আকা (-ঠ)-শ বাণী : নব-প্রকল্প ? : কতদূর ?

বিগত ২১শে জানুয়ারী (১৯৬৫) ভারতের নব্য বেতার ও তথ্য মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, বেতার অনুষ্ঠানের উন্নতির জন্য তথ্য ও বেতার দপ্তর বং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সংযোগ সমন্বয় সাধন করা হইবে। রেডিওতে মন্ত্রীদের বক্তৃতা ধিক প্রচার করা হয়—সংবাদপত্রে ইহা একটি প্রধান তি সত্য) অভিযোগ। এই সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা ইতেছে।

বেতারসূচী যাহাতে আরও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত য়, সে সম্বন্ধেও তিনি লক্ষ্য রাখিতেছেন। বেতারে াঁহারা যাহা বলেন, তাহা যাহাতে সরকারী নীতির নরাবৃত্তি না হয়, সে সম্বন্ধেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

ইহার পর বেতার সম্পর্কে বিবিধ তথ্য, অভিযোগাদি বং অন্যান্য বিষয় সংগ্রহ ও অনুসন্ধানের জন্য একটি মিটি গঠিত হয়—এই কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এ. কে. শ। মাত্র কিছুদিন পূর্বেই এই কমিটি কলিকাতা সফর রিয়া গিয়াছেন। এখানে কমিটি কি তথ্যাদি সংগ্রহ বং কাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, বিশেষ জানা নাই। ন্তু কমিটি সাধারণ রেডিও শ্রোতাদের, তাঁহাদের র্তব্য কমিটির সম্মুখে পেশ করিতে কোন আহ্বান ানান নাই এবং যাহা করাই ছিল কমিটির প্রাথমিক র্তব্য। এ-বিষয় কয়েকজন গণ্যমান্য মহাশয় ব্যক্তিদের ক্তব্য শ্রবণ এবং তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়ত সবিশেষ ল্যবান বিবেচিত হইতে পারে কর্তামহলে—কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না (এবং ভুলা উচিতও হয় নাই) যে, রডিও যাঁহারা শুনেন, তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জনই কেবল সাধারণ নহেন, অতিসাধারণ, এবং এই কারণেই ডিও সম্পর্কে ইঁহাদের মতামতই অবশ্য গ্রাহ্য। রেডিও াইসেন্স বিক্রয় করিয়া সরকারী অর্থাগারে যে বিপুল র্থাগম হয়, তাহার শতকরা ৯৯ টাকা ৯০ পয়সাই াসে সাধারণ রেডিও লাইসেন্স্ গৃহীতার ট্যাঁক হইতেই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও—রেডিও কর্তাদের নিকট এই 'সাধারণ-শ্রোতা' নগণ্য এবং ইহাদের কর্তব্য লাইসেন্সের মূল্য প্রদান করিয়াই শেষ হয়—ইহার পর তাহাদের কোন-দাবি দাওয়া থাকিবার কথা নয়!

২১শে জানুয়ারীর পর মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হইয়া গেল—কিন্তু আকা(-ঠ)-শ বাণীর কি উন্নতি হইয়াছে অদ্যাবধি তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এখনও মন্ত্রীদের শ্রীমুখের বাণী (এবং একই বাণী বার বার, শ্রোতাদের কর্ণ-বিবরের অন্তরতম গহ্বরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী হইলে ত কথাই নাই—তাঁহাদের বক্তৃতা বা বাণী যে-দিন প্রথম প্রচারিত হয়, সেই দিন হইতে অন্তত চার-পাঁচ দিন প্রত্যহ প্রায় বার ছয়েক করিয়া বিভিন্ন প্রচারক বিভিন্ন এবং বিচিত্র কণ্ঠে ঘোষণা করেন। এমন কি মজদুর মণ্ডলীর আসর, পল্লীমঙ্গল আসর (অধুনা বৈচিত্র্যহীন 'বিচিত্র অনুষ্ঠান') এবং অন্যান্য আসর বা রেডিও-আড্ডা হইতে প্রচারিত হইবেই। বলা বাহুল্য, শ্রোতা-সাধারণ রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর রেডিও ভাষণ তাঁহাদের স্ব-কণ্ঠ হইতে যে মনোযোগ এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে—বিভিন্ন ঘোষকের সানুসে কণ্ঠে তাহা যেমন বিরক্তিকর তেমনি অশ্রাব্য মনে হয়! তাহা ছাড়া বার বার একই ভাষণ বিভিন্ন কণ্ঠে (এবং অনেক সময় ভুল অনুবাদ) প্রচার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। যাক—এইবার আকা(-ঠ)-শ বাণীর অন্যান্য বিষয় কিছু বলা অন্যায় হইবে না।

মজদুর মণ্ডলীর আসর—বাঁধা ছকে এই আসরের কাজ চলে—এবং সেই কারণে এই আসরের 'পরিচালক' কি বা কোন্ প্রয়োজনে? পরিচালক মহাশয় 'আজকের কথা" প্রসঙ্গে যে-সকল ব্যাপার আলোচনা করেন এবং যে-ভাবে সুকঠিন বিশ্ব সমস্যাবলীর সহজ সমাধান করেন, তাহা একদিকে প্রায়ই যেমন হাসির খোরাক যোগায় অন্যদিকে তাহা—শ্রমিকদের নিকট যেমন অবোধ্য তেমনি প্রয়োজনহীন। আসর-পরিচালক বোধ হয় জানেন না

যে আজকের প্রায় সকল কারখানায় এবং অন্যান্য সংস্থায় শ্রমিক প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ রাখেন এবং হাজার হাজার শ্রমিক নিয়মিত সংবাদপত্রও পাঠ করিয়া থাকেন। কাজেই 'আসরের কথা' শ্রমিকদের নিকট মূল্যহীন।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি—আবার বলিব যে, কোন বিশেষ আসরের পরিচালক যদি নিয়োগ করিতেই হয় তাহা হইলে একজন বিশেষ পরিচালককে প্রায় বংশানুক্রমে রাখা অন্যায়। প্রতি বৎসর নূতন "পরিচালক" নিয়োগ করিলে একঘেয়েমী দূর হইবে। কোন রেডিও আসর কাহাকেও মৌরসী পাট্টা দেওয়ার অর্থ 'পাবলিক-মানি'র অপচয়।

'রেডিও'র নিয়োগ-বিধি কি ?

সিনেমা-ছবি কিংবা নাটক পরিচালনায় "পরিচালক" অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু কতকগুলি একঘেয়ে, নীরস, বৈচিত্র্যহীন এবং ছক-বাঁধা রেডিও আসর পরিচালনায় অত 'বেতনভোগী' অজ্ঞ, অপক্ক, অর্দ্ধপক্ক-cum-ঢাকা পরিচালক প্রয়োজন কিসের কারণে? পরিচালক যদি সত্যই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে—ঐ নিয়োগ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা সমগুণ একটি বিশিষ্ট নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে কেন করা হয় না?

শুনিতে পাই বেতারবিভাগে কাহাকে নিযুক্ত করিতে হইলে—নিয়োগের পূর্ব্বে শিল্পী, ঘোষক, প্রচারক, বক্তা প্রভৃতির বিদ্যাবুদ্ধি, কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি ইত্যাদির পরীক্ষা করিতে হইবে—এই প্রকার একটা নিয়ম আছে। বর্ত্তমানে ব্যাপার যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, উপরি-উক্ত পরীক্ষাদি বোধ হয় 'খাতা-পত্রেই' আবদ্ধ থাকে—বৈধানিক সতীত্ব রক্ষার কারণে। খাতা পরিষ্কার রাখিয়া রেডিও-মালিকরা উপর তলায় দুটি হস্ত এড়াইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু নিচেরতলার সাধারণ শ্রোতাদের কর্ণ আজ রেডিওতে 'মেধো-মেধো-মেধোর' কুকণ্ঠের অশ্রাব্য গান, 'গীত', 'আধুনিক গীত' (রচনাও বলিহারি!), ভাষণ প্রভৃতি শ্রবণ, ক্রমাগত শ্রবণ করিয়া ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করিতেছে! এ-বিষয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে (যুগান্তর) প্রকাশিত একটি মন্তব্যের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হইবে:—কর্তাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছে করে বর্ত্তমান গল্পদাদু নির্ম্মল ভাইয়ের কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি ছেলেদের উপযোগী কি না। গল্পদাদুর আসর থেকে স্বল্পকালের মধ্যে এক এক করে তিনজন 'বুড়ো' চলে গেছেন, তারপর ইনি এসেছেন। দাদু বুড়ো হবেন কী করে—এই যুক্তি সেখানে বুড়োদের যাওয়াটা ঠিকই ঠেকবে না। কিন্তু সব দাদুই কি গল্প বলতে পারেন এবং তাঁদের গল্প মনোহর হয়? একটু খবরতল্লাস নিয়ে দেখেশুনে একজন খাঁটি দাদু আনলে আসরের আকর্ষণ কি বাড়ে না? বর্ত্তমান দাদুকে না হয় তখন টাইপ-চরিত্র হিসাবে মোড়লমশায়ের কৃষিকথায় দেওয়া হবে। (অতি সাধু প্রস্তাব—পূর্ণ সমর্থন করি)। বর্ত্তমানের গল্পদাদুর আসর—সহজ কথায় একটি ন্যক্কারজনক 'লবণ-হীন' অনুষ্ঠান! গল্পদাদুর জ্ঞানও অসীম। তাঁহার মতে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন আলেকজাণ্ডার ও ফ্লেমিং—এবং এরা গ্রীস দেশের অধিবাসী। এই তথ্য একটি প্রশ্নের জবাবে বলা হয়। আর একটা কথা: শ্রীমতী পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে মহিলামহল, শিশু-মহল ও শ্রীভবনের শ্রী কতখানি বাড়ানো সম্ভবপর হয়েছে? যে কারণে তাঁকে ওখানে চাকরি দেওয়া, সেটা ত লেখা-পড়ার কাজ দিয়েও রক্ষা করা যেত?

আর এক নতুন ঘোষকের আবির্ভাব ঘটেছে। ইনি রুক্ষ কঠিন গলায় শ্রোতাদের অনুষ্ঠান শুনতে বলেন। —আচ্ছা, ইনি কি সেই গায়ক যাঁর গান আমরা আগে অনেকবার বেতারে শুনেছি?—(এবং যাঁহার গান আরম্ভ হইবামাত্র রেডিও বন্ধ করিয়াছি)।—

বিচিত্রানুষ্ঠান

পল্লীমঙ্গল আসর না থাকিলেও সেই পুরাতন 'পল্লী-চক্রবর্ত্তী' মোড়ল এখন কৃষিকথার পরিচালনার গুরু-দায়িত্বের জোয়াল কাঁধে লইয়াছেন। 'কৃষি-কথার' পরিচালনা কি খুবই কঠিন, তবে এই পরিচালনা যদি লাঙ্গল-টানা-গোছের কিছু হয়, তবে যোগ্য পাত্রই যোগ্য কাজের ভার পাইয়াছেন স্বীকার করিব। (কৃষি কথা পরিচালক না বলিয়া শ্রোতার সর্বক্ষেত্রে লাঙ্গল-টানা বলদী কার্য্যভার বলিলেই যথাযথ হয়!) কৃষি-কথায় শ্রীমোড়ল (স-মোসাহেব) প্রায় সর্ব্ববিধ চাষের সমস্যাই দু-চার মিনিটে অবলীলাক্রমে সমাধান করিয়া দিতেছেন। এবং এই সর্ব্ব-গুণ-জ্ঞান-বিদ্যাধর, চাষ যে কত সহজ এবং দেশের খাদ্য-সমস্যা কেমন সহজেই যে কাটান যায়, সে-বিষয় অতীব মূল্যবান সব কানুন প্রত্যহ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন কেবলমাত্র ইতর জনের হিতার্থে! আর এই মোড়লই বলিতেছেন—চাষীদের সকল উদ্যমে সকল সহায়তা দানের ব্যবস্থা সরকার বাহাদুর করিয়াছেন এবং চাষীরা ('রেডিও-চাষী নহে, ক্ষেত-চাষী)—আকস্মিক বা স্বাধীন কৃষি-কর্মচারী

দের নিকট গেলেই তাঁহারা চাষের জন্য সার, বীজ, কীট পোকা মারিবার ঔষধাদির প্রাপ্তিস্থান বাতলাইয়া দিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষের উন্নতি ও অধিক ফসল ফলাইবার পরামর্শও দিবেন (বলা বাহুল্য, কার্য্যক্ষেত্রে হাতে-কলমে নহে, আপিস ঘরে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপরে কাগজে কলমে !) । কৃষি-কথার কচকচানি এবং মাঠে রোদে-জলে চাষ করা যে এক বস্তু নহে, তাহা মোড়ল এবং রেডিও-কর্ত্তামহল বাদে নেহাৎ অ-বলদের দলও জানে !

অবাক হইয়া ভাবিতেছি ‘মোড়লের’ মত এমন এক জন (বাণীবিশারদ, নাটক রচয়িতা-কাম-নট, পল্লী-গীতিকার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী প্রচারক, মানব-মরাল উন্নয়ন প্রয়াসী ইত্যাদি ইত্যাদি), বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন বিশাল কৃষিবিদ্‌কে কেন সামান্য একটা রেডিওর কৃষি-কথার চাষে আবদ্ধ রাখিয়া এই দুঃখ-বিপদের দিনে—এমন করিয়া খাদ্য-সমস্যা সমাধানে এই মহাপণ্ডিতের কৃষি-সেবা হইতে দেশকে বঞ্চিত করা হইতেছে ? সরকারের অবিলম্ব-কর্ত্তব্য হইতেছে এই, কেবল বাণীর বরপুত্র নহে, কৃষি-লক্ষীর সেবক আদর্শপুত্র শ্রীশ্রীমোড়লকে তাঁহার “বর্ত্তমান” যোগ্য কর্মক্ষেত্র—সীমাহীন কোন এক প্রান্তরে স-মোসাহেব—কৃষি-লক্ষীর সেবায় লাঙল টানার কাজে নিযুক্ত করা। ধান, গম, আখ, পাট প্রভৃতি চাষের বিষয় মোড়লের আকাশ-সমান জ্ঞান বাস্তব-প্রয়োগের সুযোগ তাঁহার যোগ্য প্রাপ্য। আর কোন চাষ না হউক—সরিষার চাষ করিয়া চাষের কাজে নিদান পক্ষে সরিষার ফুল গাছেও তিনি দেখিতে পাইবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ‘কৃষি-কথার’ এই মোড়লরা বলেন যে :

“প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন ফসল বাড়াইতে—এবং আমরা এই আবেদন পালন করিব। চাষ আমরা করিব, কেমিক্যাল ম্যানিওর এবং ফার্টিলাইজার কম, কাজেই আমরা গোবর সার ব্যবহার করিব এবং এই গোবর আমরাই উৎপন্ন করিব !” সত্যই এক আনন্দ সংবাদ! মোড়ল এবং তাঁহার স্ত্রী মোসাহেব—এক জোড়া লাঙলও টানিতে পারিবেন !

আকাশবাণী লইয়া এত কথা বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না, রেডিওর সহিত যুক্ত বিশেষ কাহারও প্রতি আমাদের কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে। যাঁহাদের বিষয় আলোচনা করা হয়, তাঁহাদের কাহাকেও চোখে দেখি নাই এবং কাহারও কোন [illegible]ক ক্ষতি করিতেও চাহি না। রেডিও-শ্রোতাদের স্বার্থরক্ষা, সাধারণের অর্থ অপচয় বন্ধ এবং রেডিওর কল্যাণই আমাদের কাম্য।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব

গত কিছুকাল হইতে এ-রাজ্যে খাদ্যাভাব ক্রমশ তীব্রতর হইয়া মানুষের পক্ষে অসহনীয় হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ‘অধিক ফসল ফলাও, ধান-চাষের জমি বাড়াও, এক জমিতে বৎসরে তিনটি ফসলের ব্যবস্থা কর’—প্রভৃতি নানা মূল্যবান পরামর্শ, বিশেষ করিয়া সরকারী মহল হইতে প্রত্যহ ঘোষিত হইতেছে। সংবাদপত্রে, রেডিওতে চাষা-পণ্ডিতদের নানা প্রচার প্রাত্যহিক ক্রিয়া-পদ্ধতির অঙ্গ হইয়াছে। একথা নেহাৎ গাধাও বুঝে যে দেশের খাদ্যাভাব দূর করিতে হইলে দেশে যে-সব অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে তাহাতে চাষের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যদি আবাদী জমির উৎপাদন শক্তি বাড়ান যায় তাহা হইলে খাদ্য-সঙ্কটের বেশ কিছুটা সমাধান হইতে পারে। অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার সহিত সর্ব্বত্র জলসেচের যথাযথ ব্যবস্থা, ভাল জাতের বীজ এবং সারের যোগান অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহার সহিত বন্যা ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা করারও উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা ভুলিলে চলিবে না। ধানের জমি নাকি এ-রাজ্যে আর বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে, অথচ সংবাদে প্রকাশ যে—

বসিরহাট অঞ্চলের এক স্থানে প্রায় ৮০,০০০ বিঘা জমি জলে নিমজ্জিত হইয়া আছে বলিয়া সেখানে কোন প্রকার চাষ হওয়া সম্ভব নহে। অথচ চাষীদের মতে—ঐ জমি হইতে যদি জল বাহির করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ ৮০,০০০ বিঘাতে বিঘা-প্রতি প্রায় ২০ মণ করিয়া ধান উৎপন্ন হইতে পারে। এবং ইহা করিতে পারিলে বছরে প্রায় ষোল লক্ষ মণ ধান পাওয়া যাইবে !

বিদ্যাধরী এবং অন্যান্য শাখা নদীগুলি মজিয়া যাওয়ার ফলেই কৃষিযোগ্য জমিগুলির আজ এই অবস্থা। অবিলম্বে আঞ্চলিক নদীগুলির সংস্কার না করিলে ক্রমশঃ আরো বহু পরিমাণ জমি জলে ডুবিয়া যাইবেই। অথচ বহুভাবে বহুজন কর্তৃক এ-বিষয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলেও, সরকার এ-বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট আছেন বলিয়া মনে হয়। অনেকে বলিবেন নদী সংস্কার সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে জমি হইতে পাম্পের সাহায্যেও জল নিকাশন করা সম্ভব এবং একাজে ‘বৈদেশিক’ মুদ্রারও কোন দরকার হইবে না।

—কেবল মাত্র বসিরহাটেই এইরূপ আবাদযোগ্য অথচ অনাবাদী জমি বেকার পড়িয়া নাই, এই রাজ্যে এই শ্রেণীর আরও বহু জমির সন্ধান মিলিবে। বিশেষভাবে সুন্দরবনের কথা বলা যায়, বিশেষজ্ঞদের মতে, সুন্দরবনে ধানচাষের যে সুযোগ রহিয়াছে তাহা গ্রহণ করিলে সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের একটা শস্য-ভাণ্ডারে পরিণত হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্যান্য বহু অঞ্চলে কেবল কি অনেক আবাদযোগ্য জমিই পতিত থাকিয়া যাই-তেছে? দেশে যে সব জমিতে চাষবাস হইতেছে তাহারও প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ সেচের জল পাইতেছে না। ফলে এই শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে জলের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ামের মতে, এ দেশে প্রয়োজনীয় সারের শতকরা ৫০ ভাগের অভাব। অন্যান্য উন্নত দেশে কৃষিজমিতে যে হারে সার দেওয়া হয় তাহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় ভারতে জমির প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের শতকরা ৯০ ভাগেরই অভাব রহিয়াছে বলা যায়। বহু আন্দোলন সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ উৎপাদনের জন্য পর্য্যাপ্ত সংখ্যক খামার স্থাপিত হয় নাই। দেশে এখনও কীটপতঙ্গনাশক দ্রব্যের অভাবে এবং বন্যার প্রকোপে শত শত কোটি টাকার খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া যায়। হালের গরু বীজ ইত্যাদি কিনিবার জন্য এদেশের চাষীকে প্রায়ই ঋণগ্রহণ করিতে হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টের মতে কৃষকদের এখনও প্রয়োজনীয় ঋণের শতকরা ৬২ ভাগ মহাজনদের নিকট হইতে অত্যধিক সুদে গ্রহণ করিতে হয়। দেশে কৃষিজমি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। জমির এইরূপ খণ্ডতার জন্য অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র এবং ইহারা উন্নততর প্রণালীতে জমি চাষ করিতে সমর্থ হয় না। এইসব সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে দেশ বর্তমানে খাদ্যশস্য এবং তুলা, পাট ইত্যাদি শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য যে পরমুখাপেক্ষী রহিয়াছে তাহার প্রতিবিধান করা যাইবে না।—

দেশে কৃষি উন্নয়নের জন্য আজ সরকারের যে উদ্যোগ দেখা যাইতেছে বিলম্বে হইলেও, তাহা কিঞ্চিত আনন্দ-ভরসার কথা। আশা করি, চাষ এবং চাষীর সমস্যার প্রতি এই সচেতনতা 'আপিস, অফিসার মহল' রেডিও ও অজস্র বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রে প্রেস নোট ইত্যাদির প্রচারেই সমাপ্তি লাভ করিবে না।

অনেক বাস্তব-কৃষক জানাইয়াছেন যে, অদ্যকার পরীক্ষা-পাশকরা কৃষিবিদদের, দেশের শিক্ষাহীন কৃষকদের চাষ সম্পর্কে 'জ্ঞানের' উপর তেমন বিশ্বাস নাই, এমন কি, পাশকরা শিক্ষিত কৃষিবিদরা—দেশের হাজার হাজার কৃষকের সমস্যা, সুবিধা অসুবিধার কথা জানা বা সে সম্পর্কে খোঁজ রাখারও কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। এবং এই কারণেই পাশকরা কৃষিবিদদের চাষ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান—ধান, গম, পাট, আলু, ডাইল, আখ চাষের মাঠ পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না। দেশে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে যাহারা পুরুষানুক্রমে চাষী, "পাশকরা" না হইলেও—এই সব প্রকৃত 'বনেদী' চাষীদের কথাও শুনিতে হইবে। যথাযথ উৎসাহ এবং সাহায্য সহযোগিতা পাইলে আমাদের নিরক্ষর কিন্তু অভিজ্ঞ কৃষক-কুলই দেশে সোনা ফলাইতে পারিবে। কেবল 'জয় কিষাণ' ধ্বনি এবং বাণী প্রচারে—কাজের কাজ বেশী হইবে না।

বাঙ্গলার শহর ও গ্রাম

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক বাস করে গ্রামে এবং এই ৭০ জনের জীবিকা নির্ভর করে কৃষি এবং 'গৃহশিল্প' অর্থাৎ হস্ত-শিল্পের উপরেই। সাম্প্রতিক ভারত-পাক যুদ্ধের ফলে (চীনা আক্রমণের সম্ভাব্যতাও)—দেশের খাদ্যাভাবের প্রতি সকলের আতঙ্ক-দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। ঠিক এই সময় ভারতের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রয়াসে (?) মার্কিণ এবং কানা-ডিয়ান খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ হওয়ার কারণে এদেশের খাদ্যাভাব ভয়ানক এবং ভয়াবহ এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহারই চাপে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার হইতে সুরু করিয়া সাধারণ জনেরও দেশের এযাবৎ-অবহেলিত কৃষির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

এখন এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন গ্রাম এবং কৃষি উন্নতির নামে বড় বড় পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রভৃতির জন্য কোটি কোটি টাকা কেবলমাত্র অপচয়ের জন্য বরাদ্দ করিলেই সমস্যা সমাধান হইবে না। বিগত ১০।১৫ বৎসর বহু প্রকার সরকারী প্রচেষ্টা, প্রয়াস এবং অর্থব্যয় সত্ত্বেও কৃষির কোন প্রকার বিশেষ অগ্রগতি কেন হয় নাই, সর্বাগ্রে সেই কারণগুলি বাহির করিয়া, তাহার দূরীকরণের পর 'মাঠে' নামিতে হইবে অবিলম্বে। সঙ্গে সঙ্গে এমন ব্যবস্থাও করিতে হইবে, যাহাতে গ্রামের লোকেরা অন্নসংস্থানের জন্য শহরের প্রতি অযথা আকৃষ্ট না হয়। গ্রামের লোক যদি গ্রামেই রোজগারের উপায় পায়, তাহা হইলে তাহারা শহরের মোহমুক্ত হইবে,

একথা জোর করিয়া বলা যায়। এ-কাজ কি ভাবে সার্থক করা যাইবে, তাহা রাজ্য সরকার এবং বহু-ঘোষিত গ্রাম পঞ্চায়েত, বি ডি ও, সরকারী বেতনভোগী কৃষি-কর্মচারীরা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারেন। "বেশী ফলাও" ফলাও করিয়া এই বাণী প্রচার করিলেই কর্মোদ্ধার হইবে না। পতিত জমিতে ফসল ফলাইতে হইলে হাতে-কলমে তাহা দেখাইয়া দিয়া যথাযথ সেচের ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়া কাজ শুরু করিতে হইবে। কেমিক্যাল সারের অভাব, কাজেই বিকল্প সারের বিষয় কৃষকদের জ্ঞান দিতে হইবে। বছরের কোন্ সময়, কোথায়, কি ভাবে কি ফসল ফলান যাইতে পারে, সেই সব কথা রেডিওতে বাজে প্রচারের দ্বারা কোন ফসলই ফলান যাইবে না। এ বিষয় দেশের কৃষকদেরই বিবিধ সমস্যার প্রতি অবহিত করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের কৃষকরা চাষের কাজে অনভিজ্ঞ একথা বলা যায় না। তবে অবস্থার গতিকে আজ তাঁহারা প্রায় নিরুপায় তথা নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের কৃষক শ্রমশীল এবং বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক কৃষি-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও তাঁহারা অনিচ্ছুক নহে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে এই যে, হালকাল ভেদে চাষের সুবিধা, অসুবিধা, বাধা-বিপত্তির প্রতি কালেজী পাশকরা ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমাধারী তথাকথিত কৃষি-পণ্ডিত বা কৃষিবিদদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সেই সঙ্গে গ্রাম্য চাষীকুলের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতির অভাব থাকায় তাঁহাদের কৃষি বিষয়ে পঠিত বিদ্যা আপিস ঘরের আওতার বাহিরে ধান, আলু, গম, আখ, ছোলার ক্ষেতে পৌঁছায় না। আমরা একথা বলি না যে, পাশকরা কৃষিবিদদের কৃষি বিষয়ে জ্ঞানের কোন অভাব আছে—কিন্তু ঐ জ্ঞান হাতে-কলমে প্রয়োগ করিয়া গ্রাম্য কৃষকদের কৃষিবিষয়ে নব নব পদ্ধতিতে উৎসাহিত, প্রণোদিত করিবার, হয় কোন ব্যবস্থা নাই, আর না হয় এ ব্যবস্থার কোন মূল্য যথাযথ স্বীকৃত হয় নাই এখনও পর্য্যন্ত। দেশের প্রত্যেক কৃষকই বলিতেছেন যে সরকার জল, সার, উৎকৃষ্ট বীজের সঙ্গে শস্য-নষ্টকারী পোকা-মাকড় ধ্বংস করা ঔষধাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিলেই কৃষক প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যাদি উৎপাদন করিয়া বর্ত্তমান খাদ্যসমস্যার সমাধান অবশ্যই করিতে সক্ষম হইবেন। আবার বলা দরকার যে—আকাশবাণী হইতে 'কৃষি-কথা'র প্রচার, পত্র-পত্রিকাতে কৃষি-বিষয়ক অতি-পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ এবং প্রায় প্রত্যহ পথে-ঘাটে (শহর অঞ্চলে) 'ফসল বাড়াও, ফসল বাড়াও' স্লোগান প্রচারে সমস্যার কোন সুরাহা হইবে না। রেডিওতে যদি 'কৃষি-কথা' আলোচনা করিতেই হয়, তবে তাহা সর্ববিভাধর রাম-শ্যামপণ্ডিতকে দিয়া না করাইয়া গ্রাম হইতে প্রকৃত চাষীকে দিয়া করাইলে কিছু লাভের আশা করা যাইতে পারে। শিক্ষিত এবং প্রকৃত চাষীর কথা চাষী মাত্রেই বুঝিবেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ অবশ্যই করিবেন। অন্যথায়—চাষ ব্যতিরেকে আর সবই হইবে!

একবেলা 'অনাহার' (or অত্যাহার ?)

কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা ময়দানের বৃহতী সভায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল জনকে এই খাদ্যসঙ্কটের কালে সপ্তাহে একবেলা (সোমবার রাত্রে), চাউল গম প্রভৃতি আহার না করিতে, এবং অসম্ভব না হইলে, উপবাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য—এ অনুরোধ সকলেরই সানন্দ চিত্তে পালন করা কর্ত্তব্য, ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর (প্রথম) সোমবার রাত্রের উপবাস-ব্রত পালনের বিশেষ শিরোনামাযুক্ত বিচিত্র সংবাদ। কোন প্রকার পরিহাস করিবার ছলে এ কথা বলিতেছি না, কিন্তু এই রাজ্যে যখন শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জন আবাল-বৃদ্ধবনিতা সপ্তাহে অন্তত দশবেলা প্রায় উপবাস-ব্রত পালন করিতেছে নীরবে সেই সময় প্রধান ব্যক্তিদের 'একবেলা' উপবাসের সংবাদকে এমন ভীষণ প্রাধান্য দিবার কি প্রয়োজন ঘটিল বুঝিতে না পারার জন্য দুঃখিত। অবশ্য, এই প্রকার সংবাদ প্রকাশের জন্য দায়ী প্রধান-মন্ত্রী এবং রাজ্যমন্ত্রী নহেন, বিশেষ উৎসাহী সংবাদদাতা এবং সংবাদপত্রই ইহার জন্য দায়ী। আমরা এই সামান্য বিষয় লইয়া এত কথা কখনই বলিতাম না, যদি দেখিতে পাইতাম—এ রাজ্যের কত লক্ষ শিশু, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং অন্যান্য ব্যক্তি সপ্তাহে কয়বেলা আধপেটাও আহার্য পাইতেছে কি না—এই সংবাদও সংবাদপত্র মালিকরা প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিতেছেন। গত কয় সপ্তাহ কলিকাতার কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া দেখা গিয়াছে শতকরা প্রায় ৮৫ জন গ্রামবাসী সপ্তাহের অন্তত পাঁচ দিন প্রায় উপবাসী রহিয়াছে, এক কণা খাদ্যশস্য কিনিবার বা পাইবার কোন উপায়ই তাদের আজ নাই। যাঁহারা সপ্তাহের প্রতিদিন ভরপেটা আহার্য্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সপ্তাহে পুরা একদিন উপবাসও কষ্টকর নহে, কিন্তু যাহারা সপ্তাহে দুই একদিনও ভরপেট খাইতে পায় না, তাহাদের নিকট প্রধান ব্যক্তিদের 'একবেলা

উপবাস' সংবাদ পরিহাস ছাড়া আর কি মনে হইতে পারে? তবে এই সংবাদে তাহারা পরম দুঃখেও একটু হাসির খোরাক হয়ত পাইবে।

বিখ্যাত এবং সর্ব্বাধিক প্রচারিত দৈনিক—

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "ভারতে সর্ব্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক" পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পরিমাণও যে সর্ব্বাধিক হইবে, তাহাতে অবাক হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রকাশকালে তাহার স্থান নির্ব্বাচন, অর্থাৎ কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ শ্রেণীর বিজ্ঞাপন ছাপা হইবে, সে বিষয় 'সর্ব্বাধিক' বিবেচনা আশা না করিলেও, পাঠক কিছু বিবেচনা পত্রিকা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অবশ্যই আশা করিবেন, কিন্তু গত ৮ই নভেম্বর, সোমবার, আলোচ্য সর্ব্বাধিক প্রচারিত পত্রিকার "আনন্দমেলা" পৃষ্ঠায়—বালক-বালিকা এবং শিশুপাঠ্য বিবিধ বস্তুর সহিত একটি প্রায় ৮"×৩ কলম বৃহৎ একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া চমকিত হইলাম। বিজ্ঞাপনটির হেড্ লাইনও অতি বৃহৎ টাইপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা একটি "কেনপ্রহ্ গর্ভনিরোধক বটিকা'র বিজ্ঞাপন! বর্ত্তমান ক্যাম্বিনি" প্ল্যানিং-এর বিষম এবং বিস্তারিকর আন্দোলনের যুগে হয়ত কাহারও কাহারও নিকট এই প্রকার বটিকার প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে—কিন্তু একান্তভাবে কিশোর-কিশোরী এবং শিশুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট (সপ্তাহে মাত্র একদিন) পৃষ্ঠায় এই বিশেষ বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিলে কি পত্রিকার খুব বেশী আর্থিক ক্ষতি হইত? তবে হয়ত পত্রিকার মালিকের অজ্ঞাতেই এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়া থাকিতে পারে, কাজেই একা মালিককে দোষ দিব না।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। বিদেশের তত্র দৈনিক এবং সাধারণ পাঠ্য পত্র-পত্রিকাতে ঔষধ এবং কন্ট্রাসেপ্টিভ্ সম্পর্কীয় কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ আইনত নিষিদ্ধ। মেডিক্যাল জর্ণালে অবশ্য এই প্রকার বিজ্ঞাপন প্রকাশে কোন বাধা নাই। চিকিৎসকের বিনা পরামর্শে এবং প্রেসক্রিপ্সনে সাধারণ লোক যদি ইচ্ছামত ঔষধাদি ব্যবহার করে, তাহার ফল দেশের পক্ষে মারাত্মকই হয় এবং সেই কারণেই—সাধারণ পত্র-পত্রিকাতে ডাক্তারী বিষয় এবং ঔষধাদির বিজ্ঞাপন প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। সর্ব্বাধিক প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশিত গর্ভনিরোধক বটিকার বিজ্ঞাপন ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে নিশ্চয়ই পড়িয়াছে এবং তাহারা নিশ্চয়ই বাবা, মা, দাদা, দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে ইহা কি? কি উত্তর তাহারা পাইয়াছে জানি না।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসঙ্কট

এ রাজ্যের মফঃস্বল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যসঙ্কট আরও ঘোরালো হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি জেলার সংবাদ দিলাম।

হাওড়া: অভয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ শ্রীগোকুললাল সাঁতরা জানাইতেছেন, অভয়নগর অঞ্চলটি হুগলী ও হাওড়া জেলার প্রায় সংযোগস্থলে অবস্থিত। এ অঞ্চলে কোন বাজার নাই। চাল প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রীর জন্য হুগলী জেলার রঘুনাথপুর বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু আন্তঃজেলা বিধিনিষেধ চালু হওয়ায় এই অঞ্চলের জনগণ রঘুনাথপুর বাজারের সুযোগ থেকে আজ বঞ্চিত।

এ অঞ্চলে চাষের কোন জমি নাই। মোটামুটিভাবে এটি উপ-শিল্পাঞ্চল। চটকলের যন্ত্রপাতি মেরামতি ও তৈরির কারখানা এবং সাতটি ইটখোলা এই গ্রামসভার এলাকাধীন। ইটখোলাগুলি এই সময় চালু হইত এবং ১০০ হইতে ১৫০ জন মজুর প্রতি খোলায় কাজ করিত। খাদ্যাভাবে এই শিল্পোদ্যোগগুলি এখন বন্ধ। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাজিরার সংখ্যা কম। যদিও বা কিছু ছাত্র হাজির হয়, ছুটি লইয়া তাহাদের চালের সন্ধানে যাইতে হয়।

খাদ্যের মধ্যে: ২ টাকা ৫০ পয়সা কিলো দরের চিঁড়া একবেলা আর অপর বেলা ১ টাকা ১২ পয়সা কিলো দরের যবের আটার সঙ্গে ৭৫ পয়সা কিলো দরের মিষ্টি আলু মিশাইয়া জনসাধারণ (যাহারা পারেন) ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছেন। জলযোগ হিসাবে ১ টাকা ১০ পয়সা কিলো দরে মুগকলাই সিদ্ধ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। আংশিক রেশনে যে খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য।

নদীয়া: রাণাঘাট পৌরপতি শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্ব্বদলীয় প্রতিনিধিগণ রাণাঘাট মহকুমা শাসকের সহিত দেখা করিয়া রাণাঘাট মহকুমা হইতে চাল সম্পূর্ণরূপ অদৃশ্য হওয়ার কথা জানাইয়া আশু প্রতিকারের অনুরোধ করেন। মহকুমা-শাসক প্রায় এক হাজার কুইণ্টল চাল আসার কথা জানান।

চালের অভাবে শতকরা ৭০।৭৫ জন লোককে অনাহার বা অর্দ্ধাহারে থাকিতে হইতেছে। কিন্তু

সর্বাপেক্ষা বেশী দুর্গতি হইয়াছে মজুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের।

হুগলী: হুগলী জেলার চুঁচুড়া, বলাগড়, মগরা, চণ্ডীতলা প্রভৃতি থানা এলাকার গ্রামাঞ্চলে আজ চালের জন্য হাহাকার। ঐ সমস্ত এলাকার কিছু কিছু অংশ পরিভ্রমণে দেখা গেল, তথাকার অধিবাসীরা অর্দ্ধাহারে ও প্রায় অনাহারে দিন কাটাইতেছেন। খোলা বাজারে চাল নাই, আর কালোবাজারের কথা না বলাই ভাল। কারণ কালোবাজারের দরের কোন স্থিরতা নেই। যে মগরা থানা এলাকা ছিল চালের ব্যবসার অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র, সেখানেই এখন চাল বিক্রয় হইতেছে প্রতি কিলো দেড় টাকা হইতে দুই টাকা দরে। সরকারী উদ্যোগে ব্যাণ্ডেলে কিছু চাল দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অল্প। স্থানীয় জনসাধারণকে দুই কিলো চাল সংগ্রহ করিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।

হুগলী জেলার শহরাঞ্চলের শতাধিক হোটেল চাল অভাবে বন্ধ। হুগলী জেলার প্রধান সরকারী কর্মকেন্দ্র হুগলী-চুঁচুড়া শহর যেখানে মামলামোকদ্দমা করিতে বা জেলার সরকারী কার্য্যালয়ে দৈনিক প্রায় দশ হাজার লোক বাহির হইতে আসিয়া থাকেন এবং কার্যোপলক্ষ্যে প্রায় সারাটি দিনই এখানে থাকিতে বাধ্য হন আজ তাঁদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ এখানকার হোটেলে চাল বাড়ন্ত। হোটেলওয়ালারা খুলিয়া বসিয়াছেন রেস্টুরেন্ট এবং বিক্রি করিতেছেন ডিম, মাংস আর পাঁউরুটি।

হুগলী জেলার সরকারী উদ্যোগে প্রায় এক হাজার কুইণ্টল চাল গ্রামবাসীদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বণ্টন করা হইয়াছে বলিয়া সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়। এই সমস্ত চাল চোরাবাজারে বিক্রয়ের সময় পুলিশ নিজ নিজ থানা এলাকায় আটক করেন।

হুগলী জেলায় যে প্রায় সাড়ে ছ'শো ধান-ভানা হাস্কিং মেশিন আছে এবং যেগুলি প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল সেগুলি আবার পুলিশ ও সরকারী তত্ত্বাবধানে চালু হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। আরও জানা গেল যে, এই সমস্ত মেশিন চালু হইলে বাজারে চালের আমদানী হয়ত বৃদ্ধি পাইতে পারে—অবশ্য পুলিশ যদি এই সব চালের চলাচল জেলার মধ্যেও নিয়ন্ত্রণ না করেন!

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসঙ্কটের এই সময় রাজ্যসরকার আদেশ জারি করিয়াছেন যে, (১৫ই নভেম্বর হইতে) কেবলমাত্র শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে—রাজ্যের অন্য কোন এলাকায় কেহ জেলাশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে ধান-চাউলের পাইকারী ব্যবসা চালাইতে পারিবেন না। রাজ্যের কোথাও এই আদেশ অমান্য অথবা লঙ্ঘন করা হইতেছে কিংবা হইবার সম্ভাবনা আছে মনে হইলে জেলাশাসক (কিংবা ন্যূনপক্ষে থানার ছোট দারোগা) জেলার যে-কোন স্থানে মজুত ধান বা চাউল আটক করিতে পারিবেন। পরে ভারতরক্ষা আইনের বলে সেই আটক মাল যথাবিহিত দখল করিয়া সরকারী তত্ত্বাবধানে বিক্রয় করিতে আইনগত কোন বাধা থাকিবে না। অতি সময়োচিত ব্যবস্থা হইয়াছে মনে হয়।

প্রসঙ্গত একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, খুচরা ব্যবসায়ীদের (সীমিত মূলধন) পক্ষে ধান-চাউল বা অন্যান্য খাদ্যসম্ভার মজুত করিয়া বাজারে মূল্যস্ফীতি ঘটাইবার সামর্থ্য নাই বলিলেও চলে। আসলে বন্টন ব্যবস্থার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে মিল-মালিক এবং আড়তদার পাইকার খুচরা কারবারীদের নিকট হইতে মুনাফা আদায় করিয়া লয়—এবং এই কারণেই খুচরা ব্যবসায়ীকে কেনা-দামের উপর আরও কিছু না চাপাইয়া মাল বিক্রয় করা ছাড়া উপায় থাকে না এবং ইহার ফলেই সাধারণ ক্রেতাকেই অতি মুনাফার দায় বহন করিতে হয়। যাহা হউক—রাজ্য সরকারের এই নব-উদ্যম সার্থক হইলে, ক্রমে বাজারের অন্যান্য বহু ভোগ্যপণ্যের উপরেও অনুরূপ কার্য্যক্রম প্রযুক্ত হইতে কোন বাধা হয়ত থাকিবে না।

(স্বয়ংনির্ভর চাষী ছাড়া) রাজ্যের সমস্ত লোককে খাদ্যশস্য যোগানোর দায়িত্ব অতি বিশাল। রাজ্য সরকার অনুমান করেন যে, এই উদ্দেশ্যে মোট পঁচিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য দরকার। ইহার মধ্যে পনেরো লক্ষ টন রাজ্যের ফসল হইতেই তাঁহারা যোগাড় করিতে পারিবেন। বাকী দশ লক্ষ টনের জন্য কেন্দ্রই একমাত্র ভরসা। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য আশা দিয়াছেন যে, কলিকাতার জন্য তিন লক্ষ টন চাল এবং দরকার মত গম সরবরাহ করিবেন। কলিকাতার বাহিরে গমের চাহিদাও এতদিন কেন্দ্রই পূরণ করিতেন, এবার সে কথাটা উল্লেখ না করায় তাঁহাদের মতিগতি সম্পর্কে সংশয়ের কারণ আছে। যদি সত্যই সেটা না পাওয়া যায় —তবে কে আমাদের রক্ষা করিবে? পঞ্চাশ লক্ষ উদ্বাস্তু এবং চল্লিশ লক্ষ বহিরাগতকে খাদ্য সরবরাহের জন্য এই রাজ্যের উপর যে অতিরিক্ত বিষম চাপ পড়িয়াছে তাহার

উপর পাট চাষের জন্ত আট লক্ষ একর জমি ছাড়িয়া দেওয়ায় ধান চাষের যে ক্ষতি হইতেছে—এই সব কথা স্মরণে রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের জন্ত বরাদ্দ দশ লক্ষ টন অটুট রাখিবেন এই আশাই করছি।

এই বরাদ্দ কেন্দ্রের দয়ার দান নহে—পাটের কল্যাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন কেন্দ্র, কাজেই পশ্চিমবঙ্গ ইহার জন্য অবশ্যই ন্যাষ্য প্রাপ্য দাবি করিতে পারে। তাহা ছাড়া যে খাদ্য-সম্ভার কেন্দ্র এই রাজ্যকে দেন—পশ্চিমবঙ্গকে তাহার মূল্য বাবদ বহু বহু কোটি টাকা কেন্দ্রীয় তহবিলে দিতে হয়। কাজেই এ রাজ্যকে চাউল-গম যথাযথ পরিমাণে সরবরাহ করিতে কোন প্রকার কেন্দ্রীয় টাল-বাহানার প্রশ্ন উঠিতে পারে না, উঠা উচিতও নহে।

পশ্চিমবঙ্গে 'লেভি' প্রথায় ধান সংগ্রহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন—জমির মালিক চাষীর নিকট হইতে সরাসরি ধান আদায় করিবেন। যাহার যেমন জমি—সে তেমন ধান যোগাইবে সরকারকে। অর্থাৎ বেশী জমির মালিক বেশী, কম জমির মালিক কম। সরকার জমির ফলনের একটা গড়-পড়তা হিসাব করিয়াছেন—এবং বোধ হয় এই হিসাবের ভিত্তিতেই তাঁহারা 'লেভির' পরিমাণ ধার্য্য করিয়াছেন। ভাল কথা। কিন্তু ইহা বাস্তবযুক্তিসহ হইয়াছে কি না গভীর সন্দেহের বিষয়।

চাষীর উদ্বৃত্ত ধান সরকার সংগ্রহ করিবেন না—এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু "লেভি" উদ্বৃত্ত ধানের উপরই হওয়া উচিত—লেভির যেনো জল দিয়া চাষীর ঘরের অন্ন বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিলে সে বিমুখ হইবে। সেইজন্ত লেভির পরিমাণের পুনর্বিভাগ এমন ভাবে করা দরকার যে, তাহা চাষী অনায়াসেই দিতে পারে। বাড়তির হিসাব করিতে হইবে চাষীর খোরাকির ধান বাদ দিয়া। তাহার উপর এ কথাও অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র উৎ-পাদনের পরিমাণ সমান নয়—কোথাও বেশী, কোথাও কম। এমন অবস্থায় গড়পড়তা হিসাব ধরিলে যে-সকল এলাকায় উৎপাদন বেশী তাহারা অতিরিক্ত সুবিধা পাইবে, যেখানে কম সেখানে চাষী বিপদে পড়িবে। কাজেই বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া, লেভির পরিমাণ নির্দিষ্ট করাই অত্যাবশ্যক। ইহাতে ধান সংগ্রহ করাও সহজ হইবে, ফলন বাড়ানোও সম্ভব হইবে। এখন যাহা হইয়াছে তাহাতে কি সরকারের, কি চাষীর, কি জমির মালিকের, কি ক্রেতাদের কাহারও লাভ হইবে না। বরং আশঙ্কা হইতেছে শেষ পর্য্যন্ত সকলেরই ক্ষতি হইবে। সাধ করিয়া সে বিপদ কেন সরকার ডাকিয়া আনিতেছেন?

লেভি সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত খুবই দরকার বলিয়া অনেকের—বিশেষ করিয়া কৃষক সমাজের—মনে হইতেছে।

'লেভির' নিয়ম-কানুন দেখিয়া যাহা মনে হওয়া স্বাভাবিক তাহা এই যে—বোধ হয় ভাগচাষীদের কথাটা সরকারের খেয়ালে আসে নাই বা আসিলেও তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন তাহারা জমির মালিকদের সঙ্গে একটা যা-হয় বোঝাপড়া করিয়া লইবে। কিন্তু কোনও সমস্যাকে অস্বীকার করিলেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, তাহার জটিলতাও কমে না। ভাগচাষীর নিকট হইতে লেভির ধান কে আদায় করিবে এবং কি হারে? একটা জমির যদি একজন মাত্র চাষভাগী থাকে তাহা হইলে অবশ্য বিষয়টা অনেক সরল হইয়া আসে—মালিক ও ভাগচাষী মিলিয়া লেভির ধান যোগাইতে পারে। কিন্তু আবাদী জমির পরিমাণ বেশী হইলে একাধিক ভাগচাষী মিলিয়া চাষের কাজ চালায়। তাহাদের প্রত্যেকের অংশ কিভাবে স্থির হইবে? মালিকের ও ভাগচাষীর অংশ একইভাবে স্থির করিতে গেলে ভাগচাষী আপত্তি করিতে পারে, কেননা তাহার জমির পরিমাণ কম; আর মালিককে যদি নিজের ভাগ হইতে ভাগচাষীর লেভির কিছুটা দিতে হয় তবে সে চোখে অন্ধকার দেখিবে। অনেক ক্ষেত্রে তাহার সে সামর্থ্যও থাকিবে না।

লেভির ফলে চাষী যদি খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিয়াও নিজের পরিজনের অন্ন যোগাইতে না পারে তাহা হইলে চাষে তাহার উৎসাহ থাকিবে কেন? এমন অবস্থা ঘটিলে চাষী চাষ ছাড়িয়া জীবিকানির্বাহের জন্ত পথ খুঁজিতে বাধ্য হইবে। ফলে উৎপাদনের মূল ধরিয়াই টান পড়িবে—চাষের ফলনও কমিয়া যাইবে।

আশা করি রাজ্য সরকার বর্ত্তমান বিপদসঙ্কুল অবস্থা—অবিবেচনার জন্ত আরো ঘোরালো করিয়া তুলিবেন না। লেভি সম্পর্কে আর একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা দরকার—সেটি হইতেছে 'লেভি' আদায়কারী দল-অনুচরদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। কারণ, মানুষ যম অপেক্ষা যমদূতদের দ্বারাই নির্য্যাতিত হয় বেশী। এ-ক্ষেত্রে যেন ইহা না ঘটে।

খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার আন্তরিক প্রয়াস করিতেছেন—এবং এই প্রয়াসে আমাদের কর্তব্য সকল প্রকার সহযোগিতা দান করা। কিন্তু কিছু সংখ্যক বামাচারী কম্যু এবং তাহাদের সমধর্মী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কিছু লোক সরকারী প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে একটা সরকার-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করিয়া—বিক্ষোভ সঞ্চারের চেষ্টা প্রকাশ্য ভাবেই করিতেছে। নদীয়া, বসিরহাট এবং অন্যান্য কয়েকটি সীমান্ত অঞ্চলে ইহাদের তৎপরতা বিশেষ ভাবে প্রকট। দেশের এই সঙ্কটকালে 'বামাচারী'দের দেশ এবং জাতিদ্রোহিতা অবিলম্বে দমন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু রাজ্য সরকার এখনও তাহা কেন করিতেছেন না, জানি না। জনসাধারণেরও এ-বিষয় কর্তব্য অতি স্পষ্ট। 'বামাচারী' এবং অন্যান্য সম-আচারীদের দমনের একমাত্র ঔষধ তাহাদের সকল আন্দোলন, সভা-সমিতি কঠোর নির্দয় হস্তে ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

ইন্দোনেশীয়া আমাদের এ-বিষয়ে সহজ শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে। কম্যুদল ভাঙ্গিতে এবং কম্যুদের নির্বাণ-মার্গে প্রেরণ করিতে আজ ইন্দোনেশীয়রাই আমাদের পথ-প্রদর্শক হউক। ইহার বেশী কিছু বলিবার কোন প্রয়োজন আপাতত আর নাই।

কলিকাতা পৌরসভা সংশোধন বিল

উপরি-উক্ত বিলটি রাজ্য বিধান সভায় গৃহীত হওয়ার ফলে বিশেষ একদল পৌর(উপ)-পিতা এবং এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা অন্তরে বিষম বেদনা পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ এবং ইঁহাদের সশব্দ বিক্ষোভ কলিকাতার ঘোলা আবহাওয়াকে আরও ঘোলা করিয়াছে।

পৌরসভার কাজ কি? তাঁহাদের কাজ এই বিরাট মহানগরীর অধিবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা—তাহারা যাহাতে মানুষের মত বাঁচিতে পারে তাহারই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। পথঘাট তৈয়ারি ও মেরামত করা, নগরীর জঞ্জাল সাফ করা, পরিস্রুত জল সরবরাহ করা, রাস্তায় আলো দেওয়া, ইহার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই পৌরপিতার দল এই কর্তব্যের কোনটিই কি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন?

কলিকাতা পৌরসভার কপালে কলঙ্কের টিকা পরাইয়াছেন এই কর্তব্যপরায়ণ পৌরপিতারা। তাঁহারা নিজেদের কাজ উত্তমরূপে না করিয়া যদি মন্দভাবেও করিতেন তাহা হইলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাহাও করেন নাই। কর্তব্যের প্রতি নজর দেওয়া তাঁহাদের কোষ্ঠীতে লিখে বলিয়া মনে হয় না। অথচ অকাজের দিকে তাঁহাদের 'কর্তব্যবোধ' অসীম। ফলে কলিকাতা মহানগরীর সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়াছে। সত্যভাষী নিন্দুকেরা শহরের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়াছে। পৌরপিতাদের কিন্তু এখনও চৈতন্য হয় নাই—তাঁহারা এখনও অধিকারবহির্ভূত নিষ্ফল তর্ক-বিতর্ক এবং সর্বাধিক অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে, চর্চা করিতে সদাই ব্যস্ত। এই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাহা কিছু ঘটিতেছে সে সবই পৌরপিতাদের নখদর্পণে—নাই কেবল এই দুর্ভাগা শহর। তাহার মালিন্যের ছায়া কোনও দিন যদি বা দৈবাৎ তাঁহাদের মানসমুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়, তবে সেটা নিতান্তই একটা ব্যতিক্রম। কোনও ক্রমে তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিলেই তাঁহারা যেন বাঁচেন। এ নগরের পৌরপিতা হইলে কি হয়, কলিকাতাই মনে হয় তাঁহাদের চোখের বালি। অনেকের পক্ষে অবশ্য অন্যায় ভাবে টাকা উপার্জন এবং বিবিধ স্বার্থসিদ্ধির একটা মনোহর যন্ত্রও বটে এই পৌরপ্রতিষ্ঠান, অন্তত দুষ্টজন যাহাকে বলে চৌর-প্রতিষ্ঠান।

মাত্র কিছুদিন পূর্বেও পৌরসভার যে অধিবেশন হইয়াছে সেখানেও দেখা গিয়াছে পৌরপিতাদের ভারত-বর্ষ তথা বিশ্বের নানা জটিল সমস্যার মীমাংসার জন্য কি প্রচণ্ড ব্যাকুল আগ্রহ! তাঁহারা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জনাব ভুট্টোর অশালীন আচরণে ভীষণ রুষ্ট। কিন্তু নিজেদের 'পরম-শালীন' আচরণের জন্য এই পৌরপিতারা বোধ হয় গর্বিত! তাঁহাদের উষ্মা প্রকাশের জন্য পাঁচ মিনিট আনুষ্ঠানিকভাবে সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখিয়াই দিলেন। দুরাত্মা আমেরিকানদের উপরও তাঁহারা খড়্গহস্ত। মার্কিন বদান্যতার দান না লইবার জন্য তাঁহারা সরকারকে সনির্বন্ধ ও কাতর অনুরোধ জানাইয়াছেন। এমনতর আরও অনেক ব্যাপার লইয়াই তাঁহারা মাথা ঘামাইয়াছেন—এক কর্পোরেশনের কাজকর্ম ছাড়া। অধিকার নাই এমন সব ব্যাপারেই পৌরসভার মিটিং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায় কিন্তু খাস কলিকাতার নানাবিধ সমস্যাগুলির প্রতি দু-চার মিনিট সময় দান করিতেও পৌরপিতারা অক্ষম কিংবা রাজী নহেন!

এমত অবস্থায় কলিকাতার করদাতারা এবং রাজ্য

সরকার—সকলেই চাহিতেছেন যে পৌরসভা অথবা যেন সারা দুনিয়া লইয়া মাথা না ঘামাইয়া নিজেদের চরকাতেই তেল দেন। তাহাতে তাঁহাদেরও ভাল হইবে, এবং হয়ত কলিকাতার নাগরিকদেরও। ইহার ফলে গণতন্ত্রও রসাতলে যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

পৌরপিতাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রাখিবার জন্য কলিকাতার লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবন যদি বিড়ম্বনাময় হইয়া ওঠে তাহা হইলে সে অধিকার খর্ব করাই কর্তব্য। নূতন পৌরসভা বিলে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য পৌরসভার কাজকর্ম যাহাতে অল্প শান্ত পরিবেশে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক অথবা মানবিক অধিকার নয়।

তবে সবকিছু সত্ত্বেও আমাদের সন্দেহ আছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্যাদি, বর্ত্তমান পৌরপিতারা বিতাড়িত না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও ন্যায় পথে চলিবে কি না। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কথা এই যে, অদ্যকার পৌরসভা এবং পৌরপিতাগোষ্ঠীর—কর্ণধার পরমপিতা তাঁহার সুবিপুল দেহ এবং বিশাল বক্ষ দিয়া এই পৌরপিতাদের সকল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন। এই 'পরমপিতা'কে বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন এবং শকুনীর গুণাগুণ মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব অ্যামালগাম দিয়া।

এখন আমাদের অর্থাৎ করদাতাদের একমাত্র কাতর প্রার্থনা, "হে ভগবান! তুমি যদি থাক তবে কলিকাতাকে বাঁচাও কিংবা আমাদের একসঙ্গে নির্ব্বাণ দাও!"

আশ্চর্য দ্বীপের রহস্য

("সুইস্ ফ্যামিলি রবিন্‌সন্")

পরদিন ভোর হ'তেই মা সকলকে ডেকে দিলেন। সকলে তখন প্রস্তুত হয়ে নিলে। বন্দুক, কুকুর ও কিট্-ব্যাগে কিছু খাবার নিয়ে সকলে প্রাতরাশ খেয়েই বেরিয়ে পড়ল। অজানা পথে গাড়িটাকে না নিয়ে যাওয়াই ভাল, তাই গাড়ীটাকে আর নেওয়া হ'ল না।

দ্বীপের পশ্চিম দিকটাতে বনজঙ্গল বেশি নেই। অনেকটা স্থান মরুভূমির মত বালুকাময়। ছোট ছোট জঙ্গল ও কাঁটার ঝোপঝাপ—এই নিয়েই পশ্চিমাংশ। ওরা ক্রমাগত এগিয়ে চলল। স্থানে স্থানে খেজুর গাছের ঝোপও দেখতে পেলে ওরা। তিন-চার ঘণ্টা পশ্চিম-দিকে এগিয়ে গিয়ে তারা একটা বালুকাময় প্রান্তরে এসে উপস্থিত হ'ল। কয়েকটা খেজুর গাছের ঝোপের নিচে ছায়ায় বসে কিট্‌ব্যাগ খুলে তারা মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করল। মা অনেক জিনিষই দিয়েছিলেন। রুটি, মাখন, ডিম, দুধের শক্ত ক্ষীর, বাদাম, আখের রসের গাঢ় জেলী প্রভৃতি ছিল। অনেকক্ষণ হেঁটে সকলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই সেই সব খাবার খুব তৃপ্তির সঙ্গে তারা খেয়ে নিলে। এবার আধঘণ্টা বিশ্রাম করে আবার তারা সেই বালুকার উপর দিয়ে চলতে লাগল। হঠাৎ ফ্রান্সিস ও ফ্রিৎস একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—"ওটা আবার কি!"

সকলে সামনের দিকে চেয়ে দেখল বালুর মধ্যে মাথা গুঁজে একটা প্রকাণ্ড পাখি বসে আছে। বাবা তখন বললেন—"আরে! এ যে দেখছি উটপাখি! এখানে আবার উটপাখি কোথা থেকে এল!"

ফ্রিৎস বললে—আশ্চর্য ত! উটপাখি শুনেছি মরু-ভূমির দেশেই থাকে।"

বাবা বললেন—"এ দ্বীপের এ জায়গাটা ত মরুভূমির মতই। তাই হয়ত কোনরকমে উটপাখি এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।"

ফ্রান্সিস ও আর্নেষ্ট তখন উটপাখিটার কাছে গিয়ে একটা খোঁচা দিতেই সেটা উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বালুকাপ্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটল। বাবা বললেন—"উটপাখি এমনি ধরা যায় না। ফাঁদ দিয়ে ধরতে হয়।"

হঠাৎ বালুর মধ্যে যেখানে উটপাখিটা বসে ছিল, সেখানে তিনটে বড় বড় ডিম দেখা গেল। ওদের কেউ অত বড় ডিম কখনো দেখে নি। বাবা বললেন—"এ ডিমগুলো খুব টাটকা, যত্ন করে গরমে রাখলে এ ডিম থেকে বাচ্চা বেরুতে পারে।"

বাবার এই কথা শুনে ফ্রিৎস ও জ্যাক অত্যন্ত সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ডিমগুলি তুলে নিয়ে ব্যাগের মধ্যে রাখলে। তারপর উটপাখিটাকে ধরবার জন্যে একটা দড়ির ফাঁদ তৈরি করলে, তারপর খেজুর গাছের পাশে সকলে লুকিয়ে রইল।

উটপাখিটা কিন্তু বেশিদূরে যায় নি। বোধ হয় তার ডিমের জন্যে সে আবার সেখানে ফিরে এল। হাজার হোক্ সন্তান-স্নেহ ত! যদিও এখন সে-সব সন্তান ডিমের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে।

উটপাখিটা এসে বালুর গর্তের মধ্যে খানিকক্ষণ খুব

খোঁজাখুজি করল, তারপর ভিমের জন্তে সে যেন দিশাহারা হয়ে পড়ল। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে সে বোধ হয় ভাবতে লাগল—ডিমগুলো গেল কোথায়?

ঠিক সেই সময়ে বাবা দড়ির ফাঁসটা ঠিকমত ছুঁড়ে দিলেন উটপাখির পায়ে। দড়ি জড়িয়ে গেল তার দু' পায়ে। সে তখন পালাবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু পা আটকানো থাকায় মোটেই নড়তে পারল না, শুধু ছটফট্ করতে লাগল। কুকুর ছটো উটপাখির সে অবস্থা দেখে খুব ঘেউ ঘেউ করতে আরম্ভ করল। বাবা তখন আর একটা ফাঁস দিয়ে তার গলা ও ডানা শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। তারপর তার পায়ের বাঁধন খুলে দিলেন।

বাবা বললেন, "এবার বাড়ী ফেরা যাক্। বেলা অনেক হয়েছে। ফিরতেও সময় লাগবে।"

তখন উটপাখিটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে তারা টেনে নিয়ে চলল। উটপাখির তখন অবস্থা কাহিল।

বাড়ীতে ফিরতেই মা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন উটপাখি দেখে। তিনি বললেন—"এত বড় পাখি যে পৃথিবীতে আছে তা ত জানতাম না! তবে এটাকে রাখবে কোথায়?"

ফ্রান্সিস বললে—"কেন মা, আমাদের নিচে গুহায় যেখানে তেলের পিপেগুলো রয়েছে—তার পাশে একটা বড় খাঁচায়।"

—"বড় খাঁচা পাবে কোথায় তুমি?" মা হেসে কথাটা বললেন।

—"তৈরী করতে হবে আজই।" বলে ফ্রান্সিস এমন মুখের ভাব দেখালে যেন খাঁচাটা তৈরি হয়েই গেছে।

চার ভাই মিলে সারাদিন খেটে প্রকাণ্ড এক বাঁশের খাঁচা তৈরী করলে। সেই খাঁচার মধ্যে জল ও খাবার দেওয়া হল। উটপাখি কিন্তু খাঁচায় ঢুকে কিছুই খেলে না। না জল, না কোন খাবার। বাবা বললেন—"উটপাখির খাত বোধ হয় অন্ত রকম।"

তখন চার ভাই তাকে রকমারী খাদ্য দিতে লাগল আর দেখতে লাগল কোন্ খাদ্যটা উটপাখি খায়। কিন্তু উটপাখি কোনকিছুই মুখে তুলল না। এইভাবে তিনদিন কাটল। তখন বাবা সেই ডিমটে ডিম নিয়ে কিছু খড়কুটো ও বালির ওপর সাজিয়ে তার সামনে রাখলে। হঠাৎ ডিম ক'টি দেখতে পেয়ে উটপাখির মনের পরিবর্তন হ'ল। সে তখন ডিমগুলি ওঁকে ও ঠোঁট দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলে, তারপর তার উপরে সাবধানে বসে তা দিতে লাগল।

একটু পরে উটপাখির কাছে যেসব খাদ্য দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে সে বেছে নিয়ে অল্প অল্প খেতে আরম্ভ করে দিলে। জলও বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেলে। তখন সকলে নিশ্চিন্ত হ'ল এই ভেবে যে, উটপাখি আর মরবে না, এবার সে বেঁচে গেল।

কয়েকদিন পরেই উটপাখির ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুল। কি সুন্দর পাখিগুলি। কেমন লাল-লাল ঠোঁট আর ছোট্ট ডানা। তখনও চোখ ফোটে নি। তারপর দিন দুইয়েকের মধ্যেই চোখ ফুটল। উটপাখি সেই বাচ্চাদের ছেড়ে সহজে কোথাও নড়ে না। নিজের ঠোঁটে সাবাড় সাবাড় খাবার তুলে বাচ্চাদের খাওয়ায়। এইভাবে উটপাখি তার বাচ্চাদের বড় করে তুলতে লাগল।

এদিকে আর এক ঘটনা ঘটল। ওরা দেখতে পেলে সেই দ্বীপের মধ্যে এক জায়গায় কিছু ধান ও গম গেকে রয়েছে। বাবা বললেন—"আশ্চর্য হবার এতে কিছু নেই। এক সময় উড়ন্ত পাখিরা অন্ত দ্বীপ থেকে ধান ও গমের দানা বয়ে আনতে আনতে এ দ্বীপের মাটিতে ফেলে দিয়েছে অথবা গম ও ধান কোন জাহাজে যাচ্ছিল, কোনক্রমে সেই জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে পড়ে ভাসতে ভাসতে এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছে। যাক্, ধান ও গম যেকালে গেকেছে তখন ওগুলো সাবধানে নিয়ে আসাই ভাল। ওগুলো থেকে দানা বার করে যাঁতায় পিষে আমাদের খাদ্য হবে।"

মা একথা শুনে খুবই খুশী হলেন। তাঁর একটা চিন্তা সর্বদা মনে আসছিল যে ময়দা ও চাল যখন ফুরিয়ে যাবে তখন ওগুলি পাওয়া যাবে কোথা থেকে। এখন সে চিন্তা অনেকটা দূর হ'ল।

সেদিন সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। সারা আকাশ মেঘে কালো। তার সঙ্গে এলোমেলো বাতাস বইতে লাগল। বেশ একটু শীত বোধ করল সকলে। কেউ আর সে দুর্যোগে বাইরে বেরুতে চাইল না। মা সেদিন মধ্যাহ্নভোজে গরম গরম মাংসের চুমুরি ও সরেস পাখির রোষ্ট্ করেছিলেন। গোটা চারেক সরেস পাখি ফ্রিৎস বন্দুক দিয়ে সেদিন সকালে সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই শিকার করেছিল। সকলে মধ্যাহ্নভোজের সময় মায়ের হাতে চমৎকার রান্না খেয়ে খুবই খুশী। তা ছাড়া বিকালে তারা কফির সঙ্গে দু একখানা গরম কাট্‌লেটও খেতে পেলে। গুহাঘরের বারান্দায় বসে বাইরের প্রকৃতির বৃষ্টিস্নাত সৌন্দর্য দেখতে দেখতে তারা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে লাগল। ফ্রিৎস এবার তার সঙ্গে গীটার বাজাল।

বৃষ্টির জন্যে সারাদিনটা ঘরের মধ্যে আটকে থেকে তারা সকলে পরদিন বৃষ্টি থামলেই বাইরে বেরুল। তখন আর আকাশে মেঘ ছিল না। পরিষ্কার রৌদ্রে চারদিক ঝলমল করছে। ক্রিস তখন একলাই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিকারে। এবার পশ্চিম দিকে সে অনেকদূর এগিয়ে গেল। সেখানে সে অনেকগুলো বাতাবি লেবু ও সাবুদানার গাছ দেখতে পেলে। সাবুদানার জন্ম থাকে পাতার খাঁজের মধ্যে। একটু চাপ দিতেই গোলগোল ছোট্ট সাবুদানা ঝর্‌ঝর্‌ করে ঝরে পড়ল। কিছু সাবুদানা পকেটে পুরে নিয়ে ক্রিস চলল আরও এগিয়ে। বন্দুক সঙ্গে থাকলেও পাখি শিকার করবার প্রবৃত্তি তার ছিল না। তাই সে নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে পশ্চিম দিকে অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেল। এক জায়গায় দেখল অনেকগুলো ভুট্টা গাছ রয়েছে। একটা কাঁচা ভুট্টার গোল গোল ছোট দানা মুখে পুরে সে চিবুতে লাগল। ভালই লাগল খেতে। বুনো আঙুরের লতাও সে দেখতে পেলে মাঝে মাঝে। পাকা আঙুর দু'চারটে মুখে দিয়ে সে দেখল টক্-টক্ মিষ্টি-মিষ্টি। পথশ্রমের কিছুটা লাঘব হ'ল সেই বুনো আঙুর খেয়ে। ক্রিস এবার ভাবল, বাড়ী ফেরাই ভাল। দুপুর পার হয়ে গেছে। আর বেশি দূরে যাওয়া ভাল নয়। তার মনে কেবলই জাগছিল যে সে সমগ্র দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখে আসে। দ্বীপটার সবটা এখনও দেখা হয় নি কারুরই। মাত্র এক-চতুর্থাংশ দেখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

একটা জামগাছের নিচে ঘাসের উপরে পাশে বন্দুকটি রেখে ক্রিস একটু বিশ্রামের জন্য বসল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভেসে আসছিল বুনো ফুলের এক রকম মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা চমৎকার সাদা পায়রা সেই জামগাছের পাকা জামের উপর ঠোকরাচ্ছে। গাছের ডাল নড়ে যাওয়ায় কয়েকটা পাকা জাম ক্রিসের কাছেই পড়ল। ক্রিস সেগুলি খেয়ে দেখলে বেশ মিষ্ট। কিন্তু অনেকদিন পায়রার মাংস সে খায় নি। আগে একবার একটা হুইল্ হোটেলে সে পিজিয়ন্ রোষ্ট্ খেয়েছিল। তার স্বাদ এখনও যেন তার মুখে লেগে রয়েছে। সে ভাবলে, এই পায়রাটা শিকার করে সে মায়ের হাতের রান্না পিজিয়ন্ রোষ্ট্ খাবে। এই ভেবে সে বন্দুক তুলে তাক্ করে পায়রাটাকে গুলী করলে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পায়রাটা একটু সরে গেল, আর বন্দুকের গুলীটা তার বুকে না বিঁধে তার ডানার একটা কোণে লাগল। পায়রাটা ডানায় আহত হয়ে ঝুপ্ করে ক্রিসের কাছে ঘাসের উপরে পড়ে গেল। ক্রিস তাড়াতাড়ি সেই পায়রাটাকে তুলে নিলে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ল পায়রার পায়ে একটুকরো কাগজ কারোর মাথার লম্বা সোনালী চুল দিয়ে বাঁধা। একটু আশ্চর্য হয়ে সেই টুকরো কাগজটি সে সাবধানে খুলে নিয়ে পড়ে দেখলে পরিষ্কার ইংরাজি ভাষায় এক লাইন লেখা—

"যেখানে ধোঁয়া উঠছে দেখবেন সেখানে আছে এক উদ্ধারপ্রার্থিনী হতভাগিনী।"

ক্রিস লেখাটি পড়ে খুবই আশ্চর্য হ'ল। বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লেখাটি দেখতে লাগল। তা হ'লে এ দ্বীপে আর একজন মানুষ আছে এবং সে একজন স্ত্রীলোক। কিন্তু কোথায় সে আছে সেটা ত জানা যাচ্ছে না। স্থানের কোন নির্দেশ নেই, শুধু 'যেখানে ধোঁয়া উঠছে দেখবেন'—এই কথা কয়টি লেখা আছে। কিন্তু ধোঁয়া উঠবে কোথায়? আর সেই স্থানটিতে কোন্ পথে যাওয়া যাবে, এটা ক্রিস ভেবে স্থির করতে পারল না। তবে এটা বুঝল যে লেখাটি দুই-একদিনের। বেশি দিনের পুরানো নয়।

ক্রিস তখন পায়রাটিকে লক্ষ্য করে দেখল যে তার আঘাত মারাত্মক নয়, শুধু ডানার এককোণে গুলী লেগে একটু জখম হয়েছে। একটু শুশ্রূষা করে সে পায়রাটাকে আকাশে উড়িয়ে দিলে। পায়রাটি কষ্টে ডানা মেলে আকাশের যেদিকে উড়ে গেল সেটা পূব দিক।

ক্রিস ভাবলে পায়রাটির বাসস্থান যদি পূবদিকে হয়, তবে নিশ্চয়ই সেই উদ্ধারপ্রার্থিনী নারী দ্বীপের পূবদিকেই কোন এক স্থানে আছে। কিন্তু বেলা পড়ে আসছে দেখে সে আর সেদিন পূবদিকে যেতে সাহস করল না, বাড়ীর দিকেই রওনা হল।

বাড়ীতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। মা বাবা ও ভাইয়েরা তার এতক্ষণ বাইরে থাকার কথা ভেবে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এখন তাকে নিরাপদে বাড়ীতে ফিরতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করল। ক্রিস তখন তার বাবার হাতে সেই কাগজের টুকরাটি দিয়ে বললে—"আমার মনে হয় আর একজন হয়ত আমাদের মতই এই দ্বীপে আটকা পড়ে গেছে এবং সে যে একজন নারী তার সাক্ষী শুধু লেখা নয়, কাগজে জড়ানো এই দীর্ঘ সোনালী চুল।"

তখন সকলে স্থির করলে পরদিন সকালবেলাতেই সেই দ্বীপের পূবদিকে গিয়ে খোঁজ করতে হবে কোথায় ধোঁয়া উঠছে।

সকাল হতেই মা সকলের জন্তে বাদাম বাটা, কিছু ছানা, চিনি ও ডিম মিশিয়ে আগুনের অল্প আঁচে চমৎকার পুডিং তৈরী করলেন। সেই পুডিং, রুটি, কলা, মাখন ও কিছু খেজুর একটা ব্যাগে পুরে তিনি ওদের হাতে দিলেন পথে খাবার জন্তে। বাবা বললেন —"হাঁটা পথে আজ যতটা পারা যায় যাওয়া যাবে, তার পর কাল আবার বোটে চেপে দ্বীপের পূব দিকটা ভাল করে দেখে আসা যাবে।" তখন সকলে হাঁটা পথেই পূব দিকে এগিয়ে যেতে লাগল আর লক্ষ্য রাখতে লাগল কোথায় ধোঁয়ার সন্ধান পাওয়া যায়।

সারাদিন ঘোরাঘুরি করে সকলে সন্ধ্যার ঠিক আগে আবার বাড়ীতে ফিরে এল। কিছুই সন্ধান পেলে না তারা। কোথাও ধোঁয়ার চিহ্নমাত্রও দেখতে পায় নি। এ নিয়ে সন্ধ্যার পর বসবার ঘরে বসে অনেক আলোচনা হ'ল।

পরদিন আবার তারা বের হ'ল, কিন্তু এবার পায়ে হেঁটে নয়, বোটে। তাদের বোটটি দ্বীপের ধারে ধারে সমুদ্রের ঢেউ এড়িয়ে পূব দিকে এগিয়ে চলল। নূতন নূতন দৃশ্য তারা দেখল কিন্তু কোথাও ধোঁয়া দেখতে পেল না।

সারাদিন ঘোরাঘুরি করেও যখন কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না, তখন অগত্যা তারা বাড়ী ফিরে এল। মা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, এখন তাদের সকলকে নিরাপদে ফিরতে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু যখন শুনলেন সেই উদ্ধারপ্রার্থিনী মেয়েটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি, তখন তিনি ব্যাপারটাকে রহস্যময় বলেই মনে করলেন।

পরদিন ভোরবেলায় সকলের ঘুম থেকে উঠবার আগেই ক্রিস বোট নিয়ে একলাই কোথায় বেরিয়ে গেল। মা, বাবা ও ভাইয়েরা ক্রিসকে দেখতে না পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু উপায়ই বা কি? ক্রিস হয়ত তখন বোটে চেপে অনেকদূর গিয়েছে। মা ত ভেবেই সারা, ক্রিস খাবার-টাবার কিছুই নিয়ে যায় নি।

এদিকে ক্রিস বোটে চেপে প্রায় মাইল চারেক দ্বীপের পূবদিকে চক্কর দিলে। কোথাও ধোঁয়া দেখতে পেলে না। তখন একটা সরু প্রণালীর মধ্যে বোটটা ঢুকিয়ে রেখে সেইখানে তীরে নেমে পড়ল। তীরের কাছে কয়েকটা নারকেল গাছ ছিল। ক্রিস বন্দুক তাক্ করে সেই নারকেলের কাঁদির গোড়ায় গুলী করলে। দুম করে শব্দে সঙ্গেই এক কাঁদি নারকেল গাছ থেকে পড়ে গেল। তখন ক্রিস সেই নারকেল পাথরে আছড়ে আছড়ে ভেঙে শাঁস ও জল পেটভরে খেয়ে নিলে। এখান কাছেই একটা উঁচু পাথরের স্তূপ ছিল। ক্রিস চারদিক দেখবার জন্তে সেই পাথরের উঁচু ঢিবির উপর উঠল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল কিছুদূরে সমুদ্রের কূলের কাছে একটা ছোট পাহাড় থেকে ধোঁয়া উঠছে। আশ্চর্য হয়ে বারবার বিশেষ লক্ষ্য করে দেখে ক্রিস, তখনি আবার বোটে চেপে সেই ধোঁয়ার পাহাড়ের দিকে যাত্রা করল।

খুব সাবধানে বোট চালাতে লাগল সে। চারদিকে আশেপাশে ছোট-বড় পাহাড় জলের উপর অল্প মাথা তুলে রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে বোটের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। এইভাবে এগিয়ে যেতে যেতে সে সেই ধোঁয়ার পাহাড়ের কাছে এল। সেটা কূলের কাছাকাছি দ্বীপের উপরেই ছিল। ক্রিস লক্ষ্য করে দেখলে কোন্ অজ্ঞাত কারণে সেই ছোট পাহাড়টার চূড়ের কাছে একটা বড় গর্তের মধ্য থেকে ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী উঠছে। হয়ত কোন নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির শেষ স্মৃতি ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কেননা, সেই গর্তের অনেক নিচে একটা ফাটল দিয়ে আগুনের একটা ক্ষীণ শিখা বেরুতে দেখতে পেল ক্রিস।

ক্রিস সেই ধোঁয়ার পাহাড়ের পাশে একটা ছোট-খাট অরণ্য দেখতে পেলে। নানারকমের ফলগাছ সেখানে প্রচুর রয়েছে। নানা বর্ণের ও নানা গন্ধের ফুলের রাশি সেই অরণ্যসৌন্দর্যকে আরও মধুর করে তুলেছে। বনের মধ্যে যাবার সহজ পথ কিছু নেই। শুধু একটা পায়ে-চলার সরু পথ এঁকে-বেঁকে ভিতরের দিকে চলে গেছে।

ক্রিস খুব সাবধানে এগিয়ে যেতে লাগল। একটু পরেই এক অপরূপ দৃশ্য তার চোখে পড়ল। এক পরমা-সুন্দরী যুবতী পাতায়-ছাওয়া একটি ছোট কুটিরের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে। তার সোনালী চুল বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে। তার গায়ে লম্বা ঘাসের তৈরী পোশাক। হঠাৎ ক্রিসের পায়ের শব্দ পেয়ে সে ক্রিসের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর তাড়াতাড়ি কুটিরের মধ্যে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে।

ক্রিস বাইরে থেকে প্রশ্ন করলে—"তুমিই কি পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে দিয়েছিলে?"

এবার দোর খুলে যুবতী বাইরে এল, মৃদু হাসি হেসে উত্তর দিলে—"আমাকে ক্ষমা করো, দেখছি তুমি একজন

ভদ্রলোক, তুমি যে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ একথা জেনে এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

ক্রিজকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে যুবতী বললে—"আমার মত হতভাগিনী জগতে আর কেউ আছে কিনা জানি না, আমি জাহাজে আমার জন্মভূমি ইংলণ্ডে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ঝড়ে জাহাজ ডুবে যায়। আমি তখন একখণ্ড কাঠ আঁকড়ে ধরে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে এই নির্জন দ্বীপে এসে পড়ি। আমার পোশাক সমুদ্রের জলে ভিজে অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল, তখন আমি এই বনের লম্বা লম্বা ঘাস তুলে এনে তারই পোশাক তৈরী করে পরলাম। আমার খাদ্য হ'ল বনের ফল ও সমুদ্রের ছোট ছোট মাছ। মাছগুলি পাহাড়ের গর্তের মধ্যে ঢুকে আর সহজে বেরুতে পারত না। আমি সেগুলি ধরতাম ও ধোঁয়ার পাহাড়ের নিচের আগুন-শিখা থেকে কাঠ ধরিয়ে এনে সেগুলি পুড়িয়ে খেতাম। মাঝে মাঝে পাখির ডিম, কচ্ছপের ডিম এসবও জলে সেদ্ধ করে খেয়েছি। বড় বড় শুক্তি ও ঝিনুক পাত্রের মত ব্যবহার করতাম।

অন্ত কোন লোকের দেখা পাই নি। বন্য জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তে গাছের ডাল কেটে বেড়ার মত করে তার উপরে ঘাসপাতা চাপা দিয়ে লতা দিয়ে বেঁধে একখানি ছোট্ট কুটির করেছি। এই কুটিরের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্তে ছুঁচলো গাছের ডাল ও পাথর রাখলাম। কিন্ত এ পর্যন্ত কোন বন্যজন্তর উপদ্রব সহ্য করতে হয় নি আমাকে।

আমার বাবার নাম কাপ্তেন রোজ। আমার মা আমার অল্প বয়সে মারা যান। বাবা ছিলেন ভারতবর্ষের এক সৈন্যদলের অধিনায়ক। তিনি তাঁর সৈন্যদলের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরে কোন এক স্থানে যাচ্ছিলেন বলে আমাকে তিনি ইংলণ্ডে আমার খুড়োর কাছে পাঠিয়ে দিলেন অন্ত এক জাহাজে।

তারপর ঝড়ে সমুদ্রে আমাদের জাহাজ ডুবে গেল ও আমি এই দ্বীপে আশ্রয় পেলাম।

ক্রিজ প্রশ্ন করলে—"তুমি যে ইংরাজ সেটা তোমার সোনালী চুল দেখে কতকটা বুঝেছি। তোমার নামটি কি জানতে পারি কি?"

যুবতী হেসে বললে—"আমার নাম জেনি রোজ। আমি বাবার খুব আদুরে মেয়ে ছিলাম, কিন্ত আজ যে কি ভয়ানক দুরবস্থায় পড়েছি তা ত চোখে দেখতেই পারছ।"

ক্রিজ বললে—"তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে চল। আমরাও তোমার মত ঝড়ের শেষে ভাঙা জাহাজ ছেড়ে এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছি। অবশ্য তোমার চেয়ে বেশিদিন আছি আমরা এ দ্বীপে। আমার বাবা মা ও ভাইয়েরা তোমায় দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন। আমার নাম ক্রিজ, আমিই বাড়ীর বড় ছেলে।"

যুবতী হেসে বললে—"নিশ্চয়ই আমি তোমার সঙ্গে তোমার বাবা-মায়ের কাছে যাব। আজ আমি বুঝতে পারছি আমার দুর্ভাগ্যের অবসান হয়েছে। কিন্ত একটা কথা, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি এখনও কিছু খাও নি—আমার কুটিরে সামান্ত যা-কিছু খাদ্য আছে, তাতে আশা করি তোমার কোন অসুবিধা হবে না।"

সত্যই ক্রিজের খুব খিদে পেয়েছিল। এখন জেনির কাছ থেকে প্রস্তাবটা আসাতে সে তখনি রাজি হয়ে গেল। জেনি তখন সযত্নে তাকে কুটিরের মধ্যে বসিয়ে একটা বড় শুক্তির পাত্রে কিছু বাদাম, কলা ও ডিমসিদ্ধ তার সামনে রাখলে।

ক্রিজ হেসে বললে—"তোমার খাবার থেকে ভাগ নিতে আমার ইচ্ছা নেই। তুমি কি অভুক্ত থাকবে?"

জেনি বললে—"না, না, আমি অভুক্ত থাকব কেন? এই ত এত খাবার রয়েছে আমার। অবশ্য সব কিছুই বুনো খাবার। তোমারই খেতে হয়ত কষ্ট হবে।"

ক্রিজ বললে—"আমরাও ত বুনো হয়ে গেছি। কিন্ত এসব খাবার ত বুনো খাবার নয়, ইউরোপের যে-কোন প্রথম শ্রেণীর হোটেলেও বাদাম কলা ডিম লাঞ্চ ও ডিনারের সঙ্গে থাকে।"

জেনি শুধু বললে—"তা বটে।"

ক্রিজ বললে—"তুমিও খেয়ে নাও, অনেকটা পথ বোটে যেতে হবে আমাদের।"

জেনি এবার আর আপত্তি না করে একটা বড় শুক্তির পাত্রে ঐ রকম খাবার সাজিয়ে নিয়ে ক্রিজের পাশে খেতে বসল।

খেতে খেতে দু'জনে তাদের দ্বীপবাসের অভিজ্ঞতার কথা গল্প করে বলতে লাগল। খাওয়া শেষ হ'লে জেনি যাবার জন্তে প্রস্তত হ'ল। নিজের হাতেগড়া কুটিরের জন্তে তার সুন্দর নীল চোখ দু'টি অশ্রুসজল হয়ে উঠল। দুঃখের স্মৃতিও যে কত মধুর হ'তে পারে জেনি তা আজ প্রথম বুঝতে পারলে।

ক্রিজ জেনির মনের ভাব কতকটা অনুমান করে বললে—"আমি এ কুটিরের নাম দিলাম 'জেনি লজ'—এখানে আমরা প্রতি সপ্তাহে বোটে চড়ে এসে বনভোজন

করে যাব। প্রথম এখানে তোমাকে পেয়েছি, তাই এর স্মৃতিও মধুর হয়ে থাকবে আমার মনে।"

জেনি একটু অবাক হয়ে ক্লিফের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ কিছু করে হেসে ফেললে—"এ সব কথার অনেক কিছু মানে ত হ'তে পারে এটা ত জান?"

জেনির মুখের দিকে চেয়ে ক্লিফ বললে—"যা সত্যিকারের মানে, সেইটেই কোনদিন বদ্‌লাবে না।"

—"তুমি অনেক কিছু স্বপ্ন দেখতে পার, কিন্তু স্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই।"

—"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যা দেখা যায় সেটা হ'ল স্বপ্ন, আর জেগে জেগে যা দেখা যায় সেটা হ'ল বাস্তব,—এ প্রভেদটুকু দূর করে দাও না কেন জেনি।"

—"তুমি খুব তার্কিক দেখছি ত ক্লিফ।"

—"তার্কিক লোককে তুমি বুঝি পছন্দ কর না, কেমন?"

—"না, তোমার সঙ্গে যাওয়া আমার আর চলবে না। আমি আমার এই কুটীরেই থাকব। তুমি ফিরে যাও।"—এই কথা বলে জেনি মৃদু হাসতে লাগল।

—"তা হ'লে আমারও আর এ কুটীর ছেড়ে যাওয়া চলবে না। আমিও এই কুটীরে থাকব। চিরদিন—অনন্তকাল।" —এই কথা বলে ক্লিফ খুব হাসতে লাগল।

জেনি বললে—"যাও, ও সব বাজে কথা রাখো, এখন বেলা অনেক হয়ে গেছে, দেরি করে যাওয়া করা উচিত হবে না।"

ক্লিফ বললে—"'জেনি লজ' আমাদের জীবনে অমর হয়ে থাকুক, এস আমরা এবার একই বোটে ভ্রমণ করি।"

এ কৌতুক-কথার উত্তরে জেনি আর কোন কথা না বলে ছলছল চোখে একবার চারদিক দেখে নিলে। শান্ত বনভূমির উপর তখন রৌদ্রছায়ার চমৎকার লুকোচুরি খেলা চলছে। কুটীরের দ্বার ভাল ভাবে বন্ধ করে জেনি ক্লিফের সঙ্গে বোটের দিকে পা বাড়াল।

সন্ধ্যার আগেই ক্লিফ ও জেনি তাদের জাহাজের দ্বারে এসে উপস্থিত হ'ল।

বাবা মা ও ভাইয়েরা তখনি ছুটে এল সেখানে। ক্লিফের সঙ্গে জেনিকে দেখে মা এগিয়ে এসে জেনির হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন ও তখনি তাকে স্নান করিয়ে তাঁর একসেট পোশাক পরিয়ে তাকে ভোজন-টেবিলের সামনে সকলের সঙ্গে খেতে বসালেন। জেনি ত লজ্জায় জড়সড়।

খেতে খেতে ক্লিফ জেনির জীবনের সকল ঘটনা সকলকে জানাল। মাও জেনিকে তাঁদের এ দ্বীপের জীবন-প্রণালী সব বললেন। সে রাত্রি সকলেরই বেশ কৌতুকে ও আনন্দে কাটল। পরদিন সকাল হতেই মা জেনিকে সঙ্গে নিয়ে গড়শালা, তাঁদের ঘর প্রভৃতি সব কিছু দেখিয়ে আনলেন। জেনিও এসব দেখে খুবই আনন্দিত হ'ল।

জ্যাক ও ক্লিফ সকালবেলায় গোটা চারেক সরেস পাখি শিকার করে এনেছিল। মা জেনিকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে তার চমৎকার মাংস রান্না করলেন। মায়ের রান্না খাবারের পায়েস ও ডিমের পুডিং অতি অপূর্ব হয়েছিল।

একদিনেই জেনি যেন এদের খুব অন্তরঙ্গ আত্মীয় হয়ে পড়ল। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কাজও জেনি করতে লাগল। জেনির ব্যবহারে বাবা মা ও আরো সকলে খুবই সন্তুষ্ট। জেনি চমৎকার গান গাইতে পারত। ক্লিফ গীটার বাজাত আর জেনি গান গাইত। এক এক সময়ে জেনিও গীটার বাজাত। জেনি আগেই গীটার বাজানো শিখেছিল।

সবচেয়ে জেনিকে আশ্চর্য করল প্রকাণ্ড উটপাখি ও তার তিনটে বাচ্চা। বাচ্চাগুলো তখন একটু বড় হয়েছে। ছোট্ট ছোট্ট ডানা মেলে লাল ঠোঁট বাড়িয়ে তারা রুটির টুকরো জেনির হাত থেকে খেত। উটপাখিরা এক একবার ঘাড় ফিরিয়ে বাচ্চাদের খাওয়া সন্দেহের চোখে দেখত। কখন কখন ধমকের ছলে ঠোঁট দিয়ে বাচ্চাদের পিঠে ঠোকর মারত। এসব দেখতে জেনির খুব ভাল লাগত। এক এক সময় জেনি ক্লিফকে টেনে আনত উটপাখির কাণ্ড দেখতে। ক্লিফ হাসত আর জেনিকে বলত, "আমরা তোমার বিয়েতে এই উটপাখি তোমাকে উপহার দেব।"

জেনি হেসে বলত, "বিয়ের উপহারে উটপাখি পেলে পৃথিবীতে একটা আন্দোলন সুরু হয়ে যাবে। যে দেবে তাকে দিতে নয়, যে নেবে তাকেও তার দায়িত্ব নিতে হবে।"

ক্লিফ হেসে বলে—"তারপর থেকে বিয়েতে উটপাখি দেওয়া প্রচলন হয়ে যাবে। বেচারা উটপাখির দল তখন মানুষের সমাজে একটা উচ্চ স্থান অধিকার করবে।"

জেনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে—"শুধু কি তাই? উটপাখিরা তখন হয়ত মানুষকে বিয়ে করতে চাইবে।"

ক্লিফ আশ্চর্য হয়ে বলে—"মানুষকে?"

জেনি খিল খিল করে হেসে ওঠে, বলে, "হ্যাঁ, তোমারই মতন মানুষকে।"

ক্রিস কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলে—"কি! আমাকে গাঁটা?"

জেনি আবার খিলখিল করে হাসে, বলে—"ঠাট্টা বোঝবার শক্তি আছে দেখছি তোমার!"

এই সময় মা কাছে এসে বললেন—"জেনি, আজ মার্কেট থেকে গোটা তিনেক সামন্ মাছ এনেছে, কর্তা বললেন তোমাকেই সেই মাছের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করতে হবে, সেদিন তুমি হেরিং মাছের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করেছিলে, খুব ভাল হয়েছিল,—আজ সামন্ মাছের কর।"

জেনি বললে—"সব সময়ে আমার হাতের রান্না কি ভাল হবে মা?"

মা হেসে বললেন—"সেদিন ভাল লেগেছিল বলেই ত কর্তা আজ আবার বললেন।"

—"আচ্ছা, চলুন"—এই বলে জেনি মায়ের সঙ্গে উপরের শুকাঘরে চলে গেল।

দুপুর বেলায় খাবার টেবিলে সামন্ মাছের চমৎকার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে খেতে কর্তা বললেন—"এই আশ্চর্য দ্বীপের কত রহস্য এখনও আমরা জানতে পারি নি। কাল আর একবার দ্বীপের উত্তর দিকটায় ঘুরে আসব ভাবছি।"

সকলে এ কথায় খুশী হয়ে সায় দিলে। মা বললেন—"তোমরা সব ঘুরে-ফিরে দ্বীপের চারদিক দেখছ কিন্তু আমার ভাগ্যে শুধু রান্নাঘরের ভার।"

বাবা বললেন—"সত্যি কথাই বলেছ। এবার তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

গাড়ী নিয়ে যাবার ঠিক হ'ল। গাধাটাকে গাড়িতে জুতে নিয়ে সেই গাড়িতে উঠলেন বাবা, মা, জেনি ও ফ্রান্সিস্। ফ্রান্সিস গাড়ি হাঁকাতে লাগল। ক্রিস, আর্নেষ্ট ও জ্যাক্—এরা সকলে গাড়ির সঙ্গে পায়ে হেঁটেই চলল। বনভূমির পথ, কাজেই গাড়ি আস্তে আস্তে যেতে লাগল। উত্তর দিকে খানিকদূর যাবার পর হঠাৎ একটা নারকেল বনের আড়ালে একটা চমৎকার ছোট্ট পুকুর দেখতে পেল তারা। পরিষ্কার জল, সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। আর নিচেতে পাথর থাকায় জলের তলা পর্যন্ত বেশ সুন্দর ভাবে দেখা যাচ্ছে। সেই পুকুরের এক পাশেই একখানা চওড়া চেপ্টা পাথর খানিকটা গিয়ে পুকুরের জল পর্যন্ত এসেছে। সেই পাথরের পরে বসে সকলে বিশ্রাম করতে লাগল।

জেনি বললে—"এটা যেন সাঁতার কাটবার চমৎকার একটা সুইমিং পুল। এই পাথরখানায় দাঁড়িয়ে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া খুব সহজ।"

কথাটা যেন লুফে নিয়ে ক্রিস বললে—"বেশ ত এটা তা হ'লে আমাদের সাঁতার কাটবার বড় চৌবাচ্চা হ'ল। এ রকম একটা জিনিষের দরকার ছিল আমাদের। সমুদ্রের কাছে বাস করে শরীর যেন নোনা হয়ে যাচ্ছিল।"

ফ্রান্সিস বললে—"এটারও ত একটা নামকরণ করতে হবে। আমার মতে এটার নাম রাখা হোক 'সুইমিং বাথ'।"

হঠাৎ ক্রিস বললে—"দূর! শুধু সুইমিং বাথ কেন হবে, এটার নাম রাখা হোক 'জেনি সুইমিং বাথ'।"—কথাটা বলে ফেলে ক্রিস যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল। জেনি বললে—"তোমার যেমন কথার ছিরি ক্রিস—এটার নাম হোক্ 'ফাউন্টেন বাথ'।"

কথাটা সকলের পছন্দ হ'ল। ফ্রান্সিস তার খাতায় পুকুরটার একটা ম্যাপ এঁকে নিয়ে ঐ নামটাই লিখলে।

বেলা বাড়তে সকলের বেশ খিদে পেয়েছিল। একটা বড় তুমুর গাছের নিচে বসে সকলে এবার কিছু খেয়ে নিলে। মা সঙ্গে বেশি কিছু খাবার আনেন নি, শুধু কেক্ স্যাণ্ডউইচ, বাদামের শাঁস আর নারকেলের জমানো পায়েস। এই সব সকলে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে সেই গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। জেনি ও ক্রিস দু'জনে একসঙ্গে একটা সুপরিচিত গান গাইতে লাগল।

গাড়ির গাধাটা ভরপেট ঘাসজল খেয়ে বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে। বাবা বললেন—"আর না এগিয়ে এবার বাড়ী ফেরা যাক্। আবার একদিন এখানে পরে আসা যাবে।"

সকলে তখন পূর্বের মত ব্যবস্থায় বাড়ী ফিরে এল। পরদিন সকালে ক্রিসই প্রস্তাবটা করল। সেদিন বোটে চেপে জেনি লজে গিয়ে পিক্‌নিক্ করলে কেমন হয়? জেনির মনে তার পূর্ব বাসস্থান সেই লতাপাতার কুটীর-খানি দেখবার ইচ্ছা খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই প্রস্তাবে সে ক্রিসকে ধন্যবাদ দিয়ে বাবা ও মায়ের অনুমতি চাইলে। তাঁরা তখনি অনুমতি দিলেন। তখন সকলে মিলে বোটে পিকনিকের সমস্ত জিনিষপত্র গুছিয়ে তুলে নিয়ে যাত্রা করলে 'জেনি লজের' উদ্দেশে। তাদের গুহাঘর ভাল করে তালা বন্ধ করে গড়শালার গেটে চাবি দিয়ে শুধু কুকুর দুটোকে পাহারাদার রেখে তারা চলে গেল।

পথ ত বড় কম নয়, তাই দুপুরের আগে তারা পৌঁছতে পারল না জেনি লজে। জেনির কুটীরখানি ঠিক তেমনি আছে। ক'দিনে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি তার। জেনি ছুটে গিয়ে নিজের হাতে-গড়া কুটীরখানির ভিতরে ঢুকল। ফ্রিজ জেনির সঙ্গে সেই কুটীরের কোথায় কেমন ভাবে তার সাক্ষাৎলাভ ঘটেছিল সে কথা সকলকে বুঝিয়ে দিলে। কুটীরের পিছনে যে সুন্দর ছোট বনভূমি সেইখানেই পিকনিকের আয়োজন হ'ল। মা ও জেনি দুইজনে রান্নার ভার নিলে। ফ্রান্সিস ও জ্যাক যোগাড়-যন্ত্র করে দিতে লাগল। আর্নেষ্ট ও ফ্রিজ বন্দুক নিয়ে পাখি শিকারে গেল। বাবা একটা গাছের ছায়ায় বসে একটা বই পড়তে লাগলেন।

চারপাশের দৃশ্য অতি মনোরম। অদূরে পাহাড় থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে সমুদ্র-বাতাসে ধীরে ধীরে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। সমুদ্রের ঢেউগুলি কূলের ছোট ছোট পাহাড়ে লেগে ভেঙে পড়ছে আর ফেনার রাশি পাহাড়ের গায়ে লেগে যাচ্ছে। গল, সাগরচিল প্রভৃতি বড় বড় পাখী আকাশে উড়তে উড়তে মাঝে মাঝে হঠাৎ নেমে এসে সমুদ্রের দু'চারটে মাছকে ছোঁ মেরে নিয়ে আবার আকাশে উঠে যাচ্ছে। সমুদ্র-বাতাসে কেমন এক রকম উগ্র গন্ধ। আকাশের সাদা সাদা মেঘ হঠাৎ যেন দিগন্তে আবির্ভূত হয়ে তারপর সাগর ছুঁয়েই এক লাফে যেন আকাশে উঠে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ছিল। মধ্যাহ্ন-সূর্যের তীব্র কিরণে সাগরের ঢেউ যেন রূপোর ঢেউ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যেন আকাশটা একটা গোল গম্বুজের তলার ছাদ। গোল হয়ে ঝুঁকে পড়েছে নীল সাগরের বুকে। আকাশের রঙ আসমানী, কিন্তু সাগরের রঙ নীল। এই দুই রঙের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে যেন লুকোচুরি খেলা চলছিল।

রান্নার মিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। মা বললেন—"ওরে ফ্রান্সিস, চেখে দেখ দেখি মাংসটা কেমন হ'ল।"

অমনি সঙ্গে সঙ্গে জেনি বলে উঠল—"আর চেখে দেখ আমার মাংসের কিমার বড়াগুলি।"

ফ্রান্সিস ও আর্নেষ্ট এ কথা শুনেই বসে গেল ওগুলি চেখে দেখতে।

—"চমৎকার হয়েছে মা তোমার মাংসের কারি"—ফ্রান্সিস ঠোঁট চাটতে চাটতে বললে।

—"কিমার মাংসের বড়া যে এত সুস্বাদু হ'তে পারে এটা আমি ধারণাই করতে পারি নি"—আর্নেষ্ট জেনিকে বললে।

মা বললেন—"এইবার মাখন ও মশলা মাখিয়ে সরেস পাখির রোষ্ট হবে,—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুডিং পর্যন্ত হয়ে যাবে।"

এ কথা শুনে সকলে উৎসাহিত হয়ে চারদিকে একটু-আধটু ঘোরাফেরা করতে লাগল। বনের ধারে একটা আপেল গাছ ছিল। তার মধ্যে যে ক'টা আপেল একটু পেকেছিল সেগুলি ডাল থেকে ছিঁড়ে আনা হ'ল। আপেলগুলো তত মিষ্ট নয়, একটু টক্-টক্। তবুও সেগুলোর মধ্যে ওরা সকলে বেশ একটা মুখরোচক স্বাদ পেলে।

রান্না শেষ হয়ে গেলে গাছের ছায়ায় চাদর বিছিয়ে সকলে খেতে বসল। সকলে খুব পেটভরে খেলে। খাওয়ার পর সকলের চোখে পড়ল সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে বেশ একটু ঢলে পড়েছে।

বাবা বললেন—"আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না, অজানা দ্বীপ, কোথা থেকে কি ঘটবে তা কে জানে?"

তখন আবার সকলে সঙ্গে-আনা জিনিষপত্র নিয়ে বোটে গিয়ে উঠল। জেনির মনে আর একবার তার কুটীরখানি ভাল করে দেখে নেবার ইচ্ছা জাগল। সে ফ্রিজকে বললে—"চল না ফ্রিজ আমার সঙ্গে, আমি একবার আমার কুটীরখানি দেখে আসি।"

ফ্রিজ বললে—"বেশ ত, চল না, তবে বেশি দেরি করতে পারব না। দেখছ না বেলা পড়ে আসছে।"

ফ্রিজকে নিয়ে জেনি তার কুটীরে ঢুকে দেখলে কত না পূর্ব স্মৃতি জড়ানো রয়েছে সেই কুটীরের সর্বত্র। জেনির চোখে জল এল। ফ্রিজ বললে—"তোমার কাছে এ কুটীরের মাধুর্য যতখানি, আমার কাছেও তার চেয়ে কম নয়।"

—"কেন বল ত?"

—"এ কুটীরে একদিন তুমি ছিলে, তাই। এ কুটীর আমার কাছে এক অপরূপ স্বর্গ রচনা করেছে।"

এই বেদনাময় পরিস্থিতির মধ্যেও জেনির ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা দেখা দিল। সে বললে—"তোমার ব্যাপারখানা কি বল ত? হঠাৎ যে খোসামুদে হয়ে উঠলে!"

ফ্রিজ বললে—"খোসামোদ যতটা করা উচিত ছিল, তার চেয়ে অনেক কম করা হয়েছে কিন্তু।"

জেনি বললে—"নিজের বিষয়ে নিজেই বিচার করতে শিখেছ দেখছি। বাচাল লোকের ঐ ত দোষ!"

ফ্রিজ বললে—"কেন যে দোষ, তার কারণটা ত বুঝলে না।"

—"খুব বুঝেছি, আর বুঝিয়ে বলতে হবে না—" এবার খিলখিল করে হেসে ওঠে জেনি।

মা বোটের কাছ থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন—"এবার এস জেনি।"

জেনি ক্রিসকে বলে—"শুনতে পাচ্ছ মায়ের আহ্বান। এবার সুবুদ্ধি বালকের মত চল বোটে গিয়ে ওঠা যাক্।"

বোটে সকলে উঠে বসল। বোট চলল জলের কিনারা ঘেঁসে। জ্যাক ও আর্নেষ্ট দাঁড় টানতে লাগল। ক্রিস হাল ধরে বোট চালিয়ে নিয়ে গেল, আর ফ্রান্সিস ঝুঁকে পড়ে জলে হাত ডুবিয়ে দু'চারটে ছোট মাছ ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।

সন্ধ্যার আগেই ওরা সকলে তহাখরে পৌঁছল। সব ঠিক আছে,—কুকুর দুটো ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ওদের পোশাক চাটতে লাগল। মা তখনি পশুশালায় গিয়ে খানিকটা টাটকা দুধ নিয়ে এলেন। জেনি সকলের জন্যে ক'ফ তৈয়ার করতে লেগে গেল।

সন্ধ্যার পর সকলেই শয্যা গ্রহণ করল। মধ্যাহ্নের পিক্‌নিক্-ভোজটা একটু গুরুতর গোছের হওয়াতে রাত্রে শুধু কেহ আর দুধ খেয়ে সকলে রইল।

সকাল হ'তেই জেনি বাবার কাছে আবদার ধরল যে, সে সেই পাহাড়ে আটকানো ভাঙা জাহাজখানাকে একবার দেখতে যাবে। জাহাজখানা তখনো কাৎ হয়ে সেখানে আটকে ছিল। প্রায় সব দরকারী জিনিষই এরা নিয়ে এসেছিল। তখন স্থির হ'ল প্রাতরাশ খেয়েই জেনি ও ক্রিস চলে যাবে বোটে চেপে জেনিকে সেই জাহাজ দেখাতে।

প্রাতরাশ খেয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল জাহাজ দেখতে। জেনির উৎসাহ খুব বেশি, সে সারাটা পথ শুধু জাহাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেই চলছিল। কত লোক ছিল জাহাজে, কাপ্তেনের নাম কি, সেই ঝড়জলের রাত্রে তারা জাহাজ ছেড়ে যারা প্রাণের ভয়ে পালিয়েছিল তাদের কেউ বাঁচতে পেরেছিল কি না,—এই সব প্রশ্ন জেনি কেবলই ক্রিসকে করতে লাগল।

জাহাজে উঠে দুজনে চারদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। শূন্য জাহাজ, কেউ কোথাও নেই। সেই জনহীন প্রকাণ্ড ভাঙা জাহাজের মধ্যে ওদের মনে যেন কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব আসছিল। ক্রিস জেনিকে বোঝাতে লাগল জাহাজের কোন্‌খানে তারা থাকত, সেই চরম দুর্যোগের রাত্রে তারা কিভাবে কেবিনে আটকা পড়েছিল ইত্যাদি। অতবড় জাহাজ এখন একেবারে নির্জন। ক্রিস ও জেনি জাহাজের সব জায়গায় সব কেবিনে ঘুরে বেড়াল। জাহাজের খোলের মধ্যে অনেক জল জমে গিয়েছিল, সেখানে কতকগুলো ছোট-বড় সামুদ্রিক মাছ এসে আশ্রয় নিয়েছিল। হঠাৎ খোলের এক কোণে একটা চৌবাচ্চার মত জায়গায় তারা দেখতে পেলে একটা বাচ্চা অক্টোপাসকে। মাকড়সার মত অক্টোপাস দেখতে, তবে খুব বড়। জেনি বইয়ে পড়েছিল অক্টোপাসের কথা, দেখেছিল তার ছবি। এখন সেই অক্টোপাসের বাচ্চাটাকে দেখে তার কেমন যেন আতঙ্ক হ'ল। ক্রিস তাকে বোঝাল যে, ওটা থেকে ভয় পাবার এখন আর কিছু কারণ নেই, কারণ জাহাজের খোলেই ওটা তখন বাস করছে।

জেনির ইচ্ছা হ'ল একবার কাপ্তেনের কেবিনের ছাদ থেকে হেলান মাস্তলে উঠে সমুদ্রের দূর পর্যন্ত দেখে। ব্যাপার যে সোজা নয়, ক্রিস সেকথা জেনিকে বললে। কিন্তু জেনির এ কথায় অভিমান হ'ল। এমন কি আর শক্ত কাজ কাপ্তেনের কেবিনের ছাদ থেকে হেলানো মাস্তলে ওঠা? শুধু ক্রিস একটু সাহায্য করলেই কাজটা সহজ হবে। অগত্যা ক্রিস জেনিকে সাবধানে ধরে ধরে মাস্তলের কিছুটা অংশে উঠিয়ে দিলে ও নিজেও উঠল।

হঠাৎ ক্রিসের মনে হ'ল সমুদ্রের বুকে একটু দূরে যেন একটা পাল-তোলা জাহাজ যাচ্ছে। এ রকম দৃশ্য দেখতে পাবে ক্রিস বা জেনি ভাবতেই পারে নি। তখন ক্রিস তাড়াতাড়ি জাহাজের উপর থেকে একখণ্ড সাদা পালের অংশ সংগ্রহ করে সেটাকে দু'হাতে ধরে খুব নাড়তে লাগল। মনে হ'ল সে-জাহাজের লোকেরা এ ইঙ্গিত বুঝেছে।

পালতোলা জাহাজ তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল ভাঙা জাহাজের কাছে। সে জাহাজ সমুদ্রে মাছধরা সরকারী জাহাজ। তাই বড় না হলেও তাতে যে লোকজন নেহাৎ কম নেই সেটা তার ডেকে নাবিকদের দেখে জানা গেল।

মাছধরা জাহাজ পাহাড়ের খুব কাছে এল না, শুধু একটা বোটে কাপ্তেন নিজে তাঁর একজন সহকারী ও জন চারেক নাবিক নিয়ে ভাঙা জাহাজের কাছে এলেন ও সাবধানে জাহাজে উঠে এলেন। কাপ্তেন ভাঙা জাহাজের অবস্থা দেখে ত অবাক! এখানে যে এমনভাবে সেটা আটকে আছে, সেটা বাইরে থেকে জানা যে একেবারেই অসম্ভব।

জেনি ও ক্রিসের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে কাপ্তেন সব

কিছু জানতে পারলেন। কি অসহায় অবস্থায় এই নির্জন দ্বীপে তারা পড়ে রয়েছে এই কথা ভেবে কাপ্তেন বিস্মিত হলেন। হঠাৎ কথাবার্তার মধ্যে কাপ্তেন জানতে পারলেন জেনির পরিচয়। তিনি তখন জেনিকে বললেন—"আমি যে তোমার বাবা কাপ্তেন রোজকে খুব চিনি। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। কি আশ্চর্য! তুমি কাপ্তেন রোজের মেয়ে! আমার নাম কাপ্তেন স্টোন্। আমি গভর্ণমেণ্টের মালবাহী জাহাজগুলির অধ্যক্ষ।"

ক্রিস ও জেনি তখন খুব আগ্রহের সঙ্গে কাপ্তেন ও তাঁর সহকারীকে নিয়ে গেলেন তাঁদের গুহাঘরে। অন্য নাবিকেরা জাহাজের কাছে অপেক্ষা করবার আদেশ পেল। ক্রিসের বাবা ও মা সকল কথা শুনে পরম সমাদরে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন ও সব কিছু দেখালেন। তাঁরা এঁদের কাণ্ড দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন। নির্জন দ্বীপে কিভাবে ক্রিসেরা সব কিছু নিজহাতে করেছে জেনে তাঁরা বুঝলেন মানুষ অসহায় অবস্থাতেও নিজের চেষ্টায় কতখানি সফলতা লাভ করতে পারে।

স্থির হ'ল ক্রিস, জ্যাক ও কর্তা গভর্ণমেণ্টের সেই মালবাহী জাহাজে দেশে ফিরে যাবে ও সেখানকার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে আত্মীয়-স্বজনকে সব কিছু জানিয়ে আবার ফিরে আসবে এই দ্বীপে। এ দ্বীপের উপর তাদের এমনই মায়া পড়েছিল যে এ দ্বীপ ছেড়ে তারা আর কেউ স্বদেশে ফিরে যেতে চাইল না।

মা জিজ্ঞাসা করলেন জেনিকে—"তুমি তোমার দেশে ফিরে যেতে চাও জেনি? তোমার বাবার কাছে যেতে চাও?"

জেনি বললে—"আমি আমার বাবাকে এখানে আসতে বলব। চিঠি লিখে সব কথা তাঁকে জানাব। চিঠিখানা মালবাহী জাহাজে পাঠিয়ে দেব।"

মা বললেন—"তা হ'লে তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে চাও না, কেমন?" সলজ্জভাবে জেনি বললে—"হাঁ"।

মা এবার হেসে ফেলেন, বলেন—"সেটা আমি আগেই অনুমান করেছি। আমার খুবই ইচ্ছা ক্রিসের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে চিরকালের জন্য আমাদের সংসারের একজন করে রাখি এতে তোমার অমত নেই ত?"

লজ্জায় জেনির সুন্দর মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল, সে মৃদু হাসি হেসে মুখ নত করে রইল।

কাপ্তেন স্টোন বললেন—"আমিই সকল কথা জেনির বাবা কাপ্তেন রোজকে জানিয়ে দেব। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর কন্যার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন আছেন। এ খবর পেলে তিনি নিশ্চয়ই নিজে ছুটে আসবেন এই দ্বীপে।"

কর্তা, ক্রিস ও জ্যাক কাপ্তেন স্টোনের সঙ্গে মালবাহী জাহাজে আবার দেশে ফিরে গেলেন। সেখানে সম্পত্তির সমস্ত ব্যবস্থা করে আবার তাঁরা ফিরে এলেন দ্বীপে।

তাঁদের ফিরে আসবার এক সপ্তাহ পরেই খবর পেয়ে জেনির বাবা কাপ্তেন রোজ হন্তদন্ত হয়ে এলেন সেই দ্বীপে। মেয়েকে ফিরে পেয়ে তাঁর সেকি আনন্দ! অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে তিনি ক্রিসদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। ক্রিসের বাবা ও মা তাঁকে ছাড়লেন না, বিশেষ অনুরোধে তাঁকে আটকে রাখলেন কিছুদিনের জন্য সেখানে।

কয়েক দিন পরেই কাপ্তেন স্টোন তাঁর মালবাহী জাহাজ নিয়ে আবার এলেন সেই দ্বীপে। এবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন মিষ্টার ওয়েট নামে একজন ভদ্রলোক। মিঃ ওয়েট নিউ সাউথ ওয়েলস্-এ জমিজায়গা কিনে ঘর-বাড়ী করে বাস করবেন স্থির করেছিলেন কিন্তু তিনি কাপ্তেন স্টোনের কাছে এ দ্বীপের খবর পেয়ে এখানেই প্রকৃতির অবারিত অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে বাস করবার একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ও তিনটি অবিবাহিত মেয়ে নিয়ে সেই দ্বীপে এলেন।

মা বললেন—"ভালই হ'ল, একঘর ভদ্রলোক প্রতিবেশী পাওয়া গেল।"

গুহাঘরের কাছাকাছি আর একটি সুন্দর জায়গা মিঃ ওয়েট বেছে নিলেন তাঁর বাসস্থানের জন্যে। মিঃ ওয়েট আবার চাষবাসের উপযুক্ত আধুনিক যন্ত্রপাতিও আনিয়ে নিলেন।

জেনির বাবা কাপ্তেন রোজ এবার কার্য থেকে অবসর নেবেন স্থির করলেন। তাঁর স্ত্রী ছিল না, সুতরাং তাঁর একমাত্র মেয়ে জেনিকে ছেড়ে তিনি আর কোথাও যেতে চাইলেন না। মিঃ ওয়েটের সঙ্গে এলেন তাঁর বন্ধু এক অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্ত্রী ও ক'টি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েরা ত দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মহা খুশী। তাঁদেরও গুহাঘরের কাছাকাছি একটা চমৎকার জায়গা ঠিক করে দেওয়া হ'ল।

কাপ্তেন স্টোনের চেষ্টায় সেই ভাঙা জাহাজখানিকে সরিয়ে নেবার জন্য গভর্ণমেণ্ট লোকজন নিযুক্ত করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙা জাহাজখানিকে আর সেখানে দেখা গেল না।

এবার থেকে মাসের মধ্যে দু'একদিন সেই দ্বীপে গভর্ণমেণ্টের মালবাহী জাহাজ এসে থামে। দ্বীপের

অধিবাসীদের আবশ্যকীয় জিনিষপত্র দিয়ে যায়, তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করবার চেষ্টা করে সে ব্যবস্থাও হ'ল।

কিছুদিন পরে সেই দ্বীপের খবর পেয়ে সেখানে বাস করতে এলেন সস্ত্রীক এক বৃদ্ধ অধ্যাপক ও তাঁর বন্ধু এক বৃদ্ধ ধর্মযাজক। তাঁদেরও কাছাকাছি ভাল জায়গা দেওয়া হ'ল ঘরবাড়ী করবার জন্যে। তাঁরাও দ্বীপের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলেন।

দ্বীপের মধ্যে কোথাও দ্রুত যাওয়া-আসার জন্যে কয়েকটি ঘোড়াও আনা হ'ল। মাঝে মাঝে ছেলের দল ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক নিয়ে শিকারে যেত। এখন আর দ্বীপের কোন স্থানই তাদের অপরিচিত রইল না।

এবার ক্যাপ্টেন রোজের সম্মতিক্রমে ফ্রিজের সঙ্গে জেনির বিয়ে হয়ে গেল। এ বিয়েতে সকলেই খুব খুশী। সকলেই বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে ফ্রিজের মায়ের রান্নার খুব সুখ্যাতি করল।

দ্বীপের বিশাল বনভূমির একাংশের মধ্যে ছেলে-মেয়েরা সকলে মাঝে মাঝে পিকনিক করতে যেত। তা ছাড়া মাছধরা, কাউন্টেন্ বার্গে দল বেঁধে স্নান করা, জেনি সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ত ছিলই। ক্যাপ্টেন রোজ জেনি সঙ্কটকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে ফেললেন তাঁর মেয়ে জেনির এই দ্বীপে প্রথম আশ্রয়স্থল ভেবে।

আরও কয়েকটি ভাল গরু ও কুকুর আনা হ'ল দ্বীপে। ক'জন শ্রমিককেও নিযুক্ত করা হ'ল দ্বীপের মধ্যে ঘরবাড়ী করবার জন্যে, যাতে সকলেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে।

শেষে এমন হ'ল শ্রমিকেরাও তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে এল সেই দ্বীপে বাস করবার জন্যে। তারা দ্বীপের ও সমুদ্রের অনেক জিনিষ সংগ্রহ করে মালবাহী জাহাজে বিক্রী করে আসতে লাগল।

সকলে বেশ নিশ্চিন্তভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে লাগল। ছেলেমেয়েরা যদি দ্বীপের বাইরে কোথাও চাকরি করতে যায় তবুও এ দ্বীপকেই তারা তাদের নিজের দেশ বলেই মনে করবে এতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। ভবিষ্যতে হয়ত দ্বীপ আরও জনবহুল হয়ে পড়বে, কিন্তু এই দ্বীপের প্রথম অধিবাসীদের দাবি যে সর্বাগ্রে সে কথা স্বীকার করতে গভর্ণমেন্ট বোধ হয় কোন দিনই দ্বিধাবোধ করবেন না।

আশ্চর্য দ্বীপের রহস্যময় গভীর রাত্রি আরও কত সুন্দর, আরও কত মোহময়! এক একদিন গভীর রাতে জেনি শয্যা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। সমুদ্রকল্লোলের সঙ্গে বনমর্মর মিশে গিয়ে যেন এক অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করে। জেনি কান পেতে সে অপরূপ সঙ্গীত শোনে। তার মনে হয় নিষ্ঠুর মানুষ প্রকৃতিকে কেন তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করতে চায়? কেন সভ্যতার দাবে এই চিরশ্যামল অরণ্যের আর্তনাদ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে? মানুষ প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গ করে নিতে পারলে সে কতই-না সুখী হ'তে পারে! প্রকৃতির প্রতি মানুষের অবিচার অত্যাচার বুঝি জাগিয়ে তোলে প্রকৃতির বুকে একটা প্রতিশোধ নেবার প্রচ্ছন্ন আশা, তাই তার সুপ্ত রোষ মূর্ত হয়ে ওঠে ধ্বংসের নির্মমতায়, প্রতিঘাতের দুর্জয় শক্তিতে।

ফ্রিজ হঠাৎ বাইরে এসে বলে—"কি ভাবছ এখানে? এখনও ঘুমুতে যাও নি যে!"

জেনি বলে—"গভীর রাত্রির এ রহস্যময় পরিবেশে ঘুম যে আসতে চায় না ফ্রিজ।"

দ্বীপের উপকূলের পাহাড়ে অশ্রান্ত তরঙ্গের আঘাতে দূর থেকে শোনা যায় যেন জেনির কথারই প্রতিধ্বনি।

—:০:—

বাজী

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রৌঢ় ধনকুবের তাঁর পড়ার ঘরে ইতস্ততঃ পদচারণা করছেন। আজ থেকে পনের বছর আগের এক নৈশ-ভোজসভার কথা মনে পড়ছে তাঁর। সেদিনও ছিল এমনি শরতের কৃষ্ণপক্ষের রাত। এই বাড়ীতে সেদিন সমাগম হয়েছিল অনেক বুদ্ধিজীবী মানুষের। কথা হয়েছিল সংলগ্ন অসংলগ্ন নানা প্রসঙ্গ নিয়ে, সেইসূত্রে প্রাণদণ্ডের কথাও উঠেছিল। অতিথিদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত, কেউ কেউ অভিজাত সাংবাদিক। তাঁরা সকলেই প্রাণদণ্ডের অসমর্থন করলেন; যুক্তি দিয়ে উদাহরণ সহযোগে দেখালেন শাস্তি হিসেবে প্রাণদণ্ডের বিধান অচল, খ্রীষ্টান-রাষ্ট্রের আদর্শ-বিরোধী, এবং ন্যায়নীতির পরিপন্থী। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রচলন হওয়া উচিত ব'লে অনেকে মতঃপ্রকাশ করলেন।

'আপনাদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না,' গৃহকর্তা বললেন, 'যদিও আমি নিজে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দুটোর কোনটাই ভোগ করিনি, তবু দুয়েরই উদ্দেশ্য যখন অভিন্ন তখন— আমার মতে—প্রাণদণ্ড অনেক বেশি নীতিবোধ সম্পন্ন, কম দুঃসহনীয়। প্রাণদণ্ডে অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু, আর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে তিলে তিলে মৃত্যুর বিধান। কোন্ ঘাতককে আপনারা বেশি হৃদয়হীন মনে করেন—যে আপনাকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই হত্যা করে, না যে বছরের পর বছর ধ'রে বীভৎস মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে নিষ্পিষ্ট ক'রে এক সময় প্রাণটাকে আপনার দেহ থেকে বার ক'রে নেয়?'

'দু'জনেই সমান নীতিবোধ বর্জিত।' অতিথিদের একজন মন্তব্য করলেন, 'কেন না দুয়েরই উদ্দেশ্য এক,—হত্যা। রাষ্ট্র ঈশ্বর নয়, যে-জীবন সে দিতে পারে না তা নেবার অধিকার তার নেই।'

'ঠিকই।' সমর্থন করলেন একজন তরুণ অতিথি। সুন্দর সুগঠিত দেহ। পেশায় আইনজীবী। এতক্ষণ একমনে আলোচনা শুনছিলেন তিনি। বেশ কৌতুক উপভোগ করছিলেন। এবার বললেন, 'কথাটা ঠিকই বলেছেন আপনি, প্রাণদণ্ড আর যাবজ্জীবন কারাবাস দুটোই সমান অবাঞ্ছনীয়। তবু এর মধ্যে যে-কোন একটা বেছে নিতে হলে আমি দ্বিতীয়টাই বেছে নেব। একেবারে বেঁচে না থাকার চেয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকাও ভালো, তাতে মানবজীবনের সম্ভাবনাটা অন্তত একেবারে ফুরিয়ে যায় না।'

এইখানেই আলোচনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। ধনকুবেরের তখন যৌবনকাল, প্রকৃতিতে সহনশীলতার অভাব ছিল; সুতরাং নিমন্ত্রিত অতিথির প্রতি শিষ্ট সৌজন্য রক্ষা করতে পারেন নি। টেবিলে ঘুঁসি মেরে উকীল অতিথির দিকে চেয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিলেন —'মিথ্যে কথা। আমি এক লাখ টাকা বাজী রাখতে পারি—যাবজ্জীবন তো দূরের কথা, এক টানা পাঁচটা বছরও আপনি জেলে কাটাতে পারবেন না।'

নিমন্ত্রণকর্তার অশোভন উত্তেজনায় মনে মনে রুষ্ট হয়েছিলেন উকীল ভদ্রলোক। সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় কঠিন দেখাচ্ছিল তাঁর মুখ। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বাজী ধরতে রাজি হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'আমি থাকবো, পাঁচ বছর নয়, পনের বছর।'

'পনের বছর! ঠিক আছে!' তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করেছিলেন সেদিনের ধনকুবের। যার নিজস্ব ব্যাঙ্কে সেদিন ছিল লাখ লাখ টাকা। আজ মনে পড়ছে সমবেত অতিথিদের উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন তিনি— 'আপনারা সব শুনলেন, আমি লাখ টাকা বাজী ধরলাম।'

'অত টাকা তো আমার নেই।' উকীল বললেন— 'আমি বাজী ধরলাম আমার স্বাধীনতা।'

এমনি করেই এই ভয়ানক অথচ হাস্যকর বাজী ঠিক হয়ে গিয়েছিল। অপরিমিত অর্থপ্রাচুর্য ছিল ধনকুবেরের, কৌতুকে ফেটে পড়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন—'লাখ টাকা আমার কাছে কিছুই নয়। আপনি আবার একবার ভেবে দেখুন, এর পরে কিন্তু আর সময় পাবেন না। জীবনের তিন চারটে বছর—যৌবনের একটা অমূল্য অংশ—আপনি হারাতে যাচ্ছেন। তিন-চার

বছরই বলছি, কেননা এর চেয়ে বেশীদিন আপনি টিঁকতে পারবেন না। কেন না, বাধ্যতামূলক কারাদণ্ডের চেয়ে স্বেচ্ছাকারাবাস অনেক বেশি দুঃসহ। আপনি ইচ্ছে করলেই মুক্তি পেতে পারেন, এই চিন্তাই আপনার প্রতিটি মুহূর্তকে বিষিয়ে দেবে।

ঘরের এ'দিক থেকে ওদিকে পায়চারী করতে করতে এসব কথাই ভাবছিলেন সেদিনের ধনকুবের। নিজেকেই এখন তিনি প্রশ্ন করছেন, কেন আমি বাজী ধরতে গেলাম? কী লাভ হলো? যৌবনের বেহিসেবী মূঢ়তায় উকীল বেচারা জীবনের পনেরটা বছর হারালো, আর আমি হারালাম এক লাখ টাকা। এ থেকে কি মানুষ বুঝবে প্রাণদণ্ডের চেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভালো বা মন্দ? না—না, অর্থহীন বাজে। এই বাজীর মূলে ছিল বিত্তবান আমার ধনোন্মত্ত অসহিষ্ণুতা আর দরিদ্র উকীলের অর্থতৃষ্ণা।

পনের বছর আগের কথা, তবু অনায়াসে আজ সবই মনে পড়ছে। তিনি স্থির করেছিলেন তাঁর বাগানের মধ্যে বাড়ীর একটা প্রান্ত বর্দ্ধিত ক'রে যে অংশ তৈরী হয়েছে তাতেই কড়া পাহারা বসিয়ে উকীলের বন্দীজীবন শুরু হবে। উকীল রাজী। ঠিক হ'ল, ঐ সময়ের মধ্যে বন্দী চৌকাঠের এদিকে আসতে পারবেন না। রাজী। মানুষের মুখ দেখতে পাবেন না, মানুষের গলা শুনতে পাবেন না। বেশ, রাজী। না পাবেন বাইরের চিঠি, না খবরের কাগজ। তা-ও রাজী। তবে উকীল ভদ্রলোক যদি চান একটি বাদ্যযন্ত্র—ধরুন পিয়ানো কাছে রাখতে পারেন, ইচ্ছে করলে বই পড়তে পারেন, চিঠি লিখতেও পারেন; মদ ও ধূমপানে আপত্তি থাকল না।

চুক্তি অনুযায়ী একটা খুপরি জানলা বিশেষভাবে তৈরী করানো হ'ল যাতে প্রয়োজন হলে বন্দী নীরবে কোন সঙ্কেত করতে পারেন। ঐ জানলা দিয়ে একটি চিরকুট ফেলে দিলেই তিনি ইচ্ছেমত বইপত্তর, গানের স্বরলিপি বা মদ যখন যা দরকার পাবেন। চুক্তিতে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ সর্ত দেওয়া হ'ল যার ফলে কারাবাস হবে সম্পূর্ণ নির্জনবাস এবং উকীল ভদ্রলোককে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর বারোটা থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর বারোটা পর্যন্ত ঠিক পনের বছর সেখানে থাকতে হবে। ধনকুবের আরও চুক্তি করে নিলেন, মুক্তিলোভে সর্তগুলি বা তার কোন একটা সামান্য লঙ্ঘন করলে, এমন কি তা যদি সময় পূর্ণ হবার দুমিনিট আগেও হয়, তিনি বাজীর টাকা না দিতেও পারেন।

তাতেও রাজী হয়ে উকীল ভদ্রলোক নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

ছোট ছোট চিঠি থেকে যতটুকু বোঝা যায়, নির্জনবাসের প্রথম বছর ভয়ঙ্কর নির্জনতা ও দুঃসহ একঘেয়েমি ভোগ করেছেন তিনি। অবিরাম পিয়ানো বাজাতেন, উদ্দাম শব্দ শোনা যেত তার। মদ ও ধূমপান বর্জন করেছিলেন তিনি। ছোট্ট একটি চিরকুটে লিখেছিলেন, 'মদ বাসনা উদ্রেক করে, আর বাসনাই কারাগৃহীর সবচেয়ে বড় শত্রু। তা ছাড়া ভাল মদ একা একা পান করার মত বিড়ম্বনা আর নেই।' তিনি আরও লিখেছিলেন, তামাকের ধোঁয়ায় তার কক্ষের আবহাওয়া দূষিত হয়। সারা বছর তিনি প্রেমের উপন্যাস, খুনজখমের গল্প, হুরীপরীর কাহিনী, হাসির নাটক প্রভৃতি হাল্কা ধরনের বই চেয়ে পাঠিয়েছেন।

দ্বিতীয় বছর কিন্তু আর পিয়ানো শোনা গেল না। তিনি শুধু ক্লাসিক গ্রন্থ পড়েছেন। পঞ্চম বছরে আবার সুর এল, আবার মদের জন্য তাগাদা। যারা তাকে পর্যবেক্ষণ করেছে তারা দেখেছে ঐ বছর তিনি শুধু খেয়েছেন, আকণ্ঠ মদ্যপান করেছেন এবং শুয়ে থেকেছেন বহু ব্যবহারে জীর্ণ বিবর্ণ বিছানায়। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আপন মনে কি সব বলতেন। বই পড়তেন না। কোন কোন দিন রাত্রিতে হয় পিয়ানো বাজাতেন, নয় বসে বসে লিখতেন। অনেকক্ষণ বসে লিখতেন, অনেক রাত পর্যন্ত লিখতেন; সকালেই আবার তা ছিঁড়ে ফেলতেন। একাধিকবার তাকে কাঁদতে শোনা গেছে।

ষষ্ঠ বৎসরের শেষার্দ্ধে একাগ্রতার সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করতে লাগলেন তিনি। পড়তে লাগলেন দর্শন আর ইতিহাস। এমন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে এই সময় তিনি বই পড়ে শেষ করতেন যে যোগান দিয়ে ওঠা শক্ত হয়ে পড়েছিল। ধনকুবেরের মনে পড়ল চার বছরের মধ্যে ছ'শ বই কেনা হয়েছিল। সেই সময় তিনি বন্দীশালা থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন—'প্রিয় মহাশয়, আমি ছ'টা ভাষায় এ চিঠি লিখছি; ভাষাবিদদের দেখাবেন, তাঁরা পড়ে দেবেন। এতে তাঁরা যদি একটাও ভুল না পান তবে অনুগ্রহ ক'রে বাগানে একটা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করবার ব্যবস্থা করবেন। সেই আওয়াজে আমি বুঝতে পারব আমার অনুশীলন ব্যর্থ হয় নি। সর্ব-কালের সর্বদেশের প্রতিভা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তাদের মধ্যে জ্বলে যে আগুন তা অভিন্ন। আমি সে ভাষা বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি প্রতিভার

উত্তাপ। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে আপনি যদি জানতেন!'

বন্দীর বাসনা পূর্ণ হ'ল। বাগানে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হ'ল।

দশ বছর কেটে গেল। উকীল ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে পঁয়ত্রিশ। চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার। মাথা ভর্তি অবিন্যস্ত চুল, কাঁধের ওপর নেমেছে; মুখময় চাপ-চাপ রুক্ষ দাড়ি গোঁফ। তপস্বীর মত টেবিলের সামনে অনড় হয়ে বসে থাকেন আর বাইবেল পড়েন। ব্যাঙ্ক-মালিক অবাক হয়ে ভাবতেন যে লোকটা চার বছরে ছ'শ' সুবৃহৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ শেষ করেছে, সে একটা বই পড়ছে এক বছর ধরে—তা-ও বাইবেল এমন কিছু মোটাও নয়, দুর্বোধ্যও নয়। বাইবেল ছেড়ে বন্দী ধরেছিলেন ধর্মের ইতিহাস আর ধর্মতত্ত্ব।

শেষ দু'বছর বন্দী অনেক বই পড়লেন, কিন্তু এলোমেলোভাবে। এই প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়ছেন, এই আবার বায়রণ সেক্সপীয়র। একই চিঠিতে একই সময়ে তিনি চেয়ে পাঠাতেন রসায়ন—,চিকিৎসাশাস্ত্র, উপন্যাস, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বই। তিনি পড়তেন, যেন জাহাজ-ডুবিতে সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তি প্রাণপণে সাঁতার দিচ্ছে জাহাজের ভাসমান ভগ্নাংশের মধ্যে।

(দুই)

সব একে একে মনে পড়ল ব্যাঙ্ক-মালিকের। তিনি ভাবলেন, কাল বেলা বারোটায় বন্দী মুক্তি পাবে। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী তাকে প্রচুর অর্থ দিতে হবে। ওর অনেক হবে, আমি পথে বসব। পনের বছর আগে ধনকুবেরের অর্থাগমের হিসেব ছিল না, ঐশ্বর্যের স্তূপের ওপর বসে থাকতেন তিনি। কিন্তু আজ তার সম্পদের চেয়ে ধারই বুঝি বেশী। ফটকাবাজার আর চরিত্রগত বেপরোয়াভাব—যা থেকে এই বৃদ্ধ বয়সেও মুক্তি পান নি তিনি—তার ব্যবসায় পতন ঘটিয়েছে। একদা নির্ভয় আত্মবিশ্বাসী গৌরবান্বিত ব্যবসায়ী বাজারের উত্থান-পতনের দোলায় দুলে সাধারণের স্তরে নেমে এসেছেন।

'অভিশপ্ত বাজী!' হতাশায় নিজের মাথাটা চেপে ধরে আক্ষেপোক্তি করলেন বৃদ্ধ। 'মানুষটা মরল না কেন? মাত্র চল্লিশ বছর বয়স ওর। ও আমার সর্বস্ব নেবে, আনন্দ করবে, জীবনটা উপভোগ করবে, ফটকা বাজারে বাজী ধরবে; আর আমি নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হয়ে বেঁচে থাকব, চেয়ে চেয়ে দেখব ঈর্ষাকাতর ভিক্ষুকের মত। আর একই কথা হয়ত ও আমাকে রোজই বলবে—আপনার জন্যেই আমার এই সুখস্বাচ্ছন্দ্য। না, এ হতে পারে না। ও যদি মরে আমি বাঁচি—দেউলেপনা আর অগৌরবের হাত থেকে।'

ঘড়িতে তিনটে বাজল। বৃদ্ধ কান পেতে আছেন। বাড়ীর সবাই ঘুমুচ্ছে। জানলার বাইরে গাছের পাতার মর্মরধ্বনি শোনা যায়। অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে সিন্দুক থেকে চাবি বার করলেন তিনি। পনের বছর এ চাবি ব্যবহার করা হয় নি।

ওভারকোট গায়ে দিয়ে বেরুলেন তিনি। বাগানে অন্ধকার, ঠাণ্ডা বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে স্যাঁতস্যাঁতে দমচাপা-হাওয়া বাগানের মধ্যে উত্তাল হয়ে বেড়াচ্ছে, গাছগুলো দুলছে অবিরাম। অনেক চেষ্টা করেও বাগানের শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলো বা বাড়ী কিছুই দেখতে পেলেন না তিনি। আন্দাজে এগিয়ে পাহারাওয়ালাকে ডাকলেন দুবার। সাড়া নেই। নিশ্চয়ই এই বিশ্রী আবহাওয়ায় কোথাও আশ্রয় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

যদি সাহস ক'রে কাজটা করতে পারি, বৃদ্ধ ভাবলেন—তা হলে সন্দেহটা গিয়ে পড়বে পাহারাওয়ালার ওপর। অন্ধকারে পায়ে হাতড়ে সিঁড়ি খুঁজে দরজা দিয়ে বড় হলঘরটায় ঢুকলেন তিনি। তারপর একটা সরু চাপা বারান্দায় ঢুকে দেশলাই জাললেন। কেউ কোথাও নেই। একটা বিছানা পড়ে রয়েছে—পাহারাওয়ালার বিছানা, কোণে পড়ে রয়েছে একটা স্টোভ। দেশলাইয়ের জলন্ত কাঠিটা এগিয়ে ধরে দেখলেন বন্দীর ঘরের দরজায় তালা সীল করা আছে।

দপ্ ক'রে কাঠিটা নিভে গেল। আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন বৃদ্ধ। ছোট জানলাটা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলেন বন্দীর ঘরে বাতি জ্বলছে।

স্বেচ্ছাবন্দী উকীল ভদ্রলোক টেবিলে বসে আছেন, শুধু আলোয় তার পিঠ মাথা চুল আর হাত দু'খানা শুধু দেখা যাচ্ছে। খোলা বই ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে টেবিলে-চেয়ারে, অনেকগুলো আবার মেঝের পাতা কার্পেটের ওপরে।

পনের বছর বন্দী জীবনে নিশ্চল বসে থাকা অভ্যেস হয়ে গেছে, সুতরাং পাঁচ মিনিটের মধ্যে একবারও তিনি একটু নড়লেন না। বৃদ্ধ আঙুলের টোকা দিলেন দরজায়, কোন চাঞ্চল্যের রেখা ফুটলো না বন্দীর দেহে। সতর্কতার সঙ্গে সীল ভাঙলেন বৃদ্ধ, তালায় চাবি লাগালেন, অমনি তালার গর্তে একটা বিশ্রী কর্কশ

শেষ হ'ল, দরজা খুলে গেল। বৃদ্ধ ভেবেছিলেন হয়ত খুনি লোকটা চমকে উঠে চীৎকার করবে, উঠে দৌড়ে আসবে। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট হয়ে গেল, কিন্তু কিছুই হ'ল না। ঘরে ঢুকলেন তিনি।

টেবিলের সামনে বসে আছেন বন্দী। টান টান চামড়ায় মোড়া যেন একটি জীবন্ত কঙ্কাল। স্ত্রীলোকের মতো কোঁকড়া চুল, অযত্ন বর্ধিত দাড়ি। মুখের রং হলদে, একটু মেটে মেটে। ভগ্ন চিবুক, অপ্রশস্ত দীর্ঘ পিঠ। চুলভর্তি মাথাটার ভর রেখেছেন দু'টি চর্মসার হাতের ওপর। চুলে পাক ধরেছে। তার অকালবার্ধক্য-জনিত কড়িখচা মুখের দিকে চাইলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না বয়স ওঁর মাত্র চল্লিশ বছর। বৃদ্ধ দেখলেন, ঝুঁকে পড়া মাথার সামনে টেবিলের ওপর ছোট ছোট হরফে লেখা একখণ্ড কাগজ পড়ে রয়েছে

বেচারা! বৃদ্ধ ভাবলেন, ও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে ভবিষ্যৎ স্বর্ণসম্ভাবনার। এই আধমরা অস্থিচর্মসার বস্তুটাকে বিছানার ওপর দিয়ে ফেলতে পারলেই হ'ল! তারপর বালিশ দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড মুখটা চেপে ধরলেই শেষ হয়ে যাবে। কোন পরীক্ষাতেই আর তখন অস্বাভাবিক মৃত্যুর সামান্যতম প্রমাণ পাওয়া যাবে না। যাক্‌, প্রথমে দেখা যাক কী লিখেছে ও কাগজে। কাগজখানা নিয়ে বাতির মৃদু আলোকে বৃদ্ধ পড়তে লাগলেন।

'কাল বারোটার সময় আমি মুক্তি পাবো, পাবো সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করার স্বাধীনতা। কিন্তু এই কক্ষ ছেড়ে যাবার আগে, বাইরের আকাশে সূর্য দেখার আগে আপনাকে গুটিকয়েক কথা বলা দরকার মনে করছি।' বন্দী লিখেছেন: 'নিজের বিবেক ও সর্বদর্শী ঈশ্বরের নামে আমি ঘোষণা করছি—আমি মুক্তি চাই না, জীবন চাই না, স্বাস্থ্য চাই না, বইয়ের ভাষায় যাকে পৃথিবীর আশীর্বাদ বলে তার কিছুতেই আমার বাসনা নেই।

'পনের বছর ধরে পার্থিব জীবনকে আমি সযত্নে অনুশীলন করেছি। একথা মানি, আমি না দেখেছি মাটি, না দেখেছি মানুষ। কিন্তু আপনার পাঠানো বইয়ের সাহায্যে আমি পড়েছি সকল পৃথিবী। সেই বিকল্প জগতে আমি সুগন্ধ সুরা পান করেছি, সুমধুর গান গেয়েছি, সুবর্ণ মৃগয়া করেছি, সুন্দরী নারী ভালবেসেছি। কবিদের প্রতিভার যাদুতে সৃষ্টি করা নারীরা, মনোলোভা মেঘের মত রাত্রিতে অভিসারে এসেছে সুন্দরী সর্বসহ-চারীরা, তারা আমার কানে কানে বলেছে রূপকথার গল্প; রূপে নাচে কথায় গানে আমাকে তন্ময় করেছে। গ্রন্থের জগতেই আমি আরোহণ করেছি পর্বতমালার উত্তুঙ্গ শীর্ষে, সেখান থেকে দেখেছি প্রভাতের সোনা-ঝরা সূর্যোদয়, আর সন্ধ্যার সিঁদুর-রাঙা সূর্যাস্ত। দেখেছি আকাশের মেঘ-ভাঙা বিদ্যুতের ঝলকানি, দেখেছি সবুজ বনানি, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নদী, সরোবর আর দূর শহর। শুনেছি মধুকণ্ঠ পাখীর গান, রাখালিয়া বাঁশীর সুর। শুভ্র পবিত্রতার প্রতীক রাজহংস উড়ে এসেছে, আমি তাদের কোমল পালকের সুখস্পর্শ পেয়েছি। বইয়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি অতল গহ্বর, পেয়েছি অলৌকিকতার স্বাদ। কখনও বীর বিক্রমে শহর জালিয়ে-পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দিয়েছি, নতুন ধর্মমত প্রচার করেছি, সমগ্র দেশ জয় করেছি।

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার গ্রন্থরাজি আমাকে কী না দিয়েছে। বিশ্বের যুগ যুগ সঞ্চিত বিরাট মানবচিন্তা আমার মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র আধারে স্থান পেয়েছে। আমি নিশ্চিত, আজ আর এ কথা বললে অবিনয় হবে না যে আমি আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান।

'আমি আর আপনার বই চাই না, চাই না জাগতিক সমৃদ্ধি, বৈষয়িক জ্ঞান। সবই শূন্য, ভঙ্গুর, কাল্পনিক, মরীচিকার মত প্রবঞ্চনা। আজ জেনেছি, যতই দম্ভ কর, যতই বুদ্ধিমান ও রূপবান হও না কেন, মৃত্যুতে বিলীন হতে হবে মাটির নীচের ইঁদুরছানার মত। তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার ইতিহাস, তোমার প্রতিভার অমরতা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। পৃথিবীটা হবে ধ্বংসস্তূপ।

'আপনি পাগল, ভুল পথে চলেছেন। আপনি মিথ্যেকে মনে করেছেন সত্য, অসুন্দরকে সুন্দর। হঠাৎ যদি আম আর কমলালেবুর গাছে ফলের বদলে ব্যাং আর টিকটিকি জন্মায়, যদি গোলাপ ফুলে পরিশ্রান্ত অশ্বের নিশ্বাসের গন্ধ আসে আপনি যেমন চমকে যাবেন, আমিও তেমনি চমকে যাই আপনাদের দেখে, যারা পৃথিবীর জন্য স্বর্গকে বিকিয়ে দিয়েছে। আমি শুধু কথায় নয় কাজে দেখিয়ে দেব আপনারা যা নিয়ে বেঁচে আছেন তার প্রতি আমার ঘৃণা কতখানি। একদিন যে-বাজীর টাকা আমি স্বর্গ বলে মনে করতাম আজ আর আমি তা চাই না। আপনার মর্যাদার হানি করব না, নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাব। লোকে জানবে, চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন

ক'রে আমি প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, আমি বাড়ী হেরে গেছি।'

চিঠিটা শেষ করে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন বৃদ্ধ। পালাবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না ; ঐখানেই বসে পড়লেন। অতগুলো টাকা বেঁচে যাবে, তবু আনন্দ অনুভব করতে পারলেন না। বন্দীর নিষ্ফল দেহের দিকে একবার মুখ তুলে চাইলেন। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন।

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(৪) শেষের গান।

অঘোরনাথ চক্রবর্তী :

আবদুল করিম খাঁর প্রসঙ্গ আরম্ভ করবার আগে অঘোরনাথ চক্রবর্তীর কথা এ সম্পর্কে একবার উল্লেখনীয়। কারণ অঘোরনাথেরও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গান গাইবার কথা শোনা যায়। তবে সে-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হয় নি, প্রসঙ্গটি দেওয়া হবে সংক্ষিপ্ত আকারে।

সমসাময়িক উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী অঘোরনাথের সঙ্গীতশিক্ষা, সাধনা, শিষ্যকরণ ইত্যাদি বিষয় অন্যত্র সবিস্তারে দেওয়া হয়েছে। পুনরুল্লেখ বাহুল্য। এখানে তাঁর জীবনের একেবারে শেষ পর্বের কথা মাত্র আলোচনা করা হবে, মৃত্যু প্রসঙ্গের ভূমিকা স্বরূপ।

বাংলা দেশের বাইরে, যুক্তপ্রদেশে, এমন কি সুদূর বোম্বাই অঞ্চলেও সেকালে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মানের আসন ছিল। জীবনের শেষ দিকে বেশ কয়েক বছর সেজন্যে তিনি বাস করেন পশ্চিমাঞ্চলে। মাঝে মাঝে বাংলায় আসতেন, স্বগ্রাম রাজপুরে কিছুদিন বাস ক'রে যেতেন, কলকাতার নানা আসরে গুণমুগ্ধ উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষকদের আমন্ত্রণে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তারপর পুনরায় বাস করতে যেতেন পশ্চিমে। এমনিভাবে শেষের প্রায় ৯।১০ বছর চলেছিল। তার মধ্যে পশ্চিম প্রবাসের বেশির ভাগ দিন থাকতেন তাঁর প্রিয় তীর্থস্থল বারাণসীতে। এখানেও তাঁর ধনী গুণগ্রাহীর অপ্রতুল ছিল না। বিশেষ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আসাম-গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া প্রভৃতি। আরো কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক তাঁর আনুকূল্য করতেন, কিন্তু উক্ত দু'জন তাঁর কাশীতে বাসস্থানেরও ব্যবস্থা ক'রে দেন তাঁদের সেখানকার গৃহের একাংশে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অবশ্য অঘোরনাথের মৃত্যুর ৫ বছর আগে পরলোকগত হন। প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া অঘোরনাথের জীবনের শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বারাণসীতে।

অঘোরনাথের কাশীবাসের প্রসঙ্গে তাঁর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী শিষ্য গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিজড়িত আছে। বারাণসীর সন্তান গোপালচন্দ্র এখানেই চক্রবর্তী মশায়ের কাছে নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ পান কয়েক বছর ধ'রে। অঘোরনাথের আর একজন শিষ্যও কাশীতে তাঁর কাছে কিছুকাল শেখেন বটে, কিন্তু তা গোপালচন্দ্রের মতন নিয়মিত নয়। তিনি হলেন অমরনাথ ভট্টাচার্য, বর্তমান বাংলার প্রবীণতম ধ্রুপদী। চক্রবর্তী মশায়ের আত্মীয় অমরনাথ ভট্টাচার্য চাকুরি জীবনে পশ্চিমাঞ্চলে বহুদিন থাকেন। তা ছাড়া, অমরনাথের শ্বশুরের পরিবারও তখন ছিলেন কাশীবাসী। সেজন্যে অমরনাথ ছুটি উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে কাশীতে আসতেন, সেসময় অঘোরনাথের কাছে শিক্ষারও সুযোগ পেতেন। অমরনাথের প্রথম জীবনে ২৪ পরগণায় স্বগ্রামে থাকবার সময় কিংবা কলকাতায় তিনি অঘোরনাথকে অনেক বেশি পেতেন, অনেক শেখবার সুযোগ পান তাই সে সময়ে।

কিন্তু অঘোরনাথ কাশীতে থাকবার সময়ে অমরনাথ আর তেমন সুযোগ পান নি, অর্থাৎ প্রথম জীবনের মতন। অমরনাথের স্বত্র যেরা রাজ্য থেকে চাকুরিতে

অবসর নিয়ে কাশীতে বাস করতে থাকেন। সেই সূত্রে কাশীতে বছরে ২।৩ বার আসতেন অমরনাথ। তখনই গুরুর কাছে যতটা সম্ভব শিখতেন।

চক্রবর্তী মশায় অমরনাথকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছেন (তিনি ছিলেন অমরনাথের পিতা গায়ক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের মামাতো ভাই), গান শিখিয়েছেন। তাই স্নেহ করতেন অমরনাথকে। কাশীতে এসে তাঁর কাছে গান শেখবার ও নেবার কথা তিনিই শিষ্যকে বলেন। কিন্তু বছরে ২।৩ বার কয়েকদিনের শিক্ষায় কত আর নেওয়া সম্ভব? অঘোরনাথের গান সংগ্রহ ত কম ছিল না। তরুণ বয়স থেকে গান শিখতে আরম্ভ করেছেন তখনকার ভারতবর্ষের ক'জন বড় বড় ওস্তাদের কাছে। আলী বখ্‌সের ধ্রুপদ, দৌলৎ খাঁর ধ্রুপদ, মুরাদ আলীর ধ্রুপদ, শ্রীজান বাঈয়ের টপ্পা আর হয়ত কিছু ধ্রুপদও, ভোলানাথ দাসের ভজন। এমনি কত সূত্রে কি বিপুল সঞ্চয় তিনি করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে আপন প্রতিভায় সংগৃহীত এই ঐশ্বর্য-সম্ভার বছরে কয়েকদিনের সময়ে শিষ্যকে আর কত দেবেন?

তাই এক একবার অমরনাথকে আপসোস ক'রে বলতেন, 'ঘরের এত জিনিষ! তোকে সব দেবার ইচ্ছে ছিল, বাইরে বাইরে থাকার জন্যে দিতে পারলাম না।'

অমরনাথ তখন ডাক বিভাগে কাজ করতেন, মাঝে মাঝেই এখানে-সেখানে বদ্‌লি হ'তে হ'ত। তবু যা পেয়েছিলেন এবং শিখেছিলেন অঘোরবাবুর কাছে তার মূল্যও কম নয়। আর দরাজ-কণ্ঠ অমরনাথের ধ্রুপদ গানে প্রতিভার পরিচয়ও পান চক্রবর্তী মশায়। তাই আশীর্বাদও করতেন, 'পরে বড় গাইয়ে হ'বি।'

এমনিভাবে অঘোরনাথের কয়েক বছরের কাশী-পর্ব চলেছিল। তারপর সব শেষ হয়ে এল একদিন। কিন্তু 'মরণের সেদিন ভয়ঙ্কর' রূপ নিয়ে তাঁর জীবনের অন্তিমক্ষণে দেখা দেয় নি। সকরুণ হলেও শান্ত এবং অপ্রত্যাশিত, সংঘাতহীন সেই বিদায়ের মুহূর্ত। মৃত্যুর কোন কালিমা সেই পরম লগ্নটিকে কলুষিত বা বিকৃত করতে পারে নি। কিংবা বলা যায়, মৃত্যু যেন এই চিরসত্য চিরবিচ্ছেদকে রূপায়িত করে অদৃশ্য হয়ে গেল চকিতে।

অঘোরনাথের অতি আকস্মিক মৃত্যু হয়। বয়স তখন ৬৩ বছর চলছে। সেকালের হিসাবে রীতিমত বৃদ্ধ বয়স। কিন্তু শরীর তাঁর জরাগ্রস্ত হয়নি। কেশ, গুম্ফের পক্কতা দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু শরীর ও মুখের অবয়ব তখনো প্রায় অটুট। মেদ-বর্জিত সুঠাম দেহপট। অভ্যাসমত ভ্রমণ প্রত্যহই করেন। অতি প্রত্যুষে নিয়মিত শয্যাত্যাগ। ঊষাকালে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গীত শিক্ষা দান। সবই পূর্বেকার মতন চলেছে। সঙ্গীত-শক্তিতেও পটু আছেন। সকালে এবং কখনো সন্ধ্যায় গানের আসর বসে, তিনি গান করেন প্রায় আগেকার মতন। তবে কণ্ঠস্বর আগের তুলনায় কিছু নিস্তেজ হয়ে এসেছে। তাহলেও গান গাইতে কোন অসামর্থ্য বোধ নেই। ধ্রুপদ গান, ভজনও গেয়ে থাকেন। ধ্রুপদাঙ্গে কিংবা টপ্পার ধরনে গান করেন ভজন। বেশির ভাগই প্রতিদিনের ঘরোয়া আসর। বারাণসীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্রতিবেশী কেউ তাঁর সে-সব আসরে উপস্থিত হন।

এমনিভাবে বাইরে থেকে দিন বেশ নিরুপদ্রবে একটির পর একটি চলে যায়। নিশ্চিন্ত, শান্তির দিন সব। কিন্তু সেই শান্তিময় পরিবেশে, তাঁর আপাত সুস্থ দেহের মধ্যে অলক্ষ্যে মৃত্যু-কীট বাসা বেঁধেছিল তা বাইরে থেকে বুঝতে পারেননি কেউ।...

নিজে সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার বাড়ীতে তখন অঘোরনাথ বাস করতেন। সেখানে তেমনি ঘরোয়া আসরে বসে সেদিনও গান গাইছিলেন, প্রতিদিনের মতন নিজেরই ভাবে। কাউকে শোনাবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, যদিও কেউ কেউ তাঁর সামনে বসে শুনছিলেন। ধীর গতির সেই গানের সঙ্গে তিনি নিজেই তানপুরা ছাড়ছিলেন কোলে রেখে।

এমন সময় অকস্মাৎ সেই মধুর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। শিথিল হাত থেকে, কোলের ওপর থেকে মেঝের গড়িয়ে পড়ল তাঁর তানপুরা। তিনিও চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন। সঙ্গীতেই নিবেদন করে গেলেন জীবনের শেষ অঞ্জলি!

আবদুল করিম খাঁ :

খ্যাতনামা স্বর-শিল্পী আবদুল করিম খাঁও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অঘোরনাথের মতন গান গেয়েছিলেন। কিন্তু অঘোরনাথের সঙ্গে তাঁর ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ছিল যে, চক্রবর্তী মশায় শুনতে পান নি মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার। মৃত্যু একেবারে অতর্কিতে এবং অতি অকস্মাৎ এসেছিল। প্রতিদিনের মতন সেদিনও গান গাইবার সময় তাঁর মৃত্যু হয় আচম্বিতে।

কিন্তু আবদুল করিম খাঁর বিষয়ে সেকথা বলা চলে না। তাঁর মৃত্যু এক হিসেবে আকস্মিক ভাবে হলেও, তার পরোয়ানা তিনি পেয়েছিলেন কিছুক্ষণ আগে। বুকে

পেয়েছিলেন, মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে। শেষ বিদায়ের ক্ষণ সমাসন্ন। সুতরাং শেষ করণীয় যা আছে, এখনি ক'রে নিতে হবে। আর সময় নেই। গৃহ থেকে বহু দূরে, এক যাত্রাপথের মাঝখানে হঠাৎ মহাযাত্রার ডাক তাঁর কানে পৌঁছেছিল। তিনি ইতিকর্তব্য স্থির করে নিতে কিছু সময় পেয়েছিলেন, তাই সঙ্গীতেই জীবনের শেষ নিবেদন জানিয়ে গেলেন।

যথার্থ সঙ্গীত-সাধক ছিলেন আবদুল করিম খাঁ, আবাল্য তাঁর সঙ্গীতের সাধনা। সঙ্গীত তাঁর দ্বিতীয় সত্তা। অন্তরের গভীরতম প্রকাশের বাহন তাঁর সঙ্গীত। তাই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলের রহস্যলোকে দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার শেষ আকূতি সঙ্গীতেই ব্যক্ত হয়েছিল। সচেতন ভাবেই তা করবার অবকাশ পেয়েছিলেন তিনি, সে সময় অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত।

তাঁর সেই বিয়োগ-গম্ভীর বিবরণ অনেকাংশে জানা গেছে, পরে তা যথাসম্ভব বর্ণনা করা হবে। এখানে তাঁর সঙ্গীতজীবনটি একবার জরিপ করে নিতে ইচ্ছা হয়। তাঁর সমকালে তুল্য কণ্ঠসঙ্গীত-শিল্পী বেশি ছিলেন না সমগ্র ভারতবর্ষে। ভারতীয় সঙ্গীতে বহুকাল তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় থাকবে—প্রদেশে প্রদেশে আসরে, জলসায়, সম্মেলনে অসংখ্য শ্রোতাদের প্রাণে সাড়া জাগাত, সকলের মুখে মুখে ফিরত সে নাম।

তিনি যে সঙ্গীতের সাধক ছিলেন তা তাঁকে আসরে সামনাসামনি দেখলেও সহজেই ধারণা হ'ত। ক্ষীণ, দীর্ঘদেহী, অতি সাধারণ অবয়ব ও মুখভাব। তবে সাধারণ মানুষের মতন বহির্মুখী, পারিপার্শ্বিক সর্ববিষয়ে সচেতন ও সদাজাগ্রত আদৌ নন। বাহ্য বহু বিষয়ে উদাসীন। মাথার একটি প্যাঁচদার পাগড়ি ভিন্ন বেশ-ভূষা সাদাসিধা; চাল-চলনও। প্রথম দর্শনে কিংবা অ-সাঙ্গীতিক পরিবেশে দেখলে মনে হয়—ব্যক্তিত্বহীন। কিন্তু অসাধারণ হয়ে উঠতেন এবং শিল্পী-জনোচিত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেত গান আরম্ভ করলে। তখনই আবদুল করিম খাঁর স্ব-রূপ। গান একটু অগ্রসর হলেই সুরের মধ্যে একান্তভাবে আত্মস্থ হয়ে যেতেন। সঙ্গীত-ক্রিয়ার অনুধ্যানে সেই আত্মসমাহিত ভাব এক দর্শনীয় বস্তু ছিল আসরে। মুখভাবে এক আবিষ্ট প্রকাশ, চোখের দৃষ্টিতে ধ্যানের মহিমা। শ্রোতাদের যেমন সুরের আবেশে আচ্ছন্ন করতেন, তেমনি নিজের সৃষ্টিতে নিজেই নিমগ্ন হয়ে যেতেন। সঙ্গীতের একটি নিষ্কম্প ধ্যানী-সত্তা যেন। অতি আকর্ষক তাঁর এই সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব।

যেমন চিত্তাকর্ষক সেই সুরকণ্ঠ। শ্রোতারা সকলেই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর স্বর বলশালী বা উদাত্ত ছিল না। বরং ক্ষিন্ আওয়াজ বলা যায়। কিন্তু যেমন সুমিষ্ট, তেমনি সুরেলা। শ্রী ও মাধুর্যমণ্ডিত। চিকণ, মনোরম কারুকর্মে শোভমান। কিন্তু সে কণ্ঠের সূক্ষ্ম কারিগরি শ্রোতাদের মনে অনুরণন জাগায়। কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহু সাধনায় লাভ-করা শিল্প-নৈপুণ্য। সত্যকার কলাবন্তের কণ্ঠ।

গীতিরীতিতেও নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে। রাগ-বিস্তারে অসামান্য অধিকারী হ'লেও, অল্পক্ষণ মাত্র চলে তাঁর আলাপচারি। গান ধরে নিতে বিলম্ব করেন না। গানের অঙ্গে অঙ্গেই রাগের রূপায়ণ হ'তে থাকে। গানে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে চলে রাগের আবাহন। রাগের স্বকীয় রূপ ক্রমে অবয়বপ্রাপ্ত হয়, ছন্দিত সুরের লীলায় তান কর্তবের অলঙ্করণে সুসজ্জিত হয়ে।

আর তানের কি বিপুল বৈচিত্র্য। সেইসব মনোমুগ্ধকর তানের কত সম্ভার, যেন অফুরন্ত। বর্ণধারার স্বচ্ছন্দ-গতিতে তানের পর তান নিঃসৃত হয়, কিন্তু কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটে না। প্রত্যেকটি তান স্বতন্ত্র, কোনটিই আগেকার অনুকৃতি নয়। তাঁর ছন্দের কাজও প্রত্যেকটি আলাদা রকমের। দরদী কণ্ঠে ছন্দজ্ঞান ও রসবোধের যুগল মিলন। সেই সঙ্গে কণ্ঠের বিস্তারও স-বিস্ময়ে লক্ষ্য করবার মতন—তিন সপ্তকে তার অবাধ বিচরণ। এই সমস্ত গুণের যোগফলে শ্রোতাদের তিনি আসরে দীর্ঘকাল মোহাবিষ্ট করে রাখেন।

খেয়াল, ঠুংরিতেই সিদ্ধ গুণী বলে সকলের সুপরিচিত। কিন্তু অনেক সময় যেমন দেখা যায় শিল্পীর কোন কোন গুণ সাধারণের অগোচরে থাকে, তেমনি তাঁরও সঙ্গীতকৃতির পূর্ণ পরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশ পায় নি: একথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, তিনি একজন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ গায়কও ছিলেন। তেমনি অনেকের কাছেই এটি নতুন সংবাদ মনে হ'তে পারে যে, আবদুল করিম ছিলেন একজন বীণকারও (যেমন ছিলেন বড়ে গোলাম আলীর পিতৃব্য, খেয়াল-গুণী কালে খাঁ)। তাঁর এই শেষোক্ত পরিচয়ের একটি স্থায়ী নিদর্শনও আছে। মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে বীণাবাদনের রেকর্ড করেছিলেন আবদুল করিম খাঁ সাহেব।

বীণা বাজাবার কথায় তাঁর সঙ্গীত-কৃতির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা আসে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতধারার মধ্যে কর্ণাটকী

বা দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের অনেকখানি পার্থক্য আছে রীতি-নীতি ও প্রয়োগ-পদ্ধতিতে। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গীত-শৈলীর এই দূরত্বকে সঙ্গীতক্রিয়ার মধ্যে নিকটতর করতে যাঁরা সচেষ্ট হন, আবদুল করিম খাঁকে উত্তর ভারতে তাঁদের অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায়। দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের রীতিনীতি তিনি অনুশীলন করেছিলেন এবং এই দুই সঙ্গীত পদ্ধতির প্রয়োগে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করেছিলেন তাঁর উপস্থাপনায়। তাঁর নিজের সার্গম-শৈলী এ বিষয়ে একটি দিক্-দর্শনী।

তাঁর ব্যক্তি-জীবনেও দাক্ষিণাত্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, তবে সেকথা এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই। কথা হচ্ছে তাঁর দাক্ষিণাত্য পদ্ধতির প্রতি প্রীতি। দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গীত বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করবার জন্যে, তা যথাসম্ভব আয়ত্ত করবার জন্যে তিনি দীর্ঘকাল মাদ্রাজে বাস পর্যন্ত করেছিলেন। কর্ণাটকী পদ্ধতির প্রসিদ্ধ বীণকার বীণা ধনম্মল তাঁর বন্ধুস্থানীয়। বীণা ধনম্মলের বাদন-রীতি ঘনিষ্ঠভাবে বহুদিন শোনেন এবং তাঁর বীণা যন্ত্রে সূক্ষ্ম কারুকর্মের ব্যঞ্জনায় দৃষ্টান্তে নিশ্চয় লাভবান হন। সেই সঙ্গে দাক্ষিণাত্য রীতির সঙ্গীতেও অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। তাঁর বীণা-চর্চার কথা যে আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সে বিষয়েও তিনি বীণা ধনম্মলের বাদক-জীবন থেকে হয়ত প্রেরণা পেয়ে থাকবেন। অবশ্য গুণী বীণকারের দৃষ্টান্তের অভাব খাঁ সাহেবের নিজের বংশেও নেই। গোয়ালিয়র দরবারের বিখ্যাত বীণাবাদক বন্দে আলী খাঁ, আবদুল করিমের পিতৃকুল গৌরবান্বিত করেন। তাঁদের ঘরাণা প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা হবে যথাস্থানে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে তিনি উত্তরাঞ্চলের পদ্ধতির একটি শিল্পসুন্দর সংমিশ্রণ করেছিলেন এবং এই নব রূপায়ণের কাজে দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের আদর্শরূপে যাঁরা তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এক নেতৃস্থানীয় এলেন উক্ত গুণী বীণা ধনম্মল।

কর্ণাটকী রীতি আয়ত্ত করবার জন্যে এবং তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার জন্যে আবদুল করিম খাঁ একটি স্বকীয় গায়ন-শৈলীর রূপ-গঠন করেন। তাঁর সেই মৌলিক চালের গানের জন্যে তিনি চিহ্নিত ছিলেন সঙ্গীত-জগতে।

বংশধারার দিক থেকে তিনি কিরাণা ঘরাণার অন্তর্ভুক্ত। দিল্লীর নিকটবর্তী কিরাণা নামে প্রসিদ্ধ গ্রামটি (কর্ণপুর নামেরই অপভ্রংশ) একটি ভারত-প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পরিবারের জন্ম দেয়। বেশ কয়েকজন গুণী একাধিক পুরুষে পরিবারটিকে ধন্য করার ফলে গ্রামের নামটি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ঘরাণার মর্যাদা লাভ করে। কিরাণা ঘরাণার নাম-যশ শোনা যেতে থাকে ভারতের নানা দরবারে ও সঙ্গীতের আসরে। আবদুল করিম খাঁ'র সঙ্গীত-জীবনের আগে থেকেই কিরাণা ঘরাণার নাম সুপরিচিত। এই সঙ্গীত-সাধক পরিবারে জন্ম লাভ করে তিনি বংশের গৌরব বহুলাংশে বর্ধিত করেন।

কিরাণা ঘরাণা অর্থে যে একটি বৈশিষ্টপূর্ণ চাল বা সঙ্গীতশৈলী, তা হয়ত সর্বাংশে নয়। এখানে ঘরাণা বলতে কিরাণা গ্রামের এই সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারকে ধরা যায়। কারণ এ বংশের সকলে একটি বনজ সঙ্গীতশৈলীর সাধনা করেন নি, যেমন হয়েছে অন্য নানা ঘরাণার ক্ষেত্রে। এ বংশে সকলে গানেও চর্চাও করেন নি। বীণকার বন্দে আলীর নাম আগেই করা হয়েছে। তেমনি রীতিনীতিতেও এ বংশের অনেকে বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় এ বিষয়ে। উক্ত বীণাবাদক বন্দে আলী খাঁ সাধারণত ধ্রুপদাঙ্গে বীণাবাদন করতেন, তার পরণ বাজাতেন মৃদঙ্গ সঙ্গতে। তানসেনের পুত্রবংশীয় গুণী নির্মল শাহের তিনি শিষ্য। বারাণসীর ধ্রুপদ-গুণী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সঙ্গীতে পরিবর্তন' পুস্তকে কাশীর একটি ধ্রুপদের আসরে বন্দে আলী খাঁর বীণা-বাদনের বর্ণনা করেছেন। আবার অন্য সূত্রে জানা যায়, বন্দে আলী খাঁ নাকি ঠুংরি অঙ্গে বাজিয়েছেন কোন কোন আসরে। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রহিম আলী ছিলেন গায়ক এবং দিল্লীনিবাসী। তা ছাড়া গোয়ালিয়রের যশস্বী খেয়াল-গায়ক হদ্দু খাঁ ও তাঁর পুত্র রহমৎ খাঁ কিরাণার এই বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু তাঁদের রীতিনীতির সঙ্গে কিরাণা ঘরাণার অন্যান্য গায়কদের পার্থক্যের কথা বলা বাহুল্য। আবার আবদুল করিম উক্ত রহমৎ খাঁর শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। এবং নিজের পিতা ও খুল্লতাত প্রভৃতি আত্মজনদের তালিমও পান শৈশব থেকে। কিন্তু একথা সর্ববাদীসম্মত যে, তিনি (আবদুল করিম) স্বকীয় চালেই আসরে গাইতেন। এ বিষয়ে এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কিরাণা ঘরাণার বা পরিবারের অন্তর্গত সঙ্গীতজ্ঞরা একই ঢংয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন না—অর্থাৎ কিরাণা ঘরাণা কোন একটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত চাল নয়; একটি সঙ্গীতজ্ঞ বংশ বা পরিবার।…

আনুমানিক ১৮৭১ খ্রীঃ আবদুল করিম খাঁর এই পরিবারে জন্ম হয়। সঙ্গীত-ব্যবসায়ী বংশ। সুতরাং নিতান্ত শৈশবকালে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হ'ল—বয়স তখন মাত্র ৫ বছর। প্রথম তালিম পিতার কাছে। তার পর পিতৃব্যদের কাছে। পরিবারের সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ, যদিও প্রত্যেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। পিতৃকুলে বন্দে আলী খাঁ ও রহিম আলীর নাম আগেই করা হয়েছে, তা ছাড়াও এদিকে আছেন রহমন বক্স, নান্নে খাঁ, আবদুল্লা প্রভৃতি। তেমনি মাতৃকুলের দিকে গৌরবান্বিত করেছেন গোয়ালিয়রের সুবিখ্যাত হদ্দু হস্সু খাঁর ধারা। তাঁদের পিতামহ নথন পীর বক্সের সময় থেকে। এমনি একাধিক ধারার উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতিক পরিবেশে আবদুল করিমের সঙ্গীত-জীবন গঠিত হয়। এবং অতি অল্প বয়সেই গুণী গায়ক রূপে খ্যাতিমান হন তিনি।

পিতা ও পিতৃব্যদের কাছে প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করবার পর (হদ্দু খাঁর পুত্র) রহমৎ খাঁর তালিমও তিনি পান। রহমৎ খাঁ তাঁর স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত কৃতী হয়েছিলেন খেয়াল অঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গীত-জীবনের সমসাময়িক কালে তাঁর সমকক্ষ খেয়াল-গায়ক অতি অল্পই ছিলেন উত্তর ভারতে। রহমৎ খাঁর মধ্যবয়সেই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, নচেৎ তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেয়াল-গুণী হিসাবে সঙ্গীত-জগৎ থেকে অবসর নিতে পারতেন। আবদুল করিম খাঁ ভিন্ন তাঁর আর একজন শিষ্যের কথা জানা যায়, যিনি সাময়িকভাবে শিক্ষার সুযোগ পান রহমৎ খাঁর কাছে। তিনি হলেন কাশীর ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী জীবনে ধ্রুপদ চর্চা করলেও প্রথম জীবনে গোপালবাবু খেয়াল গায়ক (এবং তবলা-বাদকও) ছিলেন। সে সময় রহমৎ খাঁ একবার বছর খানেক কাশীতে অবস্থান করেন, গোপালচন্দ্র খাঁ সাহেবের কাছে শিখেছিলেন সেই সুযোগে। রহমৎ খাঁর মস্তিষ্কের পীড়া তখন মাঝে মাঝে দেখা দিলেও অন্য সময়ে স্বাভাবিক থাকতেন, গান গাইতেন, শিক্ষাও দিতেন। অবশ্য সাধারণের পক্ষে তাঁর শিক্ষা পাবার সুবিধা ছিল না কোন সময়েই। গোপালচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ও অধ্যবসায়ী এবং পশ্চিমের বাসিন্দা হওয়াতেই তাঁর পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল। আবদুল করিম খাঁ জানতেন যে, গোপালবাবু রহমৎ খাঁর শিক্ষা পেয়েছিলেন, সেজন্যে একটি প্রীতির সম্বন্ধ অনুভব করতেন তাঁর সঙ্গে। তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, খাঁ সাহেব যখন প্রথম কলকাতায় আসেন এবং ভবানীপুরে তাঁর গান হয়। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দেবার অনেক আগে সেবার যখন আবদুল করিম প্রথম এখানে আসেন দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের উদ্যোগে।

রহমৎ খাঁর প্রসঙ্গে আর একটু যোগ করবার আছে। একবার কাশীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় স্বনামধন্য গায়ক মৌজুদ্দিনের। সে ঘটনার বিবরণ শুনে অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর 'মৌজুদ্দিন' প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। এখানে প্রসঙ্গটি তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল, রহমৎ খাঁর একটি চিত্র দেখাবার জন্যে: বাবুজী··· বললেন, ওস্তাদ আমাকে বলেছিলেন, খবরদার, মৌজুদ্দিন গান করতে চাইলে ওকে নিষেধ করো না; নয়ত সে পাগল হয়ে যাবে, রহমৎ খাঁর মত।···'

'ঐ রহমৎ খাঁ ও মৌজুদ্দিনের প্রসঙ্গে বাবুজী একটি বৃত্তান্ত বলেছিলেন, যার মধ্যে আছে কলাবিৎ শিল্পীর হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় রহস্য। শ্যামলালজীর কথা:—রহমৎ খাঁ ছিলেন নামজাদা খেয়ালী ও তানাইৎ কলাবিদ, যাঁর মত অদ্ভুত দম ও তান এ যুগে আর কেউ দিতে পারেন নি। তাঁর দোষ ছিল মাথায়; মাঝে মাঝে পাগলের মত হয়ে যেতেন। বারাণসীতে ভাইয়া সাহেব, মৌজুদ্দিন ও আমরা থাকতে থাকতে মৌজুদ্দিনের খ্যাতি ছেয়ে পড়েছিল দেশ দেশান্তরে। হঠাৎ রহমৎ খাঁ এসে হাজির গোয়ালিয়র থেকে। ওস্তাদ তাঁকে অত্যন্ত খাতির করে বসতে বললেন।···রহমৎ খাঁ ওস্তাদকে বললেন, 'ভাইয়াজী, মৌজুদ্দিন নামে একটি ছোকরার বড় সুখ্যাতি শুনেছি। তার গান শুনতে বেরিয়েছি; শুনলাম, সে তোমার সঙ্গেই থাকে। তাকে দেখাও তার গান শুনব।' ওস্তাদ বললেন, 'আচ্ছা', তার জন্য চিন্তা কি, সে এখানেই থাকে। আপাতত আপনি কিছু সেবা করুন, পরে গান হবে।' রহমৎ খাঁ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'না ভাইয়া, দেরি করো না; আমি এখনই শুনব, না শুনে যাব না।'

ওস্তাদ কি করেন, অগত্যা মৌজুদ্দিনকে ডেকে বললেন, 'বেটা এঁকে আদাব করো। হদ্দু হস্সু খাঁর ঘরের সেরা গাইয়ে, হিন্দুস্থানের গৌরব এই রহমৎ খাঁ সাহেব। ইনি তোমার গান শুনবেন;·····' রহমৎ খাঁ মৌজুদ্দিনের গলা ও গান শুনে মহা খুশি। খুব 'সাবাস' করতে লাগলেন। পরেই বলে উঠলেন, 'বেটা! একখানা ভৈরবী ত শোনাও।

মৌজুদ্দিন ধরে দিল—'বাজুবন্দ খুল্ খুল্ যায়।'······ গান শেষ হবার আগেই রহমৎ খাঁ তারিফ করতে আরম্ভ

চললেন। এ রকম ব্যাপার তাঁর পক্ষে একেবারেই নূতন ছিল। যা হোক গান থেমে গেল কিন্তু তারিফ থামে না। ভাইয়া সাহেব ভাব-গতিক দেখে তাঁকে হাতে ধরে চলে গেলেন ছাদে, খোলা হাওয়ায়। কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁরা ঘরে ফিরে এলেন, তখন আমরা দেখি, রহমৎ খাঁ সাহেবের ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। সে বড় করুণ দৃশ্য।......' ইত্যাদি।

এখন আবদুল করিমের প্রথম জীবনের কথায় আবার ফেরা যাক। প্রতিভাধর তিনি, স্বাভাবিক সুকণ্ঠ ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে মাত্র ১৫·১৬ বছর বয়সেই সঙ্গীতে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন। সূক্ষ্ম কারিগরিতে ভরা তাঁর চিত্তাকর্ষক কণ্ঠ তাঁর প্রাথমিক সঙ্গীত-জীবন থেকেই শ্রোতাদের আকর্ষণ করত তাঁর গানের দিকে। তাঁর মতন এত অল্প বয়সে খুব কম কলাবন্তই সঙ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হন কুনাগড়ের রাজ পরিবারে। শুধু তাই নয়। রীতিমত জলসায় অনুষ্ঠান করে তখনই তিনি মুজরো নিতে আরম্ভ করেছেন। সে সময় থেকেই নানা আসর থেকে তাঁর ডাক আসতে থাকে এবং যশ, অর্থ দুই-ই উপার্জন করতে থাকেন তিনি। কুনাগড় রাজপরিবারে নিযুক্ত হবার দু'বছর পরে, অর্থাৎ তাঁর ১৮ বছর বয়সে বরোদার গায়কোয়াড়ের দরবারে গায়করূপে তিনি যোগ দেন। সেখানে তাঁর সুনাম ক্রত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বরোদা দরবারেও বেশী দিন নিযুক্ত থাকেন নি তিনি। সে কাজ ছেড়ে দেবার পর বাইরের নানা দরবার ও সঙ্গীতাসর থেকে আমন্ত্রিত হ'তে থাকেন এবং সেই সব আসরে যোগ দিয়ে বৃহত্তর সঙ্গীত-সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেন।

উপার্জন যখন ভালভাবে হতে থাকে তার একটি বড় অংশ ব্যয় করতে আরম্ভ করেন সঙ্গীত-চর্চার বিস্তারের জন্যে। বছরের পর বছর ধরে নিজের অর্থে নানা স্থানে তিনি সঙ্গীত-শিক্ষার জন্যে এক একটি কেন্দ্র স্থাপন করে যান। সঙ্গীতজ্ঞ রূপে তাঁর নাম সমধিক পরিচিত, কিন্তু সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও উদ্যোগী পুরুষ হিসাবেও তাঁর নাম স্মরণীয়। তাঁর উদ্যোগে বিভিন্ন সঙ্গীত-কেন্দ্র স্থাপিত হয় ভারতের নানা জায়গায়—বোম্বাই, পুণা, মিরাজ, বেলগাঁও ইত্যাদিতে এবং সেই সব সঙ্গীতকেন্দ্রে তালীমদের মধ্যে অনেক সঙ্গীতজ্ঞের জীবন গঠিত হয়েছে। তাঁর এই অবদানটির কথা তেমন সুবিদিত নয় পূর্বাঞ্চলের সঙ্গীতজ্ঞ মহলে, কিন্তু পশ্চিম ভারতের সঙ্গীত-সমাজে সেকথা বহুজনেরই জানা আছে।

তা ছাড়া আরও নানা প্রকারে সহায়তা করতেন তিনি উদীয়মান গায়ক-বাদকদের। এ বিষয়ে মিরাজের বার্ষিক উরস্ উৎসবটির কথা বলা যায়। সেখানে খাজা মিরাজ সাহেবের দরগায় প্রতি বছর যত সঙ্গীতজ্ঞ জমায়েৎ হ'তেন তাঁদের মধ্যে তরুণ সঙ্গীতজ্ঞদের প্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন এবং প্রয়োজন মতন সাহায্যও করতেন তিনি।

সঙ্গীত বিষয়ে এমনি নানা কার্যধারা সত্ত্বেও খাঁ সাহেবের মধ্যে ছিল একটি আত্মগোপনকারী ভাব—আসরে শুধু নয়, ব্যক্তি জীবনেও। অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় নিরুপদ্রব মানুষ। আত্মপ্রচারের জন্যে আদৌ উন্মুখ ছিলেন না, প্রচার বা নাম যশ যা হয়েছে, তার জন্যে তাঁকে তৎপর হতে হয় নি। বরং বিনয়ী ছিলেন বলা যায়। তাঁর গুণগ্রাহীরা একাধিকবার তাঁকে ইউরোপে গুণপনা প্রদর্শনের জন্যে পাশ্চাত্য জগতে যাবার অনুরোধ জানান, এমন কি ইউরোপের কোন কোন সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি আমন্ত্রিতও হন। কিন্তু সেই অসামান্য সম্মানলাভের সুযোগ নিতে রাজি হন নি আবদুল করিম।

তাঁর সঙ্গীতকৃতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে আরও দু'একটি কথা বলা যায়: তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ কতখানি তৈরি ছিল, এটি তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। বোম্বাই ফিলহার্মনিক সোসাইটির স্থাপনকর্তা মিঃ ক্লেমেন্টস্ একবার শ্রুতি বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেন। তখন আবদুল করিম নিজের কণ্ঠে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়ে দেন সপ্তকের মধ্যে শ্রুতির অবস্থান কিভাবে হয়। মিঃ ক্লেমেন্টস্ আবদুল করিমের প্রদর্শিত শ্রুতি বৈজ্ঞানিক বিচারসহ বলে সমর্থন জানান।

এক একজন গুণীর কোন একটি রাগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। তিনি বিশেষভাবে সেইটির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, আবদুল করিম সিদ্ধ ছিলেন ভৈরবী রাগিণীতে। তাঁর এই এক আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল যে, ভৈরবী তিনি নানা রূপে গেয়ে শোনাতেন, কিন্তু এই বৈচিত্র্যের জন্যে অন্য রাগের স্বর-সহায়তা কখনও গ্রহণ করতেন না।

বাংলার সঙ্গীতপ্রিয় সাধারণ তাঁর গান শোনবার প্রত্যক্ষ সুযোগ পায় তাঁর জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের তৃতীয়

বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সেবার আবদুল করিম কলকাতায় আসেন। তার কয়েক বছর আগে দিলীপ-কুমার রায় খাঁ সাহেবকে কলকাতায় প্রথম নিয়ে আসবার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই প্রথম-বারে এখানকার অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে তেমন জানতেন না এবং তাঁর গান শোনবার সুযোগও পান নি অনেকে। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের কল্যাণে তাঁরা খাঁ সাহেবের সঙ্গীত কৃতির আস্বাদন করে তৃপ্ত হন।

সে হ'ল ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসের কথা। সেই বছরেরই শেষ দিকে তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, যার প্রসঙ্গ পরে বর্ণনা করা হবে। সেবার ঐ সম্মেলনের পক্ষ থেকে তাঁকে যদি আমন্ত্রণ করে আনা না হত, তা হলে সে সুযোগ বাংলা দেশ আর কখনও লাভ করতে পারত না।

সম্মেলনের সেবারকার অধিবেশনে আবদুল করিম খাঁ প্রথম সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন দ্বিতীয় দিনে। ১৯৩৭-এর জানুয়ারীর ৩ তারিখে। সকালবেলার আসর। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশাবরীতে ধ্রুপদ, রাধিকাপ্রসাদ ও ভবানীদেবক মিশ্র ভ্রাতাদের রামকেলিতে দ্বৈতকণ্ঠে খেয়াল, তার পর মুস্তাক আলী খাঁ তোড়ি ও ভৈরবীর গৎ সেতারে বাজাবার পর সকলের শেষে আবদুল করিমের গান আরম্ভ হ'ল। উৎকর্ণ শ্রোতাদের সামনে তিনি আড়াই ঘণ্টারও বেশিক্ষণ একাসনে বসে গেয়ে গেলেন সেদিন।

সেই অন্তর্মুখী, আত্মসমাহিত ভাবে গান আরম্ভ করলেন, তাঁর সুরের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে শ্রোতারাও ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। যেমন তাঁর সমস্ত আসরেই হয়ে থাকে। খেয়াল ও ঠুংরি দু' রকমই গাইলেন। প্রথমে ধরলেন বিলম্বিত লয়ে মিঞা-কি-তোড়ি —"দাইয়া বতা দুখারা বারী।" গানখানি শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করলেন ঐ রাগেই দ্রুত লয়ের গান— 'বেগুণ গুণ গাওয়ে।'

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে মিঞা-কি-তোড়ির গান দু'খানি গেয়ে যখন শেষ করলেন, বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনির সঙ্গে শ্রোতারা তাঁকে অভিনন্দিত করলে। কালবিলম্ব না করে তিনি তৃতীয় গানটি গাইতে আরম্ভ করলেন— শুদ্ধ আশাবরী, বিলম্বিত ঝুমরা তালে: 'বিচাওয়া মনওয়া।' শুদ্ধ আশাবরীর রূপায়ণ সম্পূর্ণ করে অবশেষে ধরলেন তাঁর মনোমুগ্ধকর স্মরণীয় ভৈরবীর ঠুংরিটি— 'যমুনা কি তীর'।

সেদিন সকালবেলার অনুষ্ঠান যখন খাঁ সাহেব শেষ করলেন, বাংলার শ্রোতাদের সঙ্গীত বিষয়ে একটি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল। এখানকার গায়কদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর তান কর্তব্যের ধরন-ধারণ অনুকরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেদের সাধ্য মতন। আর 'যমুনা কি তীর' গানটি মুখে মুখে ফিরতে লাগল কিছুদিন ধরে। এই ভৈরবীর ঠুংরিটি অনেকের মনের মণি-কোঠায় অক্ষয় হয়ে রইল।

সম্মেলনে আরও এক দিন তাঁর গান হ'ল—চতুর্থ অনুষ্ঠানে। জানুয়ারির ৫ তারিখ, রাত্রির আসর। প্রায় সকলের শেষে; তাঁর পরে গান হয়েছিল শুধু ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের 'বন্দেমাতরম' ও ভজন। এদিনও প্রায় তিনঘণ্টা শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে এক দমে খাঁ সাহেব গেয়ে গেলেন। প্রথমে দুখানি খেয়াল গাইলেন শুদ্ধ কল্যাণে, বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে। যথাক্রমে গান দুটি হ'ল—'এরি এক নজরা' ও 'মন্দার বাজে রে'। তার পর দুখানি মালকোষের খেয়াল—অধুনা-প্রসিদ্ধ 'পীর না জানি রে' ও 'আজ মোরে ঘরে আইলা।' প্রত্যেকটিই আবার সাড়া জাগানো গান। এই চারখানি খেয়ালের পর দুটি ঠুংরি গেয়ে খাঁ সাহেব মধুরেণ সমাপ্ত করলেন। প্রথমটি তাঁর বিখ্যাত ঝিঁঝোটি 'পিয়া বিন নাহি' এবং দ্বিতীয়টি সরফরদা—'গোপাল মেরি'।

সম্মেলনের আসর মাৎ করবার এমন দৃষ্টান্ত কলকাতায় বেশি দেখা যায় নি।

কলকাতায় সর্বজনীন সম্মেলনে সেই আবদুল করিম খাঁর প্রথম ও শেষ অনুষ্ঠান। সেই বছরেরই অক্টোবর মাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স তখন তাঁর ৬৬ বছর।

মৃত্যুর কিছু আগে তাঁর বীণা-যন্ত্রে রেকর্ড করবার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কণ্ঠসঙ্গীতেরও কয়েকটি রেকর্ড গৃহীত হয় তাঁর। তার মধ্যে সব পরিচিত তাঁর ঐ দুখানি ঠুংরি—'যমুনা কি তীর' ও 'পিয়া বিন্ নাহি।' তা ছাড়া ক'টি খেয়াল গানেরও রেকর্ড তাঁর হয়।

এই ক'টিই তাঁর সঙ্গীতসৃষ্টির তবু কিছু নিদর্শন স্বরূপ বেঁচে থাকবে ভাবীকালের জন্যে।

তাঁর যে মৃত্যুর প্রসঙ্গ বর্ণনা করবার জন্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা তার ঘটনাকাল হ'ল—২৭ অক্টোবরের (১৯৩৭) রাত্রি। স্থান—দক্ষিণ ভারত। পণ্ডিচেরির কাছে একটি সংবাদ, অখ্যাত রেলষ্টেশন।

দক্ষিণ ভারতের পথে সেই যাত্রার আগে তিনি

গিয়াছে ছিলেন। অন্যান্য বছরের মতন মিরাজের সেই উরস্ উৎসবে যোগ দেবার জন্যে তিনি গিয়েছিলেন সেখানে। উৎসব শেষ হবার সময় পণ্ডিচেরি যাবার জন্যে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এল।

পণ্ডিচেরির একটি প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয় সেখানে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান করতে। প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করবার জন্যে সেই আসরের ব্যবস্থা করা হয়। পণ্ডিচেরিতে সেই উপলক্ষ্যে গিয়ে গান গাইতে সম্মত হন খাঁ সাহেব।

সঙ্গে শিষ্য-সেবক ও তবল্‌চিকে নিয়ে তিনি ট্রেনে পণ্ডিচেরি যাত্রা করলেন। শরীরে কোনরকম অসুস্থতা তখন তাঁর ছিল না বলে জানা যায়।

প্রথম রাত্রি তখন পার হয়ে গেছে। খাঁ সাহেব যাত্রা শেষ ক'রে নিয়েছেন সঙ্গীদের সঙ্গে। নির্জন প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে রাত্রির নিস্তব্ধতা সচকিত করে ট্রেন পণ্ডিচেরির দিকে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ শরীরে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন আবদুল করিম। অনুভব করলেন, বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। একজন শিষ্যকে ডেকে জানালেন শরীরের এই অবস্থার কথা।

সঙ্গীরা সকলেই তৎপর হয়ে তাঁকে হাওয়া ইত্যাদি করতে লাগলেন। কিন্তু খাঁ সাহেব বিশেষ স্বস্তি পেলেন না কিছুতেই।

সঙ্গীরা ইতিকর্তব্য আলোচনা করছিলেন, এমন সময় ট্রেনের গতি মন্দীভূত হয়ে এল। জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে একজন দেখলেন, একটি স্টেশনে এসে গাড়ি থামছে।

তখন সকলে স্থির করলেন, খাঁ সাহেবকে নিয়ে এই স্টেশনেই নামা যুক্তিযুক্ত। তা হ'লে সেবা-শুশ্রূষার সুবিধা হবে।

তাঁকে নিয়ে তাঁরা স্টেশনে নেমে পড়লেন। অতি ছোট স্টেশন। নাম সিঙ্গাপেরুমাকোলম্। লোকজন বিশেষ কেউ নেই।

খাঁ সাহেবকে সেখানেই একটা বেঞ্চে তাঁরা আরাম পাবার জন্যে সম্ভব মতন ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি স্থিরভাবে খানিক বিশ্রাম ক'রে নিলেন কষ্ট উপশমের আশায়। কিন্তু স্বস্তি পেলেন না, বুকের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

তিনি হয়ত বুঝতে পারলেন—চরমক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে, আর সুস্থ হবার আশা নেই। শেষ কর্তব্য স্থির ক'রে তিনি প্ল্যাটফর্মের ওপর সতরঞ্চ বিছিয়ে দিতে বললেন, নমাজের জন্যে। অন্তিম মুহূর্তে খোদার কাছে শেষ প্রার্থনা নিবেদন করবেন।

তখনি কথা মতন ব্যবস্থা হ'ল। তিনি নমাজে বসলেন জানুতে ভর দিয়ে। কিন্তু আজীবন একনিষ্ঠ সঙ্গীতসাধক আবদুল করিম প্রচলিত পদ্ধতিতে নমাজের মন্ত্র পাঠ করলেন না। প্রাণের গভীরতম আবেগে প্রার্থনার মন্ত্রগুলি দরবারি কানাড়ার স্বর-ধ্বনিতে নিবেদন করতে লাগলেন।

দরবারি কানাড়ার রাগরূপে সেই শেষ প্রার্থনাসঙ্গীত সমাপ্ত হবার আগেই তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। তিনি ঢলে পড়লেন পাশে। সঙ্গীতকণ্ঠ তাঁর চির-নীরব হয়ে গেল।

রাত তখন প্রায় এগারটা।

●—[০]—●

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(চৌত্রিশ)

সমস্ত দুপুরটা এবং বিকেলেরও খানিকটা রাসবিহারী ছটফট করে কাটালে। তাল খবরটা কি হতে পারে? ব্যাপারটাকে যত দিক দিয়ে যত রকম করেই ভাবতে যায় কিছুই কিনারা করতে পারে না।

সারদাও যেন ক্রমশঃ হেঁয়ালি হয়ে উঠছে। কোন কথা একবারে বলবে না। পরিষ্কার করেও বলবে না। তার ফলে সময়টা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি দুর্ভাবনার মধ্যে কাটে, বোঝে না। অথবা বোঝে, ওইটুকুই তার আমোদ। শিকারকে খেলিয়ে শিকারী যেমন আনন্দ পায়।

সন্ধ্যে অবধি সে আর অপেক্ষা করতে পারলে না। তার আগেই স্নান করে, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল। মিষ্টির কথাটা সারদা পরিহাস করে বলেছে কি না কে জানে! সে ভাবেই বলে থাক, যখন বলেছে তখন রাসবিহারী একঠোঙা মিষ্টি হাতে করেই চলল।

অন্যদিন সারদাকে পরিচ্ছন্ন কিন্তু সাধারণ বেশে দেখা যায়। কি জানি কেন, আজ সে সেজেছে। পরিধানে মূল্যবান শাড়ি, কেশ পরিপাটি করে বাঁধা।

তার দিকে রাসবিহারীকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে সারদা লজ্জিত ভাবে হেসে ফেললে।

বললে, হাতে ওটা কি? আপনি কি সত্যি সত্যি মিষ্টি এনেছেন না কি?

এবার রাসবিহারী লজ্জা পেলে। বললে, তুমি বলেছিলে বলেই আনি নি। ইচ্ছে হ'ল বলে এনেছি।

—ইচ্ছেটা কি হলো? ঘুষ?

—তুমি যা খুশি মনে করতে পার।

রাসবিহারী হাসতে লাগল।

সারদা হেসে বললে, একটু অপেক্ষা করুন। চায়ের জল বসিয়েই রেখেছি। এক্ষুণি আপনার চা নিয়ে আসছি। চা খেতে খেতে বলা যাবে।

চা এবং সেই সঙ্গে দু'টি প্লেটে খাবার ভাগ করে সারদা অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল।

বললে, খবরগুলো আমার কাছ থেকেই শুনবেন, না, বৌরাণীর কাছ থেকে?

রাসবিহারী বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁকে পাব কোথায়?

সারদা হেসে বললে, তিনি আপনার জন্যে বাপের বাড়ীতে অপেক্ষা করছেন।

শুনে রাসবিহারীর চক্ষু স্থির: আমার জন্যে!

—তাই। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিন। আমার ওপর হুকুম হয়েছে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে।

চা খেতে খেতে রাসবিহারী বললে, ঠিক আছে। সুখবরটা তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাবে। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করি তুমি আজ এমন সেজেছ কেন? কোন দিন ত এত সাজসজ্জা দেখি নি।

চোখে একটা কটাক্ষ হেনে সারদা বললে, আপনার কি ধারণা আপনার জন্যে?

—না। কার জন্যে সেইটেই জানতে চাইছি।

সারদা হেসে বললে, আমি বৌরাণীর খাস ঝি। যাচ্ছি তাঁর বাপের বাড়ী। একটু সেজেগুজে যেতে হবে না?

বলেই বললে, বিধবা হওয়ার পর বৌরাণী রঙিন শাড়ি এখন পরেন না, তাঁরই একখানা আমাকে বকশিস দিয়েছেন। তাঁরই হুকুমে পরেছি। কারও জন্যে নয়। মনিবের ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্যে দাসীদের সাজতে হয়।

হাতের দু'গাছি বালা দেখিয়ে বললে, এও তাঁরই দেওয়া। তাঁরই হুকুমে পরা।

সারদা হেসে বললে, আপনার সন্দেহ বাতিক আছে জানতাম না।

রাসবিহারী বললে, সন্দেহের জন্যে নয়, তোমাকে এমন সাজতে কোনদিন দেখি নি তাই বললাম। [illegible]

করেছ। সাজলে তোমাকে কত সুন্দর লাগে আজ বোঝা গেল।

লজ্জায় এবং গৌরবে সারদা মুখ নামালো কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

বললে, চলুন এবার ওঠা যাক। বৌরাণী হয়ত অপেক্ষা করছেন।

বৌরাণী অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে খুব চঞ্চল এবং চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

তাঁর পরনে একখানি মিহি মলমলের ধুতি। গায়ে সাদা ব্লাউজ। দু'টি হাত নিরাভরণ। শুধু গলায় একগাছি সরু হার। এই বেশে রামকিঙ্কর বৌরাণীকে এই প্রথম দেখল। একটু আগে সে সারদাকে বলছিল, 'সাজলে তোমাকে কত সুন্দর লাগে আজ বোঝা গেল।' মালতীকে দেখে এখন তার মনে হ'ল, না সাজলেও সুন্দরী মেয়েকে কত সুন্দর দেখায়।

মালতীকে খুব বেশিবার রামকিঙ্কর দেখে নি। তখন মালতী কনে বৌ বললেই চলে। এ মালতী অন্য মেয়ে। চোখে-মুখে এর ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট।

কোন প্রকার ভূমিকা না করেই মালতী বললে, বিশেষ প্রয়োজনেই আপনাকে ডেকেছি। আর বিশেষ কারণেই আমার বাড়ীতে না ডেকে এখানে ডেকেছি।

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে।

সারদার দিকে চেয়ে মালতী জিজ্ঞাসা করলে, তুই কি কিছু বলেছিস?

সারদা ঘাড় নেড়ে বললে, না।

রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে বৌরাণী বলতে লাগল: মায়ের শরীর ভাল নয়। মন একেবারে ভেঙে গেছে। বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করছেন বটে, কিন্তু খুব মন দিয়ে নয়। কিন্তু আমার ত মন ভেঙে গেলে চলবে না। আমাকে খোকাবাবুর মুখ চেয়ে শক্ত হ'তে হবে। কিন্তু আপনারা শক্তি না দিলে আমি কোথা থেকে শক্তি পাব। তাই আপনাকে ডাকলাম। আপনারা ভরসা দিলে বিষয়-সম্পত্তির ভার আমি নিতে পারি। না দিলে কি করতে পারি জানি না।

বৌরাণীর কোমল করুণ কণ্ঠস্বরে রামকিঙ্কর ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে, আমি আছি আপনার দিকে। আমাকে যা হুকুম করবেন, আমি করব।

বৌরাণীর ওষ্ঠপ্রান্তে খুশির রেখা ফুটে উঠল। বললে, তা জানি। আমি বলেই আপনাকে ডাকতে সাহস করেছি। বিষয়-সম্পত্তির দেখাশুনার ভার নিতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে যথার্থ অবস্থা কি। তারই জন্যে হিসেব-নিকেশের ব্যবস্থা। মা-ও বলেছিলেন, আমিও জানতাম, ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না। দোকানের ম্যানেজার ছেলের অসুখের নাম করে সরে পড়লেন। জমিদারীর ম্যানেজারও কাল হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে মফঃস্বলে চলে গেলেন। কে কবে ফিরবেন জানি না।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, গিন্নীমা বাধা দেন নি?

—না। তিনি জানেন তহবিল তছরূপ সর্বত্রই হয়েছে। কিন্তু এদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। তাই হিসেব-নিকেশে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। আমার জেদে পড়েই তিনি রাজি হয়েছেন। এখন ভাবছি, এ অবস্থা সামলাব কি করে? পিছুবার উপায় নেই। তা হ'লে হাল একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবে। দুর্বলতা দেখান একেবারেই চলবে না। কিন্তু জোর দেখাবই বা কার ভরসায়। আপনার কথা মনে হ'ল। তাই ডেকে পাঠালাম।

বৌরাণী তাকে কোন্‌দিকে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে রামকিঙ্কর বিব্রত হয়ে উঠল। বললে, আমি কি করতে পারি বলুন?

—অনেক কিছুই করতে পারেন। ধরুন আপনাকে যদি সমস্ত কাজের ভার দিয়ে সদর কাছারিতে রাখি, ব্যবসা, জমিদারী সব দিক আপনি সামলাতে পারবেন?

রামকিঙ্কর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত ফ্যালফ্যাল করে বৌরাণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বৌরাণী বললে, আমি এখনই কাউকে তাড়াতে চাই না। যিনি যেখানে আছেন, নিজে না চলে গেলে তিনি সেখানেই থাকুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি একজন বিশ্বাসী বুদ্ধিমান লোক চাই, যিনি আমার কাছে থাকবেন এবং সবদিকে দেখাশুনা করবেন, যাতে সামান্য ফাঁকি না পড়ে। আর আমিও আমার দায়িত্ব নিশ্চিন্তে পালন করে যেতে পারি।

রামকিঙ্কর চিন্তিত ভাবে বললে, জমিদারীই বলুন আর

দোকানই বলুন, সেখানে এখন পর্যন্ত যাঁরা কর্তা হয়ে রয়েছেন, তাঁরা বয়েসে এবং পদমর্যাদায় আমার চেয়ে বড়। আমার নীচে কাজ করতে তাঁরা কি রাজী হবেন? তাল করে বুঝে দেখুন।

মালতী বললে, তাও বুঝে দেখেছি। এতে গণ্ডগোল বাধার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু সেটা আপনার কৌশল এবং ব্যবহারের উপর নির্ভর করছে।

রামকিঙ্কর বুঝে নিয়েছে, এ মেয়ে সামান্য নয়। অনেক ভেবে, সবদিকে বিবেচনা করে কথা বলছে। তার মাথা আপনার থেকেই নীচু হয়ে এল।

বললে, আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

—আরও বুঝিয়ে বলতে হবে?—সৌরাণী হেসে ফেললে। বললে, আপনাকে আমি আমার একান্ত সচিব করে সদরে আনতে চাই। ওঁরা যে যা কাজ করছেন করুন, আপনি আমার হয়ে সমস্ত দেখা-শুনো করবেন। পারবেন না?

পারবে কি না রামকিঙ্কর ঠিক করতে পারছিল না। বললে, আমাকে দুটো দিন ভাববার সময় দিন। তার পরে বলব।

সৌরাণী তাড়াতাড়ি বললে, নিশ্চয় নিশ্চয়। খুব তাড়াতাড়ি নেই। আপনি ধীরে-সুস্থে ভেবে আমাকে জানাবেন।

সারদা সৌরাণীর গাড়িতে উঠে চলে গেল। রামকিঙ্কর হাঁটতে হাঁটতে দোকানে ফিরল।

অতখানি পথ রামকিঙ্কর কি করে যে এল তা সে বলতে পারে না। তার সমস্ত মন একটা আশ্চর্য অনুভূতিতে পূর্ণ। একটু আগে যে কথা সে সৌরাণীর কাছ থেকে শুনে এল, এখন মনে হচ্ছে তা বুঝি সত্য নয়, স্বপ্ন। দেখা হওয়াটাই যেন একটা স্বপ্ন। সত্য সত্য সৌরাণীর সঙ্গে দেখা হ'ল, সত্য সত্য তার কথা শুনে এল তা যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে স্বপ্ন কথা।

সুবল বোধ হয় তার জন্যেই সিক-ঘেরা বারান্দায় বসে ছিল। তাকে দেখা-মাত্র লাফ দিয়ে নীচে নেমে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার?

রামকিঙ্কর চমকে উঠল: কিসের?

—তুমি বড় বাড়ী যাও নি?

—না। বড় বাড়ী যাব কেন?

সুবল হতাশ হয়ে গেল। বললে, ও! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি বড় বাড়ী গিয়েছিলে। তাই খবর জিজ্ঞেস করছিলাম।

রামকিঙ্কর হেসে ফেললে। বললে, আর কিসের খবর চাও তুমি?

সুবল বললে, আর কিসের খবর চাইব? দোকান ছাড়া আর কিসের খবর আমার চাইবার আছে?

রামকিঙ্কর বললে, দোকানের খবর ত বলেছি। হরেকেষ্ট না-আসা পর্যন্ত এই ঘানি আমাকেই টানতে হবে।

হঠাৎ সুবল লাফিয়ে উঠল। বলল, ভাল কথা। তোমার একখানা খামের চিঠি আছে।

—আমার চিঠি!

রামকিঙ্করের তিনকুলে একটি মাত্র কাকা আছে। বিয়ের জন্যে কয়েকখানা চিঠিও লিখেছিল। রামকিঙ্কর বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় বোধ হয় রেগে গিয়েই আর চিঠিপত্র দেয় না। সুতরাং তার চিঠি এসেছে শুনে বিস্মিত হওয়া বিচিত্র নয়।

সুবল চিঠিখানি এনে তাকে দিলে। বললে, হরেকেষ্টর লেখা মনে হচ্ছে না? দেখ আবার কি লিখেছে।

রামকিঙ্কর চিঠিখানা পড়লে: হরেকৃষ্ণরই বটে. নিরাপদে পৌঁছানোর খবর দিয়ে দোকানের অবস্থা সবিস্তারে জানতে চেয়েছে। শেষে লিখেছে রামকিঙ্করের কাছ থেকে খবর পেলে সে চলে আসতে পারে, নচেৎ নয়।

সুবল বললে, ও আর আসবে না হে। তোমার তক্ত কায়েমী হয়ে গেল! তুমি লিখে দাও এখন আসতে হবে না।

রামকিঙ্কর হাসলে, ব্যাপার কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে সুবলের সে সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই বলে: দোকানের ম্যানেজারি আজ তার কাছে তুচ্ছ।

কিন্তু সে কথা সুবলকে বলে লাভ নেই। বললে. আসবে না যে, চাকরি গেলে খাবে কি?

সুবল বললে, থাম থাম। হরেকেষ্ট তোমার-আমার মত করে চাকরি করে নি। দু'হাতে লুটেছে আর দেশে জমি কিনেছে। এখন দু'পুরুষ বসে খাবে।

পয়সা জোটাও সত্যি, জমি কেনাও সত্যি। কিন্তু দু'পুরুষ বসে খাবার মত কিছু হয় নি। রামকিঙ্কর নিজের চোখে দেখে এসেছে, হরেকৃষ্ণ যথেষ্ট দুঃস্থ। খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না।

সুবল বললে, ও কি অভাবে চাকরি করে ভেবেছ? চিরকাল কলকাতায় কাটিয়েছে নানা কাজের মধ্যে, দেশে বেকার বসে থাকতে পারে না, সেইজন্যে চাকরি করে।

তারপর বললে, আচ্ছা তোমার কি মনে হয় তহবিল তছরূপ ধরা পড়লে বাবুরা কি মামলা করবে?

রামকিঙ্কর হাসলে: তা আমি কি করে জানব?

—তুমি গিন্নীমার কাছে যাও-টাও, কিছু আঁচ পাও নি?

রামকিঙ্কর আবারও হাসলে: গিন্নীমা কি আঁচ দেবার মানুষ? তাঁর মনের কথা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

—তা বটে।

সুবলের আজ যেন কি হয়েছে। তার কল্পনা লাফ দিয়ে দিয়ে চলছে।

জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা গিন্নীমার অবর্তমানে কে এত বড় বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করবে?

রামকিঙ্কর জোরে জোরে হেসে উঠল: সে যাদের বিষয় তারা ভাববে। তুমি এতে আগের থেকে মাথা খারাপ করছ কেন? বিষয় যখন আছে, তখন বিষয় দেখবার লোকও থাকবে।

লোক যে থাকবে তার পরিচয় রামকিঙ্কর এইমাত্র পেয়ে এল। বয়স হওয়ার ফলে গিন্নীমার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ছাপ পড়েছে। বৌরাণীকে এখনও ছেলেমানুষ বললেই চলে। তার মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ নেই কিন্তু চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে।

আর রূপ। দু'জনেই অপরূপ সুন্দরী। গিন্নীমার রূপে বয়সের ছায়া নেমেছে বটে, কিন্তু সে ছায়া রূপকে মলিন করে নি, স্নিগ্ধ করেছে। আর মালতী যেন একটি সোনালী আগুনের শিখা।

রূপের কথা থাক। মাঝে অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে একটি চিন্তা রামকিঙ্করের মাথায় ক্রমাগত ঘুরতে লাগল: তাকে যদি সদরে নিয়ে যাওয়া হয় আর হরেকৃষ্ণও যদি না ফেরে তা হ'লে দোকানের ভার কার ওপর দেওয়া যায়। বৌরাণী নিশ্চয় তাকে এ কথাও জিজ্ঞেস করবে। কি উত্তর দেবে সে?

একটি মাত্র লোক আছে, অবিনাশ, যে খাতা লিখতে পারে। খাতা দেখেও। কিন্তু দোকান চালাবার যোগ্যতা তার কতখানি সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কিন্তু কি আর করা যাবে? বাইরে থেকে লোক এনে ত চলবে না। যদি রামকিঙ্করকে সদরে যেতেই হয় এবং হরেকৃষ্ণ আর না ফেরে, তা হ'লে অগত্যা এর হাতেই দোকানের ভার দিয়ে যেতে হবে।

(পঁয়ত্রিশ)

ঘটনা এত দ্রুতবেগে ঘটবে রামকিঙ্কর তা ভাবতেও পারে নি। হরেকৃষ্ণ ফেরে নি। রামকিঙ্কর জানে সে আর ফিরবে না। অবশ্য সে কথা কর্তৃপক্ষকে সে বলে নি। ম্যানেজারেরও বোধ হয় সে রকম মতিগতি। ভদ্রলোক কি গুরুতর কাজের অছিলায় সেই যে জমিদারীতে গেছেন, পুনঃপুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও, তিনি নিত্যনতুন কাজের অছিলায় আসতে পারছেন না। তার পর একদিন দেখা গেল, তিনি উধাও। কাছারিতে নেই, তাঁর দেশের বাড়ীতেও না। কোথায় আছে কেউ জানে না।

ব্যাপারটা কি বুঝতে কারও বাকি রইল না। কিন্তু করা যাবে কি?

মালতী বললে, ওদের অবর্তমানেই হিসেব-নিকেশ হোক। আমাদের জানা দরকার কত টাকা তহবিল তছরূপ হয়েছে। একজন পাকা অডিটরকে দিয়ে হিসেব-নিকেশ করানো হোক। যা টাকা লাগে দেওয়া যাবে।

গিন্নীমা রাজি হলেন না। বললেন, যাক্ সে। যা গেছে গেছে। ও নিয়ে আর হাঙ্গামা করে লাভ নেই: বৌমা, ওরা সামান্য টাকা মাইনে পেত, সে টাকায় সংসার চলে না। চুরি না করে করবে কি?

মালতী এই যুক্তি মানতে চাইলে না। বললে, মাইনে অল্প ত সে মাইনেতে চাকরি করছিল কেন?

গিন্নীমা হেসে উঠে বললেন, করছিল অন্যদিক দিয়ে পুষিয়ে নেবার সুযোগ ছিল বলে।

তার পরে হেসে বললেন, ওরা কত চুরি করেছে আমি

না। ধরে নাও অনেক দিনে একটু একটু করে অনেক টাকাই মেরেছে। কিন্তু দিয়েছেও অনেক টাকা।

—কি করে দিলে? যা দিয়েছে তা ত আমাদেরই পাওনা টাকা।

—না। যেমন অন্যায় করে নিয়েছে, তেমনি যা দিয়েছে তাও অন্যায় করে। প্রজাদের ওপর জোর-জবরদস্তি জুলুম করে। মস্ত দোকানে খারাপ মাল ভাল মাল ব'লে চড়া দামে বেচে। সে অনেক কথা বৌমা। খবর নিলে ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে। ওদের চিঠি দেওয়া হয়েছে, চাকরি ছেড়ে দিলে ওদের বিরুদ্ধে আর কিছু করা হবে না।

মালতী অবাক: চিঠি দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। আশা করছি দু'এক দিনের মধ্যেই ওদের পদত্যাগ-পত্র এসে যাবে।

মালতী শাশুড়ীর মুখের ওপর কিছু বলতে সাহস করে না। কিন্তু এদের নির্বিবাদে ছেড়ে দিতে তার ইচ্ছা ছিল না।

গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু, আমি ভাবছি তার পরে কি?

—কার পরে?

—এরা চাকরি ছেড়ে দিলে তার পরে? সে জায়গায় কাজ করবার লোক ত দরকার?

—মালতী বললে, আপনার কি ধারণা লোকের অভাব হবে?

—লোকের অভাব হবে না। কিন্তু কাজ-জানা লোকের অভাব নিশ্চয় হবে। এরা অনেক দিন ধরে এই কাজ করে আসছিল। যে লোক আসবে তাদের সব বুঝে নিতে সময় নেবে।

—তা ত নেবেই। কিন্তু কি কাছারিতে, কি দোকানে, সব কাজ জানে এমন লোকও কিছু কিছু আছে।

গিন্নীমা চুপ করে রইলেন।

মালতী বললে, পুরোনো অভিজ্ঞ লোক ত অমর নয়। তারা মরলে কিংবা কাজ ছেড়ে দিলে ক'টা দিন অসুবিধা হবেই। তার জন্যে আমি ভয় পাই না।

গিন্নীমা তথাপি চুপ করে রইলেন।

একটু পরে গিন্নীমা বললেন, ওই যে কথাটি বললে বৌমা, মানুষ অমর নয়। ক'দিন থেকে আমিও ওই কথাটি ভাবছি। ভাবছি আমি থাকতে থাকতে তুমিও তোমার ছেলের বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নাও।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কথা। গিন্নীমা কোনদিন এ রকম কথা বলবেন, মালতী স্বপ্নেও তা ভাবে নি। তার ধারণা ছিল গিন্নীমা তাঁর কর্তৃত্ব কোনদিনই ছাড়তে চাইবেন না। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত নয়। এবং এই নিয়ে শাশুড়ী-বৌয়ে যে সংগ্রাম অনিবার্য, তারই জন্যে সে সর্বদিক দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু, আশ্চর্য মানুষের মন, বিনাযুদ্ধে গিন্নীমা যখন রণক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন, তার আকস্মিকতায় মালতী বিব্রতবোধ করল।

ব্যস্ত ভাবে বললে, ও কথা বলবেন না। আপনি না দেখলে এই বিরাট সম্পত্তি দেখবে কে? আমার কতটুকু সাধ্যি?

গিন্নীমা তার জবাব দিলেন না। কিন্তু এই সূত্রে পরোক্ষ ভাবে একটা মন-বোঝাবুঝি হয়ে গেল। মালতী বুঝলে গিন্নীমা তার ইচ্ছায় বাধা দেবেন না।

ধৈর্য আর বয়সের ধর্ম নয়। যে ধৈর্য গিন্নীমার আছে সে ধৈর্য মালতীর থাকবার কথা নয়। তার মতে যেটা করতে হবে সে বিষয়ে কালক্ষেপ করে লাভ নেই। স্থির হ'ল দোকানে এবং এস্টেটের ম্যানেজার দু'জন না কেরা পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ স্থগিত থাকবে। যদি তারা পদত্যাগ-পত্র পাঠায় তা হ'লে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না সে ত লিখেই দেওয়া হয়েছে। যদি পদত্যাগ করে তাল।

ইতিমধ্যে রামকিঙ্করকে বৌরাণীর একান্ত সচিব পদে নিযুক্ত করা হ'ল। সদর থেকে রামকিঙ্কর দোকান এবং এস্টেট দু'য়েরই কাজ দেখাশুনা করবে। গিন্নীমার এ বিষয়ে আন্তরিক সম্মতি বোধ হয় ছিল না। কিন্তু তিনি, যে কারণেই হোক এতে আপত্তিও করলেন না।

অবিনাশের হাতে দোকানের কাজকর্ম ন্যস্ত করে রামকিঙ্কর সদরে ফিরে এল। তার সেই পুরানো ঘরে। তবু কত তফাৎ! তখন এসেছিল পরীক্ষার পড়া করবার জন্যে। তখন আর পাঁচজন আমলার মতই সে একজন

ছিল। এখন তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা। আমলারা তাকে সমীহ করে চলে।

রামকিঙ্কর বুঝলে, বৌরাণীর হাতে উত্তরোত্তর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া এক কথা আর সুষ্ঠুভাবে কাজ চালান অন্য কথা। এ বিষয়ে বৌরাণী নিতান্তই আনাড়ি। গিন্নীমার সাহায্য ছাড়া কাজ চালান অসম্ভব।

গিন্নীমা এখনও প্রতিদিনের অভ্যাস-মত সকালে ঠাকুরদালানে এসে বসেন গৃহদেবতার পরিচর্যার জন্যে। বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনার এইটেই প্রকৃষ্ট সময়। রামকিঙ্কর এই সময়েই তাঁর কাছে এসে বসে এবং আবশ্যকীয় পরামর্শ ও নির্দেশ গ্রহণ করে। বিকেলে অথবা সন্ধ্যার আগে, বৌরাণীর সুবিধা মত, রামকিঙ্কর তাঁর কাছে এত্তেলা দেয় এবং গিন্নীমার সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে তাও বিবৃত করে। তার ফলে বিষয়-কর্মে বৌরাণীরও জ্ঞান বাড়ে। এ বিষয়ে বৌরাণীকে খুব উৎসাহী বলেই মনে হয়।

প্রথম প্রথম রামকিঙ্করকে প্রতিদিন বিকালে একবার করে দোকানে যেতে হ'ত। অবিনাশকে দোকানের কাজকর্ম সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া দরকার ছিল। এখন আর প্রত্যহ যেতে হয় না। মাঝে মাঝে যায়।

এই ডামাডোলে অনেকেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। শুধু ভুবন সেই একই আছে। এখনও তেলের পিপে গড়াচ্ছে।

বেচারা একদিন বলেই ফেললে: ভাই রামবাবু, তুমি আজ একজন কর্তাব্যক্তি। অবিনাশবাবুও দোকানের কর্তা হলেন। আরও অনেকেরই কিছু-না-কিছু হয়েছে। শুধু ভুবন যে-পাল্লাদার, সেই পাল্লাদারই রয়ে গেল!

কথার মধ্যে কোন গাত্রজ্বালা নেই, ঈর্ষা-বিদ্বেষও নেই। সে হা হা করে হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর ভুবনকে বড় ভালবাসে। দোকানে দুঃখের দিনে সেই তাকে সহানুভূতি জানিয়েছে। প্রকাশ্যে হয়ত তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে নি, কিন্তু মুখে যে সহানুভূতি জানিয়েছে, তার মধ্যে বরাবরই আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। তার কথায় শুধু যে রামকিঙ্কর সান্ত্বনা পেয়েছে তাই নয়, শক্তিও পেয়েছে।

ভুবন কথাগুলো হাসতে হাসতে বললেও রামকিঙ্কর মনে মনে কষ্ট পেল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তার যা বিদ্যা-বুদ্ধি তাতে উন্নতির কোন আশা নেই।

শুধু বললে, ভুবন, তোমার কথা আমি মনে রাখব। কিছু করতে পারব কি না জানি না, কিন্তু চেষ্টা করব।

এবারে ভুবন আরও জোরে জোরে হাসতে লাগল। বললে, কি চেষ্টা করবে শুনি? আমার জন্যে চেষ্টা করবার কিছু আছে না কি? আমার যে বাপ-দাদা, সেই বাপ-দাদা! তবে একটা কাজ করতে পার, আমাকে তোমার খাস-খানসামা করে নাও। তোমার কাছে কাছে থাকব, ফাই-ফরমাশ খাটব। যা বলবে করব। তেলের পিপে আর গড়াতে পারছি না।

রামকিঙ্কর সে কথার আর জবাব দিলে না। জিজ্ঞাসা করলে, অবিনাশবাবু কাজকর্ম কি রকম করছেন?

ভুবন তৎক্ষণাৎ বললে, ভাল। খুব ভাল। তোমার চেয়ে ভাল না হতে পারে, কিন্তু হরেকেষ্টর চেয়ে অনেক ভাল। আসল কথা কি জান, মানুষটা ভাল হওয়া চাই। অবিনাশবাবু মানুষটা ভাল। তাই কাজও করছেন ভাল।

রামকিঙ্কর সন্তুষ্ট হ'ল। ভাল লোকই সে নির্বাচন করেছে। সে এটা জেনে খুশি হ'ল যে, হরেকৃষ্ণের চক্রান্তে দোকানের যে কদর্য আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা আর নেই। এখন সবাই নিশ্চিন্তে এবং খুশি মনে কাজকর্ম করছে।

দু'তিন দিন হ'ল হরেকৃষ্ণের কাছ থেকে একখানা চিঠি সে পেয়েছে। অসংখ্য আশীর্বাদ জানিয়ে তাতে সে লিখেছে যে, কর্তৃপক্ষ যে তাদের রক্ষা করেছেন তার জন্যে সে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েছে। বুঝেছে এ কাজ রামকিঙ্করের, তারই চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ নরম হয়েছে। নইলে এ যাত্রায় তাদের রক্ষা ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় পদত্যাগের কথা কিংবা কবে ফিরবে সে কথা বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করে নি। মনে মনে সে আবার কি প্যাঁচ কষছে কে জানে।

অবিনাশ রামকিঙ্করকে খুব তোয়াজ করলে। সে-দিনের ছোকরা রামকিঙ্কর, কিন্তু তা হ'লে কি হবে? একে সে বি. এ. পাশ করেছে, তার উপর এখন সে ওপরওয়ালা। তোয়াজ না করে উপায় কি?

লোকটি সত্যি খুব নিরীহ এবং সরল। কখনও সে সাতে-পাঁচে বড় থাকে না। তার মনের মধ্যে কোথাও ক্ষোভ বা দুঃখের চিহ্ন নেই। উপরওয়ালা যেই হোক, তাতে তার কিছুই যায়-আসে না। নিজের কাজকর্ম করে ওই পর্যন্ত। কোন কিছু সম্বন্ধে তার কৌতূহলও নেই। বড় বাড়ীর হাওয়া কোন্ পথে বইছে, হরেকৃষ্ণের কি হ'ল, রামকিঙ্করের কাছ থেকে সে সব সম্বন্ধে একটা কথাও সে জানতে চাইলে না।

কাছারি বাড়ীতে নিজের ঘরে ফিরে রামকিঙ্কর অবাক হয়ে গেল। সারদা এর মধ্যে তার ঘর গোছাচ্ছে। টেবিলের উপর খানকয়েক ইংরাজি বইয়ের আর একখানা ডিক্সনারী ছিল। সেগুলো ঝেড়ে-মুছে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিছানার চাদরটা ক'দিন থেকেই ময়লা হয়েছিল। রোজই ভাবছিল চাদরটা বদলানো দরকার। কিন্তু হয়ে আর উঠছিল না। অথচ ধোয়া চাদরটা আলনাতেই ছিল। দেখলে ইতিমধ্যেই সেটা বদলানো হয়ে গেছে। ধব ধব করছে বিছানা। ঝাড়া-মোছা। এখন সারদা আলনাটা নিয়ে পড়েছে।

রামকিঙ্কর দোরগোড়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সারদা বোধ হয় একমনে কাজ করছিল বলেই ওর আসা টের পায় নি। হঠাৎ কি একটা শব্দে চমকে পিছন ফিরে চেয়ে রামকিঙ্করকে দেখেই সে অপ্রস্তুতভাবে হেসে ফেললে।

হেসেই জিজ্ঞাসা করলে, কখন ফিরেছেন?

—অনেকক্ষণ। মানে চার-পাঁচ মিনিট হবে।

—তা চোরের মত দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

—চোরেরা কি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে? না ঘরের মধ্যে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে?

সারদা হেসে বললে, নানারকম চোর আছে। যার যেটা সুবিধা হয় সে সেইটে করে।

বলেই বললে, আসছি বৌরাণীর কাছ থেকে। আপনাকে এখনই তলব দিয়েছেন।

বৌরাণীর নাম শুনে রামকিঙ্কর ব্যস্ত হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, জরুরী তলব কি?

—তা আমি কি করে জানব? গেলেই বুঝতে পারবেন জরুরী কি না।

—তা হ'লে তুমি চল। আমি এখুনি যাচ্ছি।

সারদা চলে গেল। রামকিঙ্কর নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চাইলে, এ পোশাকে বৌরাণীর কাছে যাওয়া যায় কি না। [illegible] গর্বের জন্ত কি না জানি না, বৌরাণীর কাছে সে দোরস্ত পোশাকে যেতে ভালবাসে।

দেখলে জামা-কাপড় বেশ ফরসাই আছে। আজ বিকেলেই এগুলো কেচেছিল। ধীরে ধীরে বৌরাণীর মহলে গিয়ে সে হাজির হ'ল।

বিনীত নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি আমাকে তলব করেছেন?

খাটে পা ঝুলিয়ে বৌরাণী বসেছিলেন। সেই গোলাপী মখমলের শাড়ি, সেই রিক্ত করপ্রকোষ্ঠ, শুধু গলায় একগাছি সরু হার গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে গেছে।

বৌরাণী জিজ্ঞেস করলেন, খাতা-পত্র কিছু দেখলেন?

রামকিঙ্করের মুশকিল হয়েছে, বৌরাণীর এই আশ্চর্য রূপের সামনে এসে দাঁড়ালে তার কি রকম গলা শুকিয়ে যায়, বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে রামকিঙ্কর কোনমতে জানালে, দেখছি।

—কি রকম দেখছেন?

—খুব খারাপ কিছু নয়। সমুদ্র থেকে দু'বালতি জল তুলে নিলে সমুদ্র জানতেও পারে না।

রামকিঙ্কর হাসলে। বৌরাণীও।

রামকিঙ্কর অবাক হয়ে দেখলে, আরক্ত ঠোঁটের ফাঁকে সামনের কয়েকটি কুন্দ ফুলের মত দাঁত ঈষৎ বিকশিত হ'ল।

তার গলা আবার শুকিয়ে গেল। বুকের ভিতরটা আবার ঢিপ ঢিপ করে উঠল। কপালে কয়েকবিন্দু ঘামও দেখা দিল।

বৌরাণী বললে, তাই বা যাবে কেন?

—পিসীমা বলেন, বৃহৎ ব্যাপারে এরকম কিছু কিছু যায়ই। সেদিকে চাইতে নেই।

রামকিঙ্কর হাসলে।

মালতী বললে, নাবালকের সম্পত্তির একবিন্দুও অপচয় হয়, এ আমি চাই না।

রামকিঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটু পরে বললে, অপচয়ের ছিদ্রগুলো বন্ধ করার কথা আমি ভাবছি।

—কি ভাবছেন?

রামকিঙ্কর বললে, অপচয়ের একটা বড় ছিদ্রপথ হচ্ছে, মামলা। আমাদের এস্টেট থেকে প্রতি বছর প্রচুর মামলা করা হয়। মুন্সেফ কোর্ট, জজ কোর্ট, কিছু কিছু হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। দু' চারটে ক্ষেত্রে জমিদারী প্রতাপ রাখবার জন্তে এর দরকার থাকতে পারে। কিন্তু, আমার মনে হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মামলা নিষ্প্রয়োজন।

—তবে করা হয় কেন?

—ওই যে বললাম, ছিদ্রপথ। মামলা না করলে আমলার পকেটে দু'পয়সা আসে না। আপনি শুনলে অবাক হবেন, এই মুহূর্তে বি'ভন্ন আদালতে ব'ত্রশটা মামলা ঝুলছে।

—বলেন কি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একটু চিন্তা করে মালতী বললে, এ অপচয় বন্ধ করার উপায় কি?

—উপায় আছে। পিসীমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু উপায়টা পিসীমার মনঃপূত নয়।

—উপায়টা কি?

রামকিঙ্কর কুণ্ঠিতভাবে বললে, খোকাবাবুকে নিয়ে আপনাকে অথবা পিসীমাকে একবার কাছারিগুলো ঘুরে আসতে হবে।

—তাতে কি হবে?

—প্রজারা যদি তাদের রাণীমাকে এবং রাজাবাহাদুরকে একবার দেখতে পায়, মোটা টাকা নজর ত তারা দেবেই, যে কোন শর্তে মামলা মিটিয়ে ফেলতেও তারা রাজী হবে।

—মায়ের তাতে মত নেই?

—না।

—আপত্তিটা কি?

—বলেছেন, এ বংশের কেউ কখনও কাছারি যান নি। মেয়েরা ত নয়ই, বেটাছেলেরাও নয়।

—কেন, তাতে কি সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়?

—পিসীমার তাই ধারণা।

রামকিঙ্কর তার ঘরে ফিরে গেল। বৌরাণী চলল পিসীমার মহলে।

অনাবৃত মার্বেলের মেঝের উপর পিসীমা শুয়েছিলেন। খাস-ঝি তাঁর পদসেবা করছে।

এ সময়ে মালতী এ মহলে বড় একটা আসে না। সুতরাং কিছু দরকারেই এসেছে, বুঝতে পিসীমার বিলম্ব হ'ল না।

জিগ্যেস করলেন, কিছু কথা ছিল, বৌমা?

—ছিল একটু। তা থাক। আপনি বিশ্রাম করছেন, করুন। আমি বরং অন্য সময় আসব।

—না, না।

পিসীমার ইঙ্গিতে খাস-ঝি বাইরে গেল।

পিসীমা বললেন, কি বল?

একটু ইতস্ততঃ করে মালতী বললে, একটু আগে রামবাবু এসেছিলেন।

পিসীমা নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চেয়ে রইলেন।

মালতী কাছারি পরিদর্শনের কথাটা পাড়লে।

ঈষৎ বিরক্তিভরে পিসীমা বললেন, রামকে ত আমি বলেছি যে, তা হয় না। সে আবার তোমাকে বলতে গেল কেন?

ব্যস্তভাবে মালতী বললে, না, না। আপনি যে আপত্তি করেছেন, সেই কথাই সে বলছিল।

গম্ভীরকণ্ঠে পিসীমা বললেন, আমাদের বংশের কেউ কখনও তা করেন নি। তোমাকেও তা করতে দেব না।

মালতী বললে, সে কথাও রামবাবু বললেন। কিন্তু মামলার অপচয় বন্ধ করবার জন্তে করাই বা যায় কি?

পিসীমা অনেকক্ষণ নিঃশব্দে পড়ে রইলেন।

তিনি কিছু বলতে চান না বলে মালতী যখন উঠে আসবে কি না ভাবছে, তখন পিসীমা বললেন, রামকে পাঠিয়ে দেখতে পার। সে যদি কিছু করতে পারে করুক। এস্টেট দেখা-শুনার ভার যখন সে নিয়েছে, তখন সরেজমিনে তারও একবার কাছারিগুলো দেখে আসা দরকার। তুমি বরং তাকে একবার পাঠাও।

পিসীমা খাস-ঝিকে ডেকে পাঠালেন।

অর্থাৎ এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা তিনি করতে চান না।

ইঙ্গিতটা বুঝে মালতী নিজের ঘরে ফিরে এল। (ক্রমশঃ)

কিংবদন্তীর দেশ মানালি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সেই ঢালু পথেই এগিয়ে গেলাম। দূর থেকে মনে হচ্ছিল কতটুকুই বা বন! কিন্তু পথ ত সোজা ছিল না—এঁকে-বেঁকে উঠানামা করে অনেকখানি ঘুরে একেবারে বনের শেষ প্রান্তে এসে পথটা উপরে উঠেছে। সেই পথ ধরলাম। বাঁ ধারে রইল আপেল বাগানগুলো, কয়েকটা আলুর ক্ষেত, আর কয়েকটি গ্রাম্য-কুটির—ডানধারে বনের সীমানায় পথটা পাক খেয়ে বনের মধ্যে ঢুকেছে। বনের তলাটি ভারি পরিষ্কার, গাছগুলো খুব লম্বা লম্বা—ত্রিশ ফুট উঁচু একটা মন্দিরকে লুকিয়ে রাখতে পারে শাখা-প্রশাখার আবরণে। বনভূমি খুবই নির্জন—আমরা ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। সন্ধ্যা হতে আধ-ঘণ্টা বিলম্ব। বনের মাঝখানে ইতিমধ্যেই গোধূলির আবছায়া—অন্ধকার নেমেছে। পায়ের গতি বাড়িয়ে দিলাম যথাসাধ্য। কিন্তু খুব দ্রুত চলার উপায় ছিল না। ঝরা পাতার রাশি বিছিয়ে আছে বনভূমিতে—একটু অসাবধান হলেই পপাত ধরণীতলে।

যাই হোক, খুব বেশি দূরে যেতে হ'ল না। সামান্য উঠেই সামনে পেয়ে গেলাম মন্দির। নামটা যেন ডুংরি মন্দির। তিনচালা ধরনের নক্সা-কাটা কাঠের মন্দির—দেখলে মনে হয় পরিত্যক্ত। মন্দিরের একধারে আরও দু'তিনখানা ছাদ-ভাঙা ঘর দেখলাম। ওগুলির দেওয়াল ও ছাদ ধূমার রেখায় কলঙ্কিত, ঘরের ভিতরে একরাশ পোড়া কাঠকয়লা আর ছাই ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ। মনে হ'ল এটা অতিথি ভবন। পর্বদিনে দূর দূরান্তর থেকে যে যাত্রীরা আসে—তারাই হয়ত রন্ধনাদি করে, আহারান্তে একরাত্রি কাটিয়ে যায় এখানে। কিংবা রান্না ওরা করে না—শীত থেকে আত্মরক্ষার্থে কাঠের আগুন জ্বালায় সারারাত্রি ধরে।

আপাতত কাউকে দেখছি না। মন্দিরের দুয়ার বন্ধ। চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছি—ইতিমধ্যে আর একটি পাঞ্জাবী পরিবার এসে পৌঁছল। ওরাও দুয়ার বন্ধ দেখে হতাশ হ'ল। কি আর করা যায়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্দিরের গায়ে দারুশিল্পের নমুনা দেখতে লাগলাম। এমন কিছু চোখে ধরার মত শিল্প নয়—তবু প্রাচীনকালের একটি ধারাকে ধরে রেখেছে। মন্দিরের নাম বা ইতিহাস চোখে পড়ল না, অথচ ট্যুরিষ্ট-গাইডে এর উল্লেখ আছে। যাত্রীরা সরকারের কাছ থেকে একটি পরিচয়লিপি অন্তত আশা করতে পারে। নতুবা এইটিই যে প্রকৃত হিড়িম্বা-মন্দির, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন।

মন্দিরের ভিতরটা কেমন, দেবতার মূর্তিটা না দেখেই ফিরতে হবে ভেবে মন খুঁতখুঁত করছিল। আর একবার চাইলাম এদিক-ওদিক।

চাইতেই দেখি একটা দশ-বারো বছরের ছেলে ঢালু বনপথ বেয়ে এই দিকেই উঠে আসছে। ছেলেটিকে ডাকলাম হাত ইসারায়। ও দৌড়তে লাগল। মন্দিরের দুয়োরে পৌঁছেই ঠেলা দিয়ে দুয়োরটা খুলে ফেলল। ও হরি—দুয়োরটা বন্ধই ছিল না! আমরা এবং পাঞ্জাবী পরিবারটি ভিড় করে দুয়োরের সামনে দাঁড়ালাম। মূর্তি কোথায়! ভিতরে ত সূচীভেদ্য অন্ধকার!

ছেলেটাকে ইসারায় বললাম, ঠাকুর কই?

ও সুরুৎ করে সেই অন্ধকারে ঢুকে গেল এবং অনতিবিলম্বে ছোট্ট একটি পুতুল এনে আমাদের সামনে তুলে ধরল। পুতুলের গায়ে-মাথায় দু'চারটি বনফুল—না চন্দন সিঁদুরের ফোঁটা, না অর্ঘ্যপূজার চিহ্ন! এটি আদৌ দেবমূর্তি কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতেই ছেলেটি একই সঙ্গে হাত আর মাথা নাড়লে। তারপর সেই হাত উপরে উঠিয়ে যে ভঙ্গি করল তার অর্থটি কিছু পরে পরিস্ফুট হ'ল। দেবতা এই মন্দিরে থাকেন না—থাকেন পুরোহিতের বাড়ীতে। পুরোহিত থাকেন ওই উপরের পাহাড়ে।

কয়েকটি পয়সা পেয়ে ছেলেটির মুখ খুশিতে ভরে উঠল।

এমন সময়ে একজন তার-পিওন এসে পুরোহিতের খোঁজ করল। বলল, তার নামে একটা তার আছে। কোথায় সে?

ছেলেটিকে বুঝিয়ে দিতে সে তার-পিওনকে নিয়ে পাহাড়ের উপরের দিকে চলে গেল। আমরা নেমে

এলাম। পরে জেনেছিলাম—দেবী থাকেন পুরোহিতের আশ্রয়ে, এই বনের উপরকার পাহাড়ে। মাসের প্রথম দিনে বাজনা বাজিয়ে ধুমধাম করে তাঁকে নামিয়ে আনা হয় এই মন্দিরে। তখন যাত্রী আসে অনেক। পূজা হয়, পশুবলি হয়, সারাদিন ধরে চলে উৎসব। সন্ধ্যায় দেবী ফিরে যান নিজ আলয়ে।

পরো খরগুলিতে কাঠকয়লার সদ্ব্যবহার করে কারা স্পষ্ট হ'ল।

হিড়িম্বার বৃত্তান্ত কিন্তু দ্বাপর যুগের। আসলে তিনি ছিলেন রাক্ষসী। এই উপত্যকায় দেবদেবীর সঙ্গে দৈত্য-দানবী কিংবা রাক্ষস-রাক্ষসীর পূজাও ত বেশ চালু রয়েছে দেখছি। 'জামলু'র কথা আগেই বলেছি। আসলে অতি-প্রাকৃত শক্তিকেই এরা দেবশক্তির প্রতীক বলে পূজা অর্চনা করে। শক্তির উৎস যেখানেই থাক—নদী, শিলা, অতিকায় বৃক্ষ, সাপ, বক, অসুর কিংবা নর—যিনিই অলৌকিক ঘটনার মূলে রয়েছেন, তিনিই দেবতা। তাঁর মহিমাকে স্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে পুরাতন যুগ থেকে।

হিড়িম্বা মানালির অরণ্যে থাকতেন কি না সে বৃত্তান্ত খুলে বলেন নি মহাভারতকার, কিন্তু ভীম সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ ও দেশ-দেশান্তর ভ্রমণের উল্লেখ আছে। ভারতের পূর্বপ্রান্তে আসামে কোহিমা ডিমাপুর (হিড়িম্বাপুর) থেকে নেপাল হরিদ্বার নৈনিতাল প্রভৃতি যাবতীয় শৈলনগর ভীম হিড়িম্বার মধুচন্দ্রিমা যাপনের স্মৃতি বহন করছে। এতে বেশ বোঝা যায়, এই বীর-দম্পতি হিমালয়ের প্রান্তরে উপত্যকার অরণ্যে ভ্রমণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে ফিরেছেন। বীর্যবান নর ও বীর্যবতী রাক্ষসী অতীত মহিমার খাতিরে দেবদেবীরূপে পূজা পাচ্ছেন।

এই উপত্যকায় আরও বহু দেবদেবী আছেন—তার মধ্যে রঘুনাথজী সর্বপ্রধান দেবতা। দশেরা উৎসবে কুলুর ময়দানে যে বিরাট মহোৎসব হয়, তাতে বহু দেবতা সমবেত হয়ে রঘুনাথজীকে সম্মান প্রদর্শন করেন। কেবল 'জামলু'দেব এই উৎসবে আসেন না। নিজ রাজ্য ছেড়ে উনি কোথাও যান না।

দেখছি, মানালির আকর্ষণ মুনি-ঋষিরাও কাটাতে পারেন নি। এখানে মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এসেছেন—এসেছেন বশিষ্ঠ মুনি। পরের দিন সকাল বেলায় বশিষ্ঠ আশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম। মানালি থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে। অর্দ্ধেকটা সমতল পথ, বাকিটা চড়াই। রোহতাং যান চলে যে পথ ধরে, সেই পথে মাইলটাক যাওয়ার পর আরম্ভ হয়েছে চড়াই। লেখা আছে পাঁচ ফার্লং, কিন্তু ঊর্দ্ধমুখিতে পাঁচ ফার্লং ঠেলে ওঠার পরিশ্রম সমতলে পাঁচ মাইল হাঁটার সমান। তবু সেই পথে না উঠে উপায় কি!

উঠছিলাম চওড়া পাথর-বিছানো পথ ধরে। পাথরের মাঝখান দিয়ে জলের ধারা নেমে আসছিল। যেখানে ধারার বেগ বেশি, সেইখানেই এক একটা পানিচাক্কি। জলের স্রোতটা এক জায়গায় আটকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে—মাঝখানটিতে চাকি। জলের ধাক্কায় চাকিটা বন্ বন্ করে ঘুরছে আর একরাশ গম নিয়ে একটা লোক চাকির উপর ঢেলে দিচ্ছে। গম পেষাই হ'লে আটা ভরে নিচ্ছে থলিতে।

এই রকম পাঁচ-সাতটা চাকি দেখলাম।

এখানে পাহাড়ে উঠবার সময় ছোট একটি ঘটনা ঘটল—সেটি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আমাদের পিছু পিছু উঠছিল একটি তিব্বতী মেয়ে। আমাদের কাছ-বরাবর এসে মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে শুধোল, কোথায় চলেছ তোমরা?

বললাম, বশিষ্ঠ কুণ্ডে।

বললে, ভাত্তা পানিতে চান করবে বুঝি?

বললাম, জানি না। আগে দেখি ত কুণ্ডের চেহারা—পরে স্নানের কথা।

ও বলল, গরম জলে চান ত ভাল—চান করবে নিশ্চয়।

এই ঠাণ্ডার দেশে গরম জলটা আশীর্বাদই বটে। হিমালয়ের এক অঙ্গে পাথরের মত শক্ত হয়ে জমে আছে তুষার—কঠিন হিমবাহ—সেই শৈলেরই অপর অঙ্গের অভ্যন্তর ভাগ থেকে অবিরল ধারায় নেমে আসছে অতি উষ্ণ জলের ধারা। ...হিমালয় সত্যই বিচিত্র।

এখন পাহাড়ে উঠতে উঠতে দেখলাম আর এক বিচিত্র দৃশ্য। অসংখ্য গিরগিটি পাথরের উপর চলাফেরা করছে। তার এক একটির চেহারা দেখলে জাপানী ড্রাগনের কথা মনে পড়ে। আমার নাতি কৌতুহল বশে একখানা পাথর উঠিয়ে একটা গিরগিটিকে তাক করে ছুড়লো—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল।

কি-ব্যাপার! মনে হ'ল—মেয়েটি রীতিমত বিচলিত হয়েছে। সেটা ক্রোধ কিংবা করুণার অভিব্যক্তি বুঝতে পারলাম না। মোট কথা, ও উত্তেজিত হয়েছে—হাত আর মাথা নেড়ে তিব্বতী ভাষায় অনেক কিছু বলছে।

যার তাৎপর্য—এভাবে একটা প্রাণীর উপরে পাপর চোড়া ঠিক হয় নি।

ওর উত্তেজিত ভঙ্গি দেখে আমরা থামতে গিয়েছিলাম। এখানে এই পথে আরও কয়েকটি তিব্বতীকে উপরে উঠতে দেখেছি। যদি আরও জোরে চীৎকার করে মেয়েটি তাদের জড়ো করে এবং এই ধর্মবিরুদ্ধ কাজের প্রতিফল দেওয়ার জন্য লোকগুলিকে ক্ষেপিয়ে তোলে তা হ'লে সেটা বিশেষ প্রীতিপ্রদ হবে না। অতএব আমরা ইচ্ছা করেই পায়ের গতি শ্লথ করে দিলাম।

মেয়েটি আমাদের অভিপ্রায় বুঝে একটু হাসল। দু'পা নেমে এসে আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, ভয় পেলে? না, না, ভয়ো নং, এগিয়ে চল। বলতে বলতে তরতর করে উপরে উঠে গেল।

ঘোরা পথ দিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আমরাও উপরে উঠছি। একটা বাঁক ফিরে দেখি বনতুলসীর ঝোপ। আর একটু এগিয়ে দেখি এক রাখাল ছেলে গোটাকতক গরুকে খেদিয়ে নীচে নামছে। আরও একটা বাঁকের পরে ছোটখাট একটা ইস্কুল দেখলাম। ছেলেরা লম্বা লম্বা সুর করে পড়ছে। ইস্কুলের বারান্দায় সারি সারি টিনের টবে ফুলগাছের চারা। অধিকাংশই পাঁচ-মেশালী ডালডার টিন। টিনের গায়ে যে গাছ পুঁতেছে তার নাম লেখা। পাঠের সঙ্গে উদ্ভিদ-বিদ্যার পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস! ভালই লাগল। এই ছোট বয়স থেকে নিজের হাতে-পোঁতা গাছকে লালন করা ও ভাল ফুল ফোটানোর প্রতিযোগিতা মনে উত্তম রচনার উদ্যমকেই বাড়িয়ে দেয়।

ইস্কুল ছাড়িয়ে এবার কয়েকটি বসতবাড়ী চোখে পড়ল রাস্তার ধারে ছাগল চরছে, মুরগি চরছে। প্রসঙ্গত বলা যায় এই পাখীটি এই অঞ্চলের হিন্দু মহলে অচ্ছুৎ বলে গণ্য নয় কুলুতে হিন্দু সব্জি-ওয়ালার দোকানে একটি হিন্দুমেয়েকে মুরগীর ডিম কিনতে দেখেছি।

পাহাড়ের মাথায় বশিষ্ঠ কুণ্ডকে ঘিরে রীতিমত একটি গ্রামই দেখছি। কুণ্ডটি দু'টি মহলে ভাগ করা। প্রথমেই পড়ে মেয়েদের মহল। একটু ঘুরে আমরা পুরুষ মহলে এলাম। কুণ্ডে ঢুকবার আগে প্রশস্ত একটি অঙ্গন পড়ল—তার একধারে বশিষ্ঠ আশ্রম। সেটা আশ্রমই—কেননা মন্দিরের মত চূড়া নাই সেই ঘরের। ছোট পাথরের টালিতে ছাওয়া ঢালো সমেত একখানা চালাঘর। দাওয়ার উঁচু মেঝে থেকে ঘরের মেঝেটা তিন-চার হাত নীচু। সেই মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছেন বশিষ্ঠদেব। ঘরটি প্রায়ান্ধকার। মূর্তিটি মানুষের চেয়ে উঁচু, চোখে চশমা—জীবন্তবৎ। ঘরখানি আর দাওয়াটি ভারি মনোরম। হাঁটু-পীঠ সেই মেঝেতে মাটির প্রলেপ দেওয়া—যেমন আমাদের দেশে চাষী-পল্লীতে প্রতিটি কুটিরের দাওয়া আর উঠোন গোবর দিয়ে পরিপাটি করে নিকনো থাকে তেমনি তক-তক করছে। অনেকখানি চড়াই ভেঙে শরীর ক্লান্ত হয়েছিল—দাওয়ার ফুরফুরে হাওয়ায় ভারি আরাম বোধ হ'ল।

আশ্রম-সংলগ্ন আরও কয়েকখানা ঘর দেখলাম। মাটির দোতলা ঘরে পূজারী সপরিবারে বাস করছেন। আর একখানা একতলা ঘরে তপস্বাধনরত জনা কয়েক সন্ন্যাসী চিত্তকে একাগ্র করার সাধনায় মনোনিবেশ করেছেন দেখলাম। ছোট কল্কেটি ওদের হাতে হাতে ফিরছে।

একটু জিরিয়ে নিয়ে আমরা কুণ্ডের পারে এলাম। পাথরের দেওয়াল ঘেরা একটা বড় মত চৌবাচ্চায় গরম জল এসে জমছে। পাহাড়ের ভিতর থেকে একটা নল দিয়ে আসছে জল, পড়ছে চৌবাচ্চায়। কোন্ পথে যায় বয়ে যাচ্ছে—ঠিক ধরা যাচ্ছে না। যাঁরা রাজগীর কুণ্ড দেখেছেন তাঁরা ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে পারবেন।

জলে বুদ্বুদ উঠছে—কিন্তু কি গরম জল! অল্পক্ষণের জন্য হাত-পা রাখা যায় না। একজন তিব্বতী কোমর ডুবিয়ে স্নান করছিল। আমরা জল স্পর্শ করে—চীৎকার করে উঠায় লোকটি একটু হাসল। তারপর দু'বার মাথা ঠেলে আমাদের আশ্বস্ত করতে চাইল। ইঙ্গিতে-ইশারায় চলল কাজ। ও কোমর-জল থেকে উঠে এল হাঁটু-জলে। তারপর হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে কিছুক্ষণ থামল। তারপর উরু পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখল। একটু থামল। তারপর নেমে গেল কোমরজলে। আবার থামল একটু। তারপর বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে হাসল। ওর ইঙ্গিতটা বুঝলাম। আমরা পায়ের পাতা থেকে আরম্ভ করে একটু একটু তাপ সইয়ে বুক পর্যন্ত জলে ডুবলাম। অদ্ভুত একটা অনুভূতি, হাল্কা-হাল্কা ভাব, অথচ ঠাণ্ডাজলে স্নান করে যেমন স্ফূর্তি পাওয়া যায় ঠিক সেই রকমটি নয়। মনে হচ্ছে আর নয়, উঠি—অথচ উঠতেও পারছি না।

তিব্বতী যুবক আলাপ আরম্ভ করল। ওর হিন্দীর পুঁজি অতি সামান্য, কয়েকটি শব্দ মাত্র আয়ত্তে, কিন্তু সেই

মন খুঁজি আর ইঙ্গিত-ইশারায় কয়েকটি মুহূর্তে আমাদের আলাপটা মন্দ জমল না।

তিব্বতী বলল, পেটে বেশ করে গরম জল লাগাও—উপকার পাবে।

বললাম, ভারি গরম।

ও হেসে বলল, এর চেয়ে রাজগীরের জল গরম। তুমি রাজগীর গেছ?

বললাম, গিয়েছি। তুমি সারনাথে গেছ?

ও এবার খুশি হয়ে উঠল। বলল, নিশ্চয়। তুমি বোধগয়া গেছ?

বললাম, নিশ্চয়। তুমি কুশীনগর গেছ?

ও মাথা নেড়ে বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি লুম্বিনী দেখেছ নিশ্চয়?

বললাম, না—দেখি নি।

ও বলল, নিশ্চয় দেখবে। ভাল লাগবে।

আলাপের ধরন দেখে বোঝা যায় লোকটি বৌদ্ধ। বুদ্ধের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করে। আমি এতগুলি বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করেছি বলে আমাকে ও মনে করেছে বন্ধু।

কথায় কথায় জানালে, কলকাতাতেও ওরা গেছে। আজ ওরা নিঃস্ব, দলাই লামার সঙ্গে তিব্বত ছেড়েছে। সেই থেকে ভারতবর্ষের যেখানে যত বৌদ্ধ তীর্থ আছে ঘুরে ঘুরে দেখছে। ভারতবর্ষ ওর ভাল লাগছে।

বললাম, এখানকার মানুষগুলিকে কেমন লাগছে?

অত্যন্ত খুশি হয়ে জবাব দিলে, বহুৎ আচ্ছা আদমি। নেহরু বহুৎ আচ্ছা আদমি।—বহুৎ আচ্ছা আদমি।

ওর নেহরু-প্রশস্তি যেন শেষ হতে চায় না।

চীনের কথায় ওর মুখখানা কালো হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে তিব্বতী ভাষায় কি একটা কথা বলল—যার অর্থ বুঝলাম না, কিন্তু বিদ্বেষটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অবশেষে আমরা জল থেকে উঠলাম। বিদায় নিলাম। কোথায় তিব্বত আর কোথায় বাংলা দেশ! দুস্তর ব্যবধান রচনা করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়, অভ্রভেদী হিমালয়। হাজার হাজার মাইলের মাঝখানে আরও কয়েকটি রাজ্য, দুর্বোধ্য ভাষা, বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ আর আচার-নিয়মের বেড়া। কিন্তু মানুষের মন যদি একবার সমভূমিতে নামল, একবার ভাবতরঙ্গে দোলা খেয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারল, তখন সব বাধাই তুচ্ছ!

স্নান সেরে আমরা বশিষ্ঠদেবের সামনে এসে দাঁড়ালাম। পুজারী তাঁর শ্বেত পাথরে বাঁধানো দোতলা থেকে নেমে এলেন। তাঁর নির্দেশে আমরা ঋষিমূর্তির সামনে এলাম। উনি আমাদের কপালে বিভূতির ফোঁটা দিলেন। কোন দক্ষিণা দাবি করলেন না।

নামবার সময় আর একটি অপরূপকে দেখলাম। যে হিমবাহকে যাবে আসার কালে দেখেছিলাম মেঘের কোলে চিত্রলেখাবৎ—সে এখন রজতগিরিসন্নিভ মূর্তিতে আমাদের অতি নিকটে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে রোহটাং গিরিসঙ্কট, তারই হিমবাহ গোড়া নীল আকাশের কোলে অপরূপ হয়ে উঠল।

বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা সেই আশ্চর্য্য রজত রূপকে দেখতে লাগলাম।

নীচে এসে পাশাপাশি দুটি দৃশ্য চোখে পড়ল। একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য—তার পাশে চলমান লোকযাত্রার ছবি। সেখানে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল বই কি। পাহাড় সেখানে ত্রিধা-বিভক্ত। তিন দিক থেকে তিনটি প্রবল ধারা এসে মিশেছে বিপাশায়। ওই তিনটি ধারার সম্মিলিত শক্তিতে বিপাশা আরও বেগবতী ও কলরবমুখরা হয়েছে। ধারা তিনটি পৃথক পৃথক তিনটি নদী কি না জানি না, হয়ত মূল বিপাশাকেই আরও ঊর্দ্ধের শৈলমালা এইভাবে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের খাদ ও অরণ্য পার হয়ে এসে এই বাঁকের মুখে ধারা তিনটি এক হয়েছে পুনরায়। আমরা কিন্তু ত্রিবেণী সঙ্গমই দেখলাম। আর দেখলাম এই মনোরম স্থানে পথের ধারে যে প্রশস্ত অঙ্গনটুকু রয়েছে—তাতে একটি ভর্ত্য-গোষ্ঠী তাঁবু ফেলেছে। তাঁবুর এপাশে ওপাশে গরু ছাগল ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে—মেয়েরা রান্না চাপিয়েছে—কেউ বুনছে পশমের আবরণ, কেউ বা চলছে গাগরী-ভরণে। পুরুষরা খাটিয়ায় বসে তামাক টানছে আর গল্প করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খচ্চরের পিঠে চেপে—ছাগল ভেড়াকে তাড়া দিয়ে পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে যত প্রকৃতির রূপটিকে অনাবৃত করছে। খোলা জায়গায় হিম আর ধুলো খেয়ে খেয়ে ওদের দেহবর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন বটে—স্বাস্থ্য সম্পদে ছেলেমেয়েরা বা তাদের বাপ-মায়েরা কেউ কম নয়। আর নাক মুখ চোখ দেহের রং আর ধাঁচের সব মিলিয়ে ওরা এই দেবভূমিরই যোগ্যতর প্রতিনিধি। খাঁদা নাক, কুতকুতে চোখ, হাড়-উঁচু চোয়াল—মঙ্গোল টাইপের বেঁটে চেহারা একটিও চোখে পড়ল না।

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন আগেকার একটি কথা মনে

পড়ছে। তখন প্রবাসী পত্রিকায় হিমালয়-দুহিতা গৌরীর কয়েকটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সেই ছবিতে গৌরীর মুখের আদল ঠিক আমাদের বাংলা দেশের মেয়েদের মত ছিল না। ঈষৎ চ্যাপ্টা মুখ আর খাঁদা নাকগুলিতে মঙ্গোল প্রভাব পড়েছিল। পর পর কয়েকটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল একই ছাঁচের। একজন সহঃ-সম্পাদক সেদিন রহস্য করে বলেছিলেন, চিত্রকর বোধ করি মানস নেপাল ভুটানে বেশ কিছুদিন ছিলেন—না হ'লে ওঁর গৌরীরা এমন খাঁদা হচ্ছেন কেন!

হিমাচলের অধিবাসী মাত্রই যে মঙ্গোল টাইপের হবে এমন কিছু নয়। দু' ধারার মাইলের ব্যবধানে একই হিমালয়ের রূপান্তর যেমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ, তেমনি জনপদবাসীদের কাঠামোর প্রভেদটাও লক্ষণীয়। আরও একটি কথা—পুরাতন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী—সর্বভারতীয় কাহিনী। দেশ কাল পাত্র এবং রুচিভেদে ঘটনা ও পাত্রপাত্রীদের সাজিয়ে নেওয়ার রীতিটা স্বাভাবিক। আমাদের দেশের রাম-সীতাকে যে পোশাকে, যে মূর্তিতে আমরা কল্পনা করে থাকি—উত্তরপ্রদেশে, পাঞ্জাবে অথবা তামিলনাড়ে পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে আমরা অবিকল সেই চেহারায় দেখতে পাই না। অমৃতসরের দুর্গামন্দিরের বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজধামের ত্রিভঙ্গিম ঠাম বাঁকা-শ্যামকে মেলাতে গেলেই মুশকিল। দেশে কালে রীতি-প্রকরণে রূপান্তরিত সর্বভারতীয় ছবির রূপটি এই রকমই ভিন্নতর। সেই রূপকে ও রীতিকে দেশজ মহিমায় উত্তীর্ণ করে দিতে না পারলে দেশের মানুষের মনে সেই ছবি ঠাঁই করে নিতে পারে না। উক্ত শিল্পীর আঁকা উমা ঐতিহাসিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রাদেশিক সত্যে প্রাণবন্ত হয় নি, আর সেই কারণেই আমাদের মনে অমনি একটি বিরূপ প্রশ্ন উঠেছিল।

বিপাশার ত্রিধারা সঙ্গমে সেই চলমান গুর্জর দলের সংসারযাত্রার ছবিটি আজও অত্যন্ত উজ্জ্বল। নদীর ধারা-পথ বেয়ে আদিকালের মানবগোষ্ঠীর বিচরণ-লীলাকেই যেন প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে।

সেদিন বাসায় ফিরতে দুপুর উৎরে গিয়েছিল—ক্ষুধাপিপাসা পথশ্রমে পীড়িত হয়েছিলাম, তবু যতক্ষণ পথে ছিলাম বিচিত্ররূপিণী প্রকৃতি আমাদের ক্লান্তিকে তীব্রভাবে অনুভব করতে দেয় নি। বাসায় চার-দেওয়ালের মধ্যে এসে অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করলাম। তৃষ্ণা ও ক্ষুধা যুগপৎ আক্রমণ করল। আমরা শুয়ে পড়লাম।

কুলু উপত্যকার তিলোত্তমা হ'ল মানালী। তিল তিল শৈল-সৌন্দর্য্য নিয়ে এর সৃষ্টি। সৌন্দর্য্যে এই উপত্যকা বিচিত্র। উপত্যকার সব জায়গায় রূপটি সমান নয়। এক একটি পাহাড়ের প্রাচীরের বন্দী-ভূমি অংশের এক এক রূপ। এক একটি বাঁকের শেষে ভিন্ন স্বাদের এক একটি ছবি। এই ছবির চরম উৎকর্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানালি। তাই বিদেশীরা এর নাম দিয়েছে কুলু উপত্যকার রাণী। গণতন্ত্রের যুগে এই উপমা যুক্তি নয়, সঙ্গত নয়। আজ পৃথিবীতে রাজরাণীর যুগ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এলেও এর মোহ বা উপমা প্রয়োগরীতি আরও বেশ কিছুকাল মানুষের মন থেকে যাবে না। অন্তত ইতিহাস এই উপমার কথা আরও কিছুকাল ধরে রাখবে। বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে চলেছে মানবগোষ্ঠী। সুদূর ভবিষ্যতে—কে বলতে পারে বৈচিত্র্য-পিয়াসী মনের তাগিদে আবার এরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠবে না!

মানালী কিন্তু ভ্রমণকারীদের স্বর্গলোক। যাঁরা নিশ্চিন্ত আরামে স্ত্রী-পুত্র-কলত্র ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে বর্মাচ্ছাদিত হয়ে পীচ-বাঁধানো পথে ধীরে ধীরে চলাফেরা করেন, একটি টিলায় উঠে পরিশ্রান্ত দেহকে শিলাসনে ন্যস্ত করে প্রাকৃতিক দৃশ্য-শোভায় অভিভূত হন, দূর থেকে হিমবাহকে দেখে হিমবাহ উত্তরণের স্বাদকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন, কচিৎ বিপাশার উদ্দাম স্রোতধারাকে স্পর্শ করে রোমাঞ্চিত কলেবর হন, তাঁদের পক্ষে মানালী ত স্বর্গলোকই। অতি আরামের মধ্যে লালিত-পালিত রোমান্সকে তাঁরা পুরোপুরিই ভোগ করতে পারবেন। আর যাঁদের অস্থি-মজ্জা শোণিতে এখানকার তরঙ্গ-কুটিলা তরঙ্গী বিপাশা—বিপদসঙ্কুল অরণ্যানী ও পাকদণ্ডির দুরূহ দুস্তর গিরিপথগুলি আত্মগোপন করে আছে তাঁরা মানালীকে ঘাঁটি করে নিজেদের দূর দূরান্তে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবার আনন্দে অনায়াসে মেতে উঠতে পারবেন। দু' রকমের মানুষই ত চোখে পড়ল।

সেইদিন অপরাহ্ণে বেমনদের আপেল বাগানে বসে শান্ত স্থির আত্মসমাহিত মানালীকে দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল, আদি জীবনের কামনার অঙ্কুরগুলি কোন্ পথ ধরে সংখ্যাতীত দিনরাত্রির দণ্ড প্রহর পার হয়ে বর্তমানের মনোভূমিতে প্রসারিত হবার অবকাশ পেল, এবং এইখানেই তার মহীরুহ-জীবনের পূর্ণ পরিণতি ঘটল না। কত রূত শতাব্দী আগে যে মানুষের কামনা

পায়ের চিহ্ন ফেলেছিল এই কুমারী মৃত্তিকায়, আজ কত লক্ষ বছর পরে সেই মানুষের উত্তরপুরুষরা তেমনি কামনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসছে সেই তীর্থভূমিতে। এখানে প্রকৃতি যেমন অবারিত, আদি কামনার ক্ষেত্রটি তেমনি আদিগন্ত-বিস্তৃত ভূমিতে বিস্তৃত। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তন ধারা উর্বরা পলি-মাটিতে জমিয়ে রেখেছে কল্পনার ঐশ্বর্য্য,—কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঐশ্বর্য্য। প্রকৃতির কোলে এসে মানুষ নূতন করে রচনা করেছে নিজ নিজ প্রকৃতিকে। প্রকৃত দুঃখ-কষ্ট ভোগ না করেও তার স্বাদকে পেতে চাইছে—রোমান্টিক মন নির্দয় রোমান্সের মুখোমুখি না দাঁড়িয়েও—সেই উত্তেজনাটুকু আভাসে-ইঙ্গিতে ধরতে চাইছে। যদি মেনে নেওয়া যায়—এটি মনেরই বিলাস, ক্ষতি কি! বিলাস আছে বলেই ত মন বিচিত্র, মনের কল্পনা নিত্য-নূতন। জীবন নিত্য-নূতন বস্তুকে সন্ধান করে ফিরছে প্রতিক্ষণে, না হ'লে জীবনের অর্থই বা কি!

অতএব বৈচিত্র্য-সন্ধানী জীবনের অর্থ খুঁজতে হ'লে মানালীতে আসতেই হবে। আরও পাঁচ হাজার ফুট দুর্গম চড়াই ভেঙে উঠতেই হবে—মানালি গ্রামের শিরোদেশে। ওইখানেই বিজয়া রাণার দুর্গ-ভবনের ভগ্নাংশ রয়েছে। জনশ্রুতি ওই ভগ্নাবশেষ দুর্গ-প্রান্তরে আজও নাকি অশরীর আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সারারাত ধরে। ওরা নাকি রাজমহিষীর দল। কোন এক সময়ে রাণা যুদ্ধযাত্রা করে আর ফিরে আসেন নি দুর্গে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শত্রুহস্তে লাঞ্ছিতা হবার ভয়ে রাণীরা ওই দুর্গাভ্যন্তরে আত্মবিসর্জন করেছিলেন। এগারো হাজার ফুট উপরের এই গিরিচূড়ায় উঠতে পারলে দেবতাত্মার মহিমময় রূপটি কেমন হবে সেটা আমরা কল্পনা করেই নিলাম।

বন-বিভাগের ডাক বাংলোর পিছনে যে পাইন অরণ্য ভূমি প্রসারিত তার ঢেউখেলানো নদীশাখা শৃঙ্খলিত ছবিটিও কম মনোহর নয়। তারই উত্তরে মানালসু প্রবাহটি অরণ্যভূমিকে আশ্রমের রূপ দিয়েছে।

মানালি থেকে কোটি যাও, রোহালা যাও, রোহটাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম কর কিংবা চাঁদির শিরোদেশে ভক্ত-বৎসল ভৃগু দর্শন কর—সারা লাহুল উপত্যকাই তোমাকে মুগ্ধ করবে। আরও দূরে ব্যাস গিরিশৃঙ্গে গিয়ে বিপাশার জন্মস্থানটিকে প্রত্যক্ষ কর নব নব আবিষ্কারের বাতায়ন খুলে যাবে তোমার সামনে। বিপাশা যেখানে ভগ্নপথ বেয়ে অতি সঙ্কীর্ণ গুহামুখে সগর্জ্জনে সহসা আত্মপ্রকাশ করেছে মানালি থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে—সেই কোটিতেই কি বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা আছে! এ-ছাড়া মণিকরণের উষ্ণ কুণ্ডে স্নান সেরে ওই গরম জলেই চাল ডাল যা কিছু আনাজ সিদ্ধ করে নিয়ে—বা চাপাটি বানিয়ে আহার-পর্ব্ব সেরে নিশ্চিন্তে চলে যেতে পার আরও দূরে পার্ব্বতী উপত্যকায়। মাত্র সপ্তাহকালের যাত্রা। একটি তাঁবু—একটি ঘোড়া আর একজন পথ-প্রদর্শক আর সপ্তাহ খানেকের রসদ থাকলেই এই ভ্রমণ অভিযান পর্য্যায়ে উঠবে। অভিযান শেষ করে ফিরে এসে সে কাহিনী কৌতূহলী শ্রোতাদের শোনালে তারাও পুলক-রোমাঞ্চে বিহ্বল হবে। পথ একেবারে জনশূন্য নয়, দু'একটি জায়গায় বিশ্রামের জন্য রেস্ট-হাউসও রয়েছে।

এ ছাড়াও যদি অন্তহীন তুষার রাজ্যে বিচরণ করতে চাও তা হ'লে পনরো হাজার ফুট উঁচু কুনজুম্ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে চলে যাও স্পিতি উপত্যকায়। তরু-পাদপহীন সেই উপত্যকায় তুষার-নদীগুলি তোমাকে সুমধুর সঙ্গীত শোনাবে, এবং ছুঁচে-চোখ, উঁচু-চোয়াল মঙ্গোল ছাঁদের বেঁটে মানুষগুলিকে দেখে ভাববে—দেশ-ভূমি ছাড়িয়ে নিশ্চয় আর একটি নূতনতর রাজ্যে এসে পড়েছ। সেই রাজ্যের সঙ্গে তিব্বতীদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। হিমালয় তার বহুশত মাইলব্যাপী সাম্রাজ্যের এক এক অংশে এক এক রকমের প্রকৃতির নিলয় তৈরী করে রেখেছে। নদী ও শৈল সমাবেশে এক একটি অঞ্চল সম্পূর্ণ পৃথক জলহাওয়াতে অভিনটা অনুভূত হয়, আর সেই সেই রাজ্যের বাসিন্দারাও দৈহিক গঠনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-নিয়মে বৈচিত্র্যকে বহন করে ফিরছে। এই ভূখণ্ডে সবই নূতন—সবই বিচিত্র; আর সেই কারণেই দুর্গম দুস্তর হিমালয় দুঃসাহসী পথিককে কোনদিনই আনন্দের ভোজ্যে বঞ্চিত করে না।

সর্ব্বশেষে একটি রূপকথা শোনাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। কাহিনীটা বহু পুরাতন, রাজা-রাজড়ারা যখন প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতেন সেই সময়কার। সেই সময়ে নাগার ও মানালি দু'জায়গাতেই দু'জন রাজা ছিলেন। কোন এক সময়ে নাগারের যুবরাজের সঙ্গে মানালির রাজকন্যার বিবাহ হয়। সেকালের রীতি অনুযায়ী বিবাহের পর রাজকন্যারা কোনদিনই পিতৃগৃহে ফিরে আসতেন না। বহুদিন শ্বশুরালয়ে থাকবার পর মানালির রাজকন্যার ইচ্ছা হ'ল একবার পিতৃ-ভবনে ফিরে যাবার। যে প্রাসাদে তিনি জন্মেছেন তার আশেপাশের পার্ব্বত্যভূমি, যেখানে তাঁর

শৈশব কৈশোরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, সেই জায়গাতে একবার ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রবল হ'ল। ব্যাকুল হয়ে রাজকন্যা তাঁর বাবাকে পত্র দিলেন নিয়ে যাবার জন্য। যখন পত্র এসে পৌঁছল—রাজা ও রাণী তখন প্রাসাদ-সংলগ্ন ফুলবাগানে বেড়াচ্ছিলেন। রাজা সাগ্রহে চিঠি-খানা খুলে ফেললেন এবং রাণীকে পড়ে শোনালেন রাজকন্যা যা লিখেছেন। রাণী ত সেই চিঠির কথা শুনলেন—আর শুনল মৌমাছিরা। ওরা তখন ফুল-বাগানে ফুলের মধু সংগ্রহ করছিল। চিঠির ভাষায় রাজকুমারীর হৃদয়ের আর্তি মিশেছিল। জন্মভূমিকে একবার দেখবার জন্য, তার প্রতিটি বস্তুকে স্পর্শ করবার জন্য করুণ মিনতি যেন ঝরে পড়ছিল। অথচ সে আশা পূরণের কোন উপায় ছিল না। রাজকুমারীর মনো-বেদনা মৌমাছিদের মনে মমতা সঞ্চার করল, ওরা বিচলিত হ'ল। ওরা ঠিক করল—যেমন করে হোক রাজকন্যার এই কামনাকে পূর্ণ করবে। রাজবিধান অনুসারে রাজকন্যা ত ফিরে আসতে পারবেন না পিতৃরাজ্যে—তবে কেমন করে তাঁর মনোভিলাষ পূর্ণ হবে? ওরা পরামর্শ করে একটা উপায় বার করল এবং সেইমত কাজ আরম্ভ করে দিল। রাজ-ভবনের পাশে যে পাহাড়টি ছিল ওরা তার থেকে একখানা বড় পাথর কেটে ফেললে। অবশ্য এই কাজ করতে ওদের বেশ কিছুদিন লেগেছিল। তারপর সেই কাটা পাথর-খানা বয়ে নিয়ে গেল নাগার রাজপ্রাসাদে শৈশব-স্মৃতি-জড়িত সেই পাথরখানা দেখে রাজকুমারী কি পরিমাণ খুশি হয়েছিলেন সেটা অনুমানের বিষয়, কিন্তু নাসাদি থেকে দু'মাইল দূরে একটি খাড়া পাহাড়ের গায়ে ত্রিকোণ-বিশিষ্ট একটি শূন্যস্থান দেখিয়ে এখানকার লোকেরা বলবে—এইখান থেকেই পাথরখানা কেটে নাগারে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল মৌমাছিরা। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, নাগার দুর্গের মধ্যে ছোট মন্দিরাভ্যন্তরে ঠিক ওই আকৃতির একখানা পাথরও রয়েছে! ঘটনাটা হয়ত কাকতালীয়বৎ, কিন্তু কাহিনী-রচয়িতার দরদী মনকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশের খাদ্যসংকট বিষয়ে নিম্নলিখিত জরুরী সংবাদগুলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে :

নয়াদিল্লী, ২৩শে নভেম্বর : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী লোক-সভায় আজ বলেন যে মজুরদের (অর্থাৎ যারা কায়িক পরিশ্রম করে থাকেন) জন্য অতিরিক্ত খাদ্য-বরাদ্দের ব্যবস্থা করবার বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিচারাধীন রয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি এই সম্পর্কে কতটা করে অতিরিক্ত খাদ্যবরাদ্দের ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেই হিসাব বিচার করছেন।

এর পূর্বে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শ্রী ডি আর চাবন বলেন যে দেশের সামগ্রিক খাদ্য-বাজেট বর্তমানে রচনাধীন রয়েছে ; বিভিন্ন রাজ্যের অতিরিক্ত বা ঘাটতি (surp-luses or deficits) উৎপাদনের হিসাব করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে কলকাতা র‍্যাশনবিধৃত এলাকায় প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য সপ্তাহে ১৯০০ গ্রাম এবং মাদ্রাজ ও কয়ম্বাটুরে ২০০০ গ্রাম হিসাবে বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী বলেন যে সমগ্র দেশের জন্য একই মাপে খাদ্য-বরাদ্দের ব্যবস্থা করা কঠিন। তিনি বলেন যে কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবার উদ্দেশ্য এই যে, ঐভাবে কতকগুলি অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতাসম্পন্ন এলাকাগুলিকে আলাদা (seal off) করে দেওয়া ; এর ফলে গ্রামগুলিতে খাদ্য-শস্যের সরবরাহ চালু রাখা সম্ভব হবে।

কলকাতা, ২৬শে নভেম্বর (সংবাদদাতার সংবাদ) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থা যদি অবিলম্বে চালু না করা হয় তবে এর সাফল্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের কারণ রয়েছে। ইতিমধ্যেই গ্রামগুলিতে নতুন ফসলের প্রচুর পরিমাণ ধান বিক্রী হতে সুরু করেছে—কোন কোন ক্ষেত্রে ফসল ওঠবার পূর্বেই মাঠের ধান বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ জেলা শাসকগণ আশঙ্কা করছেন যে সরকার যদি সংগ্রহ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করতে আর দেরি করেন তবে জমির মালিকদের ওপর যে দাবীর (levy on land holdings) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, সেটি সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে যাবে।.

কলকাতার র‍্যাশন-বিধৃত এলাকার সংলগ্ন হাওড়া এবং ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত অঞ্চলগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, ছোট ছোট খুচরা দোকানে ইতিমধ্যেই নূতন ধানের চাউল ১·৭৫ টাকা বা তার চেয়েও বেশী দামে বিক্রী হচ্ছে। দোকানদারদের কাছে জানা গেল যে, জেলার মধ্য এলাকায় প্রায় দেড় সপ্তাহ আগে থেকেই নূতন ফসল উঠতে সুরু করেছে এবং সেখান থেকেই এই চাউল সংগ্রহ হয়েছে।

হাল্তু এলাকায় সুবোধ মল্লিক রোডের এক পাড় কলকাতার র‍্যাশন এলাকার মধ্যে পড়ে, উল্টো পাড়টি মডিফায়েড র‍্যাশন এলাকা। কয়েক সপ্তাহ ধরে মডি-ফায়েড র‍্যাশন দোকানগুলিতে চাউলের সরবরাহ না পৌছুবার ফলে বেসরকারী দোকানগুলি থেকে মানুষকে বাধ্য হয়ে চাউল কিনে খেতে হচ্ছে ; দাম মোটামুটি ১·৭৬ থেকে ২·৭০ টাকার মধ্যে ওঠা নামা করেছে।

খুচরো দোকানদারের কোন নালিশ নেই, কেননা এ পর্য্যন্ত তাঁদের কেনা-বেচার ওপরে এন্‌ফোর্সমেন্ট বিভাগের হাত পড়ে নি। এমন কি চাউলের চলাচল বন্ধ রাখবার উদ্দেশে জেলা শাসন-কর্তৃপক্ষের জারী-করা আদেশ বলবৎ থাকা সত্বেও এঁরা অবাধে বারুই, জয়নগর, ক্যানিং, কুলতলী ইত্যাদি স্থান থেকে চাউল সংগ্রহ ও আমদানী করতে পারছেন। কেবলমাত্র সম্প্রতি দু-একটি ক্ষেত্রে জনতা এই চলাচলে বাধা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে।

মনে হয় জেলা শাসক এইভাবে চাউলের নির্দিষ্ট আইনানুমোদিত দাম অমান্য করবার ঘটনার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেন নি, কেননা, এভাবে অন্ততঃ লোকে খুব উচ্চ মূল্যে হলেও কিছুটা খাবার ব্যবস্থা করতে পারছে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে মডিফায়েড র‍্যাশন দোকানগুলিতে চাউলের সরবরাহ বন্ধ আছে এবং এই সরবরাহে বিরতির ফলে চাউলের এবং ধানের দর এত বেড়ে চলেছে। নূতন ধান এই এলাকায় অল্প-বেশী ৩৫ টাকা মণ দরে বিক্রী হচ্ছে এবং দাম একবার বাড়লে সেটি যে সাধারণত আর কমে না সেও জানা কথা।

কোন একটি জেলা শাসন অধিকরণের জনৈক মুখপাত্র বলেন সরকারের নির্দিষ্ট মণ-প্রতি ১৪, ১৫, এবং ১৬ টাকা দরে ধান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। যখন খোলা-বাজারে ৩৫৲ দাম পাওয়া যাচ্ছে, তখন এই দামে বিক্রীর দায়িত্ব এড়াবার সব রকম চেষ্টা যে হবেই, সেটা নিঃসন্দেহ। তার ওপর লেভী অর্ডার জারি করায় সরকারের এই বিষম ব্যাপারটাকে যে আরও জটিল করে তুলবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কলকাতা, ২৭শে নভেম্বর (সংবাদদাতার সংবাদ): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাউল এবং ধানের সর্বাত্মক (monopoly or total) সংগ্রহ ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে যেটি সবচেয়ে জরুরী প্রয়োগ, অর্থাৎ "পশ্চিমবঙ্গ চাউল কল নিয়ন্ত্রণ আদেশ" সেটি আজ জারি করা হয়েছে। এই আদেশ আগামী ১লা ডিসেম্বর তারিখ থেকে চালু হবে।

এই আদেশের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের ৭০০ চাউল কলগুলির ওপরে নির্দেশ জারি করা হল যে, এদের সম্পূর্ণ উৎপাদন এরা সরকারে চালান (deliver) করতে বাধ্য থাকবে; তাছাড়া এই আদেশের দ্বারা চাউল কলগুলির ওপর নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে তারা তাদের নিজেদের খরিদ-করা বা সরকারের মারফৎ প্রাপ্ত ধান ছাড়া আর কাহারও ধান তাদের নিজ নিজ কলে ভানতে পারবে না। এই আদেশটি সরকারী খাদ্যনীতির একটি প্রধানতম প্রয়োগ, কেননা এই মিলগুলির সম্পূর্ণ উৎপাদন সাফল্যের সঙ্গে হস্তগত করতে পারার ওপরই নির্ভর করবে এ বৎসর সরকারী সংগ্রহে মোট ১৫ লক্ষ টন চাউল জমা করবার সিদ্ধান্তের সাফল্য। এই ১৫ লক্ষ টনের মধ্যে চাউল মিলগুলির কাছ থেকে ৮ লক্ষ টন এবং অবশিষ্টাংশ সমবায় সমিতিগুলি থেকে এবং সরকারী নিজস্ব প্রয়োগের দ্বারা সংগৃহীত হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

এই আদেশ অনুযায়ী চাউল মিলগুলিকে সরকারী অনুশাসন অনুযায়ী এবং নির্দিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ অনুযায়ী ধান ক্রয় করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে. এই আদেশটি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক পূর্বপ্রচারিত ১৯৬৬ সালের সরকারী খাদ্যনীতির সম্পূর্ণ অনুসারক নয় বলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই পূর্বপ্রচারিত বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বলেন: "সরকার চাউল কলগুলিকে কেবলমাত্র তাদের নিজ নিজ অবস্থানের সংলগ্ন এলাকা থেকে ধান সংগ্রহ করবার অধিকার দেবেন।"

অতীতে এই অভিযোগ বারংবার করা হয়েছে যে চাউল মিলগুলি তাদের উৎপাদনের অঙ্ক ইচ্ছে করে কম করে দেখিয়ে সরকারের বর্তমান সম্পূর্ণ উৎপাদনের ওপরে লেভীর আদেশ ফাঁকি দেবার সুযোগ করে নেবে। সব মিলগুলি মিলে বার্ষিক মাত্র ৮ লক্ষ টন উৎপাদনের হিসাব পশ্চিম বঙ্গের মোট ৪৫ লক্ষ টন চাউলের উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে অসম্ভব কম বলে মনে হয়। কেননা ঢেঁকি বা হাতে ভাঙা চাউলের পরিমাণ অনেকদিন থেকেই খুবই সামান্য বলে দেখা যাচ্ছে। বস্তুতঃ রাজ্যের চাউলের মোট উৎপাদনের অধিকাংশ পরিমাণটাই হয় মিলে কিংবা হাস্কিং মেশিনে প্রস্তুত হয়ে থাকে। হাস্কিং মেশিনে বার্ষিক প্রায় ৩৭ লক্ষ টন চাউল প্রস্তুত হয়ে থাকে, একথা সহজে মানা চলে না।

খাদ্য দপ্তরের কোন কোন কর্মচারী মনে করেন যে অনেক বৎসর ধরেই মিলগুলি তাঁদের উৎপাদনের অঙ্ক বাস্তবের তুলনায় অনেক কম করে দেখিয়ে আসছেন. অবশ্য এটা যে লেভী আদেশ অমান্য করবার জন্য করা হ'ত তা নয়, কেননা এই আদেশটি ত মাত্র সম্প্রতি জারি করা হয়েছে; এটা করা হত, তাঁরা মনে করেন, আয়কর ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে।

অবশ্য খাদ্য-ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে ১২,০০০ হাজার হাস্কিং মেশিনের সরকারী হিসাব ভুল, এর বাস্তব সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ হাজার। এরা অনেক আগে থেকেই মাঠের ফসল কিনতে শুরু করেছে, কেননা

রা মিলেদের তুলনায় বেশী দাম দিতে সমর্থ; মিলদের পর সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী ধানের খরিদ দাম ১৪, টাকা, ১৫ টাকা এবং ১৬ টাকায় মণ-প্রতি বেঁধে দেওয়া রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে-শতাধিক মিল-মালিকরা চধান সরকারী সংগ্রহ-নীতি অনুযায়ী সরকারী এজেন্ট হিসাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তাঁদের খরিদ করবার এলাকাগুলিকে মিলের অবস্থানের সংলগ্ন অঞ্চলের মধ্যে সীমিত করে দেবার ফলে বড় বড় মিলগুলি অসুবিধায় পড়বেন বলে আশঙ্কা করেন। তাঁরা আশঙ্কা করেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমগ্র উৎপাদনটাই ছোট ছোট মিলগুলির চাহিদা মেটাতে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং দূর থেকে বড় মিলদের ধান সংগ্রহ করতে না দিলে সেগুলি বেকার হয়ে পড়বে।

কলকাতা ২৯শে নভেম্বর (সংবাদদাতার সংবাদ): ...শ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে ...ন যে রাজ্য সরকারের নূতন খাদ্য-নীতি অনুসরণে যে ...প্রয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার ফলে বর্তমানের ...সঙ্কটটিকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। বিরোধী দল ...মুখপাত্ররা কিন্তু আশঙ্কা করেন যে সম্প্রতি ঘোষিত ...খাদ্যনীতিতে জোতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে ...প্রয়োগ ব্যবস্থা গৃহীত না হবার ফলে এ নীতি সম্পূর্ণ ...পর্যবসিত হবে এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ...সঙ্কট আরও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করবে।

মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য-বিতর্কের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিধান সভায় ...তাঁর সরকারের নূতন খাদ্যনীতি বাস্তবপক্ষে গত ...প্রয়োগেরই পরম্পরা রক্ষা করে চলবে। গত ...প্রয়োগ আংশিকভাবে সার্থক প্রমাণিত হয়েছে— ...রাশনিং ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু ...মূল্যনিয়ন্ত্রণ-বিধি জেলাগুলিতে সার্থক ভাবে ...করা সম্ভব হয় নি। বর্তমান নীতির প্রয়োগের ...এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে ...। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ ...হয়:

উৎপাদনকারী চাষী ধানের বদলে লেভী অনুযায়ী ...শস্য চাউলেও দিতে পারবেন এবং তার জন্য ...একটা নির্দিষ্ট অতিরিক্ত দাম পাবেন;

সরকার থেকে চাউলের সঙ্গে সঙ্গে চিঁড়াও খরিদ করা হবে (পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে ৪০,০০০ হাজার টন ধানের চিঁড়া প্রস্তুত হয়) এবং এই চিঁড়া র‍্যাশন দোকানে বিক্রী করা হবে; যাঁরা চিঁড়া নেবেন, তাঁদের সমপরিমাণ চাউল ছেড়ে দিতে হবে;

জেলা শাসকগণকে ক্ষমতা দেওয়া হবে যাতে মডিফায়েড র‍্যাশনিং অর্ডার অনুযায়ী র‍্যাশনের পরিমাণের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রয়োজন বোধে কিঞ্চিৎ রদবদল করা সম্ভব হয়;

মিলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা ধান খরিদ করবার জন্য তাদের লোকেদের গ্রামে না পাঠায়;

হাস্কিং মেশিনের কারবার নিয়ন্ত্রীকরণ করা হবে;

খাদ্যশস্যের সর্বপ্রকার বেসরকারী পাইকারী ব্যবসা বন্ধ করা হবে;

খাদ্যশস্য চলাচল নিয়ন্ত্রিত (cordoning) করা হবে; এবং জেলাগুলিতে মডিফায়েড র‍্যাশনিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।

খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থা সরাসরি সরকারের কিংবা সমবায় সমিতিদের অধিকারভুক্ত থাকবে!

অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে লেভী ধার্য্য করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে করে একদিকে সরকার যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য সার্থকভাবে সংগ্রহ করতে পারবেন, অন্যদিকে তেমনি দেশবাসীকে অসৎ ব্যাপারীদের মুনাফাখোরির প্রতিঘাত থেকে রক্ষা করতে পারা যাবে। ঘাটতি জেলাতেও বড় জোতদারদের এই উদ্দেশ্যে লেভীর অধীন করা হয়েছে।

ধানের দর, এগ্রিকালচার প্রাইসেস্ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, মণ প্রতি, পর্য্যায় হিসাবে, ১৪, ১৫, ও ১৬, টাকায় ধার্য্য করা হয়েছে।

নয়াদিল্লী, ২৯শে নভেম্বর (সংবাদদাতার সংবাদ): রোম সফর থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম্ দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-সচিব, মিঃ অরভীল্ ফ্রীম্যানের সঙ্গে তাঁর আলোচনার ফলাফল তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। বর্তমানে মিঃ ফ্রীম্যান পি এল ৪৮০ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম রপ্তানীর বিরুদ্ধ নন, কিন্তু শ্রী সুব্রহ্মণ্যম তাঁকে বোঝাতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যে আমেরিকার

রাষ্ট্রসারকদের যে ধারণার ফলে পি এল ৪৮০ অনুযায়ী ভারতে গম রপ্তানীতে বিঘ্ন ঘটছে, অর্থাৎ ভারতের আর্থিক উন্নয়নের ধারায় মূলধন সময়ের মধ্যে ভারতে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধন সম্পর্কীয় প্রয়োগের অভাব, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি মিঃ ফ্রীম্যানকে ভারতে কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কীয় নূতন প্রয়োগের কথা জানিয়েছেন।

নয়া দিল্লী, ২৯শে নভেম্বর: আজ কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী শ্রী সুব্রহ্মণ্যম রাজ্য সভাতে বলেন যে রাষ্ট্রায়ত্ত বণ্টন ব্যবস্থায় মাথাপিছু দৈনিক ১২ আউন্স খাদ্যশস্যের বরাদ্দের ব্যবস্থা হয়েছে।

তিনি বলেন, সংগ্রহের পরিমাণ যদি বাস্তবপক্ষে আশানুরূপ না হয়ে ওঠে, তবে এই বরাদ্দ কমিয়ে ১০ আউন্স করতে হবে, এমন কি শেষ পর্যন্ত এর পরিমাণ আরও কমিয়ে যদি ৮ আউন্স মাত্র বণ্টন করা সম্ভব হয়, তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। অবশ্য কায়িক পরিশ্রমী মজুরদের জন্য, তিনি বলেন, অতিরিক্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে।

নয়া দিল্লী, ২৯শে নভেম্বর (বিশেষ সংবাদদাতার ডেস্প্যাচ): কেন্দ্রীয় সরকার চতুর্থ পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অঙ্কটিকে (target) ১২০ মিলিয়ন টন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ মিলিয়ন টনে ধার্য্য করবার কথা চিন্তা করছেন। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের দৃঢ় আশা এই যে, কৃষি উৎপাদন সম্পর্কীয় নূতন রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সার্থকভাবে প্রয়োগ ও রূপায়িত করতে পারলে এই উচ্চতর লক্ষ্যটিতে পৌঁছান সম্ভব হবে।

এই ১২৫ মিলিয়ন টন শস্যের মধ্যে ১০৭ মিলিয়ন টন মানুষের ভোগের জন্য এবং অবশিষ্ট ১৮ মিলিয়ন টন থেকে বীজশস্যের চাহিদা ও অনিবার্য্য অপচয়ের দায় মিটিয়ে, অবশিষ্টাংশ গবাদি পশু ও পোলট্রির (মুরগী, হাঁস ইত্যাদি) খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট হবে।

এই সঙ্গে খাদ্যশস্য ব্যতীত, ডিম, মাছ, দুধ, মাংস ইত্যাদি পরিপূরক খাদ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট পুষ্টির উপাদান যাতে বর্তমানের মাথাপিছু ২১০০ ক্যালরি থেকে অন্ততঃ ২৩০০ ক্যালরিতে পৌঁছতে পারে তার আয়োজন করা হবে। বর্তমানে এদেশে প্রোটিনের ভোগের পরিমাণ মাথা-পিছু ৫৪ গ্রাম ধরে হিসাব করা হয়েছে, এটিকে বাড়িয়ে ৬১ গ্রাম করবারও আয়োজন হয়েছে।

এই সকল লক্ষ্যে সার্থকভাবে পৌঁছুতে হলে একটি অষ্টবাহু প্রয়োগ (eight-point programme) দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর চাষ-ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমতঃ, অধিক উৎপাদনকারী বীজ শস্যের ব্যবহারের দ্বারা বিশেষ বিশেষ মনোনীত ক্ষেত্রে চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। সমগ্র দেশে মোট ৩০টি জেলায় ২৩ মিলিয়ন একর জমিতে ধান চাষ করা হয়ে থাকে; এর মধ্যে সেচ-ব্যবস্থাসম্পন্ন ১২.৫ মিলিয়ন একর জমিতে এই নূতন প্রয়োগ অনুযায়ী চাষের ব্যবস্থা করা হবে। অনুরূপ ভাবে ৫৩টি জেলাতে ৮.১ মিলিয়ন একর জমিতে উচ্চমানের উৎপাদক গমের বীজের চাষ করা হবে। এছাড়া ভুট্টা, জোয়ার ও বাজরা প্রত্যেকটি শস্যের চাষ ৪ মিলিয়ন একর করে জমিতে করা হবে। উপযুক্ত সময়ে ও পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহার এই নূতন আয়োজনটির একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ।

এই ভাবে ৪.১ মিলিয়ন একর জমিতে তুলার ও ৪.৭ মিলিয়ন একর জমিতে একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী নানাবিধ তৈলবীজের চাষ করা হবে। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহারের ১৪টি জেলায় ২ মিলিয়ন একর করে জমিতে পাটের ঘন সন্নিবিষ্ট (intensive) চাষ করা হবে।

খাদ্য-মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট দ্বিতীয় প্রয়োগের দ্বারা জরুরী খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য জলের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং যে সকল জমিতে একটি মাত্র ফসল ফলে, তাতে একাধিক ফসল ফলাবার আয়োজন করা হবে। হিসাব করা হয়েছে যে এইভাবে উত্তর প্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে ২.৫ মিলিয়ন একর জমিতে দু'টি করে ফসল ফলান সম্ভব। এছাড়া মহারাষ্ট্রে ৬ লক্ষ একর এবং গুজরাটেও ২ লক্ষ একর জমিতে দু'টি করে ফসল ফলান সম্ভব।

এই প্রয়োগ সার্থকভাবে রূপায়িত করবার জন্য কতকগুলি অনিবার্য্য আয়োজনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যথা রাসায়নিক সার, পোকা ধ্বংসকারী ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উপযুক্ত পরিমাণ সরবরাহ; এছাড়া সেচ-ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় কৃষিঋণের ব্যবস্থাও অত্যন্ত জরুরী। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে এ সকল জরুরী চাষের আয়োজনে

যথাসময়ে এবং উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহের অভাবেই বস্তুতঃ কৃষি-উৎপাদন এদেশে বিশেষ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কৃষির উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক কৃষি-ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থার বর্তমান দুর্বলতা। যে সকল রাজ্যে সমবায় ঋণ ব্যবস্থার বিশেষ প্রসার হয় নি, সে সকল অঞ্চলে, বিশেষ করে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থানে, সরকারী কৃষি-ঋণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন করা হয়েছে।

কৃষি-বিষয়ক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রসার ব্যবস্থার যথোপযুক্ত আয়োজন সৃষ্টি করবার জন্ত কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা সংস্থাটিকে উপযুক্তভাবে পুনর্গঠন করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নয়া দিল্লী, ১লা ডিসেম্বর (পার্লামেন্টারী সংবাদদাতার সংবাদ): লোকসভায় শ্রীসুব্রহ্মণ্যম ঘোষণা করেন অভূতপূর্ব অনাবৃষ্টির ফলে বর্তমান বৎসরের খারিফ ফসলে ৮০ লক্ষ টন ঘাটতি ঘটবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন বৃষ্টির পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর হবার ফলে আগামী রবি ফসলের পরিমাণও খুব আশাপ্রদ নয়। শ্রীসুব্রহ্মণ্যম স্বীকার করেন এই পরিস্থিতিতে সমাধানমূলক যে সকল আয়োজন চালু করা হয়েছে, তাতে মোট ফসলের পরিমাণে খুব যে একটা বৃদ্ধি ঘটবে এমন আশা সুদূরপরাহত।

এই অবস্থায় পি এল ৪৮০ সদের আমদানীই দেশের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভরসা। এই বিষয়টিও এখন পর্যন্ত খুব স্পষ্ট নয়। তিনি আশা করেন যথোপযুক্ত পরিমাণ বিদেশী শস্যের সাহায্যমূলক আমদানী পাওয়া সম্ভব হবে এবং তার সহায়তায় আশু সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। তিনি সকল দেশবাসী এবং রাজনৈতিক দলের নিকট আবেদন করেন যে সরকারের বর্তমান খাদ্যনীতি যাতে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যায় এবং তার ফলে দুঃখতর সঙ্কটের দেখা ঘটতে না পায় তাতে যেন তাঁরা সহযোগিতা করেন।

তিনি বলেন যে গত একশ বছরের মধ্যে এমন অনাবৃষ্টি আর হয় নি। এ অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে শস্য সংগ্রহের আয়োজনটিকে জোরদার করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সঙ্গে বন্টনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও অনুরূপ ভাবে জোরাল করার আয়োজন হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায়—তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে বার্ষিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার গড়পড়তা ৮ কোটি টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—বর্তমান সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। গত বৎসর সৌভাগ্যক্রমে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টনের অধিক হয়েছিল এবং বর্তমান বৎসরে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টন ফসল উৎপাদনের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু অনাবৃষ্টির ফলে এই লক্ষ্যে পৌঁছান অসম্ভব হয়ে গেছে।

এই অবস্থায় জন্ত রাজ্য সরকারদের ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে চাষীদের কাছ থেকে শস্য সংগ্রহের আয়োজনটি জোরদার করে, ব্যবসায়ীদের হাতে যেন শস্যের মজুদ চলে যেতে না পারে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা। উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী চাষীর ওপরে লেভী ধার্য্য করা হবে এবং এই ভাবে রাজ্য সরকারগুলি ও ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া যতটা সম্ভব বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হবেন। এ ছাড়া কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় সরকার সার্বভৌম (monopoly) সংগ্রহ ব্যবস্থাও প্রবর্তন করার আয়োজন করছেন। সরকার এভাবে দেশে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের যতটা পরিমাণ সম্ভব সংগ্রহ করবার আয়োজন করছেন, যাতে সরকারী খাদ্যশস্যের বন্টন নিয়ন্ত্রণ আয়োজনটিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। তবে এই বিষয়ে দেশবাসীর সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক, তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁদের যোগসহযোগ না করলে বর্তমান সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা দুঃসহ হয়ে উঠবে।

কলিকাতা, ২রা ডিসেম্বর (সংবাদদাতার সংবাদ): পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ঘোষণা করেন যে প্রয়োজন হ'লে রাজ্য সরকার চাল মিলগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিতে দ্বিধা করবেন না। সম্ভব হ'লে রাজ্যের সমগ্র সরকারী ধান-সংগ্রহের দায়িত্ব তিনি সমবায় সংস্থাগুলির ওপর দিতেন, কিন্তু ২২ লক্ষ মণ ধান সংগ্রহ করবার মতন উপযুক্ত সঙ্গতি এখনও সমবায় সমিতিগুলির গড়ে ওঠে নি।

তিনি বলেন যে ১৫ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ করবার আয়োজন হয়েছে, তার মধ্যে ৬ লক্ষ টন বড় জোতদারদের

কাছ থেকে, ৭ থেকে ৮ লক্ষ টন চাউল-মিলগুলির কাছ থেকে এবং প্রায় দেড় লক্ষ টন সমবায় সমিতির কাছ থেকে সংগৃহীত হবে। সমবায় সমিতিগুলি যদি কেবল মাত্র ছোট ছোট চাষীদের দায়ে পড়ে বিক্রী করা ধানটুকু (distress sale of paddy) মাত্র সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে পারতেন (এর মোট পরিমাণ আনুমানিক ৪ থেকে ৫ লক্ষ টন) তবে বাংলা দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ঘটিয়ে তুলতে পারা যেত।

নয়া দিল্লী, ৭ই ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী খাদ্য পরিস্থিতিতে যে সঙ্কটজনক অবস্থার আভাস কয়েকদিন আগে দিয়েছিলেন, তাতে বর্তমানে সামান্য একটুখানি আশার আলোক দেখা যাচ্ছে। এই আলো এসে পড়েছে দু'দিক থেকে—প্রথমতঃ, দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির পর দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টি শুরু হয়েছে ; দ্বিতীয়তঃ, আপাততঃ মাসিক ৫ লক্ষ টন হারে আমেরিকার পি এল ৪৮০ গম আমদানী যে অব্যাহত থাকবে, সেই ভরসা। এই কারণে বর্তমানে কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী ৪র্থ পরিকল্পনাকালে খাদ্যোৎপাদন সাফল্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট লক্ষ্য, ১২৫ মিলিয়ন টন পর্য্যন্ত, বাড়াবার দিকে মন দিয়েছেন।

নয়া দিল্লী, ১০ই ডিসেম্বর : গতকাল জনসন সিটি, টেক্সাসে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন জনসন ঘোষণা করেন যে, ভারতের বর্তমান খাদ্যসঙ্কট মোচন সাহায্যার্থে অবিলম্বে ১৫ লক্ষ টন গম রপ্তানী করবার ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া ভারতকে রাসায়নিক সার খরিদ করবার জন্য ৫ কোটি ডলার (প্রায় ২৫ কোটি টাকা) ঋণও দেওয়া হবে। প্রেসিডেন্ট জনসনের এই সিদ্ধান্তের ফলে তিন মাসের স্থলে এক মাসের মধ্যেই এই ১৫ লক্ষ টন গম ভারতে পৌঁছুবে। প্রেসিডেন্ট জনসনের নেতৃত্বে ভারতকে তার আশু দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থেকে বাঁচাবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক খাদ্য সাহায্য সংস্থা গঠনের চেষ্টা হচ্ছে ; এই উদ্দেশ্যে তাঁদের আগামী আমেরিকা সফরের সময়ে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন এবং পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার লুডউইগ এরহার্ডের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

আজ নয়া দিল্লীতে আমেরিকান এবং ভারত সরকারের মধ্যে পি এল ৪৮০ অনুযায়ী অতিরিক্ত ১৫ লক্ষ টন গম ভারতে রপ্তানী করা সম্পর্কে চুক্তি বিনিময় হয়েছে। এই গমের মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে ৪১·৬৭ কোটি টাকায়। এই চুক্তি, শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেন, ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তির প্রাথমিক প্রয়োগ।

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর (সংবাদদাতার সংবাদ) : পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৪ পরগণা জেলা থেকে ১,৭৫,০০০ টন চাউল সংগ্রহ করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এটা প্রধানতঃ ২ একরের অধিক পরিমাণ জমি যাদের চাষে আছে তাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত হবে। বর্তমানের সরবরাহে ঘাটতির অবস্থায় সরকারের পক্ষে চাউলের দাম নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রক্ষা করা অসম্ভব হবে বলে সকলে আশঙ্কা করেন। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে মডিফায়েড র‍্যাশন ব্যবস্থা ক্ষুদ্র চাষীর স্বার্থে সাফল্যের সঙ্গে চালু রাখা সম্ভব হবে কি না, এ বিষয়েও গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে।

এই আশঙ্কা আরও দৃঢ় হয় যখন দেখা যায় যে গত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রাজ্য সরকারের মডিফায়েড র‍্যাশন ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল শুধু তাই নয়, কিন্তু বাজারে নূতন ধানের চাউল আসতে সুরু করবার পরেও এখনও খোলাবাজারে চাউলের খুচরা দাম সাধারণতঃ সরকারী দামের চেয়ে অন্ততঃ দ্বিগুণ বেশী, কোন কোন স্থলে আরও বেশী।

উপরোক্ত সংবাদগুলির চুম্বক থেকে মোটামুটি নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয় :—

খাদ্য উৎপাদন নীতি-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি :—৩ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমিতে কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় সরকার প্যাকেজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করবার ব্যবস্থা করবেন। এর আনুষঙ্গিক প্রয়োগ, যথা রাসায়নিক সার, সেচের জল, উন্নত ধানের বীজ, উন্নত ধান্যের আধুনিক চাষের প্রণালী প্রবর্তন, কৃষি ঋণের ব্যবস্থা, ইত্যাদি পরিপূরক আয়োজনগুলির ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট এবং প্ল্যানিং কমিশন, উভয়েই এই প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছেন এবং এর প্রয়োগে কোন বাধা ঘটতে দেওয়া হবে না।

এই প্রয়োগের ফলে চতুর্থ পরিকল্পনাকালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন-লক্ষ্য (target) স্থির করা হয়েছে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টনে।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,

কোন বাধা বা অজুহাতেই তিনি দেশকে এই লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হতে দেবেন না—এই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করছেন। এর কোন ব্যত্যয়ের জন্য তিনি নিজে সম্পূর্ণভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন এবং দেশের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। এই প্রতিশ্রুতি খুবই আশাপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর নিজের এবং পূর্বতন মন্ত্রীদের আমলের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে দেশের লোক যা শিক্ষা লাভ করেছে, তাতে এই সকল প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা আস্থা স্থাপন করতে পারবেন এমন আশা করা যায় না। বর্তমানে খাদ্য পরিস্থিতি আগের তুলনায় আরও ঘোরাল হয়ে উঠেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে গত আঠারো বছরে দেশে খাদ্য সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি যে কখনই খুব সুস্থ অবস্থায় ছিল না, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

বস্তুতঃ খাদ্যশস্যের উৎপাদন পরিমাণে ক্রমিক উন্নতির কোন প্রয়োজনীয়তা থাকলেও অস্বীকার করবে না; কিন্তু বর্তমান শঙ্কাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব কেবল মাত্র উৎপাদন-ঘাটতির অভাবেই ঘটেছে এটা প্রমাণসহ নয়। কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরের হিসাব অনুসারী গত বৎসরের পূর্ব পর্যন্ত তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের বার্ষিক গড়পড়তা পরিমাণ ছিল ৮ কোটি টন। এই পরিমাণ শস্যে উৎপাদনের ১০% অনিবার্য অপচয় ও বীজশস্যের জন্য আলাদা করে রেখেও, ০ থেকে ৯ এবং ১০ ও তদূর্ধ্ব বয়স্কদের জন্য মোটামুটি দৈনিক ৮ আউন্স এবং অন্যদের জন্য ১৬ আউন্স বরাদ্দ হিসাবে, সকলেরই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য, বর্তমান লোকসংখ্যার ভিত্তিতে (১৯৬১ থেকে সুরু করে বার্ষিক মোট ২·৪% লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ধরে) মোটামুটি ৭ কোটি ১০ লক্ষ টন শস্যের বেশী লাগবার কথা নয়। গত বৎসরে আমাদের ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টন উৎপাদন হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে। এটা যদি উৎপাদনের বাস্তব হিসাব হয় তবে এ বছর গত বছরের ফসল থেকে আমাদের অন্ততঃ ১ কোটি টন আন্দাজ শস্য গত বছরের উৎপাদনের উদ্বৃত্তাংশ হিসাবে মজুত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সরকারীভাবে ঘাটতি দেখান হচ্ছে ৯%। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ৯% ঘাটতির ফলেও বর্তমানের দারুণ দুর্ভিক্ষসূচক অবস্থার উদ্ভব হবার সঙ্গত কোন কারণ ছিল না। উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে গত বৎসর বিদেশ থেকে যে প্রায় ৬৫ লক্ষ টন পরিমাণ শস্য আমদানী করা হয়েছিল, সেটুকুর হিসাব ধরা হয় নি।

বণ্টন-নীতি-সংশ্লিষ্ট বিষয়:—বস্তুতঃ বর্তমান দুর্ভিক্ষ-সূচক খাদ্য পরিস্থিতি কেবলমাত্র এমন কি প্রধানতঃও উৎপাদন-ঘাটতির জন্য ঘটেছে এর কোন প্রমাণ নেই। বরং বণ্টন ব্যবস্থার গোলযোগের জন্যই যে প্রধানতঃ বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার অনেক এবং স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সরকারের তথাকথিত নূতন খাদ্যনীতিতে এই বণ্টন-ব্যবস্থার রদবদলেরই খানিকটা প্রচেষ্টা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, আগামী বৎসরের প্রথম দিক থেকে দেশের সকল ১০ লক্ষ অধিবাসীর শহরগুলিতে পূর্ণ র‍্যাশনিং প্রবর্তিত হবে। এরূপ শহরের সংখ্যা সমগ্র দেশে মোট ৮টি, মোট লোকসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ। বাকী দেশটার কতটা সাফল্যের সঙ্গে মডিফায়েড র‍্যাশন ব্যবস্থার দ্বারা খাদ্য-সরবরাহ অব্যাহত রাখা যাবে, সেটা সন্দেহের বিষয়।

কেননা সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থা প্রধানতঃ বিদেশ থেকে আমদানী শস্যের ওপর এ পর্য্যন্ত নির্ভরশীল ছিল বলে দেখা যায়। কয়েক বৎসর পূর্বে র‍্যাশনিং কমিশনের বর্তমান ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেহতার সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এবং মালিকানায় একটি সুবৃহৎ মজুদ শস্যের ভাণ্ডার (buffer stock) গড়ে তোলবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কোন বিশেষ কার্য্যকরী ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত গৃহীত হয়েছে বলে দেখা যায় নি। গত বৎসরের নূতন ফসলের পূর্বেকার সঙ্কটজনক অবস্থার ফলে আবারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এবার এই মজুদ গড়ে তুলতেই হবে। সেই সাপেক্ষে উদ্বৃত্ত উৎপাদক রাজ্যগুলি থেকে ২০ লক্ষ টন চাউল কেন্দ্রীয় মজুদের জন্য সংগৃহীত হবে বলে স্থির হয়। এবং নূতন ফসল ওঠবার পর যখন দেখা গেল এরূপ বিরাট খাদ্যশস্যের ফসল এদেশে পূর্বে আর কখনও হয় নি, তখন স্থির হয় বিদেশ থেকে আমদানী শস্যের সবটাই কেন্দ্রীয় মজুদে জমা করা হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি, যদিও আমদানীর পরিমাণ গত এক বছরে ৬৫ লক্ষ টনেরও বেশী ছিল। এই মজুদ স্কীম উদ্দেশ্য

ছিল ফসলের দুর্বৎসরে বিরাট কেন্দ্রীয় মজুদ বাজারে ছেড়ে দিয়ে যাতে ব্যবসায়ীরা অল্প ফসলের সুযোগ নিয়ে সরবরাহে সংকটাবস্থার সৃষ্টি করতে না পারেন তার ব্যবস্থা করা। বণ্টন নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এর কোন আত্মিক সম্পর্ক ছিল না।

ইতিমধ্যে বড় শহরগুলিতে পূর্ণ র‍্যাশনিং ও অন্যত্র মডিফায়েড র‍্যাশনিং প্রবর্তন করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় সরবরাহের ওপর সরকারের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, কিন্তু তার প্রয়োগের বেলায় দু'টি স্থানে বিশেষ গলদ দেখা গেছে; প্রথমতঃ, সমগ্র খাদ্যশস্য ব্যবসায়টির সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে, এখন কেবলমাত্র পাইকারী ব্যবসায়টির রাষ্ট্রীকরণ করা হবে স্থির হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ, সরকারী মজুদের জন্য সর্বাত্মক শস্য সংগ্রহের আয়োজনের কার্যকারিতা নূতন ফসল উঠতে শুরু করার বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে চালু করবার হুকুম হয়েছে, এর ফলে বহু শস্য ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ীর কুক্ষিগত হয়েছে। তাঁরা এখন খুচরা দোকানদারের মাধ্যমে তাঁদের মুনাফাবাজী অবাধে চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলেই এখন খোলাবাজারে ১০০ টাকা মণ দরে চাউল কেনা-বেচা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু বণ্টন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এঁদের অস্পষ্ট কোন এবং সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য সম্বন্ধীয় নীতি ও প্রয়োগের যে ছবি উপরোক্ত উক্তিগুলি থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাতে এ কথা বেশ স্পষ্ট হয়েছে যে, সমস্যাটির স্বরূপ, এর সমাধানের উপায় এবং তার উপযুক্ত প্রশাসনিক প্রয়োগ সব কিছু মূল ব্যাপারেই সরকারের চিন্তা একটা অস্পষ্ট (vague) এবং ঘোঁয়াটে (confused) অবস্থার পরিচয় দেয়। মূল সত্যটা, অর্থাৎ আমাদের গত কয়েক বৎসরের এবং বিশেষ করে বর্তমান বৎসরের দারুণ খাদ্য-সঙ্কট বস্তুতঃ উৎপাদনের অপ্রতুলতার জন্য ততটা নয় যতটা বণ্টন ব্যবস্থার অসমতার (imbalance) জন্য ঘটেছে এবং ঘটছে তার কোন স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। এই দিকটার সুষ্ঠু সমাধান না হলে খাদ্যের উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, খাদ্য সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার আশ নেই। এবং দেশে বর্তমানে খাদ্য মুনাফাবাজির আবহাওয়া একমাত্র পূর্ণ র‍্যাশনিংই এর আসল প্রতিষেধক এবং সমগ্র দেশে একটি মাত্র একক (uniform an integrated) খাদ্যনীতির প্রয়োগ ব্যতীত এর সাফল্য সাধন একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সে ধরনের র‍্যাশনিংয়ের কথার কোন আভাস সরকারী চিন্তায় এখনও প্রতিফলি হয় নি। আমেরিকার গম দিয়ে এ সঙ্কট সর্বকালের জ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

মুখর অতীত

পুষ্পদেবী, সরস্বতী

সেই কালের সঙ্গে চলতে লাগল ঝি-অবজবে গঙ্গা
...ক। নইলে বাড়ী শুদ্ধ হবে কি করে? আগে
...বার রাবণের ভুঁই থেকে থালা থালা গঙ্গার জল।
...তার যে এমন অরুচি ধরতে পারে তা মামার জানা
...ল না। পাঠকরা হয়ত বিস্মিত হয়ে ভাবছেন ন'মেসোর
...ত: নেই কেন? নমেসো নির্ভেজাল অমায়িক মানুষ।
...টো তোলার সখে তিনি ভরপুর। তাঁর যে স্ত্রী পুত্র
...রিবার আছে এসব বাজে জিনিষ নিয়ে তিনি মাথা
...মান না। সারাদিন ফটো তুলে বেড়ান। নিজে
...ডেভালাপ, নিজে প্রিন্ট করেন, এনলার্জও নিজে করেন।
...ন্ত বাড়ীর লোকের ছবি তোলার অবসর কম। কোন
...ন যান দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার নানা দৃশ্য তুলতে। মন্দিরের
...না ছবি তুলতে দিন কেটে যায়। কোনদিন বা
...য়মণ্ড হারবার। আবার কোনদিন জু-এ। তাছাড়া
...বি তোলার নেশা যার আছে সেই জানে তার অবসর
...ত কম। পাড়ার কারুর বিয়ে হলে তখুনি ছুটতে
...বে। কেউ মরলে সেই মৃতদেহের সঙ্গে তাদের পুরো
...ছবি তুলতে হবে। কারুর মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হলে
তার ছবি তুলতেও প্রিয়দা। প্রিয়দর্শন মেসোমশায়ের
নাম। ভারি সুন্দর স্বভাব। তবে মজা হচ্ছে এই যে,
কোন দায়িত্ব নেওয়া তাঁর স্বভাব নয়। তবে হ্যাঁ ছবির
জন্যে তাঁকে যা করতে বলবে তিনি রাজী। বিয়ের পর
ন'মাসী এসে দেখল তার শোবার ঘরে সাইকেল নিয়ে
এক যুবকের নানা রং-এর ছবি দেয়ালে টাঙানো।
ন'মেসোমশায়ই বলেন ও হ'ল আমার বন্ধু ব্যানীন।
ওকে ব্যাভো বলে ডাকতাম আমরা। ব্যাভো হ'ল
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপভ্রংশ।

কখনো জু-বাগানে মেজোর সঙ্গে বন্ধুর ছবি তোলেন।
বড়লোকের ছেলে, হাতে অগাধ টাকা। ঐ মেজোর সঙ্গে
ছবি তুলতে দিয়ে বন্ধু হয় হাজার টাকা ধার নিয়ে গাড়ি
কেনে। মাঝে মাঝে সেই গাড়ি চড়িয়ে ছবি তোলাতেও
নিয়ে যায়। ন'মেসো মহাখুশী। দোকানে ছবি তুলতে
গেলে খরচ। এ প্রিয়দর্শনের কাছে যত চাইবে সে তত
খুশী।

শুধু ছবি নেই ন'মাসীর। রাতে ফ্লাশ লাইটে ছবি
যে তোলে নি তা নয়। তবে ছবি হিসেবে সে ছবি তত
উৎকৃষ্ট হয় নি বলে তা আর ডেভালাপ করেও প্রিন্ট
করা হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া বৌ-এর ছবি তোলার
নানান ন্যাটা। তাকে হাতে রোদে বসান যাবে না।
এখানে-ওখানে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া
ডেভালাপ প্রিন্ট সবই করতে হবে লুকিয়ে লুকিয়ে।
পাঁচজনকে দেখিয়ে বাহাদুরি নেওয়ার উপায় নেই।
উপায় নেই দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার।

তোমরা হয়ত ভাববে সত্যিই কি স্ত্রীকে নিয়ে
কোথাও যাননি নমেসো। সত্যিই যান নি। এক প্রকাশ্যে
বিয়ে করা ছাড়া আর সবই স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতের কারবার।
কাজেই দিনের বেলায় মধ্যে স্ত্রীর স্থান ছিল না তাঁর।
একদিনের কথা মনে পড়ে ন'মাসীর। সাংঘাতিক
পেটের যন্ত্রণা হচ্ছিল তাঁর। রাতে ন'মেসোমশাই
বলেছিলেন সকালে সদরে গিয়েই বেদনানাশক কি
একটা ওষুধ তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন তাঁর চাকর হরিকে
দিয়ে। সারা সকাল কেটে গেল, দুপুরে হরি যখন পান
দিতে অন্দরে এল, ন'মাসী তাকে জিগ্যেস করে ওষুধের
কথা। হরি বলে, তিনি ত নেই, বোটানিক্যাল
গার্ডেনে গেছেন কার ছবি তুলতে! সেই দিন থেকে
নিজের কোন কষ্টের কথা তাকে বলে নি মাসী। বাড়ী
ফিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন প্রিয়দর্শন। নমাসীর দাঁতে
ঠোঁট চাপা মুখের দিকে চাইবার তাঁর অবসর কোথায়?

বাপের বাড়ী যেতেন বৈ কি। বছরে একদিন বাপের
বাড়ী যাবার শর্তায় ছিল তাঁদের। বিজয়ার পর বাপ-

মাকে প্রণাম করতে। কিন্তু সে যেদিন তাঁরা কলকাতায় যাবেন সেইদিন।

বাড়ীর দুর্গোৎসবের খাটা-খাটুনির গায়ের ব্যথা মরতে যেত অনেকদিন। পুজোর চন্দ্রপুলীর ক্ষীরের ছাপায় নারকোল কুরতে কুরতে হাতের ছাল উঠে যেত। শীতকালে ঠাকুর ঘরের শ্বেত পাথরের বারন্দায় বসে ভিজে কাপড়ে নারকোল কুরতে হ'ত বৌদের—। আর দাসীর দল তাদের কখন কি দরকার হবে এইজন্যে রোদে বসে গল্প যেতে থাকত। বলার উপায় নেই যে তোরা নারকোলগুলো কুরো, আমরা একটু রোদে বসি। বাজারের সন্দেশ অনায়াসে মা দুর্গার ভোগে দেওয়া যাবে কিন্তু নারকোল ঝিয়েরা কুরলে সর্বনাশ। মনে হয় বৌদের কষ্ট দেবার জন্যে শাশুড়ীরা মাথা ঘামিয়ে নানা ফন্দি-ফিকির বের করত। সেকালে গেরস্ত ঘরে মেয়েদের রাস্তায় পার্কে যাওয়া নিষেধ ছিল। অনেকের একমাত্র মুখচাওয়া ছেলে যাদের তারাও চাকরকে দিয়ে ছেলের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাকে পার্কে হাওয়া খেতে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ীর বৌ সিঁড়ির তলার খুপরী রান্নাঘরে কয়লা ভেঙে মশলা বেঁটে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে রাঁধতে বসত। যত কষ্টই হোক না একবেলা পাঁউরুটি বা চিঁড়ে খেয়ে ছেলেকে নিয়ে মা একটু খোলা হাওয়ায় শরীর সারাবে তার উপায় ছিল না। সে কথা ভাবতেও পারত না কেউ।

এবারে চাকররা সেই রোগা ছেলেকে কোন বাড়ীর রকে নোংরার মধ্যে ফেলে দিয়ে বসে বসে বিড়ি খেত। যারা তারি মধ্যে ভাল চাকর তারা পার্কের ঘাসের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়ে কারুর সঙ্গে গল্প যেতে যেত। অনেক সময় একটু বড় ছেলে হলে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসত বাড়ীর চাকরকে না খুঁজে পেয়ে। আবার লবেনচুস বা পাঁঠার ঘুগনী খাওয়ান হ'ত সেই ছেলেকে যে বাড়ীতে মাতৃ মায়ের কোল আর পোয়ের ভাত খেয়ে আছে।

আবার ভালো-মন্দ রেঁধে খাইয়ে যে তুমি ঘরের প্রশংসা অর্জন করবে সে আশায় ছাই। গেরস্ত ঘর হলে বাঁট পাট কাপড় কাচার ভার পেত বৌরা। রান্নার ভারটুকু শাশুড়ীর। আর বড় লোকের বাড়ী হলে বৌ ঠাকুর ঘরে আর ভাঁড়ারে পান সাজায় বন্দী, বসে খাওয়াবেন গিন্নীরা। আবার যদি বা রান্নাঘরে যাও ত ঘরের পছন্দসই রাঁধলে ছি-ছি-কারের সীমা থাকবে না। রাঁধতে হবে তাঁদের পছন্দসই পানফলের পালো বা শাশুড়ীর জন্যে নিমঝোল।

তখনকার ব্যবস্থা শুনলে শিউরে উঠবে তোমরা। একটি খুব বড় লোকের বৌকে ইলেকট্রিক দিয়ে সাজানো সিংহাসনে বসান হয়েছে। আপাদমস্তক হীরে দিয়ে মোড়া বৌ বসে আছে। এক ভদ্রলোক বৌকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে শক খেলেন, বললেন, এ কি ইলেকট্রিক কারেণ্ট পাস করছে যে! বৌ অনবরত শক খাচ্ছে অথচ ভয়ে কারুকে কিছু বলে নি। বাপের বাড়ী থেকে আসার সময় মা বলে দিয়েছেন কোন কষ্ট হলে বলতে নেই শ্বশুরবাড়ীতে। কাজেই বেচারা চুপ করে আছে। কোনদিকেই সোয়াস্তি ছিল না। তখন আবার বড়লোকের মেয়ের খোয়াদের অন্ত ছিল না শ্বশুর-বাড়ীতে।

একটি বিখ্যাত ধনী পরিবারের মেয়ে গৃহস্থ ঘরে বৌ হয়। বাপ নামী লোক কলকাতাতেই বিশ-পঁচিশটা বাড়ী ছিল তাঁর। একদিন খেয়ালের বশে বাপ বলেছিলেন, জানিস বুড়ী, শ্যামবাজারের বড় বাড়ীটা তোকে দেব। মেয়েটির শাশুড়ী ননদরা রায়বাঘিনীর দল। একদিন কথাশোনানোর বেলায় মেয়েটি বলে ফেলেছিল, যে শ্যামবাজারের বাড়ীটি বাবা আমায় দেবেন বলেছেন। ব্যস, আর যায় কোথা! রোজ সুরু হ'ল কথা শোনানো, কই তোমার বাপ কবে বাড়ী দেবে? শেষে মেয়েটি থাকতে না পেরে বাবাকে বলে, কই বাবা তুমি যে শ্যামবাজারের বাড়ী আমায় দেবে বলেছিলে—দিলে না ত? বাপ বিরক্ত হয়ে বলে, কেন আমার মরার তর সইছে না? যা দেব না তোকে। এরপর বাপের লজ্জা ঢাকতে মেয়েটির আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ রইল না। আর একটি বাড়ীর কথা জানি। সমান সমান দুটি বাড়ীর ছেলে-মেয়ের বিয়ে হ'ল। বিয়ের সময় দানসামগ্রীর নমস্কারীর সব টাকাই নিলেন বরপক্ষ। তারপর সারা জীবন ধরে চলল মেয়েটিকে কথা শোনানো। বাপ কিছু দেয় নি বলে। তোদের চুপড়ী ধুয়ে তাঁরা মেয়ে এনেছেন। শাশুড়ী বড় মেয়ে বহলে—মানে, যাঁদের নমস্কারী পাবার কথা তাঁদের সামনে অম্লান বদনে বৌ-এর সামনে বলেন, বৌ-এর বাপের বাড়ী থেকে সুতোর সুতোটুকু দেয় নি, কি তোমাদের দেবো বলো। এমন কি শ্বশুর ও বৌকে বলেন কই তোমার বাবা যে পরে খাট আলমারি দেবেন বলেছিলেন কই দিলেন না তো? এমনি কথা শুনে শুনে দশবছর কাটল। শেষে বৌ থাকতে না পেরে বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুরের লেখা চিঠি এনে শাশুড়ীকে দিল যাতে শ্বশুরের নিজের

হাতে লেখা আছে মশহারী ও ফার্নিচার বাবদ এত টাকা পেলাম।

ব্যস, আর যায় কোথায়? শাশুড়ী মুখতোলো করে বললেন, তুমি বৌ মানুষ বৌমানুষের মত থাকবে, অত লেখা-পড়া-কাগজে তোমার কাজ কি?

এবার শ্বশুর অন্য পন্থা ধরলেন। বৌএর বাপ কি কাজে টাকা দিয়েছেন, সেখান থেকে আদরের জামাইয়ের জন্যে একটি রূপোর কাপ-প্লেট এনেছিলেন। তখন থেকে মেয়েকে কথা শোনাতে সুরু করলেন, বাকী সেটটা কবে দেবে তোমার বাবা?

তখনকার যুগে সাড়ে তিনশো টাকার শাল ও পঁচাত্তর টাকার গরমকোটের ভয় পেয়ে বেয়াইকে পৃথিবীর ভয় দেখতে বাধে নি তাঁর। এমনিভাবে বধূর বুকে তিনি চিরঅমর হয়ে রইলেন। মামার বাপের বাড়ীর দেশ ছিল রংপুরে। রংপুর থেকে এসে কর্তা যখন কলকাতায় মস্ত তিনতলা বাড়ী তুললেন, সে-বাড়ীটা রংপুরেরই একটা অংশের মত ছিল। হঠাৎ এক-গাড়ি লোক এল রংপুর থেকে এক রুগী নিয়ে। বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। ডাক্তার বদ্যি ছুটোছুটি। বাড়ী-শুদ্ধ পালা করে সেবা। রুগী সারল, পথ্যি পেল, গায়ে জোর পেল, কালীঘাটে পুজো দিয়ে বাড়ী ফিরল তারা। আবার হয়ত কারুর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে মেয়ে নিয়ে এসে উঠল, মেয়ে দেখান হ'ল, বিয়ে হ'ল, বৌভাত সেরে তারা বাড়ী ফিরল। এ ছাড়া পালে-পার্বণে গঙ্গাস্নান কালীদর্শনেও লোক আসত মন্দ নয়। কর্তা-গিন্নী ও যার যার পৃথক ঘরে থাকতেনই, বাড়তি লোক এলে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাদের নিজস্ব ঘর ছেড়ে দিত। একতলায় থাকত দাদুর দুঃস্থ ছাত্ররা। তাদের সঙ্গে নিয়ে খেতে বসতেন দাদু। যে জিনিষ তাদের জন্য যোগানো না তা তাঁকে দেওয়া নিষেধ ছিল। ভাবা যায়, ভীমনাগের সন্দেশের ছড়াছড়ি না হলেও দিশি খাবার, দরবেশ, মুগের নাড়ু, নারকোল ছাপার, ছড়াছড়ি প্রচুর ভাবেই ছিল। তাঁদের দানের খ্যাতি ছিল রংপুরে। খবরের কাগজে অসীম বদান্যতা নামে তা ছাপা হ'ত না। যে দায়গ্রস্ত লোকটি মেয়ে নিয়ে আসত সে জানত তার বেশীর ভাগ ভারই বহন করবেন এঁরা।

বিয়ের ঠিক হ'লে কর্তা ছেলেদের ডেকে বলতেন, দেখ, দশ ভরি সোনা চেয়েছে বরপক্ষ, পাঁচ ভরি আমি দেব আর পাঁচভরি দেবে তোমরা ক'ভাই। এইভাবে সহজ দানে অভ্যস্ত ছিল ছেলেরা। পরোপকারের নেশা ও জোয়ার। এর ওপরও লুকিয়ে টিউশানি করে দুঃস্থকে সাহায্য—লুকিয়ে এই জন্যে বলছি তখন হয়ত সামনে পরীক্ষা, পড়ার সময় নষ্ট করে। রাত্রে নৈশ পাঠশালায় পড়ান, প্রতিবেশীর বাড়ীতে অসুখে পালা করে রাত জাগায় তাদের সমান উৎসাহ ছিল। এর মধ্যে দানের গর্ব ছিল না, ভালোবাসার আন্তরিকতা ছিল।

(৬)

এই বাড়ীর মেয়ে ম'মাসী—যে জ্ঞান হতেই ছড়া শিখেছে "পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়", "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন"। নিজের অপরূপ রূপের সম্বন্ধে সে সত্যিই অচেতন ছিল। তার ছড়ার সঙ্গে রাজবাড়ীর ছড়া মিলত না। অবাক হয়ে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকত সে। ছোট্ট পাঁচ বছরের মেয়ে মন্দ যখন বলত ঘটিচোরা ডিপুটী বাপ আদরের জেলা তৈরী করেছে। বাপও আদর কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হলেও জেলা কথাটা ওখানে কেন যোগ হ'ল বুঝত না। বাপের বাড়ীর সঙ্গে যোগ প্রায় শিথিল হয়ে এসেছে। কেবল সদরে, খাওয়া চলবে না। খামে চিঠি এলে তারি দিনে। ও মা, এ যে রবিঠাকুরের মত চিঠি গো—।

একবার তারি মজা হয়েছিল, অন্দরে এসে মেজকর্তা ডেকে পাঠালেন মামাকে। হাতে নীল রংএর খামে উঁচা ইংরিজিতে মামা সিনা ঠিকানা লেখা। সিংহাসনের মহিমা স্মরণ করে সিংহ বিচলিত হলেন। কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল কম্পিত কলেবর মামা। চিঠির ওপরে সম্বোধন প্রাণের মামা, তলায় সই বন্ধু। এত বড় অপরাধ হাতে-নাতে ধরে উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু খোলা খামের মধ্যে চিঠিটা দেখে শাসন ভুলে নেচে উঠল মামার চোখের তারা। মেজকর্তা বললেন, এ চিঠি তোমায় কে লিখেছে? মামা বলল, দিদিবন্ধু আমাদের রংপুরের বাপের বাড়ীর দিদিমা। বাবা ওঁকে মাসীমা বলেন কি না? তাই উনি আমায় বন্ধু বলেন। পরাজয়ের ক্ষোভে সিংহমশাই বলেন যত সব ফষ্টি-নষ্টি। মামা অবাক হয়ে ভাবে বাবা যে বলতেন পরের চিঠি পড়তে নেই, এরা পরের চিঠি পড়ে কেন?

আবার হয়ত বর্ষাকাল ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে, ছোট ভাইটির জন্যে মনকেমন করে মামার। দূরে রাস্তা দিয়ে ছেলের দল বৃষ্টির মধ্যে কলরব করতে করতে চলেছে। বোধহয় রেনি-ডে বলে ছুটি হয়ে গেছে। রাস্তার মোড়ে বটগাছের তলায় বৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার

জড়ে দাঁড়ায় তারা। মাধা শাসন ভুলে ছোট ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে। ঠিক যেন মামের মত দেখতে। মামও হয়ত এখন ইস্কুল থেকে ফিরেছে, তাকে মনকেমন করে একবার দেখার জন্যে। এবার ছোড়দাকে বলবে আসার সময় যেন মামকে নিয়ে আসে। এমন সময় চিন্তা-সূত্র ছিঁড়ে যায়, মেজকর্তার সন্দেহকুটিল মুখ দেখে। তিনি বলেন, কি দেখছিলে ওখানে? বৌকে সরিয়ে দিয়ে নিজে জানলায় দাঁড়ান তিনি। সন্দেহজনক কিছু না দেখতে পেয়ে বলেন, বল, কি দেখছিলে? কে এসেছিল? বল শিগ্‌গির। অবাক চোখে চেয়ে থাকে মাধা। বলে, কে আবার আসবে? আবার জেরা চলে কি দেখছিলে? মাধা দেখিয়ে দেয় ছেলের দলকে। বিরক্ত হয়ে মেজকর্তা বলেন, হাঁ করে ঐ সব দেখা হচ্ছে। যাও, ছাতে দেখ গে আচার-বড়ি ভিজছে কি না। যত সব—। বলতে বলতে চলে যান তিনি মাধার ক্ষণিকের স্বপ্ন চুরমার করে।

এদের বাড়ীতে কিছুরই অভাব নেই। অভাব কেবল হাসির। প্রাণখোলা যে হাসিতে মামাদের বাড়ী ভরপুর ছিল। মামারা হাসতেন পাড়া কাঁপিয়ে। সে হাসি বিদ্রূপের নয়, আনন্দের। মাধার বারে বারে বাবার কথা মনে হ'ত। বাবা বলতেন, দেখ সাবধান পরিহাস যেন উপহাস না হয়। হাসতে ভুলে গেছে মাধা। উৎসাহে জল ঢেলে দিতে এদের জুড়ি নেই। হাসলেই বলবেন হেসো না, অত হাসি সইবে না। গুরুজনের এই প্রচ্ছন্ন শাপ-শাপান্তে মাধার বুক ভয়ে কেঁপে উঠত। বোধ হয় 'রাম গরুড়' এই শাশুড়ীরই পূর্ব-পুরুষ কেউ হবেন।

পরভোলানি কথার দোষ মাধা বুঝতে পারে না। পাড়া-পড়শী এসে মাধার প্রশংসা করলেই সবাই বলবেন পরভোলানি ঘরজ্বালানি। পরকে ভালবাসলেই বুঝি ঘরজ্বালানি হয়ে যায়? মনে পড়ে ছোটবেলায় শেখা গান, "পরকে বাসরে ভাল তোর মনের ময়লা কাটবে তবে"। ঘরজ্বালানি স সে কি দোষে হ'ল ভেবে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠে মাধা। এরা কিন্তু একবারও ভাবে না এক কণা স্নেহ, একটি মিষ্টি কথার জন্য, তৃষিত মাধার কচি বুকের কথা।

হাসতে বারণ থাকলেও মাঝে মাঝে হাসির কারণ জুটত। চাকরের নাম ছিল মাদার। মাদার মানে মাদার কল অর্থাৎ আস্তা নয় কিন্তু। মাদার মানে মা নাম রেখেছিল তাই মাদার নাম। সেই মাদার অপর্যাপ্ত ইংরাজী কথা বলত—বাড়ীর কর্তাকে বলত লর্ড। হুঁকিকে বলত পিকচার। দেশলাইকে বলত ফায়ার বকসো। তার ঐ ইংরিজি মাঝে মাঝে বাড়ীতে এক-আধটুকু নির্মল হাসির খোরাক এনে দিত। হয়ত সদরে মাখনবাবু এসেছেন, তিনি সিসিমার ডাক্তার। মাদার ছুটে এসে বলল বাটার এসেছেন, বাটার। কিংবা বলত, টিটা যেন ত বেহারা, বড়বাবুর গরম জল ভরে রাখতে হবে। কিংবা বলত, গরম জলটা কি পাইলজ্‌ করিয়ে দোব। হয়ত কোন রান্না ভাল হয় নি, সদরে সে কথা শুনে এসে বামুনমাকে বলল, সরকারবাবু হুকোটা লাইক করলেন না। এ ছাড়া বাংলা সম্বন্ধে তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। যেমন অনবরতকে সে ভা করে বলত অনাবৃত। ব্যগ্রতাকে বলত একাগ্রতা আর চঞ্চুকে বলত পঞ্চু। সত্যিই পাখীর ঠোঁট জিনিষটা চঞ্চু না হয়ে পঞ্চু হওয়াই স্বাভাবিক। প শব্দে তার পৈত্রিক অধিকার। ম'বাসী গল্প শুনেছিল যে মাদার না কি তার বাবাকে যখন চিঠি লেখাত তখন নতুন শেখা কিছু কথা তাতে জুড়ে দিত। বাপ তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারত কি না জানি না কিন্তু ছেলের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'ত। এমনি ভাবে একবার প্রকাণ্ড চিঠি যখন সাজে চুমাক্ষর দিয়ে সবে শেষ হয়েছে তখন মনে পড়ল নতুন শেখা একটা কথা লেখা হয় নি। তোমরা ভাবছ ত কাদার? মোটেই নয় কতিপয়। তখন চিঠিতে ঠিকানাতে লেখা হ'ল কতিপয় পিতা ঠাকুর মহাশয়। তোমরা হয়ত হাসছ কিন্তু পিতা এক থেকে বহুর পদ পেয়ে নিশ্চয় আনন্দিত হয়েছিলেন। এই সুপণ্ডিত মাদারও একবার ধাঁধায় পড়েছিল জগদম্বা মাষ্টারমশাইকে নিয়ে।

জগদম্বা মাষ্টারমশাই মাদারকে বলেছিলেন মাষ্টারের পদ শুনলে তার ত্রিসীমানায় যেও না। চিন্তায় পড়েছিল মাদার, বারে বারে বলেছিল ত্রিসীমানা ত্রিসীমানা, ত্রিসীমানা কাকে বলে জানে ও'র নি বাবা। এই জগদম্বা মাষ্টারমশায়ের নাম জগদম্বা ছিল না। কথায় কথায় তিনি জগদম্বা জগদম্বা বলতেন বলে ছেলেরা নাম দিয়েছিল জগদম্বা মশা মশা। শেষে তাঁকে সবাই জগদম্বা বলেই চিনত। কর্তারা ডাকতেনও তাই বলে। শুধু জমিদারী তহবিলে টাকা দেবার সময় লেখা হ'ত হরকালী। তাও একবার নতুন সরকার মুচকে হেসে বলেছিল ওঁকে জগদম্বা লিখলেন না? জগদম্বা ক্রোধ কষায়িত নেত্রে চেয়ে পাছে আরও মাইনে কমে যায় ভয়ে ভয়ে ওঁকে জগদম্বাই লিখেছিলেন। এবং খাতায় যা লেখা হ'ত তা মাইনে পেত না সবাই। ও ছাড়া মাঝেমাঝে খোদকা আমলা করলা মজুরকে একটাক

দাউ আলা করে দিতে দিতে কুড়িটাকা মাইনে র জায়গায় পনেরো টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা পেতেন। অলধবা মাষ্টারমশায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল সহজ জিনিষকে তিনি ঘোরালো করে তুলতে পারতেন। যেমন হতবুদ্ধি মানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় শুনে সত্যই ছাত্ররা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেত। বেচারা ন'মাসী। যার কি না ছোটবেলা থেকে মন্ত্র রবিবাবুর কবিতা কণ্ঠস্থ, তাকেও তাড়ুয়পোর কাছ থেকে অলধবা মাষ্টারমশায়ের ব্যাখ্যা শুনতে হ'ত। খোকা মাকে শুধায় ডেকে এর অর্থ হবে বিশ্বমাতাকে বিশ্বখোকা বলছে। সত্যিই এর উত্তরে বলতে হয় যে বলছে তিনি একটি অর্থ তিব কিন্তু তা বলা ত বাড়ীর বৌএর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ন'মাসীর ছেলে ত হ'লই লিভারের দোষ নিয়ে। বাড়ীতে হৈ হৈ পড়ে গেল। ছিঃ ছিঃ লিভারের দোষ সে যে ভারি বিচ্ছিরি কথা। বেশী মদ খেলে ওসব অসুখ হয়। ওসব দোষ ত এদের চোদ্দ পুরুষে নেই। কোথা থেকে এল এসব অসুখ ভেবে পেল না কেউ। এল ছেলেদের বড় বড় ডাক্তার, বললেন, কল খাওয়াতে হবে পেঁপে। পেঁপে কত বড়, কি ওজন এসব ভেবে দেখা হয় নি। কটুকলো খাওয়ান সম্ভব ঐ বাচ্চাকে? চতুর্দিকে লোক ছুটল পেঁপের খোঁজে। প্রজারা রাজাবাবুদের খুশী করতে ছুটে এল বড় বড় লাউএর মত পেঁপে কাঁধে করে। সে পেঁপে প্রাণপণে খাওয়ান হল। যা ব্যাপার তাতে দম আটকেই মরার কথা ছেলের। কিন্তু না মরে যেমন তা হ'ল। হ'ল পেটের অসুখ। আবার সাহেব ডাক্তার এলেন, বত্রিশ টাকা ফী তাঁর। ভবনপুরে একপোতেই আসেন। অনেক দেখে-শুনে বললেন, বার্লি খাওয়াতে হবে ছেলেকে, এবার সারা বাড়ীতে আকাশ ভেঙে পড়ল। বার্লি? বার্লি যে ভাতের সকড়ি, বার্লি কি করে খাওয়ান যাবে? তখন আবার শীতকাল। অত শীতে পুকুরপাড়ে বার্লি খাইয়ে চান করিয়ে আনলে আবার বুকে সর্দি বসবে না? জল্পনা-কল্পনা করতেই সাত দিন কেটে গেল। পিসীমা কপাল চাপড়ে বললেন, ঐ অলক্ষুরের এঁটোয় একটা দিনরাতের ঝি রাখতে পারি না। সেই অলক্ষুরের এঁটোয় বাড়ী ভরে যাবে। খাটে শুয়ে ছেলে কি বার্লি খায়? খাট বিছানা মশারি বালিশ সব যে অলক্ষুরের এঁটো হয়ে যাবে।

কি হবে উপায়? ভেবে থৈ পায় না কেউ। এমন সময় মারা গেল ছেলেটা। সামান্য কয়েকটা হিক্কা তার পরই স্থির। বাড়ীর লোকের ধড়ে প্রাণ এল। হত-বুদ্ধি কিংকর্তব্যবিমূঢ়রা ঠিক করতে পারছিল না যে বার্লির এই ক্যাসাদ থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়। উদ্ধারের পথ বাৎলে দিল ছেলেটা। হোক না ছেলে-মানুষ তবু ত রাজার ছেলে, রাজবুদ্ধি জিনিষটাই আলাদা। মহাসমারোহে মৃতদেহ পুঁতে দিয়ে এল সবাই। জানি না এর ছবি ন'মেসোমশাই তুলেছিলেন কি না? তবে ন'মাসী কাঁদার ছুটি পায় নি। পিসীমা বলেছিলেন, দেখ নতুন বৌমা, তোমার ঐ তিনমাসের ছেলের জন্যে চিটের বসে কেঁদে তুমি যে আমার তিনপুরুষের অকল্যেণ করবে তা হবে না। অত ঢং সহ্য করতে পারব না আমরা। এই সময় আবার বাড়ীতে মেজকর্তার অসুখ হ'ল। অসুখ যত না হ'ল হাঁক-ডাকে বাড়ী কেঁপে উঠল। অসুখটা ডায়বেটিস। ডাক্তার মাপাজোখা খাবার খেতে বলেছে। কিন্তু কে শোনে কার হুকুম? সেই অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। আমার যা ইচ্ছে করব। আমি কি কারুর চাকর যে ডাক্তারের হুকুম মানতে হবে। সকালে উঠে একদিন মেজগিন্নীকে বললেন, তপসে মাছ খাবো, আমাও আড়াইসের তপসে মাছ। আবার বলছি সেটা ছিল চল্লিশ বছর আগের কথা। তখন ইনসুলিন বেরোয় নি। ডায়বেটিস হলে তখন ডায়েট কন্ট্রোল ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু কার ডায়েট কে কন্ট্রোল করবে? তবু মেজগিন্নীর অদ্ভুত অধ্যবসায়। খাটের পাশে খাওয়াতে বসে যত অদ্ভুত অদ্ভুত উদ্ভট গল্পের আমদানি করলেন তিনি। মেজকর্তা তন্ময় হয়ে শুনছেন আর মেজগিন্নী একটু করে মাছ মেজকর্তার মুখে দেন আর বাকিটা তাবড়ে ফেলেন। তপসের একপো উঠল মুখে বাকি নপো গেল তাবড়ে। ঠাকুর একটি করে লুচি ভাজে একতলার রান্নাঘরে ঘুরে দোতলার অন্দর মহলে আসতে তা কেন জুড়িয়ে যায়? দিনকতক রাগা-রাগির পর নতুন সিঁড়ি উঠল রান্নাবাড়ী থেকে সটান মেজকর্তার ঘরে। দ্বিগুণ খরচ, চতুর্গুণ মজুর দিয়ে দিনরাত কাজ করানো হ'ল রাতারাতি সিঁড়ি তোলানর জন্যে। এই মেজকর্তাই যখন কাশ্মীর গেছলেন সাবিত্রী ব্রতর জন্য মেজগিন্নী যেতে পারেন নি সঙ্গে। সাবিত্রী ব্রতর কল ফললো হাতে হাতে। নতুন জীবন-সঙ্গিনী নিয়ে ফিরলেন মেজকর্তা। কাশ্মীরী নববধূ। সদরে খবর এলো নতুন আখরোট কাঠের পালঙ্ক করো, যাতে শোবেন কাশ্মীরী নববধূ নিয়ে। খাটের ছত্রিতে ছত্রিতে পরীর মেলা। মালা হাতে করে উড়ছে তারা দল বেঁধে। ঠিক অমনি করেই উড়েছিলেন মেজকর্তা। তবে হ্যাঁ মেজগিন্নী যে বলেছিলেন সাবিত্রী ব্রতর আগে

ফিরতে মাথার দিব্যি দিয়ে তাইই ফিরেছিলেন। আর মেজগিন্নী খবরটা শুনে যতই কাঁদুন না, অবিচল ধৈর্যে ফুলের গয়না পরা মেজকর্তার পা পুজো করেছিলেন। সে ছবি আজো তাঁর ঘরে টাঙানো আছে সাহেববাড়ী থেকে করা ফ্রেমে গির্জার ঘণ্টা টাঙানো। সেই যে কাশ্মীরী নববধূ তাকে আনতেই মেজগিন্নী প্রথম হুজুগ তুললেন, "এ বাড়ীতে থাকব না আমি", মেজকর্তা প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। কারণ বরাবর তাঁর খোলের পালে হাওয়া জুগিয়েছেন মেজগিন্নীই। তিনিই আজ কেন বেসুর ধরলেন বুঝলেন না মেজকর্তা। যাই হোক চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে তখন। তখন আর চাবুকমারা বা চাবি দিয়ে রাখার কথা না বলে বললেন, ঠিক আছে। রাতারাতি বাড়ী উঠল উঠোনে যাকে সবাই বেঁকা বাড়ী বলে। সেই বেঁকা বাড়ী দিয়ে মেজগিন্নীর বেঁকা মন সোজা করার উপায় বাৎলালেন।

(৭)

মেজগিন্নী রইলেন বেঁকা বাড়ীতে কিন্তু পুজো আর্চা নিয়ে নয়। অলক্ষ্যে মেজকর্তার পুজোর আয়োজন করতেন তিনি। মেজকর্তার লুচি বেলে দিতেন রান্নাঘরে বসে। অনেকক্ষণ ধরে না ঠেসলে সে লুচি মেজকর্তার মুখে রুচত না, হয়ত সে লুচি কাশ্মীরী বেগম খাবে তা জেনেও তা থেকে বিরত হন নি তিনি। চাকর বিছানা করে গেলে সযত্নে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতেন বিছানায় ধুলো-বালি আছে কি না? মশারি তুলে পরীক্ষা করতেন মশা আছে কি না ভেতরে। একদিন রাতে শুয়ে মেজকর্তার ঘুম আর আসে না, যতবারই শোন কানের কাছে সেই মশার পোঁ আওয়াজ। বিরক্ত হয়ে বেল বাজালেন। চাকর এল। তাকে বললেন, কি মশারি ফেলেছিস আজ, ভেতরে মশা ঢুকেছে। জোরার মুখে প্রথম যেমন রোজ মশারি ফেলেন মেজগিন্নী—আজ তিনি ঘরে বেহোর। মেজকর্তা পর-দিন সকালে সদরে গিয়ে খবর দিলেন ডাক্তার এসে যেন দেখে যায় মেজগিন্নীকে। ব্যস্, এতেই মেজগিন্নীর আনন্দের সীমা নেই।

ডাক্তারকে চন্দ্রপুলি খাইয়ে বিদেয় করে চাকরকে বকতে বসলেন তিনি। হ্যাঁরে গোবিন্দ, জানিসই ত মানুষটার মাথার শরীর তাকে এত ভাবান কেন বল দিকি? নিজে মশারি ফেলতে জানিস না বাইজীকেও ত (কাশ্মীরী বেগমকে ঐ বলে ডাকত চাকররা) দেখে নিতে বলতে পারতিস, শুধু শুধু মানুষটাকে ভাবান। নিজের মনের অকৃপণ ভালবাসা আর নিঃসন্তান মনের বাৎসল্য দিয়ে তিনি যে মেজকর্তার ছবি মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন মেজকর্তার অসীম অত্যাচারেও তা বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি। কিংবদন্তী আছে যে বাইজীকেও সাজ-পোশাক সম্বন্ধে তিনি যা যা ভাল-বাসেন মেজকর্তা তা বলে দিতেন। মানুষের মন বিচিত্র। মেজগিন্নীর এই সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণে মেজকর্তার মনের দেবতাব গেল বেড়ে। তাঁর মনে একটি অবুঝ আবদেরে দেবসর্বস্ব মেয়ের প্রয়োজন হয়ে উঠল। তাই মেজগিন্নী তাঁর প্রিয়া হতে পারলেন না, পারল বাইজী। মেজকর্তা বাইজীর নাম দিয়েছিলেন নিরুপমা। কি আদর করা ছুরে যে মেজগিন্নী নিরু বলে ডাকতেন সে না শুনলে বোঝার নয়। এত কাণ্ডর পরও সকালে যথারীতি শ্বেত পাথরের বাটিতে করে জল নিয়ে যেত গোবিন্দ। মেজকর্তা পা ডুবিয়ে দিতেন, ঐ জল খেয়ে তবে জল খেতেন মেজগিন্নী।

(ক্রমশঃ)

প্রকাণ্ড কারখানা···

ওষুধ তৈরীর নয়, প্রাণ-ক্যান্টীনও নয়,

কৃত্রিম চাল তৈরীর কারখানা।

এস. সি. তালুকদার ওরফে নটচন্দ্র তালুকদার।

দীর্ঘ দিন আমেরিকায় থেকে এই চাল তৈরীর বিদ্যা শিখে এসেছেন। রীতিমত গবেষণায় সিদ্ধান্ত ক'রে তিনি বিরাট ব্যয়ে এই কারখানা স্থাপন করেছেন।

তিনি প্রথমে দেখলেন, চালে কোন্ কোন্ বস্তু বর্তমান, তার গুণ কি এবং তার বিকল্পে কোন্ কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করা যেতে পারে···সেই সব দ্রব্যের সংমিশ্রণেই তিনি এই বৈজ্ঞানিক চাল তৈরী করেছেন।

বিরাট কারখানা।

মিশ্রিত দ্রব্যের মণ্ড···যন্ত্রের এক মুখ-গহ্বরে গিয়ে পড়ছে, অপর মুখ দিয়ে চালের আকারে ট্যাবলেট হয়ে বেরিয়ে আসছে।

সুন্দর চাল···আসল-নকল বুঝবার উপায় নেই। চাষ করতে হবে না—জমির প্রয়োজন নেই, বন্যা-ভয়ও নেই—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির দুর্ভাবনাও নেই—ইচ্ছামত প্রচুর চাল···ধান নয়, একেবারে চাল হয়ে বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু নটচন্দ্র শুধু চালই তৈরী ক'রে চলেছেন, তাকে চালাবার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত করতে পারেন নি। সরকারী দপ্তরখানায় এই ভেজাল-চাল নিয়ে তিনি হাঁটাহাঁটিও করেছেন, অবশ্য তিনি হতাশ হন নি···তাঁর বিশ্বাস, এই চাল একদিন ভেজাল-রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করবে। তিনি খবর পেয়েছেন, মাড়োয়ারী-মহাজনেরা ইতিমধ্যেই গড়তা করতে সুরু করেছে। ওরা একটু দেরীতে বোঝে বটে, কিন্তু বাজার ওরাই রেখেছে। ভেজাল বলে ওরা অবহেলা করে নি। ভেজাল নাই আজ কিসে? ওষুধে ভেজাল, ঘি-তেলে ভেজাল—তবে দেখতে হবে, এই ভেজাল বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তৈরী হচ্ছে কি না। যেমন তৈরী. হচ্ছে, আলকাতরা থেকে চিনি। আলকাতরাই যদি আমাকে চিনি যোগাতে পারে, তবে মিছিমিছি ইক্ষু চাষের প্রয়োজন কি?

প্রকৃতির ওপর নির্ভর ক'রে আজকের মানুষ ব'সে থাকতে জানে না। তার চেষ্টা চলেছে প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে। 'ভেজালে দুনিয়া ছেয়ে গেল'—এই মিথ্যে চীৎকারে লাভ নেই। প্রকৃতি যেখানে মানুষের প্রয়োজন-মত যোগান দিতে পারছে না, সেখানে মানুষকে বিকল্পের আশ্রয় নিতেই হবে।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ভেজাল-জিনিসে শরীর কমজোরি হচ্ছে কি না? এর পর পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে দেখতে হবে—তাতেও সমাধান না হ'লে, অপর বিকল্প বের করতে হবে। এক্সপেরিমেন্টের যুগ···পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে প্রকৃতিকে পরাস্ত করতে হবে। দাঁত নেই ব'লে, আজকের মানুষ চুপ ক'রে ব'সে থাকে না—সে কৃত্রিম দাঁত লাগিয়েও মাংসকে খিঁচোয়!

আজ নটচন্দ্র তালুকদারকে গাল দিলে চলবে কেন! সে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন লোকের মুখে অন্ন যোগাবার ব্যবস্থা করছে। ভেজাল হোক, তবু ত চাল—বনস্পতি হোক, তবু ত ঘি!

খুড়ো বললে, তোমার এই লেখাটা নটচন্দ্র তালুকদারকে পাঠিয়ে দাও বাবাজি, তার পাবলিসিটির কাজ হবে।

এর পর খুড়োকে অনেক দিন দেখি নি।

খোকা এসে খবর দিলে, খুড়োর নাকি মাথা খারাপ হয়েছে। দেখতে গেলাম।

সেই পুরাতন মেস-বাড়ী। দেখি ভাঙা তক্তপোষের ওপর খুড়ো চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আমাকে একবার চেয়ে দেখলে মাত্র। সেই খুড়ো। যার মুখে কথার খই

ফুটত, তাকে এমন চুপ ক'রে থাকতে দেখে ভাবনাই হ'ল। বললাম, কেমন আছ খুড়ো?

—ভাল বিষ কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?

থাবড়ে গেলাম। ভাল বিষ আবার কি রকম বিষ?

—জান না, শালারা আজকাল পটাসিয়াম সায়নায়েডেও ভেজাল দিচ্ছে। এতখানি গিলেও কিছু হ'ল না হে!

—কেন, বিষ খাবে কোন্ দুঃখে?

খুড়ো হাসল। কয়েকটি তাঁত করেছি। করেই ঠকেছি। তার সুতোর জোগান দিতে পারি না। আজকাল কোন জোগাড়ই সহজে হয় না—পারমিট দরকার। তোমরা বল ব্যবসা করতে—পাঁচ শালাকে দিতেই যদি ফতুর হয়ে যাব, ব্যবসা করব কি পুঁজি নিয়ে! জান, 'পারমিট'ও আজকাল চড়া-দরে বিক্রি হচ্ছে? কিন্তু আমি অত টাকা পাব কোথায়? তার চেয়ে তাঁতগুলো বিক্রি ক'রে দেওয়াই ভাল। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করলাম —তারা সৎ-পরামর্শই দিলে।

অবশেষে বিক্রি করাই স্থির হ'ল। খদ্দের খুঁজছি··· দলে দলে লোক আসে—তারা দেখেই যায়, কিনবার কথা কেউ বলে না। একজন পরামর্শ দিলে, আপনার এ লকড়িগুলো চেলাই করলে ভাল জ্বালানি-কাঠ হবে। জ্বালানি-কাঠের দরে যদি নেন···

ঠিক করলাম 'পারমিট'ই যেমন ক'রে হোক আদায় করতে হবে। দিনকতক কাগজে খুব লেখালেখি করলাম। লিখলাম, কুটির-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব সরকারের, অতএব, অতএব···

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

হয়ত পারমিটের সহজ রাস্তা তাঁরা দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে এই পারমিট পাচার হচ্ছে সে-খবর ত আর তাঁরা রাখেন না—

ক্যাবলাটা এসে বললে, বাবা, একটা পরিচিত লোক পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু ওকে শ'পাঁচেক দিতে হবে। ভাবলাম, শ'পাঁচেক দিয়ে সত্যি যদি দুর্লভ বস্তু পাওয়া যায় তবে মন্দ কি। লোকে ত এর পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করছে।

দিলাম পাঁচশ টাকা ছেলের হাতে তুলে। কিন্তু তার পর কি হ'ল বল দেখি বাবাজি?

—কি হ'ল?

খুড়ো আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। হাঁ, কি বলছিলাম? ও। তার পর হ'ল কি জান? পটাসিয়াম সায়নায়েডের জন্তে একটি কলেজের ছেলেকে ধরলাম। সেও খোকা বুঝে ভেজাল চালিয়ে দিলে।

—তোমার ছেলে কি করলে বল?

—ও, আমার ছেলে? কি আবার করবে···লোকে বাবাকে ঠকালে।

—তোমাকে ঠকালে?

—তা ঠকাবে বৈ কি। ওরা যে আমাদের এক যুগ পরে এসেছে বাবাজি।

—সবই না হয় বুঝলাম। কিন্তু মরবে কেন?

—মরব কেন? খুড়ো আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল; তার পর প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আমাদের জন্তে এ পৃথিবী নয়।

পথে এসেও, খুড়োর সেই কথা মন থেকে দূর করতে পারছি না···সত্যি কি, আমাদের জন্তে এ পৃথিবী নয়?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নয়েডেককে চাষী ভহেথলিনকে দুধের ট্রাকে করে শহরে নিয়ে যাবে। ভহেথলিন দুগ্ধ সংগ্রহ ক্ষেত্রে অপেক্ষা করছিল নয়েডেকের তৈরী হওয়ার জন্য। চমৎকার কালো পোশাক এবং শক্ত-সমর্থ দেহটার আড়ালে তার মনটা কিন্তু ভয়ে আচ্ছন্ন। শক্ত টুপিটা যেন লোহার পিপের ক্ষুরের মত তার কপালে দাগ দিয়ে দিচ্ছিল। মাথার মধ্যে গজ-গজ করছে হঠাৎ ভাবনাগুলো তার সায়ুতন্ত্রের উপর চাপ দিচ্ছিল। লোকগুলোর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল সে, কিন্তু অনুভব করতে পারছিল যে তাকে দেখে ওদের চোখে বিস্মিত ও আতঙ্কিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। ট্রাকের উপর বেঞ্চিতে নয়েডেকের পাশে বসতে পেরে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করে সে।

শহরের বাজারে ডিম ও দুগ্ধজাত দ্রব্য কারখানার ইন্চার্জ ছিল নয়েডেক। তার আপাদমস্তক চমৎকার পোশাকে মোড়া। একগাদা কাজকর্ম নিয়ে উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকত সে। সমস্ত কাজই সাফল্যের সঙ্গে উৎরে যেত কারণ সে নিজে তার দেখাশোনা করত। সে বিয়ে করে নি, কারণ সব সময়েই এত নারী ও তরুণী জুটত তাকে ঘিরে যে তাদের ঐ ডোরাকাটা অথবা চেককাটা পরিচ্ছন্নতা দেখে দেখে সে একেবারে হাড়ে হাড়ে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তাদের ঘিনঘিনে ও রুক্ষ ঘ্যানঘ্যানিতে ওর কান ঝালাপালা হয়ে থাকত। শহর ও গ্রামের মাঝখানকার রাস্তার ধুলোর মেঘ ওদের দু'জনকেই ঢেকে দেয়। এই অবস্থায় নয়েডেকের মধ্যেকার সেই সহজাত ঔৎসুক্য জেগে ওঠে, যার দরুণ সে নানা রকম বাস্তব ব্যাপারকে সরল ভাবে সমাধান করে এবং যার তাড়নায় সে এখন অদ্ভুত উদ্দেশ্যে চাষী ভহেথলিনের কাছ থেকে বোধ শীকারের অবশ্যম্ভাবী আঘাতে উঠে-পড়ে লাগে। যখন তারা নদী-তীরবর্তী ছোট্ট ছায়াঘেরা বনাঞ্চলটা পার হতে থাকে তখন নয়েডেক জিজ্ঞাসা করে: "এখন বল দেখি, তোমার বউ-এর এরকম হ'ল কি করে?"

চাষী শান্তভাবে জবাব দেয়: "কি করে হ'ল বলে তোমার ধারণা? মাথার রক্ত চড়ে গিছল।"

এতক্ষণে বন পার হয়ে গিয়েছে তারা, শূন্য মাঠে সূর্যালোক বিছানো। নয়েডেক ভাবল, সে যদি একটা স্পষ্ট ছবি তুলে ধরে তা হ'লে হয়ত চাষীটার কাছ থেকে আরও কিছু বের করতে পারবে। কাজেই সে জিজ্ঞাসা করে: "কোথায় পেলে ওকে?" "আমি নিজে সেখানে ছিলাম না"—রুক্ষ, সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় ভহেথলিন।

এবার তাদের গাড়ি নদীর তীর ধরে চলছিল। কতক-গুলো বাড়ী নদীর এত কিনারে যে ছিপহাতে লোকগুলো তাদের উঠোনের দেয়ালের উপরই বসে গেছে। একটা ছোট্ট ভেলা আপনাআপনি ভেসে চলেছিল নদীতে, তার উপরে একটি ছাউনি, একটি কুকুর এবং ঊর্ধাংগ অনাবৃত করে শয়ান একটি মানুষ। নদীটা অপরিচিত মনে হচ্ছিল চাষীর কাছে, ভাল লাগছিল না তার। একে ত তার জমি পাহাড়ের উপর দিকে, তার উপর সারা বছরে সে নদী একবার চক্ষেও দেখত না। দেয়ালের উপর, ভেলাটার উপর, ঝকঝকে জলধারার উপর একটা সন্দেহপীড়িত দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় সে। একতাল অজীর্ণ চর্বির মত পেটের মধ্যে তার অস্বস্তি গজগজ করতে থাকে। ট্রাকে ঝাঁকুনিতে প্রায় তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবার উপক্রম। যাই হোক, শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা। আমিই কি তাকে ও পথে ঠেলে দিলাম? অবশ্যই আমি দিয়েছি, আর সে কি ঠেলা! তা তুমি হোকহোক করে ফিলের

সন্ধান করছ? অদৃশ্য, অপরিমেয় শক্তিধর এবং অসম্ভব লোভী এক সয়েডেকের বিরুদ্ধে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে। ওকে এ দিকে না ঠেললে আমি চালাতাম কেমন করে? ও বেঁচে থাকতেই খামারটা ওকে দিতে কি ওর বাবা রাজী ছিল? সত্যি কথা খামারটা পাবার জন্ত আমি অস্থির হয়েছিলাম, কিন্তু কথাটা শোন, যদি আমি সেজন্তে অতটা অস্থির না হতাম তা হ'লে কি আমি ওকে কম কষ্ট দিতাম? বড় জোর হয়ত সাজাটা একটু কম হ'ত, তা হ'লে?

স্ত্রীর প্রথম ছেলে হবার সময়কার একটা ঘটনা ওর মনে পড়ে যায়। আঁতুড় থেকে উঠে বৌ ওর সঙ্গে আলু তুলতে গিয়েছিল ক্ষেতে। তখনও সে দুর্বল, হাঁটু দুটো ভেঙে পড়ছিল, মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল সে। সমস্ত আলুগুলো গড়িয়ে গিয়েছিল, ওর মুখখানাও মাটিমাটি হয়ে গিয়েছিল। সয়েডেকে তখনও খবর বের করার চেষ্টা করে চলেছিল। চাষী তাকে বলে তোমার হয়ত জানা নেই কোনও কিছু নষ্ট হতে দেবার সাধ্য নেই আমার। অবশেষে একেবারে চুপ করে যাবার আগে সে বলে: "আমার শাস্তিতে থাকতে দাও।" সয়েডেকে বুঝল যে এই দৃঢ় নীরবতার সামনে সে শক্তিহীন।

লোহার সেতু পার হয়ে পিচের রাস্তা দিয়ে তারা শহরের গেটের মধ্যে ঢুকল। তখন সয়েডেকে ট্রাইবের ঘরের সামনে থামল এবং ওরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিল। বুকের উপর হাত দু'খানা যুড়ে সয়েডেকে ভহেথজিনের দিকে চেয়ে রইল। ভহেথজিন কাঁধ উঁচু করে মাথা ঝুলিয়ে হেঁটে চলে গেল। মাথার উপরকার চূড়াটা তার মস্তিষ্কের মধ্যে কেটে বসতে লাগল, সমস্ত শহরটাই যেন লোহার শিরস্ত্রাণের মত চেপে রইল তার মাথার উপরে। প্রত্যাশিত সময়ের ঢের আগে সে ম্যাজিস্ট্রেটের ওখানে পৌঁছে গেল। দরজায় তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল কি দরকার। কোটের বোতাম খুলে সে সমনখানা বের করল। লম্বা দালানের ভিতর দিয়ে অনেকখানি হেঁটে গিয়ে ২৭ নম্বর ঘরে পৌঁছল। সে একবার দ্বিধা করল। কিন্তু তার শক্তিশালী করাঘাত সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

সে যা ভেবেছিল তার চাইতে ঘরটা ছোট। অনেক-গুলো ডেস্ক এবং একটা টেবিল রয়েছে। টেবিলের পেছনে পিঁসনে পরা এক ছোট্ট কুঁকড়ান বুড়ো বসে আছে। ভহেথজিন যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে শুধু তা- বাহু দুটো দেখা যাচ্ছিল, সে দুটো অস্বাভাবিক রকম লম্বা ছোট্ট লোকটার পিছনে আর একটা দরজা, সেটা দিয়ে পাশের ঘরে পৌঁছান যায়। দরজার উপর হিণ্ডেনবুর্গে একটা বিরাট কাচে বাঁধানো ছবি ঝুলছিল। হঠা ভহেথজিনের খেয়াল হয় এ ঘরে তাকে একটা কিছুর না শপথ নিতে বলা হবে। সে জানত না সেটা ঠিক কি রক তবু এই শপথের কথা ভেবে ভয় হয় তার।

"এই যে, তোমার কি চাই?"

আবার কোটের বোতাম খুলে সমনখানা বের করে দে ভহেথজিন। ছোট্ট মানুষটা যখন ওটা পড়ছিল তখন তাকে লক্ষ্য করতে থাকে। তাকে প্রশ্ন করা হয়, সে জবা দেয়। বুড়ো লোকটা তার জবাবগুলোকে একটা কা উপর লিখে নেয়। এই ছোট্ট লোকটার মধ্যে সয়েডেকে লোভ বা জিদ কোনওটাই ছিল না, তবু ভহেথজিনের ম হয় এ লোকটা যে ভাবে তার ভিতর পর্যন্ত দেখে নি সয়েডেকে কখনই তা পারত না। এর এক্তিয়ার রয়ে তাকে প্রশ্ন করবার এবং জবাব নেবার: তার বাবা-মা ছিল, তার বৌএর বাবা-মা কে, ক'টা ছেলেমেয়ে হয়ে তার, এমন কি বৌ-এর যে মরা ছেলেটা হয়েছিল, কথাও বের করে নেয় সে। তার অধিকার ছিল এসব করবার। কিন্তু সে সব খবর নিজের স্বার্থে ব্যবহার ক অধিকার ছিল না তার। তা যদি থাকত তা হ'লে বো লোকটা এমন হাড়সর্বস্ব, এমন বিবর্ণ এবং দরিদ্র থাকত না। ভহেথজিনের জবাব শুনে একটুও সন্তুষ্ট পারেনা সে, কিন্তু নিখুঁত ভাবে সমস্ত লিপিবদ্ধ করে যা যখন কাগজটা তার কাছে সই করাবার জন্ত আনে 'শপথ নিয়ে সত্য বলে বিবৃত' কথাটা ছাপার লেখা তখনই ভহেথজিন বোঝে সে ধরা পড়ে গিয়েছে। এখন নিজে যা বলেছে তাই সত্য বলে টিঁকে থাকতে তাতেই নাম সই করতে হবে।

"একটু দাঁড়াও।"

চমকে ওঠে ভহেথজিন। এতক্ষণ ধরে সে ভু গিয়েছিল যে মেয়েটা এখনও এখানে আছে—রয়েছে শবদেহটা। ছোট্ট লোকটা চেয়ার থেকে উঠে পিছ দরজায় গেল।

একটু পরেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পার ডবেথিল। ওরা তাকে শবদেহটা দেখায় না, দেখায় একখানা ছবি। কঠোর পরিশ্রমী জীবনের করুণ এবং জমি ও বলদ পাবার আশায় এই মেয়েটাকে স্ত্রী হিসাবে মেনে নিতে যে আতঙ্ককে জয় করতে হয়েছিল তাকে জলে-ডোবা মেয়েটার স্ন্যাপ লাগান ছবিখানা দেখে আবার সেই আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয় সে। তার কেবল একটাই ইচ্ছে হয়—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটাকে সনাক্ত করা, যাতে সে মাটির বুকে আশ্রয় পায়, তার এবং ওর নিজের শান্তি হয়। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে: "হাঁ, এই আমার স্ত্রী বটে।"

তাকে সে মেডিক্রিয় এবং কবর দেওয়ার জন্যে টাকা দিতে হ'ল তার জন্যও দুঃখ হয় না তার। যখন সে আশ্বস্ত এবং শান্তভাবে লম্বা দালানটা দিয়ে হেঁটে আসছিল তখন জানলার উপর আঁটা একটা লাল পোস্টারের দিকে ওর নজর পড়ে। পাঁচশ' মার্ক পুরস্কার, এত টাকার অঙ্কটা দেখে অবাক হয় সে। কাছাকাছি গিয়ে টুপিটা খুলে ফেলে সে। হঠাৎ লোভের ক্ষুরটা মাথা চেড়ে দায়। পোস্টারটা সে পড়ে, বুঝতে পারে যে একটা লোককে খুঁজে বের করতে পারলেই এই টাকাটা রোজগার করা যাবে। সে লোক একজনকে ছুরি মেরেছে, তার মাথায় সোনালী চুল, নীল ধূসর তার চোখ, পরনে নীলশার্ট আর একটা বায়ুরোধী কোট। যে লোকটাকে খোঁজা হচ্ছে তার ফটো সঙ্গে লাগান ছিল। ডবেথিল উপর উপর দেখে। সে সব সময়ে অন্যদের থেকে তফাতে থেকেছে, বিশেষতঃ এই ছেলেটা জন্মাবার আগে পরে সে প্রায় কারও সঙ্গেই মেশে নি, কারও মুখের দিকে তাকায় নি। ডবেথিল মনকে প্রশ্ন করে, সত্যিই কি এমন কেউ আছে যাকে এই বিরাট টাকাটা পুরস্কার দেওয়া হবে? যদি সে রকম কেউ সত্যিই থাকে তা হ'লে শিকার কাছে বাঘের ছলের মত তার কাছে টাকাটা আসবে। নিহত অথবা হত্যাকারীর চেয়ে যার পুরস্কৃত হবার সম্ভাবনা সেই ওর মনকে বেশী অধিকার করে। এই লোকটা যে রকম সহজে টাকা পাবে তার সঙ্গে তার নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমের দীর্ঘ বছরগুলোকে, তার দুর্ভাগ্য এবং দুর্গতিকে তুলনা করে হতভম্বভাবে মাথা নাড়ে ডবেথিল। মাথা নীচু করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় সে, বাজার চৌধুপীটা এড়িয়ে শহরের দেওয়াল ঘেঁষে চলতে থাকে। পরে অবশ্য যখন সে সামনে এক গ্লাস বীয়ার নিয়ে বসে তখন মুক্তির একটা অনুভূতি তার মধ্যে জোয়ার তোলে, ওই ঘৃণিত মেয়েটাকে আর যে বাড়ীতে দেখতে হবে না তাতে যেন একটা বড় স্বস্তি। পুলকিত এবং আশ্বস্ত বোধ করে ডবেথিল।

॥ ২ ॥

বউৎসেনবাথ থেকে দু'জন রাখাল ছেলে একপাল ভেড়া নিয়ে মঙ্গলবার ভোরে শহরে পৌঁছল। তারা নিজেদের এবং পশুগুলোর জন্য কোনও যানবাহন জোগাড় করতে পারে নি এবং রাত্রেই রওনা হয়ে এসেছে। তারা শহরের গেটের ভিতর দিয়ে আসে নি এবং পার্কেও ঢোকে নি। এ রাস্তাটায় পশুচলাচল নিষিদ্ধ ছিল। তাই তারা এসেছে খালির খাদ এবং শহরের দেওয়ালের ফাঁকে শত শত বছর ধরে জেগে-ওঠা মাটির ঢিপির পিছনের ডান দিকে বেঁকে যাওয়া রাস্তা ধরে। এ রাস্তায় পড়ে কয়েকটা আঁকা-বাঁকা গলি, নতুন ও পুরানো বাড়ী। সেগুলোর কোনওটার ছাতাপড়া, কোনওটায় নতুন রং, কোনও বাড়ীতে পলেস্তারায় তালি, কোথাও আলকাতরায় পোঁচ। জুতোর কালির কারখানার মজুর এবং বালিখাদের বেকার মজুরেরা এখানে থাকে।

একটা গেটের ভিতর দিয়ে যাবার সময় মেষপালক ছেলে দু'টির দেখা হ'ল আর এক দল ছেলের সঙ্গে। রাখাল দু'টির একটি হ'ল হেমিশের দলের এবং গেটের ওই ছেলেদের একজন রবিবারে মেডেলের ট্রাকে ছিল। সে অগ্রসরমান রাখাল ছেলেটাকে চিনতে পারে নি, তাই বিশেষ কোনও ঔৎসুক্য না নিয়েই তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু রাখালটি অন্যটিকে চিনে ফেলে। একজন চাষী একজন শহরের লোককে সব সময়ে সহজেই চিনতে পারে। সে তার পাশ ঘেঁষে চলে এল এবং হেসে বলল: 'তা বেশ, তোমাদের ইমস্ট এখন কেমন বোধ করছে?' তখন অন্য ছেলেটি তার ঘাড় ধরে ঠাণ্ডাভাবে জবাব দিল: 'ঠিক এখন তুমি যেমন বোধ করছ,' তারপরই তাকে ঘুঁষি দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

সময়টা ভোর হওয়া সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় সোরগোল পড়ে গেল। চঞ্চল ভেড়ার পালের মধ্যে মিশে লোকগুলো

তাদের ঘড়িতে টাম বলাল। দরজার দিকে যখন দ্বিতীয় রাখালটি বৎসেরবাথে ফিরে এল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে মেরেছে তার মাথায় টাক কি না। ছেলেটি জানাল তার মাথায় টাক।

সন্ধ্যা ঘোর হলে তাটিখানার ড্রাইভারের ট্রাক বড় রাস্তা ধরে শহরের দিকে ছোটে। ৎসিম্লিশ ড্রাইভারের পাশে বসেছিল। তার সঙ্গে ছিল কুকেল, তার ভাই, কোরেন্‌জিন এবং আরও প্রায় বারো জন। খালিখাবে পৌঁছে তারা বলল: "রেণ্ডেল এখন বীয়ারের নেশা করছে।" যখন তারা পুলের উপর এল তখন বলল: "রেণ্ডেল এখন তার স্ত্রীর কাছে গিয়েছে।" যখন তারা পার্কের ভিতর দিয়ে চলল তখন বলল: "রেণ্ডেল এখন তার প্যান্টের বোতাম খুলছে।"

ৎসিম্লিশ এদিক-ওদিক চায় নি। সে হাসে নি। শহরে পৌঁছবার ঠিক আগে যখন একটা টায়ার ফেটে গেল এবং সেটা বদলাতে হ'ল তখন সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। কুকেলও ছিল শান্ত, যদিও মনে তার অস্বস্তি। এ যাত্রায় বাদ যেতে পারলে সে খুশী হ'ত। যখন সে দেখল তার ভাই তারই দিকে তাকিয়ে আছে এবং তাকে বিবর্ণ ও আড়ষ্ট দেখাচ্ছে তখন সে মুখ উঁচু ক'রে শিস দিল। কোরেন্‌জিন ছিল যথারীতি শান্ত এবং খোশমেজাজ। নতুন বাড়ী-গুলোতে তখনও আলো দেখা যাচ্ছিল। ওগুলোতে ধনীরা বাস করে—সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও ইহুদীরা। ওরা চেঁচিয়ে ওঠে, "ইহুদীরা নিপাত যাক, নিপাত যাক, নিপাত যাক।" ৎসিম্লিশ তার গুম ভাব ছেড়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজেই চিৎকার করে, "নিপাত যাক"। তারপর আবার সে মূকে চেয়ে থাকে। তারা শহরের গেট দিয়ে বাজার ঘুরে আপার আইসেল লেনে বাঁধের দিকে গাড়ি চালিয়ে যায়। যে সরাইটা খুঁজছিল সেখানে তখনও আলো জ্বলছে, সজোরে রেডিও বাজছে। তারা থেমে যায় এবং লাফিয়ে নামে। ঠিক সেই মুহূর্তে ভিতরের দিকের খড়খড়ি-গুলো সশব্দে নেমে গেল। প্রত্যেকটা লোক সরাইএর দরজার উপর গিয়ে পড়ল, উল্টো দিক থেকে ঠিক তাদের মতই সমান জোরে ঠেলা হ'ল দরজাটাকে। মাত্র কয়েকটা তক্তার তফাতে দাঁড়িয়ে ওরা ভিতর এবং বাইরে থেকে দাঁতে দাঁত চেপে, মুখোমুখি হয়ে বুক চিতিয়ে প্রবল জোরে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। হঠাৎ ড্রাইভার গাড়িতে ছুটে গিয়ে একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে এল এবং হাত ঘুরিয়ে জোর ঘা মারল একটা লোকের মাথায়, আর দরজায় যে পাটটা সে মাথা দিয়ে ঠেলছিল সেটার উপরে। এক মুহূর্ত পরে নীচে পড়ে রইল মৃত লোকটা আর বিপর্যস্ত এক দল লোক চৌকাঠের উপর কাৎরাতে লাগল আর ছটফট করতে লাগল। কেউ বলতে পারে না এ সংঘর্ষ কখন শেষ হবে.

হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল, "রেণ্ডেল!" কোথায় সে? লোকগুলো চতুর্দিকে চায়। ভীড়ের মধ্যে সে নেই। মৃত লোকটি, যে নাকি চৌকাঠের উপর প'ড়ে আছে, সেও রেণ্ডেল নয়। ষাঁড় যেমন সবেগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে তেমনি করে ছুটে যায় ৎসিম্লিশ। মাটি কেঁপে ওঠে। অন্য সকলেও তার পিছনে ছুটে যায় রাস্তার ক্রিমটে বাড়ীর পরের বাড়ীটায়। দরজা খুলে যায়, সরু ঘোরান সিঁড়ির উপর আলো পড়ে। ভীত-সন্ত্রস্ত মেয়েরা, শিশুরা এবং অর্ধনগ্ন পরিহিত দু'জন বৃদ্ধ বাইরে উঁকি মারে। হঠাৎ নীচের দিকের সিঁড়িতে ৎসিম্লিশ থেমে যায়। "রেণ্ডেল!" চিৎকার করে ওঠে সে।

তাড়াতাড়ি ক'রে সেমিজের উপর ঢোলা লোয়েটার চড়াতে চড়াতে একজন বেঁটে মোটা স্ত্রীলোক সিঁড়ির উপর এসে পড়ে, ঘাড়ের উপর তার এক বন বিনুনী ঝুলছিল। সে চিৎকার করে জবাব দেয়, "আমি তার স্ত্রী, কি চাও তোমরা?"

ঠিক সেই সময়ে রেণ্ডেল বেরিয়ে আসে। তখন সে পা মুড়ছিল, তোয়ালেটা তখনও খালি কাঁধের উপর জড়ানো। সেও জিজ্ঞাসা করে: "কি চাও তোমরা?" স্ত্রীর পাশে তাকে আরও ছোট ও রোগাটে দেখাচ্ছিল। ৎসিম্লিশ যেখানে ছিল সেখানেই নিশ্চল হয়ে গেল মনে হয় পাছে যেন এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওপর থেকে রেণ্ডেল দেখতে পাচ্ছিল ওর নীচু করা মাথার খুলিটা ভুরু ... সাদা ও চকচকে। ঘটনাচক্রে কুকেল ছিল সবচেয়ে উঁচুতে, তাই তাকেই জবাব দিতে হয়. 'তুমি আমাদের লোককে খুন করেছ।" কুকেল ড্রাইভারের কাছ থেকে লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু সে যে সশস্ত্র সেটা তার তখনও মনে হয় নি। রেণ্ডেল বলে, "আমি? কক্ষনো না।" এক মুহূর্ত পরেই রেণ্ডেল মনে মনে ভাবতে থাকে না ব'লে

সে ঠিক করেছে কি না! এতে তার দলের লোকেদের কোনও উপকার হবে কি না। এক মুহূর্ত পরে কুঃকনও তাবে এখনই আঘাত করা সমীচীন হবে কি না। তাতে কোনও সুবিধা হবে কি না। এই মুহূর্তটি পর্যন্ত কোনও একটা শক্তি তাকে পরিচালিত করেছে এবং তাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু এখন সে যা করতে যাচ্ছে তাতে ওই শক্তি এখনও রক্ষা করবে কি না এ বিষয়ে তার সন্দেহ হয়। একবার মনে হয় হয়ত করবে, আবার মনে হয় হয়ত করবে না।

এই বিরতিটুকু ব্যবহার করে রেগুয়েল। প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সে নীচু গলায় বলে, "আমাদের সদ্ব্যবহারের এই কি জবাব, ৎসিরিশ?" হঠাৎ একলাফে সমস্ত সিঁড়িটা কাঁপিয়ে ৎসিরিশ এবার সিঁড়ির উপর উঠে আসে। সেই মুহূর্তে দরজার ওদিকে রাস্তা থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, "পুলিশ।"

এবার সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করে। রাত্রির পোশাক-পরা বাড়ীর লোকগুলো এবং ইউনিফর্মধারী দল সিঁড়ির উপর পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল খাঁচার-পোরা জানোয়ারের মত। ভিতর থেকে কেউ দরজার খিল লাগাচ্ছে শোনা গেল।

এই দ্বিতীয়বারের বিরতিও পুরোপুরি ব্যবহার করে নেয় রেগুয়েল। আগের চেয়েও কোমলস্বরে এবং দ্রুতস্বরে বলে: "তুমি যেহেতু কষ্ট ক'রে এখানে এসেছ আমার আর গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে হবে না। গেল বৎসরে মাঠে আমার দু'টি প্রশ্নের জবাবে তুমি বলেছিলে ঠিক'। এখন আমি তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করছি— বছর আগে আমরা একসঙ্গে মারেম থেকে কারখানা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলাম, তুমি আর আমি। আর তখন তুমি আমাকে বলেছিলে 'আমি মাঝে মাঝে এওার্দ-এর বাগানে কাজ করি, কি ক্রীতদাসের মত খাটায় সে।' মনে আছে, ৎসিরিশ?"

যখন রেগুয়েল বলে যাচ্ছিল ৎসিরিশ তার মুখের উপর শয়তান মাথাটা এক ঝটকায় পিছনে হেলায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এসব ঘটে যায়। ৎসিরিশ মাথা হেলায় তা আর কিছুই করে না দেখে সিঁড়ির উপরের লোকগুলো মনে করে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

কিন্তু রেগুয়েল ৎসিরিশের মুখটা এত কাছে দেখতে পেল যে তার বুকের মধ্যেটা যেন ধক ক'রে উঠল। সে চিৎকার ক'রে বলল: "হয়ত এওার্দ এখন গ্রুপনেতা, এবং তুমি এখন একটা ঝটিকাবাহিনীর নেতা। ৎসিরিশ, ৎসিরিশ তুমি ওদের তোমার উপর সর্দারি করতে দিচ্ছ। তুমি একজন মজুর এবং তাইই থাকবে। বেশ তা হ'লে তৃতীয় রাইখে দৌড় দাও সদর্পে এবং সবেগে"…

তারপর ৎসিরিশ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সব কিছুই যথাস্থানে ফিরে যায় আবার। আবার রক্ত টগবগিয়ে ওঠে ওদের। গায়ের জোর ছাড়া আর সব নিরর্থক হয়ে যায়। তারপর রেগুয়েল উঠে দাঁড়ায় এবং দশ রেগুয়েলের শক্তিতে ৎসিরিশের বুকে মুখে ও ঘাড়ে ঘুঁষি দেয়। ৎসিরিশের দলের একজন ছুরি বের করে। রেগুয়েল পিছনে হটে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরের ভিতর দৌড় দেয়। ওরাও তার পেছনে ছোটে। কিন্তু রেগুয়েল জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ে। ছাদের উপর দিয়ে রাস্তাটা সে চিনত। গায়ে তার জোর ছিল না কিন্তু বেশ ক্ষিপ্র ছিল, অন্যদিকে ঝটিকাবাহিনীর চাষী ছেলেদের গায়ে জোর ছিল কিন্তু তারা চটপটে ছিল না। জানলার চৌকাঠে রেগুয়েলের রক্তের দাগ লেগেছিল এবং খুব সম্ভবত ছাদের উপর দিয়ে যে পথে সে গিয়েছিল সেখানেও চিহ্ন রেখে গিয়েছিল। রেগুয়েলের স্ত্রী হাতের কাছে পাওয়া বিছানার চাদরগুলো দিয়ে বাচ্চাদের জড়িয়ে ফেলেছিল যেন আগুন লেগেছে। তার চারিদিকে কাচ এবং আসবাবপত্র চূর্ণবিচূর্ণ করা হচ্ছিল।

পটিজিয়েব ফুকেন রেগুয়েলের এক ছেলের হাত ধরে টানছিল। হঠাৎ সে ভাবে, কেন আমি এ কাজ করছি? ইতিমধ্যেই তার মত্ততা নিঃশেষ হয়ে গেছে, সে এখন পীড়িত এবং ক্লিষ্টভাবে চতুর্দিকে তাকায়। এ ঘরের গন্ধ তার বাড়ীর মত নয় বটে, কিন্তু বিছানা, চেয়ার এবং বাসনের তাকগুলো সেই একই রকম। তবে এগুলো সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। দলের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়েছে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, তার বালসুলভ মুখখানাতে সেই অতরুণসুলভ তিক্ততা ও সন্দেহের অভিব্যক্তি যা দেখা দিত তার ভাইয়ের দিকে চাইলেই

বাইরে বাড়ীর সামনের গলিতে পুলিশের লোকেরা হুইসল-এর তীক্ষ্ণ আওয়াজ করছিল।

দরজা খোলা হ'ল। ৭লিরিশ তার লোকেদের জড়ো করল এবং এক একজন করে নাম লিখে নেওয়া হ'ল তাদের। ওরা ওদের পোশাক গোছাতে গোছাতে হাসছিল। যাদের নাম নেওয়া হয়ে গিয়েছে তারা এক একজন ক'রে সারি দিয়ে অপেক্ষমান ট্রাকে গিয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে রেগুলি পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তোলকের কারখানায়। পরদিন সকালে লোকে বলল সে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু আসলে তোলকের ঘরে তার শরীর সেরে যায় এবং কারখানা থেকেই সে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করে; সহরটি ছোট হলেও সে চালিয়ে যাচ্ছিল। শেষের দিকেই শুধু তারা ওকে ধরে ফেলে এবং খুন করে।

"আমার বাবা মা বলল তা কি সত্যি যে তুমি সারারাত ধরে চিৎকার করে কেঁদেছ?" জিজ্ঞাসা করে ছোট মেরৎস।

সোফি মুখ ফিরিয়ে নেয়। সারা সপ্তাহ ধরে বুড়ো মেরৎস বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কনরাড বাস্তিয়ানকে উত্যক্ত করেছে। কিন্তু কনরাড বাস্তিয়ান বারবার বলেছে যে সোফি তার যৌতুক ছাড়া আর কিছুই পাবে না। যৌতুকটা অবশ্য অসাধারণ বড় রকমের। সেটা কেনা হয়েছিল ১৯২৩ সালের মুদ্রাস্ফীতির বছরে, তখন সোফির বয়স ছিল সাত। এর মধ্যে একবার সে কথাচ্ছলে বলে দেয় যে তার ছোট মেয়েকে এ বছর বিয়ে দেওয়ার জন্য সে বিশেষ ব্যগ্র নয়। সে ভাল করেই জানত যে ছোট মেরৎস ব্যাপারটা অত সহজে ছেড়ে দেবে না। এই কারণেই সে বুড়োকে উপেক্ষা করার ঝুঁকি নেয় না।

"তুমি কাঁদছ কেন বল? আমার দিকে তাকাবে?" সে দু'হাত দিয়ে সোফির মাথাটা ধরে জোর করে ফিরিয়ে নেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত সোফি তার দিকে চায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, "আমাদের বিয়ে হতে যাচ্ছে বলে।" গেল রবিবারের পর থেকে সে আরও রোগা হয়ে গেছে, মুখখানা সাদা হয়ে গিয়েছে এবং সেই একই পোশাক পরে আছে। বেল্টে ভাঁজ পড়ে গেছে, ইস্ত্রি করা দরকার।

"আমি তোমার থেকে কেবল না", বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বেল্টের তলায় হাত রাখে মেরৎস। জড়িয়ে ধরার জন্য তাকে হাত বাড়াতে হয়, কারণ সোফি তার থেকে সরে গিয়েছিল। সোফি কাঁপতে সুরু করে। মেরৎসও ভীষণ ভাবে চমকে ওঠে যখন তার হাত ওর বুক ছোঁয়। "চুপ করে বসবে তুমি?" হিসহিস করে বলে সে। বাৎসেন-বাখের ছোট্ট চাকরাণি মেয়েটা গত বছরে যেমন করেছিল সে যদি সেই রকম তাকে দূরে সরিয়ে দিত...কিন্তু এ মেয়েটা ভয়ে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল, চুপ করে বসেছিল যতক্ষণ ব্যাপারটা চলেছিল। ছোট মেরৎস একটা কঠোর হাসি হেসে বলে: "তোমার বান্ধবীরা বুধবার আসছে, তাই নয়? আমার মা তোমার জন্য এক মস্ত কেক দিয়ে লুইজেকে পাঠাবে।"

দু'দিন পরে সত্যিই একটা কেক নিয়ে লুইজে বাস্তিয়ানের বাড়ী হাজির হ'ল। সোফি যে এতদিন চুপচাপ ছিল সে এই প্রথমবার হাসল এবং খুশীতে লাল হয়ে উঠল। সব মেয়েরাই কেক এবং উপহার এনেছিল, সেগুলো টেবিলের উপর সাজানো। ক্রমে ক্রমে সোফি এই বিদায় সম্বর্ধনার কারণটা ভুলে গেল। সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং তার হাল্কা নীচু গলা নিয়ে গানে যোগ দিল। যৌথ স্বরের মধ্যে সে গলা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল।

নিমন্ত্রিত মেয়েদের মধ্যে ছিল তোন্না বাস্তিয়ান। সে একটা এপ্রন পরে এসেছে। এই একই রকমের উৎসব আবার কয়েকদিনের মধ্যেই হবে লুইজে মেরৎস-এর বাড়ীতে। তাই মেয়েদের পরিবারের লোকেরা এরই মধ্যে দু'বার উপহার দিতে হবে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সমস্ত বাস্তিয়ান পরিবারের পক্ষে এই উপহারের ব্যাপারটা ছিল এক বিরাট বোঝা। জোহান কাঠ খোদাই করে কিছু একটা তৈরী করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ঘরে তৈরী কোনও জিনিস উপহার দেওয়া অসম্ভব, শুধু দোকান থেকেই কিছু কিনে দেওয়া চলে। অবশেষে বাস্তিয়ানের স্ত্রী তার সংসারের কাছ থেকে পাওয়া দুটো রূপোর চামচ বার করে দেয়।

গন্ধ থেকেই তোন্না বাস্তিয়ান বুঝতে পারছিল যে কেকটা মিষ্টি এবং প্রচুর মাখন দিয়ে তৈরী। কেকে একটুখানি কামড় দিতেই জিভের উপর যেন গলে যায়। সাদা কাপড়ে ঢাকা টেবিলের উপর বোঝাই উপহারগুলো ও কেকটার মাঝখানে চামচ দুটো রূপোর বিন্দুর মত ঝকঝক করছিল।

সকলেরই নজরে পড়ে লোকিকে দেখতে ওরই মত। কিন্তু লোকির পরনের পোশাক ছিল সাদা। কনরাড বার্টরাম দু'বার দরজার ভিতর দিয়ে উঁকি দেয়, কি রকম একটা নাচার কায়দায় সেও অনেকটা ওর বাবারই মত। কিন্তু বাড়ীটা তার অপরিচিত, এর বনিয়াদ বেশ শক্ত, তল তলার জায়গাটা ইঁটের গাঁথনি দিয়ে ঘেরা। চেহারাটা অদ্ভুত, দেখে মনে হয় কোন আদ্যিকালের এক বাগানের ভিতর থেকে লম্বা ডালপাতি গাছের মত উঠেছে। ডোরা লোকির দিকে চায়। অন্য সব মেয়েরাই বেশ একসঙ্গে হাসাহাসি করছিল, শুধু তারা দু'জনেই ছিল বাইরের লোকের মত।

লোকি বার্টরামের বাড়ীর উৎসবে যে মেয়েরা গিয়েছিল দুই সপ্তাহের মধ্যেই তারা মেরংস-এর বাড়ী এল। লোকি তার অতিথিদের মধ্যে নিঃশব্দে হারিয়ে গিয়েছিল। দুইন্সে মেরংস কিন্তু বসেছিল তার টেবিলের মাথায়, মুখে তার অহঙ্কার এবং আত্মবিশ্বাস। বৃদ্ধ মেরংস বিচারালয় এবং রেজিষ্ট্রি অফিস হিসাবে যে ঘরটা ব্যবহার করত সে ঘরেই কফির টেবিল পাতা হয়েছিল। বিকেল যখন প্রায় এসেছে একটা বিরাট পাত্রে করে পানীয় এবং একটা বড় চামচ নিয়ে আসা হ'ল। প্রত্যেকটি মেয়েকে এক গ্লাস ক'রে দেওয়া হ'ল। তারা বিরাট টেবিলটা ঠেলে দেওয়ালের গায়ে রাখল, ঘরের ভিতর থেকে টুকরো জিনিস-পত্র কুড়িয়ে জড়ো করে সরিয়ে রাখল, রেডিওটা খুলে দিল আর নাচতে সুরু করল।

এর মধ্যে ছোট মেরংস মাঠ থেকে ঘরে ফিরেছে—অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু আগেই। সিঁড়ির সবচেয়ে নীচের ধাপে বসে সে শুনতে থাকে। যদিও সে জানত ঘরের ভিতর মেয়েদের এরকম মজলিস স্বাভাবিক, তবু সে খুশী হয় নি। মেয়েদের জোর গলার তীক্ষ্ণ হাসির মাঝখানে শুনতে পারল পাখির মত হাল্কা ছোট্ট একটা হাসি। আন্দাজ করে নিল হাসিটা কার, যদিও সে নিজে কোনও দিন সে হাসি শোনে নি। তার উপর দিয়ে তিক্ততার একটা ঢেউ বয়ে গেল, পৃথিবীটা অন্ধকারময়, ভবিষ্যতকে বোঝবার কোনও উপায় নেই, এখন যা ঘটল না তা কোনও দিন ঘটবে না।

ইতিমধ্যে মেয়েরা স্থির করেছে দুই জনে একসঙ্গে নাচবে। সে উঠে পড়ে এবং আলতো ভাবে দরজাটা খোলে। উঁচু বুক এবং গম্ভীর মুখ দুইন্সে লোকির পিঠের উপর হাতখানা রেখেছে। দুইন্সের কাঁধে পৌঁছানর জন্য লোকিকে হাত দু'খানা উপরে তুলতে হয়েছে। তার উঁচু-করা মুখে হাসি, প্রায় সুখের হাসি। ও তাকে কখনও এরকম দেখে নি, আশঙ্কা হয় আর কখনও এরকম দেখবেও না, কারণ ও তাকাতেই আবার লোকির মুখ সেই পুরাণো অভিব্যক্তিহীন মুখোশে পরিণত হয়। তাকে দেখেই হাত নামিয়ে ফেলে দুইন্সে। এরকম হঠাৎ থেমে যাওয়ায় সমস্ত নাচটা এলোমেলো হয়ে যায়। মেয়েরা হেসে ওঠে এবং তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, "বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!"

ছোট মেরংস যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। রাগে তার মুখ বিকৃত হয়ে যায়। সে চিৎকার করে ওঠে, "এক্ষুণি এখানে এস।" লোকি মেনে নেয়, যানতেই সে অভ্যস্ত। মেয়েরা ঘরের দিকে লক্ষ্য করে হাসাহাসি বন্ধ করে না। ছোট মেরংস লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করে এবং মেয়েটাকে টেনে উপরের সিঁড়িতে নিয়ে যায়। দুই ঝটকায় সে মেয়েটাকে এদিক-ওদিক করে দেওয়ালে ঠেসে ধরে। "এবার তুমি কেন ভিতরে যেতে পার।" ঠেলা দিয়ে সিঁড়ি পার করে এক ধাক্কায় তাকে ঘরে পাঠিয়ে দেয় ছোট মেরংস। তারপর সে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে লোকির উদ্দেশ্যে মেয়েদের তীক্ষ্ণ ও প্রায় উন্মত্ত হাসি যতক্ষণ না মিলিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। সে বাগানে ফিরে এসে দেখে যে মাষ্টার জানলায় দাঁড়িয়ে শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েরা তাকে দেখতে পায় নি। ছোট মেরংস ভ্রূকুটি করে এবং তাকে সম্ভাষণ না করে পাশ কাটিয়ে যায়। খুশী মনে, প্রায় আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে নিরুদ্বেগে চেয়ে থাকে গোলাপী মুখগুলোর দিকে। চেয়ে থাকে তাদের ছোট ছোট বুকের দিকে যেগুলো তার স্কুলের মেয়ে তারই কাছে মানবতা পড়তে পড়তে পুরন্ত হয়ে উঠেছে।

(ক্রমশঃ)

বিদেশের কথা

রোডেশিয়া

এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশ' তেত্রিশ বর্গমাইল এলাকায় দু'লক্ষ সতের হাজার শ্বেতকায়দের নেতা আইয়ান স্মিথ ব্রিটিশ সিংহের লেজ এমনই মুচড়ে দিয়েছে যে ব্রিটিশ সিংহ গর্জন পর্যন্তও করে নি—বিড়ালের মত স্রেফ্ মিউ-মিউ করছে। অথচ যখন ১৯৬১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে স্বস্তি পরিষদে ব্রিটিশ প্রতিনিধি রোডেশিয়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনাকালে গর্জন করে ঘোষণা করলেন যে রোডেশিয়া নিয়ে আলোচনা স্বস্তি পরিষদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এই সময়ই ইউ. এন. সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করে যে রোডেশিয়ার ব্যাপার আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্ন করতে পারে।

শান্তি ও নিরাপত্তা সত্যই বিঘ্নিত দু'দিক থেকে। আইয়ান স্মিথের এক তরফা স্বাধীনতা ঘোষণাতে লণ্ডনের তামার বাজারে ঝড় উঠেছে এবং সবার কালোছায়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এন্টনি স্যামসনের ভাষায় বলা যায়: এখনও চিলির খনি-মজুরদের ধর্মঘট চলেছে। আমেরিকানরা যে তামা বাজারে ছাড়বে তার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রতি টন হাজার পাউণ্ড বা দু'হাজার পাউণ্ড দা দা পুরী হ'তে পারে। অর্থাৎ, বলা যায় যে পৃথিবীর তামার সরবরাহের শতকরা ১৪ ভাগ কমে যাওয়ার লণ্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জে তামার দাম গগনচুম্বী হতে পারে। আর অন্যদিকে নাইজেরিয়া ও তানজানিয়া ও. এ. ইউর আদ্দিস আবাবাস্থিত সেক্রেটারিয়েটকে অনুরোধ করেছে রোডেশিয়ার ব্যাপারে অনতিবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে, কারণ আয়ান স্মিথের কার্য্য-কলাপের জন্য প্রায় চ'ল্লিশ লক্ষ আফ্রিকান এবং প্রায় ষাট হাজার এশিয়াবাসীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। শুধু তাই নয়। আর জাম্বিয়া ও তানজানিয়াতে গরিলা-বাহিনী গড়ে তোলার বন্দোবস্ত হচ্ছে, কারিবা বিমানক্ষেত্রে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে, জাম্বেজি তীর বরাবর

আয়ান স্মিথ

হ্যারল্ড উইলসন

স্মিথ-উক্তি

আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সময়ে একটি উক্তি যে তুষার ঝড় সৃষ্টি করতে পারে তা স্মিথ ঘোষণা পৃথিবীর লোককে দেখিয়ে দিল। ইংলণ্ডের 'দি অবজারভার' তার ১৮ই নভেম্বরের সম্পাদকীয়তে লিখেছে: এ কতিপয় রোডেশিয়ার সেটলার ও ব্রিটেনের ঝগড়া নয়। এ আফ্রিকার সংকট, এবং এই সংকট পৃথিবীর পটভূমিতে। আর শুধু একটি দেশ অর্থাৎ রোডেশিয়ার ভবিষ্যৎ বিঘ্নিত নয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এই সমস্যায়: একদিকে

র্ক, আর অন্যদিকে জড়িয়ে রয়েছে সমস্ত আফ্রিকানদের
র সমস্ত পাশ্চাত্যের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ।

এই ভবিষ্যৎ যে মধুর হবে না বরং তিক্ততর হবে তার
না সুরু হয়েছে। এর জন্য দায়ী ব্রিটেনের তোষণনীতি
, সাম্রাজ্যবাদী লোভ। মার্কিন দেশও আংশিক দায়ী
নাই। কারণ ইউ, এন, তে সেদিনও উক্ত দেশ
ডেশিয়ার ব্যাপারে পরোক্ষে ব্রিটেনকে সমর্থন করেছে,
ন বোধ হয় একটু কপিকঙের ভাষায় বলা যায় যে এঁরা
করেন যে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে কোন রকম নরমপন্থীর
নৈতিক চাপ দিলেও হয়ত এঁদের দক্ষিণ আফ্রিকীয়
দার মিলিয়ন ডলার স্বার্থ বিপদগ্রস্ত হতে পারে। অবশ্য
দাবে মার্কিন দেশ স্মিথ ঘোষণা মেনে নিয়ে স্মিথ
কারকে স্বীকৃতি দেয় নি।

'বস্তু, এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে যে, ব্রিটেন এমন
ন ব্যবস্থা নিচ্ছে না—যাতে স্মিথ সরকার কোন
দায়ে পড়ে, অর্থাৎ এই 'বিদ্রোহ'-কে দমন করার জন্য
ন্যসৈন্য পাঠানর কোন কথাই ভাবে না, উপরন্তু
ন কোন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না যাতে
ডকারা 'পিউনিটিভ' ব্যবস্থা মনে করতে পারে।

রোডেশিয়ার আমদানী-রপ্তানী

সকলেই বলছে ব্রিটেনের অর্থ নৈতিক অবরোধের
ন রোডেশিয়াকে বিপদে পড়তে হবে তামাকের
পারে। কিন্তু লণ্ডন বাজার রোডেশিয়ার তামাকের
কম: মাত্র ত্রিশ ভাগ আমদানী করে থাকে। অর্থাৎ
র বছরে ২০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের ১০০ মিলিয়ন
উণ্ড তামাক। অতএব তামাক কোম্পানীগুলি বিশেষ
উদ্বিগ্ন হবে না, কারণ অন্যত্র তাঁরা তামাক পাবেন।
নিই মনে করে ডানলপ রবার, ইউনিলিভার, টেট এণ্ড
লাইল (চিনির ব্যবসা), টার্নার এণ্ড নিওয়াল (এ্যাসবেস্টস
ব্যবসা) প্রভৃতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। মনে হয় এখানে
রোডেশিয়ার আমদানী-রপ্তানীর ১৯৬৪ সালের হিসাব
ব্রিটেনের অর্থনীতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণার
সহায়ক হবে।

(মিলিয়ান পাউণ্ড মূল্যের)

রপ্তানী (মি: পাউণ্ড)		আমদানী (মি: পাউণ্ড)	
জাম্বিয়া	৪১	ইউ. কে	৩৩
ইউ. কে	৩১	দ: আফ্রিকা	২৭
দ: আফ্রিকা	১২	ইউ. এস. এ	৭
প: জার্মানী	৮	জাম্বিয়া	৫
জাপান	৬	প: জার্মানী	৪
কমনওয়েলথ	৮৭	কমনওয়েলথ	৪৯
ই. ই. সি.	১২	ই. ই. সি	১০
মোট	১৩৭	মোট	১১০

ব্রিটেনের সাথে ব্যবসা

রপ্তানী (মি: পাউণ্ড)		আমদানী (মি: পাউণ্ড)	
তামাক	২০.৬০	পরিবহণ সামগ্রী	৮.৭৬
এ্যাসবেসটাস	৩.১৫	মেশিনারী (বৈদ্যুতিক নয়)	৫.৬৮
মাংস	২.২৫	বস্ত্রাদি	৪.৬০
চিনি	০.৯৫	বৈদ্যুতিক সামগ্রী	২.৭০
ফেরো এ্যালয়	০.৮১	রাসায়নিক	২.২২
তামা প্রভৃতি	০.২৫	খাদ্য ও পানীয়	২.০০
মোট	৩০.৫১	মোট	৩৩.৬৮

ব্রিটেন যে ব্যবস্থা অবলম্বন করুক না কেন রোডেশিয়া
কিন্তু তার পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। রোডেশিয়া যে
ব্যবস্থা নিয়েছে বা নিচ্ছে তা হচ্ছে নিজ স্বার্থে যাতে কোন
'এমবার্গো' বিশেষভাবে কার্যকরী না হয়।

পাশ্চাত্য ও কমিউনিষ্ট জগৎ

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মি: রবার্ট মেন্জিস্ স্মিথ ঘোষণা
শুনে শুধু বলেছেন: আমি মনে করেছিলাম স্মিথ অন্য পথ
নেবে। কিন্তু উল্লাস প্রকাশ করেছে সাউথ আফ্রিকার
শ্বেতকায়রা। আর পর্তুগাল কোন কথাই বলতে চায় নি।
তবে পশ্চিম জার্মানী বলেছে যে সে নীতি নির্ধারণ করবে
আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে ভিত্তি করে। প্রসঙ্গত: বলে রাখা
ভাল যে গত বছর পশ্চিম জার্মানী মোট প্রায় ৩২ মিলিয়ান
পাউণ্ড মূল্যের ক্রোমিয়াম ও তামাক আমদানী করেছে
রোডেশিয়া হতে।

কিন্তু, সোভিয়েত বলছে: স্বাধীনতা—বর্ণ-বিদ্বেষমূলক
এবং এ সম্ভব হয়েছে ব্রিটেনের সাক্ষাৎ সহায়তায়…।
এ যে সত্য তার প্রমাণ হচ্ছে অতীত ইতিহাস এবং
সেদিনকার রক্তশীল ও আজকের শ্রমিকদলের কার্যকলাপ।
আজ উইলসন অর্থ নৈতিক চাপ দিয়ে স্মিথকে সায়েস্তা
করতে চান কিন্তু ইংলণ্ডের 'নিউ ষ্টেটসম্যান' ১৯শে
নভেম্বরের সম্পাদকীয়তে বলেছে: ইতিহাসে এমন কোন
নজির নেই যাতে উক্ত ব্যবস্থা কোনদিন পররাজ্য আক্রমণ
বন্ধ করতে পেরেছে বা কোন বিদ্রোহীকে সায়েস্তা করেছে।
তবুও উইলসন ঐ পথই নিয়েছে।

এই নীতি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। শ্রমিকদল-
প্রিয় স্যার রয় ওয়েলেন্স্কি ১৯৫৮ সালে বলেছেন: 'পূর্ব-

সহজ ভোটাধিকার অবাস্তব' এবং তিনি তখনই বলেছিলেন যে তিনি অর্থনৈতিকক্ষেত্রে অশ্বেতকায়দের প্রতিযোগিতাকে ভয় করেন অর্থাৎ তিনি চান যে কোনদিনই যেন অশ্বেতকায়রা শ্বেতকায়দের প্রতিযোগী না হয়। এমনি ধারণা পোষণ করেন স্যার এডগার হোয়াইটহেড এবং তাঁর বক্তব্য হচ্ছে: শ্বেতকায় শাসন চিরন্তন করার জন্য ক্রমবর্দ্ধমান বলপ্রয়োগ, প্রয়োজন হলে তাই করা উচিত। রক্ষণশীল ও শ্রমিকদল এই নীতিকে এতদিন লালন-পালন করে এসেছে এবং আইয়ান স্মিথ হচ্ছেন এরই ফল। আইয়ান স্মিথ যদি দৈত্য হয়ে থাকেন তবে সে দৈত্য-স্রষ্টা হচ্ছে নিঃসন্দেহে ইংল্যাণ্ড।

অশ্বেতকায়

যদিও আইয়ান স্মিথ আজ দৈত্যের মত মনে হচ্ছে তবু তাঁর ভয় হচ্ছে এই অশ্বেতকায়দেরকে এবং বিশেষ করে তাঁদের নেতা জস্থ্যা নকমোকে। জস্থ্যা নকমো আজ অন্তরীণাবদ্ধ তাঁর কিছু সহকর্মীবৃন্দ সহ।

বিচক্ষণ, ধীমান জস্থ্যা নকমোর জন্ম হয় ১৯১৭ সালে রোডেশিয়ার মাটোপো জেলায়, এক কৃষক পরিবারে। এবং লেখাপড়া শিখেছেন নাটাল ও জোহান্সবার্গে আর সামাজিক বিজ্ঞানে ডক্টরেট পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে। নানাস্থান ঘুরে বেড়িয়েছেন নানা দেশের অবস্থা-ব্যবস্থা দেখবার জন্য এবং আক্রাতে অল আফ্রিকান পিপলস্ কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব করেন রোডেশিয়ার অশ্বেতকায়দেরকে। পরে কায়রোতে যান। তিনি ১৯৫০ সালে রোডেশীয় রেলওয়ের আফ্রিকান কর্মীদের সংগঠন করেন। নকমো বিশ্বাস করেন যে নেতা বা নেতৃত্ব মানুষের সত্যিকার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবরূপ দেবার পথ দেখাবে। ১৯৫৯ সালে 'আফ্রিকা সাউথ' নামক কাগজে রোডেশিয়া সমস্যা নিয়ে লিখতে গিয়ে লিখেছেন:

শীঘ্রই সরকার আবিষ্কার করবেন যে বাধা-নিষেধ, অন্তরীণ—জেল এবং অত্যাচার কখনও আফ্রিকানদের অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ধ্বংস করতে পারবে না। যদি রোডেশিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তা কেউ আশা করেন, তা হ'লে এখনই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন…আমরা কিছু চাইছি না, কারণ জনসাধারণ হিসাবে আমরা জানি যে আমাদের অধিকার আমাদেরই।

অমর রাহা

বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা বর্তমানে প্রায় প্রহসনের পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। এখন উদ্যোক্তাদের কাছে মুষ্টিযুদ্ধের থেকে তার প্রচার ও সংগৃহীত অর্থটাই প্রিয়। এই লড়াই থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় তা প্রায় অবিশ্বাস্য। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্লয়েড প্যাটারসন যেদিন সনি লিস্টনের কাছে পরাজিত হলেন সেদিনই মুষ্টিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক বিদায় হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমেরিকার মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনার পেছনে কু-প্রভাব সংক্রমিত হচ্ছে। আমেরিকা গ্যাংস্টারদের স্বর্গ। গ্যাংস্টাররা এখন উদ্যোক্তারূপে অবতীর্ণ হচ্ছে। লিস্টন ওখানকার একজন নামকরা গুণ্ডা, তার পেছনেও বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি আছে। লিস্টন নাটকীয় ভাবে মুষ্টিযুদ্ধে এসে প্যাটারসনকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। প্যাটারসনের প্রস্থান থেকেই মুষ্টিযুদ্ধ—মুষ্টিযুদ্ধ থেকে বিদায় নেয়। আর তার স্থান দখল করে লড়াই। সম্প্রতি বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ক্যাসিয়াস ক্লে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন প্যাটারসনকে পরাজিত করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আখ্যা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ক্যাসিয়াসের অদমনীয় উৎসাহ, অস্বাভাবিক ক্ষমতা ও মনের জোর তাকে জয়মাল্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছে। মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে ক্যাসিয়াসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই কিন্তু অত্যধিক কথা বলার জন্য সাধারণের কাছে অনেক সময় সে হাস্যাস্পদ হয়ে যায় এবং অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে ফেলে। ক্যাসিয়াস অনেক গুণের অধিকারী, তথাপি তার ভেতর কোথায় যেন একটা খুঁত রয়ে গেছে। এ যেন বিরাট একটা দামী পার্শিয়ান কার্পেট তৈরী করে তার ভেতর

গত ২২শে নভেম্বর লাস ভেগাসে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইতে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ক্যাসিয়াস ক্লে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ফ্লয়েড প্যাটারসনকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করে ফেলেছেন।

...তা কীট ছেড়ে দিয়েছে। সকলের অজ্ঞাতসারে সে কীটটি ...পটিকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। ক্যাসিয়াস যদি একটু ...নত, একটু অল্প ও নম্র হ'ত তা হ'লে রসিক জনসাধারণ ...কে মাথায় তুলে রাখত। ক্লে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ...খ্যালাভ করেছে কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ-রসিক জনসাধারণের ...হৃদয়ের মধ্যে নিজ স্থান করে নিতে পারে নি। অপর ...কে ফ্লয়েড প্যাটারসন পরাজিত হলেও তাঁর স্থান ঠিকই ...য় গেল। তার জনপ্রিয়তা একটুও কমে নি।

ক্যাসিয়াসের কাছে পরাজিত হলে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন বলে জানান, কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও সঠিকভাবে তিনি কিছু জানান নি। সম্ভবত আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখার প্রয়াস তিনি করবেন। বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে তিনি নেমে গেছেন। বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ সংস্থা ক্যাসিয়াস ক্লে-কে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলে মানেন না। তাঁদের মতে এর্ণি টেরেল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ক্যাসিয়াস এবার এর্ণি টেরেলের সঙ্গে লড়বেন।

ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান ডবলিউ এম লরি ইংলণ্ডের স্পিন বোলার ফ্রেড টিটমাসের একটি বল ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে উঁচু করে মেরে বাউণ্ডারী সীমানায় পাঠাচ্ছেন।

* * *

বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে ভারতে আনার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এই সফরকে কার্য্যকরী করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের কর্ণধার গ্যারি গোমেজ এবং দলের অধিনায়ক সোবার্সের অনিচ্ছার জন্যেই শেষ পর্য্যন্ত সফর বাতিল হয়ে গেল। এই সফরের প্রস্তাবনার মুখেতেই কোন অন্তত প্রশ্নে প্রভাব পড়ে কে জানে। তাই প্রথম থেকেই সংশয়ের দোলায় এই সফরের ভবিষ্যৎ দুলতে থাকে। ভারত সরকার প্রথমে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর না করায় একবার সফর ভেস্তে যায়। তখন বিভিন্ন মহল থেকে অনুরোধ-উপরোধ হ'তে থাকে সরকারী মহলে। শেষকালে এক অদৃশ্য ও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে এবং এক রকম নিজ প্রচেষ্টায় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করা হয়। তারপরই দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তান ভা .র্ব আক্রমণ করায় সাময়িক ভাবে সফর বাতিল হয়ে যায়; কিন্তু বর্তমানে অবস্থা স্বাভাবিক হওয়া সত্বেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভারতের অস্বাভাবিক অবস্থার দোহাই পেড়ে সফর বাতিল করে দেয়।

এখানে কথা হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের কর্ণধারগণ এই সফরের জন্যে যে প্রাণপাত প্রচেষ্টা করেন তা অনেক ক্ষেত্রে শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে নিছক কাংগালির পর্য্যায়ে পড়ে। বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটের মান খুব উচ্চে না হ'লেও সম্মানজনক স্থানেই আছে বলা যায়। আমরা ইংলণ্ডকে হারিয়ে রাবার কেড়ে নিয়েছি, পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ডের রাবারও আমাদেরই দখলে। দুর্দ্ধর্ষ অষ্ট্রেলিয়াকেও দু'বার হারিয়েছি। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে আমরা সব ক'টা ম্যাচেই হেরেছি কিন্তু তা খুব অগৌরবের নয় সত্য। কারণ সেবার দুর্ভাগ্য আমাদের পিছু নিয়েছিল। ভারতীয় দলে য'দি একজন যোগ্য অধিনায়ক থাকত তা হলে এই দল নিয়েই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে অন্তত একটা টেষ্টম্যাচে হারানো অসম্ভব ছিল না—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেলই এ কথা বলেছেন। উমরিগড়ের মতন খেলোয়াড় দলে থাকতে নরি কন্ট্রাক্টরকে অধিনায়ক এবং তরুণ পাতৌদির নবাবকে সহ-অধিনায়ক করা হয়। চান্দু বোরদের মতন অল-রাউণ্ডার থাকতে তাঁকে বল করতে দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র খুঁটির জোরে দলে স্থান পাওয়া ভারতেই সম্ভব। ভারতীয় ক্রিকেটের রথী-মহারথীরা নিজেদের মান-সম্মান দেশের ইজ্জত-সম্ভ্রম খুইয়ে অনুরোধ-উপরোধ, আবেদন-নিবেদন ছাড়িয়ে শেষ পর্য্যন্ত অনুনয়-বিনয় করতেও কসুর করেন নি। বরোদার মহারাজাও নিজের সম্মান মর্য্যাদা হারিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে স্বয়ং দরবার করতে যাবার কথা বলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই কি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর ভারতের এই দুর্দিনের ভেতরও অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল যে এত হ্যাংলামী করতে হবে। না এই খেলাটা হলেই ভারত বিশ্ব ক্রিকেটে রাজসম্মান লাভ করত। তা যদি হয় সেখানে কোন কথা নেই, কিন্তু সমস্ত ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে বেশ অনেকের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। অনেকের অনেক কিছু এই সফরের ওপর নির্ভর করছে। ভেতরের কথা যাই থাক আমাদের সুস্থ বুদ্ধিতে মনে করি যে, একটা দেশের, একটা জাতের মান-সম্মান নিয়ে এ রকম ভাবে খেলা করা কোন সুস্থ বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের পক্ষে বা কোন সংস্থার পক্ষে উচিত নয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড } মাঘ, ১৩৭২ { চতুর্থ সংখ্যা

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

রুশ-নেতা কোসিগিনের আমন্ত্রণে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সাময়িক বিরতি চিরস্থায়ী করিবার আশায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তান রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান তাসখন্দ গমন করেন ও সেইখানে কয়েক দিন-ব্যাপী আলোচনার পরে উভয়ে এক মিলিত মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই মীমাংসাতে যে সকল অভিমত ব্যক্ত করা হয় তাহার মধ্যে বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির কথা কিছু না থাকিলেও শান্তিরক্ষার দায়িত্ব মিলিতভাবে বহন করিবার ইচ্ছা বিশ্ববাসীর নিকট দ্ব্যর্থবর্জিত ভাবে প্রকাশ করাতে বিপরীত ব্যবহারের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ মহাসমারোহে পররাষ্ট্রের দরবারে একত্রভাবে বসিয়া কোন কথা বলিলে তাহার উল্টা আচরণ করা নিজের ও নিজ দেশের সম্মানহানিকর হয়, এ কথা সর্বজনবিদিত। এমন কি পাকিস্তানের পক্ষেও অতঃপর যথেচ্ছভাবে গোলাগুলী চালান কিছুটা লজ্জাকর বলিয়া মনে হওয়া সম্ভব। শেষ পর্য্যন্ত এই মীমাংসার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি পূর্ণরূপে রক্ষিত হইবে কি না তাহার বিচার করা এত শীঘ্র সম্ভব নহে। কিন্তু এ কথা বলা যায় যে শান্তিভঙ্গ পূর্বের ন্যায় অতটা সহজে আর সম্ভব হইবে না।

যাহা হউক; এই শান্তিস্থাপন প্রচেষ্টায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে গমন করিয়া কয়েক দিবস ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করার ফলে হৃদ্‌রোগের আকস্মিক আক্রমণে দেহত্যাগ করেন। চতুর্দ্দিকে যখন বিশ্ববাসী ভারত ও পাকিস্তানকে পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছিলেন সেই সময় এই বজ্রাঘাত ঘটাতে ভারত, তথা সারা জগত, কিছুকালের মত স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া শোকের নিষ্পন্দ আবেগে আকুল হইয়া পড়ে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী অল্পদিনের মধ্যেই সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। কারণ, স্পষ্ট বক্তা হইলেও তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন। কঠোর কর্ত্তব্য করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না, কিন্তু সকল মানুষের দুঃখে তিনি সমবেদনা অনুভব করিতেন। সাদাসিধা ভাব তাঁহার নিজস্ব ও স্বাভাবিক ছিল। দারিদ্র্যের অভিনয় করিয়া গোপনে ভোগের ইচ্ছা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যে সকল আদর্শ তাঁহার সহকর্মীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রচার করিতে ব্যস্ত থাকিতেন তিনি সেইগুলিকে নিজের অন্তরের মধ্যে সত্যরূপ দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেহের গঠনে তিনি অল্পবয়স্ক বালকের মতই ক্ষুদ্রকায় ছিলেন। প্রাণে তিনি বালকের মতই

সরল ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্বলাভ করিয়া তিনি কিছুমাত্র আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন নাই। ক্ষমতার নেশা তাঁহার মধ্যে কোনও ভাবেই জাগ্রত হয় নাই। গরীবের ঘরের সন্তান লালবাহাদুর শাস্ত্রী শুধু নিজ কর্তব্য ও ধর্মবোধ আশ্রয় করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতাসুলভ দোষ তাঁহার মধ্যে ছিল না। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে তাঁহার মধ্যে তেজ ও সাহসের কোনও অভাব ছিল না। তিনি যে শান্তির জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ধর্মের আগ্রহে; জগত সভায় গৌরব অর্জন করিবার জন্য নহে। সম্রাট অশোক যেরূপ যুদ্ধে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াও অহিংসানীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, লালবাহাদুর শাস্ত্রীও সেই মনোভাবে চালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শান্তিস্থাপন আগ্রহ যে হৃদয়ের গভীরতম কেন্দ্রজাত ছিল তাহা ভারত-বিদ্বেষীপ্রধান আয়ুব খানও বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নশ্বর দেহ যখন তাসখন্দ হইতে ভারতে আনা হইতেছিল তখন দেহ বহন করিয়া যাঁহারা বিমানে তুলিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন আয়ুব খান ও কোসিগিন। ভারতে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময় যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা অল্পই পাওয়া যায়। মহা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে আরম্ভ করিয়া অতি দরিদ্র পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক দলে দলে তাঁহার শেষ দর্শন লাভ করিতে গমন করেন। শ্মশানের পথে ও যমুনার তীরে প্রায় দশ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। লালবাহাদুর পত্নীর নিকট পৃথিবীর বহুদেশ হইতে সহস্র সহস্র সহানুভূতিজ্ঞাপক তারপত্র আসে। শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিয়া বিশ্ববাসীর লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতি এই অকপট প্রীতির সঞ্চার হয় নাই—হইতে পারিতও না। বর্তমানকালে মানব-সমাজে বিজ্ঞাপনের জোরে বহু লোকের নাম পৃথিবীর নিকট জাহির করা হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল লোকের মধ্যে অল্প কয়জনই থাকেন, যাঁহাদিগের চরিত্রগুণে অপরে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ঐ অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবার যাঁহাদিগের কর্মশক্তি আছে তাঁহারা আরও সংখ্যায় কম। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে বহুগুণ একাধারে দেখা গিয়াছিল। বিশেষ করিয়া যে সকল গুণ থাকিলে মানুষ বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য হয় সেই গুণগুলি লালবাহাদুরের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তিনি কোন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল কোথায় তাহা তিনি পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইতেন ও সেই মঙ্গল সাধনে তিনি চিরযত্নবান ছিলেন। এই মাহাত্ম্যই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল এবং ভারতের জনসাধারণ এই কথা চিন্তা ও তর্কের সাহায্যে না বুঝিয়া থাকিলেও মনের সহজ ও স্বভাবজাত অনুভূতির দ্বারা পূর্ণজ্ঞাত ছিল।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুতে ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ করা সহজ হইবে না। এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি কঠিন নহে। প্রধানমন্ত্রীর পদে কাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে ইহা লইয়া যে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, সকলের বিশ্বাস ও নির্ভরের পাত্র কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কারণ সকলেই কোনও না কোন দলের সহিত সংযুক্ত এবং মনে হয় যে এমন কেহই নাই যাঁহার উপর ভারতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব রক্ষিত হইলে সে দায়িত্ব কোন ভাবে বা কোন কারণে উপেক্ষিত হইবে না। প্রধানমন্ত্রীর কার্য্য যদি শুধু একটি প্রতীক সাজিয়া রাজসভার শোভাবৃদ্ধি করা হইত তাহা হইলে যে কেহ প্রধানমন্ত্রী হইতে পারিতেন। সেরূপ ঘটনা যে ইতিহাসে কখনও ঘটে নাই এমনও নহে। কিন্তু যদি কোন জাতির জীবনে এমন কোন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় যখন ঘটনাচক্র বিপজ্জনক সম্ভাবনাসঙ্কুল আবর্তে ক্রমাগত ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে, তখন দেশের মঙ্গল অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে লোকদেখান অথবা সভা-সাজান প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা পূর্ণ কর্মক্ষম ও সদাজাগ্রত মানুষের প্রয়োজন হয়। লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন তখন অনেকের ধারণা ছিল না যে তাঁহার মধ্যে কি বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু সে সময় কংগ্রেসের কর্মীরা একমত হইয়া তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করেন। অর্থাৎ তাঁহারা জানিতেন যে লালবাহাদুর শাস্ত্রী দেশরক্ষা ও শাসনকার্য্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে যোগ্য ব্যক্তি।

এবং পরে তাঁহারা যে কথা পূর্ব্বে চিন্তা করেন নাই তাহাও ঘটিয়া আরও উত্তমরূপে প্রমাণ হইয়া যাইল যে লাল-বাহাদুর শাস্ত্রী সত্য সত্যই কত বড় কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। অর্থাৎ পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের সময় লালবাহাদুর শাস্ত্রী যে ভাবে সেই সঙ্কটকালে ভারতের রাষ্ট্রীয় রথ সুচালিত রাখিয়াছিলেন তাহা মহাকর্ম্মী ব্যতীত কেহ পারিত না। এখন আমরা জানি না যে কংগ্রেসে কে আছেন যিনি সঙ্কটকালে ভারতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে পারেন। ভোট দিয়া প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় কিন্তু অন্তরের ক্ষমতা সৃষ্টি করা যায় না। ভারত এখনও বিশেষ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রহিয়াছে। যাহাকে-তাহাকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া দিলে এই সময় চলিবে না। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অভাব এই কারণে আরও গভীর ভাবে অনুভূত হইতেছে।

শ্রীগুলজারিলাল নন্দ এখন সাময়িক ভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্য্য করিতেছেন। তিনি মহা প্রতিভাশালী ব্যক্তি না হইলেও তাঁহার মধ্যে কর্ম্মক্ষমতা, দায়িত্ববোধ ও ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান জাগ্রতভাবে বর্ত্তমান আছে। তিনি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন সাক্ষাৎভাবে কার্য্য করিয়া। এই সকল কারণে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি বর্ত্তমান না থাকিলে তাঁহাকেই প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত রাখা যুক্তিযুক্ত হইবে। তাঁহার বিরুদ্ধে বহুলোক আছেন বলিয়া মনে হয় কেননা তিনি কংগ্রেস রাজত্বে অন্যায় ভাবে ঐশ্বর্য্য আহরণ বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন ও এখনও চাহেন। যে সকল কংগ্রেস কর্ম্মী ও নেতারা জনসেবার নামে নিজেদের বা নিজেদের বেনামদারদিগের আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা গুলজারিলালকে পছন্দ করেন না। ইঁহাদিগের সংখ্যা অল্প নহে।

মোরারজি দেশাই জনপ্রিয় লোক নহেন। অনেকের মতে তাঁহার অন্যান্য এমন এমন মানসিক চারিত্রিক বিশেষত্ব আছে যাহাতে তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী করিলে দেশের ক্ষতি হইতে পারে। একটি বিশেষত্ব হইল যথেচ্ছাচার স্পৃহা। আর একটি হইল আত্মীয়স্বজনের কথা শুনিয়া নানাপ্রকার দান বণ্টন করা। অনেকের মতে মোরারজির মনোভাব স্বতঃপরিবর্ত্তনশীল এবং তিনি যে কখন কি করিয়া ফেলিবেন তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। আমরা মোরারজির সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহি; তবে যাঁহার সম্বন্ধে এত কথা উঠিয়া থাকে তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী না করিলেই দেশের মঙ্গল বলিয়া মনে করি।

শ্রীচৌহান (চাওয়ান) আমাদিগের দেশরক্ষক যুদ্ধমন্ত্রী। তিনি কর্ম্মীলোক এবং দেশের অধিকাংশ রাজস্ব তাঁহার হাত দিয়াই ব্যয় করা হয়। তাঁহার ক্ষমতা অটুট থাকিলেই দেশের মঙ্গল। তাঁহাকে যদি অপর কোন অযোগ্য প্রধানমন্ত্রীর আদেশে চলিতে হয়, তাহা হইলে মনে হয় তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার পথে বাধার সৃষ্টি হইবে। তিনি তাহা হইলে নিজ কার্য্য না করিয়া নিশ্চয়ই মন্ত্রী সাজিয়া বসিয়া থাকিতে চাহিবেন না। দেশরক্ষা উত্তমরূপে করিতে হইলে শ্রীচৌহানকে প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা যুক্তিযুক্ত হইবে। কেননা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে বিশেষ তৎপর ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে এবং সেই ব্যক্তির হস্তে ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ভাবে ন্যস্ত করা আবশ্যক। এই কার্য্য ঠিক ভাবে কখনও হইবে না, যদি না শ্রীচৌহানকেই প্রধানমন্ত্রী করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

শ্রীকামরাজ কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি পূর্ব্বে মাদ্রাজ শাসনকার্য্যও উপযুক্তভাবে করিয়াছিলেন। তিনি শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞ, জনহিতব্রত তাঁহার অন্তরের এবং তিনি অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাদিগের প্রিয়পাত্র। এই অবস্থায় তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করাইয়া প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করিলে কোথাও কোন মনোমালিন্য ঘটিবে না। শ্রীকামরাজ ও শ্রীচৌহান সম্ভবত পরস্পরের সহিত মিলিত ভাবে কাজ করিতে পারিবেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বা সপক্ষে কিছু বলা চলিবে না, তাহার কারণ তাঁহার বিশেষ কি ক্ষমতা, জ্ঞান বা গুণ আছে তাহা আমরা জানি না। পরিবারের দিক দিয়া তিনি অভিজাতবংশীয়া এবং পিতার সহিত ভ্রমণাদি করিয়া তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পরিচয় আছে। ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে চীনের সহিত

ভারতের যুদ্ধ লাগিলে শ্রীমতী ইন্দিরা তাহার ধাক্কা সামলাইতে পারিবেন কি না তাহা বিচার করিয়া পরে তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব দান করার কথা আলোচনা করা কর্তব্য। শ্রীমতী ইন্দিরাকে খাড়া করিয়া দিলে অবশ্য কংগ্রেসের ভিতরের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকটা থামিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। শুনা যায় যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদিগের অধিকাংশের ইচ্ছা শ্রীমতী ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। ইহা ঝগড়া বন্ধ করিবার জন্য অথবা নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাহা কে বলিতে পারে ? কারণ শ্রীমতী ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হইলে যে প্রবল প্রতাপে প্রদেশগুলির মুখ্যমন্ত্রীদিগকে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া শান্ত-শিষ্টভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিতে বাধ্য করিবেন, এরূপ আশা করা যাইবে কি ? কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ব্বল হইলে প্রদেশের শাসকগণই ক্রমশঃ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়াই মনে হয়।

মহিলা প্রধানমন্ত্রী

কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিভাবান পুরুষ রাষ্ট্রনেতার সংখ্যা বড়ই অল্প। যে কয়েকজন আছেন তাঁহাদিগের কথা অপরস্থলে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল কর্ম্মী মহিলা কংগ্রেসে সংযুক্ত থাকিয়া দেশের কার্য্য করিতেছেন ও করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট নারীর কথা বলা উচিত হইবে। পুরুষ কংগ্রেস নেতাদিগের তুলনায় ইঁহারা বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মশক্তিতে উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার যোগ্য শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। তিনি পৃথিবীর অনেক মহা মহা রাষ্ট্রে ও সম্মিলিত জাতি সভায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধির কার্য্য বহু বৎসর করিয়াছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী প্রধানমন্ত্রী হইলে ভাল হয়। দ্বিতীয়তঃ নাম করা যায় শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের। ইঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জ্ঞান, বিদেশে কার্য্যের অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মক্ষমতা আছে। শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননও প্রধানমন্ত্রীত্ব পাইবার যোগ্য। তিনি বর্ত্তমানে নিজ কার্য্যসূত্রে যে সকল আলোচনায় যোগদান করিয়া থাকেন, তাহাতেই বুঝা যায় যে তিনি সজাগ বুদ্ধিতে যে কোন মন্ত্রীর সমকক্ষ। কংগ্রেসের নেতাগণ এই দুইজন মহিলার কথা চিন্তা করিয়াছেন কি না আমাদিগের জানা নাই। যদি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে মনে হইবে যে তাহা ইচ্ছাকৃত। কেননা এই দুই জনের কেহই অপরের কথায় উঠিবেন বসিবেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইঁহাদিগের দ্বারা কংগ্রেসের নাম উজ্জ্বল হইবার আশা ছিল। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সময় উচিত ছিল শ্রেষ্ঠ প্রতিভার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অগ্রসর হওয়া। প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস নেতাদিগের দলপতি হইবেন, না তাঁহাদিগের ক্রীড়নক হইবেন ? এই কথার উত্তরের উপর প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচন নির্ভর করিবে।

তাসখন্দের পরে

অতঃপর আলোচ্য বিষয় হইল যে, তাসখন্দ মীমাংসার পরে ভারত, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি দেশগুলিতে শান্তির হাওয়া কতটা প্রবল ভাবে বহিতে আরম্ভ করিবে। উক্ত মীমাংসা দ্বারা যে যুদ্ধবিগ্রহের কারণসমূহ দূর হইয়া পৃথিবীতে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এইরূপ আশা করিবার কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না। পাকিস্তান কিছুকাল হয়ত অবথা গোলাগুলী চালান স্থগিত রাখিতে পারে। এবং ভুট্টো ও আজিজ আহমেদের প্ররোচনায় যদি আয়ুব খানের শান্তির আগ্রহ অকালে হাওয়ায় মিলাইয়া না যায় তাহা হইলে ভারতের ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমশঃ উন্নততর ভাবে ঝগড়া মিটাইবার রীতি প্রতিষ্ঠিত হইতেও পারে। কিন্তু ইংরেজদিগের একটা প্রবাদ আছে যে চিতাবাঘ তাহার গাত্রচর্ম্মের কালো কালো ছোপগুলি কখনও হারাইয়া ফেলিতে পারে না। পাকিস্তানও সেইরূপ নিজের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম বলিয়াই মনে হয়। যে দেশ বা জাতির কোন অস্তিত্ব কখন ছিল না এবং যাহার জন্ম হইল মিথ্যা প্রচার ও খুনখারাবির সাহায্যে সেই দেশ ও জাতি অর্থাৎ পাকিস্তান ও তদ্দেশবাসীরা যদি অকস্মাৎ সত্য ও ধর্ম্মের পথে চলিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে সে ঘটনা অত্যাশ্চর্য্য হইবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাহার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ক্রমাগত শান্তির নাম জপ করিয়া বিশ্বাসীজনের মনে একটা অমূলক যুদ্ধভয়হীন ভাবের সঞ্চার হয়। যাহারা শান্তিতে বিশ্বাস করে না তাহারা সেই অবাস্তব মানসিক অবস্থার সুযোগে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে ও বিশ্বাসীগণের উপরে যথাসময়ে আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে সহজে বিধ্বস্ত করে। এই কারণে, "এইবার শান্তি হইল, এইবার শান্তি চিরস্থায়ী হইল" ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়া সরল চিত্তে যুদ্ধের আয়োজন ও সতর্কতা ভুলিয়া শত্রুর নিকট সহজে পরাজিত হইবার ব্যবস্থা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। তাসখন্দ সম্বন্ধে আমরা এই মনে করি যে, ঐ মীমাংসার পরেও ভারতবর্ষকে যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং যে কোন সময়ে পূর্ণযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ব্যবস্থা সকল সময়ে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে রাখিয়া চলিতে হইবে। অহিংসানীতি উত্তম নীতি। তাহার গুণ পূর্ণতম ভাবে বিকশিত হয় যখন তাহা শত্রুনিধন ক্ষমতা পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্ম ও আদর্শের জন্য সুচালিত থাকে। দুর্ব্বলতাপ্রসূত নহে।

তাসখন্দের পরে ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থলে ও উভয় দেশের নেতৃস্থানীয় লোকেদের মধ্যে ঐ মীমাংসার বিরুদ্ধবাদ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের কোন নেতা নিজ সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানের কথার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাওয়া বুদ্ধির কার্য্য হইবে না। পাকিস্তান যেখানে গোপনে অনুপ্রবেশকারী সৈন্যগণকে সরাইয়া লইবার কোন প্রতিশ্রুতি দিতেছে না, সেখানে ভারত উরী-পুঞ্চ এলাকা ছাড়িয়া হটিয়া আসিলে ভুল করিবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কি ভাবে ভারতের সীমানা সুরক্ষিত রাখা হইবে তাহা এখনই স্থির করা প্রয়োজন। ৫ই আগষ্ট একটা তারিখ মাত্র। সেইদিন পাকিস্তান বহু স্থলেই নিজ সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া বসিয়া ছিল। এখন সেই সেই স্থল পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দিলে সেগুলি আর কোনদিন ভারতের অধিকারে ফিরিয়া আসিবে না। পাকিস্তানও সম্ভবত যুদ্ধের সরঞ্জাম ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়া কোন-না-কোন সময় পুনরায় ভারতের সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং তাসখন্দ ততক্ষণই উত্তম যতক্ষণ পাকিস্তানের সংবুদ্ধি জাগ্রত থাকে।

চীনের সহিত তাসখন্দের কোনও সংযোগ ছিল না। সুতরাং চীন প্রয়োজন ও সুবিধা হইলেই ভারত আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিবে না। এ অবস্থায় ভারতের পক্ষে যুদ্ধ ভুলিয়া শান্তির স্বপ্নে বিভোর থাকা সমীচীন হইবে না। যুদ্ধের আয়োজন সর্ব্বদা পূর্ণ উদ্যমে ঠিক রাখিয়া চলিতে হইবে। আণবিক অস্ত্র তৈয়ারী করা ও ব্যবহার শিক্ষাও অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এ বিষয়ে কোন বিলম্ব করা চলিবে না। চীন ভারতের মহা শত্রু এবং চীনের সৈন্যসামন্ত অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি প্রচুর ও সদা-প্রস্তুত। এই অবস্থায় ভারতের ধ্যানে মগ্ন হইয়া ধর্ম্মচিন্তার অবকাশ কোথায়? তাসখন্দে যে সময় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন, চীন সেই সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল যাহাতে কোন মীমাংসা না হইতে পারে। যে সকল এলাকা কাশ্মীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাকিস্তান চীনকে দান করিয়াছে, সেই সকল এলাকা সম্বন্ধেও তাসখন্দ মীমাংসা নীরব। সুতরাং তাসখন্দ কোন একটা পরিবর্ত্তনের আরম্ভ মাত্র। তাহার পরিণতি কি হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুতে বিষয়টা আরও অনির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক শান্তির কথা

পৃথিবীর ইতিহাসে মানব সমাজে শান্তি স্থাপন চেষ্টার বৃহৎ বৃহৎ উদাহরণ রহিয়াছে। মানব সমাজে কলহ ও যুদ্ধের কথাই বড় কথা বলিয়া চলিয়া থাকে এবং কে কাহাকে কবে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে তাহার আলোচনাই ইতিহাসে বিশেষ স্থান পাইয়া থাকে। অতি-মানব তাহারাই, যাহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে অথবা বিরাট বিরাট শহর জ্বালাইয়া মানব-প্রগতি ও কৃষ্টির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাবে যাহারা আলেকজান্দ্রিয়া কিংবা নালন্দা অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করিয়াছে তাহাদেরই আমরা শিশুকাল হইতে ইতিহাসের

মহাকর্মীদিগের মধ্যে স্থান দান করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছি। অপরদিকে যাঁহারা মানুষকে সত্য মানবতা কি তাহা শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা ধর্মের ক্ষেত্রে উচ্চ স্থান দিয়াছি ও তাঁহাদিগের শিক্ষা অবসর সময়ে আত্মার উন্নতির জন্য কখন কখন আবৃত্তি করিয়াছি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ও জীবনপথে চলিতে চলিতে আমরা সততই সেই সকল প্রসিদ্ধ পুরুষদিগকেই ভক্তি নিবেদন করিয়া থাকি, যাহারা মনুষ্যত্বের প্রকৃত অর্থ বিকৃত ভাবে দেখিয়া সদাসর্বদা কলহ-বিবাদে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতি ও জগতের সভ্যতা ও জীবনযাত্রার মহা অনিষ্টের কারণ সৃষ্টি করিয়া থাকে। বর্তমান জগতে ধর্মের স্থিতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ায় আধুনিক মানব আরও সুনীতি ও আদর্শের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধিক মাত্রায় মানবহিতের বিরুদ্ধ-কার্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। রাষ্ট্রনীতি বর্তমানে দুর্নীতির অপর এক নামমাত্র। কারণ, রাষ্ট্রিয়ক্ষেত্রে নিজ জাতির অথবা আন্তর্জাতিক বিষয়ে সমান মাত্রায় অসত্য ও অন্যায় প্রচলিত হইতে থাকিতেছে এবং ঐ সকল অসত্য ও অন্যায়কে মানুষ জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেছে। ধর্মের কথা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে উচ্চারিত হইলেও তাহার কোন প্রকৃত স্থান বা মূল্য আছে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও অন্যায়ের সাফাই দিয়াই রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ রক্ষা আধুনিক জগতে ঘটান হয়। মানব জীবনের অপর এক মহাশক্তির কেন্দ্র হইল জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়। এই স্থলেও সুনীতি বা সদাচারের স্থান নাই। ব্যবসা হইল ব্যবসা। তাহাতে লাভ ও সফলতাই হইল বড় কথা এবং অপরাপর প্রসঙ্গ, অর্থাৎ ধর্ম কিংবা ন্যায়ের আলোচনা, ব্যবসার সহিত মিলিত ভাবে কখন হইলে তাহা শুধু আলোচনার শোভাবৃদ্ধির জন্যই হইতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় অথবা ব্যবসাগত বিষয়ের কোনটিতেই ধর্ম, ন্যায়, সত্য, নীতি প্রভৃতির উপস্থিতি প্রকৃত অর্থে বিশেষ লক্ষিত হয় না। মানব জীবনে বর্তমান জগতে রাষ্ট্র ও অর্থনীতিই সকল গতি ও শক্তির মূল কারণ। সভ্যতার অপরাপর অঙ্গগুলি রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমষ্টির অলঙ্কার বলিয়াই সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

এই পরিস্থিতিতে মানব জীবন ক্রমশঃ সভ্যতার ও কৃষ্টির আলোক হারাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া বিনাশের গভীর অন্ধকারে পতিত হইবার সকল লক্ষণ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং কয়েকটি জাতি ও রাষ্ট্র এই ভুল পথে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে ও অপরাপর জাতি ও রাষ্ট্রকেও তাহাদিগের অনুসরণে চলিতে বাধ্য করিতেছে। মানব সভ্যতা, এমন কি মানুষের অস্তিত্বও লোপ পাইবার সম্ভাবনা এখন এতটা প্রকটভাবে ব্যক্ত হইতেছে, যে, জগদ্বাসী সেকথা আজ গভীর ত্রাসের ভাষায় আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু পাপ ও বিনাশের আকর্ষণ প্রবল। মানুষ সমবেত ভাবে কোন কার্যে অবতীর্ণ হইলেই তাহার মধ্যে কলহ ও মতভেদের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ সেই কলহের ফলে রক্তপাতের সূচনা হয়। এই সকল কারণে যুদ্ধ নিবারণ একটা মহা সমস্যার কারণ হইয়াছে। যুদ্ধ নিবারণের জন্য যাঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগের যশ ও খ্যাতি চিরজাগ্রত থাকে। ইহার অর্থ নীতিগত ও আধ্যাত্মিক। সেই কারণে যাহারা নীতিজ্ঞান অথবা আধ্যাত্মিক অনুভূতিবর্জিত জীবনযাত্রা নির্বাহেই লিপ্ত থাকে, সেই সকল লোকের নিকট যুদ্ধ-বিবাদকলহ বর্জন অবাস্তব ভাবে উচ্চাদের কথা এবং তাহা সাধারণ মানবের কর্ম বা উপলব্ধির বাহিরে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই মানবাত্মার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বস্তুতান্ত্রিক আগ্রহের আঘাতে জর্জরিত—সম্মোহিত করিয়া রাখে এবং বড় কথার খাতিরে নিজেদের ছোট ছোট লোভগুলিকে দমন করিবার কোনও চেষ্টা করে না। সুতরাং রাষ্ট্র ও অর্থনীতি সাবলীল গতিতে নিজ পতনের পথে চলিতে কোন বাধা পায় না: এবং যুগে যুগে মানব ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই একই পাপের প্রেরণায় সেই একই মহাসর্বনাশের কবলে পতিত হয় ও সর্বহারা হইয়া পরে নূতন করিয়া অন্ধকার হইতে পুনরায় আলোকে ফিরিয়া আসিবার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ নিবারণের সর্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায় হইল আত্মপ্রতিষ্ঠার নেশা ও পরধনলোলুপতা। যে সকল জাতি বা

ব্যক্তিসমষ্টি জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া সর্ব্বগ্রাসী মহাশক্তির অধিকারী হইতে চাহে বা নিজেদের কোন প্রতিষ্ঠা না থাকিতেও প্রতিষ্ঠার সৃষ্টির জন্য নানা চক্রান্ত ও অন্যায় করিতে লজ্জাবোধ করে না, তাহারাই সাধারণত মানব সভ্যতার সর্ব্বনাশের কারণ হয়। বর্ত্তমানকালে চীন ও পাকিস্তান এই প্রকার আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রসৃজন চেষ্টার অঙ্গ হিসাবে যুদ্ধ, পরদেশ লুণ্ঠন ও দখল, নরহত্যা, দাঙ্গা ইত্যাদি করিয়া আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বিষময় করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতীয় কার্য্য প্রাচীনকালে যাহারা করিত তাহাদিগকে বর্ব্বর জাতি বলিয়া অভিহিত করা হইত। যথা, হুন, শক, ভিসিগথ, লম্বার্ড, মঙ্গোল, তাতার প্রভৃতি জাতি সকল, যাহাদিগের জীবনে লুণ্ঠন, হত্যা, পররাষ্ট্রধর্ষণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মের মতই ছিল। বর্ত্তমানে তথাকথিত সভ্যজাতির মধ্যে একত্র সংযোগ রক্ষা করিয়া অবস্থিত থাকিয়াও চীন ও পাকিস্তান বর্ব্বর জাতির মত ব্যবহার করিয়া চলিতে কোন অসুবিধা বোধ করে না। কারণ ভিতরে ভিতরে ইহাদিগের দ্বারা অপরাপর মহাজাতিদিগের কার্য্যসিদ্ধি হয় বলিয়া এই বর্ব্বর জাতিদ্বয় অবাধে রাষ্ট্রজগতে যোরাফেরা করিতে পারে। পাকিস্তানের জন্মদাতা ব্রিটেন ও তাহার পরম বন্ধু ও মিত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঐ নবসৃষ্ট দেশের সকল অন্যায় ও অধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া তাহার স্থিতি সহজ করিয়া দিবার সকল ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই কারণে পাকিস্তানের সৈন্যদল রক্ষা ও হাতিয়ার সংগ্রহ অবাধে হইয়া থাকে এবং পরদেশ লুণ্ঠন প্রভৃতিও পাকিস্তান অনায়াসে করিতে সক্ষম হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করিয়া এক মহাযুদ্ধের আরম্ভ করে। যুদ্ধে ভারতের নিকট পরাজিত হইয়া পাকিস্তান ব্রিটেন-আমেরিকা প্রভৃতির আশ্রয়ে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অতঃপর কি অন্যায় ও অধর্ম্ম করিবে তাহার পরিকল্পনায় নিযুক্ত রহিয়াছে। চীন কেমন করিয়া তিব্বত ধর্ষণ ও দখল করিয়াও অক্ষতভাবে জাতিসভায় ঘুরিয়া ফিরিতেছে তাহাও আমরা বুঝি না। ব্রিটেন ও আমেরিকার ঐ অন্যায়ে সমর্থন রহিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কারণ সম্ভবত তিব্বত দখল করিয়া চীনের ক্রমশঃ এশিয়ার অন্তর্ভূত রুশিয়ার সহিত সংঘর্ষণ ঘটিবে বলিয়া ইঙ্গ-আমেরিকানদের আশা। যাহাই হউক ব্রিটেনের যুক্তিতে বিশ্বাস করিয়া পণ্ডিত নেহরু চীনের তিব্বত দখল মানিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া সকলের ধারণা। ইহাতে মনে হয় ব্রিটেন ও আমেরিকা চীন ও রুশিয়ার মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিবার জন্য ইচ্ছুক। ভারত যে চীনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল তাহাও চীনের সমগ্র এশিয়ার উপরে প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছাপ্রসূত। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুদ্ধ না করিবার ইচ্ছা থাকিলেও শান্তিপ্রিয় জাতিগুলি যুদ্ধের আবর্ত্তে পড়িয়া যাইতে পারে ও পড়িয়া যায়। ভারতের যুদ্ধ করিবার কোনও ইচ্ছা নাই; কিন্তু ভারত অপরের পাপের তাড়নায় যুদ্ধে জড়িত হইয়া যায়। ইহাতে ভারতের কোনও দোষ দেখা যায় না। কিন্তু দোষ না থাকিলেও যুদ্ধের আশঙ্কা প্রবল ও সদাজাগ্রত। এই কারণে ভারত শান্তির জন্য যাহাই করুক না কেন, তাহার ফলে তাহার যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন আর কখনও হইবে না, এই চিন্তা একান্তই কষ্টকল্পনাপ্রসূত। শান্তি শান্তি করিয়া জাতীয় যুদ্ধশক্তি খর্ব্ব করিয়াছিলেন পণ্ডিত নেহরু, এবং সেই কারণে তিনি দেশের চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে কোন প্রকার যুদ্ধ নিবারণ আলোচনারই কোন মূল্য ধার্য্য হইতে পারে না, যদি না আলোচনাকারীগণ বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য হন। কারণ শান্তি শান্তি বলিয়া পিছন হইতে ছুরি মারা আধুনিক যুগে বিশেষ ভাবেই প্রচলিত হইয়াছে। উদাহরণ হিসাবে দেখান যাইতে পারে যে, বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর উপাসক আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া যাইতেছেন ও লক্ষ লক্ষ মানবের হিতের জন্য তাহাদিগের দেশে যুদ্ধ চালাইয়া বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদিগের বিশেষ অনিষ্টের কারণ হইতেছেন। রুশ ও চীনের কথা আরো অলৌকিক। বিশ্বের সর্ব্বমানবের সাম্য ও মুক্তির জন্য এই দুই মহাজাতি বহু যুদ্ধ করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও স্থিতিশীল করিয়াছেন; কিন্তু অপরাপর জাতিদিগের ইঁহাদিগের প্রচেষ্টায় কি লাভ হইয়াছে তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন জাতির লাভ ত হয়ই নাই বরং ক্ষতিই হইয়াছে।

চীনের বিষয়ে বলা যায় যে, চীনের কার্য্যকলাপ সাম্রাজ্যবাদী পরদেশ-লুণ্ঠক জাতিদিগের সহিত একই প্রকারের হইয়াছে। চীন এমন কি অপর দেশ দখল করিয়া সেই দেশের সামাজিক রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করা অথবা তথাকার জনসাধারণের উপর নির্দ্দয় অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ নির্ম্মূল করিয়া ফেলাও অন্যায় মনে করে না। এবং চীন-যত বড় অন্যায়ই করুক না কেন, তাহা বিশ্বকম্যুনিজম্‌ ও মানবপ্রগতির আদর্শের অন্তর্গত বলিয়া বিশ্ববাসীকে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ চীনের সামরিক শক্তি আছে। পাকিস্তান অন্যায়, অধর্ম্ম ও দুর্নীতির উপরেই সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত। তাহার সহিত কোন আলোচনা বা সন্ধিসর্ত্তের কোন মূল্য আছে বলিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস করেন না। সুতরাং ঐ জাতীয় ব্যবহার উপর নির্ভর করা কখনও চলিতে পারে না। বর্ত্তমান পরিস্থিতি যাহা তাহাতে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকাই উচিত। এমন কি আণবিক শক্তিও ততটাই গঠন করা উচিত, যতটা না করিলে সামরিক শক্তিতে চীনের বা পাকিস্তানের সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

জাতীয় শক্তি ও স্বাস্থ্যের আয়োজন

ভারতের অধিকাংশ লোকই স্বাস্থ্য ও শক্তিহীন। ইহার কারণ দারিদ্র্য, চিকিৎসার ব্যবস্থার অভাব, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা পদ্ধতি, বাল্যবিবাহ, সুপ্রজনন জ্ঞানের অভাব, অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও ভারতে বহু সংখ্যক শিশু জন্মগ্রহণ করে যাহারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে শক্তি সামর্থ্যে অপর জাতির লোকেদের তুলনায় কোনও অংশে নিকৃষ্ট প্রমাণ হইবে না। কিন্তু শক্তি সামর্থ্য শিক্ষা ও ব্যায়াম চর্চ্চার ব্যবস্থা ভারতে অত্যন্তই অল্প আছে। বড় বড় শহরে ক্রীড়াকেন্দ্র অল্পসংখ্যক আছে, ব্যায়ামাগারও কোথাও কোথাও দেখা যায়। স্কুল-কলেজে খেলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা কোন কোন স্থলে আছে। কিন্তু ভারত সরকার ও প্রদেশ সরকারগুলি যে অর্থ ক্রীড়া ও ব্যায়ামের জন্য ব্যয় করেন তাহা উপযুক্ত স্থলে কার্য্যকরী ভাবে খরচ হয় কি না, তাহার কোনও নিশ্চয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ রাষ্ট্রীয় দলের লোকের প্রাধান্যে এই টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রনেতাদিগের প্রাধান্য অর্থে সর্ব্বদাই বুঝিতে হইবে ভোট সংগ্রহ ও রাষ্ট্রমত প্রচারকার্য্য। তাহা হইলে ক্রীড়া, ব্যায়াম, শক্তি ও স্বাস্থ্য সাধনা এবং ভোট সংগ্রহ আর্থিক ভাবে জড়িত হইয়া গিয়া স্বভাবতই ভোট সংগ্রহই আসল কার্য্য হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা হয়। অতএব সরকারী ব্যবস্থা এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ক্রীড়া ও ব্যায়াম রাষ্ট্রনেতাদিগের মতলবমুক্তভাবে চলিতে পারে। ইহার উপায় স্কুল, কলেজ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ক্রীড়া ও ব্যায়াম কেন্দ্রগুলিকে অর্থ সাহায্য করা। যে সকল স্কুল, কলেজ ও ক্লাব বহুকালাবধি শক্তি ও স্বাস্থ্য চর্চ্চা এবং খেলার ব্যবস্থা উন্নতভাবে চালাইয়াছে সেগুলির সর্ব্বাগ্রে সাহায্য পাওয়া আবশ্যক। নূতন গঠিত ক্লাব প্রভৃতিকে সাহায্য না করাই কর্ত্তব্য। এবং যে সকল ক্লাব ভোটাভুটি করিয়া থাকে সেগুলিকেও বাদ দিলে মঙ্গল।

ধানচাল সংগ্রহ

পশ্চিম বাংলা সরকার যে ধানচাল সংগ্রহ চেষ্টা করিতেছেন তাহার কার্য্য যে খুব সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শুনা যাইতেছে যে, ১৫ লক্ষ টন খাদ্য সংগ্রহ পরিকল্পনার ফলে এখন অবধি মাত্র ১ লক্ষ আশি হাজার টন জোগাড় হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা জোগাড় করা আবশ্যক তাহার এক-অষ্টমাংশও জোগাড় হয় নাই। ইহা খুবই আশঙ্কার কথা; কারণ সরকারী ব্যবস্থায় খাদ্য ক্রয় ক্রমশঃ সকলেই করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং সেই খাদ্যের পরিমাণ এতই অল্প যে তাহাও ঠিকমত না পাইলে শহরবাসীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবে। ধানচাল জোগাড় করাও কঠিন কার্য্য। কারণ গ্রামবাসী লোকে শহরবাসীদিগের তুলনায় দ্বিগুণ খাদ্য খাইয়া থাকেন। নিজেদের খাবার ব্যবস্থা রাখিয়া সরকারী দাবি মিটান কঠিন বলিয়াই সরকারী জোগাড় ঠিকমত হইতেছে না। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি; পুনর্ব্বার বলিতেছি যে সরকারী ধানচাল জোগাড় লইয়া দেশবাসীর পিছনে না ঘুরিয়া পশ্চিম বাংলা

সরকারের উচিত ছিল নূতন নূতন জমিতে ধান চাষ করিবার ব্যবস্থা করা। পশ্চিম বাংলায় লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি পড়িয়া আছে যাহা চাষ করিবার ব্যবস্থা করা অসম্ভব নহে। ঐ চাষের ব্যবস্থা করিলে খাদ্যের অভাব সহজে দূর হইত। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান কালে রাষ্ট্রনেতা ও শাসনক্ষেত্রের মালিকদিগের প্রধান কার্য হইয়াছে "মাইক" ও "ক্যামেরা"র সম্মুখে দাঁড়াইয়া জনসাধারণের নিকট আত্মপ্রচার। কোন আইন করিয়া যদি সকল মন্ত্রী ও তাঁহাদিগের নিজের কর্মচারীদিগকে সাক্ষাৎভাবে খাদ্য উৎপাদন কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য করা যায়; তাহা হইলে খাদ্য সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে। খাদ্য উৎপাদন পূর্ণমাত্রায় না হওয়া পর্যন্ত ফটো তোলা ও মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বড় বড় বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

পণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ অনুশীলনে পরম পণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য গত ১২ই ডিসেম্বর তাঁর কলিকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দুরারোগ্য কর্কট রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

অথর্ববেদের লুপ্তপ্রায় 'পৈপ্পল সংহিতা'র আবিষ্কারক হিসাবে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল বিস্তৃত। তিনি কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ ও ভাগবতরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল উপাধিই নয়, তাঁর মত পরম পণ্ডিত বর্তমানে ছিল না বলিলেই চলে।

গত ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ওড়িশার দুর্গম গ্রামাঞ্চল হইতে বহু পরিশ্রমে পৈপ্পলাদ সংহিতার শুদ্ধ পাঠ সম্বলিত পুঁথি আবিষ্কার করেন। তার পূর্বে অথর্ববেদের নবটি শাখার অন্যতম এই সংহিতার একটি খণ্ডিত ও ভ্রমাত্মক পুঁথি উনবিংশ শতাব্দীতে পাওয়া গিয়াছিল। প্রায় ৭৫ বৎসর ধরিয়া পণ্ডিত মহল মূল পাঠ উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তারপর অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের আবিষ্কার প্রাচ্যবিদ্যা-অনুরাগীদের মধ্যে আলোড়ন জাগায় এবং ভারততত্ত্ব বিষয়ে অসামান্য ঘটনা হিসাবে অভিনন্দিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক "সংস্কৃত কলেজ-গবেষণা গ্রন্থমালাতে এই সংহিতার প্রথম খণ্ড গত বৎসর প্রকাশিত হয়। কুড়ি খণ্ডের মধ্যে আরও চারটি খণ্ডের সম্পাদন তিনি সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন।

শেষ জীবনে তিনি সংস্কৃত কলেজের বেদ-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক গবেষক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। গত ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। পরে কিছুকাল পুণার মহারাষ্ট্র বিশ্বপরিষদে অধ্যাপনা করেন।

তাঁর গবেষণা-গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভোজরাজের 'যুক্তিকল্পতরু', গৌহিবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্য', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব', এবং গোপদেবের 'মুক্তাফল'।

১৮৯৯ সালের ১লা নভেম্বর দুর্গামোহন মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গেল।

ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি ও কলিকাতার প্রাক্তন শেরিফ ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা গত ১৫ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল।

ডঃ লাহা ১৮৮৭ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা হৃষিকেশ লাহা। ডঃ লাহা ১৯১০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। কয়েক বৎসর পরেই তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এবং দর্শন বিষয়ে ডক্টরেট লাভ করেন।

ডঃ লাহা ১৯৫৩ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। দেশীয় ভাষায় প্রথম অর্থনৈতিক বিষয়ক সাময়িকপত্র "আর্থিক উন্নতি"র তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

শিক্ষা-জগতের সঙ্গেও ডঃ লাহা যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রম কমিটি এবং ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন অনুসন্ধান কমিটির তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির সঙ্গে অন্তত কুড়ি বছর তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

পরলোকগত লালবাহাদুর শাস্ত্রী

মাত্র আঠার মাস পূর্বে জওহরলালজীর মৃত্যুর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্বের গুরুদায়িত্বভার বহন করবার জন্ত যখন পরলোকগত লালবাহাদুর শাস্ত্রী নির্বাচিত হন, তখন কেহ কল্পনা করতে পারে নি যে এত শীঘ্র এবং এমন আকস্মিকভাবে তাঁর দেহান্ত ঘটবে। সে সময়ে এ কথাও কল্পনা করা সহজ ছিল না যে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের এই স্বল্পকালের মধ্যে তাঁকে এতগুলি এবং এমন জটিল সমস্তা নিয়ে যুঝতে হবে।

দেশের আর্থিক সমস্তাগুলি অবশ্য আগে থেকেই ছিল। কিন্তু শাস্ত্রীজীর রাজত্বকালে সেগুলির জটিলতা প্রায় সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে জটিল সমস্তা খাদ্যশস্ত উৎপাদন এবং তার তোগবণ্টনের সমস্তা। জওহরলালজীর জীবদ্দশাতেই এই দ্বিবিধ সমস্তা সঙ্কটের অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। এই সমস্তাটি পরিকল্পনা রূপায়ণের ধারায়ও অপঘাতের সৃষ্টি করতে সুরু করেছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী হিসাবনিকাশের (mid-term appraisal) রিপোর্টে তার স্পষ্ট স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রীজী প্রধানমন্ত্রীত্বভার গ্রহণ করবার কয়েক মাসের মধ্যেই যখন ১৯৬৪ সালের শেষভাগে খাদ্যশস্তের আশাতীত পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় এবং একই সঙ্গে যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে পি এল ৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী প্রভূত পরিমাণ গম আমদানীর আয়োজন পুনরায় চালু হয়, তখন আশা করা গিয়েছিল যে, অন্ততঃ কিছুকালের জন্ত খাদ্য সঙ্কটের ভয়াবহ পরিণাম এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু পরবর্তী বৎসরের মধ্যভাগ থেকেই এই সমস্তাটি গুরুতর আকার ধারণ করে। এর অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবতঃ ১৯৬৫ সালের ফসলের বিরাট ঘাটতি। অনাবৃষ্টি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে ফসলের ঘাটতির স্পষ্ট আভাস পূর্ব থেকেই পাওয়া গিয়েছিল এবং তার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ী মুনাফাবাজ-গোষ্ঠী খাদ্যশস্তের সরবরাহ ও মূল্যমানে একটা ব্যাপক সঙ্কটের সৃষ্টি করবার আয়োজন করে তুলেছিলেন।

এই পটভূমিকার উপরে চতুর্থ পরিকল্পনার খাড়া রচনা সুরু হয়েছিল। এই সময়ে শাস্ত্রীজী দৃঢ় ভাষায় এই অভিমত প্রচার করেন যে, কৃষিক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি বিধান সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনার রূপায়ণের গতি রুদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়বে। বস্তুতঃ শেষ পর্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়াতে কৃষি উন্নতির দাবিকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা প্ল্যানিং কমিশনও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। এতে শাস্ত্রীজীর স্পষ্ট ও ঋজু চিন্তার প্রভাব স্পষ্ট।

যাই হোক, আর্থিক উন্নয়ন গতির আপেক্ষিক হ্রাস্য, উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রয়োগের পারস্পরিক অসামঞ্জস্য, লগ্নীর তুলনায় উন্নয়ন-পরিমাণের (quantum of growth) ক্ষীণতা ইত্যাদি নানাবিধ আর্থিক ও সামাজিক সমস্তা মোটামুটি দেশের জীবনে প্রায় এমন ভাবে কয়েক বৎসর ধরে কায়েমী হয়ে রয়েছে যে এগুলিকে সঙ্কটাবস্থার সূচক বলে বড় কেহ মনে করেন না। একমাত্র খাদ্য সঙ্কটের ক্ষেত্রেই আশঙ্কার সৃষ্টি করে থাকে। শাস্ত্রীজীর প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে এই সমস্তাটি সঙ্কটাবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে। শাস্ত্রীজী স্বয়ং এই সঙ্কট থেকে দেশকে স্থায়ী মুক্তি দেবার একমাত্র উপায় বলে উৎপাদন-উন্নতির উপরে রাষ্ট্রের প্রধানতম প্রয়োগ কেন্দ্রীকরণের উপদেশ দেন। সেই প্রয়োগ রূপায়ণের কাজ সম্প্রতি সুরু হবার অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। তাঁর অন্তর্ধানে ভবিষ্যতে এই বিষয়টির গুরুত্ব সরকারী চিন্তায় অব্যাহত থাকবে কি না সেটা এখনই নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়।

আর্থিক সমস্তা ছাড়াও আরও একটি বিরাট সমস্তা শাস্ত্রীজীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে সঙ্কটাবস্থার সৃষ্টি করেছিল, সেটি ভাষা-সমস্যা। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি কার্যকরী রাষ্ট্রীয় ভাষার সমস্যার সমাধান সহজ নয়। স্বাধীনতার পূর্বে এবং স্বাধীনতার পরে প্রায় আঠার বৎসর কাল ধরে আন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষার ব্যবহারই এতাবৎকাল চলে এসেছে। কিন্তু সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী এই ব্যবহারের কাল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল; অতঃপর ইংরাজীর বদলে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা রূপে ব্যবহৃত হবে এই স্থির ছিল। ইংরাজী ভাষার ব্যবহার চালু রাখার

বিবিধ বাধা ছিল; প্রথমতঃ এটা-বিদেশীর ভাষা এবং এই ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে ইংরাজের ভারতের ওপর প্রভুত্বের কারণে। তা ছাড়া দেশের জনগণের মধ্যে একটি সামান্য ভগ্নাংশ সংখ্যা মাত্র ইংরাজী ভাষার অধিকারী। কিন্তু ইংরাজীর বদলে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা রূপে ব্যবহার করতে হলে অন্য এবং জটিলতর সমস্যার উদ্ভব হওয়া অনিবার্য। এটি আঞ্চলিক ভাষা মাত্র; এই ভাষাটিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র-ভাষা রূপে গ্রহণ করার ফলে, হিন্দী যাদের মাতৃভাষা, অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষায় তাঁরা লালিত ও বর্ধিত, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীর তুলনায় তাঁদের রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছুটা অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা মিলবে এরূপ আশঙ্কা অসম্ভব নয়। এই সমস্যাটির একটা আপাতঃ সমাধান শাস্ত্রীজীর ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সেটা কতকাল স্থায়ী হবে তা এখনই নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এতে একটা বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, অবস্থার সঙ্গে এবং বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথোচিত প্রয়োগ ব্যবস্থা করবার তাঁর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর এই স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ও প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে যাকে বলে pragmatic approach, অর্থাৎ কোনও একটি বিষয় সম্বন্ধে তার প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের দৃষ্টিকোণটিকে মানিয়ে নেওয়ার স্বভাব বা ক্ষমতা, এটিই ছিল শাস্ত্রীজীর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য।

তবে কেহ যদি মনে করেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কার্যকলাপ কোনও একটি নির্দিষ্ট আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অনুসারক ছিল না, তবে তাঁরা ভুল করবেন। মূল আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির রেখে তিনি পথের বাধা যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে প্রয়াস করতেন। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে এই কারণে আদর্শ বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিত, তখন পথের বাধা দৃঢ়তার সঙ্গে ভেঙ্গে দিয়ে অগ্রসর হতে তিনি দ্বিধা করেন নি। গত আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের ওপর পাকিস্তানী হামলার সময়ে মূল আদর্শ সাধনে ও লক্ষ্য অনুসরণে তিনি কতটা দৃঢ় ও অনমনীয় হতে পারতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে গেছেন। তার সামান্য মাত্র কাল পূর্বে কচ্ছে পাকিস্তানী হামলার সময়ে তাঁর ব্যবহার ছিল অন্য রকম। সে সময়ে বিরোধী দল তাঁর তথাকথিত দুর্বলতার জন্য তাঁর কঠিন সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করেছেন, এমন কি তাঁর দলের কেহ কেহও কচ্ছ সমস্যার যে পথে তিনি সমাধান খোঁজবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা তাঁর দুর্বলতারই লক্ষণ এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু কাশ্মীরে পাকিস্তানী হামলার সময়ে আমরা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অন্য রূপ দেখতে পাই। দেশের রাষ্ট্রকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর অনমনীয় দার্ঢ্য, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে শত্রুর রাষ্ট্রের সীমানা লঙ্ঘন করে প্রতি-আক্রমণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধার আভাস নাই, এটি শাস্ত্রীজীর আর একটি চেহারা। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজন আশু এবং অনিবার্য না হয়ে উঠেছে, ততক্ষণ তিনি সর্বরকমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খুঁজে বেড়িয়েছেন। কিন্তু যেই মাত্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হ'ল, তখন আর অস্ত্র ব্যবহারে তাঁর কোন দ্বিধা রইল না। এই দার্ঢ্যের জন্য তিনি দেশবাসীর অন্তরে সত্যকার নায়কের স্থানটি অনায়াসেই অধিকার করে বসতে পেরেছিলেন।

কিন্তু তাঁর চরিত্রের বিশিষ্টতম রূপটি দেখতে পাওয়া যায় তাসখন্দ বৈঠকে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁর সঙ্গে আলোচনায় কোনখানে একটুখানি পারস্পরিক স্বীকৃতির (Common agreement) স্থানটি ছিল অতি সঙ্কীর্ণ। আয়ুবের অন্যতম মূল দাবি ছিল তথাকথিত কাশ্মীর সমস্যার আলোচনা; শাস্ত্রীজীর মূল দাবি ছিল কাশ্মীর সমস্যা ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং কোন আন্তর্জাতিক আলোচনার এলাকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তথাপি তিনি আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় যারা, লড়াইয়ের দ্বারা নয়, উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিরোধের বিষয়গুলির সমাধানের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সোভিয়েৎ প্রধান-মন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যবর্তিতা না হ'লে সম্ভবত কোন সমাধানই শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হ'ত না। কোসিগিন ভারত-পাকিস্তান বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে অসাধ্য সাধন করেছেন, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। বস্তুতঃ ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের জনগণই এই অসাধ্য সাধন সম্ভব করাবার জন্য কোসিগিনের প্রতি আজ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। তবু তাসখন্দের শাস্ত্রী-আয়ুব যুক্ত ঘোষণা মূলতঃ আলোচনা-রত রাষ্ট্রনায়কদের নিজেদেরই রচনা। সারা বিশ্ব আজ এই রচনার সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়েছে। তাসখন্দ ঘোষণা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নিশ্চিন্ত ও বিবিধ প্রাণান্তকর সমস্যাকণ্টকিত

মাত্র আঠার মাসের রাষ্ট্রশাসককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ অবদান। জীবন দান করে তিনি দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন এই একটি উপহার, যার ফলে আজ সবাই আশা করছে ভারতের উপমহাদেশে আঠার বৎসর পর আবার শান্তি, মৈত্রী ও সুহৃতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে কেবলমাত্র নেহরুর উত্তরাধিকারী বা প্রতিধ্বনি বলে অনেকে বলছেন দেখতে পাওয়া যায়। এ কথা শুধু যে ভুল তা নয়, এটি ঘোরতর অন্যায়। নেহরুর পরবর্তী রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে, নেহরুর নীতি এবং প্রয়োগের ফলাফল উত্তরাধিকার সূত্রে অবশ্যই শাস্ত্রীজীর স্কন্ধে বর্তাইয়াছিল। কাশ্মীর সমস্যা বস্তুতঃ উপযুক্ত সময়ে নেহরু-নীতির দার্ঢ্যের অভাবেরই ফল। দেশের খাদ্য ও আর্থিক সমস্যাসমূহও নেহরুর অনুসৃত নীতি ও প্রয়োগেরই বিষময় ফল। এমন কি আজিকার ভাষা সমস্যাও প্রধানতঃ নেহরু-নীতিরই আরও একটি প্রকাশ। ভারত-চীন সমস্যাও নেহরুরই হঠকারিতার আর একটি উদাহরণ। এ সকলই লালবাহাদুর শাস্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। মাত্র আঠার মাস কালের মধ্যে তাঁকে ভাষা সমস্যা, একাধিক সীমান্তে সশস্ত্র শত্রুর হামলা এবং একটি বড় রকমের লড়াই সামলাতে হয়েছে। যে ভাবে তিনি এগুলি সামলিয়েছেন তাতে তাঁর স্বাধীন, প্রবল এবং স্বস্থ ব্যক্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এমন কি দলীয় সম্পর্ক ব্যাপারেও তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য আপন প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্রীজী যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রীর গদী দখল করেন, তখন রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ব্যাপারে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের প্রভাব ছিল প্রবল এবং স্পষ্ট। গত আঠার মাসে তার প্রায় সবটাই শাস্ত্রীজী নিজ ব্যক্তিত্বের এবং দৃঢ়-চিত্ততার ফলে স্বয়ং অধিকার করে নিয়েছিলেন; রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীই হয়ে উঠেছিলেন কংগ্রেস নীতির প্রধান নিয়ন্তা। গত ব্যাঙ্গালোর কংগ্রেস অধিবেশনে তার বেশ খানিকটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

শাস্ত্রীজীর পর এখন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর গদী কে অধিকার করবেন এই সিদ্ধান্ত আজ তাই আর সহজ নয়। কংগ্রেসপতির সেই প্রভাবের ফলে শাস্ত্রীজীর নির্বাচন সহজ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন হয়েছিল, আজ তাঁর আর সেই প্রভাব নেই। তা ছাড়া শাস্ত্রীজীর মত নির্বিরোধী (non controversial) অথচ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণে সক্ষম অন্ত কোন নেতা আপাততঃ ঐ দলের মধ্যে আর নজরে পড়ে না। এ পর্যন্ত যে সকল সম্ভাব্য উমেদারদের নাম জানা গিয়েছে, যথা গণসংযোগ মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন, বর্তমান রেল-মন্ত্রী শ্রীপাতিল, এবং বর্তমান অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ (শ্রীসঞ্জিব রেড্ডীর নামও এই সম্পর্কে প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রীত্বের উমেদারী অস্বীকার করেছেন বলে প্রকাশ) এঁদের কাহাকেও নির্বিরোধী বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ এঁদের মধ্যে কোন একজনকে মনোনয়ন করা সহজ নয়। সংবাদে প্রকাশ যে, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের কেহ কেহ কংগ্রেসপতির নিকট দাবি করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর পদে কাহাকেও নির্বাচনের অধিকার পার্লামেন্টারী দলের নিজস্ব অধিকার। নেহরুর মৃত্যুর পর তাঁহাদের এই অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়। এবার তাঁরা যেন দ্বিতীয় বারের মতন তাঁদের এই মূল অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন।

অন্য পক্ষে কংগ্রেসের উচ্চতম পর্যায়ে বা উমেদারদের মধ্যেও নিজেরা কেহ চান না যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এইরূপ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কোন কোন রাজ্যে বিষময় ফল ফলিয়েছে এবং দলের মধ্যে চিরকালের মতন একটা চিড় থেকে গেছে। কেন্দ্রেও অনুরূপ ফল ফলুক এটা কেহই চান না। শেষ পর্যন্ত তাই হয়ত নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়িয়েই আগামী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন। এই নির্বাচনের ওপরে আগামী বৎসরের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল যে অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্র-কাব্যে যৌবনের অস্তরাগ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠপদ্ধতি ও ব্যাখ্যা নির্ণয় করতে দেখা যায় যে, একই কাব্যের অন্তর্গত বিভিন্ন কবিতার মধ্যে প্রেরণার কোন সাদৃশ্য সব সময় না থাকতেও পারে। কবির মত ছিল এই রকম যে, মহুয়া কাব্যের উদ্ভব আকস্মিকতায় এবং পরিণতি অন্তঃপ্রেরণায়। এই মতের যথার্থতা বিচার করা চাই। মহুয়ার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত ও সম্পর্কসমন্বিত কবিতাসমূহের বিচার দরকার। মহুয়া নামকরণের সার্থকতা আছে একটি সাধারণ ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা। সেই সাধারণ ভাবব্যঞ্জনা নির্দেশ করে যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কড়ি ও কোমল যেমন যৌবন-সূচনার কবিতাসমষ্টি, মহুয়া ও সানাই তেমনি যৌবনের রক্তিম অস্তরাগনির্দেশক রচনাবলী। কবির যৌবনচেতনার বহ্নি জরার জড়তা প্রতিহত ক'রে দীপ্ত তেজে জ্বলে উঠেছে শেষবারের মত এই দু'টি কাব্যগ্রন্থে। সানাই কাব্যগ্রন্থে অস্তরাগরক্তিম যৌবনের গোধূলি-লগ্ন সমাগত। কিন্তু মহুয়া পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে যুবকের প্রেমকাব্য ব'লে মনে হয়—বয়ঃপ্রবীণ কবির চেতনায় এমন যৌবনরসসৃষ্টি কি ক'রে সম্ভবপর হ'ল, তা বোঝা কঠিন।

প্রথমে মহুয়ার কথা আলোচনা করা যাক। কবির মতে, এ-কাব্যে প্রণয়ের প্রসাধনকলা ও প্রণয়ের সাজবেশ মুখ্য ও প্রবল উপজীব্য। যৌবনধর্ম যে প্রণয়চেতনা, তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েও এ কাব্যের কবিতাগুলির শ্রেণীবিভাগ করার সময় যৌবনকাব্যের নবীন ঋতুরসকাব্যের কথা কবি ভুলে যান নি। মহুয়ার কবিতার শ্রেণীবিভাগ ক'রে দু'রকম কবিতা পাওয়া যায়: ঋতুবিষয়ক কবিতা ও প্রেমের কবিতা। ঋতুবিষয়ক কবিতাবলী কবির প্রণয়চেতনাকে পরিপুষ্ট করেছে: কবির যৌবন-উপলব্ধি শেষ বসন্তের যৌবনজ্বালা রাগে কিংশুকরক্তিম হয়ে আসন্ন জীবন-বিরহ-বেদনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে তীব্র রোমান্টিকতার মনোহর আভায়।

ঋতুরসবিষয়ক কবিতায় কবির রূপমুগ্ধতার আবেশ প্রকৃতির উপরও আরোপ করা হয়েছে। মহুয়ার প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় এই সব কবিতায় তীব্র উন্মাদনা ও প্রশান্তির অভাব তাঁর বৈশিষ্ট্য। কবির পূর্বতন যুগের কাব্যের প্রকৃতিবোধের সঙ্গে মহুয়ার এই ধরনের কবিতার মৌলিক পার্থক্য আছে। বলাকা-র গতিবাদের প্রথম আবির্ভাব দেখা গিয়েছিল; গতিবাদের দ্বারা রূপাসক্তিকে খণ্ডন করার প্রয়াসও বলাকা-র কবিচেতনায় অবহিত। ঐ প্রয়াস কবিমনের দার্শনিক নিরাসক্তির পরিচায়ক। গতিবাদের আবিষ্কার বলাকা কাব্যে দার্শনিক নির্লিপ্তি-সম্পন্ন। গতিবাদ মহুয়া কাব্য রচনার যুগেও বিস্তৃত। কিন্তু মহুয়ার এই গতিবাদ যৌবনরসসিক্ত, দার্শনিক ঔদাসীন্য বা নির্বৃতি সেখানে নিতান্ত অনুপস্থিত। গতিবাদ বা জীবনের ক্ষিপ্র বেগ কবি কখনও ভুলে যান নি। কবি বিশিষ্ট একটি ভাবে আবদ্ধ হয়ে প্রকৃতি-পরিভ্রমণ করেছেন। কবির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণপ্রবাহই ভাবানুভূতিতে পরিণত। প্রকৃতির প্রাণোচ্ছলতা কবিচিত্তে ভাবের ভাব-প্রবাহে পরিণত হওয়ায় কবির যৌবনচেতনায় প্রকৃতির চিত্তাকর্ষ সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি বসন্ত ঋতুর বিস্ময়কর প্রাণোচ্ছলতা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর নিজের প্রাণচেতনা প্রবীণ হলেও প্রকৃতির সমতালে পা-ফেলার বাড়তি উত্তেজনা এ কাব্যে নেই। কবির প্রাণপ্রবাহ প্রকৃতির উপর আরোপ না ক'রে নিজের ভাবমুগ্ধতা প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। ফলে, প্রকৃতির সঙ্গে কবির যোগ যতটা ভাবের, ততটা প্রাণের নয়। প্রাণের সংযোগও সম পরিমাণে হলে মহুয়া যৌবন-সূচনার কাব্য হত, নিভন্ত প্রদীপের শেষ প্রজ্বলনের আকস্মিক দীপ্তি এতে হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিত না।

প্রেমবিষয়ক কবিতায় যে সব ভাবপরিবেশ দেখা যায়, পূর্ব যুগের প্রণয়কাব্যের সঙ্গে তার পার্থক্য "ভূমিকা"-র

কবিতাটি থেকে বিদায়। সেটি পরে লিখে এখানে সংযোজিত হয়েছে। উজ্জীবন কবিতাটির সঙ্গে মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভস্মের পরে কবিতা দুটির তুলনা করলে মহুয়া-র প্রেমানুভূতির বিশেষ রূপটি উপলব্ধি করা যায়। সে-রূপ প্রেমের নিকলুষ বীরমূর্তি। মহুয়ার প্রেমও গতিবেগচঞ্চল। সে-প্রেমের প্রেমিক যে, তার মধ্যে আছে দার্শনিক ও প্রেমিকের মাঝামাঝি হয়ে যাওয়া জীবনের স্রোত-উজ্জ্বলতা। মহুয়ার রূপভোগস্পৃহা দার্শনিকতা ও গতিবাদের দ্বারা পরিশুদ্ধ। "বসন্ত" প্রেমিকের ঋতু বসন্ত নয়—এতে প্রেমজ আসক্তি নেই, আছে প্রাণশক্তির বিস্ময়কর উন্মেষ। প্রেমের কবিতাগুলির মোট কথাটা এই: প্রেম-সম্বন্ধে নতুন বলিষ্ঠ পৌরুষদৃপ্ত আদর্শ কবিচিত্ত অধিকার করেছে; মুগ্ধ ভাবাবেশকে তিনি অস্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর প্রেম জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সমতাবিশিষ্ট বিচিত্র অভিব্যক্তি-ময়; জীবন থেকে প্রেম পলাতক নয়। উজ্জীবন কবিতাটিতে এই প্রেমচেতনার সাধারণীকরণ হয়েছে।

বাংলা কাব্যে প্রেমের সাধারণ রূপ স্থূল মোহের রূপ—প্রায় জান্তব চেতনার বিকাশ মাত্র। প্রেমের অধ্যাত্মশক্তি আমাদের কাব্যে স্থান পায় নি। তপস্যা হচ্ছে স্থূল প্রেমের মহত্ত্ব-অবসাননাকর আশ্রয়; মদনকে ঐ তপস্যা ত্যাগ করার জন্যে কবি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। মদনদেবের হর-কোপানলে দগ্ধ হওয়ার অর্থ, আমাদের প্রেমের বিশুদ্ধি সম্পাদন। ঐ রুদ্র-বহ্নি থেকে প্রেমকে নতুন বলিষ্ঠ উপাদান গ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ মহুয়া কাব্যে তাঁর প্রেমের কবিতায় কাম-গ্লানি দূর ক'রে বলিষ্ঠ প্রেমকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। হর-কোপানলে কেবল গ্লানি দূর হয়েছে, প্রেম বিনষ্ট হয় নি। মদনভস্মের তাৎপর্য কেবল কাম-গ্লানির অপসারণ, প্রেমের নিঃশেষ বিলুপ্তি-সাধন নয়। বরং মদন ভস্মীভূত হওয়ার ফলে প্রেমের হোমবহ্নির উৎসারণ সম্ভব হবে।

বিচ্ছেদ ও মিলন, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ বাংলা কাব্যে স্তিমিত প্রাণ-প্রদীপের মলিন শিখায় কজ্জল-কালিমায় রেখাঙ্কিত হয়েছে। আসক্তির স্থূল হতাবশেষ প্রায় সর্বত্র মহত্তার আবেদন এনে দিয়েছে। কবি চান, প্রেমের মিলনেও তীব্র প্রখরতা থাক, মূর্ছিতপ্রায় ভাবাকুলতা দূর হয়ে যাক। বিচ্ছেদ হোক দুঃখ-সহনক্ষম সামর্থ্যে পূর্ণ। অভ্রংলিহতার পরিপন্থী কবিচেতনা যে প্রেমাদর্শ কল্পনায় ব্রতী, তা সাধারণ ভক্তি-পেলব ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সাধারণত প্রেমের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি থাকে। কিন্তু কবি বাস্তব জীবনের সঙ্গে, প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে, প্রেমকে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ করতে চান। সেই চাওয়াও অবশ্যই রোমান্টিক; কিন্তু রোমান্টিকতার ধরনটা শেষের কবিতা উপন্যাসের অমিত চরিত্রের রুচির অনুরূপ নয়, বরং লাবণ্য চরিত্রের আদর্শানুসারী। প্রেমের গতিবেগ অবসাদের মুহূর্তে বহ্নিপ্রাণনা সঞ্চার করবে, এই হ'ল কবির নতুন মনোভাব, প্রথাবদ্ধ জীবনের মৃদু, ম্লান অভিব্যক্তির পরিবর্তে তিনি প্রেমের উদ্দাম অভিব্যক্তি চেয়েছেন। কৃত্রিম প্রণালীতে আবদ্ধ স্বাভাবিক প্রেমপ্রবাহকে তিনি মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তুচ্ছ সামাজিক বাধার দ্বারা প্রেমের শক্তিকে বাধাপ্রাপ্ত হ'তে দিলে চলবে না—এই ছিল তাঁর অভিমত। এই প্রেমাদর্শই মহুয়ার সব প্রেমের কবিতায় নানা ভঙ্গিতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

মহুয়ার কাব্যোৎকর্ষ বিচার করতে হ'লে মনে পড়ে যে, ভাবের মৌলিকতাই কবিতার উৎকর্ষের একমাত্র উপাদান নয়। কবির প্রধান কৃতিত্ব অভিব্যক্তিতে। চাই এমন কোন ব্যঞ্জনা যা আদর্শকে অতিক্রম করে। দেখতে হবে যে, প্রেমের সৌকুমার্য ও পৌরুষের ব্যঞ্জনায় সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে কি না। যে-কবিতায় এই সামঞ্জস্য আছে, তাই শ্রেষ্ঠ কবিতা। পৌরুষ-ব্যঞ্জনার আধিক্যে প্রণয়-কোমলতা নষ্ট হয়ে গেলে উন্নত শ্রেণীর কাব্য হবে না। কারণ, কাব্যে বৃহৎ আদর্শ নয়, অভিব্যক্তির অনির্বচনীয় মাধুর্যই কাম্য। মনের নিম্নভূমির ভাবকে কল্পনার ঊর্ধ্বলোকে প্রতিষ্ঠিত করা আসল কথা। মামুলি প্রেম আর মহুয়ার রবীন্দ্র-পরিকল্পিত বলিষ্ঠ প্রেম—দুই প্রেমের কল্পচিত্র বা imageries আলাদা। বলিষ্ঠ প্রেমের ব্যঞ্জনায় বলিষ্ঠতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়মণ্ডিত প্রণয়-মাধুর্যেরও পরিচয় চাই।

যাকে ইংরেজিতে imagination বলে তা হচ্ছে উচ্চস্তরের কবি-কল্পনা। এর বিশেষত্ব হ'ল অনিবার্য ভাব-সংহতি। এই কল্পনা বাহুল্যবর্জিত; এখানে কল্পিত ও কল্পনার নিবিড় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক; কতটা কল্পনা আর কতটা বিষয়ের স্বাভাবিক দান, তা সহজে বোঝা যায় না।

এক অপরূপ সত্তা গড়ে ওঠে ভাব ও বিভাবাদি মিলে-মিশে, যাতে জোড়া-দেওয়ার চিহ্ন ধরা পড়ে না। এই জাতীয় কল্পনা সার্থক ভাবে অব্যর্থ গতিতে পাঠকের মন অধিকার করে।

যাকে ইংরেজিতে fancy বলে তা তুলনায় নিম্নস্তরের কল্পনা। যা চাই বা পেলে ভাল হয় সেই উদ্দেশ্যমূলকতা এর প্রাণ। এ হ'ল শিথিল যুক্তিতে গড়া সৌন্দর্যচিত্র; এখানে কবির খেয়াল-খুশিতে চলাই প্রধান বিষয়; এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কবিতায় সৌন্দর্যসমষ্টি একত্ব লাভ করে না। fancy-পর্যায়ভুক্ত সৌন্দর্য চিত্রসমূহ সংহত হ'তে পারে না। তাদের মধ্যে এক রূপসত্তা জন্মগ্রহণ করে না। কল্পনার পূর্ণপাক যেন কিছুতে সম্পূর্ণ হয় না।

ইমাজিনেশন ও ফ্যান্সি সম্পর্কে বলতে গিয়ে খ্যাতনামা সমালোচকশ্রেষ্ঠ নলিনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন দিলীপকুমার রায়ের সাহিত্যশিষ্যা জ্যোতির্মালা দেবীর কাব্য প্রসঙ্গে :—

"এইরূপ ব্যাপারের উল্লেখ কোলরিজ করে গিয়েছেন তাঁর ইমাজিনেশন ও ফ্যান্সির সুবিখ্যাত তুলনায়। দেশে কালে অন্তরিত, বিষয়ের হিসাবে অসম্বদ্ধ বস্তুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা, নূতন নূতন ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করা, অভিনব একত্ব ব্যক্ত করা যে-বৃত্তির সহজ ধর্ম তাকেই কোলরিজ নাম দিয়েছিলেন ইমাজিনেশন, কবি-কল্পনা। আর যে-বৃত্তির সে-ক্ষমতা নাই, যে চলে ধাপে ধাপে ক্রমে ক্রমে একটির সঙ্গে তার সন্নিহিত বস্তুটি যোগ ক'রে ক'রে, যার মধ্যে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত কিছু নেই, তারই নাম ফ্যান্সি। আমরা প্রায় বলতে পারি এই শেষোক্ত বৃত্তিটি হ'ল গদ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী হ'ল ইমাজিনেশন।" (শিল্পকথা—১১৫ পৃষ্ঠা।)

আশীর্বাদ, নববধূ, পরিণয় ও মিলন—বিবাহবিষয়ক কবিতা চারটি এমন এক গভীর স্তরে অবতরণের পরিচয়, যেখানে কল্পনা গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করেছে। এই প্রসঙ্গে মৌলিকতা-প্রদর্শন দুরূহ বলেই কৃতিত্বপূর্ণ। মানুষের উৎসবজাত আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিখিলের আনন্দধারার পরিপুষ্টি-সাধন এই কবিতাগুলির সাধ্যবস্তু। এরা সাময়িকতাকে অতিক্রম ক'রে চিরন্তন হয়ে উঠেছে।

নারী-কবিতাগুলি কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গিমার রূপায়ণ, রূপগুলির অনুধ্যানসিদ্ধ চিত্র। বিভিন্ন জাতীয়া রমণীর শীল, স্বভাব, প্রেমানুভূতি ও তার প্রকাশ বর্ণনার দ্বারা এক এক নায়িকা-শ্রেণীর কল্পনা হয়েছে। নামের অভিধা-ধর্মের অন্তরে যে এক অব্যক্ত ব্যঞ্জনা আছে, তার আশ্রয়ে এই সব কাল্পনিক চিত্র রচিত। এই কবিতাগুলি poems of fancy। এদের অন্তর্নিহিত কল্পনা fancy বা নিম্নস্তরের কল্পনা। "Fancy is never at home"—এই উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নারী-কবিতাগুলি লঘু, ক্রীড়াশীল ভাবের চিত্রসমষ্টি মাত্র। এদের মধ্যে দুচারটি কেন্দ্রাভিমুখী লক্ষ্য সাধি; যথেষ্ট সৌন্দর্য থাকলেও কোন গভীর ভাব বা অনিবার্য আবেগ এ-সব রচনায় অনুপস্থিত।

মহুয়া কাব্যে উপস্থাপিত রবীন্দ্র-যৌবনবোধ যে অতোমুখ তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, বৃহত্তর মুক্তজগতের সংস্পর্শে এসেই কবির তরুণ মনের ভাবৈকনিষ্ঠা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। সাগরিকা কবিতার প্রণয়চিত্র পর্যবেক্ষণ করলে তা বোঝা যায়। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতির সম্পর্কব্যাখ্যাতা এই চিত্র ভারত ও যবদ্বীপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে রাজকুমার-রাজকন্যার এক মিলনোৎসব-মুখর কাহিনী উপস্থাপিত করছে। এখানে প্রেমিক যুগলের প্রেম-মিলন গৌণ হয়ে দুই দেশের সাংস্কৃতিক সান্নিধ্যের ইতিহাসই মুখ্য স্থান অধিকার করছে। কবির প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে জীবন-রহস্য ভেদ করার সাধনা, সৌন্দর্যবোধ এখন তাঁর কাছে গৌণ। মহুয়া কাব্যে সৌন্দর্যবোধ জীবনপিপাসায় নিহিত। কবি জীবনবৃক্ষের মূল অনুসন্ধান করছেন বিভিন্ন কবিতায়। সৌন্দর্য এই জীবনবৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছ। এই মনোভাব প্রথমে বলাকায় দেখা দিলেও মহুয়াতে এই মনোভাব রসচেতনায় সম্যক্ বিবৃত। কবির বক্তব্য, জীবনের শক্তিপ্রেরণা অব্যাহত থাকলে সৌন্দর্য আপনিই বিকশিত হবে। যৌবন কবিতায় তিনি বলেছেন : প্রাণবন্তার উর্মিল কেশরে মাধুরীর মঞ্জরী। প্রাণবত্তা তাঁর প্রকৃত সম্পদ; মাধুরী তার অনিবার্য পরিণাম।

প্রত্যাশা কবিতায় প্রেম ও কাম্যবস্তুর গূঢ় সম্পর্ক রূপায়িত। এই কবিতায় কবির মধ্যে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ক্ষীণ তৃষ্ণাও দেখা যায়। তাঁর বাল্যকালে সদর স্ট্রীটের বাড়ীতে একদা সকালবেলার মত যে-উপলব্ধি হয়েছিল হয়ত তার আবির্ভাবের আশা তাঁকে অধীর ক'রে তুলেছে :—

কার গো আমার ভাগ্যরাতের তারা!
নিমেষ-গণন হয় নি কি মোর সারা?

বসন্তের ফাল্গুনী আভাসে সমগ্র বনভূমি তাকে সার্থকতা দিতে পারে যে বাসন্তী প্রাণশক্তি, তার আগমনের প্রত্যাশায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। তেমনি কবিও যে পরম লগ্নের আবির্ভাবে সার্থক হবেন তার প্রতীক্ষারত। বনভূমি বসন্তের আশায় বার বার কবিকে প্রশ্ন করে: বসন্ত কত দূরে? কবিও প্রশ্ন করছেন তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা প্রকৃতে, জন্মলগ্নকে: তার জীবনের বসন্ত কত দূরে? তাঁর বসন্তাধিপ কবে আসবেন? তাঁর প্রতীক্ষাকাল কি এখনও শেষ হয় নি? বসন্তশেষে বনভূমি হয় পুষ্পল—পরম লগ্ন ও প্রিয় আগন্তুকের জন্য সে রচনা করে মঞ্জরিত সম্ভার দিয়ে। বসন্ত উৎসুক প্রকৃতির প্রাণস্পন্দন কবির চিত্তে এ সব প্রশ্ন উদ্বুদ্ধ করেছে। কাল্পনিক উৎকণ্ঠায় কবিও চঞ্চল। বসন্তস্পর্শের স্বর্গীয় পুষ্পমঞ্জরিকাচক্রে উল্লাস উৎসবোজ্জ্বল বনান্তবীথি প্রশ্ন করে: যার জন্যে অক্লান্ত পুষ্পবিন্যাস আয়োজন, সে কত দূরে? কবি নিজের মর্মকন্দরে প্রকৃতির এই আকুতি অনুভব করেছেন। জীবনে প্রথম প্রণয়ে যে আনন্দ একদিন লাভ করেছিল হয়ত তার আবির্ভাবের আশা কবিকে উন্মনা করে।

প্রেমের জগৎ কেবল স্থূল নয়, বহু অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। সেই মায়াময়তায় প্রেমের প্রকৃত মাধুর্য নিহিত। মায়া কবিতায় একাধারে প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলির সাংকেতিক তাৎপর্য সংহত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের প্রসাধনকলা ও অনুভূতির ভাবগভীরতা—দু'ধারাই মিশ্রিত হয়েছে। প্রেমিকযুগল এই মায়াময় জগতের স্রষ্টা। রূপ ও রসের সম্মিলনে রচিত এই মায়াই প্রেমের প্রকৃত "বস্তু"। তাই তার মূল্য তথাকথিত বাস্তব উপাদানের চেয়ে বেশী। প্রেমিক-প্রেমিকা অনেকাংশে পরস্পরের রচনা। প্রেমের জগতের আলোছায়ার অস্পষ্টতা এই মায়া কবিতায় রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, প্রেম প্রেমিকের চিত্তে শক্তির উদ্বোধন করে। প্রেমের অভিসার মানবচিত্তের অবচেতনে। সেই অবচেতনে অস্ফুট অনুভূতির ক্ষীণ রশ্মি মাত্র বিরাজিত; সেখানে অনুভূতি ক্ষীণদীপ্ত, স্বপ্নলুপ্ত। কবি যে "দীপশিখা"র কথা বলেছেন, তা হ'ল কবিদের সূক্ষ্ম প্রকাশ, কবিকল্পনার অপূর্ব দীপ্তি।

সাধারণ জীবনের আলো-আঁধার তাৎপর্যহীন; কবি-রচিত আলোছায়ার এক অখণ্ড রসরূপ আছে। এই রসরূপ যে-প্রেমের মধ্যে উদ্ভাসিত, তার ব্যঞ্জনা হবে সার্বভৌম: দেশ-কাল-পাত্রের সীমা লঙ্ঘন ক'রে বিদেশের কথা, বিস্মৃত যুগের কথা, বিদেশিনীর কথা কবির মনে পড়বে। জ্ঞান যেমন পূর্বজন্মের স্মৃতি, প্রেমানুভূতিও সেই রকম পূর্বজন্মের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে, All knowledge is forgetfulness and remembrance—সব জ্ঞানই বিস্মৃতি ও স্মৃতির সমাহার। রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। গেটের মতের চেয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুভব তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে:—

তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মন রে আমার
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে।
যে-পথ দিয়ে চলে এলি
সে পথ এখন ভুলে গেলি—
কেমন ক'রে ফিরবি তাহার দ্বারে।

দু'টি প্রাণের প্রণয়লীলার সার্থকতম প্রকাশ দেখা যায় সেতু কবিতায়। এতে এক আত্মার বিদ্যুৎ বিকাশ দেখা গেল। গগন ও ধরার বাণীবিনিময়ের মধ্যে প্রেমের একটি সার্থক রূপকময় প্রকাশ। স্বকুমার প্রেম দয়িতের কাছে নত হয়ে সীমাহীন বিস্তৃতির মধ্যে প্রেম ও পূর্ণতাকে খুঁজে পেতে চায়। প্রেমিকের মধ্যে আছে প্রেমের ধ্যান-তন্ময়তা, প্রেমিকার মধ্যে আছে আত্মবঞ্চনা। প্রেমের অন্তর রহস্য ও অনন্তের দিকে অভিসার এখানে সুব্যক্ত।

কবির যৌবনরাজ্যের সবচেয়ে দীপ্ত ভাবে প্রকাশিত অপরা নত কবিতায়। দু'টি প্রকৃতিচিত্রের দ্বারা সাময়িক ভাবে বিমুখ প্রেমিকার সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়শালী প্রেমিকের সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে। রাত্রে প্রেম কবিতায় শক্তির ব্যঞ্জনা ছিল হয়ত আরও প্রবল। কিন্তু তার প্রেরণা ছিল অসহ ও বিকৃত। সেই বাধিকারপ্রমত্ত শক্তি প্রেমকে বলপ্রয়োগে স্থূল হত্যাবেশে কলঙ্কিত ক'রে উপভোগ করতে চায়। অচেনা ও অপরাজিত কবিতা দু'টিতে প্রেমের যে প্রেরণা, তা বলিষ্ঠ ও সুস্থ, সৌন্দর্য ও শক্তির উপাসক। মহুয়ার এ ধরনের কবিতাগুলির প্রাণরস সত্য ও শুচি। নির্ভয় কবিতায় প্রেমের দুর্বল ভাববিলাসকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রেমিকযুগল প্রেমের শক্তির সাহায্যে দুঃসহ ব্রত গ্রহণ

ক'রে জীবনের সব দ্বিধা জয় করবে। প্রেমই তাদের পাথেয়। প্রেমিকের জীবনে সর্ববৃহৎ সত্য—যুগ্ম সত্তার অস্তিত্ব। প্রেমের ক্রিয়াশীলতার অভিব্যক্তি পথের বাঁধন কবিতায় আরও বেশী। সংরক্ষণ প্রয়াসের প্রতি প্রেমিকরা উদাসীন। তারা ঘর না বেঁধে সমস্ত জীবনে চলার আনন্দ লাভ করতে চেষ্টা করবে। তাদের পারস্পরিক যোগ ও পরস্পরের অগ্রগতিতে সহযোগিতা জীবনের প্রধান ধর্ম। তাদের জীবনের মুহূর্তগুলি আবেগে রঙিন কিন্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। সাধারণ জীবনের সহজাত-উদ্ভূত প্রাণচাঞ্চল্য প্রেমিকদের প্রাণবন্তের প্রধান সম্বল—হঠাৎ-আলোর ঝলকানি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপরিবেশ এই বলিষ্ঠ প্রেমাদর্শের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন আকস্মিক প্রকৃতি-প্রেরণাই এর জন্যে যথেষ্ট। কবির নিজের ভাষায়:—

রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,…
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।…
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত॥

কবির স-মনোযোগ সাধনা সত্ত্বেও তাঁর শেষ বয়সের প্রেমের কবিতাগুলিতে প্রথম যৌবনের সোনার তরী, চৈতালি ও কল্পনার মত রসোচ্ছ্বাস ও রাগরঙ্গ নেই; দায়মোচন, সবলা প্রভৃতি কবিতায় যুক্তিবাদী ভাববিন্যাসের প্রভাবে রসমাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সবলা কবিতাটিতে এই দুর্বলতা স্পষ্টতর। দায়মোচন কবিতার প্রেমাদর্শে ইংরেজ কবি Donne ও Browning-এর প্রভাব লক্ষণীয়। অনেকটা "শেষের কবিতা" উপন্যাসে অমিতের প্রতি লাবণ্যের উক্তির সঙ্গে তুলনীয় এই কবিতার মর্ম। এই প্রেমাদর্শ বাঙালী হিন্দু সমাজে কতকটা অভিনব বটে। কিন্তু ইঙ্গবঙ্গ সমাজে এই ধরনের মনোভাবের দ্রুতসঞ্চার বিকাশ বেশ স্বাভাবিক। এই সব কবিতাকে রসোত্তীর্ণ বলে মনে করতে হ'লে চমৎকার মনস্তত্ত্বের অবতারণায় নিছক কাব্যের প্রত্যাশা সঙ্কুচিত করা আবশ্যক। এ সব কবিতায় যুক্তির দীপ্তি যতটা উজ্জ্বল, আবেগের প্রাবল্যশক্তি সেই অনুপাতে বিরল। তার ফলে কাব্যোৎকর্ষ অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তা ছাড়া,

আসা যাওয়া দু দিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।

এই মনোভঙ্গির মধ্যে ভারতীয় সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সংযোগের অভাব স্পষ্ট। যাওয়ার রাস্তা অবশ্যই খোলা থাকবে, কিন্তু আবার আসার রাস্তা কোন সমাজেই সহজে খোলা যায় না, যাওয়ার অনুমতি সহজে দিলেও ফেরার অনুমতি দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভবপর কি না, ভেবে দেখার বিষয়। নায়িকাকে মোহ-মুক্ত বিশ্লেষণী বুদ্ধির পরিচয় দিতে দেখা যাচ্ছে। পরবর্তী পংক্তির সমাবেশে কাব্যরস শুষ্কতাপ্রাপ্ত, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথম কলিতে লাবণ্য ও কমল চরিত্রের পূর্বাভাষ স্পষ্ট। আসলে একটি গদ্য কবিতার আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। বাক্যবিন্যাস ঐ প্রতিজ্ঞার উপযোগী আর তাকে পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে চয়ন-করা। "সত্য যা দিয়েছিলে" ইত্যাদি উক্তি নীতিগত বটে, কিন্তু কাব্যের সহজ উদ্ভাবন নয়। কবির নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিই হয়ত এখানে হয়েছে, ঠিক নীতিকথা শোনাতে তিনি চান নি। হতাশাকে জয় করেছে যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা তার আভাস পেতে পাই, কিন্তু কাব্যলোকের পরিচয় নেই।

সবলা কবিতায় নারীর বলিষ্ঠ সত্তার আত্মপরিচয় প্রদান উপলক্ষে বেশ অভিভাষণের কিছু পরিচয় দেখা যায়। ক্ষাত্র-সৌন্দর্যদীপ্ত প্রেমের ছবিতে একটু বেশী বর্ণসমাবেশ হয়ে গেছে। অন্ধকার থেকে কবিতায় যেতে যে সন্নিহিতি দরকার তা সমাবিষ্ট করা কঠিন। হঠাৎ অন্ধকার থেকে কবিদের প্রবর্তনা অস্বাভাবিক। সিন্ধু-পরিবেশের অকস্মাৎ প্রবর্তনা এই দোষে দুষ্ট। বেশ কয়েক জায়গায় কবিদের কষ্টকল্পনাগত প্রয়োগ দেখা যায়। জলদ-গর্জনোচ্ছ্বাসে মিলনের বিজয়ধ্বনি ঢাকা পড়ার কথা, দিগন্তের বক্ষে বিদীর্ণ হবার কথা নয়। ক্লান্তৈশ্বর্য শব্দটি বাংলা বাগ্‌ভঙ্গিতে অস্বাভাবিক। দুর্বার, দুর্জয়, দুর্ধর্ষ ইত্যাদি শব্দের অতি-প্রয়োগ কবিতার পক্ষে অবাঞ্ছনীয় ত বটেই, বলপূর্বক শক্তিপ্রকটনের আয়াস হাস্যকর মনে হয়। রুদ্র বীণা মুদ্রাদোষের আভাস দেয়। অপরিমিত শব্দটিও নিষ্প্রয়োজন। কবিতাটিতে মানসিক ও বাচনিক—দু' রকম আড়ম্বর-প্রিয়তার পরিচয় দৃষ্টিকটু। ইংরেজিতে যাকে bombast

মহিলাকে গ্রহণ করা নিয়ে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের একটা চাপা গুঞ্জন উঠেছিল। এই গুঞ্জন ধ্বনি যতটুকু নরেনবাবুর কানে পৌঁছাল তার চেয়ে ঢের বেশী শুনতে হ'ল রত্নার মাকে। তিনি রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন।

জানতে পেরে এগিয়ে এলেন নরেনবাবু। বললেন, ওদের দোষ নেই রমা। আরও বহু যোগ্য মেয়ের আবেদন-পত্র বাতিল ক'রে দিয়ে তোমাকে নিয়োগ-পত্র দেওয়ায় ওদের ক্ষুব্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নিজের কথা ভেবে একটু স্বার্থপরের মত কাজ করেছিলাম। হয়ত চিরদিন আমি নিজের কাছেও অপরাধী হয়ে থাকতাম। কিন্তু তুমি বাঁচিয়েছ আমার নির্বাচনের মর্যাদা দিয়ে। বুঝলে রমা, ঠিক এমনি ক'রে মুখ বুজে থেকে কাজ করে ওদের বুঝিয়ে দাও যে আমার নির্বাচনে কোন ভুল হয় নি। পারবে না?

খুব পারব। আপনি শুধু আশীর্বাদ করবেন।

সেই দিনই সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে এসে উপস্থিত হ'ল অশোক। নরেনবাবুর একমাত্র পুত্র। রত্নার মাকে প্রণাম ক'রে বলল, বাবা ঠিকই বলেছেন। আপনি হুবহু আমার ছোট পিসীমার মত দেখতে। বাবার অত্যন্ত আদরের ছিলেন তিনি। গত বছর হঠাৎ মারা গেলেন।

রত্নার মা আশ্বস্ত হলেন। পরিষ্কার মন নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন।

অশোকের কথার সূত্র ধরে একটু একটু করে নরেনবাবুর হৃদয় জয় করে নিলেন। মা ও মেয়ের জীবনের ধারা নতুন পথে এগিয়ে চলল। চতুর্দিকের গুঞ্জন ইতিমধ্যে থেমে গেছে। মেনে নেছে রমার জয়। তার ঐকান্তিক সততা ও প্রচেষ্টার জন্য সহকর্মীরা খুশী। নরেনবাবু গর্বিত।

খবরটা অশোক দিয়েছে।

রমা বলেন, তোমার বাবা দেবতুল্য মানুষ। নইলে কোথায় যে ভেসে যেতাম—

বাধা দিয়ে অশোক বলেছে, মোটেই দেবতুল্য নন ছোটপিসী। নিজের স্বার্থেই তিনি নাকি আপনাকে আটকে রেখেছেন। কথাটা কিন্তু আমার না। বাবা নিজেই শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁর বন্ধুদের বলে থাকেন।

সব কথাই রত্নার সম্মুখে হয়। আড়ালেও সে সব কথা শুনেছে। আর এই একই কথা অশোকের মুখে এত বেশী শুনেছে যে, এত বছর পরেও প্রত্যেকটি কথা সে গুণে গুণে বলতে পারে।

অশোক চলে গেলেও মা কেমন যেন অভিভূতের মত বসে থাকতেন। রত্না হেসে বলত, এই একই কথা তোমার বার বার শুনতে ভাল লাগে না?

এ কথার জবাব মা সেদিন তাকে দেন নি। হয়ত ইচ্ছে করেই দেন নি। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রত্না নিজেও বুঝেছিল যে, জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে যা শুধু অনুভব করা যায়, কথা দিয়ে বোঝান যায় না।

রত্নাও একদিন অনুভব করল। অনুভব করল যেদিন তার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশের খবর নিয়ে অশোক হাসিমুখে তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

মা আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেললেন। রত্না আস্তে আস্তে বলল, তুমি খুশী হয়েছ অশোকদা?

বিলক্ষণ! আমি খুশী হব না ত কে হবে! আর খুশী হয়েছি বলেই এটা তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।

রত্না এতটা আশা করে নি। সে মা'র মুখের পানে তাকাল। রমাও একটু চমকে উঠলেন। বললেন, তুমি খুশী হয়েছ তাই যথেষ্ট। আবার এতগুলো টাকা খরচ করে এটা আনতে গেলে কেন? না অশোক, কাজটা তোমার ভাল হয় নি।

অশোক এত কথার পরেও সহজ কণ্ঠে বলল, টাকা অনেকগুলি নয় ছোটপিসী। এটা আসল নয়—কালচার্ড পার্ল। তা ছাড়া আমি যদি ওর মায়ের পেটের দাদা হতাম কি করতেন আপনি?

রমা আর্তনাদ ক'রে ওঠেন, অশোক—

অশোক চমকে উঠল। রমা মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। লজ্জিত হয়ে বললেন, ভাবতেও ভাল লাগে অশোক কিন্তু কথাটা আমরা বুঝলেও সকলে বুঝবে না।

রত্না এতক্ষণ চুপ করে ছিল। মা'র শেষ কথাটায় সে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, আর কারুর বুঝে দরকার নেই অশোকদা। আমরা দু'জন বুঝে থাকি সেই ঢের।

ছোঁ মেরে অশোকের হাত থেকে মালাগাছি তুলে নিয়েছিল রত্না। বলেছিল, আজকের কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে। তোমার দেওয়া এবং আমার নেওয়াকে উপযুক্ত মর্যাদা দেব এ কথা তোমরা বিশ্বাস করতে পার অশোকদা।…

আর এই মর্যাদা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় দিতে গিয়েই রত্না তার নিজের সংসারে অকারণে এক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। পাছে তার আত্মবিশ্বাসের সৌন্দর্য অবিশ্বাসের স্পর্শে অশুচি হয়ে যায় এই আশঙ্কায় সে সত্য কথাটা বলতে পারে নি। রত্নার মনের আসল চেহারাটা অপরের চোখেই পড়বে না এই চিন্তা করেই সাবধানে অশোককে স্বামীর দৃষ্টি পথ থেকে দূরে রেখেছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা ত হ'ল না।

তাই আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে রত্নাকে।

যেকথা এতদিন সে প্রকাশ ক'রতে পারে নি আজ আর সেকথা বলা চলে না। স্বাভাবিক কারণেই তরুণ তা বিশ্বাস করবে না। কোন পুরুষই পারে না। অনাত্মীয় কোন যুবককে কোন তরুণী সহোদরের মর্যাদায় আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছে, একথা সংসারে কেউ বিশ্বাস ক'রতে চায় না। বিশেষ ক'রে স্বামী ত নয়ই। রত্না সবই বোঝে। অথচ সে পারে নি। একছড়া নকল মুক্তার মালাকে কিছুতেই নকল ভেবে গলা থেকে খুলতে পারে নি। প্রথম প্রথম তরুণ সূক্ষ্মভাবে রত্নাকে ঠাট্টা করেছে। ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হ'লেও এই অসম্মানকে সে মেনে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে একটা রফা করে নেয় নি। স্বামী ভুল করেছেন ব'লেই কি সেই ভুলকে মেনে নিতে হবে?

তরুণ আজ আর ইঙ্গিত করে নি, সোজাসুজি অভিযোগ করেছে। নিজের মনকে খুলে ধরেছে। বোঝা যাচ্ছে তাদের মধ্যের সম্বন্ধটা একটা বিশ্রী রূপ নিয়েছে। সময়মত সাবধান হ'লে এটা হ'ত না। শঙ্কায় আসন বুকের মধ্যে। তাকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানাতে গিয়েই রত্নাকে একটা নোংরা পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

এই মাত্র তরুণ ফিরে এসেছে। ও বেলার শ্লেষাত্মক কথাগুলির কথা মনে হ'তে রত্না নিজেকে খানিকটা গুটিয়ে নিল। কিন্তু নিজের কর্তব্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত হ'ল না। তরুণও আর নতুন ক'রে তার জের টানল না। কিন্তু দুজনেই মনে মনে অনুভব করল যে, তাদের মধ্যের ব্যবধানটুকু কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। পরিস্থিতিটা খুবই অস্বস্তিকর কিন্তু সহজ পথ কেউই খুঁজে পেল না।

অন্যমনস্ক ভাবে চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তরুণও এই কথাটাই মনে মনে চিন্তা করছিল।

বাহাদুর এসে সংবাদ দিল যে, একজন সাহেব মাইজির খোঁজ করছেন—

খানিকটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল রত্নার চোখে-মুখে। বলল, মাইজিকে না বাবুকে বাহাদুর? তুমি ভুল করনি ত?

বাহাদুর জানাল যে সে ভুল করে নি।

তা হ'লে তাঁকে···আচ্ছা থাক, আমিই দেখছি। রত্না উঠে দাঁড়াল। সদরে এসেই সে অবাক হয়ে গেল, কি আশ্চর্য! অশোকদা তুমি? কবে ফিরলে?

অশোক মৃদুকণ্ঠে বলল, গত সপ্তাহে ফিরেছি। মুখে এ কথা বললেও দৃষ্টি তার আটকে আছে ওর গলার মুক্তার মালার উপর।

রত্না বলল, কি দেখছ? ওটা তোমার দেওয়া সেইটেই। এ বাড়ীর কেউ জানে না। আমি বলি নি। কিন্তু এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে? উপরে যাবে না—

রত্না তরুণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাল। বলল, আপনার কথা রত্নার মা'র কাছে অনেক শুনেছি। অনেকদিন বাইরে কাটিয়ে এলেন। ফিরলেন কবে?

অশোক জবাব দিল, সপ্তাহখানেক হ'ল ফিরেছি। ভাবলাম দেখে আসি কেমন ক'রে সংসার করছে রত্না।

আসবেন বৈ কি অশোক বাবু—কিন্তু রত্না ওঁর চায়ের ব্যবস্থা করবে না? চা খেতে খেতেই না হয় গল্প করা যাবে।

তরুণের কথা বলার ধরনে কিছুটা যেন আশ্বস্ত হয়েছে রত্না। সকাল বেলার জের টেনে এই মুহূর্তে সে তাকে লজ্জা দেবার চেষ্টা করে নি তার জন্য স্বামীর কাছে কৃতজ্ঞ।

চা-জলখাবার বাহাদুরের হাতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেও ফিরে এসে একটা চেয়ার টেনে ব'সল। বলল, চা খেয়েই কিন্তু পালান চলবে না অশোকদা। তোমার মুখে আমরা বিলেতের কথা শুনব।

অশোক একটুখানি হাসল।

তরুণ বলল, আমিও এই কথাই ভাবছিলাম অশোক বাবু। আর যদি আপত্তি না করেন তা হ'লে রাত্রের খাওয়াটাও আমাদের সঙ্গে হ'লে খুশী হব।

অশোক এক কথায় রাজি হয়ে গেল। বলল, উত্তম প্রস্তাব। গল্প করাও হবে, রত্নার হাতের রান্নাও খাওয়া যাবে। রান্নার হাত এক সময় ওর ভালই ছিল। স্বাদ প্রায় ভুলেই গেছি।

তরুণের চোখ দুটো যেন খানিকটা দুলে গেল। হাসিটাও অর্থপূর্ণ মনে হ'ল রত্নার। ঠিক এভাবে স্বামীকে ইতিপূর্বে কোনদিন লক্ষ্য করবার কথা রত্নার মনে হয় নি। আজ কিন্তু—

আবার ধাক্কা খেল রত্না। তরুণ বলছিল, কি কি খাওয়াতে চাও তোমার অশোকদাকে। বিশেষ ক'রে যেন করো, যেন আগের চেয়েও বেশী ক'রে সুখ্যাতি করতে পারেন অশোক বাবু।

রত্না একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে বলল, তা হ'লে মেনুটা তোমাকেই করতে হয় যে। সুখ্যাতি হ'লে তোমার বাড়ীর হবে।

একথা অবশ্যই বলতে পার—তরুণ বলল, তবে তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাও থাকতে পারে ত?

রত্না জবাব দেয়, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

তরুণ একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা! রত্না বেশ বলেছে কিন্তু অশোক বাবু।

তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, বাহাদুর মার্কেট চলো। তার পরে অশোকের পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনরায় বলে, আমার ফিরে আসার মধ্যেই সব গল্প শেষ করে ফেলবেন না। ইতর জনের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে যেন।

তরুণ হাসতে হাসতে চলে গেল। অশোক না বুঝলেও রত্না স্বামীর ভাব-ভঙ্গিতে ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল। নিজের অজান্তেই তার একখানা হাত গলার মুক্তামালা-গাছাকে চেপে ধরল। কোন কারণে যদি তরুণ এই মালা-গাছা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ত' তা'র লজ্জা রাখবার আর ঠাঁই থাকবে না তা'র।

তরুণ চলে গেলেও রত্নার অস্বচ্ছন্দতার ঘোর কাটতে সময় লাগল। অশোক সব কিছুই লক্ষ্য করেছে।

আস্তে আস্তে সে ডাকল, রত্না—

কি অশোকদা—

হঠাৎ তোমার হ'ল কি ?

কিছু হয় নি ত—

খানিক চুপ করে থেকে অকস্মাৎ অশোক একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল, তরুণ কি তোমাকে শ্রদ্ধা করে না রত্না ?

রত্না ঠোঁট বেঁকাল, এ কথা কেন অশোকদা!

অশোক সহজ ভাবে জবাব দিল, হঠাৎ কি মনে হ'ল তাই। আচ্ছা রত্না, আমি বিলেত থেকে অতগুলি চিঠি দিলাম, অথচ একটারও জবাব দিলে না কেন ?

রত্না আকাশ থেকে পড়ল, চিঠি পেলে ত জবাব দেব ? মামা বাবুও তোমার ঠিকানা দিতে পারলেন না।

অশোক গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, পারলেন না কথাটা ঠিক হ'ল না। তিনি দিলেন না। আমার চিঠিও না— ঠিকানাও নয়। কিন্তু তুমিও কি আমাকে জানতে না রত্না, তুমি কেন অপেক্ষা করতে পারলে না ?

রত্না ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেও বাইরে একটুকু প্রকাশ পেল না। সে সহজ ভাবে জবাব দিল, তুমি অদ্ভুত হেঁয়ালী করছ অশোকদা। তবে আমার কথাটা বললে বলেই বলছি, তোমাকে না জানলেও নিজেকে আমি ভাল করেই জানতাম তাই কারণও আগ্রহ দেখাইনি। ভয় ছিল ভুল বোঝার। অকারণে পায় কাদা লাগাতে আমি কোনদিন চাই নি।

অথচ আজও তোমার গলায় ঐ সাধারণ নকল মুক্তার মালাটা—

বাধা দিল রত্না, অসাধারণ ভেবেই গলায় পরেছিলাম। একদিনের জন্যও গলা থেকে খুলতে পারি নি। এর জন্য প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অনেক লাঞ্ছনা আমাকে সইতে হয়েছে—

দুঃখের কথা তুলে নিয়ে অশোক বলে, তবুও মালাটা ফেলে দিতে পার নি। কিন্তু কেন ?

তোমার কি মনে নেই আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে ?

কি কথা ?

তোমার দেওয়া আর আমার নেওয়ার কোনদিন অসম্মান হ'তে দেব না—

পড়েছে মনে।

রত্না বলতে থাকে, অপরে যদি না বোঝে আমার বলবার কিছু নেই কিন্তু তুমি কেন ভুল করবে অশোকদা!

অশোক বলে, কোনটা ভুল আর কোনটা সত্য তা যখন আমার কাছে ধরা পড়ল, তখন কোন কথা গোপন না করে বাবার কাছে নিজেকে প্রকাশ করলাম। তিনি মন দিয়ে শুনলেন। উৎসাহ দিলেন না বটে তবে নিরুৎসাহও করলেন না। বললেন, সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন তোমার নিজের পায় দাঁড়ান। আগে দাঁড়াও তার পরে সাহায্য চেও। কথা দিচ্ছি, না করব না। কিন্তু তুমিও আর মুখ খুলতে পারবে না।

কথা দিতে হ'ল বাবাকে। চলেও গেলাম বিদেশে। এইখানেই আমার ভুল হ'ল রত্না। বাবা ঠাণ্ডা মাথায় নিজের প্ল্যান মত কাজ করে গেলেন। আমাকে কিছু বুঝতেও দিলেন না। কিন্তু তুমি রত্না বাধা দিলে না কেন ? তুমি কেন জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া এই বিয়েকে মেনে নিলে।

আর এগোতে দেওয়া সঙ্গত হবে না। রত্না এতক্ষণে শক্ত হয়ে বসল। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, এতক্ষণে তোমাকে ভাল করে বুঝতে পারলাম। কিন্তু তোমার এত কথার একটা মাত্র উত্তরই আমার জানা আছে, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার উপর জোর করে কেউ কোন কিছু চাপিয়ে দেয় নি। আর একটা অনুরোধ এ সব আলোচনার যেন এখানেই শেষ হয়, আর…ঐ যে উনিও এসে পড়েছেন।

অশোককে বাধ্য হয়েই থামতে হল।

সারাদিনের আগুন-ঝরা গরমের পরে বিকেল থেকেই একটু একটু মেঘ জমতে সুরু ক'রেছিল। এখন তা কাল হয়ে আকাশ ছেয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আয়োজন বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি। যতটুকু হয়েছে তাইতেই রাত দশটা হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে আরও এক ঘণ্টা। ইতিমধ্যে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। রত্না

ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তরুণ নির্লিপ্ত। একটু বেশী রকম নির্লিপ্ত।

ঘড়ির কাঁটা প্রায় রাত বারটায় পৌঁছে গেছে। তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। অশোক বারে বারে ঘড়ি দেখছে।

তরুণ বলল, থেকে যান অশোক বাবু।

অশোক একটু কিন্তু করে বলে, থেকে যেতে বলছেন? কিন্তু…অশোক রত্নার দিকে মুখ ফেরাল।

তরুণ বলল, আমাদের আলাদা কোন ঝঞ্ঝাটও নেই। রত্নাও আমার কথায় সায় দেবে।

থেকে গেল অশোক। কিন্তু বিছানায় শুয়ে তার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সে উঠে অনেকক্ষণ ধরে পায়চারী করে এক সময় দরজা খুলে ভিতরের বারান্দায় এসে উপস্থিত হ'ল। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে।

রত্নার ঘরের দরজাও সেই সময় খুলে গেল। রত্না বার হয়ে আসতেই কতকটা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে অশোক বলল, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। ভাবলাম যদি কোন চাকর-বাকর—

বাধা দিয়ে রত্না বলল, ঘরে যাও, দিয়ে আসছি। এ সময় কি চাকর-বাকর কেউ থাকে?

রত্না নিজের ঘরে ফিরে এল। একবার স্বামীর সুপ্ত মুখের পানে চেয়ে দেখে নিজের জলের জগ আর গ্লাস নিয়ে সে অশোকের কাছে ফিরে এল। টেবিলের উপর জল আর গ্লাস রেখে চলে যাচ্ছিল রত্না।

অশোক পিছু ডাকল।

রত্না ঘুরে দাঁড়াল।

আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও রত্না।

রত্না শান্ত কণ্ঠে বলল, উত্তর দেবার সত্যিই কিছু আছে কি অশোকদা?

ঘরে নীল আলো জ্বলছে। বাইরে তখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। অশোকের দু'চোখ জ্বলছে। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে রত্নার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করছি আবারও [illegible] তোমার [illegible] কেন। এত ব্যবধান [illegible] নয়?

রত্না [illegible] সে [illegible] অশোকের হাত [illegible], আর চোখে [illegible] কিন্তু অশোক নিজেকে [illegible] মাথা [illegible] "[illegible]" গুলি না

তরুণ [illegible] আমি [illegible] ফেলে [illegible]

অশোক ডাকল, রত্না—

কোন কথা নয়, তুমি এ বাড়িতে [illegible] থাকলেও আর কোনদিন আমার [illegible] আর পারবো না। এগুলি চলে যাও।

রত্না আর দাঁড়াল না। দ্রুত ঘর থেকে বার হয়ে গেল। কিন্তু নিজের ঘরে এসে সে একেবারে ভেঙে পড়ল।

অশোক [illegible] ভোর হয়েছে। [illegible] চাপে [illegible]

[illegible]

তরুণ [illegible] সবই সে জানে। [illegible] উঠে এসে স্ত্রীর মাথার উপর একখানি হাত রেখে গভীর কণ্ঠে ডাকল, রত্না—

রত্না মুখ তুলে [illegible] বলে, তুমি আমায় ক্ষমা করো—

প্রশান্ত হেসে তরুণ বলে, কতদিন আমিও একথা ভাবছিলাম। ভুল কি আমিও কম করেছি রত্না…

•—•—•

অবসরত শিল্পী

শিল্পী মণীন্দ্রনাথের শিল্পকলা

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

শিল্প যদি আত্মপ্রকাশ ঘটায়, শিল্পে যদি শিল্পী আপনাকে প্রকাশ করেন তা হ'লে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, শিল্প-মাধ্যমে শিল্পী আপনার সমস্ত চারিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন। আর এই শিল্পী চারিত্রের বৈশিষ্ট্যটুকু শিল্পে প্রকট হয় বলেই শিল্প সৃষ্টিতে এই বিপুল বৈচিত্র্য, সেই বৈচিত্র্যের আবার দেখা মেলে একই শিল্পীর বিভিন্ন শিল্পকর্মে, কেননা তারা শিল্পীর, শিল্পী-মানসের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিক্রিয়াটুকু ধরে রাখে। তরুণ শিল্পী মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছবি দেখে এই বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছিলাম। এ সত্যটুকু পরম বিস্ময়ের যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী চিত্রকলা একই শিল্প-মানস থেকে উদ্ভূত হয়। শিল্প-পদার্থ নানান রূপ, কোথাও তা আকাশ-নীল, কোথাও বা তা সমুদ্র-নীল; কখনও তাতে গৈড়ি মাটির রং লাগে, কখনও আবার তা গেরুয়ার বৈরাগ্যে লাঞ্ছিত হয়; কখনও তা নৃত্য-চপল, কখন তা নৃত্য-চঞ্চলা, আবার কখনও তা শান্ত গাম্ভীর্যের ধৈর্যে মন্থর। শিল্পের এই বিচিত্র বৈভব সৃষ্টি সম্ভব হয় আত্ম-শিল্পীর হাতে। আজ যাঁর কথা আলোচনা করছি সেই মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই আত্ম-শিল্পীদের একজন।

শিল্পকর্ম দেবশিল্পের [illegible]—এ তত্ত্ব আমাদের দেশে সুপরিজ্ঞাত। এই তত্ত্বের অন্তরে যে বিরোধটুকু আছে সে বিরোধটুকু উল্লেখ করেছিলেন প্লেটো তাঁর 'Mimesis' তত্ত্বে। শিল্প যদি মাত্র প্রকৃতির অনুকৃতি হ'ত, তা হ'লে শিল্পের কোন আত্যন্তিক মূল্য থাকত না, পৃথিবী জুড়ে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে যে সব বাস্তব চিত্র আঁকা হয়েছে তাদেরও কোন মূল্য থাকত না। শিল্পী মণীন্দ্রনাথের আঁকা 'কেদারনাথ' মন্দিরের অনবদ্য চিত্রখানিও ব্যর্থ হয়ে যেত। মণীন্দ্রনাথের বাস্তবানুগ এই চিত্রকর্মটি একদিকে যেমন শিল্পরসিককে আনন্দ দেবে, অন্যদিকে ভক্ত হৃদয়ে আনন্দপ্রস্রবণ উদ্বোধিত করে দেবে। যাঁরা তুষার-লোকের এই পবিত্র তীর্থস্থানটি দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা শিল্পীর আঁকা এই ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে সচকিত হয়ে উঠবেন। কি গভীর বাস্তববোধ, কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি থাকলে এই ধরনের শিল্প সৃষ্টি করা যায় তা রসিক-জন মাত্রই সহজে

অনুধাবন করতে পারবেন। তত্ত্বদর্শনের ভাবানুভূতিটুকু বাদ দিয়ে একথা বলা যায় যে, মণীন্দ্রনাথের এই শিল্প-কর্মটুকু সার্থক হয়ে উঠেছে দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনার প্রসাদ-গুণে। তেল-রঙে আঁকা এই ছবিটি এমন এক বাস্তবতার দাবী রাখে যা সহজে বস্তু-জগতকে অতিক্রম করে গেছে। শেষ নাগের চিত্রটিও অতীব মনোরম; হয়ে যাওয়া হ্রদের জল, বরফে ঢাকা পাহাড়, তার

কেদারনাথ
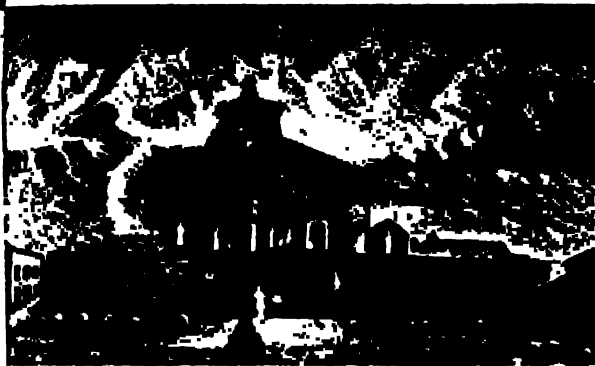
উত্তুঙ্গ শিখরশ্রেণী এমন একটি অর্থ ও ব্যঞ্জনার দ্যোতনা ঘোষণা করে যা সাধারণ শিল্পকর্মে অলভ্য। পাহাড়ের চূড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় তারা যেন জীবন্ত, তারা যেন প্রাণবন্ত, একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা উঁচু করে দিয়ে তারা যেন দর্শকের মনকে আকর্ষণ করতে চাইছে। এই ছবিটি দেখে মহাকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-বর্ণিত 'Craggyhill'-এর কথা মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে যায় সূর্যের আলোক-পথ-রোধকারী ক্রমবর্ধমান বিন্ধ্য পর্বতের কথা। গতির কি দুর্নিবার ব্যঞ্জনা এই ছবিটিকে ঘিরে রয়েছে।

'শেষ-নাগ' চিত্রে এই দুর্নিবার গতির বৈপরীত্যটুকু লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীর আঁকা 'ডাল হ্রদ' ছবিটিতে কি শান্ত মহিমা ভোরের আকাশটুকু ঘিরে রেখেছে; তার অনাবিল আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে হ্রদের শান্ত জলে। পাহাড় স্তব্ধ হয়ে নিঃস্তব্ধ সঙ্কেতে তার ছায়াটুকু জলে বিছিয়ে দিয়েছে। ফুলওয়ালার শিকারা যেন হঠাৎ থেমে গিয়েছে; চতুর্দিকের একটি শান্ত গভীর পরিবেশে শিল্পী তেলরঙের যাদুতে যে গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন তা অনন্যসাধারণ। ছবির গভীরতা বা Depth শিল্পরসিকের দৃষ্টিকে এমন একটি সমগ্রতা দেয় যা আধুনিক শিল্পকর্মের অধিকাংশ দৃষ্টান্তেই একান্ত দুর্লভ।

শেষনাগ

এই শৈল্পিক গভীরতা মণীন্দ্রবাবুর আঁকা অন্যান্য ছবিতেও পাওয়া যাবে। প্রথাগত রঙের ব্যবহার না করে শিল্পী অপ্রচলিত বর্ণ-সমন্বয়ের মাধ্যমে হিমালয়ের তুষারমৌলি শৃঙ্গমালার যে ছবি এঁকেছেন তাকে অভিনন্দিত না করে পারা যায় না। সমতলভূমির সবুজের

কৈলাস মানস সরোবর

আবেষ্টন থেকে আরম্ভ করে শূন্যচারী ভাসমান মেঘমালার আমন্ত্রণ এ সবই একটি ছোট্ট 'ক্যানভাসে' এক অপূর্ব সজীবতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আকাশে তখন গভীর

রোদের খেলা, তার বর্ণাভা, সাদা বককে রজতমহিমা দিয়েছে। বিস্মিত মন এই খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে এক সামগ্রিক সৌন্দর্যের সমুদ্রে ডুব দেয়। কলা-রসিক আপনাকে হারিয়ে ফেলে এক বৃহত্তর সৌন্দর্য-চেতনার মধ্যে। শিল্পী মণীন্দ্রনাথের সার্থক তুলি এটুকু সম্ভব করে তুলেছে।

ব্যবহারিক জীবনের প্রকৃতির খুঁটিনাটিগুলোকে শিল্পকর্মে যথাযথভাবে সংস্থাপন করতে পারলে তবেই যে শিল্পমূল্যের ব্যত্যয় ঘটায় না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে শিল্পীর আঁকা সিকিম রাজ্যের বনস্থলীর একটি দৃশ্যে। মহামহীরূহ বৃহৎ বনস্পতি, তাদের সদ্য-আন্দোলিত শাখা-পল্লব এক বিচিত্র রহস্যের সৃষ্টি করে। পাতার ফাঁক দিয়ে উপচে-পড়া রোদের ভগ্নাংশ বনের অন্ধকারে

ভালহ্রদ
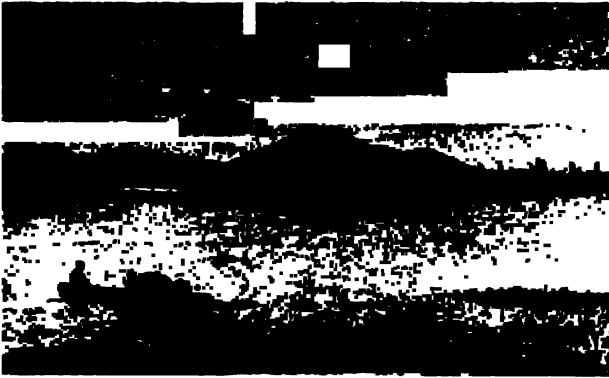
আলোছায়ার আলপনা সৃষ্টি করেছে। সন্ন্যাসী মানুষের আবির্ভাব সেখানে ঘটেছে। প্রকৃতির অরণ্য পটভূমিতে শিল্পী দুটি সন্ন্যাসী মানবমূর্তিকে সংযোজিত করেছেন। এর ফলে হারমান-কথিত হিংস্র বনভূমির নিরুদ্ধতা দূরীভূত হয়েছে। রসিকের দৃষ্টি প্রকম্পিত ও আপনাকে প্রসারিত করে দিয়েছে বনভূমির দূরতম প্রদেশে, নির্জন সঙ্গ নিয়েছে ঐ দুটি চলমান মনুষ্যমূর্তির।

কৌণিক এবং জ্যামিতিক আকারকে পরিহার করে প্রথাগত পন্থায় এ যুগেও যে উৎকৃষ্ট শিল্প রচনা করা যায় তার নিদর্শন রয়ে গেছে শিল্পী মণীন্দ্রনাথের শিল্পে। বাংলা দেশের সুপ্রাচীন লোক-শিল্পের আঙ্গিকটুকুকেও তিনি ব্যবহার করেছেন নিপুণ হাতে। পটুয়াদের তুলি মণীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অনায়াসে ব্যবহার করেছেন তাঁর সহজ সাবলীল সৃষ্টির ছন্দে। 'রথ', 'নাগরদোলা' প্রভৃতি ছবিতে তিনি পটুয়া-আঙ্গিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই দুখানি ছবিতে ভাবের বাহন যে আঙ্গিক তার চর্চা এ দেশে আবার নতুন করে শুরু হওয়া দরকার। সৃষ্টিশীল শিল্পীর রেখার যাদুতে বাংলার লোকশিল্পের যে বিপুল উদ্বোধন ঘটতে পারে তার দৃষ্টান্ত মণীন্দ্রনাথের এই দুটি শিল্পকর্মে সুপ্রকট। নতুন শিল্পাঙ্গিক, নবতর শিল্পধারণা নিশ্চয়ই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে না; যদি করে, তবে তা শিল্পের অপমৃত্যুকে ঘোষণা করবে। শিল্পী মণীন্দ্র-নাথের শিল্পকর্মে আমরা এই শিল্প-ঐতিহ্যের যোগসূত্র-

কাঞ্চনজঙ্ঘা—সূর্যোদয়
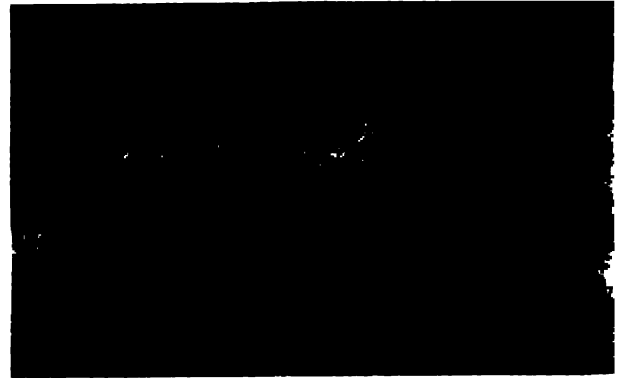
টুকুকে আবিষ্কার করেছি। ঐতিহ্য-আশ্রয়ী প্রথাগত পথে চলেও তিনি মামুলি রং তুলির ব্যবহারকে অতিক্রম করেছেন; নব নব সৃষ্টির তীর্থপথে তিনি আপনার শিল্প-দৃষ্টিকে যেভাবে প্রসারিত করে দিয়েছেন তা সত্য সত্যই রসিকজনের কাছে প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা মণীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ বর্ণসঙ্গতি, তাঁর সাবলীল অঙ্কন-আঙ্গিক ও তাঁর ঐতিহ্য আশ্রয়টুকুকে প্রশংসনীয় বলে মনে করি। প্রথাকে তিনি অনায়াসে লঙ্ঘন করেছেন যেখানে সে প্রথা অবশ্য-লঙ্ঘনীয় বলে তাঁর মনে হয়েছে, সেখানে তিনি ভাগ্নারের, ব্রাঁকুসির অনুপন্থী। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে শিল্পীর দেখাটাই বড় কথা

আর শিল্পীর সেই রেখার কারুটুকু নিত্যনিরত চলে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণোদয়' শীর্ষক ছবিটিতে আমরা শিল্পীর এই দর্শন-মাধুর্টুকু প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হয়েছি। দূরে ও পাশে সাদা বরফে ঢাকা শৃঙ্গমালার সমুন্নতশিখা, তার কোলে পেঁজা তুলোর মত উড়ে-আসা খণ্ড মেঘের মেলা; আর এপাশে রংবেরংয়ের ফুল-ছাওয়া পাহাড়ী গাছের সারি; দূরের মাঝে ঢেউখেলানো কালো পাথরের ব্যবহার এমন একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্ররূপ সমাবৃত করেছে যা অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ধরনের শিল্পকর্মে রংতুলির অন্তরালে শিল্পীর মন দৃষ্টিটুকু মুখ্য হয়ে ওঠে। আর তা হয় বলেই শিল্পকর্মটুকুও অনবদ্য হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়।

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(৫) ছন্দহারা

সঙ্গীতে যাঁর ছন্দ-নৈপুণ্যের সীমা ছিল না, ছন্দো-বৈচিত্র্যের জন্যে যিনি অভিনন্দন লাভ করতেন আসরে আসরে, তাঁরই জীবনে ঘটল এমন ছন্দ-পতন! রাগসঙ্গীতের এত বড় গুণী, ছন্দকৃতিতে যাঁর তালজ্ঞানের সুষম বিকাশ রস-মাধুর্যের সঙ্গে শিল্প-পটুত্বের সমন্বয় করত তাঁর জীবনেই তাল-ভঙ্গ হ'ল!

অন্য কোন শিল্পীর সরল রেখার জীবন নয়। সেকালের এক খ্যাতনামী নটীর আন্দোলিত জীবন। বর্ণালী বর্তমানই তার সর্বস্ব। ভবিষ্যৎ অ-দৃষ্ট, অতীত অদৃশ্য। ইহ দিনের উচ্ছ্বসিত দ্যুতি সেখানে অনন্ত সুখের মরীচিকা সৃজন করে। আর সেই জমাট আসরে অকস্মাৎ যেন উর্বশীর তালভঙ্গ!

কলাবতীর আলো-আঁধার জীবন। জানা-অজানার বর্ণ-ছায়াময় রহস্যে ঘেরা। পাদ প্রদীপের সামনে স্ব-প্রকাশ এবং যবনিকার অন্তরালে নেপথ্যচারী।

সে নটীর জীবনের বেশি অংশই অপরিচয়ের আবরণে ঢাকা। শুধু বিদ্যুৎ চমকে বজ্রদীপ্তির মতন ক'টি মাত্র অধ্যায় উদ্ভাসিত দেখা যায়। কিন্তু সেই বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পর্বের সাহায্যে তাঁর জীবন কাহিনী সম্পূর্ণ হয় না। তবে সেই খণ্ডিত জীবনই ভাস্বর হয়ে আছে নানা নাটকীয়তার সঙ্গে।

তাঁর জীবনের মধ্য মধ্যাহ্ন এবং বিশেষ করে সকাল সায়াহ্নের অন্তরাগ কথার বিচ্ছিন্ন বিবরণ জানা যায়। আর সেই সঙ্গে ঊষাকালের সামান্য আভাস।

শিল্পী জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই যশের স্বর্ণমুকুট তিনি লাভ করেন। মধ্য পর্বে অর্থ ও প্রতিপত্তির অজস্র দাক্ষিণ্য এবং গুণী ও সঙ্গীতরসিক মহলে প্রতিভার স্বীকৃতি। সেদিক থেকে জীবনে সার্থকতা এসেছিল। কারণ সাধারণ নটীর জীবন নয়। নিছক রূপজীবিনী বলা যায় না, কারণ রূপ ছিল না আদৌ। পেশা ছিল সঙ্গীতচর্চা। তবে সে কলাবতী সঙ্গীত-সাধিকার জীবন সমাজ শাসনের বহির্ভূত, অসামাজিক। সুতরাং পূর্ব জীবন অজ্ঞাত। উর্বশীর রূপ-জন্মের মতন তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রস্তুতি বা সাধনার পর্বের মতন তাঁর প্রথম জীবনও ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

নাম যাদুমণি। বাঙালী বাঈ শ্রেণীর মধ্যে এত সুপরিচিত নাম সে যুগে আর দ্বিতীয় ছিলনা। কণ্ঠ-সঙ্গীতে বহুমুখী প্রতিভার আধার যাদুমণি। খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরিতে পারদর্শিনী। তেমন আসর জমে এসরাজও শোনাতেন। উপরন্তু নৃত্য পটিয়সী। ভাব প্রদর্শন করে (তাও বাথজাবার সঙ্গে) নৃত্য পরিবেশন করতেন সুষম ছন্দে। এবং সে সবই রীতিমত শিক্ষার ফলে সম্ভব হয়েছিল, অশিক্ষিত-পটুত্বে নয়। আর সে শিক্ষা পেয়েছিলেন তখন তারস্বর্গের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণীর কাছে। যেমন, কালীপ্রসাদ মিশ্র, জগদীপ মিশ্র, সারদা সহায় প্রভৃতি।

বেতিয়া ঘরাণার গুরুপ্রসাদ মিশ্র উনিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ ও সুপরিচিত গায়ক। কাশীর লোক হলেও দীর্ঘকাল তিনি কলকাতায় বাস করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিবনারায়ণ মিশ্রের সঙ্গে এবং বাংলা দেশেই তাঁর সঙ্গীত-জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়েছিল, বলা যায়। তাঁর বেশির ভাগ শিষ্যও গঠিত হয় বাংলায়। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও উত্তরাধিকারী। তা ছাড়া, খেয়াল-গায়ক শশিভূষণ দে (অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র প্রথম সঙ্গীত-গুরু), গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও গুরুপ্রসাদের কাছে শিক্ষা করেছিলেন। মিশ্রজীর অন্য এক খ্যাতনাম্নী শিষ্য হলেন যাদুমণি। বেতিয়া ঘরাণা ধ্রুপদের ঘর, কিন্তু গুরুপ্রসাদ খেয়াল গানের সাধনাও রীতিমত করেন এবং তাঁর শিষ্যদের খেয়াল অঙ্গেও শিক্ষা দিতেন। কোন কোন খেয়াল গান সঙ্গীতের আসরে চিহ্নিত ছিল গুরুপ্রসাদের ঘরের ব'লে। যেমন, ইমনের সেই বিখ্যাত গানখানি—'সহেলি সহেলি নদীয়া তারি আরি।' যাদুমণি তাঁর কাছে প্রধানত খেয়ালই শিখেছিলেন। এই গানটিও তিনি পেয়েছিলেন ওস্তাদের কাছে। গানটি যাদুমণির একটি প্রিয় গান ছিল, অনেক আসরে গেয়েছেন এবং শেষ জীবনের কয়েকজন ছাত্রকে শিখিয়েছেনও। তাই পরে একদিন তাঁর এক ছাত্রের মুখে 'সহেলি সহেলি' গানখানি শুনে সেকালের আলফ্রেড থিয়েটারে হিন্দী নাটকের সঙ্গীত-পরিচালক বন্দে খাঁ বলেন—এ ত গুরুপ্রসাদের ঘরের গান। তেমনি, খেয়ালগুণী রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একদিন গানটি শুনে বলেছিলেন—এ যাদুমণির গান।

যাদুমণি নিতান্ত বালিকা বয়সে গুরুপ্রসাদের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন।

গুরুপ্রসাদের কাছে গান শেখবার সুযোগ যাদুমণি কিভাবে পেলেন, সে কৌতূহল-উদ্দীপক কাহিনী তাঁর প্রথম জীবনের কথায় জানানো হবে।

যাদুমণির দ্বিতীয় সঙ্গীত-গুরু জগদ্দীপ মিশ্র। পশ্চিমাঞ্চল থেকে এমন বহুমুখী গুণী বাংলা দেশে বেশি আসেন নি। তিনি ছিলেন একাধারে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ও ঠুংরির একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক, উপরন্তু নৃত্যবিদ। ঘটনাচক্রে কলকাতায় তাঁর শেষ পর্যন্ত থাকা সম্ভব হয় নি এবং যাদুমণি ভিন্ন অন্য বিশেষ কেউ তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগও বোধ হয় পান নি। কলকাতায় তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত-জীবনের প্রসঙ্গ বিশেষ করে বলা হবে 'সঙ্গীতের দীপশিখা' নামে অধ্যায়টিতে। এখানে শুধু বলে রাখা যায় যে জগদীপ মিশ্রের কাছে যাদুমণি টপ্পা, ঠুংরি যেমন শিখেছিলেন, তেমনি নৃত্যও কিছু শিক্ষা করেছিলেন। যতদূর জানা যায়, জগদীপ ছিলেন যশো-জজির।

যাদুমণির আর একজন সঙ্গীতগুরু ছিলেন বারাণসীর গুণী ধ্রুপদী সারদাসহায় মিশ্র, এ কথাও কোন কোন মহলের ধারণা। সারদাসহায়ের অন্য দুই ভ্রাতার সঙ্গেও বাংলার সঙ্গীত জগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—তাঁরা হলেন গোপাল প্রসাদ ও লক্ষ্মী প্রসাদ। ধ্রুপদী গোপালপ্রসাদের শিষ্য গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক এবং বীনকার লক্ষ্মীপ্রসাদের শিষ্য—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সারদাসহায়ের যাদুমণি ভিন্ন অন্য বাঙালী শিষ্য কেউ ছিলেন কি না জানা যায় না। সারদাসহায়ের সঙ্গীত-পরিবারের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ভ্রাতাদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। সেদিক থেকেও হয়ত যাদুমণির সারদাসহায়ের কাছে শিক্ষার সুযোগ ঘটতে পারে।

যাদুমণির এই তিন জন ওস্তাদের মধ্যে গুরুপ্রসাদের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন সর্বপ্রথমে, অতি অল্প বয়সে এবং জগদীপ মিশ্রের কাছে শিখেছিলেন সব শেষে। জগদীপের কাছে শিক্ষার অনেক আগেই যাদুমণি গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিলেন এবং বয়সও তখন খানিক পরিণত। সারদাসহায়ের কাছে যাদুমণি শিখে থাকলে তা তাঁর প্রথম জীবনে হওয়াই সম্ভব। গুরুপ্রসাদের কাছে শিক্ষার অব্যবহিত পরেও তা হ'তে পারে। গুরুপ্রসাদের শিক্ষা অন্য ওস্তাদের চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছিলেন যাদুমণি।

তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার বিষয়ে অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

গায়িকা রূপে যাদুমণির প্রথম খ্যাতি হয় সেকালের বাংলার রঙ্গমঞ্চ থেকে। মঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে তিনি যখন প্রথম অবতীর্ণ হন তখন তাঁর বয়স ২০।২১ বছর হবে। কিন্তু তার আগেই থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গীত-গুণের পরিচয় পেয়েছিলেন। কারণ গায়িকা হিসাবেই যাদুমণিকে নেওয়া হয়েছিল রঙ্গমঞ্চে।

থিয়েটারের নটী-জীবন তাঁর বেশিদিন স্থায়ী হয় নি, দু' বছরের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। কিন্তু বাংলার নাট্যমঞ্চের প্রথম যুগের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের জন্যে তা উল্লেখ্য। কারণ বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীদের অংশ গ্রহণের তা প্রথম যুগ। বিনোদিনীর যোগদানেরও আগেকার কথা। যাদুমণি প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেত্রীর নাম সেযুগে ইংলিশম্যান ও অন্যান্য সাময়িক পত্রে একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা-গ্রন্থ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' থেকে যাদুমণির রঙ্গমঞ্চ-জীবনের কয়েকটি তথ্য এখানে উদ্ধৃত করা হবে প্রাসঙ্গিকভাবে।

যে ন্যাশনাল থিয়েটার (সম্পূর্ণ নাম 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি') ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর

সাল থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রবর্তন করে সে সম্প্রদায়ে পুরুষ অভিনেতারাই স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করতেন। যেমন, 'নীলদর্পণ' নাটকে অমৃতলাল বসু 'সৈরিন্ধ্রী', অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী 'সাবিত্রী' (অন্য তিনটি ভূমিকার সঙ্গে), মহেন্দ্রলাল বসু 'পদী ময়রাণী', অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) 'ক্ষেত্রমণি' ইত্যাদি ভূমিকায়। এমনিভাবে 'নীলদর্পণে'র পর 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'কৃষ্ণ-কুমারী' নাটকে পুরুষ অভিনেতারা স্ত্রীভূমিকা অভিনয়ের পরে ন্যাশনাল থিয়েটার যখন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে বন্ধ হয়ে যায়, তখন বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলছিল। বিখ্যাত সৌখীন ধনী ও সঙ্গীতজ্ঞ সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব, ধনকুবের রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ছিলেন এই রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী। "মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে (বেঙ্গল) থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন, তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটার খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না'।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ' পুস্তকে অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা)। বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম অভিনেত্রী নিয়ে ১৮৭৩ খ্রীঃ আগষ্ট থেকে 'শর্মিষ্ঠা', 'মৃণাল' (?), 'মায়াকানন', ইত্যাদি অভিনয় করবার পর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হল বাংলার দ্বিতীয় রঙ্গমঞ্চ, যেখানে অভিনেত্রীরা স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণা হন। এবং সেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পাঁচজন অভিনেত্রীর অন্যতমা হলেন যাদুমণি। অন্য চারজনের নাম —কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যাদুমণিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠের জন্যে। গায়িকা হিসাবে তখনই তাঁর নাম হয়েছিল। এই থিয়েটারে যাদুমণি 'সতী কি কলঙ্কিনী?' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে সেপ্টেম্বর। তখন তাঁর বয়স ২০।২১ বছর হবে। সে-সময় গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুরূপা দেবী ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মাতামহ) এবং স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী। ঐ বছরেরই শেষে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভুবনমোহনের মনান্তর হয় এবং "নগেনবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান।" (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'গিরীশচন্দ্র', ১৮৩ পৃঃ)

তারপর নগেন্দ্রনাথ যে 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নামে থিয়েটারের দল গঠন করলেন, যাদুমণিও তার মধ্যে ছিলেন, জানা যায়। যাদুমণি এই সম্প্রদায়ের প্রধানা অভিনেত্রীর সম্মান অর্জন করেন তার পরিচয় আছে নিম্নলিখিত বিবরণীতে—"গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী গড়ের মাঠের সুপরিচিত লিউইস থিয়েটার রয়ালে 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনয় করেন···৯ই জানুয়ারী (১৮৭৫)। যোধপুরের মহারাজা, অনেক গণ্যমান্য দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় বেশ সাফল্যলাভ করিয়াছিল। রাধিকার ভূমিকায় যাদুমণি···বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন।" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃঃ ১৪৮)।

তারপর গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী আগেকার বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে গিয়ে অভিনয় আরম্ভ করে ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭৫) থেকে। সেই মিলিত সম্প্রদায়েও গায়িকা যাদুমণি ছিলেন একজন বিশিষ্ট। এ বিষয়ে ইংলিশম্যান পত্রিকা থেকে (১৭ আগষ্ট, ১৮৭৫ তারিখের) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ওই পুস্তকে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করেছেন— The following actor & actresses deserve special mention···The songstress Jadumani, deserves praise.

এই অভিনীত নাটকটির নাম 'শরৎ সরোজিনী'।

তারপরে আর যাদুমণির কোন অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায় না। যতদূর মনে হয়, তারপর আর বেশিদিন রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে দেখা যায় নি তাঁকে। নচেৎ এ বিষয়ে তাঁর আরো উল্লেখ পাওয়া যেত এবং থিয়েটার জগতে তিনি পরে নিশ্চয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে যশস্বিনী হতেন। রঙ্গমঞ্চে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই যিনি মাত্র ২০।২১ বছর বয়সে সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেন, তাঁর অভিনয়-প্রতিভা সম্বন্ধে স্বীকৃতি প্রকাশ পায় পত্র-পত্রিকায়, তিনি এ বিভাগে যুক্ত থাকলে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারিণী হতেন, তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু তাঁর প্রতিভার যথার্থ ক্ষেত্র হ'ল সঙ্গীত। তাই হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই রঙ্গমঞ্চের মায়া ত্যাগ করে তিনি ফিরে আসেন সঙ্গীত-জগতে—রঙ্গালয়ে যদিও তিনি গায়িকা রূপেই যোগ দিয়েছিলেন। গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা থিয়েটার জীবনের অনেক আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। এবং যে সময়ে তাঁর রঙ্গালয়ে অভিনয় করার কথা জানা গেল, তার পরবর্তীকালেও গুরুপ্রসাদের কাছে তিনি শিখেছিলেন। জগদীপ মিশ্রের কাছে শেখেন তারও পরে। সেই সঙ্গে, থিয়েটার ছাড়বার পর অন্য কোন কোন ওস্তাদের কাছেও হয়ত শিখতে বা সংগ্রহ করতে

পারেন। কারণ তাঁর সঙ্গীত-জীবনের খুঁটিনাটি সব বৃত্তান্ত জানতে পারা যায় নি। শুধু এটুকু বোঝা যায় যে, থিয়েটারের পাদপ্রদীপ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সঙ্গীতচর্চা করতে থাকেন একান্ত ভাবে।

এখন সঙ্গীতের আসরে তাঁর খ্যাতির প্রদীপ উজ্জ্বলতর হ'তে লাগল দিনের পর দিন। সুরেলা, শিক্ষিতপটু বামাকণ্ঠ। নামী ওস্তাদের তালিমে এবং গায়িকার নিজস্ব প্রতিভায় গঠিত। তাছাড়া, সেকালের আসরে বাঙালী নারীশিল্পী প্রায় দুর্লভ ছিল। বিশেষ এমন গুণী গায়িকা যিনি পারদর্শিনী হন খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি তিন অঙ্গেই। উপরন্তু নৃত্যেও কিছু অধিকার তাঁর হয়েছিল। 'খাড়া ঠুংরি' গাইতেন তেমন তেমন আসরে—দাঁড়িয়ে বা ঈষৎ ঘুরে-ফিরে, তাও বাংলাবার সঙ্গে। সব মিলে একটি ব্যবসায়িনী, পরিণত সঙ্গীত-প্রতিভা। সুতরাং যাদুমণি সেকালের সঙ্গীতামোদী ও বিলাসী সমাজে যশ, অর্থ ও প্রতিষ্ঠায় ধাপে ধাপে উঠে যেতে লাগলেন। সেকালের সঙ্গীতাসরের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক, সঙ্গীতের উপভোগ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যে যাঁরা মুক্তহস্ত, তাঁদের দরবারে অসাধারণ নাম-ডাক হ'ল যাদুমণির। বাছাই-করা জলসার পর জলসা থেকে মুজরো পেতে লাগলেন।

শুধু কলকাতার আসরে নয়, আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে, বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সঙ্গীতের খ্যাতি। পশ্চিমের কোন কোন রাজদরবার থেকেও তাঁর গানের আমন্ত্রণ আসত। তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে আরো প্রসিদ্ধ হয়ে ফিরতেন।

প্রচুর উপার্জন হ'তে লাগল যাদুমণির। নানা আসরের মোটা মোটা টাকার মুজরো ত বটেই; সেই সঙ্গে নিজের ঘরের অনুষ্ঠানেও অপর্যাপ্ত অর্থ। সেসব দিনের যাদুমণির গান আর রোজগারের ধুমধামের কথায় পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু বলেন—আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, যাদুমণির ঘরে জলসা চলেছে, তিনি গাইছেন। ঘরে লোক ভর্তি, আর বসবার জায়গা নেই। তখনো তাঁর অনুরাগী পৃষ্ঠপোষকরা আসছেন। কিন্তু দোতলার ঘরে আর স্থান সঙ্কুলান হবে না শুনে রাস্তা থেকে জুড়িগাড়িতে বসেই একশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিচ্ছেন ওপরকার বারান্দার ধারের সেই জলসাঘরে।...

শুধু এইসব আসরের উপার্জনই নয়। কোন কোন সঙ্গীতপ্রেমী, বিলাসী ধনীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল যাদুমণির ওপরে। তেমন তেমন ব্যক্তি তাঁকে নিজস্ব করে রাখতে চাইতেন, রাখতেনও। সে ধরনের আশ্রয়ের কাঞ্চন-মূল্যও অল্প নয়। এইভাবে শোভাবাজার অঞ্চলে তথাকথিত এক রাজ-পরিবারের জনৈকের আনুকূল্যে বেশ কিছুকাল যাদুমণি কাটিয়েছিলেন।

নটীর জীবনের সেই উজ্জ্বলিত মধ্য পর্ব। সুরে সুরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে উচ্ছল জীবনের ভোগ-পাত্র। দুঃখের তিমির ছায়া যেন তার কোথাও নেই। স্বর্ণ, মণিরত্ন-খচিত যাদুমণির অলঙ্কার-শোভার মতন তার সবটাই যেন অত্যুজ্জ্বল দ্যুতিময়। এমনিভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নটীর জীবনস্রোত বয়ে চলেছিল। দীর্ঘকাল। যৌবনা-হৃতির শেষ পরিণতি পর্যন্ত।

কিন্তু এই শ্রেণীর আলোকিত জীবনের অন্তরালে কোথায় আত্মগোপন করে থাকে অন্ধকার। বলতে গেলে, আলো আর অন্ধকারের সহাবস্থান এখানে। পাশাপাশি, অতি ঘনিষ্ঠ ভাবের অস্তিত্ব। একের সঙ্গে অন্যের কোন দুস্তর ব্যবধান নেই। দুই সীমানার বদল মাঝে মাঝেই ঘটে যেতে পারে। ঘটেও। কখনো অন্ধকারের জীব আলোকের জগতে উঠে আসে। আবার আলোর সত্তা আকস্মিকভাবে হারিয়েও যায় অন্ধকারের অজানায়।

যাদুমণিরও তাই হ'ল। হঠাৎ এক রাতের বিপর্যয়ে তাঁর জীবনের সমস্ত আলো একসঙ্গে নিভে গেল। তিনি হারিয়ে গেলেন অপরিচয়ের ছায়ার জগতে।

সে-কাল সংবাদপত্রের যুগ নয়। তাই বাইরের বিশেষ কেউ জানতেও পারলে না যাদুমণির ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা। উত্তর কলকাতার সেই কুখ্যাত অঞ্চলের মধ্যে তাঁর কি পরিণতি ঘটল তার সন্ধানও আর কেউ পেলে না।

সঙ্গীত-জগতের বহুমুখী প্রতিভা, কোকিল-কণ্ঠী গায়িকা যাদুমণিকে দেখা গেল না আর কোন আসরে। শুধু সঙ্গীতের আসর থেকে নয়, লোকের মনেও ক্রমে ম্লান হয়ে এল তাঁর গানের স্মৃতি। তাঁর নাম পর্যন্ত অনেকের কাছে বিস্মৃতির অতলে বিলীন হ'ল।

তারপর পৃথিবীর দিন-রাত্রির আবর্তনে একে একে কেটে গেল কয়েক বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ে জগতের কত মানুষের জীবনে কত অভাবিত পরিবর্তনই ঘটে গেল।

কয়েক বছর পরে এই জীবন-নাটকের যবনিকা নতুন করে উন্মোচিত হ'ল—অন্য এক জায়গায়, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে। নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক অপরিচয়ের অন্ধতম থেকে পরবর্তী অঙ্কের 'উন্মোচন করলেন। নগেন্দ্রনাথ পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার, কিন্তু নেশা ছিল সঙ্গীতে। নিজে সঙ্গীত-চর্চা করতেন না বটে, কিন্তু গান ভালবাসতেন অন্তরের সঙ্গে। ভাল গান শুনতেন। সঙ্গীতের ভালমন্দ বোঝবার মতন কান তাঁর ছিল এবং সঙ্গীত-শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা। নিজের বৃত্তিগত কর্মে তিনি পরে পি. ডব্লিউ. ডি-র অ্যাসুরার হয়েছিলেন।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ তার অনেক আগেকার কথা। তখন

তাঁর প্রথম জীবন। ইঞ্জিনীয়ারের পেশা তখনও আরম্ভ হয় নি। তরুণ বয়সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটি মেস করেছেন জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বলরাম দে ষ্ট্রীটে। আর গান শোনার সখ খুব।

তখন তিনি টাকার বাড়ীতে থাকেন। একদিন পথের ধারের ওপরের ঘরে বসেছেন, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন কে গান গাইছে রাস্তার দিকে। প্রথমে সেদিকে কান দেন নি। পথে ত কত গানই হয়ে থাকে, তাই মন দিলেন নিজের কাজে।

কিন্তু সেই গান এবার স্পষ্ট করে তাঁর কানে গেল আর তিনি অন্যমনস্ক থাকতে পারলেন না। এ সাধারণ গলার গান নয়। যেন সাধা, তৈরি গলা। উচ্চারণ খাসা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে উঠে নগেন্দ্রনাথ বারান্দায় দেখতে গেলেন—এমন গলায় গান গাইছে কে?

ওপর থেকেই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন—এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান গাইছে বাড়ীর সদরের সামনে। নিতান্ত মলিন তার বেশ-বাস, পথের ভিখারিণীর যেমন হয়ে থাকে। উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সেই ভিখারিণী গাইছে —দুখ হরা তারা নাম তোমার···

'দুখ হরা' এবং 'তারা' শব্দের ওপর উচ্চারণ তানের বোলের মতন কারুকার্য লক্ষ্য করলেন নগেন্দ্রনাথ। কণ্ঠও যথেষ্ট সুরেলা। কোন ভিখারিণীর এমন গলা শোনা যায় না।

তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন তাকে দেখবার জন্যে। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিখারিণী তখন গাইছে—

দুখ হরা তারা নাম তোমার,
আমি তাই ত ডাকি বারে বার।···

নগেন্দ্রনাথ দেখলেন—ময়লা কাপড় পরা এক শ্যামবর্ণা নারী। খর্বাকৃতি, শীর্ণ শরীর। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা, কিন্তু কণ্ঠে জরার চিহ্ন নেই!

নগেন্দ্রনাথ নির্নিমেষ চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? এমন গলা তোমার!

বৃদ্ধা ভিখারিণী এক মুহূর্ত দ্বিধা করলে, শুষ্ক ঠোঁট একবার কেঁপে উঠল আত্মপরিচয় দিতে। কিন্তু প্রশ্নকারীর কথায় সহানুভূতির সুর শুনে আস্তে আস্তে বললে, আমি যাদুমণি। কিন্তু আমার সবই গেছে।

নগেন্দ্রনাথ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন সচকিত হলেন। এ নাম তাঁর অজানা নয়! সাক্ষাৎ ভাবে না দেখলেও যাদুমণির নামও গায়িকা হিসেবে খ্যাতির কথা তাঁর বিলক্ষণ জানা ছিল। তাই তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না তাকে এই নিদারুণ অবস্থায় দেখে।

—কি করে এমন হ'ল?

যাদুমণি তেমনি ভাবে বললেন, সে অনেক কথা, বাবা।

নগেন্দ্রনাথ তাঁকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে আনলেন। ওপরের ঘরে এসে বসলেন যাদুমণি। এই চরম দুর্দশা তাঁর কি করে ঘটল, তা নগেন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর আগ্রহ ও সমবেদনা দেখে যাদুমণি সেখানে বসে জানালেন তাঁর অদৃষ্ট বিপর্যয়ের কাহিনী।

তাঁর জীবনে যশ, অর্থ ও বিলাসের প্রাচুর্যের মধ্যে, সুখৈশ্বর্যের সেই চূড়ান্ত সময়েই এক'দিন দুর্যোগের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। সেই কাল রাত্রির কথা নগেন্দ্রনাথকে এই ভাবে বিবৃত করেছিলেন যাদুমণি—এখন মনে আছে হবে। কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। আচমকা ঘুম ভেঙে যেতে প্রথমটা মনে হ'ল বুঝি কোন দুঃস্বপ্ন দেখছি। কিন্তু যে কষ্টের জন্যে ঘুম ভেঙে যায়, সেই কষ্টটা এখন এত বেশী হ'তে লাগল যে বুঝতে পারলাম এ স্বপ্ন নয়। দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার, নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলাম না। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আর ঘুমের ঘোরে প্রথমে বুঝতে পারি নি আমার বিপদ। তারপর নিঃশ্বাসের কষ্টে আর গলার যন্ত্রণায় বুঝতে পারলাম—কে একজন দু' হাতে আমার গলা টিপে ধরেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই হাতের ও বজ্র চাপ সরাতে পারলাম না। চীৎকার করতে গেলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না। অসহ্য যন্ত্রণায় আমার দম বন্ধ হয়ে এল, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে আর আমি শুয়ে আছি সেই বাড়ীরই একটি ঘরের কোণে মাথা রেখে। একটু পরে জানতে পারলাম—আমার যথাসর্বস্ব চুরি গেছে। খোলা পড়ে রয়েছে সব বাক্স, তোরঙ্গ আর আলমারি। আমার সমস্ত জমানো টাকা, সোনা-জহরতের সব গয়না, দামী কাপড়-জামা কিছুই আর নেই। একদিনেই আমি সর্বস্বান্ত।···

কিন্তু সেই ভাঙা হাটে আর কেন জোড়া লাগল না, কি করে তিনি ধাপে ধাপে নেমে এসে একেবারে পথে দাঁড়ালেন—তার ধারাবাহিক বিবরণ যাদুমণি দেন নি, নগেন্দ্রনাথও সেই সব মর্মন্তুদ কথা জানাতে চান নি। ভাগ্যের চাকার ঘূর্ণনায় হয়ে একেবারে ছিটকে পড়েছেন অবশেষে। আর কি জানবার আছে? এমন প্রসিদ্ধা কলাবতী গায়িকা এখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, সহায়-সম্বলহীন। জরার আক্রমণে পীড়িত দেহ, দুরারোগ্য হাঁপানি রোগ সেখানে বাসা বেঁধেছে।···

যাদুমণির বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে নগেন্দ্রনাথ

সেদিন স্থির করলেন যে, শুধু সাময়িক সাহায্য দান নয়, তাঁকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। নচেৎ তাঁর কোন উপকার হবে না। তিনি উদ্যোগী হয়ে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতায় সেই ব্যবস্থা করতে তৎপর হলেন। যাদুমণি যেন আত্মনির্ভর হ'তে পারেন সঙ্গীত-চর্চার সাহায্যে।

পূর্ব জীবনের মতন সঙ্গীত-চর্চা অবশ্য এখন আর তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। সে শক্তি-সামর্থ্য আর নেই এই বৃদ্ধ বয়সে। যন্ত্রে নিয়ে নিয়মিত আসরে গান করা এখন আর তার ক্ষমতা হবে না। তা ছাড়া, সে নাম-ডাকও আর নেই। আগেকার আসরের পৃষ্ঠপোষকদের অনেককেই আর পাওয়া যাবে না। গায়িকা এই ক্ষেত্র থেকে বহুদিন বিদায় নেওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। এখন আর তা সেভাবে পূরণ হবার উপায় নেই। এই সব কথা চিন্তা করলেন নগেন্দ্রনাথ।

শুধু এক পথ আছে—সঙ্গীত-শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু, তারও পেশা হিসাবে নানা অসুবিধা। সেকালের সঙ্গীত-ক্ষেত্রে বেশী শিক্ষার্থী পাওয়া যেত না, কারণ এ বিভার চর্চা ব্যাপক ছিল না। তা ছাড়া এখানেও থাকে নামের বা প্রসিদ্ধির প্রশ্ন। যাদুমণিকে এখন আর চিনবে ক'জন? তিনি যে কত বড় গুণী এ খবর কে রাখে?

তবু নগেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করতে লাগলেন। হয়ত ভাবলেন, যাদুমণির জীবনযাত্রার প্রয়োজনে এই বাবদ যা ঘাটতি পড়বে তিনিই তা পূরণ করে দেবেন। আর গায়িকার জীবনে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে, জীবন-যাত্রার আদর্শ এমন বদলেছে যে তাঁর প্রয়োজনও এখন নিতান্ত অল্প।

এই সব বিবেচনা করে এবং অন্য উপায় রহিত হয়ে তিনি যাদুমণির জন্যে একটি সঙ্গীত বিভালয়ের পত্তন করলেন। যে তিনতলা বাড়ীটির নীচের তলায় তিনি ক'জন বন্ধুর সঙ্গে প্রেস করেছিলেন, তারই দোতলায় স্থাপিত হ'ল এই সঙ্গীত বিভালয়—সঙ্গীত পরিষদ বিভালয়। স্কুলের ওপরের তলায় যাদুমণির বাসের ঘর নির্দিষ্ট হ'ল।

সঙ্গীত পরিষদকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচালনার জন্যে একটি রীতিমত সমিতিও গঠন করা হয়। এক বছরের কার্য-নির্বাহক সমিতিতে দেখা যায়—সভাধিপ সভাপতি: মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। সভাপতি: মতিলাল ঘোষ (অমৃত বাজার পত্রিকা)। সম্পাদক: গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, এম. এ, বি. এল, এফ. আর. ই. এস (লণ্ডন)। তত্ত্বাবধায়ক: নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিভালয়টির কাজ আরম্ভ হয়। কলরাম দে ষ্ট্রীটে (এখন যে অংশের নাম ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট), ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী মহাশয়ের পৈত্রিক বাড়ীর বিপরীত দিকে (তখনকার ৬৭।৯ সংখ্যক বাড়ীতে) ছিল এই সঙ্গীত পরিষদ এবং যাদুমণির তৎকালীন বাসস্থান।

প্রধানতঃ এখানে তিনিই সঙ্গীত-শিক্ষা দেবেন স্থির হ'ল। তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণধন ভট্টাচার্যকেও নগেন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ করে আনলেন শিক্ষকরূপে। কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য সেকালের একজন কৃতী ধ্রুপদ-গায়ক ছিলেন। বাংলা দেশে খাণ্ডার-বাণী ধ্রুপদের আদি আচার্য গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য (পাথুরিয়াঘাটার) হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বিশেষ তাঁর পুত্র দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে কৃষ্ণধন 'রাগ পরিচয়' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ভৈরব, ভৈরবী, গুর্জরি, তোড়ি, রামকেলি ও বরাটির স্বরলিপি সমেত রূপ-পরিচয় দিয়ে। কৃষ্ণধনের বাড়ীতেই বাস করতেন বহুগুণী গুণী এবং যাদু-মণির অন্যতম ওস্তাদ জগদীপ মিশ্র। তা অবশ্য এই বিভালয় প্রতিষ্ঠার অনেক আগের কথা। যাদুমণি এই শেষ পর্বে ফিরে আসবার কয়েক বছর আগেই জগদীপ সনাতন জির অশান্তি এড়াবার জন্যে কলকাতা ত্যাগ করে যান। যাদুমণির এই অভাবিত ও করুণ পরিণতি জগদীপকে দেখতে হয় নি।...

সে যা হোক, সঙ্গীত পরিষদের এই বিভালয়টিকে কেন্দ্র করে যাদুমণির সম্পূর্ণ নতুন জীবন আরম্ভ। এ যেন আর এক যাদুমণি। পূর্ব জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, সঙ্গীত ভিন্ন। যৌবনকালের ঐশ্বর্য-বিলাস এবং পরবর্তী জীবনের নিঃস্ব দৈন্য দুই এখানে অনুপস্থিত। এখানে অনাড়ম্বর হ'লেও সুস্থ গৃহস্থের স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার ধারা। বহুদর্শী পরিণত বয়সের অভিযোগহীন প্রশান্তি। শান্ত মনে তিনি ভাগ্যের সব রকম দান মেনে নেবার মতন করে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। শরীরও এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ।

মানস পরিবর্তন অবশ্য। কিন্তু যা দৃষ্টির গোচর সেখানেও কম পরিবর্তিত হন নি যাদুমণি। যোগিনীর মতন নিরাভরণা বেশবাস। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হরিণ-চর্মের আসন। সেই আসনে বসেই ছাত্রদের সঙ্গীত-শিক্ষা দেন।

আট-দশটি ছাত্র আসেন বিভালয়ে। সকলেই নিতান্ত তরুণ বয়সী—আঠারো, উনিশ, কুড়ি বছরের সব ভদ্র-সন্তান। কেউ কেউ তার মধ্যে কলেজের ছাত্র। সঙ্গীত-শিক্ষার আন্তরিক আকর্ষণে এখানে এসে ভর্তি হয়েছেন। প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধা যাদুমণি শুধু সঙ্গীত-গুণে নয়, সকলের

শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন বিনীত স্বভাবে এবং সস্নেহে, সুশীল ব্যবহারে। সঙ্গীতের পাঠ নিতে যখন তাঁরা আসেন, সন্তানের মতন স্নেহের ব্যবহার করেন তাঁদের সঙ্গে, ধৈর্য ধরে শেখান। ছাত্রদের বেতন অবশ্য দিতে হয়, কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর নিষ্ঠার অভাব দেখা যায় নি কোনদিন।

এমনি ভাবে যাদুমণির সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের কাজ চলতে লাগল। আচার-আচরণে কথাবার্তায় জীবনের পূর্ব ইতিহাসের কোন চিহ্ন রইল না তাঁর মধ্যে।

সঙ্গীত বিষয়ে শুধু শিক্ষিকারূপেই তাঁর পরিচয় যে পর্যবসিত হয়েছে, তা অবশ্য নয়। তাঁর শিল্পী-সত্তা তখনও অন্তর্ধান করে নি, যদিও সূর্য মধ্যাহ্নের শেষে দেখা দিয়েছে অপরাহ্নের অস্তরাগের আভাস। 'তৈয়ারী' তখন আর নেই, থাকবার কথাও নয়। তবে নিয়ম আছে, মাধুর্য আছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গীতের অনুভব।

সঙ্গীত-কণ্ঠ ক্ষীণ, নিস্তেজ হয়ে এসেছে। কিন্তু সুর অলঙ্করণ, ঢঙ ও কারিগরি আছে তখনও। প্রায় প্রতি রবিবার বিদ্যালয়েই তাঁর গানের আসর বসে। ছাত্রী ভিন্ন কিছু কিছু বাইরের শ্রোতা আসেন, কলকাতার কোন কোন বিখ্যাত গায়কও মাঝে মাঝে গান শোনান আমন্ত্রিত হয়ে। যাদুমণির গানের সঙ্গে এস্রাজ বাজান কার্তিকবাবু। খেয়ালে বিশেষ সাধনা ছিল, তাই খেয়ালই বেশী গান। বহু রাগেই তাঁর অধিকার ছিল, সেসব রাগে গাইতেনও। কিন্তু তাঁর বেশী প্রিয় ছিল—মালকোষ, দরবারি, কানাড়া, ভৈরোঁ, বেহাগ, ভৈরবী, বারোঁয়া, ইমন ইত্যাদি ক'টি।

যদিও বহুদিন হ'ল সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, অনেক দিন থেকে কোন আসরে আর তাঁর নাম শোনা যেত না, সঙ্গীত-সমাজের অনেকেই তাঁর কথা এক রকম ভুলে গিয়েছিল—শুধু তাঁর এই নতুন করে ফিরে আসার সংবাদ একেবারে অগোচর বা উপেক্ষিত রইল না। মুখে মুখে বাইরের কোন কোন সঙ্গীতপ্রিয় মহল জানতে পারলে যে, যাদুমণি এই গানের স্কুলে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাঁর আসর হয় এখানে। বাইরের কোন আসরে সাধারণত তাঁর গান হয় না বটে, কিন্তু তিনি এখনও গান করেন, গলা এখনও আছে।

আগেকার আমলের তাঁর পৃষ্ঠপোষক এবং গুণগ্রাহীদের মধ্যেও কেউ কেউ সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর ফিরে আসবার কথা শুনলেন এবং তাঁর গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এমনি ক'টি বিশেষ আসরে যাদুমণি গান গাইলেন বিদ্যালয়ের বাইরে। সেই উপলক্ষ্যে সঙ্গীতজ্ঞ মহলে আবার নতুন করে অনেকদিন পরে তাঁর গুণপনা প্রকাশ পেলে।

এমনি একটি আসর হ'ল দ্বারবঙ্গ-রাজ রামেশ্বর সিং-এর জন্যে। দ্বারবঙ্গ-রাজ যাদুমণির পুরণো পৃষ্ঠপোষক। যতগুলি রাজদরবার সেকালে সঙ্গীত-প্রেমী ও সঙ্গীতের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিখ্যাত ছিল, দ্বারবঙ্গ তাদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট। দ্বারবঙ্গ রাজাদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন লক্ষ্মীশ্বর সিং। তাঁর আমলেই দ্বারবঙ্গ দরবার সঙ্গীতের দরবারে পরিণত হয়। তিনি ভারতের বহু গুণীকে বিভিন্ন সময়ে দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছেন, তাঁদের বেশ কয়েকজনকে নিয়মিত ভাবে নিযুক্ত রেখেছেন প্রতিদিন সঙ্গীত আস্বাদ করবার জন্যে। সরোদী মুরাদ আলী, সরোদী আবদুল্লা খাঁ, সুরচেন ও সরোদ-বাদক আসগর আলী, গায়িকা জোহ্‌রা বাঈ ও জানকী বাঈ, গায়ক ভোলা বস, নর্তকী মেনকীয় প্রভৃতি অনেক গুণী এখনকার দরবারে নিযুক্ত থেকে দ্বারবঙ্গে সঙ্গীতের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন। মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের পর দ্বারবঙ্গ রাজ্যের অধিকারী হন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর সিং। মহারাজা রামেশ্বর জ্যেষ্ঠের মতন সঙ্গীতের অত বড় পৃষ্ঠপোষক না হ'লেও সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং রাজ-দরবারে আগেকার আমলের সঙ্গীত-চর্চার ধারা বজায় রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, রামেশ্বর সিং স্যর আশুতোষের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ আনুকূল্য করেছিলেন, যার নিদর্শন 'দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং।'

রামেশ্বরের রাজ্যকালেই যাদুমণি আমন্ত্রিত হয়ে এক সময়ে দ্বারবঙ্গে গান গাইতে গিয়েছিলেন। যাদুমণির তা পূর্ব জীবনের কথা; সেই মধ্য জীবনে, যখন তিনি সঙ্গীত-খ্যাতির শীর্ষে আসীনা। মহারাজা রামেশ্বর তখন ইন্দ্র-পূজার বার্ষিক অনুষ্ঠান সভায় সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে যাদুমণিকে দ্বারবঙ্গে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানকার এই ইন্দ্র-পূজার প্রবর্তকও রামেশ্বর। দ্বারবঙ্গে পুরাণো রাজবাড়ী 'পুরাণি দেউড়ি'-র (রাজ্যের নতুন প্রাসাদ 'আনন্দ বাগ প্যালেস' লক্ষ্মীশ্বরের আমলে তৈরি) মন্দির প্রাঙ্গণে সেবার ইন্দ্রপূজা উপলক্ষ্যে যাদুমণি গান গেয়েছিলেন।

রামেশ্বরের সে কথা মনে ছিল এতদিন পরেও। তাই এবার কলকাতায় এসে যখন শুনলেন, যাদুমণি এখনও গানের জগৎ থেকে বিদায় নেন নি, তিনি তাঁর গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই সূত্রে যাদুমণির গানের আসর বসল উত্তর কলকাতার ভারত-সঙ্গীত সমাজে।

সেদিন ভারত-সঙ্গীত সমাজে মহারাজা রামেশ্বরকে গান শোনাবার জন্যে যাদুমণি একটু বিশেষ রকম প্রস্তুত হয়ে যান। পূর্ব জীবনে তিনি যেমন রাজা-রাজড়ার সঙ্গীত-দরবারে যেতেন পেশাদার নটীর বেশে অর্থাৎ দরবারি পোশাকে, এই আসরেও তেমনি ভাবে উপস্থিত হতে

চাইলেন তিনি। ভারত-সঙ্গীত সমাজ যদিও দরবার নয়, কিন্তু মহারাজা রামেশ্বরের যোগদানের ফলে তা দরবারী মর্যাদা লাভ করেছে, বাহুমণির এই ধারণা। আগেকার আসরে মতী যেমন অভ্যস্ত ছিলেন দরবারি আদব-কায়দা, পোশাক-আশাকে, সে সবই তাঁর মনে পড়ল। এ ধরনের আসরে সাধারণ ভাবে অংশ নেবার কথা যেন ভাবতেই পারেন না তিনি, যদিও সে বয়স নেই, জীবনের সে জৌলুস চলে গেছে, সে সময়ও আজ অন্তর্হিত। তবু তাঁর দরবারি আদব-কায়দার কথা মনে হ'ল শুধু এই কারণে যে—এ ধরনের আসরের যা রীতি তা ত্যাগ করে তিনি সাধারণ বেশভূষায় মহারাজার সামনে গান গাইতে পারেন না। যে আসরের যা রীতি-নীতি এবং যে রীতিতে আগে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত ছিলেন এখানেও তিনি তাই মানলেন।

রামেশ্বর আসরে উপস্থিত হবার অনেক আগেই তিনি ভারত-সঙ্গীত সমাজে এলেন, বিতাজনের কয়েকজনের সঙ্গে। সেখানে যেমন কাপড় পরে থাকতেন এখনও পরণে তাই ছিল, কিন্তু তাঁর একটি বাক্স বিতাজনের পরিচারককে নিয়ে আসতে হয়েছিল। সঙ্গীত পরিষদের যে ছাত্ররা শোনেন এসেছিলেন তাঁরা তখন জানতেন না বাক্সটির মধ্যেকার জিনিষপত্র। তার মধ্যে ছিল বাহুমণির বিগত আসরের সামান্য কিছু পোশাক, যা সেই রাজে কোন-ক্রমে বেঁচে যায়।

এখন আসর বসবার কিছু আগে তিনি সেই সব সরঞ্জাম নিয়ে পাশের ঘরে সাজতে গেলেন।

তারপর তাঁর ছাত্ররা তাঁকে দেখতে পেলেন এক অ-জনপ সাজে, য তাঁরা আগে তাঁকে দেখেন নি কখনও। এ তাঁর অন্ত আর এক রূপ, সেই পূর্ব জীবনের একটি অবশেষ কিংবা স্মারক। অবশ্য তাঁর মুখভাবে বা ভঙ্গিতে মতীর কোন চাপল্য নেই। কিন্তু পেশোয়াজ পায়জামা আর ওড়নায়, মুখে ঠোঁটে রঙের প্রলেপে, চোখে সুর্মা এবং কপালে কপোলে অভ্রচূর্ণের অলঙ্করণে সেই বৃদ্ধাকে দেখে ছাত্ররা সরল মনে হাসতে লাগলেন।

বাহুমণি তাদের হাসি দেখে ক্রোধ প্রকাশ করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তারা এ সব রীতি কিছুই জানে না। তাই হাসছে। এ আদব-কায়দা। এর সঙ্গে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই—এই তাঁর ধারণা। দরবারি কেতা পালন করতে তাঁর দস্তরমত আগ্রহ দেখা গেল।

ওদিকে আসরে রামেশ্বর সিং উপস্থিত হয়েছেন, খবর এল। তখন আসরে প্রবেশ করতে এলেন বাহুমণি।

হল-এর দরজা থেকে মহারাজাকে নিখুঁত কুর্নিশ করতে করতে অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে তিনি এসে আসরে বসলেন। সমাসীন অতিথিকে দেহ আনত করে সম্ভ্রম জানিয়ে মতী আসীনা হলেন আদব-কায়দার সঙ্গে।

তার পর কয়েকটি শিষ্টাচার বাক্যের পর তাঁর গান আরম্ভ হ'ল।

পর পর চারখানি গান গাইলেন বাহুমণি। দু'টি খেয়াল ও দু'টি ঠুংরি। ষাট বছরের বৃদ্ধার কণ্ঠে আগেকার সেই সতেজ স্বরলীলা আর না থাকলেও এখনও যা আছে তার মূল্যও অল্প নয়। প্রাণের অনুভবের সঙ্গে রাগ রূপের যথাযথ মহিমা বিস্তার করে তিনি খেয়াল অঙ্গে গাইতে লাগলেন।

প্রথমে ধরেছিলেন দরবারি কানাড়া—

এয়্য সে চাঁদিনী রাত···

গানের অন্দেশ অতি জমাটি। দরবারির গভীর ভাবের সুরে আসর ভরিয়ে দিয়ে তিনি প্রথম গান শেষ করলেন। তার পর ধরলেন তাঁর প্রিয় ইমন, গুরুপ্রসাদ মিশ্রের ঘরের সেই বিখ্যাত গানটি—

গহেলি গহেলি সদীয়া ভরি আমি,

চলত পবন পূরবৈয়া মৈইয়া মোরি।···

এই গানে তিনি পূর্ব জীবনে অনেক আসর মাৎ করে-ছিলেন, এই শেষ বয়সেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না।

তার পর ঠুংরি আরম্ভ করলেন—

হামে ছোড় চলে বেণীমাধো,

তব সে সোবত রহি মন মে।

হৃদয়স্পর্শী বিরহ-গীতি। সমঝদার শ্রোতাদের মনে আকুল আবেগ জাগিয়ে তিনি দরদ দিয়ে গাইতে লাগলেন। বেণীমাধব বা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধিকার প্রাণের আকুতি সুরের কত মোচড়েই যে প্রকাশ করলেন গায়িকা।

এই গানের পর বাহুমণি আরও একখানি মনোমুগ্ধকর ঠুংরি গাইলেন—

পিয়াকো মিলনে ম্যয় ক্যয়সে ক্যয়সে যাওয়ে

রামেশ্বর সেদিন তাঁর গান শুনে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন এবং ভাল মুজরোও দেন।

সে-সময়ে আর একজন মহান গুণগ্রাহীরও সাক্ষাৎ পান বাহুমণি। তিনি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনিও বাহুমণির পূর্বজীবনে তাঁর গান শোনেন এবং তাঁকেও সঙ্গীত-শিল্পীর একজন পৃষ্ঠপোষক রূপে গণ্য করা যায়। বাহুমণির বিতাজনের অন্যতম ছাত্র বিশপতি চৌধুরী তখন চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকায় লেখার সূত্রে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতেন। চিত্তরঞ্জন একদিন বিশপতিবাবুর মুখে শোনেন যে বাহুমণি এখন সঙ্গীত-পরিষদে আছেন এবং গান শেখান সেখানে।

চিত্তরঞ্জন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কি সেই যাদুমণি?

আগেকার আসরের গায়িকা যাদুমণিকে তিনি বিশেষ করে জানতেন। চিত্তরঞ্জন রচিত বাংলা গানও গেয়েছেন যাদুমণি। সে শিল্পীকে সঙ্গীতপ্রেমী চিত্তরঞ্জন কেমন করে ভুলবেন?

তিনি একদিন সঙ্গীত পরিষদে এলেন যাদুমণির সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর গান শুনতে। চিত্তরঞ্জনকে তিনি সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানালেন।

কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, হরিণ চর্মের আসনে বসে প্রবীণা গায়িকা। তাঁর সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তার পর চিত্তরঞ্জন বললেন—এবার গান হোক।

যাদুমণি জিজ্ঞেস করলেন—তা হ'লে 'কোন্ তারেতে' দিয়ে আরম্ভ করি?

চিত্তরঞ্জন জানালেন—সে আপনার ইচ্ছে।

'কোন্ তারেতে' অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনেরই রচিত 'কোন্ তারেতে বাজবে বল ওগো প্রাণের বাজনদার।' গানটি রচয়িতার বিশেষ প্রিয় এবং গায়িকাও তাঁকে পূর্বে এটি শুনিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের 'কিশোর কিশোরী' পুস্তকে মুদ্রিত আছে এই গান। যাদুমণি এবারও এটি আস্তো-পান্ত গাইলেন।

গানখানি শেষ করে যাদুমণি রাগসঙ্গীত আরম্ভ করলেন। প্রথমে গাইলেন দরবারি কানাড়া, শেষে একটি ঠুংরি। দেশবন্ধু মুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত শুনলেন। সেদিনের মতন আসর শেষ হ'ল তারপর।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর জীবনের নানা কথায় যাদুমণি সম্পর্কিত প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। সে সব কোন সময়ের—অর্থাৎ যাদুমণির মধ্য কিংবা শেষ জীবনের, তা ঘটনা সঠিক জানা না গেলেও এখানে উল্লেখ করবার যোগ্য। প্রথম তথ্যটি হ'ল—যাদুমণি একটি সভায় গান গেয়েছিলেন এবং সেখানে সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন। দ্বিতীয় সংবাদ—চিত্তরঞ্জনের গৃহে একবার যাদুমণির সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। সেখানে তিনি স্বরচিত 'তুমি যে আমার গলার মালা, তুমি যে আমার বুকের কাঁটা' গানখানি গায়িকাকে বিভিন্ন সুরে গাইতে অনুরোধ করেন। যাদুমণিও ভিন্ন ভিন্ন সুরে গানটি গেয়ে সুরের ওপর নিজের অসামান্য অধিকার দেখান এবং সন্তুষ্ট করেন চিত্তরঞ্জনকে।

সঙ্গীত-জীবনের এই শেষ পর্যায়ে যাদুমণি আর একটি আসরে গান গেয়েছিলেন, যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানের তিনি উদ্বোধন করেছিলেন একটি ধ্রুপদ গান গেয়ে এবং সমাপ্তি সঙ্গীতও তাঁরই গীত। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের তিনটি গানও যাদুমণি এ আসরে গেয়েছিলেন, কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে নয়। এ বিষয়ে কিছু বিশেষ কথা আছে এবং তা এই আসরের সংবাদ প্রকাশের পরে উল্লেখ করা হবে।

অনুষ্ঠানটির বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় (শনিবার, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে) প্রকাশিত হয়—

The Sangit Parishad|A musical demonstration|Hindu Music and Sir Rabindranath :—

The musical demonstration given by the Parishad by way of a protest against the latest utterances of Sir Rabindranath Tagore on Indian Music came off last Friday evening at the Presidency Theatre. On the motion of Rai Jatindranath Chowdhury, Babu Motilal Ghosh was voted to the chair.

The demonstration opened with two Dhrupad songs by Sm. Jadumani and Prof. Jogindra Kishore Banerji of Parishad Vidyalaya. Babu Krishna Chandra Ghosh then read his paper which was explained by practical demonstrations....another song by the Lady Vice-Principal (যাদুমণি—লেখক) of the Vidyalaya.........

রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ 'সঙ্গীতের মুক্তি' নামে ভারতীয় সঙ্গীতের যে সমালোচনা করেন, তার প্রতিবাদে সঙ্গীত পরিষদ উক্ত অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন। সভার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক, শুধু একথা উল্লেখ করা যায় যে, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি মূল প্রতিবাদ প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত গান তাঁর কথানুবর্তী সার্থক তাল-সুরে গীত হয় শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে, ভারতীয় সঙ্গীতের তাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরুদ্ধে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের যে পাঁচটি গান সভায় গাওয়া হয় তার তিনটি গেয়েছিলেন যাদুমণি—'সে কাঁদনে হিয়া কাঁপিছে' (বাগেশ্রী। তাল : কীর্তি), 'বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে' (পূরবী। তাল : প্রতিমাঠ্য) এবং 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে' (বেহাগ। তাল : বসন্ত)।

যাদুমণি যে সুরে ও তালে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গান সেই সভায় গেয়েছিলেন সেই তিনটি গানের স্বরলিপি ও ছন্দের সঙ্কেত পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায়

প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি লিখিত ও সভায় পঠিত প্রবন্ধটি নিয়েই সেই পুস্তিকাটি —'হিন্দু সঙ্গীত ও কবিবর শ্যার রবীন্দ্রনাথ।' অনুষ্ঠানটির ছয় মাস পরে প্রকাশিত (২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫) সেই পুস্তিকার উক্ত লেখক যাদুমণির উদ্দেশে ভূমিকায় নিবেদন করেছেন—

"আপনার সুমার্জিত কণ্ঠ ও অশ্রান্ত শিক্ষানৈপুণ্যের সাহায্য না পাইলে আমি এই প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইতাম না। সুরতালাদি যে সমস্ত গুরুতর বিষয় একমধ্যে আলোচিত হইয়াছে, তাহা আপনারই অসামান্য শিক্ষাচাতুর্য-প্রসাদে সম্ভবপর হইয়াছে। আপনার সর্ববিধ দুষ্টদোষ-বিবর্জিত সুন্দর সুমিষ্ট আলাপ-রীতি দর্শন ও শ্রবণ করিলে, ওস্তাদ জীতিরূপ পদার্থটি আর চীনদেশীয় দুর্লঙ্ঘ্য-প্রাচীর বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেবল ইহাই মনে, আপনার অসামান্য কারুকার্যখচিত বিবিধ অলঙ্কার-বিমণ্ডিত যাবতীয় রাগরাগিণীর গায়নাদি শ্রবণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয় এবং এই বিশাল বিশ্ব যে ছন্দ ও সঙ্গীতময়, তাহা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।"...

এই আসরের বিবরণ যা পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে, এখানে যাদুমণির একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতের তাদের গুরুত্ব কতখানি এবং তা যে বিজ্ঞানসম্মত, এ কথা প্রদর্শন করবার জন্যে তিনি সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন এই সভায়। শুধু শিল্পী নয়, এখানে তাঁকে তাত্ত্বিক রূপেও পাওয়া যায়।

জীবন সায়াহ্নে এই বোধ হয় তাঁর শেষ বড় আসর। তার আট ন' মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। সে কথা বলবার আগে আরও কিছু জানবার আছে তাঁর বিষয়ে। বিশেষ করে তাঁর প্রথম জীবনের, একেবারে বালিকা বয়সের কথা। তাঁর প্রথম গান শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার কথা, যা প্রায় নাটকীয় বলা চলে।

ঘটনাটির কথা তাঁর নিজের মুখেই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদিন শুনেছিলেন, স্মৃতিচারণের সময়ে। এইভাবে তা বিবৃত করা যায় :—বর্ণনার সময়ের প্রায় ৫৫ বছর আগেকার কথা। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা ভবন। তার দোতলার জলসাঘরে তখন গানের আসর বসেছে। রূপদের আসর। বেতিয়া ঘরাণার খ্যাতিমান গায়ক গুরুপ্রসাদ মিশ্র ধ্রুপদ গাইছেন, পাখোয়াজে সঙ্গত হচ্ছে। শৌরীন্দ্রমোহন রয়েছেন আরও কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতাদের সঙ্গে। গান শুনতে শুনতে হল্-এর দরজার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তে শৌরীন্দ্রমোহন দেখলেন—দরজার সামনে পাপোষের ওপর একটা ছোট মেয়ে বসে গান শুনছে। লক্ষ্য করে দেখলেন, চেনা মনে হ'ল মেয়েটাকে। বাড়ীতেই অনেকবার দেখেছেন। বাড়ীতে কাজ করে মজুর, তারই মেয়ে শুনেছিলেন। ৯।১০ বছর বয়স হবে হয়ত। তাকে আসরের সামনের দরজায় বসে থাকতে দেখে শৌরীন্দ্রমোহন একজন পরিচারককে দিয়ে তাকে সরে যেতে বললেন। মেয়েটা চলে গেলে আবার গানে নিবিষ্ট হলেন শৌরীন্দ্রমোহন। খানিক পরে আবার দরজার দিকে চোখ পড়ায় দেখলেন, মেয়েটা আবার এসে পাপোষের ওপর বসেছে এবং এক মনে গান শুনছে। একদৃষ্টে গায়কের দিকে চেয়ে, অন্য কোন দিকে তার খেয়াল নেই, স্পষ্টই বোঝা গেল। শৌরীন্দ্রমোহন আশ্চর্য বোধ করলেন, এবার আর তাকে তাড়িয়ে দিলেন না। ধ্রুপদ গান একটা এই বয়সের মেয়ে 'এমন তন্ময় হয়ে শুনছে, এ কথা উপলব্ধি করে চমৎকৃত হ'লেন তিনি।

সেদিন আসরে যতক্ষণ গান হ'ল, তিনি লক্ষ্য করলেন, সে তেমনি স্থির হয়ে বসে শেষ পর্যন্ত শুনলে।

আসর ভেঙে যাবার পর শৌরীন্দ্রমোহন তাকে ডেকে আনালেন। সে তখন ভয়ে জড়সড়। তিনি তাকে অভয় দিয়ে জানতে চাইলেন যে, তার কি গান শিখতে ইচ্ছে করে? যদি তিনি ঐ ওস্তাদের কাছে শেখবার ব্যবস্থা করে দেন, সে শিখবে?

সে রাজি হ'ল। শৌরীন্দ্রমোহন তারপর তার গান শেখবার ভার দিলেন গুরুপ্রসাদ মিশ্রকে। মিশ্রজী দীর্ঘকাল শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-সভায় নিযুক্ত গায়ক ছিলেন এবং তাঁর কাছে মেয়েটি বহুদিন ধরে রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ পায়।

এমনি করে শৌরীন্দ্রমোহনের আনুকূল্যে সেদিনকার যে পরিচয়হীন মেয়েটি পণ্ডিত গুরুপ্রসাদের অধীনে গান শিখতে আরম্ভ করলে, সে-ই হ'ল তখনকার সুপরিচিতা গায়িকা যাদুমণি। কিন্তু মেয়েটি কিভাবে পেশাদার বাঈতে পরিণত হ'ল, থিয়েটারে যোগ দিলে, সমাজ-বহির্ভূত জীবনে চলে গেল—তার ক্রম-পর্যায়ের বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। যেমন জানা যায় না তার জন্ম-পরিচয়।...

যাদুমণির জীবনের শেষের অধ্যায় বর্ণনা করবার আগে তাঁর শিষ্য-প্রসঙ্গের কথা কিছু আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, সঙ্গীত পরিষদে তাঁর ৮।১০ জন ছাত্র ছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম হ'ল—অজয়পদ চট্টোপাধ্যায়, বিধুপতি চৌধুরী, গঙ্গাধর ঘোষ চৌধুরী, ইন্দুভূষণ প্রভৃতি। কিন্তু তাঁদের কেউই সঙ্গীত-জগতে কৃতী হন নি। সেজন্যে, শিক্ষাদানে একটি ছাত্রও রীতিমত তৈরী হ'ল না বলে আক্ষেপ করতেন যাদুমণি।

কিন্তু তাঁর মধ্যজীবনে এমন একজন ছাত্র তাঁর কাছে টপ্পা ও খেয়াল শিখেছিলেন, যিনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী। তিনি হলেন অগ্রগায়ক সাতকড়ি মালাকর। প্রথম জীবনে গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য সাতকড়ি মালাকর গুরুর শেষ বয়সে তাঁরই নির্দেশে যাদুমণির কাছে শিখতে যান। যাদুমণি তখন শোভাবাজারের সেই বিলাসী ধনীর আশ্রয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে গানের মধ্যে সাতকড়িবাবু চার মাত্রা আট মাত্রার টুকরো তানে যে মুন্সীয়ানা দেখাতেন, তা—তিনি বলতেন—যাদুমণির কাছে শেখা। সাতকড়ি মালাকরের সঙ্গীতজীবন যাদুমণির শিষ্য-কৃতি ও শিক্ষাদানের একটি নিদর্শন রূপে স্মরণ করা যায়।

যাদুমণির শেষ জীবনের ছাত্রদের মধ্যে অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় ধ্রুপদ ও খেয়াল চর্চা করতেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁর সঙ্গীতজীবন পরিণতি লাভ করে নি। আর একজন ছাত্র বিশ্বপতি চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও সাহিত্যিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন উত্তর জীবনে। যাদুমণির অন্তিম পর্বে এঁরা তাঁকে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছিলেন এবং তিনি যে যথার্থ সঙ্গীত-শিল্পী ছিলেন তার বহু পরিচয় পেয়েছিলেন।

দিনের পর দিন যাদুমণির সঙ্গীত শিক্ষা দেবার সময় তাঁরা দেখেছেন নানা রাগে তাঁর অসাধারণ অধিকার, তাঁর বিস্তার-নৈপুণ্য, তাঁর টপ্পার দানার অবলীলাক্রম, তাঁর ঠুংরির ভাবসম্পদ ও মাধুর্য। রবিবারের সান্ধ্য আসরে অন্যান্য গায়কদের সামনে এই বৃদ্ধার সঙ্গীতকৃতির যে পরিচয় পেতেন, বয়সের হিসাবে সে গুণপনা কদাচিৎ প্রকাশ পায়। গানের ক্ষমতা তখনও কতখানি আছে, তার প্রমাণ পান ভারত-সঙ্গীত সমাজে মহারাজা রামেশ্বর সিং-এর সেই আসরে। চিত্তরঞ্জনকে তাঁরই রচিত কাব্য-সঙ্গীত শুনিয়ে যে মুগ্ধ করেন, তা যাদুমণির শিল্পীসত্তার আর এক প্রকাশ। গায়িকার কাব্যপ্রিয় ভাবুক-মনের প্রকাশ।

ঘরোয়াভাবে যাদুমণির শিল্পীমনের নানা বিচিত্র রূপায়ণ তাঁরা মাঝে মাঝে দেখতেন।

ছাত্রদের অনুরোধে একদিন নৃত্য প্রসঙ্গে 'ভাও বাৎলানো' (ভাব প্রদর্শন) দেখিয়েছিলেন—হয়ত তা জগদীপ মিশ্রের শিক্ষার ফল। হাতের মুদ্রায়, মুখ-চোখের ভাব প্রকাশে রাধার কৃষ্ণ বিরহের আকুল ভাব 'হামে ছোড়কে দেশী যাবো' গানটির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতেন। বলতেন, 'আমি বসে বসেই দেখাব, চলে চলে দেখাতে পারব না।' (আগেকার আসরে সব নামকরা বাঈজীরাই, যেমন গহর জান, নূরজাহান, আগ্রার মালকা জান প্রভৃতিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আসরে ঘুরে-ফিরে ভাও বাৎলাবার সঙ্গে ঠুংরি গাইতেন—খাড়া ঠুংরি)। যাদুমণি তাঁর সেই মৃগচর্মের আসনে বসে রীতিমত শিক্ষাপটু ভাবে চোখের তারা ঘুরিয়ে, মুখে ভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে তাঁর পূর্ব জীবনে অধীত একটি নৃত্য-শিল্পের আঙ্গিকের পরিচয় দিতেন।

ঘরে এক একদিন কীর্তনাঙ্গে গান গেয়ে শোনাতেন ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে। সে আর এক রকমের রসোত্তীর্ণ সঙ্গীত। নিস্তব্ধ নিশীথিনীতে তিনি গোবিন্দদাসের পদ গাইছেন—

মাধব কি কহব দৈব বিপাক…

তাঁর কণ্ঠে যেন কথা ও সুরের ইন্দ্রজাল রচনা আরম্ভ হয়। বাইরে বসন্তের মায়ারজনী জ্যোৎস্নাধারায় আকুল। ঘরের মধ্যে ভাব-মুগ্ধা গায়িকা গেয়ে চলেছেন—

পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥
মন্দির ত্যজি যব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই ন পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ।
একে কুলকামিনী তাহে কুহযামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরখিয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর ॥
একে পদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূর গেল ॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস।

সে সুরের পরশমণিতে জ্যোৎস্নাময় নিথর রাত্রি যেন প্রাণ পেয়ে মুখর হ'ত। অভিসারিকা রাধার বেদনায় যেন আবেগ বিধুর হ'ত স্বরধারা। যেন মরু-মরীচিকা জগতে এমন জাত সঙ্গীত-শিল্পী তিনি।

তাই তাঁর সঙ্গীতে প্রাণের স্পন্দন থাকত আর অন্তরের গভীর অনুভব। একদিন বিশ্বপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। হাতে ছিল একটি কবিতার বই—কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'একতারা'। যাদুমণির সেদিন শরীর ভাল ছিল না, শুয়েছিলেন। কবিতার বই দেখে বললেন, 'একটা কবিতা পড়, শুনি।' ছাত্র বইটি খুলতেই বেরুল সেই পাতাটি—'ওরে পাখি, তরী হেথা বাঁধব না কো

আসরের মাঝে। তিনি শেষ পর্যন্ত কবিতাটি পড়ে শোনালেন। পড়া শেষ হ'তে দেখলেন—শ্রোত্রীর দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'কি চমৎকার এই লোকটির প্রাণ!' ব'লে বিছানা থেকে উঠে বললেন, 'সুর দাও ত, বিশ্বপতি।'

তানপুরায় সুর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়মণি গুনগুন করে গাইতে লাগলেন—ওরে মাঝি, তরী হেথা বাঁধব নাকো •। সমস্ত কবিতাটি (এটির গান হিসেবেও চলন ছিল, তিনি বোধ হয় আগে থেকেই জানতেন গানখানি) সাহানায় গেয়ে চললেন। কি করুণ, কি মর্ম বিদীর্ণকরা তাঁর সেই সুরের আবেগ! তাঁর সুরের জগৎ যেন ভাবের জগতের সঙ্গে, তাঁর আত্মা সুরের জগতের সঙ্গে এমন সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে বাঁধা ছিল যে, একটি ভাবের আঘাতেই ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। মর্মস্পর্শী এই কাব্যের আবেদনে জেগে উঠল তাঁর প্রাণের সুর। তাঁর সাহানা। তাঁর স্পর্শকাতর মন গানকে প্রাণস্পর্শী করে তুললে।

এমনিভাবে তাঁর শিল্পীসত্তার যেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় পান তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র এই দু'একজন ছাত্র, তেমনি মানুষটিকেও অত্যন্ত কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পান তাঁরা। অন্তিম পর্বে অনুতপ্ত, পাপ-ভয়ে উদ্বিগ্ন সে যেন আর এক ব্যক্তি-মানুষ এক একদিন বলতেন—'হ্যাঁরে, মানুষ পাপ করলে পরলোকে তার শাস্তি হয়, না রে?'

—আপনি কেন পাপের কথা, শাস্তির কথা এ সব ভাবছেন?

—ভাবব না, আমি কি কম পাপ করেছি? এর চেয়ে বড় পাপ মেয়েমানুষের আর কি আছে? কি করে জীবন কাটিয়েছি…

এমনিভাবে স্মৃতির দংশনে কাতর হতেন। আবার কোন কোন দিন বলতেন—হ্যাঁরে, আমি মরে গেলে তোরা কি রাস্তায় ফেলে দিবি, ডোমের হাতে দিবি?

—কেন এ কথা বলছেন?

—না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। আর ক'দিনই বা বাঁচব! মরে গেলে কি আমার সৎকার হবে না? সদ্গতি হবে না?

—আমরা আপনার সৎকার করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা আপনাকে সৎকার করতে নিয়ে যাব।

—সত্যি বলছিস, কিন্তু তোরা যে বামুনের ছেলে, তোরা কি পারবি?

—নিশ্চয় পারব, আপনি কেন ভাবছেন?

—আঃ, আমায় বাঁচালি। আমি মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করছি তোরা সুখী হবি, ভগবান তোদের ভাল করবেন। আমার সৎকার যদি তোরা করিস, তোদের পাপ হবে না।

—একটু থেমে বলেন—এজন্যে কোন পাপ হবে না রে। আমি বামুনের মেয়ে। আমার বাবা ব্রাহ্মণ ছিলেন।

এমনি অসতর্ক মুহূর্তে এক একদিন জন্মের কথা শোনা যেত বটে, কিন্তু তা থেকে সম্পূর্ণ জানা যেত না ও বিষয়ে।

একটি চন্দনা পাখী পুষেছিলেন। দু'একটা গানও শিখিয়েছিলেন আদরের পাখীকে। চন্দনা গাইত—সুখ হয়া তারা নাম তোমার…। গানগুলো অনেকটাই গলায় খেলত তার। একদিন বিশ্বপতি চৌধুরীকে পাখীটি দিয়ে বললেন—কবে আছি, কবে নেই, এটা তুমি বাড়ীতে নিয়ে রাখ।

তার কিছুদিন পরেই বাড়মণির সব যন্ত্রণার অবসান ঘটল। বয়স তখন ৬৫ বছর হবে। সঙ্গীত পরিষদ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরেকার কথা। (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ)

হাঁপানির অসুখ ছিল, মাঝে মাঝেই শ্বাসকষ্ট পেতেন। তবু মৃত্যু হয়েছিল আকস্মিক। সেদিন প্রথম রাতেও গান শিখিয়েছেন ছাত্রদের। তারপর রাত্রির কোন্ অলক্ষ্য মুহূর্তে চরমক্ষণ এসেছে, কেউ জানে না। পরের দিন সকালে স্নেহাস্পদ ছাত্ররা নগেন্দ্রনাথের মুখে শুনলেন শেষের সংবাদ।

সৎকারের যে আশ্বাস পেয়ে মাটির পৃথিবীর শিল্পী নিশ্চিন্ত ছিলেন, তা যথাযথ পালিত হয়েছিল।

উপরন্তু বিশ্বপতি চৌধুরী প্রমুখ উৎসাহী ছাত্রদের উদ্যোগে গায়িকার স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সে সভার সভাপতি এবং নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দুই প্রধান বক্তা।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় বাড়মণির গায়িকা হিসেবে খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা সেখানে বলেন। অমৃতলাল জানান—গায়িকার গানের জন্যে কাশেম বাবুদের বাড়ী থেকে এক'শ টাকার নোট জুড়ি-গাড়িতে বসে তাঁর বোতামের ঘরে গুঁজে দিতে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। নাট্যাচার্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাচনভঙ্গীতে আরও বলেন, কিন্তু বাড়মণি যে এতদিন বেঁচেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে জানতে পারলাম। আমি জানতাম তিনি অনেকদিন আগে মারা গেছেন, কারণ তাঁর কথা আর ইদানীং শুনি নি।

আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাড়মণির সঙ্গীত-গুণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ধরনের কথা বলেছিলেন যে—আমরা মানুষকে ঘৃণা করতেও চাই না, ক্ষমা করতেও চাই না, আমরা চাই মানুষকে ভালবাসতে।…

(ক্রমশঃ)

প্রায় টলতে টলতে শিথিল একটা বেদনা বুকে চেপে বাসবী নিজের চেয়ারে এসে বসল। নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর সব লোক বুঝি তার দিকে আঙুল নির্দেশ করে দেখাচ্ছে। ম্যানেজারের প্রিয়পাত্রী, তার নর্মসঙ্গিনী।

মিথ্যা এই অপবাদ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে যে সেটা থেকে নিষ্কৃতি পাবার বাসবীর বুঝি কোন উপায় নেই।

সামনে দিয়ে একটা বেয়ারা যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বাসবী এক গ্লাস জল দিতে বলল। জল পান করার আগেই ম্যানেজারের বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

ম্যানেজার সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

জলের গ্লাসে হাতটা রেখে বাসবী আবার হাতটা সরিয়ে নিল। অমিতেশ কি বলবে তা তার অজানা নয়। বিতানবাবু আর প্রীতি এসেছিল, সেই কথাই জানাবে।

কিন্তু এ কথা, এ সব কথা বাসবীকে জানানোর কি প্রয়োজন! অফিসের সব কিছুর ভার বাসবীর ওপর ন্যস্ত নয়। সে এ অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী, এই সহজ সত্যটা অমিতেশ মাঝে মাঝে বুঝি ভুলে যায়।

এ সব চিন্তা শুধু বাসবীর মনকেই আলোড়িত করে, এ কথা প্রকাশ করে বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অফিসে দাসখত লিখে দিয়েছে। মাসান্তে কয়েকমুঠো রজতখণ্ডের পরিবর্তে তার স্বাধীন চিন্তা, বিবেক সব কিছু বিসর্জন দিতে হবে।

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকতেই, অমিতেশ একটা কাগজ তুলে বাসবীকে দেখাল।

বিতানবাবু আর প্রীতিদেবী এসেছিলেন। আমাদের সলিসিটারও ছিলেন। কাগজপত্র সব সই হয়ে গেল। প্রতি মাসের কুড়ি তারিখের মধ্যে এঁরা অফিসে টাকা জমা দিয়ে যাবেন। বিতানবাবু অবশ্য বলছেন, তিনি কোথায় বুঝি ভাল চাকরি পেয়েছেন, টাকাটা মেয়াদ শেষ হবার অনেক আগেই তিনি শোধ করে দেবেন। কিন্তু আমার ত মনে হয়, সব কিছু প্রীতিদেবীই করবেন। অসমসাহসিকারই প্রাণপাত।

কতকগুলো শব্দের ঝঙ্কার, বিশেষ কোন অর্থবহ নয়। অন্তত বাসবীর কানে কথাগুলো কোন অর্থ বহন করে আনল না।

দুটো হাত জড়ো করে টেবিলের ওপর রেখে সে চুপচাপ বসে রইল।

একটু পরেই অমিতেশের দৃষ্টি পড়ল বাসবীর ওপর।

কি ব্যাপার, শরীর খারাপ না কি?

মাথাটা বড্ড ধরেছে।

বাসবী একটা যন্ত্রণার অভিনয় করল।

শরীরে অস্বস্তি একটা ছিলই, কিন্তু বাসবী বেশী অসুস্থতার ভান করল, যাতে এ সব শোনার হাত থেকে পরিত্রাণ পায়।

মাথা ধরেছে? অমিতেশ বাঁ এক হাত দিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলল, তারপর সেলোফেন কাগজে মোড়া একটা বড়ি বের করে বাসবীর সামনে রেখে বলল, নিন, অ্যাসপিরিনের বড়িটা জল দিয়ে খেয়ে নিন। মাথা ধরা ছেড়ে যাবে। কাজের চাপে মাঝে মাঝে বিকালের দিকে আমার যা অবস্থা হয়, সেইজন্য সব সময় কিছু বড়ি হাতের কাছে রেখে দিই।

একটু থেমে, বাসবীকে একটু পর্যবেক্ষণ করে, অমিতেশ

আমার মতন, যদি তেমন শরীর খারাপ বোধ করেন, তা হ'লে বাড়ী চলে যাবেন। আমার মনে হয়, একটু ঘুমালে হয়ত শরীরটা ঠিক হয়ে যেতে পারে।

বাসবী কোন উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। যাবার আগে ঘড়িটা হাতের মুঠোয় তুলে নিল।

নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। অবশ্য ঘড়িটা খাওয়ার কোন মানে হয় না। শরীর খারাপের কারণ অন্য।

বাসবী ঘড়িটা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল।

সামনের ফাইলগুলো আরো কাছে টেনে নিয়ে এল। কাজের মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করতে পারলেই চিন্তাটা দূর হয়ে যাবে। দু' কানের কাছে অভব্য যে কথার বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে, সেটারও অবসান হবে হয়ত।

কাজ করতে করতেই বাসবীর মনে হ'ল। এ একরকম ভালই হ'ল। সমস্ত ব্যাপারটার একটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গেল। তা না হ'লে ব্যাপারটা হয়ত কোর্ট পর্যন্ত গড়াত। দু' পক্ষের আলোড়নে জল কর্দমাক্ত হয়ে উঠত।

আর একটা কথা মনে হ'তেই বাসবী চমকে উঠল। কিছু বলা যায় না, বাসবীকেও সম্ভবত সাক্ষী হিসাবে এজাহার দিতে হত। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উকিলের জেরার উত্তর। বিপক্ষের উকিলের অশালীন ইঙ্গিত, কুৎসিত প্রশ্ন। অভিযোগের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার স্বরূপ।

সেই বিপদ থেকে বাসবী বেঁচে গেছে। তার পরিবর্তে ছোটখাট ধরনের দু'-একটা মন্তব্য হজম করতে হবে। এ ছাড়া আর উপায় নেই।

টিফিনের সময় খাবারের প্যাকেট হাতে বাসবী রুক্মার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছিল, বিভাস-প্রীতি প্রসঙ্গ একেবারে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে। রুক্মাকে স্পষ্ট বলবে, এসব শুনতে তার কোন আগ্রহ নেই। রুক্মা অন্য কথা বলুক।

উঁকি দিয়েই বাসবী বিস্মিত হ'ল। রুক্মা নেই। তার চেয়ারে অফিসেরই একজন কেরাণী বসে রয়েছে।

তার সঙ্গে আলাপ নেই, কিন্তু মুখ চেনা ছিল।

বাসবীকে দেখে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠল।

মিস পালিত আজ আসেন নি, তাই আমার এখানে ডিউটি পড়েছে।

বাসবী কিছু না বলে নিজের চেয়ারে ফিরে এল।

এতদিনের চাকরি-জীবনে রুক্মাকে বাসবী কোনদিন অনুপস্থিত হ'তে দেখে নি। ঘড়ির কাঁটার মতন তার উপস্থিতি তাকে আশ্চর্যই করেছে।

মানুষের অসুখ-বিসুখ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। খুব সম্ভব রুক্মা অসুস্থই হয়ে পড়েছে।

তারপরই কথাটা বাসবীর মনে হ'ল।

রুক্মা অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা করছিল। হয়ত কোথাও কিছু জুটে গিয়ে থাকবে।

অবশ্য রুক্মার উন্নতি হোক, এটাই বাসবী মনে-প্রাণে কামনা করে। কিন্তু রুক্মা চলে গেলে, সারা অফিসে বাসবী একমাত্র মেয়ে-কেরাণী হয়ে পড়বে। তবু মাঝে মাঝে সুখ-দুঃখের কথার আদান-প্রদান হয় রুক্মার সঙ্গে, সেটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে।

বাসবী টিফিন শেষ করল। অসুবিধা নেই। অফিস খালি। বসে বসেই ভাবল ছুটির পর একবার রুক্মার বাড়ী গেলে হয়। রুক্মার ঠিকানা তার জানা। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল, এই যাওয়া-আসাটা বাসবী রাখতে চায় না। এতে বিপদ আছে। বাসবী গেলেই, রুক্মা হয়ত আসবে। খবর না দিয়েই হাজির হবে বাসবীর জরাজীর্ণ সংসারের মাঝখানে। দারিদ্র্যের রূপটা প্রকট হয়ে পড়বে।

মাঝে মাঝে রুক্মাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে বাসবীরও ইচ্ছা হয়। অন্তত মা দেখুক, জানুক, বাসবী ছাড়াও অফিসে আর একজন মেয়ে-কেরাণী আছে। জীবিকার জন্য, সংসার বাঁচাবার জন্য অন্তহীন মেয়ের যে দল বাইরে বেরিয়েছে, এরা তাদেরই দু'জন মাত্র। বাসবীর মায়ের ভয় অমূলক।

হ'তে পারে কিছু মেয়ের হয়ত পদস্খলন ঘটে, সাধ্যের সীমানার বাইরের জীবনের স্রোতে কয়েকজন নিজেদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে, কিন্তু কয়েকজনকে দিয়ে সকলের বিচার চলে না। কত মুহূর্তে, পদে পদে এই সব মেয়েদের কল্যাণে রক্ষা পায়, তার হিসাব-নিকাশ করাটাও উচিত।

দিন গেল।

বাসবী মুখ তুলল। নিশিবাবু এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের কলম কানে গোঁজা।

শুনুন ?

সকালে বিভাসবাবু এসেছিলেন, ম্যানেজারের কাছে নিশ্চয় শুনেছেন।

আবার সেই এক প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি।

বাসবী ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, শুনেছে।

নিশিবাবু হাসল, হ্যাঁ, তা ত শুনবেনই, তারপর গলাটা খাটো করে বলল, ম্যানেজারের কামরায় ঢোকবার আগে বিভাসবাবু আমার কাছে বসেছিলেন কিছুক্ষণ।

এ কথা বাসবীকে বলার কি উদ্দেশ্য, সে ঠিক বুঝতে পারল না। বিভাস যেখানেই বসুক, যাই করুক, তাতে বাসবীর কি প্রয়োজন!

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বাসবী চেয়ে রইল।

আমরা যে কন্ট্রাক্টরদের কাছে গিয়ে তাতে স্টেটমেন্ট নিয়েছি সে খবরও ভদ্রলোক যোগাড় করেছেন। হ'তে পারে অফিসেরই কোন লোক বলেছে। এ অফিসে বিভাসবাবুর বন্ধুর ত অভাব নেই, তারা কেউ গোপনে সংবাদটুকু দিয়েছে।

কিন্তু বাইরে আমরা কি করেছি, কার স্টেটমেন্ট নিয়েছি সেটা ত অফিসের কোন লোকের জানবার কথা নয়।

বাসবীর অজ্ঞতায় নিশিবাবু বিস্মিত হ'ল।

চোখ-মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল, এ অফিসে দেয়ালেরও কান আছে। খবর ঠিক পেয়ে যায় সবাই। কোন খবর চাপা থাকে না।

বাসবী একটু বিব্রত হ'ল।

নিশিবাবু কি তাকে সন্দেহ করছে! দুর্বল মুহূর্তে অফিসের কাউকে বাসবী কথাটা বলে ফেলেছে। কুকাকে কিংবা বাসববাবুকে!

বাসবী কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করল।

যাক, ব্যাপারটা যখন মিটে গেছে, তখন আর এ সব আলোচনা করে কি লাভ! আপনি ত জানেন মাসে মাসে টাকাটা শোধ দেবার জন্য ওঁরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

হ্যাঁ, তা ত জানি। সে কথাও বিভাসবাবু বললেন। শুধু স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে তাঁকে এই কাজ করতে হয়েছে। স্ত্রীভিদেবী দিনরাত কান্নাকাটি করতেন, তা না হ'লে অফিসকে বিভাসবাবু শিক্ষা দিতে পারতেন। এভাবে তাঁর ওপর অন্যায় জুলুম করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা। তার ওপর আরো সব বিশ্রী কথা বললেন।

কি ?

এমন একটা কৌতূহল বাসবী প্রকাশ করতে চায় নি, কিন্তু প্রশ্নটা কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে যাবার পর তার খেয়াল হ'ল কৌতূহলটা অহেতুক। এতটার প্রয়োজন ছিল না। তবে বাসবী এটুকু বুঝতে পেরেছিল, নিশিবাবু যখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন কিছু একটা বলার কথা নিশ্চয় তার আছে। নিছক কোন একটা ঘটনার বিবরণ সে কোন দিনই দেয় না। কথার অভ্যন্তরে প্যাঁচ থাকে, অন্তর্নিহিত অর্থ একটা থাকে, কিংবা কারো প্রতি বিকৃত কুৎসা।

নিশিবাবু উত্তরের জন্য তৈরী হয়েই ছিলেন। বাসবীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ভদ্রলোক বললেন তাঁর স্ত্রীর ওপর নাকি ম্যানেজারের লোভ ছিল। অফিসের এক ফাংশনে আলাপ হবার পর থেকেই ম্যানেজার অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেছিলেন। বিভাসবাবু বাধা দিতে ম্যানেজারের বিষ নজরে পড়ে গেছেন। তখন থেকেই নাকি ম্যানেজার বিভাসবাবুকে জব্দ করার চেষ্টা করছেন।

বাসবী আরক্ত হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ মাথা তুলতে পারল না।

যখন মাথা তুলল, তখনও নিশিবাবু সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাসবীর চোখে চোখ পড়তেই বলল, আপনি আবার এসব কথা ম্যানেজারকে যেন কিছু বলবেন না। বিভাসবাবু যা বলে গেলেন, সেইটুকুই আপনাকে জানিয়ে দিলাম।

বাসবী চুপচাপ বসে রইল। একটি কথাও বলল না। বলার মতন কোন কথা যেন তার ছিলই না।

নিশিবাবু সরে যেতে, ভাবল, বিভাসবাবু কি শুধু এই ক'টা কথাই বলেছে। আর কিছু বলে নি? বলে নি, ম্যানেজারের ইদানীং ঝোঁকটা শ্রীভিদেবীর ওপর থেকে অফিসের কমিষ্ঠ মেয়ে-কেরাণীর ওপর পড়েছে। তাই তাকে সঙ্গে করে ট্যুরের নাম করে ম্যানেজার বিহারে বেরিয়েছিল। নিশিবাবুও উত্তরে কিছু বলেছে কি না, ঈশ্বর জানেন।

এক অফিসে কাজ করত দু'জনে। বিতানবাবুর সঙ্গে নিশিবাবুর সম্প্রীতির মাত্রা কতটা, বাসবীর জানবার উপায় নেই। তবে বলা যায় না, এমন একটা সুযোগ নিশিবাবু কি আর বৃথা যেতে দিয়েছে। হাবে-ভাবে, আকারে, ইঙ্গিতে বাসবীর সম্বন্ধেও হয়ত কিছু বলে থাকবে। সেই সব শুনেই বিতানবাবু বাসবীকে 'ম্যানেজারের পেয়ারের মেয়ে' এই আখ্যা দেবার সাহস পেয়েছে।

সেই মুহূর্তে বাসবীর মনে হ'ল কোথাও যদি একটু অন্নের সংস্থান থাকত, গোটা সংসারকে বাঁচাবার মতন সামান্য আশ্রয়, তা হ'লে এই অবসাদময় পরিবেশ থেকে বাসবী মুক্তি নিত। যেখানে মানুষের সম্মান নেই, মর্যাদা থাকে না, নির্বিচারে কুৎসা রটনা চলতে পারে, সেখানে কাজ করা অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার, শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয়।

অনেকটা পরে বাসবী শান্ত হ'ল।

বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এল। উত্তেজনা একটু প্রশমিত হ'লে কাজে মন দিল। সেই সঙ্গে মনকেও বোঝাতে সুরু করল।

পৃথিবীতে এ ধরনের লোক চিরদিনই থাকবে। বাসবী অফিসে চাকরি করছে বলেই এ ধরনের কুৎসা কানে আসছে এটা সত্য নয়। অফিসের বাইরেও এরা আছে। অনেক সময় নিজের সংসারেও থাকে। সংসারের চারপাশে।

বাড়ীতে বসে থাকলেও প্রতিবেশীরা বাড়ী বয়ে এমন কথা শুনিয়ে যেত। এ কুৎসার কোন মূল নেই। মূল নেই বলেই সতত সঞ্চরমান। যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই আত্মপ্রকাশ করে। ট্রামে-বাসে মাঝে মাঝে যে সব উড়ো মন্তব্য আসে, মানুষকে উত্যক্ত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে বাসবীর খেয়াল হ'ল।

আজ কাজ কিছুই হয় নি। কয়েকটা জরুরী চিঠি লেখা ছাড়া, অনেকগুলো ফাইল বাসবী স্পর্শই করে নি। মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল। কোন কাজে মন বসাতে পারে নি।

টিফিনের সময় ভেবেছিল, ছুটির পর কৃষ্ণার বাড়ীতে যাবে। কৃষ্ণাকে একবার দেখে আসবে।

কিন্তু অফিসের পর বাসবীর আর কোথাও যাবার ইচ্ছা করল না। আজ আর টিউশানি নেই। কোন রকমে বাড়ীতে গিয়ে শয্যায় আশ্রয় নেবার দুর্বার ইচ্ছে হ'ল। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহটাই যে তাতে স্বস্তি পাবে তাই নয়, ছিন্নবিচ্ছিন্ন মনটাও হয়ত শান্তি পাবে।

যদি অবশ্য কুটিল চিন্তা বাসবীকে না আচ্ছন্ন করে।

দিন সাতেক। তার মধ্যে বাসবী নিজের মনকে অনেকটা শক্ত করে নিল। কে কোথায় কি বলছে সেদিকে কান না দেওয়াই সমীচীন। কানে এলেও অগ্রাহ্য করবে।

কারণ, এ ছাড়া তার পথ নেই। চাকরি ছেড়ে শুধু টিউশানি-নির্ভর জীবনযাপন করার কথা চিন্তা করাও মূর্খতার পরিচয়। চরের শক্ত মাটির আশ্রয় থেকে বিক্ষুব্ধ জলরাশির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সামিল।

তা ছাড়া মেয়েদের পক্ষে কোন পথই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কুৎসা আর অপবাদের কণ্টক তাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী।

টিউশানির ব্যাপারে নিজে ভুক্তভোগী নয়, কিন্তু অনেক মেয়ের কাছ থেকে শুনেছে। ছাত্রীর দাদা, কাকা, মামার অহেতুক অন্তরঙ্গতা করার জন্য এগিয়ে আসে। বৃষ্টির দিনে ছাতি দিয়ে বাসষ্টপে পৌঁছে দেবার ছুতোয় সান্নিধ্য কামনা। অস্বীকার করলে কিংবা প্রত্যাখ্যান করলে টিউশানি রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে।

সে তুলনায় অফিসের চাকরি ত অনেক সুখের। তা ছাড়া, যখন এ ছাড়া নিজে বাঁচবার, সংসারকে বাঁচাবার বাসবীর অন্য পন্থা নেই।

কৃষ্ণা অফিসে আসছে। দু'দিন কামাই করার পর।

নতুন চাকরি পায় নি। অসুস্থই হয়ে পড়েছিল।

কৃষ্ণা আসতেই বাসবী দেখা করতে গেল।

কি ব্যাপার? আমি ভাবলাম বুঝি তোর একটা চাকরি জুটে গেছে।

কৃষ্ণা হাসল। নিজের কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, এই কপালে!

সকালের দিকে কথা বলার বেশী সময় পাওয়া যায় না। টিফিনের সময় দু'জনে পাশাপাশি বসল। বাসবী বলল, ভাবলাম তোমার বাড়ীতে একবার খোঁজ নিয়ে আসি।

পলকের জন্য কৃষ্ণা যেন একটু বিমর্ষ হয়ে গেল। ম্লান একটা ছায়া মুখের উপর। তারপর সে ভাবটা কাটিয়ে

ফিরে বলল, গেলেই পারতে? তবে আমাদের মতন গরীবের বাড়ীতে কি আর তুমি যাবে?

বাসবী হাসল, হ্যাঁ, সেই জন্যই ত যাওয়া হ'ল না। আমার বিরাট মোটর যদি তোমাদের ছোট গলিতে না ঢোকে।

কৃষ্ণা বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। বাসবীর প্রচ্ছন্ন পরিহাসের সুরটা তার কানে ধরা পড়ল না।

হঠাৎ বলল, মোটর? ম্যানেজারের মোটরে যাওয়া আসা করছ?

বাসবী হাসতে গিয়েও পারল না। সারা মুখে রক্তের সঞ্চার। সপ্তরথীর মতন তাকে আবেষ্টন করে সবাই তীর নিক্ষেপ করছে। তার যন্ত্রণা, তার বেদনার দিকে কারও দৃষ্টি নেই।

তবু বাসবী নিজেকে সামলে নিল।

কি ব্যাপার বল ত? মনটা কোথায় পড়ে রয়েছে? ম্যানেজারের মোটরের কথা আবার আমি কখন বললাম? আমি বলছি নিজের মোটরের কথা।

কৃষ্ণা অপ্রস্তুত হ'ল। হাসি দিয়ে সে ভাবটা ঢাকতে গিয়েও পারল না। দুটো হাত ওপরে তুলে ক্লান্তির ভাব করল, তারপর বলল, শরীরটা এখনও ভীষণ দুর্বল। আমি তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারি নি ভাই।

বাসবী আর কিছু বলল না। টিফিন শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

যাবার সময় তবু বলল, চলি, টেবিলে একগাদা ফাইল এসে জমেছে।

জোরে পা চালিয়ে বাসবী ভাবল। তাদের বাড়ী যাবার কথা বলতে কৃষ্ণা যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল, সে ভাবটা বাসবীর চোখ এড়ায় নি।

সেই একই সনাতন কারণ। বাইরের সাজপোশাকে, কিছুটা জাঁকজমকে ভিতরের দারিদ্র্য চাপা দেবার একটা অসহায় প্রচেষ্টা চলেছে। যেমন বাসবীর, তেমনই কৃষ্ণার। কৃষ্ণা যদি আচমকা বাসবীর সংসারে গিয়ে দাঁড়ায়, তা হ'লেও বাসবী কম লজ্জায় পড়বে না।

বিকালে বাসবী ছাত্রীর বাড়ী গিয়ে শুনল, ছাত্রী নেই। মাসীর বাড়ী গেছে। সারা দিনের পরিশ্রমের পরে বাড়তি ক্লান্তিটুকুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাসবীর খুব ভাল লাগল। এখনও রোদ রয়েছে গাছের পাতায় পাতায়। ধীরে ধীরে বেলা বড় হচ্ছে। অন্ধকার নামতে বেশ দেরি হয়।

রাস্তার মোড়ে এসে কিছুক্ষণ বাসবী অপেক্ষা করল। ট্রাম, বাস, সব এখনও কানায় কানায় পূর্ণ। এখনও ঘণ্টা দুয়েক অন্তত এমনই অবস্থা চলবে।

বাসবী উল্টো দিকে হাঁটতে সুরু করল। উজান বেয়ে গেলে হয়ত ট্রামে-বাসে আশ্রয় মিলতে পারে।

ফুটপাতে ফেরিওয়ালাদের ভীড়, সিনেমার সামনে জমাট জনতা, তা ছাড়া পথচারীর দল ত আছেই। ভীড় কাটিয়ে কাটিয়ে বাসবী ধীর পায়ে চলতে লাগল।

অনেকটা পথ এসে খেয়াল হ'ল। খেয়াল হ'তেই বাসবী ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এ কোথায় সে এসে দাঁড়িয়েছে। ভীড়ের ভয়ে ট্রামের রাস্তা ছেড়ে অপরিসর গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

জায়গাটা খুব চেনা-চেনা লাগছে।

রেলিং ভাঙা ছোট পার্ক। দু-একটা বেঞ্চ। জরাজীর্ণ অষ্টবক্র একটা গাছ রাস্তার ধারে।

এই পার্কেই বাসবী আর দীপক একদিন বসেছিল। দীপকের বাড়ী থেকে ফেরার সময়।

নিজের ওপরই বাসবী বিরক্ত হ'ল। এতদূরে চলে আসার কোন মানে হয়!

ফিরেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা কাজ করলে হয়। এতটা পথ যখন এসেছে, তখন দীপকের বাড়ীতে একবার দেখা করে গেলে হয়। দীপক নেই, বাসবী এ পাড়ায় এসেছিল, তাই একবার দেখা করতে এসেছে। সাধারণ ভদ্রতা, এর মধ্যে মনে করার মতন কি থাকতে পারে!

দীপকের বাড়ীর লোক খুশীই হবে। দীপকের বাবা, মা, বোন। কিন্তু এমনও ত হ'তে পারে, আর এটাই খুব স্বাভাবিক, দীপককে চিঠি লেখার সময় বাসবীর আসার কথা উল্লেখ করবে। দীপক নেই, তবুও মনে করে বাসবী তাদের খোঁজ করতে এসেছিল। বাসবীর সহৃদয়তা, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন সন্দেহ নেই।

দীপক হয়ত হাসবে মনে মনে। কল্পনায় তাস সাজিয়ে

সাজিয়ে নিজের মনোমত প্রাসাদ গড়ে তুলবে। কোর্টের ঘাসে যে স্বপ্নটুকু বাসবী দেখেছিল, সেটাই বাস্তবের রূপ নেবে। দীপক সোজাসুজি বাসবীকে চিঠিই লিখে বসবে।

অপবাদের কালি বাসবী গায়ে অনেক মেখেছে। নতুন করে কালি মাখার সাধ আর তার নেই। কিছু বলা যায় না, দেয়ালেরও কান আছে বিপিনবাবুর এই কথাটা সত্য হয়ে উঠবে। আবার নতুন করে অফিসে বিদ্রূপ আর কানাকানির ঝড় উঠবে।

বাসবী ট্রাম-রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

এ কি মা, তুমি এদিকে ?

একেবারে মুখোমুখি।

চমকে বাসবী মুখ তুলল। দীপকের বাবা রণজিতবাবু। হাতে একটা বোঝা। বোঝার ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে।

বাসবী ইতস্তত করল। হঠাৎ কোন কথা মুখে এল না। কথা বলতে হ'লে মিথ্যা কথাই বলতে হয়। অন্যমনস্ক হয়ে এতটা পথ চলে এসেছে এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বাসবী মিথ্যা কথাই বলল।

আমার একটি বান্ধবী অসুখ। তাকে দেখতে এসেছিলাম।

বা রে, এত কাছে এসে চলে যাচ্ছ। তার মানে আমাদের কথা তুমি একেবারে ভুলে গেছ। একটুও মনে নেই।

রণজিতবাবু বোঝাটা এক হাত থেকে আর এক হাতে নিল।

চল, চল। এত কাছে এসে ফিরে গেলে ভারি দুঃখ পাব।

বাসবীর ইচ্ছা হ'ল সশব্দে নিজের কপালে করাঘাত করে। অদৃষ্ট মন্দ, সন্দেহ নেই। নিজেরই তৈরি ফাঁদে পা দেওয়া ছাড়া তার পক্ষে আর গত্যন্তর নেই।

বাসবী রণজিতবাবুর পাশাপাশি চলতে শুরু করল।

একেবারে মুখ বুজে চলাটা বিসদৃশ ঠেকে, তাই বলল, আপনার হাতে ওটা কিসের বোঝা ?

আটার। গম ভাঙাতে গিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি।

এ বয়সে আপনাকে এসব কাজ করতে হচ্ছে, এ কথাটা বলতে গিয়েও বাসবী থেমে গেল।

এমন একটা প্রশ্ন অর্থহীন। দীপক এখানে নেই, চাকর-বাকর রাখার মতন সচ্ছল অবস্থাও ভদ্রলোকের নয়। বাড়ীর মেয়েদের দিয়ে নিশ্চয় এসব কাজ করান সম্ভব নয়।

কাজেই বাইরের সবটুকু কাজই এই বুড়োকেই করতে হয়।

দরজা ভেজান ছিল। হাত রাখতেই খুলে গেল। ঘর অন্ধকার।

রণজিতবাবু বলল, দাঁড়াও মা, আমি বাতিটা জ্বালাবার ব্যবস্থা করি।

বাসবী বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের মধ্যে বাতি জ্বলে উঠতে ভিতরে পা দিল।

ঘরের অবস্থা আগের চেয়েও একটু যেন পরিচ্ছন্ন। বিছানা-বালিশগুলোর ওপর রঙিন চাদর ঢাকা। টেবিলের ওপর বইয়ের স্তূপ অন্তর্হিত। মেঝের পেতে-দেওয়া মাদুরটাও প্রায় নতুন বলেই মনে হ'ল।

বাসবী বসতেই রণজিতবাবু অদ্ভুত এক কাণ্ড করল। হাতপাখাটা টেনে নিয়ে বাসবীকে বাতাস করতে লাগল।

বাসবী হাত নেড়ে বারণ করল।

ও কি করছেন আপনি ? আমার বাতাসের দরকার নেই। আপনিই বরং বরং ক্লান্ত।

রণজিতবাবু হাসল। এমন ভাবে পাখাটা ঘোরাতে লাগলেন যাতে দু'জনের দেহেই বাতাস লাগে।

প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, সত্যিই আর পেরে উঠি না। কবে যে দীপু বাইরে থেকে এসে সংসারের ভার নেবে।

ক্লান্তিতে শেষ দিকের কথাগুলো অস্পষ্ট শোনাল।

দীপকবাবু কেমন আছেন ?

কাল চিঠি এসেছে। লিখেছে ত ভালই আছে। যা ছেলে, শরীর খারাপ হ'লেও ত আমাদের জানাবে না। পাছে আমরা চিন্তিত হই। নিজের কথা কিছু লিখবে না, অথচ সবিস্তারে আমাদের খোঁজ নেওয়াটুকু চাই।

হঠাৎ রণজিতবাবু থেমে গেল। কি একটা কথা যেন তার মনে পড়ে গেছে। হাতপাখা ঘোরান বন্ধ করে অন্দরের দিকে একটু গলা বাড়িয়ে বলল, ওগো শুনছ, কোথায় গেলে ? কে এসেছে একবার দেখবে এস।

কিছুক্ষণ কোন শব্দ নেই। বাসবীর মনে হ'ল রণজিত-বাবুর ক্লান্ত কণ্ঠ বোধ হয় ভিতর পর্যন্ত পৌঁছায় নি।

একটু পরেই বাসবীর ভুল ভাঙল। চৌকাঠে একটা ছায়া দেখা গেল। তারপর ধীরপায়ে দীপালী ঘরে ঢুকল।

হাত বাড়িয়ে বোঝাটা তুলে নিতে গিয়েই থেমে গেল।

এ কি, আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

বাসবী কিছু বলবার আগেই রণজিতবাবু কথা বলল।

পথে দেখা হ'ল। পালিয়ে যাচ্ছিল, আমি ধরে নিয়ে এলাম।

দীপালী মুচকি হাসার চেষ্টা করে বলল, এদিকে কোথাও এসেছিলেন বুঝি?

যে মিথ্যা দিয়ে বাসবী শুরু করেছিল, তারই জের টানতে হ'ল তাকে।

এক অসুস্থ বান্ধবীকে দেখতে এসেছিলাম। পথে এঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

দীপালী আর দাঁড়াল না। যেতে যেতে বলল, মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একটু পরেই দীপকের মা এসে ঘরে ঢুকল।

চেহারা যেন আরও নির্জীব, আরও জীর্ণ। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে বলল, তুমি ত আমাদের ভুলেই গেছ মা। সেই গেলে আর এ পথ মাড়ালেই না।

বাসবী এ কথার উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল।

আপনার শরীরটা বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে।

প্রৌঢ়া সন্তর্পণে দেয়ালে ভর দিয়ে মাটির ওপর বসে পড়ল।

হেসে বলল, মরণ ত হচ্ছে না। এখন ত ভাঙনের দিকেই চলেছি। আর কি এখন শরীর ভাল হয়।

রণজিতবাবু বলল, শরীরটা রীতিমত খারাপ হয়েছে। দাঁড়ালেই মাথা ঘোরে। বুকের যন্ত্রণাও মাঝে মাঝে খুব বাড়ে। এক কবিরাজকে এনেছিলাম। তিনি বললেন, এ বয়সে ভাঙা শরীর জোড়া লাগবে এমন আশা করা যায় না। ওষুধ দিয়েছেন। সময়ে সময়ে ভাল থাকে, আবার দিনের পর দিন বিছানাতেও শুয়ে থাকে।

প্রৌঢ়া এর পর এক অদ্ভুত কাণ্ড করল।

একটু এগিয়ে এসে দুটো হাত দিয়ে বাসবীর একটা হাত আঁকড়ে ধরল। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলল, তুমি একটা উপকার কর মা লক্ষ্মী। দীপুকে এখানকার অফিসে বদলি করে দাও। এই সময়টা সে আমাদের কাছে থাকুক।

বিব্রত, হতচকিত বাসবী রণজিতবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, তার দু'চোখের তারায় একই অনুরোধের ছায়া কাঁপছে।

আস্তে আস্তে প্রৌঢ়ার মুঠি থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বাসবী বলল, কাউকে বদলি করা বা ফিরিয়ে নিয়ে আসার ক্ষমতা আমার নেই। আপনাদের ত আগেই বলেছি, আমি অফিসের একেবারে তলার দিকের সামান্য কেরাণী। এ ধরনের অনুরোধ করে আমায় লজ্জায় ফেলবেন না। আজ আমি উঠি।

বাসবী উঠতে যেতেই প্রৌঢ়া বাধা দিল।

তুমি বস মা, বস। আর এ ধরনের কথা তোমায় বলব না। এতদিন পরে এলে, একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও।

ততক্ষণে বাসবী দাঁড়িয়ে উঠেছে।

হাত দুটো জোড় করে বলল, মাপ করবেন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তা ছাড়া, আজ আর কিছু খাওয়ার কথা বলবেন না। আমি যে বান্ধবীকে দেখতে গিয়েছিলাম, তাদের বাড়ীতে একপেট খাইয়ে দিয়েছে।

দরজা খোলাই ছিল। বাসবী আর একটুও অপেক্ষা না করে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তা দিয়ে অনেকটা আসার পর বাসবীর খেয়াল হ'ল ব্যাপারটা বড় বেশী নাটকীয় হয়ে গেল। এভাবে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে, ধীর-সুস্থে উঠে না এসে, দ্রুত গতিতে চলে আসাটা অভদ্রতাসূচক। দীপকের বাবা আর মা বাসবীর এই ব্যবহারে মনোক্ষুণ্ণ হবেন।

কিন্তু বাসবীর সহ্য করারও ত একটা সীমা আছে। প্রতি পদে, প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে এমন একটা আচরণ সেও প্রত্যাশা করে না। সকলের ধারণা সে বুঝি এই অফিসের ওপর তলার লোক। তারই ইঙ্গিতে সারাটা অফিস চলছে।

কিছু বলা যায় না, দীপকও তার মা-বাপকে এমন একটা কথাই হয়ত বলেছে। বাসবীর এই ধরনের পরিচয়।

দীপকেরও হয়ত ধারণা, এই ক'দিনে সহকর্মীদের কাছ থেকে শুনে শুনে এমন একটা ধারণা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়, যে বাসবী নিজে খুব বড়-গোছের চাকরি একটা না করলেও, অফিসের কর্তার টিকি তার কাছে বাঁধা। ম্যানেজারের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, খেয়াল-খুশী সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করার ভার এই মহিলার ওপর।

এমনও হ'তে পারে, দীপক মাঝে মাঝে চিঠিতে এ কথা বাপকে স্মরণ করিয়েও দিয়েছে। যদি সুযোগ-সুবিধা হয়, মুখোমুখি দেখা হয় বাসবীর সঙ্গে, তা হ'লে তাকে অনুরোধ করলেই দীপক ফিরে আসতে পারবে কলকাতায়।

তার একটু আগে যে নাটকের অভিনয় হ'ল, তার সব কিছুর জন্য দায়ী দীপক। নেপথ্য নির্দেশনা তারই।

অসহ্য, অসহ্য।

সমস্ত শরীর বিজাতীয় ক্রোধে জ্বালা করে উঠল। বাঙলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানো পাপ। তবু যারা গৃহের আবেষ্টনীর মধ্যে জীবনযাপন করে, সংসারের ঘানিতে নিজেদের নিয়োজিত ক'রে, তারা তবু নিষ্কৃতি পায়, কিন্তু নিরুপায় হয়ে যাদের অন্ন খুঁটে নেবার জন্য পথে বের হ'তে হয়, তাদের মতন সন্তাপিনীদের অশেষ জ্বালা, অনন্ত দুঃখ।

হালো, হন হন করে কোথায় চলেছ ?

যান্ত্রিক একটা আর্তনাদ। ব্রেক কষার শব্দ। পথরোধ করে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে।

ট্যাক্সির কোটরে চোখ পড়তেই বাসবী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মনে মনে ভাববার চেষ্টা করল, আজ ভোরে শয্যাত্যাগ করে প্রথম কার মুখদর্শন করেছে। মা'র, রবির মা খোকনের ? কিংবা দরজা খুলে বোধ হয় গোয়ালার মুখোমুখিই দাঁড়িয়ে ছিল।

কি হ'ল, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে ?

বাসবী ঢোক গিলল। এভাবে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না চুপচাপ। কিছু একটা উত্তর দিতে হয়।

এবার আর মিথ্যা নয়। বাসবী সত্যি কথাটাই বলল।

আমাদের অফিসের একটি ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে আসছি।

বিদ্রূপে বেলাদেবীর ঠোঁটের দু'টি প্রান্ত কুঞ্চিত হয়ে গেল। ট্যাক্সির দরজাটা খুলে আচমকা বাসবীর একটা হাত আঁকড়ে ধরে বলল, আরে, এস, এস, মোটরে উঠে এস। যেখানে বলবে তোমাকে নামিয়ে দেব। মোটরে যেতে যেতে তোমার কাহিনী শোনা যাবে। উঠ্‌তি বয়সের মেয়েদের রোমান্স শুনতে চিরকালই আমার খুব ভাল লাগে।

না, না, আপনি যান। আমি ট্রামে যাব।

হাতটা বাসবী ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। পারল না। প্রৌঢ়ার লঘু মুষ্টি নয়, বেলাদেবী বেশ জোরে হাতের কব্জি আঁকড়ে ধরেছে।

ট্রামে কেন ? বলছি ত যেখানে বলবে তোমায় নামিয়ে দেব।

বেলাদেবী নাছোড়বান্দা।

ইতিমধ্যেই এপাশে-ওপাশে কিছু লোক জমে গেছে। কিছু কিছু গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। ড্রাইভারও যেন একটু বিরক্ত। এভাবে পথের মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে সে রাজী নয়।

আর একবার আকর্ষণ করতেই বাসবী ট্যাক্সির মধ্যে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও ভেবে নিল, এতে কি আর ক্ষতি! বেলাদেবী তার কি অনিষ্ট করতে পারবে ? কতটা ?

বরং বেলাদেবীর একটা পুরোনো ধারণার অবসান ঘটাতে পারবে বাসবী, এই চিন্তাতেই সে প্রফুল্ল।

কোথায় গিয়েছিলে বললে ? দরজাটা হাত দিয়ে বন্ধ করতে করতে বেলাদেবী আবার জিজ্ঞাসা করল।

আমার অফিসের এক সহকর্মী দীপকবাবুর বাড়ী।

গলার স্বরে বাসবী লজ্জার জড়তা ছোঁয়াল।

কৌতূহলে, আগ্রহে বেলাদেবীর দু'টি চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

বাসবীর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেকদিনের আলাপ বুঝি ?

মুখটা নীচু করে আস্তে আস্তে বলল, কলেজেও আমরা একসঙ্গে পড়তাম। এ অফিসে দীপককে আমিই ঢুকিয়েছি। অমিয়বাবুকে বলে।

অকারণ হাসিতে বেলাদেবী ফেটে পড়ল। ড্রাইভার পর্যন্ত চমকে উঠে একবার পিছন দিকে চাইল। কিছুক্ষণ

পরে হাসি থামিয়ে বলল, So, that's that। সেইজন্য তুমি অনিমেষের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে। নিজের প্রেমাস্পদকে চাকরিতে ঢোকাবার জন্য? আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। অবশ্য আমি তোমাকে যা বলেছি, তোমার ভালর জন্যই। অনিমেষকে নিয়ে কোন মেয়ে সুখী হ'তে পারে না, শান্তি পেতে পারে না। বিদেশ ঘুরে এলে হবে কি, অনিমেষের মধ্যে একটা প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন বাস করে। তার ইচ্ছা, এ যুগেও স্ত্রীরা এক-গলা ঘোমটা টেনে তার সংসার পাহারা দেবে। তাদের কোন বন্ধু থাকবে না, বাইরের জীবন থাকবে না, একেবারে পতি পরমগুরু মার্কা সতীলক্ষ্মী। Oh, dear, dear! কি backdated idea!

আর একবার হাসতে গিয়েই কি ভেবে বেলাদেবী থেমে গেল।

বাসবী চুপ করে রইল। মাথা নীচু করে। মনে মনে নিজের অভিনয়শক্তির তারিফ করল। এ একরকম ভালই হ'ল। পথে-ঘাটে দেখা হ'লে অবহেলা আর টিটকারি দেবে না, বিদ্রূপ করবে না। যদিও অনিমেষের সঙ্গে বেলাদেবীর আর কোন সম্পর্ক নেই, তা হ'লেও বাসবীরও যে কোন আকর্ষণ নেই অনিমেষের ওপর এটা জেনেও বেলাদেবী মনে হয় খুশীই হবে।

ঈশ্বর তোমায় বাঁচিয়েছেন বাসবী। আমি ত তোমাদের অন্তরঙ্গতা দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আর একটা মেয়ের জীবনে বুঝি অভিশাপের অন্ধকার নেমে গেল। আর একটা মেয়ের ভাগ্য পুড়ল। যাক, তোমার যে সবটুকুই ছলনা, আজ বুঝতে পারলাম। অবশ্য অনিমেষের ওপর আমার আর কোন বিদ্বেষ নেই। আমার যা পাওনা ছিল, তা সে দেরিতে হলেও কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবু মেয়ে হয়ে আর একটা মেয়ের সর্বনাশ আমি দেখতে পারব না।

বেলাদেবী হয়ত আরও অনর্গল বলে যেত, কিন্তু বাসবী বাধা দিল।

ঝুঁকে পড়ে বলল, ড্রাইভার, এখানে একটু রাখুন। আমি নেমে যাব।

মোটর থামল।

জানলা দিয়ে বেলাদেবী উঁকি দিল, তারপর বলল, এখানে তুমি থাক?

ভিতর দিকে ছোট গলিতে থাকি। এত ছোট সেখানে ট্যাক্সি ঢুকবে না।

শাড়ি সামলে নিয়ে বাসবী নেমে পড়ল।

ট্যাক্সি গতিশীল হতেই বেলাদেবী একটা হাত বের করে আন্দোলিত করল, গুড নাইট। তোমার আর দীপকের জীবন মধুময় হোক।

ভাগ্য ভাল বাসবীর। এ রাস্তায় খুব ভিড় নেই। বেলাদেবীর এ প্রগল্‌ভতার বিশেষ সাক্ষী কেউ রইল না।

এ গলিতে বাসবী থাকে না। ইচ্ছা করেই সে একটু আগে নেমেছিল। গাড়িতে বেলাদেবীর নিবিড় সান্নিধ্যে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বেলাদেবীর মুখ থেকে বিশেষ একটা গন্ধ তাকে আরো বেশী চঞ্চল করে তুলেছিল। কথাবার্তায় বেলাদেবী হয়ত মাত্রা ছাড়ায় নি, কিন্তু তার অহেতুক উচ্ছ্বাসকে বাসবী বরদাস্ত করতে পারছিল না।

যখন বাসবী বাড়ীর দরজায় গিয়ে পৌছল, তখন পরিশ্রান্তিতে তার সারা দেহ ভেঙে পড়ছে। দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। দেহের ক্লান্তি নয়, সবটুকু অবসাদ মনের। বিরাট একটা সাঁতারের পরে নিজেকে যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব মনে হচ্ছে।

বারান্দায় মা দাঁড়িয়েছিল। বাসবীকে দেখে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

কি রে, এত তাড়াতাড়ি চলে এলি? শরীর ভাল আছে তো?

মনে মনে বাসবী হিসাব করল। ছাত্রীর কাছে দু' ঘণ্টা কেটে যায়। কোন কোন দিন পড়াতে পড়াতে সময়ের খেয়ালই থাকে না। তারপর বাসে বাড়ী ফিরতেও সময় নেই। আজ সেই অনুপাতে বাসবী অনেক আগে ফিরেছে। দীপকদের বাড়ীতে মোটেই বসে নি, তারপর বেলাদেবীর কল্যাণে অনেকটা পথ ট্যাক্সিতে এসেছে।

কিন্তু তবু অন্যদিনের চেয়ে অনেক ক্লান্ত, দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে।

মাথাটা বড্ড ধরেছে, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

পাশ কাটাতে কাটাতে বাসবী বলল।

দরজা বন্ধ করে মা পিছন পিছন এল।

তুই টিউশানিটা ছেড়ে দে বাপ্পা। এত পরিশ্রম তোর সহ্য হচ্ছে না।

বাপ্পী মা'র দিকে ফিরে দাঁড়াল।

তারপর?

তারপর আমাদের যা হয় হবে, তা বলে তিলে তিলে তুই শেষ হয়ে যাবি, না হয় তা আমি দেখতে পারব না।

একটু মাথা ধরেছে তাতেই তুমি এত ব্যাকুল হচ্ছ মা।

তক্তপোষের ওপর রুবি আর খোকন পড়ছিল, বাপ্পী এসে তাদের পাশে বসল। ভ্যানিটিব্যাগটা পাশে রাখতেই কথাটা মনে পড়ল।

খোকনের দিকে চেয়ে বলল, খোকন, আমার জন্ত এক গ্লাস জল এনে দে ত।

খোকন এক লাফ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল, তারপরই জলভরা গ্লাস নিয়ে বাপ্পীর সামনে এসে দাঁড়াল।

রুবি দিদির কাছ ঘেঁষে বসে করুণকণ্ঠে বলল, আমি কি আনব দিদি।

বাপ্পী সস্নেহে রুবিকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমায় কিছু আনতে হবে না। তুমি আমার কাছটিতে বসে থাক।

ভ্যানিটিব্যাগ খুলে অমিতেশের দেওয়া অ্যাস্পিরিনের বড়িটা মুখে দিয়ে বাপ্পী জল খেল।

তোমার কি হয়েছে দিদি?

খোকন খুব ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

কিছু না, মাথাটা একটু ধরেছে। ওষুধ খেলাম, এখনি সেরে যাবে। তোমরা একটু সরে বস ত, আমি একটু শুয়ে থাকি।

ভাই-বোনদের পাশে পা মুড়ে বাপ্পী শুয়ে পড়ল। শুধু মাথাতেই তীব্র যন্ত্রণা নয়, বুকের মাঝখানেও একটা ব্যথা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বাপ্পী চোখ বন্ধ করল।

একটু পরে গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতেই চমকে বাপ্পী চোখ খুলল।

মা তার মাথার কাছে বসে হাতপাখা নাড়ছে।

বাপ্পী ধড়মড় করে উঠে বসল।

সর্বনাশ, একি করছ? তুমি যে আমায় সত্যিই রোগী বানিয়ে দিচ্ছ। বললাম না, মাথাটা একটু ধরেছে। এখনি ছেড়ে যাবে।

একটু বাতাস করলে আর কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে।

মা পাখা থামাল না।

একটা হাত দিয়ে বাপ্পী পাখাটা কেড়ে নিয়ে একপাশে রেখে দিল, তারপর নিজে উঠে বসল।

মাথার যন্ত্রণাটা একটু কম। খুলে-আসা চুলগুলো দু' হাত দিয়ে খোঁপার আকারে জড়িয়ে নিল।

মা তক্তপোষ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাপ্পীকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, হ্যাঁরে বাপী, একটা কথা বলবি?

কোন উত্তর দিল না। বাপ্পী মুখটা মা'র দিকে ফেরাল।

প্রায়ই তোর এই রকম মাথা ধরে, তাই না?

বাপ্পী অস্বীকার করল, প্রায় মাথা ধরবে কেন? কোন দিন কি এরকম হয়েছে দেখেছ?

হয়েছে কি না জানব কি করে বল? এত সকাল সকাল কোনদিন কি বাড়ী ফের?

উত্তর দিল।

একটু চুপ করে থেকে মা আবার অনুযোগ করল।

রোজ মাথা ধরে না ত ভ্যানিটিব্যাগে বড়ি ধরে বেড়াও কেন?

বড়িটা কোথা থেকে এসেছে বলতে গিয়েই বাপ্পী থেমে গেল। অফিসের ম্যানেজার মাথা ধরার বড়ি পর্যন্ত বিতরণ করছেন এমন একটা খবর মার কাছে মোটেই প্রতিমধুর হবে না।

যতই মিথ্যা কথা বলবে না বলে বাপ্পী প্রতিজ্ঞা করে ততই পাকে-প্রকারে তাকে সত্য গোপন করতে হয়। অন্তত আজ বিকাল থেকে তাই করতে হচ্ছে।

তবু এবারেও বাপ্পী মিথ্যা বলল।

মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে বলে মোড়ের দোকান থেকে একটা অ্যাস্পিরিনের বড়ি কিনে নিয়ে এলাম।

কথাটা বলেই বাপ্পী আর দাঁড়াল না। বাথরুমের দিকে চলে গেল। মাথা ধরাটা অনেক কম। যেটুকু আছে, স্নান করলেই সেরে যাবে।

তাই হ'ল। স্নান করে বাপ্পী অনেকটা সুস্থ হ'ল।

মা'র পাশাপাশি খেতে বসে কথাটা বলল।

জানো মা, আমাদের অফিসের সেই ব্যাপারটা মিটে গেছে।

কটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মা থেমে গেল।

কোন্ ব্যাপার ?

সেই যে বিতাসবাবুর চুরির ব্যাপারটা।

কি হ'ল ? টাকা দিয়ে দিয়েছে ভদ্রলোক ?

টাকাটা ভদ্রলোক নিয়েছে কি না তারই কোন ঠিক নেই।

তবে তোমা এত যে দৌড়-ঝাঁপ করলি ? কন্ট্রাক্টরা নাকি বলেছে লোকটা টাকা নিয়েছে। তুই আবার সে-সব কথা লিখে নিয়ে এলি ?

কন্ট্রাক্টরা বলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের সামনেই বলেছে। লিখেও নিয়ে এসেছি সত্যি কথা, কিন্তু কোর্টে এ সব টিঁকবে কি না কে জানে। টাকা ত নিতে কেউ আর দেখে নি।

ও মা, সবাইকে দেখিয়ে-জানিয়ে আবার কেউ টাকা নেয় না কি ?

মা বিস্ময় প্রকাশ করল।

তা নেয় না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে প্রমাণ না পেলে কোর্ট গ্রাহ্য করবে না। সন্দেহের বশে কোর্ট কাউকে শাস্তি দেয় না।

তা হ'লে ব্যাপারটা মিটে গেল বললি ?

বিতাসবাবুর স্ত্রী প্রীতিদেবী মাসিক কিস্তিতে টাকাটা শোধ করে দিতে রাজী হয়েছে।

তা হ'লে ত বোঝাই যাচ্ছে বাপু, তার স্বামী টাকাটা নিয়েছিল, নইলে খামোকা কেউ কি আর এত টাকা ফেরৎ দেবার দায়িত্ব নেয়।

অবশ্য কথাটা তাই দাঁড়াচ্ছে। যদিও বিতাসবাবু এখনও বলে বেড়াচ্ছেন শুধু স্ত্রীর জন্যই এমন একটা ব্যাপারে তিনি রাজী হয়েছেন। টাকা তিনি নেন নি।

মা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অন্য দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, এ ত কম সুবিধা নয়। থোক টাকা দরকারের সময় তুলে নিলাম, তারপর দরকার মিটলে আস্তে আস্তে নিজের সুযোগ-সুবিধা মত অল্প অল্প করে শোধ দিয়ে দিলাম। এমন সুবিধা থাকলে আমাদের বাড়ীর মানুষটার এমন অবস্থা হ'ত না।

মা'র কথাগুলো বাসবী ঠিক বুঝতে পারল না। বিতাসবাবুর অবস্থার সঙ্গে মা কার তুলনা করছে ? বাসবীর ? বাসবী অফিসের টাকা সরিয়ে নিয়ে সংসারের গর্ত ভরাট করবে, তারপর ধরা পড়লে আস্তে আস্তে কিস্তিবন্দী ভাবে শোধ করবে টাকাটা ?

কার কথা বলছ মা ? কিসের সুবিধা ?

না, তোর বাপের কথাটা ভাবছি বাসী। এমন সুযোগ থাকলে অফিস থেকে থোক টাকা তুলে অনায়াসে তোর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারত। তারপর এক সময়ে টাকাটা শোধ করত।

বাসবীর দুটো চোখ জ্বলে জ্বলে উঠল। দারিদ্র্য মানুষকে বুঝি এমনই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে ? এমনই বিবেচনাহীন ?

কিন্তু একটা কথা এখনও তোমায় বলা হয় নি মা।

কি কথা ?

বিতাসবাবুর চাকরি নেই। চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সন্দেহের বশে কোর্টে শাস্তি হয় না বটে, কিন্তু অফিসে চাকরি যেতে কোন বাধা নেই।

মা নিস্পলক নেত্রে বাসবীর দিকে চেয়ে রইল। ভাষাহীন দৃষ্টি। খাওয়ার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে।

তার মানে, তেমন কোন কাজ করলে বাবার চাকরি যেত। বিয়ে হয়ত সেই টাকায় আমার হয়ে যেত, কিন্তু অফিসের টাকাটা শোধ হ'ত কি করে ? কে শোধ করত ? তুমি, না আমি ? বাবাকে কত বড় একটা অসম্মানের ভাগী হয়ে এ পৃথিবী থেকে চলে যেতে হ'ত সে কথাটা ভেবেছ একবার ! এখন ত শুধু আমরা দুঃখের অন্ন সবাই মিলে ভাগ করে খাচ্ছি, তখন আমাদের পরিণামটা কি হ'ত ভাব দেখি ?

বাসবীর কণ্ঠস্বর প্রয়োজনের চেয়েও একটু বেশী উচ্চগ্রামে হয়ে যেতে, মাও একটু ভয় পেয়ে গেল।

আমি অত সব ভেবে বলি নি বাসী। তোর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতাম।

এত কষ্টেও বাসবীর হাসি পেল।

হাসি চেপে বলল, আমার ব্যবস্থা হ'লে সংসারের কি হাল হ'ত মা ? এ শুধু দু'বেলা দু'মুঠো জুটছে, তখন ?

সে যা হবার হ'ত। তোর এ কষ্ট আমি আর দেখতে

পারি না। দরকার হ'লে আমি না হয় লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করেও কোন রকমে সংসার চালাতাম।

সেটা কি খুব সম্মানের হ'ত না? তা ছাড়া দাসীগিরি করে সংসার চালালে এ ভাবে আর পাকা বাড়ীতে বাস করতে পারতে না। ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানোও সম্ভব হ'ত না। আমার জন্ত তুমি অযথা চিন্তা করছ না। তোমাদের মাথা নীচু হয়, বাবার স্মৃতির অমর্যাদা হয়, এমন কাজ আমি কোনদিনই করব না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

কথা শেষ হবার আগেই বাসবী মাথা নীচু করে ফেলল। দু' চোখ জলে ভরে এসেছে। সে জল মা'র নজরে পড়ুক, চায় না বাসবী।

সেদিন অফিসের চেয়ারে গিয়ে বসতেই বাসববাবু বাসবীর সামনে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে টেবিলের ওপর রেখে বলল, সামনের বুধবার, সন্ধ্যা ছ'টার রঙমহল থিয়েটারে আমাদের দুই পুরুষ অভিনয়। এবার আর কোন ওজর শুনছি না। যেতেই হবে আপনাকে।

কার্ডটা তুলে নিয়ে বাসবী পড়ল, তারপর বলল, বুধবার বিকালে আমার টিউশানি রয়েছে যে?

ওটা একদিন ম্যানেজ করুন, কিংবা সোজা ডুব মারুন। মোট কথা এ অভিনয় দেখতে আপনি যদি না যান ত আপনার সঙ্গে ঝগড়া। একেবারে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দেব।

কথাটা শেষ করে বাসববাবু হাসল।

কার্ডটা ভ্যানিটিব্যাগের মধ্যে রাখতে রাখতে বাসবী বলল, এখনও ত দিন-চারেক দেরি আছে। আমি যাবার বিশেষ চেষ্টা করব। খুব বড় রকমের বাধা যদি না আসে ত নিশ্চয় যাব। আপনার অভিনয় দেখার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। আপনি কি সাজছেন?

বাসববাবু হাসি থামাল না। বলল, কি মনে হয় আপনার? ধরুন তামাক।

তার মানে?

বাসববাবুর রসিকতার তাৎপর্য বাসবী সত্যিই গ্রহণ করতে পারল না।

বাসববাবু বলল, অভিনেতাদের তামাক সাজবার ত একজন লোকের দরকার।

বাজে কথা রাখুন। আপনার কি রোল বলুন?

নুটবিহারী।

কলেজে কি এক অনুষ্ঠানে একবার 'দুই পুরুষ' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। কলেজের ছেলে-মেয়েরাই বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিল। বাসবী কিছু সাজে নি। অভিনয়ে কোনদিনই তার কোন আসক্তি ছিল না। পারদর্শীতাও নয়। দর্শকের আসনে বসে শুধু দেখেছে। কাজেই নাটকের বিষয়বস্তু তার জানা। নুটবিহারী যে মুখ্য চরিত্র সেটা বুঝতে তার কোন অসুবিধা হ'ল না।

আপনি একেবারে শ্রেষ্ঠাংশে?

বাসববাবু সরে যেতে যেতে বলল, মহাফলে হনুমানের যেমন শ্রেষ্ঠ অংশ। যাক্‌, আমি কি দরের অভিনেতা, সেটা দেখে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবেন।

বাসবী মনে মনে ঠিক করেই ফেলল, এবার বাসববাবুর অভিনয় দেখতে যাবে। আগের বারের নিমন্ত্রণ রাখতে পারে নি, এবার রাখবে। এক সঙ্গে কাজ করে, বার বার তাকে প্রত্যাখ্যান করাটা সমীচীন হবে না।

টিউশানিটা আগের দিন সেরে রাখবে। অফিসের পরে সোজা রঙমহলে চলে যাবে।

তাই ঠিক হ'ল।

বুধবার বাসবী অফিসে এসে বাসববাবুর খোঁজ করেছিল। বাসববাবু আসে নি। অভিনয়ের দিন বোধ হয় অফিসে আসে না।

টিফিনের সময় বাসবী রুমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি যাচ্ছ ত?

কোথায়?

রঙমহলে, বাসববাবুদের থিয়েটার দেখতে।

বাসববাবু কার্ড একখানা দিয়ে গেছেন, কিন্তু আমার যাওয়া হবে না। বাবার শরীরটা ক'দিন ভাল যাচ্ছে না। আজ ভাবছি, ফেরার সময় একেবারে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

একটু থেমে রুমা প্রশ্ন করল, তুমি যাবে না কি?

ভাবছি এবার যাব। আর একবার 'ভদ্রলোক বলে-ছিলেন, যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এমনি ত আর থিয়েটার-

সিনেমা দেখা হয় না। সিনেমা মাঝে মাঝে যাওয়া হয়, থিয়েটারের বা প্রদর্শনী, তাতে আমাদের পক্ষে যাওয়া দুষ্কর। বিনামূল্যে একবার দেখেই আসি।

হ্যাঁ, ঘুরে এস। আমি বাসববাবুর অভিনয় বার কয়েক দেখেছি। ভদ্রলোকের এলেম আছে।

পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বাসবী তৈরি হয়ে নিল। গোটা দুই ফাইলের কাজ বাকি ছিল, সেগুলো পরের দিনের জন্য রেখে দিল।

তাড়াতাড়ি না উঠলে ট্রামে উঠতে পারবে না। বাসববাবু বলেছে, ঠিক ছ'টার সময় অভিনয় আরম্ভ হবে।

বাসবী যখন রঙমহলের সামনে গিয়ে পৌঁছাল, তখনও ছ'টা বাজতে মিনিট পঁচিশ বাকি। বাসবী ঠিক করল, হাতে যখন সময় আছে, তখন কোন রেস্তরাঁয় ঢুকে কিছু খেয়ে নেবে। বাড়ী যেতে বেশ রাত হয়ে যাবে। সামান্য টিফিন, কখন হজম হয়ে গিয়েছে।

বাসবী প্রবেশপথে কার্ডটা দেখাতেই ভদ্রলোক তাকে সসম্মানে একেবারে সামনের সারির একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

বাসবীর দিকে নীচু হয়ে কৈফিয়তের সুরে বলল, পরেশদা ভিতরে রং মাখছেন, নয়ত তিনি নিজে এসে আপনাকে বসাবার বন্দোবস্ত করতেন।

পরেশদা!

দু' এক মুহূর্তের বিহ্বলতা। পরেশদাকে বাসবী ঠিক চিনে উঠতে পারল না। একটু পরেই তার খেয়াল হ'ল। বাসববাবুর আসল নাম পরেশ। বাসবের ভূমিকা অভিনয় করার জন্য অফিসের লোক তার আসল নামটা বিস্মৃতই হয়েছে।

একটু একটু করে হলে জনসমাগম সুরু হ'ল। সামনের দু' সারি প্রায় খালি। পিছনে বসা মহিলারা দু' একজন কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে বাসবীকে দেখল। আর একটি ভদ্রলোক একটি প্রোগ্রাম বাসবীর হাতে দিয়ে গেল।

এ পর্যন্ত কোনদিক দিয়ে বাসবী কোন অসুবিধা বোধ করে নি, কিন্তু বাতিগুলো নেভার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গেটে দাঁড়ানো ভদ্রলোকটি আপ্যায়ন করে যাকে নিয়ে এসে একেবারে বাসবীর পাশের সীটে বসিয়ে দিল, তাকে দেখেই বাসবীর রক্ত জল হয়ে গেল।

সর্বনাশ। এমন একটা সম্ভাবনার কথা সে কল্পনাও করে নি, অথচ এ ব্যাপারটা যে ঘটতে পারে, এটা বাসবীর জানা উচিত ছিল।

লোকটি বসার সঙ্গে সঙ্গে বাতিগুলো নিভে গেল। হ'ল অন্ধকার।

অনিমেষ রায় সম্ভবত পাশে বসা বাসবীকে চিনতে পারে নি, সেইজন্যই সে মাঝখানে একটা সীট খালি রেখে পাশের চেয়ারে গিয়ে বসল।

কিন্তু বাসবী জানে এ ব্যবধান সাময়িক। এ অন্ধকার অনন্তকাল থাকবে না। আলো জ্বলে উঠলে, বাসবীকে দেখতে পেলেই অনিমেষ সরে এসে বসবে। একেবারে বাসবীর পাশের সীটে।

পিছনের দর্শকশ্রেণীর মধ্যে অফিসের কিছু লোক অবশ্যই আছে। বাসববাবু নিশ্চয় শুধু রুক্মা, বাসবী আর অনিমেষ রায়কে কার্ড দেয় নি। তারা ম্যানেজার আর স্টেনো-কেরাণীর এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য নাটকের দৃশ্যাবলীর চেয়েও বেশী উপভোগ করবে।

বাসবী যা আশঙ্কা করেছিল, তাই হ'ল।

একটা দৃশ্যের পরে আলো জ্বলে উঠতেই অনিমেষের চোখে পড়ল।

এ কি আপনি? তখন আমি অন্ধকারে দেখতে পাই নি।

উত্তরে বাসবী শুধু মুচকি হাসল। এটা কথাবার্তা বলার জায়গা নয়। এখনই আর একটা দৃশ্য সুরু হবে। সামনের সারিতে কথাবার্তা হ'লে পিছনের লোকের শোনবার অসুবিধা হবে।

কিন্তু একদিক দিয়ে অনিমেষ বাঁচাল। মাঝখানের খালি সীটে আর সরে এল না। কি ভেবে, বাসবীর জানা নেই। হয়ত পিছনে বসা অফিসের অন্য লোকের কথাটা চিন্তা করে থাকবে। কিংবা ইচ্ছা হ'ল না সরে আসতে।

একটু যেমন স্বস্তি পেল বাসবী, তেমনই মনের গোপন কোণে একটা কাঁটাও বিঁধে রইল। অনিমেষ অফিস থেকে সোজা আসে নি। বাড়ী থেকে পোশাক বদলে এসেছে। ধুতি-পাঞ্জাবিতে অনিমেষকে ভারি মনোরম দেখাচ্ছে।

দৃশ্য সুরু হ'তে বাসবী আবার মঞ্চের দিকে নজর দিল।

অপূর্ব অভিনয় করছে বাদলবাবু। চলনে, বাচনভঙ্গিতে একেবারে নিখুঁত।

এ দৃশ্য শেষ হ'তেই অমিতেশ উঠে দাঁড়াল।

বাসবী মনে মনে প্রমাদ গণল। এইবার হয়ত বাসবীর পাশে এসে বসবে। দু' একজন করে সামনের সারিতেও লোক আসতে সুরু হয়েছে। অমিতেশের বোধ হয় ভয় হয়েছে, কি জানি সামনের আসনটা বাইরের কোন লোক যদি অধিকার করে বসে!

কিন্তু অমিতেশ বসল না।

বাসবীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি চলি। আপনি যাবেন, না দেখবেন?

বাসবী বুঝতে পারল এদিকের সারির দু' একজন ভদ্রলোক মুখ তুলে দেখল।

বাসবী মাথা নাড়ল, না, আমি শেষ অবধি থাকব।

অমিতেশ হাসল, খুব ভাল, সব ব্যাপারের শেষটুকু দেখে যাওয়াই ভাল।

অমিতেশ আর দাঁড়াল না। সামনের পর্দা উঠছে, তাই দ্রুতপায়ে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এল।

এতক্ষণ বাসবী জড়সড় হয়ে বসেছিল। এইবার সহজ হ'ল। সীটের হাতলে দুটো হাত রাখল। ভ্যানিটিব্যাগ থেকে ছোট রুমাল বের করে কপালের ক্ষরিত ঘামের বিন্দু মোছার চেষ্টা করল।

কিন্তু এ কথা কেন বলল অমিতেশ? শেষ দেখার কথা। কিসের শেষ!

সেজোদেবীর সঙ্গে যে তার দেখা হয়েছিল, এক ট্যাক্সিতে দু'জনে এসেছে কিছুটা পথ, এ কথা বাসবী অমিতেশকে বলে নি। বলার মতন ছিলও না কিছু, আর সব কথাই যে অমিতেশকে জানাতে হবে এমন কোন অলিখিত চুক্তিও তার সঙ্গে নেই।

এমন কি হ'তে পারে, সেজোদেবীর সঙ্গে অমিতেশের দেখা হয়েছে। সেজোদেবীই হয়ত বলেছে বাসবীর কথা। দীপকের সঙ্গে বাসবীর ঘনিষ্ঠতার খবর। তার বাড়ীতে বাসবীর গোপন অভিসারের সংবাদ।

অমিতেশ অবশ্য জানে দীপক এ শহরে নেই। দীপকের সঙ্গে দেখা করতে বাসবী যায় নি। কিন্তু সেজোদেবীর কিছুই অসাধ্য নয়। মিথ্যার জাল বুনে এটাও হয়ত অমিতেশকে জানিয়েছে বাসবীর তার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই, কোন আকর্ষণ ছিল না। তবু দীপককে অফিসে ঢোকাবার জন্য বাসবী অমিতেশের সান্নিধ্য কামনা করেছিল।

মিথ্যা হ'লেও এমন একটা কথা যে কোন পুরুষের পৌরুষে আঘাত লাগার পক্ষে যথেষ্ট। কোন মেয়ে তাকে সোপান হিসাবে ব্যবহার করেছে এমন একটা অপবাদ কোন পুরুষই বরদাস্ত করতে পারে না।

হঠাৎ কানে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর আসতেই বাসবী চমকে সোজা হয়ে বসল। চোখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল, তারপর মঞ্চের দিকে নজর দিল।

আমি ত ফিরে যাব ব'লে আসি নি ছুটকি।

কল্যাণী এসে দাঁড়িয়েছে মঞ্চের ওপর। বিধবার বেশ। রুক্ষ, শুষ্ক চেহারা। অনন্ত শিখার মতন।

একটু দ্বিধা, একটু ইতস্তত ভাব, কিন্তু তারপরই বাসবী চিনতে পারল।

প্রীতি, বিভাসবাবুর স্ত্রী কল্যাণী সেজেছে।

আশ্চর্য, প্রীতিও যে অভিনয় করছে এ কথা বাদলবাবু একবারও বাসবীকে বলে নি। অবশ্য বাসবীকে যে বলতেই হবে এমন কোন কথা ছিল না। প্রীতি সখের থিয়েটারে অভিনয় করে অফিসশুদ্ধ লোকের জানা। বাসবীরও না জানবার কথা নয়। ইদানীং প্রীতি নিয়ম করে মঞ্চে নামবে এটা বাসবীর অন্তত জানা উচিত ছিল। অনেক টাকা পরিশোধের চুক্তিপত্র প্রীতি সই করেছে। সই অবশ্য বিভাসও করেছে। কিন্তু প্রীতি মুখ্য, বিভাস গৌণ। যত কিছু দায়-দায়িত্ব সব প্রীতির।

সেই ঋণ পরিশোধের পালা সুরু হয়েছে।

কিন্তু অনবদ্য অভিনয় করছে প্রীতি। আহত-অভিমান, রাম বিদায়ের আঘাত, ছুটকিরাণীর প্রতি শ্রদ্ধা-মেশানো গোপন ভালবাসা, চোখের তারায়, মুখের রেখায় প্রীতি অপূর্ব ভাবে প্রকাশ করছে। ছুটকিরাণীর কথার উত্তরে সেখানে বলছে, মনে আছে ছুটকি,

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।

উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তিতে সারা প্রেক্ষাগৃহ গম গম করে

ওঠে। কোথাও সামান্য শব্দও নেই। একটা সূচ পড়লে বুঝি তার আওয়াজ শোনা যাবে।

আবিষ্টের মতন বাসবী বসে রইল।

ছুটবিহারী আর কল্যাণী বাস্তব অভিনয়ের ধারাস্রোতে সকলকে সিক্ত, মোহিত করে দিল। দৃশ্যের পর দৃশ্য অনাস্বাদিত রসসম্ভারে সমৃদ্ধ।

যবনিকা নেমে আসতে বাসবীর খেয়াল হ'ল। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ। পিছনের সারির কয়েকজন কল্যাণীর প্রশংসায় মুখর।

প্রীতি হালদার বহুদিন স্টেজ ছেড়ে দিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে।

এসব মেয়ে অনায়াসেই পাবলিক স্টেজে নামতে পারে।

পরেশবাবু ত পাকা অভিনেতা, তাঁর কথা আলাদা, কিন্তু এ রকম কল্যাণী না পেলে তাঁর ছুটবিহারীর ভূমিকা এতটা খুলত না।

শুনছেন।

বাসবী একমনে পিছন থেকে ভেসে-আসা সমালোচনা শুনছিল, হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমাকে বলছেন?

পাশে দাঁড়ানো অল্পবয়সী ছোকরাটির দিকে বাসবী চোখ ফেরাল।

আপনাকে পরেশদা একবার ভিতরে ডাকছেন।

আমাকে?

হ্যাঁ, আপনিই ত মিস বাসবী সেন।

কিন্তু ভিতরে কোথায়?

স্টেজের ভিতরে। আপনি একটু তাড়াতাড়ি আসুন, এখনই ড্রপ উঠবে।

বাসবী উঠে দাঁড়াল। জীবনে খুব বেশী থিয়েটার সে দেখে নি। যে ক'টা দেখেছে মঞ্চের সামনে বসে। মঞ্চের পিছনের রহস্যের ওপর দুর্নিবার একটা আকর্ষণ তার ছিলই। এতে আর কি ক্ষতি! অন্য ক্লাবের অভিনয়। মহিলা-শিল্পীরা কেউ নিষিদ্ধ পল্লী থেকে আহরিত নয়।

বাসববাবু উইংসের কাছে একটা চেয়ারে বসেছিল, বাসবীকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

আসুন মিস সেন, কেমন লাগছে বলুন।

কোথা থেকে কে একজন চেয়ার টেনে দিল বাসবীর দিকে। বাসবী বসল।

বলল, খুব ভাল লাগছে। ভেবেছিলাম দু' একটা সিন দেখে উঠে যাব, কিন্তু উঠতে পারলাম না। আপনার আর কল্যাণীর অভিনয় বিশেষ করে অনবদ্য। আমার ত অদ্ভুত ভাল লাগছে।

অনেক ধন্যবাদ। শেষ অবধি থাকবেন। আমার মৃত্যু-দৃশ্যটা না দেখে উঠবেন না। শেষ সিনটাই একটু difficult সিন। মনে হয় আপনার ভাল লাগবে।

কথার মাঝখানে বাসববাবু হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্তরালের দিকে চেয়ে বলল, এই কল্যাণী শুনুন, এদিকে আসুন।

প্রীতি এসে দাঁড়াল। এক হাতে পাউডারের প্যাক। বোধ হয় মুখটা মেরামত করছিল।

আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমাদের অফিসের বাসবী সেন। আর ইনি হচ্ছেন প্রীতি হালদার। আগে আমাদের অফিসে কাজ করতেন বিকাশবাবু, তাঁর স্ত্রী। মিস সেনের আপনার অভিনয় খুব ভাল লেগেছে।

প্রথমে আড়চোখে জরিপ করার ভঙ্গিতে প্রীতি বাসবীর আপাদমস্তক দেখল। তারপর সোজাসুজি চোখ তুলে চাইল।

তার চাউনি দেখে বাসবী রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। কিছু বলা যায় না সেদিনের মতন অভব্য আবার যদি কিছু বলে বসে। সেদিন অবশ্য প্রীতি কিছু বলে নি, বলেছিল বিতান, কিন্তু প্রীতির যে সায় ছিল তাতে বাসবীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তাই বাসবী তাড়াতাড়ি বলল, আপনার কল্যাণীর রোলটা আমার খুব ভাল লাগছে। কি অপূর্ব অভিনয় করেন আপনি।

প্রীতি আর দাঁড়াল না। মুচকি হেসে বলল, হ্যাঁ, অভিনয়টা আমি চিরকালই ভালই করি।

কি ভেবে প্রীতি কথাটা বলল, বাসবী বুঝতে পারল না। বোঝার চেষ্টাও করল না। শুধু এইটুকু বুঝল কথার মধ্যে কোথায় একটু অপমানের হুল লুকানো রয়েছে, তাচ্ছিল্যের ছিটে।

বোধ হয় এই কথা বলতে চাইল, বাসবীর মতন একজন

সফলতার জের ছুটেছে তার জীবনে। এ ধরনের চাটুবাক্যে সে যথেষ্ট অভ্যস্ত।

কিংবা এর মধ্যে বেদনার মেঘের গোপন অস্তিত্ব থাকাও অস্বাভাবিক নয়। নিজের জীবন দিয়ে অভিনয় করছে প্রীতি। মুখে চড়া রং মেখে, পাদপ্রদীপের সামনে যে আত্মপ্রকাশ করছে, সেটা কি প্রীতির আসল সত্তা।

বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই বাসবী দেখল, তার সামনে অরেঞ্জের বোতল হাতে একজন এসে দাঁড়িয়েছে।

বাসববাবুর দিকে ফিরে বাসবী বলল, এ কি, আমাকে এসব কেন? আপনাদের চেঁচিয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আপনাদের এসব দরকার।

বাসববাবু হাসল, আর লজ্জা দেবেন না। নিন।

বাসবী হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিল।

বোতলটা যখন অর্ধেক শেষ হয়েছে তখন ড্রপ উঠল।

মহাভারতের বাড়ীটা জ্বলছে। সারা স্টেজে লাল আলোর ফোকাস। বাইরে থেকে সম্মিলিত কণ্ঠের চীৎকার। আগুন। আগুন।

দেখবার সুবিধার জন্য বাসবী উইংস-এর ধারে একটু সরে এল।

মহাভারত আর কালী বাগচী মঞ্চের।

এমন একটা চমৎকার দৃশ্য বাইরে বসে দেখতে পেল না বলে বাসবীর আফসোস হ'ল। এখনও বোতলটা কোণের দিকে রেখে দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে চলে যেতে পারে।

কালী বাগচীর বুকের ওপর মহাভারত চেপে বসেছে।

বাইরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েই বাসবী থেমে গেল।

একেবারে পিছনে প্রীতি।

তার মুখে, সারা দেহে লাল আলো এসে পড়েছে। রুক্ষ চুলের রাশ বাতাসে উড়ছে। দু'টি চোখের তারায় রক্তিম স্পর্শ।

প্রীতিকেও যেন সর্বনাশা আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ বলে মনে হচ্ছে।

আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে বাসবী বাইরে চলে এল।

পাশ দিয়ে আসবার সময়ও প্রীতি চোখ ফেরাল না। কোন সাড় নেই মানুষটার, চেতনা নেই। নিজের ভূমিকায় সম্পূর্ণভাবে মগ্ন।

বাসবী ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত দেখবে, কিন্তু হাত-ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল। সাড়ে নটা। বাড়ি যেতে বেশ রাত হয়ে যাবে।

বাসবী উঠে পড়ল।

এর পরের অংশটুকু বাসবীর জানা আছে। দারিদ্র্য পার হয়ে হুটবিহারী সম্পদের মালিক হয়ে উঠবে। পুরনো দিনের কথা একটু একটু করে বিস্মৃত হবে। আদর্শচ্যুত, অভিজাতপন্থী। হুটবিহারীর এ অধঃপতন দেখতে বাসবীর ভাল লাগবে না। যে মানুষটা দারিদ্র্যকে ব্রত বলে গ্রহণ করেছিল, আদর্শরক্ষার জন্য সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অক্লান্ত যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত করেছিল নিজেকে, সে এত সহজে ঐশ্বর্যের আবরণে ঢাকা পড়ে গেল। তার মনুষ্যত্ব হারাল!

অথচ এই মানুষের রীতি, এই তার প্রকৃতি।

এ দেশেই যারা একদিন মৃত্যুপণ করে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেছিল, আজ ক্ষমতা পেয়ে তারা নিজেদের বিবেক বিক্রয় করছে। একদা সংগ্রামের উদ্দেশ্য ভুলেছে।

রাস্তার কাছ-বরাবর এসেই বাসবী থেমে গেল।

একেবারে সামনে। একটা পানের দোকান। তার কাছে দাঁড়িয়ে লোকটা সওদা পান করছে। আলোর নীচে। কোথাও একটুও অন্ধকার নেই। চেহারা যেন আরো খারাপ, আরো জরাজীর্ণ। অকাল বার্ধক্য শরীরে জয় করেছে।

কিন্তু বিতান হালদারের পাশে দাঁড়ানো মহিলাটিকে বাসবী চিনতে পারল না।

উৎকট, প্রসাধন। হেসে হেসে গায়ে ঢলে পড়ে কথা বলার ভঙ্গি, চটুল দৃষ্টি কিছুই আভিজাত্যের দ্যোতক নয়। বরং খুব সহজলভ্য মেয়েদের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

বাসবী খুব দ্রুত জায়গাটা পার হয়ে গেল।

বলা যায় না, সেদিনের মতন বিতানবাবু হয়ত একটা অভব্য মন্তব্য করে বসবে। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটি হেসে উঠবে খিল খিল করে।

পথ-চলতি লোকেরাও ফিরে ফিরে দেখবে।

পরের দিন সকালেই মাধববাবু মাধবীর সামনে এসে দাঁড়াল।

বেশ লোক ত আপনি?

বুঝেও মাধবী না বোঝার ভান করল।

কপট বিস্ময়ে বলল, কেন, কি করলাম?

বা, এত করে বললাম শেষ দিনটা দেখবেন, আর আপনি আগে পালিয়ে এলেন?

কি করব, সাড়ে নটা বাজার পর আর থাকতে পারলাম না। তাও বাড়ী পৌঁছতে প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে গেল।

কিন্তু আমার মৃত্যুর দিনটাই ত আসল ছিল। মরবার পর চোখ কুঁচকে চেয়ে দেখি, আপনার চেয়ার খালি। আপনি নেই।

মাধবী হেসে ফেলল, সর্বনাশ, মরার পরেও চোখ চেয়ে দেখছিলেন আপনি, অত দর্শকরা ত আপনার মৃত্যু সম্বন্ধে রীতিমত সন্দেহ করবে।

মাধববাবুও হাসল, উঁহু, সে চোখ চাওয়া কারো দেখতে পাবার কথা নয়। বিমলা যখন আমার দেহের ওপর পড়ে আর্তনাদ করছে, সেই ফাঁকে একবার দেখে নিয়েছিলাম।

শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। আপনি যে অসামান্য অভিনেতা সেটা বোঝবার জন্য আপনার মৃত্যু পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না।

আপনি ত ভারি সুন্দর কথা বলেন। যাক, আপনার ভাল লেগেছে, তাতেই আমি কৃতার্থ। মাঝে মাঝে যদি যান, খুব খুশী হব। চলি।

মাধববাবু নিজের জায়গায় সরে যাবার মুহূর্তেই কথাটা মাধবীর মনে পড়ল।

একটু গলা চড়িয়ে বলল, শুনুন।

মাধববাবু ফিরে এসে দাঁড়াল।

সে রাতে বিভাসবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল।

মাধববাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

কোথায়?

রঙমহলের সামনে। সঙ্গে আর একটি মহিলা ছিল।

রাস্কেল। স্ত্রী মুখে রক্ত তুলে দেনা শোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, আর নিজে ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে! সঙ্গের মেয়েটি শকুন্তলা সেন। উনিই ত যত সর্বনাশের মূল। শকুন্তলাকে বিভাস আমার কাছে এনেছিল, বিমলার ভূমিকাটা দেবার জন্য। আমি একেবারে স্পষ্ট না বলে দিয়েছি।

মাধববাবু একটু থামল। রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিল। উত্তেজনা প্রশমিত করার চেষ্টায় তার মাংস-পেশীগুলো কঠিন হয়ে গেল।

তারপর বলল, জানেন অভিনয়ের পরে প্রীতির কি অবস্থা হয়েছিল?

মাধবী মুখ তুলল। কোন প্রশ্ন করল না।

শেষ হ'তে সবাই যাবার জন্য ব্যস্ত, হঠাৎ খেয়াল হ'ল প্রীতি নেই। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখা গেল ড্রেসিং রুমের এক কোণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

অজ্ঞান?

হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি মুখে জল আছড়ে, বাতাস করে জ্ঞান ফিরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল। আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। আমি একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করে করে জানতে পারলাম, যে, সকাল থেকে বেচারী খায় নি। তার ওপর অভুক্ত অবস্থায় পার্ট করার এই উত্তেজনা। শরীরে আর সহ্য হয় নি

কিছুক্ষণ মাধবী কোন কথা বলল না। এক সময়ে আস্তে আস্তে বলল, বিভাসবাবু প্রীতিদেবীকে নিতে এসেছিলেন না? তিনি শুনেছেন সব?

তিনি আর নতুন করে কি শুনবেন, মাধববাবুর কণ্ঠে পরিহাসের সুর, এ নাটকের ত তিনিই নায়ক। অভিনয়ের শেষে এসেছিলেন স্ত্রীর প্রতি অবিচল কর্তব্যের তাগিদে নয়, অভিনয় বাবদ বাকি টাকা প্রীতিকে সে-রাতে দেবার কথা, তারই লোভে।

মাধববাবু আর দাঁড়াল না। নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

সেই মুহূর্তে মাধবীর মনে হ'ল প্রীতির মতন দুঃখী, নিঃসহায় নারীর সংখ্যা বুঝি বেশী নেই।

একটা কথা ছিল।

নিশিবাবুর গলা।

মাধবী একটা ফাইল খুলছিল, বন্ধ করে বলল, বসুন।

বলবার চেষ্টা ত অনেকক্ষণ ধরেই করছি, মাধববাবুর

এ্যাক্টিংয়ের জন্ত পারছি না। ভদ্রলোক অফিসকেও ঠিক মনে করেন, না কি?

বাসবী কিছু বলল না। শুধু বাসববাবু নয়, সেও অনেক কথা বলেছে। বাসববাবুর সঙ্গে এত কথা সে কোনদিন বলে না।

কথায় কথা বাড়ে, বিশেষ করে নিশিবাবুর মতন লোকের সঙ্গে।

কিন্তু নিশিবাবু ছাড়বার পাত্র নয়।

বলল, সাতসকালে এত কি কথা?

এবার বাসবী না বলে পারল না।

হাসতে হাসতেই বলল, ওই যে কাল বাসববাবুদের থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, সেই বিষয়ে কথা হচ্ছিল।

আপনি গিয়েছিলেন থিয়েটার দেখতে?

এমনভাবে নিশিবাবু কথাগুলো বলল যেন থিয়েটারে যাওয়া বাসবীর পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে।

নিশিবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাসবী বলল, ম্যানেজারও গিয়েছিলেন।

কথাটা হঠাৎ বাসবীর মনে পড়ে গেল। এও মনে হ'ল নিশিবাবুকে থামাবার পক্ষে এর চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র আর তার তূণীরে নেই।

মুহূর্তে নিশিবাবুর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল, তারপরই দু'টি চোখের কোণে বিদ্যুৎ স্ফুরিত।

ভ্রু-দুটো তুলে, ঠোঁট কুঁচকে বলল, ও, আপনারা দু'জনে গিয়েছিলেন।

এ আর এক বিপদ। তিলকে তালে পরিণত করতে নিশিবাবু অদ্বিতীয়। সামান্ত এই কথার তিলটুকু দিয়ে দুর্গ গড়ে তুলবে। সে দুর্গ হয়ত দুর্ভেদ্য নয়, কিন্তু যেই ভেদ করতে যাবে, তার কর্দমাক্ত হবার সম্ভাবনা ষোল আনা।

একসঙ্গে যাই নি। আমি যাবার অনেক পরে ম্যানেজার গিয়েছিলেন, তিনি দুটো সিন দেখেই উঠে এসেছেন, আমি প্রায় শেষ পর্যন্ত ছিলাম।

বিশদ ব্যাখ্যায় কোন ইতর বিশেষ হল না। খঞ্জন পাখীর মতন নিশিবাবুর দুটো চোখ নাচতে লাগল। মুখে কিন্তু গাম্ভীর্যের নির্মোক।

যাক সে, থিয়েটার প্রসঙ্গ থাক, কাজের কথাটা বলি। গোবিন্দপুরের কলেজ হস্টেলের যে কাজটা আমরা করেছি, সেটার ফাইলটা শেষ করে রাখুন। বিকালের দিকে দরকার হবে। চুক্তিপত্রটাও দরকার। মনে হল দু বছরের গ্যারান্টি ছিল। এখনও পুরো এক বছর হয় নি, এর মধ্যে নালিশ এসেছে, ছাদ দিয়ে নাকি জল পড়ছে। যে ফার্ম কাজটা করেছিল, তাদের ডেকে পাঠানো হয়েছে, কাজেই ফাইলটা দরকার হবে।

ঠিক আছে, বাসবী মাথা নীচু করে বলল, টিফিনের আগেই ফাইলটা আপনার টেবিলে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আর একটা কথা।

বলুন।

রাঙামাটি ব্রিজ কন্‌ট্রাকশনের ফাইলটাও দরকার।

রাঙামাটি?

বাসবী বিস্ময়ে মুখ তুলল। এ ফাইলটার সঙ্গে তার যোগসূত্র নিবিড়। শুধু তার নয়, বিভাস হালদারের ভাগ্যও এই ফাইলটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এ সর্বনেশে ফাইলটা আবার কেন?

নিশিবাবু বলল, এ মাসের কিস্তির টাকা প্রীতিদেবী পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটা ফাইলে নোট করে দিতে হবে, তারপর পাকা রসিদও একটা পাঠাতে হবে। প্রীতিদেবীকে কাঁচা রসিদ অবশ্য একটা দেওয়া হয়েছে।

প্রীতিদেবী এসেছিলেন বুঝি?

অফিসে আসেন নি, ম্যানেজারের বাড়ীতে গিয়ে টাকাটা দিয়ে এসেছেন।

কথাটা বাসবী নিশিবাবুকে না বলে পারল না।

জানেন, কাল প্রীতিদেবী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

নিশিবাবু হাসল, পাকা অভিনেত্রী, ওদের কথা ছেড়ে দিন। প্রয়োজনে অজ্ঞান হচ্ছেন, শোকের অভিনয় করছেন, আবার তলায় তলায় কাজ হাসিল করছেন।

বাসবী কিছু বলল না। নিশিবাবুর মতন লোককে কিছু বলেও লাভ নেই। সব কিছু বুঝেও এরা না বোঝার ভান করে। পৃথিবীর ভাল কিছু, সুন্দর কিছু দেখার চোখ এদের অন্ধ। মক্ষিকার মতন আসক্তি শুধু নিকৃষ্ট দ্রব্যে, নিষিদ্ধ জিনিসে।

ঘাড় হেঁট করে বাসবী কাজ শুরু করল।

নিশিবাবু একটু দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সরে যেতে

যেতে বলল, তা হ'লে ফাইল দুটো আমার টেবিলে পাঠিয়ে দেবেন দিন দেখে।

বাসবী কোন উত্তর দিল না। ঘাড়ও নাড়ল না। এক মনে কাজ করে যেতে লাগল।

গতানুগতিক এক রাশ দিন। একটানা ঢেউয়ের মতন। কোন বৈশিষ্ট্য নেই, নতুনত্ব নেই। রসহীন, স্বাদহীন।

এর মধ্যে মাত্র দুদিন অনিমেষ রায় ডেকেছিল। দু'দিনই অফিসের জন্য। শুধু কাজের কথা। আর কিছু নয়। মনে হ'ল কোন ব্যাপারে অনিমেষও বোধ হয় বিব্রত রয়েছে। মুখে-চোখে চিন্তার ছাপ। কথা বলছে বটে, কিন্তু বেশ একটু অন্যমনস্ক।

সেদিন টিফিনের পর কুন্তার কাছ থেকে নিজের চেয়ারে বসামাত্র বেয়ারা এসে দাঁড়াল। ম্যানেজার সাহেব ডাকছেন।

আড়চোখে বাসবী ঘড়ির দিকে দেখল। এখনও টিফিন শেষ হয় নি। রুমালে মুখটা মুছে উঠে পড়ল।

অনিমেষ রায়ের মুখ খুব গম্ভীর। টেবিলের ওপর প্রসারিত একটা কাগজ।

বাসবী কাছে যেতেই অনিমেষ কাগজটা তুলে বাসবীর দিকে এগিয়ে দিল।

কি ব্যাপার?

দীপক গুপ্তর ইস্তফা-পত্র।

ইস্তফা?

হ্যাঁ, একমাসের নোটিশ দিয়েছে। সামনের মাস থেকে আর আমাদের চাকরি করবেন না। (ক্রমশঃ)

কালো আফ্রিকার আতঙ্ক

(জুল্‌ভার্নের "ফাইভ্‌ উইকস্‌ ইন্‌ এ বেলুন")

১৮৬২ সালের জানুয়ারী মাস। লণ্ডনে সে বছর শীতের প্রকোপ এত বেশী যে সকালে ৯টার আগে কেউ পথে বার হতে পারছে না। সমস্ত শহর যেন বরফের সাদা চাদরের নিচে ঝিমিয়ে পড়েছে। সারাদিনের কাজকর্ম দুপুরের মধ্যে কোনরকমে সেরে নিয়ে সকলেই বেলা ৪টার আগে নিজ নিজ ঘরে গিয়ে ঢুকছে। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় ও ঝিরঝিরে বরফ-বৃষ্টিতে সকলেরই থরহরি কম্প। মিনিটে মিনিটে জানালার শার্সিতে জমা-বরফ পরিষ্কার করতে হচ্ছে। প্রত্যেক ঘরের একপাশে চিম্‌নিতে যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে তার সামনে বসে সকলে এই নিদারুণ শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করছে। কুকুরগুলোও কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের কোণে শুয়ে আছে। বুড়োরা বলাবলি করছে এমন শীত তাদের জীবনে তারা আর কখনও দেখে নি।

এমনি এক শীতের দিনে বেলা দ্বিপ্রহরে লণ্ডনের লেস্টার স্কোয়ারের কাছে এক প্রশস্ত কক্ষে রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির এক জরুরী সভার অধিবেশন হচ্ছিল। ইংলণ্ডের ও অন্যান্য স্থানের সুপণ্ডিত সভ্যগণ সকলে মিলিত হয়ে উত্তেজনার সঙ্গে কি যেন একটা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন। টেবিলের উপর আফ্রিকার একখানি প্রকাণ্ড ম্যাপ বিস্তৃত ছিল। প্রৌঢ় সভাপতি সেই ম্যাপের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে লাগলেন—

"মাননীয় সভ্যবৃন্দ, আজ এই ১৮৬২ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। জলে স্থলে আকাশে আমরা আমাদের জয়ডঙ্কা নিয়ে ঘুরেছি নূতন নূতন আবিষ্কারের আশায়। আমাদের সে আশা অনেকক্ষেত্রেই সফল হয়েছে। কিন্তু এই আফ্রিকা সম্বন্ধে আমরা আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানতে পারি নি। যেটুকু জানা গেছে তা অতি সামান্য। অবশ্য আমি ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী প্রদেশগুলি বা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রদেশগুলির কথা বলছি না, সে বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য আফ্রিকার মধ্যভাগ নিয়ে। আট হাজার মাইলব্যাপী সেই নিবিড় অরণ্যের অন্তরালে যে কি ভয়ানক রহস্য লুকিয়ে আছে সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কালো আফ্রিকার সেই কালো যবনিকা ভেদ করে আফ্রিকার আসল রূপটি প্রত্যক্ষ করা বর্তমানে একরকম সাধ্যাতীত। কালো আফ্রিকার কথা শুনলেই পর্যটকদের মনে এক আতঙ্কের সঞ্চার হয়। যে সকল বলবন্ত নির্ভীক পর্যটক কালো আফ্রিকার রহস্য ভেদ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সেই অজ্ঞাতদেশে হয় রোগের আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেছেন, নয়ত হিংস্রপ্রকৃতি অসভ্য নরখাদকদের হাতে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়েছেন। তাঁদের মৃত্যুই তাঁদের রেখেছে স্মরণীয় ও বরণীয় করে। কিন্তু তবুও আফ্রিকা যে

অন্ধকারে ছিল, আজও সেই অন্ধকারেই আছে। নানা দেশ থেকে জ্ঞানী ও গুণী পর্যটকের দল নীলনদীর উৎপত্তিস্থলের সন্ধানে কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম, কত বিপদ মাথায় করে সেই পর্বতসমাকুল সেই নিবিড় অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু তার পরিণামে তাঁরা পেয়েছেন নৃশংস মৃত্যু, অসাধ্য রোগ ও মস্তিষ্ক-বিকৃতি।"

নিস্তব্ধ কক্ষে তখন সকলে একাগ্রমনে বক্তার বক্তৃতা শুনছিলেন, সভাস্থলে শুধু বাইরে থেকে আসছিল অবিশ্রান্ত তুষারপাতের ক্ষীণ শব্দ। বক্তা আবার বলতে লাগলেন—

"আমাদের এই রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলেই সকলের ধারণা। আমাদের অর্থবল, উৎসাহ-বল, রাজকীয় সাহায্য-বল এখন যথেষ্ট। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই নূতন নূতন ভৌগোলিক অনুসন্ধানের ফল আমাদের কাছেই জানতে পেরেছেন। তাই আমরা এই কালো আফ্রিকার কালো যবনিকা যতদূর সাধ্য উন্মোচন করে জগতের সামনে আমাদের প্রতিষ্ঠা আরও বদ্ধমূল করতে চাই।"

সমবেত সকল সভ্যই সভাপতির এই কথায় উচ্চৈস্বরে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন। সভাপতি মহাশয় বলতে লাগলেন—

"ডাক্তার লিভিংষ্টোন, ষ্টানলী, মাঙ্গোপার্ক, ভোগেল, ডনহাম, ক্লাপার্টন, ক্ল্যাপার্টন, দৈনাম, আস্ত্রিয়া ক্রবোনা, মেজর ল্যাং, রোজার, বার্টন, স্পিক্, গর্দো-রিন্, ডাক্তার বার্থ, ব্রিয়োলি, গ্রেকুসাক্—এঁরা সকলেই নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে কালো আফ্রিকার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আফ্রিকাকে জানতে, মানুষের জ্ঞান-সম্পদ বাড়াতে। তাঁদের দু' একজন জীবন্মৃত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন, বাকি সকলে প্রাণবলি দিয়েছিলেন আফ্রিকার রক্তলোলুপ মাটিতে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকেই আমাদের এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পত্র আসছে জানবার জন্যে নীলনদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়। আমরা এ বিষয়ে নীরব থাকাতে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের উপর সকলের অশ্রদ্ধা বেড়ে উঠেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানকে লোকচক্ষে হেয় করা হচ্ছে। ইংলণ্ডের জনসাধারণও রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির উপর বেশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছেন। তাঁদের অনেকের মতে এই সোসাইটি একটা বোগাস্ প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে তাঁদের ধারণা যে ভুল, সেটা আমরা প্রমাণ করব।"

সভ্যগণ সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন—"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

সভাপতি মহাশয় বলতে লাগলেন—

"এ পর্যন্ত যে সব মহান্ পর্যটক স্থলপথে কালো আফ্রিকার মধ্যস্থলে যেতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা যে কিরূপ অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন সে কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। তাঁদের অনেকেই যে আর ফিরে আসেন নি, সে কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন তাই আমি আকাশপথে কালো আফ্রিকার অন্তঃস্থলে যাবার বন্দোবস্ত করেছি। অবশ্য আমি এর জন্য যথেষ্ট রাজকীয় সাহায্য লাভ করেছি। আমাদের দেবীকল্পা মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর নিজস্ব ফাণ্ড থেকেও অনেক টাকা আমাদের সমিতিতে এই উদ্দেশ্যে দান করতে চেয়েছেন। ইংলণ্ডের নৌবহরের 'রেজলিউট্' রণতরী এই অভিযানে আমাদিগকে সাহায্য করতে আদেশ পেয়েছে। তাই আমাদের এবারের আফ্রিকা-অভিযান হবে আকাশপথে।"

সভাপতির কথার উপর বহুকণ্ঠে প্রশ্ন উঠল—আকাশপথে? ব্যাপারটা কি খুলে বলুন।"

সভাপতি বললেন—"আমরা এবার পাঠাব বেলুনে আমাদের পর্যটককে। একটি বেলুন আফ্রিকার পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে উড়ে যাবে। আকাশপথে যাওয়াতে দুর্গম অরণ্য, নির্মম নরখাদক অসভ্যের দল, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, হিংস্র বন্যপশু, দুস্তর নদনদী—কিছুই এ অভিযানের গতিরোধ করতে পারবে না। এই বেলুনস্থিত পর্যটক আফ্রিকার নূতন মানচিত্র অঙ্কিত করবেন—নূতন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিবৃত করবেন, নূতন অসভ্য জাতিদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবেন—মোট কথা কালো আফ্রিকা এবার আলোয় ভরে উঠবে, আফ্রিকার স্বরূপ জানতে আর কষ্ট হবে না।"

বহুকণ্ঠের আনন্দধ্বনি ও করতালি আবার শোনা গেল।

সভাপতি বলে চললেন—"আমাদের এই পর্যটনের প্রধান উদ্দেশ্য নীলনদের উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা। যে পর্বত থেকে নীলনদ প্রথম উৎসাকারে বেরিয়ে যে হ্রদের সৃষ্টি করেছে, তারপর যে জলপ্রবাহে পরিণত হয়ে বহু দুর্গম অরণ্য, মরুভূমি, প্রান্তর পার হয়ে কত জনপদ, কত নগর, কত পল্লীর পাশ দিয়ে বয়ে এসে শেষে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে, তার উৎস-সন্ধান যে

ভৌগোলিক গবেষণায় এক বিস্ময়কর পরিণতি হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এ সম্বন্ধে কোন প্রচেষ্টা না করলে তার শোচনীয় কর্তব্যভ্রষ্টতাই জগতের কাছে ধরা পড়ে যাবে ও তার সুনাম চিরতরে কলঙ্কিত হয়ে উঠবে। তাই আমরা অবিলম্বে বেলুনের সহায়তায় নীলনদের উৎস-সন্ধানে যাবার ব্যবস্থা করেছি।"

সভাপতির এই কথায় ঘন ঘন করতালি ও আনন্দধ্বনিতে সভাগৃহ মুখর হয়ে উঠল। প্রবীণ সভ্য স্যার আর্চিবল্ড প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু এই বেলুনযাত্রায় কোন্ নির্ভীক পর্যটক যাচ্ছেন, মাননীয় সভাপতি মহাশয় তা এখনও তাঁর কোন উল্লেখ করলেন না। আমরা কি তাঁর নাম জানতে পারি?"

সভাপতি বললেন—"নিশ্চয়ই, এখনই তাঁর নাম আপনারা সকলে জানতে পারবেন।"

আর একজন প্রবীণ সভ্য—স্যার অস্কার বললেন—"শুধু তাঁর নাম উল্লেখ করলে হবে না, আমরা তাঁকে এখনি এখানে দেখতে চাই। সভাপতি মহাশয় কি সে সুযোগ আমাদের দেবেন?"

সভাপতি মৃদুহাস্যের সঙ্গে বললেন—"আপনাদের সুসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত। পর্যটকের নাম ডাঃ কারগুসন।"

প্রথমে সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর মুহূর্ত মধ্যে করতালিধ্বনিতে আবার সভাগৃহ উচ্চকিত হয়ে উঠল। সকলে জানলেন এবারের অভিযানকারী আর অন্য কেউ নন,—ভৌগোলিক তত্ত্বে সুপণ্ডিত, ইতিহাসে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, আবহাওয়াতত্ত্বে পারদর্শী, বিজ্ঞানচর্চায় অগ্রণী, পৃথিবীর নানা দুর্গম দেশ পর্যটনকারী, বিভিন্ন প্রাচ্যভাষায় অভিজ্ঞ ইংলণ্ডের গৌরব ডাঃ কারগুসনই বেলুনে আফ্রিকার নীলনদের উৎস পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন।

এবার সভাপতির অনুরোধে সভ্যমণ্ডলীর মধ্য থেকে ডাঃ কারগুসন ধীর পদক্ষেপে উঠে এসে সভাপতির পার্শ্বে দাঁড়ালেন ও সকলকে অভিবাদন করলেন। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ, দেহ সুগঠিত ও সুদৃঢ়, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, মুখে শান্তমধুর হাস্যরেখা। সভাপতি তাঁকে এবার কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। ডাঃ কারগুসন বললেন—

"মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সভ্য বন্ধুগণ, রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির তরফ থেকে আমি আফ্রিকা পর্যটনের যে আদেশ পেয়েছি, কর্তব্যনিরত আজ্ঞাপালকের মত আমি সানন্দচিত্তে সে আদেশ পালন করব। কিন্তু আমি যদি এ অভিযানে সিদ্ধিলাভ করি তা হ'লে সে গৌরব আপনাদের, আর যদি আমি বিফল-মনোরথ হই তবে সে ব্যর্থতা সম্পূর্ণ আমারই। আমি এ ব্যাপারে পূর্ব থেকেই অভিজ্ঞতালাভের চেষ্টা করেছি ও প্রস্তুত হয়ে আছি। আমার গন্তব্যপথের ম্যাপও প্রস্তুত করেছি। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কারখানা 'মায়ন্ কোম্পানী' আফ্রিকার আকাশে ভ্রমণোপযোগী এই প্রকাণ্ড বেলুনের নির্মাণভার গ্রহণ করেছেন ও সে কাজ প্রায় সম্পন্ন করে এনেছেন। বেলুনটি হাল্কা হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ করা হবে ও পথিমধ্যে সে গ্যাস উৎপাদনের আবশ্যক মালমশলা ও যন্ত্রপাতি বেলুনে থাকবে। বড় বেলুনের মধ্যে আবার আর একটি গ্যাসপূর্ণ ছোট আকারের বেলুন থাকবে। সেটির গ্যাস বাহির করে দিলে বেলুন ইচ্ছামত নামানো যাবে, আবার সেটি গ্যাসে পূর্ণ করলে বেলুন উপরে উঠবে। এই উঠা-নামার জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও গ্যাসের নল প্রভৃতি বেলুনে থাকবে। বড় বেলুনের বিপুল গ্যাসসম্ভার বেলুনকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর অভ্যন্তরের ছোট বেলুনের কাজ হবে গ্যাস নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বেলুনকে উঠা-নামা করানো। তা ছাড়া বেলুনে দিগ্দর্শন যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র, বায়ুপ্রবাহ-নির্দেশক যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি থাকবে। বেলুনের নিচে যে চতুষ্কোণ দোলনাটি ঝুলবে, তাতে থাকবে শোবার ও বসবার যথেষ্ট স্থান। খাদ্য, সামান্য হাল্কা বাসন ও একটি ছোট তাঁবু নিয়ে যেতে হবে। পথে শিকার বা আত্মরক্ষার জন্য থাকবে বন্দুক ও কিছু গুলী-বারুদ। তা ছাড়াও বিশেষ আবশ্যকীয় কয়েকটি জিনিষও সঙ্গে নিতে হবে। হঠাৎ জলে পড়লে যাতে আত্মরক্ষা করা যায় সেজন্য থাকবে একটি রবারের ভাঁজ করা ছোট নৌকা। অত্যুজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করে অন্ধকারে পথ দেখার জন্য থাকবে দুটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত কার্বন স্টিক। এতে উৎপন্ন তীব্র আলোকে পথের অন্ধকার অনেকটা দূর হতে পারে। জলের অভাব দূর করবার জন্য কয়েকটি মুখ-আঁটা জলপাত্রও সঙ্গে থাকবে। ইহা ছাড়া মরণাধিক হিংস্র অসভ্যদের দলবদ্ধ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য থাকবে এক বাক্স ডিনামাইট স্টিক। এগুলি ছাড়াও ছোটখাট দরকারী জিনিষও কিছু কিছু নিতে হবে,—যেমন সাবান, দাড়ি কামাবার ক্ষুর, কাঁচি, সুতোর বাণ্ডিল, কার্ড এডের উদ্ধবণায়, দড়ির মই প্রভৃতি। ইচ্ছামত বেলুনটিকে মাটিতে আটকাবার জন্যে থাকবে কয়েকটি নোঙর।"

এই সময়ে আর একজন সভ্য বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডঃ হার্ডিংটন প্রশ্ন করলেন—"অজ্ঞাত আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য বেলুনটিকে মজবুত করবার আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বিত হয়েছে কি?"

ডাঃ ফারগুসন বললেন—"লায়ন্ কোম্পানী এর জন্যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করেছেন বেলুন নির্মাণে। বেলুনের চারদিকে রেশমের যে আবরণ থাকবে তার উপরে গাটাপার্চার একটা মোটা প্রলেপ দেওয়া হবে। তার পরেও থাকবে পাতলা রবার-কাপড়ের একটা আচ্ছাদন। সুতরাং কোন কারণে যদি একটা আবরণ ছিন্ন হয়, তা হলেও বেলুন উড়তে থাকবে, তার গতির কোন ব্যাঘাত হবে না। তা ছাড়া একটা হাল্‌কা রশির জাল বেলুনকে ঘিরে থাকবে। বেলুনের যে চৌকো দোলনা থাকবে সেটি বেত ও পাতলা লোহার চাদর দিয়ে তৈরী হবে। দোলনার উপরে একটা রবার-কাপড়ের ছাদ থাকবে রৌদ্র-বৃষ্টি নিবারণের জন্যে। এ ছাড়া চারপাশে পরদাও থাকবে বাইরের বৃষ্টির বা বালুকার ঝাপটা এড়াবার আটকরূপে। সুতরাং লঘুতার হিসাবে যতগুলি সম্ভব অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ নেওয়া যেতে পারে। আর আমি আমার সঙ্গী হিসাবে দু'জন লোককে সঙ্গে নিতে চাই। তাঁরা আমার সহকারীরূপে এই বেলুনে পর্যটন করবে।"

উৎসুক সভ্যগণ আগ্রহের সঙ্গে ডাঃ ফারগুসনের বক্তৃতা শ্রবণ করছিলেন। এখন প্রবীণ সভ্য সার বেকন্‌ফিল্ড প্রশ্ন করলেন, "ডাঃ ফারগুসন, আপনার সঙ্গীদের নাম ও পরিচয় জানতে পারি কি?"

ডাঃ ফারগুসন মৃদু হাসিয়া বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন—"নিশ্চয় পারেন, একজন আমার বিশিষ্ট বন্ধু যশস্বী শিকারী এডিন্‌বরা-নিবাসী মিঃ কেনেডি, আর একজন আমারই একান্ত অনুগত ভৃত্য জো। মিঃ কেনেডির নাম আপনাদের অপরিচিত নয়, তাঁর শিকার-কাহিনী নিয়মিতরূপে ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'ডেলি টেলিগ্রাফে' প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বন্দুক চালনা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রতিবারই প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন। আর আমার ভৃত্য জো সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলতে পারি যে, শারীরিক শক্তি, ধৈর্য, সাহসিকতা ও বিশ্বস্ততা তার অসাধারণ। সুতরাং আমি এ অভিযানে এই দু'জন সঙ্গীকেই নিতে চাই।"

সভ্যগণ সকলে সমস্বরে ডাঃ ফারগুসনের কথা অনুমোদন করলেন। তখন ডাঃ ফারগুসন আবার বলতে লাগলেন—

"জানি না আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি কি না, তবুও আমার নির্দিষ্ট পথের কথা আপনাদের সামনে বলতে আমি বাধ্য। কালো আফ্রিকার রহস্যময় যবনিকা উত্তোলন করতে হলে আমি প্রথমে রেজলিউট্ জাহাজে জাঞ্জিবার দ্বীপে যাব, সেখান থেকে বেলুনে চড়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলে যাবার সোজাসুজি পথ ধরে গিয়ে আমি মধ্য আফ্রিকায় যাত্রা করব। নীলনদের উৎস আবিষ্কার আমার প্রধান লক্ষ্য হলেও আট হাজার মাইল দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, দুস্তর মরুভূমি ও নিবিড় অরণ্যের উপর দিয়ে আমাকে বেলুন পরিচালনা করতে হবে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, বায়ু-প্রবাহের উপরই নির্দিষ্ট হয় বেলুনের গতি। সেটা অনেকখানি আবহাওয়ার উপরেই নির্ভর করে। আফ্রিকার এই নিবিড় অরণ্য হিংস্র জন্তুদেরই শুধু আবাসভূমি নয়, এখানে নরখাদক দুর্দান্ত অসভ্য লোকেরাও বাস করে। বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা বন্যপশুদের স্বভাবই পেয়েছে। তা ছাড়া মরুপ্রান্তরে আরব জাতীয় দস্যু দলও আছে। কোনক্রমে বেলুন পথভ্রষ্ট বা অচল হলে যে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা অনুমান করা সহজসাধ্য। কিন্তু তবুও আমাদের যাত্রা যাতে সফল হয় সেজন্য আসুন আমরা সকলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।"

ডাঃ ফারগুসন থামলেন। সভা এক মিনিট স্তব্ধ ও নীরব হয়ে রইল তারপরে ডাঃ ফারগুসনের নামে বার বার আনন্দধ্বনি উত্থিত হতে লাগল।

কলরব একটু থামলে, সভাপতি মহাশয় বললেন—"আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারী আমরা যাত্রার শুভদিন নির্দিষ্ট করেছি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদেশে রেজলিউট জাহাজ প্রস্তুত হয়েই আছে। লায়ন কোম্পানী বেলুনটি সেই জাহাজে সত্বর পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন। ডাঃ ফারগুসনও প্রস্তুত হচ্ছেন। সুতরাং এই শুভযাত্রা নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে এই আমাদের আশা ও বিশ্বাস।

সভাপতির অনুমতি নিয়ে একজন সভ্য ডাঃ ফারগুসনকে প্রশ্ন করলেন—"যাত্রাপথের ম্যাপ কি প্রস্তুত হয়েছে?"

ডাঃ ফারগুসন বললেন—"মাননীয় সভ্য মহাশয় অতি সুন্দর প্রশ্নটি করেছেন। আমি যে পথ চিহ্নিত করেছি সে পথে পড়বে কুবেনী, মাইসার নদী, ওয়ারেই হ্রদ, দুর্দুর প্রান্তর, সাকাটু আরণ্য জনপদ, ট্যাঙ্গানিকা, গণ্ডরোকো বন্যভূমি, আউকেরিউ হ্রদ, ঘাটুন্দু

হাসিয়ানা হ্রদ, সেনেগাল নদী, আউরিজারা পর্বতমালা, হুথুমি, জিমাবোয়া, আন্দেমেরো জলাভূমি, রুবেহো পর্বত, কাযে জনপদ, মেনে হ্রদ, চন্দ্র পর্বতমালা, ভিক্টোরিয়া নায়েঙ্গা হ্রদ, নাম্বুবা জনপদ, মিমিক্ পর্বত, মালেইয়া প্রান্তর, বোন'দূ-উল-জেরিদ মরুভূমি, টিম্বাক্টু, চইনা জলপ্রপাত—আরও অজ্ঞাত বহু অরণ্য, বহু পর্বতমালা, বহু হ্রদ, বহু মরুদেশ, বহু জনপদ আছে, সে সকলের নামোল্লেখ করে আমি আপনাদের ধৈর্য নষ্ট করতে চাই না। তবে আমি অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার যাত্রাপথ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি ও কিছু জুলু ভাষা, কিছু মাণ্ডিন্ডইয়াম্ ভাষা, কিছু মিশ্র আরবি ভাষা ও কিছু তামিল ভাষা শিখেছি।"

সমবেত সভ্যবৃন্দ সকলে "ধন্য ধন্য" রব তুলে ডাঃ ফারগুসনের প্রতি অভিনন্দন জানালেন। প্রবল উৎসাহের সঙ্গে অতঃপর সভা ভঙ্গ হ'ল।

পরদিন প্রভাতে ইংলণ্ডের সমস্ত সংবাদপত্রে ডাঃ ফারগুসনের এই আশ্চর্য অভিযান সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হ'ল। অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রেও ডাঃ ফারগুসনের ছবি ও জীবনী মুদ্রিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। ডাঃ ফারগুসনের কথা ছাড়া অন্য কোন আলোচনাই তখন আর নাই। একদিনে তিনি যেন সমগ্র ইংরেজ জাতির উপাস্য দেবতা হয়ে পড়লেন।

১৮৬২ সালের ২৫শে জানুয়ারী প্রাতঃকালে জাঞ্জিবার দ্বীপের উপকূলে ইংলণ্ডের রেজলিউট রণতরী থেকে প্রকাণ্ড বেলুনটিতে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি করা হচ্ছিল। সমুদ্র-বায়ুহিল্লোলে বেলুনটি দুলে দুলে যেন অবস্থিরতা প্রকাশ করছিল। বেলুনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডাঃ ফারগুসন, কেনেডি, জো ও সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন। অন্যান্য কর্মচারী ও খালাসীর দল আকুল আগ্রহে বেলুনের স্ফীতি লক্ষ্য করছিলেন। জাঞ্জিবার দ্বীপের অধিবাসীগণ দলে দলে সমুদ্রতটে উপস্থিত হয়ে এই অপরূপ দৃশ্য দেখছিল।

বেলুনে গ্যাস ভর্তি শেষ হ'ল। বেলুনের দোলনাটিতে পূর্বেই সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষপত্র রাখা হয়েছিল, এখন বিদায়ের পালা। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, "আমি এই অভিযাত্রী দলকে সমগ্র ইংরেজ জাতির পক্ষ থেকে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

ডাঃ ফারগুসন বললেন—"আমিও আমার অভিযানের পূর্বে এই বেলুনের নামকরণ করছি আমাদের মহামান্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে। আজ এই মুহূর্ত থেকে এই বেলুনের নাম হ'ল—'ভিক্টোরিয়া'।"

জাহাজের ডেকে মধুর সুরে ব্যাণ্ড বাজছিল। বিদায়-ভোজে সম্বর্ধিত হবার পর সকলের সঙ্গে করমর্দন করে ডাঃ ফারগুসন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বেলুনের দোলনায় উঠে পড়লেন। জাহাজ থেকে বেলুনযাত্রার সম্মানসূচক তোপধ্বনি হতে লাগল। ক্যাপ্টেন কয়েকজন খালাসীর সাহায্য নিয়ে আপন হাতে বেলুনের জাহাজে বাঁধা দড়িটি খুলে দিলেন। উচ্চ আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে বেলুনটি মুহূর্তমধ্যে আকাশে প্রায় দুশ' ফিট উঁচুতে উঠে গেল। ডাঃ ফারগুসন ও কেনেডি রুমাল নাড়তে লাগলেন। ক্যাপ্টেন আবার তোপধ্বনি করলেন। জাঞ্জিবারের লোকেরা ভয়ে বিস্ময়ে কোলাহল করে উঠল। বেলুন এবার বায়ুস্রোতে পশ্চিমমুখে চলল।

বেলুন এবার আরও উপরে উঠতে লাগল। প্রায় ১৫০০ হাজার ফুট উপরে উঠে পশ্চিমদিকে চলল। সমুদ্রের অশ্রান্ত তরঙ্গ উপকূলে আহত হয়ে রাশি রাশি ফেনা ছড়িয়ে দিচ্ছে—এ দৃশ্য দেখে সকলে তৃপ্তিলাভ করলেন। ঊর্ধ্বে নীল আকাশ, নিম্নে সূর্যালোকিত ধরণী, দূরে মেঘমালার মত পর্বতশ্রেণী। প্রবল বায়ুপ্রবাহ না থাকায় বেলুনের গতি তখন ঘণ্টায় ২০ মাইল। ফারগুসন আফ্রিকার গুটানো প্রকাণ্ড ম্যাপখানি খুলে স্কেল দিয়ে মেপে কি যেন দেখলেন তারপর বললেন—"আমরা উপকূল থেকে এখন ৪০ মাইল এসেছি। নিম্নে ঐ যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে, ওর নাম কাওলি। এইবার আমরা আউজয়ামো প্রদেশে প্রবেশ করব। পশ্চিমদিকে যে পর্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছে ওর নাম আউরিজারা পর্বত। আমাদের সামনে যে উচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছ ওটা হ'ল দুথুমি শৃঙ্গ।"

কেনেডি ও জো দূরবীনে সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে লাগল। বেলুনকে ফারগুসন আরও ঊর্ধ্বে তুললেন। দুথুমি শৃঙ্গ পার হয়ে বেলুন আবার কিছু নীচে নামল। যে প্রান্তরের উপর দিয়ে বেলুন যাচ্ছিল, তার এক পাশে নিগ্রোদের একটি গ্রাম দেখা গেল। সেই গ্রামের অধিবাসীরা দলে দলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে অবাক হয়ে ভয়ব্যাকুল চোখে বেলুনের দিকে চেয়ে রইল। তারা কোন দিন এ রকম দৃশ্য দেখে নি। একটা প্রকাণ্ড চকচকে গোলাকার পদার্থ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে দেখে তারা দারুণ ভয়ে

ালাহল করে উঠল। তারপর তারা ওটাকে দৈত্য
ভেবে অনবরত বিষাক্ত তীর ছুড়তে লাগল বেলুনকে
ক্ষ্য করে। কিন্তু বেলুন ছিল তাদের অনেকটা উঁচুতে।
াদের তীরই সেখানে পৌঁছতে পারল না। তখন তারা
রও ভয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করে বোধ হয় বাদ্যযন্ত্র
াজাতে লাগল। কিন্তু বেলুন আকাশপথে আরও
গ্রসর হতে লাগল। ক্রমে সে গ্রাম ছাড়িয়ে আবার
রণ্যভূমি দেখা গেল।

ফারগুসন হিসাব করে দেখলেন, এখন তাঁরা ছ'শ
াইল ঘুরে এসেছেন। এইবার আফ্রিকার রূপ যেন
দলে গেল। এখন মনে হ'ল এটা অরণ্যের রাজত্ব।
কাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, অরণ্যের উপর মাথা তুলে রয়েছে।
াৎ একটা প্রান্তরের মধ্যে একটা গাছ দেখিয়ে
ারগুসন বললেন—এই গাছটাই আমার মনে হয়, অবশ্য
ামি পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী থেকেই বলছি—বাওবাব্
ছ। এমন বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত মহীরুহ আর কোথাও
খা যায় না। এই রকমের গাছ আফ্রিকায় অনেক
াছে। এর কাণ্ডের ব্যাস একশ' থেকে দেড়শ'
ট হয়ে থাকে। এক একটা গাছের নিচে একটা
াম বসতে পারে। ১৮৪৫ সালে পর্যটক মেইজান এই
ছ আবিষ্কার করেন। পরে তিনি এই আফ্রিকার
সভ্য লোকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

বেলুন এবার একটি অরণ্যপ্রান্তে এসে পড়ল। তাঁরা
খলেন বিশাল অরণ্যের পরে একটি ছোট পাহাড়ের
াশে সুন্দর সমতলভূমি রয়েছে। সেখানে একটি
াট নদীও বয়ে চলেছে। ফারগুসন স্থির করলেন,
খানেই একটু নামা যাক। তিনি তখন বেলুন নামিয়ে
কটা বড় গাছের ডালে নোঙর আটকে দিলেন। বেলুন
য় ২০ ফুট ঊর্ধ্বে রইল।

সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। গোধূলির আকাশ
মশঃ ম্লান হয়ে আসছে। তাঁরা সকলে তখন দড়ির
: বেয়ে নিচে নেমে পড়লেন। নদীর জলে ভাল করে
-হাত ধুয়ে শ্যামল ঘাসের উপর খানিকক্ষণ হাত পা
ড়িয়ে বিশ্রাম করে নিলেন। তারপর ফারগুসন সেই
ছু শুকনো পাতা ও ডালে আগুন জালিয়ে জোকে
ক ও কিছু খাবার তৈরী করতে বললেন।

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে আসছিল। রাতে সেই বিপদসঙ্কুল
নে কিভাবে থাকা যাবে ফারগুসন সে বিষয়ে চিন্তা
র বললেন—"এই অজ্ঞাত স্থানে কখন কোন্ দিক
য় যে বিপদ আসবে তা বলা শক্ত। তাই আমরা
জনে পালাপালি জেগে বেলুন পাহারা দেব। প্রথম
চার ঘণ্টা জেগে থাকব আমি, দ্বিতীয় চার ঘণ্টার প্রহরে
জেগে থাকবে জো, তারপরে শেষ চার ঘণ্টার প্রহরে
জাগবে কেনেডি। আমি প্রথমে জেগে থাকলেও
দরকার হলে তখনই তোমাদের ডেকে তুলব। আর
তোমরাও দরকার হলে আমাকে ডেকে তুলবে। এই
ভাবে রাত্রি কাটানো যাবে।"

জো'র তৈরী মোটামুটি খাদ্য খেয়ে তাঁরা তৃণশয্যায়
কম্বল পেতে শয়ন করলেন। ফারগুসন বন্দুক হাতে
সতর্কভাবে বসে রইলেন।

নিস্তব্ধ রাত্রির অরণ্য তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে চোখের
সামনে যেন ওৎ পেতে বসে আছে। অরণ্যের অন্ধকার
গাঢ়, আকাশের অন্ধকার কতকটা ফিকে। অসংখ্য
তারার মালা পরে আকাশ যেন পৃথিবীর দিকে অক্লান্ত
দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আকাশের এককোণে কালি চাঁদ
একটা হাল্কা কুয়াসার আস্তরণে ঢাকা। মাঝে মাঝে
শন্ শন্ শব্দে একটানা বাতাস বয়ে চলেছে সেই
প্রান্তরের উপর দিয়ে। কোথায় যেন রহস্যময় শব্দ।
পাতার মর্মরে সে ধ্বনি যেন মিশে গিয়ে একটা আতঙ্কময়
পরিবেশের সৃষ্টি করছে। ফারগুসন বন্দুক হাতে নিয়ে
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক নিরীক্ষণ করছেন। অন্ধকারের
মধ্যে যেন চারপাশে মৃত্যুর দূত এসে দাঁড়িয়েছে!

রাত্রি বাড়ছে। কালি চাঁদ ক্রমে আরও উঁচুতে
উঠে যেন সমগ্র বনভূমিকে এক রহস্যময় আবরণে
সাজিয়ে দিলে। ফারগুসনের পাহারার সময় এবার
শেষ হ'ল। তিনি এবার জো'কে আস্তে আস্তে ধাক্কা
দিয়ে ঘুম থেকে তুললেন। জো এবার বন্দুক হাতে
নিয়ে পাহারার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসল। ফারগুসন
কেনেডির পাশে শয়ন করলেন।

জো'র কাছেও এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নূতন। এক-
একবার অরণ্যের রহস্যময় শব্দে সে সচকিত হয়ে উঠে
বন্দুক হাতে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে চেয়ে
দেখে। নিস্তব্ধ অরণ্যভূমি যেন তার কাছে একটা
ভয়াবহ রূপ নিয়ে তাকে গ্রাস করবার জন্যে উদ্যত
হয়েছে, এইরকম একটা আর্ত অনুভূতি তার মনকে
আচ্ছন্ন করে রইল। প্রতিটি মুহূর্ত যেন মৃত্যুর অজ্ঞাত
আক্রমণের প্রতীক্ষায় উন্মুখর। জো কোনরকমে চার
ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে কেনেডিকে জাগিয়ে তুললে। তারপর
ফারগুসনের পাশে চুপ করে শুয়ে পড়ল।

কেনেডি বন্দুক নিয়ে পাহারা দিতে বসল। চাঁদ
কখন অস্ত গেছে। ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর
বুকে। রাত্রির শেষযামে অরণ্যের যেন তন্দ্রা এসেছে।

তবুও সেই তন্দ্রালুতার মধ্যেও একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মারাত্মক রূপ নি.য় তার সর্বাঙ্গে ভীষণতার কুৎসিত আবরণ পরিয়ে দিয়েছে। কেনেডি দু'চোখ দিয়ে প্রকৃতির এই তন্দ্র হিংস্রতা দেখতে লাগল। কখন কখন রাত্রিচর পাখীর দল একটা বীভৎস ডাক ডেকে উঠে কোথায় যেন উড়ে গেল। সারা অরণ্য সে ডাকে চমকে উঠে তার তন্দ্রালুতার মধ্যেও যেন তীব্র দৃষ্টি মেলে কেনেডিকে দেখতে লাগল।

ক্রমে পূর্ব দিগন্তে ঊষার আলোর আভাস দেখা গেল। দুঃসহ রাত্রির এবার অবসান ঘটবে, আলোর ঝর্ণা-ধারা এবার ঝরে পড়বে পৃথিবীর বুকে। ক্রমে সব কিছু স্বচ্ছ হয়ে উঠল কেনেডির চোখে। এবার জো ও কারগুসন জেগে উঠলেন। তিনজনে তখন নদীর জলে মুখ-হাত ধুয়ে ঘাসের উপর বসলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই জো কিছু খাবার ও চা তৈরী করে ফেলল। প্রাতরাশ সেরে নিয়ে আবার তাঁরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

নোঙর খুলে দিয়ে বেলুনে গ্যাস দিতেই তিনজনকে নিয়ে বেলুন আকাশে উঠল। এবার বায়ুপ্রবাহ ধীর শান্ত। বেলুন ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

কারগুসন ম্যাপের উপর চোখ বুলিয়ে বললেন—"আমরা যে প্রদেশের উপর দিয়ে এখন উড়ে যাচ্ছি সেটা জাঙ্গোমেরো প্রদেশ। এদেশের জলবায়ু অত্যন্ত বিষাক্ত। এখানে যেসব পর্যটক এসেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই কঠিন দুঃসাধ্য রোগে পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ এখানে দেহ বিসর্জন দিয়েছেন।"

বেলুন কয়েক শত ফুট ঊর্দ্ধে থাকলেও একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ নিচের জলাভূমি থেকে উঠছিল। কারগুসন বেলুনটি আরও উঁচুতে নিয়ে গেলেন।

আর কিছুদূর এইভাবে যেতেই সেই জাঙ্গোমেরো প্রদেশ পার হয়ে তাঁরা এক বিশাল অরণ্যের উপর এসে পড়লেন। সেই অরণ্যের অদূরেই এক বিশাল উন্নত পর্বত স্বর্ণ-কিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। কারগুসন সেই পর্বত লক্ষ্য করে বললেন—"ঐটি রুবেহো পর্বত। আমাদের এই উচ্চ পর্বত অতিক্রম করে যেতে হবে।"

কারগুসন আবার বেলুনে গ্যাস দিলেন। বেলুন আরও উঁচুতে উঠল। মেঘ ভেদ করে বেলুন চলতে লাগল। ক্রমে রুবেহো পর্বতশৃঙ্গ পার হয়ে যেতে আর কোন বাধা রইল না।

রুবেহো পর্বতের অপর পারে নিবিড় অরণ্য। সে অরণ্যের ভীষণতা অবর্ণনীয়। কোন পর্যটক সে অরণ্যের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে পারে নি। এ অরণ্যের মধ্যে অনেক স্থানেই কোনদিন সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না। এখানে যে সব অসভ্য লোক বন্যপশুদের সঙ্গে একত্র বাস করে তারা যেমন হিংস্র, তেমনি নরমাংসলোলুপ। তারা বন্যপশুদেরও অধম। এ অরণ্য যেন তাদের একচেটিয়া সম্পত্তি। এখানে কেউ সাহস করে প্রবেশ করতে চায় না, পারেও না।

বনের বাইরে কতকগুলি হরিণ চরছিল। তাদের দেখে কেনেডি বললেন—"কারগুসন, .আমাদের সঞ্চিত খাদ্যের উপর চাপ না দিয়ে এখানে আহার্য সংগ্রহ করলে হয় না? হরিণগুলো দেখে আমার শিকারী-হাত যে নিশপিশ করছে।"

কারগুসন মৃদু হেসে :বললেন—"শিকারী মানুষকে নিয়ে আ:নার ঐ বিপদ! শিকার দেখলে আর থাকতে পারে না! বেশ, আমি বেলুন নামাচ্ছি, তবে এসব জায়গায় খুব সাবধানে নামতে হবে।"

গ্যাস কমিয়ে কারগুসন বেলুনকে নিচে নামিয়ে দিলেন। একটা বড় গাছ দেখে বেলুনের নোঙর সেই গাছে আটকানো হ'ল। বেলুন এবার স্থির হয়ে গাছের কিছু উপরে বাঁধা পড়ল।

সকলে দড়ির মই বেয়ে নিচে নেমে এসে মাটিতে পা দিলেন। চারদিকের সেই আরণ্য সৌন্দর্য এতই অপরূপ যে, তিনজনে বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন বনভূমির দিকে।

কারগুসন বললেন—"দেখ কেনেডি, আমি বেলুনের কাছে থাকি, তুমি আর জো দু'জনে কাছাকাছি শিকারে যাও। আমার বন্দুকের শব্দ শুনলে তোমরা কালবিলম্ব না করে ছুটে এখানে আসবে। ঐ বন্দুকের শব্দই হ'ল আমার বিপদের সঙ্কেত।"

বেলুনের কাছে কারগুসনকে রেখে কেনেডি ও জো অরণ্যের কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ একটা বাচ্চা হরিণ অরণ্য থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে কেনেডির চোখে পড়ল। কেনেডি তখনি গুলী করে সেটাকে বধ করলেন।

জো মহোৎসাহে হরিণের ছাল ছাড়িয়ে তাকে একটা গাছের ডালে লতা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে তার নিচে শুকনো ডালপাতা সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। কেনেডি হেসে বললেন—"তোমার রোষ্ট মন্দ হবে না জো। অনেকদিন পরে বাচ্চা হরিণের মাংসের রোষ্ট খাওয়া যাবে।"

আগুনের শিখায় কল্পনে কল্পনে রোষ্ট তৈরী হতে

লাগল। কেনেডি বন্দুক হাতে নিয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে লাগলেন।

একটু দূরে বেলুনটি গাছের মাথায় হেলে-দুলে বাতাসের সঙ্গে খেলা করছে দেখা গেল। কেনেডি নিশ্চিন্তমনে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে হরিণের রোস্ট-করা দেখতে লাগলেন।

রোস্ট শেষ হয়ে এল। একটা গাছের ডালে রোস্ট-করা হরিণটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে জো আর কেনেডি চললেন বেলুনের দিকে।

হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনে তাঁরা ভয়ে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন। ব্যাপার কি? দ্রুতগতিতে বেলুনের কাছে গিয়ে দেখেন প্রায় শ' দুয়েক বানর একযোগে বেলুন আক্রমণ করেছে ও ফারগুসন মহা ব্যস্ত হয়ে তাদের তাড়াবার জন্য বন্দুক ছুঁড়ছেন।

কেনেডির নজরে পড়ল কয়েকটা বানর নোঙরের দড়িটি নিয়ে টানাটানি করছে। কেনেডির ভয় হ'ল যদি নোঙরের দড়িটি খুলে যায় তবে বেলুন আকাশে উড়ে যাবে, ফারগুসন আর সহজে বেলুনকে সেখানে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। জো আর কেনেডি সে অবস্থায় ভীষণ বিপদে পড়বেন।

কেনেডি আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সেই বানর কয়েকটাকে পর পর গুলী করলেন। গুলী খেয়ে তারা চিৎকার করে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদের সে অবস্থা দেখে অন্য বানরগুলো সেই গাছ ছেড়ে লাফিয়ে নিচে পড়ে যে যেখানে পারে পালিয়ে গেল।

রোস্ট-করা হরিণটাকে খণ্ড খণ্ড করে নিয়ে জো আবার কেনেডির সঙ্গে বেলুনে উঠলেন। ফারগুসন বললেন—"কি বদমাস্ বানরগুলো! আর একটু হলেই নোঙর খুলে দিত আর বেলুন উড়ে যেত!

চমৎকার রোস্ট-করা মাংস খেয়ে তাঁরা বেলুনের নোঙর তুলে আরও ঊর্ধ্বে উঠে গেলেন। বেলুন আবার পূর্বমুখে চলল।

নিবিড় অরণ্যানীর এক পাশ দিয়ে তাঁদের বেলুন চলছিল। ক্রমে তাঁরা একটা সমতলভূমিতে এসে পড়লেন, সেখানে বেশ অনেকগুলি কুটীর রয়েছে দেখা গেল। ফারগুসন ম্যাপ মিলিয়ে বললেন—"এটা হ'ল 'কাজে' জনপদ। এদের দেশে এটাকে কেউ কেউ নগরও বলে থাকে। আর ঐ যে কুটীর শ্রেণীর শেষে বালুকা ও মৃত্তিকা দিয়ে তৈরী অনেক বড় একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওটা বোধ হয় 'কাজে'র সুলতানের প্রাসাদ। প্রাসাদ বলতে আমরা যা বুঝি, ওটা অবশ্য তা নয়, তবে এদেশের লোকের কাছে ওটা প্রাসাদ বৈ কি!"

বেলুনকে অনেকটা নামিয়ে এনে ফারগুসন 'কাজে' নগরের অবস্থান ও অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, অগণিত নরনারী কুটীর ছেড়ে বাইরে এসে মহাবিস্ময়ে বেলুনটির দিকে চেয়ে চিৎকার করে কি যেন বলছে। তাদের ভাষা অনেকটা আরবীর সঙ্গে কাফ্রিভাষা মেশান। কয়েকটা শব্দ শুনেই ফারগুসন বুঝলেন, তারা ঠিক শত্রুভাবাপন্ন নয়। তারা ভেবেছে এরা নিশ্চয়ই চন্দ্রমণ্ডল থেকে নেমে এসেছে। তাই এদের অভ্যর্থনার জন্য তারা নানাভাবে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

এদিকে আর এক কাণ্ড ঘটল। বেলুন অনেকটা নিচে নামাতে, কিরকম করে নোঙরটা হঠাৎ বেলুন থেকে খুলে গিয়ে নিচে ঝুলে পড়ল। একটা বড় গাছের মাথায় একটা ডাল অনেকটা উঁচু হয়ে ছিল, নোঙরটা সেই ডালে আটকে যেতেই বেলুনটা অচল হয়ে গিয়ে হেলতে-দুলতে লাগল।

হঠাৎ এ ব্যাপার দেখে ফারগুসন, কেনেডি ও জো খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন। কিন্তু 'কাজে' নগরের অধিবাসীদের মনে এল অন্যরকম ভাব। তারা ভাবলে বোধ হয় তাদের অভিনন্দনে প্রীত হয়ে চন্দ্রলোকের তিনজন অধিবাসী 'কাজে' নগরে অবতরণের সঙ্কল্প করেছে। তাই তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আরও অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে লাগল।

নোঙর খোলবার জন্য বাধ্য হয়ে জো'কে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নামতে হ'ল। তখন কয়েকজন 'কাজে'-অধিবাসী তাড়াতাড়ি গাছে উঠে জোকে ধরে নিয়ে আবার নিচে নেমে গেল। উপায়ান্তর না দেখে চিন্তিত মনে ফারগুসনও নেমে এলেন। শুধু কেনেডি বন্দুক হাতে নিয়ে বেলুনের উপরে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

কিন্তু 'কাজে'-অধিবাসীরা এঁদের দু'জনকে খুবই আপ্যায়ন করতে লাগল। একজন উৎকৃষ্ট বেশধারী লোক, বোধ হয় তিনি প্রধান অমাত্য, এগিয়ে এসে মিশ্র-ভাষায় জানালেন যে 'কাজে' নগরের সুলতান খুবই অসুস্থ। চন্দ্রলোকের অধিবাসী যদি কোন দৈব-ঔষধে সুলতানকে আরোগ্য করতে পারেন তবে তারা খুবই কৃতজ্ঞ হয়। চন্দ্রলোকের অধিবাসীকে যেকালে তাদের

এ সঙ্কট সময়ে পাওয়া গেছে তখন অনুগ্রহলাভ করতেই হবে।

কারগুসন বুঝলেন, এদের কথামত কাজ না করলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই তিনি জোকে গাছের কাছে রেখে 'কাজে' নগরের অসুস্থ সুলতানকে দেখতে চললেন।

কুটীরশ্রেণী পার হয়ে সুলতানের প্রাসাদে তিনি নগরবাসিগণের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলেন। তোরণদ্বারে বর্শা ও তরবারি-হাতে রক্ষিগণ তাঁকে অভিবাদন করল। কয়েকটি কক্ষ পার হয়ে কারগুসন অবশেষে সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করলেন। কক্ষটি প্রশস্ত ও বিচিত্রভাবে সজ্জিত। একটি কাষ্ঠনির্মিত পালঙ্কে মধ্যবয়সী সুলতান শায়িত ছিলেন। তাঁর সারা দেহ একটি চিত্র-বিচিত্র রঙিন চাদরে ঢাকা। খাটের নিকট দুইটি বৃহৎ শুভ্র গজদন্ত এমনভাবে রাখা হয়েছিল যাতে তার উপরে প্রদীপ বসান চলে। কক্ষের মেঝে নানা রঙে রঞ্জিত। দেওয়ালগুলিতে নানারূপ লতাপাতা, ফুল-ফল নানা রঙে আঁকা। কক্ষের ভিতরের দিকে ছাদের নিচে একটি রঙিন চন্দ্রাতপ। একপ্রকার সুমিষ্ট গন্ধ ধূপাধার থেকে বার হচ্ছে। সুলতানের পালঙ্কের তিনদিকে সুসজ্জিতা রূপসী তরুণীগণ বসে আছে। কারগুসন বুঝলেন এরা সব সুলতানের পত্নী। কক্ষের মধ্যে কয়েকখানি উজ্জ্বল কাপড়ে ঢাকা কাষ্ঠাসন।

কারগুসন সুলতানকে পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর শেষ অবস্থা উপস্থিত। উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী জীবন-যাপনের ভয়াবহ পরিণামচিহ্ন যেন সুলতানের সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। সুলতান নিস্পন্দভাবে শায়িত ছিলেন, তাঁর বাক্-রোধ হয়েছিল। চক্ষুতারকা অচঞ্চল ও নিঃশ্বাস অতি ক্ষীণ।

কারগুসন বুঝলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই সুলতানের মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু তিনি তখন ভাবছিলেন, কি উপায়ে কৌশলে তিনি দ্রুতগতিতে বেলুনে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। তিনি তখন অমাত্য-প্রধানকে বললেন—"সুলতান নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করবেন। আমার নিকট চন্দ্রদেবের প্রদত্ত যাদুদণ্ড আছে। সেই যাদুদণ্ডের স্পর্শে সুলতান আবার নবযৌবনপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করবেন। কিন্তু চন্দ্রদেবের সেই যাদুদণ্ড আমার চন্দ্রযানে রয়েছে। আমি এখনই সেটি নিজে নিয়ে এসে সুলতানের অঙ্গে স্পর্শ করাচ্ছি। আপনারা এখনি দেখতে পাবেন সুলতান আবার পূর্বের মত কথাবার্তা বলতে ও উঠে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছেন।"

এবার কারগুসন সুলতানকে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, তাঁর অন্তিম শ্বাস উপস্থিত হয়েছে, মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই। অমাত্য-প্রধানও কারগুসনের কথায় আস্থা স্থাপন করে তাঁর সঙ্গে দ্রুত বেলুনের কাছে চললেন। কারগুসন তখন জো-কে বললেন—"জো, আর দেরী ক'রো না, আমি দড়ির মই বেয়ে বেলুনে উঠলেই তুমি নোঙরটি খুলে দিয়ে দড়ির মইয়ে উঠে পড়বে। ভয়ঙ্কর বিপদ এসেছে।

কারগুসনের কথা অমাত্য-প্রধান বুঝতে পারলেন না। তিনি গাছের নিচে তাঁর দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারগুসন তাড়াতাড়ি দড়ির মই বেয়ে বেলুনে উঠে পড়তেই জো নোঙরটি খুলে দিয়ে মইয়ের উপর উঠে পড়ল। বেলুনও বন্ধন মুক্ত হয়ে আবার আকাশপথে যাত্রা করল।

এরা পালাচ্ছে এই ব্যাপারটা বুঝেই ক্রুদ্ধ 'কাজে' নগরের অধিবাসীরা চীৎকার করে বেলুনকে লক্ষ্য করে রাশি রাশি তীর ছুড়তে লাগল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ একটা তীরও বেলুনকে স্পর্শ করল না।

বায়ুপ্রবাহে ভাসতে ভাসতে বেলুন অনেক দূরে চলে গেল। দৃষ্টিপথ থেকে কাজে নগর এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। এবার আবার নিবিড় অরণ্য শতাধিক মাইল জুড়ে রয়েছে দেখা গেল। সেই অরণ্যের মাঝখান দিয়ে একটি সর্পিল নদী বয়ে চলেছে। কারগুসন ভাল করে ম্যাপ দেখে বললেন—"এটি 'মালাগারাজি' নদী। এটি উৎপন্ন হয়েছে 'তাগানিকা' হ্রদ থেকে। সেই হ্রদ যেমন বৃহৎ, তেমনি গভীর। কিন্তু সে হ্রদের উপর দিয়ে ত আমরা যাব না, আমরা যাব এবার 'মেরে' হ্রদের উপর দিয়ে।"

তীব্র বায়ুপ্রবাহে বেলুন কেলে-দুলে সেই ভীষণ অরণ্য পার হয়ে এবার 'মেরে' হ্রদের উপর দিয়ে চলতে লাগল। কি অপরূপ শোভা! হ্রদের চারিদিকে অরণ্য থাকলেও অনেকগুলি পাতার কুটীর রয়েছে দেখা গেল। বর্বর নরমাংসভুক অসভ্যের দল সেই সব কুটীর থেকে বেরিয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কে বেলুনের দিকে চেয়ে উচ্চ চীৎকার করতে লাগল। কেউবা ভয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কয়েকজন তীরও ছুড়ল কিন্তু বেলুন অনেকটা উঁচুতে থাকায় তাদের তীর বেলুনকে স্পর্শ করতে পারল না।

বেলুন ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু এবার কারগুসন কেনেডিকে বললেন—"কেনেডি, আকাশের পূর্ব কোণে কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

কেনেডি বললে—"হাঁ, ফারগুসন, কালো মেঘ যেন সঞ্চিত হচ্ছে ওখানে।"

—"ঠিক বলেছ কেনেডি। আমি কিন্তু একটা ভয়ানক ঝড়ের আশঙ্কা করছি। দেখছ না প্রকৃতির রূপ কেমন বদলে গেছে।" বাস্তবিক সমগ্র আকাশ যেন ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাতে লাগল। কালো মেঘের স্তূপ আরও বাড়তে লাগল। নিচে অরণ্য প্রান্তর স্তব্ধ প্রতীক্ষায় কি যেন একটা ভয়ঙ্কর দুর্যোগের আভাস দিচ্ছিল। হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎরেখা ঝলসে উঠল আর সঙ্গে একটা উদ্দাম ঝড়ের গর্জন শোনা গেল। আকাশে মেঘের কুণ্ডলী ক্রমে ঘনীভূত হয়ে উঠল, আর ঘন ঘন বজ্রধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

ফারগুসন বললেন "আকাশের অবস্থা যেমন দেখছি তাতে একটা ভয়ানক ঝড় উঠতে পারে। এ দেশের ঝড় বড়ই ভয়ানক। এখন বেলুনকে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে হবে।"

কেনেডি বললেন—"তা হ'লে আর দেরি করা উচিত নয়।"

ঝড় কিন্তু ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে সমস্ত আকাশ যেন মথিত করে তুলল। বেলুন উপরে উঠতে না উঠতেই ঝড়ের আঘাতে ঘুরপাক খেতে খেতে একদিকে ছুটে চলল। বেলুনের চারদিকে তখন বিদ্যুতের আগুন ঝলসে উঠছে। ফারগুসন এবার যেন ভয় পেলেন। তিনি বললেন, "আমাদের বেলুনকে বিদ্যুৎ যদি একবার স্পর্শ করে তা হ'লে এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে। বেলুনকে কোন ক্রমেই বাঁচান যাবে না। আমরাও তিনজনে সে আগুনে পুড়ে মরব।"

কেনেডি বললেন—"বেলুনকে কি নীচে নামান যায় না?"

ফারগুসন বললেন—"তাতে বিপদ আরও বেশী। তার চেয়ে মেঘের অনেক উপরে ওঠাই ভাল। তাতে বেলুন রক্ষা পেতে পারে।"

জো এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা দেখছিল। ফারগুসন তাকে বেলুনের দোলনাটি যাতে না কোনক্রমে ছিঁড়ে যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে বলে বেলুনের গ্যাস বাড়াতে লাগলেন। এবার বেলুন দ্রুত-বেগে আকাশে উঠতে লাগল। ঝড়ের বেগে কালো মেঘের দল ওলটপালট খেতে লাগল। বেলুনের চার-পাশে বজ্র-বিদ্যুতের লীলা ক্রমশঃ বেড়ে উঠল। বেলুনের চারপাশে যেন অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হ'ল। এ অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে বেলুনে আগুন ধরে যেতে পারে। ফারগুসন তখন বেলুনের গ্যাস আরও বাড়াতে লাগলেন। বেলুন ঘুরপাক খেতে খেতে আরও উঁচুতে উঠল। শেষে দেখা গেল কালো মেঘের কুণ্ডলী ছাড়িয়ে বেলুন উপরে উঠে গেছে।

সে এক অভাবনীয় অপূর্ব দৃশ্য। উপরে নীলাকাশ শান্ত, নিচে ঝটিকার তাণ্ডব-নৃত্য শান্ত আকাশের স্নিগ্ধ মধুরিমা দেখে তিনজনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে নীচের সেই প্রচণ্ড ঝড় থেমে গেল, আকাশে আর একটুও মেঘ রইল না। শ্যামল ধরিত্রীর স্নিগ্ধ শোভা আবার তাদের চোখে পড়ল।

বেলুন এবার নামাতে লাগলেন ফারগুসন। ক্রমে বেলুন এক হ্রদের কাছাকাছি এসে পড়ল। ফারগুসন ম্যাপ দেখে বললেন—"আমরা এবার 'টাঙ্গানিকা' হ্রদের উপর এসে পড়েছি। এই হ্রদের চারদিকে যে পর্বতমালা বেষ্টন করে রয়েছে তার নাম 'চন্দ্র পর্বত'। কোন পর্যটকই এ পর্যন্ত এখানে আসতে পারেন নি। এই প্রদেশ আফ্রিকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা খনিজ পদার্থে পূর্ণ। এখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বর্বর।"

'চন্দ্র পর্বতের' এক পাশ দিয়ে বেলুন যাচ্ছিল। পর্বতের তলদেশে বিস্তীর্ণ প্রান্তর এক প্রকার বড় বড় ঘাসে ঢাকা। সেই প্রান্তরের মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় ছড়িয়ে আছে। প্রান্তরের উপরে হরিণের দল ছুটোছুটি করছে। কেনেডি বললেন—"এখানে একটা হরিণ শিকার করে কিছু মাংস রোস্ট করলে হয় না ফারগুসন?"

ফারগুসন বললেন—"তা বেশ ত, এখানে নোঙর ফেল।" জো তখনই সেই প্রান্তরে নোঙর নিক্ষেপ করল। কেনেডিও বন্দুক নিয়ে তৈরী হয়ে রইলেন।

নোঙর একটা বড় কালো পাথরের গায়ে আটকে গেল। কেনেডি বন্দুক নিয়ে নামবার জন্য প্রস্তুত হলেন। হঠাৎ জো চীৎকার করে বলে উঠল—"এ কি ব্যাপার! বড় পাথরটা যে চলছে!"

বড় পাথর চলছে! এ অসম্ভব কাণ্ড দেখে সকলে চমকে উঠল। কেনেডি বিশেষ লক্ষ্য করে বলল—"আরে! এটা ত বড় পাথর নয়, এ যে একটা হাতী!"

সত্যই সেটা একটা হাতী ছাড়া আর কিছু নয়। বেচারা হাতী ঘাসের বনে মনের সুখে চরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ তার বড় বড় দাঁত দুটোতে বেলুনের

নোঙরটা আটকে গেল। সে হঠাৎ এ ব্যাপারে খুবই হকচকিয়ে গিয়ে আতঙ্কে ছুটতে আরম্ভ করল।

হাতীও ছুটছে, বেলুনও চলছে। অদ্ভুত কাণ্ড ত! কিন্তু বিপদ যে কতখানি সেটা কারসন বুঝতে পারলেন। সম্মুখে একটা নিবিড় অরণ্য। সেই অরণ্যের দিকে হাতীটা প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল। যদি সত্যিই সে অরণ্যে হাতী ঢুকে পড়ে তা হ'লে বেলুন বড় বড় গাছের ধাক্কায় একেবারে ছিন্নভিন্ন হতে পারে বা ফুটো হয়ে গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে।

কারসন কম্পিত কণ্ঠে বললেন—"কেনেডি, গুলী কর।"

কেনেডি তখনই হাতীর মাথা লক্ষ্য করে গুলী চালালেন। হাতীর সর্বাঙ্গ একবার কেঁপে উঠল কিন্তু পরক্ষণেই আবার ছুটতে লাগল।

অরণ্যের প্রান্ত তখন প্রায় একশত ফুট দূরে। কেনেডি আবার গুলী করলেন, গুলী এবারও হাতীর মাথায় লাগল।

হাতী তবুও টলতে টলতে চলতে লাগল। কেনেডি এবার পর পর আরও তিনবার গুলী করলেন। হাতী এবার হুমড়ি খেয়ে মাটির উপর পড়ল। সেই পতনের আঘাতে তার দুটি প্রকাণ্ড দাঁত ভেঙে গিয়ে বেলুনের নোঙর মুক্ত হ'ল। বেলুন তখন সোজা খানিকটা উপরে উঠে গেল। হাতীটা তখন মাটিতে পড়ে ছটফট করছিল। কেনেডি আরও দু'বার তাকে গুলী করে তার ভবযন্ত্রণা মোচন করে দিলেন।

বেলুন আবার সেই অরণ্যের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলল।

জো বললে—"আমার ইচ্ছা ছিল হাতীর অমন চমৎকার লম্বা দাঁত দুটো বেলুনে তুলে নিই।"

কারসন বললেন—"হাতীর দাঁতে বেলুন ভারী করে লাভ নেই। এখনও আমাদের অনেক পথ যেতে হবে।"

কেনেডি বললেন—"আমরা ঠিক নীল নদীর উৎপত্তি-স্থলের দিকেই যাচ্ছি ত?"

কারসন বললেন—"নিশ্চয়ই। আমি ম্যাপ ও কম্পাসের সাহায্য নিয়েই গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছি। অবশ্য, বায়ুপ্রবাহে মাঝে মাঝে এক-আধবার পথ ভুল হয়েছিল বটে, কিন্তু মোটামুটি আমরা ঠিক পথেই চলেছি।"

বেলুন তখন অরণ্যবেষ্টিত এক প্রান্তরের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। সম্মুখে এক উচ্চ পর্বত দেখে কেনেডি প্রশ্ন করলেন—"এটা কি পর্বত কারসন?"

কারসন ম্যাপ দেখে বললেন—"এটা হ'ল 'রুবেমি' পর্বত। এই পর্বত পার হয়ে গেলে আমরা 'কারাগোয়া' পর্বতশ্রেণীর মধ্যে পড়ব। 'কারাগোয়া' শৈলরাজির প্রধান শৃঙ্গ 'ঠেকা'। ইহার পরেই 'ইউকেরিউ' হ্রদ। আমরা এখন যে পথে চলেছি, প্রাকৃতিক শোভায় এ স্থান অতুলনীয়। কিন্তু এখনও আমাদের বহুদূর যেতে হবে।"

পশ্চিম দিক থেকে পূবদিকে বায়ুপ্রবাহ বইছিল। বেলুন দ্রুতগতিতে আকাশপথে পূবদিকে উড়ে চলল। এক বিশাল অরণ্যের প্রান্তভাগে দেখা গেল অনেকগুলি কুটীর নিয়ে একখানি গ্রাম। বেলুন দেখে অসভ্য কাফ্রির দল কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে আতঙ্কে ও বিস্ময়ে বেলুনের দিকে চেয়ে রইল। কারসন বললেন—"এই সব অসভ্য লোকেরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির। এখন আমাদের এখান থেকে আরও পূবদিকে গিয়ে বেলুন নোঙর করাই ভাল। সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। আজকের রাত্রিটা ঐ সামনের বনের উপরেই কাটাতে হবে।"

বনের প্রথমেই একটা বড়গাছ পেয়ে কারসন সেখানেই নোঙর নিক্ষেপ করলেন। গাছের গুঁড়িতে নোঙরটা আটকে গেল। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে জো আগেই নেমে পড়ল। তারপর কেনেডি ও কারসন বেলুনের গ্যাস কমিয়ে দিয়ে নিচে নামলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে আসছে। জো তাড়াতাড়ি কতক-গুলো শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন জেলে ফেললে, তারপর রুটি তৈরী করতে আরম্ভ করল।

আকাশে পাখীর দল উড়ে যাচ্ছিল। কেনেডি তখনি পর পর তিনটে সরাল জাতীয় পাখী গুলী করে মারলেন। বন্দুকের নির্ঘোষে শান্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জো সেই পাখী তিনটির রোষ্ট তৈরী করে ফেললে। গাছের নিচে ঘাসের উপর বসে সেই রোষ্ট ও বিস্কুট খেতে খেতে সকলে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

কেনেডি জিজ্ঞাসা করলেন—"নীল নদীর উৎপত্তি-স্থলে কি কেউ এ পর্যন্ত যেতে পারে নি?"

কারসন বললেন—"চেষ্টা ত অনেক পথিকই করেছেন, কিন্তু সেই অতি দুর্গম স্থানে অনেকেই যেতে পারেন নি। কেউ কেউ নরখাদক অসভ্যদের হাতে

প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আমাদের আরও ক'দিন লাগবে সেখানে উপস্থিত হতে। অবশ্য, যদি বেলুন ঠিকমত যেতে পারে। এসব ভয়ঙ্কর স্থানে পদে পদে বিপদ।"

কেনেডি বললেন—"সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে এই কালো আফ্রিকা এক মহা রহস্যের ভয়ঙ্কর রূপ ধরে রয়েছে। এত বড় একটা মহাদেশ যেন সভ্যজগতের কাছে চিরদিন যবনিকার অন্তরালেই রয়ে গেল। এর কি রহস্য-উন্মোচনের কোন সুযোগই এল না?"

ফারগুসন মৃদু হেসে বললেন—"পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ মহাদেশ এই আফ্রিকা। এর আয়তন এক কোটি সতের লক্ষ বর্গমাইল ও ইউরোপের তিনগুণ। বিষুব রেখা এর মধ্যস্থল দিয়ে গেছে। দুর্ভেদ্য নিবিড় অরণ্য, সমুচ্চ পর্বত, দুস্তর জলাভূমি, বিশাল হ্রদ ও সুদীর্ঘ নদীমালায় আফ্রিকা মহাদেশ সমাচ্ছন্ন। নীল নদী আফ্রিকার দীর্ঘতম নদী। প্রায় চার হাজার মাইল এর দৈর্ঘ্য। এই নদী ভিক্টোরিয়া নায়েজা হ্রদের উত্তর উপকূল থেকে বার হয়ে তারপর বহুদূর এসে আবার 'আলবার্ট নায়েজা' হ্রদে প্রবেশ করেছে। এই নীল নদী 'নিমুল' থেকে 'খার্টুম' নগরে এগিয়ে গেছে, তখন এর নাম 'শ্বেত নীল'। 'আসোয়ান' নগরের পথে আসবার সময়ই নীল নদীর নাম 'নীল নদী' হয়েছে। এই পথেই ছটি বড় বড় জলপ্রপাত আছে। তারপর বহু কান্তার-প্রান্তর-মরু অতিক্রম করে নীল নদী মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছে। আফ্রিকার আরও যে কয়টি নদী আছে তার মধ্যে দৈর্ঘ্যে 'কঙ্গো নদী' তিন হাজার মাইল, 'নাইজার নদী' দু' হাজার ছ'শ মাইল, 'জাম্বেসী নদী' দেড় হাজার মাইল। তা ছাড়া 'সেনিগাল', 'গাম্বিয়া', 'সোবাত', 'বহর্-এল্-গজল্', 'আটবারা', 'লিম্পপো', 'অরেঞ্জ' প্রভৃতি নদীগুলিও সুদীর্ঘ। আফ্রিকার মাঝামাঝি বিষুবরেখা থাকাতে ও নদীগুলির অসংখ্য অববাহিকা থাকাতে আফ্রিকার মধ্যদেশ অত্যন্ত নিবিড় দুর্গম অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। আমরা যে পথে ও যে গতিতে অগ্রসর হচ্ছি তাতে নীল নদীর উৎপত্তিস্থলে পৌঁছতে আমাদের আর বেশীদিন লাগবে না।"

কেনেডি আবার প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা ফারগুসন, আমরা যে পথে যাচ্ছি, সেই পথেই ফিরতে পারব ত?"

ফারগুসন বললেন—"সেটা অনিশ্চিত। বেলুন সম্পূর্ণ বায়ুপ্রবাহের বশীভূত। আমাদের হিসাবমত কোন কাজই ঠিকমত করা চলবে না। তবে সতর্কতার সঙ্গে বেলুন পরিচালনা করলে অল্প সময়ের ব্যবধানে আমরা নীল নদীর উৎপত্তিস্থলে হয়ত পৌঁছতে পারি। অবশ্য, এটা নির্ভর করে বায়ুপ্রবাহের উপরেই। ফেরবার সময় এ পথে নাও আসতে পারি। আমরা যে সম্পূর্ণ বায়ুপ্রবাহের বশীভূত এ কথা ভুললে ত চলবে না। তাই হয়ত আট্লাস্ পর্বতমালা, টিবেষ্টি ও আহাগর পর্বতমালা বা রুটাজালোন পর্বত বা কামেরুন পর্বত আমাদিগকে আহ্বান করতে পারে। হয়ত আমরা লবণ হ্রদগুলি পার হয়ে 'সাহারা', 'লিবিয়া' বা 'কালাহারি' মরুভূমির দিকেও চলে যেতে পারি, কিংবা আর একটু বেঁকে গিয়ে মাউণ্ট কিলিমাঞ্জারো, মাউণ্ট কেনিয়া, মাউণ্ট রুয়েঞ্জোরি বা ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতের পাশ দিয়ে জোয়ার্টবার্গেন ও ন্যাজবার্গেন পর্বতের মধ্যবর্তী 'বড় কারু' মালভূমিতে উপস্থিত হতে পারি। কোন্ পথে যে বেলুন যাবে সেটা এখন ঠিকমত বলা চলে না।"

জো প্রশ্ন করে বসল—"আচ্ছা, আমরা যে পথে যাচ্ছি সে পথে কি মরুভূমি পড়বে?"

ফারগুসন বললেন—"বড় মরুভূমি এদিকে নেই তবে কিছু কিছু সামান্য তৃণময় শুষ্ক প্রান্তর পড়বে। সেগুলিকে আফ্রিকার 'ভেল্ড' কেউ বলে। তা ছাড়া বহু শুষ্ক নদীখাতও আমরা হয়ত দেখতে পাব, এগুলি 'ওয়াদি' নামে পরিচিত।"

কেনেডি কি যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ কাছাকাছি কি একটা শব্দ শুনে সকলে চমকিত হয়ে উঠলেন।

শব্দটা সত্যই একটু অদ্ভুত ধরনের। একসঙ্গে যেন অনেক লোকের পদশব্দ। কখন থামছে, কখন চলছে। কেনেডি হাতে বন্দুক নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ফারগুসন বললেন—"আমার মনে হচ্ছে কারা যেন আমাদের দিকে আসছে।" জো একটু বনের মধ্যে অগ্রসর হয়ে দেখলে—অনেকগুলো কালো কালো মূর্তি যেন মাটির ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের হাতের শাণিত বল্লম সেই অন্ধকারেও যেন চক্ চক্ করছে।

জো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে বললে—"অসভ্যেরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। চলুন, এই মুহূর্তেই আমরা বেলুনে গিয়ে উঠি।"

ফারগুসন ও কেনেডি তাড়াতাড়িতে দড়ির মই বেয়ে বেলুনে উঠে গেলেন। গাছের ডাল থেকে নোঙর খুলে

দিয়ে জো-ও তাদের পিছনে পিছনে দড়ির মই বেয়ে উঠে পড়ল। বেলুন আবার উপরে উঠল।

অসভ্যের দল তখন গাছের কাছে এসে পড়ে বল্লম ও তীর ছুড়তে লাগল। কিন্তু বেলুন উঁচুতে উঠে যাওয়ায় তাদের তীর ও বল্লম বেলুনকে স্পর্শ করতে পারল না।

আকাশে তখন আধখানা চাঁদ উঠেছিল। সেই চাঁদের আলোয় বেলুনকে অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। অসভ্যের দল তখন চীৎকার করে বেলুনের দিকে তাদের তীর ছুড়তে লাগল।

কেনেডি বললেন—"গোটাকতক অসভ্যকে মারব না কি কারগুসন?"

কারগুসন বললেন—"না কেনেডি, অনর্থক নরহত্যায় লাভ নেই। তা ছাড়া ওদের তীর আমাদের বেলুনের ক্ষতি করলে তুমি সে চেষ্টা করতে পারতে। আমাদের যাত্রা কতদিন চলবে কে জানে? আত্মরক্ষা ছাড়া আমরা কেন নরহত্যা করতে যাব?"

বেলুন অসভ্যদের গ্রাম পার হয়ে অরণ্যের উপর দিয়ে পূর্বমুখে উড়ে চলল। শান্ত রাত্রির আকাশে আধখানি চাঁদ উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করছিল। বনভূমির মাথায় কে যেন এক পোঁচ রূপালী রঙ লাগিয়ে দিয়েছে। বায়ুর গতি তীব্র নয়, অথচ একটানা পূব থেকে পশ্চিমে বয়ে চলেছে। সেই মৃদুল বায়ুস্রোতে বেলুন ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

কারগুসন বললেন—"তোমরা দু'জনে এইবার একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি বেলুন চালনা করছি।"

বেলুনের দোলনার এক পাশে তখন কেনেডি ও জো শুয়ে পড়ল। কথা রইল যে, তিন ঘণ্টা পরে ওদের জাগিয়ে দিয়ে কারগুসন ঘুমুবেন।

বেলুন উড়ে চলল। মাথার উপরে রাত্রির জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশ, পায়ের নিচে রহস্যময় আঁধার অন্ধকার বনভূমি—কারগুসন স্থিরভাবে বেলুনকে বাতাসের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে পশ্চিম দিকে চললেন। হাল্কা-ভাবে ভেসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করলেন, জীবনটাও যেন কত হাল্কা হয়ে গেছে! অনন্ত আকাশে এমনিতর অনির্দেশ যাত্রায় মন যেন পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণ ছাড়িয়ে এক আশ্চর্য অনুভূতিতে ভরে উঠেছে! পৃথিবীর মায়া, পৃথিবীর মোহ—সব যেন সরে যাচ্ছে দূর হতে দূরে। একটা মুক্তির—একটা নির্ভরতার—নব জাগ্রত আবেগ যেন কারগুসনের অন্তর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রইল। তিনি ভাবলেন—কেনেডি ও জো'কে তিনি তিন ঘণ্টা পরে আর জাগিয়ে তুলবেন না, সারা রাত এইভাবে বেলুনের উপর বসে থেকে অনাগত ভবিষ্যৎকে ঊষার আলোকে বন্দনা করবেন।

ভোর হতেই কেনেডি ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন—"কি আশ্চর্য! তুমি আমাকে জাগাও নি কেন কারগুসন?"

জো'ও উঠে দুঃখিতস্বরে সেই একই অভিযোগ করল।

কারগুসন হাসলেন, শান্তস্বরে বললেন—"রাত্রে বেলুন চালনা সহজ নয় কেনেডি। একটু ভুল হলেই আমরা বিপথে চলে যেতে পারতাম। সারা রাত আমার হাতে ছিল কম্পাস, আর বায়ুপ্রবাহও ছিল শান্ত। তাই বেলুন ঠিক পথেই এসেছে।"

ঊষার আলোক আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাঁরা দেখলেন সমুদ্রের মত এক বিশাল হ্রদের কাছাকাছি তাঁদের বেলুন এসে পড়েছে। কারগুসন বললেন—"এই সেই ভিক্টোরিয়া স্যারেঞা হ্রদ। আফ্রিকার দীর্ঘতম হ্রদ যে টাঙ্গানিকা, তার দৈর্ঘ্য চারশ' মাইল হলেও এই ভিক্টোরিয়া হ্রদ আয়তনে টাঙ্গানিকার চেয়ে অনেক বড়। এ একটা সমুদ্র বললেও হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, ভিক্টোরিয়া হ্রদের জল লবণাক্ত নয়। এর উত্তরের মালভূমি মরুময়, অথচ দক্ষিণের মালভূমি নিবিড় অরণ্য-সমাচ্ছন্ন।"

প্রভাত-সূর্যের অরুণালোকে হ্রদের তরঙ্গময় জলরাশি এক অপূর্ব সৌন্দর্যে ঝলমল করছিল। সে শোভা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনজনে মুগ্ধ ও বিস্মিত চক্ষে ভিক্টোরিয়া হ্রদের দিকে চেয়ে রইলেন। এই সময়ে বাতাসের বেগ একটু প্রবল হওয়ায় বেলুন ঘণ্টায় প্রায় তিরিশ মাইল বেগে হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে চলল। সমুদ্রের মতই জলরাশির বিস্তার, সমুদ্রের মতই তার তরঙ্গ। তবে তরঙ্গগুলি উদ্দাম নয়, উচ্ছ্বসিত হয়েও বায়ুহিল্লোলে যেন একই ছন্দে তটভূমি আঘাত করছে। হ্রদের উপর ছোট ছোট অনেকগুলি দ্বীপ। তার উপরে সাদা বকের সারি বসে বিশ্রাম করছে।

বেলুন জলরাশির উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। হ্রদের একদিকে দুর্গম নিবিড় অরণ্য। কারগুসনের ইচ্ছা ছিল সেই অরণ্যপ্রান্তের কোন একটা বড় গাছে বেলুনের নোঙর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বায়ু-প্রবাহ বিপরীত থাকায় তাঁর সে ইচ্ছা সফল হ'ল না। বেলুন হ্রদের উপর দিয়েই পূর্বের মত অগ্রসর হ'তে লাগল।

কেনেডি বললেন—"তুমি কি এই হ্রদ পার হয়ে যেতে চাও কারুসন? আমার মনে হয় তীরের কাছাকাছি কোথাও বেলুন নোঙর করে একবার নামতে পারলে ভাল হ'ত।"

কারুসন বললেন—"বেশ ত। ঐ অরণ্যময় তীরের কাছে একটা ছোট দ্বীপের মত কি দেখা যাচ্ছে। ঐখানেই বেলুন নোঙর করে একটু বিশ্রাম আর কিছু খাওয়ার চেষ্টা দেখা যাক।"

বেলুন অগ্রসর হতে হতে একটা ছোট দ্বীপের কাছে যেতেই কারুসনের আদেশে জো নোঙর নিক্ষেপ করল। নোঙর দ্বীপের উপর একটা বড় পাথরের একপাশে আটকে গেল।

তিনজনে দড়ির মই বেয়ে দ্বীপের উপর নামলেন। দ্বীপটি ছোট হলেও দেখতে চমৎকার। দু'চারটে বড় বড় গাছও আছে। জো একটা স্থান বেছে নিয়ে রন্ধনের ব্যবস্থা করতে লাগল।

কারুসন বললেন—"এই সব দ্বীপে কুমীরের উপদ্রব খুব। হঠাৎ তারা দল বেঁধে দ্বীপের উপর উঠে পড়ে। তুমি সর্বদা প্রস্তুত থেক কেনেডি, দরকার বুঝলেই গুলী করবে।"

ছোট্ট দ্বীপটির একপাশে জো কিছু শুকনো তালপাতা জোগাড় করে রাঁধবার ব্যবস্থা করল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল বুনো হাঁসের দল সেই দ্বীপের একদিকে জড়ো হয়েছে। কি ভেবে জো সেইদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল। হাঁসের দল তাকে দেখে ভয়ে উড়ে পালাল। জো সেই জায়গায় কতকগুলি টাটকা ডিম পেলে। সে তখনি সেগুলি সংগ্রহ করে আনন্দে কারুসন ও কেনেডির কাছে এসে তার সার্থক অভিযানের কথা বলে ডিমগুলি দেখালে।

ডিমের ওমলেট্ ও কফি তৈরী হ'ল। ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জার সেই ছোট্ট দ্বীপটিতে বসে সেই প্রাতরাশ খেতে খেতে কেনেডি বললেন—"এমন চমৎকার পরিবেশের মধ্যে এমন প্রাতরাশ খাওয়ার কি তুলনা আছে কারুসন?"

কারুসন হেসে বললেন—"বিশেষতঃ যদি চারদিকে মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসে।"

"মারাত্মক বিপদ?"—একটু আশ্চর্য হয়েই প্রশ্নটা করলেন কেনেডি।

"হাঁ কেনেডি। আমরা এখন ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জার যে উপকূলে রয়েছি, এর কাছেই ছড়িয়ে আছে নরখাদক অসভ্যদের গ্রামগুলি। বড়পশুদের চেয়েও তারা দুর্দান্ত ও হিংস্র। আমাদের খুব সতর্ক হয়েই থাকতে হবে। আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তারা আমাদের বেলুন দেখতে পেয়েছে ও আমাদের আক্রমণ করবার সুযোগ খুঁজছে।"

জো হঠাৎ কারুসনের দৃষ্টি একদিকে আকর্ষণ করে বললে—"দেখুন, দেখুন, একটা উপুড়-করা বোট ভেসে যাচ্ছে!"

কারুসন বিশেষ লক্ষ্য করে দেখে বললেন—"না জো, ওটা উপুড়-করা বোট নয়। ওটা একটা প্রকাণ্ড কুমীর। জলের উপর দিয়ে আমাদের দিকে আসছে।"

জো আবার চিৎকার করে উঠল—"ঐ দেখুন, আরও কতগুলো আসছে।"

সত্যিই ত! কারুসন চিন্তিত হয়ে কেনেডিকে বললেন—"এস আমরা সকলে বন্দুক নিয়ে দাঁড়াই। ওরা ভয়ানক হিংস্র কুমীর। অতগুলো একসঙ্গে এই দ্বীপে উঠে এলে এক ভয়ঙ্কর বিপদের সৃষ্টি হবে।"

তিনজনে বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। প্রকাণ্ড কুমীরগুলো কিন্তু দ্বীপের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল।

ভাসমান কুমীরের মাথা লক্ষ্য করে একসঙ্গে তিনটে বন্দুক গর্জন করে উঠল।

তিনটে আহত কুমীরের ছটফটানিতে জল তোলপাড় হতে লাগল, কিন্তু অন্য কুমীরগুলো থামল না, তারা আগের মতই এগিয়ে আসতে লাগল।

তাদের মাথা লক্ষ্য করে আবার তিনটে বন্দুক গর্জে উঠল। এবারেও তিনটে কুমীর আহত হ'ল।

এবার কিন্তু কুমীরের দল আর দ্বীপের দিকে এগিয়ে এল না। তারা অন্যদিকে দ্রুত চলে গেল।

আহত ছ'টা কুমীরের দেহ জলে ডুবে গেল। কারুসন বললেন—"একটু পরেই ওদের মৃতদেহ জলে ভেসে উঠবে।"

হঠাৎ জো ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—"দেখুন, দেখুন, তীরের কাছে বনের মধ্যে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!"

কেনেডি ও কারুসন বিস্মিত হয়ে তীরের জঙ্গলের দিকে চেয়ে দেখলেন, অগণিত মানুষ ঝোপের পাশে পাশে দেখা যাচ্ছে। অসভ্য যত কালো মানুষগুলো প্রায় উলঙ্গ দেহে তীর-ধনুক ও বল্লম নিয়ে হিংস্রচোখে তাদের দিকে চেয়ে আছে। এরা তিনজন তাদের লক্ষ্য করছে দেখে হঠাৎ তারা বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

কারুসন বললেন—"যেমন গতিক দেখছি ওরা হয়ত আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আমাদের খুব

সতর্ক হয়েই থাকতে হবে। বোধ হয় বন্দুকের শব্দ শুনে ওরা এদিকে এগিয়ে এসেছে। এই অসভ্য লোকেরা এই নিবিড় অরণ্যে কত যুগ থেকে বাস করছে তা কে জানে! বন্যপশুর সঙ্গে থেকে ওরা সম্পূর্ণ বন্য হয়ে উঠেছে। ওরা জানে শুধু হত্যা করতে আর যে কোন উপায়েই হোক খাদ্য সংগ্রহ করতে। ওদের কাছে পশুর মাংসও যা মানুষের মাংসও তা। অনেক সময় কাঁচা মানুষের মাংসও এরা খেয়ে থাকে।"

কেনেডি বললেন—"কি বীভৎস কাণ্ড!"

কারগুসন বললেন—"আফ্রিকার এই ভয়ঙ্কর স্থানের নাম কারাগোয়া। এর অধিবাসীরা ভয়ানক হিংস্র।"

জো ততক্ষণে কিছু খাবার তৈরী করে ফেললে। দ্বীপের উপর একটা বড় গাছের নিচে বসে তারা খেতে খেতে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল।

কারগুসন বললেন—"এই কারাগোয়া থেকে গণ্ডোকো নব্বই মাইল হবে। এই পথটুকুতে অনেক বাধা-বিঘ্ন আসতে পারে। সমুচ্চ পর্বতমালা আছে, দুর্ভেদ্য নিবিড় অরণ্য আছে, জলপ্রপাত আছে, আর আছে হিংস্র বর্বর মানুষ। যদি ঝড়-জল হয় তবে হয়ত আমরা পথভ্রষ্টও হতে পারি। তাই এই নব্বই মাইল পথ আমাদের খুব সাবধানে যেতে হবে। কেনেডি বললেন—"এ স্থানে আর কেউ আমাদের আগে আসে নি, তোমার কি মনে হয়?"

কারগুসন হেসে বললেন—"হাঁ, এসেছিলেন একজন, তাঁর নাম পর্যটক 'ডিবোনো'। অসমসাহসী তিনি। কিন্তু তিনি নীল নদীর উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি একটা জলপ্রপাত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তারপর তিনি যে কোন কারণেই হোক আর অগ্রসর হতে পারেন নি। ভগ্ন শরীর ও হতাশ মন নিয়ে তিনি এই পথেই ফিরেছিলেন বোধ হয়। কিন্তু দুর্গম অন্ধকার অরণ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।"

কেনেডি বললেন—"তুমি এত সংবাদ জানলে কি করে কারগুসন?"

কারগুসন বললেন—"তাঁর ডায়েরী ও জিনিষপত্র সেই অরণ্যের মধ্যেই পরে আবিষ্কৃত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যটকেরা তাঁর পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু নীল নদীর অতি দুর্গম উৎপত্তিস্থানে কেউই পৌঁছতে পারেন নি।"

"এখন কোন্‌দিকে যাবে?" কেনেডি অধীরভাবে প্রশ্ন করলেন।

"আমরা এখন পূর্বমুখে বেলুন পরিচালনা করব। এ দ্বীপে আর আমাদের থাকা উচিত হবে না। আমার মনে হয় বর্বর কাফ্রিরা আমাদের রাত্রে আক্রমণ করতে পারে।"

জো'কে নোঙর খুলবার আদেশ দিয়ে কেনেডি ও কারগুসন এবার দড়ির মই বেয়ে বেলুনে উঠলেন। জো-ও নোঙর খুলে দিয়েই দড়ির মই বেয়ে তাঁদের পিছনে পিছনে বেলুনে উঠে পড়ল। তারপর দ্রুত নোঙরটাকে টেনে উপরে তুলে নিলে। বেলুন আবার আকাশে ভেসে চলল।

কারগুসন এবার ঘন ঘন দূরবীক্ষণ দিয়ে সামনের পর্বতমালা লক্ষ্য করছিলেন। তুষারমণ্ডিত উচ্চ শিখরগুলো সূর্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি সেই দিকে কেনেডি ও জো-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—"এই যে পর্বতশ্রেণী দেখতে পাচ্ছ, ওদের পাশেই ছোটো হ্রদ আছে। সেই হ্রদে পর্বতের অসংখ্য নির্ঝরধারা এসে পতিত হয়েছে। সেই জলধারা একটা হ্রদ থেকে বেরিয়ে আবার অন্য হ্রদে এসে পড়েছে। আবার সেখান থেকে বেরিয়ে দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়ে নিজের পথ করে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরে এসে পড়েছে। ঐ পর্বতমালাই হচ্ছে নীল নদীর উৎপত্তিস্থল। আর অসংখ্য নির্ঝরের দ্বারা পরিপুষ্ট প্রবল জলধারাই নীল নদীর জননী।"

"আমরা ত সেই দিকেই যাচ্ছি কারগুসন?" প্রশ্ন করলেন কেনেডি।

"তা ত যাচ্ছি, কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠতে পারে। দেখছ না, সমস্ত প্রকৃতি যে ক্রমশঃ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেলুন বাতাসের অভাবে অতি ধীরে ধীরে চলছে। আর ঐ দেখ, পূর্বদিগন্তে একখানা কালো মেঘ বেশ ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে। এদিকে মধ্যাহ্ন সূর্যও ক্রমশঃ পশ্চিমে চলে পড়ছে।"

কেনেডি ও জো আতঙ্কের দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন। কারগুসন বলতে লাগলেন—"ঝড় উঠলে বেলুন যে কোন্ দিকে ভেসে যাবে সেটা অনিশ্চিত। হয়ত আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থল থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ব। তার চেয়ে কাছাকাছি কোথাও বেলুন নোঙর করে নেমে পড়াই ভাল। পরে ঝড় থামলে আবার যাত্রা করা যাবে।"

সামনে নিবিড় জঙ্গলের পাশেই হ্রদের উপরে একটা ছোট দ্বীপ ছিল। সেই দ্বীপ আর জঙ্গলের মধ্যের ব্যবধান বোধ হয় একশ' হাতের বেশী হবে না। সেই দ্বীপের একটা বড় গাছে আবার বেলুনের নোঙর আটকানো হ'ল।

কিন্তু এদিকে আর এক ভয়ঙ্কর বিপদ যে ঘনিয়ে আসছিল, সে বিষয়ে তাঁরা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। যে হিংস্র কাফ্রির দল অরণ্যের মধ্য থেকে আগেই তাঁদের দেখতে পেয়েছিল, তারাও যে সেই অরণ্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের অনুসরণ করে চলছিল, তা তাঁরা ভাবতেও পারেন নি। এখন ঘন জঙ্গলের ফাঁকে হঠাৎ দু'একটা বীভৎস মুখ দেখে জো চমকে উঠে কারগুসন ও কেনেডিকে সে কথা বলতেই কারগুসন বললেন—"ওরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির নরঘাতক কাফ্রি। ঝড় না থামা পর্যন্ত আমাদের খুবই সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।"

এবার ঝড় উঠল। প্রচণ্ডবেগে আকাশের কালো মেঘরাশিকে আবর্তিত মথিত করে ভয়ঙ্কর গর্জনে ঝড় ছুটে এল এক দল উন্মত্ত দৈত্যের মত। হ্রদের জলরাশি হঠাৎ যেন উদ্দাম ঢেউয়ে পরিণত হ'ল। সে ঢেউ মাঝে মাঝে দ্বীপের উপরেও এসে আছড়ে পড়ল। বেলুন সেই প্রচণ্ড ঝড়ে একদিকে হেলে পড়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। দ্বীপের গাছগুলো যেন ভেঙে পড়বার মত হ'ল। চারিদিক কালো হয়ে চোখের সামনে সব কিছু আড়াল করে ফেললে। কারগুসন চিন্তিত হলেন। নোঙর ছিঁড়ে যদি বেলুন ঝড়ে উড়ে যায় তবে তাঁদের সকল আশা নির্মূল হয়ে যাবে। এই অজানা দেশে এক অতি ভয়ঙ্কর পরিবেশে তাঁদের সকলকে প্রাণ হারাতে হবে। কিন্তু প্রকৃতির বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে এ অবস্থায় তাঁরা আর কি করতে পারেন?

ঝড় সমানেই চলল প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপরে ক্রমশঃ কমে এল। কারগুসন বললেন—"আকাশে এখনও মেঘ জমে আছে। ঝড় না হলেও হয়ত প্রচণ্ড বৃষ্টি নামতে পারে। এ অবস্থায় বেলুন নিয়ে আকাশে ভেসে যাওয়া ঠিক হবে না। আমাদের এখানে প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

জো বললে—"তা হলে বেলুনের দোলনা থেকে ছোট তাঁবুটা নিয়ে আসা যাক্। বৃষ্টি যদি আসে, ভিজে যেতে হবে না।"

কারগুসনের আদেশে জো এবার দড়ির মই বেয়ে বেলুনে উঠে গেল। কেনেডির দিকে চেয়ে কারগুসন বললেন—"কোন বিভ্রাট না ঘটলে আর নব্বই মাইল যেতে পারলেই আমরা নীল নদীর উৎপত্তিস্থলে পৌঁছতে পারব। তবে এই পথটাতে দু'বার পর্যন্ত পার হতে হবে। আর তা ছাড়া আফ্রিকার সবচেয়ে হিংস্র ও নরঘাতক অসভ্যেরা আদিম যুগ থেকে এই জায়গাটাতেই বসবাস করছে। তাই কোন কোন পর্যটক নীল নদীর উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি এসেও তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করতে পারেন নি। হয় তাঁরা এখানকার দূষিত জল-হাওয়ায় নিদারুণ অসুস্থ হয়ে আর অগ্রসর হন নি, নয়ত তাঁরা এখানকার অসভ্য বন্য লোকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন।"

এই সময়ে জো বেলুন থেকে হাল্কা কাপড়ের ছোট তাঁবুটা এনে সেই বড় গাছটার কাছে খাটিয়ে ফেললে। কেনেডি দ্বীপের আর এক দিকে একটু অগ্রসর হয়েই চীৎকার করে বললেন—"কারগুসন, শীগ্‌গির এদিকে এস।"

ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে কারগুসন ও জো তাড়াতাড়ি কেনেডির কাছে ছুটে গেলেন। সামনের একটা ঝোপের পাশে একখণ্ড চওড়া উঁচু পাথর দেখিয়ে কেনেডি বললেন—"এই দেখ এই পাথরের উপর ইংরাজী অক্ষর খোদাই করা রয়েছে!" সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনিয়ে আসে নি। দিনের স্বল্প আলোকে তাঁরা স্পষ্টই সে অক্ষর দু'টি পড়তে পারলেন।

কারগুসন উৎসাহভরে বললেন—"দেখেছ কেনেডি, দু'টি অক্ষর 'এ, ডি' স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!"

'এ, ডি' এ দু'টি অক্ষরের মানে কি?"—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন কেনেডি।

কারগুসন বললেন—"বিখ্যাত পর্যটক 'আন্দ্রিয়া ডিবোনো'। তাঁরই নামের দু'টি আভক্ষর তিনি হয়ত ছুরি বা অন্য কোন লৌহ অস্ত্রে এই পাথরের উপর খোদিত করে গেছেন। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি এখানেও—এই অরণ্য প্রান্তের ছোট দ্বীপেও আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমরা ঠিক পথেই এসেছি।"

"আচ্ছা কারগুসন, আন্দ্রিয়া ডিবোনো কি নীল নদীর উৎপত্তিস্থলে যেতে পারেন নি?"—প্রশ্ন করলেন কেনেডি।

কারগুসন বললেন—"না, তিনি শুধু নীল নদীর উৎপত্তিস্থলের সর্বোত্তর সীমানা পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। আর কয়েক মাইল গেলেই হয়ত তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ত। কিন্তু বহু কষ্টে বহু ক্লেশ সহ করে এই দুর্গম অজ্ঞাত অরণ্যভূমিতে এসেও তিনি নীল নদীর উৎপত্তিস্থলে পৌঁছতে পারেন নি। যে কোন কারণেই হোক তিনি ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর এই দুর্গম অরণ্যেই কিভাবে যে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল সে কথা কেউ বলতে পারে না। তাঁর ডায়েরি ও পোশাক-পরিচ্ছদ

যে পরে আর পর্বতটি আবিষ্কার করেছিলেন, সে কথা আমি পূর্বেই তোমাকে বলেছি।"

এবার তাঁরা তাঁবুর কাছে ফিরে এলেন। এই সময়ে জো হঠাৎ হ্রদ-তীরের বনভূমির দিকে চেয়ে আতঙ্কে বলে উঠল—"দেখুন, দেখুন, গাছের উপর থেকে কারা যেন আমাদের লক্ষ্য করছে।"

সকলে সেই দিকে স্তব্ধভাবে চেয়ে রইলেন। ফারগুসন বললেন—"আমাদের খুব সাবধানে চারপাশে লক্ষ্য রেখে রাত্রি কাটাতে হবে। সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রি বারটা পর্যন্ত আমি জেগে থাকব। রাত্রি বারটার পর কেনেডি আর জো বেলুন পাহারা দেবে।"

সেই মত ব্যবস্থা হ'ল। ফারগুসন সন্ধ্যার পর বন্দুক হাতে নিয়ে জেগে বসে রইলেন। কেনেডি আর জো দু'জনে ঘুমুতে লাগল। কিন্তু এক কারণে ফারগুসন অস্থির হয়ে পড়লেন। রাত্রির অন্ধকারে দলে দলে কীটপতঙ্গ এসে তাঁকে আক্রমণ করল। এক একটা মশা যেন মাছির মত। আর এক প্রকার বোলতার মত পতঙ্গ এসে ফারগুসনের হাতে মুখে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফারগুসন তখন উপায়ান্তর না দেখে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য একটা চাদর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে শুধু চোখ দু'টি বার করে সতর্ক হয়ে বসে রইলেন।

রাত্রি বেড়ে চলেছে। হ্রদের জলে তরঙ্গের মৃদু কল্লোল শোনা যাচ্ছে। আকাশে কালো মেঘের রাশি তখনও যেন ঘুরপাক খেতে খেতে ছুটোছুটি করছে। তবে ঝড়ের বেগ আর তেমন নেই। রহস্যময় অন্ধকার চারদিক ঘেরে ফেলেছে। হ্রদতীরের বনভূমির মর্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে যেন দূরাগত মৃদু সঙ্গীতের মত। এ যেন আর এক জগৎ, আর এক বিস্ময়! এখানকার আকাশে-বাতাসে ভেসে আসছে একটা চাপা আতঙ্কের শঙ্কিত দীর্ঘশ্বাস! আদিম আফ্রিকা যেন তার বন্যতা, হিংস্রতা ও ভয়াবহতা নিয়ে মূক আক্রোশে সমগ্র সভ্য জগতকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছে! সে যেন বিদ্রূপ কণ্ঠে বলছে—"হে সভ্য জগতের মানুষ, আমার মাটিতে রত্নসম্ভার, আমার অরণ্যে বনৈশ্বর্য, আমার নদী-হ্রদে স্বর্ণচূর্ণ, আমার পর্বতমালায় খনিজ-সম্পদ—এদের লোভে তোমরা উন্মাদের মত ছুটে এসেছ আমার কাছে, আমার বক্ষপঞ্জরের প্রতিটি অস্থি চূর্ণ করেছ তোমাদের গর্বিত আঘাতে! কিন্তু আমি দেব না তোমাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে। তোমাদের সভ্যতা চূর্ণ করেছে আদিম পৃথিবীর যে প্রাকৃতিক গৌরব, আমি এখনও আঁকড়ে ধরে আছি তাকে। তোমরা বেঁধে ফেলেছ কত নদ-নদী-হ্রদ-পর্বত-অরণ্য তোমাদের বিজ্ঞানের লৌহশৃঙ্খলে—আমি এখনও রেখেছি আমার বুকে তাদের মুক্ত উদার আদিম মহিমায়! সরে যাও, হে যান্ত্রিক সভ্যতার পতাকাবাহীর দল, তোমাদের স্থান এ আফ্রিকায় নেই!"

ফারগুসনের চোখের সামনে অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। পাশে কেনেডি ও জো কম্বলে শরীর আবৃত করে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ফারগুসন স্তব্ধভাবে বসে চেয়ে রইলেন সেই অতি-অস্পষ্ট অরণ্যের দিকে। হ্রদের জল যেখানে তটভূমিকে বার বার যে ভাবে আঘাত করছে,—তারও ধ্বনি শুনতে পেলেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল হ্রদের জলে কিসের যেন ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারে যতখানি দেখা যায় তিনি দেখলেন তিন-চারখানা লম্বা ছিপের মত নৌকা যেন দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে। বন্দুক-হাতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নৌকাগুলি আরও কাছে এলে তাঁর সন্দেহ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি তখনই কেনেডি ও জো'কে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে জাগিয়ে তুললেন। তাঁরা ঘুম থেকে উঠতেই ফারগুসন বললেন—"কেনেডি, জো—তোমরা বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হও—আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব কর না—হিংস্র কাফ্রীরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! বেলুনে উঠে যাবার সময় পর্যন্ত আমাদের আর নেই!"

নৌকাগুলি তখনই দ্বীপের ধারে এসে পৌছল আর হঠাৎ কয়েকটি মশাল জ্বলে উঠল। সেই আলোকে অসভ্য লোকদের নৃশংস চেহারা দেখে তাঁরা বুঝলেন এবার কি ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পড়েছেন তাঁরা!

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী !

কলিকাতা আকা(-ঠ)শ বাণী সম্পর্কে শ্রোতা মহলে যতপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনাই হউক না কেন এখানের, তথা কেন্দ্রের বেতার কর্তারা কর্ণ-বিবরে তুলা গুঁজিয়া মৌনীবাবা হইয়া অচল-অটল রহিয়াছেন।

(১) গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা বেতারে 'আধুনিক' গানের এক অদ্ভুত অশ্রাব্য বন্যার স্রোত বহিতেছে। এই আধুনিক গীতগুলি রচনা করেন যাহারা, তাঁহাদের রচনাশক্তির প্রশংসা করিবার মত ভাষাজ্ঞান আমাদের নাই। দুই-একটি আধুনিক গানের সামান্য নমুনা দিতেছি।

(১) তুমি এখন এলে ভাল হত
কারণ আমার হাতে কিছু সময় ছিল !
(গোপন কথা বলার ?)
আমার ধারণা ছিল কথা দিয়ে তুমি কথা
রাখবে ! (কিন্ত হায় !)

(২) তুমি যখন চলে গেলে রাত দুপুরে
তখন কেউ তোমায় দেখতে পায় নি !
(কারণ অন্ধকার ছিল !)

(৩) প্রেম সে ত প্রেম নয়, যদি না সে প্রেম হয় (!)
পাখী সে ত পাখী নয় যদি সে বাসায় বসে
থাকে—(ডিমে তা দিতে ?)

গানের ঠিক কথাগুলি মনে নাই—তাই ঐগুলির মোটামুটি ভাবার্থ দিলাম। যে-সব আধুনিক প্রেমের গান বর্তমানে কলিকাতা কেন্দ্র হইতে আকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের কর্ণ বিদ্‌ঘুটে শব্দ-তরঙ্গে কলুষিত করা হয়—সেই সব যথার্থ প্রেম সঙ্গীতগুলির মোটামুটি ভাবার্থ অ্যানালিসিস্ করিলে দাঁড়াইবে—

(১) আকাশে চাঁদ ছিল, আমি ছিলাম
হায় ! তুমি ছিলে না !

(২) তুমি ছিলে, আকাশে ছিল চাঁদ—
কিন্তু আমি ছিলাম না—হায় !

(৩) তুমি ছিলে, আমিও ছিলাম—কিন্ত হায় ! হায় !
তখন আকাশে চাঁদ কোথাও ছিল না !

এই 'আধুনিক গীত' যাহাদের কণ্ঠ হইতে নির্গত হয়, তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জনের ঊর্দ্ধতন চৌদ্দ-পুরুষ (বা নারী) মনের ভুলেও 'গান' নামক বস্তুটি কখনও করেন নাই, করিবার বাসনাও তাঁহাদের কখনও হয় নাই। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে রাত্রি প্রায় সওয়া সাতটায় অন্ধকার ঘরে, অনৈকা শ্রীমতী···মজুমদারের কণ্ঠে—'প্রেম সে ত প্রেম নয়···' আধুনিক গানটি শ্রবণ করিয়া হঠাৎ মনে হইল গ্রামের এক এঁদো বাগানে বাঁশবনে এক অশরীরি নারী পুত্রশোকে নাকি-সুরে বিলাপ করিতেছে। ভয়ে ঘরে বাতি জালিতে বাধ্য হইলাম ! সত্য কথা বলিতে কি —এই ভাবে যদি বেতার কর্তারা আরও কিছুকাল আধুনিক গানের শলাকা দ্বারা শ্রোতৃ-কর্ণে খোঁচা চালাইতে থাকেন তাহা হইলে বহু নিরীহ, শান্তিপ্রিয় শ্রোতা রেডিও লাইসেন্স বাতিল করিতে বাধ্য হইবেন এই কারণে যে 'দুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল' !

আধুনিক গানের বিষয় একটি কথা মাত্র বলা যায় এবং তাহা এই যে, পয়সা (করদাতাদের) খরচ করিয়া হঠাৎ-কবিদের রচিত 'আধুনিক গান' ক্রয় না করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'উপক্রমণিকা' কিংবা 'কথামালা' হইতে ইচ্ছামত অংশ 'আধুনিক গান' বলিয়া প্রচার করিতে দোষ কি ? ইহাতে গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের কিছু জ্ঞান লাভ এবং রেডিও মহলের রাম-শ্যাম পণ্ডিতদের সামান্য বিদ্যাজ্ঞানও হয়ত হইবে ! যথা-মহলে এই প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবে, এমন আশা অবশ্যই করি না।

(২) কলিকাতা বেতার হইতে পল্লীমঙ্গল আসর তুলিয়া দেওয়াতে বহু ভদ্র শ্রোতা আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়াছিলেন, কিন্ত হায় ! আসরের নাম বদল হইলেও আসর মোড়লী হইতে অব্যাহতি পাইল না। বিচিত্রা-অনুষ্ঠান এবং কৃষিকথার আসর বস্তুত পল্লীমঙ্গল...

আসরের নবরূপ হইলেও চলিতেছে সেই একই ঢঙে। ঘোড়লের তিন মোসাহেবের একযোগে ভাঁড়ামো, ডাকামো এবং হ্যাবলামো ক্রমশঃ বৃদ্ধিমুখেই এবং এই সবের সর্বাধিনায়ক সর্বগুণের-বিতার-আকর সেই চির-পরিচিত (এবং চিরস্থায়ী) ঘোড়ল!

কৃষি-কথার আসরেও পরমভক্ত শ্রীঘোড়ল শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের বাণী প্রায়ই কিছু-না-কিছু শ্রোতাদের মানসিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রচার করিবেনই! কিন্তু কেন? কৃষি-কথার মধ্যে মহাপুরুষদের বাণীর অবকাশ কোথায় জানি না। কৃষি সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ কিছু বলিয়াছেন কি না জানা নাই। কেমিক্যাল ম্যানিওর এবং ফার্টিলাইজার সম্পর্কেও তাঁহাদের কিছু উপদেশ আছে কি না বলিতে পারি না। তবে মনে হয়, ভক্তপ্রবর ঘোড়ল কৃষি-কথার মধ্যে মানব-জমি আবাদ করিয়া সোনা ফলাইবার দায়িত্বটাও তাঁহার একান্ত কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! তাহা না হইলে কৃষি-কথার আসরে আলু-কচু-আদা-পেঁচু চাষের আলোচনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামীজীকে অযথা মাঠের কাদায় টানিয়া আনেন কেন? চাষীদের মনে সায় দিবার জন্যই কি ইঁহাদের বাণী ব্যবহার করা হইতেছে কৃষি-কথার আসরে? কৃষি-কথার যদি কোন ঠাকুরের কথা বলা বা বাণী উদ্ধৃত করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা হইলে সর্ব-পরিচিত এবং অ-নামধন্য অন্ত একজন ঠাকুরের—অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা হইতে কৃষি এবং কৃষক সম্পর্কে বহু মূল্যবান (অবশ্য শ্রীঘোড়লের মতে অন্ত প্রকার হইতে পারে) বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে প্রধান বাধা এই যে, সামান্ত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কৃষি-বিষয়ে কথার উপরে শ্রীঘোড়লের ঘোড়লী করিবার কোন অবকাশই নাই!

কিন্তু আমরা বৃথাই এত কথা লিখিতেছি। রেডিও কর্তাঃ দীর্ঘ কর্ণের অধিকারী হইলেও তাঁহাদের পরম-পোষ্য চরম-ভক্ত ঘোড়লের 'বিচিত্র অনুষ্ঠানে' কি প্রকার চাষ হইতেছে এবং দেশের অভাগা কৃষক ইহাতে কি পরম-ফল পাইতেছে, তাহা শ্রবণ করিবার সময় বোধ হয় ইঁহারা পান না! কৃষি-বিষয়ে বর্তমানে যে প্রকার এবং যে ভাবে অসার কথার আগাছার চাষ হইতেছে, তাহা একমাত্র এই বাংলা দেশেই সম্ভব।

কলিকাতা আকা(-ঠ)শ বাণীর সবই বাজে এমন কথা বলি না, কিন্তু এখান হইতে প্রচারিত উত্তম সারযুক্ত বিষয়গুলিও একান্ত অশ্রাব্য বিষয়ের চাপে মাঠে মারা যাইতেছে। বিশেষ করিয়া সংবাদ প্রচার।

একজন মাত্র সংবাদ-ঘোষক শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিতে পারি। অন্যদের কথা বার বার বলিয়া কোন লাভ হইবে না। প্রসঙ্গক্রমে কিছুদিন পূর্বে একজন মহিলা সংবাদ প্রচারিকার প্রচার নমুনা দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। তিনি প্রচার করেন "আগামী বৎসরের (১৯৬৬) ১৮ই তারিখে" কি একটা বিষম জরুরী সম্মেলন হইবে যাহাতে প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। (অতএব প্রত্যেক শ্রোতা ১৯৬৬ সালে সারা বছর ধরিয়া ঐ বিশেষ ১৮ তারিখের প্রতীক্ষায় থাকুন!)।

"দরখাস্ত অবশ্যই ইংরাজী বা হিন্দীতে লিখিতে হইবে!"

'ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ্ (*sic*) এমপ্লয়মেন্ট অ্যাণ্ড ট্রেনিং'—সরকারী এই সংস্থার একটি বৃহৎ বিজ্ঞাপন বিবিধ সংবাদপত্রে কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটির শেষ দুই লাইনে আছে:-

'দ্রষ্টব্য: দরখাস্ত অবশ্যই ইংরাজী বা হিন্দীতে লিখিতে হইবে'...ইত্যাদি।

তাই যদি হয়, তাহা হইলে আমরা কি ইহাই বুঝিব যে বাঙ্গলা, ওড়িয়া, অহমিয়া, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষী যাহারা ইংরেজি কিংবা হিন্দীতে দরখাস্ত লিখিতে পারিবে না, সরকারী চাকুরি হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে? কেন এবং কোন্ অপরাধে? ভাষা লইয়া কিছুদিন পূর্বে যখন দেশব্যাপী হাঙ্গামা চলিতেছিল, সেই সময় শুনিয়াছিলাম যে, ভারতের চৌদ্দটি ভাষাই সম-মর্যাদা লাভ করিবে এবং হিন্দী না জানিলেও অহিন্দী-ভাষীদের পক্ষে সরকারী চাকরি লাভের পথে কোন অন্তরায় বা বাধা সৃষ্টি হইবে না। ইহা সরকারী ভাবে প্রচারও করা হয়—বিবিধ মাধ্যমে। কিন্তু গত কিছুকাল হইতে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় হিন্দীভাষী কর্তারা নানা ভাবে—প্রকাশ্যে এবং গুপ্তপথে ধীরে ধীরে আবার 'হিন্দী অনুপ্রবেশের' প্ররোচনা দিতেছেন। এমনকি মাস তিনেক পূর্বে প্রধানমন্ত্রীও গৌহাটির এক বক্তৃতা জনসভায় ভাষণদানকালে ভারতের জন্য একটি লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজের (link language-এর) প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেন। বলা বাহুল্য 'লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ' হিন্দী ছাড়া আর কিছুই যে হইতে পারে না বা হইবে না এই মনোবাসনাই

কর্তাদের অন্তরে সদা তীব্র ভাবে বিরাজ করিতেছে। দেশের এই সঙ্কটকালেও—কর্তাদের হিন্দীকে দেশের 'রাষ্ট্রভাষা' করিবার প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও কমে নাই দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। কেবল দরখাস্তই নহে, রেলের টিকিট, বিবিধ মূল্যের কারেন্সী নোট, মনি-অর্ডার ফর্ম, বিবিধ সরকারী রসিদাদি, রেল-ষ্টেশনের নামের বোর্ড, কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস প্রভৃতির সাইন-বোর্ড—প্রায় সকল ব্যাপারেই প্রকট ভাবে হিন্দী বিরাজমান। প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত নাম প্রভৃতি হিন্দীর নিচে এবং অপেক্ষাকৃত বেশ ছোট হরফে—কেবলমাত্র পিত্ত রক্ষার জন্যই দেওয়া হইতেছে। মনি-অর্ডার ফর্ম—এমন এক বিচিত্র কিম্ভূত বস্তু হইয়াছে, যাহা অহিন্দীভাষীর পক্ষে বোঝাই এক সমস্যার কথা। সরকারী কোন ফর্ম এমন কুৎসিত অবোধ্য হইতে পারে, আগে জানা ছিল না!

হিন্দীকে সিংহাসনে বসাইবার অপচেষ্টা করিতে গিয়া কর্তারা দেশের সংহতি বৃদ্ধি করিবার বদলে সংহতিকে প্রায় সংহার করিতে বসিয়াছিলেন—এখন আবার তলে তলে সেই অপচেষ্টাই তাঁহারা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু কেন? দেশের সামগ্রিক কল্যাণ অপেক্ষা কি হিন্দীর সিংহাসন লাভই অধিকতর কাম্য হইল? দেশের বিপদকালে, জাতির জীবন-মরণ সমস্যার সময়—সমগ্র ভারত যে এক এবং হিন্দী ছাড়াও যে ভারতের ৪৫ কোটি মানুষ পরম ঐক্যবদ্ধতার পরিচয় দিতেছে, সেই সময় আবার কেন সেই প্রায়-মৃত ভূতকে এমন করিয়া খোঁচান হইতেছে তাহা আমাদের পক্ষে বুঝা অসম্ভব।

সরকারী কাজের, বিশেষ করিয়া টেকনিক্যাল কাজের জন্য দরখাস্তকারীকে কেন বাঙলা, অহমিয়া, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় দরখাস্ত করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে? ইহা কি সংবিধানসম্মত?

বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে বহু বাঙালী বাড়ী-ঘর করিয়া বিগত বহুকাল এবং বহু পুরুষ যাবত স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। পূর্ব্বে জমি, বাড়ীঘর এবং চৌকিদারী ট্যাক্স প্রভৃতির রসিদে ইংরেজীর সহিত আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হইত। গত কিছুকাল হইতে ইংরেজীকে বিতাড়িত করিয়া সব কিছুই হিন্দীতে করা হইতেছে, বিশেষ করিয়া বিহারে। খাজনা প্রভৃতির রসিদে হিন্দীতে বিচিত্র শ্রীঅক্ষরে অর্দ্ধশিক্ষিত পকায়েত অথবা গ্রাম-প্রধান কি লিখিয়া দেন, তাহা অহিন্দীভাষীর পক্ষে পড়া বা বুঝা অসম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। বাৎসরিক দেয় খাজনার অতিরিক্ত অর্থ নিয়মিত প্রতি বৎসর প্রেরণ করা সত্বেও—কেমন করিয়া এবং কোন বিচিত্র হিসাবে এক বৎসরের খাজনা নিয়মিত বাকী পড়িয়া থাকে—তাহা আমাদের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। বিহারে খাজনা আদায় এবং রসিদ দেওয়া—বিষয়টি এমন এক অবস্থায় দাঁড় করান হইয়াছে, যাহাতে বিহারে বোধ হয় আর বেশীদিন বাঙালীদের, বিশেষ করিয়া যাঁহারা চাকুরি এবং অন্যান্য কারণে বিহারের বাহিরে থাকেন, বাড়ী-ঘর, জমি-জমা বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। বিহার সরকারের মনোগত বাসনাই ইহা কি না জানি না, কিন্তু বিহার রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের—বিশেষ করিয়া জমি-রাজস্ব বিভাগের কর্মপদ্ধতি এবং ব্যবহারে আমাদের মনে এই ধারণাই ক্রমশ বদ্ধমূল হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ-বাসী বাঙালীদের বলিতে গেলে বিহারে বিদেশী বলিয়াই বিবেচনা করা হইতেছে।

আন্দামানে উদ্বাস্তু বাঙালী

বর্তমানে আন্দামানে উদ্বাস্তু বাঙালীর সংখ্যা বহু সহস্র এবং ইঁহারা এখানে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন। এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে—ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা উদ্বাস্তু বাঙালী এই আন্দামানেই সর্বাপেক্ষা ভালরূপেই পুনর্ব্বাসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই উদ্বাস্তুদের শতকরা ৯৮ জনই চাষী-কৃষক শ্রেণীর এবং সাধারণভাবে প্রায় সকলেই কৃষিতেই জীবিকা অর্জন করিতেছেন। কিন্তু একমাত্র কৃষিকেই সম্বল করিয়া সমগ্র সামাজিক জীবন গঠিত হয় না। সামগ্রিক সামাজিক জীবন গঠনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা। আন্দামানে বাঙালীদের শিক্ষা-ব্যবস্থা নাই—এ কথা বলিব না, কিন্তু এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও উদ্বাস্তু বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর জোর করিয়া হিন্দী চাপান হইয়াছে। একজন সংবাদদাতা জানাইতেছেন—আন্দামানে:

প্রাথমিক পর্য্যায়ে কোন কোন স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম বাঙলা এবং কোন কোন স্কুলে বাঙলা একটি ভাষা হিসাবে পড়ান হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর তাদের মাধ্যমিক শিক্ষা হিন্দীর মাধ্যমেই নিতে হচ্ছে। এই অবস্থার দরুণ ক্রমে ক্রমে বাঙলা ভাষা শিক্ষা এখানে একেবারেই উঠে যাবে। এ বিষয়ে বাঙালীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আন্দামানে বাঙালী উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। সরকারীভাবে উদ্বাস্তু এলাকায় অনেক

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার অভাবে ভাল পড়াশুনা হয় না। কোন জায়গায় শিক্ষক আছেন ত স্কুলঘরের অবস্থা শোচনীয়। বৃষ্টি হলেই ঘরের ভিতরটা জলকাদায় একাকার হয়ে যায়। পাকা রাস্তার অভাব। বনজঙ্গল থাকায় ছাত্রদের আসা-যাওয়ার অসুবিধা। শিক্ষকদের মাহিনাও ঠিক সময়মত দেওয়া হয় না। তাই ছাত্রদের প্রতি তাঁরা মনোযোগও তেমন দিতে পারেন না। এখানে কংগ্রেস অবাঙালীদের কুক্ষিগত। যে দু'চারজন বাঙালী কংগ্রেসে আছেন তাঁরাও ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন কথা বলেন না। এখানে যাঁরা বাঙালী উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন, তাঁরাও অতিশয় বশংবদ। নিজ নিজ স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী সমাজকে বাঁচতে গেলে কি করা কর্তব্য, সেইদিকে নজর দেবার কারও সময় নেই।

এই অধঃপতন থেকে বাঙালী সমাজকে বাঁচাতে হলে রামকৃষ্ণ মিশনের মত কোন সঙ্ঘের কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক বা নৈতিক চেতনা জাগাতে হবে। আজ আন্দামানে বাঙালী সমাজ দিন দিন কোথায় যে যেতে বসেছে, তা কেউ বলতে পারে না। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তবে আন্দামানে বাঙালী সমাজ বলতে কিছুই থাকবে না। হিন্দী ভাষার দাপটে বাঙালী হিন্দুস্থানীতে পরিণত হবে।

এবং বাস্তবে ইহা ঘটিলে দেশের সংহতি আরও এক ধাপ অগ্রসর হইবে! খাস পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় এই অবস্থা। এখানে বহু বিদ্যালয়ে হিন্দী শিক্ষার আসর বেশ ভালভাবেই বসান হইয়াছে—অথচ বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষা শিক্ষার দিকে চাপ দিবার কোন প্রয়োজনীয়তা বিশেষ কেহ স্বীকার করেন না। ভারতের সংহতি শেষ তক 'সব-হিন্দীত্বেই' কি পরিসমাপ্তি লাভ করিবে?

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-দপ্তরের কর্মতৎপরতা!

হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের নাম একদা ভারতের সর্বত্র অতি পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলের ছোট ছোট কারখানাগুলিতে বছরে প্রায় ২০।২৫ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নির্মিত হয় এবং সেই সঙ্গে অন্তত ৬০।৭০ হাজার নর-নারীর অন্ন-সংস্থান হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমানে ঐ 'ভারতের শেফিল্ড' বেলিলিয়াস রোডের কারখানা-গুলি প্রায় অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ কারখানাগুলির অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন কাঁচামাল—যথা: তামা, দস্তা, সিসা, পিতল, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতির একান্ত অভাব। উক্ত অঞ্চলের কারখানার লোকে ইহার জন্য দায়ী করিতেছেন রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প-দপ্তরকে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শিল্প-দপ্তর তাঁহাদের এলাকার শিল্পগুলির জন্য দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছেন এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ব্যবস্থা করিতে-ছেন, কিন্তু আমাদের এ-রাজ্যের কর্তৃপক্ষ এ বিষয় কি করিতেছেন জানিতে ইচ্ছা করি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা পুরানো কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেলিলিয়াস রোডের কারখানাগুলি প্রতি মাসে তিন-চারি কোটি টাকার সমরোপকরণ যোগাইয়াছিল। ইহা ইংরেজ আমলের কথা—কিন্তু অতঃপর দেশীয় সরকার সমরোপ-করণ প্রস্তুতের প্রায় কোনপ্রকার ফরমাসই বেলিলিয়াস রোডের কারখানাগুলিকে দেন নাই। অথচ এখানের কারখানাগুলি মোটর কার্গোর পার্টস, পেপার মিলের কলকব্জা, পাইপের জয়েন্ট এবং অন্যান্য বহুপ্রকার যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কাজে আজও ভারতে অদ্বিতীয় এবং জাপান-জার্মানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে। কঠিন যন্ত্রপাতি 'মানে' বিদেশী সমপ্রকার যন্ত্রপাতির সমান হইয়াও, দরে কম।

সমগ্র ভারতে তামা ও দস্তা দিয়া যে-সকল দ্রব্যাদি নির্মিত হয়, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগই প্রস্তুত হয় পশ্চিমবঙ্গে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রকে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী তামা ও দস্তা দিয়া থাকেন। সীসার সরবরাহ আরও বিচিত্র! এ-রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রয়োজন বৎসরে বারো হাজার টন সীসা—কিন্তু কেন্দ্রের বরাদ্দ মাত্র ১৪৬ টন! তদ্বির-তদারকের জোরে অন্যান্য রাজ্য প্রয়োজনের বেশী মাল আদায় করিয়া লইতেছে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে। অন্যান্য রাজ্যের কারখানাগুলি ঐসব মাল যতটা দরকার ব্যবহার করিতেছে এবং উদ্বৃত্ত যাহা কিছু চালান হইতেছে পশ্চিমবঙ্গের কালোবাজারে এবং এ-রাজ্যের কারখানাগুলি সেই মাল দু তিন গুণ বেশী মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে—কোনক্রমে কারখানা চালু রাখিবার জন্যই। ইহার ফলে অন্যান্য রাজ্যের ক্ষুদ্র কারখানাগুলির হইতেছে শ্রীবৃদ্ধি আর পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলির অবস্থা আজ দাঁড়াইয়াছে প্রায় যায় যায়!

রাজ্য কর্তৃপক্ষ দিল্লীর কর্তামহলের দরবারে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পের বক্তব্য পেশ করার ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দান করিয়াছেন বলিয়া লোকে মনে করে। রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প-দপ্তরের কর্তারা তাঁহাদের একান্ত করণীয় যাহা, তাহাও করেন না বলিয়া মনে হয়। বেলিলিয়াস রোডের বহু কারখানা-মালিকের এমন অভিযোগও আছে যে, দুই বৎসর পূর্বে পেশ করা ঋণের আবেদন আজও বিবেচিত হয় নাই, কারণ 'অফিসারদের সময় নাই'। এ-রাজ্যের শিল্প-ঋণ দিবার ব্যাপারে যে-প্রকার অসম্ভব দীর্ঘসূত্রতা লক্ষিত হয়—অন্য কোন রাজ্যে তাহা দেখা যায় না। ঋণপ্রাপ্ত অর্থের পরিমাণে এই অভিযোগের প্রমাণ মিলিবে।

সবকিছু দেখিয়া মনে হয়, এ-রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পের বক্তব্য পেশ করিতে রাজ্য সরকারের তরফ হইতে দিল্লীতে যাঁহারা রেলের প্রথম শ্রেণীতে কিংবা বিমানে যাতায়াত করেন, তাঁহারা বোধ হয় ক্ষুদ্র শিল্প বলিতে কি বুঝায় তাহাই জানেন না, কাজেই তাঁহাদের পক্ষে এই শিল্পের সমস্যার বিষয় কিছু বলার আশা করা বাতুলতা মাত্র। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহারা বেলিলিয়াস রোডে গিয়া এই স্থানের কারখানাগুলির অভাব-অভিযোগ এবং সমস্যাগুলির বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সরেজমিনে আহরণ করা তাঁহাদের সামান্য কর্তব্য বলিয়াও মনে হয় নাই! 'বার বার' করিয়াও গত কয়েক বছরেও তাঁহাদের এখন পর্যন্ত সময় হয় নাই এবং যখন সময় তাঁহাদের হইবে, তখন হয়ত বেলিলিয়াস রোডের এবং রাজ্যের অন্য-স্থানের ক্ষুদ্র কারখানাগুলির মহা-শ্মশানে যাইবার সময়ও উপস্থিত হইবে! এ বিষয় আমরা বর্তমানে আর বেশী কিছু না বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি মন্তব্যের উল্লেখ করিব। অন্যান্য রাজ্যের শিল্প-দপ্তর শুধু কাঁচামাল সংগ্রহ নয়,মাল বিক্রয়ের ব্যাপারেও তাঁহাদের শিল্পগুলিকে সাহায্য করেন। তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন, তাঁহাদের প্রয়োজন সম্পর্কে শিল্পগুলিকে সচেতন করেন এবং কেন্দ্রকে চাপ দেন নিজ রাজ্যের 'শিল্পগুলি হইতে মাল কিনিতে। এখানের ক্ষুদ্র শিল্প-দপ্তর সে তুলনায় প্রায় নির্বাক দর্শক এবং এখানের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির পরিচালকদের অনেকটা হারাধনের ছেলেদের মত কেন্দ্রীয় ক্রয় দপ্তরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এবার যে বেলিলিয়াস রোড সমরোপকরণ সরবরাহের কোন অর্ডার একরকম পাইলই না তাহার প্রধান কারণই হইল রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প-দপ্তরের চরম ব্যর্থতা এবং ঔদাসীন্য।

জানি না এ বিষয় নবীন রাজ্য শিল্প-মন্ত্রী মহাশয়ের কোন কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে কি না এবং তিনি কি ভাবে তাহা পালন করিয়া থাকেন। খুব সম্ভব বৃহৎ শিল্প ব্যাপারে তাঁহার কর্তব্যতার প্রচণ্ড এবং সেই কারণেই হয়ত ক্ষুদ্রের দুঃখ-বেদনা, অভাব-অভিযোগ তাঁহার কৃপাদৃষ্টির গোচরে পড়ে না।

পশ্চিমবঙ্গের ধান-চাউলের ভবিষ্যৎ কি?

খাদ্যাভাব সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে আজ ভীষণতম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং এ-রাজ্যের নগণ্য সংখ্যক এক শ্রেণীর বিত্তবান (যাহাদের শতকরা ৮০ জনই ভিন্ন রাজ্যের) ছাড়া সকল সাধারণ মানুষই আজ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার পাশে যাদবপুর অঞ্চলেই চাউলের নিম্নতম দর ২·৫০-৩৲ টাকা কেজি—তাও প্রয়োজনমত পাওয়া যায় না। এ-রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষ করিয়া গ্রামের লোকদের অবস্থা চাউলের অভাবে আজ কি নিদারুণ হইয়াছে তাহা চোখে না দেখিলে কেহ সম্যক অনুভব করিতে পারিবেন না। চারিদিকে হাহাকার কিন্তু সরকারী মতে এ-রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই এবং অনাহারে কেহ যে মরিবে এমন অবস্থা কখনও ঘটিবে না! রাজ্য সরকার চাউল-ধান সংগ্রহ করিতে যথাসাধ্য করিতেছেন অবশ্যই স্বীকার করিব—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেন অবস্থার উন্নতি হইতেছে না? লেভি চালু হইবার প্রথম পর্যায়েই যদি এত বাধা দেখা দেয় তাহা হইলে এ বৎসর জুন-জুলাই মাসের কথা চিন্তা করিতেও ভয় হয়।

একদিকে চাউল সংগ্রহের বিষম অসাফল্য—অন্যদিকের চিত্র কি? একটি দৈনিক পত্রে বড় হরফে শিরোনামা দেখিলাম—"সরকারী কর্মচারীদের যোগসাজসে প্রতিদিন প্রচুর চাল পাচার" হইতেছে! সংবাদে দেখা গেল উত্তর কলিকাতার একটি সুবৃহৎ সরকারী গুদাম হইতে প্রতি-দিন প্রচুর চাউল পাচার হইয়া যাইতেছে বলিয়া প্রকাশ এবং এই পাচার-কারবারে একদল সরকারী কর্মচারীর যোগাযোগ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। আরও প্রকাশ যে, কয়েকদিন পূর্বে একদল চাউল-পাচারীকে বাধা দান করিতে গিয়া একজন স্বেচ্ছাসেবক এবং একজন দারোয়ান ছুরিকাহত হইয়াছেন। ইঁহারা দুইজনই আলোচ্য সরকারী গুদামে নিয়োজিত কর্মচারী। ঘটনার সহিত জড়িত সন্দেহে অঞ্চলের তিনজনকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রখ্যাত দৈনিক 'যুগান্তরে'র প্রতিনিধি সন্ধান

করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে এই চাউল পাচারের ঘটনা একদিনের নহে, দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই কাণ্ড চলিতেছে। সরকারী কর্মচারী ছাড়াও কিছু পুলিশ, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক, লরীর ড্রাইভার এবং স্থানীয় কয়েকজন "মস্তান" সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই কাজ করিতেছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে।

রাত্রির ঘটনা কেহ বলিতে পারেন না। কারণ, রাত্রিতে সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবনের ঝুঁকি লইয়া ঐ দৃশ্য দেখা সম্ভব নহে বলিয়া জানা যায়। ঐ সব ঘটনার সঙ্গে কিছু পুলিশ জড়িত আছেন বলিয়া যে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে সংশ্লিষ্ট পুলিশ মহল হইতে তাহার কোন স্বীকৃতি পাওয়া যায় নাই। তবে চাউল পাচারের সংবাদ তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে এই সব বেআইনী কাজ বন্ধ হয় তাহার জন্য পুলিশের পক্ষ হইতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া পুলিশের উর্দ্ধতন মহল জানাইতেছেন।

এ-রাজ্যের অন্যান্য কতকগুলি সরকারী গুদাম হইতেও চাউল অদৃশ্য হইবার সংবাদ মাঝে মাঝে বেসরকারী সূত্রে পাওয়া যায় এবং এই সব সংবাদ সরকারী ভাবে অস্বীকৃত না হওয়ায় সংবাদগুলি সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে তৎপরতার সহিত কিছু ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ এক-দুই কেজি চাউল আড়াই-তিন টাকা দরে যে-সব হতভাগ্য পেটের দায়ে ঘরে লইয়া যাইবার পথে কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশের হাতে ধরা পড়িতেছে, তাহাদের লঘু পাপে (?) গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা তড়িৎ গতিতে হইতেছে। এক হতভাগিনী ত পেটের দায় মিটাইতে দুই কেজি চাউলের জন্য প্রাণই দান করিল।

প্রসঙ্গক্রমে একটি নূতন 'লেভি'র বিষয় বলা যায়। শিয়ালদহ (সাউথ) ষ্টেশনে সকাল ৫।টা হইতে ৮।৯টা পর্য্যন্ত যে-কেহ দেখিতে পাইবেন—উর্দীপরা এবং প্লেন-ড্রেস পুলিশ কেমন ভাবে ডেওয়ালাদের নিকট হইতে মাছ, তরিতরকারি প্রভৃতি দ্রব্যাদির 'লেভি' আদায় করিতেছে খাস ষ্টেশনে এবং ষ্টেশনের সামনের এলাকায়। মধ্যে মধ্যে পয়সাও 'লেভি' হিসাবে বেশ আদায় হয় এবং এই লেভিতে গেটের টিকিট-চেকার মহোদয়গণও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন—ইহা যে-কেহ দেখিতে পাইবেন। বলা বাহুল্য ষ্টেশনে মাছ, তরিতরকারি এবং অন্যান্য সামগ্রী যাহা পুলিশের লোকেরা লেভীতে আদায় করেন তাহা খুব সম্ভবত বড়বাবু, ছোটবাবু এবং অন্যান্য সংযুক্ত সকলেই ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করেন। তবে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে সিংহ-শৃগালে অবশ্যই কিছু তারতম্য থাকিবে।

কল্পনার বিকল্প খাদ্য

দেশে চাউলের অভাব, কাজেই সরকারী কর্তারা এবং কংগ্রেসী নেতারা লোককে চাউলের পরিবর্তে কাঁচকলা, আলু, রাঙ্গালু এবং অন্যান্য শাকসব্জি দিয়া পেট ভরাইবার উত্তম পরামর্শ বিতরণ করিতেছেন। তাঁহারা লোককে খাদ্য অপচয় বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতিথি-নিয়ন্ত্রণ করিবার উপদেশও অহরহ দান করিতেছেন। এ-সবই "তোমরা কর"—"তোমাদের করা কর্তব্য"। কিন্তু নিজেরা কি করিতেছেন বা নিজেদের কর্তব্য কি—সে-বিষয় তাঁহারা সাধারণ মানুষকে কিছু বলেন না। নিজেদের দৃষ্টান্ত হিসাবে সাধারণ মানুষের সামনে দাঁড়াইবার সাহস কেন তাহাদের হয় না? তাঁহাদের কাজে এবং কথায় মিল নাই বলিয়াই কি এই সঙ্কোচ?

সংবাদে প্রকাশ—সরকারী মন্ত্রী পর্য্যায়ের কেহ কেহ উৎসব-আনন্দ উপলক্ষ্যে নিজ গৃহে (অতিথিদের কাঁচকলা না খাওয়াইয়া) অতিথি-নিয়ন্ত্রণ আদেশকেই কাঁচকলা ভক্ষণ করাইয়া বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন। এই ভোজে মাননীয় অতিথিরা কি কি সুখাদ্য ভোজন করেন তাহার পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত অবশ্যই হয় না। দেশের নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র জনগণ যে-সময় সপ্তাহে দুই-তিন দিন প্রায় অনাহারে কাটাইতেছে ঠিক সেই সময় কল্যাণ রাষ্ট্রের (শাসকদের পক্ষে) পাণ্ডিয়াদের আনন্দ এবং বিরাট ভোজন-উৎসবের সংবাদ—আমাদের পক্ষে অবশ্যই অতীব আনন্দদায়ক। দেশের নিদারুণ খাদ্য-সঙ্কটের কালেও—অন্তত কয়েকজন যে কেদিয়া-ছড়াইয়া খাইতেছেন, খাওয়াইতেছেন—ইহাতে হর্ষবোধ করিবে না এমন নরাধম কেহ আছে বলিয়া মনে করি না!

যার কর্ম্ম তারে সাজে—অন্যজনে লাঠি বাজে

সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পরিচালিত ব্যবসাগুলিতে গত দুই বৎসরে লোকসান হইয়াছে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। প্রকাশিত বৎসরের হিসাবে এখনও সব কয়টি সরকারী প্রকল্পের পুরা দুই বছরের হিসাব—হয় দেওয়া হয় নাই আর না হয় ধরা হয় নাই। রাজ্য অর্থমন্ত্রী মহাশয় জানাইতেছেন যে, সরকারী ব্যবসায় প্রকল্পগুলিতে রাজ্য সরকার মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছেন ১৩০ কোটি টাকা। তিনি বলেন, আগের বছরের তুলনায় '৬৪-'৬৫ সালে লোকসান কম এবং আরো ভবিষ্যতে আরও কমিবে!

লোকসানের হিসাবে বৃহৎ অঙ্ক কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন করপোরেশনের। ১৯৬৩-৬৪ ও '৬৪-৬৫ সালে মোট লোকসান ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া বৃহত্তর কলিকাতা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পে ৭৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা; শিল্প এস্টেট কল্যাণীতে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ও বারুইপুরে ২৫ হাজার (শুধু '৬৩-৬৪ সালে); দারু শিল্পে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার; ইঁট ও টালি পর্যদে ৮ লক্ষ ৭৮ হাজার; টুরিষ্ট বাসে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার; ওরিয়েণ্টাল গ্যাসে ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার (শুধু '৬৩-৬৪ সালে); দুর্গাপুরে প্রকল্পে ৯২ লক্ষ ১১ হাজার এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদে ৪৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা (শুধু '৬৩ ৬৪ সালে) লোকসান হইয়াছে।

অনেকের মতে রাজ্য সরকারের ব্যবসায় প্রকল্পে লগ্নীর পরিমাণ ১৩০ কোটি অপেক্ষা অধিকতর হইবে, এমন কি ইহা প্রায় ২০০ কোটির মত হইতে পারে। অন্য দিকে লোকসানের হিসাবও যে যথাযথ হইয়াছে তাহা মনে না করিবার হেতুও বিদ্যমান। দুঃখের কথা যে, সরকারী পরিচালনাধীন ব্যবসায়গুলিতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা বিভাবরীতে যাইতেছে তাহা পরিচালকবর্গের কাহারও খাস তালুক হইতে আসে না। পয়সাটা সবই অনাথ করদাতাদের এবং এই পয়সা শ্রীগৌরীসেন মহাশয়ের তোষাখানায় জমা থাকে।

ব্যবসায় সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা সামান্য অভিজ্ঞতাও নাই এমন সব সরকারী উচ্চমার্গীয় ব্যক্তিদের হাতে ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হইলে—ব্যবসায়ের এই চমকপ্রদ পরিণতি ছাড়া আর কি হইতে পারে!

ভারত ইংরেজ কবলমুক্ত হইবার পর হইতে দেখা যাইতেছে এক বিচিত্র ব্যাপার। রাম, শ্যাম, হরি, মধু, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে টম-ডিক-হ্যারী—মন্ত্রী হইবামাত্র সমস্ত বিষয়েই বিশেষজ্ঞ এবং পরম অভিজ্ঞ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া পড়েন! উকিল হইয়া যান বৈজ্ঞানিক, স্কুল-কলেজের মাষ্টার হয়েন বাঘা পলিটিসিয়ান, কোন মিনিষ্টার কিংবা উপমন্ত্রী। ধনীর দুলাল অর্বাচীন হইতেছেন শিক্ষামন্ত্রী, ভোজন-পারগ ব্যক্তির খাদ্যমন্ত্রী হইবার যোগ্যতা অবশ্যই আছে, পদচ্যুত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নির্বাচিত হইতে পারেন অর্থমন্ত্রী, জেলা-হাকিম গ্যাস কিংবা লৌহ-ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার, দোকানদার-cum-বিস্কুট কারখানার মালিকেরই সর্ব-যোগ্যতা অবশ্যই আছে পুলিস এবং প্রচারমন্ত্রী হইবার। কিন্তু এমন একটি মাল যেখানে উন্নীত হইলে অজ্ঞ হয় বিজ্ঞ, বুদ্ধি-বিদ্যাহীন হয় বুদ্ধিদীপ্ত পরম পণ্ডিত, অর্বাচিন হয় বিচক্ষণ বাচাল, নীতিহীন হয় পরম নীতিবান! তালিকা বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। এই প্রসঙ্গে আর এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, যে-কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি মন্ত্রী হইবামাত্র তাঁহার অন্তরের বিশাল খনি হইতে অজস্র ধারায় নীতি-আদর্শ ও উপদেশবাণী নির্গত হইয়া সারা দেশকে প্লাবিত করে।

ভোগলক্ষী কারবার—কোন স্বার্থে

সংহতির কথা যতই প্রচারিত হউক না কেন—এক শ্রেণীর উচ্চমার্গস্থিত কেন্দ্রীয় অফিসার এবং কর্মকর্তার মধ্যে প্রাদেশিকতা এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে সর্বভাবে আঘাত করা প্রায় তাঁহাদের জীবনব্রত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা না হইলে এ রাজ্য হইতে ক্রমে ক্রমে এবং নিঃশব্দে সব বড় কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে কেন অন্য রাজ্যে অবধা সরানো হইতেছে—করদাতাদের অর্থ শ্রাদ্ধ করিয়া। পূর্বে কয়েকটি সংস্থা এখান হইতে চালান হইয়াছে, অধুনা পূর্ব রেলের ট্রাফিক ট্রেনিং বিদ্যালয়টির অন্ত্যেষ্টি-পর্ব সুরু হইয়াছে! এ সংবাদ কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়।

শিয়ালদহ হইতে হঠাৎ কেন বিহারে এই ট্রেনিং স্কুল লইয়া যাওয়া হইল সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের আমলে এই চেষ্টা একবার হয়। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত বানচাল হইয়া যায়।

'ইংরেজ্রেসার কোর্স'-এর ট্রেনিং-এ প্রত্যেকবার প্রায় ৪ শত শিক্ষার্থীকে পাঠান হয়। এর অধিকাংশই হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিসনের কর্মী। ট্রেনিং স্কুলটি শিয়ালদহে স্থানাভাবের জন্য ঠিক মত চলার পক্ষে কিছু অসুবিধা আছে। কিন্তু কল্যাণী বা দক্ষিণেশ্বরে রেলের যে জমি আছে সেখানে তার ব্যবস্থা করা যাইত বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। ইহাতে খরচও বাঁচিত—শিক্ষার্থীদের সুবিধাও হইত।

পূর্ব রেলের আঞ্চলিক ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুল কয়েক মাস আগে শিয়ালদহ হইতে ধানবাদের কাছে ভুলিতে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের অসুবিধা এবং সেই সঙ্গে রেলকর্তৃপক্ষের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে অত্যধিক। শিয়ালদহের ট্রেনিং স্কুলটি এখনও আংশিকভাবে চালু আছে—তাহা সত্ত্বেও শিয়ালদহ এবং হাওড়া ডিভিসনের কর্মচারীদের ভুলির নির্জন মাঠে ট্রেনিং এ পাঠান হইতেছে। ধানবাদ হইতে ৩ মাইল দূরে নির্জন মাঠের মধ্যে ভুলির এই ট্রেনিং স্কুল

স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে হাট-বাজারের অসুবিধা আছে—তাল ছাড়া জলের অভাবও বিষম।

শিক্ষার্থীদের কোচিং-এর ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হয় কিন্তু যে ভাতা তাহাদের দেওয়া হয় তাহাতে খরচ কুলায় না।

ডাঃ রায় থাকিতে রেলকর্তাদের এই অপকর্ম ইচ্ছা থাকিতেও সফল হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেলকর্তাদের এই খামখেয়ালীর কোন প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। বিহারের শ্রীবৃদ্ধি হউক তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই কিন্তু এই শ্রীবৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গের নাসিকা কর্ত্তন করিতে হইবে কেন? এ রাজ্যের বেওয়ারিশ নাসিকা কি যে-কেহ ইচ্ছামত কাটিতে পারে?

কেন্দ্রীয় বিচার-বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গের পরম ন্যায্য দাবিদাওয়াও প্রায় ক্ষেত্রেই মূল্যহীন বিবেচিত হয় এবং হইতেছে। আমাদের পরম বিজ্ঞ এবং জনকল্যাণে অর্পিত প্রাণ মন্ত্রিমণ্ডলী কি বাংলা ও বাঙ্গালীর ন্যায্য স্বার্থ-রক্ষার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন না? জানি না কোন্ মহত্তর কর্মে তাঁহারা দিবারাত্র মশগুল থাকেন! এই ভাবে চলিতে থাকিলে সারা পশ্চিমবঙ্গ বিশাল এক খাপা কিংবা বিভাবরীতে পরিণত হইবে অচিরে।

বাঁদরামো এবং বানর

ভারতীয় সামরিক বিভাগ পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় ত্রিশ হাজার কার্তুজ (বন্দুকের) দান করিয়াছেন বানর হত্যা করিয়া এ রাজ্যের খাদ্য সমস্যার কিঞ্চিৎ সুরাহা করিতে। বাঁদরদের অমার্জ্জনীয় অপরাধ তাহারা গাছের ফল এবং বাগানের ক্ষতিসাধন অবশ্য ভক্ষণ করে। এই ভাবে বে-আইনী ভোজনে তাহাদের অবশ্যই কোন মানবিক অধিকার নাই। বাঁদরকুল বিধিমত রেশন কার্ডের আবেদনও পেশ করে নাই এবং ইহাতেই প্রমাণ হয় তাহাদের ক্ষুধা বলিয়া কিছু নাই—তাহারা খায় কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গবাসীদের জব্দ করিবার জন্যই। অতএব বাঁদর নিধন এ রাজ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য! কিন্তু কংগ্রেসী রামরাজ্যে ইহা কি ঠিক হইতেছে? কিংবা ছদ্মবেশী রাবণের দল আজ রাজ্য শাসনভার হাতে পাইয়াই ত্রেতা যুগের প্রতিশোধ লইবার মওকা পাইলেন?

অপরাধী বাঁদর না হয় মারা হইল কিন্তু যাহাদের অর্থাৎ যে সকল অমানুষদের চরম বাঁদরামো হাজার হাজার মানুষকে অখাদ্য, কুখাদ্য, ভেজাল খাওয়াইয়া হত্যা করিতেছে, যাহারা খাদ্য মজুত করিয়া কালোবাজার আলো করিতেছে, ভেজাল ঔষধাদি দিয়া নিরীহ আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে অকালে পরলোকে পাঠাইতেছে এবং আরও বহুপ্রকার অপকর্ম করিয়া দেশের চরম সর্ব্বনাশ করিতেছে—সেই সব মানুষরূপী চণ্ড-হনন হনুমানদের বাঁদরামো বন্ধ করিবার জন্য সরকার বাহাদুর—বেশী নহে মাত্র কয়েক শত কার্তুজ আমাদের দান করিয়া প্রয়োজনমত ব্যবহারের আদেশ এখনও দিতেছেন না কেন? অপকর্মী দুর্দ্দান্ত হনুমানদের উপর কর্তাদের মনোভাব এত কোমল কেন? বাঁদর তাঁহাদের একান্ত অনাত্মীয় বলিয়াই কি তাহাদের নিধনে কর্তারা এত তৎপর? বানর-বিদ্বেষী এই রাবণবংশধরগণ কি মনে করেন, পৃথিবীতে একমাত্র তথাকথিত নর-নারী ছাড়া ঈশ্বর-সৃষ্ট অন্য কোন জীবের বাঁচিবার, কিংবা বাঁচিলেও আহার করিবার কোন অধিকার নাই?

সাবধান বাণী: বিগতকালে বানর বধের ব্যাপার লইয়া ভারতে বহু স্থানে বহু মারাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিয়াছে and history sometimes repeats itself!

—●—

তোমরা যদি ভাব মেজকর্তার টাকার জোরে অত করতেন মেজগিন্নী তা হ'লে ভুল করবে। নামে মিল থাকলেও টাকার মিল ছিল না তাঁর ভায়েদের সঙ্গে। মেজগিন্নীই সামলাতেন সব কিছুটা তাঁর গতর দিয়ে। এর পর আরও ভাঙন ধরল। কাশ্মীরের বাঈকে সামলাতে মোটা মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজনে ধারে দেনায় বিষয় বাঁধা পড়ল। তারপর মুক্তি দিল বাঈই, অসুখ হতেই সে পালাল দিয়েই। মেজগিন্নী সহজ ভাবেই এগিয়ে এলেন, যেন কিছু হয় নি। এমনি মনের ভাব দিয়ে কিন্তু মেজকর্তার তখন আর কিছুই নেই। না দিবসে, না রেতে। গায়ের জ্বালায় ছটফট করতেন সারা রাত। মেজগিন্নী বরফে হাত ঠাণ্ডা করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। যাতে গায়ের জ্বালা একটু কমে। মেজগিন্নীও রামনগরের রাজার মেয়ে ছিলেন, বাপ-মা'র একমাত্র মেয়ে। টাকার টান পড়লে চাইবার আগেই সেখান থেকে টাকা এসে পৌঁছত। কিন্তু বাপের বাড়ীর বেলা তাঁর আত্মসম্মান প্রখর।

কাশ্মিরী বেগমের কথা রামনগরে যেতে খুড়তুতো ভাই এসে বলল এসব কি শুনছি বড়দি? তুমি বাড়ী চল। প্রশান্ত হেসে মেজগিন্নী ভাইকে বললেন, কে কোথায় কি বলল আর তুই অমনি ছুটে এলি? ছেলেপুলে হয় নি আমার, আমার মেয়ের বয়সী একটা মেয়ে যদি এসেইছে তাতে দোষটা কি? বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করলেন মেজগিন্নী। মেজগিন্নির ড্রেসিং টেবিলে বসে বাঈজী তখন চোখে কাজল দিচ্ছিল। তাকে দেখিয়ে দেন মেজগিন্নী। ভাই প্রসন্ন মনে রূপোর বাসনে সাতরকমের খাবার খেয়ে ফিরে যায়।

আবার এই ভাই এসেছিল মেজগিন্নী বিধবা হবার পর। সেবারও ফিরে যেতে হয় তাকে। মেজগিন্নী বলেছিলেন নাইবা রইল বিষয়, নাই-বা রইল মেজকর্তা। এ বাড়ী ছেড়ে যেতে মেজকর্তা আমায় বারণ করে গেছে। স্বামীর ভিটে ছাড়া হতে বলিস নি ভাই। তবু ভাই বলেছিল চিরজীবন সকলের সেবাই করে গেলে বড়দি, চল দু'দিন আমরা তোমার সেবা করি। দু'চোখ জলে ভরে ওঠে মেজগিন্নীর। বলেন, ওরে সেবা নেওয়ার বড় দুঃখু—অসবে কাজ নেই ভাই। এ বাড়ী আমার অনেক দিয়েছে, ভোরে উঠে গয়লা ডা'কবে, মেজমা! মেজমা দাঁড়ালে তবে গরু দো'য়া হবে। ভোরে নাম-কীর্তনের দল এসে ডাকবে মেজমা! মেজমা ভিক্ষে দেবে তবে যাবে। ভাঁড়ারী এসে চাবি চাইবে মেজমা! ঠাকুর এসে রান্না চাইবে, ডাকবে মেজমা! বসে বসে রান্না দিতে হবে। ওরা নিজেরাই জানে না ওরা কি খেতে চায়। মিষ্টির ঘরে মিষ্টি হবে, সেও মেজমা। খাজার ঘরে মেজমা ছাড়া হবে না। সদরে খাজনার টাকা নেই, সেও মেজমা। ওরে এ বাড়ীর আকাশ বাতাস যে আমায় ছাড়া কিছু জানে না। মণিসরকারের শতব্যঞ্জন থাকলেও একটু তেঁতুল চাই। মহু আমলার আলু-ভাতের হামলা নিত্যি। এসব কে পারবে? বুড়ো মা'র হাঁপানির বালিশ মাথ রাত্তিরে উঠে কে করতে চাইবে বল? সেজবৌ তিন ছেলের মা হ'ল, আজও চুলের রাশ সামলাতে পারে না। চুলকটা বেঁধে দিতেই হবে। ওদিকে বিধবাদের পিণ্ডি গেলার বড়ি আচার আমসত্ত—নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই আমার। মেজকর্তা নেই তোদের কষ্ট ত হবেই ভাই। তবে হাত আতাড় নেই আমার। ন'বৌ পোয়াতি মানুষ, ভালয় ভালয় খালাস হলে বাঁচি। জানিসই ত ওর শাশুড়ী সব আহ্লাদী

মানুষ, দুঃখ কষ্ট ঘাঁটতে পারে না। আহা, অমনি করেই যেন দিনগুলো কেটে যায় ওর। আঁধার না পোয়াতে আমার ঘরে এসে জোটে ছোটদের দল। কারুর নাড়ু, কারুর সন্দেশ, কারুর জিলিপি রাতে শিকেয় রাখতে হয়। কাপড় ছাড়ার অবকাশ দেয় না ওরা। ওদের মায়েরা খেটেখুটে আক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, যত হাঙ্গামা আমার ওপর। এ বাড়ী ছেড়ে যাবার কথা ভাবারও আর উপায় নেই আমার।

কবে কোন্ ভাগ্নে আসবে, সে কি মিষ্টি ভালবাসে, কি মাছ, কি ধরনের রান্না খায়, কে জানে বল্ আমি ছাড়া? ননদের মা'র সঙ্গে বনে না, তাদের যা কিছু সাধ আহ্লাদ মেটাতে মেজবৌদি। বৌমা বায়োস্কোপ যাবে ছেলে রাখবে কে, না মেজমা। আম উঠে যাচ্ছে, আমচুর আমসত্ত্ব করে কে রাখবে, না সেও মেজমা। এই যে এদের এত বড় মামলা, যা নাকি বিলেত অবধি গড়িয়েছিল, সেও মেটামেটি হ'ল মেজমাকে দিয়ে। নাইবা হ'ল নিজের বিষয়, নাইবা হ'ল নিজের ভাগে, তবু একটা এত বড় বংশের কেলেঙ্কারি ত? তা ছাড়া মেজবাবুর হাতের রাশ নেই। ঐ খরচে মানুষ যদি হাতে টাকা না থাকে হাঁপসে মরে যাবে। নিজের ভায়ের সঙ্গে আবার লোকে মামলা করে? লুকিয়ে মালির সঙ্গে রাতের আঁধারে গা-ঢেকে গেলাম বেঁকার বাড়ীতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের বঙ্কুবিহারীই বটে। আমি ত সেই ওর ছোটবেলা থেকে বেঁকা বলেই ডেকেছি। গিয়ে দেখি বারান্দায় তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তামাক খাচ্ছে। আমায় দেখে ত অবাক! বললে, এ কী মেজমামী তুমি? আমি বললাম, হ্যাঁ বেঁকা, আমিই। কত কথা হ'ল দুজনে কত মেজকর্তার গল্প। দুজনে হাসলাম ছোটবেলার মত। আমার সব কথা দিইয়ে নিল যদি কোনদিন শুই যেন ওর বাড়ী গিয়ে শুই।

ওর ধারণা আমার গতরের জন্যেই বুঝি এ বাড়ীতে এত আদর আমার। আমি বললাম, না বেঁকা, তা নয়। স্বামীর ভিটে মহাতীর্থ আমার। স্বামীর ভিটে মানেই আমার মান। তাই তার আদর আমার কাছে আর আমার জিনিসের আদর আমি করব, না ত কে করবে? আমার আদর আবার ওরা করবে কি রে? সে করে গেছেন আমার শ্বশুর-শাশুড়ী। শাশুড়ীর বুক থেকে নামি নি কখনও। যত দিন বেঁচে ছিলেন নিজে হাতে চুল বুঁধে দিতেন। অত চুলের রাশ শুকুতে চাইত না ত? তা হ্যাঁরে, আমার দু'পাশে শুতিস তোরা দু'জন। তুই আর সেজো। চিরকাল তোদের আড়াআড়ি। একজনের দিকে ফিরলে আর একজন রক্ষে রাখত না। হ্যাঁরে তোরা নাকি ভায়ে ভায়ে বিষয় নিয়ে বিবাদ করছিস? মামলা নাকি বিলেতে গেছে? আমি মরি, তখন তোরা যা ইচ্ছে করিস। আমি থাকতে ত তা হবে না। আমার রোগ হলে তোদের দুপাশে যে আমি চাইব রে। সেদিন কি পারবি না দিতে? ওসব ছেড়ে দে। দাঁতে দাঁত চেপে কি যেন ভাবল বেঁকা। তারপর বলল, তাই হবে মেজমামী। জন্মে মা জানি না। মা বলতে তোমারই মনে পড়ে। তোমার হুকুম না মেনে পারব না। তবে বল তোমার সেজোকে, তোমার বিষয়ে আমার লোভ নেই; তোমার শ্রাদ্ধটা যেন আমায় করতে দেয়। তুমি যেদিন যাবে আমায় দেবে ত কারুর যাবে না। কেঁদে বাঁচি না আমি। বলি, সে কবে যে মরব তার ত ঠিক-ঠিকানা নেই, তোরা দু'ভায়ে আবার তেমনি করে দরদালানে বসে পাশা দিয়ে খাবি আমি দেখব। হেসে বেঁকা বলে, তার আর উপায় নেই মেজমামী। শরীরে ঘুণ ধরেছে। বাবাদের অসুখে ধরেছে, খাওয়া সব বন্ধ। বুকের কাছে তখন যেন চন্দ্রপুলি আর আমসত্ত্ব আমার পাথর হয়ে উঠেছে।

চোখ মুছে বললাম, সেরে যাবি বাবা, আমি রায়ের ঘাটে ধত্যেন করাব তোর জন্যে। তোর জন্যে সোমবার নিলাম আজ থেকে। বাবা তারকনাথ সারিয়ে দেবেন তোকে। এ কি শুনতে এলাম বল্ দেখি? এর চেয়ে মামলা পড়া যে ঢের ভাল ছিল। কেঁদে ফিরে এলাম আমি। শুধু বার বার বেঁকাকে বললাম, একথা যেন সেজোর কানে না যায়। রাতে দু'চোখের পাতা এক করি নি বহু—কেবল বললাম, ঠাকুর, এদের রেখে কবে যেতে পারব আমি? কখনও ত তোমার কাছে কিছু চাই নি। আমার এ চাওয়াটুকু রেখ। আর জীবনে মিষ্টি দ্রব্য মুখে দেব না আমি। আহা বেঁকা

আমার মিষ্টি কি ভালবাসত গো ? কদমা, পাটালি, আমসত্ত কিছুতে অরুচি ছিল না।

সকালে সবাই অবাক! খবর এসেছে বেঁকাবাবু মর্কটমা ছুলে দিয়েছে। সেকোটা চিরকালের গোঁয়ার ত ? বললে, বাছাধন ভয় পেয়েছে এবার। আমায় এসে বললে, জান মেজকাকী, তোমার বেঁকা চন্দর যে সোজা হয়েছেন এবার! বুঝতে পেরেছে আমার সঙ্গে লড়া সহজ নয়। দাও আর ঘটা করে সত্যনারায়ণ। সন্দেশ আনাও এক মণ।

আমি বললাম, সত্যনারায়ণ ত পেত্যেকবারই হয়, এবার আর ওসব নয়; ওগাড়ী দিয়ে ভাইকে ডেকে আন সেজো। সে ত হার মেনেইছে তোর কাছে! কি জানি কি ভেবে গোঁয়ার গোবিন্দ রাজী হ'ল।

সন্ধ্যেবেলা মালা জপতে বাচ্ছি, চাকর বিধু এসে বলল, বেঁকাবাবু এসেছেন সদরে। আপনার কাছে দুখির রুটি আর মাছের ঝোল খাবেন। সেই বেঁকার মরণ হ'ল, আর আমার মরণ হ'ল না ? কি করে দি বেঁকা আমার জন্তে ? গঙ্গাযাত্রা করে বসে আছি আমি আর চ'লে গেল আমার সাজোয়ান ছেলে ? আমি না আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে আরও কতকাল বেঁচে থাকব ? আমার বাতের যন্ত্রণা ভ'নে বেঁকা হাওয়ার বিছানা পাঠিয়েছিল। দেখতে এসে বলত, জান মেজমাসী, তোমায় আমি চন্দনকাঠে পোড়াব। আমার ভাগ্যে অত সুখ সইবে কেন ? আরও কত কি দেখতে হবে! এখন তোদের রেখে যেতে পারলে হয়। হ্যাঁরে বদু, তুই অত রোগা হয়ে গেছিস কেন ভাই ? ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করিস ত ? লক্ষ্মী ভাইটি আমার, বর্তাদকে নিয়ে যেতে হবে না, তুই বরং সাহেব ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে যা দেহটা। তোরা হলি সাত রাজ্যির প্রাণ, তোরা বেঁচে থাকলে তবে রাখবি বজায়। হ্যাঁরে, সেজো বৌ কেমন আছে? কতদিন দেখি নি তাকে। এখনও কি তেমনি হাউড়ে-পাগা আছে ? আমার হাতের মাখা ভাত বড় ভালবাসত। তা যাবার কি উপায় আছে আমার যে ছুটো দিন গিয়ে তোদের যত্ন করে আসব! পায়ে আমার বেড়ি লেগেছে মেজকর্তা; কি করে যাই বল ভাই ? আর

অত রাশ রাশ টাকা পাঠাস নি ভাই, তোরা ে আমার খাওয়া। তোদের বংশের টাকা তোরা (করবি। হ্যাঁরে, বাপ কাকা কি আলাদা রে ? বড়। আমি যে এখন অর্ধ গাছ। এক গাছ কি এক গাছে জোড়া লাগে ? মনে করিস বড়দি তে মরে গেছে। এলি, মুখখানি দেখলাম, বড় আনন্দ ভাই। মাঝে মাঝে এমনি আসিস। প্রণাম ব সময় ভাইকে পায়ের কাছে নোটের গোছা রাখতে বললেন, এনেছিস ভাই ফেরৎ দেব না। তুই বরং কাজ কর। সদর থেকে বাড়ীর ঠিকানাটা নিয়ে মাঝে মাঝে তাকে বরং কিছু কিছু পাঠাস। আহা, না কি ভারি কষ্ট। এক পাল ছেলেপুলে নিয়ে বিপদে পড়েছে! চিঠি এসেছিল মেজকর্তার না জানে না ত সে নেই। কার ছেলে, কি করে হ'ল, প্রশ্ন না করেই ভাই বিদায় নেয়। যাই হোক না বড়দির আহা থাকবেই।

৮

মেজগিন্নীর কথা ভাবলেই মনে পড়ে আর এ মানুষের কথা। হাসিখুশী সাদাসিধে মানুষ ছিল কিন্তু কর্তাকে বাঁধতে পারে নি। কর্তা প্রকাশ্যে থাকতেন শালাজের কাছে।

শ্বশুর বাড়ীতে থাকলেও বেঁকার বাবা চা করতেন সওদাগরি আপিসে। কর্তা বাড়ী এসে খেতে বসতে না বসতেই দরজায় এসে দাঁড়াত ওদিকে ছুকিগাড়ি। আবার শার্টটা মাথায় গলিয়ে কর্তা রাস্তায় পায়চারি করতেন। কখনও বা শালাজ নিয়ে কর্তা যেতেন থিয়েটার দেখতে। কখনও যেতেন গঙ্গার হাওয়া খেতে। কিন্তু সে গাড়িতে পেত না বেঁকার বাবা বা বেঁকা বা মদন। দরজায় খিল দিয়ে সবাই আর শালাজ তাসে থাকতেন। রাত দশটা বাজত, এগারটা বাজত, দিয়ে ছুকিগাড়িতে উঠতেন। কর্তা ঢুকত বাড়ীতে এ ঘটনাটা সকলের সয়ে গিয়েছিল।

এমন কি গয়না যখন গড়ান হ'ত, তখনও হ'ত করে সমান ভাজের। টাকা দিতেন সদাইবাবু। সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন বেঁকার বাবা। তাঁর পর

সাজের পারিপাট্য তেমনি রইল বেঁকার মা'র। তাই বেঁকা আর মদন মা'র কাছে ঘেঁষত না বড়। বেজপিসীর নিঃসন্তান বুকের অপরিসীম বাৎসল্যের অমৃতে তারা বড় হয়েছিল। থান কাপড় পরেও কত যে সাজা যায় তার চূড়ান্ত করেছিল বেঁকার মা। হবে না কেন? ঐ সব স্বেচ্ছাচারী ভাইদের বোন ত? অর্ডার দিয়ে কাইন অলপায়ু ছুরে কালো ফিতে পাড় পরতেন। রং পাউডার ঘোষে মুখে ডুবে থাকতেন একেবারে। আলতাটা পায়ে না পরে দিতেন ঠোঁটে। হাতের পায়ের নখের ডগায় আলতো করে। মদনাই সাজের জিনিষ যোগাতেন আশ্চর্য মদন কিন্তু প্রতিবাদ করত না তার, বরং নিজেই বলত এ জিনিষ আমার মানাবে না, তোমার প্রতিমাকে দিও। আচারে ব্যবহারে প্রতিমার ওপর কোন দ্বেষ বা বিরক্তি তাঁর ছিল না।

এই বাড়ীরই একধারে আগাছার মত বেড়ে উঠেছিল নটেমামা, আর জটেমামী। নটেমামা এ বাড়ীর দূর সম্পর্কের মেয়ের ছেলে। নিকটতম কেউ নয়। তাদের একটা পোড়ো বাড়ীর একটা অংশ জুড়ে ছিল তারা। নটেমামার মা বিউটি এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। গরীবের ঘরের বুড়ো বরে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। বরকে স্বামীরূপে মনে-মনে গ্রহণ করতে পারেন নি তিনি। স্বামী জ্যোতিষের বই নিয়েই থাকতেন। বিউটির ইচ্ছে ছিল না ছেলের বিয়ে দিতে। কিন্তু ঘটনা পর্যায়ে সেই নটেমামা তার চিরদিনের মায়ের আনুগত্য ভুলে বিয়ে করে বসল এক রূপসী মেয়েকে। বাপ-মা'র আদরের ধনীর দুলালী ভালোবেসে এই নিঃস্ব ছেলের গলায় মালা দিল। এই দেবী মেয়েটি শুধু মেয়েই সুন্দরী ছিল না, মনেও সে ছিল অতুলনীয়া। বিদ্রূপের হাসি হেসে বিউটি বৌকে বরণ করে ঘরে তুলল। বিউটির স্বামী শুধু একবার বললেন, মা যেন আমার রাজী! ঠিক এমনি দেখতে ছিলেন আমার মা। রাঙা ডাগর চোখ, ছোট্ট ছোট্ট হাত পা, যেন দেবী প্রতিমা। খিলখিলিয়ে হাসির সঙ্গে ভঙ্গি করে বিউটি বলে, আর, আমার কাকা আমায় ডাকত বাঈজী। কাকা বলত, দেশ-বিদেশের বাঈজী এসেছে আমাদের বাড়ীতে, কিন্তু বিউটির রূপ সকলকে হার মানায়। আজই ত বাড়ীশুদ্ধ সবাই বলছে কি দেখে নটে তুলল গো? চিরদিন বিউটিকে দেখেও কি রূপ কাকে বলে নটে চিনল না? নটে সংকোচে মাথা হেঁট করে।

জমিদার বাড়ীর মোটরগাড়ি চেপে দেবী শ্বশুরবাড়ী এল। বড় দেউড়ি পেরিয়ে দালানের কাছে গাড়ি থামল। শ্রাবণের জলে উঠোন গোবরে কাদায় চপচপ করছে। তার মধ্যে লাল রংএর জংলা বেনারসী পরে, মুখে চুনকাম করার মত ঘোষে মুখ, আর আই লাশ মেক আপ দিয়ে চোখ-ভুরু-আঁকা মাথায় সেফটিপিন-আঁটা ঝুঁটি দিয়ে-কাপড়-পরা ঠোঁটে-গালে রং-মাখা বিউটি এগিয়ে এল স্বচ্ছ লেসের ব্লাউজ পরে। পায়ে জুতো ছিল কি না মনে নেই। তবে সিঁদুর আলতা যে ছিল না এটা ঠিক। অবাক হয়ে চেয়ে রইল দেবী, এ কোন্ ছলনাময়ী নারী! আর বিউটি ভাবল এত রূপ বুঝি দেবী কখনও দেখে নি তাই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছে। নটে বলল আমার মা। দেবী প্রণাম করল নত হয়ে। এই দু'জনে প্রথম দেখা। বধূ আগমনে পুত্রবধূর কল্যাণ কামনায় মৌচক্র আঁকা হয় নি অঙ্গনে, দরজায় বসে নি মঙ্গলঘট। বাজে নি শাঁখ, ওঠে নি উলুধ্বনি। উৎসবের যা কিছু প্রকাশ তা বিউটির সাজসজ্জায় কিন্তু তাতে আনন্দের চেয়ে প্রতিযোগিতার ঝাঁজ যেন বেশী। নববধূর চেয়ে বিউটির রূপের জৌলুস বাড়ানর আবেগ। সরল বুদ্ধিদীপ্ত কালোচোখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে দেবী। ফর্সা রংএর সঙ্গে এক ঢাল কালো চুল ছিল জটেমামীর, যা আজ জটার আকার ধারণ করিয়ে তার দেবী নাম ঘুচিয়ে জটেমামী নামকরণ করেছে। নিজের বাপের বাড়ীর সঙ্গে এ বাড়ীর সব অসাম্য ভুলে গিয়ে ঐ শাশুড়ীকে খুশী করার অসাধ্য সাধনে ব্রতী হ'ল দেবী। আর কিছুদিনের মধ্যেই মায়ের অসাধারণ বাধ্যতায় নটেমামা নিঃসংশয়ে জেনে নিল যে দেবীর বিউটির পাশে ত নয়ই, এ বাড়ীর কোন বৌএর পায়ের কাছেই দাঁড়াবার যোগ্যতা নেই। মাতৃহীনা দেবীর স্নেহোপম চরিত্রের পিতা ঠনঠনিয়ার নামে অভিহিত হ'ল।

যে মেয়ে জীবনে মাটিতে শোয় নি, ছোট পলির

দিকের অন্ধকার ঘরে মাটিতে চেক চেক চাদর আর অয়েলক্লথের বালিশে তাদের ফুলশয্যা হ'ল। বোধ হয় বাড়ীর কোন কর্মীর ফেলে দেওয়া বিছানা। মায়ের বিরক্তির গ্লানিতে ফুলশয্যার রাতে নটু মরমে মরেছিল, আগেকার সব আদর, সব ভালোবাসা সে নিঃশেষে ভুলে গিয়ে সে দেবীকে বলল, তুমি দেখতে ভাল নও বলে তোমায় সবাই যা বলছে তাতে মনে কষ্ট কর না। সবাই ত আর আমার মা'র মত সুন্দর দেখতে হয় না। মা'র মনে কষ্ট দিয়ে আমি তোমায় এ বাড়ীতে এনেছি তুমি কিন্তু মা-কে সুখী কোরো। জান, আমি সবচেয়ে ভালবাসি আমার মাকে, আমার মা বেচারী সুখী হয় নি আমার বাবাকে নিয়ে, তার সব দুঃখ আমাকেই ভোলাতে হবে। তারপর শুধু মা'র রূপের ও গুণের বর্ণনা শুনতে শুনতে ভোর হয়ে গেল। ওঠার সময় আবার দেবীর হাত ধরে নটু বলল, বল, কথা দাও, আমার মাকে সুখী করবে। একটু থেমে দেবী বলল, চেষ্টা করব। এবার নটু ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বলে, চেষ্টা নয়, করতেই হবে তোমায়। একান্ত প্রিয় সেই মুখটির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দেবী বলে, বেশ, তাই করব।

পরদিন থেকে অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হয় তার। মনে পড়ে আমায় দিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পিতার কথা; নটুর দু'টি হাত ধরে শিববাবু বলেছিলেন,"জমিদার বাড়ীতে আমার বড় ভয়, তবুও আমার দেবীমা'র কোন ইচ্ছে আমার পক্ষে অপূর্ণ রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, আমার মা-হারা মেয়ে মা পাবে, তোমার মায়ের কোলের ভাগ ওকে দিও নটু।" নটু বলে, ভাগ কেন? পুরোই দেব, আমার জগতে মা ছাড়া কি কেউ আছে? মা-অন্ত প্রাণ ছেলে। নিজের চোখ দিয়ে জগতকে চিনেছে। মা'র বলা, মা'র কথা, মা'র ইচ্ছা, মা'র অভিরুচি সে যেমন বিনা দ্বিধায় মেনে এসেছে, ভেবেছিল মা-ও বুঝি তাই করবে।

দেবীর বাবা হেডমাষ্টার ছিলেন। দেশে জমি-জমা বাগান-পুকুর নিয়ে বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। আর ছিলেন খোলা-মেলা একটি মহান হৃদয়ের অধিকারী।

সকালে উঠে দেবী দেখে বিউটি কেঁদে কেঁদে ঘু ঘুমিয়েছে। দেবী কাছে এসে বসতেই বললেন, "আমি কি কখন বউকে ছেড়ে রাত কাটিয়েছি? এ আমা কি হ'ল? রাতে আমার ঘুম হয় না, ও বাঁশী বাজা আমি শুনি, আমি বই পড়ি ও শোনে। ও আমা বন্ধুকে বন্ধু, ছেলেকে ছেলে। আমি রান্না করি ও যোগাড় দেয়, আমি শুয়ে থাকি ও মুখের কাছে চ করে এনে দেয়। ওর সাজা পান ছাড়া আমার মুখে রোচে না। আজ সে পর হয়ে গেল।

ও যে কবে হয়েছে আমার কিছু মনে নেই। আমারই সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে ও। আমার ছিল গোলাপ ফুলের মত রং। আমি যখন নীল রং বিছানায় শুয়ে থাকতাম ও অবাক হয়ে আমায় দেখত। ও ছোটবেলায় কোথায় থাকত কি করত কিছু আমার মনে নেই। আমি ত কলকাতায় বাপের বাড়ীতে থাকতাম বেশী। ও থাকত মিরেটে ওর বাপের কাছে। তখন পালা করে থিয়েটার হ'ত আজ খানিকটা, কাল খানিকটা—চলত এক সপ্তাহ দু'সপ্তাহ ধরে। তাই আমি মিরেটে থাকতে পারতাম না। ওর বাপ তখন চাকরি করতে বেহালায় যেত। বাড়ীতে ছেলেকে তালাবন্ধ করে রেখে যেত। যখন আমি থাকতাম, বাবু ঢাকাই পরটা মাংস কিনে দিয়ে যেত। আমরা দুজনে খেতাম, ওর কথা মনেই থাকত না আমার। গয়লা বড় খাতির করে দুধ দুয়ে রেখে যেত ও খিদে পেলে তাই খেত।" ছেলের কথা মায়ের মনে থাকত না এমন অদ্ভুত অসঙ্গত কথা দেবী কখনও শোনে নি। অবাক হয়ে শুনতে থাকে— আবার বিউটি বলে যায়, তারপর ওর খুব অসুখ হ'ল। আমি ত আসতে পারলাম না। তখন "দিলকে সোনালী" থিয়েটার হচ্ছে, কলকাতায় তাতে গহরজানের নাচ টেক কাটিয়ে দিয়েছে। কে তখন ছেলের মাথায় বসে বসে জলপটি দেয় বল! বাবুর চাকরি নিয়ে টানাটানি, অত কামাই করলে চাকরি থাকবে না। তখন বাধ্য হয়ে বাবু ওকে নিয়ে এ বাড়ীতে এল। চাকরি অবিশ্যি তবুও রইল না। ঐ ছেলের তখন নিভন্ত প্রাণ। আমি বাবা রোগ-তাপ সইতে পারি না। যা করবে

ঐ বাপ-ছেলে। অবিশ্যি আমার মা-অন্ত-প্রাণ। বড় হয়ে মা ছাড়া কিছু জানে না। হাড় জুড়ুৎ আমার।

এমন অদ্ভুত গল্প দেবী জীবনে শোনে নি তার ঠাকুমার ও প্রথম সন্তান তার বাবা। কিন্তু বাবার ছোটবেলার গল্প ঠাকুমার কাছে অজস্র শুনেছে দেবী। সেই গল্পই ঠাকুমার প্রতি তার প্রধান আকর্ষণ ছিল।

নিজের মা দেবীর নেই বটে, তবে কাকীমারা আছে। সাধারণ শ্যামবর্ণ বেঁটেখাটো দুজনেই। আর ঠাকুমা ছিলেন অসাধারণ রূপসী, যেন শ্বেত পাথরের প্রতিমা। পাঁচ পিসীরা রূপের ডালি ছিলেন, কিন্তু কৈ, তাদের বাড়ীতে ত এত রূপের সমালোচনা ছিল না? ঠাকুমা ঠাকুমা, পিসীমা পিসীমা। রং আর গড়ন দিয়ে কি তাদের মূল্য?

ঠাকুমা দিদিমা ভাবলেই দেবীর মনে হয় তার ঠাকুমা দিদিমার কথা। লাল কস্তাপেড়ে শাড়ীপরা কপাল আর সিঁথের সিঁদুর। পা ভরা আলতা। আর দু চোখে মেয়ের মমতার বাৎসল্যর ধারা। এ কিন্তু তা নয়। তার সধবা ঠাকুমা ভোরে গঙ্গাস্নান করে ফিরতেন, মুখে স্তব পাঠ, ভক্তিতে গদ্গদ চোখ মুখ। তাঁর কাছে শুনে শুনেই এত স্তব মুখস্থ হয়েছে দেবীর। এদের বাড়ীর মতন আদিরসাত্মক ছড়ার চলন সে বাড়ীতে নেই। রামায়ণ-মহাভারত মোহমুদ্গর ছিল মেয়েদের কণ্ঠস্থ। আর বাবা ঠাকুর্দা কাকা এদের কাছে শুনে শুনে গীতা উপনিষদের বহু শ্লোকও দেবী অনর্গল বলতে পারত। আর কণ্ঠস্থ ছিল রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা।

এ দিদিমা যেন বুড়ী; কোমরে শুধু কাপড় জড়ান বাকি, কাপড়টা হাতে। ঘরে একটি রামায়ণ নেই, নেই ঠাকুরদেবতার ছবি। না গীতা, না মহাভারত। সারাদিন শুধু পানদোক্তা খাওয়া, ঠোঁট উল্টে আর নাটার মত চোখ পাকিয়ে পরচর্চা আর পর-আলোচনায় দিন কাটাতেন তিনি। আফিং ত খেতেনই, দুর্বল বলে ব্রান্ডি ও মাছ মাংসও চলত। এই দিদিমার কথা বেদবাক্য ছিল নটুর কাছে। আদি রসাত্মক গল্পে কোন ঢাকাঢাকি ছিল না তাঁর। তাঁর কোন্ ছেলে কোন্ মেয়ে কবে কি কীর্তি করেছে সবই সাড়ম্বরে বলে বেড়াতেন তিনি। গল্পের মধ্যে দিয়ে বোঝাতেন যে স্ত্রী হ'ল কুহকিনী, স্ত্রী হ'ল 'বিবি সাহেবের দাসী', 'ব'ল পুরুষের বাচ্চা হোস কখনও স্ত্রীর কথা শুনবি নি'। নির্বোধ নটুর মনে সেই কথার প্রতিক্রিয়া হ'ত। জটেশ্বরীর শত দুঃখেও নটুর মনে করুণা অনুকম্পা আসে নি। নিজের পৌরুষের গর্বে সে আস্ফালন করে বেড়াত। যদি বা একান্ত নিরুপায় হয়ে কিছু বলতে যেত দেবী, দিদিমার কথা স্মরণ করে দেবী বলত সেকথার কাড়তে এল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জটেশ্বরী আড়ালে গিয়ে চোখ মুছত। যে চোখের জলের মূল্য দিয়ে জটেশ্বরীর বাবা নিঃস্ব নটুর হাতে প্রাণাধিকা কন্যাকে সঁপে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, আজ সে চোখের জলের কানাকড়ি মূল্যও রইল না। নিজের আলায় বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে জটেশ্বরী। নটেশ্বর বিরক্ত হয়ে বন্ধুদের কাছে পরামর্শ চায় কেন ও কাঁদে বল ত? বন্ধুরা বলে, ব্যাপার আছে হে বন্ধু, ব্যাপার আছে। পূর্ব অনুরাগী কেউ আছে হয়ত। পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও এর পর থেকে দেবীর চোখের জলকে সে অগ্রাহ্যই করে এসেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় দিই দূর করে। আবার মনে হয় থাকুক, মা বেচারীর সাশ্রয় হচ্ছে বিবি সাহেবের দাসী থেকে। তা ছাড়া খাটতে পারে মেয়েটা ভূতের মত। দিনরাত মুখ বুজে খেটে যাচ্ছে। শীতের ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে উঠোনে বসে জমিদার বাড়ীর ফেলে-দেওয়া ভাঙা তোলে চা তৈরী করে। দুকাপ জল ফুটতেই এক ঘণ্টা লাগে। বিউটির আবার চায়ের তরিবৎ খুব। জল বেশী ফুটলে সে জলে চা হলে চলবে না। আবার কম ফুটলেও চলবে না। 'পিক্‌নে'র মত টিমটিমে আঁচে মস্ত লোহার কেটলি চড়িয়ে অতন্দ্র চোখে বসে থাকে দেবী। মনের মধ্যে ভীড় করে আসে বাপের বাড়ীর কথা।···বাথরুমে গরমজল মিশিয়ে খাটের কাছে চটি এনে রুবিবৌ বসে থাকত তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায়। বামুন ময়দা মেখে বসে থাকত গরম গরম লুচি ভেজে দেবে বলে। মিষ্টি দেবী ভালবাসত না, বাসি লোনতা খেলে অসুখ করবে তাই এই ব্যবস্থা। খাবার খেয়ে দেবী ছুটত বাগানে। বাবা পায়চারি করতে করতে গীতা উপনিষদ আবৃত্তি করতেন। তাদি

ভাল লাগত তার। ঘুম ভেঙে যায়। চাঁদের আলো ফুটে উঠেছে। বিছানার গরম ছেড়ে উঠে এসেছে শীতের হাওয়া। বুকের ভেতর কাঁপন দিয়ে যায়। দু' চোখ ভরে যায় জলে। রাত দশটায় ছুটি পায় সে। সারা-দিনের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রাতে বেশী জাগতে পারে না নটু, বিরক্ত হয়। ভোরের দিকে গাঢ় ঘুমে দেহ আচ্ছন্ন হয়ে আসে, কিন্তু তখন বিউটির বেড-টি চাই। নিজে চা খেত না দেবী, তাই বলেছিল বিউটিকে। তখন কি জানত চা খাব না বললে জলখাবারও বন্ধ হবে তার! চায়ের সময় ডাক পড়ে না তার। চায়ের বদলেও কিছু দেয় না তাকে বিউটি। ঠিকে ঝি রোদে বসে দু'খানা আটার রুটি গুড় দিয়ে খায়, তাই চেয়ে চেয়ে দেখে দেবী। ভাবে তাকে যদি অমনি কেউ দিত? এই ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর একটা অবধি অনাহারে কেটে যাবে। এখন মনে হয় চা খেলেও ভাল হ'ত। টেবিলে মুখোমুখি বসে চা খায় নটু আর বিউটি। নটুর মুখে একটু খোশামোদের হাসি। মা বেচারী হয়ত শীতের ভোরে চা পেয়ে খুশী হয়েছে এই প্রত্যাশা। বিউটির মুখে বিদ্রূপের হাসি। উঠতে হ'ল ত বিছানা ছেড়ে? কৈ বর ত আদর করে ধরে রাখতে পারল না? নটু ও দেবীর দুজনের আহারের প্রতিদানে নিজের গতরের দাম দিয়ে তা উপার্জন করে নিতে হবে দেবীকে। কিন্তু দেবী আর পারে না তবু নটুর কঠোর নির্দেশ তাকে খুশী করতেই হবে।

বিউটির কাজের ধরণ আলাদা। চানের ঘরের কোণে বালতিতে মশারি সাবানে ভিজিয়ে দিল। দেবীকে বললে, কেচে রেখ চানের সময়, তুমি মেলতে পারবে না ঠিকমত, আমি মেলে দোব। চানের ঘরের মধ্যে দেবী মশারি কাচল, সবাই দেখল মেলছে বিউটি। এমন কি নটুই হয়ত মা'র সঙ্গে ধরাধরি করে মেলল মশারি; কিন্তু কারুর মনের কোণেও এল না যে ঐ মস্ত মশারিটা কেচেছে দেবী।

এর পর দেবীর হ'ল সন্তান সম্ভাবনা। বিউটি সেল-ফেসে আর বুঝি আগের মত খাটতে পারে না দেবী। রক্ত মাথাঘোরা আর শরীর থেকে সব ক্যালসিয়াম টেনে নিচ্ছে সন্তান। এধারে অনাহার অর্ধাহার চলছে। কি জানি কি মনে হ'ল বিউটির, বললে, দিনকতক বাপের বাড়ী যাও, অত ঢং আমার পোষাবে না। তা ছাড়া নটু বড্ড রেগে গেছে তোমার নিত্যি ছিরি ছিরি পিরি পিরি দেখে। কত সইবে পুরুষে? তিন দিন শাশুড়ীর ঘরে বন্দী হয়ে রইল দেবী। যাবার বেলা যখন প্রণাম করতে গেল নটুকে, কথা কইল না নটু। মার কথায়ও বিরক্ত মুখে বসে রইল খবরের কাগজে মুখ আড়াল করে। আর সইতে পারে না দেবী। বলে, কি দোষ করলাম আমি? যাবার বেলাও ক্ষমা করতে পারলে না? একরাশ চোখের জল ঝরে পড়ে নটুর পায়ে। দ্রুতপদে বেরিয়ে যায় দেবী। বিউটি কাছেই ছিল বারান্দায়। বলে, কি গো কেঁদে কেটে গলাতে পারলে না? ছিঃ ছিঃ! বেচে সোহাগ আর কেঁদে মরি, গলায় দড়ি অমন ভালবাসায়।

বাবার সেই অপর্যাপ্ত যত্নে বাবার কাছে সেই সেরে উঠেছে দেবী, ডাক পড়ল শ্বশুরবাড়ীতে। তার মাস, পেটে সন্তান, ঠাকুমা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, পাঠাস নি শিবু, পাঠাস নি। যা হাল করেছে মেয়েটার! এ সময় কত শক্তি দরকার, নিজের শক্তিতে প্রসব করতে হবে। সর্বক্ষণ হাঁপায়, কেমন যেন মনমরা ভাব। অমন হাসিখুশী মেয়েটা বদলে গেছে একেবারে। অথচ কিছু বের করতে পারলাম না ওর পেট থেকে যে, কিসের ওর কষ্ট। অত বড় পণ্ডিত শ্বশুর, জোয়ান শাশুড়ী, তার একমাত্র বৌ আদর যত্নেই ত থাকার কথা। শিববাবু শান্ত স্বরে বললেন, তা হবে না মা, পাঠাতেই হবে ওকে।

এবার মোক্ষম চাল চেলেছে বিউটি। বিউটি চির-কালের আয়েসী মানুষ। রান্নাবান্না তার পোষায় না। একটা ঠিকে বামুন রেখেছিল ক'দিনের জন্যে, সে পালিয়েছে, তা ছাড়া বামুন ডাঁই ডাঁই কাপড়ও কাচবে না, ভোরে বেড-টিও দেবে না। অথচ মাইনেও নিচ্ছে। তা ছাড়া বাঁচছে শুধু দেবীর ভাতটা। নটু ত খাচ্ছেই কাজেই দেবীকে আর না আনলে চলছে না। তবু দেবীর ঠাকুমা অবুঝের মত জেদ ধরলেন, "ওকে পাঠাস নি শিবু, মেয়েটা মরে যাবে। করুক ওর শাশুড়ী রাগ, শেষে সোনার চাঁদ নাতি দেখে সব ভুলে যাবে।" তখন

নিরুপায় হয়ে শিববাবু একটা চিঠি মা'র হাতে দিয়ে চলে গেলেন। বিউটির লেখা চিঠি। "বেয়াইমশাই, বৌমার শরীরের গতিক ভাল নয় বুঝিয়া আপাততঃ ওকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু নটু এ বাড়ীর একটি মেয়েকে লইয়া বড়ই বাড়াবাড়ি করিতেছে। যদি বৌমার মঙ্গল চান পত্রপাঠ তাহাকে পাঠাইবেন। তার মাসের ওষুধ ভুলিবেন না, জোয়ান বয়েসে মানুষ এসব করিয়াই থাকে। বৌমা আসিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।" ঠাকুমা বাক্যাহতের মত বসে থাকেন। পরে দেবীকে ডেকে বলেন, এই দেখ দিদি, তোর শাশুড়ীর চিঠি—। আজ ঠাকুমার কাছে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। ভাবেন তাই মেয়েটা দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। যে মেয়ের হাসির চোটে কান ঝালাপালা, সেই মেয়ে আজ হাসতে ভুলে গেছে। চাপা মেয়ে, মুখে কিছু বলে না বটে, তবে শাশুড়ী ভাল নয়। হয়ত বাক্যযন্ত্রণা দেয় মেয়েটাকে। আবার ভাবে কি সে বাক্যযন্ত্রণা দেবে? ঐ সরল অবোধ মেয়েকে কি করে বকবেন? ও যে মা ভেবে বিউটিকেই জড়িয়ে ধরেছে। আবার ভাবেন বিউটি যা লিখেছে তাইই হয়ত সত্যি। নইলে মা হয়ে কি সন্তানের নামে অত বড় অপবাদ দিতে পারে? তাইই হবে নটু অন্যের প্রতি আসক্ত। নইলে স্বামী থাকতে স্ত্রীকে দুঃখ দেয় কার সাধ্যি? মনে পড়ে শিবু যখন পেটে আসে শিববাবুর বাবার সে কি ভাবনা। বাড়ীতে প্রথম বৌএর প্রথম সন্তান আসবে, আদর যত্নের অভাব ছিল না। তবু রোজ নিজের হাতটি ফলপাকড় ভাঙাচৌকেন আনে স্ত্রীকে খাওয়ান চাই। ঐ শা-বাবির ওপর ভাঙা-চোকেন খেতে রাজী হতেন না শিনি। তা নিয়ে কত মান-অভিমান। চমক ভাঙে দেবীর ডাকে। দেবীর দু' চোখে জলের ধারা। বলে এ চিঠি বাবা দেখেছেন ঠাকুমা? ঠাকুমা বলেন, শিবুই ত দিল। দেবী বলে, তোমরা ভেব না ঠাকুমা, ও সব বাজে কথা, কি জানি মা কি ভাবতে কি ভেবেছেন?

ঠাকুমাকে স্তোক দেয় বটে, কিন্তু নিজের মনকে বোঝাতে পারে না। মা'র কথায় নটু সব করতে পারে। তা ছাড়া বাড়ীতে ত নীতি বলে বস্তু নেই। আর দিদিমাই ত বলবে ও কিরে, তুইও শেষে ভেতো হয়ে গেলি? ছিঃ ছিঃ! বৌ থাকবে লক্ষ্মীর সিঁদুর কৌটো র মত তোলা। বাইরে কি মেয়েমানুষের অভাব? না ইচ্ছে কর না? দেবীর ভাবতে ইচ্ছে করে না যে অপরকে ভালবেসে নটু তার কাছে যাচ্ছে। ভাবে না দিদিমার কাছে পৌরুষ দেখাতেই খুঁকু জিজির সঙ্গে অত মেলামেশা, গান বাজনা করে। মনে পড়ে বন্ধু রামমোহনের কথা। অত বড় লম্পট, দুশ্চরিত্র যে মানুষ হতে পারে তা দেবীর জানা ছিল না।

দেবী শ্বশুরবাড়ী যায়। নটুর সঙ্গে দেখা হলে কেঁদে আছড়ে পড়ে। দেবী বলে, কেন অমন চিঠি লিখল মা, ঠাকুমা পড়ে—বিরক্ত হয়ে নটু বলে, "মা বলেই ছিল বাপের বাড়ীর রাজভোগ ছেড়ে সহজে আসবে কি? এলেও দেখিস কত জ্বালাবে।" দেবী বলে তা নয় গো, জান না কি সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা মা লিখেছেন। দেবীকে স্তব্ধ করে দিয়ে নটু বলে, সে চিঠি আমি দেখেছি। আমার সামনে বসে মা লিখেছে। ব্যথায় ঘৃণায় দাঁতে দাঁত চেপে দেবী বলে, যদি না আসতাম? নটু অম্লানে বলে, চিরদিনের মত এ বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে যেত তোমার কাছে। তারপর দেবীর দেহ নিয়ে আনন্দে মগ্ন হয়ে যায়।

নটু বা দেবী কেউই জানল না এর মধ্যে কত চাল চেলেছিল বিউটি। নটুর সামনে একটা মায়াকান্নাভরা চিঠি লিখেছিল, "মা দেবী, তুমি নেই, বাড়ী অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি জানি বাপের বাড়ীর আনন্দে তুমি সুখেই আছ, তবু তোমার মা নেই তাই ভেবে আমার মন তোমার জন্যে অস্থির হয়। রাজকন্যা সাবিত্রী স্বামীর জন্যে * * * নটুও বড় মনমরা হয়ে থাকে। তার কথা ভেবে তুমি অবিলম্বে চলে আসবে।"

ক্রমশঃ

টংকিং উপসাগর কূলে

অমর রাহা

১৯৬১ সালে কেনেডি স্যাটারডে ইভিনিং পোস্টের স্টুয়ার্ট এ্যালসপকে বলেছিলেন: শেষতঃ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে রাজনৈতিক সমাধান; এবং ঐ বছর যে মাসে কংগ্রেসের নিকট বিশেষ বাণী হিসাবে বলেছিলেন: এঁরা চাইছেন ন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের অবসান। না শুধু তাই নয়—এঁরা চান জীবনের চলার পথে বাধার দূর।

সেদিন কিন্তু এই উপসাগর কূলের দক্ষিণাংশে সংগ্রাম চলছিল দু' বিরোধী শক্তির মাঠে-ঘাটে ও প্রান্তরে এবং এতে জড়িয়ে পড়েছে মার্কিন দেশ। এঁদের হিসাব অনুযায়ী ভিয়েতকং ও সরকারী সামরিক বাহিনীর সংখ্যা হার ছিল ১: ০। আর আজ চার বছর পর সে সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে অনেকগুণ—এমন কি ১৯৬৪ সালের 'দশ হাজার মার্কিন উপদেষ্টা' আজ পরিণত হয়েছে প্রায় দু-তিন লাখ স্থল-নৌ-বিমান বাহিনীর সৈন্যতে। শুধু তাই নয়, মাস ছয়েক পূর্বের মার্কিন হতাহতের সংখ্যা আজ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় হাজার গুণ। এবং এ সবই হচ্ছে সায়গনের শাসকদেরকে গদীতে বসিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা।

কিন্তু এঁরা কারা?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং জার্মানী কর্তৃক ফরাসী দেশ অধিকৃত হওয়ার পর শুরু হ'ল এক অধ্যায়, যার শেষ আজও হয় নি।

ভিসি সরকার আনল জাপানীদেরকে এই দেশে। ১৯৪৫ সালে এই জাপান ভিয়েতমিংদের নেতৃত্ব গঠন করলে এক সরকার; এবং জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর ফরাসীরা হ'ল এই দেশে নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। শুরু হ'ল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যার এক অধ্যায়ের শেষ হ'ল ১৯৫৪ সালে দিয়েন-বিয়েন-ফুতে।

এই সংগ্রামের সময় ফরাসীরা গড়ে তুলল এক বাহিনী ফরাসী অফিসারদের নেতৃত্বে। এই বাহিনী গড়ে উঠল কমিউনিষ্ট-বিরোধী দল হিসেবে। এই বাহিনী পরবর্তীকালে রূপ নিল ১৭ প্যারালেলের দক্ষিণের সরকারী বাহিনী। তা ছাড়া ফরাসীরা কাও-দাই হোয়া-হাও প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়কেও সুসজ্জিত করল অস্ত্র দিয়ে ভিয়েতমিনদেরকে দমনের জন্য এবং এঁরাও ভিত হ'ল সায়গন সরকারের শক্তি। তা ছাড়া, এই

সায়গন সরকারের পুলিশ বাহিনীর মূল শক্তি হচ্ছে সেদিনকার Binh Xuyen নামক এক সংগঠন, যাদেরকে সায়গন শহর জানে জলদস্যু ও শহরের যত ঘৃণ্য ও নোংরা জীবনের কর্তা হিসেবে।

আজকের শাসকশ্রেণী হচ্ছেন এঁরাই। এবং এঁদেরই গদীতে বসিয়ে রাখবার জন্য মার্কিন দেশ খরচ করছে দিনে প্রায় দু' মিলিয়ান ডলারের ওপর শুধু গোলা-বারুদে।

সংগ্রামের দু' নীতি

ত্রুয়ং চিং বলেছিলেন: কোন দৈত্যাকৃতিই কোন নতুন দর্শন-শক্তির সম্মুখীন হতে পারে না যে আদর্শের জন্ম হয়েছে। শক্তিশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎমিনের অমূল্য বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি, তাই আজ মার্কিনরা যেমন একদিকে ব্যবহার করছে অতি আধুনিক অস্ত্রাদি, তেমনি তার প্রধান চেষ্টা কি করে বেরিয়ে আসতে পারে সংঘর্ষ হাত হতে।

তাই আজ জগৎ দেখছে অতি আধুনিক সমরসজ্জার হার স্বীকার করতে প্রতি পদক্ষেপে ভিয়েতকংদের হাতে।

পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউস কিন্তু এ বিশ্লেষণ করছে অন্যভাবে, অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হচ্ছে পিকিং-হ্যানয় সাহায্যপুষ্ট ভিয়েতকংদের গ্রাম-গ্রামে ধ্বংস যতদিন না করা যাচ্ছে ততদিন এরকমই অবস্থা হতে বাধ্য। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে উত্তর ভিয়েৎনামের গড়ে ওঠা সমাজের ধ্বংস করা যাতে করে সাহায্য না পৌঁছতে পারে দক্ষিণ দিকে। কিন্তু হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্নার্ড বি. ফলের ভাষায় বলা যায়: কমিউনিষ্ট ওদের সামরিক লক্ষ্যবস্তু নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক গুরুত্বের ওপর, আর আমাদের দিকে তা নির্ধারিত হয় সংগ্রামী ব্যক্তির ওপর। মূলতঃ আমাদের কাছে এই রাজনৈতিক দিকটা অপরিচিত এবং সেইজন্যই আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'নিধন করা'।

বর্তমানে

উক্ত নীতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে যেমন একদিকে মার্কিন দেশে সরব প্রতিবাদ উঠছে, ঠিক তেমনি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সায়গন সামরিক জেনারেলদের মনে। সামরিক বাহিনীর অফিসারেরা ভয় করে যে আজ যদি হো-চি-মিনকে কোণঠাসা করার প্রয়াস করতে থাকে মার্কিন শক্তি তবে সে সহনীয়তা অতিক্রম করলেই যে সংগ্রাম শুরু করবে তা সর্বনাশাত্মক রূপ আনবে সায়গনের। এখানে কিংসলে মার্টিনের উদ্ধৃত হো-চি-মিনের কথা বললে অবান্তর হবে না। হো চি-মিন এক ফরাসী জাঁ স্যাঁতেনিকে বলেছিলেন: যদি আমাদেরকে লড়াই করতেই হয়, তবে আমরা তা করব। তোমরা আমাদের দশজনকে মারবে, আর আমরা মারব তার বদলে তোমাদের একজনকে। এবং তোমরাই প্রথমে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

আবার অন্যদিকে আমেরিকান সিনেটের ডেমোক্রাট ও রিপাব্লিকান নানা সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন জনসন নীতির বিরুদ্ধে। এভাবেই ডার্কসেন বলেছেন যে আজ অতি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ভিয়েতনামীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা। তা ছাড়া বলেছেন প্রতিপত্তিশালী পেনসিলভানিয়ার সিনেটর জোসেফ ক্লার্ক। তাঁর বক্তব্যকে প্যাট্রিক ও'ডনোভান আখ্যা দিয়েছেন: Who has spoken up like a heretic at a burning। এমনি বহু সিনেটার আজ প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়েছেন যদিও এঁদের ধরন ব্রিটেনের ধরনের নয়, তবুও কার্যকরী।

আজ তাই জনসনের সামনে রয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে কোরিয়ার পুনরাবৃত্তি, এবং দেশাভ্যন্তরে রয়েছে পারিপার্শ্বিক বাধ্যকর চাপ ও পেন্টাগন একগুঁয়েমি।

—o]—[o—

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(ছত্রিশ)

নতুন চাকরিতে রামকিঙ্করের আরাম অনেক। প্রথমতঃ তেলের দুর্গন্ধ সহ্য করতে হয় না। তার সঙ্গে অন্ধকার ঘরের ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। দোকানের মত বড় বড় ইঁদুরও এখানে ঘোরাফেরা করছে না। কাছারি ঘরগুলো একতলার বটে, অনেকদিনের পুরনো বাড়ী, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই, জায়গায় জায়গায় দেওয়ালের চুণবালিও খসে পড়ছে, কিন্তু ঘরগুলোর আলো-হাওয়া আছে, মোট কথা, ওখানকার চেয়ে অনেক আরামে আছে।

কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করে।

দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্যেও বটে, কিন্তু তারও চেয়ে বেশী ভয় বৌরাণীকে। সমস্ত দিন কাছারি ঘরে কাজের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে মন্দ কাটে না। সন্ধ্যার পরে বৌরাণীর তলব আসে। তার সামনে গেলেই ওর হৃদকম্প উপস্থিত হয়। বৌরাণীর হাজারো রকমের প্রশ্ন থাকে। কতক কাজের, কতক এলোমেলো। কি যে তার ভয়, সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে না। নিজের ঘরে ফিরে এসে মনে পড়ে, জবাব ঠিক দেওয়া হয় নি। কেন হয় নি, বুঝতে পারে না।

প্রথম প্রথম সন্ধ্যের দিকে সারদার সঙ্গে তার বসবার ঘরে প্রায়ই দেখা হ'ত। ক'দিন থেকে হচ্ছে না। সন্ধ্যের দিকে সারদা মোটেই ছুটি পাচ্ছে না বোধহয়।

সকালে সারদা প্রতিদিন একসময় এসে তার ঘর গুছিয়ে দিয়ে যেত। বোধ হয় একই কারণে তাও করতে পারছে না। হঠাৎ তার কি যে কাজ বেড়ে গেল, সেই জানে। দেখা হলে জিজ্ঞাসা করা যেত। দেখাও হচ্ছে না। সে যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

বৌরাণীর বাইরের ফাইফরমাস সেই খাটত। তার জন্যে দিনের মধ্যে বিশবার বাইরে যাওয়া ছিল। এখন আর তাকে দেখা যায় না। সে কাজ বোধ হয় অন্যলোকে করছে।

সারদার কি প্রমোশন হয়ে গেল? আর তারই জন্যে সে কি পর্দানশীন হয়ে গেছে?

বৌরাণীর ডাকে সন্ধ্যার পরে যখন অন্দরে যায়, তখনও কোথাও তাকে দেখা যায় না। তবে কি তার চাকরি গেছে? কিন্তু তা হ'লে ত তাকে তার বস্তীর ঘরে পাওয়া যেত।

কি যে ব্যাপার, রামকিঙ্কর বুঝে পায় না। অন্য দাসী-চাকরকে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত জানা যায়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে, কেন জানি না, রামকিঙ্করের লজ্জা হয়। ফলে এ বাড়ীর এত মানুষের মধ্যেও তার মন সবসময় চঞ্চল হয়ে থাকে।

আবার একদিন চেষ্টা করলে। গেল বস্তীতে। সারদার খোঁজে। না পেয়ে যথারীতি ফিরে আসছিল বিমর্ষ চিত্তে। পথে ভুবনের সঙ্গে দেখা।

ভুবন আজকাল সমীহ করে কথা বলছে। 'আপনি' বলতে বাধে। তাই ভাববাচ্যেই বেশী কথা বলে।

—কি রামবাবু, ও'দিকে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

রামকিঙ্কর হেসে জবাব দিলে, কোথাও যাই নি। তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলাম।

অনেকদিন রামকিঙ্কর দোকানে আসে নি; সুতরাং বিশ্বাস করতে ভুবনের কষ্ট হচ্ছিল।

অবিশ্বাসের সুরে বললে, আমাদের ওখানে! আমাদের মনে আছে এখনও?

তার কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে রামকিঙ্কর বললে, তোমাদের কথা মনে থাকবে না? সে কি ভোলা যায় কখনও? কেমন আছ বল?

—এই কেটে যাচ্ছে আর কি!

একথা-সেকথার পর ভুবন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, ভাল কথা, চক্রবর্তীর খবর কি?

—জান না, ভদ্রলোক মারা গেছেন।

ভুবন লাফিয়ে উঠল, মারা গেছেন!

—হ্যাঁ। দু'দিন হ'ল তার ছেলে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। বৌরাণীর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গিন্নীমার হুকুমে তাঁর শ্রাদ্ধের জন্যে দু'শ' টাকা পাঠানো হ'ল।

ভুবন আবার একবার লাফ দিলে, দু-শ'-টা-কা! আমরা মরে গেলে দেবে না বোধ হয়।

রামকিঙ্কর হাসলে, মরে দেখতে পার।

ভুবন বললে, দু'শ টাকা পাওয়া ব'লে ভরসা দিলে ধরে দেখতে পারি।

একটু পরে রামকিঙ্কর বললে, মানুষটাকে আমরা যত খারাপ ভাবতাম, আসলে তত খারাপ ছিল না।

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে ভুবন বললে, তুমি একথা বলছ! অথচ তোমাকে কি কষ্টই না দিয়েছে!

—তা দিয়েছে। বোধহয় তার ভয় ছিল, তার সিংহাসন আমি দখল করে ফেলব! কিন্তু আমাকে সে মনে মনে বিশ্বাস করত।

—কি রকম?

—বসন্ত যখন হ'ল, তখন বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্যে আমাকেই সে বেছে নিয়েছিল, মনে নেই?

ভুবন হেসে উঠল, সেটা বিশ্বাসের জন্যে নয়।

—তবে?

—রোগের ছোঁয়াচটা তোমাকে দেবার জন্যে।

—না, তা নয়—রামকিঙ্কর হেসে বললে, আর কারও ওপর সে ভরসা করতে পারে নি। ভয় হয়েছিল, বাঁচবে না। ট্রেনেই মারা যাবে হয়ত। তারপরে যে সময়টুকু তার বাড়ীতে ছিলাম, এত যত্ন করেছিল যে, সে আর বলবার নয়।

ভুবন বললে, কিন্তু তুমি জান না, শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে তাড়াবার জন্যে সে চেষ্টা করেছে।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, তাও জানি।

—তবে?

রামকিঙ্কর বললে, দেখ, কিছু মানুষ ত দেখলাম। এই রকমই মানুষ। কিছু ভাল, কিছু মন্দ। কারও ভাল বেশী, কারও বা মন্দ বেশী। মোটামুটি দেখেছি, মানুষ নিতান্ত মন্দ নয়। হরেকেষ্টও মোটামুটি মন্দ ছিল না।

কথাটা ভুবনের মনঃপূত হ'ল বলে বোধ হ'ল না। সে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মিটি মিটি হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর বোধ হয় তা লক্ষ্য করলে না। আপন মনেই বলতে লাগল, ওদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ বলে হ'ল না। জমি-জমা, ক্ষেত খামার কিছু আছে। তাই বসে বসে খাবার অবস্থা বোধ হয় নয়। বড় ছেলেটা বোধহয় পড়ে। কেমন পড়ে জান?

ভুবন বিরক্তভাবে বললে, না।

রামকিঙ্কর বললে, সে যদি চাকরি করতে চায়, তাকে দোকানে নিয়ে এলে কেমন হয়?

ভুবন লাফিয়ে উঠলে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

—কেন?

—ওই বংশ আবার এখানে ডেকে আনবে?

রামকিঙ্কর হাসলে, ক্ষতি কি?

—তুমি কর্তা হয়েছ, ইচ্ছে করলেই আনতে পার। কিন্তু আমি বলব, ভাল চাও ত এনো না।

ভুবনের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ, বিরক্তি এবং ক্রোধ।

দোকান থেকে বেরিয়ে রামকিঙ্কর এলোমেলো ঘুরতে লাগল। মনটা তার চঞ্চল। সম্ভবতঃ সারদার জন্যে। কি যে হ'ল মেয়েটার, একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল!

বড় বাড়ীটাও যেন আর আগের মত নেই। সব সময় কেমন থমথম করে। গিন্নীমা নিত্যদিনের মতই ঠাকুরদালানে এসে বসেন। কিন্তু যেন প্রাণ নেই। বৌরাণীকে দেখলে মনে হয়, খাঁচার মধ্যে যেন পাখী ঝাপটাচ্ছেন সব সময়। দাসী-চাকর তারাও যেন কলের পুতুলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগের সেই জমজমাট ভাব কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে।

রামকিঙ্কর এলোমেলো ঘুরতে লাগল।

হঠাৎ একসময়ে দেখে, সে মনোহর ডাক্তারের ডিসপেন্সারীর সামনে এসে গেছে।

দরজার গোড়াতেই মনোহর ডাক্তার।

তাকে দেখে সাগ্রহে মনোহর ডাকলে, এই যে রামবাবু! আসুন, আসুন। খবর কি বলুন?

মনোহর ডাক্তারকে রামকিঙ্কর কোনদিনই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে নি। সে ভিতরে গেল না। রাস্তায় দাঁড়িয়েই উত্তর দিলে, কিসের খবর?

—আপনাদের বড় বাড়ীর খবর?

—চলে যাচ্ছে।

—বৌরাণী কেমন আছেন?

রামকিঙ্কর বিস্মিত হ'ল। জিজ্ঞাসা করলে, বৌরাণীর খবর আপনি জানেন না?

—কি ক'রে জানব? আমি ত অনেকদিন ওদিকে যাই নি।

—আপনি কতদিন ওদিকে যান নি?

—তা মাস দুই হবে।

—সে কি!

—হাঁ। আমার ও বাড়ী যাওয়া গিন্নীমা পছন্দ করেন না। মালতী তাই ও বাড়ী যেতে নিষেধ করে পাঠিয়েছে। আগে আগে মালতীর বাপের বাড়ীতে মাঝে মাঝে দেখা হ'ত। এখন, কেন জানি না, সেখানেও সে বড় একটা যায় না। কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝি না। সে ভাল আছে ত?

—ভালই ত আছেন।

মনোহর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে, ভাল থাকলেই ভাল।

রামকিঙ্কর আর সেখানে দাঁড়াল না। একটা নমস্কার করে বড় বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগল।

তার সবই যেন গোলমাল লাগছে। মনোহর ডাক্তার যায় না। অথচ রামকিঙ্করের গভীর সন্দেহ বৃন্দাবনচন্দ্রের মৃত্যুর পিছনে মনোহর ডাক্তারের হাত ছিল। থাক আর না থাক, মনোহরের সঙ্গে মালতীর একটা মধুর সম্পর্ক আছে। এবং মালতী জানে, সে যে গিন্নীমার ভয়ে মনোহর ডাক্তারকে বাড়ী আসতে নিষেধ করে দেবে, এও অবিশ্বাস্য।

ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কিছু রহস্য আছে। কিছু একটা ঘটছে, যা রামকিঙ্কর জানে না। এই সময় সারদার সঙ্গে দেখা হলে ব্যাপারটার আঁচ পাওয়া যেত। কিন্তু সারদা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মনোহর ডাক্তারকে খুব ক্ষুব্ধ মনে হ'ল। হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মালতী কি একেবারেই তাকে ছেঁটে ফেলে দিলে? মালতীর কাছে তার প্রয়োজন কি নিঃশেষ হয়ে গেছে? নিজের বাড়ীতে মনোহরের আসা নিষেধ। যদি গিন্নীমার ভয়ে হয়েই থাকে, গিন্নীমাকে দেখা করতে দোষ কি? আগে আগে ত করেছে। এমন অবস্থায় মনোহর যদি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

ভাবতে ভাবতে রামকিঙ্কর চলছিল। হঠাৎ একটা মানুষের সঙ্গে ধাক্কা। একেবারে মাথায় মাথায়।

দু'জনে ক্ষুব্ধভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে।

উপেন।

তার বাঁ হাতে একটা থলিতে কিছু তরিতরকারি। ডান হাতে বেবী ফুড।

বললে, অমন অন্যমনস্কভাবে কোথায় চলেছেন?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, অন্যমনস্কভাবেই বটে। কিন্তু আপনিই বা অমন হন্তদন্তভাবে চলেছেন কোথায়?

—বাড়ী। বাজার করে যাচ্ছি। ডান হাতে বেবী ফুড। আজকাল বেবী ফুড যোগাড় করা যে কি মুস্কিল, আপনি হয়ত বুঝবেন না। বহু কষ্টে যেতে হয় দাম দিয়ে এটি সংগ্রহ করতে হয়েছে। আজকালকার মেয়েদের বুকে দুধ থাকে না, বেবী ফুডই বাচ্চাদের একমাত্র ভরসা।

উপেন হাসলে।

খুশী হয়ে রামকিঙ্কর বললে, একটি বাচ্চা হয়েছে নাকি? ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে হয়েছে। আপনি ত বহুকাল ও'দিকে আসেন নি, জানবেন কি করে?

—কাজের চাপে অনেকদিন খোঁজ ও যাওয়া হয় নি।

—অপ্রস্তুতভাবে হেসে রামকিঙ্কর বললে, সবিতা আছে কেমন?

—খুব ভাল নয়। সর্দি, কাশি আর কিছু-না কিছু একটা লেগেই আছে। যাবেন দেখতে? কাছেই ত।

—চলুন। আপনারা কি বাসা বদলেছেন?

উপেন হেসে বললে, ক্রমাগতই বদলাচ্ছি। কম ভাড়ার বাড়ীতে যারা বাস করে, তাদের তা ছাড়া উপায়ও নেই।

—কেন?

উপেন আবার হাসলে: সে আপনি বুঝবেন না। বিয়ে-থা করলেন না, বাসার ঝামেলাও পোয়াতে হ'ল না।

চলতে চলতেই উপেন ব্যাপারটা বোঝাতে লাগল: আমাদের প্রথম বাসাটা ত দেখেছেন। যেমনটা নিতান্ত স্যাঁৎসেঁতে ছিল। গ্রীষ্মকালটা মন্দ চলল না। কিন্তু শীত আসতেই বদলাতে হ'ল। তারপরে যে বাড়ীতে এলাম, সেখানে শীতটা বেশ চলল, কিন্তু গ্রীষ্মকালে অসহ্য ব্যাপার। একটুকু হাওয়া নেই, আর ভ্যাপসা গরম। এ বাড়ীটাও বদলাতে হবে। জলের বড় কষ্ট। এই যে এসে গেছি।

ভিতরে ঢুকেই উপেন হাঁক দিলে, এই যে! কাকে এনেছি দেখ।

সবিতা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। তার বাড়ীতে বাইরের লোকজনের আসা-যাওয়া নেই বললেই চলে। ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এসেই দেখে রামকিঙ্কর। অনেকদিন পরে বাপের বাড়ীর লোক দেখে তার মনটা খুব খুশী হয়ে উঠল।

এক-গাল হেসে বললে, রামদা! কি ভাগ্যি! পথ ভুলে এলে নাকি?

জবাব দেবে কি, সবিতার চেহারার দিকে চেয়ে রামকিঙ্কর অবাক।

অমন স্বর্ণলতিকার মত চেহারা, এই ক' বছরে কি বিশ্রী হয়ে গেছে!

বাজারের থলিটা নামিয়ে উপেন বললে, পথ ভুলেই বটে! রাস্তায় দেখা। আমি জোর করে নিয়ে এলাম।

রামকিঙ্কর আমতা আমতা করে বললে, অনেকদিন থেকেই তোমার কথা ভাবছি। কিন্তু কাজের এমন চাপ পড়েছে যে, কিছুতেই আসতে পারি নি।

ঠোঁট ফুলিয়ে সবিতা বললে, জানি, জানি। আর বাজে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। নিজের দাদাই কোনদিন আসে না। তোমার ওপরে অভিমান করব কি? অভিমান করা আমার শেষ হয়ে গেছে।

সবিতার চোখ ছলছল্ করে উঠল।

তার চোখে জল দেখে রামকিঙ্কর ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, বিশ্বাস কর সবিতা, কাজের চাপে আমি একেবারে সময় পাই না। দোকানটা তোমার বাসার কাছে ছিল। কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না, আমি আর দোকানে নেই।

সবিতা জানত না। বললে, দোকানে নেই! ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?

রামকিঙ্কর বললে, না, না। আমি আর এখন ওদের দোকানে কাজ করি না। সদরে থাকি। ওদের এষ্টেটের ম্যানেজার হয়ে। সেটা বাবুদের বাড়ীতে। সেইখানেই থাকি। সেটা এখান থেকে কিছুটা দূরে।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। সেই জন্যেই আসা হয় না। বিশ্বাস কর, বিশ্বনাথের সঙ্গেও বহুদিন দেখা নেই। ও বাড়ীও অনেক দিন যেতে পারি নি। ওদের বাড়ীর খবর কিছু জান?

সবিতা মুখ নামালে: আমি কি করে জানব? আমার এখানে কেউ ত আসে না। আমারও যাবার উপায় নেই।

এতদিনেও উভয়ের মধ্যে যাওয়া-আসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নি! চন্দ্রনাথবাবু একে জেদী মানুষ, তার অসুস্থ। রামকিঙ্কর বুঝলে, সে কারণে সবিতা ও বাড়ী যেতে সাহস করে না। কিন্তু বিশ্বনাথের অন্ততঃ বোনের খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল না কি?

জিজ্ঞাসা করলে, বিশুও আসে না?

—না।

রামকিঙ্কর অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে।

—তারপরে, কেমন আছ বল? শরীর ত মোটেই ভাল দেখছি না।

সবিতা শুধু বললে, না।

—অসুখটা কি?

একটু ইতস্ততঃ করে সবিতা বললে, তাও ঠিক বুঝি না। এই খোকাটা হওয়ার পর থেকেই শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না।

উপেন বললে, রোগটা আসলে মনে। মেয়েরা বিয়ের পরে বাপ-মা ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী করতে যায়। কতজনের শ্বশুরবাড়ী হয়ত বহুদূরে। সে কিছু নয়। কিন্তু এই যে কাছে থেকেও বাপ-মা কারুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, এইটেই ওর ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। তার ওপর সংসারের খাটুনিও আছে। একা মানুষ, সবই ত করতে হয়। কিন্তু তারও চেয়ে বেশী হচ্ছে, বাচ্চা দুটোর উৎপাত। একটা মুহূর্ত ওকে বিশ্রাম দেবে না। এক মুহূর্ত কাছ-ছাড়া করবার উপায় নেই। ওই ওষুধ না কাঁদছে।

রামকিঙ্কর হাসলে। বললে, খুব দুষ্টু হয়েছে বুঝি?

উপেন বললে, দুষ্টু বললে খুব কম বলা হয়। ওদের যে কি ঝোঁক, কয়েক ঘণ্টা না থাকলে বুঝতে পারবেন না। শুধুন খাচ্ছে। গরীবের সংসারে, এই দুর্দিনে, যতটুকু পথ্য সম্ভব, তারও ত্রুটি হচ্ছে না। তৎসত্ত্বেও যে সবিতার শরীর সারছে না, সে ওই বজ্জাত দুটোর জন্যে।

সবিতা বললে, ঘরের মধ্যে গিয়ে একটু বস, রামদা। আবার কবে আসবে, তার ত ঠিক নেই। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি এক্ষুণি চা নিয়ে আসছি।

রামকিঙ্কর বললে, চা থাক, সবিতা। তাছাড়া আমি চা বেশী খাই না। তার চেয়ে যেটুকু সময় আছি দুটো গল্প করি। আমার ফেরবার তাড়াও আছে।

সবিতার মুখ মেঘাচ্ছন্ন হ'ল। তার কাছে কেউ কখনও আসে না। যদি আসে, কাজের তাড়া নিয়ে আসে। বললে, তা হ'লে আজ আর আটকাব না, রামদা। সময় পেলে আরেকদিন বরং এস।

কথার সুরে রামকিঙ্করের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, সবিতার অভিমান হয়েছে। কিন্তু কাজের তাড়া তার সত্যিই ছিল। আর একটু পরে বৌরাণী ডাকতে পাঠাবেন। তার আগে উপস্থিত থাকা দরকার।

বললে, সেই ভাল, সবিতা। আমি শীঘ্রই আর একদিন আসব। একটা ছুটির দিন দেখে।

(ক্রমশঃ)

●—[●]—●

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রি। রাত বেশী না হলেও, ভিড় কমে এসেছে।

কলেজ স্ট্রীট ধরে চলেছি।

একটি মেয়ে পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ব্যাকুল হয়ে বললে, আমাকে বাঁচান!

চমকে উঠলাম।

প্রশ্ন করবার অবসর মাত্র না দিয়ে বললে, ঐ লোকটা অনেকক্ষণ থেকে আমার পিছু নিয়েছে—

চেয়ে দেখলাম, অদূরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে বটে।

মেয়েটি বলতে লাগল, কাল সকাল হলেই বাড়ী-ওয়ালাকে ত্রিশটি টাকা দিতে হবে, তাই দাদার কাছে গিয়েছিলাম টাকা আনতে। ফিরতে যে এত রাত হবে ভাবি নি। সেই অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা টাকা ক'টি ওর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ওকে দিয়ে দিলাম, তবু—

—আপনি কতদূরে থাকেন?

—খুব বেশি দূরে নয়। আমার স্বামী থেকেও নাই, তাই এর-ওর কাছে হাত পাততে হয়। কাল বাড়ী-ভাড়া না দিলে ঘর থেকে বের করে দেবে। বলতে বলতে মেয়েটি কেঁদে ফেললে।

এইবারে মেয়েটিকে দেখবার অবসর পেলাম। বয়স বেশী নয়, উনিশ-কুড়ি হবে…ভদ্রবংশের ছাপ আছে। খুব ফর্সা না হলেও সুন্দরী বলা চলে।

দেখলাম, দূরে সেই লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গেলাম। বললাম, কি চান মশাই আপনি?

লোকটা দাঁত বের করে হাসল। বললে, আপনিও যা চান।

শুনে মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠল। কিন্তু কোনও কথা না বলে মেয়েটিকে বললাম, আসুন আমার সঙ্গে।

—কাজটা ভাল করছেন না মশাই, মুখের গ্রাস—

ইচ্ছা হ'ল একটা ঘুষি মেরে ওর মুখখানা থেঁতো করে দিই, কিন্তু কোনও কথা না বলেই মেয়েটিকে নিয়ে পথ চলতে লাগলাম।

পথ-প্রদর্শক মেয়েটি,

আমি তার অনুগামী।

মেয়েটি সম্বন্ধে অনেক কিছুই কৌতূহল হচ্ছিল জানবার। কিন্তু কি দরকার—নাই বা জানলাম সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আমি ওকে বাড়ী পৌঁছে দেব মাত্র। আর যদি পারি, কিছু সাহায্য—

পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, তিনখানা দশ টাকার নোট আছে। মনে মনে স্থির করলাম, এ টাকা ক'টা ওর হাতে দেব—কিন্তু কিছু মনে করবে না ত?

অবশ্য আমার অবস্থাও এমন কিছু নয়—এই টাকা ক'টা দিলে অনেক কিছুতেই টান ধরবে। যাক্, যা হয় হবে—আমাদের দুঃখের জীবন, না হয় আর একটু দুঃখ বাড়বে।

—কি ভাবছেন বলুন ত?

মেয়েটির কথায় চমকে উঠলাম,

বললে আর বেশীদূর নেই।

• • •

ছোট্ট একখানি ঘর। আসবাবপত্র সামান্যই, কিন্তু বিশেষ কোনও অভাব আছে বলে মনে হ'ল না। এমনি নিখুঁত পরিষ্কার করে সাজান।

পকেট থেকে ত্রিশটি টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, মনে কিছু করবেন না, কাল সকালের বিপদ দূরে এই টাকা ক'টা রাখুন।

মেয়েটি হাসল। হাত পেতে টাকা ক'টা নিতে নিতে বললে, বিপদের জন্যেই ত টাকা।

ঠিক এই সময়…বোধ হয়, ভূত দেখলেও এতটা চমকাতাম না, ভিতরের দরজা দিয়ে সেই লোকটা—যার ভয়ে মেয়েটি আমার সাহায্য চেয়েছিল, সে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললে, তিশ টাকার বেশী ওঁর দেবার ক্ষমতা নেই এ আমি জানতাম। এর চেয়ে, সেই মেড়ো-বাবুটিকে ধরলেই ভাল করতে।

মেয়েটি হেসে বললে, তুমি থাম ত, সব দিনই কি সমান যায়।

আর শুনবার ধৈর্য ছিল না। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

অবাক হ'য়ো না বন্ধু…দেখেছ, রাতের কলকাতার নগ্ন রূপ? দিনের আলোয় যাদের পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি, তাদের এই নির্লজ্জ রাত্রিতে আর-এক মূর্তিতে দেখে শিউরে উঠেছি। এরাই রাত্রিকালের অসাধ্য সাধন করছে মানুষের প্রতিবেশী রূপে!

সেখানে রাত্রি আর রাত্রি নয়…রাত্রির সহস্র বাতি সেখানে সারারাত্রি ধরে পুড়ছে! গোলদীঘি আর ডালহাউসী কোয়ারের ক্ষুধা-মিছিল সেখানে স্তব্ধ হয়। কে বলবে মানুষ আজ খেতে পাচ্ছে না, কে বলবে তাদেরই প্রতিবেশী হয়ে উম্মত্তরা অতন্দ্র রাত্রি জাগছে!

ওরা রাত্রির উন্মাদ…রাত্রিকে ওরা বন্ধুর মত উপভোগ করে। জান বন্ধু, ওদের রাত্রি আর আমাদের দিন…পাপ আর পাপ নয়, রাতের বেসাতি দিনকে উচ্চকিত করে!

সারাদিনের ক্লান্তি…রাতে আসে ঘুম।

এই ত অবকাশ! পাপের পথে পা বাড়াবার এই ত মহা-মুহূর্ত!

একই মানুষ—তুমি আর আমি, অভিনয় করে চলেছি দিন আর রাত্রিকে ভাগ করে নিয়ে।

যে-আমি দিনের বেলায় উদ্বাস্তুর দুঃখ লাঘব করতে চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি, সেই-আমি রাতের অন্ধকারে তাদেরই মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে চড়া-দামে অজস্র বিক্রী করছি। আমিই মহা-মোহান্ত, আমিই মূর্তিমান ব্যভিচার!

আমরাই তোমরা…তোমরাই আমরা। একদল রাত জাগে, অপর দল দিন জাগে।

রাতের কলকাতা। অলি-গলির রন্ধ্রপথে ওঁৎ পেতে আছে শিকারীর দল। দানব নয়, পশু নয়…মানুষই কামড়াচ্ছে মানুষকে! রাতের আলোয় চক্ চক্ করে ওঠে তাদের লুব্ধ চোখ! এই চোখ দিয়ে তারা রাত্রি জাগে…আর সেই রাত্রিকে মুখর করে রেখেছে বাঈজীর পায়ের ঘুঙুর, সাথি সুরের সঙ্গে একঘেয়ে তবলার চাঁটি! মদ আর তখন মদ নয়, উত্তেজক দ্রাবক…টাকা আর টাকা নয়, কাঙালের উন্মাদ উৎসব!

তুমি শোন বন্ধু বাস্তহারার কান্না, আমি শুনি মদির-রাত্রির মত্ত উল্লাস। কুবেরের ধন ধূলায় লুটিয়ে যায় এক নিমেষের প্রমোদে!

লুটের রাত্রি…মানুষ যে যা পারে লুট করে নিচ্ছে মানুষেরই হাত থেকে।

চীৎকার ওঠে—ছিনিয়ে নেওয়ার চীৎকার, আঘাত খাওয়ার চীৎকার! বীভৎস চীৎকারে রাতের পাখী ওঠে কঁকিয়ে।

দেখেছ কি বন্ধু, কোনও দিন রাতের উৎসব শেষে মদের ফেনার সঙ্গে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়তে সেই উৎসবেরই সঙ্গিনীকে?

আমি জানি বন্ধু, একদল স্ফূর্তি করে আর একদল সুযোগ খোঁজে। মদের গ্লাস তোমারই হাতে তুলে দেয় তারা—শত্রু নয়, বন্ধু।

অনিশ্চিত পরমায়ু রাত্রির প্রহর গোণে ভোর না হওয়া পর্যন্ত। রাত্রি প্রভাত হলে আনন্দ, একটা দিন তবু বাঁচলাম!

তবু এই নিরুপায় জীবন-যাত্রায় তারাই আবার আর-এক রাত্রির উৎসবের জন্তে প্রস্তুত হয়।

তবু এ উৎসব-রাত্রির শেষ নেই—
এই উৎসবেই পুড়েছে লক্ষ ধনীর লক্ষ টাকা!
ঐশ্বর্য এসে মিশেছে পথের ধূলায়—
ধূলার চিহ্ন পড়ে রইল, মুছে গেল মানুষের গরিমা!

সোনার স্বপন

শ্রীকালিদাস রায়

সোনার বাংলা সোনার স্বপন দেখলে চিরকাল।
যখ দেওয়া রয় মাটির তলে অনেক সোনার তাল।
ব্যাধের ঘরে চণ্ডী দিলেন সাত কলসী সোনা,
মূর্খ-ব্যাধের সাধ্য কি সেই, সোনার মোহর গোণা।
কাঠের সেঁউতি হলো সোনা দেবীর চরণ ছুঁয়ে,
থাকত তোমার রাজকুমারী সোনার খাটে শুয়ে।
সারা গায়ে গয়না সোনার তাহার শুক তারে
দেরি হতো পথে যেতে রাধার অভিসারে।
সোনার খাঁচায় সারিকা শুক পুষতে ঘরে ঘরে,
সোনার কমল ফুটতো তোমার মানস-সরোবরে।
জগতে তো পাই পরশ মাণিক খুঁজলে পাওয়া যেত,
নদীর জলে ফেলে দিত যে সাধু তার পেত।
মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীরা লোকালয়ে আসি
গলিয়ে তামা বানিয়ে যেত স্বর্ণ রাশি রাশি।

বনের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে কাঙালিনীর মেয়ে
হলো দেবী চৌধুরাণী সোনার কাঁড়ি পেয়ে।
স্বপ্ন দিয়ে সোনার লঙ্কা গড়েন তোমার কবি
কাঙাল ছিলেন হলেন তাতেই অতুল্য বৈভবী।
আরেক কবি ধারাগোলের অগম্য জঙ্গলে
স্বর্ণপুরীর আবিষ্কারক মহাতপের ফলে।
সোনার ফসল বহন করে সোনার তরী তাঁর
দেশে দেশে পৌঁছে দিল সুবর্ণ-ভাণ্ডার।
তুষার শৃঙ্গে দেখলে গিরির স্বর্ণ মুকুট পরা।
নদীর চড়ার বালুরাশি স্বর্ণ-কণায় ভরা।
জননীদের কোলে কোলে ছিল সোনার চাঁদ
ঘরে ঘরে ছিল তোমার স্বর্ণলতার ফাঁদ।
সোনার দোয়াত কলম ছিল তোমার ঘরে ঘরে
গুরুজনের আশীর্বাদে এবং তোমার বরে।
কোথায় গেল সে সবই কি গ্রাস করিল মাটি?
এখন কেবল পুঁথি তোমার সোনার পাথর বাটি!
এই যে সোনার হিসাব দিতে গেলাম আমি বকে
একি শুধু সোনার স্বপন মাইরালেরি চোখে?
সব সোনা কি বরণ ফুটে আকাশ জলদ তালে।
হায়রে কনক চম্পা চাঁপা-করবী সোঁদালে?
হায়রে কাঙাল দেশ!
চলছে আজো চিরকালের সেই স্বপনের দেশ।

মহানন্দা

মনোরমা সিংহ রায়

"They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude."
—Wordsworth.

কতকাল কতকাল হ'ল
তোমাকে দেখি নি আমি
মহানন্দা, হে নদী আমার !
তবু তুমি বল একবার
মনে কি পড়ে
একটুছু ছোট মেয়ে
খেলা করে
তাই এক সাথে নিয়ে
তাদের বাবার হাত ধরে
তোমার জলের ধারে গিয়ে !
রূপালি বালুর চরে বিকেল বেলায়
যখন আশ্চর্য রঙ ছড়িয়ে ছড়িয়ে
সূর্য ডুবে যায় !
সেইদিন চলে গেছে কিছু মনে নেই
সেদিনের খেলা বুঝি শেষ হয়ে গেছে সেখানেই ?

কতদিন কতকাল চলে গেছে তারপর
কত বৃষ্টি ঝরে গেছে বয়ে গেছে সময়ের ঝড়
সেদিনের সেই ছোট মেয়ে
আজ আর ছোট নেই।   তবু সেই ছুটোছুটি খেলা
তোমার রূপালি বালুর চরে
আজও মনে পড়ে।
মহানন্দা, ওগো কলস্বরা
বন্যার আঘাতে তুমি এখনও তেমনি ভয়ঙ্করা
অথবা তৃষিত মন মাতৃস্নেহে ব্যাকুল চঞ্চল
কূলে কূলে তাই বুঝি নেমে আসে ঢল
দু'বাহু বাড়িয়ে দিয়ে নিতে চাও আলিঙ্গনে ঘিরে
লালিত তোমার স্নেহে অতি দূর সে শহরটিরে
বাধা পাও কোথাও বুঝিবা অভিমানে তাই যাও ফিরে
আবার নিজের কূলে
সব ভুলে।

তুমি কি তেমনি বয়ে চল
এখনও রৌদ্রে তুমি তেমনি উজ্জ্বল
চাঁদের আলোতে ঝলোমলো !
এখনও তেমনি নৌকো চলে
মাঝি—ই-ই, মাঝি—ই-ই, পার কর
এপারে নৌকো নিয়ে এস
এপারে চেঁচিয়ে লোকে বলে ?
তোমার জলের ধার দিয়ে
কত যে গরুর গাড়ি সারি সারি থাকে যে দাঁড়িয়ে
পার হবে বলে।
ওপারেতে বটগাছ তার ছায়া
পড়ে দেখি জলে।
এমনি কত যে ছবি দাঁড়িয়ে দেখত চেয়ে
মাঝে মাঝে খেলা ভুলে
সেই ছোট মেয়ে।
বেড়াতে খেলতে যেত তোমার বালুর চরে
তুমি কি দেখেছ চেয়ে
মনে কি পড়ে ?

হয়ত দেখেছ তুমি হয়ত দেখ নি
দেখলেও হয়ত বা মনেও রাখ নি।
মহানন্দা, হে রূপালি নদী,
তোমার জলের মত বয়ে যায় কাল নিরবধি।
তবু সেই ছোট মেয়ে
সেই ছবি তার মনে আঁকা হয়ে আছে
কত রঙ দিয়ে।
ছোট মেয়ে ছোট আর নেই
তবু আজ সেই ছবিকেই
সে আজ দেখছে চেয়ে সময়ের ব্যবধান ভুলে।
মনে হয় সেই ছোট মেয়ে
খেলা করে আজও তেমনি
মহানন্দা, তোমারই কূলে।

॥ ৪ ॥

বুড়ো সেরগুন ম্যাকটেভকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে সকাল নটার কাছে ক্রীলে। ম্যাকটেভ কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে এসেছে। কিন্তু তার সন্দেহ হয় বুড়ো সেরগুন নির্ধারিত সাক্ষাতে আসবে কি না। এখন দিবারাত্র নাৎসীদের গাড়ি শহরের ভিতর দিয়ে ছুটছে। ক্রমাগত আস্তে ও জোরে 'নিপাত যাক' ধ্বনির আক্রমণ তার মাথায় যন্ত্রণা ধরিয়ে দেয়, তার বৃদ্ধ হৃদয় পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠে। সে থাকে শিবার কাছে এশ্রিথ্‌গাঞ্জার জেলে। সেখানে সে জন্মেছে এবং তার বাবাও জন্মেছে। তার ঠাকুরদা বাড়ীর পিছনে একটা মুরগীপালার উঠোন রেখেছিল। বাবার ছিল কাপড় ধার দেওয়ার কারবার। কয়েকবছর আগে, মূত্রাশয়ের রোগে আক্রান্ত হবার আগে পর্যন্ত গরু ঘোড়ার ব্যবসা ছিল তার। অসুখের ফলে জামাইএর উপর সব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সে। মাঝে মাঝে সে কিছু পুরাণো খদ্দেরের সঙ্গে ব্যবসা করে—ছোটখাট লেনদেন। এর জন্য এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে হ'ত না তাকে। বৃষ্টির মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও হয় না। এ ব্যবসায় লাভ তাকে অপরিমেয় আনন্দ দেয়, যেন তা দিয়ে সে মৃত্যুকে ঘুষ দিতে পারবে, কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে দিতে পারবে তাকে। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকেই মৃত্যুকে সে জয় করতে শুরু করেছিল। সিক্ত হয়ে কফি খেতে থাকে সে, কারণ বুঝতে পারে বৃথাই কফির অর্ডার দিয়েছে।

বাজারের অপরদিকে অবিরত উত্তেজনাপূর্ণ কোলাহল তার সঙ্গে লেন-দেন সম্পূর্ণ করা থেকে বুড়ো সেরগুনকে বিরত রাখবে। দুপুর বেলায় নিরাশ মনে বাড়ী ফিরতে হবে তাকে। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করবে, আবারও কিছু হ'ল না? তাকে জবাব দিতে হবে, সে এল না পর্যন্ত।

বুড়ো ম্যাকটেভ কফিখানার বিরাট ঘরটার পিছনে বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে বসেছিল। সে একবার জানলার নীচে রাস্তার দিকে চায়, আর একবার বাজারের মুখোমুখি সামনের ঘরের খোলা দরজার ভিতর দিয়ে মার্বেলপাতা টেবিলগুলোর দিকে তাকায়। সকাল সকাল হ'লেও কয়েক কুড়ি চাষী ও কারবারী খদ্দের মদ ও কফি খাবার জন্য ইতিমধ্যেই এখানে জুটেছে। চারজন লালমুখো নাৎসী তরুণ কাঁচের বড় জানলার কাছে বসে খোশমেজাজে বাদাম চিবোচ্ছিল। বিপুল বিস্ময় ও সন্দেহ নিয়ে ম্যাকটেভ দেখছিল তাদের দৃঢ় পিতৃহনন্ত মুখ।

ক্রমে ক্রমে বাজারটা মানুষ ও গরু ঘোড়ায় ভর্তি হ'তে লাগল। দু'ঘণ্টা আগে তার জামাই হাইনরিশ এলটার বাজারে যাবার জন্য বাড়ী ছেড়ে আসতে চেয়েছিল। বাজারে ঢোকবার মুখে কয়েকটা ছেলে তাকে ধাক্কা মারে। ওই ছেলেরাই হাতে ইস্তাহার বিলি করেছে। নির্বাচন, পাসের সরকার ও নাৎসীদের দাবি-সংক্রান্ত রোজকার ইস্তাহার-গুলোর মধ্যে অন্য একটা ইস্তাহার ছিল ছোট, হলদে রঙের, সেটা বিশেষ করে আজকের দিনটার জন্য লেখা। যে চাষীরা গরু ঘোড়া নিয়ে শহরে আসছে এই ইস্তাহারে তাদের ইহুদীদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কাদায় ভেজা, পায়ে মাড়ানো কিংবা দুমড়োনো যে অবস্থাতেই ইস্তাহারগুলো ফুটপাথে পড়ে থাকুক ম্যাকটেভ সেগুলোকে ঠিকই চিনতে পেরেছে।

হোয়া হোয়া আওয়াজ এবং চকম চাবুকের সপ সপ শব্দে তাড়িত পশুগুলোর লোমাবৃত পাটল পিঠগুলো বাজারের গলি দিয়ে হু হু করে ঢুকতে থাকে। বাজারের দিককার খোলা নীচু জানলা দিয়ে তাকিয়ে সেরগুনকে খুঁজতে গিয়ে ম্যাকটেভ কেবল পশুগুলোর চোখের বিস্মিত দ্যুতি ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। সে প্রায় তাদের গরম ভারী নিঃশ্বাস মুখের উপরে অনুভব

করে। গলিটার দু'পাশের বাড়ীগুলো দূর এবং সাম্প্রতিককালে পড়া গোবরের গন্ধে ভরে গিয়েছে। বুড়ো অশ্বগুলোর খটাখট শব্দ এবং বাচ্চাগুলোর পরস্পরের ঘাড়ে এসে পড়ার শব্দ বাড়ীগুলোর ভিতর পর্যন্ত শোনা যায়। বাজার এলাকাটা ইতিমধ্যে ঝিকমিকে ভাজগোল পাকান ছোট ছোট স্তূপে বাদামী রং ধারণ করেছে। এখানে-ওখানে শুধু কর্দম এবং চাষীর টুপি উঁকি দিচ্ছে। বুড়ো মাকটেলের চোখে পড়ে যে জায়গাটায় তার জামাই সাধারণতঃ দাঁড়ায় সেটা আজ ফাঁকা। ব্যবসায়ীরা এ জায়গাটার নাম দিয়েছিল 'দ্বীপ', কিন্তু বাস্তবিক এটা কর্দমের চারপাশ ঘিরে একটা পিচের চৌখুপীমাত্র।

হঠাৎ চমকে ওঠে মাকটেল। এন্টার দোকান থেকে বেরিয়ে এল, বিলিয়ার্ডের ঘরে ঢুকল। যথারীতি সে তার দাগলাগা বর্ষাতিটা পরে ছিল, যেটা সে সকল ঋতুতেই পরত।

"সুপ্রভাত, বাবা।"

"শেষ পর্যন্ত তুমি এসে পড়লে?" জিজ্ঞাসা করে মাকটেল।

"নাঃ, কেবল দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখব আর কি।" জবাব দেয় এন্টার।

"যা হোক একটা কিছু করতে পারতে ব'লে মনে হয় না?"

"নির্বাচনের আগে?—না। সে রকম মনে হয় না।" সে কথি জানতে বলে, কিন্তু বলে না। তার বদলে ভিতরের দরজা দিয়ে এগিয়ে যায় এবং একটা সিগারেট ধরায়। সে ছিল মোটা ও স্বাস্থ্যবান। তার ঘন তেল-তেলে চুলে পাশের দিকে সিঁথি করা। মুখে বিচলিত হবার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। তার জলজলে পাটল চোখ দুটো সেই দিকেই তাকায়, যে দিকে একটু আগে চেয়েছিল তার শ্বশুর। তার একটা অনুভূতি হয় যেন সে ওখানে যেতে পারলেই সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে। বোধ হয় তার পুরাণো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে কারবার আবার আগের মতই চলবে। মনটা তার একবার এদিকে, একবার ওদিকে ঘুরতে থাকে, শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্তে আসে: না, না যাওয়াই ভাল। সে বলতে যাচ্ছিল এমন সময় কয়েকটা টেবিলের ওপার থেকে কে যেন ডেকে ওঠে,

"হেই এন্টার!" যে ডাকল সেও একজন ব্যবসায়ী, ছোট্ট দেখতে, মাথাজোড়া টাক, তারও বর্ষাতি গায়ে, "অপেক্ষা করছ কি জন্যে?"

এন্টার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেখিয়ে দেয় বাদাম খাওয়ায় ব্যস্ত ছেলেগুলোর দিকে। অন্য লোকটাও কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেয় এবং মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়। খানিক পরে সে দুজন বেঁটে মত চাষীকে নিয়ে ফিরে আসে, দেখতে তাদের একরকম, বোঝাই যাচ্ছে বাবা আর ছেলে।

"এরা কি বেচতে চায়।"

দুজন চাষী একসাথে বলে ওঠে, "হেডি, দেরি করছ কেন? আমরা যে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এবার চলে এস।"

এন্টার বলে, "এখন যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।"

টেবিলে বসে থাকা লোকগুলো কান খাড়া করে।

"যাবার করে নিয়ে যেতে হবে, বেশ, বেশ, বেশ।"

"বাবকে একেবারে অস্থির।"

এন্টার আবার জোরে জোরে বলে, "স্বপ্নেও ভাবা যায় না।" চাষী দুজন হতভম্বভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে বেরিয়ে যায়।

বুড়ো মাকটেল চেঁচিয়ে ওঠে "বল না কেন তুমি।"

কিন্তু এন্টার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাষীদের দেখতে থাকে। তারা সবাই ফিরে আসে, সঙ্গে আনে একজন বুড়ো, বিরাট লম্বা চাষীকে। "এও অপেক্ষা করছে।" বুড়ো চাষীর চেহারা অনেকটা আজগাইয়াদের মত, আর বাস্তবিক তার ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকমই। ওর নাম ধুয়েনার হার্টবের্গ। এন্টারের সঙ্গে আগেকার কথা মত সে আজ বাজারে এনেছে তার সবচাইতে ভাল গরু তিনটি নিয়ে। এই গরুগুলোকে বিক্রি করতে পারার উপর তার দেনা শোধ নির্ভর করছে। কিন্তু যদি এই লেন-দেন সে ঠিকমত চালাতেও পারে তবু তার মানে কেবল জিনিসপত্র ক্রোককে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা। কারণ পাঁচটা গরু নিয়ে যে ভাবে সে চাষবাস করত সে ভাবে চাষ করা আর অসম্ভব হয়ে পড়বে তার পক্ষে। সর্বনাশের আশংকা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কথা বলে বলে গলা ভেঙে ফেলবার সুযোগ জোটবার আগে থেকেই তার মুখের

ভিতর এবং গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। এই বিক্রি তার কাছে একটা জরুরী ব্যাপার বলেই সে চাইছিল এখুনি কাজে হাত দিতে। তার ধারণা ছিল অন্ততঃ আধদিন লাগবে এর জন্যে।

মুয়েলার হার্টবের্গ একটা গোলাঘর তৈরীর জন্য তার ভগ্নীপতি কারেলের মুরেকের কাছে টাকা ধার করেছিল। বিয়ের আগে ও পরে এই মুরেকই ছিল তার একমাত্র বন্ধু। কিন্তু গেল দু'বছরে মুরেকের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হয়ে পড়েছে, সম্প্রতি সে টাকাটা শোধ চেয়েছে। সে বলেছে তা নইলে তাকে খামার সম্পত্তি ক্রোক করতে হবে, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সম্পত্তি ক্রোক না করতে পারলেই তার হয়। বন্ধুতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বেও যে ছেদ প'ড়ে গেল এ কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে হার্টবের্গ মুয়েলার। কাজের শেষে সে টুল নিয়ে গোয়ালে বসে থাকে, গোয়াল ত শীগগিরই খালি হয়ে যাবে। কারও সঙ্গে কথা বলে না। আজকের জন্যই গোলমাল এবং কথাবার্তার যা কিছু শক্তি সে নিজের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। কাল যে ক'টা মার্ক তার ভগ্নীপতিকে ফেরৎ দিতে হবে তার প্রত্যেকটার জন্য সে এলস্টারের গলা কাটতে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। দু'তিন বার হলদে ইস্তাহার তার হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষা করার সময়টাতে তার মনে ভাসছিল তার ভগ্নীপতির পরিচিত বেদনাদায়ক মুখখানা খোঁচা খোঁচা হাল্কা রঙের গোঁফ—ঘৃণা করা মুস্কিল। ইস্তাহারে ছাপা বর্ষাতি পরা অপরিচিত লোকটার মুখকে ছাপিয়ে উঠছিল ভগ্নীপতির চেহারা। মুয়েলার হার্টবের্গ শেষ মুহূর্তে ভিতরের দরজার কাছে তাকে দেখতে পেয়ে হেঁকে ওঠে, "হেই এলস্টার, এই যে আমি!"

"দেখতে পাচ্ছি", জায়গা থেকে না নড়ে জবাব দেয় এলস্টার, "তুমি যে এসেছ তা দেখতে পাচ্ছি, আমি কিন্তু আসি নি তা ব'লে! বুঝতে পারছ?"

এবার টেবিলগুলোর ভিতর দিয়ে জায়গা করে নিয়ে মুয়েলার তার দিকে এগিয়ে আসে। অন্যান্য লোকে যখন ডেকেছিল তখন টেবিলে বসা লোকগুলো নজর দেয় নি। কিন্তু এর ডাকে সকলে ঘাড় ফেরায়। পাইপ হাতে একটা ছেলে সেই মুহূর্তে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে তাড়াতাড়ি খুঁটিতে দড়িগুলো জড়িয়ে গরুগুলোকে পিছনে টেনে রাখে। মুয়েলার হার্টবের্গ এলস্টারের জামার একটা বোতাম পাকড়ায় এবং বলে, "আমি তিন তিনটে জানোয়ার নিয়ে এসেছি, আমাদের আগে থেকে কথা হয়ে আছে।"

এলস্টার বলে, "আজ করতে পারব না।" অপর লোকটার দিকে সে শান্তভাবে তাকায়, উত্তেজিত চাষীদের নিয়ে কাজ করবার অভ্যাস আছে তার। এই চাউনি মুয়েলার হার্টবের্গকে আগুন করে দেয়, সে আত্মহারা হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন আগুনলাগা ঘরের ভিতের খড়ের চাপড়ার মত চৌচির হয়ে যাচ্ছে তার কপালটা। তার জঘন্য দুর্ভাগ্যকে যেন সে চোখের উপর দেখতে পায়। এই অবস্থায় কেউ ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না। এলস্টারের হাতখানা পাকড়ে ধরে বলে, "এখন আর অন্য কোথাও বেচা আমার পক্ষে অসম্ভব। দুপুরের মধ্যে আমায় ফিরতে হবে। আসতেই হবে তোমাকে।"

এলস্টার বলে, "সাধ্যেরও অতীত, ভাবাই যায় না। অন্য কাউকে বের কর।"

মুয়েলার তার হাত ছেড়ে দেয়। এদিকে-ওদিকে চেয়ে তার নজর পড়ে পাইপ হাতে সেই ছেলেটার দিকে। হঠাৎ সে ডেকে ওঠে, "মার্টিন!" ছেলেটা দড়িগুলো অন্য একজনের হাতে দিয়ে ছুটে আসে, "ব্যাপার কি? শান্ত হও। ইহুদীটার সঙ্গে কি দরকার?"

"ও আসবে না!"

তারা দুজনে মিলে এলস্টারের হাত পাকড়ে ধরে। বেঁটে কিমাদ ব্যবসায়ী চেঁচিয়ে ওঠে, "এলস্টার! এলস্টার!" এবার সেই একরকম দেখতে চাষী দুজন ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। "ওকে আসতেই হবে! আসতেই হবে!" মুয়েলার এলস্টারকে পাকড়ায়, তার দু'পর্দা জামার ভাঁজ দিয়ে হাতখানাকে অনুভব করে। মুখটা তার বদলে যায়। প্রাণটা গলায় উঠে এলে যে রকম হয় যেন সেই রকম। মার্টিন হাসে এবং হাঁটুর জোড়ের উপর লাথি লাগায় এলস্টারকে, "নোংরা ইহুদী, চিৎপাত যাও!"

এলস্টার ভাবতে থাকে। তার শান্ত পাটকিলে চোখের ভাবটা উত্তেজনা নয়, যেন একটা বর্ম। হাতে এঁটে বসা আঙুলগুলোকে, হাঁটুর জোড়ে লাথা লাথিকে অনুভব করে সে। শান্তভাবে চারপাশে চেয়ে—দেখে হাজার জনেও

এরা কিছুই নয়, এরা এসেছে ব্যবসা করতে, জোতা আছে জোয়ালের অন্তপ্রান্তে। চাষীরাও পাল্টে তার দিকে চায়, হাজার হলেও এ লোকটা কিছু নয়, এও জোয়ালের অপর প্রান্তে জোতা। এলস্টার চিন্তাকুলভাবে বলে, "বেশ, তা হ'লে আর কাউকে খোঁজ তোমরা।" আশা করে তারা শুনবে?

ইতিমধ্যে একপাল লোক ওদের ঘিরে ধরেছে। এবার মুরেনার হার্টবের্গ চীৎকার করে ওঠে, "তুমি জানবে, কি না?"

এলস্টার শান্তভাবে তার দিকে চায়—অবজ্ঞার সঙ্গে নয়, কিন্তু হয়ত একটু বেশী শান্তভাবে। অথবা হয়ত চাঞ্চল্যের লক্ষণ বলে মনে হতে পারে এমন কোনও খাঁজ পড়ে নি তার গোলগাল মুখে। এলস্টারের চিবুকের নীচে হাতের মুঠোটা ঠেকায় মুরেনার, এলস্টারের মনে হয় যেন একটা ধারাল নখ দিয়ে চিরে গেল। তরুণ চাষীটি কিন্তু মুরেনারের হাতটা এক ধাক্কায় সরিয়ে দেয়। "নিজের সর্বনাশ করতে চাও নাকি?" মুরেনারের মুঠোটা চাপ দিয়ে খুলে ফেলে ছুরিটা বের করে সে তার বাবার হাতে দেয়। "মরতে যাবার মতলব না কি লোকটার?" গভীর বিস্ময়ে তারা পরস্পরের দিকে চায়।

এলস্টার চিবুকে হাতটা ছুঁইয়ে বর্ষাতির উপর আঙুল ঠেকায়। ঘোড়া হঠাৎ লাথি ছুঁড়লে লোকে তার দিকে যে ভাবে তাকায় সেইরকম হতভম্বভাবে সে হার্টবের্গ মুরেনারকে দেখে। মুরেনারের মুখে যে হুমকির ভাব ছিল ইতিমধ্যেই তা গভীর যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। হারাণো বন্ধু ভগ্নীপতির রোগা চটপটে চেহারাটা যেন গোটা অজস্র এলস্টারের সামনে ভেসে ভেসে উঠতে থাকে। এলস্টারের চিবুকের নীচেকার কাটাটা ইতিমধ্যে দাড়ি কামানোর সময়ে সামান্য ছড়ে যাওয়ার সামিল হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তার বর্ষাতির উপরের দাগটা আর পাঁচটা দাগের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। ইউনিফর্ম-পরা সেই চারটে ছোকরা এদিকে টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে চীৎকার জুড়েছে "বেরোও বেরোও বেরোও ছোড়া নোয়াও।" কিন্তু তাদের যাদের জন্য লাথি ছোড়া তাদের পেছনে পা যাচ্ছে মোটেই লাগছে না। পাইপ-ওয়ালা ছেলেটা এবং বিকলাঙ্গ ব্যবসায়ীটা ইতিমধ্যে এলস্টারের হাত দুটো পাকড়েছে, মাতাল-টাকা হয়ে যে[...] বাধা দিচ্ছে না এলস্টার। বিভিন্ন খদ্দেরের মধ্যে বাদা[...] এবং বিচিত্র রঙের পতঙ্গগুলোর মৃদু ঠেলাঠেলির মধ্যে চ্যাপ্টা টুপি আঁটা এলস্টারের মাথাটা এবং মস্ত কানাওয়ালা টুপির তলায় মুরেনার হার্টবের্গের মাথাটা ওঠাপড়া করতে থাকে।

শত্রুর কথা একেবারেই ভুলে গেছে সে। বুড়ো মার্কটেন বিলিয়ার্ডের ঘরে ব'সে কাঁপতে থাকে, মুখখান[...] হলদে হয়ে যায়। সে জামাইয়ের পরিচিত চওড়া পিঠখানা এবং মুরেনার হার্টবের্গের মুখের পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিল। এলস্টারকে ঠিক সে ভালবাসত বলা যায় না, কিন্তু তাকে চিনত ভাল করে। ওর বাপটাও ভাল করে জানা ছিল তার—খোলা উঠোনের উপর ভিজতে ব[...] এককালে মুরগী পালা হ'ত যে সব খাঁচায় সেগুলো খালি পড়ে আছে উঠোনে। আর চিনত তার স্ত্রীকে—নিজেরই মেয়ে, অনেকটা ছেলেমানুষের মত, রুগ্ন, তার আবা[র] রক্তশূন্যতায় ভুগে ভুগে ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে। তবু মার্কটেন তাকে প্রবলভাবে ভালবাসত। জানত তার নাতনীকে রোগা হাত পা, কালো চোখ, প্রায় হুবহু মায়ের মত, রু[গ্ন] এবং মেজাজী মেয়ে। ছুরিটা যখন মুরেনার হার্টবের্গের হাত মুচড়ে বের করা হ'ল শুধু সেই একটি মুহূর্তের জ[ন্য] বিস্ময়ের একটা ছায়া খেলে গিয়েছিল এই ভেবে যে, এই লোকটারও কি ঘরবাড়ী, স্ত্রীপুত্র নেই। উঠে পড়ে আসন ছাড়ে মার্কটেন। নীচের দিকে চেয়ে দ্বীপটাকে দেখতে থাকে সে। মনটা ভারী হয়ে থাকে, প্রতিটি ছেলেকে ভয় করে সে মৃত্যুর কথা ভাবে, যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যু এসে পড়তে পারে, যেমন এই মুহূর্তে—কাঁচা সবুজ বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপার থেকে কাচের দরজা দিয়ে। হঠাৎ জানলায় করাঘাত শোনা যায়। মার্কটেন ফিরে তাকায়। ভাঁজ-দেওয়া তাল পাতার টুপি মাথায় দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো নেরথন॥

বুড়ো নেরথন তাড়াতাড়ি চৌপুনী পার হয়ে ঘরে ঢোকে। তার পরনে শহরের উপযোগী ভাল পোশাক, হাতে রূপো বাঁধান ছড়ি। কোনও কারণে আটকে গিয়েছিল সে; সেও ইস্তাহারগুলো পড়েছে, কিন্তু সেগুলো তার মনে কোনও দাগ কাটে নি। মার্কটেনের সঙ্গে ব্যবসায়ের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে সে অভ্যস্ত। নতুন পার্টি[...]

এসে গির্জেয় যেতে যেমন খারাপ লাগে, এই সব লোকদের সঙ্গে আর কাউকে খুঁজে বের করতে তেমনই খারাপ লাগে তার।

তারা পরস্পরের দাড়ির দিকে চেয়ে থাকে। তাদের শেষ সাক্ষাতের পর থেকে যে ক'টা একটু বয়সে ধরা রঙের ছিল সেগুলোও সাদা হয়ে গেছে। মেরহনএর দাড়ি ছিল শক্ত এবং জমাটবাঁধা, মাকটেলের ভলো আলগা এবং ছাড়া ছাড়া। বুড়ো মেরহন মুখ খোলবার সঙ্গে সঙ্গে মাকটেল সব বুঝে নেয়। ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগে সম্পত্তির বন্দোবস্ত করার ইচ্ছা মেরহনএর। মাকটেল মনে মনে একটা ধাক্কা খায়, মেরহন-এর পরিস্থিতি সে যা ভেবেছিল তার চেয়ে খারাপ। তার মত বুড়ো মেরহন বিশেষ উদ্বিগ্ন নয়, আয়-ব্যয়ের সমতা রাখতে পারলেই হ'ল, বেঁচে থাকলেই হ'ল। নিজের জীবন আর বেশীদিন থাকবে বলে তার মনে হয় না—বড় জোর পাঁচ-ছ' বছর। তার বাবা ও ঠাকুর্দারও ছিল মোটার ধাত। মৃত্যু এসেছিল আকস্মিকভাবে, হা-হুতাশ করতে করতে যেতে হয় নি। ঠিক হ'ল যে মাকটেল বাড়ীটার জন্য একটা খদ্দের খুঁজবে। আগামী বাজারবারে তারা এই একই জায়গায় দেখা করবে। মাকটেলের সামনে এল এক সপ্তাহের ছুটোছুটি, আলাপ-আলোচনা, দর কষাকষি। সে আনন্দিত হ'ল, মনে হ'ল যেন কেবল কাজকর্মের মধ্যে আরও বাঁচবার মত কিছু পাওয়া গেল.

বুড়ো মাকটেল মরিয়া হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তার ভাগ্যে যে সব কিছুই খারাপের দিকে চলেছে তাতে আশ্চর্য হয় নি সে। তার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে সব লোকই খারাপ। বুড়ো মেরহন, সে মা কি সব কিছু সত্বেও এসেছিল এবং তার সঙ্গে এক টেবিলে বসেছিল, তাকে ব্যতিক্রম মনে হয়, মনে হয় তার বিচার এবং দয়া আছে।

॥ ৫ ॥

হাতে আর একটা টান পড়ল, সূর্য এবং জলকে ঢেকে রয়েছে যে নলখল তার মধ্যে ভেসে গেল নৌকোটা। নল-খাগড়ার পটপট শব্দে জোহানের মনটা পুলকিত হয়ে উঠল। মারি বেঞ্চি থেকে গড়িয়ে ছেঁড়া মাদুর বিছানো নৌকোর মেঝেতে পড়ল। তার পরনে ছিল একটা পুরোনো নীল রঙের পোশাক, তার আবার বগলের কাছে ছেঁড়া। মোটা মোজাগুলো গুটিয়ে নীচের দিকে নামান, নীল পোশাকের তলায় তার পেটিকোট এবং গোলগাল পালিশ পা দুখানা, চটিরেরই সাদা, তাজা চেহারা। সতর্কভাবে পাশ ফেরে জোহান। মারির পোশাকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে সে হৃৎপিণ্ডের জায়গাটা খোঁজে, তারপর হাতখানা সেখানেই রেখে দেয়। এ বেশ চমৎকার। সে ভাবতে থাকে কখনও কখনও কোন অদ্ভুত গভীরতা। হয়ত অনেক বেশী থাকে, টেঁকেও হয়ত অনেকদিন, কিন্তু সে হয়ত এর অর্থেকও ভাল হয় না। অচেনা লোক সম্বন্ধে মানুষ যে ভাবে চিন্তা করে সেই ভাবেই ভাবতে থাকে জোহান। যদি আমি কখনও বিয়ে করি তবে এমনি মেয়েই আমার চাই। যদি আমার কখনও ছেলে হয় তবে এমনি বুকই তার পক্ষে ভাল। হেসে ফেলে আবার সে ভাবে: এই ত, এবার আমি ঠিক কাঠের খাঁচার বিকলাঙ্গের মত ছেলের কথা ভাবছি। মারি জিজ্ঞাসা করে, "হাসির কি হ'ল?"

"এখান থেকে তোমায় এমন মজার দেখাচ্ছে—তোমার মাথাটা আর থুতনিটা।" জবাব দেয় জোহান।

কিছুক্ষণ পরে তারা নৌকো বেয়ে নদখল পার হয়ে যায়, একটা জেটির গায়ে নৌকো বাঁধে। তারপর হাঁচোড়-পাঁচোড় ক'রে বন পার হয়ে তারা রাস্তায় পৌঁছায়। মারি জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি এখন অনেকদিন বাপ্টিস্টদের সঙ্গে থাকবে?"

"আমি? বলতে পারি নে।"

"হয়ত আমার বাবা আমাদের বিষয়ে কিছু লক্ষ্য করে থাকবে। তোমার দিকে সেব কি রকম অদ্ভুতভাবে তাকায়। তোমার মনে হয় নি?"—বলতে থাকে মারি।

"আমি লক্ষ্য করি নি। যাকগে, তাতে কিছু আসে যাচ্ছে না।"

"আসে যায় বৈকি।"

বন থেকে বেরিয়ে এসেছিল ওরা। জোহান বলে, "ভাল হবে যদি তুমি খালের পারে অপেক্ষা কর, সেই যে যেখানে আগে একবার আমরা বসেছিলাম। আমার কাস্টিংলিউটদের কাছে যেতে হবে, তারপর আর এক জায়গায়, তারপর এসে আমি তোমায় নিয়ে যাব।"

"এই রকম পোশাক পরে ত আমি যেতে পারি নে।"

"নয় কেন? কেউ লক্ষ্য করবে না।"

"বার্টিয়ান কি ক্যাসিংসিউতের কিস্তি শোধ দিতে পারবে? কি ক'রে জোগাড় করবে?"

"মনে হয় না জোগাড় করতে পারবে।"

হাঁটতে হাঁটতে মাথা থেকে কাঁটাগুলো তুলে দাঁতে কামড়ে রাখে মারি। বিনুনিগুলো ফের ভাল করে বাঁধে। তারপর বলে, "কি বোকার মত কাণ্ড! ওই রকম একটা পাম্প, এত পয়সাকড়ির ব্যাপার!"

"তোমার জন্তে।"

"তোমার জন্তে? জল বইতে গিয়ে আমার ত কষ্ট হয় না, তার হবে কেন?"

"তা তোমার মধ্যে ওর মত ডিসটে ধরে যাবে।"

"তা বটে, ও যদি খরগোশও হ'ত তা হ'লেও মোটা খরগোশ বলা যেত না। তা যদি শক্তও না হ'তে পার, মানে আজকালকার দিনে যা অবস্থা তাতে যদি শক্তি না থাকে তবে মাটির উপরে না থেকে তলার চাপা পড়তে হবে। তা হ'লে আর মাটির উপরকার কোনও কিছুতে গিয়ে লাভ নেই।"

"কিন্তু তার হাতের কাজ ভাল। হাত ভাল তোমার। আমার জ্যাকেটটাকে ত প্রায় একটা শিল্পকর্ম দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।"

"মনে হচ্ছে ওই তোমার প্রেমে পড়ে গেছ তুমি।"

"হাত ভাল বললেই দশ বছরের ছোট্ট মেয়ের কিছু একটা প্রেমে পড়ে যাওয়া বোঝায় না।"

"অন্ত বার্টিয়ানদের বিয়ে সম্পর্কে বার্টিয়ানরা কি বলছে?"

"তারা আবার কি বলবে? তোমার নেমন্তন্ন করেছে না কি?"

"আমাদের কারও নেমন্তন্ন হয় নি। জোর একটা বিয়ে হবে আর কি!" জোহান যে ইতিমধ্যে গভীর চাঞ্চল্যে অভিভূত হয়েছে এবং তার গলার স্বরটা ছাড়া আর কিছুই তার কানে যাচ্ছে না সে সব লক্ষ্য না করেই মারি কথা বলে চলে। "বিয়ে বটে! আবহাওয়া ভাল থাকলে মাঠের উপর লম্বা লম্বা বেঞ্চি পড়বে। মেলা খাওয়া-দাওয়া হবে—বাদামওয়ালা কেক এবং কফি—তারপরও আবার খাওয়া। সাধারণতঃ বুড়ো মেরংস বেশ কৃপণ, কিন্তু গোটা বছরের খাবারটা ওরা বিয়েতে খরচ করবে। না, বিয়েতে আমাদের নেমন্তন্ন নেই।"

সরাই-এর সামনের ছোট্ট বাগানে ঢোকে ওরা। সেল-বারের মতই খালি। জোহান আর বসেও না, শুধু মারির জন্ত থামতে বলে। "অপেক্ষা কর, আমি ফিরে এসে তোমায় নিয়ে যাব পরে।" মারি তার দিকে চেয়ে থাকে, পুলের উপর দিয়ে তাকে দৌড়তে দেখে। পুলক এবং গভীর প্রশান্তির সেই ছাপ মুছে গেছে মারির মুখ থেকে। এখন সে ক্লান্ত ও চিন্তিত বোধ করে। এখনও কোনও সাগসই চাকরি জোটে নি তার। গ্রামের শীত জোহান থাকলে এবং না থাকলে দুই স্বতন্ত্র জিনিস। জোহান কিছু চিরকাল বার্টিয়ানদের সঙ্গে মরে যেতে পারে না, আর তার মা-বাবারও বাড়তি ঘর নেই। আজ হোক, কাল হোক, বীট এবং আলু উঠে গেলে তাদের দুজনকেই শহরে ফিরে যেতে হবে।

ঠিক সেলবারের মতই জুতোর কালির কারখানা থেকে হাঁটতে হাঁটতে কিছু মজুর ঢুকল। পোশাকের জোড়াটা ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে বিব্রত বোধ করতে থাকে মারি, হাতখানা গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে রাখে। বাবার কথা ভাবে সে। এখানে বসে পুরুষ বন্ধুর জন্ত অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ তার বুড়োর কথা মনে পড়ে, বোধ হয় যুবকটি চলে গিয়েছে বলেই। পরিবারের মধ্যে, হয়ত বা সমস্ত গ্রামের মধ্যে, সে একাই তার বাবার চোখের ভাষা বুঝতে পারে। তার লোমশ অদ্ভুত মুখে এক লুকানো আলো দেখতে পায়। ওর প্রেমের ব্যাপার হয়ত সে জানে, কিন্তু গোলমাল করতে চায় না। সম্প্রতি বুড়ো মানুষটার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। এক এক সময় সে তার মাকে বলে, "বকে চলেছ কেন? কেউ তোমার কথা শুনতে পায় না।" আর পাউলকে বলে, "যদি মনে করে থাক গায়ের জোরে পরিবর্তন করবে তা হ'লে আমি তাতে বিশ্বাস করি নে।" তাকে বলে, "মেরংস এবং বার্টিয়ানরা তাদের মেয়েদের জন্ত যৌতুক দিচ্ছে, আমি তা পারব না। সেই '২৩ সালেই আমি তোমার জন্তে চাদর কিনে রাখতে পারি নি। কখনও হাতে টাকা থাকত না। যুদ্ধের সময়েও টাকা করতে পারি নি। তুমি বরং আর একটা বাপের খোঁজ কর।"

ওপাশের টেবিলের কতকগুলো ছোকরা সেলবারের থেকে মারিকে নজর রেখেছিল। তারা ডেকে ওঠে, "ও

থেকে, একা বসে? সঙ্গ চাই যে তোমার?" মারি মাথা নাড়ে ও হাসে।

হৈমন্তী সন্ধ্যার মায়ায় মাছিখালের কিনারের ঝাঁটাটাও দীপ্তিমান হয়ে ওঠে, খাদ থেকে একদল পাখি ঝটপটিয়ে বেরিয়ে আসে, খালের উপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে দু'ভাগ হয়ে যায়। একদল নামে কারখানার ছাদে, আর একদল জলের গায়ে ঝিকমিক করা তেলের উপর। মারি শিউরে ওঠে। হঠাৎ সে নিশ্চিত হয় যে জোহান আর তাকে নিতে ফিরবে না। বেদনাবোধকে দমন ক'রে সে যত তাড়াতাড়ি পারে দৌড়ে বাড়ী ফিরে যায়।

॥ ৬ ॥

জোহান মারির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। কিস্তির দ্বিতীয় অংশ নিয়ে সে কাস্টিংসিণ্ডিকেটের ওখানে গিয়েছিল। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল এর পরের কিস্তির কি হবে? সে জবাব দিয়েছিল যে সে বিষয়ে কিছুই তার জানা নেই, তবে তাদের টাকা তারা পাবে নিশ্চয়ই। তারপর সে ছুটে গিয়েছিল তোজক্-এর মেরামতির দোকানে। সেখানে বাচ্চারা নেচে বেড়াচ্ছে, বড়গুলো গাচ্ছে সাইকেলের ঘন্টা বাজাচ্ছে। তোজক্-এর ঝালাইকরার উনুনের উপর না-ঢাকা বাল্বের চোখধাঁধান আলো জ্বলছে। তোজকের স্ত্রী এবং আর একজন অপরিচিত মহিলা যে টেবিলে কাজ করছে তার উপরও সেই আলো পড়ছে। জোহান জিজ্ঞাসা করে, "মেভেল কোথায়?" রান্নাঘরের দরজাটা দেখিয়ে তোজক্ বলে, "বেশী দূর নয়,—ওই ত তার স্ত্রী, আর এগুলো তার ছেলেপিলে" ফের ঝালাইয়ের চুল্লীর কাছে ফিরে যায় সে।

ফ্রাউ মেভেল বলে, "তুমিই তা হ'লে জোহান?"

সে হাতে হাত মেলায়। এরকম গভীর অন্তর্ভেদী ...এর আগে কোনও মেয়ের চোখে দেখে নি জোহান। ...র চোখধাঁধান আলোয় তার মুখখানাকে মনে হয় যেন ...উড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, মনে হয় যেন সে আহত, তার ...র কালো চোখ দুটোই কেমন অদ্ভুত হয়ে গেছে। সে ..., "মেভেল আবার জেলে উঠেছে। আমাদের বাড়ীতে ... এখানে প্রায়ই পুলিশ আসে। তারা তাদের আদক-...রা বসার রেখেছে। তারা ওদের খানাতল্লাসী করে নি, চালিয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমার স্বামীকে যে ছুরি দিয়ে মারা হয়েছে তার খোঁজ করছ নাকি তোমরা?—জোহান, তুমি বরং এবার ফিরে যাও।"

জোহান বলে, "এখন, এক্ষুণি? আমারও অবস্থা কাহিল, সব সময়ে একা; আমার আর সহ্য হচ্ছে না।"

"দেখ, এখনও ঢের পড়ে আছে সহ্য করবার। তোমার বয়স কম। তুমি শুরুই করেছিলে পাগলের মত, পাগলার মত ছুরি মেরেছিলে। এবার চেষ্টা করে একটু শান্ত হও। কিছু শেখ।"

তখন জোহান চিৎকার করতে শুরু করে, "শান্ত হও, শান্ত হও, তোমরা কেবল বল শান্ত হও।"

চুল্লীর কাছ থেকে তোজক্ বলে, "তা কার উপর রাগ করছ তুমি?"

"কার উপর, কার উপর, কার উপর? আমি যে রকম একা সেই রকম থেকে তুমি রাগ না করার চেষ্টা ক'রে দেখ। চিরকাল আমি এমনি একা। আমার মত মাথা পর্যন্ত পাঁকে ডুবে থাকতে! এই প্রাণে সম্পূর্ণ একা! দেখ তুমি অত পথ কেবল বেড়ে যাচ্ছে, তার'পর রাগ না করার চেষ্টা করে দেখ।"

"কার উপর রাগ দেখাচ্ছ বল দেখি?"

এবার গ্যাসের আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে ওর কাছে উঠে আসে তোজক। তারপরই রাজ্যের জিনিসে হাত দেবার জন্য সে মেভেলের বাচ্চাগুলোকে বকুনি দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই মনটা খারাপ লাগে তার। ওদের প্রত্যেককে সে পুরাণ সাইকেলের একটা ক'রে ছোট্ট সবুজ বাতি দেয়। জোহানকে দেখে মনে হয় সেও একটা পেল না ব'লে যেন দুঃখ হয়েছে তার।

তোজক চোখপাকিয়ে তার দিকে চায়। হঠাৎ জোহানের চোখের দিকে চেয়ে একটা তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করে সে, নিজেই বোঝে না কিসের জন্য। যেন ছেলেটার অসংযত দুঃখের ছোঁয়াচ তাকেও লাগে।

সে বলে, "বস না, বস, খাও, পান কর।" মেভেলের ছেলেমেয়েগুলো সাইকেলের উপর চেপেই রাতের খাবার খাবে ব'লে ক্ষেপেছিল, সে তাদের ধ'রে টেবিল এবং দেয়ালের মাঝখানে গুঁজে দেয়। ফ্রাউ মেভেল ছোট ছোট

ওদের মুখের মধ্যে দেয়। কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত একটা সাধারণ রাতের খাওয়ার মত লাগতে থাকে।

ক্রাউ রেগেন বলে, "সোমবারে আমি গ্রামে যাব। আমার রেগেনের জায়গায় আমি ট্রাকের উপর থাকব।"

জোহান বলে, "সেটা বুদ্ধির কাজ হবে ব'লে মনে হয় না। রেগেন নামধারী সমস্ত লোকের খুন চাই ব'লে হেঁকে বেড়াচ্ছে ওরা।"

ক্রাউ রেগেন বলে, "তা হ'লেও আমি যাব। সমস্ত শক্তি দিতে হবে, বুকের রক্ত দিতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকে বুঝতে পারে আমরা ছাড়া তাদের পাশে দাঁড়াবার আর কেউ নেই, স্বর্গে বা মর্ত্যে আর কেউ নেই, কেউ নেই যে তাদের সাহায্য করতে পারে।

ঝগড়া সুরু হবার পর থেকে জোহান বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এখনও তার মুখ ফ্যাকাসে। সম্প্রতিকালে অনেক সময় হৃৎস্পন্দন দ্রুত হ'লে তার হাত দু'খানা কাঁপতে থাকে। যদিও তার খিদে পেয়েছিল তবু সে হাত দু'খানা টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে দেয়, যাতে অন্যদের নজরে না পড়ে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"তুমি কি ভাবছ, জোহান, আমি জানি সে," বাস্টিয়ান বলে। "ও কথা আর ওঠাই না। আমার কাছে যা জুতোর চামড়া ছিল তা অনেক দিন হ'ল শেষ হয়ে গেছে। ৎসাইগ্‌লার পর্যন্ত আর আমাকে কেনা দামে চামড়া দেবে না। সে বলছে হয় তুমি জুতো তৈরি কর, না হয় একেবারে ছেড়ে দাও।"

জোহান আস্তে আস্তে বলে, "আমার জুতোর সোলও ত একদম ক্ষয়ে গেছে।"

জোহানের জুতো জোড়ার দিকে বাস্টিয়ান একবার চকিতে চায়। ওর আপনার দিনের কথা মনে পড়ে যায়। তখনই ওর গোড়ালিতে বেমানান তালিটা নজরে পড়েছিল বাস্টিয়ানের। সে বলে, "আচ্ছা, তোমার জন্য আমি করে দেব। চামড়া কিনে নিজেই বানিয়ে দেব।"

সঙ্গে সঙ্গে ওরা সকলেই—ওর স্ত্রী, ডোরা, জোহান—সবাই উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে বাস্টিয়ান কি বলে শোনার জন্য। ওরা বোঝে ও একটা কিছু বলতে যাচ্ছে—এমন করেছে। এবার বাস্টিয়ান সুরু করে, "জোহান, তুমি ছেলে ভাল, হাঁ, বেশ বুদ্ধিমান, চটপটে এবং উৎসাহী ছেলে। কিন্তু কথা হ'ল কতদিন আর এ রকম চলতে পারে? কোনও-না-কোন সময়ে তোমাকে বাটৎসেনবাখ-এ যেতেই হবে। তোমার আত্মীয়স্বজনকে তুমি ত এখনও দেখাই দাও নি, ভাবটা ক'রে আছ যেন তুমি এখানে আসই নি। এবার কিন্তু সত্যিই তোমার যাবার সময় হয়ে গেছে। অবশ্য শীত উঠে যাওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থাকতে পার, কিন্তু তারপর আমি আর কি করব?

বাস্টিয়ান এখানেই থামতে চাইছিল, কিন্তু ওরা সবাই যেহেতু তখনও ওর প্রত্যেকটি কথার জন্য প্রতীক্ষা করছিল কাজেই ওকে বলে চলতে হয়, "আমি বললাম আমি আর কি করব? তুমি কিছু ভুল বুঝ না জোহান। আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি; কিন্তু ব্যাপারটা কি জান জোহান, আমি মনে করেছিলাম তুমি যাকে বলে নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিতে পারবে। এবার আমি তোমাকে রাখাঢাকা না ক'রে বলব। তুমি কিছুই পুষিয়ে দিতে পারলে না। আমি মনে করেছিলাম তুমি আমার জন্য যে কাজটা করবে তার দরুণ কিছু ত বেঁচে যাবে! কিন্তু কি ক'রে বাঁচাচ্ছি? চারদিকে দেখে তুমি নিজেই বল। আজ তোমার জুতোর নতুন সোল দরকার, এই সেদিন তোমার সার্টের দরকার হ'ল। এর বদলে এমন কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

সবাই তখনও ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ওকে তখনও বলেই চলতে হয়, "তুমি কি মনে কর এ সব কথা বলা আমার পক্ষে সহজ? আমার নিজের সন্তান সম্বন্ধেও আমি আলাদা কিছু করছি নে। এই শীতে ওকেও ছেড়ে দিতে হবে আমার।"

এবার অবশেষে ওরা বাস্টিয়ানের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ডোরার দিকে চায়।

এই প্রথম একথা প্রকাশ্য ও চূড়ান্তভাবে উচ্চারিত হ'ল। আবার যেন ধূসর আবহাওয়ায় একটা ফুটো ক'রে সেখান দিয়ে ডোরার সাদা মুখ ভেসে উঠল। বিয়ের সম্বন্ধ হবার দিন কনরাড বাস্টিয়ানের মেয়েকে যেমন দেখিয়েছিল অনেকটা তেমনি দেখায় ডোরাকে। এবার সেও আর তার

চারদিকে ফেরে, সকলকে যেন জেরা ক'রে যায়। বাস্টিয়ান বলে, "আমার ভাই কনরাডের মেয়ের এখন বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, সে সারা বছরের মজুরীর বিনিময়ে ওকে রোজ বিকেলবেলাটা রাখবে আর ছুটির দিনগুলোতে সারাদিন রাখবে।"

দূরের আবহাওয়ার মতই পাংশু হয়ে যায় ডোরার মুখ। ঘরের মধ্যে এখন কোনও কিছুকেই আর হাল্কা লাগে না, ওর চোখ দু'টি ছাড়া। সে জোহানের দিকে চেয়েছিল, শুধু জোহানের দিকেই। জোহান উঠে দাঁড়ায়, সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে এবং দু'হাত দিয়ে টেবিলটা পাকড়ে ধরে।

বাস্টিয়ান এই ভঙ্গির মানে বুঝে উঠতে পারে না। সে জোহানের দিকে চায়, তার সার্টের সেলাই থেকে মুখ পর্যন্ত দেখে: ক্লান্তিতে ঝুলে পড়েছে জোহানের কাঁধজোড়া! মুখখানা তার বদলে গেছে। এই নতুন মুখখানার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রী· এই রকম মুখ দেখলে ওরা কখনও ওকে আশ্রয় দিত না, কক্ষণও না। নতুন একটা গলায় জোহান বলে, "সত্যিই তোমাকে তোমরা ওদের কাছে দিচ্ছ?" টেবিলটা সে ঠেলিয়ে ধরে, কোণটা বাস্টিয়ানের বুক চেপে রাখে। টেবিল ও দেওয়ালের মাঝখানে চেপে থাকা অবস্থায় বাস্টিয়ান আবার সেই কথাই বলে, "না করলেই নয়।" তার পর আবার জুড়ে দেয়, "আর যদি দিতেই হয় তবে নিজের রক্তের সম্পর্কে লোকের কাছেই ভাল।"

জোহান বাস্টিয়ানকে দেয়ালে আর ঠেলে রাখতে সাহস করে না। নিজের হাতের চেটোর আঙুলগুলো বসিয়ে দেয় ও। গত কয়েক সপ্তাহে সে সবকিছু সহ্য করেছে, আবার লোটে গতকাল তোলুকের দোকানেও গিয়েছিল, ধোকানে তাই হ'ল।·মনে হয় অবশেষে এই মুহূর্তে যেন তার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর মরিয়া ভাব মাথা তুলছে, ঠিক হিংস্র হয়ে উঠবার আগে যেমনটি হয়। এর প্রবলতা এবং বিপুলতার সঙ্গে তুলনা করা চলে শুধু উন্মত্ত শক্তি ও ক্লান্তির। বাস্টিয়ান যদি নড়ত তা হলে হয়ত উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠত জোহান। কিন্তু সে তার আবরণের মধ্যে শান্ত হয়ে থাকে, শুধু বলে, "আমাদের রেখে তোমরা সব বাঁচিয়ে রাও।"

এক সার দিয়ে মা, ডোরা এবং ছোট্ট ভাইটা বাগানে চলে যায়। দরজাটা খুলে রাখে তারা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাওয়ালা কোদাল দিয়ে মাটি আঁচড়ানোর একটা আওয়াজ শোনা যায়, বাস্টিয়ান এবং জোহান উৎকর্ণ হয়ে শোনে। জোহান টেবিলটা ছেড়ে দেয়। তার আপন হৃৎস্পন্দন, মাটি আঁচড়ানর আওয়াজ, তাদের এবং গ্রামের পরুদের কলরব সব মিলে কেমন গভীর সারা নিস্তব্ধতার সমান হয়ে ওঠে। সঞ্চিত জনাবেগকে মুক্তি দেওয়ার জন্ত এখন আর সেই হিংস্রতা নেই, সারা শরীরটা জুড়ে যেন দুঃখের ঢেউ বইতে থাকে। মুঠো পাকিয়ে টেবিলটার উপর ঘুঁষি মারে সে।

বাস্টিয়ান বলে: 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসে পড় জোহান। আমি কি করতে পারি? মাথার উপর থেকে ছাদ খুলে নিয়ে যাবে তাই কি দেখব?"

জোহান বলে: "হ্যাঁ, এর চেয়ে তাও ভাল। হাঁ, তাই।"

"তাতে কারও কিছু সুরাহা হবে না।"

"হাঁ, হবে, হবে।"

শেষ পর্যন্ত বাস্টিয়ান বলে: "বসে পড়, না হয় বেরিয়ে যাও। আমি বুঝতি নে তুমি কি নিয়ে এত উত্তেজিত। এখানে এই রকমই অবস্থা। তা ছাড়া, এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? ও ত তোমার বোন নয়, আর তুমিও আমার ছেলে নও।"

সঙ্গে সঙ্গে সে বোঝে যে ভয়ানক একটা কিছু বলে ফেলেছে। সে বলেছে যে জোহান তার ছেলে নয়। কিন্তু জোহান এমন এক সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হয়েছিল যখন সে নিজে ক্লান্তিতে প্রায় ভেঙে পড়ছিল। আর গত কয়েক সপ্তাহে সে প্রায়ই ভেবেছে যে সময়কালে জন্মালে তার নিজের ছেলে যেমন হ'ত জোহানও তেমনি। তখনও দাঁড়িয়ে থাকা জোহানের দিকে সে চোখ তুলে চায়, জোহানও তারই বুঝিছিল যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু বলা হয়ে গেছে।

এক মুহূর্তের জন্ত মনে হল যে সে একটা উপযুক্ত জবাব খুঁজছে। তার পরেই মুখের ভাব বদলে যায় তার। সে বসে পড়ে। বাস্টিয়ান তার জোয়ান মাথা, তার হাল্কা রঙের চুলগুলো দেখতে থাকে। তার নিজের ছেলের

মধ্যেকার গভীর চাঞ্চল্যের কারণ তবু তখনই ধরতে পারে সে। একটা গভীর বিস্ময়ের অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে, একটা অকরুণ মায়া তাকে উৎপীড়িত করতে থাকে কারণ ছেলেটার মাথায় একখানা হাত রাখতে তার সাহস হয় না, সাহস হয় না এমন কোনও ভঙ্গি দেখাতে যা তার জীবনযাত্রার সীমাকে অতিক্রম করে যাবে।

বাইরে রোজ সন্ধ্যার মত পাম্পের ক্যাঁচকোঁচ আর বালতির ঠনঠন শোনা যায়।

টেবিলে বসে তারা গুনতে থাকে, দুজনেই বুঝতে পারে আর কোনও পথ নেই। মা ডেকে ওঠে: "তোরা, আয়!" হঠাৎ জোহান নিজে বুঝতে পারে যা বাস্টিয়ান এর আগে দেখেছিল—তার মুখখানা বদলে গেছে। এবার তার ধৈর্য ফিরে আসে। সে একমনে বসে ভাবতে থাকে কি রকম ভাবে বাস্টিয়ানের সঙ্গে কথা বললে তার এখানকার শেষ দিনগুলোকে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগানো যাবে। বাস্টিয়ান ইতিমধ্যে মাথা ঘামাচ্ছে এমন একটা উপায় খুঁজে বের করবার জন্য যাতে করে জোহানকে সে শীতকালটা রাখতে পারে।

শিল্পী ও সংস্কৃতি

চার্লি চ্যাপলিন

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

"...I have known humiliation. And humiliation is a thing you can not forget."

সৃষ্টিশীল শিল্পী চিরকালই বৃহত্তর জীবনের কল্লোল থেকে শিল্পের প্রাণ আহরণ করেন। শিল্পের প্রাণ জীবনের নানা সংঘর্ষ থেকে সঞ্চিত অনুভূত হয়ে উন্মুখ হয়ে পড়ে বহুজীবনের মাঝে। এক জীবন থেকে আর এক জীবনে তার ব্যাপ্তি। এক প্রাণ থেকে অন্যতর প্রাণে তার রেশ। সেই শিল্পই শিল্প রূপে অমরত্ব লাভ করে যাতে মানুষ নিজেকে বোঝে, দেখে, নিজের জীবনের উপলব্ধ অনেক গভীর সত্যের নির্যাস খুঁজে পায়, নিজের জীবনকে একটা আবর্তের মধ্যে রুদ্ধপ্রায় করে না রেখে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। সেই গতি-প্রবাহে তার চারপাশের সবকিছুতে স্পন্দন ওঠে। সেই স্পন্দিত সৃষ্টির বিশ্বকর্মা হলেন মহান শিল্পী।

কিন্তু শিল্পীর এই গতিপথ যে সহজ সরল নয়, তা ত সহজেই স্বীকার্য। তাঁর শিল্পভাবনা, জীবনবোধ, দর্শন কত শত উদ্ধত প্রাচীরে এসে আঘাত খায়, আত্মস্বার্থের চক্রে ভিন্নমুখী হয়, মানুষের জীবনবোধ রচনায় মানুষই শিল্পীকে তাই উপলব্ধ সত্যকে সচেতন মণিকোঠায় আঁকড়ে ধরে লড়তে হয় প্রতিকূল সত্তার বিরুদ্ধে। অশিব, গড্ডালিকা এবং জীবনবিমুখীনতার বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামের আগুনেই পবিত্র হন শিল্পী। তাঁর শিল্প বিভাসিত হয়ে ওঠে মানুষের জয়গানে, দেশ থেকে দেশান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে প্রায় সব বৃহৎ শিল্পীরই জীবনের নেপথ্যে এমনই নানান সংগ্রামের কাহিনী জানা যায়। সে কাহিনী যে কত বেদনার, কত দুঃসহ যন্ত্রণার, কত বীভৎস আক্রমণের তা সহজেই অনুমেয়। খ্যাতি-ভূষিত শিল্পীর আজন্ম অবস্থা দিয়ে সেটা চট করে বোঝা যায় না। একটু সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাদের শিল্পকীর্তির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করলে তার আঁচ পাওয়া যায়। ডায়েরীর বা আত্মচরিতের পাতাগুলো ঘাঁটলে উপলব্ধি করা যায়। উপলব্ধি করা যায় কি ভীষণ মানসিক সামর্থ্য প্রত্যয় এবং বিশ্বাস নিয়ে সত্যের জন্য কি দুর্দম সংগ্রামে বছরের পর বছর লিপ্ত থেকে এরা বিজয়ী হয়েছেন।

চার্লি চ্যাপলিন সেইরকম একটি নাম। এই নামটির

আছে। চার্লির আশ্চর্য্য খ্যাতি, যশ এবং শিল্পী হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেখে কে ভাবতে পারে যে তাঁর সমস্ত জীবনপথটা প্রচণ্ড রকম আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়ে এই উচ্চ শিখরে এসেছেন? কে ভাবতে পারে শিল্পী হিসাবে জীবন সুরু তাঁর জীবনে একটা আকস্মিক ঘটনা? কে কল্পনা করতে পারে এই মানুষটিই সারাটা জীবন সমাজের অর্থপুষ্ট সমাজপ্রভুদের কাছ থেকে দুর্বার আক্রমণ, অত্যাচার আর লাঞ্ছনাই পেয়ে এসেছেন?

চার্লির জীবনের পরিচ্ছেদগুলো খুললে সেই সব আশ্চর্য্য ঘটনার সত্যতা উদ্‌ঘাটিত হবে।

চার্লির শিল্পী-জীবন সুরু পাঁচ বছর বয়সে। যে বয়সে মা-বাপের স্নেহ-আদরে পরিপুষ্ট হয়ে, রঙীন কোট আর গরম টুপী পরে স্কুলে যায় শিশুরা, সেই বয়সে চার্লি এলেন রঙ্গালয়ে। মা অভিনেত্রী, নাচ-গানে পারদর্শিনী লিলি হার্লি। একদিন মা'র অসুখে বিব্রত বিরক্ত বাপ রঙ্গালয়ের প্রকোষ্ঠে ঠেলে হাজির করলেন চার্লিকে। চার্লি ভীত-চকিত, বিমূঢ়-হতভম্ব। প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে বসে থাকা বহু দর্শকের শাণিত উৎসুক দৃষ্টি তার উপর। কোন কিছু না বুঝেই চার্লি সুরু করল গান। প্রাণপণে চেঁচিয়ে, হাত-পা নেড়ে। একটার পর একটা। দর্শকের ঔৎসুক্যে যেন তরঙ্গ উঠল। বিস্ময়ে বিস্ফারিত সকলের চোখ। হাততালি, টাকা-পয়সার ফোয়ারা ছুটল মঞ্চে। সেই প্রথম। পাঁচ বছরের শিশুর প্রথম বাস্তবে হাতে-খড়ি। তারপর অনেকগুলো যুগ কেটেছে। বহু বছরের সিঁড়ি পার হয়ে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। জীবনের এক-একদিকে এসেছে আঘাত আর চার্লি দুঃসাহসে বুক উঁচিয়ে এগিয়ে গেছেন তার মুখোমুখি। পাঁচ বছর বয়সেই সেই যুদ্ধ ঘোষণা।

এরপর পিতার মৃত্যু। ভয়াবহ দুঃসহ দারিদ্র্য। শিক্ষার মুখ দেখলেন না। মা'র অনিশ্চিত স্বল্প আয়ে, প্রায় অনাহার জীবনপ্রপাত। চার্লির শৈশব মানস সেখানে বদল না। দারিদ্র্যের পরিবেশ, রুগ্ন, অসুস্থ, সহায়হীন মা'র অবিচল সংগ্রাম অভিভূত করল তাঁকে। জীবনের পথে বেরুলেন তিনি। কাঁচকল থেকে সুরু করে নানান জায়গায় জীবিকার সন্ধান করলেন। কিন্তু কোথাও তাঁর স্থায়িত্ব হ'ল না। পেটের ক্ষুধা ছাড়াও আর এক মহাক্ষুধা যেন তাঁর দেহে পুঞ্জিত হচ্ছিল। বস্তী-জীবনের সহস্ররকম ক্লেদ, গ্লানি, দুঃখ আর সহস্র ছিন্ন মানুষের হাহাকার নিরন্তর তাঁর দেহে যেন চাবুক মারত। একদিকে সমাজপ্রভুদের বিলাসের প্রাচুর্য্য, অপরদিকে অসংখ্য মানুষের নিঃস্বতা—সমাজের চলতি এই আলো-অন্ধকার দিক দু'টি অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর করে তুলত তাঁকে।

এমনি ভাবেই বিখ্যাত কারনো কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ। সামান্য পয়সার তাগিদে পথঘাটের মঞ্চে, নাচগানের হল্লোড় থেকে এক নতুন স্তরে এলেন। সেই কোম্পানীর সঙ্গেই তাঁর বিদেশ অর্থাৎ আমেরিকা পাড়ি।

আমেরিকাতে তাঁর জীবনের পরিচ্ছেদ অন্য রকম। এখানেই তিনি সৃষ্টি হলেন একজন ভাঁড় রূপে। মা'র কাছে শিক্ষা পাওয়া অভিনয়-দক্ষতার গুণে তৎকালীন চিত্র-জগতকে মুগ্ধ করতে দেরি লাগল না। সেই বেঁটে, খর্বাকৃতি লোকটি, একজোড়া সামঞ্জস্যহীন বুট পায়ে, ঢোলা ট্রাউজারে আবৃত যে মানুষটি পর্দায় রূপায়িত হ'ল—আমেরিকার সেইকালীন স্থূল রসের গ্রাহকদের কাছে তাই এক বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। চার্লির প্রত্যেকটি ঢং, অভিব্যক্তি এবং হাসানর কায়দায় মেতে উঠল দর্শক সমাজ। 'ভ্যাগাবণ্ড'-কৃতি বক্স-অফিস খোলানো শিল্পীটিকে লুফে নিল সবাই। লুফে নিল সিনেমা মালিকেরা। তাঁকে ঘিরে একের পর এক বাজার কাটানো ছবি তৈরী হতে লাগল। চার্লির সেই অর্থাভাব, দারিদ্র্যের জ্বালা ঘুচল। কিন্তু চার্লি অর্থপুষ্ট হয়ে সেখানেই থেমে থাকতে পারলেন না। সমাজে অবজ্ঞাত লণ্ডনের সেই বস্তীর মানুষগুলোর বেদনা তাঁর স্মৃতিতে। আমেরিকার জেল্লাদারি সভ্যতার বক্ষপুটে সেই নিঃস্ব মানুষের মিছিল। তাঁর বুকের মধ্যে বাজছে নিরন্তর সেই অসংখ্য সহায়হীন মানুষের জ্বালা। কিন্তু তিনি তখন বিত্তবান হয়ে পড়েছেন। চলচ্চিত্রের একচেটিয়া অধিপতিদের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ অসম্ভব। এর মধ্যেই তাঁর খ্যাতি দেশ থেকে বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছে। 'ভ্যাগাবণ্ড চার্লি' হৃদয়ে হৃদয়ে উত্তাল তরঙ্গ তুলেছে।

কিন্তু চার্লির জীবনের গতি সেই পথেও বেশীকাল এগোল না। সমাজের মানুষ, চেহারা এবং পঙ্কিল আবর্ত তাঁর জীবনকে এত বেশী প্রভাবান্বিত করতে লাগল যে, তথাকথিত জনমনরঞ্জনকারী শিল্পী হিসাবে 'শিল্পসাধনা' অসম্ভব হয়ে পড়ল। বিশ্বব্যাপী পরভোজী গোষ্ঠীর শাসন ও সভ্যতার বিরুদ্ধে উদ্ধত বিরুদ্ধ শক্তির ক্রমবিকাশে মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন যে সব দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, সমাজের পটপরিবর্তন, নতুন নতুন মূল্য-

বোধের সৃষ্টি হচ্ছিল, চার্লির চিন্তার জগতে তা এক নতুন বাত্যা সৃষ্টি করল।

ইতিমধ্যে চার্লি বিভিন্ন কোম্পানীর হয়ে ছোট ছোট পঞ্চাশ-ষাটখানা ছবি করে ফেলেছেন। তৎকালীন দর্শকদের স্থূলরস চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দিককার কয়েকটা ছবি গঠিত হলেও—ধীরে ধীরে সেই প্যাটার্ণ এবং স্থূল ভাবালুতা থেকে অনেক সরে এলেন তিনি। সমাজ-জীবনের গভীর সত্যতা তিনি ইতিমধ্যে অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেছেন। এখানেই অনেক প্রযোজকের সাথে তাঁর বিরোধ ঘটে। সেই বিরোধই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সত্যানুসন্ধানের পথে তাঁকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

এরপর চার্লির সৃষ্টির ধাপগুলোর প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির চিন্তার সাথে সমষ্টির ঐক্য, ব্যক্তির অনুভূতি সমষ্টির ব্যঞ্জনায় মুখর। অবহেলিত মানুষের প্রতি যে মমত্ব, সহানুভূতিবোধ কিছু কিছু প্রকাশ পাচ্ছিল পূর্বের কিছু ছবিতে, এবার সেই বোধ আরও ব্যাপ্তি নিয়ে বৈজ্ঞানিক ধারা গ্রহণ করল। আর সেখানেই সামাজিক বৈষম্য, শাসনকর্তার চরিত্র, মানবিক অধিকারের অপমানের চিত্র উন্মোচন করতে সুরু করলেন। 'Conception of the average man' আরও প্রকট এবং সংবদ্ধ হয়ে মূর্ত হয়ে উঠল।

এখানেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম সুরু। অর্থপুষ্ট বিত্তবানরা তাঁর প্রতি একটা আশঙ্কা পোষণ করে রেখেছিল এতকাল—এবার তাঁর দুঃসাহসিকতার মুখোমুখি আক্রমণে উদ্যত হ'ল তারা। ব্যক্তিগত জীবন থেকে সামাজিক জীবন বিভিন্ন স্তরে ষড়যন্ত্রের জাল পেতে এই অমিত প্রতিভাবান জীবন-শিল্পীকে কক্ষচ্যুত করার ঘৃণ্য কৌশল সুরু হ'ল। কিন্তু চার্লি তখন অনেক উর্দ্ধে। তাঁর সংগ্রাম চলল দুটো পথে। একদিকে চলচ্চিত্র জগতে যে স্থূলতা, ব্যভিচার, জীবনের মাঝে যৌন মত্ততা, নির্জীবতা—তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মানুষকে নবতর জীবন-চেতনায় সঞ্জীবিত করার প্রয়াস; অপর দিকে মুনাফালোভী, পুঁজিগোষ্ঠীর যে সামাজিক ধারা, জীবন বিলাস, অসাম্যতা, কারচুপির যত কৌশল—তার বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াই। অবহেলিত জাগ্রত মানুষের সব শক্তির স্পন্দন তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই নানা প্ররোচনাও তাঁকে টলাতে পারে নি ধ্রুব সত্য থেকে। এই সময় তাঁকে প্রবঞ্চক, ধাপ্পাবাজ—এমনকি গুপ্ত রাজনৈতিক চর হিসাবে প্রচার করা হতে থাকে। রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ যোগ তাঁর ছিল না। কিন্তু আগ্রহ ছিল তীব্র। গভীর ভাবে অনুধাবন করতেন সব কিছু। স্পষ্ট ছিল, নিঃসংশয় ছিল মতামত। কথাপ্রসঙ্গে তিনি এক সাংবাদিককে ত স্পষ্টই বলেছিলেন—'I am an artist. I am interested in Life. Bolshevism in a new phase of life. I must be interested in it.' এই ধরনের স্পষ্ট উক্তিই তাঁকে আক্রমণের জন্য শত্রুপক্ষকে অনেক সুযোগ করে দিয়েছিল।

'Modern Times', 'City Lights' 'The Great Dictator', 'Monsieur Verdoux' ইত্যাদি ছবিগুলোতে এই চিন্তার বলিষ্ঠ এবং গভীর প্রতিফলন হয়েছে। শিল্পের যান্ত্রিকতার মাঝে অবাধ শ্রম লুণ্ঠনকে কশাঘাত করলেন তিনি 'Modern Times'-এ। সমাজের পরগাছা শ্রেণীর লোলুপ, শোষক রূপটিকে জনগণকে চিনিয়ে দিতে কার্পণ্য করলেন না। 'City lights'-এ আঁকলেন এক ফুলওয়ালীর জীবন। জীবনের পাঁপড়ি দিয়ে মেলে ধরলেন মানবিক বোধ, পারস্পরিক বেদনার শরিকতা। কিন্তু মানবিক বোধ হোক, আর শ্রম-লুণ্ঠনই হোক প্রচণ্ড রকম হৈ চৈ পড়ে গেছে ইতিমধ্যে তাঁকে নিয়ে। আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর সব পত্র-পত্রিকায় তাঁকে আক্রমণ করা হচ্ছে জাতিবিদ্বেষী হিসাবে। পথে-ঘাটে-সভা-সমিতিতে সমাজ প্রভুদের ভাড়াটে লোকেরা চার্লির বিরুদ্ধে কুৎসায় মুখর। এর মধ্যেই সুরু হয়েছে নাৎসীদের হুঙ্কার। হিটলারের নেতৃত্বে পৃথিবীর শুভবুদ্ধি, স্বাধীনতা একের পর এক খুন হয়ে চলেছে। চার্লি চুপ করে থাকতে পারলেন না। ছোট ছোট কিছু চিত্রের কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন। সেগুলোর কিছু শেষ বা সরিয়ে রাখলেন তখনকার মতন। যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে শিল্পের অসি নিয়ে হাজির হলেন মানুষের সপক্ষে। সৃষ্টি হ'ল 'The Great Dictator'। আমেরিকা ত বটেই, সমস্ত দুনিয়াকেই চমক দিয়ে দিলেন তিনি। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের পিছনে যে স্বার্থ শক্তি থাকে, মানুষকে পদানত করে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যলিপ্সার তাগিদ থাকে তাকে সজোরে আঘাত করলেন। এই একটি ক্ষেত্রে চার্লি সোজাসুজি দুই শ্রেণী শক্তিকে প্রতীকের মাধ্যমে মুখোমুখি হাজির করলেন। হিটলার যে একজন ভাঁড় তা প্রমাণ করলেন। সেই চিত্রের নায়ক আবেগ-মণ্ডিত কণ্ঠে ঘোষণা করে—

'I am sorry, but I do not want to be an Emperor···I should like to help everybody—

if possible—jew, gentle, blackman, white······
The way of life can be free and beautiful ·'.

চার্লির চেতনার পথ বহু ধরে ফুটে ওঠে সেই কথায়। কিন্ত আমেরিকার স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তাঁকে ছেড়ে দিল না। প্রকাশ্ত অপমান, আক্রমণ সুরু করে দিল। মিথ্যে মামলায় জড়ানো হ'ল। জেলখানার ভয় দেখান হতে লাগল। কেননা 'Great Dictator'-এর মূল কথা তাদের আবরিত চরিত্রের উন্মোচন করে দিয়ে শোষিত মানুষের বিজয় ঘোষণা করেছে। সমসময়ে প্রসিদ্ধ কমিউনিষ্ট সুরকার হানস আইসলারকে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি পৃথিবীর বুদ্ধিজীবিগোষ্ঠীর কাছে এর প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন। সরকার এবং ওয়াল ষ্ট্রীটের প্রভুগণ-কর্তাদের চোখে তিনি 'সাংঘাতিক সন্দিগ্ধ' হলেন। বিচারের কাঠগড়ায় তোলা হ'ল তাঁকে। বিদেশী চর হিসাবে প্রমাণ করার জন্ত জিজ্ঞাসা করা হ'ল, এতকাল কেন তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব নেন নি। অবিচল, সাহসী কণ্ঠে উত্তর দিলেন তিনি : 'I am a citizen of the World. I am an internationalist.'

'Mousier Verdoux'-তে দেখালেন তিনি, যুদ্ধ হচ্ছে এক ধরনের ব্যবসা এবং ব্যবসাকেও তিনি দেখালেন,···a ruthless business হিসাবে। তারপর আরও কয়েকটি চিত্র। এর মধ্যে 'Lime Light', 'Gold Rush' ইত্যাদি ছবিও আছে। কিন্ত আমেরিকার সরকার আর তাঁকে সেই দেশের মাটিতে রাখতে সাহস পেল না। ধনতন্ত্রবাদের মূল শিখণ্ডীর দেশে—সেই সমাজ ব্যবস্থা ও অন্তঃসারশূন্ততার বিরুদ্ধে যে অভিযান সুরু করেছিলেন তা জিইয়ে থাকলে হয়ত আমেরিকার চেহারার মধ্যে অনেক তফাৎ আসত। এক রকম বহিষ্কারই করা হ'ল তাঁকে। দেশে আর তাঁকে ফিরতে দেওয়া হ'ল না। রকফেলার গোষ্ঠীরা তাঁকে কমিউনিষ্ট বলে দিয়েছে এবং এই 'বিষাক্ত সাপ'-কে দেশের অভ্যন্তরে রেখে নিজেদের স্বার্থে বিপদ ঘনাতে চাইল না। তবুও সেই মানুষটি চলে এল সুইজারল্যাণ্ডে। স্রোতে গা ভাসালেন না, আত্মবিক্রয় বা আত্মসমর্পণ করলেন না অসত্যের কাছে। জীবনে যে সত্যকে নানান সংঘর্ষে মহাসত্য বলে জেনেছিলেন সেই মহাসত্যের জন্ত জীবনের সব সুখ-সম্ভোগ-অর্থ ত্যাগ করে চলে এলেন পৃথিবীর নাগরিকদের কাছে। ঘোষণা করলেন দৃঢ় কণ্ঠে, 'I have millions and millions of friends in the world and a few enemies'। কোটি কোটি জনতার প্রাণস্পর্শে শিল্পী যোদ্ধা অমর, মৃত্যুহীন যেমন তেমনি মৃত্যুহীন তাঁর শিল্পরাজি।

থেকে ক্রমে মানুষ বা মানুষেরও থেকে উন্নত স্তরে পৌঁছেছে এও নিতান্ত অসম্ভব নয়। এবং সেই উন্নত জীবের কেউ কেউ রেডিও-সংকেত পাঠিয়ে অন্যত্র নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে চাইছে।

ডঃ কারডাশেভের মতে বোধ হয় সে বার্তাই ধরা পড়েছে। মহাকাশের "জানলা"গুলি খোলা রাখতে হবে। অসীম মহাবিশ্ব অনন্ত রহস্যে ভরপুর, তার সামান্য আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়েছে। আশা রাখি, ধীরে ধীরে এই রহস্যের জাল উন্মোচিত হবে। অন্য লোক-লোকান্তে অন্য পৃথিবীতে মানবের "প্রতিবেশী" অন্য মানুষ রয়েছে কি না তার উত্তর নিঃসন্দেহ হবে।

এ. কে. ডি.

অদ্ভুত পোশাক

তাকে সমুদ্রের অতলে নামতে বলুন সে নেমে পড়বে। তাকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলুন সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। শুধু বাহাদুরী দেখাবার জন্য নয়—অনেক সময় দুর্গম স্থানে আগুনে বা অতল জলে মানুষকে নামতে হয় নানা প্রয়োজনে। আপনিও নামতে পারবেন যদি থাকে বিশেষ একটি পোশাক। ছবিতে যা দেখান হচ্ছে। পোশাকটির ওজন অবশ্য একটু বেশী। কিন্তু এক হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইটের গরমে আপনার তাপ লাগবে যেন মাত্র ৭-৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট—অর্থাৎ স্বাভাবিক গরম। আর একটা ছবিতে দেখুন পোশাকের পিঠের দিকটা খুলে ধরা হয়েছে, এখানে রয়েছে ছোট একটা ট্যাংক যাতে বাতাস তরল অবস্থায় রাখা হয়ে থাকে।

এই অদ্ভুত পোশাকটি পরে আপনি প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল নিশ্চিন্তে আগুনের মধ্যে বসে থাকতে পারবেন। আপনার দরকার না হলেও দমকল বাহিনীর লোকেরা এ ধরনের পোশাক নিশ্চয়ই খুব পছন্দ করবেন।

লোকশ্রুতি

লোকশ্রুতি মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে। এ যেন গল্পের সেই সরল লোকটার মত,—সেই যে গল্প আছে: একটি গ্রাম্য লোক একটা পাঁঠা কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল, দুই জন ধূর্ত লোক মতলব করল কি করে ঠকিয়ে পাঁঠার মাংস খাওয়া যায়। যুক্তি-পরামর্শ হ'ল। শেষে একজন লোকটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, "কি গো ঠাকুর, কাঁধে কুকুর নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?"

"কুকুর হবে কেন," ঠাকুর চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হ'ল।

কিন্তু খানিক পরেই দ্বিতীয় জন: "কাঁধে কুকুর কেন গো ঠাকুর?"

কুকুর! বামুন ঠাকুর এবার যেন একটু ঘাবড়িয়ে গেলেন। মাথার ভিতর একটা প্রশ্ন ঢুকে গেল, এরা সব পাঁঠাকে কুকুর বলে কেন।

মজার কথা এই অবস্থা তৃতীয় লোকের সঙ্গে দেখা। সে ত হেসেই কুটিকুটি। "আরে, তোমরা সব দেখে যাও, বোকা লোকটা কুকুর কাঁধে

অদ্ভুত পোষাক

দিয়ে যাচ্ছে।" একবার, দু'বার, তিনবার—সোজা লোক ভাবল, ভুল তারই বুঝি, পাঁঠা ভেবে সে কুকুর কাঁধে করে চলেছে। শেষ দুয়ার ফেলা পাঁঠাটা সে রাস্তায় ফেলে দিল।

লোকশ্রুতি তথ্যকে ঠিক এভাবে বিভ্রান্ত করে—যদিও সচেতন ভাবে যা সচেষ্ট ভাবে নয়। তবু তবুও পড়ে সত্য বিকৃত হচ্ছে। ইতিহাসে এ রকম একটা ঘটনা সম্প্রতি ধরা পড়েছে। আমরা সবাই জানতাম ইংলণ্ডের রাজা জন ম্যাগনাকার্টায় সই করেছিলেন। ম্যাগনাকার্টা গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতদিনে জানা গেল এই সইয়ের ব্যাপারটা আগাগোড়াই মিথ্যা, রাজা জন সই করেন নি, আসল কথা তিনি লিখতেই জানতেন না, দলিলে তার সীলমোহর এঁকে দেওয়া হয়েছিল এ পর্যন্ত। ইতিহাসের মোটা মোটা বইয়ে স্বাক্ষররত অবস্থায় রাজা জনের যে ছবি দেখা যায় তা পুরোপুরি শিল্পীর কল্পনা, সত্যসন্ধানী ইতিহাসবিদেরা তা-ই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন—এত দিনে সে ভুল ধরা পড়ল।

ঘোর বিজ্ঞানের রাজ্যেও এ ধরনের নজীর কিছু আছে। বছর দুই আগে আমরা তার একটা আলোচনা করেছিলাম। গ্যালিলিও পিসা নগরীর বিখ্যাত হেলানো স্তম্ভে উঠে ছোট-বড় দুটো বল ফেলেছিলেন বলে কাহিনী প্রচলিত আছে, সম্প্রতি কথা উঠেছে আদৌ তিনি সেই স্তম্ভে আরোহণ করেছিলেন কি না। পুরানো তথ্যের মধ্য দিয়ে গেলে মনে হয় তিনি ঐ স্তম্ভে কখনও ওঠেন নি (দ্রষ্টব্য প্রবাসী)। বর্তমানে আমরা ঐ জাতীয় আর একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। সবাই জানেন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়িয়ে মেঘ থেকে আকাশের বিদ্যুৎ মর্ত্যে এনেছিলেন; শিল্পী ওয়েষ্ট-এর আঁকা তাঁর সেই ঘুড়ি ওড়ানর ছবি আমরা এখানে তুলে দিলাম। ফ্রাঙ্কলিনের পিছনে ছোট একটি ছেলে বিজ্ঞানীকে সাহায্য করছে, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন। এই ছেলেটি কে? ছেলেটি নাকি শিল্পীর তুলিতে সৃষ্টি, বাস্তবে তার অস্তিত্ব ছিল না। ফ্রাঙ্কলিনের কোন বালক সাহায্যকারী ছিল বলে প্রমাণ নেই।

কথায় বলে যা রটে তার কিছু কিছু বটে—অর্থাৎ তার কিছু কিছু সত্য। রাজা জন ম্যাগনাকার্টায় সই করেন নি, সায় দিয়েছিলেন, ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়িয়েছিলেন কিন্তু তাঁর কোন সাহায্যকারীর দরকার হয় নি। লোকশ্রুতি এখানে সত্যকে অর্ধ-সত্য রূপে বিধৃত করেছে।

সম্প্রতি বার্নপুরে রাজ্য এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী উৎসবে রাজ্য অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মার্চ পাষ্ট অভিবাদন গ্রহণ করছেন

খেলাধূলার আসরে

পি মিত্র

সম্প্রতি সাউথ ক্যালকাটা লনে সদ্যসমাপ্ত এশীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসে। প্রতিবারের মতন এবারও দেশের ও বিদেশের বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে এশীয় টেনিস প্রতিযোগিতাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। বর্তমানে ভারতীয় টেনিস বিশ্বপর্য্যায়ের শীর্ষে না হলেও মাঝামাঝি একটা স্থানে অবস্থান করছে। রামানাথ কৃষ্ণাণের নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতন এতদিন ভারতীয় টেনিসে বিরাজ করছিল। তিনি ১৯৫২ সালে ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন এবং তার পর থেকে এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের মাটিতে কোন ভারতীয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন নি। এবার পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে দ্বিতীয় স্থানীয় খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জীর কাছে স্ট্রেট সেটে পরাজিত হওয়ায় অনেকেই বিস্মিত ও মর্মাহত। কারণ কৃষ্ণাণই ভারতীয় টেনিসকে বিশ্বপর্য্যায়ে পৌঁছে দেন। এখনও বিশ্বে বাছাই খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় তিনি নবম স্থান অধিকার করে আছেন। কিন্তু অপর দিকে জয়দীপের এই সাফল্যও কম কথা নয়। আশাবাদীরা জয়দীপের কাছে আরও উন্নত টেনিস আশা করেন। কৃষ্ণাণের পরাজয়ে মর্মাহত হলেও জয়দীপের এই সাফল্যে সকলেই আনন্দিত। তরুণ খেলোয়াড় জয়দীপ কৃষ্ণাণের বিরুদ্ধে যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে এবং দাপটের সঙ্গে খেলেন যে কৃষ্ণাণকে তাঁর কাছে একদম নিষ্প্রভ মনে হয়। বিশেষ করে জয়দীপের ক্ষিপ্রতা, সার্ভিস এবং সুন্দর ব্যাকহ্যাণ্ডের স্ট্রোকগুলি তাকে জয়লাভে বিশেষ সাহায্য করে। এ মরশুমের প্রথম থেকেই জয়দীপের খেলার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে ডেভিস কাপের খেলায় জাপানের বিরুদ্ধে এবং স্পেনেতে স্পেনের বিরুদ্ধে তাঁর উন্নত ক্রীড়া-ধারার স্বাক্ষর মনে রাখবার মতন। মনে হয় ক্রমশঃ তিনি টেনিসে পরিপূর্ণতা লাভ করছেন কৃষ্ণাণের

খেলায় একমাত্র দুর্বল সার্ভিস ছাড়া অন্য ক্রটি ছিল না। জয়দীপের সার্ভিসটিও ভাল কিন্তু তাঁর মেজাজটা ঠিক সংযত নয়। বড় খেলোয়াড় হতে গেলে যে সংযম ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয় তার অভাব তাঁর মধ্যে দেখা যায়। ব্যর্থতা অনেক সময় জয়দীপের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় কিন্তু কৃষ্ণাণ অন্যরকম, সঙ্কটমুহূর্তে তাঁর দৃঢ়তা লক্ষণীয়। জয়দীপ যদি তাঁর মেজাজ ও ধৈর্য্যের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করে তাকে বশে আনতে পারেন, তবে শুধুমাত্র এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ নয়, অনেক বিজয়মাল্যই তাঁর গলায় উঠবে।

এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে জয়দীপ ব্যতীত অপর খেলোয়াড় যাঁরা নিজ প্রতিভা ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি রেখে গেলেন তাঁদের ভেতর অন্যতম হচ্ছে রাশিয়ার তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় আলেকজান্ডার মেত্রেভেলি ও গ্রীসের কালোগেরোপোলাস। বিশেষ করে মেত্রেভেলির খেলা সকলকে প্রকৃত আনন্দদান করে। আন্তর্জাতিক টেনিস আসরে রাশিয়া নবীন প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু তার ভেতর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। শারীরিক পটুতা ও দমের দিক থেকে বিচার করলে মেত্রেভেলির নাম প্রথমেই করতে হয়। তাঁর খেলা আক্রমণাত্মক। ফোরহ্যাণ্ডের স্ট্রোকের উপর এবং সার্ভিসের উপর তাঁর দখল আছে কিন্তু ব্যাকহ্যাণ্ডের স্ট্রোক তেমন জোরাল নয়। গ্রীসের কালোগেরোপোলাস ভাল খেলোয়াড়, তাঁর আরও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শারীরিক পটুতা ও ক্ষিপ্রগতি খেলোয়াড়ের মূলধন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার যোগ থাকা চাই, না হলে ভাল খেলোয়াড় হওয়া যায় না। কৃষ্ণাণ কোর্টে খুব একটা দৌড়াদৌড়ি করেন না, বেশীর ভাগ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেলেন কিন্তু সহজে কোন বল ছেড়েও দেন না বা ফসকেও যায় না। তার কারণ তাঁর কোর্ট সম্বন্ধে জ্ঞান এবং কোন্ বল কোথায় পড়বে তা নির্দ্ধারণ করার বুদ্ধি তাঁর মধ্যে সহজাত। জাত-খেলোয়াড়ের লক্ষণই প্রতিপক্ষের ক্রটি-বিচ্যুতির উপর লক্ষ্য রাখা এবং সেই বুঝে আক্রমণ করা। পরিণত খেলোয়াড় এবং অপরিণত খেলোয়াড়ের তফাৎ এখানেই। কৃষ্ণাণ পরাজিত হলেও তিনি একজন পরিণত ও সম্পূর্ণ খেলোয়াড়, কিন্তু জয়দীপ, মেত্রেভেলি ও কালোগেরোপোলাস ভাল খেলোয়াড় হলেও সম্পূর্ণ ও পরিণত নয়।

ভারতীয় মহিলাদের খেলার মান অত্যন্ত হতাশা-ব্যঞ্জক, কোন সময়েই তাঁরা উচ্চমানে পৌঁছতে পারেন না। ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁরা ভালই খেলেন, কিন্তু যখনই কোন বিদেশীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তখনই তাঁদের খেলার গলদ চোখে পড়ে। কারণ অবশ্য এর অনেক। শারীরিক পটুতা, দম, শক্তি এবং সর্বোপরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগের অভাব চোখে পড়ে। বেশীর ভাগ প্রতিযোগিতাতেই মেয়েদের খেলা কোয়ার্টার ফাইনাল পর্য্যায় থেকে সুরু করতে হয়, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কম। ভাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেললে তবেই খেলার মান উন্নত হয়। এখানে ভাল খেলোয়াড় দূরের কথা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার, অনুশীলন করার মতন খেলোয়াড়ই পাওয়া যায় না। মিস নিরুপমা বসন্ত এর আগে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও এশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কিন্তু এবার রাশিয়ার মিস তিউ দুয়ের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিয়ে উঠতে পারলেন না। মিস দুয়ে সহজেই স্ট্রেট সেটে জয়লাভ করেন। রাশিয়ান খেলোয়াড়দের অনুশীলন সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তাঁদের কোচ বললেন যে, শুধু কোর্টে খেলা ছাড়া আমাদের খেলোয়াড়রা দৈনিক নিয়মিতভাবে জিমনাষ্টিক, দৌড় এবং সাধারণ শারীরিক কসরৎ করে থাকেন। কঠোর সাধনা করেন বলেই তাঁদের দেশের খেলোয়াড়রা ধাপের পর ধাপ উঠে যান। আমাদের চিত্র অন্য রকম। আজ যে খেলোয়াড় ভাল খেলে নাম করলেন দু'দিন বাদে তাঁর কদর উঠল, খেলা পড়ে গেল এবং কিছুদিনের মধ্যেই খেলোয়াড়-জীবনে ইস্তফা দিয়ে তিনি ইতিহাস হয়ে গেলেন। কঠোর সাধনা না করলে কোন কিছুতেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কাজেই প্রয়োজন কঠোর সাধনা ও অনুশীলনের।

* * * *

আমাদের ফুটবলের চিত্র আরও নিদারুণ ও হতাশা-ব্যঞ্জক। ভারতীয় ফুটবলের মান বিশ্বপর্য্যায় না হলেও এককালে এশিয়ার শীর্ষে ছিল। বর্তমানে তা নামতে নামতে কোথায় এসেছে তা দেখতে গেলে আতস কাঁচ দিয়ে দেখতে হবে। না দেশে, না বিদেশে, কোথাও ভারতীয় ফুটবল তার স্থান বজায় রাখতে পারছে না। একের পর এক বিদেশী দল ভারতে এসে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে যাচ্ছে। মাত্র দেড় বছরের ভেতর হাঙ্গেরীর ভাভাবানিয়া, রাশিয়ার ও চেকোস্লোভাকিয়ার দল এখানে এসে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে গেছে। এই পরাজয়ের সূচনা হয় ১৯৬৪ সালে কুয়ালালামপুরে মারডেকা কাপে, কাইতানে ভারত বর্মার কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরাজিত হয়। তারপর অলিম্পিকের

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলার দুটি দৃশ্য

ভ্রমণকারী চেকোস্লোভাকিয়া ও আই. এফ. এ. একাদশের সম্মিলিত খেলোয়াড়বৃন্দ

খেলায় ইরাণে ও কলিকাতায় ইরাণ দলের হাতে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয় এবং বলতে গেলে সেই থেকেই সুরু। ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান কলিকাতা আজ কবরস্থানে পরিণত। ফুটবল-রসিকরাও ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়ছেন। স্থানীয় দলগুলি কেবল নিজস্ব ক্লাবের ঐতিহ্য বাড়াতেই ব্যস্ত। নিজ প্রদেশের মান অথবা জাতীয় মান নেমে গেলেও তাতে কিছু এসে যায় না। আই. এফ. এ. শীল্ড, ডুরাণ্ড, রোভার্স কাপ পেলেই সন্তুষ্ট।

খ্যাতনামা মোহনবাগান দল বোম্বাইতে রোভার্স কাপে কাইন্যালে উঠল কিন্তু স্বল্পখ্যাত মফৎলাল গ্রুপের কাছেই পরাজিত হ'ল। এই মফৎলাল গ্রুপ আবার ডুরাণ্ডে প্রথম খেলাতেই পরাজিত হ'ল। কোন দলেরই কোন নির্দিষ্ট মান নেই। আজ কয়েক বছর ধরে কোন নতুন খেলোয়াড় আত্মপ্রকাশ করে নি। সেই জার্ণেল সিং, চুনী গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জী এখনও খেলে চলেছেন। তাঁদের স্থানে প্রতিনিধিত্ব করার মতন খেলোয়াড় আর দেখতে পাওয়া যায় না। এঁরা ছেড়ে দিলে ভারতীয় ফুটবলের মান যে আরও কোথায় নেমে যাবে তা কল্পনা করা যায় না। সম্প্রতি চেকোস্লোভাকিয়ার ফুটবল দল প্রতিকূল পরিবেশের ভেতর খেলেও যে বিজ্ঞানসম্মত ফুটবল খেলা দেখিয়ে গেলেন তার তুলনা বিরল। সফরকারী দলের কোচ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে গলদ কোথায়, ত্রুটি কোথায়। আমাদের খেলোয়াড়দের নব্বই মিনিট খেলার ক্ষমতা নেই, নেই শারীরিক পটুতা, আর খেলাও বিজ্ঞানসম্মত নয়। এখন সমস্ত বছরই ফুটবল খেলা চলে। এত বেশী খেললে কোন খেলোয়াড়ের পক্ষেই শরীর ঠিক রাখা সম্ভব নয়। নব্বই মিনিট খেলা খেলে সপ্তাহে একটা বা দুটোর বেশী খেলা উচিত নয়। খেলা ছাড়া শরীরের দক্ষতা বাড়াবার জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম ও জিম্‌ন্যাষ্টিক করা একান্ত প্রয়োজন, যা কোন খেলোয়াড়ই সম্ভবত তা করেন না। আর সর্বশেষে হচ্ছে প্রতিপক্ষের ত্রুটি খুঁজে বার করে সেইখানে আক্রমণ করা। এ না করলে খেলার উন্নতি হবে না। ভারতের বাইরে বেশীর ভাগ জায়গাতেই খেলা রাত্রে ফ্লাড লাইটে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের এখানে রাত্রে খেলার কোন ব্যবস্থাই নেই। ঠিক মতন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কোচিংও হয় না। স্বর্গত রহিম সাহেব যথাযথ ভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ভারতীয় দলকে কোচ করে আন্তর্জাতিক এশীয় ফুটবলে জয়মাল্য এনে দিয়েছিলেন। অলিম্পিকেও তখন ভারত সন্তোষজনক কলাকৌশলই প্রদর্শন করত কিন্তু রহিম সাহেবের মৃত্যুর পর থেকেই ভারতীয় দলের এই দুর্ভোগ ও দুর্দিন এসেছে। বিদেশের কোচ এনেও সুবিধে হয় নি। তা বলে ভারতীয় ফুটবলের যে সম্ভাবনা নেই এ কথা বলব না। পৃথিবীর সব দেশই যদি এগিয়ে যেতে পারে ভারতই-বা কেন পারবে না।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রোমঁ্যা রোলাঁ

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড	ফাল্গুন, ১৩৭২	পঞ্চম সংখ্যা

রোমাঁ্যা রোলাঁ্যা জন্মশতবার্ষিকী

বর্তমান জগতে যাঁহারা আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন ও সেই জন্য বহু স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মনীষী রোমাঁ্যা রোলাঁ্যা বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি ফরাসী দেশে ২৯শে জানুয়ারী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে রোলাঁ্যা ইতালীতে কয়েক বৎসর বাস করিয়া পাঠচর্চ্চা করেন ও পরে পুনরায় ফরাসী দেশে আসিয়া একোল নর্মাল সুপেরিয়রে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সঙ্গীতের ইতিহাসের গবেষণার জন্য তাঁহার প্রথমে খ্যাতি হয়। তিনি সঙ্গীত, সঙ্গীতনাট্য, চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেগুলি এখনও গুণী মহলে আদৃত ও সুপ্রচারিত। বেটোফেন, হ্যান্ডেল, মিকাল এঞ্জেলো, মিলে প্রভৃতির সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা লইয়া তিনি অনেকগুলি গ্রন্থের লেখক। তাঁহার উপন্যাস "জাঁ ক্রিস্তোফ" বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করে। ইহা একজন জার্মান সঙ্গীতকারের জীবনীর উপরে রচিত এবং সত্য ঘটনাবলীর সহিত কল্পনার অভিব্যক্তি মিলিত হইয়া এই উপন্যাস অপরূপ ভাব ও বর্ণনা বিন্যাসে ঐশ্বর্য্যশালী।

রোমাঁ্যা রোলাঁ্যা যুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে (২১ বৎসর) কাউন্ট লিয়ো টলষ্টয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন ও টলষ্টয় উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রোলাঁ্যা কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার মানবতাবাদের ও বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার আরও পূর্ণতর প্রমাণ করেন। এই চেষ্টার ফলে তিনি নিজ দেশবাসীদিগের অপ্রিয় হইয়া পড়েন ও সুইৎজারল্যাণ্ডে জিনিভা হ্রদের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ভিলনোভ শহরে নিজের বাসস্থান স্থির করিয়া সেখানে চলিয়া যান। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই তিনি জার্ম্মানীতে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি জার্ম্মানীতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দেই প্রভূতভাবে 'প্রচার লাভ করে। তাঁহার যুদ্ধ-বিরুদ্ধতার সমালোচক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকিলেও তিনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। ভারতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত রোলাঁ্যার বিশেষ পরিচয় ও সখ্য স্থাপিত হয়। এবং ইহার পরে রোলাঁ্যা ক্রমশঃ ভারত ও ভারতবাসীদিগের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ভারত সভ্যতার চর্চ্চাতে মনোনিবেশ করিয়া ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মহাত্মা গান্ধী নামক

গ্রন্থে তিনি ভারতের জননেতা গান্ধীজীর যে সমর্থন করিয়াছেন তাহা বিদেশী লেখকদিগের গান্ধীবাদ সমর্থনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া বিচার করা হয়। পরে রোলাঁ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বিষয়ে পুস্তক লিখিয়াও খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবাসীর সংস্থাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লীগ অফ নেশন্‌সের আমন্ত্রণে জিনিভা গমন করেন। সেই সময় তিনি রোলাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভিলনোভ গমন করেন। তিনি রোলাঁর সহিত আলাপ করিয়া খুবই আনন্দিত হন এবং ঐ মনীষীশ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত সুসাহিত্যিক বিশ্বশান্তির পূজারীর বিষয়ে অনেক কিছু প্রবাসীতে লেখেন। বর্ত্তমান কালে ভারতে রোমাঁ রোলাঁর বিষয়ে জ্ঞান ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। তাহা হইলেও ভারতে জ্ঞানী ও গুণী মহলে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এখনও অটুট রহিয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে ভারতের বহুলোক শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার জন্ম শতবার্ষিকীতেও সাধারণের উৎসাহের অভাব লক্ষিত হইতেছে না। ভারত তাঁহার অন্তরে স্থান পাইয়াছিল এবং তিনিও ভারতের অন্তরের বন্ধু।

রোলাঁ ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন কিন্তু তিনি অন্ধভাবে কোন ব্যক্তি বা মতের অনুসরণ করিতেন না। অবতারবাদে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলিতেন ভগবানকে কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিবার চেষ্টা প্রায় মানবতা ভুলিয়া জাতীয়তায় নিবিষ্ট হওয়ার মতই অসীমকে সীমার বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা। অতিমানব যিনি তাঁহার মধ্যেও আমরা সেই মহাসূর্য্যের আলোকই প্রতিফলিত দেখিতে পাই যে আলোক প্রতি শিশিরবিন্দুকেই আলোকময় করিয়া দীপ্তিদান করে। বহুদূর হইতে দেখিলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যের ব্যবধান আর দেখা যায় না। সকল অন্তরায়, মতের পার্থক্য ও অপর ব্যবধান মিলিয়া এক হইয়া যায় এবং মনে হয় স্থিতি যেন গতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। গতি, বিভেদের মধ্যে একতার সৃষ্টি করে। ভগবান মহাস্রোতা নদীর মত। সেই স্রোতের জল যেখান হইতেই নেওয়া যায়, তাহাতে অন্তরের তৃষ্ণা দূর করে। মানবপ্রাণের অন্তরতম প্রান্ত হইতে আধ্যাত্মিক আবেগের প্রবল জলধারা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া বাহিরে উৎক্ষিপ্ত হয়। তাহাই ধর্মের প্রেরণা। সে প্রেরণা মানবজনের স্পর্শে রূপান্তরিত হইয়া মতবাদের মেঘের সৃষ্টি করে। সেই মতবাদই আবার বৃষ্টির জলধারার মত সুদূর অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিয়া নূতন প্রেরণার উপকরণ হইয়া দেখা দেয়। গতি ও পরিবর্ত্তনের এই খেলা সৃষ্টির আবর্ত্তনের চলচ্চিত্র। উপনিষদের ঋষিদিগের বাণীই যেন নব ও বাস্তব কলেবর লাভ করিয়া ব্যক্ত হইতেছে। রোমাঁ রোলাঁর অন্তর্দৃষ্টি গভীর ও বহুদূরগামী। ভারতীয় সভ্যতা অনুশীলনকুশল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের সংখ্যা অল্প নহে। বেদ, বেদান্ত, কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ; সকল কিছুই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা চুলচেরা বিচার করিয়া নিজেদের আয়ত্তাধীন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইয়াছে অধিক ক্ষেত্রেই শবব্যবচ্ছেদের মত সুকৌশলের কার্য্য। জীবন্ত দেহের ভিতরে যে ভাব ও প্রাণ ছিল তাহার খবর অনেকেই পান নাই। রোলাঁ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি ভারতের এবং বিশ্বমানবের প্রাণের সাড়া নিজ প্রাণে অনুভব করিয়া সেই অনুভূতি তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

রোমাঁ রোলাঁ সকল কার্য্যে ও সকল চিন্তায় বিশ্বমানবের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের কথা সম্মুখে রাখিয়া চলিতেন। ইতিহাস, সাহিত্য, মানবতাবাদ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার রচনা সর্ব্বদা ঐ আদর্শ রক্ষা করিয়া পাঠকসমাজে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি নিজেও বলিয়াছেন যে, তিনি সখের কলাকৌশলে বিশ্বাস করেন না। যে পাণ্ডিত্য ও ভাবের অভিব্যক্তি মানুষকে আত্মবিস্মৃতিপরায়ণ করে তাহার কোন মূল্য নাই। মানুষের নিজ স্বরূপ উপলব্ধি মনের সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। তিনি সেইরূপ মানুষের সন্ধানেই সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন যাঁহারা আত্ম উপলব্ধিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সকল লোকের সহিত পরিচয়েই রোলাঁ নিজ আদর্শের পূর্ণ বিকশিত রূপ দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে আদর্শ তাঁহার মুখের কথায় মাত্র ছিল না। তাহার মধ্যে ছিল তাঁহার সারা জীবনব্যাপী সাধনা ও কঠোর আত্মপরীক্ষার অন্তহীন ধারা।

সরকারী কারবার

ভারত সরকার কর্ম্মদক্ষতা বা কার্য্যকৌশলের জন্য প্রসিদ্ধ নহেন। এমন কি ইহাও বলা যায় যে, ভারত বা অপর কোনও সরকার হাত লাগাইলেই যে কোন কার্য্য, কারবার অথবা প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক ভাবে অকেজো হইয়া যায়। কিন্তু আদর্শবাদ অনেক ক্ষেত্রে; বিশেষ করিয়া যাঁহারা আদর্শবাদের অভিনয় করিয়া রাজশক্তি পূর্ণতর ভাবে নিজ করায়ত্ত করার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে; একটা মারাত্মক নেশার মত হইয়া দাঁড়ায়। এই নেশার ঘোরে মানুষ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া একের পর এক পুরাতন কারবার বা প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়া দেশের ও জাতির ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রুশিয়া দেশে প্রথম যখন চাষবাস জাতীয় ভাবে করিবার চেষ্টা হয় তখন তৎকালীন অকর্ম্মা আদর্শবাদীদিগের বে-বন্দোবস্তের ধাক্কায় প্রায় দেড় কোটি লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারায়। ক্রান্‌লেন্‌ কমিটির অনুসন্ধানের বিবরণ হইতে তাহা বিশ্ববাসী জানিতে পারেন। অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদী দেশে কি হইয়াছে তাহা জানা কঠিন নহে। এ কথা সর্ব্বজনবিদিত যে, মানুষ নিজের কার্য্য যদি নিজের লাভের জন্য করিতে পারে তাহা হইলে কার্য্য সর্ব্বোত্তম ভাবে হইয়া থাকে। এমন কি নিজের কার্য্যে যাহারা কর্ম্মী হিসাবে নিযুক্ত হয় তাহাদিগের অবস্থাও উত্তম হইতে পারে। কারণ কোন ব্যক্তির সহিত কর্ম্মিগণ যে ভাবে দরদস্তুর করিয়া নিজেদের আর্থিক উন্নতি করিয়া লইতে পারে, সরকারী মালিকানার ক্ষেত্রে তাহারা সেইরূপ করিতে সক্ষম হয় না। সরকারী সকল কারবারে এইজন্য কর্ম্মীদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের কর্ম্মীদিগের আর্থিক অবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সুইডেন, ওয়েষ্ট জার্ম্মানী, সুইৎজারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের লোকেদের বেতন ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহাদিগের জীবনযাত্রার ধরনও উচ্চতম। এই সকল দেশে জনসাধারণের উন্নতি সাধিত হয় সরকারী ব্যবস্থায় ও সেই ব্যবস্থা করা হয় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিয়া এবং খাজনা মাশুল আদায় করিয়া। যাহা আদায় হয় তাহাও সুসংবদ্ধভাবে ব্যয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু সরকারী কারবার অধিক ব্যাপকভাবে প্রবল হইয়া উঠিলে দেখা যায় খাজনা মাশুল আদায়ও ঠিকমত হয় না এবং অপচয় ও অপব্যয় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে। ভারত সরকারের কার্য্যে অক্ষমতার পরিচয় আমরা সর্ব্বত্রই পাইয়া থাকি। কোর্ট-আদালতে, পুলিসের সাহায্যে ন্যায়দণ্ড প্রতিষ্ঠায়, রেলওয়ে পরিচালনায়, ডাকঘরের ও তার-টেলিফোনের ব্যবস্থায়, বড় বড় কারবার স্থাপন করিয়া লোকসান খাওয়ায়, জলসরবরাহ ও বন্যাদমন প্রচেষ্টায় এবং সকল প্রকার কণ্ট্রোল, পারমিট, লাইসেন্স প্রভৃতির খিলি-ব্যবস্থায়। এই যে সর্ব্বব্যাপী কর্ম্মশক্তিহীনতা ইহার জন্য আজ ভারতবাসী ১৮ বৎসর কাল স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া সর্ব্বাধিক সংখ্যায় ভিখারীর ন্যায় গরীব ও অরণ্যবাসীর মতই নিরন্ন। অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রা পদ্ধতি নিম্নতম ধারার। অথচ আদর্শবাদের মনোন্মত্ত অশোক মেহতা ভাবে বিভোর হইয়া আর কোন কোন জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর সমাজতন্ত্রের খড়্গ চালান যাইতে পারে তাহার পরিকল্পনায় নিমজ্জমান। একবার পূর্ণরূপে ডুবিয়া যাইলে অশোক মেহতার উচ্চ আদর্শ বা নৈতিক পবিত্রতা দেশকে পুনর্ব্বার গভীর জল হইতে টানিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে না। এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের মধ্যে তাঁহার মত তত্ত্বনীতিজ্ঞান সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় না। বৃহৎ বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জীবনবীমা সরকারী হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে সরকারী অপব্যয় নীতির সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি নিজেদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ বীমার জন্য দিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য তাঁহারা যথাযথ ভাবে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাইতেছেন বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও সরকারী "ঢিলাবাজি" ও যথেচ্ছাচার প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সরকারী ভাবে চালিত ব্যাঙ্কগুলি অংশীদার চালিত ব্যাঙ্ক অপেক্ষা উত্তম বলিয়া মনে হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী ব্যাঙ্ক ঠিক ভাবে চালিত হয় না। এবং মনে হয় ব্যাঙ্ক সমাজতন্ত্রাধীন হইলে আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা সরকারের সাহায্যার্থেই অধিকমাত্রায় নিযুক্ত হইবে; প্রজার জন্য বিশেষ কিছু সম্ভবত অবশিষ্ট

থাকিবে না। সরকারের সাহায্যে জাতীয় উপার্জন ও সঞ্চয়ের অর্থ যদি আরও অধিক করিয়া লাগাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহার ফলে ক্রমশঃ টাকার ক্রয়শক্তি আরও কমিয়া যাইবে। কারণ সরকারী কারবারের দ্রব্য উৎপাদনে অক্ষমতা। টাকার মূল্য বা দ্রব্য ক্রয় ক্ষমতা এখন ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় এক-সপ্তমাংশে দাঁড়াইয়াছে। মনে হয় শীঘ্রই তাহা এক-দশমাংশে পৌঁছিবে। তাহা হইলে তখন দশ টাকার পরিবর্তে এক "নয়া রুপিয়া" দিবার ব্যবস্থা করিতেও হইতে পারে। ইহা করিতে পারিলে জাতীয় মূলধন গ্রাস করা আরও পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে। অক্ষমকে ক্ষমতা দিয়া উচ্চ আসনে বসাইলে তাহার ফল সর্ব্বদাই মারাত্মক হয়। যেখানে বাছাই করিয়া অনেকগুলি অক্ষম ও অহঙ্কারমত্ত লোক একত্র করা হয় সেখানে সর্ব্বনাশ আরও নিকটে আগাইয়া আসে। ভারত সরকারের উচিত প্রথমত যত ঋণ করা মূলধন কারবারে লাগান হইয়াছে সেই অর্থ বিনিয়োগ লাভজনক করিয়া তোলা। যত কর্জ্জা করা হইয়াছে তাহার সুদ ও আসল দিতে হইলে সরকারী কারবার প্রভৃতি উত্তমরূপে উৎপাদনশীল হওয়া প্রয়োজন। তাহা এখন অবধি হয় নাই এবং ইহার ফলে জাতীয় ঋণের বোঝা গরীব ভারতবাসীর উপর পরিবার-পিছু কত দাঁড়াইয়াছে তাহা বিচার করা বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ্চ ভারত সরকার যে সকল ঋণের উপর সুদ দিয়াছিলেন তাহার মোট পরিমাণ ছিল ৮৫৯৭ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ধার ছিল ৭৭৯.২ কোটি টাকা, ব্রিটেন ২২০.৭ কোটি টাকা, ওয়েষ্ট জার্ম্মানী ১৭৩.১ কোটি টাকা, সোভিয়েত ১৬৭.৭ কোটি টাকা, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ১৮১.৮ কোটি টাকা ও আই. ডি. এ. ৭২.৪ কোটি টাকা। এখন ভারতের মোট ১০,০০০ কোটি টাকা ঋণ আছে ধরা যাইতে পারে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহা দ্বিগুণ হইবে বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ ভারতে যদি দশ কি পনের কোটি পরিবার আছে ধরা যায়, তাহা হইলে পরিবার-পিছু ১০০০ টাকা ধার সরকারী "কার্য্যের" খাতায় হইয়া রহিয়াছে বলা যায়। ভারত সরকার ঋণের জন্য সুদ দিয়া থাকেন প্রায় বাৎসরিক ৩০০ কোটি টাকা অর্থাৎ পরিবার-পিছু পঁচিশ-ত্রিশ টাকা। একটা পরিবারের গড়পড়তা মোট বাৎসরিক আয় হইবে সাত-আট শত টাকার অধিক নহে। তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যদি কোন সময় ১০০০ টাকাও হয়, তাহা হইলেও সরকারী ঋণ বাড়িয়া তাহার সুদের পরিমাণও পঞ্চাশ-ষাট টাকায় দাঁড়াইবে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের আয়-ব্যয় ও ঋণ-কর্জ্জা কিছু কম নহে এবং রাজস্ব আদায় বাড়িয়া বাড়িয়া ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৮০০ কোটি টাকা এখন ২০০০ কোটিতে উঠিয়াছে। সকল লক্ষণ বিচার করিলে রাজস্ব চালনা লাভজনক ভাবে হইতেছে না এবং দেউলিয়া না হইতে হইলে আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন আবশ্যক মনে হইতেছে। অশোক মেহতার মতে বোধ হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ যত বৃদ্ধি পাইবে জনসাধারণের ততই স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও মঙ্গল হইবে। বর্ত্তমানে সামাজিক আধিপত্য যতটা হইয়াছে তাহাতেই জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পূর্ব্বের তুলনায় বহুবিধভাবে কমিয়া গিয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বে দুই-তিন কামরার গৃহে বাস করিতেন তাঁহারা এখন একখানা কামরা পাইতেই রোজগারের অর্দ্ধেক গৃহের ভাড়া দিতে খরচ করিতে বাধ্য হয়েন। সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম পয়গম্বর এঙ্গেলস্-এর মতে বাড়ীর ভাড়া রোজগারের শতকরা ১৬⅔ অংশের অধিক হওয়া উচিত নহে, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের সমাজবাদে তাহা শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগে পৌঁছিয়া গিয়াছে। খাওয়ার সময় লোকে মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতির নাম ভুলিয়া গিয়াছে। চাউল-আটাও ভুলিতে বসিয়াছে। রন্ধনে ঘৃতের পরিবর্তে বাদাম তেল অথবা ডালডাই চলিয়া থাকে। বস্ত্রে সংক্ষেপ ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করিয়া যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহাতে আধুনিকতার অজুহাতে বস্ত্রাভাবের সাফাই গাওয়া হইতেছে। পুস্তক, পত্রিকা, ঔষধ, ডাক্তার, যানবাহন, অস্ত্র, হাতিয়ার ইত্যাদি সকল কিছুই ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া যাইতেছে। অভাব আকারে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছে ও তাহা কেহ দমন করিতে পারিতেছে না। এই সকলের মূল কারণ জাতীয় অর্থনীতি গায়ের জোরে স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে চালনা করা। তথাকথিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির ফলে আর্থিক উন্নতি যদি কিছু হইয়া থাকে ত

অবনতি হইয়াছে আরও বহু-বিস্তৃত ভাবে ও জাতীয় জীবনের শাখায়, প্রশাখায়, পাতায় পাতায়। ইহার কারণ জাতীয় অর্থনীতি শতসহস্র ধারায় প্রবহমান এবং সমাজতন্ত্র-চালিত ধারা মাত্র কয়েকটি। সকল বা অধিকাংশ রস যদি জোর করিয়া ঐ অল্পসংখ্যক পথে বহান হয় তাহা হইলে জাতীয় জীবনের বহু সহস্র ক্ষেত্র রসহীন হইয়া শুখাইয়া উঠে। সরলতা সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়া নূতন রস নূতন পথে চালাইবার মত বুদ্ধি ও ক্ষমতা ভারতের জননেতাগণ দেখাইতে পারেন নাই।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ ভারতবর্ষে ২৬,০০২টি কোম্পানী ২,৩৮৯ কোটি টাকা মূলধন লইয়া কাজ করিত। ইহার মধ্যে ২০,০৪৬টি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ছিল। এইগুলির মূলধন ছিল ১২৫৯ কোটি টাকা। ঐ দিনেই সরকারী কোম্পানির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭৮টি। কিন্তু এইগুলির মূলধন ছিল মোট ৮৯৫½ কোটি টাকা। যে সকল লোক ভারতের এই ২৬,০০২টি প্রতিষ্ঠান চালাইতেন তাঁহাদিগের সংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি ছিল এবং পোষ্য গণিলে দেখা যাইত যে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উপর প্রায় ৩ কোটি লোক নির্ভর করিয়াছিলেন। বলা যাইতে পারে যে, সমাজতন্ত্রাধীন কারবারগুলি বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছায়াপাত করিতে পারে নাই। ঐ একই দিবসে ভারতবর্ষে ৭৮টি শিডিউল ব্যাঙ্ক ও ১৬৯ নন-শিডিউল ব্যাঙ্ক ছিল। বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলিতে মজুদ টাকা ছিল ১৫২২ কোটি। ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে ছিল ৬৮২ কোটি টাকা। বিগত কয়েক বৎসরে নানা উপায়ে সকল ব্যাঙ্ক, ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক মিলিতভাবে সরকারী কার্য্যকলাপের সাহায্যে নিজ নিজ হস্তে মজুত সকল অর্থের অধিক অংশ লাগাইয়া আসিয়াছে। ইহার উপরে হইল জীবন বীমার টাকা। এই টাকাও যথারীতি সরকারী কারবারে নিয়োগ করা হইয়াছে ও সকল দিক দিয়াই জাতীয় সম্পদ যথাসম্ভব সরকারী কারবারের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। অশোক মেহতা ইহাতে খুশী নহেন। তাঁহার সমাজতন্ত্র-প্রসার ইচ্ছা পূর্ণ হইলে ভারতের তিন কোটি লোক অন্নবিত্তের বিপন্ন হইবেন এবং বিংশ সহস্রাধিক বেসরকারী কারবার ধ্যানের সাহায্য হারাইয়া পঙ্গু হইয়া ভারত-প্রগতির যূপকাষ্ঠে আত্মবলিদান দিয়া ধন্য হইবে। রঙ্গমঞ্চ প্রশস্ত নহে—অভিনয়ে অসুবিধা হইতেছে। অভিনয়ের ক্ষেত্র প্রসারের ফলে দর্শক ও শ্রোতাগণ পথে বসিতে বাধ্য হইবেন, মনে হয়।

ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়ভাবে সমাজতন্ত্রের কবলে না ফেলিয়া অশোক মেহতার উচিত সমাজের সুখ-সুবিধা বাড়াইবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবস্থা বুদ্ধি দ্বারা কিছু কিছু করিয়া নিজের কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় ও প্রমাণ দেওয়া। যথা, বাসে ও রেলগাড়িতে যাত্রীদিগের বাদুড়ের মত ঝুলিয়া ঝুলিয়া যাহাতে না যাইতে হয় তাহার ব্যবস্থা করা। মনি অর্ডার পাঠাইলে গ্রামের লোকে যাহাতে টাকা দুই-তিন মাস পরে বা একেবারেই না পায় তাহা নিবারণ করা। টেলিফোনে বারের নম্বর ঘুরাইয়া যাহাতে বধিরের সহিত কথা বলিবার প্রয়োজন না হয় তাহার ব্যবস্থা করা। প্রতি প্রদেশে আইন থাকা সত্বেও যাহাতে লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকার বিবাহ না হয় তাহা নিয়ন্ত্রিত করা। একই শহরে এক বর্গফুট গৃহস্থান ভাড়া লইতে কাহাকেও মাসিক দুই টাকা হারে ভাড়া দিতে বাধ্য হইতে হয় ও অপর কেহ পূর্ব্ব-কালের ভাড়া চালাইয়া এক আনা বর্গফুট হিসাবে ভাড়া দেয়—এই ক্ষেত্রে সাম্য স্থাপন চেষ্টা করা। লক্ষ লক্ষ একর জমি মালিকদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখা নিবারণ করা ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীমেহতা ও অপর সকল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীদিগের নিজ নিজ কার্য্য না করিয়া নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজিয়া বেড়াইবার কোনও প্রয়োজন নাই। প্রথমে যে চিঁড়া ভিজান হইয়াছে তাহা যথাযথ ভাবে উঠাইবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; পরে আরও চিঁড়া ভিজাইবার ব্যবস্থা করা সহজেই হইবে। হাতের কাজে ঢিলা দিয়া নূতনের ধান্দায় ঘুরিয়া বেড়ান সুবুদ্ধির লক্ষণ নহে।

বৈদেশিক অর্থের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের বহু দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয় ও যাঁহারা সেই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া নিজ নিজ দেশে লইয়া যান

তাঁহাদিগের দেওয়া অর্থ বিদেশে ভারতের প্রাপ্য হিসাবে জমা হয়। ভারত যে সকল দ্রব্য বিদেশে ক্রয় করে ঐ সকল অর্থ দিয়া সেইগুলির দাম দেওয়া হয় বলা যাইতে পারে। বিষয়টা ঠিক অতটা সরল সহজভাবে ঘটে না; কিন্তু মূল কথা এই যে, আমদানি বস্তুর দাম রপ্তানি বস্তুর মূল্য দিয়াই শোধ হয়। ভারতের আমদানি ও রপ্তানির তালিকা হইতে দেখা যায় যে, বর্তমান কালে ভারতের আমদানির পরিমাণ সর্ব্বদাই রপ্তানি হইতে অধিক হইতেছে। এবং আমদানি বজায় রাখিবার জন্য ভারত বিদেশী অর্থ ঋণ করিয়া জোগাড় করিতেছে।

	আমদানি		রপ্তানি	
	বাণিজ্যবস্তু	সোনাদানা	বাণিজ্যবস্তু	সোনাদানা
১৯৬১	১০৭৮ কোটি	৪ কোটি	৬৬০ কোটি	৬ কোটি
১৯৬২	১০৬২ ,,	৪ ,,	৬৭৩ ,,	৫ ,,
১৯৬৩-৬৪	১১৪৩ ,,	১ ,,	৭৬৬ ,,	৮ ,,

রপ্তানি হইতে আমদানি অধিক হওয়াতে প্রথমত বিদেশী অর্থ কর্জ্জ করিয়া আমদানির মূল্য দিতে হয় ও পরে কর্জ্জার অর্থের সুদ ও আসল দিবার জন্য পুনর্ব্বার কর্জ্জ করিতে হয়। এই প্রকারে ভারতের বিদেশী অর্থ রোজগার যথেষ্ট না হওয়ায় কর্জ্জ বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহা কি করিয়া শোধ হইবে তাহা বলা কঠিন। এখন বিদেশী অর্থের প্রয়োজন বাৎসরিক প্রায় ১১০০ শত কোটি টাকা কিন্তু রোজগার হইতেছে রপ্তানি মাল বিক্রয়ের দ্বারা মোটামুটি ৮০০ কোটি টাকা। রপ্তানি মাল সবই পূর্ব্বের ন্যায় আছে; তিন বার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিয়া নূতন গড়া প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদিত বস্তু রপ্তানি করিয়া বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। সেই পুরাতন ব্যক্তিগত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানজাত মালই রপ্তানি হইতেছে। যথা, মাছ, বাদাম, কফি, চা, মশলা, তেল, তামাক, চামড়া, কাঠ, পশম, সুতার কাপড়, পাট, অভ্র, খনিজ বস্তু, গালিচা, রেশম, জুতা ইত্যাদি ইত্যাদি, সুতরাং সরকারী কারবার গড়িয়া এখন অবধি এই ক্ষেত্রে কোন সুবিধা হয় নাই দেখা যাইতেছে। অথচ অর্থনৈতিক মন্ত্র হইল "যার শিল যার নোড়া" ইত্যাদি।

বিদেশী অর্থ সংগ্রহের জন্য নূতন কিছু রপ্তানির ব্যবস্থায় অক্ষমতা ভারত সরকারের পুরাপুরি দেখা যাইতেছে। আমদানির ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সকল না আনাইতে পারায় বহু ক্ষেত্রে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। আর দেখা যাইতেছে ঔষধের অভাবে চিকিৎসা বন্ধ হওয়া। ভিটামিন বি-৬এর দাম ২৫০ টাকা কেজি হইতে বাড়িয়া ৩৫০০ টাকা কেজি কালোবাজারের দর হইয়াছে। ভিটামিন সি ৮০ টাকা কেজি হইতে এখন ৬০০ টাকা কেজিতে দাঁড়াইয়াছে। হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় ঔষধ বাজারে নাই। আইওডিন পাওয়া কঠিন এবং আরও বহু ঔষধ পাওয়া অসম্ভব হইয়া যাইতেছে। খাদ্যসমস্যা ক্রমশঃ প্রকট হইতেছে। খাদ্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হইতেছে কিন্তু ধারে বা বিনামূল্যে নহে। দাম দিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিলে এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার আমদানি করিলে বিদেশী অর্থ প্রয়োজন হইবে। ৩১শে মার্চ্চ ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় ১৯৬৩-৬৪ বৎসরে আমদানি হইয়াছিল দুগ্ধ জাতীয় জিনিস ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার, গম প্রভৃতি ১০২ কোটি ৮৫ লক্ষ, চাউল ২০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার, খাইবার উপযুক্ত বাদাম-পেস্তা-আখরোট-কিসমিস প্রভৃতি ১৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার, নারিকেল (শুষ্ক) ৮ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার, পশম ৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার, তুলা ৪৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার—অর্থাৎ মোট বিদেশী অর্থ যাহা মাল রপ্তানি করিয়া পাওয়া গিয়াছিল তাহার প্রায় ⅓ অংশ। এই সকল বিষয় আলোচনা ও বিচার করিলে বুঝা যায় যে, আর্থিক পরিকল্পনা যাঁহারা করেন ও তাহাকে বাস্তবরূপ যাঁহারা দিবার ভার গ্রহণ করেন; সকলেই অক্ষমতা দোষদুষ্ট। ইঁহারা যদি ব্যক্তিগত ভাবে ও ব্যবসা হিসাবে এই সকল কার্য্য করিতেন তাহা হইলে ইঁহাদিগের বহুবার চাকুরি হইতে বরখাস্ত হইতে হইত এবং ব্যবসাটিতেও রিসিভার নিযুক্ত করা হইত। কিন্তু সমাজতন্ত্র ব্যবসা বা কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসমষ্টির সম্পত্তি নহে। সুতরাং সমাজতন্ত্রে অক্ষমের স্বৈরাচার অদম্যগতিতে চলিতে থাকিতে পারে। ইহা জনসাধারণের দুর্ভাগ্যের কথা।

তাসখন্দের পরে

তাসখন্দের ভারত-পাকিস্তান শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টার মূলে ছিল কয়েকটি কথা—যাহার জন্য যুদ্ধগতপ্রাণ পাকিস্তান ভারতের সহিত শান্তি স্থাপনে উৎসাহ দেখাইতে কার্পণ্য করে নাই। প্রথম কথা ছিল ভারতীয় জোয়ানদিগের নিকট পাকিস্তানের সেনাদলের পরাজয়। লাহোর ও শিয়ালকোট দখল করিয়া লইলে শান্তির আগ্রহ আরও প্রবল হইত; কিন্তু ব্রিটেন ও আমেরিকার কারসাজিতে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ ক্রতগতি আগাইয়া আসিয়া যুদ্ধবিরতি কায়েম করাতে সে কার্য্য করা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় কথা ছিল পাকিস্তানের পরাজয়ের ফলে ঐ দেশের সহায়ক আমেরিকা ও ব্রিটেনের পাকিস্তান প্রেমে কিছুটা ভাটা পড়া। ইহার ফলে পাকিস্তানকে যখন রুশিয়া আমন্ত্রণ করিয়া ভারতের সহিত শান্তির আলোচনায় যোগদান করিতে বলিলেন, তখন পাকিস্তান রুশিয়াকে নারাজ করিতে সাহস করিল না, এবং তাসখন্দে যাইতে রাজি হইয়া গেল। রুশিয়া পাকিস্তানকে কি ভাবে ভয় অথবা লোভ দেখাইয়া রাজি করিয়াছিলেন সে কথা কেহ জানিতে পারে নাই। তৃতীয় ও শেষ কথা ছিল তাসখন্দের মীমাংসা অপেক্ষা অধিক লাভজনক ব্যবস্থা পাকিস্তানের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না এবং ভারতও ঐ প্রকার মীমাংসায় রাজি হইয়া ততটা লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং পাকিস্তান নিজের সুবিধা বুঝিয়াই ঐ ব্যবস্থায় রাজি হইয়াছিল। ভারতের জননেতাগণের তাসখন্দ মীমাংসা লইয়া অধিক আনন্দ দেখাইবার খুব কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে কংগ্রেসী রাজত্বে ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি বিশেষ ভঙ্গপ্রবণ ও অচল হইয়া দাঁড়ানতে ভারতের বাস্তবতাবাদী তৎকালীন নেতা লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে গিয়া যেনতেন প্রকারে শান্তি স্থাপন করিয়া যুদ্ধের খরচ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের কর্মক্ষমতাহীন জননেতাদিগের বৈষ্ণবভাব চরিতার্থ করিবার জন্য তাসখন্দ মীমাংসা করা হয় নাই। এবং অতঃপর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলেও কংগ্রেসী অপব্যয়নীতি আবার ভারতকে অর্থনৈতিক দুর্দশায় ফেলিবে না তাহারও কোন নিশ্চয়তা দেখা যায় না।

রুশিয়ার চন্দ্রবিজয় অভিযান

রুশিয়ার বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদগণ ইতিপূর্ব্বে হাউই-চালিত অস্ত্রধারা চন্দ্রের উপর আঘাত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রশিল্পীগণও সেইরূপ ভাবে চন্দ্রের উপর আঘাত করিতে পারিয়াছিলেন। পরে রুশিয়ার বৈমানিকগণ সুদূর আকাশে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেখানে ক্ষীণ, সেই সকল ক্ষেত্রে হাউই-চালিত রথ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া আকাশে বিচরণ করিয়া জগতবাসীকে বিস্মিত করেন। আমেরিকান বৈমানিকগণও কিছু পরে এই ভাবে অন্তরীক্ষে ভাসিয়া বেড়াইয়া রুশিয়দিগের সহিত সমকক্ষতা স্থাপন করেন। অতঃপর চন্দ্রের উপর হাউই-চালিত যান পাঠাইয়া বেতার সঙ্কেতে ক্যামেরা চালাইয়া ছবি উঠাইয়া তাহা বেতারে পৃথিবীতে আনাইয়া প্রথমে রুশিয়া ও পরে আমেরিকা এই নব ইন্দ্রজালের আরও আশ্চর্য্য অভিব্যক্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই সকল হাউই-চালিত যান চন্দ্রের উপর ঘণ্টায় বহু সহস্র মাইল বেগে ছুটিয়া পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। চন্দ্রের সহিত সংঘর্ষণ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত অবধি যে সকল ছবি উঠান যাইত তাহা পৃথিবীতে আনা যাইত; কিন্তু ধাক্কা লাগিবার পরে আর কিছু পাওয়া সম্ভব হইত না। এই কারণে চন্দ্রের উপর সহজ ও হাল্কা ভাবে পতন-সংঘর্ষণ ও তীব্র আঘাত না করিয়া হাউই যানগুলিকে চন্দ্রে অবতরণ করাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। বর্ত্তমানে বহু চেষ্টার পরে ও বার বার বিফল হইবার পর রুশিয়ার হাউই যান "লুনা-৯" চন্দ্রের উপর ধাক্কা বাঁচাইয়া নামিতে সক্ষম হইয়াছে। এবং চন্দ্রের বক্ষে অবস্থান করিয়া "লুনা-৯" বহু বেতার প্রেরিত চিত্র পৃথিবীতে পাঠাইতেছে। যে হাউই-চালিত যান পৃথিবী হইতে চন্দ্রমণ্ডলে গমন-কালে ঘণ্টায় ৭০০০ মাইল বেগে যাত্রা আরম্ভ করিয়া পরে ১৮,০০০ মাইল বেগে চলিয়া চন্দ্রলোকে পৌঁছায়, তাহার গতিবেগ প্রশমন অতি কঠিন কার্য্য। কারণ চন্দ্রের চারিদিকে কোনও বায়ুর

আবরণ না থাকায় গতিবেগ নিবারণ করিবার জন্ত প্যারাসুট ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। সুতরাং একমাত্র উপায় হইল ঐ হাউই-যান যাত্রাকালে যে ভাবে হাউই চালাইয়া ক্রমশঃ দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে চন্দ্রের দিকে চালিত হয়; চন্দ্রের নিকটে আসিলে বিপরীত দিকে হাউই চালাইয়া সেই গতিবেগ কমান। উল্টামুখে হাউই চালাইয়া ঠিক হিসাব করিয়া যথাযথ ভাবে প্রতিকূল গতিশক্তি সৃষ্টি করিয়া ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগ ঠিক ধাক্কা লাগিবার মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলা অতিবড় গণিতের অঙ্ক কষার কথা। দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে চন্দ্র অতি দ্রুতবেগে শূন্য পথে চলিয়াছে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হাউই যান ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সেই যান ৭ হাজার হইতে ১৮ হাজার মাইল বেগে ঘণ্টায় ধাবমান চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। বেতার সঙ্কেত যোগে হাউই যান যথাস্থানে যথাসময়ে বিপরীত গতি হাউই দিয়া নিজ গতিবেগ সম্বরণ করিয়া চন্দ্রের উপর নির্দ্ধারিত সময়ে ও স্থানে সংঘর্ষণ-বর্জ্জিত ভাবে নামিয়া অবস্থিত হইবে। রুশির বৈজ্ঞানিকদিগের হিসাব করিবার ক্ষমতা অতুলনীয় বলিতে হইবে।

যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, চন্দ্রের উপরে অতি গভীর ভাবে ধুলা জমিয়া আছে বলিয়া যে ধারণা ছিল তাহা ভুল। কারণ লুনা-৯ ধুলায় বসিয়া ডুবিয়া যায় নাই। আরও জানা যাইতেছে যে চন্দ্রের উপরে নামিয়া বসিবার মত উপযুক্ত শক্ত জায়গা আছে। অন্য কি খবর পাওয়া যাইবে তাহা অতঃপর বুঝা যাইবে। চন্দ্রে যদি মানুষ যায় তাহা হইলে তাহাদের কি ভাবে প্রস্তুত হইয়া যাইতে হইবে এখন হইতে তাহার হিসাব হইতেছে। চন্দ্রে মাধ্যাকর্ষণ জোরাল নহে। মানুষের ওজন সেখানে অনেক কমিয়া যায়। এক লাফে মানুষ পৃথিবীর হিসাবে সেখানে বহুদূর চলিয়া যাইবে। অম্লজান বাষ্প নাই বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা কৃত্রিম উপায়ে করিতে হইবে। আর কি কি অবস্থায় মানুষ পড়িবে তাহা পূর্ব্ব হইতে জানা সম্ভব নহে। তবে সম্ভবত অতঃপর মানুষ মধ্যপথে সুদূর আকাশে দুই-একটা হাউই যান আস্তানা ভাসাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে চন্দ্রে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন উভয় কার্য্যই সহজ হইবে। এই প্রকার আস্তানা বা আলমাম "ষ্টেশন" নির্ম্মাণ করা সহজেই হইবে। রুশিয়া ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে মনে হয় মানুষ কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রে গমন করিতে পারিবে।

কংগ্রেসের (দেশ) রক্ষণ ও গঠন

কংগ্রেসের কোন মহা-অধিবেশন হইলেই তাহাতে বহু মহাপুরুষের অন্তরের আশা ও আগ্রহের কথা বারম্বার উচ্চারিত হইয়া দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। অধিবেশন শেষ হইয়া যাইবা মাত্র আশা আগ্রহেরও পূর্ণ প্রশমন হইয়া যায়। ইহার কারণ, মহাপুরুষদিগের মহত্ত্বের শুধু শব্দে ও বাক্যেই আরম্ভ ও শেষ হইয়া থাকে। এইবারে জব্বলপুরে, যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাহাতে শুনা যায় যে, বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষাধিক হইয়াছে। ইঁহারা যদি দেড় বিঘা করিয়া নূতন জমি চাষ করিতেন তাহা হইলে একরে এক টন হারে ধরিলে ৮৫ লক্ষ টন নূতন খাদ্যবস্তু উৎপাদিত হইয়া ভারতের ভিক্ষাপাত্র লইয়া বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইত না। কিন্তু কংগ্রেস জ্ঞান ও আদর্শের উৎস, কর্ম্ম কিংবা জীবনধারণের উপকরণ কংগ্রেসের নিকট চাওয়া কখনও উচিত বিবেচিত হইবে না। চতুর্ব্বর্গের মধ্যে ধর্ম্ম ও মোক্ষের ভার পূর্ণরূপে কংগ্রেসের উপরে বিন্যস্ত। মধ্যের দুই বর্গ কংগ্রেস দ্বারা শুধু কথাইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত। দারিদ্র কাহার কংগ্রেসনেতাগণ বলিতে পারেন না বা জানিলেও বলেন না। কাহার কোন কোন অধিকার কাড়িয়া লইলে কংগ্রেসের ও দেশের কি কি ভাবে উন্নতি হইতে পারে, কংগ্রেসনেতাগণ তাহার চিন্তায় বিভোর। কংগ্রেসের সকল অধিকার যদি দেশবাসী কাড়িয়া লয় তাহা হইলে কি হইবে, এ চিন্তা এখনও নেতাদিগের মনে উদিত হয় নাই। কংগ্রেস সুরক্ষিত ও সুগঠিত হইয়াছে। দেশ হয় নাই। অতএব এই আলোচনা এখন সমীচীন।

ঋষি টলষ্টয়ের একখানি চিঠি

রমঁ্যা রলাঁ

মহাত্মা টলষ্টয়কে আমি প্রথম চিঠি লিখি সে আজ চল্লিশ বছর আগেকার কথা; ১৮৮৭ সালের যে মাসে তাঁকে চিঠি লিখিবার একটা তাগিদ আসে; তরুণ যৌবনের সংশয়-সন্দেহের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা নিশ্চয়ভূমি খুঁজিতেছিলাম। আমি আছি—কারণ আমি অনুভব করিতেছি—এই অপরোক্ষ অনুভূতির উপর ভূমার আমার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম—সেই প্রচেষ্টার ইতিহাস আমার Credo Zunia Verum শীর্ষক প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে। ("আত্মদর্শন", প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২ দ্রষ্টব্য)।

সে সময় টলষ্টয় 'শিল্প বস্তুটা কি?' (What is Art) লিখিয়াছেন। শিল্পীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া মনের মধ্যে বিষম একটা খট্‌কা লাগিল; টলষ্টয়কে আমি বুঝিতে পারিলাম না। সেই সময় তাঁকে যে চিঠিখানি লিখি তার দুই চারিটি টুকরা মাত্র আমার ডায়েরীতে টোকা ছিল। তার সাহায্যে আমার মনের অবস্থাটার কিছু আভাস দিই:

আমার চিঠি

মহাত্মন্! আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমায় আপনাকে চিঠি লিখিবার দুঃসাহস দিয়াছে। অপরিণতমতি এই দীন ভক্ত আপনাকে কতকগুলি নিরর্থক উচ্ছ্বাস শুনাইতে আজ আপনার সম্মুখে আসে নাই। সে ভাবে আপনার প্রতি অমর্য্যাদা দেখাইতে আমি পারি না, কারণ আমি আপনাকে নিবিড় ভাবে চিনি..........

মৃত্যু আমার চারিদিকে যেন এক কুহকজাল বিস্তার করিয়াছে; আপনার গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অনুভব করিয়াছি যেন প্রতিপদে মৃত্যুর হাতছানি—বিশেষত আপনার আইভান্ ইলিচ্ (Ivan Ilitch) পাঠে আমার মন যেন অস্থির হইয়াছে। ... ... আমি বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছি এই যে প্রতিদিনের কেজো জীবনটা আমাদের সত্য জীবন নয় ... ...। এক দিকে জীবে জীবে স্বার্থঘটিত সংঘর্ষ, অন্যদিকে এক অখণ্ড শাশ্বত জীবনের মধ্যে গভীর সমন্বয়; সংঘর্ষ কমাইয়া এই সমন্বয়ের দিকে যতই অগ্রসর হইব জীবন ততই সত্য হইয়া উঠিবে! আমাদের খণ্ড সত্তাকে অখণ্ড অসীম প্রাণের সাগরে ডুবাইয়া বিলীন করিয়া দিতে হইবে—ইহাই ত আপনার বাণী। এ বাণীকে আমার সমস্ত প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছি—আমার সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা আপনার পদাঙ্কানুসরণ করিতেছে...। আমি বুঝিয়াছি আমাদের স্বার্থ আমাদের অহংবোধকে দূর করিতে হইলে, সেই মহান্ ত্যাগটি সত্য করিতে হইলে একটি জিনিষ প্রয়োজন—সমস্ত সৌখিন কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস দূর করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণব্রতে নিযুক্ত হওয়া। আপনি বলিয়াছেন—চিন্তার ক্ষমতা, হৃদয়ের প্রশান্তি আনিতে হইলে, ক্ষুদ্র আমিত্বের অনন্ত চেষ্টার জাল ছিন্ন করিতে হইলে আমাদের একমনে পরসেবায়, লোকহিতকর কার্য্যে—শারীরিক শ্রমসাধনে লাগিতে হইবে। সেই ত জীবনের পরম আশীর্ব্বাদ...ক্ষুদ্র আমিকে ভুলিয়া যাওয়া। মহাত্মন্! আমি প্রাণপণে ভুলিতে চাই—আমি বিশ্বাস করি ক্ষুদ্র আমিকে ভুলিতে পারিব।

কিন্তু একটি প্রশ্ন কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছি না; তুচ্ছ অহমিকার কবল হইতে মুক্তি কেবল হাতের কাজের ভিতর দিয়া হইবে একথা এতটা জোরের সঙ্গে আপনি কেন বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না; এই প্রশ্ন আমার সমস্ত হৃদয় মনকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। শিল্পের প্রতি আপনি নির্দ্দয় হইয়াছেন কেন? শিল্প কি আত্মোৎসর্গ-সাধনের একটি প্রকৃষ্ট উপাদান নয়? আপনার নূতন প্রবন্ধ "কি করা দরকার," পাঠ করিয়া দেখি তার মধ্যে শিল্পের স্থান সব কিছুর নীচে! শিল্পসৃষ্টিকে আপনি আক্রমণ করিয়াছেন। অথচ আপনার বিরুদ্ধতার কোন কারণ দেন নাই। যদি আমি আপনাকে কারণ জিজ্ঞাসা করি আমার বাচালতা ক্ষমা করিবেন। বুঝিতেছি আপনি শিল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা ও ভোগলিপ্সা দেখিয়াছেন; আপনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে শিল্প যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বহুত করিয়া তুলে, শিল্পসাধকতা ততই আমাদের স্বার্থপরতাকে বাড়াইয়া চলে! হায়, স্বীকার না করিয়া উপায় নাই

তথাকথিত শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই কাছে শিল্প আভিজাত্যগর্বী ইন্দ্রিয়বিলাস মাত্র।

কিন্তু শিল্প কি ইহা ছাড়া আর কিছু নয়? খুব একদল সত্য শিল্পীর কাছে ইহা কি সব নয়? তাহাদের কাছে একমাত্র শিল্পই যে আর্থকে ভুলিতে, ভুমার মধ্যে ডুব দিয়া স্থির অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে দেয়। সেই অবস্থায় মৃত্যুই বা আমাদের কি করিতে পারে? মৃত্যু যে তখন মরিয়াছে, শিল্পী যে মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে।

আমি কি ভুল বকিতেছি? যদি ভুল করিয়া থাকি আমার শুধরাইয়া দিন। আমি শিল্পের প্রেমে ডুবিতে চাই—কারণ উহার সাহায্যে আমার এই দীনহীন 'আমির' কারা-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া শাশ্বত প্রাণের সঙ্গে এক হইয়া মিলিতে পারি। যে-সব কালবৃদ্ধ জাতি সভ্যতার চাপে মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে তাহাদের আরোগ্যের একটি বড় উপায় কি খাঁটি শিল্প নয়?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। হাতের কাজকে আপনি সব বড় স্থান দিয়াছেন, কিন্তু সেই কাজের সঙ্গে যদি মনের যোগ না থাকে আপনি কি তাহাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন? চিন্তাকে বলি দিতে, শিল্পকে অস্বীকার করিতে আপনার কি কোন অনুশোচনাই হইবে না? আর শুধু আমরা চাহিলেই কি চিন্তাকে ও শিল্পকে উড়াইয়া দিতে পারি?

আমার দেশ ফ্রান্সে, এবং ইউরোপের প্রায় সর্বত্র দেখি অধিবাসীদের ভিড়, পরমপ্রাণীদের কড়কড়ানি,—চারিদিকেই ঔদাসীন্যের অন্ধকার! ইহার মধ্যে একজনকেও পাইতেছি না—যিনি গুরু হইয়া হাত ধরিয়া লইয়া যান। আপনার উপদেশ আমার বিশেষ প্রয়োজন…

রমাঁ রলাঁ

টলষ্টয়ের চিঠি

৪ঠা অক্টোবর ১৮৮৭

সোদরপ্রতিমেষু

রমাঁ রলাঁ! তোমার প্রথম পত্রখানি পাইয়াছি; ইহা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পূর্বেই উত্তর দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু সময় পাই নাই। তাহা ছাড়া ফরাসী ভাষায় জবাব লিখিতে আমার বেশ পরিশ্রম হয়। বড় করিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কারণ আমার বক্তব্যটি ভাল করিয়া না বুঝার দরুনই তোমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা।

প্রশ্ন করিয়াছ: আমাদের স্থায়ী সুখের জন্য হাতের কাজ একান্ত প্রয়োজন কেন? সেই কাজের সঙ্গে যে সব জিনিষের ঘনিষ্ঠ যোগ নাই যেমন শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি—সেইসব মানসিক ক্রিয়া-কর্ম কি তাহা হইলে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইবে?

এই ধরণের প্রশ্নের জবাব আমার সাধ্যমত আমার (What to Do?) গ্রন্থে দিয়াছি; সে বইখানির ফরাসী অনুবাদ বাহির হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। শারীরিক শ্রম বা হাতের কাজকে আমি একটা নূতন ধর্ম বলিয়া খাড়া করিতে চাই নাই; শুধু ইহা যে একটি সহজ প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রকারভেদ এবং ইহার প্রয়োগ যে সকল অকপট মানুষের কাছেই প্রথম হইয়া দেখা দেয়, সেই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের সভ্যতাগর্বী সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বার্থ ও নীচতায় কলুষিত; ইহার মূল কারণ এই যে, দীনদরিদ্রের পরিশ্রমের সুযোগ লইয়া আমরা ভদ্রজন অধিকাংশই সকল শ্রমের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া বসিয়াছি; শুধু এই মারাত্মক ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্যই শ্রমতার সকলেরই স্বীকার করা উচিত। অশিক্ষিত মন্দভাগ্য যে অগণ্য মানুষ পুরাকালের ক্রীতদাসের মত আমাদের জন্য প্রাণপাত করিতেছে তাহাদের আত্মবলিদানের তুলনায় আমরা ভদ্র সভ্যেরা কতটুকু করি তাহা ভাবি কি?

এই মূলগত বৈষম্য দূর করিতে যদি চেষ্টা করি তবেই বুঝা যাইবে আমরা কতটা সরল এবং খ্রীষ্টের ধর্ম (দার্শনিক দিকেই হোক আর লোকহিতের দিকেই হোক) আমাদের জীবনে কতটা সত্য হইয়াছে।

এই বৈষম্য নিবারণে সফল হইতে হইলে প্রথমেই এই উপায় এই ব্রত লইতে হইবে যে, আমাদের নিজের কাজের ভার অপরের ঘাড়ে না চাপাইয়া যেন নিজে করিতে চেষ্টা করি। শারীরিক মাথা দেহ কার্য্যে অন্যের সাহায্য আমরা লইতে যতদিন দ্বিধা বোধ করিব না ততদিন কি দার্শনিক কি ঐতিহাসিক কোন ধর্মই আমাদের সত্য হইয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিব না।

অপরের সেবা যথাসম্ভব কম গ্রহণ করা, এবং যতটা বেশী সেবা অপরকে করা যায় তাহার বিধান করা, সর্বাপেক্ষা কম দাবী করা ও সর্বাপেক্ষা বেশী দান করা, ত্যাগ করা, ইহাই আমার কাছে সহজতম সরলতম নীতি।

এই নীতিই আমাদের জীবনকে একটি সুসংগত তাৎপর্য্য দেয়। ইহা হইতে যে সুখ আসে তাহা সকল দ্বিধা বাধা ও সন্দেহকে তাড়াইয়া দেয়। মানুষের মানসিক বৃত্তি শিল্প বিজ্ঞানাদির স্থান লইয়া তোমার মনে যে-সমস্তা

জাগিয়াছে তাহাও একদিন ঐ অনুপম তৃপ্তির প্লাবনে ভাসিয়া যাইবে।

সুতরাং ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যতক্ষণ না আমরা আমাদের কাজে অপরকে উপকৃত হইতে দেখি ততক্ষণ আমরা সত্য সুখ ও তৃপ্তি অনুভব করিতে পারি না। যাহাদের জন্য আমরা কাজ করিতেছি তাহারা যদি সুখী হয় তাহা হইলে সুখের উপর সুখ হইল। কিন্তু তাহারা যদি হুঁশ মাত্র না করে তাহা হইলেও আমাদের সেবা করিয়া যাইতে হইবে। আমার আত্মতৃপ্তির ভিত্তিই যে ঐখানে—আমার কাজ অপরের কাছে নিরর্থক নয়, অকল্যাণকর নয় এই বিশ্বাসেই যে আমার সুখ।

শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কাজ ছাড়িয়া মানুষ যদি এই সাধারণের সেবার কার্য্যে নামিয়া আইসে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার সহজ নৈতিক দায়িত্ববোধ আপনা হইতেই তাহাকে টানিতেছে। গ্রন্থকার বই লেখেন, ছাপিতে ছাপাখানার মানুষদের খাটাইতে হয়; সুরজ্ঞ সঙ্গীত রচনা করেন, সেগুলির প্রচার করিতে কত ওস্তাদ-বাজনাদারকে খাটান প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবেন তাঁর যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে খাটিবে কত লোক; চিত্রী ছবি আঁকিবেন তার জন্য তুলি রঙ পট প্রস্তুত করিতে হাজার লোক ব্যস্ত। এইসব শিল্প বিজ্ঞানের কাজ মানুষের কাজে লাগিতে পারে আবার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়—অনেক সময় অকল্যাণকরও হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমার এক দিকে এইসব কাজ যাহার জন্য অপরকে খাটাইতে হয় অথচ যাহার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সন্দেহজনক; অন্যদিকে আর-এক শ্রেণীর কাজ যাহার জন্য কাহাকেও খাটাইতে হয় না অথচ যাহার সবগুলিই মানুষের উপকারে আসিবে। এমনি কত কাজ চারিদিকে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের টানিতেছে! ঐ দেখ কে একজন শ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতেছে—উহার বোঝাটা খানিক বও; গরীব চাষী রোগে অকর্মণ্য, তার ক্ষেতের কাজ খানিক করিয়া দাও; দেখ, ঐ কে আহত, তার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দাও;—এমনি কত সহস্র ছোটখাট সেবার আহ্বান চারিদিক হইতে আসিতেছে, সেগুলি করিতে কারও সাহায্য দরকার নাই। একা করিয়া যাও। তখনি যে সেবা করিল এবং যাহার সেবা করা হইল দুজনেই পরম তৃপ্তি পাইবে। নিজের হাতে গাছ পোঁতা, পশুদের সেবা করা, কূপ পরিশোধন করা—এইসব কাজে মানুষের উপকার যে হইবে তার সন্দেহ নাই সুতরাং এরকম কাজে প্রত্যেক খাঁটি মানুষের আগেই যাওয়া উচিত। অনেক কাজই সমাজ সেবা বলিয়া বড় গলায় প্রচার করা হয় কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় তাহার অনেকগুলাই ভুয়ো।

ভবিষ্যৎদর্শী ঋষিদের স্থান আমাদের মাথার উপরে; কিন্তু ঐ নামটার যথেষ্ট সুবিধা হয় যে-সব ধর্ম্মব্যবসায়ী ঋষিদের মুখোস পরিয়া ভাবে—তাহারা সত্যই ঋষি হইয়াছে বলিয়া তেমন লোকের অভাব এ জগতে নাই এবং তাহারা বেশ ঋষির ব্যবসা চালাইতেছে।

শিক্ষার বলে কেহ ঋষি হইতে পারে না! যাহার গভীর বিশ্বাস আছে যে, সত্য তাঁহার ভিতর দিয়া প্রকাশ হইবেই, সত্যের বাহন না হইয়া তাঁর উপায় নাই—এমন মানুষই ঋষি হন। এই বিশ্বাস কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায় এবং এই বিশ্বাসসিদ্ধ হইতে হইলে কর্মের ক্ষেত্রে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

খাঁটি শিল্প খাঁটি বিজ্ঞান এই ত্যাগ এই আত্মোৎসর্গের উপর গড়িয়া উঠে। প্রসিদ্ধ গুণী লুলী (Lulli) যখন পাচকের স্থায়ী কাজ ছাড়িয়া বেহালা হাতে করিয়া অনিশ্চয়তার বুকে ঝাঁপ দেন, কত বিপদ কত দুঃখ তাঁকে ঘিরিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যেই সঙ্গীতজ্ঞের আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিয়া সহস্র ত্যাগের দ্বারা তিনি তাঁহার গুণী নাম সার্থক করিয়াছেন, তাঁর কর্মক্ষেত্রকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীত-পরিষদের যে মামুলী ছাত্র, মামুলী গৎ বাজাইয়া তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল ভাবে, কোথায় তার ত্যাগের অবকাশ? তাহার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাও দেখি না শুধু দেখি বেশ আরামে তার সৌখীন অবস্থাটি উপভোগ করিয়াই সে খুসী!

হাতের কাজ একদিকে প্রত্যেক মানুষের একটি কর্ত্তব্য, অন্যদিকে সেটি বহুলোকের জীবনে আশীর্ব্বাদের মত হইয়া আছে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে মস্তিষ্কের কাজ অল্পসংখ্যক লোকের অধিকার ও কল্যাণের আধার। কাহার উহাতে অধিকার আছে কাহার নাই তাহার বিচার হইবে ত্যাগের দ্বারা। শিল্পী বা পণ্ডিত তাহার আদর্শ জীবনের জন্য তাহার অবকাশ ও তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য কতটা উৎসর্গ করিয়াছে? যে মানুষ হাতের কাজ করিয়া আপনার ও স্বজনবর্গের জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং সেই সঙ্গে তার ক্ষুদ্র বিশ্রামক্ষণ, তার নিদ্রার সময়টুকুও চিন্তা ও সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত করে সেই সত্য মানসিক ক্ষেত্রে কর্ম করিবার অধিকারটি প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু যে মানুষের সহজ নৈতিক দায়িত্ব এড়াইয়া, শিল্প-বিজ্ঞান-প্রীতির অছিলা করিয়া সমাজতরুর পরগাছা হইয়া বাঁচিতে চায়, সে শুধু মেকী শিল্প ও ঝুঁটো বিজ্ঞানেরই

সৃষ্টি করিবে। খাঁটি শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস সুখ সুবিধা নয় আয়রাম।

"কিন্তু তাহা হইলে শিল্প-বিজ্ঞানের দশা কি হইবে?" এই প্রশ্ন কতবার শুনিয়াছি! এমন লোকেরা প্রশ্ন করেন যাদের না আছে শিল্প-বিজ্ঞানের বালাই, না আছে উহাদের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয় যেন বিশ্বমানবহিত ছাড়া তাঁহাদের অন্য চিন্তাই নাই—যেন তাঁহাদের মনগড়া শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি ছাড়া মানব-সভ্যতার আর উন্নতি নাই।

শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না এমন দুর্বুদ্ধি মানুষের অভাব নাই, আবার এমন মজার লোকও আছে যে সেটা স্বীকার করানই জীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করে! এমন মতভেদ হয় কেন? ঐ ত চাষী চাষ করিতেছে, মজুর খাটিতেছে, কৈ তাহাদের কাজের আবশ্যকতাটা অস্বীকার ত কেউ করে না। আবার তাহার প্রয়োজনীয়তাটা প্রমাণ করিতেও কেউ লেগে না। কাজ হইয়া যায়—কাজটা দরকারী এবং সকলেরই তাহাতে উপকার এটা আমরা বুঝি, ইহার আবশ্যকতায় আমরা সন্দিহান হই না, সেটা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হওয়া ত দূরের কথা! শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কর্মীদেরও ঠিক এক অবস্থা, তবু তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তাটা প্রমাণ করিতে এত লোক এত গলদঘর্ম হয় কেন?

আসল কথাটা এই:—খাঁটি কর্মী শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ অধিকারের দাবী করে না; তাহারা সৃষ্টি করিয়া যায়, সেই সৃষ্টিতে সকলের কল্যাণ হয় সেই যথেষ্ট; তাহার জন্য কোন দাবীদাওয়া অথবা তার দলিল ও প্রমাণের দরকার আছে তাহা ভাবে না। কিন্তু তথাকথিত অনেক পণ্ডিত ও শিল্পী যাহারা জানে যে, সমাজের যত জিনিষ গ্রাস তাহারা করে তার তুলনায় তাহাদের সৃষ্টি একেবারেই নগণ্য। তারাই সর্বাপেক্ষা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, তাহাদের কাজ ছাড়া বিশ্বমানবের কল্যাণ আর নাই! এই জায়গায় পুরুতের দলের সঙ্গে ওদের একটা মিল দেখা যায়।

খাঁটি শিল্প খাঁটি বিজ্ঞান মানুষের অন্য কর্মপ্রচেষ্টার মতন চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে; তাহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা বা অপ্রমাণ করা দুই নিরর্থক।

বিজ্ঞান ও শিল্প যে আজ সমাজে মিথ্যার সুযোগ লইয়া জঞ্জালী করিতেছে তাহার একটা গুরুতর কারণ এই যে, শিল্পী জ্ঞানী প্রভৃতি তথাকথিত "সভ্য" দল সকলে মিলিয়া একটা নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্মান্ধ 'পুরুত'দের মত গর্বান্ধ এই দলটি আভিজাত্যের মোহে অধীর! এদের জাতটা বামুনী জাতের মতই অভদ্রজন, কারণ যে-আদর্শের দোহাই দিয়া এরা জাতিভেদ সৃষ্টি করে সেই আদর্শই ইহাতে ধূলায় লুটাইতে থাকে। সেই জন্যই খাঁটি ধর্ম শিল্প বিজ্ঞানের জায়গায় মেকিতে সমাজ ভরিয়া যাইতেছে।

শিল্প ও সাহিত্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট অপরাধ করিয়াছে; যে বস্তু সাধারণ মানুষকে পৌঁছাইয়া দিবার ব্রত লইয়া শিল্প ও সাহিত্য আবির্ভূত হয় এবং যাহা প্রচার করিতে মহা ব্যস্ত বলিয়া ভান করে ঠিক সেই বস্তু হইতে শিল্প ও সাহিত্যই মানুষকে কতটা বঞ্চিত করিয়াছে ভাবিলে লজ্জা হয়। অথচ অন্তত মুখেও যে দায়িত্বটা স্বীকার করে তাহাতেই প্রমাণ হয় তথাকথিত শিল্প ও সাহিত্য কত অপরাধী ও নৈতিক দায়িত্ববোধে কত দুর্বল।

"শিল্পের জন্যই শিল্প" "বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান" বলিয়া এক দল লোক কত বুলিই কপচাইল! কিন্তু এখন মানুষ বুঝিয়াছে, তাদের সার্থকতা এইখানে যে শিল্প বিজ্ঞান নিখিলমানবের চিরন্তন উত্তরাধিকার। সকল মানুষেরই উহাতে অধিকার আছে এটি সভ্যতার পাণ্ডাদের স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কখন ঐ বস্তগুলি কি মানবের চিরন্তন সম্পত্তি হইয়া উঠে? আসল আর ঝুটোর মধ্যে প্রভেদটা ধরা যায় কিরূপে? এসব প্রশ্নের জবাব ত বড় একটা পাণ্ডারা দেন না! বরং তাঁহারা চাল দিয়া বুঝাইতে চান যে, সত্য সুন্দর ও কল্যাণ যে আসলে কি তাহা প্রকাশ করা যায় না; উহাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা শক্ত।

কিন্তু এটা মিথ্যা কথা। যুগে যুগে বিশ্বমানব তার অপরিণাম বিবর্তনের ভিতর দিয়া যদি কিছু করিয়া থাকে ত সে এই সুন্দর ও কল্যাণের ধ্যান ও ধারণা। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি সভ্যতার পাণ্ডাদের পক্ষে সুবিধার হয় না কারণ ইহা প্রমাণ করিয়া দেয় যে সুন্দর ও কল্যাণকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের জায়গায় শিল্প ও বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা শুধু নিরর্থক নয়, অনিষ্টকর। যুগে যুগে মানুষ শিবসুন্দরের রূপটি নির্ধারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সাধকগণ চীন ইহুদী ও মিশর দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানীর দল গ্রীক দর্শন ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র প্রত্যেকেই স্পষ্টভাবে শিবসুন্দরের ধ্যান-ধারণার সাক্ষ্য দিতেছেন।

যাহা কিছু মানুষকে মানুষের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া মিলিতে সাহায্য করে তাহাই শিবসুন্দরের দান; যাহা কিছু ভেদের সৃষ্টি করে তাহাই অশিব, তাহাই অসুন্দর।

এই অমোঘ মন্ত্রটি সকল জীবই জানে, সকলের প্রাণে ইহা গ্রথিত আছে।

মিলন যাহার সাহায্যে ঘটে তাহাই সুন্দর, তাহাই বিশ্বমানবের কল্যাণকর। এই কল্যাণ যদি শিল্প ও বিজ্ঞানের সাধকদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এটি তাঁহাদের ভোলা উচিত নয়; যে শিল্প ও যে বিজ্ঞানের সাধনায় ঐ কল্যাণ হয় শুধু তাহারই চর্চা যদি সাধকরা করেন তবেই স্বীকার করিব তাঁরা সত্যদর্শী। কিন্তু তাহা হইলে ভেদমূলক আইন বিজ্ঞান, অর্থ-শোষক অর্থনীতি ও ধনবিজ্ঞান ও মৃত্যুমূলক যুদ্ধবিজ্ঞান কোথায় দাঁড়ায়? ইহাদের যে একমাত্র উদ্দেশ্য একদল মানুষের উচ্ছেদ করিয়া অন্য এক দলকে সাময়িকভাবে বাড়ান। সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে ইহাদের ত কোন যোগই দেখি না, তবু কেন এইসব তথাকথিত বিজ্ঞান এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে? আজকাল দেখি শিল্পভোগে অলস অপদার্থদের লালসায় ইন্ধন অথবা হৃষ্ট-পুষ্ট নিষ্কর্মাদের খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবু এই শিল্প কেন এত লোককে টানিতেছে? এ শিল্পের দ্বারা কোন্ কল্যাণ সাধিত হইতেছে?

কতকগুলা বিষয়ে খবরের সংখ্যা বাড়াইয়া গেলেই "জ্ঞান" মিলে না। জানিবার বস্তু এ জগতে অসংখ্য; অনেকের চেয়ে বেশী জানিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। কোন্ জিনিষ কতটা মানব-কল্যাণের সহায়ক তাহাদের গুরুত্ব ও ক্রমানুসারে নিজের জ্ঞানের মধ্যে গ্রহণ করা ইহাই একমাত্র পন্থা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল অরণ্যে কোন্‌টিকে বাছিব? যাহার সাহায্যে এমন জীবন গঠন করা যায় যাহাতে মানুষকে সবচেয়ে কম দুঃখ ও সবচেয়ে বেশী আনন্দ দিতে পারি তাহাই আমার কাছে সর্বোচ্চ বিজ্ঞান; এবং আমাদের তুচ্ছতম কাজেও যখন শিব-সুন্দরের ছায়া পড়িবে, তখন সেই জীবনকেই সর্বোচ্চ শিল্প বলিব। কিন্তু যেসব ভণ্ড শিল্পবিজ্ঞান বিশ্বমানবকে ঠকাইয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে কল্যাণদর্শী শিল্পবিজ্ঞানের স্থান কোথায়?

আজকাল সমাজে শিল্প ও বিজ্ঞান বলিয়া যেসব জিনিষ চলে তাহার অধিকাংশই একটা বিরাট বুজরুকী মাত্র। এককালে ছিল ধর্মের বুজরুকী এখন তাহার স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে শিল্প-বিজ্ঞানের বুজরুকী। চোখে ঠুলি দিয়া দিব্য আরামে আমরা আছি! কিন্তু মনে নাই যে, অনেক জিনিষই চোখে পড়িতেছে না। চোখের ঐ ঠুলীটা দূর করিয়া ফেলিয়া একেবারে গোড়া হইতে নূতন চোখে সব জিনিষ দেখিতে হইবে। গন্তব্য পথের সন্ধান করিতে হইবে। কত প্রলোভন পথ ভুলাইতে চেষ্টা করে। হাত অথবা মাথা খাটাইয়া আমরা খাই, ক্রমশঃ সামাজিক মর্য্যাদার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছি, ক্রমশ ধনিবাদীদের ধাপে উঠিয়া সভ্যতার মধ্য সাধী হইয়া গর্ব অনুভব করিতেছি। আমাদের মত 'কাণ্ডারে'র মাঝে প্রায় মূর্চ্ছা যাই আর কি! এত কষ্টে আজ উঠিয়া এত বাহবাই করিয়া হঠাৎ আগাগোড়া সবটাকে অবিশ্বাস করিতে হইলে অনেকখানি সরলতা ও সত্য নিষ্ঠা থাকা দরকার; সত্য ও কল্যাণের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা না থাকিলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। কিন্তু নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়; যে কেহ প্রাণের মধ্যে সাড়া পাইয়াছে জীবনের সমস্যা তোমার মত যাহাদিগকে আকুল করিয়াছে, তাহাদের সত্যের পথ না ধরিয়া গতি নাই। মোহের আবরণ যতই মধুর হউক, সকল কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিত্তকে মুক্ত করিয়া স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। যে মানুষ অন্ধভাবে তার গোড়ামিকে আঁকড়াইয়া থাকে তাহার কথা বলিয়া লাভ নাই। যুক্তির ক্ষেত্র যদি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত না হয়, তাহা হইলে অনেক শূন্য তর্ক, অনেক সুন্দর বক্তৃতা হইতে পারে কিন্তু সত্যের দিকে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না। সমস্ত যুক্তি গোড়ামির খোঁটায় বাঁধা থাকিবে, সকল সিদ্ধান্ত ভুল হইবে। গোড়ামি শুধু ধর্মে নয় তথাকথিত সভ্যতার রাজ্যেও আছে, দুই-ই মূলতঃ এক বস্তু। গোঁড়া ক্যাথলিক বলিবে, "আমরা কি যুক্তি মানি না? মানি বই কি; তবে যুক্তিকে শাস্ত্র ও আচারের উপরে যাইতে দিই না, কারণ তাহাদের মধ্যে পূর্ণ ধ্রুব সত্য রহিয়াছে।" সভ্যতার সাধু বলিবে, "আমার সমস্ত যুক্তি শিল্প ও বিজ্ঞান পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া যায়। কারণ উহাদের মধ্যে আমি সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ দেখি। মানবের সমস্ত জ্ঞান আমাদের বিজ্ঞানে পর্য্যবসিত; পূর্ণ সত্যকে এখনও বিজ্ঞান ধরিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে পারিবে এবং আমাদের শিল্পের উদার ভিত্তির উপর সত্য-শিল্পের একমাত্র প্রতিষ্ঠা।" ক্যাথলিক বলিবে, "মানুষের বাহিরে একটি মাত্র বস্তু পূর্ণ ভাবে আছে সেটি হইতেছে সঙ্ঘ (church)।" আর সংসারী বলিবে, "মানুষের বাহিরে আছে শুধু সভ্যতা!" ধর্মে অন্ধসংস্কার লইয়া আলোচনা করিতে যুক্তির দুর্বলতাটা আমরা সহজেই ধরিতে পারি, কারণ, সেই সংস্কার আমরা কাটাইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু যে করে তার কাছে একটি মাত্র ধর্ম, একটি মাত্র সত্য আছে যেটি বিশ্বাস সে বিশ্বাস করে! অথচ সেটা যুক্তিদ্বারা সে প্রতিপন্ন করিয়াছে বলিয়া তার ধারণা। সভ্যতা-সংস্কার লইয়াও আমাদের সেই একই অবস্থা; আমরা বিশ্বাস করি যে, জগতে শুধু একটি মাত্র খাঁটি

সভ্যতা আছে, সেটি আমাদের; অথচ নিজেদের অযৌক্তিকতাটা মোটেই আমরা দেখিতে পাই না। আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি সকল যুগ সকল জাতির মধ্যে আমাদের এই যুগ এই জাতিই সভ্য সভ্যতার অধিকারী। যে কয়েক কোটি লোক ইউরোপ খণ্ডে বাস করে তাহারাই সকল খাঁটি বিজ্ঞান ও শিল্পের মালিক!

জীবনে সত্যের প্রকাশ অতি সহজ; এই সত্যকে ধরিতে বিজ্ঞান দর্শনের গভীর জ্ঞান না হইলেও চলে, কিন্তু একটি জায়গায় নাস্তিবাদী না হইলেই নয়—সমস্ত মূঢ় সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকে "নেতি" বলিয়া উড়াইয়া দিয়া পূর্ণ বুক চিতে দাঁড়াইতে হইবে। হয় শিশুর মত সরল হইতে হইবে, অথবা দেকার্ত (Descartes) এর মত বলিতে হইবে, "আমি কিছু জানি না, কিছু বিশ্বাসের বশে মানিয়া লই না; আমি অন্য কিছুই চাই না, শুধু বুঝিতে চাই এই যে, যে-জীবন আমরা ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি, ইহার অর্থ কি, ইহার সত্য সার্থকতা কোথায়?"

এই প্রশ্নের সরল স্বচ্ছ ও পূর্ণ উত্তর মানুষ যুগের পর যুগে পাইয়াছে। আমার স্বার্থ আমাকে শিখায় যে, জগতের সব ধনসম্মান সৌভাগ্য আমার হউক। কিন্তু আমার জ্ঞান আমায় দেখাইয়া দেয় যে, ঐ ইচ্ছাটি শুধু আমার একলার নয়, প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক প্রাণীর। সুতরাং আমি একা সমস্তটা দখল করিতে গেলে ইহারা আমায় পিষিয়া মারিবেই। সে-সুখের জন্য আমি লালায়িত তাহা আমি একচেটিয়া করিতে পারি না। কিন্তু সুখের পিছনে দৌড়ানোটাই ত জীবন! সুখ না পাওয়া, সুখ পাওয়ার জন্য চেষ্টা মাত্র না করা—সে ত মৃত্যু।

যুক্তি বলে: জগতের নিয়মে সকলেই নিজের নিজের সুখ চায় সুতরাং আমি একা সব সুখ কখনও পাইব না এবং পুরোপুরি বাঁচাও সেইজন্য আমার অদৃষ্টে নাই। কিন্তু এই সংপুষ্ট যুক্তিটা অটল থাকিলেও দেখি আমি দিব্য বাঁচিয়া আছি এবং সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের মানিতে হয়—মানুষ নিজেকে যতটা ভালবাসে তার চেয়ে আমাকে যদি ভালবাসে তবেই আমার সুখ-সমৃদ্ধি সম্ভব হয়। কিন্তু এটা যে অসম্ভব ব্যাপার। ইহা কখনও হয় না; তবুও আমরা ত পাশাপাশি আছি; আমাদের সমস্ত সর্ব-প্রচেষ্টা আমাদের শক্তি সৌভাগ্য ও সম্মানের অন্বেষণ ফলের আভাস দেয়? আমরা ঐ সবের ভিতর দিয়া জীবনকে যাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি—নিজেকে মানুষ যতটা ভালবাসে তাহা অপেক্ষা আমাকে বেশী ভালবাসাইতে প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু সকলেই দেখি আমা অপেক্ষা নিজেকে বেশী ভালবাসে সুতরাং সেই চরম তৃপ্তি আমার ভাগ্যে ঘটিল না। কত মানুষ এমনি অনুভব করে—এ সমস্তার সমাধান করিতে পারে না—হতাশ হইয়া জলিয়া পুড়িয়া বলে—এজীবন কিছুই না, শুধু একটা নিষ্ঠুর পরিহাস।

কিন্তু তবু যদি ঐ সমস্তার সমাধান অতি সহজ এবং আপনা হইতে আমাদের কাছে দেখা দেয়; একটিমাত্র অবস্থায় আমরা সুখী হইতে পারি যখন পৃথিবীর জীব নিজেদের যত ভালবাসে তাহা অপেক্ষা অন্যকে বেশী ভালবাসিবে। এইটি সত্য হইলে নিখিল বিশ্ব আনন্দময় হইয়া উঠিবে।

আমি মানুষ এবং আমার চৈতন্য আমাকে সর্বসাধারণের সুখের সর্তগত নিয়মটি দেখাইয়া দিতেছে। সে নিয়ম আমাদের মানিতে হইবে—আপনাকে যতটা ভালবাসি তাহা অপেক্ষা অপরকে ভালবাসিতে হইবে।

এই ভাবে জীবনকে চালাইলে তাহার এমন একটি অপূর্ব তাৎপর্য্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবে যাহা আমরা কখনও দেখি নাই। সৃষ্টির মধ্যে জীবে জীবে হিংসা দেখি—এক অন্যকে ধ্বংস করিতেছে দেখি, কিন্তু ইহাও সত্য যে, জীবে জীবে প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে—এক অন্যকে সাহায্য করিতেছে। ধ্বংসের সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই—প্রাণের ধারা পুষ্ট হইতেছে প্রেমের আদান-প্রদানে। এই প্রেম বাহিরে জীবে জীবে মৈত্রী ও অন্তরে অনুপম মাধুর্য্যের রূপ ধরিয়া দেখা দেয়। বিশ্বমানবের ইতিহাস আমি যতটুকু বুঝিয়াছি—আমি দেখিয়াছি যে, মানবসভ্যতা সম্মুখপানে চলিয়াছে একটি শক্তির প্রেরণায়—সেটি পরস্পরের প্রতি প্রীতির টান; এইখানেই জীবের ঐক্য-সিদ্ধির অটল ভিত্তি। এইটি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করা এবং এই অনুপম নিয়মটি জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা—ইহাই আমার কাছে ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপনির্দেশ। মানুষ তার অন্তরের অনুভূতি ও বাহিরের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়া ঐ সত্যটিকেই ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শুধু বোধের মধ্যে ধরা নয়—প্রাণের গভীরতম প্রেরণায় ঐ সত্যের অপরিসীম প্রাধান্য দেখা। মানুষের সবচেয়ে বড় তৃপ্তি, বড় মুক্তি, বড় আনন্দ ত্যাগ ও প্রেমে। এই অনন্ত পথটি দেখাইয়া দেয় প্রজ্ঞা, এবং হৃদয়ের আবেগ মানুষ সেই দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

যাহা তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যদি তাহা তোমার কাছে অস্পষ্ট বোধ হয় তাহার কঠোর সমালোচনা করিও না। আমার আশা আছে ধর্ম্য ধর্ম! একদিন তুমি এ বিষয়টি পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া ধরিবে। আমি এখন যে ভাবে দেখিতেছি তাহার একটু আভাস তোমায় দিলাম। ইতি

লিও টলস্টয়

(প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃঃ ৪৮৯-৪৯০।)

Romain Rolland

রবীন্দ্রনাথ ও রমঁ্যা রলঁা

মনস্বী রমঁ্যা রলঁার ষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কবিবর রবীন্দ্রনাথ একটি সম্বর্দ্ধনা-লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। লিপিটি ইংরেজিতে লিখিত। আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম।—

"আমেরিকায় অবস্থান-কালে, যন্ত্রসংঘসমূহ (organisations) ব্যক্তিগত (personal) মানুষকে একেবারে নির্ব্বাসন দিয়া যন্ত্রগত মানুষকে (mechanical) প্রকাণ্ড পদ্ধতি-পিণ্ডের মধ্যে সংহত করিয়া, প্রচণ্ড শক্তি অর্জ্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল এবং সে-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা আমি কয়েকবার বলিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম —মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে, তাহার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় প্রাণ ও অনুভূতির অভাব প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এবং মানুষ ধীরে-ধীরে এই যন্ত্রেরই অংশমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধের প্রয়োজন সে অনুভব করে না। প্রাণ-শক্তিকে পরিহার করাতে এই যন্ত্রবদ্ধ জড় শক্তির দোহাই দিয়া আজিকার দিনে ভয়াবহ অত্যাচার ও অবিচার করা সহজসাধ্য হইয়াছে,—কারণ জড়শক্তি অন্য সকল বিচার বিবেচনাকে পদদলিত করিয়া আপন উদ্দেশ্য-সাধনে বিরামহীন নিষ্ঠুর গতিতে অগ্রসর হয়। যে ধর্ম প্রেম ও করুণার জননী সেই ধর্মের নামে কী কদর্য্য রক্ত-লোলুপ ষড়যন্ত্র গড়িয়া উঠে তাহা আমরা দেখিয়াছি; দেখিয়াছি ব্যবসায়ের দোহাই দিয়া কি বিরাট প্রবঞ্চনা চলিতেছে! অথচ এইসকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যাহারা তাহাদের সম্মান [illegible] নিরীহ প্রজাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রাজতন্ত্রের নামে কি বীভৎস মিথ্যাবাদ প্রচারিত হইতেছে দেখিতেছি, অথ যাহারা এই রাজতন্ত্রের কর্ণধার তাঁহারা সকলেই আচার আচরণ ও [illegible] ভদ্র। ইহার কারণ এই, যে মানুষ যখন এইসকল বিপুল যন্ত্রদলকে নির্ব্বিচারে বাড়িত

শুরু করে, তখন তাহারা এই যন্ত্রকেই দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়া অশেষ গৌরব অনুভব করে এবং অন্ধ ভক্তের মত এই যন্ত্রের নামে ভয়াবহ অবিচার সাধনেও কুণ্ঠিত হয় না। এই আধুনিক জড়-পৌত্তলিকতার (fetish worship) প্রভাবে অন্যান্য মানবীয় ধর্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে; মানুষ ও মনুষ্যত্ব বলির অসংখ্য উপায় এই পৌত্তলিকতাই দিন দিন যোগাইয়া দিতেছে।

আমার এই চিন্তাধারার সহানুভূতিসম্পন্ন একজন শ্রোতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই সংঘর্ষকে ঠেকাইয়া রাখা যায় কি করিয়া; তাঁহার ভয় ছিল যে তাহা করিতে গেলেই অন্যপ্রকারের যন্ত্র মাথা খাড়া করিয়া উঠিবে। আমি বলিয়াছিলাম—ব্যক্তিস্বরূপ (personality) ও আদর্শ (ideal) যাহাদের জীবনে একীভূত এমন কতকগুলি মানুষের (individual) উপর আমার ভরসা আছে। যে যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহারা দণ্ডায়মান, তাহার সহিত তুলনায় তাঁহারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল মনে হইতে পারেন, প্রকাণ্ড একটি জড় পর্বতের পাশে সজীব একটি বৃক্ষকে যেমন মনে হয়। কিন্তু প্রাণের ইন্দ্রজালশক্তি ত এই বৃক্ষের আছে, দিনে দিনে উহা আপনার প্রাণশক্তির নব নব প্রকাশে আপনার জীবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, পরাস্ত হইয়া আপাতমৃত্যুমুখে পতিত হয়, শুধু পুনর্বার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবার জন্য। আমার বিশ্বাস অমানুষিক জড়শক্তি যখন দিকে দিকে প্রভাব বিস্তার করে, তখন মনুষ্যত্বে দৃঢ় বিশ্বাসপরায়ণ কতকগুলি ব্যক্তির উদ্ভব হয়। তাঁহারা মানুষের প্রাণ-শক্তির অবমাননায় তীব্রভাবে সচেতন হইয়া উঠেন এবং অবজ্ঞা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যেও অকুতোভয়ে আপনাদের নির্ধারিত পথ অনুসরণ করিয়া চলেন। ইংলণ্ডে ঠিক এমনি একটি ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ই, ডি, মোরেল (E. D. Morel)। তিনি আজ মরিয়াও অমর হইয়াছেন। মৃত্যুতে ইঁহাদের সমাপ্তি নহে। এমন সব লোককে দেখিলে বুঝিতে পারি এই সর্বব্যাপী জড়ত্বের মধ্যে মানবপ্রাণ-শক্তির স্ফূর্তি এখনো জ্বলিতেছে—নিরাশ হইবার কারণ নাই। মানবের সভ্যতা যেমন কয়েকটি ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে—কয়েকটি ব্যক্তিই তাহা বাঁচাইয়া রাখিবে। আজকার দিনে জড়যন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের মধ্যে যে এমন সব ব্যক্তি জন্মিতে পারে, রম্যাঁ রলাঁর জীবন ও সাধনা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে নিরন্তর সহিতে হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে আজিকার দিনে তাঁহাকে জগতের একান্ত প্রয়োজন আছে এবং এই লাঞ্ছনা ও অপবাদের দ্বারাই তাঁহার সমসাময়িক মানুষেরা তাঁহার মহত্ত্বকে স্বীকার করিয়া লইতেছে।”

[প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩২, পৃঃ ১১৫-১১৬]

আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি সেই একই প্রবাহ—সেই একই পথ। রামকৃষ্ণ অন্য যে-কোন ব্যক্তির চেয়ে যে শুধু সমৃদ্ধ ভাবজীবনের অধিকারী ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন তার চেয়েও বেশী। তিনি ঈশ্বরের এক অখণ্ড ও সামগ্রিক রূপকে তাঁর মর্মমূলে উপলব্ধি করেছিলেন—এই কারণেই আমি তাঁকে ভালবাসি; আমি তাই ভারত সংস্কৃতির পবিত্র উৎস থেকে একবিন্দু জল তৃষিত জগতের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিবেদন করছি।

রম্যাঁ রলাঁ

রামানন্দ-চরিত

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রামানন্দের জন্মভূমি বাঁকুড়া ; আমিও বাঁকুড়ার লোক —তবে আমার জন্ম বাঁকুড়ার এক গ্রামে। সেই গ্রামে রামানন্দের জেঠতুত ভাই রামশরণ বাস করতেন।

রামানন্দ আমাদের সেই গ্রাম চুয়ামসিনায় গেছলেন —এ কথা আমি তাঁর মুখেই বহুবার শুনেছি।

রামশরণ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি নিজের কুলপদবী চট্টোপাধ্যায়ের স্থানে ভট্টাচার্য লিখতেন। রামানন্দের জ্যেঠতাত রামশরণের পিতা গদাধারায়ণ বড় অধ্যাপক ছিলেন। বাঁকুড়ায় তাঁর টোল ছিল—সেই জন্যেই বোধ হয় রামশরণ ভট্টাচার্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ অনেকেই এখনও সেই উপাধিতে নিজেদের পরিচয় দেন।

রামশরণ গোঁড়া হিন্দু এবং রামানন্দ ব্রাহ্ম—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রগাঢ় ছিল। আমি স্বয়ং তা নানারূপে লক্ষ্য করেছি।

১৯১৭ সালে যখন আমি শান্তিনিকেতনে আসি তখন রামানন্দ সপরিবারে শান্তিনিকেতনে। বর্তমান হিন্দী-ভবনের উত্তরে রাস্তার ধারে 'দেহলী'র কিছু দূরে দক্ষিণে, একটি খোড়ো মাটির বাড়ীতে রামানন্দের বাসস্থান ছিল। তাঁর পুত্র "মুনু" (মুক্তিদাপ্রসাদ বা প্রসাদ) তখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র।

ছুটিতে যখনই বাড়ী যেতাম রামানন্দের দাদা রামশরণ অতি আগ্রহের সঙ্গে রামানন্দ এবং তাঁর পুত্র-কন্যাদের খবর নিতেন। সারা ছুটি একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করতেন। এতেই বোঝা যায় রামানন্দের প্রতি রামশরণের ভালবাসা কত গভীর ছিল।

রামানন্দও তাঁর আত্মীয়স্বজনগণের কথা বারংবার আলোচনা করতেন। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আমাদের গ্রাম চুয়ামসিনার কথা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম "পাঁচমুড়া"র কথা তাঁর মুখে যে কতবার শুনেছি তার ইয়ত্তা করা যায় না।

একবার বললেন, "তোমাদের গ্রামে যে 'টকের মাছ' খেয়েছিলাম তার কথা আজও ভুলি নাই। আজ বিশ বছর আমি নিরামিষাশী, কিন্তু সেই টকের মাছের স্বাদ আজও মুখে লেগে আছে।"

বাঁকুড়া জেলায় "টকের মাছ" ডাকসাইটে। সেই টকের মাছের স্বাদের সঙ্গে রামানন্দের জন্মভূমির প্রতি প্রীতির প্রলেপ ছিল। তাই স্বভাবত অম্ল-মধুর সেই টকের মাছের স্বাদ তাঁর কাছে মধুরতর হয়েছিল।

এই এক টকের মাছের কথাই বহুবার তাঁর মুখে শুনেছি।

একবার বললেন, "বল ত, আমাদের জেলার বিশেষত্ব আর কি কি? মাছের অম্বল, আলু-পোস্ত, কলাই-এর ডাল…আর…?"

আমি বলে বসলাম—"আর কুষ্ঠ!"

তিনি একটু হাসলেন—কিন্তু মুখে তাঁর বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠল। বললেন, "বাঁকুড়ার কুষ্ঠ রোগ নিয়ে আমি বহু আলোচনা করেছি। দেখেছি এই রোগ বাউরী, বাগদী, ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বেশী। তবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও আছে। সমাজে সতর্কতার অভাব।

"একবার এক ভোজে গেছলাম। হঠাৎ দেখি যিনি পরিবেশন করছেন তিনি কুষ্ঠ রোগী। আমি বড়ই বিস্মিত হলাম। কেউ দেখি আপত্তি করছেন না। তখন আমিই কর্তাদের বলে-কয়ে তাঁকে পরিবেশন থেকে নিবৃত্ত করলাম।"

রামানন্দের ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদাধিকারী। কিন্তু তাঁদের বংশে অশিক্ষিতও দু-একজন ছিলেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন হঠাৎ শান্তিনিকেতনে এলেন এবং আমার বাসায় উঠলেন। তিনি শুনলেন তাঁর কাকা রামানন্দ শান্তি-নিকেতনে আছেন—শুনেই দেখা করতে চাইলেন।

আমি তাঁকে রামানন্দের কাছে নিয়ে গেলাম। ভ্রাতুষ্পুত্র গ্রামবাসী, অত্যন্ত গোঁড়া, তার উপর অশিক্ষিত। সুতরাং ব্রাহ্ম সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব মোটেই সুবিধের নয়। দেখে এসে কিন্তু ভাইপোর মধ্যে

তোলপাড় কাণ্ড ঘটে গেল। সন্ধ্যায় তাঁকে আর একবার দেখে এলেন। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত এবং পরদিন যতক্ষণ ছিলেন—কাকার কথাই বার বার আলোচনা করতে লাগলেন।

রামানন্দের চরিত্রের প্রভাব সেই গোঁড়া গ্রামবাসী ভাইপোর উপর কিরূপ ক্রিয়া করেছিল—নিম্নোক্ত কথোপকথন থেকে তা বোঝা যাবে :

"দেখ, কাকা ত ব্রাহ্ম—অথচ নিরামিষ খান! আর 'আলো' চালের ভাত খান। এটা ত অবাক কাণ্ড!"

"অবাক কাণ্ড কিছু নয়। ব্রাহ্ম হলেই আমিষ খেতে হবে বা ব্রাহ্মের 'আলো' চালের ভাত খাওয়া নিষেধ—এমন কোনও কানুন নাই।"

"আচ্ছা—ব্রাহ্ম ধর্মটা তা হ'লে কি?"

"ব্রাহ্ম ধর্মই আমাদের দেশের আদি ধর্ম। আমাদের বেদের ধর্ম। বেদে (উপনিষদে) এক ঈশ্বরেরই পূজার বিধান আছে। মূর্তি-পূজার বিধান পাওয়া যায় না। আর খাওয়া-ছোঁয়ারও বিধি-নিষেধ নাই।"

"তুমি ত খুব সংস্কৃত পড়েছ—কাজেই তুমি যা বলছ, তাই ঠিক হবে! তা ছাড়া কাকার মত অত বড় বিদ্বান, জ্ঞানী লোক কি ভুল করতে পারেন? কাকাকে দেখে আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে—কাকা ভুল করেন নাই। কি চেহারা! মুখ দিয়ে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে!"

"বলছি ত ব্রাহ্ম ধর্ম বেদের (উপনিষদের) ধর্ম। এবং এ ধর্মও হিন্দু ধর্ম। বেদই ত হিন্দু ধর্মের মূল।"

"ঠিক বলেছ। কাকা একেবারে 'মূলটি' ধরেছেন। বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক। আমাদের মত ত 'আকাট' নন। আমরা খালি ডালে ডালে ঘুরে মরছি—উনি একেবারে 'মূলটি' ধরেছেন।"

আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল—কেননা, রাত তখন প্রায় ১টা। রামানন্দ তাঁর ভাতুষ্পুত্রের মনের ভিতর কি কাণ্ড ঘটিয়েছেন—তা তাঁর ঐ কথাবার্তায় বেশ বুঝতে পারলাম।

রামানন্দের আচার-ব্যবহার, রামানন্দের চরিত্র, তাঁর স্নেহশীল মন গোঁড়া অশিক্ষিত আত্মীয়স্বজনের উপর এবং অত্যন্ত বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরও উপর কেমন প্রভাব বিস্তার করত—এই ঘটনাটি হতে তা বুঝেছিলাম।

যিনিই রামানন্দের সংস্পর্শে এসেছেন, তিনিই তাঁকে ভালবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন।

আমার শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং রামানন্দ উভয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁদের দু'জনের পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার তুলনা নাই।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী আচারনিষ্ঠ হিন্দু। স্বপাক-ভোজী। স্বজন নিজ কন্যা এবং ভ্রাতৃবধূ (যদিও তিনি বিপত্নীক) ভিন্ন আর কারও পক্ব অন্ন গ্রহণ করতেন না। তিনিও রামানন্দকে নিমন্ত্রণ করে এক সঙ্গে বসে আহার করতেন।

সারনাথে 'মূলগন্ধকুটী' বিহারের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে (১৩৩৮ সালে) রামানন্দ এবং বিধুশেখর উভয়েই নিমন্ত্রিত হন। আমি এবং আমার সতীর্থ প্রভুভাই প্যাটেল আচার্যের সঙ্গে সারনাথ যাই। আমরা দু'জনে হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

আচার্য বিধুশেখর, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে স্বয়ং পাক করতেন। পাকের উপকরণ—আতপ চাল, ঘি, মুগডাল এবং কিছু আনাজ। যা ঐ ডালের মধ্যেই পাক করা হ'ত। তা ছাড়া ভাতের মধ্যে থাকত আলু। ঐ আতপান্ন, মুগডাল এবং আলু-ভাতেই ছিল শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাদেয় খাদ্য।

আচারনিষ্ঠ শাস্ত্রী মহাশয় এবং ব্রাহ্ম রামানন্দ উভয়ে দুই সহোদরের মত একত্রে বসে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তাই আহার করতেন। সে দৃশ্য ভুলবার নয়।

রামানন্দের চিত্ত যখন বিশ্ববাসী সকলেরই হিত চিন্তায় মগ্ন, তখনও তাঁর জন্মভূমি বাঁকুড়ার উপর একটু বিশেষ পক্ষপাত ছিল। তা যে-কেউ রামানন্দের সংস্পর্শে এসেছেন বা রামানন্দের পত্রিকাগুলি পাঠ করেছেন—তিনি জানেন। রামানন্দের পত্রিকাগুলির কার্যালয় এককালে বাঁকুড়া জেলার কর্মিবৃন্দে পূর্ণ ছিল। তাঁদের মধ্যে আমারও আত্মীয় ছিলেন।

বাঁকুড়ার দরিদ্র নিঃস্ব প্রতিভাবান তরুণদের তিনি খুঁজে খুঁজে বের করতেন। জহুরীর রত্ন চিনতে ভুল হ'ত না। এই রকম এক অখ্যাত নিঃস্ব পরিবার হতে যাঁকে তিনি শান্তিনিকেতনে এনে ভর্তি করেছিলেন—তিনি আজ ভারত-বিখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর।[১]

বাঁকুড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বাঁকুড়ার শিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত, বাঁকুড়ার খাদ্য-বিশেষ, বাঁকুড়াবাসী জনগণ, সকলেই তাঁর চিত্তে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে-ছিল।

রামানন্দ বাল্যকাল হতেই স্বভাবত কবি প্রকৃতির। যাঁরা 'দাসী', 'ধর্মবন্ধু' প্রভৃতিতে তাঁর রচনা পাঠ করেছেন—তাঁরা তা জানেন। ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে (পৃঃ ৪৮৯-৯০) তাঁর 'জন্মভূমি' পাঠ করলে তাঁর কবি প্রকৃতির এবং জন্মভূমির প্রতি প্রীতির কথা হৃদয়ঙ্গম হবে।

বাঁকুড়ার শাল-মহুয়া ও মহুয়ার অরণ্য, দিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেত, মণিকুট্টিম-সদৃশ কঠিন বনভূমি, নদ-নদী, ছোট ছোট পাহাড়—এই সমস্তই রামানন্দের প্রাণে আনন্দের হিল্লোল জাগাত।

শৈশবে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁর দেহ লালিত হয়েছিল, অন্তিমকালে সেইখানেই দেহত্যাগ করবেন—এই আকাঙ্ক্ষায় তিনি ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে বাঁকুড়ায় বাস করতে যান।

এবার বহুকাল পরে তিনি নিজের শৈশবের লীলা-ক্ষেত্র, কৈশোরের স্বপ্নলোকে দীর্ঘদিন অবস্থান করে-ছিলেন। কিন্তু সেই স্থানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ণ হয় নাই।

চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসতে হয়। ১৯৪২ সালের কোজাগরী পূর্ণিমা তিনি তাঁর জন্মভূমি বাঁকুড়ায় কাটিয়ে অক্টোবর মাসে মোটরযোগে কলকাতায় আসেন।

সেখানে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন।

১। ১৯২৫ সালে রামানন্দের নির্দেশে রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে আসেন। রামানন্দ তখন শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। তিনি স্বয়ং রামকিঙ্করকে আচার্য নন্দলালের হস্তে সমর্পণ করেন।

রামকিঙ্কর বলেন—"বাঁকুড়ায় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিনি একদিন হঠাৎ আমার খুঁজেতে এসে উপস্থিত হন। সে আমায় এক গাদা লোভালোভ দিন।"
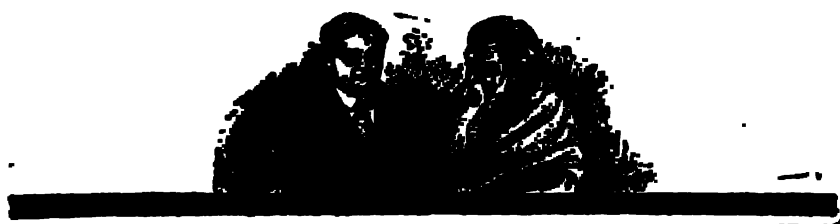
শেষ-মধু

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রান্নাঘরের রোয়াকে বাজারের থলিটা রোজকার মত পড়েই আছে। অথচ ঐ থলিটার মধ্যেই আজ একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ জিনিষ আছে। সুলোচনা সে কথা এখনও জানে না। দেখা যাক্ সুলোচনা ঐ জিনিষটা নিয়ে কি করে? মনে হয় সুলোচনা যখন বুঝতে পারবে তখন প্রখর গ্রীষ্মের একটা দাবদাহের মত সুলোচনার কান দুটো গরম হয়ে যাবে। তারপর ঈশান কোণে উঁকি মারা এক চিলতে কাল মেঘের মত, মুখটা সুলোচনার থমথমে হয়ে যাবে। পরে বর্ষণধারার মত নয়নে বর্ষা নামবে। সে সব পরের কথা। এখন এ দিকটা কি হয় দেখা যাক।

তুলসীমঞ্চে পিদিমটা নামিয়ে, আঁচলটা গলায় বেড় দিয়ে, মঞ্চে মাথাটা ঠেকাল সুলোচনা। মাথাটা ঈষৎ উঠল, আবার ভক্তিভরে কপালটা ছুঁয়ে গেল। পিদিমের আলোয় দূর থেকে ব্রজবাবু এই ভক্তি-বিনম্র মুখখানি দেখলেন। একটু হাসি বিনিময় হ'ল। শাঁখ বাজতেই ব্রজবাবুর হাত দুটো আপনা থেকেই জোড় হয়ে এল। জোড় হাতটা মাথায় ঠেকালেন।

অফিস ফেরৎ বাজারের থলিটা ব্রজবাবু রোয়াকের কোণে রেখেছেন। সেই থেকে থলিটা এক ভাবেই পড়ে আছে। চারিদিকে আলো-আঁধারের রেষারেষি। কে-বা হবে জয়ী? বাড়ী বাড়ী আলোগুলো ফুট ফুট করে জলছে। ঘর ঘর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। পাড়ার ছেলেরা খেলে এসে জমায়েত হয়েছে। নীড়ে ফেরা পাখীর মত কিচির-মিচির করছে। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর এক হয়েছে। কোনটাই আর স্পষ্ট নয়। ছোটদের আসর শেষ। এবার বড়দের পালা।

ব্রজবাবুর বাড়ীটা শেষ পর্যন্ত হ'ল। কো-অপারেটিভের ঋণের দৌলতে। টাকা ধার নেওয়া সোজা, আর শোধ দেওয়া শক্ত জিনিষ। ইতিমধ্যে সংসারের অবস্থা সঙ্গীন। কোন রকমে হয়েছে মাথা গোঁজবার মত একটু আস্তনা। এখনও অনেক কাজ বাকি। স্নান-ঘর হয় নি। পাতকুয়ার মাঝামাঝি দরমার পার্টিশান দিয়ে তৈরী দুটো চালাঘর। একটায় হয়েছে স্নানঘর। অপরটায় বাসন মাজা আর সব কাজ।

সঙ্গতির অভাবে ইলেকট্রিক আসে নি। ঘরের মেঝে, দেওয়ালের পলস্তারার কাজ শেষ হয় নি। ক'টা জানালার কাজ এখনও বাকি। বাঁশ দিয়ে ঘেরা আছে। তবু নিজের ঘর। ওরই মধ্যে রথের মেলা থেকে কেনা গাছ-গাছালি লাগান হয়েছে। তুলসীমঞ্চটা সুলোচনার মনের মত হয়েছে। তবু ভয়। বছরের দুটো মাস জলে ডুবে থাকে। তবু আনন্দ। নিজের ঘর, ভাড়া গুনতে হয় না।

রান্নাঘরের দরজাটা খুলে দেখল সুলোচনা। আঁচ উঠে গেছে। রাজ্যের কাজ চাকভাঙা বোলতার মত সুলোচনাকে যেন ভেড়ে আসে। কোন কাজটা আগে করবে, কোনটা পরে করবে, তার কোন হদিস পায় না সুলোচনা। অথচ সব দিন এমন ছিল না। মাসখানেক হ'ল নোঙরহীন নৌকোর মত সুলোচনার অবস্থা। শাশুড়ী দেহ রাখলেন। বুড়ো হাড়েও কাজে হার মানতে হ'ত সবাইকে।

সুলোচনা এক রকম গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াত। ছেলেটার ঝক্কি ত উনিই সামলাতেন। এখনও মাঝ রাতে ছেলেটা ঠাকুমা বলে কেঁদে ওঠে। দিনরাত খেলার ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে আসে, আর ঠাকুমাকে খোঁজে। দামাল ছেলেটাকে কোন প্রকারে বশে রাখতে পারে না সুলোচনা। অথচ উনি বুঝি যাদুই জানতেন। একটা দস্যি ছেলে যে বাড়ীতে আছে তা বোঝাই যেত না।

সংসারের যেদিকে তাকায় সেদিকটা শূন্য মনে হয় সুলোচনার। একটা অভাববোধ সব সময় ঘিরে থাকে। ভয়ে সুলোচনার হাত-পা কাঁপে। আর এই ভয় সন্ধ্যায় শূন্যতাবোধটা প্রবল ভাবে দেখা দেয়। বৌমাকে উপলক্ষ্য করে সে কাঁদে। কেমন করে চালাবে। নিজের মাকে মনে পড়ে না সুলোচনার। মামারা বিয়ে দিল। তারপরই এক অপার স্নেহের সাগরে অবগাহন করবার সুযোগ পেল। শাশুড়ী বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। সেদিন থেকে সুলোচনার জীবনের গতিটাই বদল হয়ে গেল।

শোবার আগে শাশুড়ীকে কাশীরামের মহাভারত

পড়িয়ে শোনান। বিধবা মানুষের খাবার তদারকে করা। সব কাজে, সব কিছুতে তিনি যেন জড়িয়ে আছেন। মনে হ'ত না শাশুড়ী আর বৌ। মনে হ'ত মা আর মেয়ে। ব্রজবাবু নিজের জগতে মহানন্দে ছিলেন। অভাব আছে, অনটন আছে, তবু মায়ের এক জোড়া সদাজাগ্রত চোখ তাঁকে ঘিরে ছিল। ওরই মধ্যে এক স্বর্গীয় আনন্দে দিন কেটে চলেছিল। মাঝখান থেকে ছন্দপতন হ'ল।

ছেদ পড়ল। নিরুপমা দেহ রাখলেন। নীলের উপোস, ঘরের লক্ষ্মীপূজা, রামনবমী, অন্নপূর্ণা পুজো, সব ক'টা উপবাস এক সঙ্গে ভীড় করল। পুরাণো দিনের মানুষ, উপবাসে ফাঁকি ছিল না। কিন্তু বয়স সে ভার সহ্য করতে পারল না। সকালেও রান্নার কাজে এটা-সেটা এগিয়ে দিয়েছিলেন। কেউ জানত না মৃত্যু তাঁর শিয়রে এসে উপস্থিত হয়েছে।

দু'টি খেতে বসবেন হঠাৎ বুকে অসহ্য ব্যথা। দম যেন বেরিয়ে আসতে চাইল। ছুটির দিন। ব্রজবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। ডাক্তার এল। অক্সিজেন সিলেণ্ডার এল। নাকের মধ্যে সরু নল চালান হ'ল। সবই হ'ল। কিন্তু প্রাণান্তকর বুকের ব্যথার উপশম হ'ল না। সাজান বাগানের সেরা গাছটি যেন আচমকা ঝড়ে প'ড়ে গেল।

বাড়ীর কারুই মনে হয় না মানুষটা নেই। মনে হয় কোথাও যেন দু'দিনের জন্ত বেড়াতে গেছে। এখুনি ফিরে আসবে। এসে নিজের সাজান সংসারের হাল নিজে ধরে বসবে। এ ধারণাটা কত ভুল, মানুষ বুঝেও তা বুঝতে পারে না। বুঝি বুঝতে চায়ও না।

বাজারের থলিটা এক ভাবে পড়ে আছে। ওটা খোলবার বা খুলে দেখবার যেন কোন স্পৃহা নেই সুলোচনার। ওটাতে যা থাকে তা সুলোচনার অজানা নয়। বাইরে থেকেই আন্দাজ করতে পারে। অভাবী মানুষ বুঝি একটা দিব্যদৃষ্টি লাভ করে থাকে। ক'টা আলু, এক ফালি কুমড়ো, কাঁচকলা, ডুমুর, ঝিঙে, পুঁই-শাক, কাঁচা পেপে, কচু। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আনেন ব্রজবাবু।

সপ্তাহে মাত্র একটা দিনে একটু মাছের বরাদ্দ থাকে। এটা নিরুপমার নির্দেশ। সধবা মানুষ বাড়ীতে থাকলে, একদিন আঁশ হাত করতে হয়। এই বিধান দিয়ে গেছেন। ছেলেটা রোজই মাছের জন্ত হটুর-পুটুর করে। তাকে থালা কোলে নিয়ে হেঁসেলের দিকে হাপিত্যেশ করে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকে। মনটা সুলোচনার আনচান করে। না হয়ে সহ্য করা যায় না। অভাব হাজারটা। কেরাসিন নেই, সরষের তেল নেই, কেবল শোনে নেই!

তাও মাসের শেষের ক'টা দিন চলে না। দুঃখহরণ গোস্ত বাটা, বড়ির ঝোল, ফেন-মাখা ডাল-ভাতে, কাঁচা পেঁয়াজ, তেঁতুল কিংবা আমড়ার টক। তবু অন্ত দিন বাজারের থলিটাতে এতক্ষণে হাত পড়ত। আজ সেটুকুরও অবকাশ নেই। আটার ডালটা সুলোচনা বেলাবেলি মেখে রাখে। সন্ধ্যার মুখেই রুটি ক'টা গনগনে আগুনে করে নেয়।

ছেলেটা এখন পাশের বাড়ীর লাল দাদুর কাছে বসে আছে। লাল রঙওয়ালা বাড়ী। তাই ছেলে নাম দিয়েছে লাল দাদু। অন্ত দিন বাপের সাড়া পেলে দৌড়ে আসে। টিফিন কৌটোটা রান্নাঘরে রেখে আসে। জুতো জোড়া খুলে দেয়! তালিমারা চটিটা এগিয়ে দেয়, ঘামসিক্ত পাঞ্জাবীটা হ্যাঙারে ঝুলিয়ে, মোড়াটার ওপর দাঁড়ায়। আলনার হুকে রেখে দেয়। রঙচটা লুঙ্গিটা এগিয়ে দেয়। লুঙ্গি আর খোকা দু'জনই সমবয়সী। হাত-পাখাটা নিয়ে হাওয়া করে।

ব্রজবাবু দোরে বসেন। কদম ফুলের ছোট চুল-গুলো খোঁচা খোঁচা। পৈতেটা দু'হাতে ঘষে ঘষে মাছি মারেন। বাঁ হাতটা সব সময় মাথায় বুলিয়ে যান। মুদ্রাদোষ। আজকে বসে বসে অনেক কথা ভাবতে সুরু করেন ব্রজবাবু। দু'দিন আগের এক রাতের কথা মনে দোলা দেয় সবচেয়ে বেশী। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কথাটা পেড়েছিল সুলোচনা। ব্রজবাবু কম কথার মানুষ তাই গৌর-চন্দ্রিকার প্রয়োজন হয় নি। সুলোচনাই কথাটা বলেছিল: "জান মা কি করেছেন! এবারে পূজায় দেওয়া সেই প্রথম থানটা, তুমি যেটা খুঁজে-পেতে সেন্ট্রল এম্পোরিয়াম থেকে নিয়ে এলে, মা আমাকে দিয়ে তোমার নামটা আঁচলের ধারে লেখালেন, ব্র. ভ। কত সাধলাম মা কাপড়টা পরুন। এক কথা। পরব বৌমা, পরব, শেষে চিবুক ধরে বললেন কি জান? তোমার একখানা হোক, মা আর মেয়েতে পরব না হয়।"

কথাটা শেষ হয় নি সুলোচনার। ব্রজবাবু দেখে-ছিলেন সুলোচনার শাড়ীর হাল। ছুঁচ দিয়ে সেখানে যুত চলছে না। মহাদেবের জিনেজের মত শাড়ীর চারিদিকে কাটল ধরেছে। সুলোচনার শেষের কথা-গুলো শুধু কানে বেজেছিল: "তোমার ধুতিটার অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে, অফিস যেতে হয়, ভদ্রজনের মান,

মার কাপড়টা পর লক্ষীটি—মাথায় একবার শুধু ছুঁয়ে দিও।"

হ্যাঁ কিংবা না বলেন নি ব্রজবাবু। মনে মনে যা ঠিক করবার তাই করেছিলেন। সুলোচনা স্বামীর মনোভাবের কথা অতকারে কিছুই বোঝে নি। শুধু বুঝেছিল শাশুড়ী মারা যাবার পর দীর্ঘদিন পরে স্বামী নিবিড় ভাবে আদর করেছিল সুলোচনাকে।

বাজারের থলিটা এবার খুলতেই হ'ল সুলোচনাকে। খোলবার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল। একটু পরে বাজারের থলিটা খুললে বুঝি ভাল হ'ত। ছেলেটার কোল করার তাগিদে ওটা খুলতে হ'ল। খেলেধেলে এসেই খেতে চাইবে। দেরি হলেই চুলু চুলু চোখে এলিয়ে পড়বে। কিলটা চড়টা দিয়ে খাওয়াতে হবে।

জিনিষটা দেখেই কান দুটো গরম হয়ে গেল। মুখটা থমথমে হয়ে গেল। আকাশ-পাতাল ভাবতে সুরু করল সুলোচনা। মাসের গোড়াতে হলেও না হয় বুঝত। ঠিক মাঝামাঝি। যখন সংসারে ট'াটার টান সুরু হয়েছে, তখন স্বামী কোথা থেকে এটা জোগাড় করল? কৌতূহল মেটে না সুলোচনার স্বামীর কাছে ছুটে যেতেও পারল না। যদি আঘাত পায়। পৌরুষে লাগে। মনকে বোঝায় সুলোচনা। সব মাকে হারিয়েছে। এখন এ সব জিনিষ নিয়ে অযথা হৈ চৈ করা উচিত মনে করল না।

তবু নারীর মন। চিন্তার সমুদ্র তোলপাড় সুরু করল। ওদিকে ছেলের কোল বুঝি পুড়ে যায়। স্বামীর কথা নতুন করে ভাবল। কম কথার মানুষ কিন্তু নির্বিকার নয়। কর্তব্যপরায়ণও বটে। গোনাগুণতি টাকা। শত ইচ্ছা থাকলেও কিছু করতে পারে না। জিনিষটার খুবই প্রয়োজন আছে। এই মুহূর্তে জিনিষটা হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যেন সব দৈন্যের দরজা এক সঙ্গে খুলে দিল।

সে প্রয়োজনটা তাকে দুঃখই দিল। কান্না পেল সুলোচনার। বেশ সুন্দর রঙ। ছাপার ডিজাইনটা কি অপূর্ব! কতদিন এমন শাড়ী পরে নি সুলোচনা! স্বামীকে চা দিয়ে ছেলেকে ডাক দিল সুলোচনা। এক ডাকেই কাজ হ'ল। আমের গন্ধে নীল মাছির মত ছেলে ছুটে এল। এসেই মা'র বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চুমায় চুমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলল সুলোচনাকে।

শাড়ীটা দেখে হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। সুলোচনার লজ্জা আরও বাড়ল। শাড়ীটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ মনে খটকা লাগল। আঁচলের কাছটা হাত বুলিয়ে দেখল। সন্দেহ ঘুচেও ঘুচল না।

ছুটে এসে ট্রাঙ্কটা খুলল। সন্দেহ ঘুচে গেল। থানটা নেই।

থান কাপড়টা আটপৌরে শাড়ী হয়ে সুলোচনার কাছেই ফিরে এল। শাড়ীটা মুখে চেপে হু হু করে কেঁদে উঠল সুলোচনা।

শাশুড়ী মরে গিয়েও বৌমার লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করে গেলেন।

কথাগুলো বুঝতে বাসবীর কিছু সময় লাগল।

বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে দীপকদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারের নগ্নরূপ ভেসে উঠল। বলিরেখাঙ্কিত, জরাজীর্ণ চেহারার রণজিৎ গুপ্ত। অশক্ত, রোগজর্জর দেহ দীপকের মা। নিঃস্ব হতভাগিনী দীপালী।

এ সব অতিক্রম করে চাকরি ছাড়ার সাহস দীপক কোথা থেকে সংগ্রহ করল? শুষ্ক, প্রায় নির্জীব কণ্ঠে বাসবী বলল, চাকরি ছাড়ার কারণ কিছু লেখেন নি?

অনিমেষ চিঠিটা বাসবীর সামনে ফেলে দিয়ে বলল, না, কিছু না। শুধু দাসত্ব-মুক্তির প্রস্তাব। আর কিছু নেই। দেখুন না চিঠিটা।

চিঠিটার ওপর বাসবী খুব দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

লিখেছে ব্যক্তিগত কারণে চাকরির বন্ধন থেকে অব্যাহতি চাইছে। কোন কারণ লেখে নি।

দু-সাত লাইনের চিঠি। এই বয় পরসায় চাকরি-জীবনে যে সব অফিসার এবং সহকর্মীদের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের বদান্যতায় দীপক মুগ্ধ, এমন কথাও আছে। অবশ্য এগুলো একেবারে মামুলী কথা। চাকরি ছাড়ার সময় সবাই লেখে।

তা হ'লে আপনি কোন কারণ জানেন না?

আমি, আমি কি করে জানব?

থেমে থেমে, হাঁপাতে হাঁপাতে বাসবী বলল।

তা হ'লে আর কি হবে। আর কাকে দীপকবাবুর জায়গায় পাঠানো যায় ভেবে দেখি। অনিমেষ দীপকের চিঠিটা নিজের সামনে টেনে নিল।

আর দাঁড়াল না বাসবী। দাঁড়াবার তার আর প্রয়োজন নেই। আস্তে আস্তে পা ফেলে বাইরে চলে এল।

টেবিলের ওপর স্তূপাকার ফাইল। সম্ভবত নিশিবাবু পাঠিয়ে দিয়েছে। গোটাকতক চিঠিও রয়েছে।

কিন্তু বাসবী কিছুই ছুঁল না। চুপচাপ বসে রইল।

অনিমেষ রায়ের বোধ হয় ধারণা দীপকের সঙ্গে বাসবীর রীতিমত যোগাযোগ আছে। চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান। কেন দীপক চাকরি ছাড়ছে সবই বাসবীর জানা।

বাসবীর ভাগ্যটাই মন্দ। মিথ্যা একটা সন্দেহে তার জীবন জর্জরিত। শুধু কি একটা সন্দেহ!

সন্দেহের পর সন্দেহ। মা থেকে শুরু করে অফিসের অধিকাংশ লোকই তার সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ধারণা পোষণ করে।

কিন্তু দীপক হঠাৎ যে চাকরি ছাড়ল? আজকালকার দিনে লোভনীয় কিছু একটা হাতে না এলে কেউ চাকরি ছাড়ে না। দেওঘরের মত জায়গায় লোভনীয় চাকরির সুযোগই বা কোথায়?

সারাটা দিন বাসবী অন্যমনস্ক রইল। অন্যমনস্ক আর বিষণ্ণ। ছাত্রী পড়াতে গিয়েও পড়াশোনাতে তাল করে মন বসাতে পারল না। কিছুক্ষণ পড়িয়েই ক্লান্তি বোধ করল।

বাসবীর এ ভাব ছাত্রীরও চোখ এড়াল না।

আপনার কি শরীর খারাপ?

বাসবী চমকে উঠল, তারপর বলল, না, শরীর খারাপ নয়, একটু জ্বরভাব হয়েছে।

তা হ'লে আজ থাক। আপনি বাড়ী চলে যান।

না, না, ও কিছু নয়। নাও, ইতিহাসটা বের কর।

বাসবী সোজা হয়ে বসল। সব জড়তা, বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে শক্ত, দৃঢ় করল।

বাড়ী গিয়ে বিপদ শুধু বাড়বে। চিন্তা তার সঙ্গ ছাড়বে না। তার ওপর মার' কাছে এই অন্যমনস্কতার কৈফিয়ত দিতে হবে।

কৈফিয়ত না দিলে মা আকাশ-পাতাল চিন্তা করে বসবে। যা প্রকৃত কারণ তার চেয়ে অনেক বেশী ভেবে নেবে। সন্দেহের রং গাঢ় কালো।

অদৃষ্ট বাসবীর সত্যিই মন্দ।

মাঝপথে ট্রাম বিকল হ'ল। অনেকক্ষণ বসে বসে বাসবী নেমে বাসে উঠল। ফলে বাড়ী পৌঁছতে অন্য দিনের চেয়ে বেশ একটু রাত হয়ে গেল।

ক্লান্ত পায়ে বাড়ী পৌঁছে দরজায় হাত রাখতেই দরজা খুলে গেল।

ভিতরে পা দিয়েই বাসবী চমকে উঠল।

জ্যোৎস্না রাত। দেখার কোন অসুবিধা নেই। বারান্দায় আঁচল পেতে মা শুয়ে রয়েছে।

হঠাৎ মনের মধ্যে তীব্র একটা ভয়ের সঞ্চার হ'ল। এভাবে দরজা খোলা। মা এমন ভাবে শুয়ে রয়েছে। খারাপ কিছু হয় নি ত?

মা, মা।

বাসবী পাশে বসে পড়ে মায়ের গায়ে আস্তে আস্তে ঠেলা দিল।

মা ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

কি রে, কি হয়েছে তোর?

আমার কিছু হয় নি মা। তুমি এ ভাবে দরজা খুলে এখানে শুয়ে রয়েছ?

মা আঁচল দিয়ে দুটো চোখ মুছে নিল। শরীরে কাপড়টা টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোর অসুবিধা হবে বলে দরজাটা খুলে রেখেছিলাম।

এ ভাবে কখনও দরজা খুলে রেখ না মা। কিছু একটা হয়ে গেলে, তার পর?

কি হবে, চুরি? চোরেরা সন্ধান নিয়ে তবে চুরি করতে আসে। এ বাড়ীতে ঢুকলে তাদের মজুরী পোষাবে না।

বাসবী আর কিছু বলল না। দরজা বন্ধ করে ভিতরের ঘরে চলে এল।

বালিশ ঠিক করে 'শুতে যাবে বাসবী, এমন সময় মা এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়াল।

কার একটা চিঠি এসেছে বাসী।

চিঠি?

বাসবী আশ্চর্য হল। তাকে চিঠি লেখবার লোক কেউ পৃথিবীতে আছে জানা ছিল না। অনেক আগে কলেজের একদা-সহপাঠিনীরা মাঝে মাঝে দু-একজন চিঠি লিখেছে। কিছু চিঠির বাসবী উত্তর দিয়েছে, অনেকগুলোরই দেয় নি। তার পর সব স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। জীবনসংগ্রামের ঘূর্ণিপাকে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, বাসবী খোঁজও রাখে না।

দেখেছে। অন্ত বাসে, কিংবা পথে, কিন্তু নেমে কথা বলবার উৎসাহ বোধ করে নি।

কার চিঠি?

কি করে জানব। খামের চিঠি।

অর্থাৎ খামের চিঠি না হলে, মা আদ্যোপান্ত পড়ত। বন্ধ চিঠি খুলতে মায়ের সাহস হয় নি। কি জানি মেয়ে যদি বিরক্ত হয়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে মা এগিয়ে এসে খামটা বাসবীর হাতে দিল।

খামটা উল্টে-পাল্টে বাসবী দেখল। ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্ট। কোথা থেকে এসেছে, বোঝা গেল না।

মুখ না তুলেও বুঝতে পারল মা তক্তপোষের এক কোণে বসেছে। চিঠির বিস্তারিত বিবরণ না শুনে উঠবে, এমন আশা কম।

মাথার কাঁটা দিয়ে বাসবী খামটা খুলল। দীর্ঘ এক পাতা চিঠি। তাড়াতাড়ি স্বাক্ষরকারীর নামের দিকে চোখ ফেরাল, তার পরই তার সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে মা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে।

কি রে কার চিঠি?

দীপক গুপ্তর।

বাসবী খুব চাপা গলায় বলল। নামটা মার সামনে উচ্চারণ করতেই যেন লজ্জা পেল।

নামটা বলেই বাসবীর মনে পড়ে গেল, আসল কথাটা মাকে বলা হয় নি।

জানো মা, দীপকবাবু চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

চিঠির পাতায় চোখ রেখে বাসবী বলল।

ছেড়ে দিয়েছে না ছাড়িয়ে দিয়েছে?

এবার বাসবী মুখ তুলল।

ছাড়িয়ে দেবে? কেন, ছাড়িয়ে দেবে কেন?

ওই যে কাকে একবার ছাড়িয়ে দিয়েছিল বলেছিলি! বিকাশবাবু না কি নাম?

বাসবী কোন উত্তর দিল না। মা'র কথাগুলো তার কানেই ঢোকে নি। চিঠির ছত্রে মনোনিবেশ করেছে।

দেওঘরের মন্দিরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দীপকের। বাঙালী ভদ্রলোক। বিদেশী এক কোম্পানীর ম্যানেজার। দীপককে তার খুব পছন্দ। তার পর বার তিনেক দেখা হয়েছে। তিনি কলকাতায় পৌঁছে দীপকের নামে এক নিয়োগপত্রও পাঠিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য এ বিষয়ে দীপকের তাঁর আগেই কথাবার্তা ঠিক হয়ে

ইতিমধ্যে দীপক অফিসে চাকরি ছাড়ার চিঠি দিয়েছে। হয়ত খবর পেয়েছে বাসবী। এই সুযোগে বাসবীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে দীপক। তার ঋণ অপরিশোধ্য।

একেবারে কোণের দিকে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, বাসবীকে এই চিঠি লিখে যদি সে অন্যায় করে থাকে, তা হলে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

চিঠিটা বাসবী আবার পড়ল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কোথাও উত্তর দেবার কথা দীপক লেখে নি। নতুন অফিসের নামও জানায় নি।

কি রে, কি লিখেছে?

মা বাসবীর গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

কি লিখেছে বাসবী মাকে পড়ে শোনাল।

একেই বলে মানুষের বরাত। ছেলেটার খুব উন্নতি হয়ে গেল। আর আমাদের বরাত পাথর চাপা।

অসহায় ভঙ্গিতে মা নিজের কপাল স্পর্শ করল।

তুই একটা কাজ কর না।

অন্ধকারে মা যেন আলোর কিছু দেখতে পেয়েছে, কণ্ঠস্বরে তেমনই উত্তেজনার কম্পন।

কি কাজ?

তুইও এ অফিস ছেড়ে দিয়ে দীপকের অফিসে কাজ নিয়ে নে না। দীপককে বলে দে মাইনেটা যাতে একটু ভাল হয়। এ মাইনেতে সংসার চালানো রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তুইই তো এ অফিসে দীপকের চাকরি করে দিয়েছিলি, সেটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ তার থাকা উচিত।

বাসবী হাসল। সংসারের দৈন্য, দুর্দশা মাকেও বস্তুতান্ত্রিক করে তুলেছে! কঠোর বাস্তববাদী। এ পৃথিবীতে সম্পর্কটা শুধু আদান-প্রদানের, এ রহস্যটুকু তারও অজ্ঞাত নেই।

কিছু একটা বলতে হবে। উত্তরের প্রত্যাশায় মা চেয়ে রয়েছে বাসবীর দিকে।

তা হ'লে এক কাজ করি মা।

কি?

কালই দেওঘর চলে যাই। মন্দিরের সামনে গিয়ে রোজ দাঁড়িয়ে থাকি, যদি কারো চোখে লেগে যাই।

প্রথম দিকটা মা খুব আগ্রহসহকারেই বাসবীর কথাগুলো শুনছিল, কিন্তু পরিহাসের গন্ধ পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি উঠি। তোর সঙ্গে এ সব কথা আমার বলতে যাওয়াই বকমারি।

মা উঠে দাঁড়াল।

শোন মা, শোন, মিথ্যেই তুমি রাগ করছ।

বাসবী মার একটা হাত ধরে আবার তাকে পাশে বসিয়ে দিল।

কি বল?

তুমি ঠিকই বলেছ মা, আমাদের পাথরচাপা কপাল। আমাদের উন্নতির আশা কম। তা ছাড়া, দীপকবাবু ত সবে ঢুকছেন নতুন অফিসে, উনি কি আর এর মধ্যে কাউকে ঢোকাতে পারবেন?

বেশ, কিছু দিন পরেই না হয় বলিস। দীপক অফিসে ঠিকমত বসলে।

তখন হয়ত দীপকবাবু তোমার এই কেরাণী-মেয়েকে চিনতেই পারবেন না মা। লোকে ওপরে উঠলে তলার লোকদের ভুলে যায়। তা ছাড়া আমার সঙ্গে কতটুকুই বা আলাপ।

এরপর মাকে আর উত্তরের অবকাশ দিল না বাসবী, বিছানা ঝেড়ে শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করল।

কেবল মা'র দিকে চেয়ে বলল, তুমি যাবার সময় বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে যেও মা। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

ঘর অন্ধকার করে মা বেরিয়ে গেল।

বাসবী ঘুমাল না। তার ঘুম এল না। অথচ ভেবেছিল, এত ক্লান্তি, এত অবসাদ শরীরে, বিছানায় গা ছোঁয়ানো মাত্র ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে।

দীপক যে ভাল চাকরি পেয়ে এ অফিসের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, এমন একটা খবর অনিমেষকে জানাবে কি না, বাসবী সেই কথাই ভাবতে লাগল।

জানাতে গেলেই অবশ্য নানা কথা উঠবে। বাসবী জানল কি করে, কোন্ সূত্রে?

মা'র ছুঁড়ে দেওয়া প্রলোভনের কথাটুকুও বাসবীর মনের আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

এমন হওয়া কি একেবারে অসম্ভব! দীপক যদি ইচ্ছা করে তা হ'লে ভদ্রগোছের বেতনে বাসবীকে নিতে পারে না তার অফিসে। তা হলে বিকালের এই ক্লান্তিকর ছাত্রী পড়ানোর হাত থেকে বাসবী নিষ্কৃতি পেতে পারে।

তা ছাড়া, মাইনেটা ভাল হ'লে সংসারের অভাব-অনটনের ছিদ্রগুলো বাসবী আবৃত করতে পারে। খোকনকে ভাল একটা স্কুলে ভর্তি করে দেবে। কবিকেও। এই সংকীর্ণ, ঘিঞ্জি এলাকা থেকে বাস উঠিয়ে একটু ভাল পাড়ায় আস্তানা নিতে পারে। দক্ষিণের দাক্ষিণ্যমাখা খোলা বারান্দা। সুপরিসর কয়েকটা কামরা। আধুনিক বাথরুম। কিছু আসবাব। সারা দিন-রাতের জন্য একজন পরিচারিকা আর একটা ছোকরা চাকর।

বিকালে অফিস থেকে এসে বারান্দায় বেতের চেয়ারে

বসে সুদৃশ্য চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে জীবনটা উপভোগ করা।

এই পৃথিবীতে এইটুকু কি খুব বেশী চাওয়া হ'ল বাসবীর পক্ষে? হাত-পা প্রসারিত করে স্বচ্ছন্দভাবে বাঁচবার কামনা করা কি অপরাধ!

বিছানার ওপর বাসবী উঠে বসল।

জ্যোৎস্নার ম্লান আলো এতক্ষণ পরে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। সেই আলোয় দরিদ্র-সংসারের একটা ছবি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোন খুঁত নেই। নিটোল, বিবর্ণ ছবি।

শাড়ীর আঁচলটা মুখে চাপা দিয়ে বাসবী আবার শুয়ে পড়ল।

বাসবী ভেবেছিল অনিমেষ হয়ত আবার ডাকবে তাকে। দীপকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু অফিসের কাজে বার কয়েক ডাকলেও অনিমেষ দীপকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করল না। বাসবীও কিছু জিজ্ঞাসা করল না। তার জিজ্ঞাসা করার কিছু ছিলও না।

দীপকের চিঠির উত্তর নিশ্চয় এতদিনে চলে গেছে। তার চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, কারণ অফিসের কথাবার্তায় বুঝতে পারল দীপকের জায়গায় মল্লিককে পাঠানো হবে। সেজন্য তাকে তালিম দেওয়াও শুরু হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা একদিন কথাটা বলল।

দীপকবাবুর কথা শুনেছ?

হ্যাঁ, শুনেছি, বাসবী ঘাড় নাড়ল, ম্যানেজার বলেছেন।

ভদ্রলোক কোন্ অফিসে চাকরি পেয়েছে কিছু শুনেছ?

বাসবী একটু চমকে উঠল। অন্য জায়গায় চাকরি পেয়েছে একথা জানল কি করে কৃষ্ণা?

নতুন চাকরির কথা ত কিছু জানি না। চিঠিতে দীপকবাবু লিখেছেন, ব্যক্তিগত কারণে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

এ ছাড়া আর কি লিখবেন? কোন্ অফিসে চাকরি পেয়েছেন সে কথা কোন বুদ্ধিমান লোকই জানায় না। কি জানি পুরোনো অফিস যদি ক্ষতি করার চেষ্টা করে। নতুন অফিসটার নাম জানতে পারলে ভাল হ'ত, একটা দরখাস্ত নিয়ে দাঁড়াতাম।

তুমি?

হ্যাঁ। অবশ্য আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের কোন আলাপ নেই। তোমার কাছ থেকে একটা পরিচয়-পত্র নিয়ে নেতাম।

বাসবী হাসল, ঠিক আছে, নতুন অফিসের ঠিকানা তুমি যোগাড় কর, দু'জনে দুটো দরখাস্ত নিয়ে হাজির হব।

তুমি এ অফিস ছাড়বে কোন্ দুঃখে ভাই?

যে দুঃখে দীপকবাবু ছাড়ছেন। এ অফিসে আকর্ষণটা আর কিসের? মাসান্তে দক্ষিণা যে বেশী দেবে, আমরা তার। তাই না?

কৃষ্ণা কিছু বলল না। মুখ টিপে হাসল।

কৃষ্ণার কামরা থেকে বেরিয়েই বাসবী দেখতে পেল তার টেবিলের সামনে বাসববাবু দাঁড়িয়ে। তার মানে, আবার বোধ হয় অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে কোথাও।

বাসবীকে আসতে দেখে বাসববাবু ঘুরে দাঁড়ান।

আপনি শুনেছেন?

কি ব্যাপার বাসবী কিছুই জানে না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারল, বাসববাবু দীপকবাবুর কথাই তুলবে। এ বাজারে এক চাকরি ছেড়ে আর এক চাকরি পাওয়া রীতিমত ভাগ্যের কথা। এমন ভাগ্যবানের সংখ্যা পরিমিত।

কি?

বাসবী নিজের চেয়ারে বসতে বসতে প্রশ্ন করল।

প্রীতিদেবীর অবস্থা খুব খারাপ।

অবস্থা খারাপ?

বাসবী ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

হ্যাঁ, অফিসে এসেই ফোন পেয়েছিলাম। কাল এক ক্লাবে রিহার্সাল দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখনও পর্যন্ত জ্ঞান হয় নি।

এতক্ষণে বাসবীর মনে পড়ল, অফিসে ঢোকবার সময় কেরাণীদের জটলা লক্ষ্য করেছিল। বাসববাবুও তার মধ্যে ছিল। অফিস-রাজনীতির আলোচনা ভেবে বাসবী আর আমল দেয় নি। এখন বুঝতে পারছে, আলোচনার কেন্দ্র ছিল প্রীতিদেবী।

বাসববাবু বলে চললেন।

ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে আমার চেনা, তাই তারা আমাকেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে। অবশ্য আমাকে ছাড়া আর কাকেই বা জানাবে।

কেন, প্রীতিদেবীর স্বামী?

সে স্কাউণ্ড্রেলটার কথা আর বলবেন না। সে কলকাতায় নেই। মাঝে মাঝে এখানে আসে, স্ত্রীর রোজগারে খেয়ে আবার ফূর্তি করতে বাইরে চলে যায়।

বাসবী চুপচাপ বসে রইল। এমন একটা ব্যাপারে কি বলবে ভেবেই পেল না। অনেক সময়, অনেক পরিস্থিতিতে মানুষের কথা বলার শক্তিও থাকে না। এ বুঝি তেমনই এক পরিস্থিতি।

একটু আগে আমি হাসপাতালে ফোন করেছিলাম, শুনলাম জ্ঞান হয় নি। অবস্থা আরও খারাপের দিকে। ম্যানেজারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমি একবার হাসপাতালে যাচ্ছি।

বাসববাবু আর দাঁড়াল না। ক্রতপায়ে বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য লাগল বাসবীর। টেলিফোনে এমন একটা খবরের আদানপ্রদান হ'ল, অথচ কৃষ্ণা ত তাকে একটা কথাও বলে নি। বলা হয়ত প্রয়োজন মনে করে নি। অফিসের প্রাক্তন এক কর্মচারীর অভিনেত্রী স্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ পরিবেশন-যোগ্য বোধ হয় নি তার কাছে।

বাসবী কাজে মন বসাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগল।

প্রীতিদেবীর কাছে নিজেকে যেন নিষ্প্রভ মনে হ'ল। সংসার বাঁচাবার জন্য বাসবী উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে। তিলে তিলে রক্তদান। প্রীতিদেবীরও অবদান বড় কম নয়। যথেষ্ট শিক্ষিতা নয়, কাজেই অফিসে, স্কুলে কাজ পাওয়া সম্ভব হয় নি। অথচ এসব অসুবিধার সংসার কর্ণপাত করবে না। তার খাওয়াদাওয়ার ক্ষুধা! ক্ষুন্নি-বৃত্তির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তাই প্রীতিদেবী যা পারে, সেই পথেই নেমেছে। দারিদ্র্যের কলঙ্কের ওপর চড়া রং মেখে পাদপ্রদীপের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কিন্তু এত করেও সংসার বাঁচাতে পারে নি। সংসারের কর্তা যিনি, তিনি রুদ্ররূপ ধরেছেন। সংহারমূর্তি। সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছেন। সংসারকে উপবাসী রেখে নিজে অবগাহন করেছেন বিলাসের স্রোতে।

নিজের সর্বস্ব পুড়িয়ে প্রীতিদেবী অন্ধকার নাশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু অভাবের অন্ধকার দূর করতে পারে নি। শুধু নিজেই দগ্ধ হয়েছে।

বেয়ারা এসে দাঁড়াল। ম্যানেজার সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

অনিমেষ কেন ডেকেছে, বুঝতে বাসবীর একটুও অসুবিধা হ'ল না। প্রীতিদেবীর কথাই জিজ্ঞাসা করবে।

অনিমেষ চেয়ারটা হেলিয়ে দু' পাশে দু'হাত দিয়ে বসে আছে। দৃষ্টি সিলিং পাখার দিকে।

বাসবী মৃদু গলার শব্দ করল।

অনিমেষ মুখটা নামাল। হাত দিয়ে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, বসুন।

বাসবী বসল।

দীপকবাবু সম্বন্ধে ভাবছিলাম। ভদ্রলোক বেশ কাজের লোক। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গেও আলাপ করলাম। ভাবছিলাম, কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিলে ভদ্রলোক থাকবেন বলে মনে হয় আপনার? হয়ত এ টাকায় সংসার চালাতে অসুবিধাই হচ্ছে।

বাসবীর দু গালে রক্তের ছিটে লাগল। রূপোর দড়ি দিয়ে দীপককে বাঁচবার চেষ্টা হচ্ছে, সে বাঁধনে দীপক ধরা দেবে কি না, সে কথা বাসবীর বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু বাসবীর মনে হ'ল যেটুকু সে জানে সেটুকু বলে ফেলাই ভাল। তার পর যে ব্যবস্থা করা উচিত, এরা করতে পারে।

কাল বাড়ী গিয়ে দীপকবাবুর একটা চিঠি পেয়েছি।

অনিমেষ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। দু'চোখে কৌতূহলের ঝিলিক। ঠোঁটের দুটো প্রান্ত একটু খুলে পড়ল।

চিঠি? আপনাকে?

কথাটা যখন ফেলেছে, তখন আর উপায় নেই। সবটুকুই তাকে উদ্গীরণ করতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অফিসে এত লোক থাকতে দীপক শুধু বেছে বেছে বাসবী সেনকেই বা চিঠি লিখতে গেল কেন? তাও বাড়ীর ঠিকানায়। তা হ'লে সন্দেহের যে অস্পষ্ট কুয়াশা এতদিন অনিমেষের মনে ঘোরাফেরা করছিল, সেটাই এবার জমাট রূপ নিল। সন্দেহ সত্যে রূপান্তরিত হ'ল।

হ্যাঁ, আমি অবশ্য বলেছিলাম মাঝে মাঝে খবর দিতে। ভদ্রলোক এতদিন কোন চিঠি দেন নি, একেবারে সৌভাগ্যের সংবাদ দিয়ে শেষ পত্র লিখেছেন।

শেষ পত্র? অনিমেষের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

শেষ পত্র ছাড়া আর কি। ক'দিন পরেই ত ভদ্রলোক এখানে চলে আসছেন।

অনিমেষ এবার কিছু বলল না। শুধু বিস্ফারিত নেত্রে বাসবীর দিকে চেয়ে রইল। এ কি শুরু করেছে বাসবী? ঐন্দ্রজালিকের মতন একটার পর একটা ঝাঁপি থেকে রহস্যের অবতারণা করছে।

অনিমেষকে আর অন্ধকারে রাখল না বাসবী। দীপকের চিঠির সারাংশটুকু বলে গেল, তার পর শেষে সঙ্গে নিজের কথাটুকুও জুড়ে দিল।

আমাকে একবার সেখানে পাঠিয়ে দিন। দু' বেলা

মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, যদি কোন মহানুভব ব্যক্তির নজরে পড়ে যাই।

বাসবী ভেবেছিল তার কথা শুনে অনিমেষ হেসে উঠবে। কিন্তু অনিমেষ হাসল না, বরং একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বাসবীর দিকে চেয়ে থেকে বলল, তা হ'লে আপনার ধারণা, মাইনে বাড়ানোর চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না। দীপকবাবুকে আটকানো সম্ভব নয়।

আমার কোন ধারণা নেই। দীপকবাবু যা লিখেছেন, তা ত আপনাকে বললাম। চিঠির ভাষায় মনে হ'ল, দীপকবাবু বেশ ভাল চাকরিই পাচ্ছেন। এর বেশী আমার আর কিছু বলবার নেই।

অনিমেষ কিছু বলবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল।

অনিমেষ চেয়ার ঘুরিয়ে হাতলটা তুলে ধরল।

অবস্থা এখনও খারাপ? কি, অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে? ডাক্তার কি বলছেন? ওঃ, কোন আশা দিতে পারছেন না? আচ্ছা, ঠিক আছে। রেখে দিচ্ছি।

টেলিফোন নামিয়ে অনিমেষ বাসবীর দিকে চেয়ে বলল, প্রীতি হালদারের খবর ত শুনেছেন?

হ্যাঁ, বাসববাবু বলছিলেন।

বাসবাবুই ফোন করেছিলেন। অবস্থা সঙ্কটজনক।

একটু থেমে অনিমেষ একটা হাত দিয়ে নিজের চুলগুলো মুঠো করে ধরল। বিড় বিড় করে বলল, ঝামেলার ওপর ঝামেলা। আমার পাগল হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে।

বাসবী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। আর তার এ ঘরে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। বাইরে চলে যাওয়াই উচিত।

আমি যাচ্ছি।

দু' এক মুহূর্ত বাসবী অপেক্ষা করল, উত্তরের আশায়। অনিমেষ মুখ তুলল না। একমনে টেবিলের ওপর রাখা কাগজপত্র দেখার ভান করতে লাগল।

স্প্রিং দরজা ঠেলে বাসবী বাইরে চলে এল।

নিজের জায়গায় বসে ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বাসবী ভাবতে লাগল, এত অল্পদিনের মধ্যে দীপক অফিসে নিজের আসন এমন কায়েমী করে ফেলেছে যে কর্তৃপক্ষরা বাড়তি টাকা দিয়ে তাকে আটকে রাখবার কথা বিবেচনা করছে।

এমন একটা ব্যাপারে বাসবীর হয়ত খুশী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিছুতেই সে মনে প্রসন্নতাব আনতে পারল না। বুকের ঠিক মাঝখানে একটা কাঁটা বিঁধে কেবলই খচ খচ করতে লাগল।

পরের দিন সকালে অফিসে আসতেই ব্যাপারটা ঘটল।

বাসবী নিজের চেয়ারে বসে সবে রুমের গ্রাসে চুমুক দিচ্ছে, বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

মুখে বিরক্তির রেখা ফোটাল বাসবী। একটু বিশ্রাম করার উপায় নেই। আসতে না আসতে ডাকের পালা সুরু হয়ে গেল।

অথচ উপায় নেই। রুমালে মুখ মুছে এখনি ছুটতে হবে ম্যানেজারের কামরায়।

মুখ থেকে গ্লাসটা সরিয়ে বাসবী বলল, যাচ্ছি দাঁড়াও, একটু জিরিয়ে নিই।

বেয়ারা বিস্মিত হ'ল

বলল, কোথায় যাবেন?

ম্যানেজার ডাকছেন ত?

আজ্ঞে না, ডাকেন নি। এই চিঠি পাঠিয়েছেন।

চিঠি? চিঠি টেবিলের ওপর রেখে যাও।

বেয়ারা চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে দিল, তারপর বলল, দিদিমণি, একটা সই করে দিন।

সই? এবার বাসবী বিস্মিত হ'ল, সই আবার কিসের?

বেয়ারা হাতের মোটা খাতাটা বাসবীর সামনে প্রসারিত করল।

বাসবী ঝুঁকে পড়ে খামটা দেখল।

এ ত অফিসের চিঠি নয়, এ চিঠি তার ব্যক্তিগত খামের ওপরে তার নাম টাইপ করা। কুমারী বাসবী সেন।

অনিমেষ রায় কি চিঠি পাঠিয়েছে বাসবী সেনকে। অনুরাগসিক্ত লিপি? কিন্তু সে চিঠি এ ভাবে প্রকাশ্যে বেয়ারা-নির্ভর হয়ে আসবে কেন?

তার আসার পথ ত স্বতন্ত্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে ফল্গুধারার মত সে ত অন্তঃশীলা।

তার জন্য বেয়ারা সই বা দাবি করবে কেন?

দিন দিদিমণি, সইটা করে দিন তাড়াতাড়ি। সায়েব ডেকে না পেলেই চেঁচামেচি সুরু করে দেবেন।

তাড়াতাড়ি কলমটা বের করে বাসবী খাতায় সই করে দিল, তার পর কম্পিত হাতে তুলে নিল খামটা।

দু' এক মিনিটের দ্বিধা, তার পর খামটা খুলল।

একবার, দু'বার, তিনবার—বাসবী বারবার চিঠিটা পড়ল।

প্রথমে কালো অক্ষরের মিছিল। অর্থহীন ভাষা। তারপর একটু একটু করে বাসবী পড়তে পারল।

এতদ্বারা বাসবী সেনকে জানানো হচ্ছে যে সামনের মাস থেকে তার পনেরো টাকা বেতন বৃদ্ধি হ'ল।

চিঠিটা সামনে রেখে বাসবী দু' গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। প্রতি মাসে বাড়তি পনেরো টাকা। দরিদ্র সংসারের পক্ষে কম নয়।

কিন্তু হঠাৎ এ বদান্যতার কারণ? যখন বাসবী অনিমেষের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল, বিভাস হালদারের বিরুদ্ধে অভিযোগের মালমশলা সংগ্রহ করতে, তখন সাইরে দাঁড়ানোর তবু একটা যুক্তি ছিল। যে কাজ অফিসে কারও দ্বারা সম্ভব ছিল না, কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করে বাসবী সে কাজ করেছিল।

ক্ষতি স্বীকার ছাড়া আর কি। অফিসের দু' একজন, যারা বিভাসবাবুর অন্তরঙ্গ, তারা মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে যে বাসবীর প্রতি বিরূপ হয়েছিল, এটা বুঝতে বাসবীর একটুও দেরি হয় নি।

তা ছাড়া, বিভাসবাবু আর প্রীতি ত সোজাসুজিই তাদের বিরাগ প্রকাশ করেছে। চোখের কঠিন দৃষ্টিতে, মুখের অভব্য ভাষায়।

একটু ভাবতেই কথাটা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতন বাসবীর মনে হ'ল।

দীপক ভাল চাকরি পেয়ে অন্যত্র যাবার সিদ্ধান্ত করেছে। অনিমেষের ধারণা দীপকের সঙ্গে বাসবীর যোগসূত্র নিবিড়। সম্ভবত কিছুদিন পরে দীপক বাসবীকেও নিজের কাছে নিয়ে যাবে। যদি ইতিমধ্যে অনিমেষের সেজাবেশীর সঙ্গে দেখা হয়ে থাকে, তা হলে এ ধারণা আরও সুদৃঢ় হবে। এমন একটা ধারণা যাতে হয় সে অবকাশ বাসবী নিজেই দিয়েছে।

কিন্তু বাসবী চেয়েছিল অফিসের লোকেরা ভাবুক যে যা তারা কল্পনা করছে, মনে মনে আকাশসৌধ গড়ার চেষ্টা করছে, তার কোন ভিত্তি নেই। অনিমেষের সঙ্গে বাসবীর অন্তরঙ্গতা, যদি কিছু থাকেও, সেটার পরিণতি অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। এ ঘনিষ্ঠতা কেবল অফিস-ভিত্তিক। দুর্জনে এমন কথাও রটনা করুক, বাসবী নিজের উন্নতির জন্য মেলামেশার একটা ভান করছে শুধু। তাতে বাসবী সকলের সামনে একটু হেয়, একটু সস্তা হয়ে যাবে হয়ত, কিন্তু নিজেকে ঘোরতর অপবাদের হাত থেকে বাঁচাবার আর কোন পথ নেই।

অনিমেষও এমন একটা কথা ভাবুক তা কি বাসবী চেয়েছিল। দীপক আর বাসবী দু'জনের প্রতি দু'জনের আসক্তি অপরিসীম। একজন আর একজনের চাকরির জন্য সুপারিশ করে, আবার পরিবর্তে সুযোগ-সুবিধা পেলে আর একজন একজনকে নিজের অফিসে চাকরি দেবার ব্যবস্থা করে দেয়। মোট কথা, দু' জনের আলাদা থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

বরং দক্ষতা নেই এমন কথাই বাসবী অনিমেষকে বুঝিয়েছিল।

দীপকের সঙ্গে নিতান্ত পথের দেখা এবং সেই দেখাটুকুর ওপর নির্ভর করে বাসবী তার জন্য এতটা করবে, এত বড় যুক্তি অনিমেষের পক্ষে গলাধঃকরণ করা যথেষ্ট কষ্টকর হয়েছিল, কিন্তু বোঝাতে বাসবী কসুর করে নি।

দীপক শুধু বাসবীকে চিঠি লিখে চাকরি ছাড়ার খবর জানিয়েছে, এমন একটা সংবাদ অনিমেষের পক্ষে খুব শক্তিমধুর হয় নি।

একটা পুরানো লোক অফিস থেকে হঠাৎ চলে গেলে অনেক ঝামেলা। সেই ঝামেলা এড়াবার জন্যই অনিমেষ মাস মাস বাড়তি পনের টাকা চড়িয়ে দিয়েছে বাসবীর সামনে। লোভের দানা খুঁটে খুঁটে খুকু। অন্যদিকে মন না যায়।

কারণ যাই হোক, বাড়তি কিছু টাকা বাসবীর করায়ত্ত হয়েছে, তার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট আনন্দের সংবাদ। তার সংসারের পক্ষে ত বটেই।

বাসবী একবার ভাবল অনিমেষের কামরায় ঢুকে তাকে ধন্যবাদ জানাবে, কিন্তু লজ্জায় পারল না।

তারপর ঠিক করল, অফিসের আর কাউকে না হোক, টিফিনের সময় কৃষ্ণকে খবরটা জানিয়ে আসবে। তার সৌভাগ্যে কৃষ্ণা নিশ্চয় খুশী হবে।

কিন্তু টিফিনের আগেই অঘটন ঘটল।

বাসবী ড্রয়ার খুলে টিফিন বাক্সটা বের করে টেবিলের ওপর রাখতে গিয়েই থেমে গেল।

সিঁড়ির কাছে বাসববাবুকে দেখা গেল। অবিন্যস্ত চুল, আধ-ময়লা পোশাক, শুষ্ক মুখ। সব ক'টাই বাসববাবুর পক্ষে ব্যতিক্রম।

বাসববাবু সোজা এসে বাসবীর সামনে দাঁড়াল। দুটো হাত ঘুরিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, সব শেষ।

ওই একটা কথাতেই বাসবীর সব প্রশ্নের সমাধানের

ইঙ্গিত লুকানো ছিল, তবু বাসবী জিজ্ঞাসা করল। নিশ্চয়কে দ্বিগুণ নিশ্চয় করার জন্ত।

কি ব্যাপার ?

আজ ভোরে প্রীতি শেষ হয়ে গেল। ভোরের দিকে একবার জ্ঞান হয়েছিল, ছটো চোখ মেলে কাকে খুঁজেছিল, না পেয়ে গভীর হতাশায় আবার চোখ বুজল।

বিতানবাবু আসেন নি।

শকুন্তলা সোম অভিনয় করতে গেছে জলপাইগুড়ি, সে হতভাগা তার সঙ্গে।

বাসববাবু কিছুক্ষণ চুপ করল। কপালের ওপর জমে থাকা ঘামের বিন্দু কোঁচার খুঁটে মুছল।

ইতিমধ্যে অফিসের অনেকেই ঘিরে দাঁড়িয়েছে। টিফিন সুরু, কিন্তু কেউ আর বাইরে যাচ্ছে না। প্রীতির সঙ্গে অল্পবিস্তর সকলেরই পরিচয় ছিল। অন্তত তার অভিনয়-প্রতিভার সঙ্গে।

সকলের মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বাসববাবু গলার সুর খাদে নামিয়ে বলল, মুস্কিল হচ্ছে বাচ্চা ছেলেটার। তাকে দেখাশোনা করার কেউ রইল না।

ভীড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলল, কেন, তার বাবা দেখবে।

তার বাবা ? বাসববাবু মুখে-চোখে বিরাগের ভঙ্গি ফোটাল, বিতান ? তা হলেই হয়েছে।

আইনত দেখাশোনা করতে বাধ্য।

আর একজন কে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল।

লম্পটকে আইন দেখানো বৃথা। এ দায়িত্ব জোর করে কারও ওপর চাপানো যায় না। নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরে চায় নি। তার কাছে এসে দাঁড়াত শুধু রোজগারের টাকাগুলো হাত মুচড়ে কেড়ে নেবার জন্ত। পুত্রের ওপর তার অপত্য স্নেহের আশা করাই বাতুলতা।

শেষ দিকে বাসববাবুর গলাটা গাঢ় হয়ে এল।

একটু একটু করে জনতা এদিক-ওদিক সরে গেল। যে যার জায়গায় গিয়ে বসল। একটু পরেই অফিসের কাজ সুরু করবে। প্রীতির স্মৃতি, তার চিন্তা, ফাইলের তলায় চাপা পড়ে যাবে।

বাসববাবু কিন্তু তখনও বাসবীর টেবিলের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

বাসবী মুখ তুলে দেখতে পেল বাসববাবু উদাস দৃষ্টিতে বাইরের খোলা জানলার দিকে চেয়ে রয়েছে।

কি ভাবছেন ? বাসবী প্রশ্ন করল।

ভাবছি না কিছু, চোখের সামনে একটা ছবি ভাসছে।

হ্যাঁ; ইদানীং প্রীতিদেবীর শরীরে কিছুই ছিল না, কিন্তু যাবার আগে পুরানো রূপ যেন ফিরে এসেছিল। ক্লাবের মেয়েরা লাল পাড় শাড়ী পরিয়ে দিয়েছিল, পায়ে আলতা, সিঁথিতে চাপাও সিঁদুর। ষ্টেজে অনেক ভূমিকায় অনেকবার প্রীতিদেবীকে মরতে দেখেছি, কিন্তু আসল মরণের কাছে সে সব কিছু নয়।

বাসবী কিছু বলল না। মাথা নীচু করে রইল। গলার কাছে অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা। ছবিবার পাকে সমস্ত শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

পৃথিবীতে কেউ অমিত পরমায়ু নিয়ে আসে না। আজ না হয় কাল, সকলকেই যেতে হয়। প্রতিটি জন্মের মধ্যে মৃত্যুর বীজ নিহিত। তবু এই সহজ সত্যটা মানুষের মন বুঝতে চায় না। যে কোন বিয়োগের সংবাদে কাতর হয়ে উঠে।

ছেলেটার মা'র বুকের ওপর আছড়ে পড়ে সে কী কান্না ! পাশের এক ডাক্তারের কাছে ছিল। ছেলেটাই শেষ কাজ সব করলে কি না।

নাটকের সংলাপ বলার মতন থেমে থেমে বাসববাবু বলতে লাগল।

বাসবী বুঝতে পারে তার ছটো চোখ ভিজে উঠেছে। চোখের কোণ উপচে গাল বেয়েও জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

বাসবী চোখে আঁচল চাপা দিল।

চোখ ছটোই চাপা দিল, কান ত আবৃত করতে পারল না। তাই বাসববাবুর কণ্ঠ কানে গেল।

বিতানের খাও যে মারা গেছেন, সেটা আমার জানা ছিল না। ছেলেটাকে নিয়েই সমস্তা।

এইবার, এতক্ষণ পরে বাসববাবু সরে গেল। নিজের জায়গার দিকে, কিন্তু চেয়ারে বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু' একজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

আজ অফিসে বিশেষ কাজ হবে না। এই সব আলোচনাই চলবে। প্রীতির মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা। বিতানের হৃদয়হীনতার ব্যাপার।

দেখলেন ত কাণ্ড।

বাসবী মাথা নীচু করে ফাইল খুলছিল, হঠাৎ শব্দ, আবেগহীন কণ্ঠে চমকে মুখ তুলল।

নিশিবাবু সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের কলম কানে।

কি কাণ্ড ?

খুব আস্তে আস্তে নিশিবাবুর চোখে চোখ রেখে বাসবী

এই বিভাসবাবুর পরিবারের কথা বলছি। আমাদের এত পরিশ্রম, এত চুক্তিপত্রের তোড়জোড় সব নিষ্ফল হ'ল।

কঠিন একটা কথা বাসবীর মুখে এসেছিল, বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে শুধু বলল, কেন, নিষ্ফল হবে কেন? বিভাস হালদার এখনও জীবিত। যৌথ দায়িত্ব। একজন গেলে আর একজন আছে। আপনি চেষ্টা করুন নিশিবাবু, হাল ছাড়বেন না।

কথা শেষ করে বাসবী আর অপেক্ষা করল না। উঠে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

অসহ্য দাহ সারা মুখে। মনে হ'ল দেহের সমস্ত শোণিত বুঝি মুখে এসে জমা হয়েছে। কপালের দুটো পাশে অপরিসীম যন্ত্রণা। মুখে-চোখে জলের ছিটে না দিলে মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে।

কল খুলে বাসবী মাথাটা জলের ধারার নীচে পেতে দিল।

বাথরুম থেকে বাসবী যখন ফিরে এল, তখন নিশিবাবু নেই। সরে গেছে।

নিজের জায়গায় বসে বাসবী ঘাড় ফিরিয়ে নিশিবাবুর চেয়ারের দিকে চোখ ফেরাল। চেয়ার খালি। সেখানেও নেই নিশিবাবু।

সম্ভবত ম্যানেজারের কামরায় গিয়েছে। আগেভাগে এমন একটা মুখরোচক খবর তাকে পরিবেশন করার জন্য।

টেবিল থেকে একটা ফাইল টানতে গিয়েই বাসবীর নজরে পড়ল। তার সামনে খাতার চিঠিটা টেবিলের ওপরই পড়ে রয়েছে। একেবারে অনাবৃত অবস্থায়।

অফিসের অন্য কারও নজর না পড়লেও নিশিবাবুর ঠিক চোখে পড়েছে নিশ্চয়। অবশ্য এ ব্যাপার নিশিবাবুর অজান্তে ঘটেছে এমন মনে করারও কোন হেতু নেই।

অনিমেষ নিশিবাবুকে নিশ্চয় বলেছে। যে টাইপ করেছে চিঠিটা সেও জেনেছে।

অফিসে একজন জানা মানে সকলের জানা। হয়ত সদ্য-বিয়োগের আড়ালে বাসবীর কথাটা চাপা পড়ে গেছে। হয়ত কারও খেয়াল নেই। খেয়াল থাকলেও, এই সময়ে এমন একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চায় নি।

বাসবীর নিজেরই লজ্জা করছে। ঠিক এই দিনে এমন একটা চিঠি না এলেই যেন ভাল ছিল।

দুটো ঘটনার মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। সেই যোগসূত্রটুকুই লোকের চোখে বড় হয়ে দেখা দেবে। দীপকের ব্যাপারটা অনেকেই জানবে না। সকলে ভাববে, বিভাসবাবুর বিরুদ্ধে মালমশলা সংগ্রহ করতে এই মেয়েটিও ম্যানেজারের সঙ্গী হয়েছিল। যেটুকু বুদ্ধি সেই তৎপরতারই পুরস্কার।

সে পুরস্কার এল এতদিন পরে? হ্যাঁ, তাই হয়। দেবতার আশীর্বাদ আসতে একটু সময় নেয়। কিন্তু অভিশাপ আরও দ্রুতগামী।

বাসবী কাজ করার চেষ্টা করল কিন্তু মন বসাতে পারল না। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগল। এক ফাইলের বদলে অন্য ফাইল টেনে নিল। তার পর খেয়াল হতে মনে মনে ধমক দিল নিজেকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলেই চমকে উঠল।

কখন টিফিন পার হয়ে গেছে, বাসবীর হুঁশই ছিল না। অন্যদিনের মতন কেরাণীরা শব্দ করে একসঙ্গে সব বাইরে চলে যায় নি। দু' একজন করে পা টিপে টিপে গিয়েছে। অনেকে আবার যায়ও নি। বাসববাবুকে ঘিরে গল্প করছে। গল্প নয়, বিয়োগান্ত এক কাহিনী শুনছে।

টিফিন বাক্স হাতে করে বাসবী উঠে পড়ল।

আবার বাধা।

বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়াল। অনিমেষের বেয়ারা। তার মানে ম্যানেজার বাসবীকে তলব করেছে।

টিফিন বাক্সটা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে বাসবী ধীর পায়ে অনিমেষের কামরায় গিয়ে ঢুকল।

অনিমেষ চেয়ারে নেই। প্যান্টের পকেটে দুটো হাত ডুবিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি বাইরের দিকে।

বাসবী ঢুকতেও অনিমেষ ফিরল না। বোধ হয় টেরও পায় নি। অনন্যোপায় বাসবী চেয়ারটা ঠেলে একটু শব্দ করল।

কাজ হ'ল। অনিমেষ ঘুরে দাঁড়াল।

আস্তে আস্তে এগিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, আপনি বসুন মিস সেন।

বাসবী বসল।

খুব মৃদু গলায়, শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে অনিমেষ বলল, ভারি মর্মান্তিক খবর। শুনে অবধি আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছি।

বাসবী নিরুত্তর।

বিভাস হালদারের মতন কাউকে সরের সাজা হওয়া উচিত। এ ত হত্যারই সামিল।

এবারেও বাসবী কোন কথা বলল না।

শ্রীভিজেবীদের মতন যেমো আছে বলেই এদেশ এখনও পুরোপুরি নরকে পরিণত হয় নি। সত্যি, এ এক

অদ্ভুত দেশ। এ দেশেরই কিছু স্ত্রীলোক সম্ভব হলে স্বামীকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়, সাজানো সংসার, ছেলেমেয়ে সব ছেড়ে অন্য পুরুষের কণ্ঠলগ্ন হয়। সংসার ভাঙাতেই যেন তাদের অসীম আনন্দ, আবার আর এক দল মেয়ে স্বামীর সুখের জন্য, স্বামীকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে বলি দেয়।

হয়ত বাসবী ভুল শুনল। তার মনে হ'ল কথাগুলোর শেষে একটা দীর্ঘশ্বাসও যেন মুক্তি পেল। হাহাকারের সগোত্র।

আজকের বিয়োগান্ত ঘটনার কষ্টিপাথরে অনিমেষ বোধ হয় নিজের জীবন যাচাই করার চেষ্টা করছে। তুলনা করছে বেলাদেবী আর প্রীতি হালদারের মধ্যে।

কিন্তু এ সব কথা বাসবীর পক্ষে অবান্তর। এ সব শুনে তার কোন লাভ নেই। এ সব শোনাবার জন্যই অনিমেষ ডেকে পাঠিয়েছে বাসবীকে? ব্যক্তিগত দুঃখ আর যন্ত্রণার কাহিনী?

অনিমেষ অন্য কথাও বলল। অফিসের পক্ষে প্রয়োজনীয় কথা।

এ বিষয়ে আমাদের সলিসিটর মিষ্টার বাসুর সঙ্গে কথা বলে দেখলাম। বিতাস হালদারের পিছনে আমরা লাগতে পারি, কিন্তু কতটা কৃতকার্য হব বলা মুশকিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গেও আলাপ করেছি, তাঁর ইচ্ছা নয় এ বিষয় নিয়ে আমরা আর ঘাঁটাঘাঁটি করি। টাকাটা এমন বেশী নয়, যে না পেলে কোম্পানীর বিরাট একটা ক্ষতি হবে। তবে এটুকু জানি প্রীতি হালদার বেঁচে থাকলে এ টাকা তিনি শোধ করে যেতেনই।

বাসবী কথা বলল না, ঘাড় নাড়ল। তারও তাই ধারণা।

কিছুক্ষণ অনিমেষ চুপ করে রইল। টেবিলের ওপর রাখা কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করল। বাসবী বুঝল আর বসে থাকা নিরর্থক। এখনও উঠতে পারলে টিফিন করার একটা চেষ্টা করবে।

ওঠার চেষ্টা করতেই অনিমেষের কণ্ঠ কানে এল।

আপনি আমাদের চিঠিটা নিশ্চয় পেয়েছেন।

আচমকা কথাটা বুঝতে বাসবীর একটু অসুবিধা হ'ল।

তাই সে বলল, কোন চিঠি?

অনিমেষ একটু ইতস্তত করে বলল, আপনার মাইনে বাড়িয়ে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

ও, হ্যাঁ পেয়েছি, এবার বাসবীর মনে পড়ে গেল। এতক্ষণেই মনে পড়ে নি বলে বেশ একটু লজ্জিত হ'ল। একটু থেমে বলল, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

অনিমেষ বিব্রত হ'ল, না, না, আমাকে ধন্যবাদ দেবার কোন হেতু নেই। ধন্যবাদ দিতে হলে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দেবেন। আমি শুধু চিঠিটা সই করেছি।

বাসবী উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল, আমাদের এলাকা আপনার কামরা পর্যন্ত। সুখ-দুঃখ আবেদন-নিবেদন সব আপনাকেই জানাই। আপনাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আমাদের নেই। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমাদের পক্ষে অনেক দূরের জিনিস। আমার কৃতজ্ঞতার শক্তি পরিমিত। তাকে যা কিছু জানাবার আপনিই জানিয়ে দেবেন।

বাসবী উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষও উঠে দাঁড়াল। তার দু' চোখের দৃষ্টিতে প্রশংসার রোশনাই।

বাঃ, আপনি ত চমৎকার কথা বলতে পারেন। আমার ত সন্দেহ হয় লুকিয়ে-চুরিয়ে মাঝে মাঝে কিছু লেখেনও বোধ হয়।

যেতে যেতে বাসবী মুখ ফিরিয়ে হাসল। ম্লান হাসি।

বলল, লিখি বই কি। তবে যা লিখি তা সাহিত্যের ছিটেফোঁটা নয়, হিসাবের খাতা। জমা আর খরচ। দুটোর মধ্যে সেতুবন্ধন করতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে উঠি।

বাসবী আর দাঁড়াল না। দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল।

নিজের জায়গায় গেল না, সোজা কৃষ্ণার কাছে চলে এল।

কৃষ্ণা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটা বই পড়ছিল, বাসবীকে দেখে সোজা হয়ে বসল।

কি ব্যাপার, টিফিনের সময় আস নি যে?

বলছি, আগে একটা বেয়ারা ডাক।

টেবিলের ওপর একটা ঘণ্টা ছিল, কৃষ্ণা সেটা বাজাল।

বেয়ারা এসে দাঁড়াতে বাসবী বলল, আমার ডান দিকের ড্রয়ারে টিফিন-বাক্সটা আছে, নিয়ে এস ত।

টিফিন খেতে খেতে বাসবী বলল, মনটা এমন খারাপ হয়ে উঠল খবরটা শুনে, কিছু ভাল লাগল না। টিফিন পার হয়ে যেতে খেয়াল হ'ল। সত্যি কথা বলতে কি আজ ত কাজে মন বসাতেই পারছি না।

তা দুঃখের খবর সন্দেহ নেই, তবে এমন ঘটনা ত আকছার হচ্ছে।

আকছার?

হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি। আমরা আর ক'টা সংসারের খবর রাখি। মত্ত, অকর্মণ্য, হৃদয়হীন স্বামীর অত্যাচারে

কত স্ত্রী পলে পলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে। একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ত তার চেয়ে অনেক ভাল।

বাসবী নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে রুক্মার দিকে চেয়ে রইল। রুক্মাও কি নিজেদের কথা বলছে। অলক্ষ্যে তার সংসারের ছায়াও হয়ত এসে পড়েছে তার কথার মধ্যে। অমিতেশের মতন নিজের জীবন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে নিজের অগোচরে।

রুক্মার বাপেরও কিছু দোষ আছে। সেজন্য রুক্মার বড় কম নয়। তার সংসারের দুর্ভোগ আরও বেশী।

একদিক দিয়ে প্রীতিদেবী কিন্তু বেঁচে গেছেন।

বেঁচে গেছেন?

তাই বইকি। লম্পট, বিবেকহীন স্বামীর ঘর করার জ্বালা ত ছিলই, তার ওপর নিজেকে ক্ষয় করে করে এই ঋণশোধের চেষ্টা। শুনেছি, বিতানবাবু ত এ বিষয়ে কোন সাহায্যই করতেন না, উপরন্তু প্রীতিদেবীর উপার্জনের ওপর ভাগ বসাতেন।

সব হয়ত সত্যি। জীবিত অবস্থাতেই প্রীতি অর্ধমৃত হয়েছিল, তবু একটা মেয়ের এভাবে ফুরিয়ে যাওয়া যেন ভাবতে পারে না বাসবী। মানুষ ত আশায় বেঁচে থাকে। আশা সঞ্জীবনী। কিছু বলা যায় না, বিতানবাবু নিজের ভুল বুঝে ফিরেও ত আসতে পারত। দু' চোখে অনুতাপের দীপ জ্বালিয়ে সংসারের দরজায় এসে দাঁড়াতে পারত।

অমিতেশই বলেছে, অফিসের টাকাটা খুব যে বেশী এমন নয়। দু'জনে মিলে চেষ্টা করলে এ টাকা শোধ করা খুব বেশী সময়সাপেক্ষ ছিল না।

টিফিন শেষ করে ওঠার মুখে রুক্মা কথাটা বলল।

তবু তুমি দিনে একবার এসে দেখা করে যাচ্ছ। আমরা ত মাত্র দু'টি মেয়ে আছি এ অফিসে। তুমি চলে গেলে আমি একেবারে একলা পড়ে যাব।

বাসবী থমকে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বলল, চলে, যাব? কোথায় যাব?

অফিসের মান ত জানি না ভাই। তবে দীপকবাবুর পি. এ. হয়ে উজ্জ্বল আসনে, শীতকার মেজাজে।

রুক্মা ঠোঁট মুচকে হাসল।

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক রুক্মা। তাই যেন হয়।

বাসবী আর দাঁড়াল না। বাইরে বেরিয়ে এল।

আজ প্রায় সমস্ত দিনটাই গোলমালে কেটেছে। মন ঠিক করে বাসবী কাজে বসতে পারে নি। টেবিলে কাজের স্তূপ জমেছে। কতকগুলো দরকারী চিঠি লেখাও বাকি রয়েছে।

বাসবী ঠিক করল, যত দেরিই হোক দরকারী কাজ সেরে তবে সে উঠবে।

মাঝে মাঝে চিত্ত একটু বিক্ষিপ্ত যে না হ'ল এমন নয়, কিন্তু বাসবী মনকে শাসন করল। প্রীতির কথা ভেবে আর লাভ নেই। শুধু নিজের মনকে বিচলিত করা। কষ্ট থেকে, অমানুষিক যন্ত্রণা থেকে প্রীতি অব্যাহতি পেয়েছে। তার পক্ষে এ মৃত্যু নয়, নিষ্কৃতি।

একটানা অনেকক্ষণ কাজ করার পর বাসবী মুখ তুলেই চমকে উঠল। অফিস খালি। বেয়ারাও কেউ নেই। শুধু ম্যানেজারের বেয়ারা টুলে বসে রয়েছে।

একেবারে কোণের দিকে নিশিবাবু বসে। তবে হাতে অফিসের ফাইল নয়, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। নিবিষ্ট মনে পড়ছে।

কাগজ-কলম গুছিয়ে বাসবী বাথরুম থেকে মুখে-চোখে জল দিয়ে এল। ঘড়িতে ছটা কুড়ি। ভিড় বোধ হয় কিছুটা কমেছে এতক্ষণে। অবশ্য ঠিক বোঝা মুস্কিল। সমুদ্রের বারির মতন উনিশ-বিশ ঠাওর করা দুষ্কর। রাত আটটা পর্যন্ত একটানা মানুষের জোয়ার।

ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বাসবী নিশিবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার, পাঁজি খুলে কি দেখছেন?

নিশিবাবু সশব্দে পাঁজিটা বন্ধ করে বলল, না, বিশেষ কিছু নয়। দেখছিলাম মৃত কোন রকম দোষ পেয়েছে কি না।

মৃত? প্রশ্নটা করেই বাসবী থেমে গেল। সে বুঝতে পেরেছে। আর প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। নিশিবাবু প্রীতিদেবীর কথা বলছে।

অনেক কষ্টে কথাটা বাসবী ভোলার চেষ্টা করেছিল, নিশিবাবু আবার নতুন করে মনে করিয়ে দিল।

আপনি এতক্ষণ কি করছিলেন? নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করল।

কাজ, আর কি। ঘাড়ে একগাদা কাজ চাপিয়েছেন, শেষ না করে উঠি কি করে?

আমি ভাবলাম বুঝি বাড়তি টাকা পেয়েছেন বলে বাড়তি সময়ও কাজ করতে আরম্ভ করেছেন।

দুটো চোখ বন্ধ করে অদ্ভুত একটা শব্দ করে নিশিবাবু হাসতে লাগল।

আর দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। ছোট একটা সূত্র ধরে নিশিবাবু প্রবেশ করবে, তার পর অগণিত প্রশ্নের স্তবক বেয়ে কোথায় গিয়ে থামবে, তার কোনই স্থিরতা নেই।

আচ্ছা, আজকের মতন চলি।

একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে বাসবী এগিয়ে গেল।

মাত্র কয়েক পা, তার পরই থামতে হ'ল। না থামলে বিপর্যয় ঘটে যেত।

অনিমেষ দরজা খুলে বের হয়ে এল। বেশ একটু ক্লান্তগতিতে।

অনিমেষও গতিবেগ সংবরণ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি ব্যাপার, এতক্ষণ অফিসে কি করছিলেন?

বাসবী হাসার চেষ্টা করল, কেন, আমি বাড়তি সময় কাজ করতে পারি এটা বুঝি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অনিমেষও হাসল, ওভারটাইম না যদি দিতে হয়, তা হ'লে নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য।

অনিমেষ বাসবীর পাশে এসে দাঁড়াল।

চলুন, নামা যাক।

দু' জনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল।

পিছনে ফিরল না বাসবী, কিন্তু পিছনে না ফিরেও বুঝতে পারল, অনেক দূরে বসা মানুষটির চোখের দৃষ্টি আর গুপ্তপ্রেম পত্রিকার পাতায় নিবদ্ধ নয়। অন্য এক ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়েছে।

কিছু বলা যায় না, নিশিবাবুর পক্ষে এটা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে শুধু বৃথা কাজের ছুতোয় বাসবী এতক্ষণ কালক্ষেপ করছিল। অনিমেষের কাছে এক সঙ্গে যাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল। হয়তো সময়েরও নির্দেশ ছিল, সেই জন্যই ঠিক একই সময়ে দু' জনে মিলিত হ'ল।

ভাবুক যার যা খুশী। লোকের কথা আর বাসবী চিন্তা করতে পারে না।

দু' জনে নীচে গিয়ে দাঁড়াল। অনিমেষ আগে, বাসবী সামান্য পিছনে।

বাসবী কিছু বলবার আগে অনিমেষ কথা বলল।

শুধু কথা বলা নয়, এক হাতে গাড়ির দরজা খুলে বলল, আসুন।

বাসবী দ্বিধা করল না, কোন আপত্তি নয়। ক্লান্তি জর্জরদেহে মোটর কোটরের এই বিলাসিতাটুকুই যেন মনে মনে কামনা করছিল। হাজার মানুষের ভিড় ঠেলে, অশালীন আচরণ ঠেকাতে ঠেকাতে রসাপারে এক সময়ে বাড়ী ফেরা আর মন্থরগতিতে পথচারীদের পরমায়ু ভিক্ষা দিতে দিতে বাড়ীর কাছে নামার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

বাসবী মোটরের মধ্যে গিয়ে বসল। ভ্যানিটি ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে।

চালকচক্র হাতে থাকলে অনিমেষ বিশেষ কথা বলে না। অভ্যাসটা নিরাপদও নয়।

চৌরঙ্গির কাছে এসে গাড়ি-তার দিকে মোড় নিতেই বাসবী বলল, এ দিকে কোথায় যাচ্ছেন?

অনিমেষ হাসল। রাস্তার আলোর দ্যুতি তার মুখের ওপর এসে পড়েছে। ঝকঝকে দাঁতের সার। দুষ্টিদীপ্ত দু'টি চোখ।

রোজ রোজ এক পথ দিয়ে যেতে ভাল লাগে না, তাই পথ বদলালাম।

বাসবী জানে এ সব শুধু কথার ফুলঝুরি জ্বালানো। এ সব কথা বিশেষ অর্থবহ নয়। পথ বদলালেই কি পথের শেষের আশ্রয় বদলায়?

বাসবীর সংসারে সম্পদ হয়ত নেই, কিন্তু শান্তি আছে। অনিমেষের সংসারে এই শান্তিটুকুও অন্তর্হিত।

বাড়ী ফিরে একটু বিশ্রাম করে অনিমেষ সম্ভবত বেরিয়ে পড়বে। কোন বন্ধুর বাড়ী, কিংবা ক্লাবে। মাঝরাত পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে বাড়ী ফিরবে। এ কথা বাসবী অনিমেষের কাছেই শুনেছে।

কিন্তু এ অবস্থার অবসান ঘটাতে ত অনিমেষ অনায়াসেই পারে। একবার গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে বলে, আর বাসা বাঁধবে না, এমন অলীক আশঙ্কার কোন ভিত্তি নেই।

অনিমেষ মনে মনে ভয় পায়। আবার এক অশান্তি, অস্বস্তি, মনস্তাপ অনিমেষ কিনতে চায় না।

মোটর শব্দ করে ব্রেক কষতে বাসবীর খেয়াল হ'ল। এতক্ষণ নিজের চিন্তাতেই বিভোর ছিল।

জানলা দিয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখল পাশে কলনাদিনী গঙ্গা। মাঝিমাল্লাদের হৈ চৈ, চীৎকারে এলাকাটা সরগরম।

এ কি, গঙ্গায় কেন?

মোটর থেকে বের হ'তে হ'তে অনিমেষ বলল, ভয় পাবেন না, ডুবতে নয়, গঙ্গার ধারে একটু বসব।

বাসবী নামল।

কিন্তু গঙ্গার ধারে অনিমেষ বসল না। সিঁড়ি বেয়ে জেটির ওপরে উঠে গেল। পিছন পিছন বাসবী।

রেস্তোরাঁ। এখানে এ রকম একটা রেস্তোরাঁ আছে, বাসবী শুনেছিল, কোনদিন আসে নি। আসবার সুযোগ আর প্রয়োজন কোনটাই হয় নি।

রেস্তোরাঁয় এলেন যে?

যেতে যেতে অনিমেষ ঘাড় ফিরিয়ে হাসল।

আপনার যেতন বুদ্ধির সমাদরে। ছোটখাট একটা ভোজ পাবার আশায়।

বাসবী বুঝল কথাটা নিছক পরিহাস, তবুও মনে মনে নিজের আর্থিক অবস্থার হিসাব না করে পারল

না। ব্যাগের মধ্যে গোটা তিনেক টাকা বোধ হয় আছে, আর কিছু খুচরো।

দু'জনে মুখোমুখি বসল। একেবারে জানলার ধার ঘেঁষে। নদীর ওপারের আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে একটা জাহাজের বিরাট কাঠামো, একটা নিশান উড়ছে, কিন্তু আধ-অন্ধকারে কোন্ দেশের নিশান বোঝা যাচ্ছে না। জাহাজের চারপাশে ছোট ছোট ডিঙির সার। জলের দোলায় দুলছে।

কি দেখছেন?

বাসবী জানলা থেকে মুখ ফেরাল। বয় একটা মেনুকার্ড এনে অনিমেষের সামনে ধরেছে। অনিমেষ অর্ডার দিচ্ছে।

বয় চলে যেতে অনিমেষ আবার প্রশ্ন করল, একমনে বাইরের দিকে কি দেখছিলেন?

শুধু দেখছিলাম না, ভাবছিলামও।

বটে, ভাবনার কণাও কিছু পেতে পারি আমরা?

অনিমেষের সুর লঘু।

বাসবী বলল, সংসারকে সাহিত্যিকরা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেন। সমুদ্র দেখার সৌভাগ্য হয় নি। আমার কাছে নদীই সমুদ্র। তাই যদি হয় তা হ'লে ঐ ডিঙিগুলো যেন মধ্যবিত্ত জীবন। ঢেউয়ের ধাক্কায় কেবল টলমল করছে। স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই।

আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে রীতিমত চিন্তিত হচ্ছি।

অনিমেষ চোখে-মুখে কপট গাম্ভীর্যের ভাব ফোটাল।

বাসবী কিছু বলল না। শুধু ভ্রূ কুঁচকে অনিমেষের দিকে দেখল।

কোটেশনের ফাইলে এসব কবিত্ব যদি আশ্রয় পায়, তা হ'লে অফিসের হাসিব নিয়ে শঙ্কিত হবার কারণ ঘটবে।

বাসবী কিছু বলার আগেই বয় ট্রে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

সেদিকে চেয়ে বাসবী বলল, সর্বনাশ, এ কি করেছেন, রাতের খাওয়াটাও এখানে শেষ করতে হবে না কি?

আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, অনিমেষ হাসল, কারণ বাড়ীতে আহার পাহারা দিয়ে বসে থাকার মতন কেউ যখন নেই।

বাসবী ভেবেছিল কথাটা বলবে না। সব কথা অনিমেষকে বলারই বা কি প্রয়োজন। কিন্তু অনিমেষের এই আক্ষেপোক্তির পর কথাটা মুখে এসে গেল।

সেদিন বেলাদেবী আমার খুব উপকার করেছেন।

উপকার?

উপকার বৈকি। ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলাম, তিনি করুণাপরবশ হয়ে আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিলেন।

তারপর।

তারপর আর কি?

বিনা স্বার্থে তুলে নিলেন এমন কথা অবিশ্বাস্য। যখন ট্যাক্সি থেকে নামলেন তখন আপনার স্থির বিশ্বাস হ'ল যে অনিমেষ রায়ের মতন লম্পট, স্ত্রী-নিপীড়নকারী দুষ্ট পৃথিবীতে বেশী-সংখ্যক নেই।

আপনি কি আমাকে এত দুর্বলচিত্ত মনে করেন?

মাথা নীচু করে মৃদুকণ্ঠে বাসবী বলল,

অনিমেষ কোন উত্তর দিল না। বুঝতে পারল বাসবী আরও কথা বলবে। তার কথা শেষ হয় নি।

তাই হ'ল। বাসবীই কথা বলল।

যার যা ইচ্ছা বলে যাবে আমি তাই বিশ্বাস করব? বিশেষ করে বেলাদেবীর-স্বরূপ যখন আমার জানতে বাকি নেই।

স্বরূপ? কাঁপা কাঁপা গলায় অনিমেষ প্রশ্ন করল।

তা ছাড়া আর কি! অনেক দিন দেখেছি হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঢুকছেন, সঙ্গে অন্য লোক। অবশ্য তাতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে, এমন ধারণা করার মতন গ্রাম্য মনোভাব আমার নেই, কিন্তু মানুষের চলন-বলনে অনেক কিছু বোঝা যায়।

বাসবী নিজেই বুঝতে পারল অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তার কণ্ঠস্বরে একটা চাপা আক্রোশ ফুটে উঠছে।

নিন-চা খেয়ে নিন।

অনিমেষ নিজের গলায় সহজ সুর আনার চেষ্টা করল। বেলাদেবীর সম্বন্ধে তার যে কোন ঔৎসুক্য, কোন আগ্রহ নেই, বোধ হয় সেটা দেখাবার জন্যই।

চায়ের কাপটা তুলতে গিয়েই বাসবী টের পেল তার হাতটা ভীষণ কাঁপছে। এখন চায়ে চুমুক দিতে গেলে হয়ত একটা বিপর্যয় হয়ে যাবে। চায়ের কাপ খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। বাসবীর বিক্ষিপ্ত, আহত সত্তার মতনই।

একটু সময় কাটাবার উদ্দেশ্যেই বাসবী বলল, বেলাদেবীর নামে এসব বললাম, আপনি কিছু মনে করলেন না ত?

অনিমেষ ম্লান হাসল, কিছু মনে করার অধিকার আমার নেই। তা ছাড়া, আজ যে আমার সংসারের এই শ্রীহীন, লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা তার জন্য বেলার এই প্রজাপতি-চরিত্রও কম দায়ী নয়। এটা বোধ হয় ওর রক্তে মিশে রয়েছে। চেষ্টা করলেও ওর মনকে একজন পুরুষের দিকে নিয়ে

যেতে দেওয়া পারবে না। সেই জন্যই ওকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া আমার পক্ষে আর পথ ছিল না।

অনিমেষের শান্ত, নিরুত্তেজ, কিছুটা বুঝি বেদনার্ত কণ্ঠস্বর বাসবীকে চঞ্চল করল। বাইরে মাঝি-মাল্লাদের আওয়াজ একটু স্তিমিত। জলের কল্লোলও। একটা জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল। সে বাঁশীতেও নিঃসঙ্গতার সুর।

এমন কি হ'তে পারে, অনিমেষের মনে বেলাদেবীর জন্য এখনও গোপনতৃষ্ণা সঞ্চিত! বেলা যদি তার চাপল্য, তার বিবিধ-পুরুষ-প্রীতি ছেড়ে দিয়ে অনিমেষের কাছে ফিরে আসে, তা হ'লে অনিমেষ তাকে গ্রহণ করবে!

বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা হ'ল না। দু'জনেই নির্বাক।

একবার শুধু অনিমেষ অনুযোগ করল, কৈ, আপনি ত কিছু খাচ্ছেন না?

বাসবী বলল, অনেক বেশিতে টিফিন করেছি কি না, তাই মধ্যবিত্ত উদর বাড়তি বোঝা নিতে রাজী হচ্ছে না।

একবার আপনার বাড়ীতে যাব।

একেবারে আচমকা অনিমেষ বলল। দ্বিধাহীন কণ্ঠে।

বাসবীর সারা মুখে আবিরের রক্তরাগ। অনিমেষ যে কোনদিন এভাবে এমন একটা কথা বলতে পারে সেটা বাসবী ধারণাই করতে পারে নি।

কি বলবে বাসবী! অনিমেষের এমন একটা কথার কি উত্তর দেবে!

অফিসের ম্যানেজার বাড়ীতে গিয়ে উঠলে তারপর মা'র দিকে বাসবী আর মুখ তুলে চাইতে পারবে না। সন্দেহের যে ছোট মেঘের ঈশারাটুকু এতদিন মায়ের মনে ছিল, সেটাই সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে।

অফিসে যত কেরাণী কাজ করে সকলের বাড়ীতে কি ম্যানেজার যায় এইভাবে! না কি বাসবী তার বিশেষ কৃপার পাত্রী।

স্পষ্ট অভিযোগের উত্তর দেওয়া চলে, মনের সন্দেহের কোন উত্তর নেই। সে আগুন ভিতরে ভিতরে নিজে পোড়ে, সকলকে পোড়ায়, কিন্তু সহজে নিশ্চিহ্ন হয় না।

অনিমেষের তার পরের কথাতেই বাসবী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। না, ভয়ের কিছু নেই। সে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করছিল। মরুতে সর্পভ্রম।

অনিমেষ বলল, আপনাদের বাড়ী গিয়ে আপনার জিনিসপত্র উল্টে-পাল্টে দেখব যদি কবিতার খাতা আবিষ্কার করতে পারি কিংবা গল্প রচনার কোন উদ্যমের সন্ধান।

অনিমেষ হাসল। বাসবীও।

বুক থেকে একটা ভারভার নেমে গেল। একটা ভয় সর্বদা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাঁধা সড়ক থেকে একটু বিচ্যুত হলেই সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করবে।

হাসতে গিয়েই বাসবীর চোখ পড়ে গেল। মণিবন্ধে বাঁধা হাতঘড়ির ওপর।

সর্বনাশ, অনেক রাত হয়ে গেছে। উঁহুঁ, উঁহুঁ।

অনিমেষও নিজের হাতঘড়ি দেখল, বলল, সোটে ত আটটা।

আপনার ত ঘরসংসারের বালাই নেই। কৃত্যক্রমে ওপর নির্ভর করে বসে আছেন। আমার মা রয়েছে, ভাই-বোন রয়েছে। এখনই গিয়ে দেখব মা বারান্দার চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে পথের দিকে চেয়ে।

অনিমেষ উঠতে উঠতে বলল, সত্যি, কেউ অপেক্ষা করে আছে ভাবতেও এত ভাল লাগে।

বাসবী, তখন কিছু বলল না। কথা বলল মোটরে অনিমেষের পাশে বসে।

জীবনে কখনও কি কেউ আপনার জন্য অপেক্ষা করে নি?

অনিমেষ বাসবীর দিকে মুখ ফেরাল। সারা মুখে একটা পাংশু আভা।

খুব আস্তে, প্রায় স্বগতোক্তির মতন বলল, বেলাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। প্রথম দুটো মাস আমাদের অদ্ভুত ভাবে কেটেছে। অফিস থেকে যেতে একটু দেরি হলে টেলিফোনের পর টেলিফোন। আমার উন্নতির জন্য নির্বিচারে সব টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছিল।

হয় ত চোখের ভুল, বাসবীর মনে হ'ল অনিমেষের দুটো চোখ যেন চকচক করে উঠল।

আর কোন কথা নয়।

বাড়ীর কাছাকাছি আসতে বাসবী বলল, এইখানে থামান। যে গলিতে থাকি, সেখানে আপনার রথের প্রবেশ নিষেধ।

নামবার মুখেই বাসবী শিউরে উঠল।

এদিকটা অন্ধকার। বাতি একটা আছে, কিন্তু ক'দিন ধরেই সেটা জ্বলছে না। লোক চলাচলও খুব বেশী নয়। যারা বাসবীদের গলির বাসিন্দা, এদিক দিয়ে তারাই শুধু যাতায়াত করে।

কিছু মনে করবেন না মিস সেন, আবোল-তাবোল অনেক কথা বলেছি। আজ শ্রীভিদেবীর মৃত্যুর খবরটা আমাকেও কিছু বেসামাল করে দিয়েছে। নিজে কি পাই

নি, সেটাই বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, গুড নাইট।

অমিতেষ একটা হাত বাড়িয়ে বাসবীর একটা হাত চেপে ধরল। খুব অল্পক্ষণের জন্য।

বাসবীর মনে হ'ল ত্বকে যেন হাজার জোনাকির দপদপ। ধীরে ধীরে সমস্ত শরীর অবশ করে দিচ্ছে। এর আগে অমিতেষ কোনদিন বাসবীকে এভাবে স্পর্শ করেছে কি না, সে স্মরণ করতে পারল না। কিন্তু এ রকম অনুভূতি বাসবীর কোন দিন হয় নি।

আস্তে আস্তে বাসবী নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

বাড়ীর সামনে এসে ওপর দিকে চোখ তুলেই বাসবী দেখতে পেল, মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৃষ্টি বাসবীর ওপর ন্যস্ত।

চকিতে বাসবী একবার পিছন ফিরে দেখে নিল। না, বারান্দা থেকেও গলির শেষ প্রান্ত দেখা সম্ভব নয়। বাসবী যে মোটর থেকে নেমেছে, এটা মা'র দৃষ্টিগোচর হয় নি।

দরজা খুলেই মা বলল, কি রে, এত রাত?

মা'র গলার স্বর রীতিমত কাঁপছে।

বাসবী ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বুকের মধ্যে রক্তের দাপাদাপি। রক্তে অশান্ত মত্ততা। অমিতেষের স্পর্শে এ কি দাহ!

আজ ত টিউশনিতেও যাবার কথা নয়। সামনের বাড়ীর খবরটা শুনে অবধি ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পারছি না।

কি খবর? বাসবী দাঁড়াল।

মজুমদারের ছোট ছেলেটা কলেজ থেকে ফিরছিল, বাস চাপা পড়েছে। ওদের বাড়ীর সব পাগলের মতন হাসপাতালে ছুটে গেছে। এখনও ফেরে নি।

বাসবীর কাছে এ কিছু নতুন খবর নয়। পথে-ঘাটে চলাফেরা করতে করতে প্রায়ই দু-একজন পথচারীকে দুর্ঘটনার নির্মম বলি হ'তে দেখেছে। অফিস যাবার সময় চাপ চাপ রক্ত চোখে পড়েছে, ফেরার সময় সব পরিষ্কার। কোথাও দাগের আঁচড়টুকুও নেই। বিয়োগান্ত নাটকের কোন সাক্ষ্য নাই।

ঘরের মধ্যে ঢুকে, বাসবীর পাশে দাঁড়িয়ে মা আবার প্রশ্ন করল, তোর এত দেরি হ'ল?

প্রীতিদেবী মারা গেছেন মা।

বাসবী তক্তপোষের এক কোণে বসে পড়ল।

কে মারা গেছে?

সেই যে অফিসের টাকা-পয়সা গোলমাল করেছিলেন বিকাশ হাজরায়, তাঁর স্ত্রী।

তুই দেখিস না তার অভিনয় দেখে এলি! এসে বললি, খুব চমৎকার অভিনয় করে।

হ্যাঁ, মা। বিকাশবাবু স্ত্রীর ওপর খুব অত্যাচার করতেন। অভিনয় করে প্রীতিদেবী যা রোজগার করতেন, সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে চলে যেতেন। বিকাশবাবুর স্বভাব-চরিত্রও ভাল ছিল না। প্রীতিদেবী এক রকম নির্যাতনে, অর্ধাশনেই মারা গেছেন মা।

বাসবী নিশ্বাস ফেলল।

অফিসের টাকাটার কি হবে?

বাসবী চমকে উঠল। মা আর নিশিবাবুর চিন্তা যেন এক খাতে বয়ে চলেছে।

একটা মানুষের পরমায়ুর অবসানের চেয়ে কয়েক মুঠো টাকার হিসাব অনেক বেশী প্রয়োজনীয়!

অফিসের টাকা আদায় হবে না, আর কি। মানুষটাই যখন চলে গেল, তখন আর আদায় করবেই বা কার কাছ থেকে।

খোকন আর রুবি পড়ছিল, দিদি ঘরে ঢুকতেই পড়া বন্ধ করে দিদির মুখের দিকে চেয়েছিল। তাদের কাছে দিদি একটা পরম বিস্ময়। সংসারের খরচ, তাদের পড়ার খরচ, দরকারী সব জিনিস দিদিই জোটাচ্ছে।

ইদানীং দিদি যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। আর তাদের কাছে আগের মতন এসে বসে না। মাঝে মাঝে ছুটির দিনও বসে বসে অফিসের কাজ করে। সেই সময় দিদির কাছে আসতে তাদের সাহস হয় না।

আজ কিন্তু দিদিকে দেবার মতন একটা খবর আছে।

দিদির কথা শেষ হ'তেই রুবি বলল, তুমি খুব সাবধানে রাস্তা পার হবে দিদি।

সবই বুঝল বাসবী, তবু জিজ্ঞাসা করল, কেন রে?

হ্যাঁ, বাস দেখলে তখনই দাঁড়িয়ে পড়বে। সাতুদা আজ বাস চাপা পড়েছে।

তোর দিদির জন্য কোন ভয় নেই রুবি। তোর দিদিকে চাপা দেবার মতন বাস এখনও তৈরীই হয় নি।

রুবি আর খোকন দু'জনেই দিদির এই ঐশী শক্তির কথা ভেবে বিস্মিত হ'ল।

বাসবী ঝুঁকে পড়ে রুবির ছুটো গাল টিপতে গিয়েই চোখে পড়ে গেল রুবির পরণের ফ্রক শতচ্ছিন্ন। অনেক জায়গায় তালি দেওয়া।

বাসবী মা'র দিকে চাইল, রুবির ফ্রকের যে আর কিছু নেই মা?

মা কিছু বলবার আগে খোকন কথা বলল, আমার একটা সার্টের অবস্থা যদি তুমি দেখ দিদি, তোমার হাসি

পারে। ছুটো হাতা সেলাই করে একেবারে কাঁধের ওপর উঠে গেছে।

বাসবী উঠে নীচু হয়ে মাকে প্রণাম করল।

বলল, সামনের মাস থেকে আমার পনেরো টাকা মাইনে বেড়েছে মা।

পনেরো টাকা ?

চাকরিতে পাকা হবার সময় বাসবীর পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছিল। সেটাই নাকি প্রেসের নিয়ম। বাসবী বলেছিল বছরে পাঁচ টাকা বাড়বে। কিন্তু বছরের মাঝখানে হঠাৎ একেবারে পনেরো টাকা বাড়ল যে ?

মা'র মনের প্রশ্নটা বোধ হয় চোখের তারায় ফুটে উঠে থাকবে। অন্তত সেটা বুঝতে বাসবীর কোন অসুবিধা হ'ল না।

তাই সে বলল, আমার কাজ দেখে ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুব খুশী হয়েছেন। তিনিই বাড়িয়ে দিলেন।

ইচ্ছা করেই বাসবী ম্যানেজারের কথাটা উল্লেখ করল না। এমনিতেই ম্যানেজারের সম্বন্ধে মা'র কেমন একটু ভয় আছে। তার ধারণা তার মেয়ের প্রতি অমিমেষের বেশ একটু দুর্বলতা আছে। তার মেয়েও যে একেবারে নিরীহ, পক্ষপাতশূন্য এমন মতও পোষণ করে না মা। বাসবীর বাইরে যাবার পর থেকেই ধারণাটা যেন আরও দৃঢ়মূল হয়েছে।

ভালই হ'ল। যা অবস্থা হয়েছে, পনেরোটা টাকা যেন পনেরোটা মোহরের সামিল। কি করে যে সংসার চালাচ্ছি ভগবানই জানেন। নে, বাথরুম থেকে ঘুরে আয়, চায়ের জল বসিয়ে দিই।

মা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

না না, এত রাতে আর চা খাব না। রুবি আর খোকনের খাওয়া হয়ে গেলে একেবারে ভাতই খেয়ে নেব।

বাসবীর যা অবস্থা তাতে রাত্রে আর কিছু মুখে না তুললেই হয়। কিন্তু সে কথা বলতে গেলে বিপদ আরো বাড়বে। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একেবারে কালকূটবিষের সাক্ষাৎ মিলবে। অফিসের পর ম্যানেজারের মোটরে তার পাশাপাশি বসে গঙ্গার ধারে বায়ু সেবনের ইতিহাস শুনলে মা'র মূর্ছাহত হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। হয়ত এমন মেয়ের উপার্জিত অন্ন গ্রহণ করতেই অস্বীকার করবে।

তার চেয়ে যেটুকু অনাবৃত সেটুকু অন্তরালেই থাক। অযথা ভুলবোঝাবুঝির পালা শুরু হ'লে সংসারের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না।

খেতে বসে মা তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করল, কিন্তু তোর এত রাত হ'ল কেন, তা ত বললি না।

মুখের গ্রাস নামিয়ে বাসবী বলল, দুপুর পর্যন্ত অফিসে ত কোন কাজই হয় নি। সবাই প্রীতিদেবীর কথা আলোচনা করছিল। এদিকে টেবিলের ওপর স্তূপাকার কাজ, সে সব শেষ করে আসতে রাত হয়ে গেল।

মা অন্য কথা বলল।

বাড়তি টাকা মাইনে পেলে আমায় পাঁচটা টাকা দিবি বাসী।

মাইনের সব টাকাটাই ত তোমার হাতেই তুলে দিই মা।

না, সে কথা নয়, মাইনে থেকে আমি পাঁচটা টাকা খরচ করব।

বেশ ত কর। কি ব্যাপার, কিছু কিনবে বুঝি ?

না বাড় বাড়ন্ত, না, কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসব। চাকরি পাকা হবার পর একবার গিয়েছিলাম। এবার ভাল করে পুজো দেব।

সে রাত্রে আর কথা হ'ল না। কিছুক্ষণ বারান্দায় বাসবী পায়চারি করল।

কিছুতে ঘুম আসছে না। উত্তেজনা নয় অবসাদ, সারা শরীরের গ্রন্থিতে।

এবার অনেকদিন পরে অমিমেষের সঙ্গে বেরিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ ছিল একসঙ্গে। মাঝে মাঝে মোটরের গতির তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছিল। মোটরের দরজা আঁকড়ে ধরেও বাসবী সে স্পর্শ এড়াতে পারে নি।

অমিমেষের মন এখনও কি চায় বেলাদেবীকে ? এমন নিবিড় একটা সম্পর্ক এত অল্পে কি ছিন্ন হতে পারে ? জোর করে ছুটো শরীরে আলাদা হবার ব্যবস্থা করলেও মনকে নিস্পৃহ রাখা যায় না। বিশেষ করে বিয়ের আগে যখন পূর্ব রাগের ব্যাপার রয়েছে। মন দিয়ে মন ছোঁয়ার ঘটনা।

বেলাদেবীও কি মনের গোপনে এখনও কোমল মধুর একটা সম্বন্ধ লালন করে ? তা যদি না করত, তা হ'লে অমিমেষের পাশে বাসবীকে দেখলে তার ছুটো চোখে আগুন জ্বলে ওঠে কেন ? সে যে ঈর্ষার বহ্নি, মেয়ে হয়ে বাসবীর এটুকু বুঝতে কোন ভুল হয় না।

কে জানে, সবটাই জটিল। মানুষের মনের মতন গভীর অরণ্য আর নেই।

সে অরণ্যে প্রবেশ করার শক্তি বাসবীর নেই।

কিন্তু তবু অমিমেষ বাসবীকে কেন ডাকে ? অবশ্য এত দিনের মেলামেশার মধ্যে কোন দিন অমিমেষ সীমা অতিক্রম করে নি। অশালীন ব্যবহার নয়।

কিন্তু নিজেকে বাসবীর বিশ্বাস নেই। অনিমেষের স্পর্শ তাকে যেভাবে স্পন্দিত করে তোলে, রোমাঞ্চিত, তাতেই তার ভয়। সংযমের বাঁধ অপ্রতিরোধ্য নয়, স্নেহে, প্রেমে, যে কোন আবেগে সে বাঁধে ফাটল ধরে। তখন কি করবে বাসবী! কি করে নিজেকে বাঁচাবে!

আঁচল দিয়ে বাসবী মুখটা মুছে নিল। সারা মুখে ঘাম জমেছে। এ ভাবে পায়চারি করলে মা এখনই উঠে আসবে। হাজার প্রশ্নবাণে জর্জরিত হ'তে হবে বাসবীকে।

বাসবী বিছানায় শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করার পর চোখে ঘুম নেমে এল। সংগ্রামী মেয়ের দেহে-মনে পরম শান্তি।

কিন্তু ঘুম ভোর পর্যন্ত স্থায়ী হ'ল না। মাঝ রাতে ভেঙে গেল।

ভীত, সন্ত্রস্ত বাসবী বিছানার ওপর উঠে বসল।

রাত্রির আকাশকে বিদীর্ণ করে শোকের বিলাপ। বিশেষ করে এক নারীকণ্ঠের আর্তস্বর। সন্তানহারা জননীর হাহাকার।

উঠতে গিয়েও বাসবী উঠল না। কি হবে উঠে। আর এক মৃত্যুর চেহারা দেখার তার লোভ নেই। এক সদ্য-মাতৃহারা শিশুর কথা মনে পড়ে গেল। এই শহরের অন্য এক গলিতে সেও হয়ত আকাশ-বাতাস মথিত করে কেঁদে কেঁদে উঠছে।

ক্রমশঃ

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(৬) দৃষ্টিহীনের সুরজগৎ :

যারা জন্মাবধি কিংবা অল্পবয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে, অনেক সময়ে তাদের অন্য ইন্দ্রিয় অধিকতর কার্যকরী বা তীক্ষ্ণ দেখা যায়। তাদের স্মৃতি ও মনন-শক্তির উৎকর্ষতা প্রকাশ পায় কোন-না-কোন ভাবে। দর্শনের অভাবে বিশাল বহির্বিশ্বের আলো থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দৃশ্যবস্তু তাদের কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়ে তাদের অন্তর-জগৎকে প্রায় একান্ত করে তোলে। মন অতিশয় অন্তর্মুখী হয়। বাহ্যদৃষ্টির অভাব অন্য দিক থেকে পূরণ করে নেয় গভীর অন্তর্দৃষ্টি। দর্শন-সম্পর্কিত নানা কার্য-কারণ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়ে তাদের নিজস্ব মানস-লোক এক এক ভাবে সমৃদ্ধ করে। তারা মননশীল হয় বেশি।

তাই দেখা যায়, সাংস্কৃতিক কোন বিষয়ে অন্তরের প্রবণতা থাকলে ঐকান্তিক মনন শক্তির জন্যে তারা সার্থকতা লাভ করে। একান্ত সাধনা তাদের পক্ষে অন্যের তুলনায় সহজতর। বিশেষ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের নৈপুণ্য অনেক দেখা গেছে। বেশ কয়েকজন talent এবং একাধিক genius-ও। যেমন খেয়াল-গায়ক শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈদ্যনাথ মিশ্রের শিষ্য), বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা কৃষ্ণচন্দ্র দে, খেয়াল ও টপ্পা-গুণী সাতকড়ি মালাকর প্রভৃতি।

তবে সকলের নাম সাধারণ্যে সুপরিচিত হতে পারে নি, নানা কারণে। এমনি একজন সঙ্গীত-প্রতিভা ছিলেন সাতকড়ি মালাকর। তাঁর মতন এমন সত্যকার প্রতিভা ও সঙ্গীতবিষয়ে রীতিমত শিক্ষিত শিল্পী বেশি দেখা যায় নি আমাদের দেশে। কিন্তু এই দৃষ্টিহীন, বিত্তহীন সুরের সাধক তাঁর সুদীর্ঘ সঙ্গীতজীবনে দেশবাসীর কাছে বিশেষ কিছু সমাদর লাভ করেন নি। গুণগ্রাহী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই মালাকর মহাশয়ের

পরিণত বয়সে তাঁর সম্বন্ধে দুঃখ করে বলতেন,—'বাংলা দেশের একটা সম্পদ। এত বড় গুণী এখন বাংলায় আর কোথায়? এঁকে কেউ চিনলে না!'

লোকে তাঁকে চিনলে না, তাঁর তুল্য গুণীর প্রাপ্য মর্যাদা দিলে না। এমনকি বাস্তব জীবনের কোন সুখভোগও তাঁর ভাগ্যে মেলে নি। আমৃত্যু নিষ্ঠার দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিদায় নিয়েছেন ইহজগৎ থেকে। তাঁর তপস্যার কথা দেশের ক'জন জেনেছে?

কিন্তু জানবার যোগ্য ছিল তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা। অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর জীবনের সাধনা, তাঁর সঙ্গীত-সাধনা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন। শুধু অব্যাহত রাখা-ই নয়, যে উচ্চ মানের সাঙ্গীতিক আদর্শ তিনি অনুসরণ করতেন, তার থেকে বিচ্যুত হন নি কোনদিন। সঙ্গীতের মান ব্যক্তি-স্বার্থের জন্যে কখনও তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি।

চিরদিন দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করেও সঙ্গীতচর্চার বিষয়ে তিনি ছিলেন পরম আদর্শবাদী। তাঁর সমকালে রাগসঙ্গীতের অনুশীলন পেশা হিসেবে খুব অর্থকরী ছিল না। উপরন্তু তিনি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, তায় অন্ধ। এই সব এবং আনুসঙ্গিক নানা কারণে সামাজিক প্রতিপত্তি না থাকায় বাস্তব জীবনের অনেক সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আর্থিক সাফল্যের তোরণ পার হবার পথে বাধা তাঁর বিস্তর। তাই জীবনের শেষ ক'বছর চরম দুর্গতি ভোগ করে গেছেন। কিন্তু তাঁর যেমন কণ্ঠসম্পদ ছিল, হালকা ধরনের গান অন্তত যদি উপার্জনের জন্যে গাইতেন, তা হ'লে তাঁর কষ্টের অনেক লাঘব হ'ত, সুখের মুখ দেখতে পেতেন। তিনি নিজেও বুঝতেন এ কথা।

কিন্তু জনপ্রিয় গায়ক হয়ে অর্থোপার্জন করা তাঁর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। যে রীতির সঙ্গীতকে শ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু বলে গ্রহণ করেছিলেন অন্তরের শিল্প-প্রেরণায়, সে বিষয়ে কোনরকম দ্বিধাবাদ ছিল তাঁর কল্পনার অতীত। এ সম্পর্কে কথা উঠলে তিনি বলতেন —'আমি মরে যাব সেও ভাল, কিন্তু সস্তা গান গেয়ে নিজেকে কিছুতেই ছেলো করব না।'

হায়, শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছিল। লঘু সঙ্গীত পরিবেশন করে রোজগারের ধান্দায় নিজের সাঙ্গীতিক মান নমিত করেন নি বটে, কিন্তু চূড়ান্ত কষ্টের মধ্যে এমন কি অর্ধাশনেও তাঁর অনেক দিন কেটে যায় শেষ বয়সে। এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রায় ভিখারির মতন সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়।

অথচ তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত গুণী। খেয়াল ও টপ্পা গানে রীতিমত ওস্তাদ ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ করে খেয়ালে উচ্চাঙ্গের শিল্পী। টপ্পা গুণীরূপে তাঁর পরিচয় বাইরে বেশি প্রকাশ পায় নি, কারণ প্রকাশ্য আসরে টপ্পা তিনি গাইতেন না। টপ্পা শোনাতেন ঘরোয়া আসরে কিংবা ছাত্রদের সঙ্গীত শিক্ষা দেবার সময়। ছাত্রদের টপ্পা শেখাতেন বিচক্ষণ ভাবে এবং টপ্পার সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও ছিল খুব প্রখর। টপ্পা শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে এই মত প্রকাশ করতেন যে,—টপ্পার দখল না হলে খেয়ালের ভিৎ কখনও পাকা হয় না। টপ্পাকে ভিত্তি কর, দেখবে খেয়াল কেমন তৈরি হবে।

তাঁর গায়ন-পদ্ধতি কঠিন সাধনাসাপেক্ষ ছিল সেজন্যে অনেকে তা দুরূহ বলে শিক্ষা করতে পারতেন না। কিন্তু আসরে শিল্পীরূপে তিনি যথার্থ গীত-রসিকদের পরিতৃপ্ত করতেন রীতিসম্মত পরিবেশনে।

একদিকে যেমন তিনি সত্যকার সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন, খেয়াল ও টপ্পা গানে রসসৃষ্টি করতে পারতেন, অন্যদিকে তেমনি তাল ও লয়ে ছিলেন অসামান্য নিপুণ এবং অভ্রান্ত। বিলম্বিত লয়েই তিনি মুন্সিয়ানা দেখাতেন বেশী। সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গীতের ভাণ্ডার অসাধারণ সমৃদ্ধ ছিল। বিপুল সঞ্চয় ছিল তাঁর, বিশেষ অপ্রচলিত রাগের, সুপরিচিত রাগগুলির তা বটেই। সেই সব অচলিত রাগের গান তিনি অতি সাবলীলভাবে গেয়ে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিতেন।

তাঁর এই একটি মনোহারী বৈশিষ্ট্য দেখা যেত যে, যে তালের যে ছন্দ গানের মধ্যে এবং তানের মধ্যেও তার রূপ ফোটাতেন সুসঙ্গতভাবে।

ষাড়ব ও ঔড়ব জাতীয় রাগের ওপর তাঁর ঝোঁক দেখা যেত অনেক সময়। অর্থাৎ বিবাদী বা বর্জিত স্বর যে সব রাগে আছে তা তিনি পছন্দ করতেন এবং বেশি গাইতেন। সে সব গানেও প্রকাশ 'পেত তাঁর শিক্ষিত পটুত্ব ও তপস্যা।

তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি ও আসরের কথা আরও কিছু জানাবার আছে, এ প্রবন্ধের শেষদিকে সে সব উল্লেখ করা হবে। তার আগে তাঁর রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষার কথা জানান দরকার। শিক্ষার সুযোগ তিনি কিভাবে পেলেন, ঘটনাচক্রে এবং তাঁর প্রতিভার কেমন করে সেকালের এক শ্রেষ্ঠ গুণীর কাছে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল, সে সব প্রসঙ্গ কৌতূহল-উদ্দীপক।

সাতকড়ি মালাকর মহাশয়ের বংশে তাঁর আগে সঙ্গীতচর্চা কখনও দেখা যায় নি। তাঁদের জীবনের বৃত্তি বা জীবিকা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সঙ্গীতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তাঁদের ছিল না। তাঁর মধ্যেই দৈবাৎ প্রকাশ পায় সঙ্গীত-প্রতিভা, তার জন্যে কোন পরিবেশ বা পটভূমি সেখানে রচিত হয় নি।

তাঁদের আদিনিবাস ছিল বর্ধমান জেলার তেন্দে নামক এক অখ্যাত গ্রামে। কিন্তু সেখানে তাঁদের পরিবারে অন্ন সংস্থান হয় নি। তাঁর বাপ, কাকা সেখান থেকে কলকাতায় চলে আসেন জীবিকার সন্ধানে। মালাকর পদবীতেই যা প্রকাশ পায়, তাঁদের পারিবারিক বৃত্তি ছিল সোলার কাজ, ফুলের কাজ, মালা গাঁথা ইত্যাদি এবং সেই সব বিক্রয় করে সংসার নির্বাহ।

আগেই বলা হয়েছে, তাঁরা দরিদ্র ছিলেন। ওই সব কাজ করে তাঁদের কোনক্রমে দিন চলত, স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। বর্ধমান থেকে তাঁরা এসে থাকতেন উত্তর কলকাতার মসজিদবাড়ী স্ট্রীটের একাংশে। সেকালে জায়গাটির নাম ছিল কাটমার বাগান। সেখানেও ওই সোলা ও ফুলের কাজ করে তাঁদের দিন চলত।

দরিদ্র বৃত্তিজীবীর ঘর। উপরন্ত সাতকড়ির শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ তাঁর বিশেষ হয় নি। ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে কাকার সঙ্গে নিতে হয়েছিল বংশের ওই পেশা। দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর আরও দুর্ভাগ্য যুক্ত হয়েছিল। জন্মান্ধ ছিলেন না, বালক বয়সে ভীষণ বসন্ত রোগে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন চিরদিনের জন্যে। বসন্তের সেই আক্রমণের চিহ্নগুলি তাঁর মুখময় পরিণত বয়সেও দেখা যেত।

মালাকার পরিবারের সেই অন্ধ ছেলেটির গান গাইবার ক্ষমতা কেমন করে প্রকাশ পায় কেউ জানে না। কিন্তু তাকে গান গাইতে শোনা যেত। যে কোন গান শুনে তা সে গাইতে পারত নির্ভুলভাবে। আর গলাটিও ছিল ভাল। তার ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করবার সময় পাড়ার লোকে তার গান শুনত। অন্য কেউ এ পাড়ায় এলেও শুনতে পেত বালকের মিষ্টি গলায় বাংলা গান।

ছেলেটির পাশের বাড়ীতে থাকতেন বীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক। বীরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসতেন তাঁর এক আত্মীয়, তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়। তুলসীবাবু রীতিমত সঙ্গীতজ্ঞ—বেহালাবাদক এবং গায়কও। সঙ্গীত জগতে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর কথা এ প্রসঙ্গে জানান দরকার।

তুলসীদাস ছিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত সঙ্গীত-গুণী পরিবারের সন্তান। কলকাতার আদি ধ্রুপদী এবং মনামধন্য যদুভট্টের সঙ্গীতগুরু গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র তিনি। যে সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে—অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষদিকে, ১৮৯০ কিংবা তার কাছাকাছি সময়—গঙ্গানারায়ণ তার অনেক আগেই পরলোক গমন করেছেন। পিতামহের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ পান নি তুলসীদাস। তিনি শিখেছিলেন প্রমদ, মনোহর ঘরাণার খ্যাতিমান গায়ক কেশবলাল মিশ্রের কাছে। কেশবলাল হলেন প্রসিদ্ধ খেয়াল ও টপ্পা গায়ক রামকুমার মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র এবং লক্ষ্মীপ্রসাদের দ্বিতীয় অগ্রজ। এই মিশ্র পরিবারের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের বংশের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ও পরিচয় গঙ্গানারায়ণের সময় থেকেই। মনোহর ও প্রমদ (বা হরিপ্রসাদ মিশ্র) ভ্রাতাদের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তারপর মনোহর মিশ্রের পুত্র রামকুমার মিশ্রও দীর্ঘকাল কলকাতায় অবস্থান করবার সময়ে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বলরাম দে স্ট্রীট ভবনে বাস করেন অনেক দিন। তারপর রামকুমারের দ্বিতীয় পুত্র কেশবলাল মিশ্রের কাছে তুলসী-দাস সঙ্গীত শিক্ষা করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর বিখ্যাত স্বরলিপি পুস্তক 'সরল স্বরলিপি শিক্ষা'র প্রথম ভাগটি উৎসর্গও করেন তাঁর সঙ্গীতগুরু কেশবলাল মিশ্রের উদ্দেশে।

বেহালাবাদক এবং গায়ক তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত-জগতে একটি অবদান রেখে যান, যা উল্লেখ-যোগ্য। তা হ'ল তাঁর 'সরল স্বরলিপি শিক্ষা' নামক চার খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকাবলী। এই সমস্ত গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং অন্যান্য রচয়িতাদের সেকালে প্রচলিত বহু বাংলা ও হিন্দী গানের স্বরলিপিই শুধু প্রকাশ করেন নি; বিভিন্ন জাতির অনেক গৎও স্বরলিপির সঙ্গে দিয়েছেন। তা ছাড়া স্বরলিপি শিক্ষা সম্পর্কে নানা নির্দেশও আছে গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে। এই স্বরলিপি পুস্তকগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে যে রীতিমত সমাদর লাভ করে তা বহু সংস্করণেই প্রকাশ—প্রথম ভাগের দশম সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম সংস্করণ, তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংস্করণ ও চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেকার আমলে সঙ্গীত পুস্তকের (শুধু

সঙ্গীত কেন যে কোন বিষয়েরই বাংলা বইয়ের) এত প্রচার দুর্লভ ব্যাপার ছিল, সন্দেহ নেই।

সে যা হোক, তুলসীদাস বাবু তাঁর আত্মীয়ের বাড়ীতে মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে যাতায়াত সূত্রে বালক সাতকড়ি মালাকরের গান শুনতেন। শুনে বুঝতে পারলেন যে, ছেলেটি সুকণ্ঠ। তারপর একদিন গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন, সামনে বসে তার গান শুনলেন। শেষে জিজ্ঞেস করলেন যে, আরও গান শিখতে ইচ্ছে আছে কি না।

ছেলেটির সম্মতি জেনে তিনি তিন-চারটি গান শেখালেন। সে সব গানের ভাষা বাংলা হলেও রাগ সঙ্গীত পর্যায়ের বলা যায়। প্রথমে শেখান সোহিনীর একটি সেকালে প্রচলিত গান। (গানটি তাঁর সরল স্বরলিপি শিক্ষা'র চতুর্থ ভাগে পাওয়া যায়)—

তোমারে ভালবেসে অবশেষে কাঁদিতে হ'ল

নিরাশায় হৃদি ঘেরিল ;

কেন জীবন বিফল হ'ল ।

ভেবেছিনু দিয়ে প্রাণ,

পাব প্রেম প্রতিদান ;

সে আশায় নিরাশ হয়ে

কেন জীবন রহিল ।

এই গান ক'খানি শেখাতে গিয়ে তুলসীদাস বাবু লক্ষ্য করলেন—বালকের কণ্ঠ রাগসঙ্গীত শিক্ষার পক্ষে যেমন উপযুক্ত তেমনি তার গ্রহণ করার শক্তি ও সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ। তিনি তখন তার পদ্ধতিগতভাবে শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। এ এক অভাবনীয় সুযোগ সেই অবস্থায় একটি ছেলের পক্ষে। তার বয়স তখন বছর পনের হবে।

কারণ, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তার রীতিমত শেখবার বন্দোবস্ত করে দিলেন তখনকার এমন একজন নেতৃস্থানীয় আচার্যের কাছে, যেখানে উপস্থিত হওয়া তখন সাতকড়ি মালাকরের পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভা-গায়ক একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পাগুণী গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে তুলসীবাবু তাকে নিয়ে গেলেন উক্ত বীরেন্দ্রবাবুর সহযোগিতায়। চক্রবর্তী মহাশয় তাঁদের অনুরোধে ছেলেটিকে তৈরি ক'রে দেবার দায়িত্ব নিলেন। শুধু তাই নয়, তাকে তিনি আশ্রয় দিলেন, নিজের কাছে রেখে রীতিমত শিক্ষা দেবার জন্যে। এমন গুরু তখনও এদেশে দেখা যেত।

অতি কষ্টসাধ্য ছিল গোপালচন্দ্রের শিক্ষাদানের পদ্ধতি। শুধু রাগে নয়, সেই সঙ্গে তাল ও লয়ে তিনি শিষ্যদের দুরস্ত করে দিতেন যে রীতিতে, তেমনিভাবেই এই প্রতিশ্রুতিবান তরুণকে শেখাতে লাগলেন। শিক্ষার্থীও তা' আয়ত্ত করতে লাগল দৃষ্টিহীনের একাগ্র সাধনায়।

এমনিভাবে ৬ বছর ধরে অনন্তকর্মা সাতকড়ি মালাকর গুরুর কাছে শিক্ষা করলেন। তিনি শিখলেন প্রধানত খেয়াল, সেই সঙ্গে টপ্পা অল্পও কিছু।

তারপর চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

আচার্যের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই শোভাবাজারের মণীন্দ্রকৃষ্ণ দেব মহাশয়ের আনুকূল্য ভাগ্যক্রমে লাভ করলেন সাতকড়িবাবু। বিখ্যাত দেব পরিবারের মণীন্দ্রকৃষ্ণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং নানা সঙ্গীতজ্ঞের পৃষ্ঠপোষকতা করে তিনি তাঁদের সঙ্গীতচর্চার পথ সুগম করে দেন। সঙ্গীতের জন্যে মণীন্দ্রকৃষ্ণ বহু অর্থব্যয় করেছেন সেকালের মেজাজে।

চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যুর পর সাতকড়িবাবুর সেই সঙ্কটাপন্ন সময়ে মণীন্দ্রকৃষ্ণ দেব মহাশয় মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি দিয়ে তাঁর বিশেষ সহায়তা করেন। শুধু তাই নয়। শোনা যায়, তাঁর সঙ্গীতচর্চার পক্ষে আরও এক মহা উপকার করেন মণীন্দ্রকৃষ্ণ। তিনিই না কি শ্রীমালাকরের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা যাদুমণির কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ করে দেন। নচেৎ যাদুমণির কাছে শিক্ষা করবার জন্যে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হ'ত না তাঁর পক্ষে। কারণ যাদুমণির তখন বর্ণাঢ্য নটীজীবনের মধ্য পর্ব। সঙ্গীত শিক্ষা করা দূরের কথা, তাঁর সামনে পৌঁছানও নিতান্ত ধনী ভিন্ন অসম্ভব ছিল।

এই দুর্লভ সুযোগ পেয়ে সাতকড়িবাবু বেশ কয়েক বছর শিখলেন যাদুমণির কাছে। যাদুমণির শিক্ষায় তিনি প্রধানত টপ্পায় বিপুল সঞ্চয় লাভ করেছিলেন।

যাদুমণির কাছে শেখবার শেষদিকে কিংবা তার অব্যবহিত পরে আর একজন আচার্যস্থানীয় গুণীর কাছেও শিখেছিলেন তিনি। তাঁর এই তৃতীয় গুরুর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী, সেকালের বাংলার একজন বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা। তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় 'সঙ্গীতের আসরে' পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। এখানে পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর নানা রীতিসমৃদ্ধ সঙ্গীত ভাণ্ডার থেকে সাতকড়িবাবু যে লাভবান হন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছেও তিনি কিছু পেয়েছিলেন, শোনা যায়। একদিন একটি সকাল-বেলার আসরে মালাকর মহাশয় একটি খট্ টোড়ির খেয়াল শুনিয়েছিলেন। গান শেষ হ'তে তিনি বলেন, 'এই খট্ টোড়ি গোঁসাইজীর কাছে নেওয়া।'

এই হ'ল সাতকড়িবাবুর শিক্ষা তথা সাধনাপর্বের রূপরেখা। সর্বসমেত ১৫-১৬ বছরের কম হবে না। সুতরাং বোঝা যায় যে, তাঁর সঙ্গীত-জীবন কত দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যাঁদের কাছে তিনি শিখেছিলেন তাঁদের সকলের প্রতি তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন উত্তর জীবনে, তাঁদের প্রসঙ্গে কথা হ'লে। কিন্তু বেশি ক'রে বলতেন গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী আর বামাচরণের সম্পর্কে। বলতে গেলে তাঁর সঙ্গীতজীবন এঁদের দু'জনের শিক্ষাতেই গঠিত হয়েছিল। সে জন্যেও হয়ত এঁদের কথা বেশি বলতে পারেন। বিশেষ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা। তাঁকে সাতকড়িবাবু মান্য করতেন সবচেয়ে বেশি। তাঁর নাম না করে 'কর্তা' বলে তাঁকে উল্লেখ করতেন। বলতেন, 'কর্তাকে এই ডান হাত দিয়েছি। এ হাত আর কাউকে দিতে পারব না।' অর্থাৎ সবচেয়ে বড় গুরু জ্ঞান করতেন চক্রবর্তী মহাশয়কেই। আর কাউকে তাঁর আসনে বসাতে পারবেন না!

সেই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুরুর কৃতি ও রীতি-নীতি গভীর প্রভাব ফেলেছিল তাঁর সঙ্গীতজীবনে, তাঁর গান গাইবার ধরনের উপর। পরিণত বয়সেও গুরুর সঙ্গীত-ধারাকে অনেকাংশে অনুসরণ করতেন। সেই সব ছন্দের কাজ, তানের বৈচিত্র্য আর সুরবিহার। আর সে সব মনোমুগ্ধকর ছোট ছোট তান। আট মাত্রা, বারো মাত্রার টুকরো তান। সম্ থেকে ফাঁক কিংবা সম্ থেকে প্রথম তাল পর্যন্ত তাদের গতি। চমৎকার সৌন্দর্য সৃষ্টি হ'ত সেই সব টুকরো তানে। খুবই artistic—টুকরো তানের রূপ যেমন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে, তেমনি বামাচরণের কাছেও পেয়েছিলেন, বলতেন।

সাতকড়িবাবু বিলম্বিত লয়ে খেয়াল বেশি গাইতেন আর তাইতেই তাঁর মুন্সিয়ানা আর ছন্দের বাহার দেখা যেত বেশি—একথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্য লয়েও গাইতেন, তবে দ্রুত লয়ে বিশেষ নয়। আড়া ঠেকা আর তেওটেই বেশি গাইতেন তালের মধ্যে।

ছন্দের কাজ তিনি বেশি করতেন, গমকের তানও দিতেন খুব। সুরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে গানের ভাষার অন্তর্গত ভাবকে ফোটাতেন। টপ্পা গাইবার সময় রাগগুলির মধ্যেই মাত্রার হিসেব থাকত আন্দাজী।

তাঁর গানের আর এক বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, স্থায়ীতেই বেশি কাজ দেখাতেন। সুরের বিচিত্র বিবরণে এই অংশেই রাগের রূপ প্রদর্শন করতেন বেশি করে। অন্তরায় দু'এক বার মাত্র যেতেন। টুকরোর বাহারে পুনরাবৃত্তি ঘটত না কখনও। এক-একটি রকম একবারই ব্যবহার করতেন। কত রকমের ছটায় চমক সৃষ্টি হ'ত তাঁর গানে। গানের চাল বা style ছিল অতি আকর্ষক। যেমন তানে তেমনি সুরেও তিনি বৈচিত্র্য ভালবাসতেন। যেমন অপ্রচলিত তেমনি অত অনেক রাগও গাইতেন আসরে। তবু তারই মধ্যে খেয়াল অঙ্গে বোধ হয় তাঁর বেশি প্রিয় ছিল ললিত, ভৈরব, দরবারি কানাড়া, বসন্ত, পূরিয়া, সোহিনী।

রাগের রূপ বিষয়ে তাঁর চিন্তা ছিল, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। রাগের গঠন সম্বন্ধে ছাত্রদের লক্ষ্য করতে শেখাতেন, বলতেন, 'কোন্ কোন্ রাগ মিশে কোন্ রাগ হয়েছে বুঝতে চেষ্টা ক'রো।'

ছাত্রদের তিনি স্বাভাবিক গলায়, অর্থাৎ আওয়াজ বেশি না চড়িয়ে, রেওয়াজ করতে ও গাইতে বলতেন। চড়া স্কেলে গাইলে অনেকের গলার স্বাভাবিক মাধুর্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এই ছিল তাঁর মত। সেজন্যে তিনি শিক্ষার্থীদের বি-ফ্ল্যাটে স্বাভাবিক গলায় শেখবার নির্দেশ দিতেন।

তাল লয়ে নিজে যেমন অটুট ছিলেন, ছাত্রদেরও তেমনি হুঁশিয়ার করে দিতেন। গান গাইবার সময়ে তালে সজাগ থাকবার উপায় শেখাতেন ছাত্রদের। সুরের সঙ্গে তাল লয়েরও সাধনা। বাঁ হাতে তবলার ঠেকা, ডান হাতে তানপুরা।

দু'একজন তবলচি সম্পর্কে তাঁর নিজের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তবলাবাদক গায়ককে ছাপিয়ে উঠে গানের, সুরের সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয় অনেক সময়। সেজন্যে তিনি ছাত্রদের সতর্ক করে দিতেন, 'তবলচিকে কখনও মাথায় চড়তে দেবে না।'

ছাত্র তাঁর কয়েকজন ছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তাঁরই শিক্ষায় গঠিত শিষ্য বিশেষ কেউ হন নি। সুপরিচিত গায়ক তারাপদ চক্রবর্তী প্রথম জীবনে তাঁর কাছে কিছুকাল শিখেছিলেন। বিখ্যাত টপ্পাগায়ক বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়ও মালাকর মহাশয়ের শিক্ষা বেশ কিছুদিন লাভ করেন, যদিও আগে-পরে অন্য ওস্তাদের কাছেও শেখেন তিনি। তা ছাড়া, বিভূতিভূষণ সেন,

জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি আরও ক'জন ছাত্র তাঁর ছিলেন।

সাতকড়িবাবুর কণ্ঠ ছিল ভরাট, মিষ্ট। বাজখাঁই নয়। খোলা অর্থাৎ স্বাভাবিক গলার মাধুর্যে তিনি গাইতেন। গমকের সময় গলা ভরাট হ'ত তাঁর। আর দানাগুলি দেখাবার সময় গলাকে মিহি করে নিয়ন্ত্রণ করতেন, দরকার মতন।

বড় আসরের মধ্যে তিনি গেয়েছিলেন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ স্থাপিত ও পরিচালিত 'নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন'-এ। এ্যালফ্রেড থিয়েটারে সেবার ওই সম্মেলনের এক আসরে তিনি রাজশ্রী গেয়ে শুনিয়েছিলেন। শুধু বাংলা দেশের নয়, কয়েকজন সর্বভারতীয় অবাঙালী গুণীও উপস্থিত ছিলেন তাঁর গানের সময়। এবং তাঁরা সকলেই তাঁর খেয়াল শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, কি বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য বলা যায় না, তিনি তাঁর উপযুক্ত সম্মান ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন নি। তাঁর চেয়ে অনেক অল্প পুঁজির লোককে বাংলার বড় বড় আসরে গেয়ে, দাপটের সঙ্গে মর্যাদা ও মোটা দক্ষিণা আদায় করে নিতে দেখা গেছে। 'খাঁ সাহেব' এই নামের মহিমাতেও কার্যোদ্ধার হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। কিন্তু এই দৃষ্টিশক্তিহীন, সম্পদহীন বাঙালী গুণী বেশির ভাগই ঘরোয়া কিংবা ছোটখাটো আসরে বিনা পারিশ্রমিকে সুর সৃষ্টি করে গেছেন।...

কি হৃদয়স্পর্শীভাবে গাইতেন তিনি সদারঙ্গের সেই ভৈরব রাগের খেয়ালটি—

তোর সব জাগি মতওয়া মোরি।
বালম্ আওয়ো, মোর সঁইয়া সদারঙ্গ রঙ্গিলে।
তোম্ বিনা তরস গয়িরি দরশন দেখ বাতাউঁ।
মেহো গলইয়া সদারঙ্গ রঙ্গিলে॥

নিতান্ত ঘরোয়া আসর হলে কিংবা কোন ছাত্রের বাড়ী তিনি কখনও কখনও টপ্পা গাইতেন। অতি চিত্তাকর্ষক হ'ত তাঁর সুরেলা কণ্ঠে টপ্পা গান, কি হিন্দুস্থানী, কি বাংলা। শোরি মিঞা, হাম্‌দুন প্রভৃতি টপ্পা-গায়কদের ঘরাণা টপ্পার সঞ্চয় তাঁর ছিল, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী এবং রামধনির প্রসাদে। মেজাজ হ'লে তবেই টপ্পা তিনি গাইতেন।

শোরি মিঞার সেই ভৈরবীর টপ্পাটি যখন ধরতেন—

নি মত্‌না যো করদা।
নাজক নাজ মিঞা জন্ জন্ রে॥
দুরক পেঁচু জরিয়া শোরি-দু
আছু বন্দে না জমক রে॥

সে গান এমন মিষ্টি শোনাত যেন মনে হ'ত ঠুংরি গাইছেন। কিন্তু ঠুংরি নয়, রীতিমত টপ্পা।

ভৈরবীরই আর একটি চমৎকার টপ্পা তিনি এক-একদিন গাইতেন, তার প্রথম লাইনটি হ'ল—

মানি সে বসন্ত্ ইয়ার রে।...

হাম্‌দুন রচিত একটি ঝিঁঝিট খাম্বাজের টপ্পাও তাঁর গলায় শোনবার মতন একটি বস্তু ছিল—

দিল লাগা রেঁাদ ইয়ার ছুবে বিনা করল।
ইস্‌ক বি চৈন আপনা হেরা কেরা॥
সঁাদ কে কিচি জিন্দা ছাড়বে হাম্‌দুন।
ইথে ছুয়ানি চল্ কেরা॥

আর একখানি টপ্পা গাইতেন গারা সিন্ধুতে, তার রচয়িতার নাম জানা যায় না—

রে হমলা সজিকা
হাঁ জবহে তাঁহে মাছুঁ।
তাঁহে নয়হু রে॥
যেখন কারণ দুরতে মহবুব
দিয়া অজ বহুত মলরা॥

আর একটি ঝুম্ ঝিঁঝিটের টপ্পা গাইতেন, তারও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নি। গানখানির আরম্ভ এই রকম—

মিল্ যা যান রে।
জিন্দা ছুড়া হঁহো
ভসা জড়না সবে॥

হিন্দুস্থানী টপ্পার পরিপূর্ণ অঙ্গে মুড়কি জমজমার কারুকার্যখচিত নিপুণ অলঙ্কারে তিনি এই সব গানে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতেন, তা শুধু ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এক একদিন বাংলা টপ্পাও গাইতেন। বিশেষ নিধুবাবুর টপ্পা। ঝিঁঝিট খাম্বাজে নিধুবাবুর এই টপ্পাটি অপরূপ গাইতেন, জমজমাগুলি যেন ফুলঝুরির ফুটন্ত ফুলকির ধারায় ঝরে পড়ত—

বার বার চায় ফিরে সজল নয়নে।
কিরা গো কিরা গো তারে প্রবোধ বচনে॥
হেরে তারে ম্রিয়মান হয়ে গেল অভিমান,
অস্থির হতেছে প্রাণ প্রতি পদ সঞ্চালনে॥

যেমন ওস্তাদ তেমনি যথার্থ শিল্পী ছিলেন তিনি। তাই কারুশৈলীর চাপে গানের ভাব-মাধুর্য কখনও তাঁর নষ্ট হ'ত না, বরং তা বহুমূল্য অলঙ্কার হয়ে তার শোভা বর্ধন করত। সঙ্গীতরস সত্যই মূর্ত হ'ত তাঁর কণ্ঠে।

ঘরোয়াভাবে অন্ত রীতির গানও গাইতেন। গানই ছিল তাঁর জীবনে একমাত্র অবলম্বন, প্রাণের আরাম। তাই অন্তরের প্রেরণায় নানারকমের গান এক একদিন গাইতেন গানের ভাবের আকর্ষণে। সে সব সময় মনে হ'ত গানের সাঙ্গীতিক প্রক্রিয়ার জন্তে নয়, তার অন্তর্নিহিত ভাবের আবেদনই উদ্বুদ্ধ করছে তাঁকে। যেমন একদিন তাঁর এক ছাত্রের (বিভূতিভূষণ সেন) বাড়ী একলা বসে গাইছিলেন। সে ঘরে তখন অন্ত কেউ ছিল না। কাউকে শোনাবার জন্তে নয়, সে তাঁর নিজেরই প্রাণের গান, তবু এমন শ্রুতিমধুর হচ্ছিল যে বড় আসরে তা সবাইকে শোনাবার মতন—

এ জগমে সব্ হি তামা,

ম্যায় বুরা বহুৎ বুরা হুঁ।...

(শেষ মোগল বাদ্শা বাহাদুরশাহ রচিত?) এই গানখানি তিনি গজলের ঢঙে গাইতে লাগলেন। অন্ধ গায়কের বিফল জীবনের মর্মন্তুদ অভিমান যেন গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে লাগল গানের ভাষায় আর সুরের প্রতিটি মোচড়ে।

এই শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি তাঁর বাস্তব জীবনের দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করে এনেছিলেন। এই সময় পর্যন্ত কলকাতায় এখানে-সেখানে তাঁকে দেখা যেত, ছেলের হাত ধরে খালি পায়ে আস্তে আস্তে পথ চলতে। অতি মলিন বেশবাস, পায়ে জুতো পর্যন্ত রাখবার সঙ্গতি নেই, ক্লিষ্ট মুখ।

তাঁর শেষ জীবনের সেইসব দিনের কথা মনে করে তাঁর এক অনুরাগী শ্রোতা (ইনি তাঁকে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করতেন) দুঃখ করে এমন কথা বলেন, 'সাতকড়ি বাবুর কথা ভাবলে মনে হয় এ দেশে যেন কেউ গান না শেখে।'

ভাগ্যের শত বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা তিনি সারা জীবনই সহ্য করেছেন, ভুলে থেকেছেন সঙ্গীতের সাধনার মধ্যে। কিন্তু এক এক সময় বোধ হয় সহ্যের সমস্ত সীমা হারিয়ে যেত, তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠতেন। যেমন একদিন সেই অবস্থায় তাঁর আর এক ছাত্রের এণ্টালির বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে অধীর কণ্ঠে বলেন, 'ওরে, তোরা থাকতে আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব?'

শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। শিল্পীর মর্যাদা দূরের কথা, সাধারণ একটি মানুষের মতনও তাঁকে বাঁচান যায় নি। দৈব মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। তাই চরম পর্যায়ে তাঁকে অবশেষে আশ্রয় নিতে হয়েছিল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়ে।

সেখানেই একদিন দৃষ্টিহীনের সুরজগৎ চিরকালের জন্তে স্তব্ধ হয়ে যায়।

(৭) বিস্মৃত ধ্রুপদগুণী

বালিতে গঙ্গার ধারে তার ওকারমল জেটিয়ার সেই সুদৃশ্য বাগান-বাড়ীতে জল্সা বসেছে। দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর গঙ্গার ঠিক বিপরীত দিকে বিরাট বাগান-বাড়ী তার ওকারমলের। বিখ্যাত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এ্যাণ্ড্ ইউলের তিনি পাটনার হয়েছিলেন। সেই ইউল্ সাহেবকে খাতির ক'রে বালির ওই গঙ্গাতীরের বাগান-বাড়ীর নাম রাখেন ইউল্ ব্যাঙ্ক।

দোলের উৎসব উপলক্ষ্যে স্যার ওকারমল পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই ইউল্ ব্যাঙ্কে সেদিন বিরাট জলসার আয়োজন করেছেন। খুব ধুমধাম। শুধু মস্ত বড় গানের আসর নয়, হোলির বিপুল আনন্দ সম্মেলন। সকাল থেকেই উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। গান-বাজনাও চলেছে তখন থেকে।

অনেক খরচ করে নামকরা কয়েকজন গুণীকে আসরে আনা হয়েছে। একের পর এক তাঁদের সঙ্গীতানুষ্ঠান চলেছে। শ্রোতাদের মধ্যে আছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। স্যার ওকারমলের ব্যবসায় জগতের নিমন্ত্রিত মাড়োয়ারি, সাহেব-সুবো থেকে আরম্ভ করে নানা জাতির অতিথিবর্গ। বাঙালীও কিছু আছেন। কিন্তু সঙ্গীতের রসজ্ঞ ও বোদ্ধা শ্রোতার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বেশির ভাগই ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক, তার মধ্যে কিছু আবার বিদেশী।

তবে প্রকাণ্ড আসর। কারণ বহু জনসমাগম হয়েছে এবং সঙ্গীত-শিল্পীও আছে কয়েকজন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই টোপ্পা, ঠুংরি ও গজল গানের শিল্পী। এই ধরনের শ্রোতাদের মুখ চেয়েই বোধ হয় ভারি চালের গানের আয়োজন করা হয় নি। কোন ধ্রুপদী কিংবা খেয়াল গায়ক আমন্ত্রিত হয়ে আসেন নি সে আসরে। যদিও সেকালে এ ধরনের আসরেও ধ্রুপদ গান বিলক্ষণ হ'ত। সাধারণ সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতারাও ধ্রুপদের রস আস্বাদন করতেন বহু আসরে। সেই পঞ্চাশ বছর আগেও ধ্রুপদের গৌরবের যুগ শেষ হয় নি। কোন আসরে ধ্রুপদ অনুষ্ঠান না হ'লেই বরং ব্যতিক্রম মনে হ'ত। অন্তত বেশির ভাগ আসরেই ধ্রুপদ পরিবেশন করার রেওয়াজ ছিল অন্ত রীতির গানের

আগে। এই আসরে যে ধ্রুপদের ব্যবস্থা করা হয় নি তেমন সেযুগে বড় একটা দেখা যেত না, শ্রোতারা যেমনই হউক। এ জন্যেই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করতে হ'ল।

যা হোক, সে আসরে সকাল থেকে গান-বাজনা হচ্ছে, তখন প্রায় বিকাল গড়িয়েছে। সমস্তই হোরি, ঠুংরি, গজল ইত্যাদি গান। আসরে উপস্থিত ছিলেন পাখোয়াজ-বাদক সন্ন্যাসীচরণ রায়। তিনি তখন তরুণ হলেও ভাল পাখোয়াজ বাজাতেন। সন্ন্যাসীবাবু নামে সুপরিচিত ধ্রুপদ-পাখোয়াজী সতীশচন্দ্র দত্তর তিনি পাখোয়াজে শ্রেষ্ঠ শিষ্য।

সন্ন্যাসীবাবু এতক্ষণ আসরে থেকেও বাজাবার সুযোগ পান নি বলেই হোক কিংবা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধ্রুপদ গানের পরিচয় দেবার জন্যেই হোক, উঠে এসে গৃহকর্তাকে বললেন,—অনেক হোলি ঠুংরি হয়েছে। এবার একটু অন্য রকম গান হলে হয় না?

গৃহকর্তা জানতে চাইলেন, কি রকম গান? তারপর সম্মত হয়ে সন্ন্যাসীবাবুর উপরই ভার দিলেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্যে।

সন্ন্যাসীবাবু কলকাতা থেকে এক ধ্রুপদ-গায়ককে নিয়ে এলেন। তিনি খেয়ালও গাইতেন, কিন্তু প্রধানত ধ্রুপদী রূপেই তাঁর পরিচয় ছিল তখনকার সঙ্গীত-সমাজে। নাম আশুতোষ রায়। পরবর্তীকালের সঙ্গীত-জগতে সে নাম বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হয়ে যায়। কিন্তু সে কালের আসরের শ্রোতারা বিমুগ্ধ ছিলেন তাঁর অসামান্য কণ্ঠ-মাধুর্য ও গায়কীর জন্যে।

সে আসরে তিনি যখন এসে বসলেন তাঁর দিকে বিশেষ কারুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল না। দর্শনে আকর্ষণ করবার মতন কিছু ছিল না তাঁর মধ্যে। বেশভূষায় দারিদ্র্য প্রকট। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে হলেও অপুষ্ট শীর্ণ শরীর। অতি সাধারণ বাঙালী কাঠামো।

আসরে তখন গান গাইছিলেন মেটিয়াবুরুজের বিখ্যাত গায়ক পিয়ারা সাহেব। ঠুংরি গজল ইত্যাদি গানের জন্যে সে যুগে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র বংশের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল, শোনা যায়। পিয়ারা সাহেবের কয়েকটি গান গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি অবাঙালী হয়েও বাংলা গান মাঝে মাঝে শোনাতেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথের গান পর্যন্ত।

একবার ষ্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত একটি বড় জলসায় পিয়ারা সাহেব রবীন্দ্রনাথের 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' গানখানি গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরাণীর দেওয়া যে সুরে গানটি শোনা যায়, সে সুরে গান নি পিয়ারা সাহেব। তিনি ঠুংরি করে গেয়েছিলেন। সেযুগে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের বহির্ভূত গায়কদের পক্ষে নির্দিষ্ট সুরের খুব কড়াকড়ি ছিল না, দেখা যায়। অন্তত একাধিক গায়ক-গায়িকা রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গান রবীন্দ্র-নির্দেশিত সুরের এদিক-ওদিক করে গেয়েছেন, কিন্তু কোন দিক থেকে তার প্রতিবাদ হয় নি একথা সুবিদিত। অধিক দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক, শুধু সুপ্রসিদ্ধা গহর জানের গাওয়া 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না। পথের শুকনো ধূলি যত' গানটির উল্লেখ করি। গায়িকা এই সুপরিচিত গানখানিতে সুরের শুধু হের-ফের করতেন না, এমন লাইনের শেষাংশের ভাষা পর্যন্ত বদলে ফেলতেন গাইবার সময়। কাজটি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু এ সবের কোন প্রতিবাদ তখন করা হ'ত না, এ এক আশ্চর্য এবং লক্ষ্যণীয় ব্যাপার।

এখন সেকথা থাক। পিয়ারা সাহেবের গানের কথা যে হচ্ছিল সে প্রসঙ্গে একটি সংবাদ জানাবার আছে। তাঁর রেকর্ড থেকেও জানা যায় এবং তিনি সব আসরেই গাইতেন মিহি গলায়। ঈষৎ তীক্ষ্ণ হলেও 'নারীকণ্ঠে' পিয়ারা সাহেব বরাবর গেয়ে গেছেন। সেজন্যে অনেকের ধারণা যে, ওইটিই তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠ! কিন্তু তা সত্য নয়। এটি তাঁর কৃত্রিম স্বর। তাঁর গলা ছিল স্বাভাবিক পুরুষোচিত। ঠুংরি গানে নারী-ভাব ফোটাবার জন্যে 'নারীকণ্ঠে' গাইতে আরম্ভ করেন কি না সঠিক জানা যায় না, তবে পরে তিনি গজল, দাদ্রা ইত্যাদি সব রীতির গানই ওই কৃত্রিম গলায় গাইতেন এবং আসরে ওইটিই তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠ বলে শ্রোতাদের ধারণা জন্মে যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উত্তরকালের প্রখ্যাত দৈত কণ্ঠের গায়ক অনাথনাথ বসু পিয়ারা সাহেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই ঠুংরি গান অবধি 'নারীকণ্ঠে' গাইতে আরম্ভ করেন। বসু মহাশয়ের সেই মিহি গলাও পিয়ারা সাহেবের মতন কৃত্রিম। অনাথবাবু তাঁর স্বাভাবিক পুরুষকণ্ঠে খেয়াল গেয়ে থাকেন এবং 'নারীকণ্ঠে' গান ঠুংরি। বাংলার বুলবুলের এ এক দুর্লভ দক্ষতা! এবং পিয়ারা সাহেবকে তিনি এক হিসাবে অতিক্রম করে গেছেন যে, একই আসরে তিনি দু'রকমের কণ্ঠেই গান শোনাতে পারেন। কিন্তু পিয়ারা সাহেব তাঁর স্বাভাবিক পুরুষ কণ্ঠে গাইতেন না, গাইতেন শুধু 'নারীকণ্ঠে'।

ওয়াজেদ আলির বাগানবাড়ীর সেই জলসায় আশুতোষ রায় যখন উপস্থিত হলেন, তখন পিয়ারা সাহেব তাঁর সেই কণ্ঠের ঠুংরিতে আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। মুর্শিদাবাদের সঙ্গে ঠুংরি গাইতেন পিয়ারা সাহেব এবং কৃত্রিম কণ্ঠ হলেও সুমিষ্ট ঠুংরি ছিল তাঁর। গলা অস্বাভাবিক মনে হ'ত না, আড়াল থেকে বোধ হ'ত যেন কোন মহিলার সতেজ কণ্ঠে গান হচ্ছে।

এ আসরেও পিয়ারা সাহেব প্রাণমাতানো যে ঠুংরি গাইলেন তা মধুবর্ষী মনে হ'ল অনেক শ্রোতারই কানে। বাস্তবিকই পিয়ারা সাহেবের গান অনিন্দ্য হয়েছিল।

তাঁর গানের পর এল আশুতোষ রায় মহাশয়ের পালা। আর তিনি ধ্রুপদ গাইবেন। সুতরাং অবস্থাটি তাঁর পক্ষে কত কঠিন দাঁড়াল তা সহজেই বোঝা যায়। পিয়ারা সাহেবের ঠুংরির তরল আমেজে তখনও মেতে আছেন শ্রোতারা। এক্ শার্পে নারীকণ্ঠে এতক্ষণ ধরে গেয়েছেন পিয়ারা সাহেব, সেই চড়া সুরে আসর রিন্ রিন্ করছে। সেই স্কেলের পর্দায় পর্দায় যেন তখন বাঁধা পড়ে আসরের জীবন্ত আবহ।

আশুবাবু এক্ শার্পে বিশেষ গাইতেন না। সাধারণতঃ ডি-তে কিংবা সি শার্পে গাওয়াই তাঁর অভ্যাস। এখন তাঁর গানের জন্যে তানপুরা ও পাখোয়াজ বাঁধতে হবে। এ অবস্থায় স্কেল নামিয়ে নিয়ে গানের জন্যে নতুন করে তানপুরা বাঁধলে দোষ দেওয়া যায় না গায়ককে। অন্য অনেক গায়ক হ'লে তা-ই করতেন। আসরের কেহ কেহ তাঁকেও বললেন নামিয়ে বাঁধতে

কিন্তু আশুবাবু রাজি হলেন না স্কেল নামাতে। তাতে আসরের সুরের পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হবে। তিনি বললেন, 'না। নামিয়ে দরকার নেই। সুর যা বাঁধা হয়ে আছে, তা-ই থাক।'

তিনি এক্ শার্পেই গাইতে মনস্থ করলেন। এবং সামান্য আলাপ করেই গান ধরে নিলেন; শ্রোতাদের দেখেই বুঝেছিলেন দীর্ঘ আলাপের আসর এ নয়।

বসন্তের সেই মধুর সন্ধ্যায় হোলি উৎসবের আসরে তিনি চৌতালে হিন্দোল রাগ ধরলেন। কতখানি কণ্ঠশক্তির প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। একে এক্ শার্প, তাতে উত্তরাঙ্গ প্রধান হিন্দোল রাগ, যার দৈবত পর্যন্ত তারা সপ্তকে বার বার পৌঁছতে হবে। উপরন্তু পিয়ারা সাহেবের চিত্তাকর্ষক ঠুংরিতে তখনও শ্রোতাদের মন দ্রবীভূত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারি চালের ধ্রুপদ গান!

কিন্তু আশুবাবু অসাধ্য সাধন করতে লাগলেন। তাঁর অসামান্য সুরেলা ও উদাত্ত কণ্ঠে গান যতই অগ্রসর হতে লাগল, শ্রোতারা ক্রমে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন তাঁর গানে। মাধুর্যময় অথচ শক্তিশালী তাঁর কণ্ঠ যেমন অবলীলায় তারা গ্রামে বিচরণ করে তেমনি অনায়াসে অবরোহণ করে আসে। তাঁর কণ্ঠসম্পদে ও গীতি-রীতিতে, তাঁর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে গেল সমস্ত আসরের আবহ। পূর্বেকার পরিবেশের স্থানে গাঢ় সুরের আবেদনে আসর নতুন রসে সঞ্জীবিত হ'ল।

বিদেশী এবং পশ্চিমা শ্রোতাদের অনেকের কাছেই ধ্রুপদের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সমস্ত আসর এই মোহন-কণ্ঠ ধ্রুপদী হিন্দোলে আবিষ্ট হয়ে পড়ল। শুদ্ধ সুরের স্পর্শে শ্রোতাদের অভিভূত করে সে গান শেষ হ'ল এক সময়ে। তখন যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা গায়কের উদ্দেশে শোনা যেতে লাগল, পিয়ারা সাহেবের গানের পর তেমন শোনা যায় নি।

শুধু প্রশংসা নয়। আসরের সামনে রূপোর একটি প্রকাণ্ড থালায় আবির-কাপ রাখা ছিল হোলির জন্যে। সেই থালার উপর শ্রোতাদের দরাজ হাত থেকে টাকা পড়তে লাগল। গায়কের জন্যেই প্রীতির উপহার সেসব।

সে রাত্রে আসর থেকে যখন আশুবাবু ফিরলেন তখন সে টাকা তাঁকেই দেওয়া হ'ল।

কণ্ঠে এমনি যাদু ছিল তাঁর। সাধারণতঃ তিনি ধ্রুপদ গাইতেন এবং খাণ্ডারবাণী রীতিতে। কিন্তু সেই স্বরসমৃদ্ধ তাঁর কণ্ঠস্বরের এমন হৃদয়স্পর্শী আবেদন ছিল যে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হতেন। তাঁর সুরের মায়া-প্রভাবের আরও অদ্ভুত দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে একটির উল্লেখ করা হবে এখানে।

যাদবপুরে তাঁর একটি আসরে আগেকার আর একটি আসরের অদ্ভুত বিবরণ পাওয়া যায়। যাদবপুরে যখন তাঁর গানের আসর হয়েছিল তখন জায়গাটির আদিম অবস্থা থেকে রূপান্তরের সূত্রপাত হচ্ছিল। নাগরিক উন্নতির সেই প্রাথমিক যুগে যাদবপুরের পল্লী-দৃশ্য তখনও দেখা যেত ইতস্তত। এখানে-সেখানে খোলা মাঠ, গাছপালা, এমনকি জঙ্গলের অংশ পর্যন্ত।

যাদবপুরের যেখানে তাঁর সেদিন গানের আয়োজন হয়েছিল সেটি একটি নতুন বাড়ী এবং কাছাকাছি

অনেকখানি জায়গা উন্মুক্ত ছিল। আশপাশে গাছপালা, ঝোপঝাড়। আশুবাবুর এক ছাত্র কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁর এই গানের ব্যবস্থা করেছিলেন। আসরে গান আরম্ভ করবার আগে ছাত্রকে তিনি বললেন, 'সাবধানে থেক। যেরকম জায়গা দেখছি গানের সময় সাপ আসতে পারে।'

কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে তখনই জানা গেল, আগেকার একটি আসরে সাপের গান শুনতে আসার কাহিনী। ছাত্রের কথায় আশুবাবু ঘটনাটি বিবৃত করেন মাত্র, তাঁর গানের অসাধারণত্ব প্রকাশের জন্যে নয়। কারণ তাঁর নিরহঙ্কার, সরল স্বভাব ছিল।

আগেকার সে আসর হয়েছিল বাংলার বিখ্যাত সঙ্গীতকেন্দ্র বিষ্ণুপুরে। আশুবাবু বিষ্ণুপুরে মাঝে মাঝে গাইতে যেতেন। সেদিন তাঁর আসর বসেছিল সেখানকার একটি চণ্ডীমণ্ডপে। তার পিছন দিকে একটি বাগান মতন ছিল।

ধ্রুপদ গানের আসর। আশুবাবু দরবারি কানাড়া গাইছিলেন। জয়জয়ন্তী, ইমন কল্যাণ, মালকোষ ইত্যাদির মতন তিনি দরবারি কানাড়াতেও সিদ্ধ। এটি তাঁর অন্যতম প্রিয় রাগও।

চণ্ডীমণ্ডপের সেই আসরে খানিকক্ষণ তাঁর গান চলবার পর হঠাৎ শ্রোতাদের কয়েকজনের নজরে পড়ল—আসরের পিছন দিকে মণ্ডপের একটি উঁচু জানলায় এক প্রকাণ্ড সাপ ফণা ধরে আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে, যেন গানেরই সঙ্গে। এই দৃশ্য দেখে আসরের অনেকে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন।

তখন একজন বললেন, 'ভয় পাবেন না, চুপ করে বসে থাকুন। গান চলুক।'

গান হ'তে লাগল পূর্ববৎ। সাপও তেমনি ভাবে যেন একাগ্র হয়ে শুনতে লাগল।

তারপর আশুবাবু যখন গান শেষ করলেন, সেই ভীষণ-দর্শন শ্রোতাও জানলা থেকে নেমে গেল নিঃশব্দে। শ্রোতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এমনি সুরেলা গলা ছিল আশুবাবুর। বাংলার যে গুণীরা অসাধারণ কণ্ঠসম্পদের জন্যে চিহ্নিত ছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। প্রতিভা ও সাধনার যুগ্ম ফল তাঁর সঙ্গীতকৃতি।

কিন্তু তাঁর তুল্য প্রতিভাবান শিল্পীর উপযুক্ত সম্মান বা অর্থ তিনি কি জীবনে পেয়েছিলেন? সেকালে এই শ্রেণীর সঙ্গীতচর্চায় বাঙালীদের উল্লেখ্য উপার্জন কিছুই হ'ত না। অনেক আসরে অনেক বাঙালী গুণীর মতন বিনা পারিশ্রমিকেই গাইতেন তিনি। নির্দিষ্ট আয় সামান্য। দারিদ্র্য তাই নিত্যসঙ্গী। এমন অভাব-অনটনের সংসার যে উপযুক্ত আহারও অনেক সময় হ'ত না। হয়ত তারই ফলে যক্ষারোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে ৪২।৪৩ বছর বয়সে (১৯২৫ খ্রীঃ)। কিন্তু সে দারিদ্র্যকে প্রসন্নচিত্তে বরণ করে নিয়েছিলেন সঙ্গীতচর্চার জন্যে। সরল স্বভাবের মানুষ, অল্পেই সন্তুষ্ট ছিলেন। নিজের দুর্ভাগ্যের কখনও অভিযোগ করতে শোনা যায় নি তাঁকে।

বাংলা দেশে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদচর্চার একটি সমৃদ্ধ ধারার অংশীদার তিনি। খাণ্ডারবাণী রীতির যে তিনি সাধক ছিলেন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যশস্বী ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁর রীতিপ্রকৃতি বা চালের তিনি একজন যথার্থ ধারক ও বাহক ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠতাত যদুনাথ রায়ের মতন। মুরাদ আলী খাঁর বিলম্বিত লয়ের বিশিষ্ট চাল এবং তাঁর সঙ্গীত-জীবনের বিস্তৃত পরিচয় 'সঙ্গীতের আসরে' পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। এখানে শুধু উল্লেখ করা যায় যে, ময়ূরভঞ্জ রাজের সভাগায়ক যদুনাথ রায়, উত্তর কলকাতার বেনেটোলার কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় (কর্মসূত্রে তমলুক-নিবাসী এবং বিখ্যাত বিপ্লবী যদুগোপাল ও আমেরিকা-প্রবাসী সাহিত্যিক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা), গোয়াবাগানের অবিনাশ ঘোষ (এঁর বাড়ীতেই মুরাদ আলীর দেহান্ত ঘটে), আশুতোষ রায় প্রমুখ তাঁর শিষ্যরা ওস্তাদের ধ্রুপদের এই ধারাকে ধারণ ও বহন করেছিলেন। অঘোর চক্রবর্তীও মুরাদ আলীর কাছে শিখেছিলেন। আশুতোষ রায় তাঁর গুরুভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ।

তবে আশুবাবুর ওস্তাদ মুরাদ আলী নন, জ্যেঠামশায় যদুনাথের শিক্ষাও তিনি ভালভাবেই পেয়েছিলেন। বলতে গেলে তাঁর সঙ্গীত-জীবনের গঠন হয়েছিল যদুনাথ রায়ের হাতে। তাঁর শিক্ষার আরম্ভও জ্যেঠামশায়ের কাছে ময়ূরভঞ্জে, যেখানে যদুনাথ সুদীর্ঘকাল দরবারি গায়ক নিযুক্ত থেকে ৯৪ বছর বয়সে গত হন।

তাঁদের আদি নিবাস ছিল হাওড়া ও হুগলী জেলার সীমানার কাছে চাঁপাডাঙ্গা ও আরামবাগের মধ্যবর্তী একটি গ্রামে। পরে আশুবাবুর কলকাতায় বাসা ছিল এবং যদুনাথ রায় ময়ূরভঞ্জ রাজাদের সভাগায়ক হয়ে বিষয়-সম্পত্তি লাভ ক'রে সেখানেই বসবাস করেন। আশুতোষ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভাই সুধীর রায় জ্যেঠামশায় যদুনাথের কাছে ছেলেবেলা থেকে পালিত হন, গান

শিখতে থাকেন। ক্রমে প্রকাশ পায় আশুতোষের অসাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভা ও অনুপম কণ্ঠের ঐশ্বর্য। পরে তিনি যদুনাথের ওস্তাদ মুরাদ আলীর কাছেও তালিম নিতে আরম্ভ করেন।

ওস্তাদজী এবং জ্যেঠামশায় দু'জনের কাছেই যুগপৎ চলতে থাকে আশুবাবুর শিক্ষা। বছরের বেশির ভাগ সময় মযূরভঞ্জে যদুনাথের কাছে শিখতেন এবং ৩,৪ মাস কলকাতায় গোয়াবাগানে থাকবার সময় অবিনাশ ঘোষের বাড়ীতে মুরাদ আলীকে পেয়ে তাঁর কাছে তালিম পেতেন। (মুরাদ আলীর কাছে যখন আশুতোষ শিখতে আরম্ভ করেন, তার বহু বছর আগে থেকে ওস্তাদজীর কাছে যদুনাথ শিখেছেন এবং তখন তাঁর শিক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বলা যায়। কারণ যদুনাথও ছিলেন একজন যথার্থ প্রতিভাশালী ধ্রুপদ শিল্পী, সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী।

এমনিভাবে এক বিচিত্র সঙ্গীতশিক্ষা ও দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক গড়ে উঠল মুরাদ আলী, যদুনাথ ও আশুতোষকে নিয়ে। এ পর্বের শেষ দিকে মুরাদ আলীর সঙ্গে যদুনাথের বেশি দেখা হ'ত না। কারণ ওস্তাদ থাকতেন কলকাতায় আর যদুনাথ থাকতেন মযূরভঞ্জে। তবে আশুবাবু পালাক্রমে দু'জায়গায় থেকে দু'জনের মধ্যে একটি যোগসূত্র রেখে দিতেন।

একবার একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটল আশুবাবুর তালিম উপলক্ষ্যে। দ্বৈত শিক্ষার এক বিচিত্র কাহিনী। তিনি তখন গোয়াবাগানের বাসায় থাকতেন। সেদিন ওস্তাদের কাছে শিখতে যেতে মুরাদ আলী তাঁকে দরবারি কানাড়ার একটি গান দেন, একবার শুনিয়ে। তখন আশুবাবু গানটি আরও খুঁটিয়ে শুনে স্বরলিপি ক'রে শিখতে চাইলে, মুরাদ আলী বললেন, "যদুর কাছে এটা শিখে নিও।"

তার পরের বার যখন আশুবাবু মযূরভঞ্জ গেলেন, দরবারি কানাড়ার সেই গানটি মুরাদ আলী যে তাঁকে শেখাবার কথা বলেছেন সে কথা জ্যেঠামশায়কে বলতে যদুবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এ গান ত ওস্তাদজী আমায় দেন নি।' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'তবে তিনি যখন বলেছেন, শেখাব তোমায়। ওস্তাদজী বোধ হয় আমার পরীক্ষা করছেন।'

'সেবার আশুবাবু মযূরভঞ্জে দু'মাস থাকেন এবং যদুবাবু তাঁকে সম্পূর্ণ করে শেখান দরবারি কানাড়ার গানখানি। তারপর কলকাতায় ফিরে এলে মুরাদ আলী জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদু শিখিয়েছে তোমায় সেই গানটা?'

'হ্যাঁ, ওস্তাদজী।'

'তা হ'লে শোনাও ত।"

আশুবাবু গাইলেন। মুরাদ আলী বললেন, 'আবার গাও।

তিনি পুনরায় শোনালেন সমস্ত কাজকর্ম সমেত, ঠিক যদুবাবু যেমনটি শেখান তেমনিভাবে। নিবিষ্ট হয়ে শুনে ওস্তাদজী বললেন, 'আমি শেখালেও এমন ক'রে পারতাম না। যদু যা শিখিয়েছে তাতে কোন খুঁত নেই। যদু দেখছি তৈরি হয়ে গেছে। আমার কাছেও এ গান এমন করে পেতে না।'

মুরাদ আলীর তারিফ থেকে বেশ বোঝা যায়, যদুনাথ রীতিমত তৈরি হয়েছিলেন। তারপর আবার তৈরি হয়েছিলেন আশুবাবু। মুরাদ আলীর বিলম্বিত লয়ের ধ্রুপদের তান—যা গমক ও মিড়ের সূক্ষ্ম কারু-কর্মের জন্যে বিশিষ্ট ছিল—যদুবাবুর মতন আশুবাবুর সাধনাতেও রূপায়িত হ'ত। আশুবাবুর সেই ধ্রুপদ গানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন স্বর ফুটে উঠে চুঁইয়ে পড়ত। দরাজ অথচ অতি সুরেলা গলার মধ্যেই সাধারণত তাঁর আসর মাৎ হ'ত, রাগরূপ বুঝতেন ক'জন শ্রোতা?

কলকাতার নানা আসরে আশুবাবুর গান হ'ত। তার মধ্যে একটি আসর ছিল মধ্য কলকাতায় মতি মিত্র মহাশয়ের বাড়ী। মতিবাবু যদুনাথ রায়ের কাছে কিছুদিন গান শিখেছিলেন বটে, কিন্তু গান গাওয়ার চেয়ে দামী গান শোনার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। যেমন দিলদরাজ, তেমনি ধনীর পুত্র। সঙ্গীত-প্রেমী হিসেবে তাই মুক্তহস্তে গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। পৈতৃক আটটি বাড়ীর মালিক হয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গীতপ্রেমের বাস্তব কারণে সে সবই জলাঞ্জলি দেন একে একে। সেকালের হাজার টাকা মুজ্‌রো দিয়েও পশ্চিমাঞ্চলের গুণীদের তিনি নিয়ে এসেছেন। তার চেয়ে অল্পমূল্যের মুজরোর ত কথাই নেই।

কলকাতার এই সব আসর ছাড়া, কলকাতার বাইরে থেকেও মাঝে মাঝে আশুবাবুর ডাক আসত। সেসব জায়গায় পারিশ্রমিক পেতেন, কিন্তু সেকালে তার সংখ্যা ও পরিমাণ তেমন উল্লেখ্য নয়। তাঁর দারিদ্র্য তাতে দূর হয় নি।

কয়েকজন মাত্র ছাত্র ছিলেন আশুবাবুর। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতের যথার্থ উত্তরাধিকারী কেউ ছিলেন না। সে ছাত্ররা হলেন—মেদিনীপুরের মাতুবাবু, কলকাতার

বিভূতিভূষণ সেন (ইনি সাতকড়ি মালাকরেরও শিষ্য হয়েছিলেন) এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

একথা অনেকেরই জানা নেই যে, পরবর্তীকালের ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক এবং সমালোচনা-সাহিত্যের সুপণ্ডিত লেখক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম জীবনে পাঁচ বছর সঙ্গীত-চর্চা করেছিলেন। সেই পাঁচ বছর (১৯১৫ থেকে ১৯২০) তিনি ছিলেন আশুবাবুরই শিক্ষাধীনে। প্রথমে খেয়াল ও পরে ধ্রুপদ শিখতেন। কিন্তু তাঁর সে সঙ্গীতশিক্ষার সূচনা হয় অন্য কারণে এবং সঙ্গীতশিক্ষারই জন্যে নয়! ঘটনা এই যে, শ্রীকুমারবাবু প্রথম অধ্যাপনা করেন রিপন কলেজে এবং সেখানকার ১৫০।২০০ ছাত্রের এক-একটি ক্লাসে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দেবার ফলে তিনি কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। Throat trouble-এর জন্যে কণ্ঠ অনেক সময় রুদ্ধ হয়ে যেত, শ্লেষ্মা জমে অত্যন্ত কষ্ট পেতেন। নানা চিকিৎসাতেও রোগের উপশম না হওয়ার পর কেহ কেহ পরামর্শ দেওয়ায় সঙ্গীতচর্চা তথা কণ্ঠচর্চা আরম্ভ করলেন আশুবাবুর কাছে। তাঁর নির্দেশে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিয়মিত কণ্ঠসাধনা। ফলে ক্রমেই সেই throat trouble কমে যেতে লাগল। বছরখানেক পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ। তার পরও চার বছর আশুবাবুর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় করেছিলেন। সেজন্যে সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি নিতান্ত অনধিকারী নন।

এখন আশুবাবুর আর একটি আসরের উল্লেখ করে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করি। শ্রীকুমারবাবু যখন সঙ্গীতচর্চা করতেন এটিও সে সময়ের ঘটনা। তিনি তাঁর এক বন্ধুর বিবাহে বরিশালে বরযাত্রী হয়ে যান, সেখানে আশুবাবুর গানের আসর বসে।

গৃহস্বামী বিবাহ উপলক্ষে সে আসরে বাঈজীর গানেরও আয়োজন করেছিলেন। আশুবাবু সেখানে সঙ্গতকার নিয়ে যান নি। খেয়াল গাইবেন, সুতরাং বাঈজীর তবল্‌চি ও তবলাতে সঙ্গত হবে।

আসরে প্রথমেই আশুবাবুকে গান গাইতে অনুরোধ করা হ'ল। তবল্‌চি তবলা নিয়ে বসলেন তাঁর সামনে। কিন্তু তবলা বাঁধা আছে জি শার্পে। সে বাঈজীর চড়া গলার সঙ্গে মিলিয়ে জি শার্পেই বরাবর বাঁধা থাকে, তবল্‌চি জানালেন। তবলা নামিয়ে বাঁধবার কথা একবার হ'ল বটে. কিন্তু তবলাবাদক রাজি হলেন না— 'নামালে তাল আওয়াজ দেবে না, বরাবর এই স্কেলেই বাঁধা হয়ে এসেছে।'

'আচ্ছা, থাক তা হ'লে', বলে জি শার্পেই আশুবাবু গান আরম্ভ করলেন। প্রথমে ধরলেন মালকোষ। সেই অত্যন্ত চড়া স্কেলেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রঞ্জনীশক্তির কোন অভাব দেখা গেল না। তিনি পর পর কয়েকটি গান গাইলেন দু'ঘণ্টা ধরে।

বিবাহবাড়ীতে সমবেত এই আসরের শ্রোতারা মুগ্ধ চিত্তে তাঁর গান শেষ পর্যন্ত শুনলেন। বাঈজীও শুনছিলেন সেখানে বসে।

আশুবাবুর গানের পর বাঈজীর পালা এল। গৃহস্বামীর পক্ষ থেকে তাঁকে গাইবার জন্যে বলতে তিনি কিন্তু সম্মত হলেন না। অনেককেই অবাক্ করে দিয়ে আশুবাবুর উদ্দেশে জানালেন, 'অপূর্ব এঁর গান। এর পরে আমি আর কি গাইব?' (ক্রমশঃ)

—•—

কার্ল স্পিটলার—বিংশ শতাব্দীর এপিক প্রতিভা

রমঁ্যা রলাঁ

বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর অমানুষিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নোবেল-প্রাইজ্ লাভের ফলে কার্ল্ স্পিটলার সাধারণের নিকট যশস্বী হইয়াছেন। অনেকের ধারণা যে মিত্র-পক্ষের অনুকূলে তাঁহার এই উক্তি তাঁহার নোবেল্ প্রাইজ্ পাইবার কতকটা কারণ, কিন্তু এই ধারণা সত্য না হইতেও পারে। ১৯১৫ সালে জুরিখে (Zurich) সপ্ততিবর্ষ-বয়স্ক এই বৃদ্ধ-কবি প্রকাশ্যে জার্মানীর রাষ্ট্রনীতি ও বিগত মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামের নির্লিপ্ততায় হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে তাঁহার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহা যথেষ্ট সাহসের পরিচায়ক, কারণ তখন ইউরোপে একমাত্র জার্মানীতেই তাঁহার গ্রন্থগুলি পঠিত ও প্রশংসিত হইত এবং জার্মান-সুইসেরা তাহাদের দুর্দান্ত প্রতিবেশীর (জার্মানী) সহিত অত্যন্ত সাবধানতাবে ব্যবহার করিত। কিন্তু কার্ল্ স্পিটলারের প্রতিভা যেমন স্বতঃউৎসারিত হইত, তাঁহার সাহসও তেমনি স্বাভাবিক ছিল। তিনি ন্যায় ও সত্যের খাতিরে ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করিতেন না এবং একবার যাহা বলিতেন তাহা লইয়া কখনও মাথা ঘামাইতেন না।

কিন্তু অন্যে তাঁহার সম্বন্ধে বেশ মাথা ঘামাইত। চারিদিক হইতে মিত্র-পক্ষীয়েরা ল্যুজার্ণে (Luzern) তাঁহার বাসভূমিতে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসিত। তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ, সম্বর্দ্ধনা-লিপি, প্রশংসাপত্র ঝুড়ি ঝুড়ি বর্ষিত হইত ও তাঁহাকে লইয়া বহু উৎসবাদিও হইত, এমন-কি জেনেভা-সম্বর্দ্ধনায় "ফ্রেঞ্চ্ একাডেমী" কয়েকজন সদস্যকে প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিল। তৎকালে প্রায়ই দেখা যাইত যে, তাঁহাকে পুষ্পপেলব বচন অর্ঘ্য দিবার জন্য এমন সব লোকে দল বাঁধিয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে, যাহারা জীবনে তাঁহার একটি লাইনও পাঠ করে নাই। সেইসকল কৌতুক-অভিনয়ে আমি উপস্থিত থাকিতাম ও রাজকীয় মহারথিগণের মূর্খতার পরিমাণ লক্ষ্য করিতাম। ফ্রান্সের এইরূপ একজন পদস্থ কর্মচারীর কথা মনে আছে, ইনি এইরূপ একটি সভায় কি বলিবেন খুঁজিয়া না পাইয়া কার্ল্ স্পিটলারের কোন গ্রন্থ-পাঠরূপ ব্যর্থ পরিশ্রম না করিয়া একটি জার্মান অভিধান খুলিয়া স্পিট্জ (Spitze) শব্দের অর্থ 'শীর্ষ' বা 'শিখর' দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার 'দ্বিপদী' (Couplet) রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন! স্পিটলারের নিমন্ত্রণকারী ল্যাটিন্-সুইস্ জাতিও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। জেনেভা-তোজে স্পিটলার যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন, আমি তখন একটি কথোপকথনের নিম্নলিখিত অংশটুকু শুনিয়াছিলাম—

"কিহে, ওর কোন বই কি তুমি পড়েছ?"

"না, তুমি পড়েছ নাকি?"

"আরে না (ব্যঙ্গ-সহকারে)। প্রথমতঃ কবিতা জিনিষটা আমার পক্ষে অতি উঁচুধরণের ব্যাপার—তা ছাড়া আমি জার্মানই জানি না। (বলিতে বলিতে থামিয়া—বক্তৃতার উদ্দেশে) চমৎকার, বাহবা!"

স্পিটলার ইহাতে মোটেই আশ্চর্য্য হইতেন না ও ইহা লইয়া যথেষ্ট কৌতুক করিতেন। আর কখনও কোন-কিছু তাঁহাকে আশ্চর্য্য করিতেও পারিত না। সত্যই ত তিনি হঠাৎ তাহাদিগকে চমকাইয়া দিয়াছেন। সদ্যবিখ্যাত লোককে লইয়া হৈ চৈ করার ত চিরচলিত প্রথাই আছে!

সেই ঘটনার পর দশ বৎসর অতীত হইয়াছে অথচ কার্ল্ স্পিটলার সেদিন অপেক্ষা তিলমাত্র অধিক পরিচিত হন নাই; ফ্রান্সে তাঁহার সম্বন্ধে লোকে কিই বা জানে? প্রয়োজন হইলে যে ভাবরাজ্যের কবি বাস্তবতার ক্ষেত্রেও শক্তিকৌশলের পরিচয় দিতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য লিখিত 'লেফ্টেনাণ্ট কন্‌রাড্' (Conrad the lieutenant) প্রভৃতি দুটি কি তিনটি মাত্র গ্রন্থের সহিত সেখানকার লোকে পরিচিত। ফ্রয়েড (Freud) সম্প্রতি ক্যাসনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া সম্ভবতঃ দুই একজনে তাঁহার 'ইম্যাগো' (Imago) পুস্তকখানিও পড়িয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার দুইটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যাহাদের বর্ত্তমান কালের মহাকাব্যের শিরোমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না সেই 'অলিম্পিয়ার বসন্ত' (Olympian Spring) ও 'প্রমিথিয়ুস্' (Prometheus)—আল্পসের (Alps) গগনচুম্বী শিখরের মত যাহারা দীপ্যমান;—

ফ্রান্সের কয়জন লোক সুইটজারল্যাণ্ডেই বা কয়জন তাহা পড়িয়াছে? কখনও কি কাহারও মনে জাগিয়াছে যে শ্পিটলার নামক যে লোকটি সেদিন পরলোক গমন করিলেন, তিনি গ্যয়টে ও মিল্টনের সহিত একাসন পাইবার অধিকারী!

তাঁহার তিনটি মহাকাব্যের মধ্যে প্রমিথিয়ুস ও এপিমিথিয়ুস, অলিম্পিয়ার বসন্ত ও সহের অবতার প্রমিথিয়ুস (Prometheus der Dulder) প্রথমটি তৃতীয়টি একই কারু-শিল্পের দুই বিভিন্ন দিক, (সুতরাং দুইটি মিলিয়া সাধারণতঃ প্রমিথিয়ুস নামে কথিত হয়) একই সুর যেন বিভিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন তাললয়ে গীত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলিতে পঁয়ত্রিশ বৎসর-ব্যাপী শ্পিটলার 'কবির লড়াই'-ক্ষেত্রে কৌশলী যোদ্ধার মত যথেষ্ট হস্ত-কাটাকাটির খেলা দেখাইয়াছেন; প্রাচীন কবি-যোদ্ধারা তাঁহার জয়ের উপকরণ জোগাইয়াছেন মাত্র কিন্তু তিনি সেই জয়ের নিষ্কল গর্ব্বে আত্ম-প্রতারিত হন নাই।

এই মহাকাব্যগুলির মূল বিষয়, মানুষের চিরন্তন বিদ্রোহ। তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একাকী দূরে রাখা হইয়াছে তবু সে বিধিবদ্ধ বিবেক ও আড়ষ্ট নীতির শাসন মানিয়া তাহার স্বাধীন আত্মাকে বন্দি দিবে না। এই নীতি ও বিবেক প্রভুর মত নিরন্তর তাহাকে হুকুম করিতেছে; রাষ্ট্রতন্ত্রবাদ বা ঈশ্বরবাদরূপ কোন পৌত্তলিকতাই সে মানিবে না। যাহারা তাহাকে নির্য্যাতিত করিতেছে, তাহাদেরই মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য নিদারুণ যন্ত্রণা সহিয়া সে পরিশেষে বিজয়ী হইয়াছে,—সেই রাষ্ট্রপ্রভু, পরমেশ্বরপ্রভু এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ—যাহাদের ধর্ম্মের অন্ধ দূত ও যাহাদের একমাত্র কৃতিত্ব বলিহিসাবে এই বীরের শক্তপান করা—এইগুলিই হইতেছে এই একক নগ্ন আত্মার (solitary nude soul) বিপুল বিজয় সঙ্গীতের বিষয়—এই আত্মাকে মানুষ নিরন্তর ক্রুশবিদ্ধ করা সত্ত্বেও সে তাহার আত্মোৎসর্গের দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

অলিম্পিয়ার বসন্ত (Olympischer Fruhling) হিন্দু মহাকাব্যের মত যেন বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাস; সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বিপুলা প্রকৃতির ক্রমিক পটোন্মোচন। নবতম দেবতা সমাজ—বর্ত্তমান যুগে যাহারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে—নিশীথিনীর গভীর তমিস্রা হইতে উদ্ভূত হইয়া যাহারা এখন মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত দীপ্যমান—রাজদণ্ড লোভে তাহাদের যুদ্ধ—নূতন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা—অলিম্পিয়াস্ স্বর্গের যৌবন—পরিপূর্ণতার আনন্দ—এইসব লইয়াই এই কাব্যটি রচিত। কিন্তু ধীরে-ধীরে সুখের দিনের অবসান হইতেছে—কবি তাই শেষ পর্য্যন্ত না দেখাইয়া ঐন্দ্রজালিক প্রাসাদে প্রথম ফাটল দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছেন; তিনি তামসঘন ভবিষ্যৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। যে শিখরে তাঁহার অধিষ্ঠান সেখান হইতে নিম্নের অতলস্পর্শ গহ্বরগুলি—যেখানে অচিরে জীবনের সকল আনন্দ নিঃশেষে তলাইয়া পড়িবে—তাহা দেখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বিশ্বমানবের জন্য আপনাকে বলি দিতে ভগবানের পুত্র 'হেরাক্লেসের' (Herakles) অবতরণ পর্য্যন্ত দেখাইয়া তিনি তাঁহার কাব্যের যবনিকা ফেলিয়াছেন।

গ্রীক্ নামগুলি দেখিয়া যেন আমরা প্রতারিত না হই। আমরা এতকাল পৌরাণিক গ্রীক নামগুলি দ্বারা যাহা বা যাহাকে বুঝিতাম এই নামগুলির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। পুরাণ-কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছে। ভাব ও রূপে সবই নবজন্ম লাভ করিয়াছে। আলুপের এই দেবতামণ্ডলীকে যে-সব নূতন দৃষ্টে অবতারণা করিয়া শ্পিটলার নব-নব রূপ দিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই নবজন্ম দেওয়ার ধারা যখন একবার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তখন এগুলিকে তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি ছাড়া অন্য-কিছু বলিয়া মনে হয় না। পুরাতনকে এই নূতন রূপ দেওয়াতেই প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের যথার্থ মাধুর্য্য।

আমার বিশ্বাস আছে যে ফ্রান্স একদিন এই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবে। আমার আরও বিশ্বাস এই যে ল্যাটিন-জাতিসমূহ জার্ম্মান-জাতি অপেক্ষা সহজেই এই কাব্যরসগ্রহণে সমর্থ হইবে। এই কাব্যের রূপোন্মেষিণী (plastic) শক্তি অপূর্ব্ব। একজন যথার্থ শিল্পীর দৃষ্টির ভিতর দিয়া ভাব-সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতা পর্য্যন্ত সব কিছু আমরা ইহাতে দেখিতে পাই। অশরীরী আত্মার চরম সূক্ষ্মতা পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়টি একটি শরীরে রূপ পরিগ্রহ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফাউস্টের (Faust) পর জার্ম্মান প্রতিভা আমাদিগকে এমন প্রাচুর্য্য ও ভাবসম্পদ কিছুই দিতে পারে নাই। আমার বয়স যদি আরও ত্রিশ বৎসর কম হইত আমার জীবনের কয়েক বৎসর আমি শ্পিটলারের কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদে অতিবাহিত করিতাম। বর্ত্তমানে যাঁহাকে ইউরোপের কবিশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি সম্মান করি তাঁহার উদ্দেশে শুধু ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে স্পিটলারের সহিত আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। তখন মহাযুদ্ধের আট মাস কাল গত হইয়াছে। এই আট মাস কাল আমি একাকী এই দারুণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। আমার এই যুদ্ধকে আমি বেদনাবিমিশ্রিত পরিহাসের সহিত "সমরাঙ্গনের ঊর্দ্ধে" (Above the battlefield) নাম দিয়াছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টা ন্যায় কি অন্যায় তাহার বিচার আমি করিব না কিন্তু এই যুদ্ধে আমার সমস্ত ন্যায় বিশ্বাস, সমস্ত অন্তরাত্মা আমাকে প্রণোদিত করিয়াছে। এই সময়ে হঠাৎ আমি "প্রমিথিয়ুসে"র সন্ধান পাইলাম, এই বীরনায়ক ন্যায়ের জন্য আপনার জীবন ও আত্মাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। এই আকস্মিক পরিচয়ে আমার ধমনীতে ধমনীতে আনন্দ ও ভাবের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল, আমি অনুভব করিলাম যে আমি আর একক নহি ; আমার ভক্ত ও সাথী জুটিয়াছে।

স্পিটলারের সপ্ততিতম জন্মদিনের কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার রচিত গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে যুক্তি ও সৌন্দর্য্যের যে দুই আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে তজ্জন্য তাঁহাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া একটি পত্র লিখিলাম।

১৯১৫ সালের ২১শে এপ্রিল আমি লিখিয়াছিলাম—

"আমার মনে হয় এই দুর্দ্দিনে 'প্রমিথিয়ুস' কাব্যখানি পাঠ করিলে, যে দারুণ কুজ্ঝটি ইউরোপের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে, মাথার উপর হইতে ধীরে ধীরে তাহা অপসারিত হইয়া শান্তিপূর্ণ শাশ্বত অনন্ত নীলাকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। যে হিংস্র সমর-দানব আমাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতেছে তাহার এই উৎপীড়নের মধ্যেই আপনাতে মহাশিল্পীর নির্ভীক প্রশান্তি দেখিয়াছি এবং তাহারই উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করিতেছি।"

তৎপরদিনই স্পিটলারের উত্তর পাইলাম—

"অশরীরী আত্মার বিচিত্র যোগসূত্রের দ্বারা আমাদের পরস্পর বন্ধন ঘটিয়াছে, বিভিন্ন জাতির প্রতি ন্যায়সাধনের জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি এবং উভয়ে ইউরোপের লোক বলিয়াই আমাদের চিন্তার ধারা একই পথে প্রবাহিত হইয়াছে। আমাদের কাব্যে ও জীবনে আরও কত বিষয়ে যে ঐক্য রহিয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমার স্ত্রী তোমার 'জন্‌-ক্রিস্টোফার' (John Christopher) পড়িতে পড়িতে বিস্মিত হইয়া আমাকে বলিল—'আশ্চর্য্য, ঠিক মনে হইতেছে যেন তুমিই এই বইখানি লিখিয়াছ'! ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তোমার মহতী দৃষ্টির অনুভূতি ঠিক আমারই অনুরূপ এবং 'বেটোফেন' (Beethoven) এর প্রতি আমরা উভয়েই সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন।"

যখন এই পত্র পাই তখন আমি জেনেভাতে 'যুদ্ধ বন্দীদিগের আন্তর্জ্জাতিক প্রতিনিধি সম্প্রদায়ে' (International Agency for the War-prisoners) কাজ করিতেছিলাম। ইয়োরোপ তখন যুদ্ধ-জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে, সকল দেশের গুপ্তবার্ত্তাবাহী বিভাগ (Intelligence Department) হিংসা ও উন্মত্ততার পরস্পরের সহিত পাল্লা দিতে ব্যস্ত। ফ্রান্সে তখন লোকে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কাণ্ট (Kant) গ্যয়টে (Goethe) ও হাইনে (Heine)-কে অতি নিম্নস্তরের লেখক বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে। বেল্‌জিয়ামের নিরপেক্ষতায় হস্তক্ষেপ করাকে নিন্দা করিয়া জার্ম্মানীতে স্পিটলার একঘরে হইয়াছেন। প্রতিদিন তাঁহার নিকট কদর্য্য অপমানকর বহু পত্র আসিত ; তিনি সেগুলিকে একটি বৃহৎ কাঁচের পাত্রে রাখিয়া কৌতুক করিয়া বলিতেন, 'এটি আমার যাদু-ঘর'। তিনি আমোদের জন্য মাঝে মাঝে সেগুলি পাঠ করিতেন। আমিও ঐ সময়ে নিষ্কৃতি পাই নাই! আমাকে তখন দুইদিক হইতে দুই মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে আমি বিশ্বমানবকে ভালবাসিতে গিয়া ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছি। জার্ম্মান পত্রিকাগুলির অভিযোগ ছিল এই যে, আমি আমার লেখা দ্বারা যুদ্ধাবসানে বিলম্ব ঘটাইতেছি। আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগের কোনই ফল হইল না। যাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি তাহা বলিতে দ্বিধা করি নাই। বহুকষ্টে জরেস্ (Jaures) সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধগুলি পরপর 'জার্ণাল দ জেনেভা'তে প্রকাশ করিলাম এবং পুনর্ব্বার অনন্ত ভাবরাজ্যে বিচরণ করিবার সুযোগ পাইলাম।

আমি স্পিটলারের একখণ্ড 'প্রমিথিয়ুস ও এপিমিথিয়ুস' সঙ্গে লইয়া থুন (Thun)-এ বিশ্রাম করিতে গেলাম। এই কাব্যরসে নিমগ্ন হইয়া আমি একমাসকাল যেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে বাস করিলাম। আমার সম্মুখ হইতে অন্য সব কিছু অন্তর্হিত হইল। যুদ্ধ-কোলাহল, ইউরোপের উন্মত্ত প্রলাপ সব কোথায় মিলাইয়া গেল। আমি জনশূন্য প্রান্তরের নীরবতা—দোয়েল-সোয়ালোর (swallow) সুমধুর স্বরলহরী—আর (Aar) নদী ও তাহার শৈবালদাম, সবুজ জলধারা এবং রক্তবর্ণ বৃক্ষের

সৌন্দর্য্যের মধ্যে একেলা কোথায় ডুবিয়া গেলাম। নির্ঝরিণী-ধারার তালে তালে হাস্ত-মুখর প্যাণ্ডোরার (Pandora) আনন্দ-চঞ্চল পদক্ষেপ শুনিতাম—যখন পড়িতাম—

'নিশীথিনীর শান্তি তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে—ঊর্দ্ধাকাশে নীলাভ নক্ষত্ররাজি ঝিকিমিকি করিতেছে এবং সেই নিঃসীম শূন্তে তাহার নিজের মৃদুচরণপাতের শব্দ ব্যতীত কোন শব্দই তাহার কানে প্রবেশ করিতেছে না'—

তখন আমি কালের সীমা অতিক্রম করিয়া কোথায় কোন অজানালোকে চলিয়া যাইতাম!

আমার মনে হয়, আমার জন্মের পর ইউরোপে লিখিত এইটিই প্রথম কাব্যগ্রন্থ যাহা অনন্তকাল আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে। অবশ্য টলষ্টয়ের 'সমর ও শান্তি'ও (War and Peace) এই চিরন্তনী সাহিত্যের একটি, কিন্তু 'সমর ও শান্তি'ও যেন কালের মুখোস পরিয়া আছে; মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারা চিরন্তন মানুষের চারিদিকে যে অন্তরাল রচনা করে 'সমর ও শান্তি'তে সেই আবরণটি লক্ষিত হয়। স্পিটেলার কালের পিঞ্জরদ্বার চূর্ণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মহাশিল্পী চরিত্র সৃষ্টির মত সময়কেও সৃষ্টি করিয়া লন। তিনি কালের প্রভাব স্বীকার করেন না; আত্মার বিশ্বে তিনি সম্রাট। এই বিরাট মহাকাব্যগুলি বৈদিক সাহিত্য ও হোমরিক গ্রীসের মহাকাব্যগুলির সহিত একশ্রেণীতে স্থান পাইবে। আমি ভাবিয়াছিলাম মহাকাব্য রচনা করিবার মত মহাপ্রাণ একালে আর সম্ভব নহে। কিন্তু আজিও সে সৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান। স্পিটেলার প্রতীচ্য দেশে সেই মহাপ্রাণ মহাশিল্পীগণের শেষ প্রতিনিধি—বর্ত্তমান যুগে তিনি একক। তিনি আপনাকে যে যশবিমণ্ডিত দেখিয়াছেন তাহা কিন্তু এক ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত!—এই মহাকবি নাকি রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে যশস্বী হইয়াছেন!

স্পিটেলার মৃদু হাস্তের সহিত আমাকে একবার বলিয়াছিলেন—"আমার জীবন-নাট্যে অর্দ্ধ ঘণ্টামাত্র পলিটিক্যাল অভিনয় করিয়াছি; একটি বিন্দু যতটুকু স্থান অধিকার করে আমার জীবনে পলিটিক্সের স্থান ততটুকুও নহে।"

১৯১৫ সালের আগষ্টের শেষাশেষি ল্যুজার্ণে তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি অতীব সমাদরের সহিত আমার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বিপুলকায় ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। কপাট-পৃষ্ঠ, আজানুলম্বিত লোহিতবর্ণ, শ্বেতশ্মশ্রু স্পিটেলারের গোঁফের বর্ণাভা তখনও নষ্ট হয় নাই; চুল পশ্চাদ্দিকে বিন্যস্ত ছিল; দেখিলেই সদাহাস্যবিকশিত সরল আভিজাত্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। ১৯১৫ সালে হোড্লার (Hodler) তাঁহার যে ছবিখানি আঁকিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিখুঁত প্রতিকৃতি।

মিষ্ট ও গম্ভীরভাষী স্পিটেলার যেন সৌজন্য ও দয়ার অবতার ছিলেন। অথচ সে দয়া সত্ত্বেও ব্যঙ্গ-পরিহাসের লোভ সংবরণ করিতে পারিত না। স্ত্রীজাতিকে তিনি অসাধারণ সম্মান করিতেন। তিনি চমৎকার ফরাসী বলিতে পারিতেন।

দুই কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া তিনি সম্পূর্ণ নির্জ্জনবাস করিতেন। সাহিত্যিকদের সহবাস বর্জ্জন করিয়া চলিতেন এবং তাহার প্রয়োজনও অনুভব করিতেন না। ল্যুজার্ণে বুদ্ধিমান লোকদের সহিত আলাপের সুযোগ আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—'না, ভগবানকে ধন্যবাদ।'

ল্যুজার্ণেও তাঁহার বাড়ীখানি তিনি লতাপাতা ও গাছপালা দিয়া এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে মনে হইত বাড়ীটি সহরের বাহিরে অবস্থিত। স্পিটেলার নির্জ্জনতাপ্রিয় হইলেও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হইতে ভালবাসিতেন, প্রতিদিন প্রাতে ৭টার সময় তিনি বাজারে গিয়া ফলমূলাদি ক্রয় করিতেন ও সে সময় নানাবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ পাইতেন।

তিনি অত্যন্ত গৃহপ্রিয় (ঘরমুখো) ছিলেন। তাঁহার যৌবনে মাত্র এক বৎসর জার্ম্মানীতে, দুই কি তিন বৎসর রুশিয়ায়, আটদিন প্যারিসে, ইটালীর সিসিলি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে আটদিন—ইহাই তাঁহার জীবনের বিদেশ ভ্রমণের তালিকা। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডে তিনি হাঁটিয়া প্রচুর ভ্রমণ করিতেন এবং একই পথে বার বার গিয়াও বিরক্ত হইতেন না—তিনি তাঁহার পরিচিত পর্ব্বত, তাঁহার নিজস্ব স্তূপ ডিট্‌সেন্‌বার্গ (Dietschenberg) হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় শোভা ও সৌন্দর্য্য, সকল প্রকারের সুখ আহরণ করিয়া লইতেন।

সুইটজারল্যাণ্ডেই তাঁহার আত্মীয় সংখ্যা অতি অল্প ছিল; সুইটজারল্যাণ্ডের বাহিরে একেবারেই ছিল না বলা চলে। জার্ম্মানীতে ভাইনগার্টনার (Weingartner) স্পিটেলারকে পরিচিত করিয়া দেন; ইঁহার প্রতি স্পিটেলার সর্ব্বদা হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা পোষণ করিতেন যদিও ইঁহাকে তাঁহার রাষ্ট্রীয় উক্তি (জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে)

প্রকাশিত হইবার পর আইনগার্টনার একটি উগ্র প্রকার পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের শেষ করিয়া দেন। স্পিটলারের কাব্যগুলির প্রশংসায় তিনি বিরত হন নাই বটে তবে তিনি বলিতেন যে কবি মানুষটা সে প্রশংসার যোগ্য নহে। "এই কাব্যগুলি স্পিটলার লেখে নাই—কোন দেবতা তাহাতে ভর করিয়া এইগুলি লিখাইয়াছেন"—নিশ্চয়ই সে কোন জার্মান দেবতা! স্পিটলার তীব্রাম ব্যঙ্গের সহিত উত্তর করেন—"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জার্মানদেবতা একজন সুইসের স্কন্ধে ভর করিবার হীনতা স্বীকার করিলেন—যে সুইস আবার ফরাসী, ইংরেজ ও রাশিয়ানদের সহিত পরিচিত ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন; অথচ সেই দেবতা হিণ্ডেনবার্গ, ম্যাকেনসেন এণ্ড কোং মহোদয়গণকে অনুগ্রহ করিলেন না।"

আধুনিক জার্মানীকে তিনি মোটেই ভালবাসিতেন না যদিও এখানেই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার প্রতিভা আদৃত হইয়াছিল। সেখানকার সঙ্কীর্ণতা ও 'পণ্ডিত মূর্খামি' দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। জার্মানীর কথা হইলেই তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত বলিতেন, "এখানে কবির কাব্য না পড়িয়া লোকে তাঁহার সম্বন্ধে সমালোচনা সাহিত্য পাঠ করে" (তিনি বহুবার নাকি এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ পাইয়াছেন; এমন কি গ্যয়টে এবং তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ইফিজেনিয়া (Iphigenia) সম্বন্ধেও ওই ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।)

তিনি জার্মানীর জনসাধারণের সহিত ফরাসীদেশের শ্রেষ্ঠ জনগণের (elite) তুলনা করিয়া দেখাইতেন যে ফরাসীরা তাহাদের শীর্ষ শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে (classics) পূজা করার প্রথা (cult) অব্যাহত রাখিতে এবং তাহাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির স্মৃতি বজায় রাখিতে জানে। স্পিটলার বলিতেন জার্মানেরা বই দেখিয়া তাহার বিচার করে না; তাহারা বই ভাল হইবার যে কতকগুলি বিধিবদ্ধ সিদ্ধান্ত (theory) আছে তাহার সহিত মিলাইয়া তবে বিচার করে। তাহারা বলে না—'এই বইখানি ভাল কিম্বা ভাল নয়' তাহারা মনে মনে বিচার করে—'যে যে গুণ থাকিলে একটি বইকে ভাল বলা যায় তাহার প্রত্যেকটি এই বইয়ে আছে কি না?' সুতরাং তাঁহার 'অলিম্পিয়ার বসন্ত' কাব্যখানিকে না পড়িয়া এই অনুমানে (a priori) নিন্দা করা হয় যে (১) বর্ত্তমান যুগে মহাকাব্য রচনা সম্ভব নহে, (২) স্পিটলার যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন বর্ত্তমান যুগে তাহা বরখাস্ত করা হইয়াছে। বিধিবদ্ধ সিদ্ধান্ত ও হাল ফ্যাসনের মত প্রতিভারও যে একটা নিজস্ব দাবী আছে একথা ইহাদের মনেই উদিত হয় না।

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে জার্মানী নিষ্ঠুর ভাবে স্পিটলারকে পরিত্যাগ করে। তিনি ইহাতে বিরক্তি-সূচক অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিয়াছিলেন যে জার্মানেরা দাসজাতি এবং চিন্তার স্বাধীনতা হারাইয়াছে। "স্বাধীন মানুষ ও স্বাধীন জাতিকে বুঝিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে," (সম্ভবতঃ স্পিটলার স্বাধীন মানুষ ও স্বাধীন জাতির স্বাধীনতাকে একটু অতিরঞ্জিত করিয়াছেন!) সাহিত্যে ও শিল্পকলায় সুইসজাতির শ্রেষ্ঠতা ও জার্মানীর সর্ব্বসাধারণ হইতে সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি মহাপ্রাণ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়া বলিয়া বেড়াইতেন। স্পিটলারের দৃঢ় ধারণা ছিল যে সুইস-ভূমিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহারা মুক্তির সফলতা ও আনন্দের অধিকারী; সেখানকার লোকেরা স্বাধীন; সেখানে কৌলিন্যপর্য্যায় (hierarchy) নাই—বিদ্বজ্জন-সঙ্ঘ (Academies) নাই;—অসামরিক, সামরিক, সরকারী বা—সাংসারিক কোন শ্রেণীবিভাগ নাই। কোন বিখ্যাত শিল্পীকে পূজার বেদীতে এখানে বসান হয় না; তিনি সর্ব্বসাধারণের সহিত সমানভাবে চলিতে ফিরিতে পারেন। এইভাবে এই মহাশিল্পী, অন্তরে অন্তরে আভিজাত্যগর্ব্বী এই স্বাধীন আত্মা আপনার স্বজাতিতে গণতান্ত্রিক সাম্যভাবের (democratic equality) প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়াছেন এবং এই সাম্যভাবের দ্বারাই তিনি তাঁহার দেশস্থ জনসাধারণের সহিত প্রগাঢ় বন্ধনে আবদ্ধ; অথচ সেই জনসাধারণ তাঁহার কোন গ্রন্থই পাঠ করে নাই।

•

আমাদের পরিচয়ের প্রারম্ভে বেটোফেন্ (Beethoven) সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি যেন আমাদের উভয়েরই বন্ধু। যৌবনে আমরা উভয়েই 'দীন যথা যাকে রাজ সদনে' (duca e maestro) তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতাম। তিনিই আমাদের উদ্বোধ্য গুরু ছিলেন। সতের বৎসর বয়সে স্পিটলার যখন লেখক হইবার অভিলাষী হন, তিনি শপথ করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ বেটোফেনের প্রথম রচনার মত সুন্দর কিছু না লিখিতে পারিলে তিনি লেখা ছাপাইবেন না।

সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার সময় আবেগে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম;—"কিন্তু আশ্চর্য্য—আমার মনে হয়, সঙ্গীত অপেক্ষা চিত্রকলায় আপনি অধিক উৎসাহী।"

তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল মুখ সহসা বিষাদাচ্ছন্ন হইল। তিনি বলিলেন, "চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে আমি কথা বলি না—কথা বলিতেও চাহি না—কারণ তাহাতে আমার হৃদয়ের একটি পুরাতন ক্ষতের মুখ খুলিয়া যায়; সম্প্রতি সে ক্ষত আরাম হইয়াছে বটে, কিন্তু অতি অল্প আঘাতেই তাহা যন্ত্রণায় অধীর করে। সেইজন্ত আমি ভরসা করিয়া কোন ছবি দেখি না। ছবি দেখিলেই আমার চিত্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে ভালবাসি এবং সঙ্গীতরসে নিমগ্ন হইয়া যাই।"

স্পিটলারের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার পিতা চিত্রকরের জীবনাদর্শ হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। আমি বলিলাম, আমাকেও ঠিক ওই বয়সে আমার পিতা সঙ্গীতকলার অনুশীলনে নিরস্ত করেন। স্পিটলারের মুখ আবার সমবেদনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং আমাদের মিলনের যেন আর একটি বন্ধন বাড়িয়া গেল।

চিত্রকলার প্রতি তাঁহার এই অনুরাগ-অনুভূতি তাঁহার কাব্যে স্বভাবতঃই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছু লিখিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মনের মধ্যে স্থান, দৃশ্য, পারিপার্শ্বিক বেষ্টনী সমস্তই নিখুঁতভাবে কল্পনা করিয়া লইতেন। তিনি বলিতেন,—"আমি সমস্তটা একসঙ্গে দেখিতে চাই।"

তাঁহার 'প্যাণ্ডোরা'র অপূর্ব্ব কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম, যে, উহা পাঠে বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃতিদেবী যেন নিজহস্তে তাঁহাকে (স্পিটলারকে) চালনা করিয়াছেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে তিনি যেন এক হইয়া গিয়াছেন।

স্পিটলার একটু যেন আহত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু উহা আমার অগোচরে ঘটিয়াছে; প্রকৃতি আমার লক্ষ্যের (objective) মধ্যে ছিল না। আমার ব্যগ্র দৃষ্টি ছিল সেই 'দূরে বিপুল সুদূরের' পানে—সেই দেবতা, সেই প্রতীকসমষ্টি (symbols)—সাধারণে যাহাকে অধ্যাত্মতত্ত্ব (metaphysics) বলে, তাহা তন্ময় হইয়া দেখিয়াছি; চক্ষুর অগ্রভাগ হইতে দেবলোক পর্য্যন্ত বিরাট শূন্যে কত ভাব মক্ষিকাসমূহ উড়িয়া বেড়াইতেছে; আমি তাহাদের অনুধাবন করি; এবং মধ্যপথে তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলি।"

তিনি পুনরায় বলিলেন, "আমি বরাবরই ভাবিতাম ও বিশ্বাস করিতাম যে, বাস্তববাদীরা (realists) যে ভাববাদীদের (idealists) অপেক্ষা বাস্তবকে বেশী পরিষ্কার দেখিতে পায় এই ধারণা সত্য নহে। ভাববাদীরাই পরিষ্কার দেখে। এ সম্বন্ধে এই উপমাটি আমার মনে হয়—একটি মুসজ্জিত গৃহ এবং একটি শূন্য গৃহ; অথচ বাড়ীর বাহিরে যাহা-কিছু ঘটে, দুটি ঘরেরই জানালা হইতে সমান স্পষ্ট দেখা যায়।"

কিন্তু যাহা অন্তরের অন্তস্তলের ব্যাপার—আমার অন্তস্পর্শ গহ্বরের তলদেশ অবধি তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন, তবু সত্তা হারান নাই। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই শুধু লিখিয়াছেন; তাহার কিছু অর্থ দিবার চেষ্টা করেন নাই। আমি অত্যন্ত সাবধানে তাঁহার এইরূপ কতকগুলি কল্পনা-অনুভূতির অর্থ জানিতে চাহিয়াছিলাম। গ্যয়টের মতন তিনি উত্তর করিলেন —"হায় আমি যদি উহার অর্থ জানিতাম!" আমি একবার বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের অর্থ বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে। স্পিটলার শব্দ (word) মানে ভাব (thought) মনে করিয়া বলিলেন, "আমার কাছেও বহু জিনিষ অবোধ্য।"

ফাউষ্ট যাহাকে 'ভূৎ-শক্তি' (Earth-spirit) বলিত, সেই শক্তি যখন প্রতিভাবান্ পুরুষ আত্মসাৎ করে তাঁহার উদ্বোধিনী-শক্তি তাঁহার বিচারশক্তিকে অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু ফাউষ্টের মত স্পিটলার তাঁহারই আহূত শক্তির সম্মুখে মুহ্যমান হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার গৃহ হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত তিনি যখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাকে কষ্ট করিয়া আসিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি নিরস্ত হইলেন না। বৃহৎ সেতুর উপর উঠিবার মুখে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি রৌদ্রকে ভয় করেন কি না; তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আমি কিছুতেই ভীত নহি।"

সত্য সত্যই এই বীরপ্রাণ সুইজারল্যাণ্ডের স্বভাব-কবি ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না।

তিনি বলিতেন, "জীবনের সকল রোগে একটিমাত্র প্রতিষেধক আমি ব্যবহার করি; সেটি সাহস—কোন কিছুতেই বিচলিত না হওয়া।"

তিনি হাস্যমুখেই তাঁহার অদৃষ্টকে উপহাস করিতেন। চরম প্রলয়ের সহিত মুখামুখি হইয়া যখন সকল সত্তা লোপ পাইতে বসিয়াছে (annihilation) তখনও যেন তাঁহার আত্মা তাঁহার নন্দন বাগানে একটি পুষ্পিত শাখা রোপণ করিয়া যাইবে এবং সেই জীবনবৃক্ষে অনির্ব্বাণ হাস্যের একটি অমর পারিজাত বিকশিত হইয়া উঠিবে।

"সেই রক্তমাত্ত অঙ্কুর—তাঁহার আত্মা; 'হাসি' আসিয়া কানে কানে তাহার অনুরাগ আনন্দ-বারতা কহিয়া যাইবে···জীবনের উজ্জ্বলতা মুহূর্ত্তের জন্তও বিনষ্ট হইবে না, অদৃষ্টে নিয়তি যে দুঃখতার বহন করিয়া আনিবে; তাহাতেও সে হাসির দীপশিখা নিভিবে না।"

স্পিটলারের সপ্ততিতম জন্ম উপলক্ষ্যে লুসার্নে যে বিখ্যাত সম্বর্দ্ধনা উৎসব হয়, তাহার কিছুকাল পরে গ্রীষ্মের শেষাশেষি তাঁহার সহিত আমার আবার দেখা হয়, এবার তাঁহাকে শীর্ণ ও ক্লান্ত মনে হইল। সহসা আবির্ভূত ভক্তবৃন্দের বিরুদ্ধে তিনি অনেক কথাই বলিলেন। তাহারা নাকি এক মুহূর্ত তাঁহাকে নিশ্চিন্তভাবে কাজ করিবার অবসর দিতেছে না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আমার ভক্তদের হাত হইতে কি উপায়ে রক্ষা পাই। আমি বলিলাম যে আমি কোনরকমে জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া একটু সুবিধা করিয়া লইয়াছি। তিনি ইহাতে প্রাণ খুলিয়া হাসিলেন ও আমাকে হিংসা করিতে লাগিলেন। তিনি লামার্তীনের (Lamartine) মত পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া ভুল করিয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন কোন শিল্পীই যেন এ ভুল না করে। তবে জেনেভাবাসীর সহানুভূতি তাঁহার কল্যাণই করিয়াছিল, এবং সেই প্রশংসাবাদের স্মৃতি তাঁহার মনসপটে উজ্জ্বল ছিল। তিনি গোপনে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া জীবনকে পুরাপুরি উপভোগ করার বাসনা তাঁহার আছে; তিনি দেখিয়াছেন যে, জীবন তাঁহার কাছে মাধুর্য্যে কল্যাণে পূর্ণ। তাঁহার জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখে অতিবাহিত হয় নাই। আমি তাঁহার 'প্রমিথিয়ুসের' উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে কবির ব্যক্তিগত এক দারুণ বিয়োগ-ব্যথা তাঁহার ওই প্রথম কাব্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে. কিন্তু তাঁহার মধুময় পরিণত বয়সের ফল, 'অলিম্পিয়ার বসন্তে' শরতের শস্যসমারোহ দেখিতে পাই—কেবল আলোক···

স্পিটলার ব্যথিত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিলেন, —"যৌবন সুখের নহে। লোকে বলে যৌবনকাল আনন্দময়—কিন্তু ইহা সত্য নহে। আমাদের দেশের এই নৈতিক পক্ষাঘাতের যুগে অন্ততঃ পুরুষের পক্ষে যৌবন অতীব ভয়াবহ।"

আমরা পরস্পর আমাদের অতীত জীবনের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুপাতে জীবন কি ক্ষণস্থায়ী! যেমনি লোকে জীবনকে বুঝিয়া জীবনকে ভালবাসিতে সুরু করে, অমনি তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়।

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের নিমন্ত্রণকারী আমেরিকা যুক্তরাজ্যের পুরাতন রাজকীয় প্রতিনিধি মহামতি মিঃ এইচ. রেমুসেন্ হোয়াইটহাউস্ মহোদয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি ছোটখাটো সভায় আমাদিগকে লইয়া গেলেন। কিন্তু পলিটিক্সের মত সাহিত্যালোচনায়ও স্পিটলার বিরক্ত হইতেন। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া একটি ছোট ঘরে লইয়া গেলেন ও আমাদের প্রিয়-প্রসঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে শুনাইবার জন্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন ইতালিয়ান ও জার্মান্ সুর, মন্টেভার্দির রচনা (Monteverdi) এবং বেটোফেনের রিটারবালেট (Ritterballet) বাজাইলাম। আমরা নিরুকণ্ঠে গভীর প্রেমের আদান-প্রদান করিলাম এবং বিদায়কালে আমি তাঁহাকে চুম্বন করিলাম।

আমি ফিরিয়া আসিয়াই যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এবং সহসা আজ যাহা খুঁজিয়া পাইলাম তাহা এই—

"আমার বৃদ্ধ প্রিয় বন্ধুর কথা ভাবিতেছি, সেই শ্রান্ত মুখখানি—যাহার উপর মৃত্যু তাহার ছাপ বসাইয়াছে! আমি এত বিলম্বে তাঁহাকে চিনিলাম বলিয়া একসঙ্গে সুখে ও ব্যথায় পূর্ণ হইয়াছি। আমি তাঁহাতেই প্রথম জীবন্ত কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইলাম কিন্তু পরিচয় এত বিলম্বে ঘটিল কেন? আজ তাঁহার বয়স ৭১ ও আমার বয়স ৫০—একত্রে আর কটা দিনই বা চলিবে।

প্রতিভার অলৌকিকত্ব এই যে মৃত্যুতেও প্রতিভাবান পুরুষের জীবনের সমাপ্তি নহে। তাঁহারা আপনাদের জীবনেই অমরতার অমৃত আহরণ করেন। তাঁহাদের কাব্যকলায় তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক যুগের সার সংগ্রহ করিয়া প্রয়োগ করেন;—তাঁহাদের আনন্দ—তাঁহাদের বেদনা, তাঁহাদের বেদনা-মধুর অনুভূতি, তাঁহাদের পুলক-বেদনা (sophrosuny) সমস্তই পরিশোধিত হইয়া তাঁহাদের কাব্যে প্রকাশ পায়। তাঁহারা অনন্তকাল জীবিত থাকেন।

স্পিটলারের সহিত প্রথম পরিচয়ের পর হইতে আমি মানস-সৌন্দর্য্য-লোকে তাঁহার সহযাত্রী হইয়া দূরে ও নিকটে পরিভ্রমণ করিয়াছি। তাঁহার নিত্যপ্রবহমান কাব্যধারা হইতে উৎসারিত সঙ্গীতে আমার সমস্ত মনন-উপত্যকা মুখরিত থাকিত। যখনই আমার চিন্তা ও কর্ম্মের ধারা স্তব্ধ হইয়াছে আমি তাঁহার কলসঙ্গীত শুনিতে পাইয়াছি। বিশেষত পরিচয়ের প্রারম্ভে যখন তাঁহার সকলই আমার নিকট নূতন বলিয়া ঠেকিত, তখন তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়াছি। ১৯১৫ সালে এমন একটি

দিনও ছিল না যখন আমি স্পিটলার-গহনে নূতন কিছু সন্ধানের জন্য অভিযান করি নাই।

প্রথমেই আমি 'প্রমিথিয়ুস ও এপিমিথিয়ুস' পড়িয়া এই কাব্যের উদার অমার্জিত সৌন্দর্য্য (ruggedness) ও মহান্ বিশৃঙ্খলতা (chaotic aspect) দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বহু বৃক্ষের মূলদেশ হইতে জীবনী রসধারা যেমন প্রচণ্ড গতিতে ছড়াইয়া পড়িয়া বৃক্ষকে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত করে, তেমনি এই কাব্যটি কোথায়ও পুরাণ-কাহিনী অবদান ও রূপকোপাখ্যানে বিকশিত হইয়া সহজ ও পরিচিত সমারোহ লাভ করিয়াছে—কোথায়ও বা মধ্যযুগের কোন পাশ্চাত্য-শকচক্রের ভীষণ প্রতীকে শোভা পাইতেছে। সেই পল্লীগীত (pastoral) 'প্যাস্তোরা'র অপূর্ব্ব ঐকতানের (symphony) অতুলনীয় আনন্দে বিভোর হইয়াছি, আর মনে পড়িয়া গিয়াছে যুবক বেটোফেনের কথা। তিনি যেন 'নিপুণ অশ্বারোহীর অভিজ্ঞতা লইয়া জীবনের ভাব ও রূপের নিগড়কেও চূর্ণ করিয়া উদ্দামগতিতে অশ্বচালনা করিতেছেন; যেমন তাঁহার সর্ব্বশেষ সুর-সঙ্গীতগুলির (Quartettes) মধ্যে দেখিতে পাই।

এই বিপুল কাব্যনদীর স্রোতে গা ঢালিয়া আরও কিছুদূর ভাসিয়া চলিলাম—সহসা যেন কোন্ অজ্ঞাত মদীঘাত হই ও পাগল হইয়া 'শাশ্বত প্রেয়সী' (Eternal Beloved) স্যান্ডেলা (যাহার সহিত মিলনের কল্পনাও আমার এখন অসহ্য) যখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, রৌদ্র-মাখা পাহাড়ের সেই উপত্যকার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া তাহার উচ্ছ্বসিত পরিপূর্ণ আনন্দ প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার সবচেয়ে করুণ ব্যথিত অথচ সবচেয়ে প্রিয় সুর 'অবসাদের' গান গাহিয়া উঠিল।

বিপুলকায় বৃত্তাকারে সজ্জিত পর্ব্বতশ্রেণীর মহাদৃশ্য, দুইকূল পরিপ্লাবিনী শান্ত ও বিশাল তটিনী, দেব-নিকেতনে—'অলিম্পিয়ার বসন্ত' ধীরে ধীরে আমার নয়ন সম্মুখে একখানা চিত্রপটের মত উন্মোচিত হইতে লাগিল। এখন আর ইহা শুধু প্রমিথিয়ুসের হৃদয়বিদারক জীবন কাহিনী নহে, শুধু তাহার আশা ও আশ্বাস, বিস্ময় বা বর্ত্তমান ব্যথার কথা নহে; যাহা তাঁহার প্রথম জীবনের লেখায় বিশেষতঃ শুধু সেই তীব্র ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার অনুপম মৌলিকতায় পূর্ণও নহে। আমাদের সৌভাগ্যগুণে 'অলিম্পিয়ার বসন্তে' আমরা অদম্য ইচ্ছাশক্তি, জীবনজ্যোতির অপূর্ব্ব খেলা—এ্যাপোলো-বীর (Apollo the Hero—অলিম্পিয়ার বসন্তে একটি গানের নাম) প্রভৃতির পরিচয় পাই। কথা ও কল্পনার কি বিপুল পুষ্পসম্ভার! মহতীমূর্ত্তি সৃজনীশক্তির কি লীলা! সকলেই যেন নূতন, সদ্যবিকশিত স্বাস্থ্যবান্ এবং সবল! বসন্ত ধীরে ধীরে আপনার পটভূমিকা উন্মোচন করিল—পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিপূর্ণ বসন্ত বিকাশ এবং অনন্ত আকাশে নক্ষত্র পুষ্পরাজি। এ যেন আপনাতে আপনি বিকশিত এক নূতন পৃথিবী—উপকথা আর দেবতার রাজত্ব—এখানে আসিলে উন্মাদনায় বিভোর হইয়া যাইতে হয়।

আমি গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন গটফ্রীড কেলার (Gottfried Keller) যেমন জাতিহিসাবে সুইট্জারল্যাণ্ডকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন তেমনি কোন সুইস্ মহাকবি সুইট্জারল্যাণ্ডের বৃক্ষিকা-সুষমা, তথাকার দেবযান, পর্ব্বতশ্রেণী এবং হ্রদ ও নদীর বর্ণনা দ্বারা তাঁহার দেশের যথার্থ পরিচয় দিবেন। এই ত সেই কবি। স্পিটলারের মত সুইস্-প্রতিভা ব্যতীত আর কে এই বিরাট চিত্র আঁকিতে পারে—অধোলোক (Hades) হইতে স্বর্গলোকে নূতন দেবতাদের বিপুল অবরোহণ, মধ্যপথে বিপদসঙ্কুল পর্ব্বত-গাত্রের উপর প্রাচীন দেবতাদের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ—তুষার-প্রবাহে প্রাচীন দেবতাদের অধোগমন—সিংহ-অশ্বারূঢ় রাজা ক্রোনসের (Kronos) উপলখণ্ডবৎ গহ্বরের তলদেশে পতন! আমি নূতন দেবতাদের অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—বহুকষ্টে উপরে উঠিলাম—গোপবালা হিবি (Hebe) শত-শঙ্খনিনাদ করিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিল, শুনিলাম। সেই শিখরদেশের লঘু সমীরণে শান্ত হইলাম; এখানে সাধু-রাজা উরেনাসের (Uranus) সপ্তকন্যা—সাতটি অপূর্ব্ব মোহিনী সুন্দরী যেন সন্তরণ করিয়া ফিরিতেছে। এই মধুর বিশ্রামভূমি হইতে এক প্রশান্ত আবেগময় আনন্দের ধারা প্রবহমান—যে আনন্দ রসধারা আমি আর কোন কাব্য সাহিত্যে আস্বাদন করি নাই। ইহার সহিত কিসের তুলনা করিতে পারি, আরিয়োস্তো (Ariosto) এবং দান্তে, মোজার্ট (Mozart) এবং ভেরোনীজের (Veronese) কথা একই সঙ্গে মনে আসে। স্পিটলারের কলাশিল্পের ইন্দ্রজালে সব যেন ভাব ও রঙে রূপান্তরিত হইয়াছে। যে সাহিত্যিক উপকরণকে স্পিটলার 'জড় ও অকর্ম্মণ্য' বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার লেখনীর ইন্দ্রজালস্পর্শে চিত্রে ও সুরে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এমনি সে মোহিনী-শক্তি যে সে সপ্তসুন্দরীদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকে সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায় না। বিচ্ছেদের মধুর বেদনায় সেই 'হারানো প্রেয়সী'র পিছনে সে হাহাকার করিয়া ফেরে।

ছন্দ একি! নূতন মায়াজাল যে আবার আচ্ছন্ন করিয়া দিল! আমার ও তাবের চির রাজ্যে এ যে বিচরণ করিতেছি;—একই সপ্তবিশ্বের এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে চলিয়া আসিয়াছি; সেই রূপহীন অসীম আনন্দ নীহারিকা যাহাকে রূপ দিবার জন্য চিন্তা করিতে হয় না—বেদনার অতলস্পর্শ গহ্বর—আনাকে (Ananke) কর্তৃক রূপবিদ্ধ জীবনের প্রহেলিকা—এ সমস্তই দেখিতে পাইতেছি। আমার বিশ্বাস, গ্যয়টে এ সমস্ত যন্ত্রণার আভাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু ভয়ে শিহরিয়া সেদিক হইতে পিছু হটিয়াছিলেন কিন্তু নিঃশঙ্কতর স্পিটলার ফাউস্টের ঐ মাতাগণের (Mothers) মাঝেমাঝে শিহরিয়া পিছাইয়া পড়েন নাই। তিনি গহ্বরের অসীম অতল পর্যন্ত—চরম শূন্যতার (annihilation) শেষ অবধি চলিয়া গিয়াছেন, এবং নরক প্রত্যাগত দান্তের মুখে বেদনার যে সুস্পষ্ট বলিরেখা দেখি তাহার একটিও তাঁহার ললাটে দৃষ্ট হয় না। স্পিটলার সম্রাট হইয়া ফিরিয়াছেন; অন্তরতম প্রদেশেরও প্রভু হইয়া তাহার চাবি হাতে রাখিয়াছেন এবং তাঁহার উরেনাস যেমন, যে অন্ধ জীবনী রসধারা শোষণ করিবার জন্য অদম্য চেষ্টা করিতেছে, সেই মূর্খ দানবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার আলোক ও বৈভব চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন, তেমনি নিরন্তর গোপনে রজনীর অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন। সুরসঙ্গতির (Symphony) স্বর-বৈচিত্র্য (Variation) যেমন অপূর্ব চক্রাকারে (Cycle) ফিরিয়া ফিরিয়া আসে; এই কবিতাটিও তেমনি ধীরে ধীরে আপনাকে প্রসারিত করে। এই তুলনাটি করিতে গিয়া আমার আবার বেটোফেনের অলৌকিক উদ্বোধিনী প্রতিভার কথা মনে পড়িল—একই সুর ও একই যন্ত্র হইতে চিন্তার সমস্ত রেখা ও সুস্পষ্ট রূপ তিনি কেমন করিয়া টানিয়া বাহির করিতেন, অনুপম সঙ্গীত-মাধুর্যের দ্বারা সকল প্রকার ভাব-ব্যঞ্জনা করিতেন। আমি মনে করি 'অলিম্পিয়ার বসন্তে' 'পবিত্র সময়ে'র (The Holy Time) বারোটি অপূর্ব ভাববিন্যাসেও স্পিটলার সেই চরম শক্তির খেলা দেখাইয়াছেন। ইহা যেন দেবতা-যুগের—আনন্দ-পরিপূর্ণতার চরম (apogee)। ইহা উপলব্ধি করিয়া স্পিটলার বারোটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন; প্রত্যেকটি এক-একটি দেবতার মহিমা-সঙ্গীত। তারপর সেই ব্যথিত মূর্ছনা—সেই 'আনাকের নিরোধ!' (Ananke's Halt) যাহা শিও "আনন্দে"র সঙ্গীতের অকালে কণ্ঠরোধ করিয়া দেয়। এই সুর-সঙ্গীতের মধ্যে ভয়, মৃত্যু, হেরার (Hera) যন্ত্রণা-মুক্তির সঙ্গীত প্রভৃতি অবতারণা করিয়া কবি প্রকৃত শিল্পকলা-কৌশল দেখাইয়াছেন। ঐ সমস্ত ভয় ও যন্ত্রণা মুক্ত করিয়া হেরাক্লেসের স্বর্গ হইতে অবতরণ ও তাহার কঠোর কর্তব্যাভিমুখে পরিক্রমণের অভিযান—সেখানে ক্রুশ যন্ত্রণা তাহাকে পাইতেই হইবে, কিন্তু তবু সে পাতালে ও প্রণাধির সঙ্গে আত্মাকে বলিদান দিবে—এই সমস্ত মিলিয়া সঙ্গীতের একটি অনন্ত সমুদ্র সৃষ্ট হইয়াছে। —এ সমুদ্রের শেষ দেখা যায় না। আমার কাবাখানি খুলিয়া পড়িতে বসিলাম; ইহাকে ছাড়িয়া দিবার শক্তি যেন আমার নাই। এই রসসমুদ্রে যেন দুপদুপ নিমগ্ন হইয়া থাকিতে চাই। তীরে প্রত্যাবর্তন করিবার প্রয়োজন কি? হাসি ও কান্নার বিপদসঙ্কুল গহন-সমাকীর্ণ অনন্ত-সংসারের অন্ধকার ও তরঙ্গশিরোধী চাঁদোজ্জ্বল রৌদ্র-কিরণলেখা এই দুই মিলিয়া সম্পূর্ণ জীবনের ধারা ত এখানেই বিদ্যমান!

অলিম্পিয়ার রৌদ্রময়ী সুরসঙ্গত অনুধাবনের বহু বৎসর পরে এই সেদিন মাত্র তাঁহার তৃতীয় মহাকাব্য 'দৈর্ঘ্যের অবতার প্রমিথিয়ুস' (Prometheus der Dulder) খানি পাঠ করিলাম। এই কাব্যখানি ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্পিটলারের মৃত্যুর মাত্র ১৫ দিন পূর্বে প্রকাশিত হয়। সেই প্রাচীন নায়কেরা যেন অলঙ্কার-বাহুল্য, যথাতিশয্য ও যৌবনের অধীর পক্ষ-বিধূনন পরিত্যাগ করিয়া আরও সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। এই কাব্য অনেক পরিণত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, classic গুণে ইহা পরিপূর্ণ; বাহিরের অযথা বাহুল্য বর্জন করিয়া অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে লইয়া সংহত ভাবে জমাট বাঁধিয়াছে। পরিণত বয়সের ধীর রেখাঙ্কন, সংযমের কারুকার্য্যে ও জীবনের বেদনাসিক্ত মহান অভিজ্ঞতার গৌরবে ভরপুর! প্রথম জীবনের প্রমিথিয়ুসের সহিত তুলনায় মনীষার কি উচ্চতা! কবির কি অপূর্ব ভাবসন্ন্যাস (detachment)! যন্ত্রণা যেমন অসীম, যন্ত্রণাশেষে শান্তিও তেমনি সীমাশূন্য। ইহার শেষ গান (chant) 'বিজয়ী' (The Conqueror) মত গভীর ও প্রশান্ত কোন কিছুর কথাই আমি জানি না। এই অংশটুকুই স্পিটলারের লেখনীর চরম জয়পত্র! তাঁহার প্রথম—'প্রমিথিয়ুস' লেখার পর বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে এবং 'বিজয়ী' 'ধনঞ্জয়' আবার লাভ করিয়াছে। মানুষ এই অবস্থায় উপনীত হইয়া চরম

বিজয় ও পরিপূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। আছে শুধু নির্ভর, আশাহীন—ভ্রান্তিহীন প্রীতি।

সেই বিরাট আত্মনাট্যের উদার পরিকল্পনা এই :—একক আত্মা, হস্তান্তর করিয়া নহে, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্বীয় নির্ভীকভাবে ভগবানের আত্মদাবর্গের (Angel of God) সম্মুখে মাথা খাড়া করিয়াছিল এবং ভগবানের দূত তাহাকে বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে বলাতে নিজ বিবেকদ্বারাই তাহাকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। এই গর্ব্বিত বিদ্রোহীকে উপলক্ষ্য করিয়া সদা-প্রভুর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অন্ধকার নির্জ্জন নির্বাসনে বহু বৎসর তাহাকে নির্য্যাতিত করা হয়, এবং এই সহগুণের অবতার এই নির্ব্বাক জবের (Job) মস্তকে সেই নির্য্যাতনের ধূলি ও কালিমা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। তারপর যখন দেবশত্রুরা দেবপুরী আক্রমণ করিল—মানুষ তাহা রক্ষা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল—তাহাদের দুর্ব্বল বিবেক—শতজায় হইয়া তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিল; সেই বিপৎকালে এই নির্য্যাতিত, অভিশপ্ত, নিঃসঙ্গ 'প্রমিথিয়ুসই' ভগবানের সন্তানদের রক্ষা করিল; সে সমরাভিলাষী ছিল বলিয়া নহে, পুরস্কারের আশায় নহে, এমন কি তাদের প্রতিষ্ঠা-কল্পেও নহে—শুধু তাহার 'আত্মা' তাহাকে প্রণোদিত করিয়াছে! অথচ সেই প্রেয়সী আত্মার মোহবন্ধনও এখন আর তার নাই। দ্বিতীয় 'প্রমিথিয়ুসে' এই আত্মাকে সে যদিও আগের মতই ভালবাসে, কিন্তু এ ভালবাসায় মোহ নাই—এ যেন সমানে-সমানে ভালবাসা; এখন সে জানে এবং বলিতে পারে তাহার প্রেয়সী আত্মার প্রণয়ের কি মূল্যই না দিতে হইয়াছে। অথচ এই আত্মা যন্ত্রণার সময় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ইহার জন্য সে বিসর্জ্জন দিয়াছে; সে ইহার সকলই লইয়া পরিবর্ত্তে কিছুই দেয় নাই এবং যখন জয়ের (জয় এখন আর তাহাকে আনন্দ দেয় না) সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখনও বন্ধু এমন কি বিশ্বস্ত ভৃত্য যে সে, তাহাকেও মৃত্যুর সম্মুখেও পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কোন অনুযোগ করিবে না। সে এখনও ভালবাসে সেই নিষ্ঠুর প্রিয়া এই আত্মাকে; এবং উহার জন্য প্রয়োজন হইলে আবার ঐ বেদন-নাট্যের অভিনয় করিতে সে রাজি আছে। অসীম নির্লিপ্ততা! বীর্য্যদীপ্ত প্রেম এবং জয়ের আত্মগরিমা—ভাবিতেও মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়।

কিন্তু এমন আনন্দময় সোমরস কয়জনে পান করিতে পারে? শক্তিশালী পুরুষের সংখ্যা অধিক নহে; ইহা প্রায় জানাই যে এত বড় কাব্য সাধারণের অপরিচিত ও অপঠিত থাকিবে। তাহাদের এই ঔদাসীন্য ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া থাকে শুধু এ হেন রসসৃষ্টিকে উপহাস করিবার জন্য! এই পূত অগ্নিবর্ষণে তাহাদের সামান্য আশা, আকাঙ্ক্ষা ভস্মীভূত হয় এবং যদ্দ্বারা এই ভস্মীভূত আশা নবগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেই আত্মা—সেই আত্মাবিশ্বাসময় সাধারণ মানুষের দুর্ব্বল হৃদয়ের পক্ষে অতিরিক্ত আলোময়।

*

আমি স্পিটলারকে আল্‌প্‌সের ম্যাটারহর্ণ (Matter horn) শিখরের মত দুর্গম একটি বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতরূপে দেখিতেছি। পাদমূল হইতে শিখর পর্য্যন্ত আগাগোড়া একটি পর্ব্বত। সেখানে আমরা প্রত্যেকে কিছু না কিছু করিবার অবকাশ পাই—গুল্ম লতা কর্ত্তন করা, পুষ্প সংগ্রহ করা, ফল সঞ্চয় করা। তৃষ্ণার সময় তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য প্রস্রবণও সেখানে রহিয়াছে, শান্তি ও স্বপ্নরচনা করিবার ছায়া-সুশীতল স্থানও আছে। ইহার প্রাচুর্য্য, ইহার জলবায়ু ও দৃশ্যপটের বৈচিত্র্যকে ধন্যবাদ! পথিক এই বিপুল দৃশ্যভূমির অর্দ্ধেক বা আংশিক অংশ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে পারে; কিম্বা একেবারেই কিছু বুঝিতে না পারে, শুধু ভালবাসিলেই যথেষ্ট! এই কলাশিল্পের একটিমাত্র অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খবর্ণনাকে, এই চিন্তাসমূহের একটিমাত্র লহরীকেও যদি কেহ ভালবাসিতে পারে তাহা হইলে সামান্য জনসাধারণের স্মৃতিতেও এই মহা-কবি জীবিত থাকিবেন।

কিন্তু এই বিপুল পর্ব্বতের তলদেশে নির্ঝরিণী ধারা যেমন উপত্যকার জনসাধারণকে সঞ্জীবিত করিতেছে—অন্য দিকে তেমনি তুষারধবল শিখরমালা নিঃসীম নীল গগনে মাথা তুলিয়া আছে—শ্বেত-কৃষ্ণ দেওদারশ্রেণী যেন চন্দ্রাতপের মত শোভা পাইতেছে—তুহিন শীতল আকাশে শুধু অনন্ত নক্ষত্রের স্পন্দন! পাদপরাজি প্রাণোন্মেষিণী বর্ত্তিকার নিঃশ্বাসে আনমিত হইয়াছে—তন্দ্রাদির মর্ম্মর রব উঠিয়াছে; প্রমিথিয়ুস যন্ত্রণায় কাতর—তাঁহার রক্তে তাণ্ডবের লীলা সুরু হইয়াছে—সে মৃত্যুহীন সৌন্দর্য্যরূপিনী দেবী-আত্মার আগমনী অনুভব করিতেছে—তাহার অরুণ নয়নসম্পাতে মোহ! প্রমিথিয়ুস পলাইতে চাহে, কিন্তু নড়িবার শক্তি তাহার নাই—সে যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সে! ব্যাঘ্রীর মত মোহন-জ্বালা কম্পিত দুটি অগ্নিশিখার মত তাহারই উপর ফেলিয়াছে! প্রেয়সী সম্মুখে! ওষ্ঠে তাহার অদ্ভুত হাসি, সে তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিল—প্রেয়সী তাহাকেই তাহার বন্দিরূপে বরণ করিয়াছে!

[প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩০২]

শতবর্ষের আলোকে রোমাঁ রোলাঁ

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

জলধারা নানা গতিতে প্রবাহিত হ'তে হ'তে কখনও নদীতে পরিণত হয় এবং নদী ক্রমে সমুদ্রে মিশে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণিকার মধ্যে আমরা হয়ত সমুদ্রের স্বাদ উপলব্ধি করি না, কিন্তু সীমাহীন পরিবেশে এই অসংখ্য জলকণিকাই যখন বিরাট কোন সমুদ্র রচনা করে, তখন সেই অকূল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশির মধ্যে যে অপরিসীম জীবনী-শক্তি লক্ষ্য করি—তার মূল প্রাণাধার যে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণিকাসমষ্টিই, এ কথা তখন আর অস্পষ্ট থাকে না। ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তে এবং অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় পরিণতিলাভ—সৃষ্টির মূলগত আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে এই। জলাশয়কে তাই সমুদ্র হ'তে হয়, আচ্ছাদনকে তাই উন্মুক্ত হ'তে হয়, কুঁড়িকে ফুটে ফুটে তাই ফুলের পূর্ণতায় পরিণত হ'তে হয়। মানুষের জীবনেও এই একই ইতিহাস। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকেই তার গতি। নানা স্তর ভেদ ক'রে তবে তাকে এই পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছাতে হয়। পথে পথে নানা সংঘাত, নানা অভিজ্ঞতার কষ্ট, নানা বিরোধ, নানা সংশয়। এই সংঘাত, বিরোধ আর সংশয়ের কাঁটা-বেড়া পেরিয়ে জীবন-অভীপ্সা আর অভিজ্ঞতার ঝুলি কাঁধে যে পথিক শেষ-পারানির পারে গিয়ে সিদ্ধ হ'তে পারল, সে-ই মানবশ্রেষ্ঠ। তাকেই আমরা মহত্তম পুরুষ বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পৃথিবীর কোটি কোটি জন-ইতিহাসে এমন মানব ক'জন? নানা যুগের বহু সাধনায় কচিৎ কখনও হয়ত এমন এক একজন মহত্তম পুরুষের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হয়—যার জীবনের প্রারম্ভিক কালগুলির দিকে আমাদের হয়ত লক্ষ্যই ছিল না; সেই কালগুলি ছিল তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণিকার মতই, যখন সে সমুদ্র হ'য়ে উঠলো, আমরা লক্ষ্য ক'রলাম সেই সমুদ্রকেই। সে তখন আমাদের মনের এ-কূল ও-কূল দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের বহুকালের সংস্কারের আবর্জনা তার প্রবল বিক্ষেপে নিঃশেষে মুছে দিয়ে যায়, দূর ক'রে দিয়ে যায় আমাদের জড়তা আর মূঢ়তা। তার বাণীবিধৃত মন্ত্রের সাধন হয় আমাদের জীবনবেদ; তারই নির্দেশিত পথ হয় আমাদের একমাত্র পথ। কিন্তু সেই অক্লান্ত পথিকের জীবন-অভিজ্ঞতার রেণুতে রেণুতে কোন্ বীণার তার ঝঙ্কৃত হয়? তার ধ্বনি এসে আমাদের শ্রবণ স্পর্শ করে না, অথচ সেই হচ্ছে তার পরম জিজ্ঞাসা, জীবন-জিজ্ঞাসা। ঝঙ্কৃত বীণার তারে তারে এই জিজ্ঞাসার বাণী ধ্বনিত হ'তে হ'তে তার সমগ্র সত্তা জুড়ে যে অনিন্দ্য সিম্ফোনীর সৃষ্টি হয়, সেই সুরই হচ্ছে তার জীবনের মূলগত সুর। এই সুর-সাধনাই তার জীবন-সাধনা। অনন্ত সমুদ্রের কল-কল নাদের মধ্যেও এই সুর, মহত্তম মানব জীবনেও এই সুর। কিন্তু এই সুর কি শুধু ভৈরবী, শুধু কেদারা, শুধু বাগেশ্রী? তা হ'লে সা থেকে সা—এই অষ্টাঙ্গিক পর্দার প্রয়োজন ছিল কি? প্রয়োজন উদারা থেকে মুদারা এবং মুদারা থেকে ক্রমে তারায় উত্তরণে। সুর কোথাও স্থির নয়, অথচ সব সুর মিলিয়ে এক অদ্ভুত ঐকতান, এক অনির্বচনীয় সিম্ফোনী। মানুষের জীবনও তেমনি স্থির নয়, সে নানা ঘাটে ও নানা ঘটনায় পরিবর্তনশীল, অথচ সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে সে এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তা।

এ কথা মনে রেখে যদি আমরা রোমাঁ রোলাঁর মত পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষী-জীবনকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখার অবকাশ পাই, তবে হয়ত অনেক জটিলতা থেকে মুক্ত হ'য়ে আমাদের সিদ্ধান্ত কিছু নিখুঁত আকার নিতে পারে। কীর্তির দ্বারা যারা জীবনকে মহত্ত্ব দান ক'রে যায়, নানা অস্থির বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাদের জীবন গতিশীল হ'য়ে ওঠে; সেই গতির আবেগে তারা জগৎকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিটি মহত্তম জীবনের মধ্যেই আমরা এর পরিচয় পাই। রোমাঁ রোলাঁও এই পরিচয়েই বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের পরিপোষক, সঙ্গীত ও সাহিত্যের মরমী শিল্পী, যুগ ও জীবনের গভীর দ্রষ্টা, মানবতন্ত্রের রূপকার এবং এই কারণেই মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিশ্বশান্তির উদ্গাতা, শিক্ষাগুরু, জনদরদী ও শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তিনি এত অধিক গুণ ও কল্যাণবোধে ভূষিত ছিলেন—যার দৃষ্টান্ত আমরা সচরাচর খুঁজে পাই না। মনীষী

ব্যক্তিমাত্রেরই দু'টি জীবন-লক্ষণ স্পষ্ট, একটি জন্মকাল থেকে নিজেকে নানা ভাবে গ'ড়ে তুলবার মধ্য দিয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রলম্বিত, আর একটি এই জন্ম, কর্ম ও জীবন-দর্শনের স্বচ্ছ চিত্রের মধ্য দিয়ে কালান্তরের পথে সম্প্রসারিত। রোলাঁ সম্পর্কেও তাই। ফ্রান্সের পুরণো বারগাণ্ডীর নিভার অঞ্চলে ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী ক্লেমেসীতে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। প্যারী শহরে এসে ১৮৮২ সালে তিনি স্কুলে ভর্তি হন। ৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৯-৯১ রোমের 'ফ্রেঞ্চ স্কুলের' মেম্বার হন। ১৮৯৫ সালে সরবোন থেকে তিনি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। সঙ্গীতের উপর তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল 'সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাস'। ডক্টরেট হ'য়ে তিনি শিল্প ইতিহাসে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেই চার্লস পেগুইর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গ'ড়ে ওঠে। এখানে ১৯০০-৪ তিনি পেগুইর সহযোগে দুর্নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ন্যায়-বিচার ও মানবিক ধর্মের লড়াই সুরু করেন। ১৯০৩ সালে রোলাঁ সরবোনে সঙ্গীতের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তাঁর ট্রিলজি নাটক "লা থিয়েটার ডি লা রিভোলিউশন' ও বিটোফেনের উপর রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯০৪—১২ সালের মধ্যে রচিত হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'জাঁ ক্রিস্টফ' (দশ খণ্ড)। ১৯১৪তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করার মনস্থ ক'রে ফরাসী, জার্মান ও বেলজিয়ান চিন্তাবিদদের একত্রিত করার চেষ্টা করেন এবং এ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে নানা প্রবন্ধও লেখেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হন না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্পষ্ট মত ব্যক্ত করার ফলে ফ্রান্সে তিনি বিশেষ 'অপ্রিয়' হয়ে পড়েন। যুদ্ধবাদী দেশভক্তি স্পষ্টই তাঁর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু ১৯১৫ সালেই যাঁরা ফ্রান্সের দুর্নামকারী হয়ে রোলাঁকে নোবেল প্রাইজে ভূষিত করা হয়

'As a tribute to the lofty idealism of ..
writings, and to wide understanding of human nature springing from a profound sympathy which they reveal.'

রোলাঁ কিন্তু যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং বিশ্বের সমস্ত চিন্তাবিদদের বার বার অনুরোধ করলেন 'টু রাইজ এ্যাবভ দি ব্যাটল'। যুদ্ধ নয়, 'মানুষ মানুষ শক্তিমূরতি দেবখিতা তার মুখে', তাই যুদ্ধ নয়, মানুষের জন্য চাই স্থায়ী শান্তি। 'শান্তির দলিত বাণী' যতই 'ব্যর্থ পরিহাস' বলে মনে হোক্‌ না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষের জন্যে থাকবে শান্তির দলিল। 'টু লিভ ইন্ পীস উইথ কো-এগজিস্টেন্স' এইটেই ছিল সেদিন রোলাঁর সার্থক ভাষ্য। প্রথম মহাযুদ্ধকালেই যুযুৎসুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে তিনি আন্তর্জাতিক রেডক্রসে যোগদান করেন। যুদ্ধের পর রোলাঁ তাঁর সহজাত মানসিক প্রেরণাতেই রুশ-বিপ্লবকে সমর্থন করেন এবং ভারতকে অন্তর দিয়ে জানবার জন্য একান্ত আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন। ১৯১৯ সালে তিনি 'সোভিয়েট একাডেমি অব সায়ান্স'-এর মেম্বার হন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২১ সালে। ১৯৩৫ সালে Fascism-কে আক্রমণ করে পুনরায় তাঁর লেখনীকে তিনি বজ্রের মত তুলে ধরেন এবং ১৯৩৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি ব্রুসেলসে বিশ্বশান্তি সম্মেলন আহ্বান করেন। ভারতীয় মনীষীদের বাণী-সম্বলিত একটি ইস্তাহার পাঠানো হয় এই সম্মেলনে। এই ইস্তাহারে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রেমচন্দ ও জওহরলাল নেহরু। যে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই তিনি বিষোদ্গার বর্ষণ করে এসেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে; হিটলারের বিরুদ্ধে তিনি তখন মিত্রশক্তিরই পক্ষ সমর্থন করেন। ১৯৪৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এই মহান চিন্তানায়কের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার যথার্থই বলেছিলেন:

'He is one of the truly (good Europeans), a friend of the future, which will know how to appreciate him as one of the glories of French letters. May the time come soon when France will recognize him for what he is, and take once more the leadership in humanity and civilization. rather than in finance and militarism, as to day.'

শিল্পীর দ্বিতীয় জন্ম তার জীবন-দর্শনে। রোলাঁর ক্ষেত্রে এই জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছিল বুঝি খুব কম বয়স থেকেই। প্রথম থেকেই জন-মনের সান্নিধ্য তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করত। অপরিণত বুদ্ধির প্রথম বাল্য বয়সেই কি জানি কেমন ক'রে তাঁর মনের মধ্যে এই বোধ জেগে উঠেছিল: ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।' এই ভূমা অর্থে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি এবং অনন্তের মধ্যে মন ও মননের ব্যাপ্তি। স্কুল-জীবনেও তাই তিনি আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে একক ছিলেন না, ছিলেন সহপাঠীদের সঙ্গে ভাবে ও চিন্তায় একত্রিত হয়ে। অথবা বলতে হয়, তাঁর ভাবনাই তাকে

সহপাঠীদের উদ্বুদ্ধ করেছে· তাঁকে কেন্দ্র করে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে। রোলাঁর প্রেরণায় ধীরে ধীরে তারা একটি আদর্শবাদী গোষ্ঠী গ'ড়ে তোলে। এ সময়ে ফ্রান্সের অবস্থা এক শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র নিয়ে ইতিহাসখ্যাত 'ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন' সুরু হয়েছিল, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে এক-া তার পরাজয় ঘটল। ফলে দীর্ঘকাল ধরে চলল বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লব এবং অবশেষে ১৮৭০ সালে ফ্রান্সকে পরাজিত ক'রে জার্মানী তার সর্বাঙ্গদেহে এঁকে দিল কলঙ্কের চিহ্ন। যে ফ্রান্স ছিল একদা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র, যে ফ্রান্স ছিল শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও সৌন্দর্যতত্ত্বের মনোভূমি, সেখানে গড়ে উঠল নানা পাপাচার, নৈরাশ্যের অন্ধকারে আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলি ভোগ-লালসাকেই জীবনে বড় করে ভাবতে সুরু করল। মানুষের মন থেকে মুছে গেল মহত্ত্ব আর উচ্চাদর্শ, তার স্থান নিল ক্রমে শঠতা, হীনতা ও ক্লৈব্যতা। সাহিত্য, সঙ্গীতে আর দর্শনেও প্রতিবিম্বিত হ'ল এই সমাজরূপ। এই রূপ সেদিন যাঁর বাল্য ও কিশোর মনে সব চাইতে বেশী আঘাত করেছিল, তিনি এই রোলাঁ। কলেজ জীবন শেষ করে তাঁর আদর্শবাদী বন্ধুগোষ্ঠীকে নিয়ে প্রথমেই তিনি একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ ক'রলেন, নাম—'Cahiers de la Quinzaine' উদ্দেশ্য—মানুষকে উচ্চাদর্শ ও আশাবাদে জাগিয়ে তুলতে হবে, নতুন করে নব মানসিকতায় ও নতুন পদ্ধতিতে গ'ড়ে তুলতে হবে দেশকে। যে প্রাণ সঙ্গীতে জাগে, তাকে সঙ্গীতে বিদ্ধ করলে চলবে না, তাকে গ'ড়ে তুলতে হবে জীবনের সার্থক মূল্যবোধের বাণী শুনিয়ে। বিশ্বের আদর্শবাদী মহত্তম জীবনের উদাহরণগুলি ছাত্রাবস্থা থেকেই রোলাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করত। এবার থেকে শুধু নিজের জীবনের প্রয়োজনেই নয়, দেশ ও জাতির প্রয়োজনেও সেই মহৎ জীবনাবলীর বিস্তৃত চিত্র তিনি তুলে ধরলেন তাঁর পত্রিকায়, রচনা ক'রলেন 'বিটোফেন', 'মাইকেল আঞ্জেলো', 'টলস্টয়' এবং সর্বোপরি তাঁর মহৎ উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ'। তার পরই তিনি হাত দিলেন নাটকে। মানুষ যে পশু থেকে পশু হয়ে উঠতে পারে, উঠতে পারে ত্যাগে, বিশ্বাসে, প্রেমে ও পরার্থপরতায় মহৎ হ'য়ে, এই আবেদনই ছিল এসব নাটকের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু রচনা এত উচ্চ পর্যায়ের হ'ল যে, বুদ্ধিজীবীদের বাইরে জনসাধারণের মনে গিয়ে তা রেখাপাত করল না। অথচ মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীকে তিনি চান না, তিনি চান অগণিত শ্রমজীবী জনগণকেই, কারণ—

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রোমাঁ রোলাঁ।

"Nothing is possible without the organised energies of the working classes. Upon their shoulders, and upon their hands—intelligence and strength—their will to devote themselves, depend the life and fate of the world. And first, let these

millions of brests learn to cry with unanimous implacable decision. the 'No' that will break the order of death and hamstring the murderous powers."

রোলাঁ তাই শুরু করলেন 'People's Theatre' বা গণনাট্য আন্দোলন, এবং তার জন্য ফরাসী বিপ্লবকে বিষয়বস্তু ক'রে একে একে রচনা করলেন 'কোয়াটর্জ জুলাই', 'ডানটন', 'রোব্‌সপীয়ার' প্রভৃতি নাটক।

কিন্তু এ সময় থেকেই নিজের দেশকে অতিক্রম ক'রে মন তাঁর বিশ্বমুখী হয়ে উঠল। 'ন্যাশেনালিজম' রূপ নিল 'ইন্টারন্যাশেনালিজম'-এ। নিজের দেশের ও নিজের হৃদয়ের দুঃখ ও বেদনাকে তিনি তখন সর্বদেশের ও সর্বজনীন ক'রে নিয়েছেন। তাঁর চিন্তার যে সংগ্রাম, তার জন্য চাই বহু-বিস্তৃত ক্ষেত্র, সমগ্র বিশ্বক্ষেত্র না হ'লে এ সংগ্রাম সার্থক রূপ নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই রোলাঁ একদিকে যেমন ইউরোপের আত্মার অন্বেষণে মগ্ন হ'লেন, তেমনি নিজেকে পুরোপুরি ভাবে নিয়োগ ক'রলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলিয়ে এক মহা ভাবমণ্ডল গ'ড়ে তোলার কাজে। এ সময়ের প্রথম পদক্ষেপই তাঁর 'জাঁ ক্রিস্‌টফ'-এ। 'জাঁ ক্রিস্‌টফ' জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ এবং গ্রন্থের দ্বিতীয় নায়ক 'অলিভিয়ে' ফরাসী লেখক; তাদের দু'জনের মিলিত সৌহার্দ্যকে কেন্দ্র ক'রে লোভ, হিংসা, অনৈক্য, জাতিবিদ্বেষ ও ঘৃণ্য চক্রান্তকারী-দের বিরুদ্ধ সংগ্রামের সার্থকতম কাহিনী নিয়ে গ'ড়ে ওঠে বিংশ শতাব্দী এই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি। পরবর্তীকালে কথা-প্রসঙ্গে 'জাঁ ক্রিস্‌টফ' সম্পর্কে রোলাঁ নিজেই ব'লেছেন:

'Jean Christophe and olivier had indeed to fight away for themselves through the Political and Social marketplace, giving blow for blow. But, like their author in those days, they had but one desire to get out if it all and return to their own realms: Mein Reich ist in der duft........the realms of the air, the vision of art.'

'জাঁ ক্রিস্‌টফ' সম্পর্কে নিউ ইয়র্কের পত্র-পত্রিকায় সে সময়ে যে সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তার প্রথম কথাই ছিল 'The Life of a musical genius written with genius.' Luciam Price তাঁর এক ব্যক্তিগত পত্রে লেখেন:

'Jean Christophe came as a communist manifesto of idealism. It brought the glad evengel that this squalid capitalist materialism is no more than an ugly mirage, that men were never meant to live in such fogs, and that there is a higher, purer air which may be breathed for the effort of climbing the Holy Hill. Here in these pages was a world ideal yet real. And in them in very truth I did come to know genius, to feel its fiery breath on my cheek, and to know that when the voice of the spirit speaks, all is beyond and above the feeble accents of human praise...... No longer was it fiction. It was a reality that one set about patiently building into his own life and the life around him."

মানবতাবাদী ঐক্যের ভিত্তিতে 'জাঁ ক্রিস্‌টফ'কে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর জীবনবেদ। যা সেই অখণ্ড বা না হ'লে জীবন মিথ্যে হয়ে যায় এবং যে মানব সমাজকে কেন্দ্র ক'রে একটি দেশ বা বহু দেশের সমন্বয়ে এক বিরাট মানব-কেন্দ্র দেবভূমি হয়ে উঠতে পারত, সেই অখণ্ড বস্তুকে গভীর মূল্যবোধে তুলে ধ'রে রোলাঁ চাইলেন 'জাঁ ক্রিস্‌টফ'-এর মধ্য দিয়ে সেই অনির্বচনীয় সত্যকে প্রকাশ ক'রতে—চিরকাল যা আপনার মধ্যে আপনিই প্রকাশিত। সে সত্য কোন শাসন বা রাজাকে মানে না, আনুগত্য স্বীকার করে না কোন দণ্ড বা শক্তির কাছে। সে নিজের কাছেই নিজে অনির্বাণ শিখা। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক ইউরোপীয় বুর্জোয়া সভ্যতা 'জাঁ ক্রিস্‌টফ'-এর মহৎ আবেদনে সাড়া দিল না। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় সে তখন বিশ্বজিগীষার মত্ত হয়ে উঠেছে।

এ সময়ে রোলাঁর অশান্ত চিত্তে একে একে এসে প্রভাবিত ক'রে তুলল রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদী বিশ্বমানবিকতা, স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-পুরুষ এবং গান্ধীজীর সত্যময় অফুরন্ত জীবনী-শক্তি, অহিংসাবাদ ও সংগ্রামী মানসিকতা। এ সময় থেকে রোলাঁর জীবন নির্ভয় বস্তুবাদকে ভিত্তি ক'রে ক্রমেই যেন সত্যাশ্রিত অধ্যাত্মবাদে উত্তরণ হ'তে লাগল। এই অধ্যাত্মবাদ ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং বেদান্তভিত্তিক সাত্ত্বিকতা। অথচ ঈশ্বরকেও তিনি গ্রহণ ক'রেছেন। তাই ঈশ্বর-পুত্র যীশু বা রামকৃষ্ণও তাঁর ধ্যেয়। অন্তরে যে সত্য তিনি লাভ ক'রেছেন, তা কোন নব আরোপিত সত্য নয়, জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে সে সত্য তাঁর রক্তের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে আসছে। তাই প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কিংবা ইউরোপ বা এশিয়া ব'লে সেখানে মানবাত্মার কোন ভাগ নেই। সব দেশের সব মহান ব্যক্তির মধ্যে একই মহত্ত্ব জাগ্রত হয়ে আছে। সেই মহত্ত্বের পায়ে নিজের মহান পুরুষের প্রণাম পৌঁছে দিতেই তিনি রচনা ক'রলেন গ্যেটে, বিটোফেন, টলস্টয়, সেন্ট লুই, মাইকেল আঞ্জেলো

প্রভৃতির মত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন পূর্ণ আস্থা ও সহানুভূতি ছিল রোলাঁর, তেমনি শ্রদ্ধা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কিত তাঁর রচনার আবহ পরিবেশ জুড়েই এই সত্য স্পষ্ট ও পবিত্র হ'য়ে উঠেছে। 'রবীন্দ্রনাথ যেমন গানের রাজা, রোলাঁও ছিলেন তেমনি সঙ্গীত-সাধক। অন্ধকার পৃথিবীর অসহায় পরিবেশের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁকে শুনিয়েছিলেন—"ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো;" রোলাঁও তেমনি এই বিপরীতধর্মী পৃথিবীর বিরুদ্ধবাদী শক্তির দিকে ইঙ্গিত ক'রে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—

'Arise! Let us extricate the spirit from these compromises (by confliction), these humiliating alliances, this secret slavery! The spirit is the servant of none. It is we who are servants of the spirit. We have no other master, we are born to bear its torch, to defend it, to rally round it all those who have strayed. Our part, our duty is to maintain a fixed point, to point out the polar star, amidst the whirl of passions in the night. Amongst these passions of pride and mutual destruction, we shall choose none; we shall reject all. We serve truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste. Of course we shall not dissociate ourselves from the interests of Humanity! We shall work for it, but for it as a whole. We do not recognise nations. We recognise the people one and universal, the people who suffer, who struggle, who fall and rise again, and who ever march forward on the rough road, drenched with their sweat and their blood,—the peole compromising all men, all equally our brothers. And it is in order to make them like ourselves, aware of this fraternity, that we raise above their blind battles the Arch of Alliances, of the Free Spirit, one and mainfold, eternal.'

রোমাঁ রোলাঁ ও ম্যাক্সিম গোর্কী

এই সত্যনিষ্ঠ মন নিয়েই তিনি যেমন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মানস-সৌহার্দ্য স্থাপন ক'রেছেন, তেমনি যারা অবহেলিত, নিপীড়িত ও শ্রমজীবী—তাদের প্রতিও রোলাঁ অধিক মাত্রায় শ্রদ্ধাবান, স্নেহপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন; এবং এই মন নিয়েই তিনি একদা মানবদরদী লেনিন ও ম্যাক্সিম গোর্কির অন্তরঙ্গ হয়ে

উঠেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন যেন একই চিন্তা-ভাবনার ভাবুক এবং একই কর্মসাগরের কাণ্ডারী। গোর্কির বিখ্যাত 'মাদার' উপন্যাসে 'নিউন রাশিয়ান' যেমন বলেছে :

'We aught to build a bridge across the bog of this rotten life to a future of soulful goodness. That's our task, that's what we have to do,'

রোলাঁও তেমনি চেয়েছেন সমস্ত নৈরাশ্য ও পৈশাচিকতার ঊর্দ্ধে এক নবতর জগৎ প্রতিষ্ঠা ক'রতে—যে জগৎ হবে গানের মতই সুন্দর। বলেছেন :

'Ecoutons l'ensemble du concert ; L'heure presente n'en est qu'un accord de passage—apre, riche et cruel—qui bientot va se resondre dans La suite de La symphonie.'

অর্থাৎ 'এস, আমরা মহান রাগমালা শুনি। আজ আমাদের চারদিকে যে সুর প্রতিধ্বনিত, তা যতই কটু ও নিষ্ঠুর হোক, সাময়িক মাত্র; এর পরেই আমরা শুনতে পাব জীবনধর্মী এক সমৃদ্ধ ঐকতান। আজ আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু নিখুঁত ভাবে নিজেদের ভূমিকা নির্বাহ ক'রে চলা, সরল সুরে এবং পবিত্র ছন্দে।'

আর্টের ক্ষেত্রেও রোলাঁ ছিলেন লেনিনের ভাবলোকের সহচর। বুর্জোয়া উচ্চতলার মানুষকে নিয়ে যে শিল্পের জন্ম, তা হয় 'আর্ট ফর আর্টস সেইক', তার মধ্যে স্থান নেই অগণিত শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের। সেই আর্টই চরমোৎকর্ষ বলে বিবেচিত—যা এই অগণিত শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের দুঃখ ও বেদনার অনুভূতিতে রঞ্জিত। লেনিন তাই যখন বলেছেন :

'Art belongs to the people. It must have its deepest roots in the broad mass of the workers. It must be understood and loved by them. It must be rooted in and go with their feelings, thoughts and desires. It must arouse and develop the artist in them',

রোলাঁ বলেছেন :

'Art and Faith, pure thought and Nature are the shadow of a great wood, and the fountain, where the weary soul comes to rest and quench its thirst. But no one has the right to remain apart there. Life is where the suffering of men and their combat are, in the sun and the rainy storm.' (via Sacra).

বিশ্বমানবের জীবনযন্ত্রণাকে রোলাঁ তাঁর নিজের জীবনে গ্রহণ ক'রেছিলেন, গ্রহণ ক'রেছিলেন দুঃখবাদের মধ্যে ডুব হ'তে নয়, গ্রহণ করেছিলেন সেই দুঃখ-যন্ত্রণা ও হাহাকারের ঊর্দ্ধে মানুষকে সুন্দর ও মহান আত্মার প্রতীক হিসেবে দেখতে। আর তারই জন্য তাঁর সারা-জীবনের কাজ ছিল অফুরন্ত। কর্মের ও মননের এই অভিজ্ঞতা নিয়েই শেষ বয়সে তিনি রচনা ক'রেছিলেন

'Il nous faut immediatement courir a l'aide des opprimes—hommes et peuples—qui ne peuvent attendre. Nous ne reconnaissons pas le droit de distraire un seul instant de l'action presente..mon premier devoir de batelier est, sur ces flots, de sauver ceux qui s'y noiant, ou perir avec eux?

অর্থাৎ—'যারা অত্যাচারে ক্লিষ্ট—মানুষই হোক বা সমগ্র জাতিই হোক—তাদের সাহায্য ক'রতে আমাকে ছুটে চলতেই হবে, আমার পক্ষে অপেক্ষা করা চলে না। যেমন দুর্গতদের সাহায্যে বিরত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি নিশ্চেষ্ট ভাবে ব'সে থাকার কোন অধিকারই নেই আমার। আমি যে মাঝি, যে ভাবে পারি নৌকোর টাল সামলে আমাকে বাঁচাতেই হবে যাত্রীদের; যদি না পারি ত মরব, কিন্তু হাল ছাড়ব না কিছুতেই।'

ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেমন তাঁর কণ্ঠ ছিল সোচ্চার, তেমনি ছিল যুদ্ধ ও মনুষ্যত্বহীনতার বিরুদ্ধেও। এই সমগ্র বিরুদ্ধশক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে একা তিনি লড়াই ক'রে গেছেন। এ যেন হুইটম্যানের কাব্যের অবিকল প্রতিরূপ।

কর্মের ও মননের দ্বারা রোলাঁ অর্জন ক'রেছিলেন এই দেবত্ব। তাঁর মহান স্মৃতির উদ্দেশে আমার ভক্তিনম্র প্রণাম নিবেদন করি।

'O to struggle against great odds, to meet enemies undaunted!
To be entirely alone with them, to find how much one can stand!
To look strife, torture, prison, popular odium, face to face!
To mount the scaffold, to advance to the muzzles of guns with perfect nonchalance!
To be indeed a god!'

রম্যাঁ রোলাঁ ঃ নির্ভীক সত্যপথদ্রষ্টা

শ্রীচিররঞ্জন দাস

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রম্যাঁ রলাঁ। এমন একজন মনীষী যিনি নিরুদ্বেগ দ্বিধাহীন ভাবে যুগের সমস্ত সংস্কার-বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত চেতনার আলো জেলেছিলেন অকম্পিত হাতে, এমন এক সন্ধানী আত্মা যিনি যুগের ঘন অন্ধকারের মধ্যে স্পন্দিত মানবাত্মার সন্ধানে অবিচল ছিলেন ; মানুষের যন্ত্রণা, বিভ্রান্তি, সমসাময়িক সভ্য জগতের বিবেকের গতিহীনতার বিরুদ্ধে একক অথচ নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর দুর্ধর্ষ যুদ্ধের কলাকল বিশ শতকের তিনটি দশক ঘিরে আছে। মানুষের সংশয়, আশা-নিরাশার দোদুল্যমানতা, আঘাতে-প্রত্যাঘাতে জর্জরিত, পরাজয়ের গ্লানিতে আচ্ছন্ন খণ্ডিত জগতের কাছে জীবন জয়ের নতুন এক সংগ্রামী মন্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমৃত্যু সেই উজ্জীবিত মন্ত্র পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমান্ত ভেঙে, জাতি-বর্ণের কৌলিন্য বিচূর্ণ করে প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ; দেশ নয়, জাতি নয়, এক আন্তর্জাতিক জীবন-মণ্ডলীর মুক্তির লক্ষ্যে। রলাঁ তাই পাশ্চাত্যের জল, আলোকে মানুষ হয়েও প্রাচ্যের অধিবাসী। ফ্রান্সের অধিবাসী হয়েও পৃথিবীর নাগরিক।

সমস্ত জীবনটাই তাঁর সংগ্রামে মুখর। সংগ্রামের আশু ফল লাভের দিকে চেয়ে তিনি কর্মযজ্ঞে নামেন নি। তিনি জানতেন, সংগ্রামের ফল লাভ একদিন হবেই। এই অবিচল আত্মবিশ্বাসই সেই যুগে রলাঁর শ্রেষ্ঠতম পুঁজি। সত্যের কণ্ঠরোধ কোনদিন করা যায় না, কারচুপির অন্তরালে অবরুদ্ধ সত্য চিরকাল ভস্মে মৃত্যুগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে না। তৎকালীন ইউরোপের অসত্যের বিপুল প্রবাহে এই বজ্র প্রত্যয়ই তাঁকে কোটি কোটি মানুষ থেকে পৃথক অথচ মহান করেছিল।

রলাঁর জন্ম-লগ্নও সত্য-মিথ্যার আবর্তিত মহাসংঘর্ষের কালপ্রহার। ১৮৬৬ সাল, ফ্রান্সে জাগ্রত মানুষের সঙ্গে শোষক সমাজের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ক্রান্তিকাল। শোণিত সিক্ত ফ্রান্স। মধ্য ফ্রান্সের ক্লেমেসির এক আইনজীবী পরিবারে তিনি জন্মালেন ২৯শে জানুয়ারী। শৈশবের সমস্ত বছরগুলো পার হয়েছে বিক্ষুব্ধ ফরাসীবাসীর রক্তাপ্লুত অভিযানের মধ্যে। কৈশোর-যৌবনের দিনগুলো ভলতেয়ার-হুগোর আদর্শবাদ অন্তরে জোয়ার এনেছে। একদিকে বিক্ষুব্ধ মানব-সত্তার নিদারুণ অপমান, অন্যদিকে জোয়াল-বাঁধা সমাজ সংস্কার, যা মানুষকে নিশ্চল অন্ধ গুহার মধ্যে বন্দী করে রেখে সমস্ত জীবনী-শক্তিকে নিস্তেজ পঙ্গু করে দিচ্ছে—এই দ্বিবিধ অবস্থা রলাঁর মানস-জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে। সেই কারণেই পাঁজর-ধসা মানুষের মুক্তির বাদ বা ভলতেয়ার-হুগোর মানবতার বাণী তাঁর কাছে এক আশ্চর্য মন্ত্র হিসাবে বন্দিত হয়েছিল।

ছাত্র-জীবন শুরু তাঁর প্যারিস ও রোমে। শৈশবে অত্যন্ত গুণগত যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন—সেটা হ'ল অদম্য সঙ্গীত-স্পৃহা। মায়ের কাছেই তাঁর প্রথম শিক্ষা। সমস্ত প্রকৃতি জগত আর মানুষ এই দুইয়ের মধ্যে পেয়েছিলেন কাব্যময় অনন্ত সুরলহরীর স্বাদ। তাই পরবর্তী কালে জীবন সন্ধানে বা শিল্প সাধনায় সঙ্গীতকে বিস্মৃত হতে পারেন নি মুহূর্তকালের জন্যেও।

ভলতেয়ার-হুগো ছাড়াও টলষ্টয় ও সেক্সপীয়র তাঁর জীবনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেক্সপীয়রের রচনায় তিনি এতটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে 'অরসিনো' নামে একখানা নাটকও তিনি লিখে ফেলেন। সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম যুগে তিনি আদর্শবাদী হ'লেও 'তথাকথিত শিল্প' সংজ্ঞায় বিশ্বাসীই ছিলেন। মানুষের জীবন-বেদনা বা তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন শিল্পীর জীবনে ছায়াপাত করবে এটা তাঁর ঈপ্সিত ছিল না। মূলতঃ যে

পরিবারে এবং যে পরিবেশে তিনি লালিত হয়ে বড় হয়ে উঠেছিলেন, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে এ ধরনের ধারণাবোধ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু রল্যাঁর বৈশিষ্ট ছিল এই যে, কোন কিছুকেই তিনি যুক্তিহীন ভাবে গ্রহণ করতে পারতেন না। তাই বাস্তবের কঠিন জীবন্ত যুক্তিগুলি পরবর্তীকালে কিন্তু বিশ্বাস ও স্বপ্ন থেকে তাঁর মোহমুক্তি ঘটায়। ১৮৯৭ সালের 'ড্রেফুস কেলেঙ্কারী' ঘটনায় তিনি উপলব্ধি করলেন আদর্শবাদ ও বাস্তবে কত বিস্তর পার্থক্য। 'ড্রেফুস কেলেঙ্কারী' ঘটনায় সত্যের নিদারুণ পরাজয়ে রল্যাঁকে বাস্তববোধ ও বাস্তব-আশ্রিত সত্যনিষ্ঠা অনেক বেশী সান্নিধ্যে নিয়ে এল। মূলতঃ রল্যাঁর চিন্তার জগতের বিপ্লব 'এই কালেই স্থচিত হয়। 'জাঁ ক্রিস্টফ' (১৯০৪-১২) রচনা করলেন তিনি। এক সঙ্গীত শিল্পীর জীবন সংগ্রামের আশ্চর্য কথকতা। বইটি নোবেল পুরস্কার লাভ করে। এই রচনার পটভূমেই জীবনের ক্ষেত্রে আত্মিক সংগ্রাম স্থরু করেছিলেন তিনি। এই সময়ই তিনি ফরাসীদেশের প্রগতিবাদী নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রগতিবাদী চিন্তার বিষয়ের সপক্ষে পর পর অনেকগুলি নাটক লিখলেন। জীবনের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন তিনি, কেননা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, "To him the great men are the men of absolute truth." তাই 'ড্রেফ্যুস কেলেঙ্কারী'র পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে তথাকথিত শিল্প-স্বর্গের স্বপ্ন ভেঙ্গে এসে পেয়েছেন ধূলো-মাটির নিবিড় জগতে, মানুষের মনের অতলান্তে।

'বিঠোভেন' (১৯০৩), 'মাইকেল এঞ্জেলো' (১৯০৫), 'টলষ্টয়' (১৯১১), ইত্যাদি জীবনী গ্রন্থগুলি রচনা করেন। এইসব মহান-ব্যক্তিদের জীবনী রচনায় একটাই মাত্র প্রেরণা ছিল তাঁর, সেটা হ'ল : স্ব-স্ব দর্শন চিন্তায় এই সব মানুষেরা কি কঠিন ভাবে আত্মিক সংগ্রাম করেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীও তিনি রচনা করেন। সেই সব জীবনী রচনায় লক্ষ্যও ছিল একই। কিন্তু এদেশী অনেক স্বল্প-ধার্মিক পণ্ডিত রল্যাঁর সংগ্রামী-মানবতার অধ্যায়গুলি বাদ দিয়ে অধ্যাত্ম-বাদের পূজারী হিসাবে চিহ্নিত করে প্রচার করেন। তাঁকে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গান্ধী'র সঙ্গে একত্রিত করে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদাসক্ত ঋষি হিসাবে চিহ্নিত করেন। মূলতঃ প্রাচ্যদেশীয় জীবন ও ভাবধারা, অগ্রসরমান ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে এশিয়ার সংযোগিকরণ, দুই মহাদেশের নির্যাতীত মানুষের মানসিক ও দার্শনিক ঐক্য সংস্থাপনই যে তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল তা তাঁর ভারত-সম্পর্কীয় স্থবৃহৎ ভাবেগী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। অধ্যাত্মবাদী ধর্মভাব নয়, ঐশ্বরিক মায়াবাদ বা সাকার-নিরাকারজাতীয় ঐন্দ্রজালও নয় বরং পরিবর্তনশীল বাস্তিক বস্তুজগতের বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সঙ্গেই তাঁর আত্মার ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর সামগ্রিক জীবনের বিপুল সংগ্রামী কর্মকাণ্ডই এই কথা বার বার প্রমাণ করায়। 'শিল্পীর নবজন্মে' আত্মগত চিন্তা, ভাবনা বা মতামতের রম্যতালি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি। এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী মনোভাব ও কর্মকাণ্ডই তাঁকে বার বার বিচ্ছিন্ন করেছে স্বদেশ থেকে, সমস্ত বুদ্ধিজীবী জগৎ থেকে। যে বুদ্ধিজীবী জগতের সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসে সত্যের লড়াইয়ে উদার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই বুদ্ধিজীবী জগতই নির্বোধ-ভীরু-সুযোগসন্ধানী মানবিকতার আচ্ছন্ন হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে, নত হয় স্বার্থান্বেষী চক্রের কাছে। এই ধরনের ঘটনায় রল্যাঁকে যেমন বিচলিত করেছে, তেমনি অন্তঃসারশূন্য মেকি সভ্যতা, সমাজ-শাসক বা ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীর সম্পর্কে আস্থাহীন করে তুলেছিল। তাই যখন প্রথম রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়, ফরাসী দেশের নিপীড়িত মানবাত্মার আশা-উজ্জ্বল কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানান। আবার ধনবাদী চক্রান্ত যখন যুদ্ধের জিগীর তুলে নিপীড়িত মানুষের প্রথম সভ্যতার পত্তনকে বিধ্বস্ত গ্রাস করার আওয়াজ তুলল, ক্ষুব্ধ বিচলিত রল্যাঁ ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীদের কাছে এগিয়ে এলেন আবেদন নিয়ে। গর্জন করে উঠলেন তিনি, "ইউরোপের সমস্ত স্বাধীন মানুষকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, রাশিয়া আজ বিপন্ন এবং সে যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে কেবল পৃথিবীর মজুরেরাই শিকলে বাঁধা পড়বে না— কি সামাজিক, কি ব্যক্তিগত সব রকমের স্বাধীনতাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।...আসুন, এর সাহায্যে এগিয়ে যাই।"

সেখানেই তিনি থামলেন না। এগিয়ে গেলেন পথে-প্রান্তরে, হাঁকলেন, "Working men, here our hands. We are yours. Civilisation is in danger."

কি অমিত সাহস আর তেজ নিয়ে প্রায় একাকী বিপক্ষ শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তা আমাদের দেশের আত্মবিক্রয়কারী, পঙ্গু, অবক্ষয়ে নিমজ্জমান বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের শিক্ষণীয়। শিল্পী, সাহিত্যিক ব্যক্তি হিসাবে, চিন্তার ক্ষেত্রে, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন কিছু থেকে পৃথক ভাবে থাকতে পারে না এই বিশ্বাস তাঁর আমরণ অটুট ছিল। সেই জন্যেই মিথ্যা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি তেজস্বী বীরের মত দাঁড়িয়েছেন। সুখ্যাত রাইখস্টাগ মামলায় অভিযুক্ত ডিমিট্রভের সপক্ষে বিশ্বজনমত সংগ্রহের জন্য, মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে তুলতে দৃঢ়পণ গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ, বিরোধী যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল তাকেও তিনি মুক্তপ্রাণে সমর্থন করেন। তথাকথিত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বন্দী নেতৃবৃন্দের সপক্ষে তিনি বিবৃতি দিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে জাগ্রত ভারতীয় মননকে প্রাণের আশীর্বাদ জানালেন।

'হিটলার মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না' এই বিশ্বাস যেমন তাঁর অমূল ছিল তেমনি মহামান্য পোপের আশীর্বাদপুষ্ট মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট শাসন প্রকরণকে মনে-প্রাণে করতেন ঘৃণা। হিটলার-বিরোধী এই মনোভাবের দরুণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলারের তাঁবেদার তিনি কর্তৃপক্ষের শাসনাধীন ফ্রান্সে কার্যতঃ তিনি বন্দী-জীবন যাপন করেন। পক্ষান্তরে, পাশাপাশি গড়ে-ওঠা নব জীবনের দেশের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। হিটলারী বর্বর উল্লাসের বিপক্ষে তিনি বললেন, "আমরা এ আনন্দ উল্লাসে বাধা দিতে চাই। আমরা গাইতে চাই অন্য গান।" সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণের বিপুল কর্মকাণ্ড, শিল্পী-সাহিত্যিকদের মহত্তর সমাজ ও জীবন গঠনে যে অপরিসীম ত্যাগ, মানুষকে ভালবাসার অপূর্ব শক্তি—সবকিছুই তাঁকে বিমোহিত করে। তিনি রুশ সমাজ ও সোর্কী প্রসঙ্গে বলছেন, আমি এতকাল বিরাট এক বৃক্ষের মত শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে মহাশূন্যে প্রসারিত হচ্ছিলাম। আমি ভুলে গেছিলাম যে এই বিরাট বৃক্ষের শিকড় মাটিতে ......এখন আমি সেই শিকড় মাটির মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে দিলাম। শিকড় গিয়ে পৌঁছাল সেই আশ্চর্য দেশে, সোভিয়েত ভৌর্থক্ষেত্রে। আমি হাত প্রসারিত করলাম, গোর্কির হাতের সঙ্গে আমার হাতের স্পর্শ হ'ল।"

সাম্যবাদী সমাজ ও মানুষকে তিনি কত নিগূঢ় রাখীবন্ধনে বাঁধতে পেরেছিলেন তা এ থেকেই বোঝা যায়। শোষণের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের হিংস্র লোভী নিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। আর সেই কারণেই মুসোলিনী এবং হিটলারের নেকনজরেও তাঁকে পড়তে হয়।

সেই কালে ভারতীয় চিন্তামানসের যাঁরা অধিকারী ছিলেন, এমন কয়েক জনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। মূলতঃ ইউরোপে এমন এক দুর্ধর্ষ মনীষা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি বিকশিত হয়ে পড়েছিলেন যে ভারতীয় অভিযাত্রিকদের তাঁর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য একান্ত লোভনীয় ও আবশ্যিক ছিল। রলাঁর সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ হয়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, লাজপত রায়, ডাঃ আনসারী, জগদীশ বসু, নেহরু ইত্যাদি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল তাঁর দীর্ঘস্থায়ী। হৃদয়ের দিক থেকেও এই দুই মনীষা খুব নিকটবর্তী ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ডায়েরীর বহু পৃষ্ঠাই রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচিত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এতে স্থান পেয়েছে। মূলত রবীন্দ্রনাথের জীবনের বহু অংশেই রলাঁর প্রভাব ছিল, এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে প্যারিসে, ১৯২১ সালের ১৭ই এপ্রিল। তবে সাক্ষাতের অনেক আগে থেকেই এই দুইজনের মধ্যে পত্র সংযোগ ছিল। তবে রলাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি যে সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এ কথা অনস্বীকার্য। দুই মনীষারই একটি সমন্বিত চিন্তা ছিল, তা হ'ল বিশ্বমানসিকতা। এই বিশ্বমানসিকতাই

ইউরোপ আর ভারতবর্ষের জনগণের সহমর্মিতার সমস্ত দরজার উন্মুক্ত করে দেন। বাস্তববোধের দিক থেকে রলাঁ এগিয়েছিলেন অনেক, রলাঁ মানুষের শত্রুকে বহু পূর্ব থেকেই চিনতেন এবং মানব-মুক্তির অদ্বিতীয় পথ সম্পর্কে স্পষ্ট ও সচেতন ছিলেন। রলাঁ রুশ বিপ্লবকে স্বাগত জানাতে গিয়ে যে বা তার বিপদে রক্ষার আহ্বান জানাতে গিয়ে বলিষ্ঠ আবেদন জানান তাতেই মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ সঙ্কেত স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণের পর সেই পথ সম্পর্কে উৎসাহিত হন। রলাঁ মুসোলিনী বা হিটলারকে স্পষ্ট ভাবে ঘৃণা বা বিরোধিতা করতে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হন নি।

যুদ্ধনেশায় উন্মত্ত ইউরোপের সমস্ত রকম সাম্রাজ্যবাদী কারসাজি, চক্রান্ত, শোষণ, উগ্র জাত্যভিমান এবং যুদ্ধ উন্মাদনার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে তিনি মুখর হন। এই মুখর সংগ্রামে তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন। এই সময় তিনি Declaration of Independence of Spirit' নামে এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। সেই ইস্তাহারের অন্যতম প্রধান স্বাক্ষরকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

মহাপৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জীবন-সংগ্রামের নিঃস্বার্থ যোদ্ধা ছিলেন তিনি। শিল্প, জীবন ও মতাদর্শ যে পৃথক নয় প্রচণ্ড বিরুদ্ধতায়ও সেই বিশ্বাস তিনি হারান নি। তাঁর অমূল্য সৃষ্টিরাজি সেই অমোঘ সত্যের ফসল—যে সত্য মানুষকে বিভেদ, বিভ্রান্তি, অন্ধকার থেকে সুন্দর আলোর পথ দেখায়। রলাঁ সেই সত্যপথ দ্রষ্টা যে সত্য শিল্পীকে ভয়, শৈথিল্য, পৈশাচিকতা সরিয়ে মহত্তম জীবনের সহগামী করে তোলে, বিশ্বজনীন করে তোলে। বিরামহীন তাঁর যাত্রাপথ, যে পথে তাঁর আপোষহীন ঘোষণা : I will go. I will not rest.

জীবন-বীর রমাঁ রলাঁর মৃত্যু হয় নির্বাসিত জীবনে, সুইজারল্যাণ্ডের ভিলনাভে, ৩০শে ডিসেম্বর,১৯৪৪ সালে।

রলাঁর জীবন-প্রবাহ এই কালের বুদ্ধিজীবী জন-মানুষের শিক্ষা, শতাব্দী জুড়ে তাঁর অচঞ্চল অগ্নিগর্ভ সংগ্রামই আমাদের পাথেয়।

আলোকসন্ধানী

(রোমাঁ রোলাঁ জন্মশতবর্ষ স্মরণে)

শ্রীশান্তশীল দাশ

আলোক পথের যাত্রী, অনেক আঁধার পৃথিবীতে,
দু'টি চোখে আলোকের স্বপ্ন নিয়ে পথ পরিক্রমা,
আজন্ম তোমার চোখে সেই স্বপ্ন, স্বপ্নালু দু'চোখ :
একটি পৃথিবী আর হাসিমুখ সেখানে মানুষ।

এখানে নিয়ত যুদ্ধ, হিংসাদ্বেষ, রক্তাক্ত ধরণী,
মানবতা কেঁদে মরে। কোথা মুক্তি ? অনন্ত পিপাসা
বুকে নিয়ে যাত্রী তুমি, তীর্থে তীর্থে অশ্রান্ত ভ্রমণ :
অসংখ্য মানুষ কাঁদে, সভ্যতার কী বীভৎস রূপ !

মুক্তিতীর্থ এ ভারত ; এখানে মানস-পরিক্রমা,
তোমার আত্মার মুক্তি, তোমার স্বপ্নের সফলতা
এই তীর্থে পেলে তুমি ; দেখা পেলে আত্মার আত্মীয়,
পূর্ব ও পশ্চিমে গড়ে গেলে মিলনের সেতু।

এ পৃথিবী আজো কাঁদে ; এক নয় অনেক পৃথিবী ;
অনেক মানুষ আজ, খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সবাই।
আলোক পথের যাত্রী হবে নাকি এই বিশ্ববাসী ?
এক মন্ত্র, এক সুর, বহু নয় সে 'এক' পৃথিবী ?
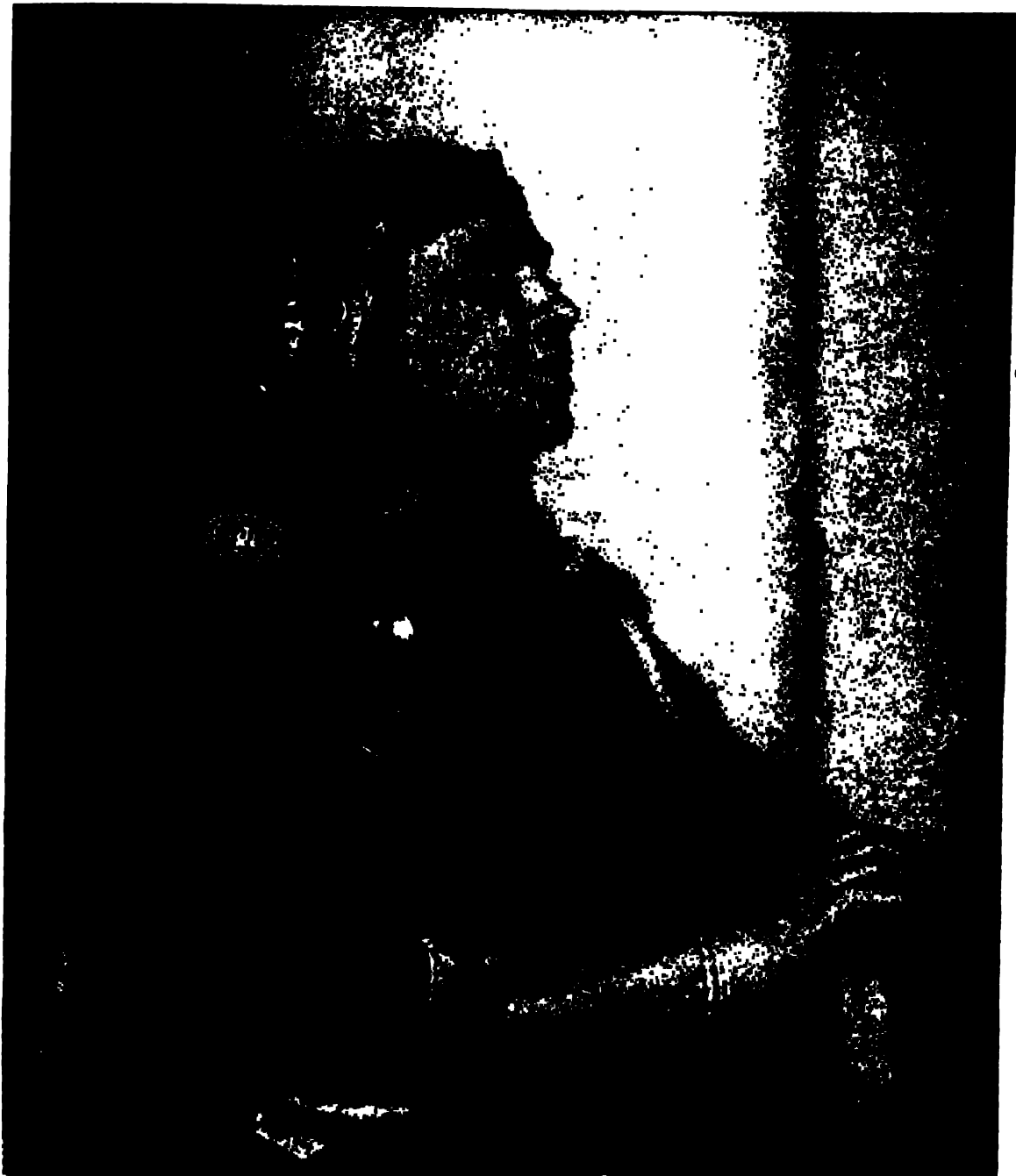
লেডি অবলা বসু

লেডি অবলা বসু স্মরণে

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী লেডি অবলা বসু ১১ই বৈশাখ ১৩৫৮ সালে পরলোক গমন করেন। এই মহিয়সী মহিলার জীবন-কথা ভারতবর্ষের নব জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার অধ্যাপক-জীবনের গোড়ার দিকে অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। পত্নী অবলা বসু হাসিমুখে তাহা বরণ করিয়া লন। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসরের বিবাহিত জীবন জগদীশচন্দ্রের সেবায় অতিবাহিত হইয়াছিল। জগদীশচন্দ্র যখন তাঁহার গবেষণাগারে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখন অবলা বসুর কর্ত্তব্য ছিল এই আত্মভোলা মানুষটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনা। পঞ্চাশ বৎসর তিনি অনন্যমনে ইহা করিয়াছিলেন। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ব্রত প্রতিপালন করিতেন বলিয়া, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জীবনে সার্থকতালাভের পথ সুগম হইয়াছিল। এই নিরলস সেবাই অবলা বসুর জীবনের সত্য পরিচয়।

তাঁহার কিন্তু আরও একটা পরিচয় আছে। তাহা তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। দুর্গামোহন দাশ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় ও ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দের মধ্যে দুর্গামোহন ছিলেন অন্যতম। শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সহজাত অনুরাগ ও আকর্ষণ অবলা বসুর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ১৯১৯ সালে 'নারীশিক্ষা সমিতি', ১৯২৬ সালে 'মহিলা শিল্পভবন', 'নারী সমবায় শিল্প আশ্রম' প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তিনি শত শত বিধবা রমণীকে স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

১৯৩৭ সালে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। তখন তিনি এক লক্ষ টাকার একটি ফণ্ড্ রাখিয়া যান। বয়স্ক পল্লী-শিক্ষা বিস্তারে এই ফণ্ড্ নিয়োজিত হয়। অবলা বসুর আন্তরিক ইচ্ছা অনুসারে তাহা নিবেদিতার নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার উৎসাহ ছিল প্রচুর, কিন্তু তাহা তাঁহার মনকে গণ্ডিবদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহা জীবনের নানাক্ষেত্রে বিচরণ করিত। রাজনীতির বিপদসঙ্কুল পথও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না এবং সেই পথে তিনি জড়িত হইয়া পড়েন ভগিনী নিবেদিতার প্রভাবে।

৮৭ বৎসর বয়সে যে জীবন প্রদীপের নির্ব্বাণ হয় তাহার আলোক দূরে অতীতকে ও দূরে ভবিষ্যৎকে আলোকিত করিয়া রাখিবে।

আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে, সেই কথাই স্মরণ করিয়া তাঁকে প্রণতি জানাই।

॥ ২ ॥

ছোট মেরৎস বাড়ী ফিরে এসে তখ-ই রাতের খাবার জন্ত টেবিলে বসল না, তার বদলে একটা ধোওয়া সার্ট গায়ে দিয়ে কনরাড বাস্তিয়ানের বাড়ীর দিকে ছুটল। সে খবর পেয়েছিল যে তার কনে সারাদিন ধর্মমায়ের বাড়ীতে সেলাই শিয়ে কাটিয়েছে এবং সন্ধ্যায় তার বাড়ী ফেরার কথা। তাই সে বড় রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা করার জন্ত বেরিয়ে পড়ে। দিনটা ছিল চমৎকার, সূর্য এখন সবেমাত্র দিগন্তে অদৃশ্ত হয়েছে। নদীর দু'ধারের পাহাড়ের মাঝখানে টুকরো আকাশটা যেন আগুনের মত দেখায়। বীচবন এবং পাহাড়ের নীচের গ্রামটোতে যেন আগুন লেগেছে মনে হয়। এপারের ফসল ইতিমধ্যেই কাটা হয়ে গেছে। ধূসর মাঠগুলো ধূ ধূ করে, বীটের ক্ষেতে একটা ম্যাটম্যেটে হলদে আভা দেখা যায়। একটা জায়গায় চাষীরা বীট খুঁড়ে বের করবার চেষ্টা করেছে—আটটা কি ন'টা ঢিপি, ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে…চাষীরা চলে গিয়েছে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যায় ছোট মেরৎস যাতে সে তার কনেকে গ্রাম থেকে যতটা দূরে সম্ভব ধরতে পারে। রাস্তার বাঁকে এসে হঠাৎ সে তাকে খুব কাছাকাছি দেখতে পায়, তার হাতে ঝুলছে একটা ঝুড়ি, মাথায় রুমাল, কোমরে বাঁধা একটা বড় এপ্রন। কিছু না ভেবেই সে গর্তের উপর দিয়ে লাফ দেয় আর মাঠের কিনারে বসে পড়ে। আগুনরঙা আকাশ আর ধূসর মাটির মাঝখানে রহস্যময় গোধূলিবেলায় মেয়েটিকে আরও কৃশ দেখাচ্ছিল, যেন তার হাতের উপরে একটি ডাঁস মশা, ঠিক সেইরকমই দূরের জিনিস যাকে হয়ত ধরাও অসম্ভব। মেয়েটি তার হাত ফসকে যেতে পারে এই যে একটা দুর্বোধ্য ভয় হয়েছিল তার, সেটা যেন এই সময়েই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। সে চিৎকার ক'রে ওঠে, "এই লোফি!"

. মেয়েটা ভয়ানক চমকে যায়, অবশ্য দৌড়তে সাহস করে না, শুধু ঝুড়িটা মাটিতে রাখে। ছোট মেরৎস তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, বলে, "লাফিয়ে এস।"

সে জবাব দেয়, "তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে হবে আমাকে।"

"আঃ, বাজে ব'কো না, আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাব।"

লোফি ঝুড়িটা তুলে নেয়। আর কি বলবে সে ভেবে উঠতে পারে না, তাই আবার এক কথাই বলে, "আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে হবে।"

লোফি কয়েক পা দৌড়ে যায়। মেরৎসও মাঠের কিনার দিয়ে পাশাপাশি ছোটে। তারপর সে গর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে এবং হঠাৎ তার কোমর জড়িয়ে ধরে এক ঝটকায় তাকে টেনে নিয়ে চুমো খায়। তার হাতের ভিতর লোফির দেহটা যেন হাল্কা পালকের মত এলিয়ে পড়ে। এই রকম সময়ে অন্ত সব পুরুষের যা অবস্থা হয় মেরৎসও সেইরকম হাঁপাতে থাকে, "আজ হোক আর কালই হোক, বিয়ের আগেই হোক আর পরেই হোক…কেউ দেখবে না, কেউ শুনবে না।"

মেয়েটা জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, "কিছুতেই না, কিছুতেই না, কিছুতেই না।" এই প্রথমবার মেয়েটা তাকে বাধা দেয় এবং বাধা খুব দুর্বলও নয়। ইতিমধ্যেই তার ধূসর চোখ দু'টি দিয়ে এক নতুন চেহারা ফুটে উঠেছে, তাতে এখনও ভয়ের ছাপ—কিন্ত প্রবল সঙ্কল্পে দৃঢ়। নিজের শক্তি দেখাবার জন্ত মেরৎস তাকে শক্ত করে পাকড়ে মাটি থেকে উপরে তুলে ধরে। লোফি বলে, "আমি কক্ষনো তোমাকে বিয়ে করব না।" মেরৎস তাকে এত জোরে নীচে নামিয়ে দেয় যে লোফি প্রায় হাঁটু ভেঙে পড়ে।

তারা পাশাপাশি হেঁটে গ্রামে ফিরে যায়। নরম হয়ে এবং প্রায় অন্তপ্তভাবে মেরৎস নিজের হয়ে ওকালতি করে মেয়েটার কাছে। সে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে একজন ভাল লোকের একমাত্র ছেলেকে বিয়ে করার মানে কি, জেলার সমস্ত চাষী-বউদের মধ্যে সে সবচেয়ে বেশী সম্মান পাবে। সে তাকে তার ঘোড়া, জমি, বনভূমি এবং মৌচাকের কথা বলে। এতদিন পর্যন্ত ওই

সব জিনিসকে সে তার বাবার একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি বলে গণ্য করে এসেছে, যার সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই। এখন তার চোখের সামনে সে সব উজ্জ্বল নতুন রং নিয়ে ভেসে ওঠে। এই প্রথম সে তার বাবার মৃত্যুর কথা ভেবে খুশী হয়। লোটি কিছুই বলে না। বাকি পথটা সে তার মুখখানা ঘুরিয়ে থাকে।

ছোট মেরৎস যখন বাড়ীতে ফিরল তখন অন্যরা সবে রাতের খাওয়া শেষ করেছে। গজগজ করতে করতে ঝি প্যানের উপর টাটকা মাখনের গোলা ঢালে। ঘরে তৈরী ভোর্টলবেরির আচার ভর্তি একটা মস্ত মাটির পাত্র টেবিলের উপর ছিল। সে বেশি খাওয়া শুরু করতে না করতেই ঝি কাঁটায় বিঁধে একটা পিঠে দিয়ে আসে। বুড়ো মেরৎস যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। মেয়েটা টেবিল সাফ করে, ডিসগুলো ধোয় এবং চেয়ারের চারপাশে পাথরের মেঝেটা ঘষে দেয়। বুড়ো তার ছেলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর চেঁচিয়ে বলে, "মেয়েছেলেরা বেরোও দেখি!"

ছেলেকে দেখে সে হাসে। তার মুখখানা উৎপীড়িত, ঠোঁটের দু'পাশ বেরির রসে নীল।

"তা খবর কি?"

"কি আবার খবর?" ছেলেটা খেঁকিয়ে ওঠে; "হঠাৎ লোটি বলছে সে রাজী নয়, কোনও দিনই রাজী হবে না।"

"কে? কি বলল?—ওঃ, বুঝলাম। ক্ষেপেছ না কি? সে বলে সে রাজী নয়। বলছে না কি? এদিক-ওদিক করছে, ভয় পেয়েছে আর কি। তোমার যেমন গড় মড় জ্ঞান নেই। যাই হোক, আমাদের চিনির বাক্স যে এখানে রয়েছে এবং ভোর্টলবেরির পাত্রটা যে আমাদের এ সবও যেমন সত্যি, লোটি যে তোমার স্ত্রী হবে তাও সেইরকম সত্যি।—তা ছাড়া আমার ভয় যে আর দর কষাকষি করার উপায়ও নেই।"

বাবার গলার স্বরে সান্ত্বনা পায় ছোট মেরৎস। তার ভয় দূর হয়।

"যা হোক, ওসবে আমি মাথা ঘামাই নি, খোকা। অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে ছিল আমার। কুকেন এবং তার দলের লোকদের সম্বন্ধে আমি যা ভাবছিলাম, বুঝলে? এই!" চেঁচিয়ে ওঠে সে, "আগে মুখের রস মুছে ফেল দেখি, তুমি যে একেবারে নীল হয়ে গেলে।"

ছেলেটা একটুকরো রুটি দিয়ে তার দাঁত ও ঠোঁট মুছতে মুছতে কি জবাব দেবে ভাবতে থাকে। বাবা বলেই চলে, "তুমি যদি ভাল মনে কর ত ওদের দলে যোগ দাও। ঈশ্বরের নাম নিয়ে লেগে পড়। এ ব্যাপারে আমার মনোভাব ভাল না, হয়ত সেটাই যোগ দেবার পক্ষে একটা বড় কারণ। আমার যেহেতু ওদের সম্পর্কে ধারণাটা ভাল নয়, সেই কারণেই হয়ত সরেজমিনে থেকে ওদের উপর নজর রাখা ভাল। কি বল? ব্রাইভাইল তাদের একজন নেতা বলেই যে যোগ দিতে হবে তা নয়। সে নিজের চারদিকে একটা হৈচৈ পছন্দ করে, লোকটা কথার ঝুড়ি, নিজের কথা শুনতে ভালবাসে আর অপরে তার কথা শুনুক তাই চায়। কিন্তু এখন শুনছি জুতোর কালির কারখানার দ্বিতীয় ডিরেক্টর ব্রাউনেভেল্—"

"কি?" বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে ছেলে।

"তা, লোকটার বুদ্ধি আছে নিশ্চয়ই, জানে কোথায় টাকা ঢালতে হয়। আমার ত তাই মনে হয়, তোমার কি ধারণা?"

ছেলেটা বেরির রসে নীল রুটির টুকরোটা টেবিলের উপর রাখে, তারপর একটা উজ্জ্বল প্রশান্ত হাসি হাসে।

"অবশ্য গিয়ে আবার কুকেনদের ব'লো না যে এসব কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি এবং ওদের কাছে দৌড়নরও দরকার নেই তোমার। কিছুদিনের জন্য নিজেকে একটু সরিয়ে রাখ, ওরা তোমায় খুঁজে বেড়াক।"

"হ্যাঁ বাবা, তাই ঠিক। আমি ত সব সময়ে তাই বলে আসছি।"

"বেশ, তাই হ'ল।" বুড়ো মেরৎস উঠে পড়ে।

। ৩ ।

বেড়ার ওপাশে মাটির উপর থেকে কে যেন ডেকে ওঠে, "জোহান!" উপুড় হয়ে কোরেনলিন জানলার কাছে পুঁডিং লাগাচ্ছিল। হঠাৎ যখনই দেখা হয়ে যায় ওরা চায় একটুখানি কথা বলতে, পরস্পরের দিকে একটু চেয়ে থাকতে। "ওখানে কি করছ তুমি?"

"গরমঘরটা একটু বাড়াচ্ছি। ওর মধ্যে পাঁচ ডিগ্রি বেশী উত্তাপ পাওয়া যাবে। আমি ওর চারপাশে পাইপ বসাব।"

জোহান বেড়ার উপর দিয়ে লাফিয়ে এসে মাটিতে বসে পড়ল। সে কোরেনলিনের ক্ষিপ্র হাতের কাজ দেখতে থাকে, এই পুডিং লাগাচ্ছে, এই কাঁটা মারছে। দৃশ্যটা জোহানকে শান্ত করে দেয়। মনে হয় যেন কোনও

গোপন কল্যাণময় সংকেত-অনুযায়ী কাজ করছে কোরেনেলিনের আঙুলগুলো। হঠাৎ তাকে সাহায্য করার ইচ্ছে হয় ওর। মাঝে মাঝে হাতার ছের চোখ দুটো তুলে কোরেনেলিন জোহানের দিকে চায়। ওর বর্ণহীন মুখের উপর চোখ দুটোই আবার সবচেয়ে হাল্কা। জোহান যে তার পিছনে বসে দেখছে তাতে সেও স্পষ্টতঃই খুশী হয়েছিল। এক টুকরো কাপড় নিয়ে সে রঙলাগানো খড়খড়িগুলোকে ঘষে ঝকঝকে ক'রে ফেলে। তারপর মাথা তুলে বলে, "তোমার যদি হাতে সময় থাকে ত আমি আমার খাবারটা নিয়ে আসতে পারি। ওরা আজ এখানে কেউ নেই। কিছুক্ষণ বসে চিবোতে পারি।"

সে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে রুটি, একপাত্র জ্যাম এবং একটা ছুরি নিয়ে আসে। "এস, আমরা এস্টার গাছ-গুলোর দিকে সরে ব'স, যতটা পাওয়া যায় আর কি! এ জায়গাটা আমা'র ভারি পছন্দ। তাব একবার, মেরৎস-এর বিয়ের জন্যে ইতিমধ্যেই এসব এস্টার বাদনা হয়ে গিয়েছে। যেন তাদের নিজেদের আর এস্টার ছিল না। দুকেন এদিকে মনে মনে হাসছে।" কোরেনেলিন কোলের উপর পরিষ্কার একখানা রুমাল বিছায়। রুটি কাটার ব্যস্ত তার আঙুলগুলো দেখে জোহান আবারও যেন সান্ত্বনা পায়। চমৎকার বিকেলটা, জানলার কাচগুলো সূর্যালোকে ঝকঝক করছে। নীল, সাদা ও বেগুনি রঙের এস্টারগুলোর নিজেদেরই রং আছে, একটা গাঢ় রং কিন্তু ঝকমকে নয়। নীরবে ওরা রুটি চিবোয়, মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে চায়। কোরেনেলিন ভাবে, ওর মত একটা ছেলে পেলে আমি একসঙ্গে কাজ করতে পারতাম, একসঙ্গে পথে বেরোতে পারতাম। জোহান ভাবে, ওর সঙ্গে আমার কথা বলতে পারা উচিত। হঠাৎ কোরেনেলিনের মুখের ভাব বদলে যায়, সে বলে, "এবার শীগগিরই আমায় যেতে হবে।"

"তোমাকে? কিন্তু কেন?" জিজ্ঞাসা করে জোহান।

"কারণ দুকেনের শীতকালে লোকের দরকার হবে না। তা ছাড়া ওরা কি চোখে দেখে তুমি জান। দুকেন অবশ্য ততটা নয়—কিন্তু ওই বুড়ী। হয়ত সেও মেনে নেবে। কিন্তু ওই মেয়েটার বোকামি।"

"তবে কি তোমাকে ওরা ওদের পরিবারে বিয়ে দিতে চায় না কি?"

"মেয়েটি ভাল, কিন্তু আমার রুচিমত নয়, দেখতেও নয়, স্বভাবেও নয়। তা ছাড়া নিজেকে আমি বেঁধে ফেলতে চাই নে। তুমি কি বল?"

"না, নিশ্চয়ই না।"

"তাই দুটো সে রকম নয়, তবু ওই বুড়ী। যা হোক, ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে সময় থাকতে বন্ধুত্ব বজায় রেখে যাওয়াই ভাল।"

"তারপর তুমি কি করবে?"

"সহরে বদলী হয়ে যাব আবার। তারা হয়ত আমাকে পেয়ে খুশীই হবে। ব্রাইডাইক আমাকে ভাল করে চেনে। তার কাছে দু'বছর আমি কাজ করেছি। আবার একটা নতুন কাচের ঘরে হাত দিয়েছি আমি। বিদায় নেবার আগে ওটা শেষ করতেই হবে।"

কোরেনেলিন রুমালখানা ভাঁজ করে, জ্যামের পাত্রটা বন্ধ করে জিনিসগুলো বাড়ীর ভিতর ফিরিয়ে নিয়ে যায়। যখন সে ফিরে এল জোহান উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। "আমি ওর জন্যে আর একটা কুটোও নাড়ব না।

আশ্চর্য হয়ে কোরেনেলিন বলে, "কিন্তু কেন? এতে ওর দোষ নেই, তাই না? আমার ব্যাপারে সে ন্যায্য কাজই করেছে। সে আমার কদরেও, তার এ অধিকারও আছে। এ ঘরের সঙ্গে গৃহবিষয় ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক নেই। বিদায় নেবার আগে একটা কাজের কাজ করতে পেরে আমি খুশী।"

"কিন্তু এ সবই নিরর্থক।"

"কিছুই নিরর্থক নয় যদি তা সত্যি ভালভাবে করা হয়, যদি তা ঠিক ও সঙ্গত হয়।"

"হাঁ, থাকল ক্রিস্টিয়ান দুকেনের সঞ্চয়ের খাতায়।"

কোরেনেলিন হাসে, তার মুখ আরও ছেলেমানুষের মত, আরও হাল্কা ও ভাবনাহীন হয়ে ওঠে। "এটা নিরর্থক নয়"—সে জোহানের কাঁধের উপর হাত দুটো রাখে। "বাস্তিয়ানের ভাণ্ডারে, বুড়ো মেরৎস-এর সঞ্চয়ের খাতায়, কিংবা দু:কলের ব্যাঙ্কে যেখানেই থাকুক না কেন সব টাকাই এক, কারণ আমরা সকলে একই মানুষ। আর ক্রিস্টিয়ান, দেখ না, আমাদের সঙ্গে আরও বেশী দিন থাকলে সে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ বনে যাবে।"

জোহান বলে, "সে কিছু বদলাবে না। চিরকালই সে সম্পত্তির মালিক থাকবে, তার থাকবে এত এত জমি, গরু-ঘোড়া ও গরমি ঘর। আর তোমার জমিও নেই, গরু-ঘোড়াও নেই, গরমি ঘরও নেই। তুমি

তুমিই থাকবে। মেরেৎস মেরেৎসই থাকবে আর ৎসিম্রিশ ৎসিম্রিশই।"

"দেখ জোহান, তুমি আমাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না, কেবল বকে যাচ্ছ। ৎসিম্রিশ সত্যিই খুব কষ্টে আছে। আমরা ওর দেনাটা মকুব করিয়ে দিতে যাচ্ছি। তারপর সে অন্য মানুষ বনে যাবে।"

"মেরেৎস-এরও খামার থাকবে আর ৎসিম্রিশেরও খামার থাকবে। তাদের খামারের দিকে একবার চেয়ে দেখে তুলনা কর।

তখনও ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কোরেসদিনের মুখের খুশি মিলিয়ে যেতে থাকে। কপালে একটা রেখা এসে তার মুখের ভঙ্গিকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। জোহানের কাঁধের উপর থেকে সে হাত দুটো টেনে নেয়।

"তুমি কি চাও রাশিয়ার মত সবাইকে একই আলকাতরার পোঁচ দেওয়া হোক, পরিচয়ের জন্য ভেড়ার মত প্রত্যেকের পাছায় জলন্ত লোহা দিয়ে নম্বর দেগে দেওয়া হোক।"

"দেখ কোরেসদিন, তোমাকে যদি যন্ত্রপাতি ও একখণ্ড জমি দেওয়া হয়, আর কুকেনের যদি ওই একই যন্ত্রপাতি এবং একই রকম জমি থাকে তা হ'লে বোঝা যাবে চাষী হিসাবে কে কত ভাল।"

কোরেসদিনের মুখখানা আবার উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। "তা তুমি, জোহান, তুমি এর চেয়ে আলাদাটা কি করছ? ওরা তোমার সম্পর্কে কি বলে তা তোমার শোনা উচিত। লোকটা ভূতের মত খাটে, কিসের জন্য?"

"তা হ'লে আমার হয়ে ওদের ব'ল যে একজন গরীব বেচারী আর একজন গরীব বেচারীকে সাহায্য করবে তাই ত স্বাভাবিক।"

সহসা ঘরের পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পায় ওরা। কুকেনের ছোট ভাই পস্তি দবেব তাদের কাছে আসে। তার মুখে একটা বিরক্তির ভাব। সে জিজ্ঞাসা করে তার দাদা ফিরেছে কি না? কোরেসদিন 'ফেরে নি' জবাব দিলে সে আশ্বস্ত হয়। কোরেসদিন ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। ছেলেটা কোরেসদিনের কাঁধে মাথা রাখে। তারপর কোরেসদিন ওকে পুডিং গরম করার জন্য ঘরে পাঠায়। সে বলে, "ছেলেটা বেশ একটু মজার, আমার কথা সে শুনবে, আমার কাছে ভাল করে কাজও করবে, কিন্তু ভাইএর সঙ্গে হলেই গজ গজ করবে আর কাজে গড়বড় করবে।"

।১৪।

মাকটেন তার জামাই এলস্টারকে যখন দেখল তার আগেই সে বিলিয়ার্ড ঘরে বসে পড়েছিল। সে তখন চটে ছিল। সকালবেলায় জানলা থেকে সে এলস্টারকে তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে শুনেছে। ঝগড়া মিটিয়ে দেবার বদলে সে কাফেতে বসে রয়েছে। মাকটেন এখন তার মেয়ের বিয়ের ব্যাপার ভাববার পক্ষে অত্যধিক উত্তেজিত। বুড়ো মেরেৎস-এর বাড়ীটার জন্যে সে একজন ক্রেতা খুঁজে পেয়েছে। জগতের আর কিছুতেই এখন তার ভয় নেই,—তার মেয়ের অসুখী জীবন, নিজের মূত্রাশয়ের যন্ত্রণা, যা নাকি গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ প্রায়ই দেখা দিচ্ছে, কত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে-চলা তাঁর দুর্বল হৃৎপিণ্ড—এর কোনও-টাকেই সে এখন আর ভয় করে না। সে শুধু একটা ব্যাপারেই ভয় পায়: বুড়ো মেরেৎস তাকে অনেক দিন ঘোরাতে পারে এবং সেই ফাঁকে ক্রেতাটি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

সকালের বাজারে কাদায় কাদায় চলা গরু-ঘোড়ার মাঝখানে দেখা দেয় বুড়ো মেরেৎস, ঠিক যেন একটি বুড়ো মেষপালক। জানলার দিকে ছড়িখানা তুলে রুপোর মাথাটা দিয়ে সে মাকটেনকে ছুঁয়ে দেয়। মাকটেন ভাব দেখায় যেন সে মেরেৎসকে খুঁজছিল না। কয়েক মিনিট পরে মেরেৎস যখন ঘুরে বিলিয়ার্ড ঘরে আসে তখন তাকে দেখে মাকটেনের মনে হয় যে বুড়ো গতবারের তুলনায় লাঠির উপর আরও বেশী ঝুঁকে পড়েছে। মেরেৎস-এর মনে হয় বুড়ো মাকটেনের চোখের নীচেটা গত সপ্তাহের তুলনায় অনেক বেশী ফুলে উঠেছে। যদিও তাদের চোখে পরস্পরের প্রতি এখনও সন্দেহ, তবুও তাদের দাড়ি ও হাত ইতিমধ্যেই পরস্পরের উদ্দেশ্যে ঝুঁকতে শুরু করেছে।

মাকটেন বলে, "শোন তা হ'লে হের মেরেৎস, আমি একজন ক্রেতা পেয়েছি।"

"ভাল কথা।"

"সে এক মজার লোক, এক আমেরিকান। বাজারে এক দরের জিনিষের একটা দোকান বসাতে চায়। আসলে বরাত জোরে পাওয়া গেছে লোকটাকে।"

ওই মক্কেলের হদিশ রাখতে গত সপ্তাহটা তার কি ভাবে কেটেছে তার বর্ণনা দিতে শুরু করে মাকটেন। খোঁজাখুঁজির খবর শোনবার মত উৎসাহ ছিল না বুড়ো মেরেৎস-এর। সে কেবল বলে, "আচ্ছা, মনে রাখব।"

মাকটেল বলে, "কিন্তু এ সম্পর্কে এখনই ঠিক করা দরকার। লোকটা ট্রাউবের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে। তোমায় মনস্থির করতে হবে।"

বুড়ো মেরেৎস বলে, "পালিয়ে ত যাচ্ছে না। এ রকম ব্যাপারে ভেবে দেখতে হয় মানুষকে।"

ঠিক এরই ভয় ছিল বুড়ো মাকটেলের। তার ইচ্ছে করছিল বুড়ো মেরেৎসের পায়ে পড়ে কাকুতি-মিনতি করতে। তাদের তিন জনের পক্ষেই এ লেনদেন লাভজনক হবে, এ কথাটা তার মাথায় গজাল দিয়ে গজিয়ে দিতে পারলে কিংবা পাথর দিয়ে মাথার মধ্যে গাঁথিয়ে দিতে পারলে সে খুশী হ'ত। তার বদলে সে শুধু বলল, "সারা জীবনে আমি তোমায় কোনও মন্দ উপদেশ দিই নি।"

"এবং কোন ভুলও হয় নি, হের মাকটেল। নিজের মনে মেরেৎস ভাবে বাড়ীটা হাতছাড়া করা সত্যিই দরকার কি না। দৈবক্রমে সম্পত্তিটা সে পেয়েছে, এ একটা বোঝাও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে। নইলে মাকটেলই বা ক্রেতা খুঁজে পাবে কেন? এ লোকটাই বা তার বাড়ীটা নিয়ে কি করতে চায়। মেরেৎস নিজেও কি ওটাকে সেই একই কাজে লাগাতে পারে না। টাকার নিশ্চয়ই দরকার। ভগবান জানেন, এই আমেরিকান ও মাকটেল নিজেদের মধ্যে কি ফন্দি এঁটেছে। তার ভয় বরং, আসল ভয়ঃ নিজস্ব কিছুকে হারাবার ভয়।

মরিয়া হয়ে মাকটেল বলে, "অন্ততঃপক্ষে লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা চালানর জন্য আমাকে ওকালতনামা লিখে দেওয়া উচিত তোমার। সে তাই চায়। ইতিমধ্যে তুমি ব্যাপারটা আরও ভেবে দেখতে পার। এমনিতেও তোমার দস্তখত ছাড়া ত কোনও চুক্তি আমরা করতে পারব না।"

মেরেৎস চটে উঠে বলে, "তোমার ত তাই ইচ্ছে, তাই নয়?"

তখনও মরিয়া হয়ে বলে চলে মাকটেল, "অবশ্য সে চায় কাম্রিৎসিউজকে বের করে দিতে, কারণ দোকানটা তার নিজের জন্য দরকার।"

মেরেৎস আরও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কোনও অজ্ঞাত কারণে এ রকম হটিয়ে দেওয়াটা তারও পছন্দ হয়। তার অবস্থা যখন ভাল ছিল কাম্রিৎসিউজের ছিল পড়তি বাজার। আগে কাম্রিৎসিউজই তাকে যন্ত্রপাতি, বাসন-পত্র যোগাত। কিন্তু মেরেৎস-এর বিবেচনায় তাকে যারা ঠকিয়েছে তাদের তুলনায় যাদের সে ঠকিয়েছে তারা আরও খারাপ। তা সত্ত্বেও সে ইতস্তত করে, "ওকালতনামার জন্য এরলারের সঙ্গে দেখা করার পক্ষে এখন বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে, আমাকে সময়মত বাড়ী ফিরতে হবে।"

ঠিক সেই সময়ে এলস্টার মাকটেলের দিকে পিছন ফিরে যে টেবিলে বসে ছিল সেখান থেকে উঠে ওদের কাছে আসে। "কিছু যদি না মনে করেন এর জন্য আপনাদের এরলারের কাছে যেতে হবে না। ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসেই ওটা হ'তে পারে। হের মেরেৎস তাঁর ওকালতনামা লিখে দিতে পারেন, এবং ওখানেই প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ হ'তে পারে।"

মাকটেল ভুরু কোঁচকায়, কিন্তু বোঝে এলস্টারই ঠিক বলছে, তখন বলে, "তা বটে!" তারপর রূঢ়ভাবে ব'লে ওঠে, "আমাদের উপর ছেড়ে দাও।"

শান্তভাবে এলস্টার তার টেবিলে ফিরে যায়। পিঠটা বাঁকা ক'রে সে অন্য টেবিলটার উপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে যেন কানদুটো তার কাঁধের উপর লাগান আছে।

"তোমার ছেলে, না ভাইপো?" জিজ্ঞাসা করে মেরেৎস।

"আমার জামাই", বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মাকটেল, "যদি এ ব্যবস্থায় তোমার কোনও আপত্তি না থাকে, হের মেরেৎস…"

তারা দু'জনে পর পর বিলিয়ার্ড টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। এই লেন-দেন সম্পন্ন করার ব্যাপারে মেরেৎস-এর এখন প্রবল অনিচ্ছা। প্রত্যেকটা জিনিসই তার আপন পদ্ধতিতে চলুক, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় যেভাবে হোক না কেন ঠিক চলে যাবে। সে যতদিন বেঁচে আছে এরকম লেনদেন আর সে করবে না, এতে শুধু গোলমাল বাড়ে, সময় নষ্ট হয়। সে যত তাড়াতাড়ি পারে বাড়ী যেতে চায়। এই উদ্দেশ্যেই মাকটেলের সঙ্গে রাস্তায় আসে। বাজার ইতিমধ্যে বন্ধ, জানোয়ারদের মলমূত্র ঝেঁটিয়ে জড়ো করা হচ্ছে, মানুষ ও গরু-ঘোড়ার শেষ দলগুলো একসঙ্গে বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছে। পাশের গলিগুলো গাড়িতে বন্ধ, গাড়ির উপরকার জানোয়ারগুলো বেজায় নাক ডাকছে। অনেকগুলো গাড়ির উপর বিজ্ঞাপন সাঁটা। কন্ধীতে রাখবাঁধা চাষীদের হাতে ইস্তাহার। বাজারের দিনের স্বাভাবিক গোলমালের মধ্যে চাঁদার বাক্সের ঝনঝন শোনা যায়, "নির্বাচন তহবিলে চাঁদা দিন!"

টাউনহলের দেয়ালে নতুন নির্বাচনী পোস্টার সাঁটা, কয়েকটা আবার ইতিমধ্যে ছিঁড়ে ফেলাও হয়ে গেছে।

বুড়ো মেরৎস ভাবে, বাড়ী যাব, যত তাড়াতাড়ি পারি। মাটকেল তাকে টাউনহলের বাঁ-দিকের দরজার সিঁড়ির কাছে ঠেলে নিয়ে যায়। "বেশী সময় লাগবে না, হের মেরৎস।" সে বুঝছিল যে বুড়ো মেরৎস সরে পড়তে চায়। বেজায় বিরক্ত হয়ে সে ভগবানের সাহায্য চায় যাতে ব্যাপারটা নির্ঝঞ্ঝাটে মিটে যায় এবং যাতে সে আজ রাত্তেই স্ত্রীকে বলতে পারে, "এবার লেগে যাবে ঠিক।"

আধ ঘণ্টা পরে তারা হাতে একখানা করে সাদা কাগজ নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। নাকটেল তার উৎফুল্ল ভাব লুকোবার চেষ্টা করে, বুড়ো মেরৎস চেষ্টা করে তার খারাপ মেজাজ ঢাকতে। তারা যখন লম্বা বারান্দাটার প্রায় অর্ধেক পার হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ তাদের একের মনোভাব অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। নাকটেল ভাবে, সত্যি সত্যি কিছুই এখনও ঠিক হয় নি, বুড়ো মেরৎস নিশ্চয়ই শেষমুহূর্তে চুক্তিতে সই দিতে বেঁকে বসবে। বুড়ো মেরৎসও ঠিক একই কথা ভাবছিল, ভাবতে বেশ মজা লাগছিল তার। মাটকেল বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বুড়ো মেরৎসকে একটা জানলার নীচে নিজের পাশে বসায়। হুক হুক বুকে সে আবার তাকে সব গোড়া থেকে বোঝাতে সুরু করে। কথা বলতে বলতে তার চোখ পড়ে তাদের সামনের দেয়ালে ঝোলান লাল পোস্টারটার উপর। পোস্টারে লেখা "পাঁচশ" সংখ্যাটি যেন সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটু পরে সে গ্রামের সেই অদ্ভুত ছেলেটার ফটোটাকে চিনতে পারে এবং সবকিছুই বুঝে ফেলে। যাই হোক সে সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে ব্যাখ্যা চালিয়ে যায়। কিছু না ভেবেই সে বুঝতে পারে যে কোনও মতেই বুড়ো মেরৎসকে এই আবিষ্কারের অংশীদার করা চলবে না।

বেঞ্চিতে বসার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো মেরৎস ফটোটা চিনতে পেরেছিল। সে নাকটেলকে ক্রমাগত কথা বলতে দেয় যাতে ও এদিক-ওদিক না তাকায়। অবশেষে যখন বুড়ো নাকটেল উঠে দাঁড়ায় তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেরৎস। একসঙ্গেই টাউনহল ছেড়ে চলে যায় তারা। বুড়ো নাকটেলকে সে বাড়ীর দিকে রওনা করিয়ে দেবে, তারপর টাউনহলে ফিরে আসবে। তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়। এদিকে নাকটেল ঠিক করে বুড়ো মেরৎস ভাটিখানায় না যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। ওখান থেকে দীভারের ট্রাক মেৎসকে ভাইলারবাখে নিয়ে যাবে। তারপর সে এখানে ফিরে আসবে।

শেষ পর্যন্ত বুড়ো মেরৎস তার আগেকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মাকবরাবর ভাটিখানার দিকে চলতে থাকে আস্তে আস্তে। ব্যাপারটা যত সরল হবে বলে তার গোড়ায় আশা হয়েছিল আসলে তত সহজ নয়। ব্যাগে টাকা আসবে, একটা কেরানী বন্দোবস্ত করবে। কিন্তু হতভাগা ছোকরাটা আঁদ্রিয়াজ বাস্টিয়ানের খামারে দিব্যি গেড়ে বসেছে। ছেলের মারফৎ আঁদ্রিয়াজ বাস্টিয়ান এখন আবার তার কুটুম হয়েছে।

গ্রামের লোক এবং সর্বোপরি কন্যাত বাস্টিয়ান কি বলবে বলা কঠিন। গভীর চিন্তামগ্ন মেরৎস ফুটপাথে তা'র স্ক্রমেকার খুঁটেখাওয়া পায়রাগুলোর উদ্দেশ্যে ফড়ফড় শব্দ করে। সে উভয় সঙ্কটে পড়েছে। এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো ঠিক হয় নি তার। কিন্তু এখন ব্যাপারটায় বাধা দেওয়ার জন্য জোর খাটাতে যাওয়া…এদিকে ওই গৌয়ার-গোবিন্দ ছেলেটা। ফুটপাতে ছড়ির খোঁচা দিতে দিতে সে তার প্রত্যেকটি চিন্তাকে আরও জোরদার করে। তা ছাড়া বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙলে গ্রামে মুখরোচক আলোচনা সুরু হয়ে যাবে। তার ফলে যে গোলমাল হবে এই টাকায় তা পোষাবে না। সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল এ সব ছন্না বিয়ে পর্যন্ত বন্ধ রাখা। বিজ্ঞিনেনে আর কোনও কর্তৃত্বের দরকার নেই তার, সেখানে সে নিজেই নিজের কর্তা। ছেলেটা বা টাকাটা—কোনটাই তার হাত ফসকে যাবে না। বাড়ীতে সে কিছুই বলবে না বলে ঠিক করে। কোনও ক্রমেই সে তার ছেলের উপর নির্ভর করতে পা'রে না যতক্ষণ না ছেলে ওই শুকনো আপেলের মত রক্তশূন্য মেয়েটার সঙ্গে রয়েছে।

বুড়ো মেরৎস উল্টোদিকের গলিতে না ঢোকা পর্যন্ত নাকটেল অপেক্ষা করে। সে ভাবতে থাকে কোন অফিসে তার যাওয়া উচিত, দাবি দেওয়ার জন্য কি কথা তার বলা উচিত। এই তিন মাস শেষ হবার আগে টাকাটা তার হাতে আসতে পারে কি না। যে লোকটা যথেষ্ট পাপ করেছে এমন একটা উন্মাদকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করলে পুরস্কার ত তার ন্যায্য প্রাপ্য। না কি তাড়াতাড়ি স্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা ভাল? স্ত্রীর মতকে সে যথেষ্ট মূল্য দেয়। কয়েক পা এগোতেই সে চৌধুরীতে পৌঁছায়। এক ঝাঁক পায়রা আকাশে

ওকে, আবার নেমে পড়ে তার পিছনে সেই জায়গাতেই বসে।

টাকা যেমন দুর্লভ তেমনি তিক্ত। মাকটেন জানত টাকা পাবার জন্ত কত তিক্ততা সইতে হয় এবং পাওয়া কত কঠিন। তা ছাড়া একটা বিরূপতার আভাস দেখা দেয় তার মনে। খুন, ডাকাতি, মিথ্যাবলা বা এই ধরনের অপরাধের সম্পর্কে বিরূপতার চেয়ে এটা শক্তিশালী। পলাতক ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিটি মানুষের মনে যে অনন্ত ঘৃণা এ তাই। মাকটেন ভাবে যদি নিজের নাম গোপন রেখে এটা করা যেত!—কেন আমি এর মধ্যে নাক গলাব? ওকে ধরবার জন্ত তাদের কেন সাহায্য করব? অন্ত সবাই থাকতে আমিই বা কেন ওকে জেলে পুরতে সাহায্য করব? আমাকে কবে কে সাহায্য করেছে? বুড়ো বয়সের শেষ ক'বছর আমার কি করে কাটছে? তিনি কি এগিয়ে এসে আমায় সাহায্য করেছেন? আমার উঠোন থেকে মুরগীর বাক্সগুলো কি তিনি বিনা পয়সায় সরাবার ব্যবস্থা করেছিলেন? মাকটেন নিজেই জানত না এই তিনি বলতে সে কাকে বোঝাচ্ছে,—বুড়ো মেথৎসকে, জমিদার আলজিন মাইয়ারকে, রাষ্ট্রকে না ভগবানকে।

সে বাড়ী ফিরে এলে তার স্ত্রী তার দিকে একবার তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করে, "কি হয়েছে?" অন্তদিনের মত মাকটেন নীচের তলায় মেয়ের ঘরে গিয়ে নাতনীর সঙ্গে খেলতে না বসে স্ত্রীর কাছেই বসে এবং তাকে সব কথা বলে। মাকটেনের স্ত্রী ছিল বেঁটে ও বিবর্ণ, তার চোখদুটো ছোট ও কালো, চুলে কলপ দেওয়া। সব শুনে সে বেজায় অবাক্ হয়ে যায়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করে। শেষ পর্যন্ত সে তার স্বামীর কাজে সায় দেয়। খেতে বসেই মাকটেন তার কোটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেয়। তার দুর্বল প্রাণটা যখনই বেরিয়ে যাবে মনে হ'ত তখনই সে এরকম করত। স্ত্রী ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। মাকটেন যখন তার ভবিষ্য সঙ্গে তাল রেখে জীবনে এই প্রথম শান্তভাবে বলে, "সময়ে ত সকলকেই যেতে হবে," তার স্ত্রী তখন আরও ভয় পেয়ে যায়।

। ৫ ।

"আমার কি আবার শুধু শুধু অপেক্ষা করতে হবে?"

"না, মারি, আমি তোমার সঙ্গে যাব।" জোহান বলে।

যেই ওরা সরাইয়ের বাগানে বসতে যাবে বৃষ্টি নেমে পড়ে। বাড়ীটার ভিতরে চলে যায় ওরা। খোলা দরজার ভিতর দিয়ে এখনও দেখা যায় দু'তার কাঠের কারখানার চৌকো চেহারাটা, বৃষ্টির পরদায় ঢাকা, খালের খোলা জলের ওপারে বাদামিরঙের রেলপাতের ফাঁকে ফাঁকে ঝকমিক করছে।

"আজ আর বীয়ার নয়, শুধু দু'কাপ কফি। সহরের এক বন্ধুর কাছ থেকে এক মার্ক ধার করে এনেছি।"

মারির হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নেয় জোহান। পরস্পরের হাত না ছেড়েই কফিতে চুমুক দেয় ওরা। জোহান বলে, "এই হয়ত শেষবার।"

তার হাতের মধ্যে মারির হাতখানার পরিবর্তন সে বুঝতে পারে। এই প্রথম সে মারির মুখে গভীর অসহায় অস্থিরতা লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামিয়ে নেয় মারি, যেন সে নিজের আবেগের জন্ত লজ্জিত। তারপর মুখখানা সম্পূর্ণ অন্তদিকে ঘুরিয়ে রাখে। দু'হাত দিয়ে কাপটা ধরে আস্তে আস্তে কফিতে চুমুক দিতে থাকে সে। কফি খাওয়া শেষ হ'তে হ'তেই তার মুখখানা আবার শান্ত হয়ে যায়। সে বলে, "আমরা একসঙ্গে সহরে যেতে চেয়েছিলাম, তাই না?"

"আমাদের কি হবে, মারি? বেকার অবস্থায় হয়ত কালেভদ্রে তুমি সহরে আসবে, আর আমি?—গায়ে একটা সার্টের সংস্থান পর্যন্ত নেই।"

"আমি আগে ভাবতাম হয়ত বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে…।"

"তোমার ভাই পাউল, তোমার বাবা—তুমি জান সে হবার নয়।" আবার সে তার হাত ধরে। "তুমি অন্ত কাউকে পেয়ে যাবে, ভাল লোক একজন।"

শান্তভাবে মারি বলে, "আহা, কথাটা তা নয়।"

সে আবার তার হাতখানা টেনে নেয়, শক্ত ভাবে আঙুলগুলোকে মুঠো করে রাখে। এসব ব্যাপারে যেমন সাধারণতঃ হয় ওদের দু'জনের বেলাও গোড়ায় তাই হয়েছিল, মারিরও, জোহানেরও—নিঃসঙ্গ হ'তে চায় নি। কিন্তু তারপর হয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণ অন্ত রকম। জোহানের পক্ষেও তাই ব'লেই মারি বরাবর বিশ্বাস করে এসেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বোধ হয় জোহান শুধু ভেবেছিল, এই চার-পাঁচ বার, তারপরই শেষ, তারপরেই নিজের পথ ধরব। কিন্তু মারি বিশ্বাস করেছিল এ চিরদিন বর্তমানে-ভবিষ্যতে, সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দিনে স্থায়ী যতদিন না মৃত্যু এসে বিচ্ছেদ ঘটায়। মুহূর্তের জন্ত মনে হয় সে এবং তার সমগ্র জীবনটা যেন একটা তৃতীয়

যন্ত্রণাময়। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেদনার উপশম হয়, ক্ষত আরোগ্য হ'তে শুরু করে। সে নতিস্বীকার করে, সে জানত প্রতিরোধ নিষ্ফল। মেয়েটার হাতখানা কেন জোহানের হাতে রাখে, বলে, "শীগগিরই আমায় ভুলে যাবে তুমি।"

"কক্ষনও না, কক্ষনও না, কোনও দিন না।" জোহান উঠে পড়ে—মারি ভয় করছিল ও বুঝি দাম চুকিয়ে দিতে যাচ্ছে, কিন্তু তা নয়, দরজায় গিয়ে বাইরে তাকানর জন্য উঠেছে। কারখানাটা যেন আলোয় আঁকা একটা দাবার ছক। যে ভাবনাটা ওর মাথায় খেলে যায় সে হ'ল এখনও লোক কাজ করছে এখানে-সেখানে, কিছু কিছু জিনিসের এখনও চাহিদা রয়েছে, যেমন জুতোর কালির। ব'সে প'ড়ে একখানা হাত দিয়ে শক্ত করে মারিকে জড়িয়ে ধরে ও।

"কি হ'ল? তোমার কি হয়েছে বলত?"

"কিছু না, কিছু না।"

তারা একই সঙ্গে ঠিক করে যে কিছুই যেন বলা হয়নি এমন ভাব দেখাবে। পরস্পরের মুখে মুখ চেপে ধরে ওরা। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে পরস্পরের কোমল সোহাগ। নেমে আসা অন্ধকার, বাগের পেছন থেকে আসা আলোর দ্যুতি, বর্ষা—এ সমস্তই ত চিরন্তন, অবিনশ্বর। শেষ পর্যন্ত জোহান নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে, "এবার আমাদের দাম দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিতে হবে।"

॥ ৬ ॥

"ছুঁচো কোথাকার! মাদী শুয়োর! লাল খানকি কাঁহাকা! উল্টো ঘোড়ায় বাজি ধরেছিস, এবার তুই ফাঁদে পা দিয়েছিস্।"

ৎসিল্লিগ তার লোকজনকে জড়ো করে গ্রাম থেকে বেরোবার সমস্ত রাস্তার মুখে দাঁড় করিয়েছে। নাৎসেদের ট্রাকটা প্রথমে গিয়েছিল সবচেয়ে দূরবর্তী কর্মকেন্দ্র বয়রেনে। তারপর কিছু লোক গাড়ি নিয়ে সিভারতাইলারবাখে এসেছে, কিছু নির্বাচনের জিনিসপত্র নিয়ে হেঁটে বাটৎসেনবাখে গিয়েছে।"

"ওই দেখ রেঙেলের বাপটা এসেছে, হেলাল কাঁহাকা। ওর নিজের মরদ ত গিয়েছে, এবার ওনার জন্য মরদ চাই। তা আমরা আছি। ধর ওকে—"

একটা বিবর্ণ হাড়সার ছেলে তার সমস্ত ওজন নিয়ে ৎসিল্লিগের বেল্ট ধ'রে ঝুলে পড়ে এবং যেখানে পারে দাঁত বসাতে থাকে। ৎসিল্লিগ ফ্রাউ রেঙেলকে ধরে থাকে। একটা বেঁটে, কাদামাখা এক, এ চাষী ওর কাটাটা ঠেলে খোলার চেষ্টা করে। ৎসিল্লিগ ছেলেটাকে তাড়িয়ে দেয়, সে আরেক দলকে ডেকে আনবার জন্য ক্ষেতের দিকে দৌড় দেয়। ফ্রাউ রেঙেলের স্কার্টের তলায় ওরা যে নধর মাংস দেখতে পাবে আশা করেছিল তা পেল না, দেখল একটা মোটা-সোটা সচ্ছল ইহুদির। "এই! এই!—কের যদি এখানে মুখ দেখাস!"

সুকৌশলে আত্মরক্ষা করে ফ্রাউ রেঙেল। তার মুখটা বিবর্ণ এবং কঠোর, কোন বিস্ময়ের লক্ষণ নেই। কালো চোখ জোড়া দিয়ে সে প্রথমে ৎসিল্লিগের দিকে কটমট করে চায়, পরে সেই বেঁটে কাদামাখা চাষীটার দিকে। সে লোকটা এদিকে পাকানো মুঠো ওর মুখের উপর এবং চোখের গর্তের মধ্যে ঠেসে ধরেছে যাতে ও উল্টে পিছনে পড়ে। ছেলেটা মাঠের মধ্যে থেমে গিয়েছিল, কারণ সে দেখতে পেল ফ্রাউ রেঙেল সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পায়ের উপর উঠে দাঁড়াল এবং স্পষ্টতঃই সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম। কাজেই মত বদলে সে রাস্তার দিকে ফিরে আসে। তাড়াতাড়ি সে তাঁদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ইস্তাহার-গুলোকে কুড়িয়ে নেয়।

মিনিট কুড়িক পরে ৎসিল্লিগ নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে কাজে যাবার পোশাক পরছিল। তার স্ত্রী বেঁটে-খাটো চাষীমেয়ে, এমন কোঁকড়া এবং ঢ্যাঙা যাতে তার মা ব'লে মনে হয়। সে তখন খাবার টেবিলে আটজনের জন্য আসন সাজাচ্ছিল।

দরজায় টোকার আওয়াজ শুনে দু'জনেই ওরা অবাক হয়, বলে, "ভিতরে এস।" অন্ধকারে ৎসিল্লিগ ঠাওর করতে পারে না কে ঢুকল। কিন্তু স্ত্রীকণ্ঠের "ভিতরে আসিতে পারি?" আওয়াজটা যেন পরিচিত মনে হয়।

সে আলোটা জ্বালায়, ওরা হতভম্ব ভাবে পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ৎসিল্লিগ মাথাটা সামনে এগিয়ে দেয়। পিছন থেকে পর্যন্ত মারমুখো ভঙ্গি বুঝতে পেরে তার স্ত্রী ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে। ফ্রাউ রেঙেল ৎসিল্লিগের পরিচিত মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ঘরের চারপাশে তাকায়। কোঁকড়া স্ত্রীলোকটা এবং আটজনের জন্য পাতা টেবিলটা তার নজরে পড়ে। আহোলা টাটকা গাছের ডাল দিয়ে তৈরী একটা বিরাট খড়িকা ঝুলছে চুল্লীর উপর। এক মুহূর্ত পরেই ৎসিল্লিগের হতভম্ব ভাবটা দারুণ ক্রোধে পরিণত হয়।

সে শিকটা তুলে নেয়।

"বেরোও, বেরোও"—অপরিচিত মেয়েটার উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে ৎসিল্লিগের স্ত্রী।

এক ঝটকায় ৎসিজিশের হাতের তলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে ফ্রাউ রেগেন। সে টেবিলের উপর সব চাইতে কাছের প্লেটখানায় কয়েকখানা ইস্তাহার রেখে দেয়। ৎসিজিশ তার হাত ধ'রে বলে, "বেরোও"। তার বউয়ের মুখটা যেন ভয়ে আরও কুঁচকে গিয়েছিল। সে স্বামীর পিঠে হাত রাখে। অলক্ষিতে ওর হাত থেকে শিকটা সরিয়ে নেয় সে।

"তোমাদের কি সব সময়েই এই রেওয়াজ নাকি? মেয়েছেলেদের এগিয়ে দেওয়া?"

"তোমরাও ত তাদের কাজে পাঠাও, তাই নয় কি? না কি তুমি একাই ক্ষেতের কাজে যাও?"

"কের যদি তুমি এখানে পা দাও…"

"তোমার সাধ্য নেই আমায় বাইরে রাখবার!"

টেবিল থেকে ইস্তাহারগুলো ঝেঁটিয়ে তুলে নিয়ে মুঠোর মধ্যে দলা পাকায় ৎসিজিশ। একটা কাগজের বল ওর মুখের দিকে ছুঁড়ে মারে আর একটা ছুরীর দিকে। তারপর বলে, "বেরোও।"

সে ওকে ধাক্কা মেরে উঠোনে নিয়ে ফেলে। গোবর ও আবর্জনায় ভরা কাদামাখা ছোট উঠোনটায় একদল ছেলেমেয়ে একটা উল্টোনো ঠেলাগাড়ির উপর খেলছিল। সে হাত তুলতেই ফ্রাউ রেগেন চেঁচিয়ে ডাকে, "এস, উলরিস্!" ছেঁড়া পোষাক-পরা একটা রোগা ছেলে, যাকে ৎসিজিশ নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্ধকারে অপরিচিত ব'লে চিনতেও পারে নি, সে গাড়িটার জোয়ালের উপর দিয়ে হড়কে নেমে আসে এবং মেয়েটার দিকে দৌড় দেয়।

ৎসিজিশ তার বাড়ীর ভিতর ফিরে যায়।

কয়েকখানা ইস্তাহার কাদার মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে। সে নীচু হয়ে একখানা ইস্তাহার তুলে খোলা দরজাটার সামনে ধরে। তোলক্-এর কারখানায় তাড়াতাড়িতে ছাপা লেখা ও ফটো ধেবড়ে গিয়েছে, এঁকে-বেঁকে রয়েছে। তা সত্বেও ৎসিজিশ একটা লোকের ছবি চিনতে পারে: চতুর দৃষ্টি, ছুঁচোলো দাড়ি—"জমি, কারখানা, রেলপথ, সমস্ত যন্ত্রপাতি নিজেদের হাতে নাও, চোখের মণির মত রক্ষা কর। এখন থেকে এসব তোমাদের সম্পত্তি হ'ল, শুধু তোমাদেরই।

যেন সে এখনও মুখটা চিনতে পারে নি এবং লোকটা যেন সে ঠেকাতে চায় এমন ভাবে বিদ্যুৎগতিতে মুখখানার মাঝামাঝি দিয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল ৎসিজিশ।

সে উঠোনে ফিরে যায়, চিন্তাকুল ভাবে ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা চুলওয়ালা মাথাটা দোলাতে থাকে। যে শক্তিকে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব এবং যাকে সংযত করা আরও অসম্ভব এমন এক শক্তির চকিত তাড়নায় যেন সে শূন্যে হাত ছুঁড়তে থাকে, মাটিতে পা দাপাতে থাকে। চারপাশে কাদা ছিটিয়ে যায়, বাচ্চারা ভয় পেয়ে বাড়ীর ভিতর দৌড় দেয়।

(ক্রমশঃ)

কবি উদাসী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জরাবিহীন বৃদ্ধ কবি থাকেন তো আনন্দে,
চঞ্চল হ'ন, ভেসে আসা পারিজাতের গন্ধে।
শিবের ভালের খণ্ড শশী,
তাঁর আকাশেই থাকে বসি,
আলোক যে তার এখনও তাঁর ধরতে চাহেন ছন্দে।

২

মধুমত্ত মধুব্রত ঘুরছে তাঁহার বুকে,
খুঁজে খুঁজে আম মুকুলের কাছেই ভ্রমর ঝুঁকে।
নাগেশ্বরের পরাগ ঝাঁকে—
ললাটে তাঁর আবীর আঁকে,
উড়ো চকোর আজও আসে—কাহার সুধা খুঁজে?

৩

আকাশ পথে মানস সরসে ডাক দিয়ে যায় নিত্য
অমৃতের হায় অন্বেষণে, পক্ক হল চিত্ত।
পড়ছে চোখে ময়ূর পাখা,—
চলে না আর আটকে রাখা
গোবিন্দ ওই আসেন বুঝি— গান হ'ল গীত ত।

পল্লীকণ্টক

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ফুলকাঁটা ফোটে যদি ও-অধর পা'র,—
যেও না যেও না প্রিয়ে ফুল-বাগিচায়!
চৌপাফুল ডাঁসা ডাঁসা
হয়ত লাগিবে খাসা
ছুটে যাবে ভালবাসা কাঁটার জ্বালায়!

বাবুলার বনে যদি মিঠে-হাওয়া বয়,
ঝিরি ঝিরি গানে যদি হও তন্ময়,
সেথা যদি মন টানে
যেও প্রিয়ে সাবধানে,
বাবুলার কাঁটা হায় বড় বিষময়!

বৈঁচি ফলের স্বাদ অম্লমধুর,
জিভ্ দিয়ে লালা ঝরে পল্লীবধূর,
ডালে তার কাঁটা আছে,
সাবধানে যেও কাছে,
কাঁটার তাড়নে হবে যাতনা-বিধুর!

শিয়ালকাঁটার বনে যেও না প্রিয়ে,
পাতার বাহার দেখে কি হবে গিয়ে!
সেখানে-যে গাছে গাছে
কাঁটা মুখ তুলে আছে,
জ্বালাবে তোমায় রূঢ় পরশ দিয়ে!

পল্লীপথের মাঝে চলা যে মিছে,
কাঁটা মনসারা আছে সামনে পিছে;
সারা ডাল কাঁটাভরা,
বাইরে যায় না ধরা,
যদিও শোভায় তারা মন টানিছে!

সাধ যদি হয় প্রিয়ে লেবুর ফুলে,
ভুল ক'রে নিও না'ক খোঁপায় তুলে!
কাঁটা আছে ডালভরা
আঁচল পড়িবে ধরা
হয়ত হঠাৎ যাবে বসন খুলে!

গন্ধ ছড়ায় বন বাতাস-কাঁপা,
সেখানে যে আছে ফুটে কাঠালী চাঁপা;
ছোট ছোট কাঁটা-ভরা
ডালগুলি নুয়ে-পড়া,
কাঁটার খোঁচা প্রিয়ে যায় কি চাপা?

কেয়াফুল সাবধানে আঙুলে নিও,
আলগোছে ছুঁয়ে হাতে ধীরে তুলিও!
হয়ত কাঁটার ঘায়ে
যাতনা ফুটিবে গায়ে,
কেয়ারেণু মুখে মেখে জ্বালা সহিও!

দীঘিতে যেও না ছুঁতে কমল-কুঁড়ি,
সেখানে রয়েছে কাঁটা মৃণাল জুড়ি!
যদি কাছে যেতে পার,
বিপদ ঘনাবে আরও,
নাগশিশু সদা সেথা বেড়ায় ঘুরি!

শেয়াকুল-কাঁটা কোথা এড়িয়ে যাবে?
চরণে ফুটিলে পথে সময় পাবে!
নিদাঘ বাতাস এসে
দোল দিয়ে যাবে কেশে,
তোমার তনুর ক্ষণ-পরশ চাবে!

কাঁটার কুহক জানে মুক্তকেশী,
আড়ালে সে কাঁটা রাখে, রীতি বিদেশী!
কণ্টিকারীর বনে
যেও না'ক আনমনে,
নীলঝাঁটি, কাঁটাবটে কুটিল বেশী!

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে বেল-ধুতুরা,
কাঁটায় কাটায় ব্যাধি নাটা-গোখুরা,
কাঁটা-বেগুনের তোর
মিঠে আশা রাতভোর,
বাসর স্মৃতিতে হলো তন্দ্রাতুরা!

শিমুল ব্যাকুল করে কাঁটায় বিঁধে,
কত আশা খেজুরের পাতায় সিঁধে!
বন-বাদাড়ের তলে
যেও নাক কুতূহলে,
কাঁটা বৃহতীরে হাতে কেনো না সিধে!

আনারস-রস যদি ডাকে—আয়, আয়!
তবুও সে পথে কেবা চরণ বাড়ায়!
কচি কাঁচা পাতা হেরি'
সেখানে ক'র না দেরি,
পেয়ে কাছে হাতে পাছে নাগিনী জড়ায়!

কণ্টকে ভরা প্রিয়ে পল্লীকানন,
সেথা শুধু পথে পথে কাঁটা অগণন,
কিবা হবে বনে ঘুরে?
—তার চেয়ে এ দুপুরে
নিভৃতে স্বপন গড়ি আমরা দু'জন!

মানুষের মনের লীলা বিচিত্র। এই ভাবে বুকে প্রথম চিড় খেল। সহজেই দেবী আজকাল ধৈর্য-হারা হয়। নটু ততই বিরক্ত হয়। ভাবে, মা বলেছে ঠিকই, একে নিয়ে ঘর করা যাবে না। আরো শাসন করতে হবে। ক্রমেই যেন হিস্টিরিক হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, চিঠিটা পালটে দিয়েছিল বিউটি। বাড়ীতে নানা অশান্তি নটুর আর ভাল লাগে না। বিউটি এ সুযোগ ছাড়ল না। নানা ভাবে দু'দিকে বিষ ছড়ায়। নটু কলকাতার সওদাগরি অফিসে চাকরি নেয়। সামান্য চাকরি মাইনে কিছুই নয়, কিন্তু চাকরির জন্যে সকাল আটটায় ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে, ফেরে সন্ধ্যায়। মাইনের কিছুটা মাকে হাত-খরচ দেয়, বাকিটা জমায়। সর্বদা সতর্ক হয়ে থাকে, যাতে উড়নচণ্ডীদেবীর হাতে টাকা না পড়ে। মা বলেছে তোর পুঁটি মাছের প্রাণ, ওর হাতে টাকা পড়লে আর রক্ষে নেই। এদিকে দেবীর ভরাভর্তি হয়ে এল। প্রসবের আগেই বিউটি কৌশল করে নটুকে পাঠিয়ে দিল রাজগীরে বেড়াতে। অথচ বাড়ীতে থাকলেই বা নটু কতটা কি করত জানি না। কিন্তু নিরুপায় ব্যাকুল হয়ে দেবী নটুকেই লেখে, "ওগো, তুমি এস, আমার বড় ভয় করছে, আর দেরি করলে আমায় দেখতে পাবে না।" হয়ত বা এ চিঠি পেলে নটু আসত কিন্তু সে চিঠি আদৌ পৌঁছল না তার হাতে। ক্রূর হাসি হেসে বিউটি ছিঁড়ে ফেলে দিল চিঠিটা। এধারে চিরকালের দায়িত্বজ্ঞানহীন নটু চিঠি দিল তার রাজগীরের নানা ভ্রমণ কাহিনী দিয়ে। সে চিঠি পড়ে দেবীর বুকে অভিমান আর ধরে না। দেবী আর চিঠি দিল না। শরীরে শক্তি নেই, প্রসব হ'তে খুব কষ্ট পেল দেবী। শেষে মেয়ে যদিবা হ'ল মা আর বাঁচে না। শেষে বিউটির হাতে-পায়ে ধরে শিববাবু তাকে নিতে এলেন। বিউটি স্পষ্ট বলে দিল এভাবে আদর মেয়েকে দেবেন না। কাতর মুখে শিববাবু বললেন, আদর কি ওদের দিতে-হয় বৌমা? ওরা নিজেরাই তা নেয় যে। পায়ের দিক ফেলে ঠোঁট ওল্টাল বিউটি। শিববাবু ফিরে গেলেন। এর পর মেয়ে দেখে নাক সিঁটকাল বিউটি। বলল, ঐ ত মা'র রূপের বাহার তারই ত মেয়ে তেমনি হয়েছে। তবু দেবীর চোখে একটা নতুন জগতের আবরণ যেন খুলে গেল। ঐ মেয়ের মুখ দেখে দেখে তার যেন আশ আর মেটে না।

অত বাক্য-যন্ত্রণা ভুলে বিউটিকেই জিগ্যেস করে, মা খুকীর নাম নীলধারা দিলে কেমন হয়? মেয়ের রং তত ফরসা নয়। রোগা হাড় জিরজিরে দুর্বল চেহারা, পাণ্ডু রং রিকেটিক রোগের দেখতে। মায়ের অনাহারের মাশুল। বিউটি বলে, কিসের ধারা? কান্নার না সর্দির? কাঁচকলা বলে ডাকে বিউটি। শিববাবু আদর করে নাম দেন মনোরমা। সে নাম বাতিল হয় তক্ষুনি।

অনেকদিন ন'মামীর খবর আমরা নেই নি। এই ছোট মামীর সঙ্গে ভারি ভাব ছিল ন'মামীর। এদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ-কলুষিত বিলাসিতাময় জগৎ ছাড়া যে একটি উদার মমতাময় জগৎ আছে, এই দুটি তরুণী তার সন্ধান রাখত। স্বল্প অবকাশের মধ্যেও তাই এদের নিবিড় বন্ধন ছিল। অর্থহীন কথা সেখানে প্রাণের সংযোগ স্থাপন করেছিল। ন'মামীর পুত্রশোকে ব্যাকুল-অন্তঃকরণ দেবীর কথার মধ্যে যেন শান্তির সন্ধান পেয়েছিল। দেবী তাকে বোঝাত, জানেনই ত মামীমা, সংসারটা বড় দুঃখের জায়গা, সে রাজার

মত এসেছিল, রাজার মত চলে গেল। সংসারের কোন কালি গ্লানি শোক তাপ তাকে ছুঁতে পেল না। এ কি কম কথা? সংসারের মধ্যে ঢুকলে হয়ত কত কষ্ট পেতে হ'ত তাকে। টাকায় ত আর সব কষ্ট যায় না। একথা মায়ার মত আর কে জানে?

দেবী মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করত—
তোমার খোকা সেকি হারায়?
আছে তোমার চোখের তারায়,
আছে তোমার বুকের মধ্যখানে।

অদৃষ্টের পরিহাস, যে বাড়ীতে একটি শিশু তার রাজৈশ্বর্য হেলায় ফেলে চলে গেল, সেই বাড়ীতেই একটি অবহেলিত শিশু সামান্য একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষও না পেয়ে বেড়ে উঠল। সেই রোগা মেয়ে মা'র কোলের আশায় দিবারাত্রি কাঁদে। কিন্তু দুর্ভাগা মায়ের অবসর নেই তাকে কোলে নেবার। বিউটির ঘরেও শিশুর প্রবেশাধিকার নেই, 'ছেলেগুলো ঠিকে ঝি'য়ের মত চৌকাঠের বাইরে শিশুকে বসিয়ে দেবী বিউটির ঘরের কাজ করে। নটু ফিরল রাজগীর থেকে। শিশু-হাতের কচি বাঁধনে বাঁধা পড়ল কিছুটা। যে নটু দীর্ঘকাল অন্দর মহলের ত্রিসীমানা মাড়াত না, সে এখন দেখা যেত ছুটির দিনে বসে বসে দোলনা দোলাচ্ছে, কখনো বা আঙুলে করে মধু চোষাচ্ছে মেয়েকে। কখনো বা মেয়েকে কোলে নিয়ে দোলাচ্ছে। বিউটির চোখে পড়লে অবিশ্যি রক্ষা ছিল না। দেবীকে বলত, বা, বেশ পাশকরা চাকর পেয়েছ যা হোক। যখন কিছু পারত না তখন বলত, অ নটু, কতদিন তোর বাঁশী শুনি নি। দিদি একটা নতুন গান শিখেছে 'সে যে পাশে এসে বসেছিল' ওটা তুলে নে দেখি। নটু ব্যস্ত হয়ে উঠে যেত। রাত দশটা অবধি গানের জলসা চলত। দিদি নাচছে, নটু বাঁশী বাজাচ্ছে, "ঝমু ঝমু ঝুমু ঝুম।" দিদি নাচে-গানে সবেতেই পটু। নটু আবার অন্তমনস্ক হয়ে যায়। বিউটি বলে দেবীকে, আমার দিদ-শাশুড়ী কচি ছেলে হ'লে গোয়াল ঘরে থাকতেন, ছেলে কাঁদলেই আমার দিদ-শ্বশুর বের করে দিতেন ঘর থেকে। কার উদ্দেশে যে এ পাঁচালি গাওয়া তা বুঝতে দেরি হ'ত না দেবীর। নটুকে বিউটি বলত তুই বরং ছাদে শো, ঘরের জানলা-দরজা খুলে শুলে ঠাণ্ডা লাগবে কাঁচকলার। এই ভাবে ছেলেকে সরিয়ে দিত। মেয়ের জন্তে আধ সের দুধের বন্দোবস্ত করেছিল নটু। সেটা ক্ষীর হয়ে বিউটির পেটে যেত। নীল রং-এর খড়ি-গোলা জলের মত দুধ মেয়ের জন্তে পেত দেবী। সে দুধে পেট ভরে না। মেয়ে দিবারাত্রির কাঁদে। কিন্তু নটুকে কিছু বলার উপায় নেই। বাড়ীর মাসি ইত্যাদিকে দিয়ে মেয়েকে কাঁদুনের মাদুলি দেওয়া হ'ল, তবুও আহারের বন্দোবস্ত করার কথা নটুর মনে এল না। চিনিবিহিন সেই খড়ি-গোলা জল শিশু খেতে চায় না। দেবীর মনে পড়ে অশ্বত্থামার মা খড়ি-গোলা জল দিয়ে তার ছেলের দুধ খাওয়ার বাসনা ঘুচিয়েছিল সেই কথা।

মায়ার ঘর ভর্তি তার মরা ছেলের জিনিষ। দেবীর মেয়ের অকল্যাণ হবে ভেবে তা দিতে ভরসা সে পায় না। দেবী চায় না পাছে মায়ার কত প্রাণ আহত হয় ভেবে। এই ভাবে কাটে দু'জনের দিন। দেবী লক্ষ্য করে মায়া যেন দিনে দিনে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। দেবীর বড় ভাবনা হয় তার জন্তে। এর মধ্যে নটুর খুব অসুখ হ'ল। প্রথম প্রথম রোজ রাত্তে বমি করত, অম্বলের বমি। বেধামটা বমি করত দুলেই সে মেঝে সাফ হয়ে যেত, অথচ বিউটির কোন ভাবনা চিন্তা নেই। ভয়ে ভয়ে দেবী বিউটিকে বলল, রোজ রাত্তে অম্বলের বমি করেন, বোলভাত খেলে বোধ হয় ভাল হয়। বিউটি তার পান-দোক্তা-খাওয়া ঠোঁট উল্টে পিচ ফেলে বলল, "কেন, বরের সোহাগটুকু ভাল লাগে, ভাকার পরিষ্কার করতে আপত্তি? নটু ত আর খোকা নয় যে সে বুঝে খেতে পারবে না? মা'র চেয়ে যে ভালবাসে তাকেই বলে ডান।" তবু দেবীর মন মানে না। নটুর কাছে বলতে গিয়েও বিপত্তি। নটু বলল, সত্যি, তোমার কাজ বাড়ে, আমি বরং বাইরে গিয়ে বমি করব এখন। কি করে দেবী বোঝায় যে মাস-শাশুড়ীর তিনটে ছেলেমেয়ের পাইখানা যদি পরিষ্কার করতে পারে মুখবুঁজে আর নটুর বমির বেলাই বা তার এত খাটুনি কেন বোধ হবে?

দেবী বড় দুশ্চিন্তায় পড়ল। এর পর আরম্ভ হ'ল

হাঁপানি। সারাদিন বেশ থাকে, রাত হলেই হাঁপায় নটু। বসে বসে রাত কেটে যায় অথচ বিউটির মনে দৃক্‌পাত নেই। নিরুপায় হয়ে দেবী শ্বশুরকে বলে। শ্বশুর বলেন, দাঁড়াও, বই দেখে ওষুধ ঠিক করব। চোখে চশমা লাগিয়ে হোমিওপ্যাথিক বই পড়ে বলেন, নেট্রামমিউর এক ডোজ দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অথচ কষ্ট কমার কোন লক্ষণ নেই। এবার দেবী নানা বার-ব্রত আরম্ভ করল। তাছাড়া বারবেলে সোমবার, বারবেলে মঙ্গলবার—এতে বিউটিরও খানিক উৎসাহ দেখা যায়। সপ্তাহে দু'দিন চাল খরচা কমলো। খালিপেটে থাকা দেবীর প্রায় অভ্যাস হয়ে গেছে। যদি তার কষ্ট হলে নটুর বিন্দুমাত্র কষ্ট কমে সব সইতে পারে দেবী। নটুর জন্যেই ত তার এই নরক বাস। নটুর মুখের হাসির জন্যেই ত বিউটিকে খুশী করার এই আপ্রাণ চেষ্টা। সেই নটু দিনে দিনে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। কি করবে দেবী সারারাত ধরে বসে বসে হোমিওপ্যাথিক বই নিয়ে পড়ে। কিন্তু সব যেন মাথার মধ্যে গুলিয়ে যায়। বিউটি ত শুধু মেয়ে অপয়া বলেই হরি আনন্দে আছে। নিরুপায় হয়ে শিববাবুকে চিঠি লেখে দেবী। বাবা ওঁর বড় অসুখ, আমি কি করব?

শিববাবু ব্যস্ত হয়ে আসেন। কিন্তু ডাক্তার দেখাতে হবে লুকিয়ে। নইলে বিউটির মান যাবে। জামাইকে নেমন্তন্ন করে নিজের ভাগের বাড়ী নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখান। ওষুধ-পথ্যর ব্যবস্থা করে দেন ডাক্তার। আজ প্রথম দেবী বাবাকে বলে, ওষুধের টাকা আপনাকে দিতে হবে বাবা। বাবা বিস্মিত হন। জানেন জামাই চাকরি করছে। বিউটির চালচলনে ধনী-গৃহের দেমাক পরিস্ফুট। তা ছাড়া দেবীকে চেনেন ভালো করেই। সহজে হাত পাতার মেয়ে সে নয়। কিন্তু মুখে বলেন, ঠিক বলেছিস দেবী, এসব ত আমার মাথায় আসে না, তোর মা থাকলে বলে দিত। ওষুধ ত হ'ল। পথ্য নিয়েই গোলমাল। প্রেসার বেশী দেখে ডাক্তার নুন বন্ধ করেছে। তা ছাড়া ফলমূল কেই বা কিনে আনবে বা খেসোরাশী মানুষ নটু। কষ্ট তার হচ্ছে সত্যি। কিন্তু মা যখন ব্যস্ত নয়, নিজের ব্যস্ত হবার কিছু নেই। সবটাই দেবীর ঝোঁক। এই ঝোঁক আর জেদ ভাবলেই নটু যেন দেবীকে সইতে পারে না। তা ছাড়া ব্যাপারটা খরচান্তি। খরচ করতে ভালবাসে না নটু। ঠিক ভালবাসে না যে তা নয়, আপাত-মধুর যা তাতে খরচ করতে ভালবাসে। কিন্তু কষ্ট করে আপেল চিবোলে আখেরে ভালো হবে, এ জিনিসটা তার পছন্দ নয়। অসুখটা যে তার, এ কথাটাও যেমন মনে থাকে না, আপেলটাও যে নিজে খাবে একথাটাও তেমনি মনে থাকে না। অকারণ টাকায় আর খরচ হওয়ার দেবীর জেদকেই দায়ী করে। সারারাত দেবী যে তার বুকে-পিঠে হাত বোলায়, জেগে থাকে, এটাও দিনের আলোয় অন্ধকারের মতই মনে থাকে না। যদি বা মনে পড়ে, তিনি মাইনের দাসী কথাটা মনে পড়লেই কৃতজ্ঞতার বা ভালোবাসার প্রশ্ন মনে ওঠে না। এর মধ্যে দুর্বলতার সুবিধে পেয়ে কঠিন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় নটু। অনাহারে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে দেবীও তখন মরণাপন্ন। তার গায়ে জোর নেই। পা হাত পা টেপা নটুর পছন্দ হয় না। কথাটা বিউটির কানে গেল। একদিন হঠাৎ বিউটি এসে ছেলের মাথা টিপতে বসল। বার মাস ক্ষীর লুচি খাওয়া শরীর। তার সঙ্গে কব্জির জোরে দেবী পারবে কেন? বিউটি বলে এমনি করে মাথা টিপতে হয় বৌমা, বেগার-ঠেলা করে কি রুগীর ভাবা হয়? উত্তর যা ছিল তা বলা যায় না। দেবী চুপ করে রইল। কিন্তু নটু স্ত্রীর এই বেয়াদপিতে বিরক্ত হ'ল যথেষ্ট। রাত্রে মাথা টিপতে টিপতে দেবীর হাত যখন শিথিল হয়ে আসে নটু বলে মা কি সুন্দর মাথা টেপে। বলা যায় না, কই ক্ষীরের বাটি থেকে ত একপো দুধ রোগা ছেলের জন্যে ছাড়েন না? সে ত শিশুর মুখ থেকেই কেড়ে দিতে হচ্ছে। বলে ফল নেই। একেই আধা মাইনের ছুটি নিতে হয়েছে, তার ওপর ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে মেজাজ হয়েছে খিটখিটে। পূর্ব জীবনের আনন্দময় হৈচৈ-ভরা জীবনের কথা মনে হ'লেই এ জীবনের কষ্টকর অধ্যায়ের জন্য দেবীকে দায়ী মনে হয়। খুকীকে অপয়া না ভাবলেও দেবী সত্যি সত্যিই অপয়া। আর যে নিজে অপয়া সে ত কষ্ট পাবেই। নটুকেও কষ্ট পেতে হচ্ছে তারি জন্যে। জ্বর ছাড়তে না ছাড়তে নটু চাকরিতে যায়। দেবী ভয়ে-ভাবনায় কাঠ হয়ে থাকে।

চাকরি ছাড়তেও বলতে পারে না, খুকীর বিয়ে দিতে হবে। ছেলেবেলা থেকে মনের ঐশ্বর্যকে সে বড় করে চিনেছে আজ নিজে ঠেকা খেয়ে বুঝেছে অর্থও প্রয়োজন। তাকে অবজ্ঞা করার উপায় নেই। সর্বরকমে তার অহংকার চূর্ণ হয়েছে। ছোটবেলা শিখেছিল খাওয়ার জন্যে মানুষ বাঁচে না, বাঁচার জন্যে খাওয়া। আজ নিজের পেটের জ্বালায় বোঝে লক্ষীর মায়ার মূল্য কতখানি। ভগবানের কাছে কেঁদে সে প্রার্থনা করে তার সন্তানকে যেন খিদের কষ্ট পেতে হয় না। নন্টুর টাকা জমানয় তাই দেবী খুশী হয়। ওই টাকায় সে কিনবে সন্তানের জন্য প্রাচুর্য। ছেলে ত নয়, মেয়ে। একবার দমকা খরচ করে বড় লোকের বাড়ী বিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত। নিজের জন্য দু'পয়সার মুড়িও সে চায় না। অবশ্য সে চাওয়ার প্রাপ্তিও কম নয়। মনের সব ঐশ্বর্যই দেবী হারিয়েছে। তবু মুখ ফুটে আবার খিদে পেয়েছে, একথা বলতে তার মানে বাধে, হজ্জ লজ্জা করে। তা ছাড়া তা হ'লে পরোক্ষ ভাবে বিন্তির ঘাড়ে দোষ পড়বে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ, তা ভাবতেই পারে না দেবী

তবু সেটুকু অহংকারও তার রইল না যেদিন বিন্তির মাংসর বাটি দেখে খুকী বায়না ধরল মাংস খাবার। তার উপকরণ মুলো ছেঁচকি দিয়ে সে কিছুতে ভাত খেতে রাজী নয়। অনেক কষ্টে, অনেক ভেবে সে নন্টুর কাছে কথাটা উত্থাপন করে। অফিস থেকে ফিরে নন্টু সবে ছানা আপেল দিয়ে জলযোগ করে উঠেছে। দেবী বলল, জানো, খুকী বড় দুষ্টু হয়েছে। মাংস দেখে আর কিছুতে তরকারি দিয়ে ভাত খাবে না। কেঁদে গড়াগড়ি। নন্টু বলল, তা আমায় বলে কি হবে? মাকে বলো। কিছুটা থতমত খেয়ে দেবী বলে, বলেছিলাম। মা বললেন, শাসন কর মেয়েকে। নন্টু বলল, ওকে সরিয়ে নিয়ো সেখান থেকে। যা দেখবে তাই চাইবে এ স্বভাব হ'লে ত চলবে না। মেয়েমানুষ শ্বশুরবাড়ী যাবে। এসব শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই দিতে হয়। মা ত তাই বলে, তোমার ত মা নেই, 'শিক্ষা সহবৎ' জিনিষটাই বাপ শেখায় নি। তাই আমায় সব সময় টিকটিক করতে হয়। জেদ-তেজ এসব কি মেয়েমানুষের সাজে? নয়, ওর শাশুড়ী যদি মা'র মত ভালমানুষ না হয়? হঠাৎ খুকীকে নিয়ে দেবী চলে যায় নন্টুকে অবাক করে। নন্টু ভাবে আশ্চর্য মানুষ! নিজে ত ভেবে মটমট করছে আবার মেয়েটারও মাথা খাবার মতলব। এখন থেকে আস্কারা দিলে আর রক্ষে নেই। রান্নে মেয়ে যখন ভাত খায় নন্টু সেখান দিয়ে যাচ্ছিল দেখে আলুভাতে দিয়ে ভাত খাচ্ছে মেয়ে। নন্টু বলে, খুব ভাল। আলু সেদ্ধর মত উপকারী জিনিষ নেই। মাংস-টাংস ভদ্রের খাওয়া ঠিক নয়। দেবী কথা বলে না। খুকী বলে পাঁড়ে দিয়েছে। অ পাঁড়ে, বাবাকেও একটু দিও। নন্টু সদরে চলে যায়। পাঁড়ে দুখো কাজ করে খুকীর কান্না-কাটি দেখে নিজের আলুভাতে থেকে তাকে দিয়েছে। খুকী তাতেই মহাখুশী। রাতে নন্টু বলে দেবীকে, ছোট মেয়ে দুধ-ভাত খেলেও ত পারে, কাঙালপনার হাজার নেই। এর পর থেকে দেবী আর খুকীর খাওয়ার কথা মুখেও আনে নি। কিন্তু নন্টুর মন-মতলব বোঝা দায়। এখানে নিজের ওষুধ-পথ্যির টাকা দেবে না, এখানে একবার বেতের চেয়ার-টেবিল কিনে আনল। সস্তা পেলে কখনও একরাশ 'খজির বাসন' কিনে আনে। দেবী বিরক্ত হয় এভাবে টাকা নষ্ট হচ্ছে বলে। বিন্তি এগিয়ে এসে সব নিজের ঘরে তোলে নন্টু খুশী হয়ে যায়। তার ধারণা মা'র মত যত্ন করে দেবী রাখতেও পারবে না। এর পর থেকে টাকার ব্যাপারে দেবীর সঙ্গে কথা বলে না নন্টু। নন্টু দেখেছে, নন্টুর আনন্দ দেবী দেখতে পারে না। রোগের সেবা প্রাণ দিয়ে করে বটে—সে ত করবেই, নইলে নিজের মাছ-ভাত বন্ধ হবে যে। দেবীর প্রশংসা আর পাঁচজন করে বটে, তাতে নন্টু গলে না। মা বলে, 'পরভোলানি ঘরজ্বালানি' তাই বাইরে অত নাম কুড়ন। কৈ, মা ত প্রশংসা করে না। ঘরজ্বালানিই বটে! দিনরাত লেকচার ঝাড়ে যেন মাষ্টারনী। হাসবার উপায় নেই, অমনি লেকচার দিতে আরম্ভ করবে। মা ঠিকই বলেন, "যা কিছু উপার্জন গোদা পায়ে বিসর্জন।" সে হচ্ছে না, মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে চলবার বান্দা আমি নই। কি জানি কেন বিন্তি নন্টুর হিসেবে মেয়েমানুষের পর্যায় পড়ে না। মূলতঃ মায়ের ইচ্ছামতই সে চলে। স্ত্রীর কাছে পেটের কোন কথা যেন ফাঁস না হয়ে যায়।

তার পাশে একে বলে মরওণ্ডি। দেবীকেও বিউটি বলে, কাছে লোক কানে কম তার কথা না বন্ধ হয়। দেবী ভাবে কানে কথা তোলার মানুষটি বেশ। স্ত্রীর কথা কানে নেবে না কখনও, এই মন্ত্র নিয়েই ত সে জন্মেছে।

এতেও বিউটির শান্তি হ'ল না। মধুপুরে বেড়াতে গেল বোনের বাড়ীতে। বিউটির মার বাতের ধাত। বাতের পক্ষে মধুপুর ভাল। মদনপুরের রাজবাড়ী রাবণের গুষ্টি। তাদের কোন কুটুমের বাড়ী ছিল মধুপুরে, সেইখানে মাকে নিয়ে বিউটি যাবে। দেবী মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, দু'চার দিন হয়ত শাশুড়ীর নিগ্রহ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে নন্টুই মাকে বলে, ওদেরও নিয়ে যাও না, খুকীর শরীরটা তবু একটু সারবে। তা ছাড়া রান্নাবান্নার ভার ওকে দিলে না আকুটে রাশ রাশ খরচ করবে তবু। আমি বরং একটা মাস হোটেল বাজারে খেয়ে নোব। তা ছাড়া খুকীর অসুখ ত লেগেই আছে, ওর যা রোগ-ভোগ যাই হয়ত কথায় কথায় ডাক্তার ডাকবে, টাকাগুলো খোলামকুচি ওর কাছে। ওদের গাড়িভাড়া আমি দিয়ে দোব তোমায়।

বিউটি এইটেই প্রত্যাশা করছিল। বেড়াতে গিয়ে সংসারের ঝামেলা নিতে ভাল লাগে না। বিউটির মা-বোনেরা যাচ্ছে সত্যি কিন্তু তারা সত্যি সত্যিই হাওয়া খেতে যাচ্ছে। সংসারের রাঁধাবাড়া, বাটনা-বাটা নানা হাঙ্গাম। বামুন রাখলে তার পেছনে ময়দা মাখা, বেলা, বাটনা বাটার লোক চাও। তা ছাড়া চুরিও আছে। এখানে যাই হোক, মেয়েটা বিশ্বাসী। চুরি-চামারি করার স্বভাব নয়। নন্টুর কাছে যাই বলুক, বিউটি ভাল করেই মনে জানে দিনের পর দিন উপোস করলেও হাতে তুলে না দিলে দেবী কিছু দাঁতে কাটবে না। সদলবলে বিউটি মধুপুর চলল। মা, বিধবা বোন, বোনের চার ছেলেমেয়ে, আর দুই ভাই। এবার দেবীকে হাতের মুঠোয় পেল সম্পূর্ণ ভাবে। ওখানে পাঁচ জনের বাড়ী, কিছুটা চক্ষুলজ্জার বজায় রাখতে হয়। এখানে সে-সবের বালাই নেই। প্রকাণ্ড বাগান বাড়ী, ঝোপ জঙ্গল হয়ে আছে। সন্ধ্যে হলেই শেয়াল ডাকে। ভোরে সকলের মুখে বেড-টি দিয়ে তবে দেবীর সকাল আরম্ভ হয়। রাত দশটায় ছুটি। রাগে, দুঃখে, অভিমানে নন্টুর কথা বারে বারে মনে হয়। কি দোষে তার ওপর এ অবিশ্বাস? এই পিণ্ড আর সে কতই বা খেত? তা ছাড়া নন্টুর যা খরচ পড়বে তাতেই ত ওদের তিনজনের সংসার চলে যেত। বিউটি অবিশ্যি বলেছে, নন্টুকেও ত আসতে বললাম। কিন্তু আসল কথা দিদিকে ছেড়ে ও থাকতে পারবে না। নইলে বিনি পয়সায় শরীর সারত এ সুযোগ কখনও ছাড়ে? তা ছাড়া প্রায়ই বলত, সারা রাত খুকীর কান্না আর বৌ-এর লেকচারের জ্বালায় ঘুম ত ঘুচে গেছে, এই ক'দিন ঘুমিয়ে বাঁচবে বেচারা। এর পর সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অন্যায়, যার জন্তে মেনে দেবীর এ নরকবাস, দেবীর সেই নন্টুর প্রতি সীমাহারা ভালবাসার মূলে কুঠারাঘাত করত বিউটি। রঙিনী বিধবা দিদিকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ছেলের সামনে লোভনীয় করে তুলতে বিউটির আপ্রাণ চেষ্টা চলত। আর তারই সঙ্গে চলত দেবীকে বোঝান যে, দিদিই নন্টুর মন জুড়ে আছে। তার মধ্যে দেবীর স্থান কোথায়? শিববাবুর রক্তে গড়া দেবীর মনে পুরুষের প্রতি সন্দেহের স্থান ছিল না। তবু এবাড়ীতে এসে এদের চক্রান্তমূলক আচরণ তাকে পাগল করে দিত। কোন নীতি, কোন ধর্ম এদের ছিল না। শুধু ছিল সত্যিকারের পশুর জীবন আর দানবীয় রুচি। নন্টু মাকে বলে বেচারা, বিউটি নন্টুকে বলে বেচারা। ঘোমটার ভেতর চোখের জল মুছে দেবী ভাবত এরা সবাই বেচারা! দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিউটিও বেচারা, আবার স্বেচ্ছাচারী খেয়ালী নন্টুও বেচারা। শুধু নিরুপায় দেবীর বিষয়ে ও কথাটা কখনও ব্যবহার করে না ওরা।

এখানে এসে তাতেও টান পড়ল দেবীর। তা ছাড়া সবাই শরীর সারতে এসেছে, রোজ আট সের দুধের ক্ষীর হয়। রাতে রুটির গোছা মাখতে বেলতে হাতের আর কিছু থাকে না। দেবী ভাবে, সত্যিই নন্টুর মনের দিশা পায় না সে। যদি তাকে দূরে পাঠাবেই তবে বাবার কাছে পাঠাল না কেন? সেখানেও ত তার খরচ লাগত না। শিববাবুর ভাই রামবাবু দিনাজপুরে বড় চাকরি করেন। তিনিও বারবার যেতে লিখেছেন দেবীকে। সেখানে গেলে কাকীমার যত্নে কিছুটা শরীর

নেমে আসতে পারত। কিন্তু নটুর ধারণা মা'র কাছে না থাকলে আচার-আচরণ কিছুই শিখতে পারবে না মেবী। সত্যি সত্যি বিউটির মত আবেগী স্বার্থপর আর আত্মসুখী মানুষ যদি হ'ত মেবী, একদিনও কি টি'কতে পারত এখানে? যে সুখের সবটুকু নটুকে খাইয়ে মেবীর অসীম তৃপ্তি—সেই সুখের সর কমলালেবুর খোসা দিয়ে ঘেঁটে আজো মেখে দেহ-লাবণ্য বাড়ায় বিউটি। তা ছাড়া মেবীর এই সাংঘাতিক আদর্শবাদই তাকে দু' চক্ষের বালাই করেছে বিউটির। বিউটির ধারণা মেবী এসব কথা লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এত ছড়ার অমন আচরণ বিউটির যে, তা লোকের কাছে বলার মত প্রবৃত্তিও মেবীর নেই। খুব অসহ্য হ'লে নটুকে দু' এক কথা বলেছে, কিন্তু নটুর মুখে সেই নিস্পৃহ ভাব। ডাল-ভাতের মত মেয়ে-পুরুষ থাকলে ওসব ত হবেই। দুঃখে-ঘৃণায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে মেবীর। কিন্তু বাধা পায় শিববাবুর কথা মনে করে আর খুকীর কথা মনে করে। শিববাবুর জন্যে কিছু করার উপায় নেই তার। তবু কি তাঁকে সন্তান-শোক দেবে মেবী? না তা হ'তে পারে না, কিছুতেই তার আত্মহত্যা করা চলবে না। বাবা জানেন মেবী সুখে আছে। স্বামীর অপরিসীম ভালবাসায় তৃপ্ত তার জীবন। তার মাতৃহীন জীবনে অমৃতের আস্বাদ এনে দিয়েছে তার শাশুড়ীমা। মাহারা মেয়ে মায়ের কোল পেয়েছে। বাপের এ সুখ-স্বপ্ন ভাঙতে চায় না মেবী। তা ছাড়া নটু? ঐ আধক্ষেপা, আপন-ভোলা মানুষ ও কি একদিনও বাঁচবে মেবীর যত্ন না পেলে? এই ক'দিনেই হয়ত শরীরের কি হাল করেছে কে জানে? কি যে অদ্ভুত গোঁ-ধরা মানুষ! নিজের ভালো-মন্দ বোঝে না এমন মানুষও হয়। এই-খানে মেবী সম্পূর্ণ পরাজিত। কেন জানেনা নটুর ওপর বিরক্ত হ'তে পারে না মেবী। তারই ভাবনায় আকুল হয়ে ওঠে। হঠাৎ ধ্যানভঙ্গ হয় বিউটির গলার আওয়াজে, "কি গো বিরহিণী, কার ধ্যানে মগ্ন হ'লে? এবারে ক্ষীরের যে পোড়া কপাল পুড়ে বসে থাকবে! জান ত, ক্ষীরে খিঁচ থাকলে মুখে রোচে না আমার। না পোড়া দেশ, মাছের ঠিক-ঠিকানা নেই। ঐ ক্ষীর-টুকুই যা ভরসা। তোমার মত সর্বগ্রাসী খিদে ত নয় যে, কিছু থাক বা না থাক বেড়াল-ডিঙুতে পারবে না! ভাতটা ঠিক থাকে। মেবী বিউটির সঙ্গে কথা বেশী বলে না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় শুধু। এছাড়া উপায়ই বা কি?

কেন জানি না বাড়ীর মধ্যে মেবীর ঠাঁই হ'ল না। বিউটি বললে, মা'র বাতের শরীর, পাশের ঘরে কাঁচকলা থাকলে মার ঘুম হবে না। কানের পোকা বের করবে। তাই মেবীর জায়গা হ'ল বাইরের দিকে মালীর ঘরের পাশে। খোলা উঠোন পেরিয়ে সে-ঘরে যেতে হয়। সাধারণ মানুষ হ'লে অমন সুন্দর বৌকে বিদেশ-বিঁভুয়ে অত দূরে রেখে স্বস্তি পায় না। কিন্তু বিউটির সেসব ভাবনা-চিন্তার বালাই নেই। যদি কিছু হয় ত্যাগ করলেই হবে। ঘাড় থেকে আপদ নেমে যাবে। সেই মালীর ঘর থেকে বাথরুম অনেক দূরে। খোলা বাগান পেরোতে ভয়ে প্রাণ কাঁপত মেবীর। রাতে হ্যারিকেনে এমন তেল দিত বিউটি যে, রাত বারটা হ'তে না হ'তে আলো নিভে যেত। পাছে তেল বেশী হয় সত্যি সত্যি, হ্যারিকেন দাঁড়িপাল্লায় ওজন করতো বিউটি। খানিকটা দূরে শ্মশান। সেখানে রাতে মৃতদেহ আসলে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপত মেবী। সবচেয়ে বিপদ হ'ল যদি রাতে বাথরুম যেতে হয়। ঐ স্বল্প তেলবিশিষ্ট হ্যারিকেনটিকে ভরসা করে ঘরে শিশু-মেয়েকে একা রেখে অন্ধকারে নি:শেষের উদ্দেশে যাত্রা করতে হয়। সাপ-খোপ কিছুরই অভাব নেই। নেহাতই মেবীর অখণ্ড পরমায়ু, তাই মধুপুর থেকে বেঁচে ফিরল মেবী। তবে কঙ্কালসার হয়ে। নটুর সঙ্গে দেখা হবার আগেই বিউটি মেবীকে বলল, তোর কথামত মেবীকে দিয়ে দিয়ে কি বিপদই হয়েছিল। বাড়ীর গরুর দুধের ক্ষীর, আর বাটি বাটি মাংস-লুচি খেয়ে কী হতভাগা মেয়েটির! পেট পুরে ত খেতে শিখল না কোনদিন। আমি সাধে বলি, আর খেও না, আর খেও না। রোগকে বাপু আমার বড় ভয়! মা ত অত বোঝে না যেমন আদর করে নাতবৌকে খাওয়ান তেমনি কাণ্ড। বেচারা কি, রোগের ভাবনা করেই দিন কাটল। কি মোটা হয়েছিল আমার মুখে সব বলে গেল। সরল বিশ্বাসী নটু মেবীর ঐ চেহারা দেখেও কিছু প্রশ্ন করল না। মেবীও কিছু বলল না নটুকে। বলে লাভটা কি!

সে কথা ত কানে নেবে না-নাই। অসুখ যে করে নি তা নয়। ঐ দিনে উঠোন পার হয়ে যেতে যেতে খুব জ্বর হয়েছিল ক'দিন বুকে সর্দি বসে। এক বাটি বার্লিও তাকে দেয় নি বিউটি। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল ঢং হচ্ছে? দেখি পেটের জ্বালায় ওঠে কি না। একদিন মামা-শ্বশুর তার কাশির আর বমির আওয়াজ পেয়ে জিগ্যেস করেছিল, "হ্যাঁ দিদি, বৌমার কি অসুখ করেছে?" শ্লেষের হাসি হেসে বিউটি বলেছিল, হ্যাঁ, দশমেসে অসুখ, তোকেও বলিহারি যাই, ভাগ্নেবৌ-এর বমির খবর রাখছিস। লজ্জায় আর তিনি কিছু বলেন নি।

এখানে আর একটি মানুষের কথা না বললে বিউটির সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব হবে না সে হচ্ছে বিউটির মেয়ে কুইন। কুইন সত্যি কুইনের মত দেমাকে থাকতো। চেহারাটা অবিশ্যি মোটেই কুইনের মত ছিল না। বেশ দোহারা শ্যামবর্ণ রং-এ ভরা ভাবনতকাটা। মুখে বেঁকা সিঁথি কেটে কুৎকুতে চোখ ঘুরিয়ে যা মুখে আসত বলে যেত। বিউটির তবু ছিল চিনির প্রলেপ, এ একেবারে গোটাপিসের কুইনাইন। বিউটির লম্বা-চওড়া পুরুষোচিত চেহারার মধ্যে লাবণ্য বা কোমলতা না থাকলেও রংটা ছিল ফর্সা, আর সেই ফর্সা রং-এর জোরেই বোধহয় পণ্ডিত মোহে পড়েছিলেন। বিউটির কাছে গল্প শুনেছে দেবী। বিউটির স্বামী বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে এসেছিলেন। সেখানে বিউটিকে সাদা সেমিজ-হীন পারমাপোলের ক্রেপ বেনারসী পরা বিউটিকে দেখে তিনি পছন্দ করেন—এইই হ'ল বিউটির বিয়ের আদি পর্ব। সেই রূপের অহংকারে বিউটির মাটিতে পা পড়ত না অবিশ্যি, কুইনকে নিয়েও অহংকারের সীমা ছিল না বিউটির। ঐ কালো মেয়ের রং না কি গোলাপ ফুলের মত। বর্ণনা করতে গিয়ে বিউটি বলত, যা রং ছিল কুইনের অমন তোমরা দেখ নি। এই দেখ নি কথাটায় আহত দেবী। তাকে সব বিউটি কালো বলে। কিন্তু দেবীর ঠাকুমা পিসীমারা ত একেবারে মার্বেল পাথরের মত রং। আর তাও যদি না হয় মেমসাহেব ত দেখেছে? কিন্তু বিউটি যা বলবে তাতে ত আর না বলার উপায় নেই। তা ত নিশ্চয় বলতেই হবে দেবীকে। সেই রূপসী ননদের একটা মুদ্রাদোষ ছিল, মুখটা ছুঁচোর মত লম্বা করে শোঁকার মত শব্দ করে করে সে ঘুরে বেড়াত। তখন সত্যিই তাকে ছুঁচোর বড় সংস্করণ মনে হত।

ক্রমশ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় ষ্টেশনারী আপিসের বাসা বদল ?

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যতই জরুরী হউক না কেন, কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গকে—ক্রমশ একটি চতুর্থ শ্রেণীর রাজ্যে পরিণত করিবার গোপন, কিন্তু অতি পবিত্র, ব্রত পালনে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই। অথচ গরীব করদাতাদের রক্তের অর্থ অযথা এই ভাবে—কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ভোগলুব্ধ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই—অপব্যয় করিবার অধিকার কে দিল, তাহা আমাদের জানিবার কোন অধিকারই নাই! কলিকাতা হইতে কোল্ কনট্রোলারের দপ্তর, শিয়ালদহ হইতে রেলওয়ে ট্রেনিং সংস্থা, জিও-লজিক্যাল সার্ভের বিরাট অংশ এবং অন্যান্য বহু কেন্দ্রীয় সংস্থা বিনা প্রয়োজনে বিহার, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যে চালান করা হইয়াছে। ডিভিসির ব্যয় পশ্চিমবঙ্গ শতকরা ৬০ টাকারও বেশী দিয়া থাকে—কিন্তু সংস্থার কর্ত্তি করিয়া কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কর্ত্তিত-নাসিকা আরও কর্ত্তন করিবার জন্যই বোধ হয় এই সংস্থার সদর কলিকাতা হইতে বিহারে বদলী করা হইল, যাহার ফলে হাজার কয়েক বাঙ্গালী কর্মচারীকে অশেষ দুর্ভোগ সহ করিতে হইতেছে!

এইবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পরম মেহেরবান শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার ইচ্ছামত কলিকাতা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের ষ্টেশনারী আপিসকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া বিভিন্ন রাজ্যে পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে! মেহেরবান খান্না প্রাক্তন পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী এবং পূর্ব্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তদের পুনর্ব্বাসন কার্য্য পরম সার্থক করিয়া এইবার তাঁহার অধীন কেন্দ্রীয় আপিস প্রভৃতির পুনর্ব্বাসন (প্রথমে অবশ্য উদ্বাস্ত করিয়া তাহার পর) কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন! সংবাদে দেখিতে পাই যে, ভারত সরকারের কলিকাতায় অবস্থিত ষ্টেশনারী আপিস গুটাইয়া বিক্ষিপ্তভাবে (রাজ্যভিত্তিক) ষ্টেশনারী মার্কেট প্রভৃতের উদ্যোগ দিল্লীতে আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য - এই ব্যবস্থা কার্য্যকর হইলে একদিকে অপব্যয় এবং অন্যদিকে দুর্নীতিও বৃদ্ধি পাইবে (অর্থাৎ বর্ত্তমান দুর্নীতি, বিক্ষিপ্ত হইয়া আরও প্রসার লাভ করিবে!)

এই ষ্টেশনারী আপিস একশ বছরেরও বেশী কলিকাতায় আছে। এই কেন্দ্রীয় আপিস কর্তৃক নতুনদিল্লী, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ডিপোগুলি পরিচালিত হয় এবং ইহার অধীনে ১৩৮৪ জন কর্মচারী কাজ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বৈদেশিক দূতাবাস, রেলওয়ে, তার ও তার দপ্তর এবং নতুন নতুন পরিকল্পনা দপ্তরের প্রায় ৭ হাজার আপিসে কাগজ, পেন্সিল, কার্ব্বন, টাইপ-রাইটার যে সব, ছাপার মেশিন, মুদ্রিত ফর্ম ও কাগজ-পত্র প্রভৃতি এক হাজার রকমের দ্রব্যসম্ভার এই কেন্দ্রীয় ষ্টেশনারী আপিস সরবরাহ করিয়া থাকে। মিল ও কলকারখানা হইতে পাইকারী হারে মালপত্র অনেক সস্তায় কিনিয়া এই আপিস বিভিন্ন ইউনিটকে দেয় এই আপিসকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিম বাঙ্গলায় বহু কুটীর শিল্প বাঁচিয়া আছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করিয়াছেন যে, এই আপিস বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভিন্ন দপ্তর তাঁহাদের প্রয়োজন মত ষ্টেশনারী মালপত্র প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করিবেন ইতিপূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দপ্তরের ষ্টেশনারী মালপত্র কিনিবার জন্য কলিকাতার এই আপিসের নিয়ন্ত্রণে যেভাবে কাজ হইত এখন আর তাহা হইবে না। 'ষ্টেশনারী ও প্রিন্টিং' বাজেটও একযোগে তৈয়ারী হইবে না। বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদানুযায়ী বিক্ষিপ্তভাবে তাহা হইবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এম সি খান্না নাকি এই ইচ্ছা পোষণ করেন।

এই নূতন ব্যবস্থায় শুধু কর্মচারীদের অসুবিধাই ঘটিবে না, সরকারের খরচাও দু-তিন গুণ বৃদ্ধির সঙ্গে অনিয়ম ও দুর্নীতিও বৃদ্ধি পাইবে। কেন্দ্রীয় আপিসের

নিয়ন্ত্রণে যেখানে ১৩৮৪ জন কর্মচারী সব কাজ চালাইতেছে সেখানে ৭ হইতে ৮ হাজার কেরাণী দরকার হইবে। অপব্যয়ের নমুনা, ৭ শত টাকায় যে টাইপ-রাইটার সরবরাহ করা হয় সে জায়গায় একটা একটা আপিসকে তাঁহাদের প্রয়োজন মত একটা মেশিন ১৪ শত টাকায় কিনিতে হইবে। অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও ইহাই ঘটিবে।

বিভিন্ন আপিসের চাহিদা কত তা নিখুঁতভাবে হিসাব করিয়া এই কেন্দ্রীয় আপিস যেভাবে মাল সরবরাহ করে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাহা সম্ভব হইবে না। ফলে যথেচ্ছ মালপত্র খরচ হইয়া বর্তমান মোট বাজেটের বহুগুণ বেশী খরচ হইবে।

অনেকে বলেন যে, অর্থ দপ্তর এবং অর্থমন্ত্রীর দাপটে, পূর্ত ও গৃহ দপ্তরের মন্ত্রী নাজেহাল হইয়া বাজেলা এড়াইবার জন্য পূর্তমন্ত্রী শ্রীখান্না স্টেশনারী আপিস ও বাজেট—বিচ্ছিন্ন ও বিকেন্দ্রীকরণে উদ্যোগী হইয়াছেন।

ভিতরের কথা যাহাই হউক, মন্ত্রীদের দাপা-দাপির ঝালটা অবশ্য করদাতাদেরই ভোগ করিতে হইবে—বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে। দরাময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পক্ষে গড়া এবং চলতি-জিনিসকে ভাঙিয়া খেয়াল এবং খুশীমত আবার নূতন করিয়া গঠন-প্রচেষ্টায় বাধা দিতে কেহ নাই, কারণ কেন্দ্রীয় এক একটি মন্ত্রণালয় প্রায় স্বাধীন রাজ্যের মত এবং সে-রাজ্যের মালিক বা রাজা একমাত্র বিভাগীয় কেন্দ্র মন্ত্রী! মন্ত্রীমহোদয়গণের মনোবাসনা পূরণ করিতে এবং ইচ্ছামত ভাঙা-গড়ার (অথবা অপ্রয়োজনে) মহৎ কর্মে অর্থ জোগাইবে গৌরী সেন!

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শাসক মন্ত্রী-প্রধান কেন্দ্রীয় হঠকারিতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার কোন প্রতিবাদই কি করিতে পারেন না? পশ্চিমবঙ্গের দুইটি গণ্ডই কি কেবল কেন্দ্রীয় কোমল হস্তের কঠিন চপেটাঘাত সহ্য করিয়াই চলিবে—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? বঙ্গ-সম্রাটও এই চড় বরদাস্ত করিবেন বৃহত্তর ভারতের সংহতির কল্যাণে? বঙ্গ-শাসকপ্রধান কি কেন্দ্রের দুই-চারিটি প্রশংসাবাণী প্রাপ্তি দ্বারাই এই ভাগ্যাহত রাজ্য এবং হতভাগ্য রাজ্যবাসীর দুঃখ মোচন করিতে পারিবেন?

"হোল্ড দ্য প্রাইস লাইন"!!

এ রাজ্যের সরকারী কর্তারা প্রায়ই কালোবাজারী ও মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে বলিয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে উপদেশও দিয়া থাকেন তাঁহারা, (এবং দেশবাসীর বহু ব্যক্তিই)—"হোল্ড দ্য প্রাইস লাইন"। ক্রমাগত দাম বাড়িতে থাকিলে জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত হইবে, জাতীয় উন্নতিও ব্যাহত হইবে—সন্দেহ নাই। আর যে সমস্ত কালোবাজারী মুনাফাখোরদের জন্য এই মূল্যবৃদ্ধি হয় তাহারাও প্রকারান্তরে দেশের শত্রুতা সাধনই করে—ইহাও বিবেচের অপেক্ষা রাখে না। কথাগুলি অতি উত্তম। কিন্তু কার্যত আমরা কি দেখিতেছি? যখনই কালো-বাজারীদের কৃপায় কোন পণ্যের দাম বাড়িতে থাকে তখনই সরকার তাহার উপর খানিকটা দাম বাড়াইয়া দেন, তাহাতেও যখন সে বস্তু মিলে না তখন দাম আরও বাড়ান। হোল্ড দ্য প্রাইস লাইনের কথা চিন্তা না করিয়াই। চাউল, তৈল, মাছ, সব ব্যাপারেই ইহা লক্ষিত হয়। ১৯৬৪ সালে নূতন চাউল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাহাদুর প্রথমেই ৩০৲ দাম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সকলের মনে আছে। সেইকালে বাজারে চাউল কম দামে বিক্রী হইতেছিল। ঐ দাম বাঁধার ফলে একদিনেই চাউল চল্লিশ টাকা মণে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে মালও অদৃশ্য হয়। দাম বাঁধিয়া কোন সুরাহাই সরকার করিতে পারেন নাই—মাছেও নয়, তৈলেও নয়। তৈলের আমদানী যখন বেশী হইল তখন আপনিই দাম কমিল। মাছ এখনও দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য, চাউলের ত কথাই নাই।

কিন্তু গরীবদের প্রশ্ন এই যে, সরকার যেসব ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন—তাহাতে শনৈঃ শনৈঃ মূল্য বৃদ্ধি হয় কেন? একচেটিয়া কারবারী যাহারা মাল মজুত করিয়া মূল্যবৃদ্ধি করে, লোকে তাহাদেরই মুনাফাখোর বলে। কিন্তু সরকারও কি তাহাই করিতেছেন না? রেশন প্রবর্তিত হইবার পর রেশনের চাউলেরই কতবার মূল্য বৃদ্ধি হইল। সরকার যখন ছানা ও ক্ষীরের মিষ্টান্ন বন্ধ করিয়া একচেটিয়া দুগ্ধ ক্রয়ের অধিকার গ্রহণ করিলেন তখন ঢক্কানিনাদে যে শিশু রোগী ও বৃদ্ধের খাদ্য দুগ্ধকে সহজলভ্য করিবার জন্যই এই আদেশ জারী হইল। মিষ্টান্ন বিক্রেতারা নাকি বেশী দামে দুগ্ধ ক্রয় করেন বলিয়া সরকার দুগ্ধ পান না, মিষ্টান্ন প্রস্তুত বন্ধ হইলে দুধ সস্তায় মিলিবে, সরকারও প্রচুর দুধ দিতে পারিবেন। প্রচুর দুধও নাকি দরকার। সরকার নির্দিষ্ট বাঁধা দামে এখন দুগ্ধ পাইতেছেন। কিন্তু তবুও অকস্মাৎ এমন দাম বাড়াইবার প্রয়োজন হইল কেন? টোণ্ড মিল্ক টাণ্ডার্ড হইয়া ও সাধারণ গো-দুগ্ধ খাঁটি গোরুর দুধ নামে অভিহিত হইয়া দর বাড়িয়া গেল!

আজ কলিকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে এক কিলো চাউলের দাম ২॥, ৩৲ টাকা, তাহাও লোকে পাইতেছে না। গম আটা ময়দারও অবস্থা প্রায় একই প্রকার। কলিকাতার লোকে (যাহাদের র‍্যাশন-কার্ড আছে) যা হোক কিছু চাউল, গম, আটা, ময়দা, সুজি পাইতেছে কিন্তু যেসব স্থানে মডিফায়েড র‍্যাশন চালু হইয়াছে এবং যেখানে র‍্যাশনের কোন বালাই নাই, সেই সব এলাকার লোকের (গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথাই বলা হইতেছে) বর্ত্তমান অবস্থার কথা না বলাই ভাল। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত কি অঘটন ঘটিবে বলা শক্ত।

দুধঃ কলিকাতার বাহিরে কাছাকাছি অঞ্চলে সাধারণ লোকের পক্ষে দুধ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইতে চলিয়াছে। কলিকাতার লোককে যে-প্রকার সস্তা দরে দুধ বিক্রয় করা হইতেছে—সেই প্রকার সস্তা দামে দুধ বিক্রয় করিলে—কিছু দিন পূর্ব্বে হয়ত গোয়ালাদের 'ডি আই আর'এ গ্রেপ্তার করা হইত। আর আজ যেরকম 'বিশুদ্ধ' দুগ্ধ সরকার যোগাইতেছেন—সাধারণ গোয়ালার পক্ষে তাহা হইবে দণ্ডনীয় অপরাধ।

কলিকাতা পৌরসভার স্বাস্থ্যবিভাগ সরকারী বিশুদ্ধ দুধে বোধ হয় হাত দিতে ভরসা করেন না! সরকারী খাঁটি গো-দুগ্ধের মূল্য মাত্র টা ১·৩৩ পয়সা—এবং ইহা অপেক্ষা 'খাঁটিতর' গো দুগ্ধ গোয়ালারা এখনও ১· মূল্যে দিতেছে—কিন্তু আর কতদিন দিবে বলা শক্ত। সরকারই হয়ত এই দুধের মূল্য ১॥ টাকা বাঁধিয়া দিবেন—স্বকীয় দুগ্ধ কারবারে বাঁচাইবার জন্য! বলা বাহুল্য গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুগ্ধসেবীদের নিকট সরকারী দুধের মূল্য কিছুই নহে! এখন যে কেহ প্রত্যহ ছটাক সের দুগ্ধ পান করিতে পারিবে। রাজ্য সরকারের খাদ্যসমস্যা সমাধানের বিচিত্র পন্থা এবং টেক্‌নিক্ দেখিয়া লোকে ইহাকে আজ 'সোরকার' (পি সি এস) ম্যাজিকের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছে। যেখানে, যে-বস্তুর উপরেই সরকারী হাত পড়িতেছে—তাহাই অপূর্ব্ব ম্যাজিকের বিচিত্র মন্ত্রে লুপ্ত হইতেছে! সাধারণত লোকে ম্যাজিক দেখিয়া আনন্দ পায়—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 'সোরকারী' অলৌকিক ম্যাজিক লোকের পক্ষে বিষম এক 'ট্র্যাজিকে' পরিণত হইয়াছে!

একথা বলি না যে, রাজ্য সরকার খাদ্য সমস্যা সমাধানে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন না। কিন্তু কোন ভাবেই যখন কিছুই হইতেছে না, তখন সরকার—একবার অন্তত পরীক্ষামূলক ভাবে—সর্ব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ কিছুদিনের মত তুলিয়া দিয়া দেখুন না কেন। বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ লোকের মতে দ্রব্য সরবরাহ যদি বাধামুক্ত হয়, তাহা হইলে দু'চার দিনের মধ্যেই বোধ হয় খাদ্যশস্য ব্যবসায় সহজ পথে বহিতে আরম্ভ করিবে। ব্যবসায় সহজ-ধারায় একবার চলিতে আরম্ভ করিলে—কালোবাজারী এবং অতি-মুনাফাকারীরাও বোধ হয় অন্ধকারময় অলিগলি পরিত্যাগ করিয়া সহজ পথে আসিতে বাধ্য হইবে—নিজেদের স্বার্থেই। সরকারী মতে ইহা গ্রাহ্য না হইলে (হইবে না জানা কথা)—আবার বলিব যে জনকয়েক কালোবাজারী এবং মজুতদারকে ধরিয়া শহরের চৌমাথায় প্রকাশ্যে চরম শাস্তি দিয়া ওপারে চালান করা চাই কালবিলম্ব না করিয়া।

কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিস—

কলিকাতায় নবাগতা জনৈকা শ্রীমতী চাষাবকে দু কেজি চাউল আনার অপরাধে কলিকাতা পুলিস হাওড়া পুলে গ্রেপ্তার করে—গত ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৬৫)। ভারত রক্ষা আইনের জোরে এই গ্রেপ্তার এবং ঐ আইনের বলে তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। আসামী উত্তর প্রদেশের এক গ্রাম হইতে কলিকাতায় কাজের সন্ধানে আসে এবং কলিকাতায় পৌঁছিবার পর হাওড়া পুলে তাহার বিষম অপরাধ পুলিসের নিকট ধরা পড়ে—ফলে ১৮ দিন হাজতবাস এবং তাহার পর আদালতে বিচার। কিন্তু এই মামলার রায় দান প্রসঙ্গে হাকিম বলেন যে কোন যাত্রী নিজের খাইবার জন্য বাহির হইতে দু কেজি চাউল সঙ্গে আনিলে তাহা ভারতরক্ষা আইন-বিরোধী নহে কাজেই দণ্ডনীয়ও নহে। অতএব শ্রীমতী চাষাবকে মুক্তি দেওয়া হয়। হাকিম আরও বলেন যে—আসামী উত্তর প্রদেশের গ্রাম হইতে নিজের ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ চাউল আনে তাহা অত্যধিক মাত্রায় বেশী নহে। একেত্রে অপরাধ যদি কেহ করিয়া থাকে তবে তাহা পুলিসই করিয়াছে এক নিরীহ ব্যক্তিকে এই ভাবে অযথা নির্য্যাতীত করিয়া! হাকিম পুলিসকে ২ কেজি চাউল মুক্ত আসামীকে ফেরত দিতে আজ্ঞা করেন। সবই হইল, কিন্তু পুলিসকে বেকুবী এবং অজ্ঞানতার অপরাধে কি দণ্ড দেওয়া হইবে জানি না। এ কথা এখনও জানা যায় নাই যে, যে ১৮ দিন হাজত-বাস-কালে শ্রীমতী চাষাব সরকারী খরচায় যে-চাউল ভক্ষণ করিয়াছেন সেই পরিমাণ চাউলের মূল্য পুলিস দাবি করিবে কি না, এবং মূল্য আদায়ে দুই কেজি

চাউল রাখার 'ডি-আই-আর' বলে বাজেয়াপ্ত হইবে কি না।

অনুরূপ ভাবে হাওড়া পুলের উপর পুলিস নারায়ণ বা নামক এক ব্যক্তিকে দু কেজি চাউল সঙ্গে রাখার জন্য গ্রেপ্তার করে গত ২৭ই ডিসেম্বর এবং প্রায় এক মাস রাজ-অতিথি থাকিবার পর আদালতে হাকিম তাহাকে মুক্তি দেন—বেকসুর বলিয়া। রায়দানকালে হাকিম বলেন যে পুলিস যদি এইভাবে খামখেয়ালী ধরপাকড় করে তাহা হইলে শীঘ্রই নাগরিক স্বাধীনতার লোপ পাইবে। পুলিসকে হাকিম যথেষ্ট (?) ভর্ৎসনাও করেন। কিন্তু ইহাতে পুলিসের কর্তব্যনিষ্ঠায় ভাটা পড়িবে কি?

এই প্রকার এক-দু কেজি চাউলের জন্য বহু নরনারী, বালকবালিকা বাসে ট্রেনে এবং পথে ঘাটে অতি-কর্তব্যপরায়ণ পুলিস কর্তৃক প্রায় প্রত্যহ নানা ভাবে নিগৃহীত, নির্য্যাতীত হইতেছে। এবং এইভাবে বে-আইনী বাজেয়াপ্ত চাউল শেষ পর্য্যন্ত কাহার বা কাহাদের ভোগে যাইতেছে, সে-বিষয় কিছু বলা হয়ত কর্তৃপক্ষের নিকট সুখদায়ক হইবে না। সরকারী ব্যবস্থায় লোকে যদি নিয়মিত, এমন কি সপ্তাহে তিন-চারি বেলাও, পেট ভরিয়া খাইতে পাইত, কিছু বলিবার থাকিত না, কিন্তু খাইতে দিতেও পারিব না, অথচ ক্ষুধার্ত মানুষ প্রাণরক্ষার এবং পেটের জ্বালা মিটাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় কিছু চাউল জোগাড় করিলে তাহাকে সদাচারী পুলিস কোমরে দড়ি বাঁধিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবে—এই বিষম পরিহাসের মর্ম বুঝা ভার! উপরে বসিয়া যাঁহারা ডি-আই-আরের' প্রয়োগ-পরিচালনা করিতেছেন—তাঁহাদের পক্ষে অনাহারী মানুষের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার যাতনা কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। কাঁচকলার চপ, আলুর পোলাও, পেঁপের পরোটা প্রভৃতি বিকল্প খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ গরীবকে বিনামূল্যে দান করা—সত্যই পরম মহানুভবতার পরিচায়ক!

দারিদ্র্য-অন্নাভাব-অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পরিণাম—

দেশের বর্তমান অন্নাভাব এবং সাধারণ জনের চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে আকাশপ্রমাণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন-জখমের সংবাদ প্রায়শই পাওয়া যাইতেছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নহে, পাশের বিহার রাজ্যের সংবাদও অতি আশঙ্কাজনক। বিহার রাজ্যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত—এই চারি মাসের পুলিস রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৬৪ সালের উক্ত চারি মাসের তুলনায় ১৯৬৫ সালে ভীষণ খাদ্যাভাব এবং তাহার সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের অতি-স্ফীতি এবং জনগণের দারিদ্র্য বৃদ্ধির ফলে দেশে অপরাধপ্রবণতা অতীব বৃদ্ধি পাইয়াছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাপি—সর্বপ্রকার অপরাধের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি-মুখে চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে খাদ্যাভাব এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আজ চরম সীমা ছাড়াইয়া তাহারও উর্দ্ধে গিয়াছে এবং মধ্যবিত্ত দরিদ্র জনগণের অবস্থা হইয়াছে অবর্ণনীয়! কর্তৃপক্ষ যাঁহারা মানুষকে ক্রমাগত হিতবাণী শুনাইতেছেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে অনাহারী মানুষে শেষ পর্য্যন্ত লুটপাট করে, অপরের খাদ্য কাড়িয়া খায়—জঠরানল তাহার হিতাহিত জ্ঞানকে ভস্ম করিয়া দেয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুধার্ত মানুষ সামান্য খাদ্যের জন্য ডাকাতি, এমন কি খুন-খারাপি করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। এই অবস্থায় মানুষকে হিতাহিতের আপ্তবাক্য—কোন সান্ত্বনা দেয় না। অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ-রাজ্যে মানুষের অসীম ধৈর্য্যের বাঁধ প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার মত হইয়াছে—এ বাঁধে ফাটল বহু পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছে। এবং এই ধৈর্য্যের বাঁধ একবার ভাঙিলে ডি-আই-আর, পুলিস, মিলিটারী—সবই বেকার হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চল হইতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি নানা অপরাধের সংবাদ কম আসিতেছে না। এবং এইসব সংবাদ সহজ ভাবে লইলে কর্তারা বিষম ভুল করিবেন। এমন অবস্থায় কর্তারা মানুষকে দু দুই মুঠা খাইতে দিন, আর তাহা যদি না পারেন, লোককে হিতবাক্য বিতরণ করা বন্ধ করুন। এতদিন মানুষকে বলা হইয়াছিল—কোন ভয় নাই, খাদ্যের কোন অভাব হইবে না—সরকার সব ব্যবস্থাই করিবেন—কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে কর্তাদের কথার কোন মূল্যই নাই। সবই সাময়িক ধাপ্পা স্তোকবাক্য আর কিছুই নহে। রাজ্যের খাদ্য-ব্যবস্থার ভার যাহার, যে-মহাশয় ব্যক্তির হাতে, তিনি যদি পথে, ঘাটে, ট্রেনে, বাসে, ট্রামে সাধারণ মানুষ তাঁহাকে কি প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছে তাহা শ্রবণ করেন, অশেষ প্রীতিলাভ করিবেন! রাজ্য খাদ্য ব্যবস্থার সম্পর্কে যে সকল উত্তম মধ্যব্যাধি আজ মানুষ করিতে বাধ্য হইতেছে তাহাতে কর্তৃপক্ষের উপর প্রজাবর্গের অসীম শ্রদ্ধাই প্রকট হইতেছে!

সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা অর্থাৎ ট্যাঁকের অবস্থার সন্ধান রাখার কোন প্রয়োজন উক্ত দপ্তরের উচ্চতম

কর্তারা বোধ করেন না। সরকারী কর্মচারীদের মাগগী ভাতা কর্তারা বৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু যে সব হতভাগ্য বেসরকারী ছোট ছোট সংস্থা, কারবার, হাসপাতাল প্রভৃতিতে কাজ করে, তাহাদের মাগগী ভাতা কে দিবে? ইহারা কি ভারতের অধিবাসী করদাতা, না বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে। ১০০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকার মধ্যে যে পরিবারের মোট আয়, এবং গড়পড়তা যাহাদের পোষ্য ৪.৫ জন, তাহাদের বাঁচাইবার জন্য দিনান্তে এক মুঠা অন্ন দিবার দায়িত্ব কাহার? এ প্রশ্নের জবাব আজ কোন মহল হইতেই আসিবে না জানি, কিন্তু আজ না হয় কাল ক্ষুধার্ত বেপরোয়া মানুষের সামনে অদ্যকার কর্তাদের দাঁড়াইতে হইবে—এবং জবাব সেই সব মৃত্যুপথযাত্রীরা আদায় করিয়া লইবে। গদিতে বসিয়া শাসনকার্য্য চালান কত সুখের, তাহা জনগণের পদাঘাতে ইতিহাসে পরীক্ষিত হইয়াছে। আজ চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া আমরা যে ভীষণ সম্ভাবনার কথা ভাবিতেছি, বাস্তবে তাহা ঘটিলে—অদ্যকার উচ্চ মার্গচিত্ত এবং বিত্ত-বিত্তবান—সকলকেই—পথের ধূলায় সকলের সমান হইতে হইবে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গরীব শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত অতি সহনশীল, কিন্তু ইহারও একটা শেষ সীমা আছে—কর্তামহল তাঁহাদের কার্য্যকলাপে দেশের সাধারণ লোকের অসীম ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া দিবার প্রায় মুখে আনিয়াছেন। ভগবান ইঁহাদের সুবুদ্ধি দিন—ইঁহাদের রক্ষা করুন!

মূল্যবৃদ্ধির পক্ষে বিষম অজুহাত!

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেন যে অবস্থার চাপে তাঁহারা ধানের দর বৃদ্ধি করিয়াছেন ১'৩০ হইতে ১'৩৬ কিলো-প্রতি অর্থাৎ এক কিলোতে ৬ পয়সা মাত্র। এবং ধানের এই দরবৃদ্ধির কারণেই নাকি সরকার মোটা, মিহি ও অতি মিহি অর্থাৎ সরেস চালের দর কিলো-প্রতি যথাক্রমে ১৪,১৬ এবং ২২ পয়সা বৃদ্ধি করিলেন। ইহা জানা কথা যে, ৩ কিলো ধানে চাউল হয় ২ কিলো। ধানের দরবৃদ্ধির কারণে চালের বর্দ্ধিত মূল্য হওয়া উচিত—(বর্তমান মূল্য অপেক্ষা) প্রায় ৫ পয়সার মত। কিন্তু এই বর্দ্ধিত মূল্য ক্রেতার নিকট হইতে উশুল করিবার সময় সরকার কোন্ যুক্তিতে কিলোপ্রতি ১৪, ১৬ এবং ২২ পয়সা আদায় করিতেছেন?

চাউলের মূল্যবৃদ্ধির পক্ষে সরকার আরও কতকগুলি যুক্তি দিয়াছেন। সংবাদপত্র হইতে জানা যায় যে, খাদ্য দপ্তরের কর্তারা গড়তা খরচ আরও চড়াইবার অনুকূলে কয়েকটি যুক্তি দিয়াছেন। কলওয়ালারা ধান হইতে চাউল তৈয়ারীর জন্য মজুরি কিছুটা বৃদ্ধি করিয়াছে। ধান-চাউল স্থানান্তরের এবং তাহা প্যাক করিবার বস্তার দরও চড়িয়াছে। ইহা সত্য হইলেও চাউলের শ্রেণীভেদে কলের মজুরি কিংবা বস্তার দর চড়িতে পারে না। তবু মোটা, মিহি ও সরেস চাউলের দর বিভিন্ন হারে চড়ান হইল কেন? সবচেয়ে বড় কথা, এ সব খরচ আয়ত্তে রাখিবার জন্য খাদ্য দপ্তরই বা সকল শক্তি নিয়োগ করেন নাই কেন?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গত বছর ৫ই জানুয়ারী বৃহত্তর কলিকাতার শিল্প এলাকায় পুরোপুরি র‍্যাশন বলবৎ করার আগে র‍্যাশনের দোকানে দর ছিল প্রতি কিলো মোটা চাউল ৫২ পয়সা, সরেস চাউল ৭৬ পয়সা ও গম ৪০ পয়সা। পুরোপুরি র‍্যাশন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দর হইল মোটা চাউল ৭০ পয়সা, মিহি চাউল ৮০ পয়সা, সরেস চাউল ৮৬ পয়সা ও গম ৫০ পয়সা। তাহার পর ১লা জুন হইতে সব রকম চাউলের দর কিলো-প্রতি ২ পয়সা ও গমের দর ৬ পয়সা চড়ান হয়। এখন আবার দর চড়ানোর ফলে গত বছর ৪ঠা জানুয়ারী মোটা চাল ৫২ পয়সার স্থানে ৮৪ পয়সা, মিহি চাউল ৬২ পয়সার স্থানে ৯৬ পয়সা এবং সরেস চাউল ৭৬ পয়সার স্থানে ১১০ পয়সা দাঁড়াইল। দেখা যাইতেছে মাত্র ৫৫ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকার র‍্যাশন এলাকায় দর বাড়াইয়াছেন—মোটা চাউল ৬১ শতাংশ, মিহি চাউল ৫৫ শতাংশ ও সরেস চাউল ৪৫ শতাংশ। র‍্যাশনের দোকানে বিক্রী চাউলের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও গুরুতর অভিযোগ আছে। মিহি চাউলের দর লইয়া অনেক সময় এমন চাউল দেওয়া হয় যা চিরকাল "মোটা চাউল" বলিয়াই বিক্রি হইত। আবার সরেস চাউলের দর দিয়াও ক্রেতা অনেক সময় মিহি চাউল লইতে বাধ্য হইয়াছে। অর্থাৎ খারাপ চাউলটা অপেক্ষাকৃত সরেস বলিয়া চালাইয়া সরকার বাহাদুর বেআইনী ভাবে বেশী মূল্য আদায় করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

এক বছরের মধ্যে মোটা চাউলের ৬১ শতাংশ চড়ানোর ফলে সর্বাপেক্ষা দুঃস্থ ক্রেতারা কত দুর্দশায় পড়িতে পারে—সে কথাটা কি সরকার চিন্তা করিয়াছেন? সংসার খরচ বৃদ্ধির ফলে মজুরী বৃদ্ধির দাবি উঠিলে তাহা সামাল দিতে সরকার পারিবেন কি না সে কথাটাও তাঁহাদের পক্ষে চিন্তা করা অবশ্য প্রয়োজন।

এবার ইংরেজী নতুন বছরের সুরু হইতে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া বৃহত্তর কলিকাতার শিল্প এলাকায় মূল্যবৃদ্ধির যে হিড়িক সুরু হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারই মুখ্য ভূমিকা লইয়াছেন। ১৯৬৬-র ১লা জানুয়ারী রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তর কলিকাতায় বাসের কণ্ট্রোল দর বাড়াইয়াছেন; অন্যদিকে সারা ভারতের সঙ্গে সমান তালে পশ্চিম বাংলায়ও বেসরকারী ক্রেতাদের জন্য সিমেন্টের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৭ই জানুয়ারী হইতে হরিণঘাটার সরকারী দুগ্ধ প্রকল্পে দুধের দর চড়ান হইয়াছে। ঠিক এক সপ্তাহ পরেই রাজ্য সরকার কলিকাতার উপকণ্ঠে লবণ হ্রদ এলাকায় মধ্যবিত্ত উপনিবেশ স্থাপনের জন্য জমির দরও বৃদ্ধি করিলেন!

আরও আছে! সরকারের বিজলী পর্ষদ এপ্রিল মাসের মধ্যেই সারা রাজ্য জুড়িয়া বিজলীর রেট বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন! কলিকাতার বেসরকারী বিজলী কোম্পানীটিও তখন সরকারী মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণে বিলম্ব করিবেন না—বলা বাহুল্য গত ১৫।২০ বৎসর ক্রমশঃ মূল্য বৃদ্ধির কারণে শুধু সাধারণ লোক নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও নিরন্ত অভাব-অনটনের চাপে নাজেহাল হইয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হইয়া অধীনস্থ কর্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা আবার বৃদ্ধি করা অপরিহার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এমন অবস্থায় আবার চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করা হইলে সাধারণ লোকের দুর্দশার অন্ত থাকিবে না। ধানের মূল্য বৃদ্ধির কারণে চাল তৈয়ারীর পড়তা খরচ যেটুকু বাড়িয়াছে বা বাড়িবে তাহা ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু গত ৫৫ সপ্তাহের মধ্যে মোটা, মিহি ও সরেস চাউলের দর যথাক্রমে ৬১, ৫৫ ও ৪৫ শতাংশ এবং পরের দর ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি-করা সত্যই ন্যায্য কি না—সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য তদন্তের প্রয়োজন আছে।

এই প্রকার মূল্যবৃদ্ধি "কালোবাজারী" কি না এবং সরকার বাহাদুর কালোবাজার দমন করিবার অছিলায় নিজেরাই কালোবাজারী করিতেছেন কি না —এ বিষয়েও নিরপেক্ষ তদন্ত অত্যাবশ্যক। যে সরকার জনসাধারণের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই করেন বেশী, সেই সরকার হঠাৎ একদিন সর্বপ্রকার জনসমর্থন-বঞ্চিত হইয়া কোথায় তলাইয়া যাইবেন কেহ বলিতে পারে না। পথে-ঘাটে লোকের প্রতিটি কথায় বর্তমান সরকারের প্রতি এক বিষম ঘৃণা-অশ্রদ্ধার প্রকট প্রকাশ আমাদের আতঙ্কিত করিতেছে।

দেওয়ালের লিখন যাহা ক্রমশ স্পষ্ট হইতেছে, সেদিকে কর্তাদের দৃষ্টি পড়িতেছে কি?

মনে ছিল আশা—

মধ্যবিত্ত বাঙালীর 'মনে ছিল আশা'—স্বর্গত ডাঃ রায় পরিকল্পিত লবণ হ্রদ এলাকায় দু-তিন কাঠা জমিতে—একটি ছোট বাসা বাঁধিবার এবং এই আশা লইয়াই অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালী যথাসময়ে লবণ হ্রদ এলাকায় জমির জন্য যথাবিহিত দরখাস্ত করেন। কিন্তু এখানে জমির পূর্ব বিজ্ঞাপিত মূল্য কাঠা-প্রতি যে-হারে হঠাৎ বাড়ানো হইল, তাহাতে সাধারণ বাঙালীর পক্ষে লবণ হ্রদ এলাকায় বাসা বাঁধিবার আশায় ভস্ম ছাই পড়িল!

একদা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই উদ্দেশ্যে লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করেন যে—এখানে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত এবং অন্যান্য শ্রেণীর অল্পবিত্ত বাঙালীদের পক্ষে অল্প খরচে—সস্তা দরের জমিতে বাড়ী করিয়া বসবাসের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু বাঙালা ও বাঙালীর দুর্ভাগ্য, ডাঃ রায়ের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে এ-রাজ্যের বহু আশা-ভরসাও মহাপ্রয়াণ করিয়াছে। প্রশাসনিক কেরামতির কল্যাণে জমি পুনরুদ্ধারের খরচা এবং সময় দুইই দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়—ইহার জন্য জমি বন্টন ব্যাপারেও অত্যধিক বিলম্ব ঘটে। রাজ্য সরকার এখন তাড়াতাড়ি লবণ হ্রদের জমির প্লট বন্টন করিয়া একটা মোটা টাকা মুনাফা লুটিতে উদ্গ্রীব। অনেক কাটাকাটির পর লবণ হ্রদে মোটামুটি প্লটের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে: ২-কাঠার প্লট—৭৫০টি এবং ৩-কাঠার প্লটও সমসংখ্যক। ইহা ছাড়া, ৪, ৫, ৬ এবং আরও বেশী কাঠার প্লটও আছে—যাহা সাধারণ বাঙালীর-আয়ত্তের বাহিরে। ২।৩ কাঠার প্লটের মূল্য পূর্ব নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা দেড়-দুই গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং তাহাও কয়জন ভাগ্যবান পাইবে বলা শক্ত। ৪-কাঠা প্লটের দাম দেড় গুণ বাড়াইয়া কাঠা-প্রতি ৬ হাজার করা হইয়াছে। ৫-কাঠা প্লটের মূল্য হইবে ৪০ হাজার, ৬-কাঠা প্লটের ৫৪ হাজার, ৭-কাঠা প্লটের ৭০ হাজার—ইহার বেশী কাঠার প্লটের মূল্য পড়িবে আরও বেশী। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী ইচ্ছা করিলেই লবণ হ্রদ প্রকল্পে খাসা বাগান এবং বাড়ী নির্মাণ করিয়া পরমানন্দে বহু পুরুষ ধরিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করিতে পারিবে!

ইহার উপরেও কথা আছে। যাঁহারা লবণ হ্রদ

এলাকায় জমি কিনিবার দরখাস্ত করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে 'বিত্তহ' বাঙালী কয়জন, বিশেষ করিয়া যাঁহারা ৭।৮ কাঠার বা তদপেক্ষা বড় প্লটের জমি কিনিতেছেন। এই ব্যাপারে বেনামী কারবারও যে হইতেছে না, কর্মকর্তারা কি তাহা একবার সন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন না?

একদিকে জমির অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে বাড়ী-ওয়ালাদের চাপে বাঙালী ভাড়াটিয়াদের প্রাণ ওষ্ঠাগত আর সর্বদিকে সর্বদ্রব্যের আকাশপ্রমাণ মূল্য কীর্তি—এবং সব কিছুর বিষম চাপে সাধারণ বাঙালীর বর্তমান অবস্থা যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে না হউক—কলিকাতা এবং কলিকাতার নিকট শিল্পাঞ্চলগুলিতে বাঙালীর স্থান আর হইবে না। বাংলা হইতে বাঙালী এখন বিদায়ের পথে। সরকারের বহু-ঘোষিত নীতি To Hold the Price Line—আজ সাধারণের পক্ষে হইয়াছে 'Behold the Price Line!' আজ বুঝা শক্ত সরকার Price Line Hold করিতেছেন, না, Price Line সরকারকে hold করিতেছে!

নিজ বাসভূমে বাঙালী বহুদিনই পরবাসী। তবু সব কিছু প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক বাঙালীর বাস্তভিটা বলিয়া একটা কিছু ছিল। কিন্তু গত ১০।১৫ বছর যাবৎ এক শ্রেণীর বিত্তবান অবাঙালীর প্রবল-আর্থিক-প্রতাপে আজ বাঙালীর সামান্য বাস্তভিটাটুকুও যাইতে বসিয়াছে। কলিকাতার কথা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে—এই শহরে এবং কাছাকাছি অঞ্চলে মধ্য-বিত্ত বাঙালী প্রায় উদ্বাস্তু হইয়াছে। অবাঙালী কোটিপতি লাখপতিদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—এই মহানগরীর পূর্বপ্রান্তেস্থিত বিরাট লবণ হ্রদ ভরাট করিয়া—

সেখানে একটি মধ্যবিত্তের স্বর্গ গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সে সুদূরপ্রসারী কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য তাঁহাকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াইতে হইয়াছে। নয়াদিল্লি ত তাঁহাকে প্রথমে আমলই দেয় নাই, এ রাজ্যেও তাঁহাকে অনেক প্রবল আপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অন্য লোক হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু ডাঃ রায়ের সঙ্কল্প তাহাতে টলে নাই। বিরোধিতার প্রতিকূল বায়ু সেই বিরাট বনস্পতির কাণ্ডদেহে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—সরকারী কাইল ছাড়িয়া লবণ হ্রদ ধীরে ধীরে সার্থক রূপায়ণের পথে অগ্রসর হইয়াছে। যে বীজ তিনি সযত্নে বপন করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া একটি চারাগাছ দেখা দিয়াছে।

কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে, সরকারী হুকুমের একটি ফুৎকারে সেই চারাগাছটি ভাঙিয়া না পড়ে। লবণ হ্রদ এলাকায় যদি মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত ব্যক্তিদের নীড়-রচনার সুযোগ দিতে হয়, তবে সেখানে জমির দর এমন ভরে রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের হাত অনায়াসে তাহার নাগাল পায়। ডাঃ রায় সে কথা বিলক্ষণ জানিতেন বলিয়া সে এলাকায় জমির দাম খুব কম করিয়া বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছামত কাজ হইলে লবণ হ্রদ অঞ্চলের জমির দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঠা-পিছু দুই হাজারের উপর উঠিত না—হয়ত বা তাহার কমেও কিছু জমি পাওয়া যাইত। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হইয়াছিল, ওই এলাকার অধিকাংশ জমির দাম কাঠা-প্রতি তিন হাজারের মত হইবে। কিন্তু এখন যে নূতন সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহাতে তিন হাজার টাকা কাঠা দরে জমি পাওয়া যাইবে বটে, তবে সে কেবল শিল্পকার্যে। খাস কলিকাতা শহরে জমির চড়া দরের সঙ্গে পাল্লা দিয়া লবণ হ্রদের জমির দরও বাড়িতেছে এবং বাড়াইতেছেন স্বয়ং সরকার।

মধ্যবিত্তের আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া যদি লবণ হ্রদ এলাকা অথবা সরকারের অন্য কোনও অনুরূপ প্রকল্পের অন্তর্গত জমির দাম বাঁধিয়া দিতে হয়, তবে সে-ক্ষেত্রে তিনটি কাজ করিতে হইবে। প্রথমত, জমির দাম কম করিয়া ধরিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, একসঙ্গে পাঁচ-ছয় কাঠা জমি কিনিতে ক্রেতাকে বাধ্য করিলে চলিবে না, তৃতীয়ত, টাকাটা একসঙ্গে না লইয়া দফায় দফায় লইতে হইবে। এ সবই ডাঃ রায়ের পরিকল্পনায় ছিল। কিন্তু সে অতীতকে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিয়া যে নূতন প্রকল্প সরকারী আমলারা রচনা করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য বুঝি মধ্যবিত্তকে আশার ছলনায় ভুলাইয়া বিড়ম্বিত করা। বিনাবাক্যব্যয়ে শুধু জমি কিনিবার জন্য চল্লিশ কিংবা ষাট হাজার টাকার চেক কাটিয়া যাবতীয় দাবি মিটাইয়া দিবে, এমন আর্থিক স্বচ্ছলতা যাহার আছে, তাহাকে সরকারী আমলারা হয়ত মধ্যবিত্ত বলেন, কিন্তু এই পোড়া দেশে তাহারা কস্মিনকালে মধ্যবিত্ত (এবং হয়ত বাঙালীরও) নয়।

সরকারী নববিধানে লবণ হ্রদের জমির খরিদ্দার পাওয়া যাইবে না, এমন অসম্ভব কথা কেহ বলে না। যত দামই হউক না কেন, সে জমির গ্রাহকের (বিশেষ করিয়া অবাঙালী) অভাব হইবে না, সরকারী তহবিলও

কাঁপিয়া-ফুলিয়া উঠিবে। দেখিতে দেখিতে একটা ইন্দ্রপুরী সেখানে গড়িয়া উঠিয়া লোকের চোখ ঝলসাইয়া দিবে—হোটেল, রেস্তোরাঁ, নাচঘর, সিনেমা, প্রাসাদপুরী কোন-কিছুরই অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে সে সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করিবে তাহারাই, যাহাদের আক্রমণে ধরাশায়ী বাঙালী মধ্যবিত্তকে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সুযোগ দিবার জন্যই অসংখ্য বাধা অতিক্রম করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ওই লবণ হ্রদপুরীর পত্তন করিয়াছিলেন। সেখানে ডাঃ রায়ের স্মৃতিরক্ষার হয়ত চমৎকার ব্যবস্থা হইবে, তাঁহার পাষাণমূর্তি হয়ত সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথের শোভা বর্দ্ধন করিবে, কিন্তু তাঁহার সাধের পরিকল্পনায় ওই ভ্রান্ত দেখিয়া যে পাষাণেরও চোখে অশ্রুধারা দেখা দিবে।

রাজ্য সরকার না কি জমি লইয়া ফাটকাবাজি বন্ধ করিতে চান; কেননা, তাহারই ফলে কলিকাতা ও শহরতলির জমির দর হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। এ শহরে যত ফাঁকা জমি পড়িয়া আছে, সে সবও তাঁহারা দখল করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহাদের সকল যে উত্তম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু লোকে যদি সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা বিরাট তামাসা বলিয়া ধরিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদের ভুল সরকার ভাঙিবেন কি করিয়া? "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়"—এ মহাজনবাক্য সম্ভবত লালদীঘির পারে কেহ শোনেন নাই বা শুনিলেও ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সরকার নিজে যে জমির মালিক, তাহার দাম খুশিমত চড়াইবেন, আর অপরে তাহাদের জমির দাম ক্রমশই কমাইবে, এমন একটা অসম্ভব আশা সরকার কেমন করিয়া করেন? তাঁহাদের বুদ্ধির ভুলে লবণজলে ডুবিয়া ধাঁধার রাতে নয়, দিন-দুপুরেই মধ্যবিত্তের 'আশার সোনার তরী ডুবিয়াছে। খাস কলিকাতার ফাঁকা জমির টোপ ফেলিয়া তাহাকে উদ্ধার করার অভিযান এক নির্মম বিদ্রূপ।—

আনন্দবাজার যাহা বলিয়াছেন—তাহার বেশী আর কিছু মন্তব্য করার কোন প্রয়োজন বর্তমানে নাই। কেবল এই ভাবিয়া দুঃখ বোধ করি যে একদল বাঙালী সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসারই আজ বাঙলা হইতে বাঙালী খেদাইয়া—সেই শূন্য স্থানে বিত্তবান অবাঙালী প্রজাপত্তন করিতে সর্বপ্রযত্ন করিতেছেন। আমাদের রাজ্য মন্ত্রী-প্রধানের এদিকে দৃষ্টি দিবার সময় নাই—মহত্তর-cum-বৃহত্তর কর্তব্যে তিনি সদাব্যস্ত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা : বাঙলা : বাঙালী

বঙ্গ-সম্রাট শ্রীমতী গান্ধীর নূতন মন্ত্রিসভার গঠন পারিপাট্যে অতি সন্তুষ্ট এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী-প্রধান শ্রীসেন বলেন এ বিষয়ে 'এখনও মন্তব্যের সময় হয় নাই' —তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি বলেন যে, "রাজ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী গ্রহণ করা রীতি হওয়া উচিত নহে।"—অবশ্যই নহে, বিশেষ করিয়া যদি এ-পোড়া রাজ্যের মুখ-পোড়া মন্ত্রী সংখ্যা কেন্দ্রে যথাসম্ভব কম করা হয়—যেমন এবার হইয়াছে।

পূর্ব্ব মন্ত্রিসভায় বাঙালী মন্ত্রী ছিলেন মোট ৫ জন। (৩ জন পূর্ণাঙ্গ+২ জন হাফ্.) নূতন মন্ত্রিসভায় এই সংখ্যা ছাঁটিয়া করা হইয়াছে—মোট ২ জন (১ জন গোটা মন্ত্রী+১ জন হাফ্.)। নেহরু এবং শাস্ত্রী মন্ত্রিসভায় একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইত এবং তাহা এই যে—বিগত দুইটি মন্ত্রিসভাতেই আঞ্চলিক ভারসাম্য এবং রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া গঠিত হইয়াছিল। আমাদের নবীনা প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিসভা গঠনে পূর্ব্ব কুসংস্কার সমস্ত পরিহার করিয়াছেন অবশ্যই স্বীকার করিব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা কর্তব্য যে, তাঁহার মন্ত্রিসভায় উত্তর প্রদেশ এবং পাশের বিহার রাজ্য পূর্ব্ব-গৌরবে অচল-অটল। (বিহার কিছু লাভই করিয়াছে।) পূর্ব্ব মন্ত্রিসভায় উত্তর প্রদেশী যাঁহারা ছিলেন সকলেই নূতন মন্ত্রিসভায় বিদ্যমান! একমাত্র পোড়া পশ্চিমবঙ্গের ৫ জন হইতে তিন জনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন এবং ইহাতে সর্বভারতীয় বিরাট কংগ্রেসী নেতা-cum-বঙ্গ সম্রাট আনন্দিত হইবার কি পাইলেন সামান্য বুদ্ধি ক্ষীণদেহী বাঙালীর পক্ষে তাহা বুঝা অসম্ভব। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার কাইন্ডাল মতামত এখনও দেন নাই—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গঠন বিষয়ে রীতির নীতিবাণীতেই আপাতত কর্তব্য সারিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিষয়ে আমরা কেবলমাত্র বাঙলা ও বাঙালীর হইয়াই সামান্য কিছু বলিলাম, সর্বভারতীয় দাবার বোর্ডে ইহার প্রতিক্রিয়া কি, সে বিষয়ে বিচার এবং আলোচনা পণ্ডিতবর্গ করিতেছেন। আর এইটুকুমাত্র বলিব যে, খাস বাঙলাতেই যখন বাঙালী কোনঠাসা হইয়া পিছু হটিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বোধ হয় ইহলিপ্ত প্রাপ্ত হইবে—তখন দিল্লীতে দুই-চারিটা মন্ত্রিত্ব গেল বা রহিল তাহাতে বাঙালীর ভাগ্যাকাশের ঘন মেঘ কাটিবে না!

—০:০—

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(সাঁইত্রিশ)

রামকিঙ্করের ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। এসেই শুনলে সৌরাণীর কাছ থেকে দু'বার তলব এসেছে। একটু বিশ্রামের দরকার ছিল। কিন্তু তা আর হ'ল না।

সৌরাণীর ঘরের সামনে লম্বা বারান্দার ওপ্রান্তে মনে হ'ল যেন সারদা দাঁড়িয়ে ছিল। রামকিঙ্করকে দেখেই বোধ হয় অদৃশ্য হয়ে গেল।

যাক। রামকিঙ্কর এই পর্যন্ত আশ্বস্ত হ'ল যে, সারদা জীবিত আছে এবং এই বাড়ীতেই আছে।

কিন্তু তাকে দেখে অমন করে পালাল কেন? কেন তাকে অমন করে এড়িয়ে চলে? তার কাছে সে কি কিছু অন্যায় করেছে?

কিন্তু ভাববার সময় নেই। সে তখন সৌরাণীর দরজার পর্দার সামনে এসে গেছে।

—ভেতরে যেতে পারি?

—আসুন।

রামকিঙ্কর ভিতরে এল।

—বসুন।

রামকিঙ্কর অদূরে একটা চেয়ার টেনে বসল।

—আপনার কাছে আমি দু'বার লোক পাঠিয়েছিলাম।

কৈফিয়তের সুরে রামকিঙ্কর বললে, আমি একটু বেরিয়েছিলাম। এইমাত্র ফিরে খবর পেয়েই আসছি।

মালতী বললে, শুনেছেন বোধ হয়, গিন্নীমা বৃন্দাবন যাচ্ছেন।

—তাই না কি?

—আপনি শোনেন নি কি? গিন্নীমা বলেন নি?

—না।

—বোধ হয় এখনও কাউকেই বলেন নি। আজ বিকেলে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর ইচ্ছার কথাটা জানালেন। সেখানে একটা ছোট বাড়ী কিনে বাকি জীবনটা সেইখানেই কাটাতে চান।

একটু চিন্তা করে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, কি করবেন স্থির করেছেন?

সৌরাণী হাসলেন, এর আর স্থির করার কি আছে? তাঁর হুকুম কে অমান্য করতে পারে?

রামকিঙ্কর বললে, উনি চলে গেলে আমাদের খুব অসুবিধা হবে। কারবার বলুন, জমিদারী বলুন, সবই তাঁর নখদর্পণে। বলতে গেলে আমরা তাঁর ছায়ায় বসে আছি।

—আছিই ত। কিন্তু ছায়া ত স্থির নয়। সরে যায়। এখন বলতে গেলে তিনি কিছুই দেখেন না।

রামকিঙ্কর বললে, কিন্তু তিনি যে আছেন, মাথার ওপরে, তার থেকে আমরা সাহসটা কি কম পাই? তিনি চলে গেলে, এই সাহসটাই আমাদের নষ্ট হবে।

মালতী বললে, ওঁকে ত জানেন। যখন স্থির করেছেন, তখন তাঁকে বোঝায়, এমন সাধ্যি কারও নেই। বৃন্দাবনে বাড়ী একটা দেখতেই হবে।

রামকিঙ্করের সন্দেহ হ'ল, সৌরাণীর ওপর রেগেই উনি চলে যাচ্ছেন। কেন এই রাগ, কে জানে? রামকিঙ্কর এরই মধ্যে বুঝেছে, সৌরাণী পাত্রীটি সহজ নয়। ধীরে ধীরে কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে আসছেন। গিন্নীমা একেই পুত্রশোকাতুরা, তার ওপর বয়েস হয়েছে। তিনি জানেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর হাত থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নেবার শক্তি লক্ষ সৌরাণীর নেই। কিন্তু সেই ইচ্ছাটাই বোধ হয় তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নিজের থেকেই চলে যাচ্ছেন।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ এই ইচ্ছে তাঁর হ'ল কেন? গৃহদেবতাকে ছেড়ে একদিনের জন্যেও কোথাও যাবার ইচ্ছা তাঁর ত হয় নি।

মালতী বললে, তাঁর কোন্ ইচ্ছা কেন হয়, তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। হুকুম হয়েছে, বৃন্দাবনে একটি বাড়ী দেখে দিতে হবে। তার একদিকে তিনি নিজে থাকবেন, অন্যদিক ভাড়া দেবেন। সেই ভাড়াতেই তাঁর চলে যাবে। এস্টেট থেকে কিছুই পাঠাবার দরকার নেই।

হুঁ। গিন্নীমা বোধ হয় এমনও সন্দেহ করেন যে, কিছুদিন পরে বৌরাণী তাঁর মাসোহারা বন্ধ করেও দিতে পারেন। তাই শেষ বয়েসে যাতে কারও কাছে হাত পাততে না হয়, সে ব্যবস্থাও করে রাখছেন।

মুখ তুলতেই রামকিঙ্কর দেখলে, বৌরাণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে। এতক্ষণ খেয়াল করে নি, এখন মনে হ'ল, বৌরাণীর সুন্দর মুখখানি স্নো-পাউডারে পরিমার্জিত। কেশ-বাসও অগোছালো নয়। বৌরাণী আশ্চর্য রূপের অধিকারিণী।

মুচকি হেসে মালতী জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছেন?

রামকিঙ্কর মালতীর আশ্চর্য রূপের কথা ভাবছিল। ধরা পড়ার মত চমকে উঠল। বললে, কিসের?

একটা আশ্চর্য ভঙ্গিতে হেসে মালতী বললে, আমি জানি, আপনি কি ভাবছিলেন।

রামকিঙ্করের মুখ শুকিয়ে গেল।

মালতী বললে, আপনি ভাবছিলেন, গিন্নীমা পাকা লোক, নিজের জন্যে নিখুঁত ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন।

রামকিঙ্কর আশ্বস্ত হয়ে একটা নিশ্বাস ছাড়লে। বললে, ঠিক তাই।

মালতী বললে, জোর করলেও তাঁকে রাখা যেত না। কিন্তু আমি জোর করিও নি।

জোর করলেও যে রাখা যেত না, তা রামকিঙ্করও জানে। সে চুপ করে রইল।

মালতী বললে, ভয় পাচ্ছেন?

—কেন?

—হালটা সরে যাচ্ছে বলে।

রামকিঙ্কর বললে, না, ভয় নয়। তবে ভাবনা একটু হচ্ছে বৈকি!

মালতী বললে, আমার কিন্তু হচ্ছে না। আমার বিশ্বাস আছে। আপনি-আমি দু'জনে মিলে বেশ চালাতে পারব। হয়ত মাঝে মাঝে ভুল হবে। তা ভুল ত হয়েই থাকে। তার জন্যে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

একটু চিন্তা করে রামকিঙ্কর বললে, দু'জনের কথা বলছেন কেন? মনোহরবাবুকেও বাদ দেওয়া যায় না। তাঁর সাহায্যও নিশ্চয় আমরা পাব।

—কে মনোহরবাবু?

—আমি মনোহর ডাক্তারের কথা বলছি।

মালতীর মুখখানি হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। সুন্দর মুখ কঠিন হলে কি ভয়ঙ্কর দেখায়, রামকিঙ্কর এই প্রথম টের পেলে।

মালতী বললে, না, তিনি নেই। তাঁর সাহায্য আমরা চাইবও না, নোবও না। রইলাম শুধু আপনি এবং আমি।

সেখান থেকে রামকিঙ্কর বেরিয়ে আসছে, সিঁড়ির মাঝখানে হঠাৎ ঝড়ের মত সারদা তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তার হাতে একটা ছোট্ট কাগজ গুঁজে দিয়ে।

সারদা কথা চমৎকার বলে। সেটা বোধহয় ভদ্র-সমাজে মেশার জন্যে। কিন্তু সে যে লিখতে পারে, এ ধারণা রামকিঙ্করের ছিল না। অবশ্য রামকিঙ্করের ধারণা যে নিতান্ত ভুল, তাও বলা যায় না। কেননা, আঁকা-বাঁকা অক্ষরে কোনমতে লিখেছে তিনটি লাইন: রাগ করবেন না। আমি কয়েদীর মত আছি। ঘরের দরজায় খিল দেবেন না। আজ রাত্রে আমি দেখা করবার চেষ্টা করব।

নিচে নাম সই নেই। উপরেও সম্বোধন নেই। রামকিঙ্কর ভাবতে বসল।

প্রথম চিন্তা, সারদা কয়েদীর মত আছে কেন? কে তাকে কয়েদ করে রেখেছে এবং কেন? দ্বিতীয় চিন্তা, এতাবৎ সারদার সঙ্গে বিকেলে দেখা হয়েছে, কিংবা সন্ধ্যার মুখে। রাত্রে কখনও নয়। রাত্রে আসার সাহস সারদার এল কি করে? দীর্ঘকালের বন্দিত্বের ফলে সারদা কি মরিয়া হয়ে উঠেছে? এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের পক্ষে দুঃসাহস অস্বাভাবিক নয়। না কি বৌরাণীকে লুকিয়ে, অসংখ্য বাধা ডিঙিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার

এই বোধ হয় একমাত্র সময়। এবং প্রচুর ঝুঁকি নিয়ে সেই সময়টুকুর সে সদ্ব্যবহার করতে আসছে।

ঝুঁকি বড় সামান্য নয়। সে কোথায় শোয়, কে জানে। বোধ হয় বৌরাণীর ঘরের সামনের বারান্দায়, যেখান থেকে বৌরাণীর প্রয়োজনমত সাড়া দিতে পারে। তা যদি হয়, সারদা চলে আসার পর বৌরাণী যদি ডাকেন, সাড়া দিতে পারবে না। ধরা পড়ার সমূহ আশঙ্কা আছে।

রাতে অন্দর থেকে সদরে আসবার দরজার ভিতর থেকে তালাবন্ধ থাকে কি না, কে জানে। যদি থাকে, তার চাবির সন্ধান সারদা নিশ্চয় রাখে। যদি না থাকে, তা হ'লে ত কথাই নেই। কিন্তু দেউড়িতে দরোয়ান আছে। তা ছাড়া বাড়ীর চাকর-বাকরের সংখ্যাও কম নয়। ভরসা এইটুকু যে, শীতের রাত্রি। সবাই ঘরের মধ্যেই ঘুমোয়। তা হ'লেও রাতে কে কখন ওঠে বলা ত যায় না। কারও চোখে পড়ে যাবার আশঙ্কা যথেষ্ট রয়েছে।

এই ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে সারদা তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, ভাবতেও এই শীতের রাতে রামকিঙ্করের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

সারদার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে নিজেও কম ছটফট করছে না। তার সঙ্গে দেখা না হ'লে ভিতরের কথা কিছুই জানা যাচ্ছে না। বিশেষ করে মনোহর ডাক্তারের ব্যাপারটা জানবার জন্যে সে অত্যন্ত ছটফট করছে। বৌরাণীর আজকের কথায় সে আরও ধাঁধায় পড়ে গেছে। বোঝা গেল, এ বাড়ীর দৃশ্যপট থেকে বৌরাণী তার ছবি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। মনোহর ডাক্তারকে রামকিঙ্কর কোনদিনই সহ্য করতে পারে না। তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ায় রামকিঙ্কর মনে মনে যথেষ্ট খুশী হয়েছে। তথাপি কৌতূহল দুর্বার। সমস্ত জিনিসটা কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে।

কেন তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হ'ল? কি এমন গুরুতর অপরাধ সে করেছে? গুজবের মধ্যে যদি কিছু সত্যতা থাকে, তা হ'লে আজ যে গিন্নীমা সরে যাচ্ছেন বৃন্দাবনে এবং বৌরাণী কর্ত্তার আসীন হয়েছেন, তার মূলে মনোহর ডাক্তারের অংশ সামান্য নয়। বৌরাণীর তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অন্ততঃ রামকিঙ্করের নিজের সেই রকমই সন্দেহ ছিল। বৌরাণীকে সামনে রেখে মনোহর ডাক্তারই সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে উঠবে, এই রকমই তার ধারণা হয়েছিল।

কিন্তু স্ত্রীলোকের মন বোধ হয় জটিল পথে চলে। চাকা অত্যন্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে যাচ্ছে। কর্ত্তা হওয়া দূরে থাক, মনোহর ডাক্তার একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। তার নাম উল্লেখমাত্র বৌরাণীর মুখ কেমন কঠিন হয়ে উঠেছিল!

অথবা এ কি সাময়িক? মান-অভিমানের পালা-মাত্র? আজ যে সরে যাচ্ছে, কাল হয়ত আবার সে ফিরে আসবে। এবং তাদের সকলের প্রভু আসনে বসবে। রমণীর মন, বিচিত্র কিছুই নয়।

মনোহর ফিরে আসতে পারে, এই চিন্তা মনে উদিত হওয়ামাত্র রামকিঙ্কর অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল। তাকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

কিন্তু কি করবে? কি করতে পারে সে?

তাও জানে না।

কিন্তু কিছু একটা করতে হবেই। অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত নিদারুণ এবং দরকার হলে অত্যন্ত নৃশংস কিছু করতেও সে পিছপাও হবে না। ক্রোধে, ঘৃণায়, আক্রোশে রামকিঙ্করের দুই হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল। অসহ্য জ্বালায় চোখ জ্বলতে লাগল। হাত-ঘড়িতে দেখলে, রাত বারোটা বাজে।

রামকিঙ্কর বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

চাঁদের আলো এসে পড়েছে প্রশস্ত উঠানের খানিকটায়। কুয়াশা-ঢাকা চাঁদের আলো চমৎকার দেখাচ্ছে। কেমন যেন অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব।

প্রথম যখন এ বাড়ীতে আসে পরীক্ষা দেবার জন্যে, তখন অনেক রাত্রি এইখানে এমনি করে সে দাঁড়িয়ে থাকত অন্দরের দিকে ঝিলমিলির দিকে চেয়ে। অনেক রাত্রি ঝিলমিলির অন্তরাল থেকে বৌরাণীর চাপা ফোঁপানির শব্দ শুনতে পেত। তার ওপর সহানুভূতিতে ও করুণায় রামকিঙ্করের মন ভরে উঠত।

সেদিন চলে গেছে। বৌরাণীর ফোঁপানির শব্দ আর শোনবার আশঙ্কা নেই। আজ আর তিনি কারও

সহানুভূতির অথবা করুণার-প্রার্থী নন। বৌরাণী তাঁর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যার ফলে অমন যে জবরদস্ত পিসীমা, তিনিও বৃন্দাবন চলে যাচ্ছেন।

সমস্ত বাড়ী নিঃঝুম। কোথাও থেকে জীবনের সাড়া এতটুকু পাওয়া যাচ্ছে না।

হু হু করে শীতের হাওয়া দিচ্ছে। হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপছে। রামকিঙ্কর আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। ভিতরে এসে খাটে শুয়ে পড়ল।

অন্ধকার ঘর। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু রামকিঙ্করের ঘরে টাইমপিসটার মৃদু টিকটিক শব্দ হচ্ছে। কিন্তু সে যেন শব্দ নয়, যেন দণ্ডি ঠেলে ঠেলে নিস্তব্ধতার গভীরতা মাপ করা হচ্ছে।

রামকিঙ্করের মন থেকে সময়ের খেই হারিয়ে গেছে। সারদার জন্যে সে অপেক্ষা করছে। করছে ত করছেই। কতক্ষণ ধরে করছে, তার খেয়ালও হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা ফিসফিস শব্দ, ঘুমিয়ে গেছেন না কি?

রামকিঙ্কর তখন এত অন্যমনস্ক যে, বুঝতেই পারছে না, প্রশ্নটা তাকে করা হচ্ছে এবং দু'হাত দূর থেকে। যখন বুঝতে পারলে, তখন সারদা তার বুকের উপর কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

রামকিঙ্করের বুকের উপর সারদা কতক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে। কান্না যেন আর থামতে চায় না। রামকিঙ্কর নিঃশব্দে তার মুখে-মাথায় হাত বুলোতে লাগল। অবশেষে শান্ত হয়ে চোখের জল মুছে অবরুদ্ধ-কণ্ঠে সারদা বললে, তোমাকে একটা দিন না দেখে আমি থাকতে পারি না।

শান্ত অথচ গাঢ়কণ্ঠে রামকিঙ্কর বললে, জানি।

—জান? তা হ'লে নিশ্চয় আমার উপর রাগ কর না।

রামকিঙ্কর বললে, একটুও না। শুধু বুঝতে পারি না, তুমি হঠাৎ গা-ঢাকা দিলে কেন? কে তোমাকে বন্দী করেছে? কেন?

এবার সারদা হেসে ফেললে, বুঝতে পার নি?

—না।

—অনুমান করতেও পার না?

—না।

—আশ্চর্য! আমি জানতাম, তুমি বুদ্ধিমান। ব্যাপারটা বুঝতে তোমার নিশ্চয় বিলম্ব হবে না।

রামকিঙ্কর হাসলে, আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভুল। এসব ব্যাপারে আমার মাথা একেবারেই খেলে না।

সারদা সোজা হয়ে উঠে বসল। বললে, আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমার-আমার মধ্যে পাঁচিল তোলার কি অর্থ হ'তে পারে?

—সেইটেই ত বুঝতে পারছি না।

—একটাই অর্থ হ'তে পারে যে, কেউ হয় তোমাকে আমার কাছ থেকে, নয় আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

পরিহাস করে রামকিঙ্কর বললে, শেষেরটাই সম্ভব।

সারদা ধমক দিলে, না মশাই। কারণ, পাঁচিলটা কোন পুরুষে তোলে নি।

রামকিঙ্কর কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে কি সম্ভব?

সারদা বললে, কত বেশী সম্ভব, সে আমিই জানি। কারণ, আমি বৌরাণীর খুব কাছে রয়েছি। জান, মনোহর ডাক্তারের এ বাড়ী আসা বন্ধ হয়ে গেছে?

রামকিঙ্কর ধড়মড় করে উঠে বসল, কেন বল ত?

—এই একই কারণে। মনোহর ডাক্তারের ওপর তাঁর মন এখন বিষিয়ে গেছে। ঝোঁক পড়েছে তোমার ওপরে। আমাকে ছাড়া তাঁর চলে না। তাই ছাড়িয়ে দিতে পারছেন না। তা ছাড়া, ছাড়িয়ে দিলে ত তোমার চোখের আড়াল করা যাবে না। তাই নিজের কাছেই বন্দী করে রেখেছেন।

রামকিঙ্কর পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সারদা জিজ্ঞাসা করলে, কি করবে বল?

রামকিঙ্কর সাড়া দিলে না। তার সাড়া দেবার শক্তি ছিল না।

সারদা বললে, ঠিক করা কঠিন কিছুই নয়। একদিকে আমি, সামান্ত একজন ঝি, সুন্দরীও নই। আর একদিকে অত টাকা-পয়সা, অত রূপওয়ালা একটি মেয়েমানুষ। অত ভাববার কি আছে?

রামকিঙ্কর তথাপি সাড়া দিলে না।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, পিসীমা বৃন্দাবন যাচ্ছেন, জান ?

—জানি। কেন যাচ্ছেন তাও জানি।

—কেন যাচ্ছেন ?

—এইজন্যে।

—কি জন্যে ?

—তাঁর বুদ্ধি অনেক। তিনি বুঝেছেন, এর পরে বাড়ীতে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড আরম্ভ হবে। তা সে তোমাকে নিয়েই হোক, আর মনোহর ডাক্তারকে নিয়েই হোক। তা তিনি চোখে দেখতে চান না। তাই তার আগেই সরে পড়ছেন।

রামকিঙ্কর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

কিছু পরে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, এই অবস্থায়, এত রাত্রে এখানে আসতে তোমার ভয় করল না ?

—ভয় ত করছেই। বুঝতে পারছ না, প্রাণের দায়ে এসেছি।

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে ওর কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। বুঝতে পারলে, যে অবস্থায় পড়লে মেয়েদের কাছে প্রাণের ভয়ও তুচ্ছ হয়ে যায়, সারদা সেই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ইতিপূর্বে কখনও সে এত বাচালতা করে নি। সাধারণতঃ সে শান্ত, সংযত এবং ধীর।

রামকিঙ্কর বললে, তোমাকে কি পৌঁছে দিয়ে আসব ?

সারদা হেসে উঠল, রক্ষে কর! আমি একা ধরা পড়ি ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে ধরা পড়লে লজ্জা পাব। চললাম।

সারদা উঠে দাঁড়াল।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, আবার কবে দেখা হবে ?

সারদা ম্লান হেসে বললে, বলতে পারি না। দেখলে ত, কি করে এলাম। এমন করে ঘন ঘন আসা সম্ভব নয়।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়াল।

—একটা কথা বলব ?

—বল।

—কিছু মনে করবে না ?

—না।

সারদা তথাপি ইতস্ততঃ করতে লাগল রামকিঙ্করের পুনঃপুনঃ তাগাদায় অবশেষে বললে ভাবছি, চাকরিটা ছেড়ে দোব। কিন্তু ছেড়ে দিলেই ব চালাব কি করে ? পরের বাড়ীতে ঝি-গিরি করতে আর পারব না। ভাবছিলাম…

—কি ভাবছিলে ?

—ভাবছিলাম, তুমি ত এখন অনেকগুলো টাক মাইনে পাও। আমাকে যদি গোটা পঞ্চাশ টাকা করে মাসে মাসে দিতে তা হ'লে বেগমের বাঁদীগিরি ছেড়ে দিতাম।

হাসতে হাসতেই সারদা কথাগুলো বললে।

রামকিঙ্কর তখনি-তখনি জবাব দিতে পারলে না।

সারদা তাড়াতাড়ি বললে, এখনি-এখনি জবা দেবার দরকার নেই। আমিও কিছু এখনই চাকরি ছাড়তে পারছি না। তুমিও ভাব, আমিও ভাবি।

সারদা চলে গেল।

দুরু দুরু বক্ষে রামকিঙ্কর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। চাঁদ ডুবে গেছে। উঠানটা প্রায়ান্ধকার সেই অন্ধকারে কালো চাদর ঢাকা সারদার মূর্তি লঘু পায়ে অন্দরের দরজার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রামকিঙ্কর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। সবা নিদ্রিত। সারদা কারও চোখে পড়ে নি।

(আটত্রিশ)

সেদিন সবিতাকে কথা দিয়ে এসেছিল, শীঘ্রই আ একদিন আসবে। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি তার মন সবসময় চঞ্চল। সমস্ত কথা ঠিক সময়ে মনে পড়ে না।

সেদিন সবিতাকে দেখে তার মন খুবই খারা হয়েছিল। তার দুর্বল দেহ, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, সবিতা খুব সুখে নেই। তার কথা বলা ভঙ্গির মধ্যে যেন গভীর বেদনার সুর প্রচ্ছন্ন ছিল।

স্থির করলে, ঠিক সময়ে সবিতার কথাটা যখন মনে পড়েছে, তখন কালবিলম্ব না করে এখনই রওনা হওয়া

যাক। হাতে কাজ ছিল না। যৌয়াণীর ডাকাডাকির তাও ছিল না।

গিয়ে দেখে, সবিতা কোলের সন্তানটির পাশে চওড়া তক্তাপোষের উপর পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে। তার কোটরপ্রবিষ্ট চোখের দৃষ্টি শূন্য।

রামকিঙ্করকে দেখে সে চমকে উঠল। তারপর মুখে জোর করে হাসি টেনে বললে, কখন এসেছ তা হ'লে। ওই চেয়ারটা টেনে বস। সাবধানে বসবে। চেয়ারটার একটা পা ভাঙা।

ভাঙা চেয়ারে রামকিঙ্কর একেবারে অনভ্যস্ত নয়। সেটিকে তক্তাপোষের কাছে টেনে এনে সাবধানে বসল।

জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? জর না কি?

—না।

সবিতা অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছিল। জিজ্ঞাসা করলে, একটু চা খাবে ত, রাঙদা?

—না, আমি এইমাত্র চা খেয়ে আসছি। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। বস।

সবিতা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। বললে, বাঁচালে। নইলে তোমাকেই যেতে হ'ত চা আনতে। বাড়ীতে এক কৌটা চা নেই।

অভাব যে চলছে, সেদিনই রামকিঙ্কর তা বুঝেছিল। আজ সেটা স্পষ্টতর হ'ল।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, উপেনবাবু কোথায়?

সবিতা চমকে উঠল। তার মুখে যেটুকু রক্তের চিহ্ন ছিল, তাও মুহূর্তে কোথায় যেন উবে গেল। তৎক্ষণাৎ সে জবাব দিতে পারল না।

রামকিঙ্কর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে, অফিস গেছেন বোধ হয়।

—তাই হবে বোধ হয়।

রামকিঙ্করের তখনি মনে পড়ল, আজ রবিবার। হো হো করে হেসে বললে, আজ ত রবিবার সবিতা। অফিস যাবেন কি?

—তাও ত বটে।

জবাবগুলো রামকিঙ্করের ভাল লাগল না। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি অমন করে জবাব দিচ্ছ কেন সবিতা? কি হয়েছে?

কথাটা জানাবার ইচ্ছা বোধ হয় সবিতার ছিল না। এখন বাধ্য হয়ে বলতে হ'ল, সত্যি বলতে কি রাঙদা, তিনি কোথায় আমি জানি না। আজ দু'দিন ধরে তাঁর দেখা নেই।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল, সে কি! কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি ত?

সবিতা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিচ্ছিল, ঘটতে সবই পারে। কিন্তু তা বোধ হয় নয়। ঝগড়া করে চলে গেছে। আর ফিরবেন না, তাও বলে গেছেন।

এতবড় আঘাতের জন্যে রামকিঙ্কর প্রস্তুত ছিল না। সে বিমূঢ়ের মত সবিতার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু সবিতার দৃষ্টি দেওয়ালের দিকে। সম্পূর্ণ অর্থহীন দৃষ্টি।

রামকিঙ্কর সামলে নিল। তারপর শুধু বললে, দু'দিন তিনি আসেন নি?

সবিতা জবাব দিলে না।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, রান্না হয়েছে? বাজার করলে কে?

সবিতার চোখ এখনও পর্যন্ত শুষ্ক ছিল। ধীরে ধীরে বাষ্প জমতে লাগল। বললে, বড়টাকে পাশের ঘরের ওঁরা দুটো ডাল-ভাত খাইয়ে দিয়েছেন। এইটেকে একটু দুধ খাওয়াতে পারলে ভাল হ'ত।

—দেখছি।

রামকিঙ্কর তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে গেল। এবং মিনিট পনেরোর মধ্যে একটা মাটির ভাঁড়ে কিছু গরম দুধ আর শালপাতার ঠোঙায় খাবার নিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সবিতা কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ়ের মত রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে রইল।

রামকিঙ্কর তাড়া দিলে, বাচ্চাটাকে আগে একটু দুধ খাইয়ে দাও। তারপরে তুমি কিছু খেয়ে নাও।

বিনা প্রতিবাদে সবিতা তার আদেশ পালন করলে। বাচ্চাটিকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে আবার সে তার তক্তাপোষের জায়গাটিতে গিয়ে বসল।

বললে, তোমাকে ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমার ওপর ঠাকুরের ত দয়া হবার কথা নয়।

রামকিঙ্কর বললে, ঠাকুরকে তুমি নির্দয় ভাবছ কেন?

—বুড়ো বাপ-মা'র মনে যে কষ্ট আমি দিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে। করবার জন্যে আমি প্রস্তুতও। চিন্তা এই বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে।

রামকিঙ্কর সান্ত্বনা দিয়ে বললে, ঠাকুর যখন তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি দেখতে পাচ্ছ, তখন এই নিষ্পাপ শিশু দু'টিকেও পরিত্যাগ করবেন না। উপেন-বাবুর সঙ্গে কি হ'ল, তুমি আমাকে পরিষ্কার করে বল।

—হবে আর কি। দারিদ্র্য।

—তার মানে?

—তার মানে, আমাকে যখন বিবাহ করেন, তখন সংসার প্রতিপালনের কথাটা না ভেবেই বোধহয় বিবাহ করেন। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে রাগ পড়ল আমার ওপর। তা ছাড়া, বোধ হয় দারিদ্র্য-দুঃখ ভোলবার জন্যেই, ইদানীং নেশা-ভাঙ করতেও শিখেছিলেন।

—তার পরে?

—তার পরে যা হয়। মার-পিট, হৈ-হাল্লা, ইত্যাদি।

—তার পরে?

বিরক্তির সঙ্গে সবিতা বললে, সে-সব নোংরা কথা সবিতারে না-ই শুনলে রামদা। এ বাড়ীতে আরও ভাড়াটে আছেন। তাঁরা যখন মারমুখর হয়ে উঠলেন, তখন তিনি চলে গেলেন। পালিয়ে গেলেন আর কোনদিন ফিরবেন না।

একটুক্ষণ চিন্তা করে রামকিঙ্কর বললে, তা হ'লে কি করবে, ভাবছ?

হতাশভাবে সবিতা বললে, ভাবছি ত অনেকরকম। কিন্তু কূল-কিনারা পাচ্ছি না।

সবিতা অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

তারপর বললে, মুশকিল হয়েছে এই বাচ্চাটিকে নিয়ে। লেখাপড়া ত কিছু শিখেছি, চেষ্টা-চরিত্র করলে একটা মাষ্টারী মিলে যেতে পারে। কিন্তু একে দেখবে কে?

তা বটে।

রামকিঙ্কর বললে, আমার কাছে গোপন ক'রো ন সবিতা। তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে?

সবিতা সাড়া দিলে না।

রামকিঙ্কর পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে বললে, এইটে তোমার কাছে রেখে দাও কাল আমি ফের এসে সব ব্যবস্থা করে দোব।

পরদিন সকালে গিন্নীমা রামকিঙ্করকে ডেকে পাঠালেন। তাকে গিন্নীমা অনেকদিন ডাকেন নি কোন কর্মচারীকেই তিনি আজকাল ডাকেন না। কো প্রয়োজন ত নেই। রামকিঙ্কর অনুমান করলে, এ আহ্বা সম্ভবতঃ বৃন্দাবন যাত্রার ব্যাপার নিয়ে।

তার অনুমান সত্যি।

কোন ভূমিকা না করেই গিন্নীমা তাঁর বৃন্দাবন যাত্রা অভিপ্রায়ের কথা বললেন। সেই সঙ্গে সেখানে একখান বাড়ী কেনারও।

বললেন, খুব বড় বাড়ী নয়; বুঝলে? বাড়ীটা দুটো পৃথক অংশ থাকবে। একটা ভাড়া দোব আ একটায় আমি নিজে থাকব। তা হ'লে মাসোহারা জন্যে মাঝে মাঝে তোমাদের বিরক্ত করতে হবে না।

কথাটার মধ্যে একটা গভীর বেদনা বোধ হয় প্রচ্ছ ছিল। রামকিঙ্করের চোখে জল এসে গেল।

হাত জোড় করে বললে, ও কথা বলবেন না। সব আপনার। আপনি যেরকম হুকুম করবেন, আমরা তা করব।

উত্তরে গিন্নীমা শুধু একটু হাসলেন। সে হা প্রসন্নতার, কি ব্যঙ্গের ঠিক বোঝা গেল না।

অনেকদিন থেকেই রামকিঙ্করের মন গিন্নীমার উপ খুব প্রসন্ন ছিল না। বৌরাণীর উপর বৃন্দাবনচন্দ্রে অমানুষিক অত্যাচার এবং গিন্নীমার এ সম্পর্কে ভূমিকা রামকিঙ্করের সহানুভূতি স্বভাবতই বৌরাণীর দিকে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন। এই মুহূর্তে সেই মনই গিন্নীমার উপর সহানুভূতিতে কানায় কানা ভরে উঠেছে। তার চোখে জল জমছে।

বললে, আপনি চলে গেলে এতবড় সম্পত্তি দেখাশুনা করবে, ভেবে আমরা অস্থির হয়েছি। কোথা

যত গোলমাল লুকিয়ে আছে, আমরা তার কতটুকু জানি। আপনি মাথার ওপরে আছেন, এটা যে আমাদের কতখানি সাহস, তা বলে বোঝাতে পারব না।

গিন্নীমা এবারও হাসলেন।

বললেন, আমার এক দিদি আর ভগ্নীপতি অনেকদিন থেকে বৃন্দাবনে বাস করছেন। বাড়ী দেখবার জন্যে তাঁদেরকে চিঠি দিয়েছি। জবাব এলেই টাকা দিয়ে তোমরা কেউ চলে যাবে। দলিল করে, দরকার হ'লে বাড়ী মেরামৎ করে চলে আসবে। সুতরাং বৃন্দাবন যেতে আমার এখনও দেরি আছে। এখন থেকেই ব্যস্ত হয়ো না।

কথা শেষ হয়ে গেলেই গিন্নীমা অন্য কাজে মন দেন। সেটাই হ'ল উঠে যাবার ইঙ্গিত। কারও সঙ্গেই অকারণ অনাবশ্যক কথা তিনি বলেন না। এই তাঁর বরাবরকার অভ্যেস। এ বাড়ীর সকলেই তা জানে। সুতরাং রামকিঙ্করকে উঠতে হ'ল।

খুব ভারী মনেই রামকিঙ্কর উঠে এল।

ক'দিন থেকেই তার মনটা খুব ভারী। প্রথম তার হাঁপিয়ে দিয়ে গেছে সারদা। ধনী-গৃহিণীর দাসী। কতটুকু স্বাধীনতা নেই। তার পরে সবিতা। তাকে নিয়েই বা কি করা যায়? বাপের বাড়ীতে আশ্রয় পাবার আশা নেই। কে তাকে আশ্রয় দেবে? অন্য জাতের একটি ছেলে, সঙ্গে দু'টি কাচ্চা-বাচ্চা। এ দু'টি না থাকলেও বা হ'ত। সবিতা লেখাপড়া শিখেছে, মাষ্টারী-টাষ্টারী যা হোক কিছু একটা ক'রে নিজের পেটের ভাতটা যোগাড় করে নিতে পারত। কারও গলগ্রহ হ'তে হ'ত না। মুশকিল হয়েছে, বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে।

হঠাৎ তার মনে হ'ল, একটা কাজ করা যায় না? গিন্নীমা দূর-প্রবাসে যাচ্ছেন। তাঁরও ত সেবা করার লোকের প্রয়োজন।.. একটা অবলম্বন ত চাই। তিনি ওদের আশ্রয় দিতে পারবেন না?

কথাটা মনে হতেই রামকিঙ্কর থমকে দাঁড়াল। গিন্নীমার কাছে আবার ফিরে এল।

তাকে দেখে গিন্নীমা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন।

করজোড়ে রামকিঙ্কর বললে, একটা দরবার করতে এলাম।

কি বল?

—আমার বন্ধুর একটি বোন বাপ-মায়ের অমতে অন্য জাতের একটি ছেলেকে বিয়ে করেছিল।

গিন্নীমা ভ্রূকুটি করলেন।

রামকিঙ্কর বলে চলল, দু'টি সন্তানও হয়েছে। কাল খবর নিতে গিয়ে শুনলাম, ছেলেটি তাদের ফেলে পালিয়ে গেছে। অত্যন্ত অসহায়। কিছু লেখাপড়া শিখেছে। একা হ'লে চালিয়ে নিতে পারত। মুশকিল হয়েছে, বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে। ছোটটি মাত্র কয়েক মাসের।

রামকিঙ্কর থামল।

গিন্নীমাও নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে রইল। কিছু বললেন না।

তখন রামকিঙ্করকেই কথাটা স্পষ্ট করে পাড়তে হ'ল, আপনি ত দূর-বিদেশে যাচ্ছেন। দাসী-চাকর অবশ্য থাকবে। কিন্তু এরকম একটি মেয়ে আপনার অনেক কাজে আসতে পারে। সেও মেয়েমানুষ; আপনার মত একজন অভিভাবিকার আশ্রয়ে নিরাপদে থাকতে পারে।

গিন্নীমা নিঃশব্দে কি যেন কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। রাম নিঃশব্দে মুহূর্ত গুণতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে গিন্নীমা বললেন, দেখ রাম, তুমি যা বললে ঠিকই। এরকম একটি মেয়ে সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধা হয়। মেয়েটির দুঃখের কথা শুনে ইচ্ছেও হচ্ছে। কিন্তু, কি জান, সংসার ছেড়ে গোবিন্দজীর আশ্রয়ে যাচ্ছি। আর জঞ্জাল জমাব না।

গিন্নীমা আবার তাঁর কাজে মন দিলেন।

রামকিঙ্কর বুঝলে, সবিতার অদৃষ্ট মন্দ। নিঃশব্দে কাছারি ঘরে ফিরে এল।

একটি ছোট তোলা-উনান ধরিয়ে সবিতা রান্নার আয়োজন করছিল।

রামকিঙ্কর সবিস্ময়ে বললে, একটা বাজে, এখন রান্না চড়াচ্ছ? খাবে কখন?

সবিতা হেসে বললে, খাব'খন। আমার ত আপিসের তাড়া নেই।

—কিন্তু এতক্ষণ করছিলে কি তা হ'লে ?

—কিছুই করছিলাম না।

—তবে দেরি কেন ?

সবিতা হেসে বললে, কাজ না থাকলে দেরি হয়। যাদের কাজ থাকে, তারা ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করে। যাদের থাকে না তাদের কিছুই ঠিক সময়ে হয় না। তুমি ঘরে গিয়ে ব'স আমি ভাতটা চড়িয়ে দিয়েই আসছি।

মেয়েটা যেন ভেঙে গেছে। কথাগুলো বলছে নিতান্ত আলুথালু ভাবে। কিছুতেই যেন উৎসাহ নেই।

বড় মেয়েটা তার বাপের ঘরে ছিল। অন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিল। সেটাও কিরকম যেন শুকিয়ে গেছে।

বললে, খেতে দেবে না ? আমার খিদে পায় না বুঝি ?

চোখ পাকিয়ে সবিতা বললে, খিদে কি রে ? এই ত পড়েশিতে এক পেট মুড়ি খেলি।

মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বললে, সে ত কখন খেয়েছি। তার পরে খিদে পায় না বুঝি ?

সান্ত্বনার সুরে সবিতা বললে, আর একটু খেলা করগে, আমার রান্না এক্ষুনি হয়ে যাবে।

রামকিঙ্করের সামনে সবিতা বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছিল।

রামকিঙ্কর বললে, বেশ ত মিছিমিছি দেরি করে নিজেও কষ্ট পাচ্ছ, মেয়েটাকেও কষ্ট দিচ্ছ।

তার কণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তির সুর।

সবিতা বললে, এর পরে অদৃষ্টে কি আছে জানি না ত, ওরা এখন থেকে তৈরি হোক।

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

মেয়েটাকে খাইয়ে দিয়ে খেয়ে ফিরে আসতে সবিতার বেশি দেরি হ'ল না।

রামকিঙ্কর বললে, এর মধ্যে খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল ? কি রাঁধলে ?

—কত কি রাঁধলাম। পোলাও, কালিয়া, কোর্মা, কাবাব। ভাবলাম তোমাকেও ডাকি।

সবিতা হাসতে লাগল।

কিন্তু রামকিঙ্কর হাসতে পারল না। এই মেয়েটির সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে সবিতা ডাকলে, রামদা !

রামকিঙ্কর ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইল।

সবিতা বললে, একটা সুরাহা হয়েছে।

—কি সুরাহা হয়েছে ?

—একটা বুড়ী ঝি পাওয়া যেতে পারে, যে ছেলে-মেয়ে দুটোকে দেখবে, দরকার হ'লে দুটো রান্নাও করে দিতে পারে।

—মাইনে নেবে না ?

—না, না। মাইনে নেবে বৈকি।

—তবে আর সুরাহাটা কি ?

একটা ঢোঁক গিলে সবিতা বললে, এই সুরাহা যে, তার জিম্মায় ছেলেমেয়ে দুটোকে রেখে আমি কিছু করতে পারব।

—কি করতে পারবে ?

—কিছু কাজকর্ম আর কি। মাষ্টারী হোক আর যাই হোক। যাতে করে আমি সংসারটা চালাতে পারব।

কথাটা মন্দ নয়।

রামকিঙ্কর বললে, কোথাও কি ভরসা পেয়েছ ?

—কোথাও না। চেষ্টাও ক'রি নি। তোমার সন্ধানে কোথাও কিছু জানা-শোনা আছে ?

রামকিঙ্কর বললে, চেষ্টা করব। যদি পাই তোমাকে জানাব। কিন্তু দিনকাল যেরকম, কোথাও কিছু হবার সম্ভাবনা দেখি না।

সবিতা বললে, তা বললে ত হবে না। ততদিন আমি চালাব কি করে ?

—সে হয়ে যাবে একরকম করে।

—কিরকম করে ? তুমি দেবে ?

—সেইরকমই ভেবেছি।

—ভেবেছ ? কিন্তু তুমি বা কেন দেবে ? আমার ভাই যদি কোন সাহায্য না করে, তা হ'লে তার বন্ধু হিসাবে তুমিই বা করবে কেন ? তোমার কি দায় ?

সবিতার কণ্ঠে ঈষৎ উত্তেজনা।

রামকিঙ্কর হাসলে, দায় ? তোমার কি ধারণা,

—আর কি জন্তে ?

রামকিঙ্কর ধীরে ধীরে বললে, তা নয় সবিতা। কোন্ কাজ মানুষ কেন করে, তা হয়ত বলতে পারব না। কিন্তু সব কাজ যে মানুষ দায়ে পড়ে করে না, এ আমিও জানি, তুমিও জান। দায়ের মূল্যও বেশী নয়। হ'লে তোমার বাবা-মা-ভাই তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারতেন না। তোমার স্বামী ত নয়ই। নয় কি ?

রামকিঙ্কর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সবিতার দিকে চাইল।

সবিতা বললে, তবে তুমি আমাকে কি জন্তে সাহায্য করবে বল ? একদিন নয়, দু'দিন নয়, যতদিন না আমার চাকরি হয়, (সে কতদিন তাই বা কে জানে) ততদিন সাহায্য করে যাওয়া কি সুখের কথা ?

রামকিঙ্কর বললে, সত্যি খুব কঠিন কথা। কিন্তু আমার একটা সুবিধা আছে।

—কি সুবিধা ?

—বিয়ে-থা করি নি। আমার ঘাড়ে কোন বোঝা নেই। যদি কিছু পারি, সেইজন্তেই পারব।

—কিন্তু একদিন ত বিয়ে-থা করবে। তখন কি করে সাহায্য করবে ?

রামকিঙ্কর হেসে ফেললে। বললে, ততদিনে তোমারও একটা চাকরি-বাকরি কিছু হয়ে যাবে। কি হয়ত উপেনবাবু ভুল বুঝতে পেরে আবার অনুতপ্ত চিত্তে তোমার কাছে ফিরে আসবেন।

উপেনের নামে সবিতার চোখ দপ করে জলে উঠল। বললে, না। এখানে আর তার জায়গা হবে না। আমি যদি খেতে না পাই, তবুও না।

রামকিঙ্কর অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। স্বামীর উপর কোন স্ত্রীলোকের বিদ্বেষ এতদূর উঠতে পারে, তার ধারণা ছিল না।

(ক্রমশঃ)

—[*]—

পথ···মানুষের পায়ে-চলার পথ, বোবা পথ, কিন্তু তার বুকে রয়েছে কতকালের স্মৃতি। শতাব্দীর মানুষ এই পথ ধরেই যাওয়া-আসা করেছে···কত রাজা, কত বাদশা, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের পদচিহ্ন মিলিয়ে আছে এরই ধুলোর সঙ্গে। কত কাহিনী···কত কীর্তি-অ-কীর্তির রোমাঞ্চ, কত শক-হূণের দৌরাত্ম্য, কত পুত্র-হারা স্বামীহারার চোখের জল এই ধুলোয় শুকিয়ে আছে ···বোবা পথ, কথা বলে না কিন্তু মূক হয়ে পড়ে আছে কত কালের কত কাহিনী।

আজও দেখি, সেই একই পথ ধরে চলেছে···যে-পথে চলেছে আমার পিতা-পিতামহেরা, যে পথ ধরে মানুষের আদিম মানুষ একদিন নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

এই পথেই চলেছেন বুদ্ধ-চৈতন্ত-রামকৃষ্ণ, আবার এই পথেই দেখছি মানুষে মানুষে করছে হানাহানি। বাধা দিতে জানে না, অসহায় বোবা পথ শুধু স্মৃতি বহন করে।

এই পথেই মানুষের আসাযাওয়া যেরোয়, আবার এই পথের ধারেই মানুষ ম'রে পড়ে থাকে। যে ঘৃণ্য অসহায়ের মত কাজ মানুষ ঘরে করতে সঙ্কোচ বোধ করে, তাকেই ঠেলে নামায় সে-পথে। তাই পথ হ'ল ঘৃণ্য কাজের লীলা-ক্ষেত্র। লজ্জাহীন, বাধাহীন, নিরঙ্কুশ দূর-প্রসারী এই পথ।

কিন্তু পথের কি কোন ভাষাই নেই ? পথের বুকে কান পেতে শোন, শুনতে পাবে···বোবারও ভাষা আছে,

বোবাও কাঁদতে জানে। বলে, আর সইতে পারি না, আমায় ছেড়ে দাও!

ফুটফুটে একটি ছেলে…কতই বা তার বয়স, এই পথ থেকেই হ'ল চুরি।

বাপের একটিমাত্র ছেলে। দুঃস্থ বাপ, সামান্য কিসের চাকরি করে। মা ছেলের শোকে কেঁদে কেঁদে বিছানা নিলে। কলকাতা শহর…বিরাট শহর, তবু শহর তোলপাড় করে খুঁজল বাপ…থানা, পুলিশ, হাসপাতাল, সর্বত্র।

কয়েকদিন পরে একখানা চিঠি এল তাকে। অপরিচিতের হস্তাক্ষর, না আছে ঠিকানা, না আছে তারিখ।

"আজ থেকে সাতদিন পরে ঠিক বেলা বারোটার সময় বৌবাজার-চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর দক্ষিণ কোণে কালো পোশাক-পরিহিত যে-ব্যক্তিটিকে দেখবে, কোন প্রশ্ন না করে তার হাতে দশ হাজার টাকা দেবে। তোমার ছেলে আমাদের কাছে আছে। নির্দিষ্ট দিনে ঐ টাকা না পেলে, তোমার ছেলের কাটামুণ্ড আমরা সেই পথের ধারেই রেখে দেব…ইচ্ছা হয়, দেখে যেও। পুলিশের সাহায্য নেবার চেষ্টা ক'রো না, তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। দ্বিতীয় পত্রের প্রত্যাশা ক'রো না…এই আমার শেষ পত্র। মনে রেখ, আজ থেকে সাতদিন পরে।"

দশ হাজার টাকা! একশ' নয়, দুশ' নয়…হাজার নয়, দশ হাজার! কোথায় আছে সে টাকা…কোন সমুদ্র মন্থন করে যে আনবে তার পুত্রের জিয়ন-কাঠি?

দরিদ্র বাপ ব্যাকুল হয়ে ছোটে পরিচিত-অপরিচিতের কাছে।

সবাই পরামর্শ দেয়, পুলিশে যান।

কিন্তু পুলিশে যেতে যে নিষেধ আছে। হায়রে বাপের প্রাণ!

লালবাজারের সকল পুলিশ একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে। পুলিশী-কথায় তারা আশ্বাস দেয় ছেলের বাপকে।

বাপের চোখে ঘুম নেই…একটি-দু'টি করে এমনি পাঁচটি রাত্রি বিনিদ্র যাপন করে বাপ।

ষষ্ঠ দিনে এল আর একখানা চিঠি।

"পুলিশের শরণ নেওয়াই অবশেষে স্থির করলে? বুঝলাম, ছেলে তুমি চাও না। তবু আমাদের কথামত আরও একটি দিন অপেক্ষা করব। মনে রেখ, বৌবাজার-চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর দক্ষিণ কোণে কালো পোশাক-পরিহিত এক ব্যক্তি।"

বাপ ছুটল লালবাজারে সেই চিঠি নিয়ে। এ ছাড়া তার করবারই বা কি ছিল? কোথায় পাবে সে দশ হাজার টাকা!

পুলিশ সেদিনের মত আজও নিশ্চিন্ত হতে উপদেশ দিলে।

ষষ্ঠ রাত্রি। একটিমাত্র রাত্রি আর অবশিষ্ট। রাত্রি প্রভাতের পর সে কি আর বেঁচে থাকতে পারবে? সারা রাত্রি উন্মাদের মত ঘরে পায়চারি করে আর বলে, লুঠ, ব্যাঙ্ক লুঠ করব…টাকা আমার চাই।

*

পুলিশ এসে যখন খবর দিলে, তার ছেলের ছিন্নমুণ্ড সেই পথের ধারে পাওয়া গিয়েছে, তখনও সে ঘরে উন্মাদের মত পায়চারি করছে আর বলছে, ব্যাঙ্ক লুঠ করব!

*

বোবা পথ…কিন্তু বোবারও ভাষা আছে—সেও কাঁদতে জানে। বোবা পথের বুকে কান পেতে শোন, শুনতে পাবে।

লোকে বলে, একটা দানব ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ ক'দিন থেকে। সারা শহরে চাঞ্চল্য! এ কে বিরাটকায় মানুষ, যার বড় বড় থাবা, অসাধারণ পায়ের ছাপ!

কেউ আজও তাকে চোখে দেখে নি…তবু আতঙ্ক, লোকমুখে শুনে শুনে আতঙ্ক, কেউ বলে ছোট ছেলে আস্ত গিলে খায়, আবার কেউ বলে ও এক নয়, বহু হয়ে ঘুরে বেড়ায়! নইলে শহরের সর্বত্র একই ঘটনা ঘটে কি করে?

লক্ষ্নৌ-এ হানানা এসেছে…তার গতিবিধি সর্বত্র হলেও রীতি এক। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, খবর শিশুর প্রয়োজন। কিন্তু এই বিরাটকায় দানবের কোন বাঁধা-ধরা রীতি নেই…কেউ জানে না, কখন অতর্কিতে কার কি সর্বনাশ করে বসে!

কোথাও কিছু নেই, এতটুকু রক্তের চিহ্নমাত্র নেই—হঠাৎ একটি ভোরের আলোয় দেখা গেল, সুন্দর ফুটফুটে এক দশ-বারো বছরের ছেলের প্রাণহীন-দেহ কার্জন পার্কে পড়ে আছে। সেই একই দাবি—প্রাণের বিনিময়ে কয়েক হাজার টাকার দাবি।

দরিদ্র পিতার টাকা কোথায়? সে ব্যাকুল হয়ে পুত্রকে রক্ষা করবার সকল রকম চেষ্টাই করলে, যা

চোখের জলে বুক ভাসালেন, কিন্তু দানবের প্রাণ গললো না।

সময় উত্তীর্ণ হ'ল। টাকা সংগ্রহ হ'ল না। পিতা আর্তনাদ করে উঠলেন। দানব তার যথারীতি কর্তব্য সম্পাদন করল।

পৃথিবীতে একটিমাত্র কাম্যবস্তু এই দানবের আছে। সে হচ্ছে অর্থ। সে এই অর্থের জন্য মানুষের যা কিছু উপভোগ্য বস্তু সমস্তই বর্জন করেছে। যে ইন্দ্রিয়-লালসায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়…এতবড় দুর্দমনীয় কাম, সেই কামও তাকে প্রভাবিত করতে পারে নি।

সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোককে সে স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছে…এনে সে খেলাই করেছে, যতদিন না স্বামীর কাছ থেকে তার মনোমত অর্থ আদায় করতে পেরেছে। কেউ পেরেছে সে অর্থ দিতে, আবার কেউ পারে নি। যে পারল, সে ফিরে পেল তার স্ত্রীকে—আর যে পারল না—

নিজের চোখে দেখেছি, সেই সুন্দর নিটোল দেহ কিভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে এমনভাবে বিকৃত করা যায় এর আগে জানা ছিল না। জিভটাকে টেনে বের করে বীভৎস লম্বা করা হয়েছে, থুঁৎনিটা খসে পড়ে বুকের সঙ্গে ঝুলছে, একটি চোখের তারা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর একটিতে গহ্বর, মাথার খুলির খানিকটা অংশ উড়ে গিয়ে ঘীলু বেরিয়ে পড়েছে…নিম্নাংশের বিকৃতি আরও বীভৎস!

স্বামী সেই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায়।

শহরের চাঞ্চল্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিকার নেই, প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা নেই…দুরু দুরু বুকে দিন ও রাত্রি যাপন করে।

মানুষের রক্ত-মাংস দিয়েই এই দানবের সৃষ্টি হয়েছে। লোকে বলে, এও একদিন মানুষ ছিল। এরও ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, ঘর-সংসার। তারা কোথায় কিভাবে হারিয়ে গেল, কেউ জানে না সে ইতিহাস। শুধু দেখতে পেল, এই মানুষেরই মাঝখান থেকে এক আতঙ্কময় দানবের উদ্ভব!

এরাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কান ছিঁড়ে স্বর্ণালঙ্কার টেনে নেয়…চিৎকার করলে গলা টিপে সে-চিৎকার বন্ধ করে দেয়। এদের লোহার মত হাত, পাথরের মত বুক!

বুড়ো বলে, দানব একটা স্বতন্ত্র জীব নয়। তোমার আমার মধ্যে…প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, এই দানব আত্মগোপন করে আছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমরাই চাল মজুত করে রেখে লক্ষ লক্ষ লোককে না খেতে দিয়ে মেরেছি, আমরাই সৃষ্টি করেছি অগণিত ভিক্ষুক…যারা পেটের জ্বালায় সকল দুয়ারে হাত পাতে। আমরা এক হাতে কল্যাণ করি, আর এক হাতে অকল্যাণকে ডেকে আনি।

বোধ হয় বুড়োর কথাই ঠিক। পাশের বাড়ীর এক নিরীহ ভদ্রলোক—যাকে এতকাল শান্ত-প্রকৃতি বলে প্রচার করে এসেছি, হঠাৎ জানলাম সে গতরাত্রে তার স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে!

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকমলাকুমার নন্দী

এয়ার ইণ্ডিয়া দুর্ঘটনা

মানুষের জীবন মৃত্যুর অধীন, অনিশ্চিত। এই অমোঘ সত্যটি সকলেরই জানা কথা। কিন্তু তবুও যখন এই জগতের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি সংসার ছেড়ে চলে যান, তখন সেই ব্যক্তিটির বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্রে অনিবার্য ভাবে একটা ফাঁক থেকে যায়। কালের অমোঘ বিধানে সে ফাঁক অবশ্যই এক সময় ভূরে যায়, কিন্তু তার দাগটুকু মিলিয়ে যেতে যে অনেক সময় যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এবারকার ইংরাজী নববর্ষ যেন ভারতের পক্ষে দুর্ঘটনা ও ক্ষতির বৎসর বলে মনে হয়। সুদূর তাসখণ্ডে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, তাঁর অতি অল্পদিনকার প্রধানমন্ত্রীত্বের কালের বিশিষ্টতম সাফল্যের মুহূর্তে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ১১ই জানুয়ারী তারিখের প্রত্যূষে দেহরক্ষা করেন। আবার মাত্র ১৩ দিন পর, গত ২৪শে জানুয়ারী তারিখের প্রাতঃকালে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে জেনেভা সহরের নিকটবর্তী আল্পস পর্বতপুঞ্জের মঁ ব্ল্যাঁ নামক প্রসিদ্ধ চূড়ার উপরে ধাক্কা লেগে এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের বোম্বাই-নিউ ইয়র্ক-গামী একটি ৭০৭ বোয়িং জেট বিমান ১১৭ জন আরোহীসহ ধ্বংস হয়, আরোহীদের মধ্যে একজনও রক্ষা পান নাই।

আরোহীদের মধ্যে ছিলেন কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হবার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিশেষ ক্ষতি সাধিত হ'ল তাতে সন্দেহ নেই। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট আণবিক-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডাঃ হোমি জে. ভাবা। উনি ভারতের আণবিক-শক্তি (atomic energy) কমিশনের প্রধানাধ্যক্ষ ও ভারত সরকারের আণবিক গবেষণা বিভাগের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জগতের আণবিক গবেষণার ধারায় এঁর চিন্তার দান বিদেশেও স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং বিজ্ঞান-গবেষণার এই বিশিষ্ট বিভাগে ভারতে তিনিই ছিলেন প্রধান পুরোহিত। তাঁর এই অকস্মাৎ মৃত্যুতে বিজ্ঞানের জগতে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হ'ল, আর সেই ক্ষতি বিশেষ করে ভারতের আণবিক গবেষণার ধারায় একটা অনিবার্য শূন্যতার সৃষ্টি করল। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি ঘটেছে, ডাঃ ভাবার মৃত্যুতে ক্ষতি আরো বেশী হয়েছে।

ডাঃ ভাবা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের মধ্যে দেশে-বিদেশে আণবিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিশেষ স্বীকৃতি এবং বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান তিনি আণবিক শক্তির উৎপাদন দ্বারা সাধন করা যাবে বলে মনে করতেন। এই সমস্যার বিষয় তাঁর অনেক রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে প্ল্যানিং কমিশন বোম্বাইয়ের নিকট তারাপুর নামক স্থানে প্রথম আণবিক শক্তি উৎপাদন সংগঠনের পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন। সেই শক্তি কেন্দ্রটির নির্মাণকার্য বর্তমানে চালু রয়েছে। ডাঃ ভাবার এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ফলে ভারতে আণবিক গবেষণার কাজে যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটল তাতে সন্দেহ নেই।

এয়ার-ইণ্ডিয়ার জেট বিমানের দুর্ঘটনার কয়েকদিন পরে জাপানে একটি বোয়িং ৭২৭ জেট বিমান, ১৩৩ জন আরোহীসহ সমুদ্রের উপর ধ্বংস হয়। এই দুর্ঘটনাটিকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষতিকারক বিমান দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই পর পর বোয়িং জেট বিমানগুলির দুর্ঘটনার ফলে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। বোয়িং জেট বিমানগুলির নির্মাণে কোন অভাবের জন্য এরূপ দুর্ঘটনা ঘটছে না ত? কয়েক বৎসর পূর্বে বোম্বাইয়ের নিকট পশ্চিমঘাট পর্বতপুঞ্জের উপর অনুরূপ একটি এ্যালিটালিয়ার বোয়িং জেট বিমানও বহু আরোহী-সহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সম্পর্কে বি ও এ সির কমেট বিমানগুলির কথা মনে পড়ে। কয়েক বৎসর নির্বিঘ্নে আকাশে ওড়বার পর, পর পর কয়েকটি কমেট দুর্ঘটনার পর —একটি কলকাতা থেকে রওনা হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই শূন্যে হঠাৎ টুকরো টুকরো হয়ে যায়—বি ও এ সির কর্মকর্তারা সব কমেট বিমানগুলির চলাচল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। যতদূর মনে পড়ে অনেক গবেষণা ও অনু-সন্ধানে এই বিমানের নির্মাণে কিছু গলদ্ (structural defect) আবিষ্কৃত হয় এবং তার সংশোধনের ব্যবস্থা হয়। এরূপ ঘন ঘন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বোয়িং দুর্ঘটনার ফলে অনুরূপ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ

বিচারের দ্বারা বিমানারোহীদের আবস্ত করলে হয়ত ভাল হয়।

ছাপাখানার জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছি, এমন সময় আরো একটি বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ৩৭ জন আরোহীসহ কাশ্মীর থেকে দিল্লীর পথে আই এ সির একটি ফোকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমান নিখোঁজ হয়েছে। আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে সম্ভবত বিমানটি কোন নিকটবর্তী পাকিস্তানী বন্দরে অবতরণ করতে বাধ্য হয়ে থাকবে, এরূপ কেউ কেউ আশা করেন। তা যদি হয় তবে ত ভালই, এবং তার সংবাদও শীঘ্রই পাওয়া যাবার কথা। না হ'লে হয়ত এবারও ৩৭টি প্রাণ নষ্ট হ'ল।

* * * *

১৯৬৬—উৎপাদকী সাল

এবারকার নূতন ইংরাজী বৎসর ১৯৬৬ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের শেষ এবং আগামী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরু হবে এই বৎসরটিকে "উৎপাদকী" (productivity) বৎসর বলে নির্দ্দিষ্ট করবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য এই যে পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রয়োগের একটা মূল্যায়ন বিচারের দ্বারা পরিকল্পনার লক্ষ্য (targets), গতি (pace) এবং প্রকৃতির আসল স্বরূপ নিরূপণ এবং পরিমাপ করা। এরূপ একটা বিশ্লেষণ ও বিচারের যে গুরুতর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সেটা স্পষ্ট। কেননা ভারত সরকারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিশ্ব ব্যাঙ্ক সম্প্রতি ভারতের পরিকল্পনা প্রয়োগের গতি ও প্রকৃতির যে বিরূপ সমালোচনা করেছেন সেটা অসমীচীন বা অলীক বলে কোন রকমেই উপেক্ষা করা চলে না। তা ছাড়া আর্থিক উন্নয়নের (economic growth) পথে ভারতবর্ষ এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে, পরিকল্পনা রূপায়ণের অস্তিব সাফল্য কতটা পরিমাণ দক্ষতা ও সুস্থতার (efficiency and wholesomeness) সঙ্গে আমাদের বর্তমান উৎপাদকী আয়োজন (productive apparatus) কাজে লাগান যাবে তার ওপরে বিশেষ পরিমাণে নির্ভর করবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের আর্থিক সংস্থানের (economic resources) উপরে যে সকল অতিরিক্ত ও আকস্মিক বোঝাগুলি চেপেছে—নানা দিক থেকে এবং বিভিন্ন কারণে এই নূতন বোঝাগুলি, বিশেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষার্দ্ধে দেশের ওপর চড়িয়েছে—যথা, অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা খরচের দায়, তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণে ঘাটতি এবং এই বিবিধ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণের ফলে মূল্যমানের উপরে যে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়ে চলেছে, তাতে বর্তমান বৎসরটিকে বিশেষ ভাবে আঘাত পাবার জন্য তৈরী করে রেখেছে। এই সকল কারণে দেশের সমগ্র উৎপাদকী আয়োজনের এবং আর্থিক সংস্থানের (productive and financial resources) সর্বতম এবং সার্থক ব্যবহার যে বর্তমান বৎসরে পূর্বের তুলনায় আরও গুরুতর ভাবে জরুরী হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান উৎপাদকী আয়োজন এবং আর্থিক সংস্থানের প্রকৃষ্টতম সার্থক ব্যবহার সত্ত্বেও যে দেশের নিম্নতম প্রয়োজনও সম্পূর্ণ সাধিত হবে না, সেটা স্পষ্ট; সেই কারণেও এই প্রকৃষ্টতম সার্থক ব্যবহার আরও বেশী জরুরী বলে অনুভূত হবে। তা ছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ার আগামী পাঁচ বৎসরে দেশের আর্থিক কাঠামোর যে বহুমুখী উন্নয়নের (diversification) আশা করা যাচ্ছে, সেটা উৎপাদকী-শক্তির প্রকৃষ্টতম সার্থক ব্যবহারের দ্বারাই সাধন করা সম্ভব।

বিশ্বব্যাঙ্কের আলোচ্য রিপোর্টে গত পনের বৎসরে ভারতের পরিকল্পনা রূপায়ণের গতি ও প্রকৃতির কঠিন বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। এই রিপোর্টে কৃষি উন্নয়ন-বিষয়ক প্রয়োগাদির সাফল্যহীনতার উপরে বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার অবশ্য বলেছেন এই সমালোচনা ভুল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, তৃতীয় পরিকল্পনার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে কৃষি ও কৃষি-উন্নয়নবিষয়ক যে সকল প্রয়োগে বিরাট লগ্নী করা হয়েছে তার ফলে খাদ্যশস্যে সার্থক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ত সাধিত হয়ই নাই, বরং এরূপ আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আগামী দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের মধ্যেও এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা আদৌ সাধন করা সম্ভব হবে কি না, তাও সন্দেহের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের বিশদতর আলোচনা প্রয়োজন—যথা. খাদ্যশস্যের উৎপাদনে বর্তমান ঘাটতি কতটা পরিমাণে বাস্তব ভোগচাহিদার পরিমাণে সত্যকার ঘাটতি, অথবা কতটা পরিমাণে এই ঘাটতি মুনাফাবাজের কারসাজির দ্বারা সৃষ্ট। ১৯৬৪-৬৫ সালে আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে, অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে দেশের খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি টন; ১৯৬০-৬১ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি টন। অর্থাৎ ১৯৫০-৫১

সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৬০% এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে ৭৬%। এই পরিমাণ খাদ্যশস্য দেশের লোকের বাস্তব ভোগচাহিদা কতটা পরিমাণে পূরণ করতে অসমর্থ, সেটাই হওয়া উচিত বর্তমান খাদ্যোৎপাদনের ঘাটতির বাস্তব হিসাব। দেশের বর্তমান জনসংখ্যার হিসাব (১৯৬১ সাল থেকে বার্ষিক ২·৪% বৃদ্ধি ধরে নিয়ে) অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য দৈনিক ১৬ আউন্স এবং জন্ম থেকে ৮ বৎসর বয়স্কদের এবং ৬৫ বৎসর এবং ঊর্দ্ধ বয়স্কদের জন্য অর্দ্ধেক পরিমাণ, অর্থাৎ ৮ আউন্স বরাদ্দ ধরে নিয়ে (সরকারী র‍্যাশন যে সকল এলাকায় চালু করা হয়েছে, সেখানে এর চেয়ে অনেক কম পরিমাণ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে) ভোগচাহিদার হিসাব করলে দেখা যাবে যে সমগ্র দেশকে খাওয়াতে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যে সঙ্কুলান হওয়ার কথা। তার সঙ্গে অনিবার্য্য অপচয় ও বীজশস্যের জন্য ভোগচাহিদার ১০% আরও যোগ করলে দেশের বর্তমান বাস্তব খাদ্যশস্যের চাহিদার মোট পরিমাণ হওয়া উচিত মোটামুটি ৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টন। অথচ ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন উৎপাদন করে এবং তার সঙ্গে আরও ৬৫ লক্ষ টন বিদেশ থেকে আমদানী শস্য যোগ করেও (মোট সরবরাহ ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ টন!) দেশে অভূতপূর্ব খাদ্য-সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে।

এটা কেন ঘটছে, একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এর আসল গোড়া হ'ল দুইটি; প্রথমতঃ খাদ্যশস্য চলাচলে বর্তমান আঞ্চলিক ব্যবস্থা (zonal system), এবং দ্বিতীয়তঃ দেশের বৃহত্তম এলাকাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ নিরপেক্ষ বাজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় বণ্টন-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এর ফলে একটা সামগ্রিক খাদ্যনীতি গড়ে উঠবার অবকাশ পায় নি। অথচ বর্তমান ব্যবস্থা নানা কারণে—প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে—বাতিল করবার সৎসাহস সরকারের হয় নি। সব দিক দিয়ে বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে সুষ্ঠু, সক্ষম এবং সাধারণের কল্যাণসাধক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালনা করবার মতন দক্ষ ও সৎ প্রশাসনিক আয়োজন বর্তমানে সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্তাতীত। বর্তমান ব্যবস্থার সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার কোন আশা নেই, কেবলমাত্র মুনাফাবাজ এর থেকে প্রভূত সুবিধা লুটে নিচ্ছে। একমাত্র সার্থক বিকল্প ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় যা হতে পারে, তা হচ্ছে খাদ্যশস্যের উপরে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ—আঞ্চলিক, সংগ্রাহক, বণ্টন, সব কিছু সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়া। তা হলেই চাহিদা ও সরবরাহে একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ফিরে আনবার আশা আছে। এভাবেই অতীতে পরলোকগত রফি আহমেদ কিদোয়াই একদা দেশকে দারুণ খাদ্য ও খাদ্য মূল্য সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

বস্তুতঃ খাদ্য সঙ্কটের অবসান—উৎপাদন যতই বাড়ান যাক না কেন—করতে হলে হয় দেশের সমগ্র খাদ্যশস্যের সরবরাহের উপরে সম্পূর্ণ সরকারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সকল স্তরে নিয়ন্ত্রিত বণ্টনের আয়োজন এবং এর সৎ ও সর্বাত্মক প্রয়োগ ব্যবস্থা করা। আংশিক ভাবে সরবরাহের উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বারা এবং নির্দিষ্ট এবং নির্বাচিত শহরাঞ্চলে সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থার প্রয়োগ করার কেবল মাত্র সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়, সমাধান হয় না। আমরা দেখিয়েছি যে বিদেশের আমদানী খাদ্যশস্য বাদ দিলেও, দেশে যা উৎপাদন হয়, তার দ্বারাই দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের দৈনিক ১৬ আউন্স বরাদ্দ সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব নয়। অথচ আংশিক ভাবে সরবরাহের এবং ভোগ-বণ্টনের ব্যবস্থা করে সরকার এখন প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক ৭ আউন্স বরাদ্দও সব সময় সরবরাহ করতে সমর্থ হচ্ছেন না। অন্য পক্ষে খাদ্যশস্যের মূল্য ক্রমগতিতে এমন একটা উচ্চতায় পৌঁছেছে যে এর একটা ব্যবস্থা অচিরে করতে না পারলে খাদ্য সরবরাহের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ আসন্ন হয়ে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্পোৎপাদনে ক্রততর গতি-সঞ্চারও একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে যে বৃহৎ পুঁজি নবীন বারা নূতন শিল্প সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, নানাবিধ কারণে সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতার (Capacity) সম্পূর্ণ ব্যবহার এখনো সম্ভব হয় নি। অন্য পক্ষে অনেকগুলি বৃহৎ শিল্প সংস্থায়—বিশেষ করে যে গুলি সরকারী মালিকানার অধীন—দেখা যাচ্ছে যে, তাদের কাঠামোগুলি পুঁজিবহুল (Capital intensive) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, তাদের উৎপাদন পরিচালনার (operational) জন্য শ্রমিক নিয়োগ কাঠামোটি (employment structure) মোটামুটি শ্রম-বহুল (labour intensive) ভিত্তির অনুকূলে গড়ে উঠেছে। এটা খানিকটা অনিবার্য্য ছিল। কারণ আমাদের যে সকল রাষ্ট্রনেতারা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক, শিল্পনৈতিক এবং আরো আনুষঙ্গিক উপদেষ্টাগোষ্ঠী দেশের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেছেন এবং এখনো করছেন, তাঁরা মোটামুটি উন্নত দেশগুলির শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের কাঠামোর দিকে নজর রেখে তাঁদের রচনা প্রস্তুত করেছেন। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনার মোটামুটি কাঠামোটি আমাদের দেশের মূল অবস্থা, আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি উপেক্ষা করে প্রস্তুত হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের দেশের মূল আর্থিক সমস্যাগুলির একটা স্পষ্ট বিচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ কৃষির উপরে দেশের মোটামুটি ৮০% জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাদের জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োগের ফলে মোটামুটি প্রায় ৩% জনসংখ্যা ক্রমে এখন শিল্পোপজীবী হয়েছেন; দেশের মোট জাতীয় আয়ের ৫৫% এবং অধিক কৃষি উৎপাদন থেকে এখনো আহরণ করা হয়। ফলে কৃষিজীবীদের মাথাপিছু উৎপাদক শক্তি (per capital productivity) এতো কম যে আর্থিক বিচারে কৃষি অলাভজনক (uneconomic) বৃত্তি বলে পরিগণিত হবে। দ্বিতীয়তঃ শিল্পে উৎপাদন এত কম যে এতে বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার মাত্র ১৩% লোকের জীবিকার ব্যবস্থা হয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুঁজি লগ্নীর অনুপাতে উৎপাদকশক্তি (productivity per unit of investment) অত্যন্ত কম। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, দেশে মাথা-পিছু আয়ের পরিমাণ এত কম যে, তার সবটাই প্রায় ভোগব্যয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, সঞ্চয় ও পুঁজি সৃষ্টির অবকাশ হয় না।

আমাদের মূল সমস্যা তাই,—প্রথম কৃষি থেকে জনসংখ্যার একটা অংশকে প্রতি বৎসর শিল্পজীবিকার দিকে চালান করবার ব্যবস্থা করা; দ্বিতীয়তঃ আমাদের স্বল্প পুঁজির সংস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বল্পতম পুঁজি লগ্নীর দ্বারা বৃহত্তম সংখ্যার লোকের জীবিকার ব্যবস্থা করা। এইগুলিই হওয়া উচিত আমাদের মূল উৎপাদক শক্তির (basic productivity) মাপকাঠি। ১৯৬৬ সালে এদিকে একটু গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হ'লে সম্ভবতঃ হালের অতীতের ভুলগুলি এবং উদ্ভূত জটিল সমস্যাসমূহের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আন্তঃ রাজ্য স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ছাত্রীদের উচ্চ লম্ফনে প্রথম স্থান অধিকারিণী বন্দিতা পাল উক্ত বিভাগে নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

খেলাধূলার আসরে

পি মিত্র

ব্রিটিশ সিংহ এবার অস্ট্রেলীয় ক্যাঙ্গারুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে ঝোলায় চেপে ক্যাঙ্গারুর দেশে উপস্থিত। গোড়া থেকেই পশুরাজ বিস্তর হাঁক-ডাক ছেড়েছেন, কখনও বা ভেঙেও গেছেন কিন্তু শান্ত স্বভাবের ক্যাঙ্গারুও যে হঠাৎ এমন রুখে দাঁড়াবে তা বোধ হয় পশুরাজ ভাবেন নি। কয়েক বছর আগেও পশুরাজ স্বাভাবিক গর্জন ও ক্ষিপ্রতা নিয়ে ভারতের হাতীর সঙ্গে মোকাবিলা করে গেছে কিন্তু হাতীর ডাকা থেকেই দেখা গেল যে সিংহ নয়, সিংহ-চর্মাবৃত শৃগাল। সম্প্রতি ব্রিটিশ সিংহ অবশ্য নিউজিল্যাণ্ডের কিউইকে পরাজিত করেছে কিন্তু এবার ক্যাঙ্গারুর ল্যাজের ঝাপটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। শেষ পর্য্যন্ত কে জয়লাভ করে দেখা যাক।

ক্রিকেটের জনক ইংলণ্ড (পশুরাজ) তাদের প্রবলতম ও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার (ক্যাঙ্গারু) সঙ্গে ঐতিহাসিক 'এ্যাসেজের' দখলদারী নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এই বাৎসরিক লড়াই ক্রিকেট-রসিকদের ভেতর যত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তত আর কোন দেশের খেলায় করে না। পূর্ববর্তী টেষ্ট পর্য্যায়ের ফল অনুযায়ী 'এ্যাসেজ' অস্ট্রেলিয়ার অধীনেই ছিল, ইংলণ্ড গত কয়েকবার ধরেই তা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সযত্নে তা নিজ দখলে রেখেছে, দু'দলের শক্তির তুলনামূলক বিচারে উভয়ের পাল্লা তেই সমান ভার।

ব্যাটিংএ দু'দলেই কৌশলী ও অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান আছেন। ইংলণ্ড দলে কাউড্রে, ব্যারিংটন, পারফিট অধিনায়ক মাইক স্মিথ, এডরিচ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয়রা আছেন। অস্ট্রেলিয়া দলে রয়েছেন বিল লরি, অধিনায়ক সিম্পসন, বব কাউপার ও তরুণ খেলোয়াড় ডাগ ওয়াল্টার্স। এখন

অস্ট্রেলিয়ার টম ভিভার্সের বলে ইংলণ্ড দলের রক ইক দিপের আউট হবার দৃশ্য।

ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ববি সিম্পসন জোরাল কাট মারছেন।

দিকটায় খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা একমাত্র ওয়াল্টার্স ছাড়া অন্য কেউ তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। বিল লরির উপর্যুপরি ব্যর্থতার জন্য অষ্ট্রেলিয়াকে বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। সিম্পসন অসুস্থতার জন্যে প্রথম ও তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে খেলতে পারেন নি। তাঁর স্থানে ব্রায়ান বুথের ওপর অধিনায়কত্বের ভার পড়ে। অধিনায়ক হিসাবে এবং খেলাতেও তিনি বিশেষ সুবিধে করতে না পারায় তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার বর্তমানে সাংবাদিকের কার্য্যে লিপ্ত খেলোয়াড় কিথ মিলার বিল লরিকে দল থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ টেষ্টে বিল লরি তাঁর পুরনো খেলার পরিচয় দেখাতে দলে রয়ে গেলেন। ববি সিম্পসন ফিরে এসেই তাঁর সহজাত ক্রিকেট প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন।

প্রথম দু'টি টেষ্ট ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। তৃতীয় টেষ্টে ইংলণ্ড শোচনীয় ভাবে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে চলতি টেষ্ট পর্য্যায়ে ১-০ খেলায় এগিয়ে গেলেন। এ ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ানরা কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতারই অবকাশ পায় নি। ইংলণ্ড-এর সবদিকেই প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে। বোলিং-এ দু'দলের ক্ষমতাই সীমিত। কোন দলেই তেমন দীর্ঘস্থায়ী অথবা বিপর্য্যয়ের বোলার নেই। তবু তৃতীয় টেষ্টে ইংলণ্ডের বোলাররা কৃতিত্ব দেখায় এবং ফিল্ডাররাও ক্যাচ ধরে সতীর্থদের সাহায্য করায়, ই দল জয়লাভ করে ১-০ খেলায় এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে অষ্ট্রেলিয়ার ফিল্ডারদের ব্যর্থতা বিশেষ করে চোখে পড়ে। যদিও হক এই খেলায় বলেও ভাল করেন। তিনি ৭টি উইকেট লাভ করেন। ব্যাটিং-এর দিক থেকে এই খেলায় ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা নির্ভয়ে এবং ভীষণ ভাবে অষ্ট্রেলিয়ান বোলারদের বল মারতে থাকেন। বব বারবার এই খেলায় ১৮৫ রান করে নিজ দলকে জয়লাভে সাহায্য করেন। এডরিচও ১০৩ রান করেন। ইংলণ্ড দল এক ইনিংসে ও ৯৩ রানে জয়লাভ করে। চতুর্থ টেষ্টে উভয় দলই সাধ্যমত পূর্ণ শক্তি নিয়ে মাঠে নামে। ইংলণ্ড গোড়া থেকেই আক্রমণাত্মক খেলার কথা বলে এসেছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ার বোলার হক ও ম্যাকেঞ্জীর বলের সম্মুখে তারা কোন সময়েই দাঁড়াতে পারেনি। অপর দিকে অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানরা অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেন। এই খেলায় সিম্পসনের

জবর · সেঞ্চুরী মনে রাখার মতন। বিল লরির অবদানও কম নয়, তিনি ১১৯ রান করেন।

খেলার আসল কথা হ'ল সঙ্কটের সময় প্রয়োজনীয় ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করতে পারলে জয়লাভ করা অসাধ্য নয়। তৃতীয় টেষ্টে ইংলণ্ড এবং চতুর্থ টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ভাল খেলা খেলে জিতে যায়। সেই হেতু স্বাভাবিক ভাবেই পঞ্চম টেষ্টের আকর্ষণ অনেক বৃদ্ধি

রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে আন্তঃ রেলওয়ে হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নর্দান রেলওয়ের অধিনায়ক হরবিন্দার সিং মিসেস রূপাল সিং-এর কাছ থেকে বিজয়ীর পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

পেয়েছে। যদি ইংলণ্ড জয়লাভ করে তা হ'লে 'এ্যাসেজ' আবার তাদের ঘরে উঠবে আর যদি অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে অথবা খেলা যদি অমীমাংসিত ভাবেও শেষ হয় তা হ'লেও 'অ্যাসেজ' অষ্ট্রেলিয়ার দখলেই থাকবে। মেলবোর্ণে পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচের শুরুতে উভয় দলই সমান উৎসাহে মাঠে নামল। ইংলণ্ড প্রথমে ব্যাট ক'রে ৪৮৫ রাণ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রত্যুত্তরে অষ্ট্রেলিয়াও ৮ উইকেটে ৫৪৩ রাণ করে মুখের মতন জবাব দেয়। পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ ইংলণ্ডের কেন ব্যারিংটন ও অষ্ট্রেলিয়ার বব কাউপারের পক্ষে স্মরণীয়। ব্যারিংটন জীবনে অনেক সেঞ্চুরী করেছেন, কিন্তু মেলবোর্ণের সেঞ্চুরী তার জীবনের শ্রেষ্ঠ। যে অপূর্ব ক্রীড়াকৌশলের স্বাক্ষর তিনি রাখলেন তা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বব কাউপার ৩০৭ রাণ করে মেলবোর্ণ মাঠে উচ্চাঙ্গের ব্যাটিং-এর এক নজির রাখলেন। পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ায় 'অ্যাসেজ' অষ্ট্রেলিয়ার দখলেই রয়ে গেল।

দল হিসেবে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ, তারপর অষ্ট্রেলিয়া। ইংলণ্ড এখন দল হিসাবে তৃতীয় চতুর্থ

স্থানে অবস্থান করছে। বেডসার, টু্ৰুম্যান, ট্যাথাম, টাইসনের মতন বোলার ইংলণ্ড দলে এখন আর একটিও নেই, আছে সব তৃতীয় স্তরের বোলার। স্পিনে লেকার ও লকের পর নাম করার মতন বোলার এক টিটমাস ছাড়া চোখে পড়ে না। সামগ্রিক ভাবে ক্রিকেটের মানও অনেক কমে গেছে। অষ্ট্রেলিয়া দলেও লিণ্ডওয়াল, মিলার, ডেভিডসনের পর তেমন বোলার আর আত্মপ্রকাশ করে নি। তবে তারই মধ্যে হক ও ম্যাকেঞ্জী কিছুটা আশার সঞ্চার করেছেন। রিচি বেনোডের বদলে নাম করা যায় এমন খেলোয়াড়ও অষ্ট্রেলিয়ায় নেই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেগ স্পিনারদের ভেতর রিচি বেনোড একজন। বর্তমানে একমাত্র ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ব্যতীত পৃথিবীর সব ক্রিকেট দলগুলির একই অবস্থা। ব্যক্তিগত প্রতিভার বিকাশ নেই বললেই হয়।

* * *

কলকাতায় এখন হকি মরশুম সুরু হয়ে গেছে। লেকের ধারে রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে নিখিল ভারত আন্তঃরেলওয়ে হকি প্রতিযোগিতার সবেমাত্র সমাপ্তি ঘটেছে। হকি ভারতের জাতীয় খেলা। অলিম্পিকের একমাত্র স্বর্ণ পদক আহরণকারী এই খেলাটি কিন্তু স্বদেশে যে যথেষ্ট জনপ্রিয় নয়, তা রবীন্দ্র সরোবরের খেলায় দর্শকদের উপস্থিতির সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়। যদিও এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দলে ভারতীয় অলিম্পিক দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন, তথাপি সেমি ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল ব্যতীত কোন খেলাতেই সন্তোষজনক দর্শক উপস্থিত হয় নি। এবারের প্রতিযোগিতাতেও গত ২ বছরের বিজয়ী নর্দার্ন রেল দল ফাইন্যালে গোরাখপুরের ইণ্টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরীকে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের গৌরব অর্জন করে। নর্দার্ন রেল দল বিজয়ী হলেও প্রথম থেকেই তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। উল্লেখযোগ্য যে বিশেষ করে সেমি ফাইন্যাল পর্যায়ে নর্দার্ন রেল ও সাউথ ইষ্টার্ণ রেল এবং ইণ্টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরী এবং ইষ্টার্ণ রেলের খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ায় টসের সাহায্যে জয়-পরাজয় মীমাংসা করতে হয়। নর্দার্ন রেল ও সাউথ ইষ্টার্ণ রেলের সেমি ফাইন্যাল খেলা তিন দিনে সর্বসমেত প্রায় ২২০ মিনিট খেলার পরও কোন জয়পরাজয় মীমাংসা হয় না। সাউথ ইষ্টার্ণ রেল দল যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু নর্দার্ন রেল দল আরও শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই তবুও তিন দিন খেলার পরও কোন জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হ'ল না। তার অন্যতম কারণ উভয় দলেই খ্যাতনামা খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও কোন দল প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। গোল-মুখে ব্যর্থতার জন্যেই গোল লাভে বঞ্চিত হয়। তিন দিন খেলা হয়, তার মধ্যে একমাত্র প্রথম দিনে উভয় দল একটা করে গোল করে। বাকি দু' দিন খেলা গোলশূন্য অবস্থাতেই শেষ হয়। গোরাখপুরের ইণ্টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরীর ও ইষ্টার্ণ রেলের খেলাতেও একই অবস্থা। এখানে জয়-পরাজয় খেলার ক্রীড়া-কৌশলের ওপর হয় নি, হয়েছে সৌভাগ্যের ওপর। টসে খেলার জয় পরাজয় মীমাংসা হয়।

কলকাতায় হকি মরশুমও সুরু হয়ে গেছে। শীর্ষস্থানীয় দলগুলো প্রত্যেকেই সাধ্যমতন খেলোয়াড় আমদানী করেছে। তবে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যেন একটু মরীয়া হয়েই উঠে-পড়ে লেগেছে। এবার তাদের দলে বিভিন্ন প্রদেশের অন্ততঃ ছয়জন খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা যাবে। ইদানিং কালে স্থানীয় দলগুলোর বাইরের খেলোয়াড় আমদানীর একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, অন্য ক্লাবকে টেক্কা মেরে ট্রফি জয়লাভ করা, তাতে স্থানীয় খেলোয়াড় তৈরী হোক বা না হোক, নিজ প্রদেশের বদনাম হোক বা সুনাম হোক তাতে কিছু এসে যায় না যেন তেন প্রকারেণ ট্রফি চাই-ই। মাত্র দু' বছর আগে এখানে বাইটন কাপের ফাইন্যাল খেলা ও লীগের একটা আকর্ষণীয় খেলাকে কেন্দ্র করে যে অঘটন ঘটে গেছে তা বিস্মৃত হবার নয়। যার ফলে বেশ কয়েকজন সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড় ২৩ বছরের জন্য সাসপেণ্ড হয়েছেন। এরই ফলে বাংলা হকি এসোসিয়েশন ও নিখিল ভারত হকি এসোসিয়েশনের ভেতর বেশ মনকষাকষিও হয়েছে। দেখা গেছে যে যারা এই অঘটনের মূল, তাদের সকলেই প্রায় অন্য প্রদেশের খেলোয়াড় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বদনাম হয় কলকাতার মাঠের এবং বাংলা হকি এসোসিয়েশনের, তবুও স্থানীয় কর্ম্মকর্তাদের চৈতন্য হ'ল না। আবারও স্থানীয় দলগুলি ভর্তি করা হল। আবারও যাতে কোন অঘটন না ঘটে তার জন্যে প্রথম থেকেই কর্মকর্তাদের সচেতন থাকতে হবে. কারণ যদি কোন বদনাম হয় তাহলে স্থানীয় কর্মকর্তাদেরই হবে। তাঁরাই অযোগ্য বলে পরিগণিত হবেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পরমহংস রামকৃষ্ণ
শিল্পী : ফ্রান্‌জ ডোরাক

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৭২

ষষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সমাজতন্ত্র বা সমষ্টিবাদ

পৃথিবীতে মানব সভ্যতা কতদিন পূর্ব্বে সঙ্ঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার কোন স্পষ্ট ও নির্ভরশীল বিবৃতি পাওয়া যায় না। পুরাণে ও উপাখ্যানে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ৫০০০—১০০০ বৎসর পূর্ব্বেও মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিরাট বিরাট শহর, দুর্গ, মন্দির, বাজার, রাজপথ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া সভ্য ও সংহতভাবে বসবাস করিত। মহাভারতের কাহিনী অথবা হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ড পাঠ করিলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে মানুষের মিলিতভাবে ও জাতি হিসাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রাজকার্য্য চালাইবারও ব্যবস্থা করিবার অভ্যাস ছিল। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার চর্চ্চা করিলেও দেখা যায় যে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরে স্থাপত্য যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহাতে অসংখ্য লোকের সমবেতভাবে কার্য্য করিবার ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুরের বর্ণনা কিংবা মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পার ধ্বংসাবশেষ হইতে বুঝা যায় যে, সমষ্টিগতভাবে বসবাস করা মানব সমাজে অতি প্রাচীনকালেও সুপ্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদ বা তৎপরবর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে মানুষকে প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও নিজ আত্মাকে অনন্ত উন্নতির পথে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য যে সকল নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে দরিদ্র ও দীনজনকে রক্ষা করা, ধনীর নিকট হইতে মাত্র রাজকর গ্রহণ করা এবং নিজ আত্মাতে সর্ব্বজীবকে প্রত্যক্ষ করা ইত্যাদি উচ্চ আদর্শের কথা পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগে মানুষকে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপর নির্ভর করাই শিক্ষা দেওয়া হইত। অর্থাৎ জনহিত ও সাধারণের মঙ্গল চিন্তা একটা নূতন কথা নহে এবং তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া সকলের পক্ষেই সহজ। যাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যেই সকল জ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ দেখিতে চাহেন তাঁহাদিগকেও বলা যাইতে পারে যে, সমষ্টিবাদ, সমাজতন্ত্র বা ব্যক্তিস্বার্থবর্জ্জন পাশ্চাত্য সভ্যতার খ্রীষ্টপূর্ব্ব গ্রীসের দার্শনিকদিগের শিক্ষাতে বিশেষ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে সমাজকে তিন জাতীয় ব্যক্তিসঙ্ঘে ভাগ করা হইয়াছিল। 'অভিভাবক' যাহারা তাঁহারা ছিলেন জ্ঞানী, গুণী, স্বার্থত্যাগী ও আত্মসংযমশীল। তাঁহারাই শাসনের দায়িত্ব বহন করিবেন। দ্বিতীয় ভাগে ছিলেন সৈন্যবাহিনীর যোদ্ধাগণ। তৃতীয় ভাগে চাষীরা। প্লেটোর এই সমাজতন্ত্র কথা সুচিন্তিত আদর্শের কাল্পনিক চিত্র। পরে আরও অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাঁহার এই রাষ্ট্রনৈতিক উদ্ভাবনার অনুকরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে টমাস মোর (ইউটোপিয়া ১৫১৬ খ্রীঃ অঃ), হবস্, লক ও রুসোর নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজতন্ত্র ও সমষ্টিবাদের সমর্থনকারী দার্শনিকদিগের মধ্যে স্যঁা সিমঁ, ফুরিয়ে, বাঁবোফ, টমাস পেন, ব্লাঁকি, প্রুধোঁ, লাসাল, কিৎ্তে, করেরবাখ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। যাঁহারা এই সকল পণ্ডিতদিগকে অবাস্তব আদর্শ অনুসরণকারী ও নিজেদের বৈজ্ঞানিক সমষ্টিবাদী বলিয়া প্রচার করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে কার্ল মার্কস্, এঙ্গেলস প্রভৃতি পরবর্তীকালের কম্যুনিষ্টদিগের নাম করা উচিত। ইঁহারা কোন নিছক মানসিক আদর্শ চিন্তা করার বিপক্ষে ছিলেন। ইঁহাদিগের মতে মানব ইতিহাস হইতেই সাক্ষাৎভাবে সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার নিজে নিজে তৈয়ার হইয়া যায়, এবং সেই ইতিহাসের ধারাকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। স্যঁা সিমঁ ভাবিতেন মানব সমাজের শ্রেণী বিভাগ ও সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের ও পারস্পরিক কলহের পরিণামে সমষ্টিবাদের জয় হইবে স্থির করিয়া লইবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। তাঁহার মতে গুণী ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া, কার্য্য বিচার করিয়া তাহার যথাযথ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া চলিলে তবেই সর্ব্বদীন সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ফুরিয়ের মতে শ্রমশক্তি, মূলধন ও কার্য্যব্যবস্থার বুদ্ধি, এই তিনের মধ্যে উৎপন্ন ঐশ্বর্য্য বণ্টন করা প্রয়োজন। বার ভাগের পাঁচ ভাগ প্রাপ্য শ্রমিকের, ৪ ভাগ মূলধনদাতার ও ৩ ভাগ ব্যবস্থাবুদ্ধির জন্য। কোন কোন সমাজতন্ত্রবাদী আবার শাসন-কার্য্য অপ্রয়োজনীয় মনে করিতেন। প্রুধোঁ, বাকুনিন ও ক্রপটকিনের এই বিষয়ে খ্যাতি হইয়াছিল। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতামত বিজ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয় অকাট্যতার ভাষায় প্রচার করা হইয়াছিল। সেই সকল অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পরে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীভাবে ঘটে নাই; কিন্তু তাহা হইলেও মার্কস-এর ভক্তমহলে তাঁহার মতামত অভ্রান্ত বিজ্ঞান বলিয়াই গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

সমাজতন্ত্র ও সমষ্টিবাদ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে শুধু এই কারণে যে, রাষ্ট্রগঠন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রায় দুই-তিন হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলগণ নিজ নিজ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। এই সকল প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের সহিত তুলনায় ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদিগের স্থান কোথায় হইতে পারে তাহার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভারতের বহু তথাকথিত জননেতা প্রায়ই সমষ্টিবাদ আওড়াইয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকেন। কর্ম্মক্ষেত্রে এই সকল লোকের কোন মূল্যই ধরা যায় না। শুনা যায়, ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় দলের সভ্যসংখ্যা প্রায় ১ কোটি সত্তর লক্ষ। ইঁহারা যদি প্রত্যেকে দশ মণ করিয়া ধান অথবা ৫ মণ করিয়া গম চাষ করিয়া দিতেন তাহা হইলে ভারতের খাদ্যের অকুলান শীঘ্রই দূর হইয়া যাইত। কিন্তু ইঁহারা শুধু বড় বড় কথা বলিয়া এত ক্লান্ত হইয়া পড়েন যে, আর কিছু করিবার ক্ষমতা পরে আর ইঁহাদের থাকে না। ইঁহাদিগের কথা শুনিলে মনে হয় যে ইঁহারা একটা নূতন কোন পথে আদর্শ সমাজতন্ত্র গঠন করিতেছেন। বস্তুত ইঁহারা রাষ্ট্রগঠন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, সে যে প্রকার রাষ্ট্রই হউক। সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্র যে সকল দেশে আইনত চালান হইয়াছে সেই সকল দেশ অপেক্ষা অন্য অনেক দেশের সাধারণ লোকের সমাজতান্ত্রিক আদর্শজাত সুখ-সুবিধা অনেক অধিক লক্ষিত হয়। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে সমাজ বলিয়া সকল ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত কোন কিছু একটা অতিকায় তোতা জীব কোথাও নাই। সকল ব্যক্তির সমবেত মঙ্গল ও উন্নতির উপরেই সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এই কথাটা যাঁহারা সর্ব্বদা মনে রাখেন না এবং সমাজ সমাজ বলিয়া বড় বড় কথা বলিয়া সকল ব্যক্তির সুখ-সুবিধা খর্ব্ব করিয়া কোন অজানা ও কাল্পনিক সমাজ দেবতার পূজারীদিগের খেয়ালের তৃপ্তির জন্য সমাজের সর্ব্বমানবের ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করেন; সেই সকল রাষ্ট্র-সেবকদিগের কার্য্য বিচার করিয়া জনকল্যাণকর যাহা পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অন্যত্র, অর্থাৎ যেখানে অতটা বড় কথা শুনা যায় না সেখানে, অনেক অধিক সমাজ উন্নতির ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্য আমাদের মনে হয় যাহারা বেশী বেশী 'সোসালিজম' আওড়াইয়া থাকেন সেই সকল লোককে আমাদের সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। কারণ যে দেশে বাধ্যতামূলকভাবে সকল বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, অসহায় বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, রুগ্ন, অনাথ, বেকার,

অসমর্থ প্রভৃতি সমাজবাসীর যেখানে কোন আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা নাই, সেই দেশের নেতাদিগের সমাজতন্ত্রের নাম উচ্চারণ করিবারও অধিকার থাকা উচিত নহে। প্রথমে কার্য্যে দেখান প্রয়োজন যে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের ব্যবস্থা অন্তত মোটামুটি করা হইয়াছে, তৎপরে সমাজ বা সমষ্টিবাদের কথা। বিভিন্ন উপায়ে সমাজের লোকের সকল অধিকার ও সম্পত্তি ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া ফেলিলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। কারণ, আইনত তাহা করা হইলেও তাহাতে সমাজের জনসাধারণের কোন সুবিধা হয় না, এবং সেইজন্য সমাজতন্ত্র নামটা সেখানে যথার্থ ও সত্য হয় না। দুর্নীতি ও অপব্যয় যেখানে প্রবল ও প্রকটভাবে অধিষ্ঠিত সেখানে নেতাদিগের হস্তে যত কম ক্ষমতা, অধিকার ও অর্থ থাকে, দেশবাসীর ততই মঙ্গল। সমষ্টিবাদ আইনত প্রতিষ্ঠিত না করিয়াও সমাজসেবা কতদূর অগ্রসর হইতে পারে তাহার কিছু কিছু উদাহরণ দিবার চেষ্টা করিতেছি।

ইয়োরোপের বহু পুরাতন একটা সাধারণতন্ত্রবাদী দেশ সুইজারল্যাণ্ডে দেখা যায় যে, সেই দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিলিতভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করেন ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে। সুইজারল্যাণ্ডে বর্ত্তমানে ৬০ লক্ষ লোকের বাস। তাঁহারা চার ভাষাভাষী। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সুইস জাতির আটটি অঞ্চল একত্র মিলিত হয়। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৩টি অঞ্চল এবং ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৯টি। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, পোর্ত্তুগাল, প্রুশিয়া, রুশিয়া, স্পেন ও সুইডেন সুইজারল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা চিরকালের জন্য মানিয়া লইলেন। এই বহু পুরাতন রিপাবলিকে সকল দেশবাসীর চিকিৎসার, শিক্ষার, দুর্ঘটনাজনিত লোকসানের জন্য বেকার হইয়া যাইলে, বয়স অধিক হইলে, বিধবা বা বিপত্নীক হইলে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। এই প্রকার সাহায্য লাভ করেন প্রায় ৫ লক্ষ লোকে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় এক লক্ষ লোকের। এই সকল সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য সুইসরাষ্ট্র কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদিগের সাহায্যে বীমা করিয়া ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করেন।

সুইডেনের রাষ্ট্র রাজতন্ত্রের উপর গঠিত। কিন্তু ঐ দেশে সকল দেশবাসীর জন্যে চিকিৎসার, শিক্ষার, বেকার অবস্থায় সাহায্যের, বার্দ্ধক্যে মাসহারার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচের ও বিধবা-বিপত্নীক-অনাথদিগের ভরণপোষণের ব্যবস্থা আছে। আয়ারল্যাণ্ডের মোট রাজস্ব ২১৫০০০০০০ পাউণ্ড। এই রাজস্ব হইতে সে দেশে শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় ২৪০০০০০০ পাউণ্ড, সামাজিক অবস্থা সকলের পক্ষে অভাবহীন করিবার জন্য ব্যয় হয় ৩৪০০০০০০ পাউণ্ড এবং চিকিৎসার জন্য খরচ হয় ১৩০০০০০০ পাউণ্ড। মোট রাজস্বের শতকরা ৩৩ ভাগ এই সকল ব্যয়ে নিযুক্ত হয়। ডেনমার্কের বার্ষিক জাতীয় আয়ের শতকরা ১৩ ভাগ সামাজিক সুখ-সুবিধা উন্নত রাখিবার জন্য ব্যয় করা হয়। নিউজিল্যাণ্ডের জাতীয় আয় ১৬০০০০০০০০ পাউণ্ড। রাজস্ব ৪০০০০০০০০ পাউণ্ড। সামাজিক সুখ-সুবিধা বজায় রাখিতে ব্যয় হয় ১০২০০০০০০ পাউণ্ড, পেন্সনে ১৩০০০০০০ পাউণ্ড, চিকিৎসার জন্য ২৪০০০০০০ পাউণ্ড।

অপরদিকে দেখা যায় চীনের জনসংখ্যা ৭৫ কোটি। হাসপাতালে লোক থাকিতে পারে ফ্রান্সের হাসপাতালের সমান সংখ্যক। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা ৪·৭ কোটি। চীন দেশে দশ কোটি ছাত্র-ছাত্রী ডেন্মার্কে দশ লক্ষ। ডেনমার্কের লোকসংখ্যা মাত্র ৪৫ লক্ষ। অর্থাৎ চীনে ছাত্র সাড়ে ৭ জনের মধ্যে একজন ও ডেন্মার্কে সাড়ে ৪ জনের মধ্যে একজন। ভারতের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯ জনের মধ্যে একজন। মহারাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য খরচ হয় ১২·২৯ কোটি টাকা, লোকসংখ্যা ৪ কোটি। উত্তর প্রদেশের লোকসংখ্যা ৭·৪ কোটি, চিকিৎসার ব্যয় ১০·৮৭ কোটি টাকা মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ৩·৫ কোটি, চিকিৎসার জন্য ব্যয় ১২·৪৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ সমাজের সকল লোকের কল্যাণের জন্য এক-একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রখণ্ড এক এক ভাবে ব্যবস্থা করে। ইহার সহিত এই সকল রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রখণ্ডের নেতাদিগের বক্তৃতার ও প্রচারিত রাষ্ট্রীয় আদর্শের কোন বাস্তব বা পরিমাপযোগ্য সম্বন্ধ নাই। সাধারণ মানব সর্ব্বদাই ওজন করিয়া প্রাপ্য কি ও তাহা পাওয়া যাইতেছে কি না দেখিতে চায়। এই প্রকারে যাচাইয়া দেখিলে ভারতীয় সমষ্টিবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রায় নিরাকার ও নিরবয়ব।

শাসন পদ্ধতি সংস্কার

ভারতের শাসন পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন বোধ করিয়া ভারত সরকার একটি কমিশন বসাইয়াছেন। এই কমিশনের সভাপতি শ্রীমোরারজি দেশাই। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হইবার পরেই ঐ পদের মর্য্যাদার কোন ধাপে প্রতিষ্ঠা তাহা লইয়া তাও করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যাহাই করুন না কেন সেই কার্য্যের তুলনামূলক মর্য্যাদা অল্প হইলে চলিবে না, এ কথা তিনি ভাল করিয়া সকল মন্ত্রীদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই পদমর্য্যাদার ওজন ঠিক করার ব্যবস্থা দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন যে শ্রীমোরারজির কোন কর্ম্ম বা কর্ম্মপদ্ধতির সংস্কার বিষয়ে কর্ম্মক্ষমতা কতটা। কংগ্রেসের কর্ম্মীদিগের মধ্যে ক্ষমতাশালী লোকের একান্ত অভাব। শাসন পদ্ধতির সংস্কার করিতে হইলে কংগ্রেসের কোন লোকের দ্বারা সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার আশা অত্যন্তই সুদূরপরাহত। আজকাল বহু বড় বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা কার্য্য পরিচালনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে ও যাহাদিগের সাহায্যে অনেক বিরাট বিরাট ব্যবসায়ী কারবার নিজ নিজ পরিচালনা-কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের হস্তে ভারত সরকারের শাসন পদ্ধতির সংস্কৃতির জন্য বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ করিবার ভার দিলে ফল ভাল হইতে পারিত। বিদেশী বিশেষজ্ঞের উপরে বিশ্বাস কংগ্রেসের নেতাদিগের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কয়েকজন বিদেশী কর্ম্ম-কুশলতা বিজ্ঞান বিষয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি গঠিত কমিটির উপর শাসন পদ্ধতি সংস্কার কার্য্যের ভার দিলে কাহারও মানহানি হইত না। শ্রীমোরারজি অথবা অপর কোন কংগ্রেসী নেতাকে এই কার্য্যের ভার না দেওয়াই উচিত ছিল। কারণ কংগ্রেসী নেতাদিগের সকল কার্য্যেই কার্য্য অপেক্ষা তোড়জোড় ও লোকদেখানো সাজান-গোছানর ব্যবস্থা অধিক লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় শাসন পদ্ধতিরও ঐ একই দোষ। সাম্রাজ্যবাদীদিগের জাঁকজমক ও আড়ম্বরপ্রিয়তা কংগ্রেস উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া তাহাদেরই অনুকরণে জমকালোভাবে কর্ম্মে অক্ষমতা দেখাইয়া চলিয়াছেন। এই অভিনয়ের শেষ হইলে তবে শাসন পদ্ধতিতে কর্ম্মকুশলতা দেখা যাইবে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ভারতের তথা ভারতের সকল প্রদেশের ও জনগণের অর্থসমস্যা ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথে বিঘ্ন ক্রমশঃ প্রকট হইতে প্রকটতর হইয়া উঠিতেছে। ভারতের রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের একটা বৈবিধ্য আছে। ভারতের অভ্যন্তরে যাহা আদায় ও ব্যয় হয়, টাকায়, তাহা হইল একদিক এবং ভারতের বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাহা সংগৃহীত ও ব্যয়িত হয় তাহা আর একদিক। বিদেশে বিদেশী অর্থ সংগ্রহ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা, কারণ ভারতের ঋণ করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা এখন পুরাণ কথার পর্য্যায়ে পড়িয়া গিয়াছে। বহু বিদেশী অর্থ সুদ ও আসলে অপর জাতিগুলির ভারতের নিকট পাওনা দাঁড়াইয়াছে ও আরও বর্দ্ধিত আকারে অদূর ভবিষ্যতে দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়। এই বিদেশী অর্থ রাজস্ব আকারে পাওয়া সম্ভব নহে, কারণ বিদেশের লোকের ভারত সরকারকে রাজস্ব দিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। এই জন্য ভারত সরকার স্বদেশের ব্যবসায়ক বিদেশী অর্থ নিজকার্য্যে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়া মাল রপ্তানী হইতে পাওয়া প্রায় সকল বিদেশী অর্থই সুবিধামত সরকারী কার্য্যে ব্যবহারের নিয়ম করিয়াছেন। ইহাতে কোন ব্যক্তিই স্বাধীন ভাবে আমদানী-রপ্তানীর কার্য্য করিয়া কোন উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে পারেন না। ভারত সরকার মধ্যে বসিয়া সকলের বিদেশী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া যাহাতে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়লব্ধ আয়ের টাকা প্রধানত সরকারী ব্যবহারে নিযুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। ফলে কি হইয়াছে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইহা বলা যাইতে পারে যে, রপ্তানী ব্যবসায় বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। হয়ত ব্যবসায়ে স্বাধীনতা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে রপ্তানীর প্রসার হইতে পারিত। ভারত সরকার এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায় নাই। সর্ব্বক্ষেত্রে

ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি চালনাই এখন অবধি ভারতের জননেতাদিগকে একটা আদর্শগত মাদকতার মতই উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ও দেশের ভিতরেও যথাসম্ভব স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে পারিলে, সকল লোকের সমবেত চেষ্টায় উভয় প্রকার ব্যবসায়েই মোট পরিমাণ দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যবহারে কোন সুফল হয় নাই। তাহার ব্যবহার স্থগিত রাখা প্রয়োজন।

রুপিয়ার মূল্য

ভারতের অর্থের মান হইল রুপিয়া বা টাকা। এই রুপিয়া বা টাকা পূর্ব্বকালে ছিল এক ভরি ১১/১২ ভাগ রৌপ্য ও ১/১২ ভাগ খাদে গঠিত। পরে রৌপ্য ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল এবং টাকার নিজস্ব মূল্য বলিয়া কিছু রহিল না। কিন্তু আইনত সরকারী মুদ্রার পরিবর্ত্তে বিনিময় কার্য্য চলিতে থাকিল এবং টাকার দ্রব্য ক্রয়শক্তির উপরেই তাহার মূল্য বিচার হইতে লাগিল। বিদেশী অর্থের সহিত টাকার বিনিময় কি হারে হইবে তাহাও আইনত স্থির করা হইল। বর্ত্তমানে ইহা এক পাউণ্ডে (ব্রিটিশ) ১৩ টাকা ছয় আনা স্থির রহিয়াছে; কিন্তু তাহা শুধু সরকারী নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করিয়া চলে। কালোবাজারে বর্ত্তমানে এক পাউণ্ড ক্রয় করিতে ২০৷২৫ টাকা অবধি লাগে বলিয়া শুনা যায়। যে সকল দেশে ভারতের আর্থিক নিয়মাবলী কেহ মানে না, যথা, সুইজারল্যাণ্ড দেশে, সেখানে একশ' টাকার নোট বদলাইলে তদ্দেশীয় অর্থ ২০৷২৫ টাকায় পাউণ্ড হিসাবেই পাওয়া যায়। সুতরাং রুপিয়া বা টাকা যদি নিয়ন্ত্রণ বর্জ্জিতভাবে অপর দেশের টাকার সহিত অদল-বদল করা হয়, তাহা হইলে পাউণ্ডে ১৩৷৶০ দরে সে কার্য্য কখনও হইবে না। ভারতের ভিতরেও রুপিয়া বা টাকার ক্রয়শক্তি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১/১ হইতে ১/৮ অংশে নামিয়াছে। অর্থাৎ যাঁহারা শতকরা ৩ টাকা সুদে সরকারকে টাকা ধার দিয়াছিলেন বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা সেই টাকা এখন ফেরত পাইলে তাহার ক্রয়শক্তি বা মূল্য এখন টাকায় দুই আনা হইতে তিন আনায় দাঁড়াইবে। এই ক্রয়শক্তিহানির কারণ ক্রমাগত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি। টাকার আন্তর্জ্জাতিক মূল্য নূতন হারে নির্দ্দিষ্ট হইলে বিদেশী ঋণ শোধ ও সুদ দেওয়ার খরচ বাড়িয়া যাইবে। বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতেও খরচ বাড়িবে। আমাদের দেশের জিনিস বিদেশে বিক্রয় করিলে মূল্য কম পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ যেক্ষেত্রে রপ্তানী ব্যবসায় আমাদের প্রায় পুরাপুরি গতানুগতিক ও পুরানো পথেই চলিতে থাকে, সেখানে টাকার দর কমাইয়া রপ্তানী কারবার বৃদ্ধি বিশেষ হইবে না বলিয়া মনে হয়। কারণ চা, পাট, কাপড় ইত্যাদির দাম কমিলে তাহার বিক্রয় বৃদ্ধি ততটাই হইবে যতটা প্রয়োজনীয় বস্তুর দাম কমিলে তাহা লোকে অধিক ক্রয় করে। ভারতের অধিকাংশ রপ্তানী মালেরই বিক্রয় অধিক করিয়া হইবে বলিয়া মনে হয় না। নূতন নূতন রকমের মাল যদি দাম কমাইলে বিক্রয় হইবে মনে হয়, তাহা হইলে সরকারী রপ্তানী কারবার হইতে সেইগুলি সস্তায় বিক্রয় করিয়া প্রথমে দেখা উচিত যে, ঐ আশা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা কতটা আছে। বিদেশী ঋণ যদি তের শত কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা থাকে, তাহা বাড়িয়া ১৫০০ কোটি হইয়া যাইবে, যদি রুপিয়া বা টাকার ভাও পাউণ্ডে ১৩৷৶০ হইতে ১৫ টাকা করা হয়। অর্থাৎ যদি টাকার আন্তর্জ্জাতিক মূল্য হ্রাস করা হয় তাহা হইলে বিদেশে সুদ দেওয়া ও ঋণ শোধের জন্ম উত্তরোত্তর অধিক করিয়া রাজস্ব আদায় করিতে হইবে। ইহা কোন আশার কথা নহে; সুতরাং ভারতের রাজস্ব সচিবের রুপিয়ার বা টাকার আন্তর্জ্জাতিক মূল্য হ্রাস না করিবার ইচ্ছা সুবিবেচনার ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল কথার মূলে রহিয়াছে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কথা। এই সকল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকিলে কি হইবে? এবং না থাকাই উচিত। নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলে স্বাধীন বিনিময়ের ফলে কি দাঁড়াইবে? ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তখন প্রতিযোগিতামূলকভাবে রুপিয়া বা টাকা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া তাহার দর বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা করিতে গেলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আরও অধিক করিতে হইতে পারে। অধিক মূল্যে কোন কোন রপ্তানী মাল খরিদ করিয়া

অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিদেশে বিক্রয় করা প্রভৃতির মারপ্যাঁচের সাহায্যে ১৩৸০ দর বজায় রাখা চলিতে পারে। এবং অপরাপর উপায় অবলম্বনে ঐ রেট দৃঢ়তর ভিত্তিতে বসান যাইতে পারে।

আমরা চির-নাবালক

ভারতের খাদ্য সমস্যা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার মূল কারণ, মোট খাদ্য কম উৎপন্ন হইয়া অভাবের সৃষ্টি হইতেছে অথবা খাদ্য যথেষ্ট থাকিলেও তাহা স্বাধীন ব্যবসায় পথে উপযুক্ত মূল্যে ও পরিমাণে শহরের লোক ও কারখানার কর্মীদিগের নিকট পৌঁছিতে পারিতেছে না; ইহার মধ্যে কোন্‌টি, অথবা সংযুক্তভাবে দুইটিই কি না তাহার উত্তর কে দিবে? একথা ঠিক যে ভারতের জনসংখ্যা শহরে ও কারখানা এলাকায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পূর্ব্বের তুলনায় অনেক অধিক খাদ্যবস্তু গ্রামাঞ্চল হইতে শহর ও কারখানার দিকে প্রেরিত হইতেছে। এই কারণে আড়তদারগণ অধিক মূল্যে খাদ্যবস্তু ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে, চালানের খরচও অধিক হইতেছে এবং চাহিদা বাড়িয়াছে বলিয়া লাভ করিবার চেষ্টাও প্রবলতর হইতেছে। এই অবস্থায় খাদ্য সরবরাহ বাজার হইতে সরাইয়া ফেলিয়া মূল্য বাড়াইবার চেষ্টাও ব্যবসাদারের পক্ষে অন্যায় হইলেও স্বাভাবিক। বস্তুত সরকারী নিয়ন্ত্রণেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। লেভি প্রভৃতিও সফল হয় নাই। খাদ্যমূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী সরবরাহ উপযুক্ত হইতেছে না। নিয়ন্ত্রণের ফলে লোকে ব্যক্তিগতভাবেও খাদ্যবস্তু গ্রাম হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিতেছে না। সাধারণ লোকে নানানভাবে খাদ্য সংগ্রহে বিফল হইলে পর অবশেষে বামপন্থী বনাম সরকারী পক্ষের 'যুদ্ধ' আরম্ভ হইল। পুলিশের গুলীতে যাহারা মরিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিল নিছক অপরপক্ষ; 'যুদ্ধের' সঙ্গে কোনই সংসর্গ যাহাদের ছিল না। বামপন্থীদিগের আক্রমণে ধ্বংস হইল ট্রাম, বাস ও ট্রেনের গাড়ি। কাজকর্ম্মও পণ্ড হইল এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া। ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত চোট কাহার উপর পৌঁছিল তাহা কে বলিবে? কেহ কেহ বলিল, "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।" যাহাই হউক একটা কথা প্রমাণ হইয়া গেল যে, জনসাধারণ এই 'যুদ্ধে'র তৃতীয় পক্ষ। লোকসানটা হইল জনসাধারণের সম্পূর্ণই প্রায়, কিন্তু আস্ফালনে আকাশ ফাটাইল 'বাম' ও 'দক্ষিণ' পন্থী মহারথীগণ।

এই 'যুদ্ধে' দেখা যাইল যে, জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ কাহারও দায়িত্বে সংরক্ষিত নহে। দেশবাসী সকলেই চির-নাবালক এবং তথাকথিত 'নেতা'গণ তাহাদের অভিভাবক। কিন্তু সে অভিভাবকত্বের অর্থ অন্তহীন অবৈধ শোষণের অধিকার। ভারতের জনসাধারণের স্বাধীন ভারতের আরম্ভ হইতেই নিজের বলিতে কোন অধিকার নাই। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী শাসক ও স্বয়ং-নির্ব্বাচিত নেতাগণ ভারত বিভাগ করিয়া দুইটি দেশের সৃষ্টি করেন এবং জনসাধারণ কার্য্যত পুরাতন বা নূতন কোন রাজ্যেরই মালিক ছিলেন না। এখনও মনে হয় নিজ রাষ্ট্রে ভারতের জনসাধারণের কোন কার্য্যকরী অধিকার নাই। তাহারা শুধু রাজস্ব দিবার এবং ক্ষতি ও কষ্ট সহ্য করিবার অধিকারী। এখন যে অবস্থা তাহাতে যদি জনসাধারণ নিজ অধিকার নিজ শক্তিতে করায়ত্ত করিয়া না রাখিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে দক্ষিণই হউক অথবা বামই হউক, কোন এক দলের একাধিপত্যের ধাক্কায় দেশবাসীর স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সকল অধিকার হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে। কংগ্রেসের নেতাগণ সাক্ষাৎভাবে ভারতের উপর রাজ-অধিকার না চালাইলেও তাঁহারাই যে এই দেশের মালিক এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের অস্থিমজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বহুক্ষেত্রে তাঁহারা যাহা বলেন, তাহার ভিতরে রাষ্ট্রের সকল শক্তিই নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখা যায়। পাঞ্জাবী সুবার উদাহরণ ইহার প্রমাণ। বাস, ট্রেন ও ট্রাম পুড়াইলেও রাষ্ট্রীয় অধিকার জন্মলাভ করে; অর্থাৎ আইন প্রণয়ন বা আইন ভাঙ্গা দুইটি কার্য্যই চালাকির বা গায়ের জোরে করিয়া দেশবাসীর উপর রাজত্ব চালান চলে। প্রমাণ 'যুদ্ধের' পরে তথাকথিত বামপন্থীদিগের প্রতি যে রাষ্ট্রীয় খাতির ইঙ্গিত একভাবে দেখান হইতেছে তাহার মধ্যেই পাওয়া যাইবে। যদি কেহ বিধান সভায় সরকারের বিরুদ্ধদলের নেতা হন, তাহার অর্থ

তিনি দেশবাসীর অধিকাংশের মনোনীত নেতা নহেন। কিন্তু তিনি যদি স্বয়ং-নির্ব্বাচিত দেশনেতারূপে প্রধানমন্ত্রীর দরবারে গিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাণ্ডবাট চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথার জন্ম কি দেশবাসী দায়ী? ইহা প্রায় ব্রিটিশের দরবারে ভারতীয় নেতাদের স্বাধীনতার দর তাও-এর মতই। জনমত বলিয়া যেন ভারতে কিছুই নাই। যে কেহই খাড়া হইয়া চতুর্দ্দশ লুই-এর মত 'আমি-ই রাষ্ট্র' বলিয়া হাঁদায়া সুরু করিয়া দিলেই রাষ্ট্র তাহারই প্রমাণ হইয়া যায়। নাবালক দেশবাসীর সাবধান হওয়া প্রয়োজন। যে নিজের সাবালকত্ব ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে ও অন্য সকালনপূর্ব্বক প্রমাণ না করিয়া নীরব ও নিস্তেজ থাকে; তাহার ভবিষ্যৎ অধিকারক্ষেত্রে অন্ধকার।

খাদ্য সরবরাহ যদি এখন কোন বামপন্থী 'আপনি-নেতার' সহিত নিষ্পত্তি করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে সেই পরিমাণে চাউল ও আটা দিবার ভার গবর্ণমেণ্ট পাইবেন। অর্থাৎ লেভি ইত্যাদি আরও প্রবল ভাব চালিত হইবে ও গরীব চাষীদিগের মরাই আরও ভেঙ্গে ফাঁক করিয়া দিয়া শহরের লোকের খাতিরে গ্রামবাসীরা অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকিবে। লেভি প্রভৃতি না করিয়া উন্মুক্ত বাজারে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যবস্তু ক্রয় করিয়া লইয়া শহর ও কারখানার লোকেদের খাওয়াইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না। কিন্তু ২০।২৫ টাকার চাউল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া পরে সেই চাউল ৩৫।৪০ টাকায় ক্রয় করিতে হইলে অবস্থা আরও বিপজ্জনক হইতে পারে। সরকারী রীতি ও পদ্ধতিতে এই সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। লোভী দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসাদারদিগের হস্তেও খাদ্য সরবরাহ ছাড়িয়া দিলে দেশবাসীর সর্ব্বনাশ। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় দেশবাসীর নিজের ব্যবস্থা নিজে করা। তাহা সমবায়ের সাহায্যে হইবে কিংবা এলাকা হিসাবে খাদ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে হইবে, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। জাতীয় অর্থে সরকারী বা আমলাতন্ত্রচালিত কোন ব্যবস্থা নহে মনে রাখিতে হইবে। কারণ লোভ ও দুর্নীতি আমলাতন্ত্রে এবং ব্যবসাদারের গদীতে সমানে বর্ত্তমান। গদী ও সরকারী দপ্তর এই দুই-এরই দমন একান্ত আবশ্যক।

বড় বড় শহরে যদি এলাকা অনুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য সাধারণের চালিত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয় তাহা হইলে সেই সকল প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে যে সকল জমি চাষ না হইয়া পড়িয়া আছে সেইগুলি ইহারা লইয়া চাষের ব্যবস্থা করিতে পারে। বহু চাষের উপযুক্ত জমি সরকারের হাতে পড়িয়া রহিয়াছে যাহা এইরূপে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া চাষ করা যাইতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে এই সকল প্রতিষ্ঠান চাউল, ডাল, তরকারি, মৎস্য ও আরও অনেক কিছু উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে; এবং সেই সকল খাদ্যবস্তু নিজেদের ভোগের জন্য ব্যবহার করিলে অল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হইতে পারে। লেভি, চেক্‌-পোষ্ট, হিসাব-নিকাশ, মাল জমা রাখা এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ উৎপাদনবর্জ্জিত কার্য্যে সরকার বাহাদুর যত লোকবল, অর্থ ও বুদ্ধির অপব্যয় করেন তাহার অর্দ্ধেক যদি শহরের ও কারখানার লোকেদের খাদ্য সংগ্রহক্ষেত্রে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিবার জন্য লাগাইতেন তাহা হইলে আজ সরকারকে বেইজ্জত হইতে হইত না। একবার যদি সকল লোকে বুঝিতে পারেন যে কেমন করিয়া সমবেত প্রচেষ্টায় সকল আবশ্যকীয় বস্তুই উৎপাদন ও সংগ্রহ করা যাইতে পারে; তাহা হইলে পরে আর কেহই প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী বা কর্ম্মে অক্ষম আমলাতন্ত্রের উপর খাদ্য সরবরাহের ভার দিয়া কষ্ট ও লোকসান বরদাস্ত করিতে রাজী থাকিবেন না। এই কার্য্য সমবায় সমিতি বা যৌথ কারবার গঠন করিয়া করা সহজেই যাইতে পারে। বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্রের চাষ যন্ত্রের সাহায্যে করিলে খরচও অনেক কম হইবে। অন্য দেশে উচ্চ বেতনে লোক রাখিয়া ভারতের তুলনায় অর্দ্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ মূল্যে খাদ্যবস্তু উৎপাদন করা হয়। এ দেশেও সেই উপায়ে দশ টাকা মণ চাউল, আটা অথবা দেড় টাকা সের মাছ পাওয়া যাইবে নিশ্চয়ই। তবে পরমুখাপেক্ষী হইলে সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। সব কিছুই গবর্ণমেণ্ট করিয়া দিবে ভাবিয়া যাঁহারা বসিয়া থাকেন তাঁহারা চিরকাল কষ্টভোগ করিবেন। সব কিছুই আমরা নিজেরা করিয়া লইব এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও নিজেদের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া লইব ; ইহা স্থির করিয়া যাঁহারা চলিবেন তাঁহাদিগের কখনও কোন অভাব সহ্য করিতে হইবে না। যথা, কলিকাতার লোকেরা বাংলা দেশের যে-কোন জেলায় সুবিধামত জমি সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতে পারেন। নিজেদের লোকেরা যদি পালা করিয়া তত্ত্বাবধানের কার্য্য করেন, তাহা হইলে সফল হওয়া নিশ্চিত। জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে মৎস্যের চাষও চলিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেচন কার্য্যও সম্পন্ন হইতে পারিবে।

পাঞ্জাবী সুবা

অনেকের ধারণা পাঞ্জাবী সুবার আন্দোলনের মূলে আছে শিখেদের একটা ভিন্ন প্রদেশ গঠন চেষ্টা। বস্তুত তাহা নহে। পাঞ্জাবী ভাষা একটি অতি পুরাতন ভাষা। এই ভাষা ভারতে প্রথম আর্য্য আগমনের সমকালীন প্রাকৃত ভাষাগুলির সহিত সম্পর্কিত এবং হিন্দি ভাষা অপেক্ষা পুরাতন। গুরুমুখী এই ভাষারই অক্ষর বা বর্ণমালার নাম ; শুধু গুরু নানকের দ্বারা ব্যবহৃত বলিয়, ঐ নাম চলিয়া থাকে। ভাষা পাঞ্জাবী এবং ঐ ভাষা সকল পাঞ্জাবীই বলিয়া থাকেন। খাস পাঞ্জাবী কাহারও মাতৃভাষা হিন্দি বলিয়া আমরা কখনও শুনি নাই। তবে হিন্দি ভাষার মাহাত্ম্য ও প্রসার প্রমাণ করিবার জন্য বহু মিথ্যা কথার প্রচলন হইয়াছে ; ইহাও তাহারই অন্তর্গত একটি মিথ্যা হইতে পারে। অবশ্য কোন পাঞ্জাবীর মাতা যদি শুধু হিন্দি বলেন তাহাতে কোন দোষ হয় না। বাংলা বা ইংরেজীও বলিতেও কোন মাতার পক্ষে আইনে আটকায় না। অথবা কার্য্যের সুবিধার জন্য বা উক্ত প্রদেশের অতি-নিকটে বাস করিবার কারণেও কোন কোন পাঞ্জাবী হিন্দি বলিতে সক্ষম হইতে পারেন। এই কারণে ইহা কখনও কেহ স্বীকার করিবে না যে, পাঞ্জাবী অর্থাৎ পঞ্চনদের জল সিঞ্চিত দেশের লোকেদের কাহারও নিজ ভাষা জাতিগত ভাবে হিন্দি। বাংলা দেশে বহু লোক আছেন যাঁহাদের মাতৃভাষা মাড়োয়ারী, নেপালী, আসামী ইত্যাদি। আরও অনেকে আছেন যাঁহাদিগের মাতৃভাষা ভোজপুরী, মৈথিলী ও ইংরেজী। কিন্তু তাহা হইলে বাঙালীদিগের ভাষা বাংলাই—অপর কিছু নহে। এই কারণে পাঞ্জাবের রাষ্ট্রীয় ভাষা পাঞ্জাবীই হওয়া উচিত এবং হিন্দি যেক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রভাষা, সেক্ষেত্রে হিন্দি লিখিতে বা বলিতে কোন পাঞ্জাবীর, তথা শিখের বা বাঙালীর কোন অসুবিধা থাকিতে পারে না। হরিয়ানার সকল পাঞ্জাবীরা হিন্দি ভাষাভাষী এ কথা সত্য হইতে পারে না, কারণ আমরা বহু পাঞ্জাবী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতির সহিত পরিচিত ; কিন্তু কোন পাঞ্জাবীর মাতৃভাষা হিন্দি এবং সেই পাঞ্জাবী পাঞ্জাবের জাতীয় ভাষা জানেন না বলিয়া শুনি নাই। ভারত সরকার বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজেদের প্রকাশিত ভারত বিবরণের মধ্যে পাঞ্জাবী ভাষা হিন্দির অন্তর্গত বলিয়া কয়েকবার দেখাইয়াছেন। উদ্দেশ্য, প্রমাণ করা যে ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ লোক হিন্দি ভাষাভাষী। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ প্রকৃত হিন্দি ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ২০ জনও বলেন না। এই মিথ্যা প্রচারের ফলেই পাঞ্জাবীদিগের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয় যে হিন্দি প্রচারে অতিবিশ্বাসী ও অপর সকল ভাষা-বিদ্বেষী রাষ্ট্রনেতাগণ পাঞ্জাবী ভাষাটিকে হিন্দির মন্দিরে বলি দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন হইতেই ভাষাভিত্তিক পাঞ্জাবী প্রদেশের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এখন কংগ্রেস এই আন্দোলনের মূল্য সত্য মানিয়া লইয়াছেন কিন্তু ইহাকে অঙ্গহীন করিয়া কিছু পাঞ্জাবীকে হিন্দি ভাষার গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজ ভাষাত্যাগী করিয়া সকল হিন্দুস্থানী বানাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহা আশা করি সফল হইবে না।

হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না ; কারণ আমরা হিন্দি ভাষা প্রচারের জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া 'বিশাল ভারত' নামক মাসিক পত্রিকা বহু বৎসর চালাইয়াছি। কিন্তু হিন্দি ভাষাভাষীদিগের নিজ ভাষার প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ তাহা অপরের স্কন্ধে ন্যস্ত ও অপরের খরচে ব্যক্ত হইলেই হিন্দি-বর্দ্ধন ধর্ম্মব্রত পূজারীগণ আনন্দ লাভ করেন। পরের দেশকে নিজের দেশ মনে করাও এই উদার মনোভাবের আর একটা নিদর্শন। যেমন বাংলার অতি প্রাচীন অনেকগুলি জেলা বিহারের অন্তর্গত করিয়া রাখা হইয়াছে শুধু গায়ের জোরে। 'ধলভূম' জেলার বিবরণ পড়িলে মনে হয় যে, ঐ জেলা ভোজপুর অথবা অপর কোন হিন্দুস্থানী মুলুকেরই মত একটা জায়গা। সিংভূম জেলাও ঐ প্রকারে হিন্দুস্থানী হইয়া রহিয়াছে। যেখানে কেহই একবর্ণ হিন্দি লিখিতে জানে না, সেখানেও ভাড়াটিয়া লোক বসাইয়া দুর্বোধ্য হরফে সংখ্যা ইত্যাদি লেখান হয়, হিন্দি মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য। এই যে মিথ্যার সাহায্যে মতলবসিদ্ধির চেষ্টা বা অন্যায়ের আশ্রয়ে স্বার্থান্বেষণ, ইহাই ভারতীয় [illegible] বিপদের কারণ। ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ এই ক্ষেত্রেই আবশ্যক।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সত্যই দীনের বন্ধু ছিলেন। তাঁর আসল নাম সি. এফ. এণ্ডরুজ। তিনি জাতিতে ইংরাজ হইলেও

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

তিনি পৃথিবীর সকল মানুষকেই আত্মীয় বলিয়া জানিতেন। জগতের যেখানে যে-কোন জাতির যে-কোন লোকের দুঃখ, নির্যাতন, অপমানের কথা তিনি শুনিতেন তাহাতেই তিনি অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেন। এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও করিতেন। কি জানি কেন, তিনি ভারতবর্ষকে আপন মাতৃভূমির মত জ্ঞান করিতেন এ বলা কঠিন। ভারতবর্ষ ছিল তাঁহার প্রাণ, তাই অমন করিয়া এদেশের মানুষকে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন।
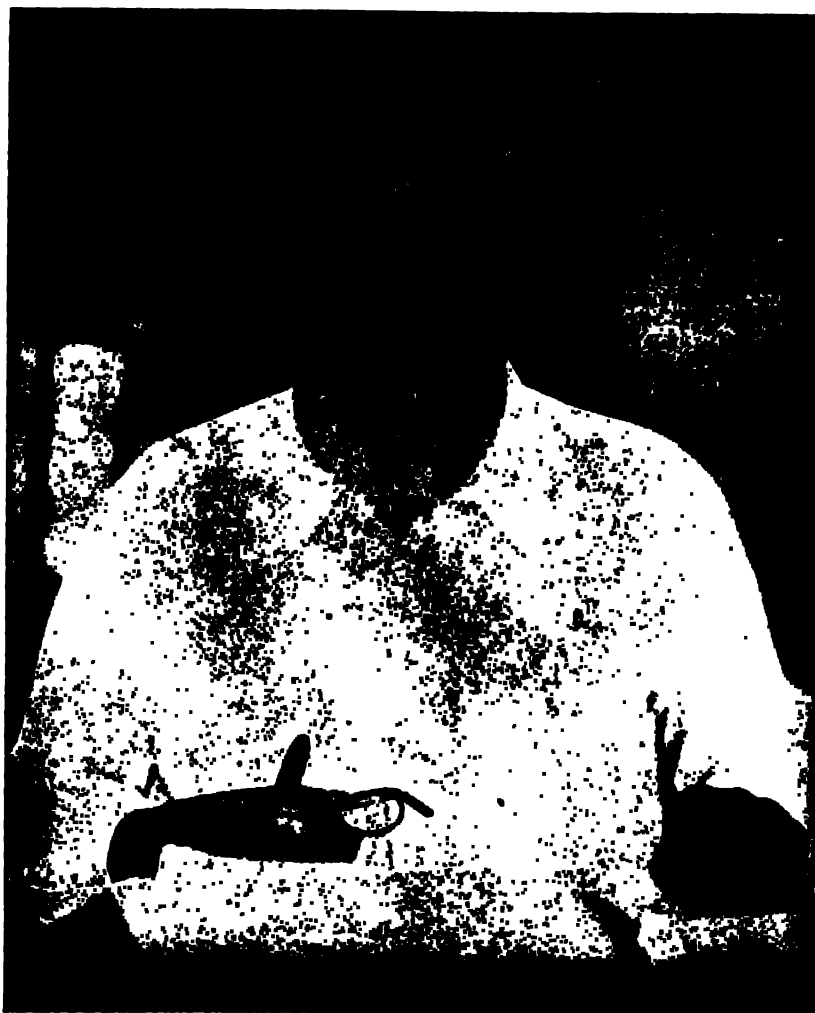
শান্তিনিকেতন ছিল তাঁহার আশ্রমভূমি। রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুদেব বলিতেন। শুধু বলা নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপর অনেকখানি আসিয়া পড়িয়াছিল। শান্তিনিকেতন ছিল তাঁহার প্রিয় 'হোম'।

সি. এফ. এণ্ডরুজ ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.। এবং পেমব্রোক কলেজের একজন ফেলো ছিলেন। তিনি যৌবনেই খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারার্থে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি অন্যান্য পাদ্রীদের মত রেভারেণ্ড উপাধি ভূষিত ছিলেন। পরে সে উপাধি ত্যাগ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায়, ফিজিতে এবং অন্যান্য উপনিবেশে দুর্গত ভারতীয়দের জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক দুঃখ এবং লাঞ্ছনা .ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বিহারের চম্পারণের নীলকরপীড়িত প্রজাদের তিনি সহায় ছিলেন, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, বন্যার প্লাবন ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উড়িষ্যার স্থায়ী দুঃখ-মোচনের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

তিনি ভারতীয় সমস্যা মানবিকতার দিক হইতেই আলোচনা করিয়া সেই দিক হইতেই তাহার সমাধান-চেষ্টা করিতেন, সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখিতেন না—যদিও রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান ও বিচক্ষণতা তাঁহার খুবই ছিল।

সাধারণত ভারতীয় ইংরেজরা তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিক বিরল। তিনি জানিতেন, স্বাধীন ভারতের সহিত স্বাধীন ব্রিটেনের মৈত্রীর চেয়ে ব্রিটেনের পক্ষে এবং জগতের পক্ষেও অধিকতর কল্যাণকর অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। এই নিমিত্ত উভয় দেশের স্বাধীনতার ভিত্তির উপর নির্মিত মৈত্রীসৌধের স্থাপতি তিনি চাহিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর, বিশ্বমৈত্রীর অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন।

এণ্ডরুজ সাহেব ছিলেন সমগ্র ইংরেজ জাতির সদ্গুণ-সমূহের প্রতীক। আমাদের শাস্ত্রে বৈষ্ণবের যেসব লক্ষণ আছে, তিনি সেইসব গুণের অধিকারী ছিলেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন পরম খ্রীষ্টান। জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মন্তুদ কাহিনী সকলেরই মনে আছে। সেই সময় এণ্ডরুজ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন। একদিন কোন গ্রামে একজন শিখ তাহার অত্যাচারের কথা গোপন করিতে না পারিয়া কেবল নিজের দেহখানিকে নগ্ন করিয়া দিল। এণ্ডরুজ তাহার দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন, আর জোড়হাতে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "আমি সমস্ত ইংরেজ জাতির হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ক্ষমা কর, তুমি সমগ্র ইংরেজ জাতিকে ক্ষমা কর।" এই একটি ঘটনা হইতেই এণ্ডরুজকে চেনা যায়।

এণ্ডরুজ সাহেবের চরিত্রের মহত্ত্ব ও মাধুর্য কত গভীর ছিল তাহা যে একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। তাঁহার হৃদয় করুণায় ও প্রেমে ভরা ছিল। যেখানে দুঃখ-দারিদ্র্য-কষ্ট সেইখানেই এণ্ডরুজ—জাতিধর্মনির্বিশেষে। তিনি সকলকেই কোল দিতেন, বড়-ছোট, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র এ ভেদ তাঁহার কাছে ছিল না। তাঁহার কাছে যে ব্যক্তি যে-কাজ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহারই তিনি তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এণ্ডরুজ সাহেবের সত্য, দম, তপ, তিতিক্ষা, ত্যাগ ইত্যাদি দেখিয়া বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিতেন। তিনি বলিতেন, ব্রাহ্মণ দুই রকমের। বর্ণব্রাহ্মণ ও গুণব্রাহ্মণ। যাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন, তাঁহারা বর্ণব্রাহ্মণ। সমাজে ইঁহারা খুব বেশ। এণ্ডরুজ ছিলেন গুণব্রাহ্মণ। যথার্থ ব্রাহ্মণ।

ভারতবর্ষ এণ্ডরুজকে দীনবন্ধু বলিয়া তাঁহার চরিত্রের একটা দিককে উপযুক্তরূপে প্রকাশ করিয়াছে। ভারতে দীনের সংখ্যা কম নহে। তাহারা তাঁহার মধ্যে যথার্থই এক বন্ধুকে পাইয়াছিল। আজ এণ্ডরুজ সাহেবের অভাব সমগ্র জগৎ অনুভব করিতেছে।

সুমিত্রাদি

শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

সুমিত্রাদির সঙ্গে চৌরঙ্গীর এক রেস্টুরেন্টে হঠাৎ দেখা।

সুমিত্রাদি আমাকে চিনতেই পারেন নি। দীর্ঘ কুড়ি বছর বাদে দেখা। চিনতে পারার কথাও নয়। ষোল বছরের একটি ছেলের জীবনের উপর দিয়ে কুড়ি বছরের অনেক জল গড়িয়েছে। সে ছিল এক কিশোর বালক, সে এখন প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখায় এসে গেছে। দেহে প্রৌঢ় না হলেও মনের বয়স যে বেড়ে বেড়ে বুড়িয়ে এসেছে তা সুমিত্রাদি জানবেন কি করে?

তাই যখন চেনা দিলাম সুমিত্রাদি অবাক চোখে প্রশ্ন করলেন—তুমি অমল? আমি প্রথমে তোমায় চিনতেই পারি নি! তুমি এত বড় হয়েছ?

হেসে উত্তর দিলাম—শুধু বড় নয় সুমিত্রাদি, বুড়োও হয়েছি।

সুমিত্রাদির সেই প্রাণখোলা মিষ্টি হাসি। খিল খিল করে হেসে উঠে বললেন—বয়সের চেয়ে পাকা তুমি চিরকালই। কিন্তু আমাকে চিনলে কি করে?

জবাব দিই নি এ কথার। সুমিত্রাদিকে চেনা সত্যিই শক্ত, বিশেষ করে আজকের সুমিত্রাদিকে ত নয়ই। অমন মেঘের মত একরাশ কালো কোঁকড়া চুলের জায়গায় ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা বব হেয়ার। হাসলে গালে টোল পড়ত যে সুমিত্রাদির তা এখন মেদে ভরাট, শুধু মাত্র চোখ দুটো সুমিত্রাদিকে চিনিয়ে দিয়েছে আমায়। অমন টানা টানা মা দুর্গার মত চোখ আর কার! সেই সঙ্গে হাসিটি আছে অবিকল এক রকম। কথায় কথায় প্রাণখোলা হাসি। যে সোসাইটিতে এবং যাদের সঙ্গে সুমিত্রাদি বসেছিলেন সেখানে এ হাসি মানায় না কিন্তু সুমিত্রাদি ত আর অন্য কেউ নন। তাই সোসাইটিতে অশোভন হলেও হাসিটি সুমিত্রাদি ছাড়তে পারেন নি, যদিও রূপ থেকে অনেক কিছুই তিনি ছেড়েছেন পরিবেশের অনুশাসনে—তুমি অমন চেয়ে চেয়ে দেখছিলে আমায়, লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সুমিত্রাদিকে একবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে এমন পুরুষ ত দেখলাম না ভাই! কথা শেষ হতেই আমার সেই প্রাণ-মাতানো হাসি।

সত্যি এমন টকটকে কাঞ্চন আভা কদাচিৎ চোখে পড়ে। এখন যেন রংটা আরও খুলেছে। মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিলাম গ্রামের বৌ সুমিত্রাদির সঙ্গে আমার সমুখের এই সোসাইটি মহিলাকে। মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত।

মনে পড়ল গ্রামের কথা। সুমিত্রাদির গ্রামে থাকার সেই কাহিনী। তাই প্রশ্ন করলাম—আপনি আর গ্রামে যাবেন না সুমিত্রাদি?

টানা টানা চোখ দুটো বিস্ময়ে অনেক বড় দেখাল। আর সুমিত্রাদি আমার কথা শেষ না হতেই জবাব দিলেন—গ্রামে? কেন গো? গ্রামে যাব কোন্ দুঃখে? গ্রামে আবার মানুষ বাস করে না কি?

আশা করি নি সুমিত্রাদির মুখে এ কথা। এর পর সুমিত্রাদিকে ছেড়ে আসার পালা। তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন বার বার। ঠিকানাও দিয়েছিলেন লিখে। কিন্তু যাই নি। মনটা খারাপ হয়েছিল। আমি আজকের সুমিত্রাদির মধ্যে গ্রামের সুমিত্রাদিকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম।

শহরবাসের সখ সুমিত্রাদির চিরকালের। বৌ হয়ে এলেন যখন আমাদের পাশের বাড়ীতে, অনেকের মত আমিও অবাক চোখে দেখেছিলাম। যে বয়সে চারদিকে চোখ-কান খোলা রাখার কথা, আমার তখন সেই বয়স। কিন্তু বয়সের বাধা সুমিত্রাদির কাছে আসতে কোন সঙ্কট সৃষ্টি করে নি। নতুন বৌ ক'দিনের মধ্যেই এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে ঘুরে পরিচিত হয়েছেন আর প্রায় সকলের সঙ্গে কোন-না-কোন সম্পর্ক পাতিয়েছেন। পাড়া সম্পর্কে সুমিত্রাদির স্বামী অমর রায় আমার দাদা।

অমরদা বলি। কিন্তু কিছুতেই অমরদার বৌকে বৌদি বলতে রাজী হই নি আমি। নিজের বৌদি ছাড়া অন্ত কাউকে বৌদি বলতে ভারী আপত্তি ছিল তখন।

সুমিত্রাদি বললেন—তবে কি তুমি আমার নাম ধরে ডাকবে না কি?

—সুমিত্রাদি বলব! আপনি আমার চেয়ে বয়সে কি-ই বা বড়।

—ওরে পাকা ছেলে? বেশ, তাই মঞ্জুর।

এই সুমিত্রাদি গ্রামে ছিলেন মাত্র দু'টি বছর। যাই যাই করেও শহরে তাঁর যাওয়া হয় নি। অমরদা ছিলেবী মানুষ। এমন বেশী কিছু মাইনে পেতেন না সওদাগরী অফিসে, যে বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক কারণে তাঁকে গ্রামের বাস তুলে দিয়ে যেতেই হ'ল কলকাতায়। আর সেই সংবাদে খুশীতে ফেটে পড়লেন সুমিত্রাদি। বস্তুতঃ তাঁর তাগিদেই অস্থির হয়ে অমরদাকে শহরবাসের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তা ছাড়া সুন্দরী বৌ ছেড়ে থাকতে বুঝি একটুও ভাল লাগে নি তাঁর। মাসে একবার কি দু'বার বাড়ী আসতে পারতেন অমরদা।

হঠাৎ চাকরিতে একটা প্রমোশন পেয়ে অমরদার হাতে সুযোগ এল সুমিত্রাদির মনোবাসনা পূর্ণ করার।

—কি সুমিত্রাদি, চললেন আমাদের ছেড়ে?

—হাঁ ভাই! চললাম বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি যাবার মুহূর্তে কেমন যেন মনটা খারাপ লাগছে। কি একটা আকর্ষণ পিছু টানছে আমায়, মায়া লাগছে ছেড়ে যেতে তোমাদের।

অবাক হয়ে চেয়েছিলাম সুমিত্রাদির মুখের দিকে। এখানে কিসের আকর্ষণ সুমিত্রাদির। শহরে যাবার নামে পাগল যে সুমিত্রাদি, আজ যাবার মুহূর্তে এ কি কথা?

তখন বুঝি নি। পরে অবশ্য শুনেছিলাম অমরদার এক বন্ধুর কাছে সমস্ত ঘটনা: সুমিত্রাদি অমরদাকে চিঠি লিখেছিলেন। আর অমরদার মনেও গোল বেধেছিল এই চিঠি। উনি লিখেছিলেন···তোমার কাছে যেতে চেয়েছি আজ দু' বছর ধরে। এতদিনে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। আজ যাবার সময় ভাল লাগছে না একটুও! এমন এক আকর্ষণ মনটাকে টেনে রাখছে যা তোমার কাছে লিখতে লজ্জা করে···এই আকর্ষণ ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

অমরদা পত্রটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছিলেন বার-কয়েক। সুমিত্রাদির প্রতিটি পত্রে কলকাতায় যাবার যে আকুলতা ফুটে উঠত তা প্রাণ দিয়ে অনুভব করতেন তিনি। সুমিত্রাদিকে ছেড়ে থাকতে তাঁরই কি কম কষ্ট হ'ত। তবু বাধ্য হয়েই ছিলেন। তার পর যেই সুযোগ এল অমনি ব্যবস্থা করলেন পাকাপাকি। কিন্তু এত যার সাধ শহরবাসের, যে কলকাতাকে মনে করে স্বপ্ন-রাজ্য—তার সে সুযোগ আসায় উল্লাস ছিল না ঐ চিঠিতে! অবশ্য কিছু কিছু আনন্দোচ্ছ্বাস ছিল বটে, কিন্তু চিঠির মূল সুর বিষাদে ভরা। শেষের দিকে ভারাক্রান্ত গ্রাম ছেড়ে আসার কথায়।

কিন্তু সব ছাপিয়ে ঐ একটি লাইন যেন জল জল করেছে চোখের সুমুখে—এমন এক আকর্ষণ মনটাকে টেনে রাখছে যা তোমার কাছে লিখতে লজ্জা করে···

অমরদা ভাবতেন কি এমন কথা সুমিত্রার, যা স্বামীকে লিখতে লজ্জা করে। কাকে ভালবেসেছে সে! কি ব্যাপার।

অমরদার হঠাৎ মনে এসেছিল অফিস-বন্ধুদের ঠাট্টার কথা, ভাল কথাই বলছি অমর! অমন সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে গ্রামে ফেলে রাখা ঠিক নয়! তাড়াতাড়ি কাছে নিয়ে আয়। পরে পস্তাতে হবে কিন্তু।

অমরদা হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন বন্ধুদের কথা। আজ হঠাৎ সেই পুরাণ কথাগুলোই মনে এল।

না, না, অসম্ভব, অমরদার মন বলেছে। সুমিত্রাকে বিশ্বাস করে সারাজীবন দূরে রাখা যায়। সুমিত্রার মনের কাছে এগিয়ে আসবে এমন মানুষ সারা গ্রাম খুঁজলেও মিলবে না।

তবু দুর্ভাবনার একটা কাঁটা কেমন যেন খচ খচ করেছে অমরদার মনে। নিজের গ্রামকে, মাতৃভূমিকে কে না ভালবাসে। তাকে ছেড়ে আসতে তাঁরই কি কম দুঃখ। তবু সব দুঃখ ছাপিয়ে সুমিত্রাদির একটা সাধ পূরণের আনন্দে মশগুল ছিলেন তিনি।

হঠাৎ সেই আনন্দের মাঝে এল বিষাদের ছায়া।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ী এলেন অমরদা। আগাম টাকা ও সেলামী দিয়ে বাসা ঠিক করে ফেলেছেন। কিছু দেনা করতে হয়েছে অবশ্য তাঁকে। কিন্তু তার জন্য আপশোষ নেই তার বিন্দুমাত্র। জীবন দিয়ে যাঁকে ভালবাসেন তার জন্য এটুকু করা ত তাঁর কর্তব্য।

সেই কর্তব্যবোধেই বাড়ী এলেন মুন্নিআপিকে নিয়ে যেতে। গম্ভীর 'হয়ে রইলেন অমরদা। মুন্নিআপিকে দেখে আর কাছে পেয়ে যে মনটা খুশীতে নেচে উঠত সে যেন ডানা-ভাঙা পাখীর মত পড়ে রইল মুখ থুবড়ে।

মনে পড়ছে মুন্নিআকে! মুন্নিআপির মুখচোখ শহর-বাসের আনন্দে উজ্জ্বল। সব কিছু গুছিয়ে নিচ্ছেন ধীরে ধীরে। কোমড়ে কাপড় জড়িয়ে পাকা গিন্নীর মত মুন্নিআপি টেনে টেনে নামাচ্ছেন বাক্স, বিছানা, সুটকেস, জামা-কাপড়। মুন্নিআপির মুখচোখ যেন ফেটে পড়ছে খুশীতে।

—অমল, ধর না ভাই এই বাক্সটা, একা কি পারি আমি?

আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

—আঃ, ধর না অমল: আমি মেয়েমানুষ সব পারি কি? তবু দাঁড়িয়ে থাকে, সব মুখ তার করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? ওঁর না হয় মুখ ভারের কারণ বুঝি কিন্তু তোমার হ'ল কি? মুন্নিআপিকে হারাবার ভয়ে বুঝি মন খাপ্পা করছে!

আমি মুন্নিআপির কাজে সাহায্য করব কি দাঁড়িয়ে রইলাম কাঠ হয়ে। আমি যে আর ষোল বছরের অমল নেই, এখন রীতিমত বড়সড় এক যুবক তা বুঝি চোখেই পড়ে না ওঁর। আমার মুখচোখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে, কান দুটো গরম। ছিঃ ছিঃ, চিরকালই মুন্নিআপির কথাবার্তা ঐ রকমের। অমরদার সামনে কি লজ্জায় ফেলেছেন যে আমায়।

কিন্তু মেঘটা কেটে গেল। স্ত্রীকে অমরদা চেনেন ভাল করেই। যে কথায় আমি মাথা হেঁট করে আছি সেই কথা জলোট আবহাওয়াকে দিল উড়িয়ে। অমরদা হেসে উঠলেন হো হো করে। তার পর স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে আমায় নিয়ে লেগে গেলেন জিনিস গোছাতে।

বেলা পড়ে আসতে ছায়া নামল উঠানে। সেই ছায়া মুন্নিআপির হাসি-খুশী-ভরা মুখের ওপরেও নেমে এল। মুন্নিআপি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। কাল সকালেই রওনা হবেন তাঁরা। তাই বুঝি এই বিষণ্ণতা। কাজেও দেখা দিল মন্থরতা। অনেক কিছু গুছিয়ে নেওয়া বাকি তখনও।

—তোমার আবার কি হ'ল? অমরদার চোখে মিলিয়ে যাওয়া প্রশ্নটা নতুন করে উঁকি দিল।

—ভাল লাগছে না। সব ছেড়ে যেতে মন কেমন করছে! কান্না পাচ্ছে যেন!

অমরদার ভাবনায় চিড় খেল আবারও। কান্না পাচ্ছে! কি এমন ফেলে যাচ্ছে যে কান্না পেতে পারে। যা ফেলে যাচ্ছে তা কি মন। মনটা কি এখানেই পড়ে থাকছে মুন্নিআপির! হারিয়ে যাওয়া সন্দেহটা আবার দেখা দিল অমরদার চোখের সুমুখে।

অমরদা এগিয়ে এলেন মুন্নিআপির কাছে। ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখলেন ওঁকে। পড়তে চেষ্টা করলেন মুন্নিআপির মুখের রেখা। চোখের ভাষায় কোন নতুন কিছু খুঁজে পেতে চেষ্টা করলেন, তার পর বললেন—তোমার আবার মন খারাপের কি আছে?

—আছে গো আছে। সে তুমি বুঝবে না।

ঘোরালো হয়ে উঠেছিল আবার পরিস্থিতিটা। অমরদা এতক্ষণ দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগেছিলেন। মুন্নিআপির হাসির সঙ্গে মিলিয়ে নিজেও হাসছিলেন। আবার নেমে এসেছিল বিষণ্ণতা। অমরদাকেও বুঝিয়ে বলা যাবে না এমন কথা মুন্নিআর মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। কত দিন ধরে এমনটি হয়েছে। কাকে কেন্দ্র করে মুন্নিআপির এই মনোবেদনা। কার বিরহে ব্যাকুল মুন্নিআপি—এই সব কথাই চিন্তা করতেন অমরদা।

তাই সারাদিনের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলিকে মালার মত সাজালেন অমরদা। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন কোথায় কীট বাসা বেঁধেছে ঐ মালার ফুলে। হদিস পেলেন না। হঠাৎ বুঝি মনে পড়ল কার কথা। সন্দেহের বদলে হাসি পেল অমরদার। হেসে উঠলেন সশব্দে হো হো করে আপন মনেই!

চমকে উঠেছিলেন মুন্নিআপি। অমরদাকে আপন

মনে এমন করে হাসতে দেখে ভয় পেয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এসে শুধিয়েছিলেন, ও কি গো, এমন করে হেসে উঠলে যে হঠাৎ আপন মনে?

—ও কিছু নয়!

—কিছু নয় কি! তোমার বুঝি খুব হাসি পাচ্ছে।

—কেন পাবে না? আমার মন খারাপের কি আছে?

—নেই! অবাক চোখে চেয়ে রইলেন ঝুমিআদি একটুক্ষণ! তারপর বললেন—আমার যেন কেমন লাগছে!

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি!

মিলে গেল চিঠির ভাষার সঙ্গে। আর কোন ভুল নেই। এতদিনের এত আগ্রহ ঝুমিআর কলকাতায় বাসা বাঁধার, সে বুঝি সব মিথ্যা। তাঁকে ভুলিয়ে রাখা যায়। ঝুমিআদির ধারণা ছিল অমরদা কোনদিনই পারবে না শহরে বাসা বাঁধতে। অমরদা সেইরকমই বুঝিয়েছেন। হিসেব কষে দেখিয়েছেন প্রতিটি পয়সা মিলিয়ে। তাই বুঝি ঝুমিআদির বাসনা ছিল কলকাতায় যাবার। যা হবে না তা বলতে দোষ কি! আগ্রহ দেখালে অমরদা অন্ততঃ ভুলে থাকবেন। বুঝে নেবেন কি চায় ঝুমিআদি। ঝুমিআদির মন পড়ে আছে কোথায়?

ভাল লাগছে না অমরদার। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ভাল লাগছে না বাড়াতে। বাইরে যাবেন। মাঠের ধারে যাবেন। হাওয়া খেয়ে আসবেন একটু।

যাবার মুখে ঝুমিআদি এলেন। সেই গম্ভীর মুখ। বাজিয়ে দেখবেন আবারও। যাচাই করবেন বার বার।

—তা হ'লে যাওয়া বন্ধ রাখি, কি বল? তোমার যখন ইচ্ছা নেই!

—বাঃ, তাই হয় নাকি!

—তুমি চাইলে সবই হয়! বল না, স্পষ্ট করে বল কি চাও তুমি! বল কি তোমার বাসনা! ঝুমিআদিকে ধরে ঝাঁকুনি দিলেন অমরদা। তারপর বেরিয়ে গেলেন দ্রুতবেগে মাঠের দিকে।

অমরদা মাঠের নির্মল হাওয়ায় ফিরে পেলেন নিজেকে। কি যা-তা ভাবছেন। এতক্ষণ পাগলামি চেপেছিল তার মাথায়। ঝুমিআদির মুখখানা মনে পড়ল। ভেসে উঠল ঝুমিআদির হাসিমুখ। ভাবলেন নদীর ধার পর্যন্ত যাবেন। দেরি হবার ভয়ে তাও গেলেন না। ফিরতে চাইলেন। আর তখনই দেখলেন ঝুমিআদির মত একজন মহিলাকে নদীর পথ ধরে যেতে।

চিনতে পারলেন অমরদা। ওঁকে চিনতে দেরি হবার কথা নয়। ঝুমিআদি চলেছেন নদীতে একা। সঙ্গে কেউ নেই। একা কেন? মন খারাপ বলে। মন খারাপ হ'লে নদীর ধারে কেন? ওখানে গেলে কি ভাল লাগে? ভাল লাগার মত কিছু আছে না কি? ঝুমিআদির মন খারাপের কারণ কি ওখানেই না কি?

অনুসরণ করতে চাইলেন স্ত্রীকে। মাঠ থেকে সোজা ধরলেন নদীতে যাওয়ার পথ। প্রায় ঝুমিআদির পিছু পিছু এসে পৌঁছালেন স্নানের ঘাটে।

জনমানবহীন অপরাহ্নের নদীর ঘাট। ঝুমিআদি পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে। একমনে কি যেন দেখছেন নদীতে। অন্য দিকে দৃষ্টি নেই।

অমরদাও দেখলেন একখানা নৌকা। ঘাটের দিকেই আসছে। কে আছে নৌকায়। কে আসছে কাকে দেখে। ঝুমিআদিকে দেখেই আসছে কি? অমরদার মনে হ'ল সমস্ত রহস্য বুঝি ঐ নৌকাটাকে ঘিরে। এবারে উঠে যাবে পর্দাটা। রহস্যের যবনিকাপাত আসন্ন।

কিন্তু না, নৌকাটা পাড় ঘেঁষে চলে গেল। জেলেদের নৌকা।

জলে নামলেন ঝুমিআদি। ঝুমিআদির চোখের আড়ালে রইলেন অমরদা পাড়ে বসে। ভাবছেন একমনে। কই, কিছু ত বোঝা গেল না?

জল থেকে উঠে এলেন ঝুমিআদি। তারপর পাড়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন ওপারের দিকে। অমরদা অবাক হয়ে দেখছেন। দেখতে দেখতে এগিয়ে এলেন কাছে। তবু খেয়াল নেই ঝুমিআদির। আরও কাছে আসতে নজরে পড়ল—ও মা, তুমি এখানে। ঝুমিআদির সেই মিষ্টি হাসি।

—দেখ, দেখ না ভাল করে!

অন্নদা চাইলেন পশ্চিম দিকের আকাশে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশের গায়ে তাই রং-এর বাহার। নিস্তরঙ্গ নদীর জলে সূর্যের প্রতিচ্ছবি নাচছে। যেন একটা গোলাকার অগ্নিপিণ্ড নদীর শীতল জলে ডুব দিয়ে স্নিগ্ধ হতে চাইছে।

চোখ ফেরালেন ঝুমিয়াদির দিকে। ঝুমিয়াদির দৃষ্টি তখন ওপারে। অন্নদাও স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। ওপারের বড় বটগাছটার মাথায় তখন বেলাশেষের আলোর নাচন। এপারের পাখীরা ফিরে চলেছে ওপারে ঐ বটগাছের নীড়ে। সেখানে তাদের কোলাহল। মাথার উপর দিয়ে চলেছে বকের সারি। ওপারের ঘাটে মায়েদের জল ভরে নিয়ে ঘরে ফেরার তাড়া। এক মা বুঝি সিক্তবস্ত্রা কাপড় কাচছে পাটার ওপর আছাড় দিয়ে। সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে এপারে। চারদিকে অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

চেয়ে রইলেন অন্নদা আরও দূরে। যেখানে সবুজ বনের রেখার সঙ্গে এসে মিলেছে নীল আকাশ দিকচক্রবাল ছুঁয়ে। সে যেন অন্য এক জগৎ, মায়াময় এক স্বপ্নের রাজ্য।

আবার চোখ ফেরালেন অন্নদা ঝুমিয়াদির দিকে। ঝুমিয়াদি তখন হারিয়ে গেছেন প্রকৃতির এই নৈঃশব্দ্যের জগতে। ঝুমিয়াদি আকাশ দেখছেন।

—বাড়ী যাবে না ঝুমিয়া?

ধ্যান ভাঙল ঝুমিয়াদির। চেয়ে রইলেন অন্নদার দিকে কিছুক্ষণ বোবার মতই। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন চল যাই!

আসার সময় বার বার ফিরে চেয়েছিলেন ঝুমিয়াদি।

সত্যিই মেলাতে পারি নি সেদিনের ঝুমিয়াদিকে আজকের সঙ্গে। মিল থাকেও না। পরিবর্তনশীল জগতে সবই স্বাভাবিক। যে ঝুমিয়াদি গ্রাম-প্রকৃতিকে ভালবেসে তাকে ছেড়ে আসতে কেঁদেছিলেন সেই ঝুমিয়াদির গ্রাম সম্পর্কে এমন উন্নাসিক কথায় আঘাতই পেয়েছিলাম। কিন্তু সে আঘাত এমন করে বাজে নি যেমন অন্নদাকে দেখে হয়েছিল। অন্নদাকে চিনতেই পারি নি প্রথমে। ভীষণ রোগা হয়েছেন অন্নদা। আনাজ-তরকারিতে ভরা দুই হাতে দুটো বড় থলি। তার ভারে নুয়ে পড়ে চলেছেন বাজার দিয়ে। দেখলে হঠাৎ মনে হয় হাঁপানির রোগী।

—আপনি বাজারে যে! চাকর-বাকর সঙ্গে নেই কেউ, অসুস্থ শরীরে বেরিয়েছেন কেন?

ম্লান হাসলেন অন্নদা একটু। তার পর বললেন—চাকর-বাকরেরা চিনতে পারে না এসব। ঝুমিয়া এগুলো খেতে খুব ভালবাসে কিনা?

সেদিন অফিসে ঢুকেই বাসবী আশ্চর্য হয়ে গেল। তার চেয়ার-টেবিল সরানো হয়েছে। সে জায়গাটা ফাঁকা।

আপনার অন্য ব্যবস্থা হয়েছে।

শিশিবাবুর গলা।

বাসবী ফিরে দেখল শিশিবাবু মুখ তোলে নি। ফাইলের দিকে চেয়েই কথাগুলো উচ্চারণ করেছে।

বাসবী অনুভব করতে পারল, সারা শরীরে শীতল একটা শিহরণ। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। দুটো পা-ই কেঁপে উঠল থর থর করে।

অন্য ব্যবস্থা। তবে কি এ অফিসের চাকরির পরমায়ু আচমকা শেষ হয়ে গেল? তার কাজে মারাত্মক কোন ভুল-ত্রুটি আবিষ্কৃত হয়েছে? সেইজন্য কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ এরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছেন?

নাকি, বাইরে কোথাও বদলীর হুকুম হবে? কোম্পানীর কাজ নানা জায়গায় ছড়ান, সেরকম কোন জায়গায় তাকে যেতে হবে।

অবশ্য নিয়োগপত্রে লেখাই ছিল প্রয়োজন হ'লে কোম্পানীর কাজে বাইরে যেতে সে বাধ্য থাকবে।

পরের টাকায় মাইনে বাড়ানো হ'ল বুঝি সেই জন্যই!

পায়ে পায়ে বাসবী শিশিবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার বলুন ত?

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তার গলার স্বরে কম্পনের রেশ।

আজ একটু আগেই অফিসে এসেছে বাসবী। ফাউন্টেন পেনটা ক'দিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। মেরামতের দরকার। তাই একটু আগে এসে কলমটা দোকানে দিয়ে অফিসে চলে এসেছে।

অফিসে এখনও অনেকেই এসে পৌঁছয় নি।

শিশিবাবু মুখ তুলল। এক হাত দিয়ে ফাইলের পাতাটা চেপে ধরে বাসবীর দিকে ফিরে মুচকি হাসল, তারপর বলল, আপনি জানেন না কিছু?

না।

আপনার ভিতরে বসার হুকুম হয়েছে। ম্যানেজারের কামরার মধ্যে।

ম্যানেজারের কামরায়?

শিশিবাবুর সামনের চেয়ারটা টেনে বাসবী বসে পড়ল।

পলকের জন্য অফিসের অন্য সহকর্মীদের ভ্রুকুটি-কুটিল মুখের ছবি বাসবীর চোখের সামনে ভেসে এল। বিশেষ করে রুক্মার ঈর্ষাজর্জর মুখের চেহারা।

কেন এ ব্যবস্থা হ'ল বলুন ত? বেশ ত বাইরে ছিলাম। আপনাদের পাশাপাশি।

শিশিবাবু বাসবীর মুখ থেকে দৃষ্টি সরায় নি। এবার সে দৃষ্টিতে একটু বুঝি ব্যঙ্গের ঝিলিক দেখা গেল।

ভাবটা যেন অভিনয়পটুত্বে এ মেয়েটিও কম নয়। সুযোগ পেলে শ্রীভিভিয়েনীকেও বোধ হয় হার মানাত।

অফিসের বাজের সঙ্গে কথাবার্তা নিশ্চয় আগেই হয়ে গেছে। পার্টিশনের বাইরে, সকলের দৃষ্টির সামনে থাকলে বাসবী স্বাভাবিক কারণেই একটা ম্যানেজারের মনঃপূত নয়। তাই একেবারে নিজের সান্নিধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা যে বাসবীর বুঝতে হচ্ছে না, এটুকু বোঝার মতন বিবেচনাশক্তি শিশিবাবুর আছে বৈকি।

ওই নিন, দূত এসে গেছে।

শিশিবাবু আকর্ণ হাসতে হাসতে বলল।

বাসবী পিছন ফিরে দেখল ম্যানেজারের বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে।

বাসবী ফিরতেই বলল, ম্যানেজার সাহেব সেলাম দিয়েছেন দিদিমণি।

বাসবী উঠল। চলতে চলতেই আঁচল দিয়ে মুখটা

একবার দুরে নিল। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে রুমাল বের করার এতক্ষণ সময় নেই।

অনিমেষ রায় বোধ হয় সবে এসেছে। কোটটা খুলে টাঙিয়ে রাখছে। মাধবী ফিরে দাঁড়াল।

দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তনটা চোখে পড়ল।

একেবারে জানলার ধারে, কোণের দিকে একটা কাপড়ের পার্টিশন। ওপারে বোধ হয় মাধবীর বসবার বন্দোবস্ত।

একেবারে বে-আব্রু নয়, মাঝখানে একটা আবরণ আছে, এইটুকু মাধবীর ভাল লাগল। সব সময় চোখ তুললেই মানুষটাকে দেখা যাবে না। চোখাচোখি হবার আশঙ্কাও কম।

আজ থেকে আপনি এখানে বসবেন।

অনিমেষ হাত দিয়ে পর্দাঢাকা জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

হঠাৎ?

কথাটা আচমকা মাধবীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

অনিমেষ চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে বলল, কিছু গোপনীয় ফাইলের কাজ আপনাকে করতে হবে। আমার ইচ্ছা নয় যে, সে সব ফাইল আমার চেম্বারের বাইরে যাক। আপনাকে নিশিবাবু সাহায্য করবেন। দরকার হ'লে তিনি আপনার সঙ্গে বসবেন কিছুক্ষণ।

মাধবী কিছু বলল না। বলার মত তার কিছু ছিলও না। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মাথা পেতে নিতেই হবে।

আস্তে আস্তে মাধবী পার্টিশনের ওপারে চলে গেল।

এখানে চেয়ারে বসলে জানলা দিয়ে রাস্তার কিছুটা দেখা যায়। শহরের হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য, যাবতীয় যানবাহনের ব্যস্ততা অনুভব করা যায়। কেবল গতি, গতি, গতি। দ্রুত কর্মপ্রবাহে সবাই ছুটে চলেছে। একদিন মাধবীও বাইরের ওই প্রবাহের অংশ ছিল। আবেদনপত্র নিয়ে জনতার সঙ্গে মিশে অফিসের দরজায় দরজায় ভাগ্য-পরীক্ষার মহড়া দিয়ে বেড়াত।

মাধবী জানে বাইরের ওই জনতার সবাই কর্মব্যস্ত নয়, অনেকেই ব্যস্ততার ভান করছে। নিজেদের প্রকৃত রূপ ঢাকবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস। যেমন মাধবী করত তার বেকার জীবনে। আশপাশের লোকদের বোঝাতে চাইত, সে কর্মহীন নয়। ব্যস্ত পদক্ষেপে নিজের সন্দেহকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রকট করে তুলত।

চেয়ার ঘুরিয়ে মাধবী নিজের টেবিলের দিকে চোখ ফেরাল।

টেবিল পরিষ্কার। কোন কাগজপত্র নেই।

কাগজপত্র আসার এখনও সময় হয় নি। অনিমেষের চিঠিপত্র লেখা হ'লে, তবে মাধবীর চিঠি তার টেবিলে আসবে।

জলের গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েই মাধবী থেমে গেল।

টেবিলের বাঁদিকে একটা বোতাম। বেয়ারাকে ডাকবার জন্য। ঠিক যেমন অনিমেষের টেবিলে আছে।

অবশ্য এ ছাড়া উপায়ও নেই। বাইরে কাছাকাছি বেয়ারা টুলের ওপর বসে থাকে। তাকে দেখা যায়। ইঙ্গিত করে, অল্প চিৎকারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু এখানে বেয়ারা বসে একেবারে কামরার বাইরে। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ছাড়া তাকে ডাকবার কোন পন্থা নেই। অনিমেষ আর মাধবীর একই বেয়ারা।

মাধবীর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। একগাদা ফাইল নিয়ে নিশিবাবু এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে হাসির আভাস।

পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে মাধবী বলল, বসুন।

নিশিবাবু বসল। ফাইলগুলো টেবিলে রেখে।

মাধবীর ধারণা ছিল গোপনীয় ফাইল মানে অফিসের বাবুদের ব্যক্তিগত ফাইল। কে কবে চাকরিতে যোগ দিয়েছে। কত টাকা বেতনে। বেতন বেড়ে বেড়ে বর্তমানে কোন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের মতামত, এমন কি বিরুদ্ধ মন্তব্যও সেই সব ফাইলে লেখা থাকে।

সেইজন্য সে সব ফাইল অফিসের প্রকাশ্য স্থানে থাকাটা অনুচিত।

কিন্তু নিশিবাবু অন্য কথা বলল।

কন্ট্রাক্ট পাবার গোপন রহস্যের খবর। শুধু কর্মক্ষমতাই আজকের পৃথিবীতে শেষকথা নয়। টেণ্ডার লাভ করতে হ'লে আরও কিছু করতে হয়। যাঁরা টেণ্ডার দেবার মালিক, তাঁরা এক-একজন এক-একরকম দ্রব্যে সন্তুষ্ট। কেউ সুরা, কেউ বিলাসদ্রব্য, কেউ নারী। এক-একজনকে এক-একরকম অর্ঘ্যে আপ্যায়িত করতে হয়।

কোন টেণ্ডার পেতে হ'লে কোন দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে হয়, কোন পূজার বিধিতে, সেইসব এই ফাইলে লেখা আছে।

এতদিন এ ফাইল ম্যানেজার দেখত, নিশিবাবুর সহযোগিতায়, কিন্তু ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাস দুয়েকের ছুটিতে বাইরে যাওয়ায়, তাঁর কাজগুলো অনিমেষের ওপর এসে পড়েছে। সেইজন্য এই গোপনীয় ফাইলের ভার ন্যস্ত হয়েছে মাধবীর ওপর। আপাতত সাময়িক ব্যবস্থা বলেই মনে হচ্ছে।

খুব মনোযোগী ছাত্রীর মতন বাসবী সব শুনল। স্বীকার করল এ ফাইলগুলো যথেষ্ট গোপনীয়। কাজ হয়ে গেলেই এগুলোকে ম্যানেজারের স্টীল ক্যাবিনেটে তুলে রাখতে হবে। একটু অবহেলা হ'লে চাকরির সুতোয় জট পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আপনি বসে বসে ফাইলগুলো দেখুন, আমি চলি। দরকার হ'লে ডেকে পাঠাবেন, ওঁকে আর বিরক্ত করবেন না।

শিশিরবাবু চোখের ইশারায় পার্টিশনের ওপারে অমিতেশের দিকে দেখিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাসবী বসে বসে ফাইলের পাতা ওল্টাতে লাগল। এ ফাইলের ধরন একেবারে আলাদা। কোথাও কোম্পানীর নাম ছাপা নেই। চিঠির তলায় সই নেই। কোথা থেকে চিঠি আসছে, কে পাঠাচ্ছে, এসব জানার কোন উপায় নেই। অথচ আসল কথা সবই লেখা আছে। কাউকে দামী ফাউন্টেন পেন পাঠানো হয়েছে, কাউকে হুইস্কির বোতল। এসব কন্ট্রাক্টবাবদ বাড়তি কত খরচ হয়েছে তার হিসাবও করা হয়েছে প্রত্যেক ফাইলে।

বাসবীর আশ্চর্য লাগল এ ধরনের গুপ্ত ফাইলের তদারক করার জন্য সারা অফিসের মধ্যে একমাত্র বাসবীকেই বিশ্বাসের পাত্রী বলে বিবেচনা করা হ'ল। বাসবীর চাকরির বয়স এমন কিছু বেশী দিনের নয়। কাজে অসামান্য যোগ্যতা দেখিয়েছে এমন মনে করারও কোন কারণ নেই। যে পনের টাকা মাইনে হঠাৎ বেড়েছে, সেটা তার যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ নয়, এটা বাসবী খুব জানে।

তবে বাসবীকে হঠাৎ এতটা দায়িত্বপূর্ণ আসনে বসাবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? তাকে অমিতেশের পক্ষপুটে স্থান দেওয়া। অন্য সকলের নজর থেকে সরিয়ে।

কিংবা হয়ত দীপকের প্রভাব থেকে বাঁচাবার জন্য। কি জানি, দীপক গুপ্ত যদি বাসবীকে নিজের অফিসে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে! এমন একটা কল্পিত ভয় প্রকারান্তরে বাসবীর উপকারই করছে।

টিফিনের সময় বাসবী প্রথম অসুবিধা বোধ করল।

টিফিন বাক্স নিয়ে উঠতে গিয়েই মনে পড়ল আর রুক্মার কাছে যাবার প্রয়োজন কি? যে অন্তরালটুকুর দরকার ছিল, সেটার ব্যবস্থা ত অমিতেশই করে দিয়েছে। এখানে বসে টিফিন করলে সহকর্মীদের চোখে পড়ার কথা নয়।

পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে বাসবী উঁকি দিয়ে দেখল। চেয়ার খালি। অমিতেশ নেই। সম্ভবত লাঞ্চে বেরিয়েছে।

তবু বাসবী টিফিন-বাক্স হাতে নিয়ে উঠে পড়ল। রুক্মার কাছে একবার যাওয়া দরকার। তার বসার এই নতুন ব্যবস্থার বাইরে কিরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেটা জানবার জন্য মন খুব উৎসুক। তার কিছুটা পরিচয় রুক্মার কাছে পাওয়া যাবে।

দরজা ঠেলে বাসবী বাইরে বেরিয়ে এল।

টুলে বসা বেয়ারাটা দাঁড়িয়ে উঠল। সম্মানের এই স্বীকৃতিটুকু নতুন। আগে বেয়ারা এভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াত না। সেও বুঝেছে দিদিমণির পদোন্নতি হয়েছে।

অফিস খালি। প্রায় সবাই বাইরে। দু'একজন বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছে।

তারা কেউ বাসবীর দিকে চোখ তুলে দেখল না।

বাসবী দ্রুত পা ফেলে রুক্মার কামরায় গিয়ে ঢুকল।

রুক্মা টিফিন করছে। বাসবী তার পাশে গিয়ে বসল।

খেতে খেতে রুক্মা আড়চোখে দেখল, কি ব্যাপার, এত দেরি হ'ল?

ভাবছিলাম আসব কি না।

কেন?

আমার নতুন জায়গায় নির্বাসন হয়েছে শুনেছ ত?

হ্যাঁ, ম্যানেজারের পাশে। সে খবর এসেছে।

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তাই ভাবছিলাম পর্দা-নশীন হলাম যখন, তখন টিফিন নিজের টেবিলে সারতে আর বাধা কি।

তবে, এলে যে?

কি করব, দিনে একবার রুক্মা পণ্ডিতকে না দেখলে হৃদয় চঞ্চল হয় যে। তারপর কি খবর বল?

আমি আর কি খবর বলব। খাসমহলের খবর ত তোমার মুঠোর মধ্যে।

খাসমহলের খবর চাই নি, বাইরের খবর কি? প্রজাবৃন্দের?

যথা পূর্বং, তথা পরং। মহারাণীর কুশলেই প্রজার কুশল।

বাসবী এবার গম্ভীর হ'ল, না ভাই ঠাট্টা নয়, আমি কামরার মধ্যে যাওয়াতে কেউ কিছু বলছে না।

রুক্মা ঘাড় নাড়ল, আমার কাছে কেউ কিছু বলে নি। কিন্তু আমার মনে হয় বাসবী এ ভালই হয়েছে। সারা অফিসে আমরা দু'টি মাত্র মেয়ে। আমি পার্টিশনের আড়ালে থাকি, তুমি একেবারে বাইরে বস, এটা যেন একটু বিসদৃশ দেখায়। এতগুলো পুরুষের মাঝখানে একটি মেয়ে। একটু অসুবিধাও হয়।

যাক, বাসবীর মন থেকে একটা ভার নেমে গেল।

রুকা কিছু ভাবে নি। অফিসের লোকেরাও এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে না। তা হ'লে রুকা বলত।

টিফিন শেষ করে মাধবী উঠে পড়ল।

কামরায় ঢোকবার মুখেই মাধববাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক টিফিন সেরে ফিরছে।

মাধবীকে দেখে একগাল হেসে বলল, কি ব্যাপার, সীতা অশোককাননে বন্দিনী যে?

একটু আরক্ত হ'ল মাধবী, কিন্তু সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বলল, সে কথাটা দশাননকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়?

মাধববাবুও হেসে পাশ কাটাল।

অনিমেষ তখনও ফেরে নি। তার কোটও নেই। তার মানে বাইরে গিয়েছে। হয় লাঞ্চে, কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে।

পার্টিশন পার হয়ে নিজের টেবিলে এসেই মাধবী চমকে উঠল।

সর্বনাশ। ফাইলগুলো সব তার টেবিলের ওপরই পড়ে রয়েছে। নিশিবাবুর নির্দেশ ছিল বাইরে গেলেই ফাইলগুলো স্টীল ক্যাবিনেটে চাবি বন্ধ করে রাখতে হবে। চাবিটাও দিয়ে গেছে মাধবীর কাছে।

কিছু বলা যায় না, নিশিবাবু এক ফাঁকে হয়ত ঢুকেছিল এ ঘরে। প্রথম দিনই মাধবীর এই গুরুতর অবহেলা তার চোখ এড়ায় নি। অনিমেষ ফিরলেই এটা তার গোচরে আনতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবে না।

নিজের ওপর লজ্জা হ'ল মাধবীর। ছি, ছি, এমন একটা দায়িত্বহীনতার কি কৈফিয়ৎ দেবে!

ড্রয়ার খুলে চাবিটা বের করে মাধবী আগে ফাইলগুলো ক্যাবিনেটে রেখে দিল। চাবিবন্ধ করছে এমন সময় পিছনে জুতোর আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের কণ্ঠস্বর, মিস সেন।

চারধারে ফাঁকফাঁকে কাঠের পার্টিশন। একেবারে ওপরে কাঁচের বাহার। এ কামরার একটি কথাও বাইরে যাবার উপায় নেই।

সেই জন্যই বুঝি অনিমেষের কণ্ঠস্বর কেমন বিচিত্র শোনাল।

মাধবী ঘুরে দাঁড়াল।

আমাকে পূর্ণচাঁদ করপোরেশনের ফাইলটা বের করে দিন ত।

মাধবী ফাইল উল্টে উল্টে একটা ফাইল বের করে দিল।

হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিয়ে অনিমেষ বলল, বসুন, এই চেয়ারে। কথা আছে।

মাধবী বসল।

চেয়ার টেনে নিয়ে অনিমেষ বসতে বসতে বলল, ফাইলগুলোর পাতা উল্টে দেখেছেন নিশ্চয়?

মাধবী ঘাড় নাড়ল।

শুধু দক্ষতার এ যুগে কিছু হয় না। যুবাঃজন, তার সঙ্গে কাঞ্চনমূল্যও ধরে দিতে হয়। যেমন ধরুন, কন্যা রূপসী, বিদুষী হলেও, পণের প্রয়োজন হয়, এও তেমনই। কোন কন্ট্রাক্ট পেতে হ'লে কন্ট্রাক্ট দেবার মালিকদের মনোরঞ্জন করতে হয় আমাদের। এই সব ফাইল সেই সব মনোরঞ্জনেরই সাক্ষ্য বহন করছে।

মাধবী হাসল, পণের ভয়ঙ্কর মারাত্মক উপমা না দিলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না।

কি বলুন?

চিঠিগুলো সব সাদা কাগজে লেখা। কোথাও কোন সইসাবুদ নেই। এগুলোও কি প্রয়োজনীয়?

প্রয়োজনীয় বৈ কি। এসব ব্যাপারে কোন রেকর্ড থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু রেফারেন্সের জন্য রেকর্ড রাখতে হয়। কোন দেবতা কবে কিসে তুষ্ট হয়েছে তার হিসাব রাখার জন্য।

এসব কাজ কাকে করতে হয়?

এই অধমকে। মাঝে মাঝে দেবতাদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করে উপঢৌকন বা দেবার দিতে হয়। যদি গোলযোগের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তবে ফাইলগুলো সরিয়ে ফেললেই হবে। অফিসের কাগজপত্রে কোথাও এর হদিস মিলবে না। তবে হঠাৎ যদি অফিস ঘেরাও করে ফেলে খোঁজ খানাতল্লাশী শুরু হয়, তা হ'লে ধরা পড়ার আশঙ্কা ষোল আনা। সে রকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা অবশ্য কম।

মাধবী কিছু বলল না। স্থিরনেত্রে অনিমেষের দিকে চেয়ে রইল।

দোহাই আপনার, পাপপুণ্যের প্রশ্ন তুলবেন না, ন্যায়-অন্যায়ের কথাও নয়। যা রীতিসিদ্ধ তা মেনে চললে পৃথিবীতে চলে না।

সে কথাটা আমার চেয়ে বেশী করে আর কে জানে বলুন?

অনিমেষ বিস্মিত হ'ল, তার মানে?

তার মানে আমার এ অফিসে প্রবেশ করাটা ঠিক প্রথানুযায়ী বা নিয়মনিষ্ঠ হয়েছিল, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। একেবারে দরজা ঠেলে আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা চাকরি চেয়েছিলাম। কোন আবেদনপত্রও দেওয়া ছিল না, যেটুকু আবেদন ছিল তা আমার ভেঙে-পড়া কণ্ঠস্বরে।

সেই জন্যই আপনাকে এত ভাল লেগেছিল।

কি ভেবে কথাটা অনিমেষ বলেছিল, অনিমেষই জানে। কিন্তু বাসবী অনেকক্ষণ মুখ তুলতে পারল না। মাথা নীচু করে রইল।

আচ্ছা, আমি একটু পরেই আসব তবে।

নিশিবাবুর গলা।

দরজা ঠেলে নিশিবাবু কিছুটা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে-ছিল। ম্যানেজার একদৃষ্টে মেয়েকেরাণীর দিকে চেয়ে রয়েছে, আর মেয়েকেরাণীটি রক্তিমমুখে মাথা নীচু করে বসে রয়েছে, এমন একটা দৃশ্যের মুখোমুখি হবার কল্পনাও বোধ হয় ভদ্রলোক করে নি।

ডাকের পর অনিমেষ নিশিবাবুকে দেখা করতে বলে-ছিল, কাজেই নিশিবাবুর হঠাৎ ঢুকে পড়াটা কোন অন্যায় হয় নি।

অনিমেষ বেল টিপল। বাসবীর দিকে ফিরে বলল, আপনি সীটে যান। ফাইলগুলো দেখুন। পরে এ বিষয়ে আলাপ করব।

বেয়ারা এসে দাঁড়াতে অনিমেষ বলল, বড়বাবু চলে গেলেন কেন? আসতে বল।

বাসবী নিজের জায়গায় ফিরে এল। এই সময় জানলা দিয়ে রোদের টুকরো এসে টেবিলের ওপর পড়ে। জানলার একটা পাল্লা সে হাত দিয়ে বন্ধ করে দিল। টেবিলে কোন ফাইল নেই। সব ফাইলই সে ক্যাবিনেটে তুলে রেখেছে। সেগুলো আনতে গেলে আবার নিশিবাবুর সামনে দিয়ে যেতে হবে।

ক্রমে ক্রমে সবই অভ্যস্ত হয়ে এল।

বাসবীর কামরার ভিতরে বসা নিয়ে কেউ কিছু উল্লেখও করল না। মাঝে মাঝে রুক্মা শুধু পরিহাসের সুরে দু'একটা কথা বলত, কিন্তু সে কথাগুলো যে নিছক পরিহাস, তা বুঝতে বাসবীর কোন অসুবিধা হয় নি।

অসুবিধা হয়েছে অন্য দিকে।

পাঁচটা নাগাদ বাসবী বাইরে বেরোবার মুখেই অনিমেষ বাধা দিত।

দাঁড়ান মিস সেন, পাঁচ মিনিট। একসঙ্গে বেরোব।

এক একবার বাসবীর মনে হয়েছে আপত্তি করে। কোন একটা ওজর দেখিয়ে বলে, আজ আর বাড়ীর দিকে যাব না মিটার মর। অন্যদিকে অন্য কাজ রয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বলে নি। বলতে পারে নি।

এক মাস হ'ল বাসবী টিউশনিটা ছেড়ে দিয়েছে। অফিসের পরিশ্রমের পরে এই বাড়তি খাটুনিটা দুঃসহ হয়ে উঠেছে। কাজেই অফিস থেকে এখন সোজা বাড়ীই চলে যায়।

সারাদিনের ক্লান্তির পরে এই বিলাসিতাটুকু খুবই আরামপ্রদ মনে হয়। মোটরের গদির ওপর নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। জনস্রোতের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে নিষ্পেষিত অবস্থায় বাড়ীতে না ফিরে, একেবারে মোটর-বাহিত হয়ে তাজা অবস্থায় বাড়ীর কাছাকাছি নামা।

এর জন্য অনিমেষের কাছে বাড়তি কোন করুণা প্রার্থনা করারও প্রয়োজন হয় না। দু'জনের একই পথ। যাবার সময় বাসবীকে শুধু একটু নামিয়ে দেওয়া।

অবশ্য প্রতিদিন যে এক সঙ্গে ফেরে এমন নয়। অনেক দিন অনিমেষের হাতে কাজ থাকে, কিংবা সে আগেই বাইরে বেরিয়ে যায়।

তবে সপ্তাহে চারদিন বাসবী অনিমেষের সঙ্গে ফেরে।

বাসবীর আশঙ্কা ছিল, মা হয়ত প্রশ্ন করবে, এত বেলা থাকতে বাসবী কি করে বাড়ী ফিরছে। কিন্তু মা সে সব প্রশ্ন করে নি। মেয়েটা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরছে, এতেই তার মা খুশী। তাড়াতাড়ি ফেরার কৈফিয়ৎ চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি। মেয়ে আর টিউশনি করে না, কাজেই শীঘ্র ফিরছে, এই ধরনের কিছু একটা কল্পনা করেই মা আশ্বস্তবোধ করেছে।

কিন্তু কয়েক দিন পরেই বাসবী বিপদে পড়ল।

সেদিন ফিরতে একটু দেরীও হয়ে গিয়েছিল। মাঝপথে অনিমেষ মোটর থামিয়েছিল, স্যুটের কাপড় কেনার জন্য।

শুধু নিজে নামে নি, বাসবীকেও নামিয়েছিল।

আমি একেবারে রং-কানা মিস সেন। আপনি নেমে আমাকে একটু সাহায্য করুন। গোটা দুয়েক স্যুটের কাপড় কিনতে হবে।

বাসবী মৃদু প্রতিবাদ করেছে।

আমাকে বাদ দিন। আমাদের তিনকুলে কেউ স্যুট পরে নি। আমার কোন আইডিয়া নেই।

অনিমেষ ছাড়ে নি। বলেছে, এ সব বিষয়ে আপনারা জন্ম-দক্ষ। তা ছাড়া, আপনি যা বেছে দেবেন, তাই অঙ্গে চড়াব, একটু আপত্তির গুঞ্জন তুলব না। কাজেই চিন্তার কোন কারণ নেই। নামুন।

অগত্যা বাসবীকে নামতে হয়েছে।

নেমে অবশ্য মুস্কিলে পড়েছে।

দোকানদার সার সার প্রায় পঁচিশ রকমের নমুনো ফেলে দিয়েছে সামনে। তার মধ্যে থেকে বাছাই করতে হবে।

অনিমেষ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। কোণের একটা চেয়ারে বসে বলেছে, আপনি বাছুন। বাছা হ'লে

বলবেন, আমি দরদস্তর করব। অবশ্য এ দোকানে দরদস্তর করার রেওয়াজ নেই।

প্রায় মিনিট কুড়ি ঘাঁটাঘাঁটি করে বাসবী দুটো কাপড় বেছেছে।

অনিমেষ বলেছে, চমৎকার। বিশেষ করে এই রংটা।

হাত দিয়ে একটা রং দেখিয়ে দিয়েছে।

এ রংটা আপনার পছন্দ? বাসবী প্রশ্ন করল।

বললাম যে আপনাকে, আমার পছন্দের বালাই নেই। বেলার এ রংটা খুব প্রিয় ছিল। সে সব সময় আমার স্যুটের কাপড় বেছে দিত কি না।

বাসবী অবাক হ'ল। এত কাণ্ডের পরেও অনিমেষের মনে বেলাদেবীর জন্য গোপন মমতা একটু সঞ্চিত রয়েছে। তাকে একেবারে মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি। যে বেলাদেবী উৎকট প্রসাধনে নিজেকে সজ্জিত করে অহরহ অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। পথ চলতে কতবার বাসবীর নজরে এসেছে।

বাসবী কিছু বলল না। দোকানের এক কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল, তারপর অনিমেষ প্যাকেট বগলে বেরিয়ে আসতে, মোটরে গিয়ে বসল।

সারা রাস্তা প্রতিজ্ঞা করল, বেলাদেবীর সঙ্গে এবার দেখা হ'লে স্পষ্ট ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করবে, অনিমেষের কাছে আবার ফিরে আসা কি তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পিছনের সব কিছু মুছে ফেলে, নতুন করে আবার সংসার সুরু করা যায় না।

কি ব্যাপার, কি ভাবছেন? বাড়ীর কাছাকাছি এসে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল।

ভাবছি, বেলাদেবীর সঙ্গে আপনার আবার মিলন হওয়া কি একেবারেই সম্ভব নয়।

অনিমেষ একটু যেন চমকে উঠল। দ্রুত হ'ল মোটরের গতি। চালকচক্র একটু কেঁপে উঠল।

কিন্তু অনিমেষ কোন উত্তর দিল না।

বাড়ীর কাছাকাছি বাসবীকে নামিয়ে দেবার সময় শুধু বলল, গুড নাইট।

বাড়ীতে দরজা খুলে মা গম্ভীর মুখে সরে গেল।

এটা অস্বাভাবিক ঠেকল বাসবীর কাছে। ফিরতে অন্য দিনের চেয়ে বেশি হ'লেও এমন কিছু রাত হয় নি। রাত হ'লে অন্য দিন মা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে, কি রে এত রাত হ'ল যে?

আজ কোন কথা নয়। তবে কি মা'র নিজের শরীর খারাপ? বাড়ীতে কোন বিপদ-আপদ হ'ল।

বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে বাসবী জিজ্ঞাসা করল, তোমার শরীর ভাল ত?

হুঁ।

বাড়ীর সবাই ভাল আছে? রুবি, খোকন?

হুঁ।

মা আর দাঁড়াল না। ক্ষিপ্র পায়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাসবী খুব আস্তে মাকে অনুসরণ করল। অস্বাভাবিক কোন দৃশ্য চোখে পড়ল না। রুবি আর খোকন তক্তপোষের ওপর পাশাপাশি বসে পড়ছে।

মা কথা বলল, বাসবীকে চা দেবার সময়।

তুই কি আজকাল ম্যানেজারের মোটরে যাওয়া-আসা করিস?

নীচু হয়ে বাসবী সবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিল, মা'র কঠিন স্বরে চমকে মুখ তুলল।

কোন কথা বলল না। একদৃষ্টে মাকে নিরীক্ষণ করল কিছুক্ষণ ধরে। এ খবর মা কোথা থেকে সংগ্রহ করল? ম্যানেজারের মোটরে বাসবী যায় না, তবে ক'দিন ধরে বাড়ী ফিরছে। এটা বোধ হয় বাড়ীর কারও নজরে পড়েছে। খোকন কিংবা রুবির। নতুন পরিচারিকা ভরসার দেখতে পাওয়াও আশ্চর্য নয়।

বাসবীর কিছু বলার প্রয়োজন হ'ল না। তার কিছু বলার আগেই মা আবার বলল। এবার কণ্ঠস্বর কঠিনতর।

দীপকবাবু এসেছিলেন।

দীপকবাবু! এবার বাসবী সোজা হয়ে বসল, বাড়ীতে?

হ্যাঁ, অফিসে দিন তিনেক বুঝি দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন, দেখা হয় নি। মানে, অফিসের 'পরে রাস্তায় অপেক্ষা করেছিলেন কিন্তু তুমি ম্যানেজারের সঙ্গে তার মোটরে গিয়ে ওঠায় তাঁর কথা বলার সুযোগ হয় নি।

এবার বাসবী কথা বলল। রুক্ষ করল নিজের কণ্ঠস্বর।

দীপকবাবু ত আর আমাদের অফিসে কাজ করেন না, আমার সঙ্গে তাঁর কি দরকার?

মেয়ের আচমকা রুক্ষ কণ্ঠস্বরে মা একটু আশ্চর্যই হ'ল।

মেয়ের কখন কোনদিকে মতি বোঝা দুষ্কর। এক সময়ে ত এই দীপকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার বাড়ী পর্যন্ত গিয়েছিল বাসবী। এই অফিসে তার চাকরিও করে দিয়েছিল। এখন ম্যানেজারের মোটরে চড়ে দীপককে আমল দিতে প্রস্তুত নয়।

অথচ মেয়ের কাছেই শুনেছে দীপক এখন ভাল চাকরি করে। দামী পোষাক পরে এসেছিল। চেহারাও অনেক

ভাল হয়েছে। বয়সও বেশী নয়। এমন একটা অল্প বয়সের প্রতিষ্ঠাবান ছেলেকে ছেড়ে প্রৌঢ় এক ম্যানেজারের সান্নিধ্য কামনায় রুচি বাসবীর কেমন করে হ'ল, মা ভেবেও পায় না। অফিসের ম্যানেজার বলতে একজন ভারিক্কি বয়সের লোকের চেহারাই স্বভাবত তার মনের সামনে ভেসে উঠেছিল।

চা-টা শেষ করে বাসবী কথা বলল, হঠাৎ বাড়ীতে এসে হাজির যে? কি ব্যাপার?

কি ব্যাপার জানি না। মনে হ'ল, এখন খুব ভাল চাকরিই করছেন। তুমি যে চাকরি করে দিয়েছিলে তার চেয়ে অনেক ভাল।

মা'র এই শ্লেষটুকু বাসবী গায়ে মাখল না। গম্ভীর গলায় বলল, বড় একটা চাকরি করছেন, গরীবের সংসারে সেটা বুঝি জাহির করতে এসেছিলেন।

মা ভ্রূ কুঞ্চিত করল। মুখে অপ্রসন্নতার মেঘ আরও গাঢ় হ'ল। একবার ভাবল, উত্তর দেবে না। থেমে যাবে। মেয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে যাওয়ার বিপদ অনেক। উপার্জনশীল মেয়ে, মায়ের মান রেখে হয়ত কথা বলবে না। আজকের বাসবী অনেক বদলেছে। সব কথা যে মাকে আর বলে না, তার প্রমাণ ত হাতে হাতে মিলছে।

তবু মা কথা বলল, কি জানি সে রকম ত কিছু মনে হ'ল না। শুধু বললেন, এ চাকরিটা আগের চাকরির চেয়ে একটু ভাল। অফিসটাও নাকি বড়।

মানুষের ভাল হ'লেই ভাল, বাসবী গম্ভীর গলায় বলল।

বাড়ী পর্যন্ত উজান বেয়ে এসে দীপক যে মাকে ম্যানেজারের গাড়িতে বাসবীর যাবার কথা বলে গেছে সে অপরাধ বাসবী ভুলতে পারছে না। এটা কি দীপকের ঈর্ষা, না বিদ্বেষ?

দীপক বোধ হয় আশা করেছিল তার বড় চাকরি নিয়ে শহরে ফেরার কথা কানে যেতেই বাসবী ছুটোছুটি করবে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। দীপকের বাড়ীতে ধর্না দেবে।

বাসবী চাকরি দিয়ে দীপকের একবার উপকার করেছিল, এবার দীপক প্রত্যুপকার করবে বাসবীকে নিজের অফিসে স্থান দিয়ে।

সেটা সম্ভব হয় নি বলেই প্রসারিতফণা ভুজঙ্গের মতন এত আস্ফালন।

বাসবী আর দাঁড়াল না। একেবারে বারান্দায় চলে এল। পাড়ার কারও বাড়ীতে বিশেষ যাওয়া-আসা নেই। তেমন পরিচয় থাকলে বাসবী কারও বাড়ীতেই চলে যেত। দাঁড়িয়ে থাকলেই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে।

এমন একটা সন্দেহ মা বোধ হয় মনের নিভৃতে অনেক দিন ধরেই লালন করছিল। মাঝে মাঝে গোপন সন্দেহ মুখের বিচিত্র রেখায় আত্মপ্রকাশিত করেছে। মেয়ে তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে এমন একটা ধারণা তার আছেই। আজ দীপক সেই সন্দেহ যে অলীক নয়, সেটাই প্রমাণ করে গেছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বাসবী চুপচাপ বসে রইল অনেক দূরের আকাশের দিকে চেয়ে।

এই সময় মা যদি কাছে এসে বসত। হাত রাখত বাসবীর পিঠে, তা হ'লে মা'র বুকে মুখ লুকিয়ে অশ্রুমোচন করতে করতে বাসবী অনেকটা সহজ হ'তে পারত।

কিন্তু মা এল না।

বারান্দায় অবিচ্ছেদ্য অন্ধকার। নিজের আলাদা কোন সত্তা বাসবী খুঁজে পেল না। তমসা সম্পূর্ণভাবে তাকে গ্রাস করেছে।

অনিমেষ রায় মনে মনে এখনও বেলাদেবীকে কামনা করে। তার কথাবার্তার মাঝে মাঝে এ গোপন তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বেলাদেবীকে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই বুঝি অনিমেষ বাসবীকে আহ্বান করে। দুধের পরিবর্তে ঘোল। হীরকের বদলে কাঁচখণ্ড।

এ বয়সে নারীর সঙ্গ মধুর লাগে, কিংবা হয়ত পথে-ঘাটে হঠাৎ বেলাদেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে এটুকু প্রমাণ করতে চায় অনিমেষ যে সে নিঃসঙ্গ নয়। বেলাদেবী তাকে পরিত্যাগ করেছে বলে সহবাস করার নারীর তার অভাব ঘটে নি।

কিন্তু অনিমেষের এই খেলায় বাসবীকে বাদ দিলেই পারত। ঘরে-বাইরে অহেতুক অপবাদের হাত থেকে বাসবী মুক্তি পেত।

বাসী।

মা'র কণ্ঠস্বর।

কোন এক সময় অবসন্ন বাসবী মেঝের আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছিল। ঠিক নিদ্রা নয়, তন্দ্রাচ্ছন্নতা।

মা'র ডাক কানে যেতেই বাসবী ধড়মড় করে উঠে বসল।

যাই মা।

উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু বাসবী উত্তর দিল। উত্তর না দিলে মা বারান্দায় এসে দাঁড়াত। বাসবীর গায়ে-মাথায় হাত দিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বাসবী রান্নাঘরে ফিরে দাঁড়াল।

কি রে ঘুমিয়ে পড়েছিলি ?

একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল।

মা'র প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে বাসবী থালার সামনে বসে পড়ল।

খেতে খেতেই বলল, একটা রান্নার লোক রাখলে হয় না মা ?

মা একটু অবাকই হ'ল। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে বাসবীকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। যা মাইনে পায় বাসবী তাতে সংসারের মূল চাহিদাটুকু কোনমতেই চলে। এ সব বাড়তি বিলাসিতার কথা ভাবাও যায় না।

কিন্তু মা কিছু বলল না। কি জানি বাসবীর হয়ত আরও মাইনে বেড়েছে। অফিসে পদোন্নতি হয়েছে। কিংবা আর কেউ হয়ত অনটন মেটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

কথাটা বলে বাসবীই একটু লজ্জিত হয়েছিল।

রোজ খেতে বসার সময় এমন একটা কথা তার মনে পড়ে যায়। মা'র শীর্ণ, শিরাবহুল, চোয়ালপ্রকট মুখ আর ক্লিষ্ট দেহটা দেখলেই মনে হয়, এই মানুষটাকে সংসারের ঘানি থেকে একটু বিশ্রাম দেওয়া যায় না! সংসারে কোন সাহায্যই বাসবী করতে পারে না। মাসান্তে এক মুঠো অর্থ মা'র হাতে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার অবকাশও পায় না।

কথাটাকে একটু সংশোধন করে নিয়ে বলল, এমন ত অনেক বাড়ীতে থাকে। কমাইও হাও। বাড়ীর কাজও করবে, রান্নার কাজও। অবশ্য কম মাইনের মধ্যে।

বাসবীর কথার ধরনে মা হেসে ফেলল।

তার মানে, মানুষের গরু হবে, খাবে কম, দুধ দেবে বেশী।

বাসবী হাসল।

অপ্রসন্নতার যে মেঘটা জমাট বেঁধে উঠেছিল, সেটা একটু লঘু হয়ে গেল। অবশ্য সাময়িক, এটা বাসবী খুব ভাল করেই জানে।

আমার দুঃখ ঘুচিয়ে তোর আর দরকার নেই বাসী, তুই ভাইবোনের দিকে একটু দেখ।

মা'র কথার মধ্যে বেশ প্রচ্ছন্ন এই ইঙ্গিতটুকু ছিল যে বাসবী ভাইবোনের প্রতি উদাসীন। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করতে, কথা কাটাকাটি করতে বাসবীর আর ইচ্ছা করল না। তা হ'লে শেষ যেটুকু ভাল হয়েছে, সেটুকু আবার মন হয়ে উঠবে। সে কালো মেঘের বুকে অশনি লুকিয়ে থাকাও বিচিত্র নয়।

তোমার ছেলেমেয়ের জন্য কি করতে হবে বল ?

বাসবী বেশ কমতর, তার কণ্ঠস্বরে তারই স্পর্শ।

ওদের পড়াশোনা একেবারে হচ্ছে না। আমি সামলাতে পারি না, তুইও সময় পাস না, ফলে ওদের দেখার লোক কেউ নেই। রুবির জন্য ভাবি না, কিন্তু খোকন, পুরুষমানুষ, তার লেখাপড়া শেখাটা ত একান্ত দরকার।

বাসবী হাসল। বলল, আমি সামনে বসে, আর তুমি এত বড় কথাটা বললে মা ? রুবি মেয়েমানুষ বলে তার লেখাপড়া শেখার কোন প্রয়োজন নেই। আজ যদি আমি অশিক্ষিতা হতাম মা—

বাসবীর কথা শেষ হবার আগেই মা'র গলা শোনা গেল। তীক্ষ্ণ, কম্পিত কণ্ঠ।

না বাসী, লেখাপড়া শিখে রুবির আর চাকরি করে দরকার নেই। যদি পারিস, আমি যদি ততদিন বেঁচে নাও থাকি, তুই রুবির অল্প বয়সে বিয়ে একটা দিয়ে দিস। একটা মেয়ে সংসারী হোক।

কঠিন একটা কথা মুখে এলেও বাসবী কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল। মা'র স্পন্দমান দেহের দিকে চেয়ে। মনে হ'ল মাও কান্না রোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

মাথা নীচু করে বাসবী উঠে গেল।

টেবিলে বসে সবে বাসবী ফাইলে হাত দিয়েছে, এমন সময় বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

টেলিফোন দিদিমণি একবার দেখা করতে বলেছেন।

টেলিফোন দিদিমণি অর্থাৎ রুক্সা।

কখন ? বাসবী মুখ তুলল।

তা কিছু বলেন নি। যখন হোক।

বেয়ারা সরে গেল।

আজ দিন তিনেক বাসবী রুক্সার কাছে যেতে পারছে না। ফাইলের বোঝা নিয়ে বসতে হচ্ছে। রুক্সার কাছে টিফিন করতে যাওয়া মানে, এই সমস্ত ফাইল ক্যাবিনেটে তুলে বন্ধ করতে হবে। টিফিন সেরে ফিরে এসে আবার ক্যাবিনেট খুলে সব সাজাতে হবে টেবিলের ওপর।

এ সব বাসবী নিজেই করে। বেয়ারার সাহায্য নেয় না। তাই এ ক'দিন বাসবী নিজের টেবিলেই টিফিন সেরে নিচ্ছে।

সম্ভবত সেই জন্যই রুক্সা খোঁজ নিয়েছে।

টিফিন হতেই খাবারের প্যাকেটটা হাতে করে বাসবী

বেরিয়ে পড়ল। রুমার কাছে যাবে বলে গোটা চারেক বেহাৎ দরকারী ফাইল শুধু বের করেছিল। সেগুলো তুলে রাখল।

রুমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কি ব্যাপার, মন কেমন করছে নাকি?

মন কেমন করারই ব্যাপার, তবে আমার নয়।

কি রকম?

বাসবী টেবিলের এক পাশেই বসল।

তোমার দীপক টেলিফোন করেছিলেন।

টেলিফোন? কবে?

মিনিট সেকেণ্ড বলতে পারব না, প্রায় দশটা নাগাদ।

কিন্তু আমি ত আজ দশটার আগেই এসেছি?

তা ত এসেছ, কিন্তু যেখানে থাক, সেখানে ফোনের লাইন দিই কেমন করে?

কেন? বলেই বাসবী থেমে গেল।

ফোন ত ম্যানেজার সাহেবের টেবিলে। অনিমেষ রায় নিশ্চয় দীপক গুপ্তর কণ্ঠস্বর শুনে প্রীত হচ্ছেন না। দেখা হ'লে গজকচ্ছপের যুদ্ধ বেধে যেত।

এ সব রসিকতার একটি কথাও বাসবীর কানে গেল না। বিরক্তিতে তার সারা মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

এ কি সুরু করেছে দীপক! পথে দেখা করার চেষ্টা করেছে, বাড়ীতে পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়েছে, আবার ফোনেও আলাপন আরম্ভ করেছে। বাসবীর সঙ্গে তার কি এমন কথা? এমন ভাব দেখাচ্ছে দীপক যেন দু'জনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক একটা গড়ে উঠেছে। যে জন্য আলাদা অফিসে চাকরি হ'লেও, দু'জনের যোগসূত্র এখনও অবিচ্ছেদ।

ভদ্রলোকও অবশ্য বুঝতে পারলেন।

একটু অন্যমনস্ক থাকলেও রুমার কথাটা ঠিক বাসবীর কানে গেল।

কি বুঝতে পারলেন?

আমি বললাম বাসবী সেন এখন ম্যানেজারের কামরায় বসছেন, লাইন সেখানে দেব? ভদ্রলোক দু'এক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বললেন, না, থাক।

টিফিন শেষ করে বাসবী নিজের কামরায় ফিরে এল।

দেখা করার জন্য এত ব্যাকুল কেন দীপক? সম্ভবত নিজের উন্নতির কাহিনী শোনাবে, কিংবা তার অফিসে বাসবীকে ছোটখাট একটা চাকরি দেবার একটা প্রতিশ্রুতি।

এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে।

এ ছাড়া আর যা হ'তে পারে তা মনে আসতেই বাসবী ভ্রূ কুঞ্চিত করল। দীপক হয়ত অন্তরঙ্গ হবার প্রয়াস করবে। আবোল-তাবোল কথা। পথে মেয়ে-হ্যাংলা মেয়েদের যে ধরনের কথা বলতে সবাই চেষ্টা করে। এখন দীপক বাসবী করুণাপ্রার্থী কেরাণী নয়, একটা অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সম্ভবত তার ধারণা অনিমেষকে যদি পাত্তা দেয় বাসবী, তা হ'লে তাকে অবহেলা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

কাজের ফাঁকে আর একটা কথা বাসবীর মনে এল।

অনিমেষের পাশাপাশি মোটরে যাওয়ার খবরের মতন এ খবরটাও যদি মা'র কানে পৌঁছে দেয় দীপক। অনিমেষ রায় ইদানীং বাসবীকে একেবারে নিজের আওতার মধ্যে নিয়ে এসেছে। কেরাণীকুলের তির্যক দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে শুধু নিজের দৃষ্টির পরিধির মধ্যে। বহুলোকের মাঝখানে নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী রচনা।

এ সব কথা শুনলে মা বোধ হয় বাসবীর আহরিত অন্ন আর মুখে তুলতে চাইবেন না।

মিস সেন।

বাসবী চমকে উঠল। অনিমেষের গলা।

বাসবী কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি দিন চারেকের জন্য একটু বাইরে যাব। দীঘার যে স্বাস্থ্যনিবাসটা তৈরী হচ্ছে সেটা দেখা দরকার, আর একটু বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এর পরের প্রশ্নটা বাসবী যেন আন্দাজ করতে পারল, তার সঙ্গে সঙ্গে তার একটা উত্তরও তৈরী করে রাখল। কড়া উত্তর।

অনিমেষ বোধ হয় বলবে, বাসবীও সঙ্গে চলুক। দুটো দিনের বিশ্রামের তারও প্রয়োজন। সেই সঙ্গে অফিসের কাজও হবে।

এ সব স্তোকবাক্যে বাসবী আর ভুলবে না।

কিন্তু অনিমেষ এসব কোন কথাই বলল না। শুধু বাসবীকে মনে করিয়ে দিল, আপনি ওই ফাইলগুলো সম্বন্ধে কিন্তু খুব সাবধান। ক্যাবিনেটে বন্ধ না করে কামরা ছেড়ে বের হবেন না। নিশিবাবু ছাড়া ওসব ফাইল কারও দেখবার কথা নয়, আর নিশিবাবুও এখানে বসে ফাইল দেখবেন। বাইরে নিয়ে যাবেন না। এ ক'দিন ফাইলগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ওগুলোই আমাদের জীয়নকাঠি আর মরণকাঠি।

বাসবী মাথা নীচু করে হাসল। সে হাসিতে কিছুটা বিপদমুক্তির আভাসও ছিল।

জোরে বলে সহজ সত্যটা বাসবীর মনে হ'ল।

বাসববাবুর কথাই ঠিক। বাসবীর বন্দিনীর দশা। প্রয়োজন হ'লে কাউকে ফোন করার তার যথেষ্ট অসুবিধা,

কারণ টেলিফোন অনিমেষের টেবিলের ওপর। অন্য কারও কোন কাজেও সুবিধা নেই।

এই সব কারণেই বোধ হয় অনিমেষ তাকে একেবারে নিজের চোখের সামনে রেখেছে। নজরবন্দী। যাতে দীপক তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

কথাটা ভেবে বাসবীর হাসি পেল। কেরাণী হিসাবে সে এমন কিছু বহুমূল্য নয়, যে, সে চলে গেলে এ অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু আসল ব্যাপার, রেষারেষি। অনিমেষ আর দীপকের মধ্যে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। না, আর কিছুর!

বাসবী মন ঠিক করে ফেলল। আজ বিকালে ছুটির পর সোজা দীপকের বাড়ীতে চলে যাবে। তার মুখ থেকেই কথাটা শুনে আসবে। বাসবীকে কি প্রয়োজন, যার জন্য তার বাড়ীতে, অফিসের সামনে দীপক হানা দিতে সুরু করেছে। কেমন উত্যক্ত!

টিফিনের পরে অনিমেষ আর ফিরল না। বেয়ারা বলল, সাহেব আজ রাত্রেই বাইরে যাবে, তাই গোছগাছ করবেন।

ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাসবী বেরিয়ে পড়ল। ফুটপাতে পা দিয়ে এদিকে-ওদিকে চোখ বোলাল।

না, কোন কুঞ্চিত চোখ কোথাও দেখা গেল না। দীপক হয়ত ধারণা করে নিয়েছে যে, অনিমেষ সম্পূর্ণভাবে বাসবীকে কুক্ষিগত করেছে।

অনিমেষ বোধ হয় ভাবে, বাসবীর ওপর দীপকের যথেষ্ট প্রভাব, আর দীপক যে কি ভাবে তা বাসবীর মোটেই অজানা নয়।

এটাই চেয়েছিল বাসবী। এটাই তার বাঁচবার একমাত্র উপায়। একজন আর একজনকে সন্দেহ করুক। এই সন্দেহটাই তার রক্ষাকবচ।

ট্রাম থেকে নেমেও কিছুক্ষণ বাসবী ভাবল। এভাবে উপযাচিকা হয়ে গেলে দীপকদের বাড়ীর কেউ কিছু মনে করবে না ত?

মনে করার আর কি থাকতে পারে। দীপক এসে পর্যন্ত তার খোঁজ করছে, তার বাড়ীতেও গিয়েছে, সেই জন্যই বাসবী দেখা করতে এসেছে। এটা ত সাধারণ ভদ্রতা।

দরজা ভেজানো ছিল। ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা রাস্তার ওপর এসে পড়েছে।

এবারের আলোর দ্যুতি আগের মতন স্তিমিত নয়, একটু জোরালো। দীপকের যে আর্থিক উন্নতি হয়েছে, তারই প্রতীক বোধ হয়।

কড়ার সন্ধানে বাসবী দরজার ওপর চোখ বোলাল। কোথাও কড়া নেই। একবার ভাবল দীপকবাবুর নাম ধরে ডাকবে, কিন্তু তারপরই মনে হ'ল, শহরের হট্টগোলের ওপরে নিজের কণ্ঠস্বর তুলতে পারবে, এমন ভরসা কম।

একটু এগিয়ে দরজায় করাঘাত করতে আরম্ভ করল।

কিছুক্ষণ পর ভিতর থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল, যাই।

মনে হ'ল দীপকের বোনের গলা। বাসবী অপেক্ষা করল।

দরজা ত খোলাই রয়েছে, তবে ধাক্কাধাক্কি করছ কেন? আশ্চর্য মানুষ।

দরজা খুলে যেতে দু'জনেই অবাক হ'ল।

পরণে লালপাড় শাড়ী, কপালে প্রমাণ-সাইজের সিঁদুরের টিপ। শ্যামাঙ্গী মহিলা।

বিব্রত কণ্ঠে বাসবী বলল, এখানে দীপকবাবু থাকেন না? মানে, রণজিত গুপ্ত?

মহিলা ঘাড় নাড়ল, না, আপনি যাঁদের নাম বললেন, তাঁরা বোধ হয় আগে থাকতেন, এখন মাস খানেক হ'ল আমরা আছি।

ওঃ, মাপ করবেন। নমস্কার।

দুটো হাত জোড় করে বুকের ওপর ঠেকিয়ে বাসবী নেমে দাঁড়াল।

এর পর দীপক যদি দেখা করে, তা হ'লেই তার আস্তানা সন্ধান পাওয়া সম্ভব, তা না হ'লে এই বিরাট জনাকীর্ণ শহরে দীপকের খোঁজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

রাস্তায় পা দিয়েই বাসবী দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই যে মা লক্ষ্মী।

দীপকের বাপের গলা বলেই মনে হ'ল।

বাসবী ফিরে দাঁড়াল।

অন্ধকার রকে একটি ভদ্রলোক বসে রয়েছে। বাসবী পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল।

কাছে আসতেই বুঝতে পারল। না, রণজিতবাবু নয়, অন্য একটি প্রৌঢ়।

কিছু বলছেন আমাকে?

আপনি ত রণজিতবাবুর বাড়ীতে এসেছিলেন? এর আগেও আপনাকে আসতে দেখেছি কি না। তা. ওঁরা ত কেউ নেই এখানে। দীপুর খুব ভাল চাকরি হয়েছে, অফিস থেকে বোধ হয় কোয়ার্টার পেয়েছে।

কিছুক্ষণ বাসবী চুপ করে রইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, কোথায় গিয়েছে বলতে পারেন?

প্রৌঢ় মাথা চুলকাল, আলিপুর, না নিউ আলিপুর, ঠিক কোন জায়গাটা স্মরণ করতে পারছি না। দীপু যাবার সময়

অন্নকণার বলেছে, কাকাবাবু, পায়ের ধুলো দেবেন একবার। ভারি চমৎকার ছেলে দীপু। আহা, ভগবান করুন, ও আরো উন্নতি হোক। লক্ষজনের একজন হোক।

দীপক-প্রশস্তি শোনার জন্ত বাসবী আর দাঁড়ায় না।

শুধু মাইনেই বেড়েছে এমন নয়, অফিস থেকে অভিজাত-এলাকায় কোয়ার্টারও দিয়েছে দীপককে। সেই জন্তই বোধ হয় দীপক এত ছোটাছুটি করছে বাসবীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করার জন্ত।

দীপকের দারিদ্র্য-জর্জর, দুঃখ-দীর্ণ হতশ্রী সংসারের রূপ বাসবী দেখেছে, সেইজন্তই দীপক তাকে পরিচ্ছন্ন, নূতন সংসারে নিয়ে যেতে চায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বাসবীর বুক চিরে। এমন একটা পরিচ্ছন্ন সংসারের স্বপ্ন বাসবীর অনেক দিনের। কলেজ জীবনে দু'-একজন ধনী সহপাঠিনীর বাড়ীতে যে রুচি আর সৌন্দর্যের বিকাশ দেখেছিল, ততটা না হ'লেও, বেশ ছিমছাম একটি সংসার। কোথাও দারিদ্র্যের ক্ষত থাকবে না, অনটনের জ্বালা।

এমন একটা সংসার বাসবী কবে পাবে! কতদিন পরে!

দিন দিন করে মাইনের অঙ্ক হয়ত বাড়বে, কিন্তু সেটা সংসারের অগ্রাসনের কাছে আর কতটুকু। মরুভূমিতে বারিবিন্দুর মতন পলকে নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

সেই সঙ্গে সংসারের ক্ষুধাও বাড়বে। রুবি আর খোকনের দাবি। মা'র শরীর জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হবে। তার জন্ত ডাক্তারের খরচ। ওষুধ, পথ্য।

বাসবীও চিরদিন এমন যৌবনবতী থাকবে না। তার শরীরেও ভাঙন ধরবে।

কিন্তু তবু সংসারের নাগপাশ থেকে স্বচ্ছন্দমুক্তির কোন আশা নেই।

পরের দিন কাজরা বাদি। অনিমেষ নেই। বাসবী একেবারে একলা।

যার হুকুম কাজের ছুতোয় নিশিবাবু এসেছিল। সোটা চুরেক কাইল টেনে নিয়ে জরুরী কি সব লিখে নিয়ে ওঠবার সময় হাসতে হাসতে বলেছিল, দিন গেল, আর এ টেবিলে কেন, এদিকের টেবিলে এসে বসুন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছুটিতে, ম্যানেজার ট্যুরে, ওখানে বসবার হক ত আপনার।

বাসবী নির্বোধ নয় যে, বুঝতে পারেনি, সব জেনেই বলেছে, আশীর্বাদ করুন, ওই জোরেই যেন বসতে পারি। একটা অফিসের ম্যানেজার হবার সাধ আমার অনেক দিনের।

নিশিবাবু একটি কথা না বলে আস্তে আস্তে কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাসবী বসে বসে চুপচাপ ভেবেছে। দু'টো দিন ত অনিমেষ ঘরে থাকবে না। এই সময় অনায়াসেই দীপকের কোন আসতে পারত। তা হ'লে কোন বাধা নেই, সোজা অনিমেষের টেবিলে গিয়ে বাসবী কোন তুলে ধরে কথা বলতে পারত।

আর কিছু নয়। দীপক কি বলতে চায় সেটাই বাসবীর জানবার আগ্রহ। তার ঐশ্বর্যের জাঁক-জমকের কতটা অংশ প্রকাশ করতে চায়, সেটাই শুধু শুনতে চায় বাসবী।

ম্যানেজার না থাকলে কাজও কম থাকে। সারাদিন বাসবী প্রায় বসেই রইল। মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে রাস্তায় জনস্রোত দেখল। একবার ভাবল অফিসের মধ্যে একটু ঘুরে আসবে। সহকর্মীদের সঙ্গে দু'-একটা কথা, কিন্তু নিশিবাবুর ভয়ে পারল না।

কিছু বলা যায় না, দেখা হ'লেই নিশিবাবু হয়ত বলবে, একটা দরকারী কাইলের জন্ত আপনার কাছে এসেছিলাম, দেখলাম আপনি অফিসের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ফিরে গেলাম। কাজটা জরুরী ছিল, একটু দেরি হয়ে গেল।

বাসবী চুপচাপ বসে রইল। নিশিবাবুকে এ ধরনের কথা বলবার কোন সুযোগ সে দেবে না। টিফিনও করবে, এই টেবিলে বসে।

নিজের ভ্যানিটিব্যাগটা এক সময়ে উপুড় করে দেখল, হাতে বেশ কিছু রয়েছে। টিউশনির টাকাটা মাত্র কাল পেয়েছে। তা থেকে একটি পয়সাও খরচ হয় নি।

মনে মনে বাসবী ভেবে নিল। আজ অফিসের পরে উত্তর কলকাতা যাবে। কাগজে দেখেছিল কোন এক দোকানে খুব সস্তায় ছেলেমেয়েদের জামা-ফ্রক বিক্রি হচ্ছে। হরেক রকমের ছিট। রুবি আর খোকনের জন্ত কিছু কিনে আনতে হবে।

দোকানে বেশ ভীড়। অফিস-ফেরত ভদ্রলোক ভদ্র-মহিলা সবাই আছে। বাসবী রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল। উদ্দেশ্য, ভীড়টা একটু কমলে ভিতরে ঢুকবে।

কি মা-লক্ষ্মী, এখানে দাঁড়িয়ে?

গলার আওয়াজে চমকে বাসবী ফিরে দাঁড়াল।

মহীতোষবাবু। হাতে একটা থলি। তার মধ্য থেকে আনাজপাতি দেখা যাচ্ছে। তার মানে অফিস থেকে ফেরার পথে কুটপাথে বাজার সেরে নিয়েছে।

দোকানে একটু যাব।

দক্ষিণ পাড়া থেকে একেবারে উত্তর পাড়ায়? তা, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

ভীড় একটু কমলে ঢোকবার চেষ্টা করব।

মহীতোষবাবু উচ্চহাস্য করে উঠল।

তা হ'লে আজ আর দোকানে ঢোকা হবে না। যত রাত হবে, তত ভীড় বাড়বে। অনেকেই অফিস থেকে বাড়ী গিয়ে আবার বের হবে।

তা হ'লে?

এস মা-লক্ষ্মী আমার সঙ্গে এস। কি কিনবে বল?

একটা ছোটদের ফ্রক আর কিছু ছিট।

মহীতোষবাবু একটু ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। বাসবী তার পিছন পিছন।

একজন কর্মচারী বোধ হয় আশা ছিল মহীতোষবাবুর।

তাকে ডেকে মহীতোষবাবু বলল, তারিণী, একবার এদিকে শোন ভাই।

তারিণী এক খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করে বাসবীর সামনে এসে দাঁড়াল।

বাসবী বিশেষ বাছাবাছি করল না। দরদস্তরও নয়।

কচির জন্য একটা ফ্রক, খোকনের একটা প্যান্ট আর সেমিজের জন্য কিছু কাপড়।

সওদা শেষ করে বাসবী পথে পা দিতেই, মহীতোষবাবু আসল কথাটা বলল।

এত কাছে এসে ফিরে গেলে ত চলবে না।

বাসবী বিস্মিত দু'টি চোখের দৃষ্টি তুলে দেখল।

পাশের গলিতেই আমার বাড়ী, মনে নেই বুঝি? মায়া যদি শোনে তুমি এত কাছ থেকে ফিরে গেছ, তা হ'লে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে।

দু'এক মুহূর্ত বাসবী ভাবল। এই একটি লোকের সান্নিধ্য তার ভাল লাগে। এই লোকটির সংসারে গিয়ে দাঁড়াবার এক তীব্র আকর্ষণও অনুভব করে। মাত্র একদিন গিয়েছিল। তার পরে আবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল, কিন্তু আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

আমি কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে পারব না। আমাকে অনেকটা পথ যেতে হবে।

মহীতোষবাবু কোন উত্তর দিল না। বাসবীর পাশে পাশে চলতে আরম্ভ করল।

মহীতোষবাবু কড়া নাড়তে চৈতন্য দরজা খুলে দিল। উঁকি দিয়ে মহীতোষবাবুর পিছনে বাসবীকে দেখতে পেয়ে এক গাল হেসে বলল, বাবাঃ, দিদিমণির এতদিন পরে মনে পড়ল।

মহীতোষবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, কই গো, কোথায় গেলে? কে এসেছে দেখ।

মায়া ভিতরের ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। মাথার ঘোমটা পিঠের ওপর। চুলগুলো চূড়া করে বাঁধা। মনে হ'ল রান্না করতে করতে আর্তির তাকে বুঝি এসে দাঁড়িয়েছে।

বাসবীকে দেখেই একটা হাত গালে দিল।

ও মা, আজ কোন্ দিকে সূর্য উঠেছে! তুমি পথ ভুলে নিয়ে এলে বুঝি?

প্রশ্নটা মহীতোষবাবুকে লক্ষ্য করে।

মহীতোষবাবু একটা চেয়ার টেনে দিয়ে বলল, বস মা, বস।

মায়া বাধা দিল, বাইরের ঘরে বসতে যাবে কোন্ দুঃখে? এস, ঘরের ভিতর এস। চৈতন্য, তুই ততক্ষণ রান্নাঘরে তরকারিটা একটু দেখ গিয়ে। ওগো শোন।

মায়া মহীতোষবাবুকে এক কোণে ডাকল।

ততক্ষণে পর্দা সরিয়ে বাসবী শোবার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'টি মাত্র মানুষের সংসার। দু'জনেই অমায়িক। কাজেই বাসবীর মনে কোন দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই।

শোবার ঘরে পা দিয়েই বাসবী কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

খাটের ওপর একটি শিশু ঘুমোচ্ছে। একটা হাত বুকের ওপর।

বাসবী পিছন ফিরে দেখতেই কৌতুকোজ্জ্বল দু'টি দৃষ্টির সাক্ষাৎ মিলল। মায়ার মুখে প্রশান্ত হাসির আভা।

এটি কার?

কেন, আমার। মায়ার মুখের হাসি অম্লান।

বাসবী একটু অপ্রস্তুত হ'ল। মায়ার যে বয়স এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শিশুর যা বয়স তাতে মায়ার সন্তান হ'লে বিবাহ-বার্ষিকীতেই বাসবী জানতে পারত।

খুব সম্ভব বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন কেউ এসেছে।

কি, বিশ্বাস হ'ল না বুঝি?

মায়া আর একটু সরে একটা হাত বাসবীর কাঁধের ওপর রাখল।

বাসবী মাথা নাড়ল, না, বিশ্বাস কি করে হবে?

কুড়িয়ে পেয়েছি। সবাই ফেলে চলে গিয়েছিল, আমি কুড়িয়ে নিয়েছি। পথের ধুলো থেকে যে বুকে তুলে নেয়, সন্তান ত তারই।

বিদ্যুৎ চমকের একটা রেখা বাসবীর মনের আকাশে

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, কিন্তু কথাটা কিছুতেই সে প্রকাশ করতে পারল না।

যে কথাটা বাসবীর ওষ্ঠপ্রান্তে এসেও থেমে গেল, সেই কথাটাই রাধা বলল।

প্রীতির ছেলে।

প্রীতির ?

হ্যাঁ, বিভাসবাবুর। প্রীতি মারা গেল। বিভাসবাবুও দেশ ছেড়ে পালালেন। ছেলেটা তাদের পাশের বাড়ীর ভাড়াটের বাড়ী পড়েছিল তারা রাখতে রাজী হ'ল না। তোমাদের অফিসের সবাই ঠিক করল, ছেলেটাকে অনাথ আশ্রমে দেবে। আমি ওকে বললাম, তার চেয়ে ছেলেটাকে আমার এনে দাও, আমি মানুষ করব। ভগবান ত কোলে কিছু পাঠালেন না, হাতের কাছে যাকে দিলেন, তাকেই বুকে তুলে নিই। সেই থেকেই ছেলেটা আমার কাছে আছে।

কথাগুলো বলতে বলতে রাধার দু'টি চোখ জলে ভরে এল, বাষ্পাচ্ছন্ন হ'ল কণ্ঠ।

অনুভবে বাসবী বুঝতে পারল তার দুটো চোখও শুষ্ক নেই। একটা আবেগ কুণ্ডলী পাকিয়ে গলার কাছে ঠেলে আসছে। এই মুহূর্তে কোন কথা সে বলতে পারবে না। পৃথিবীতে কতকগুলো কথা-না বলার মুহূর্ত আসে। যখন চুপ করে এক মহিমময় রূপ শুধু প্রত্যক্ষ করতে হয়।

রাধার দিক থেকে বাসবী শিশুর দিকে চোখ ফেরাল। ঘুমন্ত অবস্থায় শিশু হাসছে। ওর স্বপ্নের ভুবন বুঝি বাস্তব ধরিত্রীর মতন এমন কঠিন, এমন নির্মম নয়।

কিন্তু একদিন বিভাসবাবু যদি ফিরে এসে সন্তানকে দাবী করেন ?

থেমে থেমে, খুব মৃদু কণ্ঠে বাসবী জিজ্ঞাসা করল।

মনে হ'ল রাধা একবার যেন শিউরে উঠল, সেই ভাবনা নিজের কল্পনা করে। তারপর একটু একটু করে সামলে নিল নিজেকে, যদি বিভাসবাবু মানুষের মতন হয়ে ফিরেই আসেন কোনদিন, ছেলেকে ফিরে চান, তা হ'লে তার ছেলেকে তার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে বৈ কি। আইন স্নেহের চেয়ে অনেক বড়। তার দাবি আগে মানতে হবে।

কিন্তু তবু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না বাসবীর। ছেলেটা অনাথ আশ্রমে মানুষ হ'ত, এটা ভাবতেই অসহ্য লাগছিল।

কই গো। পর্দার ওপার থেকে সন্তোষবাবুর গলার স্বর শোনা গেল।

রাধা সরে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বাসবী নীচু হয়ে তার দুটো পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল রাধা, একি, এ কি, তোমরা লেখাপড়া জানা মেয়ে, আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম কেন না ?

বাসবী হাসতে হাসতে বলল, আপনার মধ্য দিয়ে জগতের সব মাকে প্রণাম জানালাম।

রাধা একটা হাত রাখল বাসবীর মাথায়। বলল, কি বলে আশীর্বাদ করব বল ? একটি টুকটুকে বর হোক।

না, না, বাসবী বাধা দিল, আশীর্বাদ করুন, যেন অফিসের ম্যানেজার হ'তে পারি। গাড়ি, বাড়ী, দারিদ্র্য রাক্ষসীটা ধারে-কাছে ঘেঁষতে না পারে।

রাধা চুপ করে রইল, কিন্তু পর্দার ওপার থেকে সন্তোষবাবুর দরাজ গলার হাসির শব্দ শোনা গেল।

কিছুতেই ছাড়ল না। রাধা আর সন্তোষবাবু দুজনেই অনেক পীড়াপীড়ি করল রাতের আহারটা করে যাবার জন্য। বাসবী অনেক কষ্টে অনুরোধ কাটাল। তবে চা সহযোগে জল-খাবারের যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, তারপর বাড়ী গিয়ে বাসবী আদৌ কিছু মুখে তুলতে পারবে কি না, সে বিষয়ে তার ঘোরতর সন্দেহ ছিল।

বিভাসবাবুর ছেলেকে বুকে নিয়ে কিছুক্ষণ আদর করে বাসবী বেরিয়ে পড়ল। সন্তোষবাবু ছাড়ল না। চৌরাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল।

সারাটা পথ বাসবী ভাবতে ভাবতে চলল, বিচিত্র এই পৃথিবী। কার আত্মজ কার অপত্য ধারায় স্নান করে মানুষ হয়ে ওঠে বলা দুষ্কর। বিরাট এক চক্রান্ত চলেছে দুনিয়া জুড়ে। আগে থেকে কোন ঘটনার সম্বন্ধেই সঠিক কিছু বলা যায় না। আমরা সবাই ভাগ্যের ক্রীড়নক। অদৃশ্য হাতের খেলার পুতুল। (ক্রমশঃ)

একটি শীর্ষ সম্মেলনে (আড়ি পেতে)

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

কৈলাস পর্বত। সন্ধ্যা আসন্ন।

চারদিকের তুষারশীর্ষ পাহাড়ের শিখরে শিখরে অস্তমান সূর্য আলোর সোনা ঢেলে দিয়েছেন।

কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী দাঁড়িয়ে সেই শোভা দেখছেন। অদূরে ভৃঙ্গি দাঁড়িয়ে দৌবারিকের দণ্ড হাতে নিয়ে। অন্য একদিকে নন্দী একটি উদূখলে সিদ্ধি কুটছিল। প্রাসাদ অভ্যন্তরে মহাদেব নিমীলিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন। নিকটে পার্বতী 'ঠাণ্ডাই' (দুধ চিনিতে বাদাম পেস্তা বাটা মিশ্রিত সিদ্ধির অনুপান বিশেষ) তৈরী করছেন।

সন্ধ্যাকাশ দেখতে দেখতে সিদ্ধিদাতা গণেশজী বললেন. "এই গুলো যদি সত্যি সোনা হ'ত তা হ'লে আর আর ভারতের অর্থমন্ত্রীকে কালোবাজারীদের এত খোসামোদ তোয়াজ করতে হ'ত না।...ওদের ঘরে কি কম সোনা আছে।" মৃদুহেসে শ্রীঐশ্বর্যদাত্রীকমলাসনা লক্ষ্মী বললেন, 'তা আছে কম নয়। লক্ষ্মীপুজোর দিন যখন এক-আধবার লোহার সিন্দুক-আলমারিগুলো খোলে দু'একখানা সোনা-সিকি আমার ঝাঁপিতে দেবার জন্যে। দেখতে পাই ত একটু —তা বেশ আছে।'

গণেশ বললেন, 'তা কত মণ মানে এখনকার ওজন কত কুইন্টাল না কি বলে —তাই হবে?' দেবসেনাপতি কার্তিক বললেন, 'যতই হোক তা, ভারত রক্ষা ত শুধু সোনার কর্ম নয়। সোনার সঙ্গে সৈন্য চাই। বীর চাই।'

জ্ঞানবিদ্যাদেবী সরস্বতী বললেন, 'তা ঠিকই, শুধু মানুষের বীরত্বেও এ কাজে কিছু হবে না। বৈজ্ঞানিক বিদ্যা চাই। দেখছ না, রাশিয়া আমেরিকা এমন কি চীনও পরমাণু বোমা নিয়ে কি ভয় না দেখাচ্ছে। কে জানে একদিনে যে কোনো দেশকে হিরোশিমা বানিয়ে দেবে কে কোন্ সময়ে।'

সহসা আকাশমার্গে কি একটা শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল আর সঙ্গে একটা না দুটো বিরাট ছায়া।

সকলে উৎকর্ণ হয়ে আকাশের দিকে চাইলেন।

লক্ষ্মী সরস্বতী বললেন, 'কত বড় ছায়া দাদা দেখ।'

কার্তিক গণেশ বললেন, 'ওটা কিসের—প্লেনের? কাদের প্লেন হবে?'

ভেতর থেকে মহাদেবও বললেন, 'নন্দী দেখ ত আকাশ এখনই অন্ধকার হ'ল কেন! সোঁ সোঁ শব্দই কিসের?'

দেখে গিয়ে নন্দী মহাদেবকে বললেন, 'বাবা, ওটা গরুড়ের আর হাঁসের ডানার আওয়াজ।'

ছেলেমেয়েদেরও বললেন, 'ওই ছায়া ওদেরই ডানার ছায়া।' এরোপ্লেন নয়।'

অন্ধকার ছায়াটা কৈলাসের বিস্তৃত উপত্যকা প্রাঙ্গণে নামল। দেখা গেল অন্ধকার দুটো।

একটা থেকে চতুর্ভুজ অন্যটা থেকে চতুর্মুখ অর্থাৎ নারায়ণ আর ব্রহ্মা নেমে এলেন।

এগিয়ে এসে নন্দীকে বললেন দেবদেব শঙ্করকে 'এত্তেলা' দাও আমরা এসেছি। একটা খুব জরুরী শীর্ষসম্মেলন হওয়া দরকার এখনি।

লক্ষ্মী বিষ্ণুকে দেখে একটু সলজ্জে মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন।

কার্তিক গণেশ সরস্বতী সসম্ভ্রমে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এলেন।

আকস্মিক ব্রহ্মা বিষ্ণুর সমাগমে মহেশ্বর বিস্মিত হয়েছিলেন। সসম্ভ্রমে বললেন, আসুন পিতামহ, আসুন, বসুন নারায়ণ। নন্দীকে বললেন পাদ্য অর্ঘ দিতে। অজিন আসন দিতে। পার্বতীর দিকে একবার চাইলেন অর্থাৎ 'পানীয়' দিও।

অতঃপর সকলে আসন গ্রহণ করলেন। পার্বতী পানীয় পরিবেশন করলেন।

বিষ্ণু আর ব্রহ্মা সেটা কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'এখন অসময়ে সিদ্ধি চলবে না। বেশ কিছু জরুরী পরামর্শ আছে।'

শঙ্কর একটু হেসে একটি দুধের চুমুকেই সেটি নিঃশেষ করে বললেন, 'তথাস্তু। কি ব্যাপার বলুন। উনিও শুনবেন না কি?'

ব্রহ্মা বললেন, হ্যাঁ, দেবীও বসুন। কিন্তু বিষ্ণুই বলুন কথা আগে। সমস্যাটা ওঁরই।'

বিষ্ণু বললেন, 'অনেকটা তাই দাঁড়িয়েছে বটে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি—সৃষ্টিকর্তা ত সৃজন করে চলেছেন তাঁর নিয়ম অনুসারে, মহেশ্বরও তাঁর নির্দিষ্ট রেটেই বিধাতার নিয়মেই ধ্বংস করে থাকেন। একটা অঙ্ক-অনুসারে সব চলে বিশ্বে, জানেন ত। এখন বিপদ হয়েছে আমার। সব বেশ ঠিকই চলছিল। হয়েছে কি পৃথিবীর মনুষ্য-সমাজ যেভাবে সভ্য আর বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠছে দিন দিন। দান ধর্ম কর্মের লেকেদের ধরণ আর নেই। সমাজ ও সভ্যতা দ্রুত বদলাচ্ছে। বড় বড় লোকেরা যত ধনী হচ্ছে ততই তাদের দেশে দেশে বিলাসের প্রয়োজনে আয়োজন উপকরণ ও ভোগ-ভবন গড়ে উঠছে। তারই উপকরণ বানাবার কর্মশালা নির্মাণের আয়োজনে আর প্রমোদ ও প্রয়োজন নিবাসের উদ্যোগে পৃথিবীতে আর খালি মাটি ক্ষেত-খামারের গোচারণের ভূঁড়ে মরের মানুষের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না। খাবারও যাচ্ছে না। সমস্ত সোনা-রূপো তাদের হাতে, কাজেই রাজ্য সরকারও তাদের মুঠোতে। কিছু কাগজ ছাপা দিয়ে তারা বিনিময় মুদ্রা বানিয়েছে।

বাকি উদ্বৃত্ত জমিতে যেখানে যা' খাদ্য উৎপন্ন হয় ধনীরা কিনে নিয়ে খেয়ে ফেলে। আমার যা সৃষ্টি ও খাদ্য উদ্বৃত্ত হয় তাতে দরিদ্রের 'একাদশ' হয়কি না সন্দেহ। তাও মোটা দরে শেঠ বণিকরা বেচে।

অথচ চতুর্মুখ পুরোনো রেটেই সৃজন করে চলেছেন। আপনিও মাত্র পূর্বের নির্ধারিত রেটেই ধ্বংস করেন। অবশ্য মাঝে মাঝে মারী মহামারী যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটায় বটে; কিন্তু তাতে আমার পালনের সমস্যা আর মেটে না।

এখন আমি প্রজা পালন করি কি দিয়ে?

বিষ্ণু পদত্যাগপত্র পেশ করলেন পশুপতির কাছে।

অবশ্য চতুর্মুখ আর পঞ্চমুখ তা গ্রহণ করলেন না।

চতুর্মুখ মৃদু হেসে বললেন, 'বুঝিন কি জানেন, আমাদেরও ত আবার মহাপ্রলয় না হওয়া অবধি বিধাতার বিধানকে অতিক্রম করবার উপায় নেই। কি করে দেখা'বেন! কি করে বিষ্ণুর আপনার রেজিগ্‌নেশন পত্র গ্রহণ করি।'

মহেশ্বর চিন্তিত। বললেন, আমারও সেই বিধান অনুসারেই কাজ করতে হবে। বেশী ধ্বংস করার উপায় নেই। বড়জোর এক আধটা 'খণ্ডপ্রলয়ের' ব্যবস্থা দিতে পারি। মহাপ্রলয়ের এখনো কত দেরি আছে পদ্মযোনি?'

ব্রহ্মা। 'এই ত মোটে কলির অপরাহ্ণ দেখা দিয়েছে।'

বিষ্ণু। 'তা হ'লে!

পার্বতীকে বিদায়ে নিমন্ত্রণে যেতে যোগ দেবার কথা নেই। তাই পার্বতী একটু দূরেই বসেছিলেন। তিনি ব্রহ্মার মানসী ঘাতীর। ব্রহ্মাপুত্র দক্ষ দুহিতা সতীর সতীত্ব সম্পর্কে।

ব্রহ্মা বললেন, 'বাছা তুমি ত প্রায়ই পৃথিবীতে পার্বণ পূজা উপলক্ষ্যে ঘুরে আস। এবার কি রকম বুঝলে। দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী বাসন্তীরূপে যাও ত;' উমা আহ্বান শুনে এগিয়ে এসে বললেন, 'পৃথিবীর সবটা ঘুরি নি পিতা-মহ। তবে যা' দেখলাম, তাতে মনে হ'ল সমস্ত পৃথিবীই আমেরিকার মত হয়ে আছে। অর্থাৎ পূর্বাভাস। ভারতের দরিদ্র সমাজ প্রায় নিঃস্ব। ভগবান বিষ্ণুর তাদের পালনের ভাবনা বেশী দিন ভাবার প্রয়োজন হবে না। শীঘ্রই অনশনে মরবে। যুদ্ধে মৃত্যুতেও অনেকটা কিছু বোধ হয় কমবে। কেননা বড় বড় শক্তিরা সকলেই পরমাণু (ব্রহ্মাস্ত্র) বোমা তৈরী করছে।'

তিন দেবতা নীরব। পার্বতী রন্ধনশালায় অতিথি সৎকারের আয়োজনে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে মহেশ্বর বললেন, 'এ বিষয়ে যমের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখলে বোধ হয় কিছু উপায় তিনি দেখাতে পারবেন। আমি ত নির্দেশ দিই মাত্র। কাজকর্ম ত তিনিই করেন।'

চতুর্মুখ আর নারায়ণ দু'জনেই সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়। সেই ঠিক হবে।'

ব্রহ্মা বললেন, 'তবে একবার কলিকেও আহ্বান করতে হয়। এই যুগটা ত তাঁরই অধিকারে দেওয়া গেছে! তিনিই এখন যুগাধিপতি সম্রাট। দুর্নীতিপরতান্ত্রিক শাস্ত্র বা আইন অনুসারে তাঁকে উপেক্ষা করা যাবে না, করলেও ফল হবে না। বিধাতার নিয়ম কঠোর।'

ব্রহ্মা বিষ্ণু জানেন কলিরাজার প্রতাপ। একটু হাসলেন, বললেন, 'সত্য বলেছেন।'

মহেশ্বর নন্দীকে আদেশ করলেন যমালয়ে আর কলির প্রাসাদে দূত পাঠাতে।'

কিয়ৎকালের মধ্যেই একটি ঘোর কালো রং বিপুল বাঁকা শৃঙ্গ বিশালকায় মহিষে চড়ে ধর্মরাজ যম কৈলাসে এসে নামলেন।

মহিষের গর্জন আর শৃঙ্গ আস্ফালন দেখে মহাদেবের বৃষরাজও ভয় পেয়ে লেজ নেড়ে। তার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ দূরে একটি প্রকাণ্ড বড় দেবদারুতে মহিষটিকে বেঁধে দিল বমদূত সহিসরা।

বৃহস্পতি বলতে যেখান যত কালো সবচেয়ে কান্তিক গণেশরা কৈলাসের পাহাড়ের নানা আড়াল থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগলেন।

প্রথম বিয়ের পর এই ধবলকে নিয়ে ভারি বিপদে পড়েছিল দেবী। মন্টুর ছুটির দিনে মন্টু চাইত দেবী তার কাছে দুপুরে থাক, কিন্তু কুইন তাকে আটকে রাখত। মন্টু বলত তোমার কুইনকে অত মাথায় কি দরকার। দেবী বলতে পারত না যে, তুমি যে থাম সেই মতে। রাগ ভুলে দেবীকে গালাগাল দিত কুইন, আর মেয়েকে দেখিয়ে বলত ভারি ত মেয়ে! ঐ মেয়ে হয়েছে মাথার মণি, ও মেয়ে তোমার বাঁচবে না। এটা ছিল বিউটির আর কুইনের মুখের বুলি। রুগ্ন মেয়ের অমঙ্গলের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠত দেবী। তাইতে তার ভারি আমোদ ছিল। যাক যে কথা বলছিলাম। কুইন আটকে রাখত দেবীকে আর বিউটি মন্টুর বিছানায় বসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলত "একেই বলে হতকো বৌ, এরা বরের কাছে যেতে চায় না। আমি ত আর কিছুই চাই না ওর কাছে, শুধু চাই তোকে সুখী করুক। কিন্তু ওর মন ওঠে নি তোকে পেয়ে, তোকেই যদি ভালো না বাসল ও আর আমার কি কাজে লাগবে? নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিস বলার ত কিছু নেই! খাঁটী কি জিনিষ তাই চিনল না! তুই ভাল মানুষ তাই। অন্য ছেলে হলে ওকে ঘরে ঢুকতে দিত না! তুই ভাবিস নি, বয়েস হলে সব সেরে যাবে। তবে ওর যা বদ-মেজাজ, ও মেজাজ থাকলে আর রক্ষা নেই! তখন কিছুতেই সামলাতে পারবি না।

কথাগুলি মন্ত্রের মত কাজ করে। একবারও মন্টু ভাবে না বিউটি যে খাটে বসে আছে তাতে দেবী শুতে আসবে কি করে? বিউটি উঠতে না উঠতে দড়াম করে দরজায় খিল লাগিয়ে দেয়। দিয়ে বন্ধু কেষ্টপদকে চিঠি লিখতে বসে, "এ কি বিষবৃক্ষ রোপণ করলাম! তোমার কথাই ঠিক বন্ধু, ও আমায় চায় না। কুইনকে পেলেই ও মহাখুশী। তার ওপর ভীষণ বদ-মেজাজী। মা বলে, ওকে সামলান দায় হবে।" এই বদ কথাটা বিউটি বা মন্টুর সব কথার সঙ্গে যুক্ত করা ছিল। এরা রাগী বলত না, বলত বদমেজাজী; বোকা বলত না, বলত বদবোকা। মন্টু অত্যন্ত রাশ-হালকা মানুষ। বিউটি তাকে যা করায় সে তাই করে। কুইনের সে বহুপালিত পুতুল। শুধু রাগটার্ট সে দেবীর বেলায়। তাকে তার আরাধ্যা মা বলেছে দেখি

বটে বোনের জেঠো যেন হ'লনে। হয়েছিল কি মরেছিল। মধু কেষ্টপদও বারবার বলেছে, দেখ ভাই, যা কর তা কর, পরিবারের কথামত চল না। এই দু'জনের কথায় গভীর আত্মসমর্পণ ছিল নটুর। কাজেই দেবীর কথা প্রাণপণে না শোনায় সে যত্ন নিয়েছিল। অতি সাধারণ বুদ্ধিতেও স্বামী-স্ত্রীর যে একস্বার্থ এটা বিশ্বাস করত না নটু। এ ছাড়া পরামর্শদাতা ছিল নীতিহীন, চরিত্রহীন মামার বাড়ীর দল। যেমন রবিবার হ'লেই তাকে মাসীর বাড়ী যেতে হবে চুল কাটতে। তারপর মাসী তাকে আটকে রেখে পকেটটি খালি করে নেবে আর যত কিছু কুবুদ্ধি তার মাথায় ঢোকাবে বিউটির নির্দেশ মত। মাসীর মেজরের মত চুলকাটার দোকান না কি আর ত্রিভুবনে নেই। দেবী চিরকালই অত্যন্ত গভীর স্বভাবের মানুষ। নটুর কাছে সে কথা দিয়েছিল যে সে তার মাকে সুখী করবে। সে বিষয় তার চেষ্টার অন্ত ছিল না। সব বিষয়েই এ বাড়ীতে ধৈর্যের পরীক্ষা। ঐ একটি কিশোরী মেয়ের পিছনে সাত সাতটা পাকা মাথা সপ্তরথীর মত তাকে আক্রমণ করেছিল। তা থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ কথা নয়। বিউটি, বিউটির বিধবা বোন, মা, দিদি, রুবীন আর বিউটির ছোট মেয়ে মেরী। এই সাতজনই যথেষ্ট। তার ওপর নটুকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে বিউটি ক্ষতবিক্ষত করত দেবীকে। দেবী ভাবে কারুর দোষ নেই। দোষ দেবীর নিজের। দেবী নিরুপায়, দেবী অসহায়, কোন উপায় নেই কিছু করার। দেবীর মনের শক্তর সঙ্গে এদের মন মেলাবার উপায় নেই। এইত সেদিন বাড়ীতে হৈ হৈ কাণ্ড। বিউটির মাকে বিউটির ভাই না কি বিষ খাওয়াতে গিয়েছিল। সাটা চোখ ঘুরিয়ে ভাঁটাপানা মাথা নেড়ে বিউটির মা বলল দেবীকে, দেখ দিকি নাতবৌ, ছেলের কাণ্ড, মস্ত বড় একখানি সন্দেশ এনে দিয়ে খায় হাফ। তাই আমি বললাম, হ্যাঁরে ভালো সন্দেশ? কোথা থেকে কিনিস? এ বাজে অমন সন্দেশ ত দেখি নি। তাতে বললে, আমাদের আপিসের কাছে বিক্রি করে, তুমি খাবে? কাল বলা নেই কওয়া নেই সেই সন্দেশ এনে হাজির। আমার তবুদি সন্দ হয়েছে। দিয়ে পাঁচের পয়সা খরচ করে আমায় সন্দেশ খাওয়ানোর ছেলে ত হাফ নয়! আমি সেই সন্দেশ দিলাম মেজো ঝিকে। মেজো ঝিও কি ভাবলে কে জানে! খেলে না। দিলে বেড়ালটাকে। বললে বিশ্বাস করবে না নাতবৌ, বেড়ালটা ধড়ফড়িয়ে মরে গেল। দেখ দিকি কাণ্ড, যদি ঐ সন্দেশ খেতুম আমি? দেবীর মনে হয় ছেলে যদি মাকে বিষ দিতে পারে সে বিষ খেয়ে মরাই তার ভালো। মুখে কিছু বলে না বিউটির মা। আস্ফালন করেন ওর নামে কেস করব আমি। ওকে জেলে দেব, ঘানি টানাবো—দেখাব বিষ খাওয়ানোর মজা। বড় সস্তা পেয়েছে বিষ, অমনি খাওয়ালেই হ'ল? দেবী আর শুনতে পারে না। সারাদিন বাড়ীময় এই সব আলোচনা। যাদের দেহে শক্তি আছে, তারা নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে যা খুশী করে যাচ্ছে। যাদের শক্তি নেই তারা কবে কি করেছে, এই চর্বিতচর্বণ ও তুক-তাক নিয়েই আছে। এদের মধ্যে দেবী গোত্র ছাড়া। কে কার ঘরে নিশি লাগাচ্ছে, কে কার কুশপুত্তলিকা দাহ করছে—তন্ত্র-মন্ত্রে এদের সাংঘাতিক বিশ্বাস। দেবীর মনে-প্রাণে এসব বিশ্বাস নেই তবুও এক এক সময় কেমন মনে হয়। মাদুরে বসতে গেলে এরা থুতু ফেলে মাদুর পাতে। দেবীর গা ঘিন ঘিন করে সে মাদুরে বসতে। চুল আঁচড়ে চুল ফেলতে গেলে তাতে থুতু দিতে হবে। ফেরিওলা এসে চলে গেলে থুতু ফেলে তার চারপাশে ঘুরতে হবে। তা হ'লে সে ফেরিওলাকে না কি ফিরে আসতেই হবে জিনিষ দিতে। মাদুরে থুতু দিলে কি হয় তা অবিশ্যি দেবী জানে না, জিগ্যেসও করে নি। তার শোবার সময় কখনও পায় বেড়ালের লোম একগোছা, কখনও পায় মুখ-না-কাটা ডাব—তার গায়ে আঁকিবুকি কাটা। কখনও পায় একগোছা শণের নুড়ি—সিঁদুর-মাখা কখনও বা হাড়ের টুকরোতে বড়ির মালা পরান।

১০

এই সময় ন'মাসীর টাইফয়েড হ'ল। তখনকার দিনের টাইফয়েড। তবে ন'মাসীর শ্বশুর এখন বেঁচে নেই, খিমর্দন বাড়ীর কর্তা। কাজেই মামার অসুখে যত্নের অভাব হ'ল না। যাই হোক, শুধু ভাল ডাক্তার হ'লে হবে না, চাই সেবা। সেই সেবা করার

লোকেরই অভাব হ'ল। 'বাবারে, জর বিকার' বলে দাসীর দল পিছপাও হ'ল। ওধারে মায়ার বাবার তখন খুব অসুখ। তা ছাড়া সেখানে খবরও দেয় নি এরা। সেটা রাজবাড়ীর মানে বাধে। এই সময় এগিয়ে এল দেবী। সারাদিনে সে যতটা পারে করে। রাত্রে তার সেবা মেজপিসী। প্রিয়দর্শন দিনরাত ঘরে থাকে, মায়ার অজ্ঞান অচৈতন্য মুখ দেখে ভারি মায়া হয় তার। তা ছাড়া জ্ঞান থাকলে মায়া তাকে পলকে হারায়, সে ঘরে থাকলে কিছুটা শান্ত থাকে। হাতে কাজ করে দেবী। চিরজীবনই দেবীর সেবা করে কেটেছে। কিন্তু তারা কেউ তার সেবাকে এমন মূল্যবান করে গ্রহণ করে নি। পা স্পর্শ করে দেবী। মায়ার অসহায় ভঙ্গি দেবীকে আরও সেবাপ্রিয় করে তোলে। প্রিয়দর্শন সম্পর্কে দেবীর মামাশ্বশুর, কিন্তু বয়েসে সে নটুর চেয়ে দু'এক বছরের ছোটই হবে। কৃতজ্ঞতাভরা চোখে সে যখন কুণ্ঠিত স্বরে দেবীমা বলে ডাকে—সন্তানস্নেহে ভরে ওঠে পুত্রহীনার বুক। দেবী ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকে, ঠাকুর, মায়াকে বাঁচিয়ে দাও। মায়া যদি না বাঁচে প্রিয়দর্শন পাগল হয়ে যাবে। দুটো মূল্যবান জীবন রক্ষা কর দয়াময়। মায়ার শাশুড়ী সেই ঘরেই থাকেন সব সময়। ডাক্তার বদ্যি বিরাম নেই। বিরাম নেই প্রিয়দর্শনের ব্যাকুলতার। মায়ার শাশুড়ীও বলেন, "মায়ের বাছা ভালোয় ভালোয় মা'র কোলে যাক্। হ্যাঁরে প্রিয়, এখন বুঝি আর ভালো ডাক্তার নেই? আমাদের কালে বড় অসুখ হ'লে সায়েব ডাক্তার আসত। ওই যদি আমার না বাঁচে বিষয় সম্পত্তি আমার কি হবে বল?" তাঁর অত সখের সেলাই বন্ধ হয়ে গেছে, জপের মালা নিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকেন। কখন দেবীকে বলেন, আমায় দেখিয়ে দাও না বৌ, আমিও পারব এখন পা মুছিয়ে দিতে। মায়ার মাথায় চুল চিরকালই কম, তাও বরফ দেবার সুবিধের জন্যে ছোট করে কেটে দেওয়া হয়েছে। তাকে ছোট ফ্রক-পরা মেয়ের মত দেখায়। প্রিয়দর্শন মাকে বোঝায় নীলরতন সরকারের চেয়ে বড় ডাক্তার আর নেই মা। শুধু শুধু সায়েব ডাক্তার এনে কি হবে? প্রিয়দর্শনের মা অবুঝের মত জেদ ধরেন, আন না বড় সায়েব ডাক্তার। কি টাকা দিয়েছিল প্রিয়, তোর বাপ্ থাকলে কক্ষণও এমন করতেন না। লোকে কথায় বলে লক্ষ্মী, ঘরের লক্ষ্মী। মা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। ঘর আমার আলো করে বেড়াত মা। কখন মুখ ফুটে একটা জিনিষ চায় নি। শুধু সেবার বললে, মা একটা তুলার বেড়াল করে দেবেন? আমার বাপের বাড়ীতে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখব। আহা, তা আর আমার দেয়া হয়ে ওঠে নি। ঠাকুরঝিও কেঁদে কেঁদে মরছে, বলছে, পেট পুরে খেতে জানে না, ছাকন-চ্যাকন করে খায় বলে কত বকেছি, কবে যে আমার আবদার নিয়ে ভাঁড়ারের দোরে বসে খাবে তাই ভাবছি। এই একটি কিশোরীর প্রাণের জন্য এতগুলি মানুষ হাহাকার করতে থাকে। দেবীর আবার যেন তার শিশু-জীবনের আস্বাদ ফিরে আসে। মনে হয় এ বাড়ীর মধ্যেও তা হলে স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য আছে!

এধারে বিউটির ঘরে হৈ হৈ মেরী বাক্সওয়ালা ডেকে একটা গোলাপী সিল্কের পেঙ্গির মাপের পোশাক কিনেছে। ঝুইনও একটা নিয়ে পরার জন্যে টানাটানি করে হয়রাণ হচ্ছে। ঝুইনের চেহারায় গলা জিনিষটা বড় কম। ঘাড়ে-গর্দানে যাকে বলে। ও বাড়ীর ভাষায় মোষের কাঁধ। তাতে গোলাপী পেঙ্গির পোশাক না পরলেই ভাল হ'ত। বিউটির মনেও বোধ হয় ঐ পোশাক পরার সাধ জাগে। অতীত রোমন্থন করে বলে, এমনি মেমের পোশাক দাদাও আমাদের কিনে দিয়েছিল সায়েব বাড়ী থেকে। বিউটির এই অনামধন্য দাদা পুলিশে চাকরি করে। এমন দুষ্কর্ম নেই যা তাঁর অকরণীয় আছে। বিউটির মা আশমানি (তাঁর ভাল নাম আশমানতারা) আর বিউটির তাঁকে নিয়ে গর্বের সীমা নেই। কবে বাড়ীর কোন দাসীকে নিয়ে বা কোন জ্যাঠতুতো বিধবা বোনকে নিয়ে কি কুকাজ করেছেন তা বলে বলে বিউটির আর আশমানির আশ যেন মেটে না।

আজও তারই আলোচনা হচ্ছিল। বিউটি বললে, দাদা, আমাদের সেই পোশাক পরে সার হয়ে দাঁড়াতে বলল। আমরা তখন বড়-সড় পুরন্ত হয়ে উঠেছি। আমাদের দেখে দাদা খুব খুশী। শুধু দিদি তখন

খুব ছোট। তার আবার ঐ পোশাক পরার সখ। দাদা রায়বর্ণ তার গালে এক চড়, বলল, তাগ্ এখান থেকে ছুঁই ছুঁচকি, ও পোশাক পরলে বা না বাহার খুলবে যেন চামচিকে।
কথা শুনলে।
সত্যি
াজই মামার
ঘরে
বিউটির ঘরে
চোখে
পা-টা হঠাৎ
শির।
ার চুলগুলো
জটা
এই একচাল
চুল দিয়েছিলেন তাকে কে জানে? এ এক শাস্তি! এই চুলের রাশ রোজ ধোয়া, শুকোনো সে এক ঝক্কাট! তা ছাড়া অত সময়ই বা কৈ? ভিজে ভাব চুল জড়িয়ে রেখে রেখেই হয়ত ঠাণ্ডা লেগেছে মাথায়। মাথা যেন কেটে যাচ্ছে। আজকাল বড় সহজে মাথায় আঠা হয় তার। আগে আগে মাথা ঘসত। কিন্তু বিউটি সোডা খরচের জন্যে রাগ করে। নটুও একদিন বলেছিল, নিজের মাথা ঘষার ত সময় হয়? দেবী অবিশ্যি বোঝে, কথাটা নটুর নয়, বিউটির কথারই প্রতিধ্বনি। তবু কি জানি কেন দেবীর মনে দুরন্ত অভিমান হয়, আর মাথা ঘসে নি দেবী। লম্বা লম্বা তিনটে জটা হয়েছিল তার। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে সে নিজেই বলত, জট নড়ে তেঁতুল পড়ে। সেই জটার জন্যে ছোটদের মহলে তার নাম হয়েছিল জটেমাসী।

এই ভাবে দিন সাত চলল। মামার জ্বর যেদিন ছাড়ল বাড়ীময় আনন্দের সীমা নেই। পিসীমা ব্যস্ত জোড়া সত্যনারায়ণ সুবচনী পুজোর আয়োজনে। মামার শাশুড়ী নিজে গেছেন কালিবাড়ী, সোনার খাঁড়া, বেনারসী দিয়ে পুজো দিতে। মামার মুখে অপূর্ব হাসি। পাশে চেয়ারে বসে প্রিয় বলছে, জান, তোমার গায়ে একটু জোর হলেই আমরা চলে যাব নৈনিতালে। শুধু তুমি আর আমি। শিশুর মত আনন্দে নেচে ওঠে মামার চোখের তারা। বলে, খুব মজা হবে। এ বাড়ী বিচ্ছিরি বাড়ী, এখানে দিনের বেলা তোমার সঙ্গে দেখা হয় না, এ বাড়ীতে থাকব না আমি। প্রিয়দর্শন বলে, বেশ, তাই হবে। রাণীগঞ্জে কয়লার খনি আছে আমাদের। সেইখানে গিয়ে থাকব দু'জনে। নতুন একটা ক্যামেরা কিনেছি, তাতে কত রকম ছবি তুলব তোমার। নিজের শীর্ণ হাত দুটি তুলে মামা বলে, যা সুন্দর ছবি হবে বোঝাই যাচ্ছে। যা ছিরি হয়েছে চেহারার। কল্পনার রাজ্যে ভাসতে থাকে দু'জনে। আবার যেন ছোটবেলার জীবন ফিরে পায় মামা। গল গল করে কত গল্প সে করে তার ঠিক নেই, আর ভাবি কাঁকে কাঁকে আঙুর তুলে তার মুখে দিয়ে দেয় প্রিয়দর্শন।

আজ আর পারে না দেবী, গোয়ালের দাওয়াতেই শুয়ে পড়ে। সন্ধ্যেবেলা চা খাবার সময় খোঁজ পড়ে তার। বুইন বলে, দেখগে তোমার সোহাগী বউকে, দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। পাড়ার লোকের সেবা করতে ভালো লাগে, লোকে ধন্যি ধন্যি করবে। বাড়ীর লোকের বেলা গতর খাটাতে ইচ্ছে করে না। মা'র পায়ের কাছে শুকনো মুখে খুকী বসে থাকে। রাতে নটু এসে তাকে বলে, জানো বাবা, মার খুব জ্বর হয়েছে। মা কি সব বলছে আমি বুঝতে পারছি না। গায়ে খই ফুটছে যেন তপ্ত খোলা। বাপ আর মেয়ে বসে থাকে দেবীর কাছে, মাঝে মাঝে জল দেয় মুখে। দেবী ভুল বকছে। এখনো দুধ খেলে না? তিনটে যে বেজে গেল। আফিসেও বোধ হয় খাও না, কি করে টি'কবে দেহ অতগুলো রোগ নিয়ে?

কি বলছো? আমার পেটে যমের গোঁচা লাগে তিনটে বাজলে? কিসের কিন্তু সত্যি সত্যি যমের খোঁচা দেয় তুমি ত জান না। কখনো বলে, আমারই দোষ, তুমি শান্ত হও দেখি। আবার ডাকে, মা মা, মাগো, দয়া কর মা। কি দোষ আমি করেছি, তোমার কি কখনো করুণা হবে না? আবার ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, দেরী হয়ে গেছে, বেড-টি দিতে হবে। দেরি হয়ে গেল, রাগ করবেন না। নটু তাকে চেপে শুইয়ে দেয়। চিকিৎসা হচ্ছে। খরচ যখন বই দেখে যা দেন। বিউটি, বুইন, মেজো তার ত্রিসীমানায় আসে না। মাসী-বৌএর একবার খুব অসুখ করেছিল, দেবীর যত্নে সে বেঁচেছিল। এই মাসী-বৌ এ সময় খুব করল। বলত নটুকে, দাও বাবা, মায়ের জটগুলো কেটে। জল ঢাললে জল মাথায় সেঁধোয় না। অমন পিরজিনের মত চেহারা যা আকার হয়েছে!

তোমারও যদি বাবা, অমন নিষ্করুণ তোমার মা-বোন, কেন বাবা পরের বাছা ঘরে আনলে? শুধু শুধু শাস্তি দিতে!

আবার প্রলাপ বলে দেবী কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে
শুধু কি দুখের কথা শুনিবে দেবতা।
শুনিবে না কখন কি অন্তরের কথা?

মন্টু অফিস যায়। বন্ধুদের কাছে টাকা চায়। খুকী বলেছে মা'র জন্যে কমলালেবু এনো বাবা। কোয়া মুখে দিলে যদি চোষে। আজ প্রথম মনে হয় মন্টুর দেবীর দিকে পায়। তারও কিছু আহারের প্রয়োজন আছে। কমলালেবুর সঙ্গে এক বাক্স আঙুরও কেনে মন্টু। বাড়ী ফিরতেই বিউটির সঙ্গে দেখা। বিউটি বলে, আঙুর কি বউ-এর জন্যে আনলি? এর ওপর যদি পেট ছেড়ে দেয় সর্বনাশ। সর্বনাশের মাথায় পা—ওটা একটা মুদ্রা-দোষ, বিউটির সর্বনাশ বললেই ও কথাটা বলতে হবে। হতবাক্ মন্টুর হাত থেকে আঙুরের বাক্সটা বিউটি নিয়ে নেয়। লেবুর ঠোঙাটা নিয়ে মন্টু দেবীর কাছে যায়। খুকী পা ছড়িয়ে বসে আছে মা'র পাশে। বাবাকে দেখে বলে, তুমি এসেছ বাবা? মা উঠে উঠে বসতে যাচ্ছে, আমি কি আটকাতে পারি? মেজপিসী এসে মা'র মাথায় ঘাপতি ঘাপতি জল দিয়ে তবে শান্ত করে। দাও দেখি লেবু, খায় কি না। লেবুর কোয়া ছাড়িয়ে মা'র মুখে ধরে।

দেবী চেঁচিয়ে উঠে বসতে যায়। আর যে পারি না মা, উঃ, বুক আমার ভেঙে গেল! এখনো মশলা বাটতে বাকি? একমণ কয়লা একদিনে ভেঙে রাখতে হবে। এত বড় মশারী তুলতে পারি না যে! প্রিয় মামা যে বিষ খেয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। ও বাঁচবে না ত কে বাঁচবে? আমার মত অপয়া নয় ত? যে-দিকে দিঠি পড়ে সব শুকিয়ে যায়। তোমার পায়ে পড়ি দুইবন, খুকীর মরে যাওয়ার কথাটা বোলো না। যা করতে বলবে তোমরা করব, শুধু ওকে শাপ-শাপান্ত করো না। কে বাবা? আপনি কখন এলেন? এখান থেকে যে আমার যাবার উপায় নেই বাবা। আপনি অত ভাবছেন কেন বাবা? বেশ আছে আমার শরীর। রোগা হওয়াই ত ভালো, বেশ শরীর ঝরঝরে বোধ হয়। কোন কষ্ট নেই আমার মা কত যত্ন করেন! উঃ বাবা, পা কেঁপে গেল, আমি ইচ্ছে করে ফেলি নি হাত, কেঁপে পড়ে গেছে! বিশ্বাস করো তুমি, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি মাকে খুশী করতে। মা'র কথা শুনব না তাও কখনো হয়? তোমার মা যে! মাকে না ভালবাসলে কি ক'রে তোমায় ভালবাসব?

মন্টু বসে থাকে চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে, ভাবে কি যেন। খুকী বলে, ও বাবা, ডাক্তার আন না। মেজপিসী বলেছে, তোর বাপকে বলিস ডাক্তার ডেকে আনতে। মেঝোরে বৌটাকে যেন না মারে। মা'র কথা যেন না শোনে। জানো বাবা, ঠাকুমা আজ বলছিল পিসীকে, আবার বিয়ে দোব মন্টুর, ঘর ভরা জিনিষ আসবে আবার। এবার নমস্কারীতে ঢাকাই বেনারসী দেব। আর এই মরা বোয়ের গয়নাতেই দুইবনের বিয়ে হয়ে যাবে। আমায় নাকি দাদুর কাছে পাঠিয়ে দেবে, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না বাবা। কি হাসাহাসি করছিল ওরা বাবা, মা মরে গেলে ওদের কেন কষ্ট হয় না বাবা? আমার ত মা থাকবে না! বলে কাঁদে খুকী। খুকীর মাথায় হাত বুলিয়ে মন্টু বলে, থাম থাম, ঠিক সেরে যাবে তোর মা। দাঁড়া না, একজনের কাছে অনেক টাকা আমার আছে, নিয়ে এসে তোর মাকে বড় ডাক্তার দেখাব। কালই যাব তার কাছে।

সত্যিই যায় মন্টু, ধীরেন সেন আর রাজেন ঘোষ দুজনের কাছেই অনেক টাকা জমা আছে তার। পাছে উড়নচণ্ডী দেবীর হাতে পড়ে টাকা উড়ে-পুড়ে যায়, সব টাকা অফিস থেকেই তাদের কাছে জমা দিত মন্টু। এমন কি নিজের রোগেও টাকা-গুলো আনে নি। দেবী যে কি ভাবে তার ওষুধ-পথ্য জোগাড় করত তা দেবীই জানে। বোকাই যায় শিববাবুই দিতেন। বড়টা শ্বশুরের ওপর দিয়ে যায় ততই ভালো। তা ছাড়া ঐ অপয়া মেয়ে ত তিনিই ঘাড়ে চাপিয়েছেন তার। নইলে কেষ্টপদ আজ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে আর সে আজও দেড়শ টাকায় ঘসটাচ্ছে। যাবে যেতে যেতে মন্টুর মনে পড়ে, একবার একটা চৌধুরী কাপড় মাথা বোঝাইর দেখে দেবী চেয়েছিল তখন সবে খুকী হয়েছে। শান্তিপুরী চৌধুরী দুলে মাকে চায়

টাকা দাম দেখে নটু আর কেনে নি। বড়বাজারের আড়ত থেকে এক রকম মিলের চেক চেক চৌধুরী এক বস্তা কিনে এনেছিল ঝাঁকড়ে। দশসিকে থেকে সাত সিকে পর্যন্ত সব দামের ছিল।

বাড়ীতে আনতেই বিউটি কুইনের জন্যে, দেবীর জন্যে, দিদির জন্যে, নিজের দুই ভাজের জন্যে পাঁচখানা বেছে নিল। তার পরে বড়তি-পড়তির মধ্যে দেবীকে বেছে নিতে বলা হ'ল। দেবী কিছুতেই বাছল না। বললে, যা মা'র পছন্দ তাই পরব। কিন্তু সে কাপড় পরে নি দেবী। আর কখনও কিছু চায়ও নি। পনেরটা টাকা খরচ হ'ল অবিশ্যি কিন্তু কেউ কিছু বলতে পেল না। শুধু দেবীর জন্যে কাপড় আনা, সে যে ভারি বিচ্ছিরি! আগে আগে দেবী অমনি অবুঝের মত বায়না করত। একবার ঝোঁক ধরল, "আমার একটা পর্সিলিনের বাঁশরী বিলাস কিনে দাও।"

চিনেপট্টি থেকে কমিশন বাদ দিয়ে কিনেও এনেছিল নটু। কিন্তু বিউটির শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত। বিউটি সে বাঁশরী বিলাস নিয়ে নিজের ঘরে সাজাল। সে কি অভিমান দেবীর? দাঁতে ঠোঁট চেপে বললে, দিলে না ত আমায় এনে? যত নটু বোঝায় মা'র কাছে থাকলে আরও ভাল থাকবে, এক বাড়ীতে দুটো এক রকমের পুতুল রেখে কি হবে? তা ছাড়া তোমার ত মা'র মত ভাল গ্লাসকেস নেই। কিছুতেই নিস্তার নেই। দোকানদারও আবার বেচতে হেসে বলল, বাঁশরী বিলাস এখন পুরণো হয়ে গেছে বাবু! সাবিত্রী-সত্যবান নিয়ে যান।

কি সুন্দর সাবিত্রী সত্যবান আর পেছনে গদা হাতে যম দাঁড়িয়ে আছে! সে দেখে পছন্দ হ'ল না দেবীর। বললে যম দেখে দেখে অরুচি হয়ে গেছে আমার। দেবীর কথার যে কি ভঙ্গি কিছু বুঝতে পারে না নটু। সব সময় যেন 'তেরিয়া ভাব'। চিরকাল ঐ দাঁতে ঠোঁট চাপা মুখ দেখে এসেছে নটু। লাল থমথমে মুখ, দেখলেই মনে হয় ফেটে-ভেঙে যেন ফেটে পড়ছে। মা বলে মিথ্যে নয়, সতী সতী বাই যেন। এই যে একরাশ টাকা পরের হাতে ফেলে রাখতে হয়েছে শুধু দেবীর আব্দার! আজ টাকাগুলো হাতে থাকলে থাকত কি? ঐ নটুকেই বলত তুমি ট্যাক্সি করে অফিস যাও, তুমি ভালাটোজেন খাও বলে সব টাকা খই জলা করত। মা ত ঠিকই বলে, কি খরচের ভাই ওরা। আর তোর ঐ পুঁটি মাছের প্রাণ বেরুতে কতক্ষণ? যাক, রাজেন ঘোষ বাড়ীতেই ছিল। বললেন, "আসুন, আসুন নটুবাবু, কিছু টাকা ছাড়ুন দেখি। শুধু গুড় কিনেই আমাদের পাঁচুবাবু লাল হয়ে গেল। আপনাদের আর কি মশাই? জমিদার বাড়ীর ছেলে, দুধে-ভাতে আছেন।"

নটু বলে, "না ভাই, কিছু টাকা আমার চাই। বৌটার বড় অসুখ, জ্বর-বিকার মত হয়েছে। মেয়েটা বড় কান্নাকাটি করছে ডাক্তার ডাক্তার করে।"

রাজেন ঘোষ বলে, টাকা কি আপনার খেয়ে ফেলব? তা ছাড়া আর দু'মাস পুরলে এক বছরের সুদ পাবেন আপনি। তা ছাড়া টাইফয়েডের ত ওষুধ নেই মশাই, শুধু সেবা। আর হোমিওপ্যাথিক ব্যাপ্টিসিয়া দিন, ওতেই সেরে যাবে। তবে আপ'নি নিজে যখন এসেছেন শুধু হাতে ফেরাব না, পাঁচটা টাকা নিয়ে যান। দেখি যত শিগ্‌গির পারি আপনার টাকা দিয়ে দেব। গত বছরও ত দিতে চেয়েছিলাম, আপনিই ত নিলেন না সব খরচ হয়ে যাবে এই ভয়ে।

অনেক কাকুতি-মিনতি করেও তাকে গলাতে পারল না নটু। পাঁচটা টাকা নিয়ে বাড়ী ফেরে। পথে রাসবেহারী ডাক্তারকে ধরে নিয়ে যায়। ডাক্তার রুগী দেখে মুখ গম্ভীর করেন। বলেন, বৌটাকে খেতে দিতেন না নাকি মশাই? কিছু নেই যে। এত এ্যানিমিক যে মানুষ হয় তা ত জানতাম না।

নটু বাধা দিয়ে বলে, রঙটাই বড্ড ফর্সা, বুঝতে পারি নি। সেবার মধুপুর থেকে—বাধা দিয়ে ডাক্তার বলে, চেঞ্জে যাবার কথা বলছেন? বলুন, বলুন, বলার ওপর ত ট্যাক্স নেই! তবে শুধু টাইফয়েডই নয়, ব্রেনও এফেক্ট করেছে। মেনিনজাইটিসও চলছে তার সঙ্গে। আসুন, ওষুধ লিখে দিচ্ছি। তবে ঘরটা বদল করুন আগে। এমন ঘরেও মানুষ রুগী রাখে?

যে ওষুধের ফর্দ দিলেন তা প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার মত। মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল নটুর। বিউটিকে দিয়ে সব বলল।

বিউটি বলে, আমি পুরুষমশায়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে সংসার চালাচ্ছি, তুই কোথায় পুরুষ মানুষ, আমায় টাকা এনে দিবি তা না টাকা চাইতে এসেছিস আমার কাছে? লজ্জা করে না তোর?

আর কথা না বাড়িয়ে নটু মেজগিন্নীর কাছে যায়। তাঁকে দেবীর কাছে বসিয়ে দিয়ে যায় ধনবান ধীরেন সেনের কাছে। ব্যবসাদার ধূর্ত চতুর মানুষ। মুখে মধুর বন্যা বইয়ে দিল।

আসুন, আসুন নটুবাবু, কি ভাগ্যি আমার! আমার মত মানুষের কুঁড়ে ঘরে আপনার মত মানুষের পদার্পণ।

নটু বাধা দিয়ে বলে, আজ আমার কিছু টাকা চাই। আমার স্ত্রীর বড় অসুখ।

হো হো করে হেসে ধীরেনবাবু বলেন, বলেন কি মশাই? আপনিও শেষে স্ত্রৈণ হয়ে গেলেন? আমরা পাঁচজনে বলতাম মরদ ত মরদ নটুবাবু! স্ত্রীকে একেবারে দাবিয়ে রেখেছেন। এই সামান্য চাকরি করে একে দশ হাজার, ওকে পাঁচ হাজার কথায় কথায় ধার দেন। টাকার মধ্যে পরিবার নাক গলাতে পারছে না। সেই আপনিও কি না শেষে পরিবারের জন্যে টাকা চাইছেন? আপনার মত মহাজনের এই অধঃপতন? ওরে চা আন, আর কেক টোষ্ট। আমার পরিবারের আবার এ-সবে বেজায় ঝোঁক। মোগলাই বাবুর্চি ছাড়া তাঁর মুখে আহার রোচে না। ব্যাটা মাইনে যা নেয় বলার কথা নয়, তবে রান্না যা করে তোফা।

আবার নটু বলে, অন্ততঃ শ'খানেক টাকা যদি আজ দেন।

ধীরেনবাবু বলেন, শ'খানেক কেন দশ হাজার টাকাই ত আজ দিতে পারতাম। দেখুন দর্জি এসে বসে আছে। লালচাঁদের দোকানের বিল, জুয়েলারী মাদার্সের বিল, তার ওপর গাড়ি কিনলাম মশাই— এখন পরিবার বলছে, ছিঃ ছিঃ, ক্যাডিলাকে আবার ভদ্রলোকে চাপে? নতুন গাড়ি চাই। অগ্নি-সাক্ষী করে গ্রহণ করেছি যাকে, তার সখ-সাধ ত মেটাতেই হবে! কি করি মশাই, কিছু মনে করবেন না।

হঠাৎ নটুর মাথায় রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বলে, ও-সব কথা বাদ দিন, আজ আমার টাকা চাই-ই।

এবার ধীরেনবাবু খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। বলেন, বটে না কি? আপনি যে শাইলক হলেন মশাই! কই, টাকা আদায় করুন দেখি? আমার সব সম্পত্তি স্ত্রীর নামে, কিছু ছোঁবার উপায় নেই। পাছে স্ত্রী খরচ করে ফেলে তাই টাকা লুকিয়ে রেখেছিলেন। আজ মরছে জেনে দিশ্বিদিক হয়ে টাকা চাইছেন। আজ আর তার ওপর খরচ করে লাভটা কি? শ্মশানের খরচ রাজবাড়ী থেকেই দেবে। যান, যান, দিক করবেন না।

অপমানিত নটু বাড়ী ফিরে আসে। এসে দেখে ধীরেনবাবু যা বলেছিল সত্যিই। দেবীর জন্যে করার আর কিছু নেই। তবু মেজগিন্নী ঝিনুকে করে জল দিচ্ছেন ঠোঁট দুটো ভেজাবার আশায়। কষ বেয়ে সে জল পড়ে যাচ্ছে। আর খুকী দু'হাতে করে মস্ত একটা কালি-ঝুলি-মাখা পাখায় করে মা'র মাথায় বাতাস করার চেষ্টা করছে। সন্ধ্যে হতেই আকাশ জুড়ে মেঘ এল। শন্ শন্ করে হাওয়া বইছে, তারই সঙ্গে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমে এল। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের সঙ্গে বজ্রপাত। তারই মধ্যে দেবীর দেহটা একবার কেঁপে উঠে চিরদিনের জন্যে স্থির হয়ে গেল। নটু সেই জল-ঝড় মাথায় করে ছুটল ডাক্তারের কাছে। এই দুর্যোগের মধ্যে ডাক্তার আসতে চান না। বলেন, রাতটা কাটুক, আমি সকালে যাব। এই ওষুধটা নিয়ে যান, দেখুন যদি বাঁচেন এতেই বাঁচবে। আমি গিয়ে আর কি করব মশাই? এ আপনার গোড়া কেটে আগায় জল। তবু নটু ছাড়ে না। অগত্যা ডাক্তার আসেন।

কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। খুকী তবু অবুঝের মত মা'র গাল ধরে নাড়ে আর বলে, ওমা! মাগো, কথা বলছ না কেন?

ওপরে বিউটির ঘরে গানবাজনা চলছে, "আমার বিবি, আমার বিবি, আমার বিবি!" এরই মধ্যে দেবী তার অপমান দাগ চিরদিনের মত মুছে দিয়ে চলে গেল।

মেজগিন্নী তার জটায় সিঁদুর ঢেলে দিলেন, পায়ে দিলেন আলতা। আর নতুন কাপড় চাইতে সেই চেক চেক কাপড়টাই এনে দিল খুকী।

এরই মধ্যে চমকে মামা বলল, দেবীর খুকী যেন কাঁদছে না? প্রিয়দর্শন বলল, বিউটি পিসীর কাণ্ড ত, হয়ত খেতে-টেতে দেয় নি মেয়েটাকে? তুমি ঘুমোও, কাল সকালে দেখা যাবে কি হ'ল?

মটুকে আর কিছুই করতে হ'ল না। দাসী-বৌই পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে এল। তারাই যা করার করল। মেজগিন্নী আঁচল থেকে খুলে দশটি টাকা দিলেন মটুর হাতে। বললেন, যা নিয়ম সব কর বাবা। আর যেন হতভাগী এমন করে না জন্মায়। খুকী ছুটতে ছুটতে চারটি ফুল কুড়িয়ে এনে মার পায়ে ছড়িয়ে দিল।

মামা তখন স্বপ্ন দেখছে—রেলে করে হু হু করে ছুটে চলেছে তারা—শুধু মামা আর প্রিয়দর্শন। কত পাহাড়, ...কত নদী...কত দেশ পেরিয়ে!...

লেখাপড়া শিল্পবার্তা কলা ইত্যাদি যত কিছু শিক্ষণীয় বিদ্যা আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি ধারা আছে, যাহা পুরাতনকে আশ্রয় করিয়া নূতন পথে প্রবাহিত হইয়া চলে। যেখানে শিক্ষা কেবলমাত্র পুরাতন আশ্রয় করিয়া স্থগিত হইয়া থাকে, নূতন পথে না চলে, সেখানে সেই শিক্ষা কেবলমাত্র পুরাতনের অনুকরণ হয়, নব নব সৃষ্টিতে আত্ম-প্রকাশ করিতে না পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও পণ্ড হয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(৭) ভগবানের চাবুক

সঙ্গীতের আসরে কত চমকপ্রদ ঘটনাই ঘটে গেছে। কত মর্মান্তিক দুর্ঘটনা পর্যন্ত। কি বৈচিত্র্যময় সব আসরের কথাই যে শোনা যায়। কত করুণ, মধুর, হাস্যরসের কাহিনী। কত কৌতূহল-উদ্দীপক, মিলনাত্মক বা বিয়োগাত্মক পরিণতি। সুরের আসরে কত বিবাদ বচসা, কত অসুরের উপদ্রব কিংবা সুরের শতদল বিকাশের কথা।

তার মধ্যে এই বিচিত্র আসরটি অনন্য হয়ে আছে। এমন ঘটনাপরম্পরা, এমন বিষয়-বৈচিত্র্য একটিমাত্র আসরের উপলক্ষ্যে সচরাচর শোনা যায় না সেকালের ক্ষেত্রেও।

এ আসরের বিবরণ আজকের দিনে অবিশ্বাস্য মনে হবে, গল্পকথার মতনও শোনাতে পারে। কিন্তু গল্পের মতন মনে হ'লেই যে অলীক কিংবদন্তী হবে, তা নয়। সত্য অনেক সময় কল্পনাকেও হার মানায়। বাস্তব কখনো কখনো অতিক্রম করে যায় উপন্যাসকে। তাই এমন সব ঘটনা জগতে ঘটে যেতে পারে যা বিবৃত করতে গেলে মনে হবে অদ্ভুত, অভাবিত।

তেমনি সঙ্গীতের আসরেও অত্যাশ্চর্য কাহিনীর অভাব নেই। বক্ষ্যমাণ কাহিনী তেমনি একটি।

কতদিন আগেকার কথা, আজ থেকে প্রায় ষাট বছরের হবে। এই শতকের একেবারে গোড়ার দিকের ঘটনা। সেদিনের সেই খণ্ড জীবননাট্যের কোন পাত্রই এখন আর ইহলোকে নেই। নাটিকার সূত্রধারও কিছু-দিন আগে লেখককে তার বিবরণ দিয়ে মরজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন অতি বৃদ্ধ বয়সে।

সেদিনের সেসব মানুষ চলে গেছেন বটে, কিন্তু ঘটনা-বলি বিলুপ্ত হয় নি। তারা জীবন্ত হয়ে আছে শ্রুতি-স্মৃতিতে। তাদের যেন মৃত্যু নেই। শিল্পীদের নশ্বর দেহ গ্রাস করেছে মহাকাল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গীত-জীবনের বিচিত্র কীর্তি ও কাহিনী, তাঁদের সার্থকতা ও দুর্বলতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও দুর্মদের নানা সংবাদ পরবর্তীযুগে এসে পৌঁছেছে ইতিহাস হয়ে। সঙ্গীত-জগতের সেসব ইতিহাস যদিও এ পর্যন্ত অলিখিত আছে।

যে বাড়ীতে সেই বিশেষ আসরটি বসেছিল সেটিও অক্ষত রয়েছে ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপ। অবশ্য তার বাহ্যরূপে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বাড়ী না বলে প্রাসাদ বললেই সঠিক হয়। যে উত্তর কলকাতায় সেকালের নাগরিক বাঙালীর গৃহস্থাপত্যে রাজকীয় ঐশ্বর্যের নিদর্শন বেশ কিছু ছিল, সে অঞ্চলেও এই প্রাসাদোপমটির তুল্য দেখা যেত না বড় একটা।

হস্তান্তরিত হয়ে এখনো তা জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বিদ্যমান। কলকাতা-নিবাসী রাজস্থানের বণিকদের উদ্যোগে এখন তা একটি সেবা প্রতিষ্ঠান। নাম— সোহিনী মাতৃ সেবাসদন। কিন্তু এ নাম ত সেদিনের কথা।

তারও আগেকার ইতিহাস কম বিচিত্র নয়। মাতৃ সেবাসদন এখানে প্রতিষ্ঠার আগে অট্টালিকার মালিক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ধনী মল্লিক পরিবারের প্রদ্যুম্ন মল্লিক। তাঁর আগেকার স্বত্বাধিকারী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের যখন ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল মল্লিকমশায় এটি কিনে নেন। বাড়ী পাবার পর বাড়ীর সামনেকার বিরাট সোপানশ্রেণীর প্রতি ধাপে উৎকীর্ণ করেন একটি স্পর্ধিত ছড়ার এক একটি লাইন। পূর্ববর্তী মালিকদের প্রতি শ্লেষ ও অহমিকা প্রকাশ করে সেই ছড়াটি লেখা হয়েছিল। কিন্তু অচিরকালেই তাঁরও (প্রদ্যুম্ন মল্লিকের) জীবনের কি মর্মান্তিক পরিণতি দাঁড়াল। শুধু এ বাড়ী নয়, আরো অনেক কিছুর সঙ্গে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হ'ল অকালে, নিজের হাতে।

প্রদ্যুম্ন মল্লিকের তখন নামডাক ছিল বাড়ী আর গাড়ি বিলাসী বলে। নিত্য-নতুন মডেলের খান পঞ্চাশ মোটর গাড়ি তাঁর সখের বাহন ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি বিলাসিতার হিসেবে। রেবাযুক্ত ছড়া লেখবার স্পর্ধা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিল, বলা যায়। কারণ অতি শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ইহজীবনের রেলা বহন্তেই কৃত্রিমভাবে শেষ করতে হয় তাঁকে।

প্রদ্যুম্ন মল্লিকের আগে হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, তাঁর আগে তাঁর পিতা আশুতোষ শীল ও রাজা ছুনী শীল, তাঁদের আগে শ্যামাচরণ মল্লিক এবং তাঁরও আগে তাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক। এই হ'ল অট্টালিকাটির জীবন-নাট্যের নায়ক-পরম্পরা। যে আসরের ঘটনা বলবার জন্যে বাড়ীর প্রসঙ্গের অবতারণা, সেটি হ'ল হরেন্দ্রকৃষ্ণের আমলের।

সেদিনের গল্পটি আরম্ভ করবার আগে হরেন্দ্রকৃষ্ণের কথা বিশেষ করে জানাবার আছে। তিনিই ছিলেন সে আসরের উদ্যোক্তা। তা ছাড়া, সেকালের বাংলার একজন সত্যিকার গুণী হিসেবেও তাঁর কথা স্মরণীয়।

সৌখীন হ'লেও তিনি প্রথম শ্রেণীর সুরবাহারবাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। যন্ত্রসঙ্গীতের শিল্পী কৌকব খাঁর তিনি একজন সুযোগ্য শিষ্য। কৌকব খাঁর আগে অন্যান্য ক'জন ওস্তাদের শিক্ষাও অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে খাঁ সাহেবের নামই ছিল বেশি আর তাঁর কাছে তিনি একাদিক্রমে শেখেন প্রায় ৭ বছর। তারপর কৌকব খাঁর মৃত্যু হ'লে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করামৎউল্লা খাঁর কাছেও শিখেছিলেন। কৌকব করামতুল্লার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ বসু। তিনি ছিলেন সরদী এবং খাঁ সাহেবদের নিজস্ব সরদ ঘরাণার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। বীরেন্দ্রনাথের গুরুভাইদের মধ্যে তাঁর পরেই উল্লেখ্য হলেন হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল। শীল মহাশয় প্রধানত সুরবাহার-শিল্পী, সেতার চর্চা প্রথম জীবনে করলেও পরে একরকম ছেড়ে দেন। সেজন্যে রাগের আলাপচারি অংশেই আত্মনিয়োগ করেন বেশি। রাগালাপে তিনি এই ঘরের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন। পরিণত বয়সে খেয়াল গানের চর্চাও করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ পরে আসবে।

অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে এবং এক বৃহত্তম সঙ্গীতপ্রেমী পরিবারে তাঁর জন্ম। আশুতোষ শীলের একমাত্র পুত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণ। পিতৃব্য, রাজা ছুনিলাল শীল অপুত্রক, সুতরাং সমস্ত সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী তিনি। সঙ্গীত-বিলাসী সমাজে সুপরিচিত ছুনী ছিলেন সঙ্গীতের এক অকৃপণ পৃষ্ঠপোষক। বাড়ীর জলসাঘর তাই ছেলেবেলা থেকেই হরেন্দ্রকৃষ্ণ সুরমুখর দেখতেন। রাজা ছুনী শীলের আসরে গানবাজনা করেন নি, এমন গুণী সেকালে কমই ছিলেন বা আসেন কলকাতায়। তাল আসরের জন্যে কত খরচ হবে সে কথাটা তাঁর কাছে একেবারে অবান্তর ছিল, এই প্রসিদ্ধি আছে।

এই সাঙ্গীতিক পরিবেশে হরেন্দ্রকৃষ্ণের জীবন আরম্ভ হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গীতে অনুরাগ আর বালক বয়স থেকে সঙ্গীতে হাতেখড়ি। পিতৃব্য ছুনিলাল শুধু সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন না, সুরের চর্চাও কিছু করতেন; হারমোনিয়ম বাজাতেন, শোনা যায়। আরো কোন কোন যন্ত্র থাকত বাড়ীতে। একটু বড় হ'তেই হরেন্দ্রকৃষ্ণ সেতার শিখতে আরম্ভ করেন, গানের চর্চাও বোধহয় কিছু কিছু সেই সঙ্গে ছিল। দোতলার জলসাঘরে নিয়মিত বড় বড় ওস্তাদের গান-বাজনা শোনা তাঁর আগে থেকেই অভ্যাস। সঙ্গীত-শিক্ষার একটি উপযুক্ত কেন্দ্র সেখানে। সেই সঙ্গে তাঁর শেখবার আগ্রহ দেখে বাড়ীতে ওস্তাদের কাছে শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল।

প্রথমে তিনি শিখতে লাগলেন সেতার। গদা মিশ্রি নামে তখনকার এক নাম-করা সেতারী তাঁকে এই যন্ত্র-বাদন শেখাতেন। উক্ত ওস্তাদের সঙ্গীত-জীবন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না, তবে পরবর্তীকালে স্যর আশুতোষ চৌধুরী ও প্রতিভা দেবী স্থাপিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘ'র বিদ্যালয়ে মিশ্রি মহাশয় যে সেতার শিক্ষক ছিলেন তা সঙ্ঘের মুখপত্র 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' থেকে পাওয়া যায়।

গদা মিশ্রির কাছে শিক্ষার পরে হরেন্দ্রকৃষ্ণের দ্বিতীয় গুরু হলেন নন্দ বীষণ। এঁর কাছেও তিনি সেতার

শিখতেন। মন জীবনের তখন কলকাতায় নাম ছিল বীণাবাদকরূপে। কিন্তু তিনি কার শিষ্য ছিলেন, সেকথা জানা যায় না। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক হ'লেও কলকাতা-নিবাসী ছিলেন অনেক দিন থেকে। তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় শিল্পাচার্য প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মজীবনী 'প্রাণকুমার' বই-খানিতে। তা থেকে মন জীবন সম্বন্ধে উদ্ধৃত করবার দরকার হবে। শুধু হরেন্দ্রকৃষ্ণের অন্যতম সঙ্গীত শিক্ষক বলেই নয়, যে আসরের কথা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় তার সঙ্গে জীবন মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বলতে গেলে, তিনিই ছিলেন সেদিনের আসরের প্রধান উপলক্ষ্য তাঁর জন্যেই সে আসরের আয়োজন ও নাটকীয় পরিণতি। সে কারণেও তাঁর সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ করা চলে যে, প্রথম জীবনে প্রবোধ-কুমার সঙ্গীতচর্চা রীতিমতভাবে করতেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং যৌবনকালে ধ্রুপদ গাইতেন চন্দ্রকুমার চৌধুরীর (ওস্তাদ আলী বক্সের শিষ্য) শিক্ষাধীনে। শুধু ধ্রুপদ নয়, সে-সময়ে প্রবোধকুমার সেতারও শিখতেন বিষ্ণুপুরের ত্রিলোচন চক্রবর্তীর কাছে। উত্তর জীবনে চিত্রশিল্পকে একান্ত সাধনের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করায় সঙ্গীতচর্চা আর আগের মতন করতে পারেন নি বটে, কিন্তু সঙ্গীত তাঁর চিরদিন অন্তরের আকর্ষণ হয়ে থেকেছে। তাই পরিণত বয়সে স্মৃতিকথা রচনার সময়ে প্রথম জীবনে দেখা-শোনা সঙ্গীতজ্ঞদের কথাও দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ করেছেন 'প্রাণকুমার' গ্রন্থে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম জীবনে উত্তর কলকাতার যেখানে থাকতেন পরে সেই রাস্তার নাম হয় বলরাম ঘোষ স্ট্রীট। তারই কাছে (এখনকার গিরিশ পার্কের পাশে) একটি বাড়ীতে মন জীবন থাকতেন। একদিন বিকালে প্রবোধকুমার সেখানে কিভাবে মন জীবনকে দেখেন এবং তাঁর বাজনা শোনেন, তা এইভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর এই বইখানিতে :—

"আমাদের বাড়ীর পিছনে যে এখন গিরিশ পার্ক, সেটা আগে ডোবাপুকুর ভোবায় ছিল ···। সেই বাগানের দক্ষিণ দিকে একখানা জীর্ণ বিজন বাড়ীতে থাকতেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী শ্রীযুক্ত মন জীবন মশাই। পাটের দালালী করতেন, বড় বেপার ছিলেন এবং তখন তাঁর পসারও যথেষ্ট ছিল, চলনসই একটা ঘোড়াগাড়িও ছিল। সম্রান্ত ব্যবসায়ী সমাজে তাঁর সম্ভ্রম কিছু কম ছিল না। কিন্তু আমার কাছে জীবন মশাইয়ের পেশাদারি সম্ভ্রমের চেয়ে অন্য একদিকে তিনি মহৎ বলে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি তখনকার বাংলার প্রসিদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ বীণকারদের একজন ছিলেন। ও ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন, কারণ তাঁর ষ্টাইল ছিল আর তা অনুকরণীয়ই ছিল, একথা আমি অনেকের কাছেই শুনেছি। আমাদের এই চন্দ্রবাবু (অর্থাৎ ধ্রুপদী চন্দ্রকুমার চৌধুরী, প্রবোধকুমারের সঙ্গীত শিক্ষক) জীবন মশাইয়ের সহকর্মী বা সহকারী ছিলেন : জীবন মশাই বীণকার আর চন্দ্রবাবু ধ্রুপদ ও খেয়ালে দক্ষ গায়ক।

একদিন মনের উদ্বেগে ছটফট করতে করতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঐ ডোবারে বসে ভাবছি, কি করে ঘরের অশান্তি থেকে বাঁচা যায়। জীবন মশাইয়ের বৈঠকখানা থেকে বীণার ঝঙ্কার আসছে না? আর কথাবার্তা নেই. সেই ময়লা গেঞ্জী গায়ে, সোজা গিয়ে দেখি সম্রান্ত বাঙালী একদল স্থির হয়ে শুনছেন তাঁর বীণা। আদলার ধাপের উপরে বসতে যাচ্ছিলাম, প্রিয়দর্শন মধ্যবয়সী শ্রোতাদের মধ্যে একজন, ইনিই চন্দ্রকুমার চৌধুরী—এইখানে ব'সো, বলে তক্তপোষের উপরে তাঁর পাশেই আমায় বসালেন।···যাই হোক, যে রাগিণীর খেলা তখন চলছিল, অল্পক্ষণেই তা শেষ হয়ে গেল। উপস্থিত শ্রোতা সকলেই তখন ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। একজন তার মধ্যে বলে উঠলেন—এই হ'ল যথার্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিক, কত তপস্যার ফল—এসব নিয়ে কালচারের সৌভাগ্য কয়জনের হয়?

অপর একজন বলে ফেললেন—জীবন মশাই, আপনার তিলক কামোদ শুনব।

কামানো দাড়ি, ছাঁটা গোঁফ, প্রশস্ত ললাট, তাতে চন্দনের ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, চন্দনলিপ্ত সোনার কবচে সোনার চেন বাঁধা, নাতিদীর্ঘ জীবন মশাই গৌরবর্ণ, প্রৌঢ় ব্যক্তি। বেশ মোটাসোটা, মাথায় টাকের আভাস, গম্ভীরস্বর তাঁর। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন ক'টা বেজেছে?

ঘড়ি ছিল না সেখানে। একজন বললেন—সাড়ে তিনটে-চারটে হবে।'

তবে তিনি বললেন—তিলক কামোদের সময় নেই। গৌড়সারঙ্গ বাজাচ্ছি, শুনুন।

তারপর আলাপ আরম্ভ হ'ল। গৌড়সারঙ্গের যে রূপ বীণায় ফুটালেন, এ অনির্বচনীয়। সেইদিন যেন আমার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নূতন জন্ম হ'ল।"

এই মহম্মদ আলী ... এই মশ দীপল হরেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। ধনী শিষ্যের বাড়ী থেকে দক্ষিণার ব্যবস্থাও ছিল বেশ। মাসিক একশ টাকা, উপরন্ত চাল, ডাল, ঘি, তেল, ময়দা, ইত্যাদি সিধার বরাদ্দ। আজ থেকে ৫০।৬৫ বছর আগেকার হিসেবে খুবই ভাল বলতে হবে।

দীপল মহাশয়ের কাছেও সেতারে শিক্ষা নিতেন হরেন্দ্রকৃষ্ণ। তাঁর পরেই যখন তিনি কৌকব খাঁর তালিম পেতে আরম্ভ করলেন, সেই সন্ধিক্ষণে সেদিনের আসরটি বসেছিল। আরো বলা যায়, সে আসর সেদিন ওইভাবে হয়েছিল বলেই হরেন্দ্রকৃষ্ণ শিখতে আরম্ভ করেন কৌকব খাঁর কাছে। সেদিনকার আসর না হ'লে মশ দীপলের শেষ জীবন অন্যরকম হ'ত, অন্তত ওই কাণ্ড ঘটত না এবং হরেন্দ্রকৃষ্ণকেও হয়ত কৌকব খাঁ শিষ্যরূপে লাভ করতেন না।

সেদিনের আসরটির গল্প বলবার আগে শীল মহাশয়ের কথা আরো কিছু জানাবার আছে। তাঁর সঙ্গীত-জীবনের কথা শুধু নয়, তাঁর ব্যক্তি-জীবনের কথাও। সে জীবনও যেন একটি বিয়োগান্ত নাটক।

জন্মকালে যাঁর মুখে সোনার চামচ, মধ্যজীবনে যিনি কলকাতার একজন নাম-করা ধনী, শেষ বয়সে তিনি হন সর্বস্বান্ত। একমাত্র বংশধর হিসেবে স্থাবর-অস্থাবর যত সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন তার মোট মূল্য তখনকার হিসেবেই কম-বেশি এক কোটি টাকা হবে। এই বিপুল ঐশ্বর্য কয়েক বছরের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায় তাঁর হাত দিয়ে। গিয়েছিল সব রকমেই। বিলাসে—সেকালের কাপ্তেনীতে, সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতায়, ব্যবসায়ে, বিশ্বাস-ঘাতকতায়, দান-খয়রাতে। তার মধ্যে একটি বড় অংশ চলে যায় ব্যবসায়ের খাতে। সুবর্ণ বণিক ব্যবসায়ী বংশে জন্ম হ'লেও তিনি ব্যবসায়ী আদৌ ছিলেন না। ব্যবসায়েই তাঁদের সমস্ত পারিবারিক সম্পদ সঞ্চিত হলেও তিনি একেবারে ব্যর্থ হন ব্যবসায় করতে গিয়ে। বণিকের সে হিসেবী বুদ্ধি আর মানুষ চেনবার ক্ষমতা কিছুই তাঁর ছিল না। একের পর এক মোটা মোটা টাকার কারবারে নেমেছেন, কিন্তু ভার দিয়েছেন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের ওপর। তাঁদের স্বরূপ চিনতে পারেন নি। সরল, উদার, মানুষের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন চিরদিন। অনেকাংশে সেই বিশ্বাসই তাঁর কাল হয়েছিল, বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই তাঁর বেশি নষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য আর অধিক আলোচনা অবান্তর।

তবে তাঁর স্বভাবের বিষয়ে আরো দু'একটি কথা এখানে বলে নেওয়া যায়। বিলাস-বৈভবের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে দুর্বলতা যেমন তাঁর চরিত্রে প্রকাশ পায়, তেমনি অন্যদিকে মনের সারল্য ও মনুষ্যত্ব-বোধ কোন অবস্থাতেই হারিয়ে যায় নি তাঁর। ঐশ্বর্যের সমস্ত রকম ভোগের মধ্যেও অন্তরে তাঁর কোথায় এক f রাসক্তির ঔদাস্য ছিল। তাই সর্বস্বান্ত হবার পর তাঁর মনের কোন বৈকল্য ঘটতে দেখে নি কেউ। সমস্ত ব্যাপারটাকে অতি সহজভাবে নিয়েছিলেন। বিপর্যয় একদিনে, এমন কি এক বছরেও হয়নি, বছরের পর বছর ধরে তাঁটার স্রোত বইতে থাকে একটানা। সতর্ক হবার অনেক সুযোগ পেয়েও সাবধান হন নি। তখনও সর্বস্ব যায় নি এমন এক সময়ে রাণাঘাটের সঙ্গীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে, সেখানকার এক আসরে যোগ দিতে যাবার সময়ে, হরেন্দ্রকৃষ্ণ বলেছিলেন—'আশী লাখ টাকা উড়ে গেছে।' কিন্তু তবু 'চৈতন্য' হয় নি।

অবশ্য বিপর্যয়ের পর তিনি প্রায় দশ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু পূর্ব জীবনের জন্যে কোন ক্ষোভ বা চিত্ত-বিকার বা অনুশোচনা ছিল না। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত মন। আগে নিজে যেমন সঙ্গীতচর্চা করতেন, এখনও তেমনি চলতে থাকে। শুধু সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের জন্যে আর্থিক কিছু করা আর সম্ভব হয় না। সহরতলিতে থাকেন অতি সাধারণ পরিবেশে। কিন্তু সকলের সঙ্গে মেলামেশা, দেখা-সাক্ষাৎ, আসরে যোগদান ইত্যাদি বিষয়ে আগেকারই মতন সামাজিক, মজলিসী। গায়ে পুরু মলমলের পাঞ্জাবী, মোটা কাপড় আর ক্যাম্বিসের

জুতো পায়ে এ-সময়ে তাঁকে পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কিংবা গান-বাজনার আসরে দেখা যেত। কখনও শিল্পীরূপে, বেশির ভাগই শ্রোতা হিসেবে। কোন কোন দিন বিনা আমন্ত্রণেও সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হয়েছেন মনের টানে। যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা খাতির আপ্যায়ন করতেন। যাঁদের জানা ছিল না, তাঁদের লক্ষ্যই পড়ত না তাঁর দিকে। তিনি কিন্তু নির্বিকার। গান-বাজনা শুনে আস্তে আস্তে আসর থেকে চলে গেছেন।

তাঁর মনের সহনশক্তি আর বিকারশূন্যতার কথা বলতে গেলে গল্প-কথা মনে হবে। তার এক একটি দৃষ্টান্ত বিশ্বাস করাই শক্ত। যেমন ওই আসরের বাড়ীতে নিলাম হওয়ার দিনটির কথা। অট্টালিকা তখন দেনার দায়ে হস্তান্তরিত হয়ে যাবে এ কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তারই উদ্‌যোগ পর্ব হিসেবে অতি মূল্যবান সব আসবাব-পত্রাদি নিলামে চড়ে সেদিন। এতকালের এমন এক সৌখীন ধনী পরিবারের কত রকমের সরঞ্জাম, কত বহু-মূল্য জিনিষ। সব সেদিন ওই বাড়ী থেকেই নিলামে জলের দামে যখন বিক্রয় হয়ে যায়, তিনি তখন এক-তলার একটি ঘরে বসে সুরবাহার বাজাচ্ছিলেন। জলন্ত নগরীর মধ্যে রোম-সম্রাট নীরোর পরমোল্লাসে হার্প বাজাবার জন্যে তাঁকে উপমিত করা চলে না, কারণ নীরোর মতন তিনি হৃদয়হীন ছিলেন না এবং হতভাগ্য প্রজাদের অসংখ্য দুঃখতাপের দৃশ্যের মধ্যেও সঙ্গীত উপভোগ করেন নি তিনি। নিজের দুর্ভাগ্যের দৃশ্য এড়াবার জন্যেই হয়ত সুরবাহারে রাগালাপের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর সমাসন্ন সর্বনাশের দৃশ্য সেই নিলামের খবর পেয়ে সেদিন তাঁর অনেক প্রতিবেশীরই দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল, কিন্তু তাঁকে দেখা যায় সমাহিতচিত্ত, নিরুদ্বিগ্ন, সঙ্গীতে নিমগ্ন!

তারপর আরও এক কঠিন আঘাত। শরীরের এক-দিক পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেল। কিন্তু দিন তখনও অপরাজিত। সেই অবস্থাতেও গান-বাজনার সঙ্গে রীতিমত সংস্পর্শ রেখেছেন। নানা আসরে আর সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, শ্রোতা হিসেবে সব সময় নয়, শিল্পীরূপেও। একটি হাতও অবশ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং এত সাধের ও এত দিনের সাধনার সুরবাহার বাজাবার আর সাধ্য ছিল না। তাই তখন মাঝে মাঝে আসরে গান গাইতেন—খেয়াল। তৈরি গাওয়া এ অবস্থায় অসম্ভব, তা ছাড়া জীবনে বেশীর ভাগ কণ্ঠের চেয়ে যন্ত্রসঙ্গীতেরই সাধনা করেছিলেন। এখন যে আসরে গান গাইছেন, এ-ই যথেষ্ট। সঙ্গীতের কত বড় প্রেরণা থাকলে কোন অপেশাদারের পক্ষে শরীর ও জীবনের এই অবস্থায়ও গান গাওয়া সম্ভব হ'তে পারে, তা ভাববার কথা।

এই দুর্দিনে শুধু যে গান গাইতেন, তা নয়। সঙ্গীত বিষয়ে নানাপ্রকার চিন্তাও করতেন। তাঁর একটি চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা খেয়াল গানের বিষয়ে। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে (১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ) তিনি বাংলা ভাষায় খেয়াল গানের স্বপক্ষে এক অভিভাষণ দিয়েছিলেন। পাঠক-পাঠিকাদের তাঁর মত জানবার কৌতূহল হ'তে পারে বিবেচনায় তাঁর ভাষণ থেকে প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল। এই উদ্ধৃতির পরেই আরম্ভ করা হবে সেদিনের আসরের গল্পটি।

সম্মেলনে অভিভাষণের মধ্যে তিনি বলেন—'আমার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি প্রধানতঃ একটি বিষয়ের অভাব আমাদের দেশের সঙ্গীতের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছি। সে বিষয়টি আর কিছুই নহে—'খেয়াল'। খেয়াল সাধারণতঃ হিন্দী বা উর্দু ভাষাতেই প্রচলিত, বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের দেশে যে যে মহোদয়গণ খেয়াল গানে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই হিন্দী বা উর্দুতে রচিত খেয়ালই আসরে গাহিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে বাংলা ভাষাতে যেন খেয়াল গান হয় না। কেন যে বাংলায় খেয়াল রচনা হয় নাই তাহার মূল কারণ আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় যে পূর্বকালে গায়ক সঙ্গীতজ্ঞগণ অধিকাংশই অবাঙ্গালী ছিলেন এবং যে সময় খেয়াল গানের সৃষ্টি হয় তখন ভাষায় এত উৎকর্ষ লাভ হয় নাই এবং তখন উর্দু ভাষারই দেশে প্রচলন ছিল। এমন কি এই বাংলা দেশেও হিন্দুরা উর্দু পাঠ করিতেন। ইংরাজ রাজত্বে

পূর্বে মুসলমান রাজত্ব ছিল এবং তজ্জন্য প্রধানত উর্দু ভাষাই রাজভাষা ছিল। প্রত্যেক প্রজাকেই তখন রাজভাষা পাঠ করিতে হইত, আর যে যে বাঙালী মহোদয়গণ খেয়াল গানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা অধিকাংশই অবাঙালী সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পর-ভাষাতেই এই গান শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এতাবৎকাল বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। যাহা হউক পর-ভাষায় রচিত গান গাহিয়া অনেক সময় অনেক কথার প্রকৃত উচ্চারণ করিতে পারা যায় না এবং আমি অনেক আসরে লক্ষ্য করিয়াছি যে বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞ খেয়াল গান গাহিতেছেন এবং কোন একটি কথার প্রকৃত উচ্চারণ হইতেছে না বলিয়া সভার অপরাপর অ-বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞগণ পরস্পর বিদ্রূপের সহিত ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। ইহা বড়ই অনুশোচনার বিষয়। অবশ্য যিনি গাহিতেছেন তাঁহার কোন দোষ নাই, তিনি সে কথাটির প্রকৃত অর্থ বুঝেন না বা উচ্চারণ জানেন না বা ইহাও হইতে পারে যে এমন উর্দু বা হিন্দী কথা আছে যাহা বাঙালীর মুখে ঠিকভাবে উচ্চারণ হয় না। যাহা হউক একথা খুব সত্য যে মাতৃভাষা যেভাবে উচ্চারণ করা যাইতে পারে পর-ভাষা সে ভাবে কখনই পারা যায় না। আরও দেখিয়াছি যে কোন এক নামজাদা বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞকে জাতীয় ভাষায় খেয়াল গাহিতে অনুরোধ করায় তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন। এই যেমন একটি সাহেব যদি বাংলা উচ্চারণ করেন তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা অনেক সময় হাসিয়া থাকি। আবার সাহেবরাও অনেক বাঙালীর মুখে অনেক সময় ইংরেজী কথা শুনিয়া হাসেন, ইহার কারণ আর কিছুই নহে মাতৃভাষা আয়ত্ত বা উপলব্ধি করা সহজ, পর-ভাষা উপলব্ধি করা তত সহজ নয়। যাহা হউক, খেয়াল গানের ভিতর আমি এই অভাবটি বেশ উপলব্ধি করিতেছি। এই খেয়াল গান যদি আমাদের বাংলা ভাষায় রচিত হইত তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় এ দুর্দশা আজ হইত না। আমরা সকলেই গানের প্রত্যেকটি কথা ও তাহার অর্থ ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতাম, এবং তজ্জন্য সে গানটিকে যতদূর সম্ভব উন্নত স্তরে গাহিতে সক্ষম হইতাম। গানের প্রতি শব্দের অর্থ ভালভাবে উপলব্ধি করিয়া গাহিলে যতদূর ভাবানুগত রসের বিস্তার করা যায়, উহার অর্থ না জানিয়া গাহিলে কখনই তাহাতে সাফল্য লাভ করা যায় না। এই কারণে আমার মনে হয়, বাংলা ভাষায় রচিত খেয়াল গান যদি বাঙালী মহোদয়গণ প্রত্যেকে আয়ত্ত করেন তাহা হইলে অবিলম্বে এই খেয়াল গানে তাঁহারা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং বাংলা দেশের সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—'তাঁহারা যেন বাংলা ভাষায় খেয়াল গানের প্রচলন দ্বারা ভবিষ্যতে বাংলা দেশে যাহাতে এই (বাংলা) খেয়ালের উৎকর্ষ লাভ হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন।...'

হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ীর সেই আসর যখন হয়েছিল, তখন তিনি নন্দ দীঘলের কাছে সেতার শিখতেন।

সে সময় একদিন তিনি বাড়ীতে বসে সেতার বাজাচ্ছেন, এমন সময় শিবকুমার ঠাকুর একজন পশ্চিমা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জলসাঘরে এলেন।

হরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতিবেশী এবং পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শিবকুমার ঠাকুর হলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং নিজেও সেতার-বাদক। সঙ্গে যাঁকে এনেছিলেন, হরেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—এঁর নাম কৌকব খাঁ। অতি গুণী। সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন। এখন কলকাতাতেই থাকবেন।

হরেন্দ্রকৃষ্ণেরও পরিচয় দিলেন খাঁ সাহেবকে।

সে হ'ল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সৌরীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে ওস্তাদ কৌকব খাঁকে তার কিছুদিন আগে কলকাতায় আনা হয়েছে। কাশী কিংবা এলাহাবাদ থেকে তিনি এসেছেন যতীন্দ্রমোহনের আমন্ত্রণে।

ভারতবর্ষে সরদ বাদনের অন্যতম প্রবর্তক, খ্যাতনামা গুণী নিয়ামৎউল্লা খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আসাদুল্লা খাঁ—কৌকব খাঁ নামে পরিচিত। সরদে বালক বয়স থেকে পিতার তালিম পেয়েছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করামৎউল্লারও। আসরে কৌকব খাঁ সরদের চেয়ে ব্যাঞ্জো বেশী বাজান।

সেতারের চর্চাও ভালভাবে করেছেন। তালিমও দিতে পারেন সেতারে।

তাঁকে যখন হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ীতে শিবকুমার নিয়ে আসেন, তার আগেই তিনি (শিবকুমার ঠাকুর) খাঁ সাহেবের কাছে সেতার শিখতে আরম্ভ করেছেন।

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ীর আনুকূল্যে কৌকব খাঁ আসেন কলিকাতায়। সেজন্য তাঁদের বাড়ী থেকেই তাঁকে কলিকাতার সঙ্গীতপ্রেমী ধনী সমাজে পরিচিত করে পৃষ্ঠপোষকতার চেষ্টা করা হয়। শিবকুমারও তাই তাঁকে এনেছিলেন হরেন্দ্রকৃষ্ণের কাছে। তাঁদের বন্ধুস্থানীয় এই শীল পরিবারের যে রকম সঙ্গীতপ্রেম ও পৃষ্ঠপোষকতা, তার ওপর হরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজে সেতারের চর্চায় যেমন আগ্রহী, তাতে খাঁ সাহেব এখানকার আনুকূল্য লাভ করতে পারলে তাঁর পেশার পক্ষে ভালই হবে।

আগেই বলা হয়েছে, শিবকুমার যখন কৌকব খাঁকে সঙ্গে নিয়ে হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ীতে আসেন, তখন তিনি সেতার বাজাচ্ছিলেন জলসাঘরে।

পরস্পর আলাপ-পরিচয়ের কথার মধ্যে তাঁর সেতার বাজনা থেমে গিয়েছিল।

প্রাথমিক পরিচয়াদির পর কৌকব খাঁ হরেন্দ্রকৃষ্ণকে বাজনা বন্ধ না রেখে পুনরায় বাজাতে অনুরোধ করলেন, শিষ্টাচার বশতই হয়ত। বললেন—আপনি বাজান যা বাজাচ্ছিলেন, একটু শুনি। বাজনা চলুক না।

তিনি বাজাচ্ছিলেন তিলক কামোদ। খাঁ সাহেবের কথায় আবার তার আলাপচারি করতে লাগলেন। বিশিষ্ট শ্রোতার জন্তে বাজালেন খানিকক্ষণ।

বাজনা শেষ হবার পর সেতাৎ কথাপ্রসঙ্গে তিনি খাঁ সাহেবকে এই তিলক কামোদ কেমন লাগল, সে কথা জিজ্ঞেস করলেন। নিজের প্রশংসা শোনবার জন্তে নয়, পশ্চিমের গুণী অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করবার জন্তেই জানতে চাইলেন তাঁর মতামত।

কৌকব খাঁ কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেন না। নিরীহ ভাবায় মারাত্মক শ্লেষ প্রকাশ করে বললেন—বাজনা আপনার বেশ। তবে এ রকম তিলক কামোদ বাড়ীতে বসে বন্ধু-বান্ধবদের শোনানই ভাল। বাইরের আসরে সকলকে শোনাবার মতন নয়।

হরেন্দ্রকৃষ্ণের তখন যুবক বয়স। মনে বিলক্ষণ আহত এবং আশ্চর্যও হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন? এ তিলক কামোদের কি হয়েছে?

—রাগে ভুল আছে।

—কি ভুল?

—উদারা গ্রামে ওরকম কাজ হবে না।

উদারায় কোন্ স্বরের কি প্রয়োগ-বিধি নিয়ে খাঁ সাহেব ভুল দেখিয়েছিলেন, তার বিবরণ সঠিক জানা যায় নি। তবে ওই উদারায় কি একটা ত্রুটির কথা বলেছিলেন।

প্রথম দিন তর্কটা ওই পর্যন্তই রইল। তাঁরা দু'জন বিদায় নিলেন খানিক পরেই। হরেন্দ্রকৃষ্ণ কিন্তু কথাটা ভুলতে পারলেন না। মনের মধ্যে বিঁধতে লাগল মাঝে মাঝেই।

তখন তিনি নন্দ ঘোষালের কাছে নিয়মিত শিখতেন এবং তিলক কামোদের এই আলাপচারি তাঁরই কাছে পাওয়া। গুরুর ওপর তাঁর শ্রদ্ধা বিশ্বাস দুই-ই ছিল তাই প্রথমে তাঁকে এ বিষয়ে জানাতে সঙ্কোচ হ'ল, কিন্তু না জানানোও ঠিক মনে হ'ল না তাঁর। শেষে ঘোষাল মশাইকে কৌকব খাঁর মন্তব্যের কথা জানালেন।

নন্দ ঘোষাল শুনে বললেন—আমার তিলক কামোদে কোন ভুল নেই।

তাঁর এই কথা তখন হরেন্দ্রকৃষ্ণ লোক মারফৎ জানিয়ে দিলেন কৌকব খাঁকে।

খাঁ সাহেব উত্তরে জানালেন যে, এই তিলক কামোদে গলদ আছে। তিনি এ বিষয়ে কোন প্রকাশ্য আসরে আর পাঁচজন ওস্তাদের সামনে পরীক্ষা দিতে পারেন, যদি প্রয়োজন হয়। তিনি সে রকম কোন আসরে আহ্বান জানাচ্ছেন শীল মহাশয়ের গুরুকে। সকলের সামনেই বিচার হয়ে যাক কার কথা ঠিক।

হরেন্দ্রকৃষ্ণ কৌকব খাঁর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষাল মশায়কে বলে জিজ্ঞেস করলেন—এ রকম একটা আসর কি তা হ'লে করব? আপনি তাতে রাজি আছেন ত?

নন্দ ঘোষাল সম্মত হলেন এবং জানালেন আসরে

বন্দোবস্ত করতে। সে আসরে তিনি বাজাতে প্রস্তুত আছেন।

তারপর স্থির হ'ল, বাংলার বাইরে থেকে কোন বড় ওস্তাদ যন্ত্রীকে নিয়ে আসা হবে। তিনি এই বিচার আসরে উপস্থিত থেকে সকলের মতামত নিয়ে সাব্যস্ত করবেন এঁদের তিলক কামোদের ঠিক-বেঠিকের কথা।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং সঙ্গীত মহলে সন্ধান নিয়ে হরেন্দ্রকৃষ্ণ এক সুরবাহার-বাদক ওস্তাদকে আনবার ব্যবস্থা করবেন। তিনি এ আসরে বাজাবেনও। দুজনো এক রাতের অনুষ্ঠানের জন্যে এক হাজার টাকা। তা ছাড়া সদলে তাঁর যাতায়াতের খরচপত্র।

সে সুরবাহারী ওস্তাদের নামটি কিন্তু জানা যায় নি। তিনি তখন না কি হায়দরাবাদের দরবারে অবস্থান করছিলেন, সেখান থেকেই তাঁকে কলিকাতায় হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ীতে বিশেষ করে আনা হয় এই জলসার জন্যে। তার আগে তিনি বোধ হয় কলিকাতায় আসেন নি। বহু মান্য গুণী যন্ত্রী শুনে হরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁকে নেতৃত্ব করতে দেন এই বিতর্কের আসরে।

হায়দরাবাদ থেকে তিনি এসে পৌঁছতে কৌকব খাঁ এবং নন্দ মীখনকে জানিয়ে আসরের দিন স্থির করা হ'ল। দোতলার সেই প্রকাণ্ড জলসাঘরে সেদিন সন্ধ্যার পর আসর বসল, তিলক কামোদের বিচার ও নিষ্পত্তির জন্যে।

নন্দ মীখন ও কৌকব খাঁ শুধু নন, কলিকাতার আরও কয়েকজন নামী গুণী আসরে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লছমীপ্রসাদ মিশ্র, বিশ্বনাথ রাও প্রভৃতি। হায়দরাবাদ থেকে আগত ওস্তাদের সঙ্গে এলেন তাঁর পুত্র ও ক'জন সহচর। গায়ক বাদক শিল্পী এবং শ্রোতাদের নিয়ে আসর পূর্ণ হয়ে গেল। অনেকেই কৌতূহলী হলেন নন্দ মীখন ও কৌকব খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখবার জন্যে।

কি ভাবে ব্যাপারটি আরম্ভ ও অগ্রসর হয় এবং বহিরাগত এই প্রবীণ ওস্তাদ কি ভাবে বচসার নিষ্পত্তি করেন তা দেখতে শ্রোতাদের মধ্যে রীতিমত ব্যগ্রতা জাগল। আসর আরম্ভ হওয়ার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন সকলে।

ওস্তাদজী তাঁর সুরবাহার যন্ত্রও নিয়ে এসেছিলেন অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গে। আসরের উদ্দেশ্য তাঁর ভাল রকমই জানা ছিল এবং এও তিনি বুঝলেন যে এ ধরনের আসরে বাক-বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পরিণতি ঘটতে পারে। অন্তত সঙ্গীতের একান্ত ও শান্তির পরিবেশ আর থাকবে না প্রতিযোগীদের বাজনা আরম্ভ হলে এবং তারপরে তাঁর নিজের মেজাজ আসবে না বাজাতে।

সুতরাং তিনি বললেন যে, তিনি আগে বাজিয়ে নেবেন। শেষে হবে দুই বাদকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। হরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি তাঁকে সমর্থন জানালেন।

বাজনা আরম্ভ করবার আগে ওস্তাদজী বেশ সপ্রতিভ ভাবেই তাঁর নিজস্ব প্রস্তুতি-পর্বটি সারলেন। এমন প্রকাণ্ড আসরে এত অপরিচিত লোকের সামনেও তিনি বেশ খানিকটা পান করে নিলেন অম্লান বদনে। একটি রূপোর পাত্রে পূর্ণ জোগান দিলে তিনি প্রায় এক নিঃশ্বাসে উদরসাৎ করে ফেললেন। ব্যাপারটি অভিনব বোধ হ'ল অনেকের কাছেই—এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তাঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন পরস্পর।

তারপর ওস্তাদজী খোস মেজাজে যন্ত্র নিয়ে বসলেন। যন্ত্র বেঁধে নিয়ে তখনই কিন্তু বাজনা আরম্ভ করলেন না, বরং দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আর একটি।

তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন। তার মর্মার্থ হ'ল—এখন আমি একটি রাগ আলাপ করব, যা শুনে আপনাদের মধ্যে একটি বিশেষ ভাব দেখা দেবে। তা আমি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখতে চাই। সে ভাবটি কি, তা আমি সকলের সামনে এখন বলে দিলে মজা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যে বুজরুকি করছি না তা জানাবার জন্যে আমি একটি কাগজে কিছু লিখে রাখব। তাতে লেখা থাকবে, আমার বাজনার সুর শুনে আপনাদের মধ্যে যে রকমের ভাব হবে তার কথা আপনারা পরে মিলিয়ে দেখবেন, সত্যি বলেছি কি না।

এই বলে তিনি এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিলেন এবং তাতে কি লিখে উপুড় করে কার্পেটের ওপরে রাখলেন। কাগজটির ওপর চাপা দিয়ে দিলেন সেই

আসরের সকলের মনে। শ্রোতারা একটি অনাস্বাদিত আনন্দ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তারপরই আরম্ভ হ'ল বহু-প্রতীক্ষিত সেই বিতর্কের সভা।

ওস্তাদজী এবার বাজনা আরম্ভ করতে বললেন। তিনি প্রস্তুত হলেন অশান্তি এবং তার নিষ্পত্তির জন্যে। কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে তা তাঁর বা আসরের অন্য কারুরই কল্পনার অতীত ছিল।

কৌকব খাঁ তর্ক উঠিয়েছিলেন যে, নন্দ দীঘলের তিলক কামোদে ঊদারা গ্রামে ভুল আছে। সুতরাং আসরে কথা হল যে, দীঘল মশায় এখানে সর্ব-সমক্ষে তিলক কামোদ বাজাবেন, তারপর কৌকব খাঁ জানাবেন তার ত্রুটি কোথায়। তখন ওস্তাদজী এবং অন্যান্য গুণীজন বিবেচনা করবেন, দু'জনের মধ্যে কার মত সঠিক।

এবার নন্দ দীঘলকে বাজাতে অনুরোধ করা হ'ল। কৌকব খাঁ তাঁর সামনেই রইলেন, সময় বুঝে নিজের মতামত প্রকাশ করবার জন্য। লছমী ওস্তাদ, বিশ্বনাথ রাও, হরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতিও কাছাকাছি রয়েছেন। উৎসুক শ্রোতায় পরিপূর্ণ আসর।

নন্দ দীঘল যন্ত্র তুলে সবেমাত্র বাজাতে আরম্ভ করেছেন, কি করেন নি, কারুর সঠিক তা লক্ষ্য হয় নি—তার পরই দেখা গেল, তিনি বাজাতে অসম্মতি জানাচ্ছেন।

ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে না পেরে ওস্তাদজী তাঁকে বাজনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তবুও রাজি হলেন না দীঘল মশায়। তখন আসরের আরও কেউ কেউ তাঁকে বাজাতে বললেন, শোনা গেল। কিন্তু তিনি কারুর কথায় কর্ণপাত করলেন না।

তাঁকে যেন কেমন অসুস্থ দেখাতে লাগল। তিনি ঘর্মাক্ত হতে লাগলেন বসে বসে। শ্রোতাদের অনেকেই পরস্পরের মুখের দিকে চাইলেন—ব্যাপার কি?

তিনি শুধু ঘামতে লাগলেন না, একটু পরেই কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। এবারে উদ্বিগ্ন হলেন উদ্যোক্তারা। কেউ কেউ তাঁকে বাতাস করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর ঘাম কমল না, সেই সঙ্গে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। দু' চোখ বুজে রয়েছেন এবং অত্যন্ত পীড়িত দেখাচ্ছে তাঁকে।

তখন তাঁকে ধরাধরি করে পাশের একটি ঘরে নিরিবিলিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আসরে সোরগোল পড়ে গেল।

পাশের ঘরে খানিকক্ষণ সেবা-যত্ন করেও সুস্থ হলেন না দেখে, তাঁকে গাড়ি করে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। বাড়ীতে ফিরে যাবার একদিনের মধ্যেই মৃত্যু হ'ল নন্দ দীঘলের। অনেক চিকিৎসাতেও তাঁকে বাঁচানো যায় নি।

তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই জমাট আসরও একেবারে মাটি হয়ে যায়, সে কথা বলা বাহুল্য।

এই অবস্থায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু বড়ই শোচনীয় ব্যাপার। অনেকেরই মনে হ'তে পারে, এত বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বিদ্যার পরিচয় দিতে ভীত হয়ে পড়েন তিনি এবং তারই ফলে মৃত্যু। খানিকটা ভাল ভাবে বাজাবার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর রাগ-জ্ঞান সম্বন্ধে এমন অপযশের কথা কেউ-ই ভাবতে পারত না। কারণ, আসরে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের সময়ে আরও কয়েক-জন গুণী শিল্পীর মৃত্যু ঘটে গেছে কলকাতাতেই, এই ঘটনার আগে এবং পরেও। ('সঙ্গীতের আসরে' পুস্তকে তেমন ক'টি দুর্ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে)। তবে তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে জোর করে কোন মতামত দেওয়া যায় না। থ্রম্বসিস জাতীয় রোগে তিনি গত হ'তে পারেন এবং বাজাবার আগে থেকেই তার অদৃশ্য আক্রমণ তাঁর দেহে ক্রিয়া করতে পারে। তার জন্যেও অসুস্থ বোধ ক'রে তিনি বাজাতে অসম্মত হন হয়ত। তাঁর যদি আত্মবিশ্বাস না থাকত, তা হ'লে তিনি কৌকব খাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে আসরে বাজাতেই আসতেন না। 'প্রাণকুমার' বইয়ের উদ্ধৃতি থেকে দেখা গেছে যে, তিলক কামোদের জন্যে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। কৌকব খাঁ যে তাঁর রূপায়ণে কিছু ত্রুটি দেখেছিলেন তা বেদবাক্য কিংবা সত্যের শেষ কথা মনে করবার কারণ নেই। কোন একটি রাগ নিয়ে দু'টি ভিন্ন ঘরের শিল্পীর মধ্যে প্রচণ্ড মতানৈক্য নতুন কথা নয়। ওস্তাদদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের এ নিয়ে শেষ নেই। সেকালে তা আরও

বিকট্ ভাবে ছিল। তার ওপর, কৌকব খাঁ উচ্চাঙ্গের শিল্পী হলেও জাত পাঠান এবং সঙ্গীত ব্যবসায়ী। যোদ্ধা-সুলভ একটা সংগ্রামী মনোভাব তাঁর ছিল এবং বাংলা দেশের সঙ্গীতক্ষেত্রে পেশাদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সুরের লড়াইও করেছেন। এক্ষেত্রেও কাজ করতে পারে তাঁর সেই মনোভাব। হরেন্দ্রকৃষ্ণের এই শিক্ষককে পর্যুদস্ত করতে পারলে শিষ্যকে লাভ করা যেতে পারে। (দীঘল মশায়ের মৃত্যুতে হরেন্দ্রকৃষ্ণ কৌকব খাঁর শিষ্য হয়েছিলেনও)। তা ছাড়া, তিলক কামোদ এমন কিছু একটা কূট বা ভারি রাগ নয় (দেশ, বেহাগ ও কামোদের সংমিশ্রণে তিলক কামোদ গঠিত) যে, নন্দ দীঘল তার মধ্যে একটা বড় রকমের গলদ করবেন। সুতরাং ওদিক থেকে জোর করে বলা যায় না তাঁর বিরুদ্ধে।

কৌকব খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করামৎউল্লা খাঁ পরবর্তী কালে একবার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নট কামোদকে অনাভিজ্ঞে ভুল বলে মন্তব্য করেছিলেন। তার পর একটি প্রকাণ্ড আসরে পাঁচ জন গুণীর সামনে বিচারে প্রমাণ হয়ে যায় যে, কোন ত্রুটি ছিল না গোঁসাইজীর নট কামোদ রূপায়ণে। পশ্চিমের ওস্তাদরা অনেক সময়ে বাংলা দেশে অহেতুক অহমিকা প্রকাশ করে গেছেন। কৌকব খাঁর ব্যবহারও এক্ষেত্রে সেরকম কিছু ছিল না এমন কথা কেউ বলতে পারেন না নিশ্চিত করে।

নন্দবাবুর আর একটি দিনের বিবরণ এখানে পূর্বোক্ত 'প্রাণকুমার' বইখানি থেকে উদ্ধৃত করা হবে। যদিও সঙ্গীতের সঙ্গে বা তাঁর সঙ্গীত-জীবনের সঙ্গে বিষয়টির আপাত কোন সম্বন্ধ নেই, তবু অন্তর্গূঢ় কোন সম্পর্ক আছে কি না পাঠক-পাঠিকারা বিচার করতে পারেন ইচ্ছা মতন। মানুষের পাপপুণ্যের বিচারকর্তা বিধাতার অস্তিত্বে অনেক সময় সন্দেহ জাগে, সংসারে দুরাত্মাদের নির্ভয়ে পাপকর্ম ক'রে যেতে দেখে। কিন্তু 'ভগবানের চাবুক' কথাটির কোন তাৎপর্য আছে কি না কিংবা এক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায় কি না পাঠক-পাঠিকারা বিবেচনা করে দেখবেন। উদ্ধৃতি—

"দীঘল মশাইয়ের কথা আরও একটু আছে এখানে। একটা মহাপাপ ছিলেন তিনি আমাদের, শেষে অর্থাৎ উপরের বোধ হয় মাসখানেক পরে এক বিকালে এমন একটি ব্যাপার চোখে পড়লো যার ফলে আমাদের মধ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বিপরীত দিকে টলে পড়লো। আমরা তাঁর বাড়ীর সামনে, পার্কের দক্ষিণ দিকের রাস্তার এক বিকালে চু-কপাটি খেলা দেখছিলাম; দেখি একখানা পালকী হুম হাম ক'রে এসে নামলো সেইখানে যেখানে ছেলেরা খেলার মশগুল। আমরা সরে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে বেরিয়ে এলো একটি মহিলা, চওড়া কালাপেড়ে ধোপদোস্ত কাপড়, গহনাগাঁটি পরা। উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী, বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে দীঘল মশাইয়ের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন—তখন একটা চাকর বেরিয়ে আসছিল তাঁর বাড়ী থেকে, সে দেখেই খবর দিতে গেল ভেতরে। অল্পক্ষণেই দীঘল মশাই এলেন বেরিয়ে—বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, নিকাল যাও ইহাঁসে। মহিলাটি বললেন, 'কেন? আমি কি করেছি—আমায় এমন করে পায়ে ঠেলে চলে এসেছ?' 'কোন কথা শুনতে চাই না, খবরদার বলছি, চলে যাও এখান থেকে, না হলে চাবুক মেরে তাড়াবো', বলে দীঘল হাতে সঙ্কেত করলেন চলে যেতে। উত্তরে সেই মহিলা বললেন, 'মারো না মারো, তোমার হাতে চাবুক খেয়েই যাবো।' আশ্চর্য, দীঘল মশাই মিথ্যা ভয় দেখাতেই যে ঐ কথাটা বলেন নি,—সবাই, আমরা অবাক বিস্ময়ে কতকটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম। আমাদের তিনি মানুষ বলেই গণ্য করলেন না। 'চাবুক লাও', হুকুম করতেই কোচম্যান চাবুক নিয়ে এসে হাজির করলে, আর তিনি সপাসপ্ চালাতে আরম্ভ করলেন ঐ মহিলার গায়ে, পিঠে, সর্বাঙ্গে—'বেরোও বেরোও, এখান থেকে', এই বলতে বলতে। মেয়েটি—সেই চাবুকের প্রত্যেক আঘাত পেয়ে চমকে চমকে উঠতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'মারো, মারো, আরও মারো।' ভয়ে, বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমরা দেখলাম শেষ পর্যন্ত দীঘল মশাই ক্লান্ত হয়ে চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে নিজের বাড়ীতে গিয়ে বসলেন আর সেই মহিলাও উঠলেন। এ দৃশ্য আজও ভুলতে পারি নি। এতগুলি চাবুকের আঘাত মেয়েটি সহ্য ক'রে শেষে চোখের জলে, 'আচ্ছা চললাম, তুমি ভাল থাকো', এই বলে চলে গেল।"

এই নৃশংস ঘটনাটির পূর্ব বৃত্তান্ত অর্থাৎ মহিলার সঙ্গে নন্দবাবুর সম্পর্ক কি, তা জানা যায় নি। আন্দাজ করা যেতে পারে (সেকালে যেমন অনেক ঘটত) মহিলাটিকে হয়ত কুল থেকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে নিত্য গৃহস্থ সংসারী সেজে বাস করতেন সমাজের মধ্যে। তবে এই দৃশ্যে নন্দ জীবনের পাষণ্ড, বর্বর চরিত্র নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অসহায়া নারীর প্রতি এই অমানুষিক লাঞ্ছনা, এই চাবুক তাদের দণ্ডে তৌল হয়ে পরে অপরাধীকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিল। ভগবানের অদৃশ্য চাবুক চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল সেদিনকার আসরে।

ক্রমশঃ

—]•[—

আমাদের দেশের বাবু লোকেরা জাতির প্রধান অংশ নহে, কেবল তাহাদিগকে লইয়াই জাতি গঠিত ও নহেই। যাহারা চাষ করিয়া কুলি মজুরের কাজ করিয়া বা কোন প্রকার কারিগরি মিস্ত্রিগিরি করিয়া খায় তাহারাই জাতির প্রধান অংশ। তাহাদিগকে বাদ দিয়া জাতি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এই যে অধিকাংশ শ্রমী ও অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও গরীব লোক, তাহাদের জীবনের ও জীবিকার উপায়ের সহিত যে শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

॥ ৭ ॥

এক রবিবার সকালে পাদ্রী ব্রাউমুরেলোর অসাধারণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার হতবাক ও সন্ত্রস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আদেশ দেন মৃত্যুর কথা না ভেবে নির্বাচনের কথা ভাবতে। সে ভাবের বলে মানুষকে প্রাণ দান করা হয়েছে সে প্রাণের পূর্ণ ব্যবহার করার জন্য, যে আপন স্বদেশবাসীর সম্পর্কে উদাসীন সে ভগবান সম্পর্কে উদাসীন। যার বাছবিচার করার অভ্যাস আছে এই নির্বাচনে পক্ষ বেছে নিতে তার কোনও অসুবিধা নেই, কারণ এ বাছাই অন্য সব জিনিসের মতই, মঙ্গল এবং অমঙ্গলের মধ্যে বাছাই।

কেবল এমন সহজ বাছাই-এর সুযোগ কদাচিৎ হয়। কারণ একটা বোকা কথা বা বাক্যের মধ্যে বেছে নিতে কোনও লোকই সত্যিকারের দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। ঘরে আগুন লাগা কিংবা ছাদে নতুন তক্তাফেলার মধ্যে, পিতৃভূমির স্বাধীনতা অথবা উৎপীড়নের মধ্যে, ক্রশ চিহ্ন ভেঙে যাওয়া বা নতুন করে তৈরী হওয়ার মধ্যে, নিজের সম্পত্তির চারধারে একটা নতুন বেড়া তুলতে পারা বা সর্বস্বান্ত হওয়ার মধ্যে বেছে নিতে কারও দ্বিধা হয় না। ব্রাউমুরেলোরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে একজনের পর একজন পড়তে থাকে। ছোট্ট গির্জাটার জানলাগুলো ঝকঝক করে, চুনকামকরা দেয়ালের দরুন লোকগুলোর নির্দিষ্ট মুখগুলোর উপর আরও আলো পড়ে। তাদের চোখে উত্তরগুলোও পড়তে পারে ব্রাউমুরেলোর: ছেড়ে দাও আমাদের, ঠিক বলেছ, নিজের চরকায় তেল দাও, আমাদের ভাতে তুমি কাঠি দেওয়ার চেষ্টা করছ। শেষ পর্যন্ত তার আলগাইরারের দিকে চোখ পড়ে। টুপি পরা না থাকলে সব সময়েই যেমন হয়, আলগাইরারের তেমনিই সে রেগে এবং বিরক্ত হয়ে দুমড়ে মুচড়ে উঠতে থাকে। আলগাইরারের এবং পাদ্রীর মধ্যে যে দৃষ্টি বিনিময় হয় তা যেন পরিষ্কার ঝকঝকে গির্জাটার মধ্যে একখণ্ড মুদ্রার মত ঝকঝকিয়ে ঝনঝনিয়ে ওঠে।

উপাসনার পর ওরা সকলেই চৌধুরীর দিকে এগোয়, কারণ সরাইতেই ভোট-কেন্দ্র হয়েছে। সমস্ত চৌধুরীটার এবং গ্রামের রাস্তাগুলোর সাদা ও রঙীন ইস্তাহারের ছড়াছড়ি। কয়েকখানা পড়েছে চালের উপর, কয়েকখানা আবার বেড়ার ফাঁকে কিংবা লাইম গাছের ডালের মধ্যে আটকে গেছে। আজ সরাইতে কোনও পতাকা তোলা হয় নি। কিন্তু যে চারটে স্বস্তিকামার্কা পতাকার সঙ্গে সবাই পরিচিত হয়ে গিয়েছিল সে ক'খানা গলির ভিতর ঝুলছিল। ইতিমধ্যে সেখানে আর একটা পতাকা তোলা হয়েছে। তা ছাড়া অনেকগুলো কালো-সাদা-লাল পতাকাও বেরিয়েছে।

দিনটা ঠাণ্ডা, ব'ড়ো হাওয়া বইছে। আকাশে নীল ধূসরের মেলা। একগাদা কালো মাথার তুলনায় সব কিছুই আরও উজ্জ্বল এবং বর্ণাঢ্য দেখায়। তবু লোকেরা সুখী নয়, তারা বিমর্ষ এবং চিন্তামগ্ন। বিলিঙেন থেকে এস.এ.-দের দলে ভর্তি একটা বিরাট ট্রাক "হাইল" ধ্বনি দিতে দিতে ছুটে আসে এবং নতুন একরাশ ইস্তাহার ছড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণের জন্য লোকগুলো দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়, তার মধ্যে থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে শুধু অল্পবয়সী ছেলেদের কাছ থেকে "হাইল" ধ্বনি ওঠে। পনর মিনিট পরে কালো-লাল ও সোনালী রঙের পতাকা উড়িয়ে একটা ট্রাক আসে। ট্রাকের উপরকার লোকগুলো চিৎ-কার করে "স্বাধীনতা" ব'লে। একটি মাত্র গলার জবাব শোনা যায়,সে হ'ল ধাত্রীর স্বামী ভিলগারবারের। বেশীর ভাগ লোকই হাসে এবং মাথা নাড়ে। আধঘন্টা পরে নাৎসীদের ছোটো ট্রাক রাস্তা ধরে পর পর এগিয়ে আসে আস্তে আস্তে। একটার পর একটা ট্রাক থেকে যৌথ গলায় নির্বাচনী ধ্বনি ওঠে। চাষীদের মুখে ক্লান্তির ছাপ। শেষ পর্যন্ত হয়ত যে ভাবেই হোক একটা ফাঁদে

গিয়ে পড়তে হবে এই ধারণা থেকে তাদের সকলের মধ্যেই একটা অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের আভাস ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ভিতর কয়েকজন এরই মধ্যে ভোট দিয়ে জটলায় ফিরে এসেছে। পুরাণো সরকার, হিণ্ডেনবুর্গ, বিশ্বযুদ্ধ এবং রাইস্ টাগ সম্পর্কে তাদের ধারণা পরস্পরের কাছে বলাবলি করে তারা।

ভোটের দিনে সরাইখানা থেকে প্রথম যে মাতালটাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করা হয় সে হ'ল গ্রসম্যানের বড় ছেলে যে সাধারণ ভাবে এখানকার অন্তদের মতই প্রকৃতিস্থ থাকে। আশ্চর্যের কথা যে চাষীরা তাকে দেখে হাসে না, বরং তাকে নিজের মত উলল করতে দেয়। সেই সব পুরাণো লোক যারা দেশটাকে রসাতলে দিয়েছে মাতাল লোকটা তাদের গালাগালি দেয়, নতুন লোকেরা যে দেশটাকে একেবারে সম্পূর্ণ ধ্বংস করবে এই মর্মে সে দৈববাণী করতে থাকে —মানুষগুলো চুপ ক'রে এ কথা শোনে। নির্বাচনে সাহায্যকারীরা সরাইয়ের বারান্দায় বসে ছিল। বারান্দাটাকেই ভোট-কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। সাহায্যকারীদের মধ্যে বিপুল দক্ষি দিয়ে বসেছিল বুড়ো মেরৎস নিজেই। তার সামনে টেবিলের উপর রাখা ছিল স্থানীয় লোকদের নামের লম্বা হাজিরা খাতা। কনরাড বাস্টিয়ান তার পাশে বসেছিল। ওরা দু'জন যখন সবেমাত্র ছেলেমেয়েদের বিয়ের জন্ত পতাকাগুলো রেখে দেবে ব'লে ঠিক করেছে তখন আলগাইয়ার ভিতরে ঢোকে। আলগাইয়ারের নামের খোঁজে মেরৎস তালিকা দেখে। আসলে এজন্ত তাকে বিশেষ খুঁজতে হয় না, আলগাইয়ারের নামের আত্যাক্ষরের দরুন অন্ততঃ এই একটা বিষয়ে গ্রামে তার নাম সকলের আগে। কনরাড বাস্টিয়ান একটুকরো কাগজে তার নাম লেখে। ইতিমধ্যে যারা ভোট দিয়ে গিয়েছে তাদের নাম ওই কাগজে নথিভুক্ত হয়েছে। আলগাইয়ার সেটা দেখে কনরাড বাস্টিয়ানের দিকে কটমটিয়ে তাকায়। তারপর সে টেবিলের পাশ দিয়ে গিয়ে পর্দার পিছনে মাথাটা ঢোকায়। কোনও এক জনকে ভোট দেবার ইচ্ছে নিয়েই সে এখানে এসেছিল। কিন্তু এখন সে মত বদলায়। বাক্সের মধ্যে একখণ্ড সাদা কাগজ ফেলে দিয়ে জিভ ভ্যাংচায়। এরকম সে'স্কুল জীবনের পরে আর কোনও দিন করে নি।

দুপুরের দিকে লাল ট্রাকটা ওদিক দিয়ে যায়। প্রায় সকলেই তখনও সরাই-এর সামনে দাঁড়িয়েছিল। কেউ পিছন থেকে চেঁচায় না, হুমকিও দেয় না কেউ—যদিও সেই একই ট্রাক, এবং ট্রাকের উপরে ব্রাউন রেঞ্জেদের মত সেই একই সব পরিচিত মুখ। কিন্তু স্ত্রীলোকটির অন্ধকার বিষণ্ণ মুখ, কানের পাশে গোঁজা মোটা বিনুনি আজ আর চাষীদের মুখে হাসি যোগায় না, তারা কেবল ভ্রূকুটি করে। আবার তাদের চোখে বিস্ময়, সমস্ত মুখে আবার সন্দেহ ছড়ানো, সন্দেহের সঙ্গে রয়েছে শিশু-সুলভ ভীতি। কোনটা কি জানবে কি ক'রে মানুষ? যা করার জন্ত তাদের প্ররোচিত করা হচ্ছিল তার সব কিছুই যেন তারা ক'রে ফেলেছে।

কে একজন আত্মিয়াজ বাস্টিয়ানের কাছে এসে সে ভোট দিয়েছে কি না খোঁজ করে। বাস্টিয়ান বলে, "হাঁ"। লোকটা তবু বলে যে বাস্টিয়ান সরাই-এর মধ্যে পর্যন্ত ঢোকেনি। কিন্তু বাস্টিয়ান জবাব দেয়, "হাঁ, আমি গিয়েছি।" ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে তার স্ত্রীর দিকে চায়, কিন্তু এই মিথ্যা কথাটা ওর কানে গিয়েছে কি না সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিছুতেই ভোট দিতে চায় না বাস্টিয়ান। কেন, তা সে ঠিক নিজেও জানত না, কিন্তু বুঝেছিল কোনও কিছু তাকে ভোট দেওয়াতে পারবে না। মিথ্যা কথা বলার জন্ত তার মনটা ভারী হয়ে ওঠে। আর বলাটাও অর্থহীন, কারণ তালিকা থেকেই বুড়ো মেরৎস জানবে ঠিক কে এসেছে আর কে আসে নি। যখন নয়সেবাওয়ার তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে যে জোহান তাদের সঙ্গে এসেছে কি না তখন একটা শাস্তির মত মনে হয় বাস্টিয়ানের। সে জবাব দেয় জোহানকে সহরে যেতে হয়েছে এবং সেখানেই সে ভোট দেবে। যদিও কথাটা খাঁটি সত্য কিন্তু নয়সেবাওয়ার অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

দুপুর বেলায় কনরাড বাস্টিয়ান এবং বুড়ো মেরৎস-এর মেয়েরা তাদের জন্ত খাবার নিয়ে আসে। নির্বাচনের অন্তান্ত সহকারীরাও একে একে খেতে যায়, কারণ এই সময়ে গ্রামের কেউ ভোট দিতে আসবে না। বিকেলে লোকে ভরে যায় সরাইটা। তাদের অধিকাংশ সকালেই ভোট দিয়ে গিয়েছে, এখন এসেছে একটু মদ খেতে এবং খোঁজ-খবর নিতে। যদিও মাঝে-সাঝে এক-আধটা কানফাটানো "হাইল" শোনা যায়, কর্কশ কণ্ঠের দু' এক কলি গানও ভেসে ওঠে এবং এখানে-ওখানে দু' একটা গালাগাল ও জল্পনা কল্পনা শোনা যায়, কিন্তু মাতাল হওয়ার মধ্যে খতি খোঁজে না কেউ। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত জড়ো হ'য়ে থাকে—গাছের গুঁড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটা অব্যবস্থিতচিত্ত জনতার ভিড়। তারা জোট বেঁধে থেকে একটা শক্তি অনুভব করে, কিন্তু সরাইএর দরজায়

পার্টিটা·খোলা-বন্ধ করার মাঝে মাঝে একটা আলো এসে তাদের ভীত ও হতবুদ্ধি ক'রে দেয়।

যখন বাস্টিয়ানরা রাতের খাবার খেতে বসতে যাবে তখন তিনজন নাৎসী ভিতরে ঢোকে। তারা আব্রিয়াম ও তার স্ত্রীকে তাদের সঙ্গে গিয়ে ভোট দিয়ে আসবার জন্য হুকুম করে। বাস্টিয়াম আবার বলে, "ভোট দেওয়া হয়েছে।"

কিন্তু নিকলাজ হেঁকে ওঠে "ভোট দিতে তুমি যাও নি, আমরা জানি।"

বাস্টিয়াম বলে, "বেশ, যাচ্ছি আমরা।"

তখন নিকলাজ আবার চেঁচিয়ে ওঠে: "কিন্তু বন্ধ হবার সময় হয়ে এল।"

বাস্টিয়াম ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর দিকে তাকায়। সে অবাকও হয় আবার স্বস্তিও পায়, কারণ তার স্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যে·কথা বলে: "আমার এখন খোকাকে দুধ খাওয়াতে হবে।"

যেতে যেতে লোক তিনটে জিজ্ঞাসা করে: "হাঁ, ভাল কথা, জোহান কোথায়?"

"সহরে গেছে।"

"আজকের দিনেই! ভোট দেবে কোথায় সে?"

"সহরে।"

"কাকে ভোট দেবে?"

"জিজ্ঞাসা করি নি।"

"এক বাড়িতে থাক, উচিত ছিল জিজ্ঞাসা করা!" বাস্টিয়ান উদ্বিগ্ন ভাবে লক্ষ্য করে যে চ'লে যেতে যেতে তখনও তারা জোহানের সম্বন্ধে আলোচনা করছে।

ভোট শেষ হয়ে গেলে কমরাড বাস্টিয়াম ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। নির্বাচনে সাহায্য-কারীরা উঠে দাঁড়িয়ে আড়ামোড়া ভাঙে। বুড়ো মেরৎস পর্দাটা ছিঁড়ে ফেলে, সাবধানে ব্যালট বাক্সটা সামনে রেখে খোলে যাতে ভোটারদের স্লিপের সঙ্গে ওর কাগজগুলো না মিশে যায়। তারপর সে সরাইওয়ালার স্ত্রীর কাছে একটা চুলের কাঁটা চায়। কমরাড বাস্টিয়ান লোকেরা যে ভাবে ভোট দিয়েছে সেই পর্যায়ক্রমে নামগুলো, আস্তে আস্তে পড়ে যায়। প্রত্যেকটা নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো মেরৎস তার প্যাক-করা স্লিপগুলো থেকে সেই নামের স্লিপটা টেনে বার করে। বুড়ো এসম্যান নাৎসীদের ভোট দিয়েছে দেখে তারা অবাক হয়। মরগেনথাওয়ার এবং তার ভাইঝি বৌটা 'একই রকমের ভোট দিয়েছে দেখে তারা হাসাহাসি করে। ধাত্রী এবং তার স্বামী সোসিয়ালিস্টদের ভোট দিয়েছে দেখে তারা গালাগালি দেয়। (তারা এ ভোট দিয়েছে তার একমাত্র কারণ হ'ল যে রাষ্ট্র থেকে ধাত্রীকে একবার বিনা বেতনে ঐ শিক্ষাটা নেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।) বেজায় চটে যায় ওরা, কারণ আলগাইয়ার একটা বাতিল ভোট দিয়েছে, ফলে ওকে ধরা গেল না। তারপর ওরা ভোট গুণতে সুরু করে। গোণা শেষ হয়ে গেলে বুড়ো মেরৎস যত সুন্দর ক'রে পারে সরকারীভাবে ফলাফল লেখে। তারপর সে দরজা খুলে বাইরের দেওয়ালে তালিকাটা টাঙিয়ে দেয়। ভিড় জমে উঠে। ফিসফিস শোনা যায়। অর্ধেকেরও বেশী লোক নাৎসীদের ভোট দিয়েছে, প্রায় এক-চতুর্থাংশ দিয়েছে 'ডয়েশ নাৎসিওনাল (জার্মান উদারনৈতিক দল)' পার্টিকে, সোসিয়ালিস্টদের পক্ষে পড়েছে দু'টো ভোট, অন্যরা একটা ভোটও পায় নি। সবাই তারা অবাক হয়ে যায় যেন এই ফলাফলে তাদের কোন ভূমিকা নেই। কিছু লোক জটলা ক'রে বাড়ীটার ভিতরে যায়, ওটা ততক্ষণে যেমন সরাই ছিল তেমনিই হয়ে গেছে। কিছু লোক অন্ধকার গলিগুলো দিয়ে বাড়ীর দিকে ছোটে, গলিগুলোতে তখনও বিরাট পতাকাগুলোর ভৌতিক ছায়া ইতস্ততঃ কাঁপছে।

সরাইএর মধ্যে কে যেন রেডিও খুলে দিয়েছিল। রেডিওর পিতলের চোঙটা দিয়ে যে সমস্ত অপরিচিত সহরের নাম আর লম্বা লম্বা অঙ্ক ভিড় ক'রে বেরোতে থাকে সেগুলো শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। এ যেন ভূতের দেশ—মানুষ নেই, বন নেই, ক্ষেত নেই, শুধু আছে সংখ্যা আর নাম। এত লোক তাদের মত ভোট দিয়েছে শুনে তারা বেজায় আশ্চর্য হয়। অনেকে আবার অন্য কারও পক্ষে ভোট দিয়েছে এটাও তাদের অদ্ভুত মনে হয়। এমন কি এ রকমও বহু লোক আছে যারা ওই গোঁয়ার রেগুলেন, তার স্ত্রী এবং মৃত ইবস্ট্রুট-এর মত অনুযায়ী ভোট দিয়েছে। হঠাৎ একজন বার্তাবাহক বটৎসেনবাখ্ থেকে দৌড়ে এসে ঢোকে। সে ঢকঢক ক'রে বীয়ার গেলে, তারপর তাড়াতাড়ি সে ওখানকার ব্যাপার বলতে থাকে। সেখানে নাৎসীরা আরও বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত হয়েছে, মাত্র আটজন ডয়েশ নাৎসিওনাল, কিন্তু দশজন সোসিয়ালিস্ট—এরা সকলেই বয়েনের বেকার এবং চারজন কমিউনিস্ট। হাসপাতালে ধীরে ধীরে মৃত্যু হয়েছে যে ইবস্ট্রুটএর সেই আগে কেবল কমিউনিস্টদের ভোট দিত। এবার সে জায়গায় তার স্ত্রী, তার শ্বশুর এবং দুই শ্যালকও ভোট দিয়েছে।

"পরে ওদের দেখে নেওয়া যাবে"—এই বার্তাবাহক

হ'ল সেই ঘেঁটে কাদামাখা চাষীটা যে গেল সপ্তাহে ফ্রাউ মেস্কেলের চোখের উপর আঘাত করেছিল। সে দৌড়ে ফুকেলদের ওখানে যায়। সেখানে তাদের সকলকে বটৎসেনবাখে নিয়ে যাবার জন্য একটা ট্রাক অপেক্ষা করছিল, ওখানে তাদের হাজিরা নেওয়া হবে।

সেদিনকার সন্ধ্যায় আপন আপন ঘরে জড়ো হওয়া সকল চাষীরই ছিল একই বাসনা, একই সন্দেহ, একই আশা। কৃতকর্মের জন্য সকলেই তারা অনুতাপ করে। যে লেনদেন শেষ হয়ে গিয়েছে, তার রদবদল সম্ভব নয়, তার জন্য যে ভাবে মানুষ অনুতাপ করে এ অনেকটা সেই রকম। সারা বছর ধরে তাদের সকল কাজ, পাগলের মত সমস্ত প্রচেষ্টা, মরিয়া হয়ে করা সকল পাপ—কিছুই ত কাজে এল না, এই রবিবারটা কি পরিবর্তন আনবে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে তারা। অবশেষে সকলেরই মনে হয় আবার তাদের এমন একটা কিছু করতে প্ররোচিত করা হ'ল যা সম্পূর্ণ নিষ্ফল, যাতে তাদের ঋণের বোঝা এক কানাকড়িও কমবে না।

॥ ৮ ॥

ভাইঝির বিয়ে উপলক্ষ্যে আব্রিয়াম বাস্টিয়ান যখন তার দাড়ি ছাঁটতে উদ্যত হয়েছে তখন দরজায় একটা টোকা শোনা গেল। অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘরে ঢুকল জেকব ভরেথলিন। ভরেথলিন তার প্রতিবেশী, ওর বাড়ীটা হ'ল বাঁ হাতে। এই জন্যই বাস্টিয়ান তার কাছ থেকে দূরে থাকার ঠিক করেছিল। অশৌচ চলছিল ব'লে ভরেথলিন বিয়েতে যেতে পারবে না, নিমন্ত্রিত লোকদের মধ্যে এখন ওর না থাকার অন্য কোনও কারণ ছিল না।

তার স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সে একেবারে আলাদা মানুষ ব'নে গিয়েছে। ফিটফাট পোশাক, দাড়ি পরিষ্কার করে কামান, এমনকি লোমে ভরা কোলা নাকটাও যেন চুপসে গিয়েছে। তার ছেলেরাও এখন সব সময়ে পরিষ্কার থাকে। বাড়ীর চারপাশটা সে খোদাই করেছে এবং নতুন রং লাগিয়েছে। এখন দেখতে একেবারে ছিমছাম। ভরেথলিনকে দেখে বাস্টিয়ান অবাক হয়ে গিয়েছে, এমন কি হতভম্বও বলা যায়। কিন্তু এখন আর তার সম্পর্কে কোনও বিরূপ মনোভাব নেই। তাকে সে একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়। কর্সা জামা গায়ে ভরেথলিন টুপিটা হাঁটুর উপরে রেখে সরাসরি আসল কথা পাড়ে: "আমি কেবল বাড়ীটা একটু মেরামত করছিলাম। কিন্তু এদিকে আবার তোমার সামান্য জলটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

"তাতে কিছু আসে-যায় না, তাতে কিছু আসে-যাচ্ছে না।"

"আমাদের উঠোনটা বড় ছোট।"

"হাঁ," অবাক হয়ে বাস্টিয়ান বলে, "আমার ঠিক উল্টো, বড় উঠোন, ছোট বাড়ী।"

ভরেথলিন বলে সে যা চায় তার দাম দেবার মত সঙ্গতি তার আছে। "কিসের দাম?" বাস্টিয়ান জিজ্ঞাসা করে। ভরেথলিন বলে দেয়ালটা সরিয়ে দেবার খরচও সে দেবে। বাস্টিয়ানের মুরগীর ঘরটা বাড়ীর সঙ্গে লাগালাগি লাগিয়ে দেবার খরচও সে বহন করবে। বাস্টিয়ান জিজ্ঞাসা করে: "কি বলতে চাও তুমি? ঠিক কি চাও?"

ঠিক সেই সময়ে জোহান ঘরে ঢুকল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ভরেথলিনের লাল কোলা গলাটা থেকে বাস্টিয়ানের হতভম্ব মুখ পর্যন্ত সব চেয়ে চেয়ে দেখে। ভরেথলিন বলে: "তোমার ঘাড় থেকে মস্ত একটা উদ্বেগের বোঝা নেমে যাবে। কিস্তির ভারটাও আমার উপর বর্তাবে।"

শেষ কথাটা থেকে জোহান যা জানবার জেনে ফেলে। কিন্তু বাস্টিয়ান তখনও বুঝে উঠতে পারে নি। সে আবার জিজ্ঞাসা করে: "ব্যাপার কি? তুমি ঠিক কি চাও?"

ভরেথলিন বলে: "তুমি একটু বিপদের মধ্যে আছ, তাই নয়?"

বাস্টিয়ান বলে: "আমি? আমি?"

এই প্রথম ভরেথলিন বুঝতে পারে যে তার সামনে চেয়ারে এমন একটা লোককে বসিয়ে রাখতে কেমন লাগে যে নিজেরই চেয়ারে বসে শান্ত ভাবে চেয়ে আছে, যদিও ভিতরটা তার দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। "এ কিছু গোপন নেই" সে বলে চলে: "কিছু মনে কর না ভাই।"

বাস্টিয়ান বলে: "কে বলল?"

"তোমার দাদা কনরাড নিজেই আমাকে বলেছে যে তুমি ঠিকমত কিস্তি দিতে পার নি," ভরেথলিন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "দেওয়ালটা এই ভাবে সরিয়ে নিতে হবে।"

বাস্টিয়ানকে দেখে মনে হয় যেন পাম্পের এ পাশটায় নতুন দেওয়ালটার ছায়া ইতিমধ্যেই তার মুখের উপর পড়ে মুখখানাকে দুমড়ে এবং বিবর্ণ করে দিয়েছে। তার হঠাৎ মনে পড়ে পাম্প বসানোর শব্দ কেমন ক'রে

ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির আশায় তার হৃদ্স্পন্দন দ্রুততর করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই উত্তেজনার সঙ্গেও মিশেছিল ভয় ও দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা। পুরো তিনদিন ধ'রে তাদের ঘর ধুলোয় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তার স্ত্রী টৈখিল, জোয়র ও মেঝে থেকে ক্রমাগত সেগুলো ঝেড়ে ফেলত। জোহান তাকে বিপদ থেকে এ ভাবে উদ্ধারের একটা পথ পাওয়া বাষ্টিয়ানের পক্ষে ভাগ্যের কথা বলতে হবে। কাষ্টিৎসিউজ তার তাগাদার চিঠি পাঠান বন্ধ করে নি। তার ক্রোধ না করার কোনও কারণ নেই। জোহান ভরেখলিনের গোল মাথার চকচকে চুলগুলোর দিকে তাকায়। ভরেখলিন ঘুরে দাঁড়িয়ে জোহানকে দেখতে পায়। তারা করমর্দন করে। জোহানের কাটখোট্টা চাহনিতে ভরেখলিন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। জোহানের দৃষ্টি তাকে অস্থির ক'রে তোলে। নাকটা ফুলে ওঠে তার।

কিন্তু এ সম্বন্ধে ভাবনাগুলো গুছিয়ে নেবার আগেই বাঁশী, একর্ডিয়ান ও মাউথ অরগ্যানের বাজনার বিপুল আওয়াজে ওরা সকলে চমকে ওঠে। বাজনার আওয়াজটা মিশ্রিত গলার হাসি ও গানের মধ্যে মিশে যায়। ভরেখলিন, বাষ্টিয়ান ও জোহান তিনজনেই আপনা থেকে বাইরে ছুটে যায়। চৌধুপীটার ওপারে কনরাড বাষ্টিয়ানের বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড় করান। ওই গাড়ীতে ক'রেই সোফি বাষ্টিয়ানের বিয়ের যৌতুক মেয়েৎস-এর বাড়ীতে যাবে। ঘোড়ায় টানা গাড়ী, বাজনদাররা মিষ্টি সুরে বাজনা বাজাচ্ছে, এলোমেলো ভাবে জড়ো হওয়া এক পাল বাচ্চা তাদের ঘিরে ধরেছে। গাড়িটাতে একটার পর একটা যৌতুকের জিনিস তোলা হচ্ছিল। বিপুল ব্যয়সাধ্য যৌতুক, বাজনা ও সর্বোপরি গ্রামের গলিতে দু'টো ঘোড়ার অস্বাভাবিক আবির্ভাব ভরেখলিন ও বাষ্টিয়ানের উপর এমন একটা গভীর ছাপ ফেলে যে তারা সব কিছু ভুলে যায় এবং অন্তত প্রতিবেশীর মত পরস্পরকে কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে হাসতে থাকে।

॥২॥

পরে যখন বাষ্টিয়ান তাড়াতাড়ি জোহানকে সহরে পাঠিয়ে দেয় তখন বিয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয় ওর। দুটো মেয়ে রং-করা বিরাট একখণ্ড পিচবোর্ড নিয়ে দৌড়ে স্কুল থেকে বেরোল। কেক-ভর্তি একটা ট্রে নিয়ে একটা ঝি বেরিয়ে এল কনরাড বাষ্টিয়ানের বাড়ী থেকে। একটু আগে বাজনদারদের বাজান সুরে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে একটা ছেলে। তিন-চারটে বাচ্চা নিস্পৃহ মুখে বেড়ার পিছনে দাঁড়িয়ে। দেখলে মনে হয় তারা যেন কত অপমানিত এবং দুঃখিত। অনেক বাড়ীতে পতাকা উড়ছিল। ভোটের পর থেকে পতাকাগুলো টাঙানই ছিল—অবশ্য সরকারী আদেশে নয়, মেয়েৎস ও বাষ্টিয়ান তাদেরগুলো রেখে দিয়েছিল ব'লেই। এই ভাবে সপ্তাহকালের মধ্যে নির্বাচনী পতাকাগুলো রূপান্তরিত হয়েছিল বিয়ের পতাকায়।

গ্রামটা পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার পর তেড়া-চ্যাটার ক্ষেতের পাশে দু'টো সবুজ রংয়ের গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল জোহান। গাড়ির মালিকেরা একটা নাগরদোলা এবং একটা চালাঘর বসাচ্ছিল। সাধারণতঃ মেলায় গাড়িগুলো ফসল তোলার পর ময়রেন থেকে রওনা হয়ে যায়। এবারে বুড়ো মেয়েৎস তাদের এখানেই মেলা সুরু করতে রাজী করিয়েছে। শ্বশুরবাড়ীর দেশের প্রথা অনুযায়ী সে অতিথিদের তিন দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল, কাজেই তাদের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা চাই।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগত জোহানের, কিন্তু এদিকে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরে পৌঁছতে চায়। প্রথম কাজ কাষ্টিৎসিউজের সঙ্গে দেখা করা। সত্যি বলতে গেলে যে সিদ্ধান্ত সে নিতে যাচ্ছে তার সঙ্গে বাষ্টিয়ান নিজে এখনও মনকে মানিয়ে নিতে পারে নি, কিন্তু জোহান বুঝছিল এই ভাবে ব্যাপারটা মীমাংসা হবার উপর ভরসা রাখতে পারবে কাষ্টিৎসিউজ। তারপর সে ভোলকের কারখানায় ঘণ্টাখানেক কাটাতে চায়। সেদিনের ছোট্ট অথচ প্রবল ঝগড়াটা তারা মিটিয়ে নিয়েছে আলোচনার ভিতর দিয়ে নয়, একসঙ্গে দৃঢ়ভাবে কাজ করবার মাধ্যমে। আজ তারা একসঙ্গে দুটো ইস্তাহারের বয়ান লিখতে চায়।

সেদিন নদীর যে জায়গাটা থেকে মারিকে নিয়ে সরবনে নৌকো বেয়ে গিয়েছিল সেখানটায় এসে পড়ে জোহান। গতবার শহরে বেড়ানর পর থেকেই মারিকে আর দেখা যাচ্ছে না। হয়ত সে তার অশ্রুসিক্ত মুখখানাকে জোহানের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। সে বুঝেছিল সেদিন ফেরার পথে কাঁদছিল মারি। কিন্তু বন ছেড়ে আলোয় বেরতেই আবার শান্ত হয়ে গিয়েছিল সে। মিথ্যে কথা ব'লে জোহান

তাকে সান্ত্বনা দিতে সাহস করে নি। তা ছাড়া "আমি ফিরে আসব" এ কথা বলতে সে নিজেই লজ্জা পেত।

এখন ঘর ছেড়ে উজ্জ্বল আলোয় এসে পড়তেই যেন পরিচিত একজনকে পিছন থেকে দেখতে পেল জোহান। সে ডেকে উঠল: "কোরেসজিন!" তার গলার স্বর চিনতে পেরে কোরেসজিন তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেল। কোরেসজিন জোহানকে বলল তাকে ব্রাইতাইজের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং কাজের কাগজপত্র ঠিক করার জন্য পৌরসভায় যেতে হবে। জোহান কোরেসজিনকে আবার তাকে যেতে হবে কাম্রিৎসিউজের কাছে।

"তোমার বাপ-মা বড় বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষা করেছিল, অনেক উঁচুর দিকে চেয়েছিল, এখন দেখ তার কি হ'ল!"

জোহান একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু জিভ কামড়ে নিয়ে শুধু বলল: "নিজের সন্তানের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবে না মানুষ?"

"আমাদের বাবারা কি আমাদের সাজসজ্জা দিয়েছিল?"

"সে কথা যদি বল, কোরেসজিন, আমি ত আমার ছেলের জন্য একটু হৈ চৈ করতে পারলে খুশী হতাম।"

কোরেসজিন হাসে, "তা তোমার সে ছেলে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?"

জোহান কোনও জবাব দেয় না। একটু পরে খুব কোমল স্বরে সে যেন নিজের মনেই বলে: "চারটে দেয়াল, একটা ছাদ, একটা চিলেকোঠা।"

"কি বললে? কি বললে?"

"কিছু না, কোরেসজিন।"

হেঁটে ওরা রেলপুলটা পার হয়ে যায়। সরাইটা একবার দেখবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় কোরেসজিন। রেণগাছগুলোর তলাকার টেবিলগুলো সব খালি। ওরা পার্কে ঢোকে। ঘাস তখনও সবুজ, সযত্নে রক্ষিত ডালিয়া গাছে নানা রংএর ফুলের বাহার। কোরেসজিন জোহানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাছেই ওই সাদা বাড়ীগুলোর একটায় ঢোকে, সেখানেই ব্রাইতাইজ থাকে। জোহান বাজার চৌধুরী পার হয়ে কাম্রিৎসিউজের দোকানে যায়।

। ৩ ।

মোরৎসএর বাগানের পাশের মাঠে ঘোড়ার খুরের আকারে সাজান হয়েছে টেবিলগুলো। বিয়েটা নিয়ে বড্ড বেশী মাতামাতি করে ফেলেছে মোরৎস। ছোট মোরৎস পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত বলেছে যে ভবিষ্যতে তার কি থাকবে এ নিয়ে ভাবনা হচ্ছে। কিন্তু মোরৎস বড্ড বেশী করে ফেলেছে এ কথা বলা যায় না, কারণ মৃত্যুর ছদ্মবেশে এসেও সোনালী ঝলকের মত যে জিনিসটা তার মনকে ভরে রাখবে তা নিয়ে যাই করা যাক তা কি আর বাড়াবাড়ি হ'তে পারে? মাকটেলের সঙ্গে দেখা হবার সময় বুড়ো মোরৎস ভবিষ্যবাণী করেছিল যে সে পাঁচ বছর পরে মারা যাবে বলে, তা কিন্তু খাটে নি। আসলে তার ঢের আগেই মৃত্যু এসেছিল ওর, পরের গ্রীষ্মেই। হয়ত মৃত্যুর করস্পর্শ সে অনুভব করতে পেরেছিল। কিন্তু সে স্পর্শে ভয় ছিল না, ছিল সান্ত্বনা। তাই হয়ত এই রকম একটা উৎসবের গভীর প্রয়োজন হয়েছিল তার। এ উৎসব তার সকল গণ্ডীকে ভেঙে দেবে, ভেঙ্গে দেবে হিসেব করে বিচার করার বুদ্ধিকে, বুকের মধ্যে পুষে রাখা কৃপণতাকে, মজুতাগারের দুয়ারকে, সযত্নে রক্ষিত মহার্ঘ্য খাদ্যবস্তুর সুরক্ষিত আধারকে।

ছেলেমেয়েদের সে ততটুকু বা ততখানি মূল্য দিত যেমন দিত অন্যান্য অতিথিদের। তার মনে পড়ছিল বাবেট্টে আণ্ডেরনাকএর সঙ্গে তার নিজের বিয়ের কথা। ছোট্ট গোলগাল বাবেট্টে ঝুঁকতে বসেছিল তার পাশে। তার যেহেতু ইচ্ছে ছিল আশেপাশের কিছু-না-কিছু প্রভাবশালী লোককে যত সম্ভব নিমন্ত্রণ করবার, তাই সে তার ছেলেকে অনুমতি দিয়েছিল বাগানের মালিক জুকেলকে, বয়নের মিল-মালিককে, ঝটিকাবাহিনীর অধিনায়ক ৎসিল্লিগকে নিমন্ত্রণ করতে। ছোট মোরৎস নিজেই বটৎসেনবাখএ গিয়েছিল এবং বিয়ের পরই ওদের দলে যোগ দেবে বলে ৎসিল্লিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল।

গির্জে থেকে বরযাত্রা বেরোল। ঘোড়ার খুরের আকারে সাজানো টেবিলগুলোর সবিস্ময় প্রশংসায় মুখর অতিথিরা বাগানে বাজনা থামতেই যে নীরবতা দেখা দিয়েছিল তাকে খান খান করে দিল। বুড়ো মোরৎসএর মনটা ভরে গেল। ঘোড়ার খুরের মাঝখানটায় বসল দুই বরকনে। জুইজেকে আগের চাইতে ঢের বেশী গর্বিত, ঢের বেশী চমকপ্রদ দেখাচ্ছিল, শান্ত দৃষ্টিতে চারপাশে চাইছিল সে। সোফির মুখখানা যেন মুখই নয়। একগাদা উড়নীর মধ্যে যেন একখণ্ড পাতলা সাদা কাগজের উপর শুধু আঁখিপল্লবের ছাপ। কোনও কোনও আত্মীয়রা ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিল।

তারা বাপমায়ের মধ্যে গুঁজতে কিংবা মায়ের কোলে ঝুলেছিল। খাওয়া শুরু হওয়ার আগেই হাতমুখ লাল-চটচটে হয়ে উঠেছিল তাদের। বুড়ো মেরেৎস প্রার্থনা করল। মনটা যদিও আনন্দে নাচছিল তবুও স্থির বসে থাকার চেষ্টা করছিল সে। বিরাট বিরাট টবে ভর্তি স্যুপ এল, চামচ করে ঢালা হ'তে লাগল। স্যুপের মধ্যে ময়দা ও মাংসে তৈরি পিঠে ছিল, পারস্‌লের ছোট ছোট সবুজ বিন্দুও ভাসছিল। প্রথম চামচে মুখে তোলার পর বুড়ো মেরেৎস ও তার স্ত্রী পরস্পরের দিকে চেয়ে আনন্দের হাসি হাসে।

লুইজে মেরেৎস এখন লুইজে মিককে, সে বরাবরকার মতই শান্তভাবে এবং বিপুল পরিমাণে খেয়ে চলে। মার্টিনেরও বিরাট খাবার ক্ষমতা। শেষের দিকে বিয়েটা সম্বন্ধে ওর মনের আশঙ্কা যেন বেড়েই চলেছিল। কিন্তু পিঠে ভর্তি মুখ নিয়ে বাজনার উঁচুতি সুরের মধ্যে মাংসের আগে ট্রে-ভর্তি সেঁকা আলু, শশা ও তরি-তরকারির পাত্র হাতে ঝিএর আবির্ভাবের মধ্যে, আজকে সত্যিকারের সুন্দরী দেখতে লুইজের দিকে দৃষ্টিপাত করে এখন সে নিজের সিদ্ধান্তের তারিফ করতে শুরু করে। বিশেষ করে এখন যখন আর উপায় নেই তখন তারিফটা আরও একটু বেশী করেই করতে হয়।

সোফি নড়েচড়ে না। ছোট মেরেৎস তার কানে কানে বলে: "খাও!" সোফি চামচেটা না তুলেই তাড়াতাড়ি ঠোঁট নাড়ে। ছোট মেরেৎস একহাত দিয়ে খায়, আর একখানা হাত সোফির ঊরুর উপর রাখে। এবার সোফি চোখ খোলে। চারপাশে সমবেত মানুষ-গুলোর নজর পড়ে ওর উপর। চোখে পড়ে তাদের পিঠে-ভর্তি মুখগুলোর দিকে, চকচকে নাকগুলোর দিকে। তার বাবামায়ের দিকেও চোখ পড়ে, তারা বহুক্ষণ ভুলে গিয়েছে ওর কথা, নিমগ্ন হয়ে গেছে স্যুপে। নিকলাস আর তার কনে জোহানার বিয়ে হবে—বড়দিনের সময়। তারা টেবিলের তলায় পরস্পরের হাত ধরে আছে, একজন খাচ্ছে ডান-হাত দিয়ে, আর এক জন বাঁ-হাত দিয়ে। আশেপাশের ঠাট্টা-বকবা সম্বন্ধে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন। ছোট একটা বাচ্চা চামচে দিয়ে স্যুপ ছিটিয়ে ফেলবার জন্য চড় খেয়ে চেঁচাতে শুরু করে। বয়রেনের মিলমালিক যেন ৎসিল্লিশকে কি একটা বোঝাতে থাকে।

কিন্তু ৎসিল্লিশ প্রায় উত্তরই দেয় না। সে খেয়েই চলে, মুখ থেকে জ্রকুটি ছাড়ায় না। সে ভাবে সব মিলমালিকগুলোই বদমায়েস। মাঝে মাঝে ফেটে পড়া ছাড়া সে সাধারণতঃ যেমন শান্ত এবং অবাক থাকে এখনও তেমনি। অতিথিদের মধ্যে কুবেন এবং নিকলাসকে দেখে সে আশ্বস্ত হয়। কুবেনের বোন তার সঙ্গে আসে নি, হয়ত নিমন্ত্রিতও হয় নি। চিন্তা-মগ্নভাবে সে স্যুপ খেতে থাকে। অভ্যাসবশে প্রান্ত চুবুকে স্যুপের সঙ্গে এক কামড় করে রুটি খেতে থাকে সে, যেন ফিরে গিয়ে টেবিল থেকে পাছে উঠতে না হয়। এই বাজনা, একপাদা অচেনা লোকের ভিড় এবং খাবারের গন্ধে তার ক্লান্তি আসছিল। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য মনে মনে অনুতাপ করতে থাকে সে। ধনী চাষীর ছেলে ছোট মেরেৎস যখন বটৎসেনবাখে এসেছিল পার্টিতে ঢোকা সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলোচনা করতে তখন তাকে বেশ পছন্দ হয়েছিল ৎসিল্লিশের। তখন খুশী হয়েই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল সে। কিন্তু এখন মনে হয় যেন একটা মস্ত বিষাদ তাকে আচ্ছন্ন করছে। এই বিষণ্ণতার জন্য সে বিব্রতবোধ করে, একে সে ঢাকতে চায় অন্যদের কাছ থেকে। এবার সে রুটি খাওয়া বন্ধ করে স্যুপ আস্বাদ করতে থাকে।

রাঁধুনীর সাহায্যকারীদের মধ্যে একজন মদ পরিবেশন করে। বাবার আমলের অল্প কিছু সাদা মদ তখনও ছিল বুড়ো মেরেৎসএর। তখনকার কালে সমস্ত সম্ভ্রান্ত চাষীরই নদীর তীরে একটা করে আঙুর ক্ষেত থাকত। কিন্তু বহুদিন হ'ল সে সব জায়গায় চাষের জমি হয়ে গিয়েছে। আর একজন সাহায্যকারী আলু ও তরকারি দেয়। বুড়ো ঝি মাংস পরিবেশন করে

অতিথিরা হাসছিল আর আহা-উহু করছিল, কিন্তু তারা জানত এখনও মুরগী আসা বাকি। স্যুপ হয়েছে যে মুরগী দিয়ে সেইগুলোই হয় তাজা হিসাবে নয় বিরিয়ানী হিসাবে আসবে। মেরেৎস এবং বার্টিয়ান পরস্পরের গ্লাসে গ্লাস ঠেকায়, অতিথিরাও অনুসরণও করে। মার্টিন এবং লুইজে তাদের গ্লাস তুলে ধরে।

ছোট মেরেৎস এবং সোফি গ্লাস তোলে না। সোফি ওর হাত ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ছেলেটা হাতখানা টেবিলের উপর রাখে। ওর মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব মরিয়াভাবের উদয় হয়েছে. মনে হচ্ছে যেন এই মেয়েটাকে ও যে কখনও পা ব না এ সম্বন্ধে ওর আর কোনও সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়বার চোখ খোলে সোফি। তার চোখে পড়ে মুখের মালা. ছোট হয়ে যাওয়া চোখের সারি, ফুলে-ওঠা গাল, এবং অতিথিদের দাঁতের ফাঁকে ভাজাভেজা ছোট ছোট সবুজ টুকরো। কাছেই তার বাবার উদাসীন মুখখানা চোখে পড়ে, হঠাৎ

আবার একেবারে অন্ত এক জায়গায় সেই মুখখানাই চোখে পড়ে। তবে হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে সে, ভুলে যায় এ হ'ল ওর কাকা। ছোট মেরেৎস বলে: "খাও! খাও!"

কাছাকাছি ঘেঁষা চোখ ছটো দিয়ে ক্রিশ্চিয়ান কুরেল কাঁচের পাত্রে রাখা মূলো এবং স্যালাড পাতাগুলোকে দেখতে থাকে। তার গরমিঘর থেকেই এসেছে ওগুলো। বয়েরেনের জিলমালিকের ভাইঝির দিকে চোখ পড়ে তার। বেশ সুন্দরী, বয়স সতের, নীল পোশাকপরা, বিনুনীটা মাথার উপর উল্টানো। টেবিলের অন্ত দিকটায় বসেছিল সে। কুরেল ভাবতে থাকে এই মেয়েটা তার পাত্রী হিসাবে চলতে পারে কি না। শেষ পর্যন্ত পাবে বলেই মনে হয় তার। সঙ্গে সঙ্গে যেন শরীরে বিদ্যুৎস্পর্শ হয়। ও বয়েরেনের মেয়েটার দিকে চায়, মেয়েটাও ওর দিকে চায় তার পর লজ্জায় লাল হয়ে এলিয়ে পড়ে। টেবিলের তলা দিয়ে পরস্পরের দিকে হাত বাড়ায় ওরা। ভিড়টা ভেঙে দিয়ে একটা খালি জায়গায় দু'জনে মিলে ঢুকে পড়তে পারলে তখন সবচাইতে ভাল লাগত ওদের।

একজনের পর একজন উঠতে থাকে, এদিকে-ওদিকে দাঁড়িয়ে গল্প চলে। কেউ কেউ কেবল বকবকে, তাদের মা-বাবা এবং তাদের প্রত্যাশিত সন্তানদের জন্তেই সমৃদ্ধির কামনা জানায় না, সমস্ত মানুষ এবং সমগ্র দেশের জন্তেও শুভকামনা করে। অভ্যাগতরা বক্তৃতা শেষ হবার জন্ত অধীরভাবে প্লেটের গন্ধ শুঁকতে থাকে। নিকলাজ এবং জোহানা কেবলই গ্লাস বিনিময় করছিল, তাদের ইতিমধ্যেই একটু নেশা ধরে গিয়েছিল এবং পরস্পরকে তারা বেশ ফূর্তিতে চুমা খেয়ে চলেছিল। মাষ্টারেরও বেশ খুশী খুশী ভাব, নতুন পরিবেশে সে চট করে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। সুইডে যেমন ভাবে খেয়েছিল তেমনি ভাবেই পান করে চলে, একটু বেশী মাত্রায় এবং ভাবগতিক না বদলে মেরেৎস গ্লাসটাকে দু'হাতে পাকড়ে ধরে চুমুক দেয়, বরের মত নয়, যেন ঘৃণিত ব্যক্তির মত। লোকি আর চোখ তোলে না। অতিথিদের চক্রটা যেন তার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে, সে তাকাক বা না তাকাক ওরা যেন তার স্পর্শকাতর কপালে ব্যথা ধরিয়ে দেয়।

সব ক'জন বক্তাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ৎসিলিশ। সে একটা উত্তেজনা নিয়ে শুনতে থাকে, যেন একটা কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে। বিষাদ এবার তার মর্মে পৌঁছেছে। তা হ'লে বুড়ো মেরেৎস এই ভাবে ছেলের বিয়ে দিল। বুড়ো মেরেৎস-এর নিজের হাতে তৈরি মদ যখন সে ৎসিলিশকে এক গ্লাস দিল তখন ৎসিলিশ হঠাৎ তার বিষণ্ণতার মানে বুঝতে পারল। ৎসিলিশ তার নিজের বড় ছেলের কথা ভাবছিল, এখন যে বড় তার কথা নয়, যে দু'মাস বয়সে হুপিংকাশে মারা গিয়েছে তার কথা। তখনও পর্যন্ত তার বৌ যে সন্তান প্রসব করবে এ বিষয়ে অভ্যস্ত হয় নি সে, অভ্যস্ত হয় নি সেই সন্তানদের আবার হুপিংকাশে এবং অপুষ্টিতে মারা যাওয়ায়।

মাংসটা তার পেটের মধ্যে গজগজ করতে থাকে, সে আর এক গ্লাস মদ খায়। সেই যাই করুক এখন সে ধরা পড়ে গেছে। সেই ছোট্ট জীবটার আবার এ বিয়ের সঙ্গে কি সম্বন্ধ? যাই হোক, তোমাকে আমি শক্তহাতে নাড়াচাড়া করব, বুঝলে ছোট মেরেৎস—বরের কথা ভেবে মনে মনে বলে ৎসিলিশ।

"মদ খাও, খেতেই হবে তোমায়!" লোকি কিছুই খায় নি, এবার সে গ্লাসটা তুলে ধরে এক ঢোক খায়। মেরেৎস ভাবে ও গ্লাসটা নামাবার আগেই যদি আমি ওটা ছুঁয়ে দিতে পারি তা হ'লে ও আমার হবেই। তাড়াতাড়ি ওর বুকের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেরেৎস গ্লাসে গ্লাস ঠেকায়। দু'জনেই ওরা চমকে যায়। কিন্তু মেরেৎস তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়ে হাসতে থাকে।

জিলমালিক ত ওর কাকা, কিন্তু ওর বাবা কে? তার কি নিমন্ত্রণ হয়েছে?—ভাবতে থাকে কুরেল। তার সম্পত্তিই বা কি? আমি বাপু সাচ্চা লোক। সকলেরই প্রায় দেনা আছে। কিন্তু আমার বাগান-ব্যবসা উঠতির দিকে। এদিকে যতই সে এসব কথা ভাবে ততই টেবিলের তলা দিয়ে বয়েরেনের জিল-মালিকের ভাইঝির দিকে হাত বাড়াতে থাকে।

বুড়ো মেরেৎস মাথাটা ঘোরায় না, কেবল চোখ দুটো ঘোরায়, যেন তার দাড়িটা সীসের তৈরি। অতিথিদের লাল এবং সাদা মুখগুলো যেন চাঁদের মত জ্বলতে থাকে। আজ সব কিছুতেই তার ভাল লাগে: ভিতর থেকে গরম হয়ে ওঠা শরীরে হৈমন্তী আলোর প্রলেপ, সকল ভাবনা তাড়ান নিরবচ্ছিন্ন বাজনার আওয়াজ।

হয়ত দ্বিতীয় গ্লাস পান করার পর তার মনের পরিবর্তন হয়। সে ভাবে ছেলে তার যত খুশী বাধা-বিঘ্নের মধ্যে পড়ুক, সে নিজে সময়মত সরে পড়বে।

কোনও এক ভুতোর আত্মীয় বাস্টিয়ান তার ভাইপোর বিয়ের ভোজ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে পড়েছিল। বৌকে বলেছিল মুখরক্ষার জন্ত আর

কিছুক্ষণ থেকে যেতে। কনরাড বাস্টিয়ানের বাড়ীর কাছেই হঠাৎ সে তাঁর মেয়ে ডোরার মুখখানা দেখতে পেল, প্রাণের পথ দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে যেন একটি পাণ্ডুর শিখা। বালতি বোঝান বিপুল এক বাঁকের মাঝখানে তার মাথাটাকে মনে হচ্ছিল যেন খাঁচার বন্দী। তাকে দেখেই সে বালতিগুলো নাবিয়ে ফেলে। তাও আবার এমন অনিপুণভাবে করে যে জুতোর মধ্যে জল ঢুকে যায়। সে বালতিগুলোর উপর বাঁকটা রাখার জন্ত এবং বাবার কাছ থেকে মুখ লুকোনোর জন্ত মাথাটা নোয়ায়।

তিনদিন আগে কনরাড বাস্টিয়ান জিজ্ঞাসা করেছিল মেয়েটাকে ওরা এখনই পাঠাতে পারে কি না, কারণ ছুটির সময়ে বাড়ীতে অনেক কাজ। আত্রিয়াজ বাস্টিয়ান রোগা মেয়েটার সিঁথিকাটা হাল্কা চুলগুলোর দিকে চোখ নাবিয়ে চেয়েছিল। সে জানত যে কনরাড বাস্টিয়ান তার মেয়ে এবং তার পরিবারকে অপমান করবার জন্তই এটা করল। নিজের হতাশা লুকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে: "তোমাদের ছুরোটা কি খারাপ হয়ে গেছে না কি?"

"বিয়ের জন্ত সব সময় কাটাকাটি চলছে।" সে নীচু হয়ে বাঁকটা কাঁধে তুলে নেয়। বাস্টিয়ান যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, ক্লান্তিতে আন্দোলিত, অপস্রিয়মান শীর্ণ পিঠখানার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে।

॥ ৪ ॥

জোহান যখন ভোলকের ওখান থেকে বেরিয়ে টাউন হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল কোরেসলিন তখন পাশের দরজায় দাঁড়িয়ে। সে জোহানকে অপেক্ষা করতে বলে যাতে দু'জনে একসঙ্গে বাড়ী যেতে পারে। জোহান সিঁড়ি দিয়ে উঠে জানলার তলাকার বেঞ্চিটাতে বসে। কোরেসলিনের ডাক আসতে বিশেষ দেরি হয় না, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সে রাগে আগুন হয়ে ফিরে আসে। কি একটা যেন পাওয়া যাচ্ছে না, আবার আসতে হবে তাকে। "সব সময়েই এই রকম, চল, এখন চলে যাই।" গজগজ করতে করতে ওরা সিঁড়ির দিকে যায়। হঠাৎ থেমে গিয়ে জোহান কোরেসলিনের হাতখানা আঁকড়ে ধরে, নিজের ছবিটা যেন চোখ বের ক'রে চেয়ে আছে ওর দিকে। আত্মকর্তৃত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় ওর, বিস্ফারিত চোখে সোজা সামনের দিকে চেয়ে থাকে।

ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে কোরেসলিন। জোহানের খেয়ালও হয় না যে সে তখনও কোরেসলিনের হাত-খানাকে শক্ত মুঠোয় ধরে আছে। কোরেসলিনেরও খেয়াল হয় না। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কোরেসলিনের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে জোহান বলে: "আচ্ছা, তা হ'লে···" মুহূর্তের জন্ত সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর দালান দিয়ে দৌড় দেয় সিঁড়িতে নাববার জন্ত, পাশে পাশে কোরেসলিনও ছোটে। জোহানের মনে হয় যা হোক কোরেসলিন শুধু পাশাপাশি আসছে। ওর দিকে তাকাতে চায় না সে। সে ভাবে এক্ষুণি ভোলকের কাছে ছুট দেওয়া যাক—কিন্ত লাভ নেই কোনও। বাড়ীতে বাটিয়ানের ওখানে—তাতেও লাভ নেই। এক্ষুণি সরে পড়া যাক—এই ঠিক। ওরা বাজারে পৌঁছে গিয়েছিল, এবার তাকে কোরেসলিনের দিকে চাইতেই হয়।

সে কোরেসলিনের দিকে চায়, কোরেসলিন শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। সেও একটু পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তারপর তারা মাটির দিকে চেয়ে নীরবে হাঁটতে থাকে। আগের বার চোখাচোখি হবার পর যেন অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে এবং এবার যেন একটা অদ্ভুত জায়গায় দেখা হয়েছে তাদের এমন ভাবে কোরেসলিন বলে: "তোমার সঙ্গে পরে কথা বলতে চাই আমি।"

জোহান বলে, "আমিও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

দু'জনেই আবার নিশ্বাস ফেলে। ওরা সহরের দরজা পার হয়ে পার্কের ভিতর দিয়ে হাঁটে। কোরেসলিন বলে, "এত কাল এত চুপচাপ রইলে কেন জোহান? আমি তোমাকে খেয়ে ফেলতাম না।"

জোহান বলে: "চেহারা দেখেই ত কেবল বোঝা যায় না যে কে কাকে খেয়ে ফেলবে।"

কোরেসলিন বলে: "তোমার চেহারা দেখেও কিছু বোঝার যো ছিল না।"

"চেহারা দেখে!······তুমি ত মানুষকে উল্টেপাল্টে দেখতে পার না।"

কোরেসলিন বলে: "প্রায়ই আমি ভাবতাম তুমি বোধ হয় একজন লাল। তুমি পার্টিতে আছ, তাই না?"

"না, পার্টিতে নেই, তবে আমি লাল বটে!"

"তোমাকে বুঝতে পারছিনে আমি।" (কিন্ত ওকে বুঝতেই হবে—ভাবে জোহান, ওর বোঝা চাই-ই চাই, নইলে আমার সমূহ বিপদ।)

"কিন্ত আমাকে তোমার বুঝতেই হবে কোরেসলিন।"

হঠাৎ থেমে গিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে সে। কোয়েসদিন বোঝে সে গভীর ভাবে চিন্তা করছে, উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করে ওর কথা বলার জন্ত।

ওদের নিজেদের হৃদ্স্পন্দনই চিন্তাজগত থেকে সরিয়ে আনে ওদের। "এই ভাবে তোমার কিছু হবে না, কোয়েসদিন। হুবেল যা চায় তা হ'ল তুমি যা চাও তার ঠিক উল্টো। তার চাই একজন মজুর, তাও কম মাইনের। তুমি কি কম মাইনের মজুর বনতে চাও?"

"প্রভুভৃত্য থাকা বরং ভাল, তাতে অন্ততঃ কিছুটা শৃঙ্খলা থাকে, কিছু স্থায়িত্ব থাকে। দু'জন দুর্গত হওয়ার চেয়ে অথবা দু'জন কিছু না হবার চেয়ে ভাল। তুমি যা চাও তার চেয়ে অন্ততঃ ভাল। সব কিছু এক গাঁজে দিয়ে ফেলা, তারপর তার উপর দিয়ে একটা রাস্তাকল চালিয়ে দেওয়া—সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা ছাড়া কিছু নয়।"

"হাঁ, তোমার আর হুবেলের ভিতরে একটা গোঁজ ঢুকিয়ে দেওয়া, আর সে যাতে তার মাতব্বরীর ঘোড়ায় চিরকালের মত শক্ত হয়ে বসতে পারে তার জন্ত তার জিনে লোহার আঁকড়া ঢুকিয়ে পেছনে ঠেকনা না দেওয়া।"

ওরা বনের মধ্যে পৌঁছয়। কোয়েসদিনের নিঃশ্বাসের ভাব দেখেই জোহান বুঝতে পারে যে সে ভাবছে। কিন্ত নীরবতাটা যেন পাথরের মত ভারী হয়ে ওদের উপর চেপে বসে।

জোহান বলে: "এ একটা জীবনই নয়, না কি?"

"এমন বিশেষ কিছু নয়।"

"যে কেউ মজুরের বিরুদ্ধে যাবে তার পিছনে এক লাথি, যে কেউ মজুরকে ঠকাবে তার ঘাড়ে এক গুঁতো।"

"আমি মজুর নই, আমি নই।"

"তাই না কি? তুমি আর মজুর পর্যন্ত নও? আমার কথা যদি বল এই অনন্ত দুর্দশার মধ্যেও ওই একটি জিনিস ওরা কিছুতেই কেড়ে নিতে পারে নি, সে হ'ল মজুর থাকা। যা আমার অবস্থা তাতে মজুর হওয়া আর হতচ্ছাড়া দুর্দশায় পড়ে থাকা একই কথা। তবু ভাবি এই দুর্দশাই একদিন আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে।"

"তোমার মত মাথাটায় কিছুতেই ঢুকছে না জোহান, যে একজন আর একজনের মজুর হয়েও তার কমরেড হ'তে পারে।"

"না, আমার মাথায় তা ঢুকবে না। ওরা তোমায় একটা শার্ট দিল তার বদলে তুমি নিজের পিঠের চামড়া তুলে দিয়ে দিলে ওদের। ইচ্ছেমত তোমাদের বুদ্ধি গড়তে দিও না ওদের! তোমরা কি অন্ধ? ওরা, তোমায় একটা বোতাম দিল আর তুমি ওদের মোহরের জন্ত বন্দোবস্ত দিলে।"

বন থেকে বেরোতেই বিরাট একটা অর্গানের অপ্রত্যাশিত সুরেলা আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। এই সেই জেরা চরার জমির পাশের নাগরদোলা। ওদের মুখভাব কৌতুক থেকে ভ্রুকুটি পর্যন্ত গড়ায়। ভোজের পর বিয়ের অতিথিরা মেলায় এসে যে সোরগোল করছিল, কাছে আসতেই তার আওয়াজ পায় ওরা। কোয়েসদিন স্বস্তভাবে চমকে ওঠে। হুবেলকে চিনতে পেরেছে সে। হঠাৎ থেমে গিয়ে জোহানের সঙ্গে করমর্দন ক'রে সে বলে: "এখনও অনেক আলোচনার আছে।"

"আমরা ত সবে সুরু করলাম।"

জোহান বাড়ীর দিকে দৌড় দেয়। ঢুকতে ঢুকতে তার নজরে পড়ে যে বাষ্টিয়ান হাত দু'টো মুখের সামনে রেখে টেবিলে বসে আছে। এ রকম নিষ্ক্রিয়তা তার পক্ষে অস্বাভাবিক। জোহান অধীরতায় কাঁপতে থাকে, তার নিজের ভাবনা নিয়ে তাকে থাকতে দিয়ে বাষ্টিয়ান যাতে চলে যায় তার জন্ত সে অপেক্ষা করে। তার খেয়াল হয় না যে বাষ্টিয়ান কাপ্রিৎসিউজের কথা জিজ্ঞাসা করে না। তার নজরে পড়ে না যে বাষ্টিয়ান শেষ পর্যন্ত মুখের সামনে থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তার দিকে ক্ষুধার্ত, লোভী দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে যাতে সে কথা সুরু করে।

জোহান মাটিতে হাঁটু গেড়ে ব'সে তার ঝোলার মধ্যে হাত চালায়। ঝোলাটা তোষায় বিছানায় তলায় গোঁজা ছিল, সে বিছানায় এখন পরের ছেলে ছুটো শোয়। যখন বাষ্টিয়ান আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় তখন জোহান উঠে দাঁড়ায়। সে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। এখনি কেবল সে বুঝতে পারে যে বাষ্টিয়ানের ভাবগতিক একেবারে সম্পূর্ণ হতাশাগ্রস্তের মত। তার মনে পড়ে তাকে গোয়ালে যেতে হবে, কারণ বাষ্টিয়ানদের বিয়ের নিমন্ত্রণ রয়েছে। মাঝখানের ছেলেটাকে দেখতে পায় সে। বিপজ্জনক কিছু ক'রে ফেলার পক্ষে ছেলেটা নিতান্ত দুর্বল ব'লে তাকে সব সময়েই ঘরে রেখে যেত ওরা। ছেলেটা দরজার সামনে পড়ে পাকা খড়ের একটা আঁকড়া নিয়ে খেলা করছিল, ওর ভারি মাথাটা কাঁধের উপর ঝুলছিল। অন্ত বাচ্চাগুলো গেল কোথায়? হয়ত তোষায় অনুমতি দিয়েছে ওগুলোকে রাখার জন্ত। সে নিজেকে সামলে

দেয়। কি কারণে যেন ওর মনে হয় যে কোয়েসদিন আবারও আজ আসবে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। এখন জুতো জোড়া খুলে চটি পায়ে দিয়ে সে গোয়ালে যাবে। সে নীচু হয়। তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তামগ্ন হয়। আজ এবং অন্যান্য দিন কোয়েসদিনের সঙ্গে যা কিছু সে আলোচনা করেছে সব তার মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে। হঠাৎ সে বিছানার তলা থেকে ঝোলাটা টেনে বের করে, ছুটো ঘরের কোনে তার যা-কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র ছিল সেগুলোকে জড়ো করে, সেগুলোকে ঝোলায় ভর্তি করে, ওর মধ্যে আধখানা রুটি রাখে তারপর সব কিছু একসঙ্গে বেঁধে ফেলে।

॥ ৫ ॥

যারা নাগরদোলার দিকে যাবে তাদের চ'লে যাবার জন্য অধীর ভাবে অপেক্ষা করে ফুকেল যাতে সে যয়েণের মিল-মালিকের ভাইঝির সঙ্গে কথা বলতে পারে। সব কিছু তার মতই এগোয়। মিল-মালিক লক্ষ্য করেছে যে ফুকেল তার ভাইঝির দিকে তাকাচ্ছে, খবরটা তাকে খুশী করে। এখন সে ওদের দু'জনের দিকে এগিয়ে আসে, কি সব আত্মীয়-স্বজনের কথা বলে তারপর ফুকেলকে ওদের যয়েণের বাড়ীতে এসে দেখা করতে বলে। মিল-মালিক, ফুকেল এবং ওই ভাইঝি তিনজনে মিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে। ফুকেল যেন এটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমন আড়ষ্ট, ভাইঝিকে আরও খানিকটা লম্বা দেখাচ্ছে আর তত সুন্দরও দেখাচ্ছে না। অন্য সমস্ত অতিথিরা মেয়েৎসএর জমি থেকে তেড়াচরানোর মাঠের দিকে এগোয়, সেখানে তারা মিশে যায় অনিমন্ত্রিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে। তাদের পক্ষে সারা বছরে এই মেলাটিই যা একমাত্র আমোদ-প্রমোদের জায়গা।

মেলায় ইতিমধ্যে কেবল আর দুটো দোকান বসেছে, তার একটা বন্দুকের খেলার আর একটা লক্ষ্যভেদের খেলার। নাগরদোলা কিছুক্ষণ ধরেই ঘুরছে, নাগরদোলায় ঘুরতে ঘুরতে যাতে যাত্রীরা লোহার বালা ধরে খেলা দেখাতে পারে তার জন্য উপর থেকে দড়ি দিয়ে বালাও ঝোলান হয়েছে। গোড়ায় শুধু বেঁটে মোটা গাউল আলগাইয়ারই গুলী ছোঁড়ার দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে তার পুরন্ত গালের পাশে বিরাট রাইফেলটা চেপে ধ'রে তাক করছিল, মুখে একটা নাছোড়বান্দা ভাব। কিন্তু চাকাও ঘুরল না, ঘড়িও বাজল না, চীমেয্যানও বেরিয়ে এসে মাথা নাড়ল না। টাকা ফুরিয়ে গেল তার।

নিকলাজ আর তার ভাবী বৌকে নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে আসে ৎসিম্নিশ। পিঠ চাপড়ে ওর হাত থেকে সে রাইফেলটা নেয়। তাক করে লক্ষ্যভেদ করে সে বিনামূল্যে আর একটা গুলী ছোঁড়ার সুযোগ পায়। আস্তে আস্তে লোক জমে ওঠে ৎসিম্নিশের গুলী ছোঁড়া দেখতে। পাশের দোকানটায় আদৌ কেউ যায় না। এবার ৎসিম্নিশের বিষণ্ণতা দূর হয়। তার দুর্ভাবনাও দূর হয়ে যায়। অবশ্য তার এক-আধটা রেশ এখনও লেগে থাকে, কিন্তু তা নিয়ে সে আর মাথা ঘামায় না। সঙ্গে যে দু'তিনটে দলের ছেলে রয়েছে, লোক যে ভীড় করে দেখছে, সে যে পুরস্কার পাচ্ছে এবং সেগুলো যে বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে এই সবই তাকে আনন্দ দেয়। প্রথম গুলীটার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনের চারপাশের পাষাণভার কিছুটা কমেছে, আর প্রথম লক্ষ্যভেদের পর মনটা ওর হাল্কা এবং খুশী হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ নাগরদোলা ঘিরে এক হৈচৈ ওঠে। তৃতীয় দফায় দোলাগুলো সব ভর্তি হয়ে গিয়েছিল, যেই ওরা চতুর্থ দফা শুরু করবে এমন সময় ময়গেবাওয়ার এবং তার ভাইনী বৌ এসে হাজির। ফ্রাউ ময়গেবাওয়ারের পোশাক-আশাক ভালই, কিন্তু আসবার পথে নিশ্চয়ই সে কার্টের তলা মাড়িয়ে ফেলেছে। সে একটা খালি জায়গা আবিষ্কার করে, কিন্তু তার স্বামী তাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। গোড়ায় সে কাকুতি-মিনতি করে। শেষ পর্যন্ত সে লোকটার কথা শোনে না, তাকে ফেলেই নাগরদোলায় চড়ে বসে। নাগরদোলার লোকগুলো যেই দেখেছে কে এসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর দোলার শখ মিটে যায়, একজনের পর আর একজন মাটিতে নেমে আসে। নাগরদোলার মালিক একটা মাথাপাগলা মেয়েলোকের জন্য আবার দোলাতে রাজী হয় না। কিন্তু সে যখন দেখল ওর মাথায় মতলব নেই তখন সে যত জোরে পারল ঘুরিয়ে দিল। সবাই দাঁড়িয়ে রইল, ময়গেবাওয়ার গিন্নী একা একাই চরকি ঘোরা ঘুরছে দেখে তারা হেসে অস্থির হ'তে লাগল। তারা ময়গেবাওয়ারকে কনুই দিয়ে খোঁচাতে লাগল, সে ফুঁকতে উঠতে থাকল। কিন্তু সেও তার স্ত্রীর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। চীৎকার করে হল্লা করে সে ঘুরে

চলেছে। সামনেই বালাটা ঝুলছিল, তার মনে হ'ল ওটা তাকে ধরতেই হবে, লোকগুলোকে মজা দেখিয়ে দিতে হবে। সে উঁচু হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু নাগরদোলাটা বেজায় জোরে ঘুরছিল। সবাই হেসে উঠল: "কৈ ধর, ধর না!" ওদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে মেয়েটা যেন আরও উন্মত্ত হয়ে উঠল। সে বালাটা ধরে ফেলল, কিন্তু এত জোরে ধরল যে ফাঁসির দড়ির মত দড়িটার একাংশও তার হাতে জড়িয়ে গেল, ঘোড়া থেকে ফস্কে সে শূন্যে ঝুলতে লাগল। নাগরদোলাটা থামবার আগে আরও পুরো দুই চক্কর ঘুরে ফেলল। দর্শকদের পেটে খিল ধরে গেল হেসে হেসে। ঠিক সেই সময় ভলী ছোঁড়া শেষ করে ৎসিম্রিণ এসে গিয়েছিল, সে তার লম্বা হাত দিয়ে মেয়েটাকে নাবিয়ে আনল, মেয়েটা তখন যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। দলামোচড়া হাত-পা নিয়ে মেয়েটা স্বামীর কাছে এল। কিন্তু স্বামী শুধু বলল: "দাঁড়াও, বাড়ী পর্যন্ত একবার গিয়ে নিই!"

আর ভলী ছোঁড়ার মত পয়সা ছিল না ৎসিম্রিণের। শীগগিরই আবার মেরৎসএর ওখানে ফিরে যাবার ডাক পড়বে তাদের। এবার অবশ্য আর মাঠে নয়, সেখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছে, এবার ওদের বাড়ীর ভিতরে। হঠাৎ তার আগের চেয়েও খারাপ লাগতে সুরু করে।

স্কুকেল মেলার মাঠে মোটে যায়ই নি, এক কেনিশও বাজে খরচ করে নি। সে ভাবল সে বরং বাড়ী ফিরে গিয়ে কাজ করবে, মিলমালিকের ভাইঝি সম্বন্ধে আর ত আর কিছু করার নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে কোরেসলিন এসে পড়ায় তার খুব সুবিধে হ'ল। "চল, যতক্ষণ আমি অপেক্ষা করছি তুমি বাগানে জল দেবে।" সে কোরেসলিনকে ডাকল, তারপর আবার বলল: "সহরে অনেকক্ষণ কাটিয়ে এলে।"

"আমি কি করতে পারতাম?"

"চলে যাও, শীগগির সুরু কর, শীগগির সুরু করে দাও, আমাকে আর একটু দেখে যেতে হবে।

কোরেসলিন ভাবল কেন ও বলল শীগগির সুরু কর, কেন দু'বার ওকে কথা বলতে হ'ল? যত বাজে কথা। কেনই বা স্কুকেল বলবে না শীগগির সুরু কর। ঐ জোহানটা কি আমার মাথায় কিছু ঢুকিয়ে দিল না কি? আস্তে আস্তে তারা মেলার জায়গা থেকে বেরোল। স্কুকেল তাকে বলতে লাগল বাড়ীতে কি কি করতে হবে। কোরেসলিন অধীরভাবে বলল: "ঠিক আছে, স্কুকেল।" কোরেসলিন ভাবতে লাগল হয় এদিক, নয় ওদিক। এ লোকটা আমার এ.প-নেতা, এরকম কঠিন একটা মুহূর্ত আমায় পার হতেই হবে আর তা এক্ষুনি হওয়া ভাল। আমি যদি জোহানের জন্য হাজার কষ্ট পাই তবুও। যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বরে সে বলে: "শোন স্কুকেল, আসবার পথে একটা ব্যাপার হ'ল..."

বরকনের বাবা মা এবং নিকট আত্মীয়রা ব্যাণ্ড নিয়ে টেবিলে বসে গিয়েছিল। তারা বেশী পান করে নি, কারণ এ নিয়ে এ সব দিকে কথা হয়। বীচবনের দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল, তারা প্রায় আসন ছাড়ি ছাড়ি করছিল এমন সময় বুড়ো মেরৎসএর ডাক পড়ে বাড়ী থেকে।

কোরেসলিন স্কুকেলকে বলে: "আমি ও টাকার ব্যাপারে থাকতে চাইনে, টাকায় আমার দরকার নেই।"

স্কুকেল বলে: "এখন সে কথা ছাড়।" স্কুকেলের মাথায় স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ভেসে উঠতে থাকে, কত লাভ হবে, কি টাকা পাওয়া যাবে, কিভাবে বিয়েটা হবে ইত্যাদি। সে বলে: "সে সব আমি নিজেই ব্যবস্থা করতে পারব বুড়ো মেরৎসএর সঙ্গে। যা হোক, তোমাকে ত এখন যেতে হবে।"

ওর খেয়াল হয় না যে কোরেসলিনকে সে যতদিন ধরে চেনে তার চেয়ে এখন স্বতন্ত্র দেখায় ওর মুখখানা। কোরেসলিন ইতস্ততঃ করে, তারপর সে বাড়ীর দিকে ঝোঁক দেয়। কঠোর, ক্লান্তিকর স্বপ্ন-ভরা কাজের বোঝা ঘাড়ে নেবার জন্য একটা ভয়ানক আকুলিবিকুলি হয় তার। এর মধ্যে দিয়ে সে ভুলতে চায়।

একটু পরেই বাগান থেকে বুড়ো মেরৎস এসে পড়ে। এক লহমার মধ্যে উৎসবসঞ্জাত সমস্ত বিষাদ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সে, চোখ দুটোতে আবার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। স্কুকেল শেষ করার জন্য সে অপেক্ষা করতে থাকে।

"ঠিক আছে, স্কুকেল। ইতিমধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। হাতের ফাঁক দিয়ে যাতে ও গলে যেতে না পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছি আমি। আমার কাছে এ কোনও নতুন খবর নয় স্কুকেল।"

গতকালকার তারিখ ও সিল দেওয়া একখানা নোটিশ সে দেরাজ থেকে বের করে।

"ও নিজে যখন জেনে ফেলেছে তখন এবার ওকে গ্রেপ্তার করতে হয়। আমি আমার ভাইপোকে পাঠাচ্ছি বনরক্ষকের কুটিতে যাতে রাইজিদার তার পুলিশ পাঠিয়ে দেয়।"

স্কুকেলের মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঘটনার

এই পরিস্থিতিতে সে বিরক্ত এবং বিব্রত হয়ে পড়েছে। সে মুখ দেখে রীতিমত ফুর্তি হয় মেরৎসএর।

॥ ৬ ॥

জোহান খলিটার মুখ বন্ধ করছিল। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে সে অবাক হয় না। সে ভেবেছিল কোরেনলিন বোধ হয়, কিন্তু বাগানে ঢুকেন এবং নিকলাজকে দেখে সে আশ্চর্য হয়। নিকলাজ ওর হাতটা ঠেলে ধরে, বলে, "পাকড়েছি তোমায়।"

জোহান নিকলাজ থেকে ফ্রুকেন পর্যন্ত চোখ বোলায়, আবার ফিরিয়ে দেখে। ওর মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফোটে। তারপর রাস্তা থেকে ষাঁড়ের মত দ্রুত খটখট আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। বেড়ার দরজাটা খুলে ফেলে ৎসিলিশ। তার সমস্ত মুখটা জ্বলে যাচ্ছিল যেন এতদিন পরে সে আবিষ্কার করেছে সেই শত্রুকে, যে তার সব দুর্দশার মূলে। এবার জোহানের চেহারাও বদলে যায়। সে হাত ছাড়িয়ে নেয়, ৎসিলিশ তার উপর পড়বার আগেই সে ৎসিলিশের গলা চেপে ধরে। সেই মুহূর্তে তাদের যা কিছু শান্তভাব তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, স্পষ্ট বেরিয়ে পড়ে সেই বন্যতা যা সকল কিছুতে অন্তর্নিহিত থাকে। স্বর্গ ও নরক যেন অনায়াসে জায়গা বদল করে, পাম্পের উপর জোয়ান খড়ের কেশরগুলো ফুলে-কেঁপে ওঠে, শক্ত মুঠো আর কড়মড়ে দাঁত নিয়ে লোকগুলো পরস্পরকে চেপে ধরে, তাদের মধ্যে পড়ে খোঁড়া বাচ্চাটা সকরুণ ভাবে কেঁদে ওঠে, মুরগীগুলো ডেকে ওঠে, যেন একটা নতুন দিনের শুরু হ'ল।

ৎসিলিশ জোহানকে একেবারে পাকড়ে ধরে থাকে, যেন কিছুতেই শিকার ছাড়বে না। তাজা গরম অবস্থায় ধরতে পেরেছে। হাঁটুর উপর ওকে চেপে ধরে আবার হাঁটু দিয়ে ওর মাথাটা চাপে ৎসিলিশ। জোহান আবার লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু ফ্রুকেন আর নিকলাজ ওকে ধরে ফেলে ৎসিলিশের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করে ৎসিলিশ, যদিও দেখতে পায় তবু ওর মনে হয় অদ্ভুত ছেলেটার এবার হয়ে গেছে। জোহানকে আগে কখনও সে দেখে নি, তার মুখটাও পরিচিত নয় কারণ দেখবার আগেই মুখখানাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সে। কিন্তু তবু সে তাকে খুঁজে বের করেছে!

হাতের উপর অচেনা ছেলেটার রক্ত তাকে অপরিসীম তৃপ্তি দেয়, যেমন হয় রক্তমোক্ষণের পর। সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায়—অন্ততঃ বর্তমানের জন্য।

ইতিমধ্যে ভরেথলিনের নেতৃত্বে একদল গ্রামের লোক দৌড়ে বাস্টিয়ানের বাগানে ঢুকেছে। ভরেথলিন যখন বুঝতে পারে তার কি বিরাট ভুল হয়ে গেছে, ছেলেটাকে পুলিশে দিতে না পেরে সে নিজের কি বিপুল ক্ষতি করেছে তখন সে পাগলের মত লাফিয়ে পড়ে জোহানকে মারতে থাকে। এবার অন্য লোকেরা বোঝে জোহানকে মারবার অধিকার ৎসিলিশের একচেটিয়া নয় তখন হতাশায় থেকে তারাও এক এক ঘা ক'রে যোগ দেয়।

গোলমালের শব্দে মারিও আকৃষ্ট হয়। সে আর জোহানকে দেখবে না বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু এখন তার বিস্ফারিত চোখ জোড়া শুধাই সেই তরুণ মুখখানাকে খুঁজে ফেরে। এই উপভোগ্য দৃশ্য ইতিমধ্যে যারা চোখ ভরে দেখে নিয়েছিল এমন কিছু স্ত্রীলোক এখন মারির দিকে নজর দেয়। তাদের মনে পড়ে এই ভিন-দেশী ছেলেটার সঙ্গে মারিকে কখনও কখনও দেখা যেত। ইতিমধ্যেই এই কেলেঙ্কারীর ছায়ায় মারির পুরন্ত গাল গত কয়েক সপ্তাহে বিবর্ণতর হয়ে গিয়েছে।

বাস্টিয়ানকে মাঠ থেকে ডেকে পাঠান হয়েছে। সে তার ভাল জামা-কাপড় ছেড়ে বিয়ের ভোজে ফিরে যাওয়ার বদলে খাঁট কেটে গিয়েছিল। তার তোয়াকে কষ্ট দেবার জন্য সে তার দাদাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। এখন সে বিধ্বস্ত বাগানটায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। গোড়ায় কেউ তাকে নজরে আনে না, কিন্তু সে বোঝে কালকের জন্য তার ভাগ্যে কি তোলা আছে। হয়ত সে রাখে কাকে আশ্রয় দিচ্ছে মনে মনে তার একটা আঁচ পেয়েছিল সে, কিন্তু নিজের অতিরিক্ত ক্লান্তির ফলে সেকথা জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। ভগবানের কাছে এসব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে সে, কিন্তু হট্টগোলের জন্য এবং ভয়ঙ্কর ভয়ের জন্য সে বোঝাতে পারে না।

অতিথিরা একটু মারামারি ক'রে আসুক বুড়ো মেরৎসের তাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু পার্টিটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় তা সে চায় নি। কাজেই যে রান্নাঘরের ছেলেছোকরা সহকারীদের পাঠায় ওদের সব ডেকে আনতে। অতিথিরা সবাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে। আসে না কেবল ৎসিলিশ, সে একা একা মাঠ পার হয়ে নিঃশব্দে চলে যায়। আজকের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেছে তার। ওয়ারতাইলারবাখ যত পিছনে পড়ে থাকে তত তার দুঃখ হ'তে থাকে। যখন সে নিজের খামারে ফিরে যায়, উপুড়-করা গাড়িটার উপর একপাল ছেলেপিলেকে ঝগড়া করতে আর চেঁচাতে শোনে, ঘরে

ঢুকে বৌকে টেবিল সাজাতে দেখে তখন তাহার একটা হতাশা তাকে নাড়া দেয়, যেন এমন একটা ছুটির দিনে সব কিছু বদলে যাবে ব'লে সে আশা করেছিল। তার বদলে তার রেলেশনদের পোশাকপরিচ্ছদ আরও জীর্ণ দেখায়, বৌকে আরও বুড়ো দেখায় এবং টেবিলে রাখা রুটিগুলোকে আরও শক্ত মনে হয়।

ওরা জোহানকে বাস্তিয়ানের বাড়ীর মধ্যে তুলে নিয়ে যায় এবং পুলিশ আসা পর্যন্ত পাহারা দিতে থাকে। আস্তে আস্তে জ্ঞান ফেরে জোহানের। যাদের নিমন্ত্রণ হয় নি এবং ফলতঃ কিছু হারাবার নেই তারাই শুধু এখন ব্যাপারটা নিয়ে মাতামাতি করে। বাস্তিয়ান এই লোকগুলোকে অনুনয়-বিনয় করে বোঝাবার জন্ত যে এসব ব্যাপার কিছুই তার জানা ছিল না। একটু পরে তার স্ত্রী ভিতরে ঢোকে। তাকে বরাবরকার মতই শান্ত দেখায় যেন সে এ ব্যাপারের আভাসও পায় নি। মুহূর্তের জন্ত সে বাস্তিয়ানের বকবক শোনে, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চায়, তারপর একটু অবাক হয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় জোহানকে দেখে সে ভয় পাওয়ার চিহ্ন দেখায় না, বরং খানিকটা জল আনে এবং ওর মাথার তলায় একটা বালিশ গুঁজে দেয়।

॥ ৭ ॥

কিছু কিছু অতিথি মার্টার এবং তার বৌএর সঙ্গে মার্টারের বাড়ী পর্যন্ত যায়। জুইচেকে বিয়ের পোশাকে যেন আরও প্রশান্ত ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে কিংবা মার্টার কেউই এমন কিছু করে না যাতে ওদের রসের হাসি এবং মস্করা বন্ধ হ'তে পারে যা না হ'লে বিয়ের শোভাযাত্রার নাচ-গান-কল্লোল আরম্ভই হ'তে পারে না। অতিথিরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করে। বয়ের সে বয়স হয়ে গেছে যাতে কি তার কর্তব্য তা সে জানে। আর যদি তার না জানা থাকে তা হ'লে এই শক্ত-সমর্থ যুবতী মেয়েটার তাকে বেশ শিখিয়ে দিতে পারার সময় হয়ে গেছে।

ফুলঘরটা সাজানো হয়েছে, বাচ্চাদের হাতে লেখা এক বিরাট স্বাগত 'চিহ্ন ঝুলছে, এন্টারের একটা মালা ঝুলছে। স্কুলের একদল বড় মেয়ে দরজার কাছে গান গাইছে। জুইচে অবাক হয় না, বরং মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে যেন এই প্রথম ওদের দেখেছে। কনের মুখে কয়েক মুঠো শস্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়, জুইচে তার ওড়না থেকে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে আর মার্টার শৌক থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরের ঘরে উঠে যায়।

উপরের ফ্ল্যাটটাতে নিজের ছটো ক্লাশঘরের মত সমান জায়গা। প্রধানতঃ একটা রান্নাঘর, হল এবং শোবার-বসবার একটা ঘর নিয়ে তৈরী। অন্ধকার কোনাচে ঘরগুলো মেরেৎসএর বাড়ী থেকে পাঠান আসবাবপত্রেভর্তি। মার্টার আর তার মা যে কাঠের তক্তপোষ এবং ফ্লানেলের কম্বলে শুত তার বদলে এখন প্রকাণ্ড টানাভর্তি শয্যাদ্রব্য। কাপড়চোপড়ের টানার হাতলে হাতলে ল্যাভেণ্ডারের ছোট ছোট গুচ্ছ ঝুলছে। একটা কথাও না বলে সমস্ত কিছু দেখে নেয় জুইচে, তারপর জানলার দিকে তাকায়। নীচে স্কুলের মাঠে প্যারালাল বার এবং শরীরচর্চার অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জাম দেখা যায়।

সে ঘরের দিকে মুখ ফেরায়।

মার্টার তার হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে নেয়। জুইচে শান্ত ভাবে তার দিকে চায়। কোনও না কোনও সময় হাত ছাড়তেই হবে তাকে। এই কনের আড়ষ্ট পোশাক-পরা বিরাটকায় নিশ্চল মেয়েটার কোন খানে যে ঠিক ধরবে সে ভেবে পায় না। হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে সে, বাহু ছটো ধরে ওকে ঝাঁকাতে থাকে। তবু শান্তভাবে চেয়ে থাকে ও। তার সুন্দর মুখে কোনও পরিবর্তন দেখা দেয় না। শেষ পর্যন্ত সে তার কাছ থেকে সরে যায়, সাবধানে ওড়নাটা খোলে, ভাঁজ করে চেয়ারের উপর রাখে। মার্টার কলার আলগা করে নেয়, জ্যাকেটটা খুলে দেয়ালের একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখে।

ছোট মেরেৎস তাদের হঠাৎ নীরব হয়ে যাওয়া বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে বৌকে নিয়ে উপরের ঘরে যায়। ঘরটা আগে ছিল তার বোনের, এখন ওদের। স্বামীর দিকে ফিরে না তাকিয়ে, এদিকে-ওদিকে আটকে যাওয়া ওড়নাটা না খুলে মেয়েটা জানলার দিকে দৌড়য়। বাড়ী থেকে পালিয়ে সহরে চলে যায় নি সে, নদীতেও ডোবে নি, কাজেই এখন তাকে পালাতে হবে বহু রঙে রঙীন ঐ বাগানের উপর দিয়ে, পালাতে হবে অস্তসূর্যের আলোয় রাঙা ঐ বনভূমি পার হয়ে।

ছেলেটা ওর নাম ধরে ডাকে। না সরে ও মুখটা তার দিকে ফেরায়। আকাশ জুড়ে একটা হাল্কা সোনালী আভা, পালঙ্কের বিছানায় খাঁজে খাঁজে, মেয়েটার পোশাকে আর ওড়নায়, তার বাহুতে আর কপালে সেই একই আভা পড়েছে। তাদের জীবনে এই

শেষবার ছোট মেরেৎস্ বোকার মত একটা ক্লিষ্ট দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে চায়। এক লহমার জন্য এই অলৌকিক আভার মধ্যে মেয়েটার শীর্ণ মুখ এমন একটা অপরূপ সৌন্দর্যে ঝলকে ওঠে যে ছোট মেরেৎসএর মনে হয় হতাশায় পাগল হয়ে যাবে সে, কারণ এ মেয়ে কোনও দিন তার হবে না। আর মেয়েটাও যেন বুঝতে পারে যে সে এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ তাই তার অধরের কোণে একটা শান্ত হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

তারপর গোধূলি আলো ঝিমিয়ে যায়, চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে ওঠে। তেইশ সালের সেই মহান সময়ে কনের বাবা যত পোশাক-আশাক কিনেছিল সে সমস্ত এবং বিছানায় পাতা সাদা চাদর-পাতনি ইত্যাদি উজ্জলতায় ঝকঝক করে। ছোট মেরেৎস হাসে এবং হাত বাড়িয়ে দেয়। দরজার ওদিক থেকে বুড়ো মেরেৎস কোনও মতে হাসি চাপে যখন তার কানে যায় মেয়েটার দুর্বল ভাঙা স্বরের, "কর না! কর না!" আওয়াজ আর তার ছেলের নরম খুশীভরা গান।

॥ ৮ ॥

রাস্তায় পুলিশগুলো জোহানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার বদলে বরং টানতে টানতে নিয়ে যায়। তাদের ঘিরে একদল লোক ভীড় করে। ওরা ছুটে এগিয়ে যায়, গ্রামের প্রান্তে গিয়ে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে একটা পথ করে দেয়, সারাক্ষণ শাপশাপান্ত করতে থাকে আর চেঁচাতে থাকে। ঐ পথটার মধ্যে দিয়েই লোক তিনটেকে যেতে হয়। পুলিশগুলো জোহানকে বগল-দাবা করে তাকে তাড়াতাড়ি চলবার হুকুম দেয়: "জোরে পা চালা, হতচ্ছাড়া!" জোহানের জ্ঞান ফিরতে সুরু করে। সারা শরীরব্যাপী একটা যন্ত্রণার বদলে এখন যেন যন্ত্রণার চার-পাঁচটা বিশেষ জায়গা সে আলাদা আলাদা করে অনুভব করতে পারে। পেটে, পিঠে এবং বুকে বিশেষ জ্বালা বোধ হয়। জিভ দিয়ে মুখের ভিতরটা অনুভব করে থুতুর সঙ্গে একটা দাঁত ফেলে দেয় সে।

একটা পুলিশ হেসে ওঠে: "কি চাঁদ, মিষ্টি লাগছে না?"

অন্য প্যাঁচামুখো পুলিশটা কর্কশ ভাবে বলে: "চল বেটা, চল।"

যে ছেলের দল পিছনে ছুটছিল তাদের ধমক দেয় সে। বাচ্চারা থেমে যায়। পিছন দিক থেকে একবার অনেকক্ষণ ধরে জোহানকে দেখে তারপর বাড়ীর দিকে কদম বাড়ায়।

চটচটে চোখগুলো খোলবার চেষ্টা করে জোহান। বনপ্রান্তটা নজর করতে পারে সে, গ্রাম থেকে নদী পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এক বিরাট কালো বিলানের মত। মাটির রং হলদে, বনপ্রান্তের আকাশেও হলদেটে রং ধরেছে। পিছনের তেড়া-চরানির মাঠে আবার নাগরদোলা চলতে সুরু করেছে, সেখান থেকে আসা বাজনার সুর ওর কানের ভিতরের গর্জনের সঙ্গে মিশে যায়।

একজন চাষী রাস্তায় এসে পড়ে। দু'জন পুলিশ একটা লোককে নিয়ে কেন সহরের দিকে চলেছে বুঝতে চায়।

আলগাইয়ার তার ক্ষেত থেকে বীট তোলা সুরু করেছিল। হঠাৎ সে জোহানকে চিনতে পারে এবং সমস্ত বুঝে ফেলে। একটা আর্ত চমক খেয়ে সে কাঁপতে সুরু করে। তার কাদামাখা হাড়িগুলো ওঠাপড়া করে, চোয়াল-জোড়া পেষণের তাদতে ইতস্ততঃ নড়তে থাকে। সে রাস্তার কিনারে নেমে দাঁড়ায়, কাস্তেটা তখনও হাতে। তারপর কাস্তেটা ফেলে তাড়াতাড়ি সে টুপিটা নামিয়ে নেয় যেন ওরা একটা শিশুকে নামকরণের জন্য নিয়ে চলেছে কিংবা একটা মরা মানুষকে কবর দিতে।

— সমাপ্ত —

কেহ কাহাকেও মানুষ করিয়া দিতে পারে না, মানুষ নিজেই নিজের প্রদীপ, নিজেই নিজের বর্তি, নিজেই নিজের অবলম্বন। অতএব অপরের অনুগ্রহ কামনা মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান অন্তরায়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৭

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাংলা দেশে কোন কালেই যুগমানবের অভাব ঘটে নি। যখন জনকল্যাণের প্রয়োজনে কোন নূতন পথ দেখাবার দরকার পড়েছে, তখন দেশে নূতন পথিকৃতের উদ্ভব হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের ভ্রান্ত অপপ্রচারের কুফল দূর করবার জন্তে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদ বা একেশ্বরবাদ প্রচার আরম্ভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মোহময় বহির্মুখী স্রোতে বাধা দিয়ে দেশবাসীকে অন্তর্মুখী হতে আকুল আহ্বান জানান। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির আলোচনা সুরু করে সর্ব্বসাধারণকে পরাধীনতার গ্লানি ও নানা অসুবিধা বুঝতে থাকেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সকল প্রকার স্বচ্ছ আরতন ভাঙবার প্রয়াস পান। শ্রীঅরবিন্দ দেশের মুক্তিসাধনায় আত্মশক্তির উদ্বোধন করেন। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-এর মাধ্যমে জাতীয় জীবনে সত্য ও সুন্দরের স্থান নির্ণয়ে ব্রতী হন। আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বাদেশিকতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। সুদূর জার্মান দেশে জার্মান ভাষায় যে মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী প্রচারিত হয়েছে, ইংরাজী ভাষাতেও যাঁর জীবনী সুলিখিত, কেবল বাঙালী বলিয়াই তাঁর জীবনীর বিশেষ অভাব। সেই অভাব যৎকিঞ্চিৎ মোচনের জন্তই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার খন্যান নামে এক অখ্যাত গ্রামে বিখ্যাত শ্রীরামঠাকুরের বংশে ব্রহ্মবান্ধবের জন্ম। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁর সকলেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব সেই ব্রাহ্মণত্বের বড়াই কোনও দিনই ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁর পিতামাতার সঠিক পরিচয় পাওয়া কঠিন। কারণ, এ বিষয়ে তিনি নিজেও বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নি, এবং যাঁরা ঠিক এ কথা জানতেন তাঁদের প্রায় সকলেই পরলোকে। এইটুকু কেবল জানা যায় তৎকালীন সুপরিচিত নেতাদেরও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পিতৃব্য। তিনি আবার স্বনামধন্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

নিজ গ্রামেই ভবানীচরণের পড়াশুনা আরম্ভ হয়। পরে কলিকাতায় এসে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ভালই ছিল। মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন হ'তে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জেনারেল এসেম্ব্লী কলেজে কিছু দিন পড়েন। ঐ কলেজ এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ নামেই পরিচিত। এইখানে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন। এফ্. এ. (F. A.) ক্লাসের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে দেশ-প্রেমে মত্ত হয়ে কেতাদুরস্ত লেখাপড়া ছেড়ে দেন। পরে কিন্তু নিজ চেষ্টা ও পরিশ্রমে তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা বেশ ভাল করেই শেখেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ছাত্রাবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট তিনি যাতায়াত করতেন। পরে আলমবাজার মঠেও তাঁর যাতায়াত ছিল।[১] স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'লে সেখানেও তিনি যাওয়া-আসা করতেন। বিবেকানন্দ স্বামী এবং তাঁর কয়েকজন গুরুভ্রাতার সঙ্গে ভবানীচরণের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল।[২]

কলেজে পড়ার সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে ভবানীচরণের স্বদেশের প্রতি গভীর ভালবাসা জন্মে। তিনি নিজেই লিখে গেছেন—"এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কলেজে উঠিলাম। তখন বয়স সতের বৎসর। ঐ কাঁচা বয়সে প্রাণটা কেমন উডু উডু করিতে লাগিল। দেশে মানুষ—সুরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে মনে মিলে না বলিলেই লোকে জ্যাঠা বলিয়া উড়াইয়া দিত। একদিন প্রাণের আবেগে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি তখন মটশ্‌ লেনে রাজা শ্রীযুক্ত সুবোধ মল্লিকের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি

---

(১) স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ

(২) শিবলাই দেবশর্মার "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়" পুস্তকে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত ভূমিকা।

আমায় চিনিতেন না। কিন্তু আমার পিতৃব্যদেব তাঁহার বিশেষ বন্ধু বলিয়া আমার সহিত তিনি খুব মন খুলিয়া কথা কহিলেন। পরিচয়ের পরেই আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বলিলাম—Not through pen, but through sword—অর্থাৎ কলমবাজিতে হইবে না, তলোয়ার বাজিতেই ভারত উদ্ধার হইবে।"৩

একরূপ মনের ভাব নিয়ে ভবানীচরণ কলেজ ছেড়ে তিনজন বন্ধুর সঙ্গে গোয়ালিয়র যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য—সেখানে গিয়ে গোয়ালিয়র রাজ্যের ফৌজের দলে ভর্তি হয়ে যুদ্ধবিদ্যা শেখেন। কিন্তু জনৈক বন্ধুর অভিভাবক কোন রকমে এ কথা জানতে পেরে তাঁদের গৃহে ফিরিয়ে আনেন। ব্রহ্মবান্ধব তাতেও নিরস্ত হন নি। কিছু দিন পরই তিনি সুখের নীড় ছেড়ে একাকীই বন্ধুর পথ পথ ধরলেন। অনেক ক্লেশ স্বীকার ক'রে আগ্রা হ'তে পায়ে হেঁটে গোয়ালিয়রে উপস্থিত হন। দৈবক্রমে সেখানে এক সর্দারের কিশোর পুত্রের গৃহ-শিক্ষকতা জোটে। তখন তিনি সেই সর্দারের সাহায্যে ফৌজদলে প্রবেশ ক'রে যুদ্ধ শেখার চেষ্টা করলেন। সেনাপতির সঙ্গেও পরিচয় হ'ল। কিন্তু তাঁর এ বিষয়ে কোন হাত নেই জেনে হতাশ হয়েই গৃহে ফিরলেন।

বাড়ী ফিরে তিনি অন্য এক পথ ধরলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানাবিধ প্রবন্ধ লিখে দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—"ইংরেজের অনুসরণ করিলে ফিরিঙ্গী ছাড়া আর কিছুই হওয়া যায় না।" সিন্ধু প্রদেশে ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে কনকর্ড ক্লাব (Conquired Club) প্রতিষ্ঠা ক'রে উহার মুখপত্র 'কনকর্ড' মাসিক পত্রে দেশের কথাই লিখতে লাগলেন। কিছুদিন পরে করাচি থেকে "ফিনিক্স" ও "হারমনি" নামে দুইখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদক-রূপে একই কথা বলতে লাগলেন। তারপর কলিকাতায় ফিরে এসে "টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি" (Twentieth Century) নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বেদান্ত বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখলেন। ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেব এই সময় উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ পড়েই ব্রহ্মবান্ধবের পরিচয় পান।

প্রথম যৌবনে কেশব সেনের সংস্পর্শে এসে ভবানীচরণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি সিন্ধু প্রদেশে গমন করেন। সেখানে রোম্যান ক্যাথলিক কয়েকজন পাদ্রীর সহিত তাঁর সংযোগ ঘটে। তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধনে আকৃষ্ট হয়ে তিনি রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নূতন নামকরণ হয় "রেভারেণ্ড থিওফিলাস" (Revd Theophilus), অর্থাৎ Lover of God বা ঈশ্বরপ্রেমিক। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসীর মত গৈরিক বসন ধারণ করে "ব্রহ্মবান্ধব" নাম গ্রহণ করেন। তখনও তিনি করাচি থেকে "সোফিয়া" পত্রিকা সম্পাদন ক'রে খ্রীষ্টধর্মই প্রচার করতেন। এই সময় কয়েকজন হিন্দু যুবককে তিনি খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করেন। সিন্ধী রেবাচাঁদ তাঁদের অন্যতম। এই রেবাচাঁদ ব্রহ্মবান্ধবের একখানি জীবনী লেখেন। উহা এখন দুষ্প্রাপ্য। এই সময় সিন্ধু প্রদেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে ব্রহ্মবান্ধব নিজ জীবন বিপন্ন করেও প্লেগরোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অন্তরের টান ছিল। তিনি ক্রমে যুক্তিবাদী বেদান্তী হয়ে ওঠেন। খৃষ্ট-ধর্মকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে করাচির খৃষ্ট-সমাজ কর্তৃক তিনি একঘরে (en-communicated হন। শুনা যায় ইতঃপূর্বে তিনি 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট' খৃষ্টধর্মও গ্রহণ করেছিলেন। পরিশেষে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে পিতৃপিতামহের সনাতন হিন্দুধর্মে তিনি ফিরে আসেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীবলাই দেবশর্মার "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়" পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন—"ভট্টপল্লীর ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় মিতাক্ষর মতে ব্রহ্মবান্ধবের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন। এবং নিজেই তাঁহাকে মন্ত্র পড়ান।"

বিবিধ পত্র-পত্রিকায় বেদান্ত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি প্রদেশে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিয়ে আসেন। মাদ্রাজে হঠাৎ একদিন বেলুড় মঠের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। উপাধ্যায় মহাশয়ের আহারাদির বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে শুনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে তাঁর আহারের সুব্যবস্থা ক'রে দেন।

বিলাতে যাওয়ার পূর্বে বোলপুরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠাকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন। সেখানে আচার্যের পদেও কিছু দিন কাজ করেন। দেশের ছেলেমেয়েদের জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁর মতবিরোধ ঘটে। তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছেড়ে চলে আসেন।

(৩) "আমার ভারত উদ্ধার"—ব্রহ্মবান্ধবের স্বি-কথা, পৃ ১০

রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের মত বিরোধ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপাখ্যান ছিল। শ্রীবলাই দেবশর্মা তাঁর 'ব্রহ্মবান্ধব' পুস্তকে লিখেছেন—"ব্রহ্মবান্ধবের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ঐ আখ্যানের প্রতিবাদ করায় রবীন্দ্রনাথ সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য করিয়া লইয়া পরবর্তী সংস্করণে উহা সংশোধন করিয়া দেন।"

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পরেই মাত্র ৩০৲ টাকা হাতে লইয়া ব্রহ্মবান্ধব বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাত্রার কারণ তিনি নিজেই লিখে গেছেন—"স্বামীজীর মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্র আমার মনে হইল বুকের মাঝে কে যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া দিল। তখনই প্রতিজ্ঞা করিলাম বিলাত যাইব। স্বামীজীর অনুষ্ঠাপিত ব্রত উদ্‌যাপন করিব। আমার অবশিষ্ট জীবনের ইহাই একমাত্র কর্তব্যকর্ম।"

আপন বিদ্যাবত্তার মহিমা প্রচার করে চম্পকবর্ণ হাতের তালি খেতে তিনি বিলাতে যান নি। স্বামীজীর ন্যায় তিনিও মনে করেছিলেন—"যদি ভারত পুরাকালের ন্যায় পৃথিবীর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি য়ুরোপ হতে ছাত্র সকল ভারতবর্ষে দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, সাহিত্য পাঠ করিতে আসে তাহা হইলে ভারতের প্রতি জগতের শ্রদ্ধা হইবে।...আমাদের শাস্ত্রবিদ্যা শিখিতে ইংরেজের যদি আগ্রহ হয়, তাহা হইলে ভারতের আত্মবিস্মৃতি দূর হইবে ও ইংরেজেরও মঙ্গল হইবে।" ভারতের অধ্যাত্ম সম্পদের পরিচয় দিতেই তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন।

নাদির তৈমুরলঙ্গের লুণ্ঠন, কোরাণ, কৃপাণ হতে ধর্মপ্রচার সত্ত্বেও যে ভারত, সেই ভারতই ছিল। ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ধনসম্পদ, শিল্পবাণিজ্য সবই অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ইংরাজ রাষ্ট্রাধিকারে সব ওলট-পালট্ হয়ে গেল কেন? কারণ, ইংরাজি শিক্ষার ফলে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে স্বদেশের ও স্বজাতির সহিত দেশের লোকের সব মর্মবন্ধন টুটে গেল। "এখন কোনও সভ্যতার কাছে যদি আমরা অবনত হয়ে থাকি, তবে ভারতের ধ্বংস অনিবার্য্য। দেশের লোক ভারতীয় না হ'লে ভারতের অভ্যুত্থান অসম্ভব।" এই সকল কথা ভেবেই ব্রহ্মবান্ধব বিলাতে গিয়ে ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রচারে ব্রতী হলেন।

বিলাতে গিয়ে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন ও ধর্ম বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। মাঞ্চিস্টারেও তিনি অনুরূপ কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁর প্রথম বক্তৃতা "হিন্দুর চিন্তাপ্রণালী ও পাশ্চাত্য শিক্ষা" (Hindu thought and Western culture)। যে সভায় তিনি এই বক্তৃতা দেন, সেই সভার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক এ. এ. ম্যাগডোনাল, এম. এ. (Prof. A. A. Magdonal, M.A.) এই বক্তৃতার ব্রহ্মবান্ধবের প্রধান বক্তব্য ছিল "জীবন-পথের জটিল সমস্যা ভঞ্জন করিতে য়ুরোপীয়েরা কেন হিন্দু চিন্তাপ্রণালীর সাহায্য না চায়? যুদ্ধের সময় ভারতের সৈনিক চাই। কিন্তু প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির যুদ্ধের সময় ভারতের দর্শন কেন না চাই?" হিন্দু জাতি কেমন করে এ সমস্যা সমাধান করেছে তার দুই-একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি অবশেষে বলেন—"শুধু মুখ্যাতি করিলে হইবে না, হাতে-কলমে করে দেখিতে হইবে—তা হলে সুফল ফলবে।" এই বক্তৃতার সময় কলিকাতার জর্জ ট্রেভিলিয়ন (Georgo Trevelyan) সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম বক্তৃতাতেই ব্রহ্মবান্ধবের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

বেলিয়ল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ কেয়ার্ড (Dr. Cairl, the Principal of Balliol College) এর সভাপতিত্বে বিদ্বজ্জন সভায় ব্রহ্মানন্দ "হিন্দুর আস্তিক্যতত্ত্ব" (Hindu Theism) "হিন্দুর সমাজতত্ত্ব" (Hindu Sociology) প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। কয়েকটি মহিলা সভাতেও এই সময় তিনি "হিন্দু গার্হস্থ্য নীতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

তাঁর "হিন্দু ব্রহ্মজ্ঞান" বক্তৃতাটি 'মাইণ্ড' (Mind) নামে একখানি প্রসিদ্ধ দার্শনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যাগুলি এরূপ যুক্তিপূর্ণ সহজবোধ্য হয়েছিল যে উহার পরই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত অধ্যাপনার উদ্যোগ হয় এবং কেম্ব্রিজেও বেদান্ত পড়াবার জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে।

ট্রিনিটি কলেজে "হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্ম", "হিন্দুর ধর্মতত্ত্ব" ও 'হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব' বিষয়ে তিনটি মনোরম বক্তৃতা দেন। দার্শনিক পণ্ডিত ডাঃ মেটাগর্ট এই সকল বক্তৃতা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরে এসে ব্রহ্মবান্ধব আর এক নূতন পথে পদার্পণ করলেন। এক পয়সা মূল্যের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্পাদন করে দেশের লোকের মনে জাতীয়তাবোধ জাগাবার প্রয়াস পেলেন। কার্তিক মাসের বাড়ী হ'তে 'সন্ধ্যা' কাগজ প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার পরিচালনায় তাঁর সহযোগী ছিলেন—নারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ও নরেন্দ্রনাথ শেঠ।

ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে সরকারের দ্বারে উপস্থিত হওয়া বিশেষ অপমানজনক, উহাতে যে পরিশ্রম হয় তাহাও ব্যর্থ—এই কথা ভেবে ব্রহ্মবান্ধব কংগ্রেসের নরম দলের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। "ফিল্ড এ্যাকাডেমির" একটি ঘরে তখন প্রতি সন্ধ্যায় গরম দলের আড্ডা বসিত। বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, এবং সুবোধচন্দ্র মল্লিক সেই আড্ডায় নিয়মিত উপস্থিত থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন।

ব্রহ্মবান্ধব এ দেশে প্রতীচ্যের জাতীয়তাবোধ (Nationality) এর উদ্বোধন চান নি। তথাকথিত রাজনীতির চর্চাও তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন জাতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার পুনরভ্যুদয়। সন্ধ্যা পত্রিকায় রাজনীতির চর্চা বিশেষ না করে স্বদেশ ও স্বাদেশিকতার কথাই তিনি বলিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে বিপ্লবের যজ্ঞানল জ্বালিয়েছিলেন ব্রহ্মবান্ধব তাতেই হবিঃ নিক্ষেপ করে দ্বিহোত্রকে রক্ষা ও বর্দ্ধন করতে আত্মনিয়োগ করলেন। আত্মবিস্মৃত দেশবাসীর সম্মুখে দেশের সত্য মূর্ত্তি উজ্জ্বল করে ধরতে প্রয়াসী হলেন, দেশপ্রেমের কোন আদর্শ যাতে দেশবাসী পায় তার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আইরিশ বিপ্লবের উদ্বোধক ছিল অতীত "কেলটিক কালচার" (Keltic Culture)। ম্যাৎসিনীর নব্য ইটালীর সাধনার প্রাচীন রোমের স্বপ্ন ছিল। নবভারতের আন্দোলনে অতীতকে একেবারে বিস্মরণ হ'লে চলবে কেন? তাই ব্রহ্মবান্ধব লিখলেন—"দরদ না হইলে আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা জাগে না। ফিরিঙ্গীর শিক্ষায় দেশের প্রতি আমাদের সেই দরদ ঘুচিয়া গিয়াছে। আমরা ভাবিতে শিখিয়াছি দেশের এটা ভাল নয়, ওটা ভাল নয়।" আর প্রচার করতে লাগলেন—চাই জাতির অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা। নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান যুক্তিসহকারে বিচার করে দেখা, এবং তার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করা।

তাই তিনি জাতীয় জাগরণের সঙ্গে জাতীয় আচার-অনুষ্ঠানের পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিলেন। সন্ধ্যা পত্রিকায় বাংলার পালপার্ব্বণে নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হইতে লাগিল। সকল মঙ্গলানুষ্ঠানে কদলীবৃক্ষ কেন দেওয়া হয় তার কৈফিয়তে তিনি লিখলেন—"বিলাতে চেরি ও ভেজি গাছের আদর আছে, আমরা কিন্তু কদলীবৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। কদলীর ফুল (মোচা), পাতা, ফল, সকলই মানুষের কাজে লাগে। তাহার মজ্জাটুকু (থোড়) পর্য্যন্ত বাদ যায় না। বৃক্ষের এই আত্মোৎসর্গ, এইটুকুর প্রতিই হিন্দুর শ্রদ্ধা। এই উৎসর্গের মহিমার জন্যই সকল উৎসব অনুষ্ঠানে, যাবতীয় মঙ্গলকার্য্যে কদলীবৃক্ষের স্থান।" ভারতীয় পূজাপার্ব্বণের প্রকৃত উদ্দেশ্যও তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে লাগিলেন।

দেশের 'মাটি'—মাটি নয়, মা-টি, তিনি প্রথমে ঘোষণা করলেন। বালগঙ্গাধর তিলক প্রবর্ত্তিত শিবাজী উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভবানী মূর্ত্তি গড়ে দেশমাতৃকার পূজা প্রবর্ত্তন করলেন। দেশবাসী দেশকে ভালবাসিতে যাতে একটি অবলম্বন পায় তার উপায় বিধান করলেন। তিনি বুঝেছিলেন—দেশকে আপন জন ভেবে ভালবাসতে না পারলে কেহই দেশসেবায় প্রবৃত্ত হবে না। ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আপনাকে কিভাবে আমি সেবা করতে পারি?" স্বামীজী উত্তর দেন—"তুমি ভারতবর্ষকে ভালবাস।" তিনি জানতেন দেশকে ভালবাসলেই মানুষ দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবে। ব্রহ্মবান্ধবও সেই কারণে চেয়েছিলেন দেশের লোক তারই মত দেশকে ভালবাসুক। সে ভালবাসা কিন্তু ইংরাজী ভাষায় Patriotism নয়, তাহা দেশাত্মবোধ যা শুধু মঙ্গলই নিয়ে আসে।

ব্রহ্মবান্ধব মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন বিপ্লবের প্রথম কথাই ভালবাসা, কারণ বিপ্লব বিদ্রোহ নয়। তাই স্বদেশী আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবে তিনি উল্লসিত হয়ে লিখলেন—"এ ফিরিঙ্গীর বাঁদাড়ের পাদাড়ের সিলি জ্যাকোবিন নহে—নির্ভীক। শুধু রক্তের বাহার; কেবল বর্ণবিন্যাস! দেবতার পূজায় লাগে না। যাগযজ্ঞে অনাবশ্যক। শুধু সাহেব বিবির সাহেবিয়ানার আড়ম্বর।" ব্রহ্মবান্ধব বুঝেছিলেন—বাঁচতে হ'লে ভারতের পক্ষে বিপ্লব অনিবার্য্য। আর সে বিপ্লব একমাত্র দেশাত্মবোধই ঘটাতে পারে।

দৈনিক 'সন্ধ্যা' পত্রিকাই ব্রহ্মবান্ধবকে খ্যাতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করে। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে এই পত্রিকা পরিচালনায় তাঁকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'স্বরাজ' পত্রিকাও তাঁর সুনাম বজায় রেখেছিল।

ব্রহ্মবান্ধব এমন বিচক্ষণ লেখক ছিলেন যে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে সহজে কোন অভিযোগ আনতে পারেন নি। অথচ তিনি তাঁর কাগজের প্রতি সংখ্যায় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কার্য্যকলাপের অকুণ্ঠ সমালোচনা করতেন।

তাঁর জ্বালাময়ী ভাষায় জনসাধারণের মনে বিপ্লবাগ্নি জ্বলে উঠতে বিলম্ব হয় নি। 'সন্ধ্যা' কাগজ পড়বার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনে তাঁর লেখনী তরবারির চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছিল। জাতিকে তিনি পাশ্চাত্যের মোহ হ'তে মুক্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

রামমোহন রায় থেকে অনেকেই দেশবাসীকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আহ্বানে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। স্বামী বিবেকানন্দ এর কারণ নির্দ্ধারণ করে বলেছিলেন—"ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখন নিঃশেষিত শক্তি, অটল এবং ধারাবাহিক প্রয়াসের প্রাণশক্তি তাদের নেই; ভারতের ভবিষ্যৎ জনসাধারণের হাতে।"[৪] ব্রহ্মবান্ধব স্বামীজীরই উপদেশ অনুসরণ করে জনসাধারণের মোহনিদ্রা ভাঙতে বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেন "দেশ স্বাধীন হইবেই। আমি মুক্তির বাণী শুনিয়াছি। আমাদের ঘর-গৃহস্থালী নিজেদের আদর্শে পরিচালিত করিব। ভারতের জাতীয় জীবনে ইংরেজের কোন কর্তৃত্বই থাকিবে না।"

এই উদ্দেশ্যেই তিনি স্থানে স্থানে "স্বরাজসঙ্ঘ" গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। তখন তিনি দেশবাসীকে উদাত্ত স্বরে আহ্বান করে বলেছিলেন—"ফিরিঙ্গী আমাদের দেশের বাস্তব সত্তার প্রতি আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দিয়াছে। এই বিমুখী মনকে দেশের অভিমুখী করিতে না পারিলে আমাদের আর গত্যন্তর নাই।"

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু উহা থেকে অচিরেই জাতীয়তার উচ্ছেদ ঘটিল। উপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উহার সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মবান্ধব "সারস্বত আয়তন" নামে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে জাতীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করলেন। কিন্তু দেশের লোকের সহানুভূতির অভাবে ব্রহ্মবান্ধবের তিরোধানের সঙ্গেই উহাও তিরোহিত হইল।

এই সময় শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার 'নবশক্তি', উপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বরাজ' পত্রে জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হ'তে লাগল। জাতি তখন কেন্দ্রচ্যুত। সুতরাং সাময়িক উত্তেজনা ব্যতীত, আর কিছুই লাভ হ'ল না। "স্বমহিমায় বিরাজ করাই যে স্বরাজ লাভ" উপাধ্যায় মহাশয়ের সে স্বপ্নের স্বরাজ স্বপ্নেই রহিয়া গেল।

ব্রহ্মবান্ধবের বিপ্লব প্রচেষ্টা কোন দিন কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরোপিত হয় নি। ঐহিক ভোগসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্ত্য দেশের আসুরিক সভ্যতার বিরুদ্ধেই বিপ্লব উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই তিনি লিখলেন—"জাতীয় আদর্শকে হারিয়ে, সমাজ-সংস্কার করে, রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে তথাকথিত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করে কিছুতেই জাতকে বাঁচান যাবে না।"

সেই কারণে তিনি স্বায়ত্তশাসন চান নি, ঔপনিবেশিক হোম রুলেরও অনুরক্ত ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবাসীর আত্মবোধের উন্মেষ। তিনি জাতীয় চেতনাকে জাগাবার জন্যে নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করলেন —"শুনেছি আমি মুক্তির সংবাদ, ভারত স্বাধীন। এখন আর নির্জ্জনে ধ্যানধারণার সময় নয়।" স্বামী বিবেকানন্দও দেশবাসীকে আহ্বান করে অনুরূপ কথাই বলেছিলেন—"আগামী পঞ্চাশ বৎসর দেশমাতৃকাই তোমাদের একমাত্র পূজার সামগ্রী, তোমাদের আরাধ্য দেবতা হোক।"

তাঁদের আহ্বানে জনকয়েক যুবক দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আত্মবলি দিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত হলেন না। তারই ফলে আজ এই স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা লাভ হ'ল না। 'পাকিস্তান' এসে পাক ঘোলালে। মহাভারতের প্রাণপুরুষ স্বস্তি পেলেন না।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কঠোর দমননীতির ফলে বারীন ঘোষের 'যুগান্তর' ও শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার পরেই উপাধ্যায় মহাশয়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হ'ল। সন্ধ্যা প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করেও তিনি সরকারকে জানালেন, বিচারে তিনি কোন অংশ গ্রহণ করবেন না। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন—বিদেশী সরকারের সাধ্য নেই যে তাঁকে শাস্তি দেয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডের এজলাসে তাঁর বিচার আরম্ভ হ'ল। আদালতে বিবৃতিদান কালে তিনি মুক্তকণ্ঠে

(৪) "বিবেকানন্দ স্মৃতি"—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭১।

বললেন—"I do not take any part in this trial, because I do not believe that in carrying out my humble share of God-appointed Mission of Swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national freedom."—অর্থাৎ আমি এই মোকর্দ্দমায় অংশ গ্রহণ করতে পারি না, কারণ আমি বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট স্বরাজ সাধনায় সামান্য অংশ গ্রহণ করার জন্য আমাকে বিদেশীর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। ওরা দৈবক্রমে আমাদের উপর শাসন-দণ্ড উদ্যত করে আছে, এবং ওদের স্বার্থ আমাদের প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতার স্বার্থের পরিপন্থী। বিদেশীর পক্ষে এরূপ স্বার্থান্বেষী হওয়া অস্বাভাবিক নয়।" হিংসাদ্বেষহীন কি নির্ভীক বিবৃতি!

এই রাজদ্রোহ মোকর্দ্দমায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বেচ্ছায় উপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। দাশ মহাশয় মোকর্দ্দমা আরম্ভ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে উহা শেষ করতে হয় নি। আদালতের মধ্যেই একদিন বাকৃসিদ্ধ ব্রহ্মবান্ধব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে (বর্ত্তমান নীলরতন সরকার হাসপাতাল) পাঠান হ'ল। সেইখানেই তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন! ইংরাজের আইন তাঁকে আর কোন শাস্তি দিতে পারে নি। 'সন্ধ্যা' তাই গান ধরল—

"তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে
আমায় ধরতে পারলি না।"

ব্রহ্মবান্ধব দেশপ্রেমে পাগল হলেও তাঁর সাহিত্য রসবোধ সামান্য ছিল না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে 'সোফিয়া' পত্রিকার এক সম্পাদক স্তম্ভে ব্রহ্মবান্ধবই সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে "The World Poet of Bengal"। "বাংলার বিশ্বকবি" আখ্যা দেন। তখনও রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি ঠিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। উপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগেই সম্ভবত ১৩১৪ সালে কাঁঠাল-পাড়ায়, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থানে, প্রথম 'বঙ্কিম উৎসব' আরম্ভ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও দেবীচৌধুরাণীর অভিনব ব্যাখ্যা করেন।

ব্রহ্মবান্ধব সন্ন্যাসী হ'লেও তাঁর লেখার মধ্যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের অভাব ছিল না। তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে সামান্য যা-কিছু লিখে গেছেন তার মধ্যে কোথাও তাঁর আত্মগরিমার প্রকাশ নেই। বরং তিনি অনেক স্থলে নিজেকে নিয়ে বেশ কৌতুক করেছেন। "বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠিতে" তিনি নিজের কথা এই ভাবে আরম্ভ করেন:—"আমি একজন ইংরেজীপড়া সন্ন্যাসী। আজ-কাল অনেকানেক সন্ন্যাসী বিলাতে গিয়া শাস্ত্রের বুকনি দিশাইয়া বক্তৃতা করে খুব হাততালি খায়। আমারও একদিন শখ হ'ল যে বিলাতের হাততালি খাব। কলিকাতা বম্বই,মান্দ্রাজের হাততালি খুব খেয়েছি, এখন দেখি চম্পকবরণ হাতের হাততালি কেমন মিষ্টি।" 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভেও এইরূপ রসিকতার ছড়াছড়ি থাকত। প্রবন্ধের 'হেড লাইনগুলিও বেশ রসাল হ'ত।

ব্রহ্মবান্ধবের সৌন্দর্য্যবোধ ছিল সহজ, আর তার প্রকাশভঙ্গিও ছিল খুব সরল। বিলাতের বসন্ত বর্ণনায় তিনি লিখলেন—"বসন্তের সমাগম হয়েছে। শীতের প্রকোপ আর নাই। প্রকৃতি আবার নবজীবন পেয়েছে। ক'মাস ধরে গাছগুলিতে একটিও পাতা ছিল না। উলঙ্গ ঊর্দ্ধবাহুর মত দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ কে যেন নবকিশলয় বসন পরিয়ে দিয়েছে। * * * এখানে পাখীর ডাক এত মিষ্টি লাগে যে মনে হয় যেন কানে মধু ঢেলে দিচ্ছে। * * * এমন তরু নাই যাতে বিহগ নাই, এমন বিহগ নাই যাহা সুখে করে না। কি কলতান, কি শিস। বিরহীর বাঁচা দায়। তবে আমার ভাগ্যগুণে বিরহ-জ্বালা নাই, তাই এখনও বেঁচে আছি। মাঠে মাঠে এত ফুল যে দেশটা প্রকাণ্ড বাগানের আকার ধারণ করেছে। ডাফোডিল (Daffodil) কুসুমে সব একেবারে ছিটিয়ে গেছে। সত্যসত্যই 'ডাফোডিল'—দিল অর্থাৎ মনের ডাকাবুকো। আর ক্রকাস (Crocus) ফুলের রঙ-বেরঙের ঘটা দেখলে চোখ জুড়ান দায়। "প্রেমরোজ" (Prim Rose) বাস্তবিক যেন এক একটি অভিমানিনী রোষভরে চেয়ে রয়েছে। যশোমণি (Jassomin) ও বোলটের (Violet) কথা আর কি বলবো—যে দেখেছে সে মজেছে।"[৫]

বিলাতি ফুলগুলির অপরূপ নামকরণ এবং ওদের সৌন্দর্য্যবর্ণন প্রকৃত রসিকমনেরই পরিচয় দেয়।

রসিক হ'লেও ব্রহ্মবান্ধব মনেপ্রাণে সন্ন্যাসী ছিলেন। বিলাতে গিয়াও তিনি সেখানে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনই যাপন করতেন। নিজেই তিনি লিখে গেছেন:

(৫) বিলাতপ্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

"এবার সন্ন্যাসীগিরি ঘুচিয়ে দিয়েছে। কেবল আলু-সেদ্ধো, আর কপিসেদ্ধো খেয়ে বিদ্রি হয়ে গেছে। মনে হয় দেশে ছুটে যাই, আর একটা ঝালঝাল তরকারি ও তেঁতুল-গোলার টক খেয়ে জিভটাকে শানিয়ে নি। একটু সুরা ও মাংস গ্রহণ করিতে বন্ধুরা খুব পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু আমি রাজি নহি। আর যা করি না করি—আমিষ, মদিরা ও ইংরেজী পোষাক একান্ত বর্জ্জনীয়।"৬

"আর আয়েসের কথা কি বলিব? খাওয়া দাওয়া নাওয়া শোয়া বসা দাঁড়ান সব কাজে এত আরাম করে তুলেছে যে ইন্দ্রলোকে এর চেয়ে আর কি হ'তে পারে!"৭

কিন্তু এত আয়েসের মধ্যে থেকেও ব্রহ্মবান্ধব আয়েসী হয়ে উঠতে পারেন নি। দু'টি মাত্র আরাম তিনি ভোগ করে এসেছেন—"থান কৌপিন" তবে "পিকচারি ও পাউডার সুখটা" ভোগ করতে পারেন নি। তাঁর দেশের আচার-নিষ্ঠার উপর টান বেধেছিল।৮

অপূর্ব প্রতিভা এবং সেই প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ ও সুবিধা থাকতেও ব্রহ্মবান্ধব কোন স্থায়ী কীর্ত্তি রেখে যেতে পারেন নি। সংবাদপত্র সম্পাদনায় ও নানা পত্র-পত্রিকায় রসমধুর অথচ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনায়, এবং স্বদেশবাসীদের নিজ নিজ সাধনা ও সংস্কৃতির অভিমুখে বাঙ্গাবদল করাবার প্রচেষ্টায় তাঁর সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও রম্য রচনায় সিদ্ধহস্ত হইয়াও তিনি উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ লিখে যেতে পারেন নি। দেশের লোক যে তাঁকে এত শীঘ্র ভুলে যেতে পেরেছে—ইহাও অন্যতম কারণ।

তবে প্রধান কারণ বাঙ্গালীর সহজ আত্মবিস্মৃতি। দধীচির ন্যায় অস্থি দান করে যাঁরা দেশকে শত সহস্র অপমান থেকে রক্ষা করে স্বাধীনতার পাদপীঠে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন, বাঙ্গালী তাঁদের একেবারে ভুলে গিয়েছে। তাঁদের উজ্জ্বল আলেখ্য লোকচক্ষুর গোচরে এনে কে আজ তাঁদের স্মৃতিপূজার আয়োজন করবে? কে আবার স্বাধীনতার ইতিহাস নূতন করে লিখবে?

---

(৬) ঐ

(৭) বিলাতপ্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

(৮) ঐ

ভারতের এত খনিতে এত ধাতু আছে, ভারতের উর্ব্বরা ভূমিতে এত বন্য শস্যাদি জন্মে; শিল্প ও কৃষির উন্নতি হইলে এই সকলের দ্বারাই দেশের অভাব দূর হইতে পারে।

(রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দাসী, জুলাই ১৮৯৩ পৃঃ ২৭)

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

(ঊনচল্লিশ)

রামকিঙ্করকে বৃন্দাবন যেতে হয়েছিল গিন্নীমার বাড়ীর জন্তে। ওঁদের উকিলের এক আত্মীয় বৃন্দাবনে থাকেন। তাঁরই মারফৎ একটা বাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। এমন কি, মোটামুটি একটা দরদস্তুরও হয়ে যায়।

এই সূত্রে উকিলকে নিয়ে রামকিঙ্কর বৃন্দাবন গিয়েছিল। বাড়ীটা তাদের পছন্দ হয়। ঠিক যেমনটি চাইছিল, প্রায় তেমনটি। একটা অংশে ঝি-চাকর নিয়ে গিন্নীমা থাকবেন, অপরাংশ ঘর ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। তাতে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, গিন্নীমার বেশ ভালই চলে যাবে। দাম ওখানকার হিসাবে হয়ত একটু বেশীই পড়ল, কিন্তু কি আর করা যাবে। দূর থেকে গরজ করে কিনতে গেলে দাম একটু বেশীই পড়ে থাকে।

আবশ্যকীয় মেরামতের ব্যবস্থা করে রামকিঙ্করের ফিরতে দিন পনেরো লাগল। সব কথা গিন্নীমাকে জানিয়ে বললে, মেরামত হয়ে বাড়ীটা বাসের যোগ্য হ'তে বেশী সময় লাগবে না। মাসখানেকের মধ্যেই যেতে পারবেন মনে হয়।

গিন্নীমাকে একটু খুশী-খুশী বোধ হ'ল। বললেন, দোলের আগে যেতে পারব?

—তা পারবেন। আর একটা সুবিধা হ'ল, উকিল-বাবুর আত্মীয়টি রইলেন। তিনি আপনার দেখা-শুনা করতে পারবেন। বড় ভাল লোক। ওকালতি করতেন, অবসর নিয়ে বৃন্দাবনেই একটি বাড়ী কিনে শেষ জীবনটা কাটাবার সংকল্প করেছেন।

—স্ত্রী আছেন?

—না। চাকরি করবার সময়েই ভদ্রলোকের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। সেই কারণেই বোধ হয় এই বৈরাগ্য। আপনার বাড়ীর কাছেই তাঁর বাড়ী, তিনিও আপনার মত ব্যবস্থা করেছেন। দোতলার দু'খানা ঘরে নিজে থাকেন, নিচেটা ভাড়া দিয়েছেন। কোন একটা মন্দিরে এককালীন থোক কিছু টাকা দিয়ে রেখেছেন, সেখান থেকেই দু'বেলা প্রসাদ আসে।

খুশীর সঙ্গে গিন্নীমা বললেন, বেশ ভালই হবে।

—আপনার সঙ্গে কে কে যাবে?

গিন্নীমা হাসলেন: কে আর যাবে বাবা। আমার সঙ্গে বনবাসে যেতে কে রাজী হ'তে পারে? গোলাপ রাজী হয়েছে। মেয়েটা ছোট বয়েসে আমার কাছে এসেছিল। আমার ওপর খানিকটা মায়াও পড়ে গেছে। তা ছাড়া মেয়েটা ভাল। সাবদা-টাবদার মত নয়। তিন কুলে তার কেউ নেইও। আর হরি যেতে চাচ্ছে। তারও ওই অবস্থা। ওরা দু'জন গেলেই চলবে।

—খুব চলবে। তা ছাড়া ওখানেও লোকের অভাব হয় না। ওই ভদ্রলোককে দেখলাম, তিনিও একটি বুড়ী বৈষ্ণবী রেখেছেন। খাবার-টাবারগুলো তৈরি করে। সেবা-যত্নও করে।

—তবে আর কি। দরকার হ'লে আমিও ওইরকম একটা রাখব। কিন্তু সেজন্তে ত ভাবছি না রাম, ভাবছি আমার রাধামাধবের যত্ন কে করবে?

রামকিঙ্কর বললে, আপনি চলে গেলে তখন বৌরাণীই করবেন।

—করেন তবে ত!—গিন্নীমা মুখ টিপে একটু হাসলেন, অথবা যেন একটা হাসি চেপে গেলেন।

বললেন, এখনকার মেয়েদের কি আর ঠাকুর-দেবতায় তেমনি ভক্তি আছে!

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে গিন্নীমা বললেন, কিন্তু ওসবও আর ভাবব না রাম। ভেবে লাভও নেই। যিনি বিশ্বচরাচর দেখছেন, তাঁকে দেখবার জন্তে কেউ না থাকলেও তাঁর অসুবিধা হবে না। অন্ততঃ এই বলেই মনকে প্রবোধ দিচ্ছি। না দিয়েই বা করি কি বল? যেতে আমাকে হবেই।

—কেন? যেতে হবেই কেন?

—হ্যাঁ, হবেই।

গিন্নীমা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গিন্নীমা গম্ভীর হয়ে গেলে কারও সাধ্য নেই তাঁর সামনে মুখ খোলে। রামকিঙ্করও চুপ করে রইল।

একটু পরে গিন্নীমা বললেন, তোমার ওই প্রসাদের কথাটা ভাবছি। এখানে কর্তা চলে যাওয়ার পর থেকে ঠাকুরের প্রসাদই আমি খেয়ে আসছি। ওখানেও যদি

সেইরকম ব্যবস্থা করা যায়, বড় ভাল হয়। কত টাকা লাগে জেনে এসেছ?

—না, তা আসি নি। তবে চিঠি লিখে জেনে নেওয়া যায়। আজই উকিলবাবুকে বলব।

—ওটা জেনে নিও। আর একটা কথা, ও ভদ্রলোক নিজে ওপর তলায় থাকেন, নিচেটা ভাড়া দিয়েছেন। একই বাড়ীতে ওরকম করে আমি থাকতে পারব না।

রামকিঙ্কর তাড়াতাড়ি বললে, আপনাকে তা থাকতে হবেও না। এ বাড়ীটা বড়। একটা ভিতরমহল, আর একটা বাইরের মহল। মধ্যেখানে দরজা আছে। সেটা বন্ধ করে দিলেই একটা অংশের সঙ্গে আর একটা অংশের কোনই সম্পর্ক থাকে না।

আশ্বস্ত হয়ে পিস্‌মা বললেন, ভাল।

বললেন, যাই হোক, বৃন্দাবন যাবার জন্যে মনটা খুবই ব্যস্ত হয়েছে। বাড়ীটা মেরামত হয়ে গেলেই আমি আর দেরি করব না। একটা ভাল দিন দেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ব।

এই বাড়ীতে, বলতে গেলে, পিস্‌মার সমস্ত জীবনটাই কেটেছে। কতটুকু বয়েসেই না এসেছিলেন এ বাড়ীতেই! সেই দীর্ঘকালের স্মৃতি তাঁর জীবনের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। সে সমস্ত ফেলে-ছেড়ে পিস্‌মা বৃন্দাবনের জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন, ভাবতে রামকিঙ্করের বিস্ময় লাগে। সে কি বৃন্দাবনের জন্যে, না, এখান থেকে পালাবার জন্যে?

এই পক্ষকালের মধ্যে সবিতার সঙ্গে রামকিঙ্করের দেখা নেই। যাওয়ার আগে কিছু টাকা সবিতার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। অল্প টাকা। হাতে তার বেশি টাকা ছিল না। এখন একবার খবর নেওয়া দরকার।

অপরাহ্ণে সবিতার কাছে গেল।

বেশ বোঝা গেল, তাকে দেখে সবিতা খুব খুশী হয়েছে। রামকিঙ্করের মনে হ'ল সবিতার হাতের টাকা বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে। তাকে দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত এবং আশ্বস্ত হয়েছে।

সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, কবে ফিরলে?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, কবে নয়; আজ দুপুরে ফিরেছি। দুপুরটা ট্রেনের ধকল কাটাতে ঘুমিয়েই কাটালাম। উঠে স্নান করে এক পেয়ালা চা খেয়েই তোমার খবর নিতে আসছি। কেমন আছ বল।

—ভালই। তুমি যার জন্যে গিয়েছিলে, তা হ'ল?

—হ'ল। সেই সঙ্গে তোমার একটা ব্যবস্থাও যদি করতে পারতাম, খুশী হতাম।

—বৃন্দাবনে আমার আবার কি ব্যবস্থা?

—থাকা-খাওয়া, জীবনটা কাটাবার একটা ব্যবস্থা।

—তোমরা যাঁকে পিস্‌মা না কি বল, তাঁর কাছে?

—সেই রকমই ইচ্ছা ছিল।

সবিতার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। বললে, কেন, আমি কি খুড়ো-হাবড়া, না, ন্যাংড়া-নুলো যে, ওইরকম একটা আশ্রমে গিয়ে জীবন কাটাতে হবে?

অপ্রস্তুতভাবে রামকিঙ্কর বললে, কিন্তু মেয়েদের একটা আশ্রয় ত চাই।

—আশ্রয় বলতে তুমি কি বোঝ? কোন আশ্রমে সেলাই-ফোঁড়াই করে কাটানো? অথবা কোন দাংশীলা বৃদ্ধার আশ্রয়ে তাঁর পরিচর্যার বিনিময়ে দুটো খাওয়া-পরা? না বাবা, তেমন জায়গায় যাবার অবস্থা আমার এখনও হয় নি। বরং তোমার সাহায্যও আর নেব কি না, এ ক'দিন ধরে সেই কথাই ভাবছি।

এটা কি রাগের কথা? না, পরনির্ভরতার উপর বিতৃষ্ণা? দুই-ই হ'তে পারে। হয়ত সবিতার হাতের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল, ছেলে-মেয়ে নিয়ে কষ্ট পাচ্ছিল। এ রকম ক্ষেত্রে রাগ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে আসা অস্বাভাবিক নয় যে, পরের দানের উপর নির্ভর করে। নিশ্চিন্তে জীবন কাটানো নিরাপদ নয়।

রামকিঙ্কর ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ও কথা ভাবছ কেন?

সবিতা বললে, টাকা, তা সে তাকে দানই বল, সাহায্যই বল, কারও কাছ থেকে হাত পেতে নিতে সঙ্কোচ হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কি বাপ-মা'র কাছ থেকেও। শুধু একটি লোকের কাছ থেকেই মেয়েরা বিনা দ্বিধায় টাকা নিতে পারে।

—স্বামীর কাছ থেকে।

—হ্যাঁ। তা ছাড়া আর সর্বত্রই সঙ্কোচ হয়।

—উপেনবাবুর কোন খবর পেলে?

—না। পাইও নি, পেতে চাইও না।

—কোথাও চাকরি-বাকরির কিছু সুবিধা হ'ল?

সবিতা হেসে ফেললে: তুমি কি ভাবছ, আমি বুঝতে পারছি।

—কি?

—ভাবছ, এত লম্বা লম্বা কথা যখন বলছি, তখন হয়, আমার স্বামীর সন্ধান পাওয়া গেছে, নয় একটা চাকরি-

চাকরি জুটেছে। না রামদা, সে-সব কিছুই নয়। তবু ভাবছি, তোমার সাহায্য আর নেব না।

—আমার অপরাধ ?

কাতর কণ্ঠে সবিতা বললে, ও কথা ব'লো না রামদা, তোমার কোন অপরাধ নেই। তুমি মহৎ, তাই দিচ্ছ। কিন্তু আমি নেব কোন্ সুবাদে ? দাদার বন্ধু, এই সুবাদে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু দাদার কাছ থেকেই যে সাহায্য নেয় না, দাদার বন্ধুর কাছ থেকেই বা সে নেবে কেন ?

রামকিঙ্কর চুপ ক'রে রইল। সবিতা সেই জাতেরই মেয়ে। কারও কাছে মাথা নীচু করতে চায় না। তবে এতদিন নিলে কেন ? এতদিন নয়, মাত্র কয়েকবার। তাই বা নিলে কেন ? বোধ হয় তার স্বামীর আকস্মিক অন্তর্ধানে তার মনের ভারকেন্দ্র নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন ধীরে ধীরে ধাক্কা কাটিয়ে সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তার পুরনো সত্তা ফিরে আসছে বোধ হয়। অথবা অন্য যদি কোন কারণ থাকে, রামকিঙ্কর তা বুঝতে পারছে না। মোট কথা ওর মনের মধ্যে কিছু একটা ঘটছে। দ্রুতবেগে নয়, ধীরে ধীরে। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে।

রামকিঙ্কর ভয় পেয়ে গেল। বললে, কিন্তু আজ আমি কিছু টাকা এনেছিলাম সবিতা। এটা নিতে না ক'রো না।

বলে পকেট থেকে গুনে গুনে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বের করে সবিতাকে দিতে গেল।

সবিতা নিস্পন্দ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। বড় মেয়েটি একটা ময়লা ছেঁড়া ফ্রক গায়ে দিয়ে চুপচাপ মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল। সবিতা ফিরেও চাইল না। তার চোখে পলক পড়ছিল না। দৃষ্টি, রামকিঙ্করের দিকে নয়, তার পিছনের দেওয়ালের দিকে।

মেয়েটি এবারে মায়ের একটা আঙুল ধরে আস্তে করে টান দিলে।

সবিতা নির্বিকার। সে যেন পাথর হয়ে গেছে। দেহে সম্বিৎ নেই। কি হয়ত কোন একটা তীব্র চিন্তা বিদ্যুতের মত ছুটেছে। মন সেই দিকে।

মেয়েটি এবারে হাত ধরে প্রায় ঝুলতে লাগল। ঝুলে তার কানটাকে নিজের মুখের কাছে আনবার চেষ্টা করলে।

সবিতার সম্বিৎ ফিরে এল। মেয়েটার মুখের দিকে চাইলে। শুকনো মুখ। সবিতার বুঝতে দেরি হ'ল না তার খিদে পেয়েছে। মুখ না দেখেও বুঝতে পারত। জানে, দুপুরে মেয়েটা যেটুকু খেয়েছে, তা নিতান্তই নামমাত্র। অনেক আগেই তার খিদে পেয়েছে। চেপে-চেপে ছিল। আর পারলে না, তাই মায়ের কাছে এসেছে যদি কিছু খাবার থাকে।

রামকিঙ্করের হাত তখনও তার দিকে প্রসারিত। মুঠোর মধ্যে একগোছা নোট। সবিতা ছোঁ মেরে নোটগুলো নিয়ে মেয়ের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

কোথায় ?

তার মন বোধ হয় একটা নিভৃত কোণ খুঁজছে।

কেন ?

বোধ হয় একটু কাঁদতে।

এখনও পর্যন্ত বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করা হয় নি, যেটা আসল কাজ, যেটা তার জীবিকা। মুশকিল হয়েছে, কিছুদিন থেকেই বৌরাণীকে তার কেমন ভয় করছে। নিজের থেকে, প্রয়োজন থাকলেও, সে যেতে সাহস করে না। নিজেকে অনেকবার প্রশ্ন করেছে, ভয়টা কিসের ? জবাব দিতে পারে না। কিন্তু ভয় যে একটা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভয়টা কোথায় ভাবতে গেলে বৌরাণীর আশ্চর্য রূপ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য রূপের ভয়টা কি ? বৌরাণী রূঢ়ভাষিণী নয়। কথায় কথায় তিরস্কার করা বা কৈফিয়ৎ চাওয়া, সে সব কিছুই নেই। তবে ? এই 'তবে'র জবাব সে খুঁজে পায় না। কার্যতঃ বৌরাণী তলব না করলে সে যায় না।

সবিতার ওখান থেকে ফিরেই খবর পেলে বৌরাণীর তলব এসেছিল। তখনই সে ছুটল।

বৌরাণীর রূপ যেন দিন দিন আরও খুলছে। এই পনেরো দিনেই সে যেন আরও সুন্দর হয়েছে। দাঁতে ঠোঁট চেপে মৃদু মৃদু হাসি। জিজ্ঞাসা করলে, ফিরেছেন ত অনেকক্ষণ। এতক্ষণে দেখা করবার সময় হ'ল ?

রামকিঙ্কর থতমত খেয়ে গেল। বললে, না। ট্রেনে বড্ড ভীড় ছিল। এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। স্নান করে ভাত খেয়ে মাথা আর তুলতে পারলাম না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বৌরাণীর মুখে সেই রহস্যময় হাসি : তারপরে ?

—তারপরে স্নান করে আবার একটু বেরিয়েছিলাম।

—কোথায় ?

মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে রামকিঙ্কর বললে, একটি বোনের কাছে।

মালতী হেসে উঠল : একটি বোন আবার কোথায় পেলেন? এখানে আপনার কোন বোন আছে বলে ত শুনি নি।

রামকিঙ্কর ঘেমে উঠল। বললে, না, ঠিক নিজের বোন নয়। একটি বন্ধুর বোন।

এবারে মালতী একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠল : বন্ধুর বোন! না, না রামবাবু, ওসব ঝামেলায় যাবেন না। ঝামেলায় পড়ে যাবেন। বন্ধুর বোনের বিয়ে হয়েছে?

—হয়েছে। দু'টি ছেলেমেয়েও আছে।

মালতী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে : তবু ভাল।

রামকিঙ্কর বললে, ভাল ঠিক নয়। মেয়েটি অসবর্ণ বিবাহ করেছিল।

অসবর্ণ বিবাহের নামে মালতী কৌতূহলে উদ্গ্রীব হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, তারপরে?

রামকিঙ্কর বললে, ছেলেটি কিন্তু কোথায় সরে পড়েছে, পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। দু'টি বাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে মেয়েটি খুব বিপদে পড়েছে।

—লেখাপড়া জানে?

—স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। কিন্তু করলে কি হবে? আজকাল আর স্কুল ফাইনাল পাশের দাম কি বলুন? ওদিকে বাপ-মায়ের অমতে বিয়ে করায় অতে বাপের বাড়ীর আশ্রয়টিও গেছে।

মালতীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, তা হ'লে ত মেয়েটি বড় মুশকিলে পড়েছে।

—খুব মুশকিলে পড়েছে।

কিন্তু পরের ব্যাপার নিয়ে মাথাব্যথা করে আর কতক্ষণ থাকে? মালতী বৃন্দাবনের বাড়ী কেনার কথা পাড়লে। কেমন বাড়ী, সেখানে একা থাকতে অসুবিধা হবে কিনা, হলেই বা কি করা যেতে পারে, এই সব আলোচনা আরম্ভ হ'ল।

রামকিঙ্কর সব কথা জানালে। উকীলবাবুর সেই আত্মীয়টির কথাও।

বললে, জায়গাটা খুব চমৎকার। ইচ্ছে করলে, আপনিও গিয়ে দু'এক মাস থেকে আসতে পারেন।

মালতী মৃদু হেসে বললে, আমার এখনও বৃন্দাবন যাওয়ার বয়েস হয় নি।

বলেই তাড়াতাড়ি বললে, উনি চলে গেলে আপনাদের একটু অসুবিধা হবে।

—হবেই ত। বাবার ওপর ছিলেন। বোধ হ'ল, উনি যেন যাবার জন্যে বড্ড ব্যস্ত হয়েছেন। ভাবছেন, কিন্তু সংসারের কথা নয়, রাধামাধবের কথা।

মালতী বললে, ভাবনা আর কি। যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে ত রাধামাধবের ছড়াছড়ি।

রামকিঙ্কর বললে, সে কথা নয়। উনি চলে গেলে এখানকার রাধামাধবের সেবায় ত্রুটি হবে বলে ভয় পাচ্ছেন।

অন্যমনস্কভাবে মালতী উত্তর দিলে, একটু ত হবেই। তার আর কি করা যায়। কবে যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?

—বাড়ীটা মেরামত হচ্ছে। হয়ে গেলেই যাবেন। দোলের আগেই যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

—হুঁ।

মালতী অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। রামকিঙ্করের মনে হ'ল, এ যেন অন্ত মৌতাশী। শান্ত, সুন্দর, গম্ভীর। মনে হ'ল মেয়েরা যেন মেঘ। একই দেহে অসংখ্য রূপ। আলো-ছায়ায় অসংখ্য বৈচিত্র্য।

হঠাৎ মালতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রামকিঙ্করের দিকে চাইলে। জিজ্ঞাসা করলে, সারদা কোথায়?

সারদা! রামকিঙ্কর ঘরের এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। প্রশ্নটার অর্থই সে বুঝতে পারল না। এ প্রশ্ন তাকে করা কেন? বারান্দায় ও প্রান্তে কিংবা সিঁড়ির আড়ালে, কি কোন ঘরের কোণে কোথায় আছে, সে তা কি করে জানবে?

রামকিঙ্কর ভেবেই পেলে না যে, এ প্রশ্ন তাকে করার অর্থ কি? অথচ সারদার ব্যাপার রামকিঙ্করের জানার কথা, এই ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। সে মনে মনে যেমন লজ্জিত হ'ল, তেমনি বিরক্তও হ'ল।

বললে, তা আমি কি করে জানব? এইখানেই বোধ হয় আছে কোথাও। কি হয়ত কোন কাজে বাইরে গেছে।

চাপা ক্রোধের সঙ্গে মালতী বললে, না, এখানে নেই। আজ তিনদিন ধরে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কোথায় আছে আপনি জানেন না?

রামকিঙ্করের মনের মধ্যে অসংখ্য চিন্তা, আগের দিনের টুকরো টুকরো কথা একসঙ্গে মনের মধ্যে জাল-গোল পাকাতে লাগল।

তারই মধ্যে বললে, আমি কি করে জানব? আমি ত এখানে ছিলাম না।

—বিকেলে ত বেরিয়েছিলেন। দেখা হয় নি?

—কি করে? আমি ত আমার বন্ধুর বোনের কাছে গিয়েছিলাম।

বৌরাণী চুপ করে রইল। রামকিঙ্করের কথা সে বিশ্বাস করল বলে মনে হ'ল না। জিজ্ঞাসা করবার অনেক ছিল। কিন্তু এখন থাক।

(চব্বিশ)

প্রবল উত্তেজনায় সারারাত্রি রামকিঙ্করের ঘুম হ'ল না। প্রথমত সারদা কোথায় গেল, কোথায় যেতে পারে এবং কেনই বা গেল? চলে যাওয়ার ইঙ্গিত এর আগের দিন সারদা দিয়ে গিয়েছিল। সেই কথাগুলো মনে পড়ল। কিন্তু সে কি ঠিক কথা, না সারদার মনের ভুল? তার মধ্যে এমন কি আছে, যা বৌরাণীর মত সুন্দরী ধনী তরুণীকে আকর্ষণ করতে পারে। রামকিঙ্কর ভাবতেই পারলে না। যদিচ তার ধারণা, এ সব ব্যাপারে মেয়েদের ভুল খুব কমই হয়।

ঈর্ষা। ওপক্ষে হয়ত ঈর্ষার বাষ্পও নেই। এমন হতে পারে যে, ঈর্ষাটা সারদারই মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। শুনেছে ঈর্ষা মানুষকে অন্ধ করে। কে জানে, হয়ত সারদা নিজেই ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে বৌরাণীর আশ্রয় থেকে পালিয়ে গেছে। এইটিই বেশী স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক ত বটে, কিন্তু বৌরাণীই বা সারদাকে বন্দীর মত রেখেছিল কেন? কোথাও বেরুতে দেত না। রামকিঙ্করের সঙ্গে দেখা করার সমস্ত পথে কাঁটা দিয়ে রেখেছিল। তার সামনে আসতে দেত না। কেন?

(নানা রকমের চিন্তা। কখনও বা নিতান্ত এলো-মেলো চিন্তা। চিন্তাগুলো ঘুরে-ফিরে আসে। কোন কিছুরই হদিশ পায় না। শুধু ভাবে। আর ঘুম আসে না।)

দ্বিতীয়তঃ, বৌরাণীর ব্যবহারটাও খুব রুক্ষ ঠেকল। সামান্ত একটা ঝি যদি চলেই গিয়ে থাকে, (তারা ত নানা কারণেই চলে যায় এবং গিয়েও থাকে) তার জন্তে মেজাজ খারাপ হবার কি আছে? তার জন্তে রাম-কিঙ্করকেই বা জবাবদিহি করতে হবে কেন? কলিকাতা শহরে পয়সা দিলে সারদার মত ঝি কি আর পাওয়া যাবে না?

কিন্তু সারদা কেন গেল? কোথায়ই বা গেল? সামান্ত বেতনের ঝি, কিছুই হয়ত জমাতে পারে নি। মনে পড়ল, সারদার সেদিনের কথাটা। রামকিঙ্কর কিছু সাহায্য করলে সে এ বাড়ীর চাকরি ছেড়ে দেবে। কিন্তু রামকিঙ্কর ত কোন প্রতিশ্রুতি দেয় নি। তার উচিত ছিল, রামকিঙ্কর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

অথবা এ ভালই হয়েছে যে, রামকিঙ্করের অনুপস্থিতি-কালেই সে সরে পড়েছে। বৌরাণী তাকে সন্দেহ করছেন বটে, কিন্তু সে বোধ হয় সন্দেহ করবার দ্বিতীয় কোন পাত্র নেই বলে। সত্য সত্য তার উপর সন্দেহটা হয়ত দৃঢ় নয়। কিংবা হয়ত সন্দেহ দৃঢ় হবার জন্তে কোন শক্ত ভিত্তিরও দরকার করে না। সন্দেহ হাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বৌরাণী হয়ত ভাবছেন, আগে থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করাই ছিল। সেই জন্তে রাম-কিঙ্করের ফেরবার ঠিক আগে সারদা চলে গেল। তাবা কিছুই বিচিত্র নয়।

এমনও হ'তে পারে যে, রামকিঙ্করের উপর ভরসাতেই সারদা চাকরি ছেড়েছে। হয়েছে ভাল! একদিকে সারদা, অন্তদিকে সবিতা! সে কাকে দেখবে?

যাই হোক, সকালে সারদার খোঁজটা একবার নিতে হবে। সে কোথায় রয়েছে, সেটাও ত জানা দরকার। যদিচ সারদাকে নিয়ে তার কোন ভয় নেই। সে মেহনতী মেয়ে, রামকিঙ্করের কাছ থেকে সাহায্য না পেলেও চালিয়ে নিতে পারবে। ঝিয়ের কাজের অভাব হয় না। তা ছাড়া সে শক্ত মেয়ে। কলিকাতা শহরের ভাল-মন্দ দু'দিকের সঙ্গেই তার নিশ্চয় পরিচয় আছে। তার পরে তাদের শ্রেণীর মধ্যে তার বন্ধু-বান্ধবেরও অভাব নেই। সুতরাং এ বাড়ীর আশ্রয় ত্যাগ করলেও তাকে অসহায় বলা চলে না।

সত্যি বলতে কি, ভয় তার সবিতাকে নিয়ে। সবিতা আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন, তার পরিচয় সে আজকেই পেয়েছে। দুঃখ তার যত বেশীই হোক, কারও কাছে হাত পাততে তার সঙ্কোচ হয়। কিন্তু ক্ষুধার্ত সন্তানের কাছে এই আত্মমর্যাদা কত দুর্বল, তারও পরিচয় সে পেয়েছে। কারও কাছ থেকে এক কপর্দকও সাহায্য নেবে না, এই তার মনের মধ্যেকার পণ। কিন্তু ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে সেই পণ রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ, তাও সে দেখে এল।

অন্ধকার ঘরে রামকিঙ্করের বিনিদ্র চোখের সামনে দু'টি মূর্তি জেগে উঠল: সবিতার আর সারদার। দু'জনের কোথাও হয়ত মিল আছে, কিন্তু আবার কত তফাৎও রয়েছে।

সারদা বলেছিল, নিজে মুখ ফুটে বলেছিল, তুমি যদি আমাকে মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা দাও, তা হ'লে আমি ঝি-বৃত্তি ছেড়ে দি। আর সবিতা বলেছিল, তোমার কাছ থেকে টাকা আমি কি স্বত্বে নেব? মেয়েরা একটি জায়গাতেই শুধু হাত পাততে পারে। আর কোথাও নয়। এমন কি বাপ-মায়ের কাছেও নয়।

রামকিঙ্করের সমস্ত মন যেন ধড়মড় করে উঠে বসল: স্বত্বটাই হচ্ছে আসল কথা। সারদা অসঙ্কোচে তার কাছে মাসোহারা চাইতে পারলে। কারণ তার বিশ্বাস, এই স্বত্বটা রয়েছে। পক্ষান্তরে সে বিশ্বাস সবিতার নেই। সুতরাং রামকিঙ্করের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিচ্ছে বটে, কিন্তু নিরুপায় হয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

রাস্তা ধোয়ার শব্দে রামকিঙ্কর বুঝলে, ভোর হ'তে আর দেরি নেই। ঘুম যখন আসবেই না, তখন আর শুয়ে থাকা মিথ্যে। এটুকু অন্ধকার হাত-মুখ ধুতেই কেটে যাবে। রামকিঙ্কর বিছানা ছেড়ে উঠল।

রামকিঙ্কর প্রথমে গেল সারদা যে বস্তীতে থাকত সেখানে। মনে তার সন্দেহ ছিল, এখানে হয়ত তাকে পাওয়া যাবে না। মৌরাণীর লোকেরা এখানে তার খোঁজ করতে আসতে পারে ভেবেই সারদা হয়ত এখানে থাকবে না। কিন্তু এখান থেকে হয়ত তার ঠিকানাটা পাওয়া যেতে পারে।

ঠিক তাই। যে ঘরে সারদা থাকত, সে ঘরটা খালি পড়ে রয়েছে। পাশের ঘরে যে মেয়েটি থাকত, ক্রমাগত আসা-যাওয়ার ফলে, তার সঙ্গে রামকিঙ্করের চেনা হয়ে গিয়েছিল। রামকিঙ্করকে দেখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

জিজ্ঞাসা করলে, সারদার খোঁজে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

মেয়েটি ফিক্ করে হেসে বললে, সে ত এখানে থাকে না বাবু।

—কোথায় থাকে জান?

মেয়েটি বললে, আমার সঙ্গে আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনি হয়ত চিনতে পারবেন না।

পথ চলতে চলতে মেয়েটি বললে, যাবার সময় আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ঠিকানা দিতে সে নিষেধ করে গিয়েছিল। বাবুদের বাড়ী থেকে কত লোক তার খোঁজ করতে এসেছিল। কাউকে ঠিকানা দিই নি। কি হয়েছিল বাবু? অমন ভাল চাকরিটা ছেড়ে দিল কেন? এখনও তারা সাধাসাধি করছে।

রামকিঙ্কর বললে, আমি ত ঠিক জানি না। এখানে ছিলাম না। এসে শুনলাম, সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কেন, কি বৃত্তান্ত তাই জানতেই এসেছি।

—তাই বুঝি?

মেয়েটির চোখে একটা অবিশ্বাসের কটাক্ষ।

এটাও একটা মস্তবড় বস্তী। এখন ভোঁ ভাঁ করছে। বোধ হয় বস্তীর মেয়ে-পুরুষ সবাই কাজে বেরিয়ে গেছে। শুধু কতকগুলো উলঙ্গ শিশু মাটির উঠানে দাপাদাপি করছিল। অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকেই সারদা ওদের দেখতে পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

এই ক'দিনেই তার চেহারা কি হয়ে গেছে! সে রঙ নেই, লালিত্য নেই, চোখে সে দীপ্তি নেই। শুধু বিবর্ণ ঠোঁটে ভোরের চাঁদের মত এক কাস্তি পাণ্ডুর হাসি!

যে মেয়েটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, নিজের পসার জানাবার জন্তে কিছুক্ষণ অনর্গল বকে সে চলে গেল।

—এস।

সারদা রামকিঙ্করকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে খাটের উপর বসাল।

ওই বস্তীর ঘরের সেই খাট, সেই বিছানা-বালিশ, সেই ধোপ দুরস্ত চাদর। রামকিঙ্করের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, বিছানাটা ঘরের শোভামাত্র। সারদা যে এ বিছানা স্পর্শও করে না, তা দেখলেই বোঝা যায়। সে নিজে হয়ত নীচেই একটা মাদুরে রাত কাটায়। রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ চলে এলে যে?

—তবে কি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আসতে হ'ত?

—না। অন্ততঃ আমার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না কেন, তাই জানতে চাইছি।

সারদা হাসলে। বললে, বুঝতে পার নি? তোমাকে বদনাম আর মৌরাণীর আক্রোশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্তে।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আক্রোশের কথা জানি না। তবে মৌরাণীর মেজাজটা একটু রুক্ষই মনে হ'ল। তবে বদনামের হাত থেকে বাঁচাতে পার নি।

মেঝের চেপে বসে সারদা বললে, তাই না কি?

—হ্যাঁ।

মৌরাণীর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে যে কথা হয়েছিল, রামকিঙ্কর সারদাকে তা বললে। জিজ্ঞাসা করলে, এঁর কি মনে হয় না, মৌরাণী আমাকেই সন্দেহ করেন?

সারদা চুপ করে রইল।

রামকিঙ্কর বললে, এখন চাকরিটা থাকলে বাঁচি।

সারদা কিছু করে হেসে ফেললে। বললে, চাকরি যাবে না।

—কি করে বুঝলে?

সারদা এবার জোরে জোরে হেসে উঠল: তুমি কি রকম পুরুষ মানুষ? তোমার চোখ নেই?

—না বোধ হয়।

—বোধ হয় নয়, নিশ্চয়। থাকলে বুঝতে পারতে তোমার ওপর বৌরাণীর টান পড়েছে। তোমাকে তিনি ছাড়বেন না।

রামকিঙ্কর রেগে বললে, এই কথাটা তুমি আগেও বলেছিলে। কিন্তু বল ত, আমার মধ্যে এমন কি আছে, যার জন্তে তাঁর মত মেয়ের আমার ওপর টান পড়বে।

রামকিঙ্করের রাগ দেখে সারদা হেসে ফেললে। বললে, কিছু আছে নিশ্চয়। নইলে তিনিই বা মনোহর ডাক্তারের বাড়ী আসা বন্ধ করবেন কেন, আর আমিই বা অমন স্থন্দর চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসব কেন?

সারদা একটা কটাক্ষ হানলে। কিন্তু তাতেও রামকিঙ্করের অবিশ্বাসও গেল না, রাগও দূর হ'ল না।

বললে, তার পরে? কি ঠিক করলে বল?

—আমি কি ঠিক করবার মালিক?

—কে মালিক তবে? কাকে জিগ্যেস করতে হবে?

মুখ নীচু করে ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে সারদা বললে, কে মালিক জান না? নিজেকে জিগ্যেস কর।

রামকিঙ্কর আরও রেগে গেল। বললে, কিন্তু চলে আসবার সময় ত আমাকে জিগ্যেস করে আস নি?

সারদা তথাপি তেমনি করে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। বললে, তাতে যদি অন্যায় করে থাকি, শাস্তি দাও।

রামকিঙ্কর হাসল না। নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগল।

সারদা জিজ্ঞাসা করলে, বৃন্দাবনের খবর বল। বাড়ী হ'ল? গিন্নীমা কবে যাচ্ছেন?

—কেন, তুমি তাঁর সঙ্গে যাবে?

একটা কৃত্রিম কোপ-কটাক্ষ হেনে সারদা বললে, আমি কি দুঃখে যাব?

—তবে আর জিগ্যেস করছ কেন?

বলে রামকিঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বললে, কে জানে, আমার পিছনে হয়ত বৌরাণীর চর ঘুরছে। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। তুমি এই কুড়িটা টাকা রেখে দাও।

সারদা হাত বাড়ালে না। বললে, এখন তোমার কাছে রেখে দাও। দরকার হ'লে চেয়ে নেব। তুমি ফের কবে আসছ?

রামকিঙ্কর চিন্তিত মুখে বললে, ভাবছি এখন দিন-কতক আসব না। গোলমালটা একটু চাপা পড়ুক, বৌরাণীর রাগ একটু কমুক, তারপরে। কিন্তু টাকাটা কি তুমি রাগ করে নিলে না?

সারদা ব্যস্তভাবে বললে, না, না, রাগ করব কেন? আমার হাতে এখনও টাকা রয়েছে। ফুরিয়ে গেলেই তোমার কাছে হাত পাতব, সে ত বলেই দিয়েছি। যেখানে-সেখানে কাজ করতে আর পারব না। বড় লোকের বাড়ীতে কাজ করে চাল-চলন বিগড়ে গেছে।

—সারদা হাসল।—তবে ভাল কোন জায়গায় কাজ পেলে, করব। তোমার ওপর চাপ দিতে ইচ্ছা নেই।

রামকিঙ্কর কিছু বললে না। নীরবে উঠে চলে গেল।

এক গ্রহ ঢুকল। সারদার বোঝা তার কাঁধে আপাতত চাপছে না। আপাতত শুধু সবিতার বোঝা।

বৌরাণী বোধ হয় ওৎ পেতেই ছিল। রামকিঙ্করকে ডেকে পাঠাল।

—কোথায় গিয়েছিলেন? সারদার খোঁজে?

বৌরাণীর ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি। কিন্তু রামকিঙ্কর যেন তা চেয়েই দেখলে না।

বললে, একটু চা খেতে গিয়েছিলাম।

—এতক্ষণ ধরে কত চা খাচ্ছিলেন?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, চায়ের দোকানে একটি পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারই সঙ্গে গল্প করছিলাম।

বৌরাণীর মুখ দেখে মনে হ'ল, তার কথা বিশ্বাস করলে বলে মনে হ'ল না। বললে, সারদা তার পুরনো বস্তীতে নেই, জানেন?

কৃত্রিম বিস্ময়ে রামকিঙ্কর বললে, নেই? কোথায় গেল তা হ'লে?

—সে ত আপনারই জানার কথা।

আমি জানি না। কিন্তু আপনি তাকে খুঁজছেন কি জন্তে? সে চলে গেছে, যাক না। ঝিয়ের কি অভাব আছে? বিশেষ এ বাড়ীতে আপনার কাছে চাকরি করবার জন্তে কত ঝি লালায়িত।

এই প্রশ্নটা প্রশ্নের জন্যে বৌরাণী প্রস্তুত ছিল না। সত্যিই ত। সারদার হয়ত কিছু অসুবিধা হচ্ছিল, চলে গেছে। সামান্য একটা ঝিয়ের জন্যে বৌরাণীর এত ব্যস্ত হবার কি আছে? তা সে যত ভাল ঝি-ই হোক না কেন।

বৌরাণী প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল। বললে, একটা মানুষ অনেকদিন ছিল, একটা মমতা পড়ে গেছে। বিশেষ খোকাবাবু তাকে বড় ভালবাসে।

রামকিঙ্কর বললে, তা হ'লে কি তার খোঁজ করব? কিন্তু যে স্বেচ্ছায় চলে গেছে, খোঁজ পাওয়া গেলেও; সে কি আর ফিরতে রাজী হবে?

সে একটা কথা।

বৌরাণীর কেমন মনে হ'ল, সারদার সঙ্গে যুদ্ধে সে হেরে যাচ্ছে। তার মন দুর্বল হয়ে পড়ছে। নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, না, না, তার খোঁজ করার দরকার নেই। আমি ভাবছি আপনার কথা। আপনার হয়ত একটু কষ্ট হবে।

রামকিঙ্কর বিস্ময়ের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলে, আমার কষ্ট হবে কেন?

বৌরাণী অন্যদিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। রামকিঙ্করের কথার জবাব না দিয়ে যেন নিজের কথার জের হিসাবেই বললে, অবশ্য তার খোঁজ পেয়ে গেলে কষ্ট হবে না। এবং আপনি হয়ত একটু চেষ্টা করলেই খোঁজ পেয়ে যাবেন।

রামকিঙ্কর দমে গেল। একটুখানি ভয়ও পেলে। বললে, আমি তার খোঁজ করতেই বা যাব কেন? আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বৌরাণী তেমনিভাবেই বলে চললে, না খোঁজ করতে যান, সে আলাদা কথা। আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনার জন্যে সে নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে গেছে।

এসব ব্যাপার ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলেই বাড়ে এই ভেবে রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

এবার বৌরাণী একটু গম্ভীরভাবেই বললে, কিন্তু আপনি তার খোঁজ করতে যাবেন নাই বা কেন? আপনার সঙ্গে ত তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সে ঘনিষ্ঠতার কাঁটা পড়ল কি করে? ভাল কথা, আপনার সেই বন্ধুর মেয়েটির কথা বলছিলেন, তার খবর কি?

সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! কোন্ কথা কখন কোন্ কথায় যায়, তার অন্তর্নিহিত অর্থই বা কি, ভাবতে গেলে সর্বাঙ্গ ঘেমে ওঠে।

নতমুখে রামকিঙ্কর বললে, ভাল কিছু নয়। কালকেই ত বললাম। তার জন্যেই ত চিন্তা করছি।

বৌরাণী হেসে উঠল: বেশী চিন্তা করবেন না। আপনার বয়সে বিপন্ন তরুণীদের সম্বন্ধে চিন্তা করাটা হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু তার অনেক ঝামেলা আছে মনে রাখবেন।

রামকিঙ্কর বললে, তার দাদা আমার বন্ধু। সে হয়ত এসব খবর জানে না। তাকে খবরটা দেওয়া দরকার।

—তা দিতে পারেন। তার দাদাকে খবর দিন, বাপ মাকে খবর দিন। নিজে বেশী মাথামাথি করবেন না।

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

বৌরাণী বললে, বৃন্দাবনের বাড়ীটা মেরামত হ'তে কতদিন লাগবে মনে হয়? বলে এসেছেন ত তাড়াতাড়ি মেরামত করবার জন্যে?

রামকিঙ্করের মনে হ'ল, পিসীমাকে বিদায় করবার জন্যে বৌরাণীর বড্ড তাড়া। তাড়াতাড়ি মেরামত হয়ে গেলে পিসীমাকে বৃন্দাবন পাঠিয়ে বাঁচবে। কথাটা তার ভাল লাগল না। আসল কথা, বৌরাণীকেই যেন তার আর ভাল লাগছে না।

বললে, তাড়াতাড়ির কথা ত বলে এসেছি। যোগের আগেই যাবার জন্যে পিসীমাও বড্ড ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তবে পর-ভরসার কাজ। কত তাড়াতাড়ি মেরামত শেষ হবে, কিছুই নিশ্চয় করে বলা যায় না। আর আমার দুপুরে খেয়ে-দেয়েই দোকানে ঢুকতে হচ্ছে।

—কেন, সেখানে কি?

—অনেকদিন ছিলাম না, সেখানে কি হচ্ছে খবরটা নেওয়া দরকার।

বৌরাণী হাসলে। খুব কামাই করে দোকানে! বড় চালাক, না? তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। কোথায় যাবে কিছুই বুঝতে পারছি না, না?

বৌরাণী বললে, তার জন্যে দোকান যাবার দরকার কি? ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেই ত হয়।

সন্দেহ হয়েছে, না? ভাবছ, আমি দোকানের নাম করে অন্য কোথাও যাব? সারদার ওখানে? যে খেলা সারদাকে নিয়ে চলছিল, এবার কি সেই খেলা আমাকে নিয়ে আরম্ভ হবে?

রামকিঙ্কর বললে, বেশ ত, তাই ভাল। ম্যানেজারকেই ডেকে পাঠাচ্ছি।

অর্থাৎ বাধা দিতে গেলে সন্দেহ আরও বাড়বে। তাতে কাজ নেই।

ফেরবার সময় রামকিঙ্কর ভাবতে ভাবতে এল, সারদা পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু এই রকম অবস্থায় সেই বা কতদিন থাকতে পারবে, কে জানে!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

ফিরতি পথের উপত্যকায়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কয়েকটি দিন ভাল করে দেখলাম মানালিকে। দেখে মন ভরল না। আরও বেশ কিছুদিন থেকে গেলেই কি মন ভরতো? না, তাও না। আরও বেশ কিছুকাল আগে অর্থাৎ যৌবনকালে যদি আসতে পারতাম এই অঞ্চলে—তা হ'লে কুঞ্চিত মনের অন্তরালে যে রহস্য-মন আত্মগোপন করে আছে—সে খুশি হ'ত। আজ অপরাহ্ণ বেলায় হিমালয় তার রহস্যপুরীর বাতায়ন খুলে দিল। উন্মুক্ত সেই পথে প্রখর সূর্য্যালোক ও প্রবল বায়ুপ্রবাহ আমার ললাটে এসে লাগছে। হিমশুভ্র শৈলশ্রেণী উদ্বেল হয়ে উঠছে অভিসারযাত্রার ইঙ্গিতে। রণরণিত নদীর আর নীল মতো অন্তরের বিস্মৃত বাসর বাসা ছাড়া নেহাইন পাখীটাকে বারংবার ডাক পাঠাচ্ছে। কিন্তু হায়, শক্তিহীন বদ্ধ-ডানা সেই আহ্বানের উত্তেজনায় কেঁপেই উঠছে, বিস্তৃত হচ্ছে না! যে সূর্য্য এগিয়ে গেছে অস্তগিরির দিকে—সে কি আর মধ্যাহ্ন আকাশে পশ্চাদবর্তন করতে পারে।

আমরা কিন্তু ফিরে আসছিলাম। ঘর থেকে ঘরে—আশ্রয় থেকে অকূলে ভাসবার উদ্দেশে নয়—আর একটি নিশ্চিন্ততর আশ্রয়ে। সেই পথ, সেই নদী, সেই প্রকৃতি; তবু তারা বিচিত্র নয়, বিস্ময় নয়, বিস্তীর্ণ নয়। এ সবই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। মন বড় খুঁতখুঁতে—এক জিনিস একইভাবে দেখে পরিতৃপ্ত হয় না। যদি বাসে না চেপে পায়ে হেঁটে আসতে পারতাম—আর একটি বিচিত্র মধুর স্বাদে হয়ত তৃপ্তি পেতাম।

আমরা মানালি থেকে ফিরছি। পথের ধুলো উড়িয়ে বাস ছুটছে। যে গ্রামে পোস্টাপিস আছে—সেখান থেকে ডাক নিচ্ছে, যাত্রী তুলছে না। যাত্রীর আসনগুলি পূর্ণ—নূতন যাত্রী নেবে না। মানালি থেকে সাড়ে ন'টায় ছেড়েছে বাস—অপরাহ্ণবেলায় পৌঁছবে যোগিন্দর নগরে। আপাতত আমরা যোগিন্দর নগরে যাব।

মধ্যাহ্নকালে বাস পৌঁছল কুলুতে। কি প্রখর তাপ সূর্য্যের! যেন চৈত্রমাসের একটি উত্তপ্ত দিনে আমরা মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। বাস এখানে ঘণ্টাখানিক থামবে—যাত্রীরা মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিতে পারবে।

কুলু পৌঁছবার আগে একটা ঘটনা ঘটল।

এই বাসে ঠিক আমাদের পিছনের আসনে এক সম্ভ্রান্ত শিখ-দম্পতি বসেছিলেন। বয়স এঁদের সত্তরের কম হবে না, কিন্তু কি সবল সুস্থ সুন্দর এঁদের পদক্ষেপ ও বসবার ঋজু ভঙ্গি! এঁদের সঙ্গে ছিল কিছু মোটঘাট আর একটি কুকুর। কুকুরটি ছিল চাকরের জিম্মায়। চাকরটা বসেছিল ওঁদের পিছনে।—তার পিছনের আসনে দুই ব্যবসায়ী বন্ধু। তাঁরা প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া কোলে বসিয়ে চলন্ত বাসেই ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দে তামাক টানছিলেন। এইসব আইন-বিরুদ্ধ ব্যাপারে কোন যাত্রীই কিছু আপত্তি তোলেন নি—বাসের ড্রাইভার কনডাক্টাররাও নয়। এরা দিব্য নিশ্চিন্তেই যাচ্ছিল, হঠাৎ বাসের মধ্যে মাছির ঝাঁক ভনভন্ করে উঠল। যাত্রীদের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠল এবং পথের ধারে বাস থেমে গেল।

ব্যাপার কি! গাড়িটা নোংরা করেছে ওই অবোলা জীব। রণসিংহজির দল হানা দিয়েছে ওই কারণেই। এর প্রতিকার না হ'লে যাত্রীরা সুস্থির হয়ে বসতে পারবেন না।

সবাই নেমে পড়ল। সেখানে আর কোন উপায় না থাকাতে কিছু মাটি এনে চাপা দেওয়া হ'ল ময়লার উপরে।

দুর্গন্ধ জমে গেল—মাছিগুলি ভন্ ভন্ করে গেল। যাত্রীরাও পূর্ব-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলেন না। অথচ হৈ হৈ হট্টগোল কিছুই হ'ল না। একটা নালার ধারে এসে ড্রাইভার পুনরায় বাস থামালে। যাত্রীরা আবার নামল বাস থেকে। আমাদের বালতিটা নিয়ে কন্ডাক্টর নালা থেকে জল টেনে এনে যথাসম্ভব ধুয়ে দিলে জায়গাটা। ময়লা সাফ গেল, শেষ পর্য্যন্ত কিছু মাছি রইলই। বাসে বসার অসুবিধা এখন আর নেই। যাত্রীরা যে যার আসনে এসে বসল। বেশ খানিকটা দেরিও হ'ল এই কারণে। 'আউটের' চেক-পোষ্ট না আসা পর্যন্ত এ ব্যাপার নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করল না।

আউটের চেকপোষ্টে দুই বিপরীত-মুখী গাড়ি এসে জমে। সেই গুলিকে মিলিয়ে ছাড়ার ব্যবস্থাতে অনেকখানি সময় যায়। যাত্রীরা আর একবার বাস-থেকে নেমে পড়ে—চা জলযোগ খাবাপিনা,—যার যেমন রুচি, সেরে নেয়। সেই অবসরে বালতি বালতি জল ঢেলে ঝাঁটা দিয়ে বাসটা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিলে কন্ডাক্টার। পরিশ্রম যথেষ্টই হ'ল অসহযোগের সুর তুলল না। অমন একটি আপত্তিকর পরিস্থিতিতে আমাদের এদিককার বাসের দৃশ্যটা মিলিয়ে নিচ্ছিলাম।

এইবার আউটের গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করবে গাড়ি। সবচেয়ে দুর্গম-সঙ্কটময় পথ অতিক্রম করব আমরা। পথের উপর ঝুঁকে-পড়া পাহাড় দেখলাম, কয়েক শো ফুট নীচেকার খাদের মধ্যে গর্জ্জমান্নাদের মত বিপাশাকে দেখলাম। মৃত্যু এখানে সর্বক্ষণ মুখব্যাদন করে আছে। কে এমন সাহসী আছে, যাঁর বুক এই মরণ-ফাঁদে পা দেবার আগে মুহূর্তের জন্যও কেঁপে ওঠে না! ভাগ্যকে পুরুষকারের উপর না বসিয়ে কার সাধ্য এই পথ অতিক্রম করবে!

শুনলাম দু'মুখের গাড়িগুলি এক হ'তে দেরি হবে—অন্তত তিন কোয়ার্টার লাগবে। একটা বড় মুদিখানার দোকানে কাঠের পাটাতনে এসে বসলাম। দোকানের পাশ দিয়ে যে পথটা পুল পার হয়ে ওধারের পাহাড়ের গায়ে গায়ে চলে গেছে, ওইটাই 'লারজি 'উপত্যকার পথ।

আমাদের দেখে দোকানের একজন লোক তাড়াতাড়ি এসে একখানা গদি বিছিয়ে দিলে কাঠের পাটাতনের উপর। তারপর সুরু করলে আলাপ।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই জায়গাটা কত বড়?

এইত ক'খানা খাবারের দোকান—ছটো দর্জ্জির দোকান, হোটেলও হোটেল একটা, মুদিখানার দোকান তিন-চারটি আর কয়েক ঘর বাসিন্দা। ব্যস্।

এইটুকু জায়গায় এতগুলো দোকান চলে কি করে?

পাহাড়ের মাথায় আরও অনেক গ্রাম আছে—পাঁচ-সাত মাইল দূর থেকে মানুষ আসে জিনিষপত্র সওদা করতে। আর বাস এখানে থামে অনেকক্ষণ, যাত্রীরাও খাবাপিনা করে। দু'একখানা বাস ত নয় এমন অনেক বাস, দিনি চলে এ লাইনে।

সামনের ঢালু পাহাড়ে একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল। সেইদিকে আঙুল বাড়িয়ে বললাম, ওগুলো কি গাছ?

ও ত পাইন আর চিড় গাছ। জানেন, ওর থেকে গর্জন তেল পাওয়া যায়।

বললাম, চিড় আর পাইন দু'গাছ থেকেই তেল পাওয়া যায়?

হ্যাঁ, যায়।

এখানকার পাহাড়ের কি নাম?

হিমালয়। সবটাই ত হিমালয়—আবার কি? তবে জায়গায় জায়গায় নাম আছে বই কি। সে নাম ত মানুষেরই দেওয়া।

কথাটা সত্য। নদী পাহাড় অরণ্য নির্ঝর শিখর এই সবকে এক একটি নাম দিয়ে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করেছি আমরা। অখণ্ড কালকেও টুকরো টুকরো করে শতাব্দী বছর মাস দিন দণ্ড পল বিপলে ভাগ করে নিয়েছি। দেশকেও ভাগ করেছি। সমুদ্রও নামহারা নয়। শুধু একটি জিনিস অখণ্ড কালের প্রতীক হয়ে আজও আমাদের অসীমের ধারণাকে বোধগম্য করাচ্ছে। মাথার উপরের ওই শূন্যলোক—আকাশ বা অন্তরীক্ষ; ওটি নাম-চিহ্নে চিহ্নিত হয় নি। না হোক—ওর গায়েতেও ভূগোলের দাগটা টেনে দেবার চেষ্টা করছি না কি অন্তত আকাশযানের গতিপথে নির্দিষ্ট একটি রেখাসীমাকে দাঁড় করিয়ে।

লোকটির উত্তর অনন্ত কালের জিজ্ঞাসার প্রান্তটি ছুঁয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

আরও অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করল লোকটি। ওর ভারি সাধ একবার কলকাতায় যায়। কলকাতার মত আজব সহর না কি দুনিয়ায় নাই! আজব কোন্ অর্থে—ভাবলাম।

অর্থটা পরমুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল। ও জিজ্ঞাসা করল, বাবুজি, আপনার গদি আছে কলকাতায়? কিসের ব্যবসা আপনার?

আমার গায়ে খদ্দরের জামা—মাথায় গান্ধী টুপি—চেহারাটা কি ব্যবসাদীর মত লাগছে? হাসলাম।

আমাকে হাসতে দেখে ও আমার বৃত্তি সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হ'ল।

এই সময়ে গাড়ির হর্ণ বেজে উঠল।

লোকটি উঠে দাঁড়াল। বলল, এইবার গাড়ি ছাড়বে। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, জয় হিন্দ্।

জয় হিন্দ্। কপালে হাত ঠেকিয়ে হাসলাম।

আরও একটি ছোট্ট ঘটনায় এই দেশের আত্মা-প্রকৃতি উন্মোচিত হ'ল। সব দেশের মানুষের চিত্ততলে একটি এক-সুরী সুরের স্রোত যে বয়ে চলেছে—প্রত্যক্ষ করলাম। ঘটনাটা বলি।

বস্তি থেকে বাস বদলে গেছে, পুরাতন যাত্রীরা প্রায় সবাই নেমে গেছে। কেবল গুজগুজা কোলে সেই দুই ব্যবসায়ী পুরুষ যথাস্থানে সমাসীন। বস্তিতে বেশ খানিকটা সময় পাওয়াতে ওঁরা চা সরবৎ পান করে নূতন উদ্যমে গুড়গুড়ার ছিলিম চড়িয়েছেন এবং সশব্দে ধূমপান করতে করতে প্রচুর ধোঁয়া 'নাক-মুখ দিয়ে বার করে দিচ্ছেন। ওঁদের পিছনের দিকেই 'ধূমপান নিষেধে'র বিজ্ঞপ্তিটা জ্বল-জ্বল করছে। লেখাটা আছে ইংরেজী ও হিন্দী দুই ভাষায় অথচ আইনটা নীরব্ত। হয়ত দীর্ঘতম বাসযাত্রার পথে যাত্রীকে যথাসম্ভব বেশী আরাম দেওয়ার সদিচ্ছাতেই আইনের কড়াকড়ি নাই। কিন্তু কোন কোন যাত্রী যে ধোঁয়ার উৎপাতে পীড়া বোধ করতে পারেন এ সম্বন্ধে সকলেই কম-বেশী উদাসীন।

তখন দুপুর বেলা—যাত্রীরা পিপাসার্ত। চালক একটি ছায়াশীতল ঝর্ণার ধারে এসে বাস থামাল। ঝর্ণার অদূরে ছোটমত একখানা গ্রামও রয়েছে। বাস থেকে নেমে যাত্রীরা ছুটল ঝর্ণার দিকে। আমরাও গ্লাসে জল ভরে পান করলাম। অনেকে আঁজলাতে ভরে জল পান করছিলেন। একটি প্রৌঢ়া পাঞ্জাবী রমণী ওই ভাবে জল পানে অসুবিধা বোধ করায় গ্লাসটি চেয়ে নিলেন আমার কাছ থেকে। উনি জল পান করে পথের মাটি-কাঁকর দিয়ে গ্লাসটি উত্তমরূপে মাজলেন—তারপর সেটি ভাল করে ধুয়ে জল ভর্তি করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাইজীকা লিয়ে—

ঘটনাটা এমন কিছু নয়, তবু এর মূল্য আছে। সেই ভদ্র ও সমব্যোধের একটি দৃষ্টান্ত। গ্লাসটি উনি না মেজে অমনে ধুয়ে অনায়াসে আমার হাতে দিতে পারতেন, জলভর্তি করে দেওয়ার কথা ত ওঠেই না। জল পান করে বড় জোর একটি ধন্যবাদ দিতে পারতেন—একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেও কৃতজ্ঞতা জানালে অশোভন হ'ত না। কিন্তু অপরের রুচিবোধ ও তৃষ্ণার কথাটি এমন দরদ দিয়ে ভাবতে পেরেছিলেন বলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেয়েও একটি মহৎ দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রাখতে পারলেন।

ব্যবসায়ী দু'টিও জল পান করে নূতন উদ্যমে ছিলিম চাপিয়ে বাসে উঠবার উদ্যোগ করতেই আমি আইনের কথা তুললাম। ওঁরা একটু থতমত খেয়ে গেলেন, কিন্তু কোনও প্রতিবাদ করলেন না। ওঁদের সবিনয়ে বুঝিয়ে দিলাম—ধূমপান করতে না পারলে ওঁরা যেমন আরাম পাচ্ছেন না তেমনি চোখে-মুখে ধোঁয়া লেগে মেয়েরাও ভারি অস্বস্তি বোধ করছে। সহযাত্রীদের যাতে কষ্ট না হয় এটাও ত দেখা উচিত।

ওঁরা কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বাস না-ছাড়া পর্যন্ত ছিলিমটা টেনে টেনে প্রায় শেষ করলেন। পরে ছিলিম ফেলে দিয়ে বাসে উঠলেন।

পাঞ্জাবী মহিলাটি হাসিমুখে আমার পানে চেয়ে ঘাড় নাড়লেন। ভাবটা—ধন্যবাদ।

বাস অপরাহ্ণ বেলায় পৌছল যোগিন্দর নগরে।

৯

যোগিন্দর নগর জায়গাটি নেহাৎ ছোট নয়। মাইলটাক সমান্তরালি ছড়িয়ে আছে লোক-বসতি। দোকানপাট, বিশেষ করে চা খাবারের দোকান, হোটেল রেস্টুরেন্ট মিলিয়ে বেশ জমজমাট জায়গা। একটি দেবালয়—তার লাগাও একটি ধর্মশালা। দেবালয়টি সম্প্রতি তৈরী হয়েছে—তখনও সিংহদ্বার কপাট বসে নি। জলের কল আছে, বিদ্যুৎ আলো আছে। বিদ্যুৎ আলো ত থাকবেই, কারণ এই-খানেই রয়েছে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। কাংড়া উপত্যকার ছোট রেল পথটি এইখানেই শেষ হয়েছে। চমৎকার ন্যারো-গেজ স্টেশন—মাত্র কয়েক বছর আগে নূতন পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে। এটিও ধর্মশালার গায়ে বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাস স্টেশনটাও তাই। একটু উঁচুতে শুধু। বাস, রেল, মন্দির, ধর্মশালা, বাজার, দোকান, হোটেল—সবই এক জায়গায় জটলা করছে—এক কার্যক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে সব ক'টি।

আমাদের কাংড়া কুলু ভ্রমণের শেষ ঘাঁটি ছিল যোগিন্দর নগর। আশা ছিল, একটা রাতের মত আশ্রয় এখানে মিলবেই। কিন্তু হোটেল, ধর্মশালা, মন্দির, সর্বত্রই স্থানাভাব। মুষড়ে পড়লাম। এ যে কূলে এসে নৌকা ডুবে যাওয়ার মত লাগছে! সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করতে মন চাইছিল না, বাসের ধকল গেছে সারা-দিন। দীর্ঘ পথে যে ক্লান্তি অলক্ষ্যে দেহে ছড়িয়ে ছিল—সেটা এইবার আশ্রয় না পাওয়ার হতাশায় চেপে বসল মনের উপরে। সুতরাং স্থির করলাম, দেবতার নাটমন্দিরে পড়ে থাকব। কাটুক না একটা রাত এমনি—গৃহহীন অবস্থায়।

স্থানটি কিন্তু মনোরম লাগছিল। যে চারখানা ঘর ছিল যাত্রীদের জন্য—সেগুলি ভর্তি। ঘরের সামনে প্রশস্ত

টিনের ছাউনিওলা বারান্দা। বারান্দায় আলোর ব্যবস্থাও রয়েছে—হোক না তা কম-জোরী। পাশেই রয়েছে জলের কল। আশ্রয় স্থানটি নিন্দার নয়। যদিও নিরাপত্তাবোধের অভাব ছিল। মন্দিরের সিংহদ্বার কপাট নাই, রাত্রিকালে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির আগমন ঘটা অসম্ভব নয়।

সিংহদ্বার ঘুরিয়ে দু'জন সন্ন্যাসী বসেছিলেন। আমরা আশ্রয় সন্ধানে এদিক-ওদিক করছি দেখে একজন ঈষৎ হেসে বললেন, রাতে কোথায় বা যাবে, দেবতার স্থানে থেকে যাও। ভয় কি!

ভয়-ভাবনা বিশেষ ছিল না। কাংড়া কুলু ভ্রমণের এইটিই উপসংহার ভাগ—সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত। বিছানাপত্র ত পেতেই শোব, স্যুটকেশ প্রভৃতির ভার যদি কিছু লাঘব হয়ে যায় খুব অসুবিধায় পড়ব না। অতএব যা করেন বংশীধারী বাঁকা-শ্যাম—তিনি ত সজাগ প্রহরী রয়েছেনই আমাদের সামনে।

সেই ত্রিভঙ্গিম ঠাম শ্যাম মূর্তিই মন্দিরে বিরাজমান—বামে শক্তিরূপিণী শ্রীরাধিকা। মূর্তিতে পশ্চিমী রূপতার লেশমাত্র নাই—এ যেন বাংলার কোন কারিগরের হাতে তৈরী। তেমনি কোমল মসৃণ লাবণ্যের আভাস মিলছে অঙ্গ-কান্তিতে। শ্বেত পাথরের শ্রীরাধা একটু ভিন্নভঙ্গী। বেশ-ভূষণ হ'লে অত,ত দৃষ্টির বিরোধ বাধত না। যাই হোক, পুরোহিত আরতি করছিলেন, আমরা দেখছিলাম। আরতির সময় কিছু প্রার্থনা করেছিলাম কি না মনে নাই।

হয়ত ভাবছিলাম—এই ভাল। এই কয়দিনই ত বাধাবন্ধহীন হিমালয়ের কোলে কোলে ঘুরে বেড়ালাম, অথচ চারদেয়াল-ঘেরা বিশ্রাম স্থানটি আঁকড়ে ধরে রইলাম। আর সেই বাধা যখন ঘুচেই যাচ্ছে—যাক না, চিন্তা করি কেন! যোগিন্দর নগরের চারদিকে ত পাহাড়ের পাঁচিল রয়েছে, মাথার উপরে টাঙানো আকাশের চাঁদোয়া। কপাটহীন সিংহদ্বার ফাঁক দিয়ে দেখছি বিস্তীর্ণ একটা মাঠ, সেই মাঠে সারি সারি তাঁবু পড়েছে, বিদ্যুৎ আলো জ্বলছে, উঁচু রাস্তার থাকে থাকে সাজানো দোকানপাট বাড়ী-ঘরের একাংশ···এ সবই নাটমন্দিরে শুয়ে দেখতে পাব।

কাংড়া কুলুর অতি বিস্তীর্ণ উপত্যকা ঘুরেও নিশীথ রাত্রির হিমালয়ের যে রূপটি দেখতে পাই নি—তা যাত্রার শেষ পর্বে অবারিত হোক—নিঃশঙ্ক সর্বভাবনা সংশয়মুক্ত চিত্তে তাকে প্রাণ ভরে দেখে যাই। তখন রাত্রি তার এলোচুল এলিয়ে দেবে হিমগিরির শিখরে শিখরে, কেশ-জাল আবদ্ধ মুক্তা বিন্দুর মত অল্প-জ্যোতি নক্ষত্ররা টিপ টিপ করবে, শৈল-প্রকৃতি মায়ের মত অতন্দ্র চোখে চেয়ে থাকবে নিদ্রা-শিথিল এই জনপদটির বিবশ তনুদেহের 'পরে। একটি জনপদ কেমন করে নিদ্রা যায় সেই দৃশ্য আর্শ দেখতে পাব ভেবে—আর দুশ্চিন্তা রইল না।

সেই ধুলোভরা মেঝেতে বিছিয়ে নিলাম বিছানাটা। এইবার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। শোবার আগে আর একবার কপাটহীন সিংহদ্বার পানে চাইলাম।

অন্তর্যামী হয়ত আমার মনোভাব বুঝলেন। ঈষৎ হাসলেন। সেই মুহূর্তে আমাদের সামনের ঘর থেকে একজন যাত্রী বার হয়ে গেল।

পুরোহিত বললেন, তোমরা ইচ্ছে করলে ঘরটা নিতে পার। সনাতন ধর্মরক্ষী-ফাণ্ডে কিছু চাঁদা দিও, ব্যস।

দেখছি বটে, নাটমন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে গীতার অনেক শ্লোক, অনেক নীতিবাক্য—সদ্ভাবে সাধুপথে জীবনযাপন করার বহু উপদেশাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। স্বধর্মে স্থিত করার প্রচেষ্টা এঁরা নানাভাবেই করছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন আছে এ নিয়ে। নিজের ধর্ম বলতে কি বোঝায় সেইটিই ত অধিকাংশ মানুষের কাছে আজ স্পষ্ট নয়। পূর্বযুগীয় ধর্ম-সাধনার পন্থাগুলি সুসংস্কৃত হয়ে ভিন্ন রূপ লাভ করছে বলে প্রাচীনকালের রীতিপদ্ধতি অচল হয়ে যাচ্ছে। কাণ্ট হেগেল বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মমতের পরিপোষক, তাতে মানুষের উপরে পূজ্য আসনে দেবতারা আর স্থির হয়ে বসতে পারছেন না। মানুষের মাঝেই তাঁদের আত্মপ্রকাশ করতে হচ্ছে—এক রূপে নয়—বহু রূপে। পথ মন্দির গৃহ গুহা অথবা তপোবন—এ সবই একার্থবাচক শব্দে রূপান্তরিত। এখন সনাতন ধর্ম যদি শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করতে চায় এই অর্থেই তা সম্ভব। সর্বজনীন কল্যাণকর্মকে আশ্রয় করে তার উজ্জীবন ঘটবে, সাম্য পন্থা বিধ্যতে অয়নায়।

একটি দর্শনীয় জিনিষ আছে যোগিন্দর নগরে, এশিয়ার মধ্যে না কি সেটি একমেবাদ্বিতীয়ম্। জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মশালা। মাত্র মাইল খানেক হাঁটলেই কারখানাটিতে পৌঁছান যায়। ভিতরে প্রবেশ করতে হ'লে অবশ্য অনুমতি-পত্রের প্রয়োজন। সেখানকার যন্ত্রকৌশল আর কর্মপ্রক্রিয়া দেখলে কৌতূহল জন্মাবে, কিন্তু তার চেয়ে ভাল লাগবে আট হাজার ফুট উঁচু বরোট পাহাড়ের মাথায় ইলেকট্রিক ট্রলিতে চেপে যদি উঠতে পারা যায়। উঠতে না পারার কোন হেতু নাই। সেখানেও অনুমতি-পত্রের ব্যবস্থা আছে এবং ট্রলি চাপবার আগে দুর্ঘটনার দায়িত্ব নিয়ে একটা বণ্ড সই করে দিতে হয়। দুর্ঘটনা অবশ্য আজ পর্যন্ত হয় নি, তবু ওটা রীতি। ট্রলি চাপার অনুমতিপত্র পেতে একটু দেরি হয়, একদিনেই তা মেলে না। ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী পাওয়া যায়।

ষ্ট্রিং করে আট হাজার ফুট উঁচুতে উঠে যাওয়া—ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। আবার ঐ অত উঁচুতে উঠে দিগন্তপ্রসারিত তুষার-কিরীট গিরীশ্রেণীর মুখোমুখি হওয়ার অসহ্য আনন্দ উত্তেজনাকে কল্পনা করেও কি কম তৃপ্তি!

আমরা কল্পনাতেই সেই আনন্দ আস্বাদ করে নিলাম—দু'একদিন অপেক্ষা করার সময় আমাদের ছিল না।

জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জল আসছে উল নামক একটি নদী থেকে। ধওলাধার গিরিশ্রেণী বিদীর্ণ করে একটি ১৫০০০ ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ পথ তৈরী হয়েছে। সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে উল নদীর জলকে টেনে আনা হচ্ছে বরোট নামক একটি পাহাড়ের মাথায়। সেই পাহাড়ের উচ্চতা আট হাজার ফুট। সুড়ঙ্গ-পথের জল ঐ আট হাজার ফুট উঁচু থেকে সবেগে নীচে নেমে এসে বিদ্যুৎ সৃষ্টির কাজে সহায়তা করছে। বরোটে বিস্তৃত জলাধারের সামনে এসে দাঁড়ালে ভ্রমণকারীরা খুশিই হবেন।

আমাদের উপত্যকা পরিক্রমা শেষ হয়ে এল, কাল যোগিন্দর নগর ছেড়ে পাঠানকোটে পৌছব—হিমালয় আবার স্বপ্নের বস্তু হয়ে উঠবে। আর কোন দিন এখানে আসার অবকাশ হয়ত ঘটবে না। যে হিমালয়ের ছবি প্রথম ভূগোল পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে এঁকে নিয়েছিলাম, পরিণত বয়সে নানা কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণাঢ্য করে তুলেছিলাম—এতদিনে জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় তাকে ভালভাবে দেখবার সৌভাগ্য হ'ল। দেখলাম কল্পনার চেয়েও বিচিত্র সে দেশ। বিজ্ঞান-শাসিত জগৎকে অঙ্গীকার করেও অরণ্য আশ্রমের শান্ত রসাস্পদ সৌন্দর্য্যকে অস্বীকার করে নি; তার শিখরে অরণ্যে গিরিগুহায় নদী-স্রোতে মানুষের চোখে-মুখে আদিযুগের সরলতা আর প্রসন্নতার ছাপ এখনও লেগে রয়েছে। আর্য্যতাপসের সংস্কৃতি চিহ্নে আজও সে সুচিহ্নিত।

আর কোনদিন আসব না এখানে, এই চিন্তায় মন বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। মন আমাদের টানছে, আজন্মের মমতা-ডুরি দিয়ে শক্তপাকে বেঁধে রেখেছে সেই মাটি; আবার হিমালয় ছেড়ে যেতেও মন কাঁদছে—আবাল্য-সঞ্চিত কল্পলোক থেকে নেমে যাচ্ছি বলে। একটাই সুতোর দু'টি মুখ—হাসি কান্নার দুই বিপরীত মুখী টানে এই ঘুমহারা রাতে কেমন টান-টান হয়ে উঠল। শিয়রের ছোট জানালাটা খোলা। আকাশ দেখছি, দু'একটি নক্ষত্র দেখছি—পাহাড় দেখতে পাচ্ছি না। জলদবরণী মেঘের নিবিড় কালো কুন্তল রাশে ঢাকা পড়েছে হিমালয়। আকাশে মেঘ জমেছে—ঘন কুয়াশার পর্দা নেমেছে দিক্‌সীমায়। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম সেই দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল। চোখে জল এল না, জ্বালা করতে লাগল।

দুপুরবেলায় ট্রেনে চেপে কাংড়া উপত্যকা পার হচ্ছিলাম। সামনে পিছনে দুটো ইঞ্জিন দিয়ে আমাদের তিন-বগির গাড়িখানাকে নাবিয়ে আনল বৈজনাথ পাপরোলায়। এখানে এক ঘণ্টা থামল গাড়ি, নতুন করে তৈরী হ'ল তার কলেবর। এবার তবলেরও বেশী বগি জুড়ে একখানা ইঞ্জিনেই গাড়ি টেনে চলল। ঘাট সড়ক চড়াই পথ শেষ হয়েছে, গাড়ি এবার অনায়াস গতি নেবে।

নামটা ঠিক মনে পড়ছে না—মাঝামাঝি কোন একটা স্টেশনে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। স্টেশনের বেড়ার ওপিঠে দাঁড়িয়ে আছে বিশ-পঁচিশটি অবগুণ্ঠিতা বধূ, কয়েকটি অনবগুণ্ঠিতা মেয়ে, বর্ষিয়সীও কয়েকজন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে চলেছে একটি বধূ, সদ্য-পরিণীতা মেয়ে চলেছে তার স্বামীগৃহে। বাজনা বাজছে বম্ বম্ বম্—সেই তালে ভীরু পা দু'খানি টেনে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। বধূর সামনে দর্পিত ভঙ্গিতে চলেছে বর—যেন এই মাত্র একটি রাজ্য জয় করে এল সে। রাজ্য জয় করে ত বটেই, মহার্ঘ্য একটি মণিরত্নকে লুণ্ঠন করেও। জয়ঢাক, বাঁশী, ঝাঁঝর করতালের ঐকতানে বিজয়োৎসব বা লুণ্ঠনোৎসবের ঘোষণা। উদ্ধত শোভাযাত্রাটি চলেছে প্ল্যাটফর্মের মাঝখান দিয়ে—আনন্দস্রোতে উচ্ছল খুশি-খুশি মুখ মানুষগুলি কলরব করতে করতে আমাদের সামনে দিয়ে চলেছে ওরা আরও এগিয়ে গিয়ে সামনের বগিখানায় উঠল। বেড়ার ওপাশে বহু অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠনের তটে পিছিয়ে রইল একটি অশ্রুনদীর বিষণ্ণ মন্থর ধারা। মেয়েরা কাঁদছে। আনন্দ আর বেদনাকে—এমন পাশাপাশি স্পষ্ট করে আর কোনদিন প্রত্যক্ষ করি নি। আমাদের দেশে কন্যাকাজলির সময়েও নয়। সেখানে বিদায়-বেদনার বাষ্পে সমস্ত দৃশ্যপটই আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

কুলুর পথেও দেখেছিলাম বাজনা বাজাতে বাজাতে বরের বেশে একটি আনন্দোৎসবের মিছিল আমাদের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিল। বিজয়ী বীরের মত গর্ব্বিত উন্নত শির বর বসেছিল পাকীর ভিতরে, কনের পাকী ছিল বন্ধ, সে অশ্রুমুখী ছিল কি না জানি না। আর দানপর্বের অত্যাবশ্যকী খাটিয়া তৈজসপত্র শয্যা আরও যেন কি সব সংসার-গৃহস্থালীর জিনিষপত্র, হাতে মাথায় কাঁধে কাঁধে করে চলেছিল অনেকগুলি মানুষ। সেই শোভাযাত্রায় মধ্যেও

দেখেছিলাম দুর্ঠোরার বিজয়োদ্ধত পদক্ষেপ। বৈজনাথেও এক বন্দিনী বধূকে দেখেছিলাম এমনি শোভাযাত্রার মধ্যবর্তিনী হয়ে যেতে। এই মেয়েগুলিকে মনে হয়েছিল এক একটি লতা-মাধবী কিংবা অন্য কোন লতা—যারা সহকার কিংবা অন্য কোন বৃক্ষকে আশ্রয় না করতে পারলে ফুলে ফলে সার্থক ও সুন্দর হ'তে পারে না। জন্মভূমির জল-বাতাসে সঞ্জীবিত লতারা এমনি সহসাই উন্মূলিত হয়ে আর এক ভূমিকে আশ্রয় করে সম্পূর্ণ হয় কিংবা এক দেশের প্রদীপ আর এক রাজ্যের তেল-সলিতা নিয়ে দীপশিখাকে সৃষ্টি করে। আনন্দ-উৎসবে দীপ জ্বালাবার রীতি চিরকালের। আর একটি বিষণ্ণ কালো পটভূমিকা না পেলে শিখাটি উজ্জ্বলতর হয় না বুঝি। ট্রেনে উঠেও বসর বসর বাজনা বাজতে লাগল—বেড়ার ওপারে অশ্রুমুখীরা গভীর ছায়ার মধ্যে সরে গেল।

সারা পথটা বাজনা বাজাতে বাজাতে চলল ওরা। নেমে গেল একটা ছোট স্টেশনে। তখন গোধূলির ধূসর অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে।

স্টেশনের সীমানা পার হয়ে খোলা মাঠে নেমে গেল। আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু পথ—তারই মাঝখানে ওরা মিলিয়ে গেল। বাজনার শব্দটা এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ ক্ষীণতর হচ্ছে। এক সময়ে সেই শব্দও আর শোনা গেল না।

এমনি চলছে অনাদিকাল থেকে। গৌরীদের নিয়ে ত্রিলোচনেরা এমনি অজানা কৈলাসের পথে পাড়ি দেয়। কৈলাসের শিখরশিরে জ্বলে ওঠে সৃষ্টি-আনন্দের প্রদীপ শিখা, তার ছায়া কাঁপে হিমালয়ের ঘরে ঘরে। গৌরীহারা গিরিরাণীরা আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে স্বস্তিবাণী উচ্চারণ করে:

শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ

তোমাদের বিজিত জীবনের যাত্রাপথ বাধাহীন হোক—সুন্দর হোক, মঙ্গলময় হোক।

—(*)—

মাটির কোন জায়গাকে আমরা ততটা ভারতবর্ষ মনে করি না, ভারতীয় হৃদয় মন আত্মা যে-যে রূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে যতটা ভারতবর্ষ বলিতেছি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২

ইতিহাসের স্মৃতি ঃ শিবনিবাস

শ্রীহারাধন দত্ত

পাল-পার্বণের এই বাংলা দেশ। এখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ। এদেশে এটা একটা প্রবাদ। নানা ধর্মোৎসব, লোকউৎসব বহুকাল থেকে বাংলার গ্রামজীবনকে সজীবতাদান করে চলেছে। প্রবর্তিত হয়েছে নতুন নতুন মেলা উৎসব। এই উৎসবগুলো মানুষের মনোধর্মের সজীবতার প্রকাশ, আর নানা পণ্য সুশোভিত মেলাগুলো দেশের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের নির্দেশক। গ্রামকেন্দ্রিক বাংলার সমাজ সংস্কৃতির সুনাম ছিল একদিন। দেশে সুখ ছিল, সমৃদ্ধি ছিল। এর তাজা মাটির উৎপাদন ক্ষমতা—শিল্পীর নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভা—সাহিত্য-দর্শনে এই জাতির মৌলিক অবদান অনেক আগেই দেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে পাশের দেশে—এমন কি সাগর-পারের মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ বৃত্তান্ত আজ আর অজ্ঞাত নয়। বাংলা দেশের এক মেলাউৎসবের কথা বলতে চলেছি। সেই বাংলা দেশের মধ্যে আবার নদীয়া। শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৌলীন্যে এর দেশজোড়া নাম। সেন আমল থেকে কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত। ধর্মের ক্ষেত্রে, সমাজ চিন্তায় কত ভাঙা-গড়া ও পরিমার্জন হয়েছে। সে ইতিহাস বিস্তৃত। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে চলে আসি। সে অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। এই অষ্টাদশ শতকে প্রায় সমগ্র বাংলা দেশে "শিবনিবাস" একটি সুপ্রসিদ্ধ তথা বহু-পরিচিত নাম। শিবনিবাসের একটি মেলাউৎসবের কথা সেই সুদূর অতীতেই সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

শিবনিবাসের সেই সর্বজন-পরিচিত মেলার কথাই বলছি। কিন্তু তার আগে আরও কিছু বলতে হয়। অষ্টাদশ শতকে রেনেল সাহেব বাংলা দেশের যে ম্যাপ এঁকে-ছিলেন—সেখানে শিবনিবাসের অবস্থানটা স্পষ্ট করে চোখে পড়ে। বাংলার সার্বভৌমত্ব পলাশী যুদ্ধ পরে সবেমাত্র লুপ্ত হয়েছে। ছোট ছোট রাজন্যবর্গ স্বার্থ ও ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে লিপ্ত। বাংলার রাজনৈতিক জীবনে তখন ঘোর অশান্তি ও অরাজকতার তাণ্ডব। বর্গীর হাঙ্গামার অভিশাপ একেবারে দূরীভূত হয় নি। ১৭৫১ সালে রচিত গঙ্গারামের "মহারাষ্ট্রপুরাণ" বা "ভাস্কর পরাভবে" এ হাঙ্গামার বিভীষিকার কথা জানা যায়।[১]—সিরাজ-বিরোধী চক্রান্তের অন্যতম নায়ক সুচতুর ও কূট রাজনীতিবিদ কৃষ্ণচন্দ্র এই ঘোর রাজনৈতিক সাংঘাতের দিনে নির্লিপ্ত থাকতে পারেন নি। রাজনীতি-বিষয়ক মন্ত্রণা ও আলাপ-আলোচনার জন্য তিনি এক নিভৃত স্থানের অন্বেষণ করছিলেন। সেদিন এই অরণ্যময় শিবনিবাস তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এর অবস্থান, মনোরম প্রাকৃতিক ও নিসর্গশোভা তাঁকে মুগ্ধ করে। সেদিনের সেই অজানা জনপদের দেশে কৃষ্ণচন্দ্র বন কেটে নগর পত্তন করলেন। আর এ নগরীর নাম হ'ল শিবনিবাস। পুত্র শিবচন্দ্রের নামের স্মৃতি জড়িত রয়েছে এই শিবনিবাসের সঙ্গে। শিবনিবাস এ নাম শিব প্রতিষ্ঠাজনিতও হ'তে পারে। রাজাকৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক এবং বিদ্যোৎসাহী সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বাংলা দেশে সুপরিচিত। চুরাশি পরগণার সুবিস্তৃত রাজ্যে নানা দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং মন্দির স্থাপন করেছেন। বাংলা দেশে ঐ রাজনৈতিক সাংঘাতের যুগে শিবনিবাস মহারাজের দ্বিতীয় রাজধানীর গৌরব লাভ করল। কৃষ্ণনগর তাঁর মূল রাজধানী। এই নূতন নগরে তিনি সুরম্য হর্ম্য, পূজার বাটী, দেওয়ানখানা, নওবৎখানা, সিংহদ্বার ইত্যাদি নানাবিধ অট্টালিকা নির্মিত করলেন। টোল, চতুষ্পাঠী, নাটমঞ্চ ও সুবৃহৎ মন্দিরাদিও প্রতিষ্ঠা করলেন। নগরে প্রবেশের একমাত্র পথ পূর্বদিকে থাকল। রাজবাস ও নগরের চতুর্দিকে শত্রুর প্রবেশ-রোধার্থে নানাপ্রকার কলকৌশল অবলম্বন করা হ'ল। পুরীমধ্যে তিনটি সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করে রাজরাজেশ্বর, রাজ্ঞীশ্বর, ও রামসীতা নামে তিনটি দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় উচ্চ মন্দির এ প্রদেশে আর কোথাও দেখা গেল না। রাজপুরী ও মন্দির প্রাঙ্গণের পাশ দিয়ে ইছামতীর চুরি-করা জলধারা পরিখা-পথে বইয়ে আনা হ'ল। কালক্রমে এই পরিখাকেই নদীর গৌরবে মণ্ডিত করা হয়।* এ কীর্তি দেওয়ান রঘুনন্দনের। আজও গ্রামবাসে রঘুনন্দনের এই কীর্তি-কথা

---

১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩ (ব্যোমকেশ মুস্তাফী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত ও টীকা সম্বলিত)।

* পুণ্যতোয়া চূর্ণী—হারাধন দত্ত, বসুধারা, ভাদ্র, ১৩৬৫।

শোনা যায়।[২] মহারাষ্ট্রীয়গণের উপদ্রব ভয়ে কৃষ্ণচন্দ্র এই নগরেই জীবন যাপন করতে লাগলেন। রাজমহিষীরাও এই নগরে বাস করতে লাগলেন। কৃষ্ণনগরের বাস প্রায় উঠে গেল। একদিকে যবন আধিপত্য হ'তে আত্মরক্ষা, অপরদিকে সুখশান্তিতে বাস করা ও ইংরেজদের সহায়তা লাভ মানসে তিনি এই শিবনিবাসকে এত গুরুত্ব দান করলেন। কৃষ্ণনগর চকের পূর্বদিক থেকে শিবনিবাসের সিংহদ্বার পর্যন্ত যে পথ তা তিনি এতৎবিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখে নির্মাণ করলেন। অচিরে শিবনিবাসের আড়ম্বরের কথা দূরদেশে ছড়িয়ে গেল। কৃষ্ণচন্দ্র এখানে অগ্নিহোত্র বাজপেয়ী যজ্ঞ সমাপন করলেন, এ যজ্ঞ কলির। শেষ বৃহত্তম যজ্ঞের মর্যাদা পেল। ১৭৫২ সালে রচিত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবনিবাসের গৌরব-গাথা প্রতিধ্বনিত হ'ল। ১৮০৫ সালে রচিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের "কৃষ্ণচন্দ্রস্য রাজ্ঞ চরিত্রং" গ্রন্থে শিবনিবাসের নগর পত্তনের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বর্ণনা অনেকাংশে কল্পনাশ্রয়ী। ঐতিহাসিকতা একেবারে উপেক্ষিত নয়। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, "ক্ষিতিশবংশাবলীচরিতে" ও মিত্র জীবনচরিতে শিবনিবাসের পুরাকথা উপস্থাপনা করেন। ১৭৭০ সালে রচিত নদীয়া তাজনঘাটের কবি বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গলেও শিবনিবাসের প্রশংসাসূচক উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।[৩] পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ(১৯০০)" গ্রন্থে শিবনিবাসের উল্লেখ করলেন। বাস্তবিকই রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের প্রবন্ধ-প্রমাণে শিবনিবাস অষ্টাদশ শতকেই ইতিহাসের দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। তারপরে শিবনিবাসের কথা নানাভাবে আলোচিত হয়েছে, সাময়িক পত্রে, ইতিহাসে, ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, কাব্যে নিবন্ধে, সরকারী বিবরণে এবং কুমুদনাথ মল্লিকের নদীয়া কাহিনীতে শিবনিবাসের ঐতিহাসিকতা বারে বারে ধরা দিয়েছে। এখানে আমরা সে আলোচনায় প্রবেশ করছি না। শিবনিবাসের ঐতিহাসিক স্মৃতির আর এক আলেখ্য আছে। সেটি শিবনিবাসের মেলা।

শিবনিবাসের এই মেলা শিবনিবাসের মতই প্রাচীন। রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই শিবনিবাসের মেলার প্রবর্তন। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন শিব-শক্তির উপাসক। তিনি ছিলেন পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক। রাজপুরী শিবনিবাসে মন্দির-প্রাঙ্গণে তিনি একটি শৈব মেলার প্রবর্তন করেন। এই মন্দির প্রাঙ্গণের পাশ কাটিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে বহুতোয়া চূর্ণী। জলধারা কাকচক্ষুর মত—উপরের গাছ-গাছালির ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় সেখানে। দু'তীরে তার বনানী। মাঝে মাঝে তাল নারিকেল দেবদারু ও ঝাউয়ের আকাশ-ছোঁয়া সারি। এরই মাঝে আবার মন্দির শৃঙ্গগুলো নীল আকাশের নিতান্ত কামনা করছে। পরপারের দূর প্রান্তর হতে অরণ্যচারী শিবনিবাস পুরীর গগনস্পর্শী দৃশ্য দূর পথিকেরই দৃষ্টিগোচর হ'ত। মাঘ মাসের ভৈমী একাদশী ও শিবরাত্রির মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে এই শৈব মেলাটির অনুষ্ঠান চলত। সে মেলার আড়ম্বর ছিল। পুণ্যার্থী দর্শকেরা এসে শিবলিঙ্গ ও রামসীতা দর্শন করতেন। দর্শন করতেন পণ্য-সুশোভিত মেলাটিকে। দূর অতীত কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে এ মেলার ইতিহাসের হদিশ মেলে। সেজন্যই শিবনিবাসের এ মেলার আদি প্রবর্তক স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের পর শিবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র ক্রমে ক্রমে শাসন-ক্ষমতায় আসেন। ক্রমে নদীয়া রাজ বংশ শ্রী ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ১৮৬০ সালের দিকে স্বরূপ সরকার চৌধুরী শিবনিবাসের জমিদারী ক্রয় করেন। স্বরূপের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার চৌধুরী (মৃত্যু ১২৮৭ সাল, ১১ই কার্তিক) সেকালের বাংলা দেশের একজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। শিবনিবাসে তিনি বহু উৎসবের প্রবর্তন করেন। সে উৎসবগুলির মধ্যে দোল, দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, গোষ্ঠলীলা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গানবাজনা, যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী, কথকতা প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষণা করে তিনি এ অঞ্চলের জনসাধারণকে সারা বৎসর আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে রাখতেন। শিবনিবাসের যে শৈব মেলার উল্লেখ আগেই করেছি—সেই পুরাতন মেলাটির সঙ্গে পরবর্তীকালে আর একটি বৈষ্ণবমেলার মিলন ঘটে। বলাবাহুল্য এ অঞ্চলে কৃষ্ণচন্দ্রের হিন্দুধর্ম সংস্কার প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি। লৌকিক লোকাচার ও নানা লোকধর্মের বাহুল্য এ অঞ্চলে আজও লক্ষিত হয়। এখানকার চড়ক, গাজনে ও নানা লৌকিক দেবদেবীর অনুষ্ঠানে অহিন্দু ও পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য বিদ্যমান। তদুপরি নদীয়া বৈষ্ণবতার লীলাভূমি। চৈতন্য জন্মভূমি নবদ্বীপ শিবনিবাস হ'তে বেশী দূরবর্তী নয়। উনিশ শতকের বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নিবাস তাজনঘাট শিবনিবাসের অতি,

২) (ক) দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র হারাধন দত্ত, ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৬৫।

(খ) দুই শতাব্দী পূর্বে নদী পরিবহনে কৃত্তিবাস—কালীকিঙ্কর দে, বসুমতী, কার্তিক, ১৩৬১।

নিকটে। আজও নদীয়ার পল্লীসঙ্গীতে, আউল, বাউল ও ফকিরের গানে কৃষ্ণ-কথাই অধিক। সেজন্যই দেখি, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম অনুষ্ঠান অপেক্ষা বৈষ্ণব অনুষ্ঠানই ব্যাপকতা লাভ করছে। যেমন ১৮৮৫ সালের দিকে হরিসভার মেলার প্রবর্তন। শিবনিবাসের ঐ শৈবমেলা অনুষ্ঠান মধ্যেই হরিসভার মেলাটিরও সূচনা। হরিসভার মেলা পরম বৈষ্ণবতার ফল। হরি সংকীর্তন হতে হরিসভার নামকরণ। ১৮৮৫ সালের দিকে শিবনিবাসের স্বর্গীয় মধুসূদন দে প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি এক বিরাট অষ্টপ্রহর যজ্ঞের সূচনা করেন। দীর্ঘ এক মাস হরিসংকীর্তনের পর চৈত্রী একাদশীতে লুট করে তাঁরা একটি হরিমন্দির ও রাধাকৃষ্ণ যুগল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৈষ্ণব উৎসব উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া প্রভৃতি বিভিন্ন বৈষ্ণবতীর্থ হ'তে কীর্তন গানের দল আমন্ত্রিত হ'ত। বছরের পর বছর এই বৈষ্ণব অনুষ্ঠানটি প্রতিপালিত হতে লাগল। কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত মেলাটিও ঐ একই সময়ে অনুষ্ঠিত হ'ত। ক্রমে ঐ মেলাযাত্রী লোকমুখে শিবনিবাসের নূতন বৈষ্ণব উৎসবের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এইরূপে মেলাটির আয়তন বেড়েই চলে। এমনকি কয়েক বছরের ভিতরে আদি মেলা প্রাঙ্গণেও স্থানাভাব দেখা দেয়। ঠিক এই সময়েই তৎকালীন শিবনিবাসের যুবকবৃন্দ মধুসূদন দে প্রতিষ্ঠিত উৎসবকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত মেলার নিকটেই আর একটি বৃহৎ মেলার আয়োজন হয়। এই মেলাই কালক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত মেলার সঙ্গে একত্রিত হয়ে 'হরিসভার মেলা' নাম ধারণ করে। সেই থেকে শিবনিবাসের মেলাটি "হরিসভার মেলা" এই নামেই অধিক পরিচিত আছে। শিবনিবাসের মেলার অপর নামগুলির মধ্যে বুড়োশিবের মেলা, রামসীতার মেলা, শিবচতুর্দশীর মেলা বা চৈত্রী একাদশীর মেলা প্রভৃতি শোনা যায়। শিবনিবাসের বহু প্রাচীন মেলার এটুকুই ইতিহাস।

বৎসরের পর বৎসর আসে। চৈত্রী একাদশীতে শিবনিবাসের সেই প্রাচীন মেলার উৎসব হয়। বাদ পড়ে না কোন বছরেই। শিবনিবাসের সেই বৈভব, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য আজ আর নেই। নেই সেই আমীর, ওমরাহ ও অমাত্য—রাজপুরীর সে আড়ম্বর। দেবমন্দিরের বাদ্য ঘণ্টা শঙ্খরোল কোথায় কবে মিলিয়ে গেছে। কলকাতার লর্ড বিশপ ১৮২৭ সালে প্রকাশিত তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ—Journy (through the upper parts of India, Vol I, ৯১-৯৮) পৃষ্ঠায় শিবনিবাসের যে বিবরণ লিখেছিলেন—সেই গ্রীক স্থাপত্যের অনুরূপ রাজপুরীকে আজ আর খুঁজে পাই না। বিশপ হেবার কথিত সেই towers এবং long and striking cloisters of Gothic Arches অভিজাযুক্ত রাজপ্রাসাদের কিছুই দেখি না। W.W.Hunter বিরচিত Annals of Rural Bengal Nadia এবং Gurrote-এর District Gazetteer, Nadia প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থে বর্ণিত শিবনিবাসপুরীর আড়ম্বর-কথা কোথায় কবে মিলিয়ে গেছে। রাজরাজেশ্বর মন্দির, রাজ্ঞীশ্বর মন্দির, রামসীতার মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির আজও ম্লান গরিমায় অবস্থান করছে। এই মন্দিরগুলিতে খ্রীষ্টীয়, ইসলামী ও হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন মিলবে। পোড়া-মাটির এ সুবৃহৎ মন্দিরগুলি বাংলার স্থাপত্য শিল্পের গৌরব। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন সেজন্যই তাঁর "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী আলোচনাকালে লিখেছিলেন—তিনি শিবনিবাসকে ইন্দ্রপুরীর মত সুসজ্জিত করেন। আবার দীনবন্ধু মিত্র শিবনিবাসের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে মুক্তকণ্ঠে লিখেছিলেন :—

সঙ্গিনী বিচ্ছেদ ভাবি নয়নের জলে,
একা আইলাম শিবনিবাসের তলে।
যেথায় বিরাজে আদি রাজনিকেতন,
পাতিত করেছে কিন্তু কাল পরশন।
এক্ষণে গণেশচন্দ্র রাজা গুণাকার,
কৃষ্ণচন্দ্র বংশ তায় করিছে বিহার।
কঙ্কণের মত আমি এসেছি ঘুরিয়ে,
তাই সেথা ডাকে মোরে কঙ্কণা বলিয়ে।
হারাইয়া রাজধানী মন্দির ও উদ্যান,
পাইলাম হাঁসখালি বাণিজ্যের স্থান।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সুরধুনী' কাব্যের প্রথম ভাগে নাট্যকার কবি দীনবন্ধু মিত্র শিবনিবাসের এই বর্ণনা উপস্থিত করেছিলেন। আজ সেই আদি রাজনিকেতন, রাজধানী, উদ্যানের কোন চিহ্নই পাই না। কঙ্কণাকারে বেষ্টিত চূর্ণীর শীর্ণধারা হয়ত বা মিলবে। ভগ্নপ্রাসাদ আজ মাটির ঢিবি। শুধু স্মৃতির ইতিহাসটুকু বিরাজ করছে। আর তাকে ঘিরে উঠেছে বনভূমি। মনে পড়ে বাংলার আকাশে যখন ঘনঘোর দুর্যোগ, তখন কৃষ্ণচন্দ্র বাস করতেন এই শিবনিবাসে। পাইক বরকন্দাজ

৩) ক) তীর্থমঙ্গল (১৩২২) নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
(খ) তীর্থমঙ্গল ও তার কবি। হারাধন দত্ত, কালপুরুষ, পৌষ, ১৩৬৮।

নদী অর্থাৎ নৈতলাবত রাগরঙ্গ-হাস্যধ্যানে মুখরিত থাকত এই রাজপুরী। আর আজ, ইতিহাসের কঙ্কালগুলোই কেবল বিরাজ করছে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সেই মেলাটি আজও লুপ্ত হয় নি। চৈত্রী একাদশীর অনেক আগে থেকেই ব্যবসায়ীরা দোকান দিতে আরম্ভ করে। আর ঐ নির্দিষ্ট দিনে জমজমাট হয়ে ওঠে—সেই ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণ। হাজার হাজার নরনারী আজও মেলা দেখতে আসে এখানে—আসে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে। কেউ হেঁটে, কেউ গরুর গাড়িতে করে, কেউ নৌকা, কেউবা একালের বাসে চড়ে। সুসজ্জিত বিপণি শ্রেণী দর্শকদের নয়ন তৃপ্ত করে। সন্ধ্যায় আলো ঝলমল্ করে ওঠে মেলার প্রাঙ্গণ। চারিদিকে হাঁক-ডাক, বাঁশীর সুর, বাজনা-সঙ্গীতের সুরলহরী। দর্শকেরা সওদা করে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস—দেখে সার্কাস—ম্যাজিক—সঙ। দোকানে দোকানে খরিদ্দার। মেলার তাঁবুতে তাঁবুতে দর্শক। সকল বয়সের নরনারীর ভীড়। একালের মানুষও এমনি করে শিবনিবাসের সেই পুরাণো মেলাকে মনে রাখে। আশায় দিন গোনে পরের বছরের জন্য।

আজও কেউ যদি সেই শিবনিবাসের মেলায় আসতে চান—অনায়াসে আসতে পারেন। শহর কলকাতা থেকে শিবনিবাস বেশী দূর নয়। হয়ত বা ৬০।৭০ মাইল দূরে। শিয়ালদা থেকে সোজা বানপুর লাইনে মাজদিয়া ষ্টেশনে (প্রাচীন নাম শিবনিবাস ষ্টেশন) নেমে পড়ুন। ষ্টেশনে নেমে সামান্য কিছু হেঁটে এলেই সম্মুখে পাবেন মাথাভাঙ্গা নদী। খেয়া নৌকায় নদী পার হয়ে পিচঢালা পথ ধরে আরও কিছু এগিয়ে আসুন—চোখে পড়বে মন্দিরগুলি মুখরিত, অরণ্য-শোভিত ইতিহাসের সাক্ষী সেই শিব-নিবাসকে। এর পরেও আবার চূর্ণীর খেয়া পার হতে হবে। সোজা জলপথে ভাগীরথী—চূর্ণীপ্রবাহ অনুসরণ করেও শিবনিবাসে আসা যাবে। আবার কৃষ্ণনগর থেকে সোজা বাসে করে চলে আসুন কৃষ্ণগঞ্জের পথে। মন্দিরের চূড়া—দেবদারু—তাল—নারিকেলের শীর্ষগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত ইতিহাসের সে আভিজাত্য চোখে পড়বে না—মনে হবে এ কোন দূরের অতীতের স্মৃতি। রাজা-ওমরাহদের জয়ধ্বনি হয়ত শুনতে পাবেন না। তবু মেলা ও মন্দিরগুলোকে আর একবার চাক্ষুষ করলে—দু'শ বছরের আগের বাংলা দেশের এক ইতিহাস আপনার চোখের সামনে হয়ত বা ভেসে উঠবে। মনে পড়বে—এইত সেই নদীয়াধিপতির লীলাভূমি। এখানেই ত জন্মে-ছিলেন বঙ্গবাণীর সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নীল আন্দোলনের বিখ্যাত নায়ক বৃন্দাবন সরকার চৌধুরী। শিবনিবাসের সংলগ্ন গ্রাম কৃষ্ণপুরে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অভিজাত সামন্ত কানাচাঁদ দত্ত ও প্রেমচাঁদ দত্ত একদিন বীর্যবত্ত ও রাজনিকতায় এই সুবৃহৎ জনপদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আবার পাশের গ্রামেই জন্মেছিলেন বঙ্গ-বরেণ্য শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ। এই অঞ্চলই ছিল বিদ্রোহী বিশ্বনাথের (বিশে ডাকাত) লীলাভূমি। নীল আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নায়ক বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাসের চৌগাছাও ছিল এখানে। এমন আরও কত কথা মনে পড়বে। এবারেও চৈত্রী একাদশীতে শিবনিবাসের সেই মেলা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আজ আঠারো বছর ধ'রে স্বাধীনতার উৎসব হয়ে আসছে। এবারও হয়ে গেল। উৎসব বলা ভুল হবে—তবে একটা কিছু হ'ল। আর সমারোহ? ওটা ছেলে-ছোকরাদেরই করা সাজে, আমরা বুড়ো মানুষ দূরে থেকে উপভোগ ক'রেই খুশি। দূরে থেকে বললাম, কারণ—আমার সাধ্য কি! ছোকরারা কি যে কখন করে পূর্বাহ্নে জানবার উপায় নেই। আর কেন যে করে তারও অর্থ বোঝা যায় না।

আগে আগে দেখা যেত, এই ছেলেরাই এক-একটা বড় কাজ অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছে—চিরদিন দেশের তরুণরাই এগিয়ে গিয়েছে দুঃসাধ্য কাজের ভার নিয়ে। আজ কোথায় সে বাংলার তরুণ দল, যাদের কাছ থেকে দেশ সব চাইতে বেশি আশা করেছিল, মনে করা গিয়েছিল যারা একদিন নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলবে তাদের দেশ, সবচেয়ে দুঃখের কথা আজ তাদের দেখা মিললো না!

উৎসবে তা হ'লে হ'ল কি? আপন আপন বাড়ীর ছাদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন—তাল ক'রে ওড়ে না, আকারে ছোট ব'লে, রং দেখেও চিনবার উপায় নেই, কারণ কোন রংটাই জীবিত নয়—ঝুলছে যা রান্না-ঘরের ন্যাতা যেন! তা হোক, তবু ত ওড়ানো হ'ল! খুড়োকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্বাধীনতা মানে কি খুড়ো? খুড়ো বললে, বোধ হয় কিছুই না বাবা। নিয়মকে ভেঙে-চুরে একটা অনিয়ম সৃষ্টি করাই বোধ হয় স্বাধীন নাগরিকের ধর্ম।

কথাটা মনঃপূত হ'ল না। কিন্তু একটু পরেই আমার ভুল বুঝতে পারলাম। উৎসব দেখে ফিরছিলাম, একটা বাড়ীর জানলা থেকে হঠাৎ খানিকটা পানের পিক আমার জামার ওপর এসে পড়ল।

ওপরের দিকে চাইলাম, কিছুই দেখা গেল না। যারা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, তারা মুখ টিপে হেসে চ'লে গেল। খুড়োর কথাই ঠিক। নিশ্চিন্ত আরামে পথ চলে কার সাধ্য!

পথ নয় খেলার মাঠ!

বড় রাস্তা থেকে ছোট গলি পর্যন্ত সেই একই উপদ্রব। ছোট ছোট বল নিয়ে খুদো-খুদো ছেলেরা ম্যাচ খেলছে। কর্দমাক্ত বল পিঠের ওপর সজোরে পড়লেও কিছু বলবার উপায় নেই। অমনি দশ কথা শুনিয়ে দেবে।

বয়সে দু'-বছর বড় হয়ে এসেছ তার জন্তে দু'-বছর আগে মরবে, কিন্তু তাই ব'লে উপদেশ দেবার তুমি কে? ওরা বলে, সেকালে নীতি-শাস্ত্র যাদের জন্তে তৈরী হয়েছিল, তারা আজকের পৃথিবীতে কেউ বেঁচে নেই।

খুড়ো বললে, তুমি জানো না বাবাজি, আমি একদিন মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছি। বলে, 'ওল্ড ফুল', তোমার চলবার জন্তে এ-রাস্তা নয়।

একটা ভিখিরী সেও আজকে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষে চায়! বলে, দিতে পারব না বললেই ত হয়, তার আবার অত কথা কেন!

খুড়ো বললে, দু'শো বছর ধ'রে এরা বুটের তলায় পড়ে থেকে, আজ এতদিন পরে পেয়েছে মুক্তি, মুক্তি ত ওদের অর্জন ক'রে নিতে হয় নি, দুঃখের মধ্যে দিয়ে যদি তা আসত, তা হ'লে থাকত দেশের প্রতি দরদ, সেই দেশের মাটির প্রতি বেদনা, মানুষের প্রতি করুণা। এখন ওরা দেশের চাইতে নিজেকে জানে—সবকিছুই 'আমি'। আমাকে নিয়েই জগৎ—আমার তুষ্টিতেই জগৎ তুষ্ট।

মুস্কিল হয়েছে সেই 'আমি'তেই আজ দেশ ছেয়ে গেল!

রাশিয়া—তাদের আর যে-দোষই থাক্, তারা কি ক'রে জাত তৈরী করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছে। মাত্র পনেরটি বছরে তারা দেশের রূপ বদ্‌লে দিয়েছে! ইস্কুলের ছেলেরা? দেশ-গঠনে ঐ ইস্কুলের ছেলেদেরও অংশ আছে। রাশিয়ার পল্লী-অঞ্চল ছিল, আমাদের দেশের মতই নোংরা। ছেলেদের মধ্যে আবর্জনা সাফাই প্রতিযোগিতা হ'ল—কে ক'টা ক'রে দৈনিক আবর্জনা সাফ করতে পারে? কেউ বলে নি তাদের। নিজের খেয়ালে তারা বেছে নিলে তাদের কাজ। পাঁচ বছরে সমগ্র রাশিয়া ঐ ছেলেদের হাতেই আবর্জনামুক্ত হয়ে গেল!

এটা একটা দৃষ্টান্ত। তারা রাস্তায় ফল খেলে পথিকের দুঃখের কারণ হয় না। তারা জানে দেশের মাটিতে প্রত্যেকেরই অংশ আছে, যে যতটুকু ক'রে যাবে, উত্তর-পুরুষে তার ফল পাবে।

আমরা চায়ের দোকানে ব'সে সারা পৃথিবীর সমালোচনা করি। নিজের ত্রুটি দেখতে জানি না, অপরে কে কি করলে, না করলে সেই নিয়ে মাথা ঘামাই!

অন্যমনে পথ চলছিলাম। একটা বুড়ো মানুষকে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে প'ড়ে যেতে দেখে থম্‌কে দাঁড়ালাম। দেখলাম, কলার খোসা! কলা খেয়ে খোসা ফেলবার সময় আমরা ক'জন ভাবি যে এতে কত বিপদ হ'তে পারে! এখানেও সেই 'আমি'। আমার প্রয়োজন ফুরলেই—ব্যস্।

ইংরেজ চ'লে গিয়েছে—কলা খেয়েই চ'লে গিয়েছে, কিন্তু ফেলে গিয়েছে চলার পথে কলার খোসা! আমরা বারবার ক'রে পড়ছি, কিন্তু পথের খোসা পথেই পড়ছে!

নইলে দেশের এই হাল হয়! আমরা জানি দেশের চাল কে সরাচ্ছে, কোন্ পথ দিয়ে কেরোসিন উড়ে গেল! কিন্তু কারু কিছু করবার ক্ষমতা নেই। কারণ একের টিকি অন্যের টিকিতে বাঁধা। সে গিঁট খুলবার ক্ষমতা সরকারেরও নেই।

গোপাল ভাঁড়ের একটা গল্প আছে: একটা আলুর গুদামে আগুন লেগেছে। রাজ্যের লোক এসে মনের আনন্দে সেই পোড়া আলু ভক্ষণ করছে আর বলছে, আবার কবে পুড়বে?

সেই অবস্থা দেখলাম শ্যামবাজারে। একটা বাস পুড়ছে—হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।—কার বাস কে পোড়ায়!

মানুষ এত নীচে নামল কি ক'রে?

খুড়ো বললেন, লোভ যখন বাড়ে তখন মানুষের কোনো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। লোভই মানুষকে আজ নীচে নামিয়েছে। একটা বই-এ পড়েছিলাম, লোভ হ'ল একরকমের পোকা। যত দাও, তার ক্ষুধা বেড়ে যাবে। সর্বস্ব খেয়েও তার তৃপ্তিবৃত্তি নেই। মানুষ তখন আপন সত্তা হারিয়ে ফেলে। তার শিক্ষা, তার স্বাভাবিক বুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পায়—সে তখন পোকার নির্দেশ মতো কাজ করে। পোকাই তখন তাকে চালায়, পোকাই বুদ্ধি দেয়—পোকার অনুভূতিতেই তার চৈতন্য।

খুড়ো বললেন, মানুষ নিজে অ-মানুষ হয় না, তাকে অ-মানুষ করে এইসব বিভিন্ন জাতীয় পোকায়। মাতালকে চালায় এই কীটে। সারাদিন বেশ আছে—সন্ধ্যা হ'লেই, পোকাগুলো আপনা থেকেই তার মাথার ওপর কাজ করতে থাকে। সে উন্মত্তের মতো ছুটবেই মদের সন্ধানে। খুন ক'রে ক'রে মানুষের খুনের নেশা চেপে যায়। এও সেই পোকার কাজ। রক্তের তৃষ্ণা—সেই তৃষ্ণাতে, তার আবার মানুষকেও উন্মাদ ক'রে তোলে। কারণ মানুষের তখন নিজস্ব কোনো সত্তা নেই।

কাম ক্রোধ প্রভৃতি যেগুলোকে আমরা রিপু বলি, তাকে পোকা বললেই আরও সহজ হয়। নইলে সকল মানুষের সমান রিপু-বেগ হয় না কেন? সংযমের দ্বারা আয়ত্তীকরণের যেখানে কোনো প্রশ্ন নেই, অতি ছোট-বেলা থেকেই এই অ-সম বণ্টন লক্ষ্য করা যায়। এসবগুলোকে অনেকে স্বভাবজ বলে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছেন। তবে এইসব পোকাকেও আয়ত্তে আনা যায়। একটা কথা আছে—'বাঁদরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে।' এইখানেই দরকার মানুষের সংযম। নইলে একই মানুষ বিচরণ করছি আমরা পৃথিবীর সর্বত্র।

বসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আভরণ খুলে ফেলে 'বুগেনভিলিয়া',
কাঞ্চনের কণ্ঠে শুনি যাই যাই স্বর!
পুষ্পিতা শাল্মলী ওঠে সরমে রাঙিয়া,
এসেছে বসন্ত প্রাণ-বল্লভ সুন্দর!

উতলা বাতাসে জীর্ণ পত্র ঝ'রে যায়!
অরণ্য শ্যামল নব-পল্লব-নিশানে!
আমি হেরিতেছি ব'সে মৃত্যুর ছায়ায়:
পুরানোর চিতাভস্ম অঙ্কুরিছে প্রাণে!

ছুটির বাঁশরি শুনি। এই অনিত্যের
দুঃখে-সুখে তরঙ্গিত সাগর-বেলায়
খেলিলাম কত খেলা! বসন্ত-শীতের
খেলাশেষে বলে যাই গোধূলি-বেলায়:

মিথ্যা নয় এ জগৎ, এ পরিবর্তন!
পিছনে আনন্দ-ঘন এক চিরন্তন!

শুধু নিমেষিকা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

সোনা নয়, রূপা নয়, ঐশ্বর্য্য সম্পদ
ধনধান্য গৃহজন খ্যাতি মানপদ
কিছু নয়। কিছু নাই।
ছোট বড় কুচি
এ শুধু কাগজ। শুধু লিখি আর মুছি,
সাগরে বুদ্‌বুদ সম ঢেউ ভেঙে উঠি'
হৃদয় বেলায় যারা করে লুটোপুটি,
যার মাঝে মন ফিরে কথা খুঁজি খুঁজি'
তার ভূর্জপত্রে কিছু লিখে নিতে বুঝি!
কোথা হায় সেই পত্র কোথা বা সে কালি!
যে কালির রং জানি সোনালি রূপালি!
ক্ষুদ্র খণ্ড কাগজের মহাকাশে মোর
ফুটাবে তপন চাঁদ তারার অক্ষর।
যদি কোনো কিছু ফুটে ওঠে লিখা,
জীবনের সত্য মিথ্যা আর মরীচিকা!

* * *

হায় এ যে ইন্দ্রধনু চাঁদ তারা নয়
মিলায় ক্ষণিক রং-লীলা পরিচয়!
সেই রং-এ ডুবালাম আমার রঞ্জিকা
মুছে মুছে আঁকা এরা মোর নিমেষিকা।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আশা-প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে কেরোসিন-প্রদীপও নিভিল ? নিষ্প্রদীপের পালা ?

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই কেরোসিন তেল উবিয়া গিয়াছে ! শ্রীকবীরের বিদায়ের পরই এমন কেন ঘটিল বলিতে পারি না। শ্রীকবীর মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে—অর্থাৎ তিনি যখন তৈল-খাদ্য মন্ত্রী ছিলেন—বহুবার ঘোষণা করেন যে দেশে কেরোসিনের কোন অভাব নাই—এবং কেরোসিন অভাবে কাহারও কোন কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না ! আজ বাস্তবে কিন্তু দেখা যাইতেছে উল্টা ! কলিকাতা শহরে কেরোসিন তেলের দোকানে প্রত্যহ সকাল-বিকাল হাজার হাজার লোকের কিউ লাগিয়া যায়—কিন্তু শতকরা ৫০জনও বারো আনা বোতল দরেও তেল পায় কি না সন্দেহ ! এক বোতল তেলের জন্ত মানুষ হাহাকার করিতেছে—কিন্তু তৈল-মালিকদের এ বিষয় কোন মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। বেসরকারী হাতে যখন কেরোসিনের ব্যবসা এবং বণ্টন-ভার ছিল, সেই সময় মানুষ সামান্ত কেরোসিনের জন্ত এমন যন্ত্রণা ভোগ করে নাই। সত্যই সরকারী ব্যবস্থায় আমরা চমৎকৃত না হইয়া পারি না—সরকার যে বস্তুর উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবেন, সেই বস্তুই কি বাজার হইতে অদৃশ্য হইবে ? সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিকরণেরও বাহাদুরী আছে স্বীকার করিতে হইবে। কালোবাজারের দরকে লজ্জা দিয়া সরকার বাহাদুর চাল, ডাল, তেল, প্রভৃতি সকল সামগ্রীর মূল্য যেভাবে ক্রমশ ঊর্দ্ধমুখী করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন—তাহাতে আর কিছুকাল পরে মানুষের পক্ষে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করার প্রয়োজন হইবে না—কারণ সবই যাইবে তাহার সীমিত ক্রয় ক্ষমতার বহু ঊর্দ্ধে !

পশ্চিমবঙ্গের কাঁথি এবং অন্তান্ত বহু মহকুমায় কেরোসিনের অভাবে পূর্ণ নিষ্প্রদীপ চলিতেছে গত কিছুকাল ধরিয়া—খোলাবাজারে কেরোসিন নিয়ন, কিন্তু টিনপ্রতি ২০।২৫ টাকা যে দিতে পারে, কালো-বাজার হইতে কেরোসিন প্রাপ্তির পথে তাহার কোন বাধা নাই ! এ সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও—সরকারী কর্তারা পরম উদাসীন কেন ? কাছাকাছি বাগনান প্রভৃতি নানা স্থানের অবস্থা একই প্রকার। বারাসাত, বনগাঁ, বসিরহাট এবং অন্তান্ত অঞ্চলের অবস্থাও সমপ্রকার। মোমবাতি এবং সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালাইয়া কয়জন কতদিন চালাইতে পারিবে ? কেরোসিন যে নাই এমন নহে—কিন্তু ঐ তেল পাইতে হইলে—সরকার-ঘোষিত মূল্যে কুলাইবে না। দিতে হইবে সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা অন্তত তিন-চারি গুণ বেশী !

বহু গৃহস্থ গৃহে উনানের পাট নাই—কেরোসিন ষ্টোভেই রান্নাবান্নার কাজ হইয়া থাকে। কলিকাতার অনেক বাড়ীওয়ালা তাঁদের ভাড়াটিয়াদের কয়লার উনান জ্বালিতে দেন না। কেরোসিনের অভাবে এই শ্রেণীর ভাড়াটিয়াদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছে কিন্তু যাঁহাদের কাছে মানুষ দুঃখ জানাইবে সেই সব মহাশয় ব্যক্তিদের হৃদয়পটে দুঃখীর বেদনার ছাপ পড়ে না। অতএব গরীবরা পড়িয়া পড়িয়া মার খাইতে বাধ্য—কিন্তু এই ভাবে কতদিন চলিবে।

কর্তামহল হয়ত জানেন না যে কেরোসিনের অভাবেও আগুন লাগিতে পারে এবং সে-আগুন শাসক মহলের প্রশাসনিক দমকলেও দমন করিতে অক্ষম হইবে ! ঘটিয়াছেও তাহাই। বর্তমান কেরোসিন সঙ্কটের জন্ত বিদেশী তেল কোম্পানীগুলিকে দায়ী করা হইতেছে। কারসাজি যদি ইহাদেরই হয়, তবে তাহা দমন করা কি সরকারের ক্ষমতার বাহিরে ? দেশী ব্যবসায়ীদের দমন সরকার ত বহু ভাবেই এবং অনায়াসেই করেন।

কেরোসিন রহিয়াছে—এবং বাজারে এই কেরোসিন আবার দেখাও দিবে কিন্তু হঠাৎ জনসাধারণকে

কেরোসিন বঞ্চিত করিয়া এমন পীড়ন করার জন্য দায়ী যাহারা, তাহাদের শাস্তিবিধান কি হইবে এবং কে করিবে? পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কেরোসিনের অভাবে—অন্ততঃ বহু কিছুর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনাও বন্ধ, অথচ সামনেই রহিয়াছে বিবিধ বাৎসরিক পরীক্ষার পালা। এই কেরোসিন তেলের অভাবেই হয়ত, হয়ত কেন—নিশ্চয়ই, এবার কেসের হারও দেখা যাইবে পর্বত-প্রমাণ!

দেশে এমনিতে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই—অন্ন এবং অন্যান্য অভাবের কারণে কম ঘটিতেছে না, এবার অন্ধকারের রাজত্বে এই সকল ক্রিয়াকর্মও যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ আছে কি?

কর্তারা বোধ হয় জানেন না—অন্ধকারের আর এক নাম মৌচুত্তলা—অর্থাৎ অজ্ঞানতা, অন্ধতা এবং সর্বপ্রকার শয়তানীর জন্মস্থল। এবং এই অন্ধকার হইতেই উৎসারিত পাপ এবং সামাজিক ব্যভিচার চতুর্দিকে প্রবাহিত হয় সমগ্র সমাজ জীবনকে প্লাবিত এবং ধ্বংস করিতে

ক্ষমতার আসীন হইবার জন্য যাঁহারা, যে-সকল দেশভক্ত এবং পরমার্থগতপ্রাণ মহাশয় মাতৃভূমিকে কাটিয়া দুই টুকরা করিতেও দ্বিধা করেন নাই, তাঁহারাই আজ খণ্ডিত ভারত শাসন করিতেছেন—অতি বিচিত্র-রূপে। স্বাধীন দেশে আজ মানুষ কি স্বর্গসুখ লাভ করিয়াছে? সামান্য প্রাণ রক্ষার জন্য আজ দিকে দিকে, হাটে-বাজারে কেবল সীমাহীন লাইন আর লাইন—তেলের লাইন, দুধের লাইন, চালের লাইন, কেরোসিনের লাইন, মাছের লাইন, বেবি-ফুডের লাইন, রেলে টিকিট কাটার লাইন (সিনেমা আর ফুটবল ম্যাচের লাইনের কথা না বলাই ভাল)—(সর্বশেষে মুপ-লাইন?)—স্বাধীন ভারতের বিশিষ্ট অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ আজ এক বিরাট এবং সীমাহীন লাইনে পরিণত হইয়াছে!

কর্তাদের নিকট 'লাইন' বস্তুটা হয়ত কিছুই নহে, কিন্তু এমন দিন অবশ্যই আসবে যখন তাঁহাদের এই লাইনে পড়িতে হইবে—এবং সেই দিন তাঁহারা লাইন-মাহাত্ম্য দেহ-মন দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন!

দয়ার নাহিক শেষ!

প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীনা কলিকাতা মহানগরীর আজকার অপূর্ব স্বর্গীয় শ্রী—নগরবাসীরা প্রত্যহ পরম পুলকভরে অবলোকন করিয়া বিমুগ্ধ হইতেছেন! কলিকাতার সরকারী বাসে ৪৬ জনের বসিবার স্থানে অন্ততঃ ১০০ জন মানুষ বোঝাই হইয়া পরমানন্দে ভ্রমণ করে, বাসের ভারী চাকার তলে প্রত্যহই দু-একজন যাত্রী র‍্যাশনের ভার লাঘব করিতে আত্মদান করে, এই শহরে বিবিধ সংক্রামক ব্যাধিতে প্রতি বছর ৩০।৪০ হাজার জন অকালে জবলীলা সংবরণ করে, হাজার হাজার মানুষ বাস করে খোলা আকাশের নিচে ফুটপাথে, কয়েক লক্ষ মানুষ বসবাস করে 'বস্তি' নামক স্বর্গীয় 'স্বর্গে'। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ র‍্যাশনের লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্র-বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকে হাতে র‍্যাশনের থলি, ট্যাঁকে পয়সা লইয়াও ভিখারীর মত। শহরের ফুটপাথগুলিকে মৃত্যু ধরিবার বিচিত্র ফাঁদ বলিলে কম বলা হয়, রাস্তাগুলিও কঙ্কালসার, তাহার উপর ট্রাম লাইনে ট্রাম চলে ক্যাকলি নৃত্যের বিচিত্র তালে যাত্রীদের দেহ-যন্ত্রের নাট-বল্টুগুলিকে খলখলে করিয়া দিতে দিতে! কলিকাতার অন্তবিধ নানা প্রকার পরম আনন্দময় বিধি-ব্যবস্থার কথা বলিবার প্রয়োজন নাই! এই সেই কলিকাতা শহর যাহাকে স্বর্গত নেহরু পরম স্নেহভরে বলেন 'সিটি অব নাইটমেয়ার, কুশ্রী' বিদেশীরা বলেন নোংরা! অন্য প্রদেশবাসীরা বলেন 'রদ্দী'! ট্রাম-বাস বন্ধ করিয়া প্রায় প্রত্যহ বেলা ৪—৬টা-সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত মিছিলের হৈ-হল্লার কথা বলিয়া লাভ কি? কলিকাতা-বাসী করদাতাদের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের সার্থক অবসান করিয়া এবং তাহাদের কিঞ্চিত একটা আনন্দ-বিধানের জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি সংরক্ষিত পল্লীনিবাস নির্মাণ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে উচ্চ মহলে, যাঁহারা পুরশ্রী বিবর্দ্ধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন! প্রস্তাব অতি উত্তম—এমন কি ১২ ইঞ্চি পাইপে ওয়াটার সাপ্লাই অপেক্ষাও অগ্রাধিকার পাইবার যোগ্য! আশা করা যায় কলিকাতা পৌরসভার মালিকদের এই উত্তম পরিকল্পনা লইয়া—তাঁহাদের মধ্যে স্বভাবগত অন্যত্য কলহবিবাদ ঘটিবে না!

পুরশ্রী বিবর্দ্ধনের পরিকল্পনার মধ্যে আমরা অন্ত দু-একটি সাইড প্রকল্প জুড়িয়া দিবার প্রস্তাব দিতেছি।

প্রথম, নিমতলা, কাশীমিত্র এবং ক্যাওড়াতলা শ্মশান প্রাঙ্গণগুলিতে একটি করিয়া রমণীয় গোলপার্ক, তাহার মধ্যস্থলে একটি ছোট সিনেমা এবং একটি ভদ্র 'পাব্' নির্মাণ করিতে।

দ্বিতীয়, শ্মশানের এক কোণে মাইক এবং লাউড স্পীকারের পাকা ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। এখান হইতে মৃতের আত্মাকে আনন্দ দিবার জন্য ২৪ ঘণ্টা কেবল হিন্দী ফিল্মী গানের প্রচার চলিতে থাকিবে।

তৃতীয়, শ্মশানের নিকটে গিয়া 'চিতা' engaged কিংবা vacant আছে কি না জানিতে শববাহকদের অসুবিধা যাহাতে না হয়, তাহার জন্ত গেটের উপর লাল এবং সবুজ জোরাল সিগ্‌ন্যাল আলোর ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। চিতা engaged থাকিলে শববাহীরা অবসর সময়টুকু পাশের 'পাবে' কিংবা সিনেমাতে ব্যয় করিতে পারিবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত যদি কলিকাতার নিমতলা, কাশীমিত্র এবং ক্যাওড়াতলা শ্মশানঘাটে করা যায় তাহা হইলে এই শহরে শববাহক স্বেচ্ছাসেবকের কোন অভাবই হইবে না বলিয়া মনে হয়। গভীর অন্ধকারময় এবং দুর্য্যোগের মধ্যেও দলে দলে শববাহক ভীড় করিয়া আসিবে।

কলিকাতায় মানুষের জীবন বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। কাজেই যে-মানুষ এই শহর-নামক নরক হইতে পলায়ন করিতে পারিবে ক্লান্ত-পীড়িত প্রাণপক্ষীকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহার দেহকে উপলক্ষ করিয়া একটু আনন্দের আয়োজন রাখিতে দোষ কি?

অসহ্য বেয়াদবী—!

আমাদের নবীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরেই দিল্লী বেতার হইতে জাতির উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণ তিনি রাজভাষা হিন্দীতে না দিয়া ভ্রম ক্রমে হিন্দীতে দিয়াছিলেন—ইহা রাজভাষী হিন্দী কেরিওয়ালের চিত্ত দাহনের মশলা যোগাইয়াছে। উগ্র হিন্দী-প্রেমিকদের মতে প্রধানমন্ত্রী (এবং অন্যান্য সকল মন্ত্রী) ভাষণাদি যাহা দিবেন তাহা অবশ্যই হিন্দীতেই দিতে হইবে—এমন কি ভারতের ৩৫ কোটি অহিন্দী ভাষীদের পক্ষে হিন্দী অবোধ্য হইলেও—দিল্লীর বেতারে হিন্দী ছাড়া আর সব ভাষাই অবশ্য পরিত্যাজ্য, কারণ ভারতের অন্ত ভাষাগুলি কেবলমাত্র আঞ্চলিক সামান্ত প্রয়োজন মিটাইবার কারণে ব্যবহৃত হইতে পারে। রাজ্য-সীমার বাহিরে আঞ্চলিক ভাষাগুলি একান্ত 'হরিজন'। প্রধানমন্ত্রীর ইংরেজী ভাষণ হিন্দীওয়ালাদের বিচারে বিষম অপরাধের কারণ হইয়াছে—এবং এই অবিবেচনা-প্রসূত কার্য্যের জন্ত একদল হিন্দীপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ-সীট দিয়াছেন! গত কয়েক মাস হিন্দী-ওয়ালাদের প্রচণ্ড বিক্রম কিছু স্তিমিত ছিল। কিন্তু এখন আবার দেশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত-নিরাপদ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা আবহাওয়া দূষিত করিবার আয়োজন করিয়াছে। এই শ্রেণীর হিন্দীওয়ালাদের বিচারে—দেশের সমস্ত সমস্যা মিটিয়া গিয়াছে—বাকি কেবল হিন্দীকে রাজতক্তে বসানো—এবং ইহা একবার করিতে পারিলেই ভারত (স্বাধীন হইতে) রামরাজ্যে পরিণত হইবে। কিন্তু এই হিন্দী-উগ্রপন্থীরা জানে না যে—তিনটি রাজ্য ছাড়া ভারতের অন্ত রাজ্যের লোকেরা হিন্দীর neocolonism মানিয়া লইতে একান্ত গররাজী এবং প্রয়োজন হইলে রামরাজ্যওয়ালাদের সহিত এই রাবণপন্থীরা 'সংগ্রাম'ও করিতে প্রস্তুত।

কংগ্রেসের গত জয়পুর অধিবেশনেও হিন্দীভাষী (অ-)সভ্যরা 'হিন্দী চাই, হিন্দী চাই' চিৎকার করিয়া যে-প্রকার বিষম হট্টগোলের সমারোহ করেন তাহাতে অহিন্দীভাষীদের আবার সতর্ক হইবার ইঙ্গিত প্রকট হইয়াছে। কয়েকজন সদস্য এমন কথাও বলেন যে, যেহেতু জয়পুরে (রাজস্থান) কংগ্রেস অধিবেশন হইতেছে, সেই হেতু সকলকেই বক্তৃতাদি হিন্দীতে দিতে হইবে! কিন্তু এই সব হিন্দীওয়ালারা ভবিষ্যতে যে-প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, সেই-বিশেষ প্রদেশের ভাষা—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বাংলা, ওড়িষাতে ওড়িয়া, আসামে অসমিয়া দাক্ষিণাত্যে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম প্রভৃতি ভাষার দাবি স্বীকার করিতে রাজি আছেন কি? ভাষা লইয়া অযথা কলহ-বিবাদ আমরা চাহি না, এবং কাহারো উপর জোর করিয়া অন্ত ভাষা চাপাইতে চেষ্টা হউক ইহাও পছন্দ করি না। কিন্তু হিন্দীওয়ালারা যদি পুনরায় হিন্দিকে (সর্ব্ব ভারতীয় রাজভাষা বলিয়া সরকারী ঘোষণার জন্ত দাবি উত্থাপন করেন, সেই ক্ষেত্রে অহিন্দীভাষীদেরও আবার হিন্দীর অন্যায় দাবি এবং জবরদস্তি ঠেকাইবার জন্ত সর্ব্বশক্তি অবশ্যই নিয়োগ করিতে হইবে। হিন্দীওয়ালারা যদি মনে করিয়া থাকেন—তাঁহাদের গায়ের জোর বেশী এবং সেই জোরেই তাঁহারা হিন্দীকে সিংহাসনে বসাইবেন, তাহা হইলে আমরা এই কথাই বলিব যে গায়ের জোরের পরীক্ষাতে হিন্দীওয়ালারা শেষ পর্য্যন্ত পরাস্ত হইবেন এবং ভাষার যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদের অবস্থা হইবে পাকিস্তানী প্যাটন ট্যাঙ্কের মত! বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান রাজ্যবাসীরা বোধ হয় নিজেদের ভারত-ভাগ্যবিধাতা বলিয়া জ্ঞান করেন এবং মনে করেন, তাঁহাদের খেয়ালখুশী মত ভারতের শাসন-কার্য্য চলিবে। বাস্তবে ইহা সার্থক করিবার প্রয়াসে

একমাত্র ফল হইবে—ভারতকে অচিরে ভিন্নট খণ্ড-রাজ্যে ভাগ করা। হিন্দী-রূপী বিষাক্ত সাপটিকে যদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট না করা যায়, তাহা হইলে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ম্যানেজিং এজেন্টস্ 'কামরাজাতুল্য' অ্যাণ্ড কোং হাজার চেষ্টাতেও ভারতের একান্ত কাম্য এবং ঈপ্সিত ঐক্য এবং শান্তি রক্ষা করিতে পারিবেন না। শেষ পর্য্যন্ত ভারত কি একেবারে নির্ভেজাল 'হাড্ডু' হইয়া যাইবে?

আধপেটা পশ্চিমবঙ্গবাসী?

ষ্টেট ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরোর কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত সমীক্ষা রিপোর্টে এই রাজ্যের রেশনিং প্রবর্তিত হইবার আগের শহরাঞ্চল এবং গড়ে দৈনিক মাথাপিছু তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের এই পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে: শহরাঞ্চল—৭.১১ ছটাক (১৪.৬ আউন্স অথবা ৪১৫ গ্রাম); গ্রামাঞ্চল—৮.৪১ ছটাক (১৭.৫ আঃ অথবা ৪৯৫ গ্রাম); গড়—৮.১৫ ছটাক (১৬.৮ আঃ অথবা ৪৭৫ গ্রাম) কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল—৭ ছটাক (১৪.৫ আঃ অথবা ৪১০ গ্রাম); মোট শহরাঞ্চল ৭.৩ ছটাক (১৫ আঃ অথবা ৪২৬ গ্রাম)।

সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হইয়াছে, এই রাজ্যের শহরাঞ্চলের মানুষ যা খায় তার শতকরা ৭০ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৮১ ভাগ চাল।

এখন রেশনে শহরাঞ্চলের মানুষ প্রতিদিন চাল-গম মিলিয়ে মাথাপিছু ২৭১.৪ গ্রাম অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় ৩৪৩.৬ গ্রাম কম খাদ্যশস্য পাইতেছেন!

অর্থাৎ বাঙলার মানুষ আজ আধপেটা বা তাহারও কম খাইয়া বিচরণ করিতেছে এই স্বাধীন ভারতের স্বর্গ-ভূমিতে। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম কি? 'জয় জোয়ান' চিৎকার করিয়া যাঁহারা—যাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করেন, ভবিষ্যতে সেই 'জোয়ান' কোথা হইতে আসিবে? একদিন যাহারা দেশের কারণে যুদ্ধে যাইবে, সেই ভবিষ্যৎ জোয়ানদের বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় যুদ্ধে পরিণত করা হইতেছে না কি?

শাসকবর্গ হয়ত বলিবেন—খাদ্য নাই আমরা কি করিব? কোথা হইতে দিব? দেবতা বিরূপ—বৃষ্টিতে হয় নাই—সুতরাং—?—সুতরাং—? কিন্তু এ কথা কেবল সাধারণ মানুষের তুষ্টির জন্য এবং ইহাতে মানুষের পেট ভরিবে কি না বলিতে পারি না।

এসব কিছু সত্ত্বেও:

"কিন্তু আসবে। ধনীর বাড়ীতে আসবে, মানীর (রাষ্ট্রীয় সম্মানে) বাড়ীতে আসবে; জোতদারদের বাড়ীতে আসবে, গ্রাম অধ্যক্ষ, অঞ্চল প্রধান, জেলা পরিষদ প্রধানদের বাড়ীতে কোনদিনই অন্নের অভাব হবে না, রাজ কর্মচারীদেরও অভাব হবে না; যারা দুর্দ্ধর্ষ, যারা অসৎ-চতুর তাদেরও বোধ হয় অভাব হবে না, বিরোধীপক্ষের দলনেতাদেরও অভাব হবে না, অভাব হবে দুর্ব্বলের, অভাব হবে নিরীহের, অভাব হবে সৎ মানুষের। যারা দলে নেই, যাদের বল নেই, যাদের চতুরতা নেই, যারা বোবা, যারা ম্লান মুখ করে আকাশের দিকে চেয়ে এক অবাঙ্মনসোগোচর ভগবানের ভরসায় থাকে; এবং মরবার সময় যারা নিজের অদৃষ্টের নিন্দা করেই সব দুঃখ উজাড় করে দিয়ে যায়, তাদের অভাব হবে। তারাই চিরকাল ধরে এমন মহানিশার পূজার বলিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে।"

কিন্তু মরা মানুষেরও বোধ হয় অত্যাচার অনাচার সহিবার একটা সীমা আছে। আজ তাহারই ইঙ্গিত বাঙলার গ্রামে গ্রামে জন-বিক্ষোভ রূপে দেখা যাইতেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছিলাম—অস্পষ্ট যাহা ছিল, তাহা আজ অতি স্পষ্ট প্রকট হইয়াছে।

বহুকাল পূর্ব্বে এক ফরাসী দার্শনিক বলিয়াছিলেন—'Hunger Causes Anger' অর্থাৎ 'ক্ষুধাই মানুষের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে'—। এবং এই ক্ষুধা-জনিত 'অ্যাঙ্গারই' সব কিছু 'অঙ্গার' করিয়া দেয়। আজ ইহারই সাক্ষ্য এ রাজ্যের দিকে দিকে অতি ভয়াবহরূপে দৃষ্ট হইতেছে।

সেই পুনরাবৃত্তি—?

ইংরেজ আমল গিয়াছে—কিন্তু ইংরেজী আমলের ধারা—বিশেষ করিয়া পুলিসি-শাসন দেশীয় কর্তারা আজ আরও বেশী করিয়া চালু করিতে লজ্জাবোধ করেন না। ইংরেজ আমলে পুলিসের গুলীতে মানুষ, বিশেষ করিয়া কোন ছাত্র নিহত হইলে যে-সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরপুরুষ ইংরেজ শাসকদের চিৎকার করিয়া রসাতলে প্রেরণ করিতেন, আজ তাঁহারাই ক্ষুধার্ত, অভাব-পীড়িত মানুষকে (এমন কি ছাত্রদেরও) পুলিসের গুলীতে পরলোকে প্রেরণ করাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছেন না! চালের দাবি ইঁহারা বন্দুকের গুলী দিয়া মিটাইতে বৃথা প্রয়াস করিতেছেন! ক্ষুধার্ত মানুষের বিক্ষোভ শেষ পর্য্যন্ত দেশকে কোথায় লইয়া যায়—ইতিহাসের পাতায় তাহা জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে! কিন্তু এ-সব বাক্য কাহাদের কাছে

বলিতেছি? অদ্যকার শাসক যাঁহারা, তাঁহারা ইতিহাস পড়েন নাই অনেকেই, সে-প্রয়োজন এবং বিদ্যাও তাঁহাদের হয়ত নাই! ইঁহারা ভারতের নব-ইতিহাস রচনার প্রয়াস পাইতেছেন বালির উপর! ইঁহারা হয়ত জানেন না যে গবর্ণমেন্টের পতন-বদল হয়, পেশাদার-পলিটিশিয়ান ক্ষীণপ্রাণ কিন্তু দেশ তথা দেশের লোক বাঁচিয়া থাকে চিরকাল এবং তাহারা সকল হিসাব মিটাইয়া লয় এবং সেই যেদিন সেই দিনটি অতি ভয়ঙ্কর। কাহাদের পক্ষে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

বর্ত্তমানের শেঠ এবং শঠদের রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবে না। বাঙলা দেশে যাহারা বাঙালীকে না-খাওয়াইয়া এবং সর্ব্বভাবে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাণের পথে প্রেরণের পরিকল্পনায় প্রাণমন অর্পণ করিয়াছে—সাময়িক সার্থকতায় তাহারা উল্লসিত হইলেও—চির-উল্লাসী হইবার বহু বহু পূর্ব্বেই পরিসমাপ্তি লাভ করিবে—এ কথা মিথ্যা নহে!

আজিকার দুর্দ্দিনে এইমাত্র আমাদের সান্ত্বনা।

একদিকে ভিক্ষাপাত্র এবং অন্যদিকে—কি?

এই নিদারুণ খাদ্যাভাবের দিনে এ-দেশ যখন বিশ্বের সর্ব্বত্র ভিক্ষা-পাত্র হাতে ঘুরিতেছে—সেই সময় এই ভিক্ষুকের দেশের এক শ্রেণীর বিত্তবান এবং তাহাদের পদলেহীদের কার্য্যকলাপ কি, তাহা বিদেশের লোক শুনিলে লজ্জা পাইবে। দেশের শতকরা ৭০ জনই যখন হা অন্ন হা অন্ন বলিয়া চিৎকার করিতেছে, সেই পরম দুঃখের দিনেও কলিকাতায় ভারতীয় যক্ষ্মা-কর্ম্মীদের (চিকিৎসক) এক সমারোহপূর্ণ তিন দিনব্যাপী সম্মেলন হইয়া গেল। ইহাতে আপত্তি করিবার কোন হেতু নাই—যক্ষ্মা চিকিৎসার বিষয় বিবিধ চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং ঔষধাদি সম্পর্কে এরূপ সম্মেলনের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব কেহ অস্বীকার করিবে না।

কিন্তু সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের আদর-আপ্যায়নের জন্য যে প্রকার ব্যাঙ্কোয়েট, লাঞ্চ, এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার খানাপিনার আয়োজন দেখা গেল, তাহাতে ভদ্র এবং শিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতবাসী-মাত্রেই বিস্ময়ে হতবাক হইবেন। প্রায় ৫০০ জন চিকিৎসক প্রতিনিধির খানা-পিনার জন্য যে-বিরাট আয়োজন হয়, তাহাকে রাজকীয় বলিলেও কম বলা হয়। বিরিয়ানী, চপ, কাটলেট, রোষ্ট, তন্দুরী এবং সেই সঙ্গে বিবিধ প্রকার মিঠাই, পুডিং—কিছুরই কমতি ছিল না। এই আয়োজনের ব্যয়ভার বহন করে—এক একটি ঔষধের কোম্পানী—কিন্তু এইটাই বড় কথা নহে। পশ্চিমবঙ্গে অতিথি-নিয়ন্ত্রণ আইনকে বৃহৎ ব্যক্তিদের এই ভাবে অমান্য করার বিরুদ্ধে সরকার বাহাদুর নীরব রহিলেন কেন? দু-তিন জন রাজ্যমন্ত্রীও নাকি এই মহাভোজ-উৎসবে সাগ্রহে যোগদান এবং খাদ্যাদির সদ্ব্যবহার পরম উৎসাহেই করেন। অথচ এই সব মহাপ্রাণই লোককে কোমরের বেল্ট বাঁধিয়া খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে অহরহ উৎসাহ দিতেছেন! এই বিরাট খানা-পিনার উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইল, কিন্তু চিকিৎসক সম্মেলনে এমন একজনও ছিলেন না যিনি ইহার সামান্য মৌখিক প্রতিবাদও করেন। খুব সম্ভবত খাদ্যসম্ভার—অতি লোভনীয় ছিল এবং প্রতিনিধিদের জিহ্বার জলে প্রতিনিধিদের বাক্‌রুদ্ধ হইয়া যায়!

অসংখ্য যক্ষ্মারোগী যখন খাদ্যাভাবে অকাল মৃত্যু-বরণ করিতেছে সেই সময় যক্ষ্মাবান্ধবদের এই বিষম-বিরাট ভোজন উৎসব—অসহায় দরিদ্র রোগীদের অবশ্যই কিছু সান্ত্বনা দিবে!

দেশ-কল্যাণে বিরাট ত্যাগ!

পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যবিধাতারা যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদে মিলিত হইয়া আমাদের কল্যাণ কামনায় বছরের কয়েক মাস প্রাণপাত পরিশ্রম করেন—সেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিরাট দুইটি কক্ষের জন্য খরচের পরিমাণ জানেন কি? সংবাদপত্র বিশেষ প্রতিনিধি (আনন্দবাজার) বলেন:

"যদি না জানেন, তবে শুনুন সেই বর্ত্তমান খরচের হিসাব: ১৯৬৪-৬৫ সালে দুই সভার জন্য খরচ হয়েছিল ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, আগামী বছরের জন্য বরাদ্দ ৫৬ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা; এ বছর ব্যয় হচ্ছে ৩৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। দু' বছরে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ খরচ বৃদ্ধি!"

আরও শুনুন: "নানা ভাবে নানা খাতে রাজ্য সরকার টাকা খরচ করেন। তার অধিকাংশই আপনার আমার অজানা। যেমন ধরুন, এ-বাড়ী থেকে ও বাড়ি রাজ্যপালের মালপত্র আনা-নেওয়া বাবদ কুলি ও গাড়ি ভাড়া। বছরে এজন্য খরচ হয় ৪৬,০০০৲ টাকা। রাজ্যপালের এ-বাড়ি ও বাড়ি বলতে এখন অবশ্য আছে মাত্র দু'টি—একটি কলকাতার আর একটি দার্জিলিং-এর রাজভবন!—"

"একটি জিনিস আমি আপনি সবাই জানি, পাকিস্তানী হামলার সময় অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর কলকাতা বা আশেপাশে কোনও ট্রেঞ্চ

পৌঁছেন নি। কিন্তু তা বলে ভাববেন না, তাঁরা চুপ করে বসেছিলেন। ট্রেঞ্চ খুঁড়তে হতে পারে, এই কথা ভেবেই অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর ১০ লক্ষ টাকার বস্তা কোদাল কিনে রেখেছিলেন।"

এই প্রকার আরও বহু রকমের অবশ্য-প্রয়োজনীয় খরচ আছে—যেমন বড়, মেজ, ছোট কর্তাদের বিরাট বিরাট মোটরকার। এই সকল মোটরকারের জন্য ড্রাইভার, ক্লিনার, পেট্রল, মবিল এবং মেরামতি খরচা কত লক্ষ টাকা হয় ঠিক বলা শক্ত—(তবে ৩০-৩৫ লক্ষ টাকার কম কোন ক্রমেই নহে) এবং এ সবই বহন করিতে হয় সেন-তারনেটর আদি ও প্রধান পুরুষ শ্রীল শ্রীযুক্ত সেই অমর গৌরী সেন—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের পরম দুখী করদাতাদেরই। কলিকাতা এবং এ-রাজ্যের প্রায় সকল শহরেই পুলিসের ব্যবহারের জন্য কয়েক হাজার জিপ এবং অন্তবিধ মোটরযান আছে—। বলা বাহুল্য এই যানগুলি থানার বড় ছোট বাবুদের এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের ব্যক্তিগত কাজে প্রত্যহ কয়েক হাজার লিটার তেল পুড়াইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। কলিকাতার রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলির গাড়ি সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য।

আজ যাঁহারা রাজকীয় চালে এবং কায়দায় রাজ্য শাসন করিতেছেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা জন্মাবধি এই ভাবেই চলিয়াছেন। গাড়ি, টেলিফোন, ডিনার, লাঞ্চ, ছাড়া তাঁহাদের চলে না। দামী স্যুট ছাড়া পরেন নাই —শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ ছাড়া বাস করেন নাই, আজ তাঁহারা আজন্ম অভ্যাস ত্যাগ করিবেন কেমন করিয়া? বিশেষ করিয়া তাঁহাদের সকল ব্যয়ভার যখন বহন করিতেছে করদাতারূপী বাঙলার গরুদের দল!

পশ্চিমবঙ্গে বিত্তবানদের পৌষ মাস সারা বছর ধরিয়া চলে—বিত্তহীনদের ভাগ্যে সেই চির-একাদশী?

প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বকথা

"শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বার বার উচ্চারিত তত্ত্বেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। বলেছেন যে, দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতাই ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ। "এ দুটো জয় করতে পারলে পৃথিবীতে কোন শক্তিই আমাদের পর্যুদস্ত করতে পারবে না।" কথাটা নূতন নয়। স্বাধীনতারও অনেক আগে থেকে কথাটা বার বার শুনতে শুনতে দেশবাসীর মনে খোদাই হয়ে গেছে। তার পর, শাসনভার গ্রহণের সময় থেকে জাতীয় সরকার দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা উচ্ছেদের জন্য সব শক্তি নিয়োগের সঙ্কল্প বার বার ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এ তত্ত্ব তাদের কাছে অজানা নয়। কিন্তু, বিভ্রাট ঘটেছে এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের জন্য অব্যর্থ কার্য্যসূচী স্থির ও বলবৎ করার ব্যাপারে। বেড়ালের আক্রমণে বিপন্ন ইঁদুররা অনেক শলাপরামর্শের পর স্থির করেছিল যে, শত্রুর গলায় ঘণ্টা বাঁধতে পারলে আগে থেকেই আওয়াজ শুনে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া সম্ভব। কিন্তু, কাজের সময় দেখা গেল যে, এমন চমৎকার ফন্দি হাসিল করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতের জাতীয় জীবনে মারাত্মক উপসর্গগুলির স্বরূপ সম্পর্কেও বিশেষ কোন মতভেদ নেই। কিন্তু গোলমাল ঘটেছে প্রতিকারের জন্য ফলপ্রদ দাওয়াই স্থির ও প্রয়োগ করার ব্যাপারে।"

সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি—কারণ:

"ইতিপূর্বে দু'জন প্রধানমন্ত্রী যে-সব দাওয়াই অনুমোদন করেছিলেন, তার মধ্যে কোনটিই পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারেন নি। কখনও মাঝপথে দাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন; কখনও বা দরাজ হাতে জল মিশিয়ে ঔষধের ক্রিয়া এত দুর্বল করে ফেলেছেন যে তা দিয়ে দুর্দ্ধর্ষ উপসর্গগুলি কাবু করা যায় নি। ফলে রোগের প্রকৃতি সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ সত্ত্বেও ফলপ্রদ ঔষধ প্রয়োগে অক্ষমতার জন্য রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। তাঁর পূর্ববর্তী দুইজন প্রধানমন্ত্রী শাসনভার গ্রহণ করার সময় যে অবস্থা ছিল, তার সঙ্গে তুলনায় আজ রোগ অনেক বেশী প্রবল। দেশে মোট উৎপাদন ও আয় অবশ্য কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু তার ন্যায্য বখরা না পাওয়ায় সাধারণ লোকের দুর্দশা আরও দুর্বহ হয়ে উঠেছে।"

এখন জনগণকে তাহাদের চরম সঙ্গীন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবে কে? কথায় কথায়—সর্বত্র এবং সর্বসময় মন্ত্রী মহাশয়গণ এবং কংগ্রেসের ও কংগ্রেসীদের লম্বকর্ণধারগণও—দেশের জনগণকে দেশের সর্বসমস্যা মোচনে তথা সমাধানে আহ্বান জানাইয়া থাকেন—কিন্তু মহাশয়গণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—

"—এ রকম অবস্থায় সাধারণ দেশবাসী "দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা উচ্ছেদের জন্য" কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে? আঠারো বছর ধরে ক্রমাগত অব্যবস্থার ও কুব্যবস্থার দ্বারা সরকার জাতির ব্যাধি জটিল করে তুলেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলোর মারফত দরাজ হাতে দাদন জুগিয়ে মজুতদারীর সুযোগ দিয়েছেন; শেয়ারের ও পণ্যের বাজার কাঁপিয়ে তুলতে রসদ সরবরাহ করেছেন।

কর্ণে বাজার দর নাগাল ছাড়িয়ে যাওয়ায় সাধারণ লোকের দুর্দশা অনেক বেড়ে গেছে। এই সমস্যার প্রতিকার মাত্র সরকারই করতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও সাধারণ দেশবাসীর ভূমিকা গৌণ। তারা মাত্র সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতে পারে। নতুবা, নিজেদের দায়িত্বে বা প্রেরণায় তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। সুতরাং মারাত্মক উপসর্গগুলির উচ্ছেদের জন্ত তাঁরাই এগিয়ে আসুন।"

সাধারণ বুদ্ধি-বিচারে একমাত্র ইহাই বলা যায়—দীর্ঘ আঠারো বৎসর ধরিয়া যাঁহারা দেশ এবং জাতির ভাগ্য লইয়া ডাণ্ডা-গুলি খেলিয়াছেন—তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশ সুশাসন করিবার মত দক্ষতা এবং বুদ্ধি-বিবেচনা তাঁহাদের নাই এবং সেই কারণে তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য গদি হইতে নীচে নামিয়া জনগণের সকল দুর্ভোগ সমানে ভোগ করা। জাতির ভাগ্য-বিধাতা অবশ্যই দেশকে নূতন নেতৃত্বের হদিশ দিবেন। বহু দেশের ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে। অযোগ্য যদি গদি না ছাড়ে—শেষ পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষই—বর্ত্তমান নোংরা শাসনপ্রণালী কঠিন হস্তে সাফ করিবার পবিত্র দায়িত্ব হাতে লইবে বাধ্য হইয়াই। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর নাই।

বর্ত্তমান সরকার সর্ব্বভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরম অযোগ্য—এবং তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য—সিংহাসন পরিত্যাগ করা!

জলসা-মঙ্গল

বিগত কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে বাঙালী যুব সমাজ প্রায় জলসাগতপ্রাণ হইয়াছেন। এ-বিষয় যারাসত বার্তার বক্তব্য সমীচিন মনে হয়—

...সাংস্কৃতিক বাংলা দেশ—জলসা সম্মেলনের বাংলা দেশ শীতের প্রতীক্ষায় যেমন অধীর হইয়া থাকে, একটু শীতের আমেজ পড়িতে না পড়িতেই চারিদিকে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের তোড়জোড় পড়িয়া যায়। শুধুমাত্র গান বাজনা নাটক জলসার বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠানই নয়—রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সঙ্ঘ সমিতি, বণিক সভা, শ্রমিক ইউনিয়ন মায় ছাত্র ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলনের সময় হইতেছে এই শীতকাল। তবে অন্যান্য রাজ্য হইতে সাংস্কৃতিক জলসার প্রচার এবং বৈচিত্র্য এখানে সর্বাধিক। বাংলা দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে গান বাজনা জলসা যতখানি আকর্ষণ করে, অপর কোন অনুষ্ঠান আয়োজনে এতখানি আকর্ষণ করে না। শীতের একটির পর একটি রাত বাঙালী তরুণেরা যেরূপ মায়ামায় আচ্ছাদনের নীচে কাটাইয়া দিতে পারে তাহা আর কেহ পারে কি না জানি না, তবে ইহা প্রায় একরূপ হলফ করিয়া বলা চলে গান-বাজনার সহিত দুই-একজন খ্যাতনামা ফিলিম ষ্টার অনুষ্ঠানে থাকিলে বাঙালী যুব সমাজের যে প্রাণ-প্রাচুর্য্য প্রকাশ পায় তাহা আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যাইবেনা। বাঙালীদের শিল্প সঙ্গীত সাহিত্যে আকর্ষণ বেশী। কাজেই সঙ্গীত ও শিল্পের নামে জনতার জলসা আসরে বাঙালী যুবাদের আকর্ষণ থাকা হয়ত স্বাভাবিক। কিন্ত ইহা কখনও সঙ্গীত ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা নহে এবং এখানে শিল্পের উৎকর্ষতার সুযোগও নাই। এই সকল জনতা সম্মেলনে শিল্পীসমাজ কতখানি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন উহা শিল্পীসমাজই বলিতে পারেন· তবে অর্থোপার্জ্জনের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া দেখা যায় শিল্পীদের পকেট (আয়কর বিভাগ এই লাইন কয়টি বাদ দিয়া পড়িবেন) ফুলিয়া উঠে। যুগের হুজুগে শিল্পীদের কেহ কেহ মোটা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন ইহাই যা আশার বিষয়। তথাপি এই হেন জনতা জলসায় শিল্পের উৎকর্ষতার বিন্দুমাত্র সুযোগ যদি থাকিত তবে দেশের উপকার হয়ত হইত। বেকারী, অর্দ্ধবেকারী এবং অল্প উপার্জ্জনের পথে বাঙালী যুব সমাজের চিত্তে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে সেই প্রতিক্রিয়ার স্রোতে জলসা সম্মেলনের শিল্পীদের অনেকখানি সতর্ক ও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নাচগান জলসা সম্মেলনের শিল্পী ('আর্টিষ্ট' নামে পরিচিত) দেশপ্রেম ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করিতেও পারিতেন অথচ কোথায়ও এইরূপ সঙ্গীত পরিবেশন করা হইতেছে না। জনতার হাততালি পাইবার মোহে তাঁহারা আসরের পর আসরে একই ফিলিম গান পরিবেশন করিতেছেন। এই সময় আবার নামী আর্টিষ্টদের দৈনিক চার-পাঁচটি 'কাংশনে' কণ্ঠ দান করিতে হইতেছে। অবশ্য আমরা আর্টিষ্টদের উপর ততখানি দোষারোপ করি না। পয়সা রোজগারের মোহে তাঁহাদের দেশ, শিল্প, ভবিষ্যৎ চিন্তার বিন্দুমাত্র অবসর নাই। যাঁহারা এই হেন সঙ্গীত জলসার অনুষ্ঠান আহ্বান করিয়া থাকেন এবং আগাম হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া আর্টিষ্টদের 'বুক' করিয়া থাকেন তাঁহাদের যদি 'প্রফিট' বুদ্ধির কোথায়ও ছিটেফোঁটা কাণ্ডজ্ঞান থাকিত তবে এই সকল অনুষ্ঠানে কিছুটা দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারিতেন। নাচ-গানের·

জলসা ক্রমে ক্রমে ব্যবসার পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গীত শিল্পের উৎকর্ষতার বিন্দুমাত্র দাবী এখানে থাকিতে পারে না, আর্টিষ্টদের নাম প্রচার করিয়া টিকিট বিক্রির (যদি সরকারী ট্যাক্স না দিবার ইচ্ছা থাকে তবে রং-বেরংয়ের প্রবেশপত্র নগদ দামে বিলি করার) উপরই সঙ্গীত ও শিল্পের মান নির্ভর করে। এখানে সঙ্গীতের দাম নাই, দাম আর্টিষ্টদের নাম। এই নাম লইয়াই যত কাড়াকাড়ি। নামডাকের আর্টিষ্ট (রেকর্ড ও ফিল্মি) দুই একজন না থাকিলে জলসা সম্মেলনে লোকসানের শেষ থাকে না, কাজেই আর্টিষ্টদের নাম প্রচারে দিনের পর দিন যেমন মাইক ফুঁকিতে থাকে তাহাতে মনোহর সঙ্গীতটাই গৌণ, মূল ঐ আর্টিষ্ট। এই মোহ যে একবার বাঙ্গালী যুবকদের পাইয়া বসিয়াছে তাহা আর সহজে যাইবে না। এই-জলসার প্রচার ক্রমে ক্রমে কলিকাতা ও শহর হইতে দূর দূরে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেছে। (সংক্রামক রোগের মত।)

জলসার নেশা ক্রমশ তীব্রতর হইতেছে এবং দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা পেটে না খাইয়া জলসার টিকিট কিনিতেছে। সিনেমা বিষয়ে একই কথা। আনন্দের প্রয়োজন আছে—কিন্তু আনন্দই জীবনের সব বা সর্ব্বস্ব নহে। অবস্থার গতি না ফিরিলে বা ফিরাইলে বাঙ্গালী যুব-সমাজ জীবনের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কালক্রমে অদৃশ্য হইবে। ভবিষ্যতের যে সামান্য আলোর আভাস এখনও দেখা যাইতেছে—তাহাও অন্ধকারাবৃত হইতে দেরি হইবে না জলসার ঘোলা স্রোত যদি এইভাবেই বহিতে থাকে!

আকা-(ঁ)শ বাণীর ক্রমোন্নতি !!

মানুষ অর্থাৎ শ্রোতার কর্ণ যতই উৎপীড়িত হউক না কেন, কলিকাতা বেতার-কর্তাদের তাহাতে কিছুই আসে-যায় না। বিশেষ করিয়া বাণী-বিনোদ শ্রীযোজন পরিচালিত বিচিত্রানুষ্ঠান নামক চাঞ্চল্যজনক 'ভাঁড়ামরটি'। দেখিয়া অশেষ প্রীতিলাভ করিলাম যে শ্রীযোজনের মোসাহেব সংখ্যা তিন হইতে বাড়িয়া চারিজন হইয়াছে। নূতন মোসাহেবটির প্রধান কাজ 'খাসিমাথের' সহিত কলহ করা এবং এই কলহটি খোকাখিল সহিত তুলনা করা চলে। ভূতপূর্ব্ব মোসাহেব গোবিন্দজীর স্থানে বর্তমানে শ্রীতত্ত্বাশিবের অধিষ্ঠান হইয়াছে। এই তত্ত্বা শিবের যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি বাচন ভঙ্গি! দুই অপূর্ব্ব !! অতি অপূর্ব্ব! আমরা ভাবিয়া পাই না, কৃষি-কথার মধ্যে কয়েকটি খাড়ি-খোকার হ্যাবলামোর কি মূল্য থাকিতে পারে। ইহাতে কি কৃষকদের ফসল বাড়াইবার সুবিধা হইবে?

কৃষিকথার আসরে শ্রীযোজন মহারাজ প্রত্যহ যে-ভাবে দশবারো রকম চাষের বিষয় পাণ্ডিত্য এবং তথ্য পূর্ণ গবেষণা চালাইতেছেন, তাহাতে মেঠো চাষীরা প্রায় হাঁপাইয়া উঠিয়াছে! তাহারা ভাবিয়া পাইতেছে না কি ছাড়িয়া কিসের চাষ করিয়া দেশের খাদ্য সমস্যা মিটাইবে। চাষা পণ্ডিতের বিষম কৃষি-গবেষণার ভীষণ ঠেলায় চাষীদের লাঙল প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! কৃষিকথার আসরের বৃথা এবং বাজে কথার চাষের চাপে মাঠের চাষ বেকার হইতে চলিয়াছে—। শতকরা দুই-তিন জন গ্রাম্য চাষীও কলিকাতা বেতারের চাষালোচনা শ্রবণ করেন কি না, এবং শ্রবণ করিলেও তাহা বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য বলিয়া ভাবেন কি না সন্দেহ!

কিন্তু আমরা হয়ত ভুল করিতেছি, কারণ প্রতি বৃহস্পতিবার অল্পবুদ্ধি গজপণ্ডিত যোজন প্রাপ্ত চিঠি-পত্রের জবাবে প্রচার করিতেছেন যে তাঁহার ভীষণ মূল্যবান কৃষি-বিষয়ক গবেষণা শ্রবণ করিয়া চাষ বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিতে গ্রামে গ্রামে এক একটি রেডিওর সামনে ভীড় লাগিয়া যায়—যে প্রকার ভীড় Meet the Challenge কিংবা মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ফুটবল ম্যাচেও কদাচিৎ দেখা গিয়াছে! এই ভীড় যাহারা করেন তাঁহারা সেন্ট্ পার সেন্ট্ খাস চাষী—এবং প্রায় প্রত্যেকেই চাষের মাঠে হাতের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়াই কাযাপায়ে কৃষি কথার আসর শ্রবণ করিবার জন্য হন্তদন্ত হইয়া মাঠ হইতে সোজা রেডিওর সামনে ছুটিয়া আসে! অনেক কৃষক নাকি হুঁকা-কলিকাটিও মাঠে ফেলিয়া আসে—এমন কথাও শুনিয়াছি! এই সব দেখিয়া-শুনিয়া মনে হইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে পোড়া বাঙলা দেশ আবার শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিতে বাধ্য।

একটি খবরে জানা গেল যে, পাক্-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ মহাশয় পূর্ব্ব পাকিস্তানের কৃষকদের কলিকাতা বেতার প্রচারিত কৃষিকথার আসর শ্রবণ এবং তাহার বাস্তব প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করিয়াছেন!

স্বর্গত প্রধানমন্ত্রীর অকালপ্রয়াণে কলিকাতা রেডিও যে-ভাবে শোকপ্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই—কিন্তু কয়েকজনের উচ্ছ্বাস অতি বিচিত্র। ইহাকে শোক প্রকাশ বলিব, না পরিহাস বলিব ভাবিয়া পাই না। বিশেষ করিয়া শ্রীযোজন মহাশয়ের বিষম শোক অতি ভীষণ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই মহাশয় ব্যক্তির একমাত্র কণ্ঠস্বর এবং বাচনভঙ্গি !!

নক্রুমা বোধ হয় পিকিং বিমান বন্দরে সংবর্দ্ধিত হচ্ছেন চীনা নেতৃবৃন্দ ও জনগণ দ্বারা। এই চীনে আসা বাকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েৎনামে শান্তি স্থাপনের পথ খুঁজে বের করার জন্য।

ঘানা রেডিওতে শোনা গেল কর্ণেল ই. কে, কোতোকার স্বর। কর্ণেল বর্ণনা করছিলেন না ঘানার নেতার পিকিং-এ সংবর্দ্ধনা। কর্ণেলের ঘোষণায় শোনা গেল : "আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে সামরিক বাহিনী পুলিশের সহযোগিতায় দখল করেছে সরকারী ক্ষমতা। আর এই সঙ্গে ভেঙে দেওয়া হ'ল নক্রুমা 'মিথ্'।" অর্থাৎ ঘটনার প্রকাশ যে শুধু হ'রিগেড সৈন্য ও আক্রার পুলিশদল বিমান বন্দর, সরকারী দপ্তর, আক্রার উপকণ্ঠে মন্ত্রীদের আবাসস্থল ও রেডিও ষ্টেশন দখল করে ভেঙে দিল নক্রুমা 'মিথ্'!

ঘোষণা শুনল আফ্রিকান নারী যে এসেছে আক্রাবাজারে তাঁর পণ্য বিক্রি করতে। মনে হ'ল সে যেন বিচলিত। স্মিতহাস্যে বিচলিত নারী একবার যেন আড়চোখে তাকিয়ে নিল পাশ দিয়ে চলে-যাওয়া সৈন্য-পুলিশ ভর্তি জীপগাড়িগুলির দিকে। এই যে স্মিত হাসি তার বিশ্লেষণ করতে পারে বোধ হয় একমাত্র ইতিহাস, কিন্তু কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়।

অন্যদিকে আনন্দের বন্যা এল হু'জায়গায়—নাগরের হোটেলে খানা-পিনার হৈ-হল্লোড়ে, অর্থাৎ আহার্য ও রঙিন পানীয়র বন্যায় প্রকাশ পেল এক দামনা পৃথিবীর যে পৃথিবী বাঁচিয়ে রাখবে অতীতকে ; আর একটি জায়গা হচ্ছে ঘানার উবেয়কোর্ট জেলখানার সিংহদ্বারে যখন অশান্তি জাতীয়তাবাদের ধারক, বাহক ও সমর্থকরা মুক্ত হ'ল নতুন শাসকদের আদেশে। এঁরা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন নক্রুমা-বিরোধী বলে, অর্থাৎ রোমান্ত লেখকের ভাষায় এঁরা বিশ্বাস করেন এমন এক সমাজ-ব্যবস্থায়, যা বাঁচিয়ে রাখবে 'institut:on of chieftaincy' এবং এঁরা ভেবেছেন যে নক্রুমা যেন দেশের সম্পদ ও ঐশ্বর্য দেশের কল্যাণে ব্যবহার না করে এক স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ আফ্রিকার রূপায়ণের সমর্থক গভর্নমেন্ট আন্দোলনকারীদের জন্য ব্যয় না করেন। আবার এঁদের সম্বন্ধে এক ব্রিটিশ জজ সহ গঠিত কমিশন মন্তব্য করেছে যে এঁদের অনেকে না কি নক্রুমার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং অনেকে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন সেন্ট্রালাইজড্ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে, কারণ এঁদের বিশ্বাস হ'ল ফেডারেল ষ্ট্রাকচারের প্রতি।

নক্রুমার এই পতনে যেমন খুশী এই জাতীয় দেশবাসী, ঠিক তেমনি খুশী বিদেশীরা। আমেরিকার 'টাইম' কাগজের প্রকাশক বেরণহার্ড এই ঘটনাকে অভিহিত করেছেন এই ভাষায় : নক্রুমার 'বামপন্থী' পুলিশী শাসন ব্যবস্থার পতন এবং তিনি খুবই খুশী, কারণ :

"In the nine years since Ghana became independent, 'Time' has been banned, burned, scissored, or otherwise censored in that country so many times that we've lost count. Another form of damaging official harassment has been the on-and-off exclusion—and in one case the arrest—of our reporters."

আবার একদিনকার UN প্রতিনিধি এবং পরে ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ ও'ব্রায়ন The Observer-এ লিখিত 'Nkrumah tarce that turned into a tragedy' নামক প্রবন্ধে নক্রুমাকে ব্যঙ্গ করে অভিহিত করেছেন একজন অভিনেতা (actor) বলে। অবশ্য তিনি এও স্বীকার করেছেন যে, নক্রুমা শাসনকালে শিক্ষাবিস্তার করেছে বিস্ময়কর ভাবে, স্বষ্ট হয়েছে বহু শিল্প ইত্যাদি।

শিক্ষা যদি বিস্তার হয়ে থাকে, শিল্পোন্নয়ন যদি ব্যাপক হয়ে থাকে তবে কি কারণে হ'ল নক্রুমা পতন? উত্তর খুঁজতে গিয়ে ডাঃ ও'ব্রায়নের প্রবন্ধে এক জায়গায় পাওয়া যায় "profiteers of private sector" আর "টাইম" কাগজের "sortages of such basic hims as soaps and matches were felt in every home ··· " তবে কি নক্রুমা ছিলেন private sector-এর সমর্থক? নক্রুমা, যদি তাই হবেন তবে ঘানাতে public sector-এর কল্পনা ও প্রসার করল কে এবং কেনই বা নক্রুমা স্বপ্ন দেখবেন Africa must unite? শুধু কি তাই। নক্রুমা জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন :

Go to the people
Live among them
Learn from them
Love them
Serve them
Plan with them
Start with what they know
Build on wht they have.

অর্থাৎ, নক্রুমা এক কথায় বুঝেছেন নিজের কথা

ফিরিয়ে ও মিলিয়ে দিতে তারই মধ্যে, যাকে ভালবাসা যায় এবং নিজেকে খুঁজে নিতে এই পথে।

অনেকের কাছে এই মন হচ্ছে বাস্তববর্জ-বিরোধী এবং স্বপ্ন বিলাস এবং সেই জন্যই তাঁরা বিশ্বাস হ্রাস করেন ভিন্ন ভিন্ন সত্তার বিকাশে। এ ভাল কি মন্দ তার বিচারভার জীবনধারার ওপর। যা হোক বাস্তববাদী আমেরিকার 'টাইম' (৪ঠা মার্চ) ঘানা ও ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছে:

"The free world would take some comfort last week from the loosely linked chain of evidence around the world that repressive regimes were losing rather than gaining ground in their effort to impress mankind that liberty, Cmmunist style, is the wave of the future."

ঠিক এমনি যখন অবস্থা তখন ঘানার সেনাবাহিনী ছুঁড়ে ফেললেন নক্রুমাকে ঘানার প্রেসিডেন্ট রূপে। জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এল নতুন রং। যা এ এক নবরূপ যার নজীর হয়ত অতীতে নেই, তবে যাবৎ-মনের কাছে তুলে ধরল আফ্রিকার নব-দিগন্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

নূতন বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেট

নূতন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি লোকসভায় তাঁর আগামী বৎসরের (১৯৬৬-৬৭) প্রথম বাজেট প্রস্তাব পেশ করবার উপলক্ষ্যে যে ভাষণ দেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য—

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণের প্রথম ভাগে (Part A) বলেন :

"ভারত সরকারের বার্ষিক বাজেট প্রস্তাব সরকারী নীতি ও উদ্দেশ্য (Policies and Plans) সাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র (major instrument)। সেই কারণে চলতি আর্থিক লক্ষণ (current economic trends) এবং সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতের আর্থিক প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেট রচনা করা অনিবার্য্য হয়ে পড়ে……

"যে বৎসর এখন শেষ হতে চলেছে সেটিকে একাধিক কারণে একটি দুর্বৎসর বলে স্বীকার করতেই হবে। দেশের আর্থিক জীবনের কতকগুলি অসুবিধা, যথা নির্দ্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় উৎপাদনে অসাফল্য, পুঁজি বাজারে গতির স্বল্পতা (sluggishness in the capital market), আন্তর্জাতিক লেন-দেনে আমাদের সঙ্গতির (balance of payments) উপর অতিরিক্ত চাপ, অবশ্যভোগ্য (essential) পণ্যাদির ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যমান, এ সবগুলি লক্ষণই কয়েক বৎসর ধরে চলে আসছে, এবং এর ফলে বাজেট, এবং বস্তুতঃ সকল প্রকার আর্থিক প্রয়োগই এমন ভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে, যার দ্বারা এই অবাঞ্ছিত ধারাটিকে বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হয়। বর্ত্তমান বৎসরের (fiscal year) প্রথম দিকে আশা করা গিয়েছিল যে, গত বৎসরের (১৯৬৪-৬৫) কৃষি উৎপাদনে প্রভূত উন্নতি এবং আনুপাতিক পরিমাণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার একটা মোটামুটি উন্নতি সাধন সম্ভব হবে। কিন্তু কতকগুলি অভূতপূর্ব কারণে সে আশা ফলবতী হয় নি। বর্ত্তমান বৎসরে বর্ষা ঋতুর অভূতপূর্ব স্বল্পতার প্রতিঘাত ছাড়াও, আমাদের সীমান্তে অকস্মাৎ শত্রুর হামলা এবং বৈদেশিক অর্থ সাহায্যে বিরতির সঙ্গে আমাদের যুঝতে হয়েছে……

……"আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়া সত্ত্বেও—এবং এই সঙ্কট আগামী কয়েক মাসেও চলতেই থাকবে—আমদানী নীতির (import policies) বর্ত্তমান রূঢ়তা আরো কঠোরতর করা, এমন কি তার বর্ত্তমান কঠোরতাও রক্ষা করে চলা আত্মঘাতী হয়ে উঠবে। উদারতর আমদানী নীতিই একমাত্র এখন শিল্পোৎপাদনে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতি সম্পাদন করতে এবং মোটামুটি একটা সাধারণ উন্নত আর্থিক অবস্থার সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।…

"গত বৎসরের বাজেটে সামান্য পরিমাণের মোট অতিরিক্ত আয়বাহুল্যের (overall surplus) আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে যদি ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং বাদ দিয়ে চলবার সিদ্ধান্ত বলবৎ রাখতে হয়, তবে অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন অনিবার্য্য হয়ে উঠবে এবং গত আগষ্ট মাসে একটি অতিরিক্ত বাজেটের দ্বারা সংশ্লিষ্ট বৎসরের বাকী সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকার বেশী রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে বাজেটের ভবিষ্যৎ (budgetary outlook) আরো অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে ১৬৫ কোটি টাকার মতন একটা মোটা অঙ্কের ঘাটতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে—আয়ের খাতে ঘাটতির পরিমাণ হবে ৫৩ কোটি টাকা এবং পুঁজি খাতে ১১২ কোটি টাকা।…

"রাজস্ব খাতে আয়কর এবং কর্পোরেশন ট্যাক্স থেকে আমদানী পূর্ব হিসাবের তুলনায় ৭৩ কোটি টাকা কম হবে; কাষ্টম্‌স্ শুল্ক থেকে আয় পূর্ব হিসাবের তুলনায় ৩১ কোটি টাকা এবং আবগারী শুল্ক থেকে ১৬ কোটি টাকা বেশী হবে; মোট ট্যাক্স-আয়, অতএব, পূর্ব-হিসাবের তুলনায় ২৬ কোটি টাকা কম হবে।…রাজস্ব-

ব্যয় (revenue expenditure) পূর্ব হিসাবের তুলনায় মোটামুটি ২৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। ফলে বর্তমান বৎসরের বাজেটে যে ৩৩৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আমদানীর (revenue surplus) হিসাব করা হয়েছিল, সেটা এখন কমে গিয়ে ২৮২ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

পুঁজি খাতে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ ৪৩ কোটি টাকা কম হবে এবং রাজ্যগুলিকে দেওয়া ১০০ কোটি টাকার ঋণ বর্তমান বৎসরে শোধ হবার কোন আশা নেই…

"পুঁজি খাতে ১১২ কোটি টাকার আমদানী ঘাটতি প্রধানতঃ দুইটি কারণে ঘটেছে, রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত ঋণ দেবার প্রয়োজন এবং বৈদেশিকী সাহায্যে ঘাটতি। কেন্দ্রীয় ট্যাক্স রাজস্বের ২৩ কোটি টাকা ঘাটতি মোট রাজস্বের মাত্র ১%। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে অতিরিক্ত রাজস্ব ব্যয় অপেক্ষাকৃত সামান্য মাত্র। বৈদেশিকী সাহায্যের পরিমাণের উপরে আমাদের কোন নির্দিষ্ট অধিকার নেই। রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত ১০০কোটি টাকা ঋণ দেবার দায় না থাকলে কেন্দ্রীয় বাজেটের মোট ঘাটতি মাত্র ৬৫ কোটি টাকার মতন হ'ত। তবু বর্তমান বৎসরের পরিস্থিতি আগামী বৎসরের বাজেট রচনায় অসুবিধার সৃষ্টি করেছে এবং কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির ব্যয়ে অধিকতর সংযমের প্রয়োজন অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি রাজ্য সরকারের বর্তমান অভ্যাস অনুযায়ী মঞ্জুরীর অতিরিক্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ধার করার ধারাটির সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। এই ধারের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করতে হয় এবং তার ফলে কেন্দ্রীয় বাজেটে একটা অতিরিক্ত বোঝার সৃষ্টি হয় এবং আনুপাতিক পরিমাণে রাজ্য সরকারগুলির পরিকল্পনা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ব্যাহত হয়। এ সকল পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।…

"১৯৬৪-৬৫ সালে কৃষি উৎপাদনে যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার গতি বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বর্তমান বৎসরে ব্যাহত রাখা সম্ভব হয় নি। বর্তমান বৎসরে কৃষি উৎপাদনের সঠিক পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নি। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, খাদ্যশস্য এবং পাট, মেস্তা, তৈলবীজ, তামাক, চা ও তুলা ইত্যাদি শিল্পপণ্যের (commercial crops) উৎপাদন পূর্ব বৎসরের তুলনায় বেশ খানিকটা কমে যাবে। এর ফলে প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিকী সাহায্য সত্ত্বেও এ বৎসর খাদ্যশস্য ও কাঁচা মালের সরবরাহে যথেষ্ট ঘাটতি অনুভূত হবে এবং ফলে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি সংকোচন একান্ত প্রয়োজন হবে।

"বর্তমান বৎসরে শিল্প উৎপাদনের গতিও শ্লথ হয়ে পড়েছে। বৎসরের প্রথমার্দ্ধে পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় শিল্প উৎপাদন মাত্র ৭.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৫%-এর বেশী হবে বলে ভরসা নেই। অনেকগুলি শিল্পে, যথা ইস্পাত, এলুমিনিয়ম, এঞ্জিনিয়ারীং শিল্প এবং রাসায়নিক শিল্পে, উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং আগামী বৎসরে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে দেশে উৎপন্ন কাঁচা মালের উৎপাদন আনুপাতিক পরিমাণে বৃদ্ধি না পাওয়ায় এবং আমদানীর (importe) দ্বারা ঘাটতি পূরণ করবার উপায় না থাকায় উৎপাদন গতি সম্প্রতি ব্যাহত হতে সুরু করেছে।……

……"তৃতীয় প্ল্যানের প্রথম তিন বৎসরে মোটামুটি উৎপাদন গতি আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়া সত্ত্বেও রপ্তানীর পরিমাণ আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ গত দুই বৎসরে এই উচ্চ হারে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি এবং আশঙ্কার কারণ ঘটেছে যে বিরূপ আবহাওয়ার কারণে আমাদের কতিপয় কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী আগামী বৎসরে বিশেষ পরিমাণে ব্যাহত হবে।

"বস্তুতঃ মোটামুটি উৎপাদন বৃদ্ধির গতি এবং সার্থকতা অব্যাহত রাখতে না পারলে এবং দেশের ভেতর মূল্যমানের ওপর ক্রমবর্দ্ধমান চাপ (inflationray pressures) সীমিত করতে না পারলে রপ্তানী বৃদ্ধির উপযুক্ত আবহাওয়া অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়…

"আমাদের প্রবলতম ইচ্ছা এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে বৈদেশিকী অর্থ সাহায্য ছাড়া চলা বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব। একথা অনস্বীকার্য্য যে, বৈদেশিকী অর্থ সাহায্য আমাদের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জ্জাতিক সম্পত্তি (resources) বৃদ্ধি করবার প্রয়াসের পরিপূরক মাত্র হওয়া সমীচীন। আমাদের সমস্যাগুলির সমাধানের পথ মূলতঃ আমাদেরই প্রস্তুত করে নিতে হবে এবং যতটুকু বিদেশের সদস্য বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য হিসাবে পাওয়া সম্ভব তার সবচেয়ে সার্থক ব্যবহার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। একমাত্র এই পথেই অসাধারণ প্রকারের বিদেশী সাহায্যের দায় থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব …আমরা আশা করি যে, বিশ্বব্যাঙ্কের নেতৃত্বে যে ভারত-সাহায্য জোট (Aid India

Consortium) অতীতে, বিশেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে আমাদের বরাবর হাতে সাহায্য করেছেন, তাঁরা আগামী চতুর্থ পরিকল্পনার জন্যও অনুরূপ সাহায্য দানে আমাদের বাধিত করবেন

"এই প্রসঙ্গে আমেরিকার পি এল ৪৮০ আইন অনুযায়ী খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যাদি আমদানীর ওপর আমাদের বর্তমান একান্ত নির্ভরশীলতার পরিমাণ যথাসম্ভব দ্রুত কমিয়ে আনবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান বাজেটের কাঠামোতেও পি এল ৪৮০ অনুযায়ী খাদ্যশস্য ও আনুষঙ্গিক কৃষিজাত পণ্যাদির আমদানীর ওপর গভীর ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, কেননা এই বিশেষ লেনদেন থেকে উদ্ভূত অর্থসম্পত্তি আমাদের বাজেটের সম্পত্তির (budgetary resources) এমন একটি বিশিষ্ট পরিপূরক অংশের স্থান অধিকার করে বসেছে, যে, এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে এবং একান্ত প্রয়াসের দ্বারা সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ এবং অতিরিক্ত অর্থসম্পত্তি সংগ্রহের প্রয়োজন আজ একং অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে।

"এই অতিরিক্ত সম্পত্তি সংগ্রহের সাফল্য নির্ভর করবে দেশের আর্থিক কাঠামোর বৃদ্ধি ও গতিশীলতার ওপর। যেদিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিই ইহার একমাত্র উপায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত শিল্পের কাঠামো যেমন অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সরকারী মালিকানায় পরিচালিত সংস্থাগুলির উত্তরোত্তর সার্থক কার্য্যকারিতা (efficient working)। এই প্রসঙ্গে গত তিন বৎসর ধরে পুঁজির বাজারে যে অচল অবস্থা চলে আসছে তার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রাইভেট সেক্টারের শিল্পগুলিকে সরকারী অর্থসংস্থাগুলি থেকে যথাসম্ভব অর্থ সাহায্য দ্বারা লগ্নী বৃদ্ধির প্রয়াস অবশ্যই করা হচ্ছে সন্দেহ নাই, কিন্তু পুঁজির বাজারে সচলতা পুনঃ প্রবর্তন দ্বারা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের একটা ক্রমবর্দ্ধমান ধারার সাহায্যে ইকুইটি লগ্নী বৃদ্ধির দ্বারাই বৃহত্তর সমাজ-কল্যাণ সাধন করা সম্ভব।...

"অর্থের ক্ষেত্রে (monetary field) সম্প্রতি গুরুতর চাপ অনুভূত হচ্ছে, যদিও একই সঙ্গে অর্থ সরবরাহের (money supply) গতি পণ্য এবং কর্মসংস্থানের (goods and services) তুলনায় অনেক দ্রুততর বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করে অর্থকৃচ্ছ্রতা কমান সম্ভব হয় না; এর ফলে কেবল মূল্যচাপ (inflationary pressure) বৃদ্ধি পায়। ক্রমান্বয়ী যাদের যে বারো মাস শেষ হয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে সাধারণ মূল্যমান (general price level) ৭.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।...

"...এ সকল কারণে বাজেট রচনায় এর কাঠামোটিকে উৎপাদনমুখী (production oriented) করতে হয়েছে, যার ফলে মোটামুটি সঞ্চয় এবং কার্য্যকারিতা (eficiency) বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ চালু লগ্নীর যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণকরণের দ্বারা আর্থিক প্রয়োগের সার্থকতার অপেক্ষাকৃত দ্রুততর গতি সঞ্চার করা সম্ভব হয় এবং দেশরক্ষার অনিবার্য্য দায় সাধন করেও সরকারী ব্যয়, বিশেষ করে প্রশাসনিক ব্যয়ে সংযম সাধন করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োগগুলিতেও লগ্নীর ব্যাপারে উপযুক্ত সংযম সাধন প্রয়োজন।

অর্থমন্ত্রীর উপরোক্ত মন্তব্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলোচ্য বাজেটে নিম্নলিখিত হিসাব মত এর কাঠামো রচনা করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়:

রাজস্ব খাতে (revenue) ব্যয়ের ক্ষেত্রে চতুর্থ ফাইনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যগুলিকে দেয় ট্যাক্সের অংশ বাবদে ৭৭ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কে রাজ্যগুলির অংশ বাবদে ৪২ কোটি টাকা, এবং রপ্তানী বৃদ্ধি অনুসারক মামাখিদ ট্যাক্স ক্রেডিট ব্যবস্থা বাবদ ২৪ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং পি এল ৪৮০ গ্রাণ্ট, জরুরী বীমা এবং ক্যাপিটাল গ্রাণ্ট ইত্যাদির প্রভাব বাদ দিলে আগামী বৎসরের রাজস্ব ব্যয় মোটমাট ৪৩ কোটি টাকা মাত্র বৃদ্ধি পাবে। পরিকল্পনা খাতে রাজস্ব ব্যয় ৩৬ কোটি টাকা কমবে। প্রতিরক্ষা ব্যয় ২৯ কোটি টাকা, পুলিশ বাবদ ১৪½ কোটি টাকা, অনাবৃষ্টির দরুণ সাহায্য বাবদ ১১½ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় এলাকাগুলির বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য ৬ কোটি টাকা এবং পুলিশ ব্যতীত প্রশাসনিক ব্যয় ১৯ কোটি টাকা (বর্তমান বৎসরে ১৩ কোটি টাকা,—এবং এর মধ্যে ২½ কোটি টাকা আগামী বৎসরের সাধারণ নির্বাচন বাবদ ব্যয় হবে। এগুলি ছাড়া রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির বাকী ১৮ কোটি টাকা প্রধানতঃ প্ল্যান-নিরপেক্ষ উন্নয়ন খাতে, বিশেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনা বাবদ প্রতিশ্রুত অর্থ, খরচ হবে।

আগামী বৎসরের রাজস্ব ১৯১ কোটি টাকা বেশী হবে; এর মধ্যে কাষ্টমস্ শুল্ক ২৯ কোটি টাকা এবং আবগারী আয় ১০৮ কোটি টাকা বাড়বে। কর্পোরেশন এবং ব্যক্তিগত আয়কর বাবদ আমদানী ২০ কোটি টাকা

থাকবে। বর্তমান ট্যাক্স রাজস্বের ভিত্তিতে (at existing levels of taxation) মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ হবে ২৬১৭ কোটি টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ হবে ২৪০৭ কোটি টাকা। অতএব অতিরিক্ত রাজস্বের পরিমাণ (revenue surplus) ২১০ কোটি টাকা, বর্তমান বৎসরের রিভাইজড হিসাবের তুলনায় ৭২ কোটি টাকা কম হবে।

পুঁজি বাজেটের ক্ষেত্রে বৈদেশিকী ঋণের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪৬০ কোটি টাকা (বর্তমান বৎসরে ৪১০ কোটি টাকা), এ ছাড়া পি এল ৪৮০ বাবদ আমদানী ২৩০ কোটি টাকা, এবং বাজার ঋণ ২৮০ কোটি টাকা। কিন্তু ঋণ পরিশোধের দায় এবার অনেক বেশী হওয়ার ফলে নীট বাজার ঋণের পরিমাণ বর্তমান বৎসরের থেকে ২২ কোটি টাকা কম হয়ে ৮৬ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং এন্যুইটি ডিপোজিট বাবদ আমদানীর পরিমাণে কোন অতিরিক্ত বৃদ্ধির আশা না করে এবং অতিরিক্ত রাজস্বের ২১০ কোটি টাকা যোগ করে মোট পুঁজি জমার সম্ভাব্য পরিমাণ ১৮৩৫ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান হয়। কিন্তু যথাসম্ভব সংযম প্রয়োগ করেও ন্যূনতম জমার পরিমাণ ১৯৫২ কোটি টাকা থেকে কমান সম্ভব নয়। প্ল্যান বাবদ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সম্মিলিত জমা, ২০৮১ কোটি টাকা বর্তমান বৎসরের বাজেটে ব্যবস্থাপিত ২২২৫ কোটি টাকা জমার তুলনায় ১৪৪ কোটি টাকা কম হবে।

মোটামুটি বাজেটের কাঠামোটি দাঁড়ায় এইরূপ :—
রাজস্ব বাবদ অতিরিক্ত আমদানীর পরিমাণ ২১০ কোটি টাকা, পুঁজি বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৫২টাকা, এর মধ্যে অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের ২১০ কোটি টাকা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ঋণ থেকে পাওয়া যাবে ৭৪৪ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় থেকে পাওয়া যাবে ১৩৫ কোটি টাকা, পি এল ৪৮০ র-মুদ্রন আমদানী থেকে পাওয়া যাবে ২৩০ কোটি টাকা, এন্যুইটি ডিপোজিট থেকে ৪৪ কোটি টাকা, পরিশোধ্য ঋণ থেকে ৩৭০ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন ঋণ এবং জমাখরচ থেকে ১০২ কোটি টাকা, মোট ১৮৩৫ কোটি টাকা ; অর্থাৎ পুঁজি বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ হবে ১১৭ কোটি টাকা।

এই ঘাটতি পূরণ করবার জন্য অতিরিক্ত সম্পত্তি সংগ্রহের ব্যবস্থার প্রস্তাব নিম্নোক্ত রূপ হবে।

কাস্টমস্ শুল্ক—	অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ—	০·৫২	কোটি টাকা
আবগারী "—	" " " "	৪২·২৭	" "
কর্পোরেশন ট্যাক্স—	" " " "	৩৬·০৭	" "
ব্যক্তিগত আয়কর—	" " " "	২৪·৪৫	" "
সম্পদ ট্যাক্স—	" " " "	০·৭০	" "
অন্যান্য—	" " " "	০·৫০	" "
নানা খাতে বর্তমান বৎসরের তুলনায় শুল্ক ঘাট্তি—	" "	৩·০০	" "
মোট অতিরিক্ত রাজস্ব—		১০১·৫১	কোটি টাকা

এই সকল বাজেট প্রস্তাবের ফলে আমাদের আগামী বৎসরের মোটামুটি ট্যাক্স কাঠামোটির রূপ হবে :—

কাষ্টম্‌স্ শুল্ক— আমদানী ৫৩৩ কোটি টাকা
ভোগ্যপণ্যের উপর কাষ্টম্‌স্— ৮৫ " "
মোট কাষ্টম্‌স্ শুল্কের তুলনায় ভোগ্যপণ্য থেকে আদায়ী শুল্কের অংশ—১৬%
আবগারী শুল্ক— আমদানী ৯৭০ কোটি টাকা
অবশ্যভোগ্য পণ্যের উপর
আবগারী— " ৫৪৪ " "
ভোগ্যপণ্য থেকে আদায়ী শুল্কের অংশ—৫০·৬%
মোট রাজস্ব— আমদানী ২৭১১ কোটি টাকা
কাষ্টম্‌স, আবগারী ইত্যাদি
পরোক্ষ শুল্ক— " ১৫৩৬ " "
মোট রাজস্বের তুলনায়
পরোক্ষ শুল্কের শতকরা অংশ— ৬০%
মোট রাজস্বের তুলনায় ভোগ্যপণ্যাদির
উপর পরোক্ষ শুল্কের শতকরা অংশ— ৪৫%

উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যাবে যে নূতন এবং তাঁর প্রথম বাজেটে অর্থমন্ত্রী আমাদের রাজস্ব কাঠামোটির মূল ধারাটিকেই রক্ষা করে তাঁর বাজেট—যাকে তিনি সরকারী আর্থিক নীতি ও প্রয়োগের একটি প্রধান এবং মূল যন্ত্র বলে স্বয়ং নিজেই অভিহিত করেছেন—রচনা করেছেন। দেশের আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল্য-চাপের (inflationary pressures) সংস্থাপক ভূমিকার কথা তিনি নিজেই বলেছেন, কিন্ত তাঁর পূর্ববর্তী অর্থমন্ত্রীদেরই মতন তিনি রাজস্বের মূল কাঠামোর মধ্যে অন্তর্নিহিত তার বর্তমান মূল্যচাপস্রষ্টা গভীর ক্ষতির প্রভাবের কথা হয় উপেক্ষা করে গেছেন কিংবা বুঝতে পারেন নি। উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যাবে যে, ভোগ্যপণ্যাদির উপরে এবং এর মধ্যে কতকগুলি অবশ্যভোগ্য পণ্যের পরিমাণই সবচেয়ে বেশী—শুল্ক থেকে মোট রাজস্বের ৪৪ শতাংশ আদায় হবে। এর মধ্যেই মূল্যচাপসৃষ্টিকারী প্রভাবটি অন্তর্নিহিত।

বস্তুতঃ অর্থমন্ত্রী ট্যাক্স কাঠামোটি তাঁর মন্ত্রণালয়ের পূর্ববর্তী অধিকর্তাদের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন, নিজে রচনা করেন নাই। এই কাঠামোটির আমূল রদ-বদলের জন্য প্রয়োজন অর্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে (applied finance) প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি প্রচণ্ড সাহস। আগামী বৎসরে সাধারণ নির্বাচন আসন্ন, ট্যাক্স কাঠামোটির সম্পূর্ণ রদবদল করতে গেলে যে সকল অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য তাতে অনেক রকমের কায়েমী স্বার্থের গায়ে হাত পড়বে। তার সম্ভাব্য রাজনৈতিক ফলাফল শাসনাধিকারী দলের পক্ষে হয়ত বিষময় হয়ে উঠবে। সেটা স্বভাবতঃই হয়ত তিনি করবার প্রয়াস করতে ভরসা পান নাই।

কিন্ত সহজতম উপায়ে অতিরিক্ত রাজস্বের ব্যবস্থাপনায় যত বিপদও যে আছে এবং যার আর্থিক তথা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যে গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হবার আশঙ্কার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে সেটুকু বিচার করবার মতন দূরদৃষ্টির কোন আভাস তাঁর রচনায় দেখতে পাওয়া যায় নি। ফলে আলোচ্য বাজেটে না দেখা যায় কোন নূতন সাহসিক দৃষ্টিভঙ্গি, না পেরেছেন তিনি দেশের কোন শ্রেণীকেই খুশী করতে। নিম্নমানের আয়করদাতাদের তিনি যেটুকু সুবিধা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী চাপ পড়বে তাঁদের উপরে এই বাজেটের দরুণ অদূর ভবিষ্যতে অনিবার্য্য অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির চাপে। অন্যপক্ষে বৃহত্তর কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদেরও তিনি রুষ্ট করেছেন। কোন বিচারসহ প্রতিবাদের আশঙ্কা না করে বলা যায় যে নূতন বাজেটের ফলে দেশের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে আরো খারাপ হবে এবং আনুপাতিক ভাবে উৎপাদন প্রগতি আরো ব্যাহত হবে।

অপদার্থ সরকারের অসৎ খাদ্যনীতি ও প্রয়োগ

খাদ্য সঙ্কটের কথা আমরা ১৯৬২-৬৩ সালের ফসলের বছর থেকেই অনবরত শুনে আসছি। ১৯৬৪-৬৫ সালে শোনা গেল সে বছর খাদ্যশস্যের ফসল এত বেশী হয়েছিল যে, এমনটি আর কখনও হয় নি। সে বছর মোট ফসলের পরিমাণ, সরকারী হিসাব অনুযায়ী, হয়েছিল ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন, তার মধ্যে চাউলের পরিমাণে ধানের ফসল ছিল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন, গম ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন এবং অন্যান্য খাদ্য শস্যের ফসল যথা, বাজরা, রাগী, জোয়ার ইত্যাদি মিলিয়ে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন। তবু সে বৎসরেও খাদ্য সঙ্কট এবং তা মেটাবার জন্য বিদেশ থেকে ৭৫ লক্ষ টন শস্য আমদানী করা হয়। অর্থাৎ গত বৎসর শস্যের মোট সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ২৫ লক্ষ টন। তথাপি ফসল ওঠবার তিন মাসের মধ্যেই এবং স্বাভাবিক কৃশ ঋতু (lean season) শুরু হবার পূর্বেই খোলাবাজারে চাউলের খুচরা দর সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যমানের তুলনায় প্রায় ৫০% এবং গমের মূল্য প্রায় ৬৫% বেড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, তখন পর্য্যন্ত ষ্ট্যাটুটারী এবং মডিফায়েড র‍্যাশনিং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলিতে দেশের জনসংখ্যার মোট

শতাংশ যাদের জন্য সরকারী এবং আধাসরকারী প্রয়োগ ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্য বণ্টন ব্যবস্থা চালু হয়; বাকী সকলকেই খোলাবাজার থেকেই তাঁদের অবশ্যভোগ্য শস্য সংগ্রহ করতে হয়। বর্তমানে উপরোক্ত শ্রেণীর সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৭ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কলিকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় স্ট্যাটুটারী র‍্যাশনিং-সার্থক ভাবে চালু রেখেছেন বলে প্রায়ই আত্মপ্রশংসায় বিভোর হয়ে পড়েন। এ বৎসর অনাবৃষ্টির কারণে ফসল সর্বত্র দেশেই কম হয়েছে। একটি প্রাথমিক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার অনুযায়ী বলা হয়েছিল মোট খাদ্যশস্যের ফসলের পরিমাণ হবে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টন। পরে এই অঙ্কটিকে সংশোধন করে বলা হয়েছে যে, এর পরিমাণ এখন ৮ কোটি টন হবে বলে ভরসা পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে গত বৎসর চাউলের ফসলের সরকারী হিসাব ছিল ৫৪ লক্ষ টন আমন এবং ৪ লক্ষ টন আউস। সরকারী হিসাবে চাহিদার পরিমাণ ছিল ৬২ লক্ষ টন, অর্থাৎ ৪ লক্ষ টন ঘাট্তি। গত বৎসর এই রাজ্যে গম আমদানী হয়েছে, সরকারী হিসাব অনুযায়ী ৯ লক্ষ ৬০ হাজার টন, এবং কেন্দ্র এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে চাউল আমদানীর পরিমাণ ছিল কেন্দ্র থেকে ৩ লক্ষ টন, উড়িষ্যা থেকে ৪ লক্ষ টন এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে ১ লক্ষ টন—মোট ৮ লক্ষ টন। অর্থাৎ এ রাজ্যে খাদ্যশস্যের মোট সরবরাহের পরিমাণ হয়েছিল ৬৫·৬ লক্ষ টন, অথবা চাহিদার তুলনায় ৩·৬ লক্ষ টন বেশী। তবুও খাদ্য সঙ্কট এবং ভয়োধিক খাদ্যমূল্য সঙ্কট!

গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গের র‍্যাশনিংয়ে সপ্তাহে প্রাপ্ত-বয়স্কের মাথাপিছু সপ্তাহে ১ কেজি গম এবং ১ কেজি চাউল দেওয়া হয়েছে এবং অপ্রাপ্তবয়স্কের তার অর্দ্ধেক পরিমাণ। ১৯৬১ সালের সেন্সাস্ অনুযায়ী এই রাজ্যে ঐ বৎসর লোকসংখ্যা ছিল ৩,৪৯,২৬,২০০। বার্ষিক নীট ২·০৪% হিসাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে গত বৎসর এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ৩,৮৪,০০,০০০। এর মধ্যে ০—৪ বৎসর এবং ৬৫ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কদের সংখ্যা ছিল ১৮% অথবা ৭০,১২,০০০; ৫—১৪ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা ২৬% অথবা ১,০৯,৮৪,০০০; এবং ১৫—৬৪ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা ৫৬% অথবা ২,০৪,০৪,০০০। সমগ্র লোকসংখ্যার জন্য সাপ্তাহিক ২ কেজি শস্যের (অর্থাৎ দৈনিক ১০·২৪ আউন্স) বরাদ্দ হিসাবে বৎসরের প্রয়োজনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭,৯৯,৬০০ টন; সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৬৫·৬ লক্ষ টন। তবুও খাদ্য সঙ্কট!

বর্তমান বৎসরের পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৯৩,২৩,২৪৪ অথবা মোটামোটি ৩,৯৪,০০,০০০। বর্তমানে কর্ত্তিত র‍্যাশনের পরিমাণ সপ্তাহে ৫০০ গ্রাঃ চাউল, ১ কেজি গম' অথবা প্রাপ্ত-বয়স্কের জন্য—১২ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কের জন্য—দৈনিক ৬·২৫ আউন্স। এই হিসাবে উপরোক্ত লোকসংখ্যার সাপ্তাহিক মোট দেড় কেজি শস্য বরাদ্দ হিসাবে, বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০,৭৩,২০০ টন, অথবা, মোটামুটি ৩১ লক্ষ টন। সরবরাহের দিক থেকে সরকারী হিসাবে চাউলের বর্তমান ফসলের পরিমাণ ৪৪ লক্ষ টন হবে বলে বলা হয়েছে, তা ছাড়া আউসের ফসল থেকে আরো ৩ লক্ষ টন চাউল পাওয়া যাবে। তা ছাড়া বাহির থেকে অন্ততঃ ১ লক্ষ টন চাউল আর মোটামুটি ১০ লক্ষ টন গম পাওয়া যাবে ভরসা করা যায়। অর্থাৎ খাদ্য-শস্যের মোট সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়ায় মোটামুটি ৫৮ লক্ষ টন। কিন্তু ঘোরতর খাদ্য ও মূল্য সঙ্কট; রাজ্যের শতকরা ৮২ জন লোক অর্দ্ধাহারে এমনকি সিকি আহারে কোনক্রমে দিন গুজরান করেছেন।

মোট কথা উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সঙ্কটের করাল মূর্ত্তিটি জিয়াইয়া রাখার মধ্যে সরকারী দলের কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আগামী বৎসরে সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচন ব্যয়ের প্রচণ্ড দায় মিটাইবার তাগিদে মুনাফাবাজ তোষণের প্রয়োজন অনিবার্য্য এবং স্পষ্ট। নিকষ নিঃস্ব ও বণ্টন নীতির নাগপাশে দেশের লোকের প্রাণহানি ঘটাইয়া নির্বাচন বৈতরণী পার হইবার তাগিদে মুনাফাবাজ তোষণ ব্যবস্থা চালু রাখা হইয়াছে। দেশের লোক নিরপেক্ষ ভাবে বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে বিষয়টি বিচার করিলেই আমাদের সরকারের সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় (অবশ্য জনকল্যাণের দিক থেকে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থাহুতন্ত্রে নহে) খাদ্য প্রয়োগের মূল তত্ত্বটি খুঁজিয়া পাইবেন। বারান্তরে আরো বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

গিয়েছে। সিংহলের মুষ্টিযুদ্ধের মান যদিও খুব ভাল নয়, তথাপি মুষ্টিযুদ্ধের প্রতি সিংহলীদের আন্তরিকতার প্রশংসা নিঃসন্দেহে করা যায়। সমুদ্রপারের এই ছোট্ট প্রতিবেশী দ্বীপটির খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ লক্ষণীয়। এতদিন ভারত ও সিংহলের ভিতর স্কুল পর্যায়ের মুষ্টিযুদ্ধেরই প্রচলন ছিল। আশার কথা যে, এবার তার বিস্তার লাভ করে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাড়াতে গেলে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নতি করতে গেলে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। যে মুষ্টিযোদ্ধা যত বেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ততবেশি বৃদ্ধি পাবে। সেদিক দিয়ে

ভারত-সিংহল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পুরস্কারসহ ভারতের
অধিনায়ক এস. বাতী ডি'সুজা ও দলের অপর সদস্যবৃন্দ

বিচার করতে গেলে এই ভারত-সিংহল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার তাৎপর্য অনেক বেশী। বর্তমানে আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা খুব সন্তোষজনক না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে নানা রকম বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সব দিক বজায় রেখে অন্তত এইটুকু বলা যায় যে, যদি ভারতীয় দলগুলিকে তাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশগুলিতে সফরে পাঠান হয়, তা হ'লে খরচ হয়ত খুব বেশী হয় না, পক্ষান্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবার সুযোগ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মান বৃদ্ধি পাবে। চারটি কি পাঁচটি দেশের ভিতর যদি কোয়াড্রাঙ্গুলার বা পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার প্রচলন করা যায় তাতে ফল আরও ভাল হবে বলে আশা করা যায়।

চলতি বছরে ব্রিটেনে এক বিরাট ফুটবলের আসর বসছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ফুটবল খেলোয়াড় দেশগুলি বিশ্বফুটবল প্রতিযোগিতায় জুলে রিমেট কাপের খেলায় অংশগ্রহণ করবে। এযাবৎ ওখানে ফুটবলকে ঘিরে সব থেকে চাঞ্চল্যকর সংবাদ যা প্রকাশ হয়েছে তা হচ্ছে তিন হাজার পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণনির্মিত কাপটি এক প্রদর্শনী গৃহ থেকে খোয়া যায়। কাপটি অবশ্য একটি কোম্পানীতে ইনসিওর করা ছিল। কে বা কারা চুরি করল তা এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। কাপটি সম্ভবত গলিয়ে তার থেকে সোনা বার করার জন্যে দুষ্কৃতকারীরা ওটি চুরি করেছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে কাপটির সন্ধান করতে বলা হয়েছে। উদ্যোক্তারা অবশ্য অনুরূপ আর একটি কাপ তৈরি করে রেখেছেন স্থির করেছেন। এই ঘটনার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওখানে আর একটি ট্রফিও চুরি হয়ে যায়। ট্রফিটির নাম ব.কেনসাকাপ। কাপটির মূল্য তিনশো পাউণ্ড। প্রথমটি বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল ট্রফি, দ্বিতীয়টি একটি ঘোড়ার বাজীর ট্রফি।

১৯৬০ সালে যার ঘোড়া কাপটি জিতেছিল তাঁর কাছেই

কাপটি এতদিন ছিল। কিন্তু হঠাৎ পর পর দুটি ট্রফি চুরি যাওয়াতে অনেকের টনক নড়েছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস থাকা সত্ত্বেও এই স্পোর্টস ট্রফিগুলি কেন চুরি হচ্ছে। এতদিন ব্যাঙ্ক লুট বা বড়লোকের বাড়ীতে সোনাদানা চুরির সংবাদ অনেক পাওয়া গেছে কিন্তু এবার চোরেদের চোখ পড়েছে অন্যান্য জিনিসের ওপর। এবার বিশ্বকাপের খেলা শুরু হবার মুখেই বিপত্তি দেখা দিল। এখন তাড়াতাড়ি যদি বিশ্বকাপের খেলাগুলির সমাধা হয় তবেই ব্রিটেনের ফুটবল কর্মকর্তাদের মুখরক্ষা হয়।

১৫ই মার্চ আই. এফ. এ. অফিসের সম্মুখে লীগে ওঠা-নামা বন্ধের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ

রূপকথার নায়কেরা নানারকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তারা চলাফেরা করে পক্ষীরাজ চড়ে। বেঙ্গমা-বেঙ্গমী তাদের পথ বাতলে দেয় দুর্ধর্ষ রাক্ষস-রাক্ষসীকে বধ করার নানাবিধ কৌশল তাদের নখদর্পণে। সেইরকম একজন রূপকথার নায়ক কলকাতার ফুটবলের ওপর (নেপথ্যে) প্রভাব বিস্তার করেছে। অসীম ক্ষমতাবান এই নায়কটিও নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। রাক্ষস-খোক্কসেরা তার শত্রু নয়, পরম বন্ধু। তাদেরই সেই নায়ক অবাধে ফুটবলকেই হত্যা করে চলেছে। কলকাতার তথা বাংলার তথা-ভারতের ফুটবল এখন প্রায় কবরস্থ। স্বয়ং ধন্বন্তরীও বোধ হয় আর ফুটবলের প্রাণ সঞ্চার করতে পারবেন না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন অলিম্পিক বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রস্তুতি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে আমাদের কর্তারা তখন ফুটবলকে কবরস্থ করার নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

ফুটবলে বাংলার প্রাধান্য প্রথম থেকেই সুবিদিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে দেখলে দুঃখ হয়। গত কয়েক বছর ধরেই বাংলার নাম ভারতী ফুটবলের মানচিত্র থেকে মুছে গেছে। বেশ কয়েক বছ সন্তোষ ট্রফির খেলায় বাংলাকে রানার্স আপ নিয়েই সন্ত থাকতে হয়েছে। কোথায় ফুটবলের উন্নতি সাধন কর তাকে আবার আপন গৌরব ফিরিয়ে দেবে, তা না কর এমন সমস্ত কলা-কৌশলের অবতারণা করা হচ্ছে যাতে ফুটবলের উন্নতির আর কোনও আশাই না থাকে। চলতি

ইংলণ্ড-নিউজিল্যাণ্ড তৃতীয় ও শেষ টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ডের পিটার পারফিট অল্পের জন্যে আউটের হাত থেকে অব্যাহতি পান। অপর ব্যাটসম্যান ইংলণ্ডের অধিনায়ক মাইক স্মিথ

বছরে কলকাতায় ফুটবলের মাতব্বর মহাপ্রভুরা স্থির করেছেন যে ফুটবলের মান উন্নত করার জন্যে আগামী তিন বছর লীগে ওঠানামা বন্ধ রাখা হবে। এর আগেও একবার নব-উদ্ভাবিত পন্থাটির প্রয়োগ হয় এবং ফল যে সন্তোষজনক হয় নি তা বলাই বাহুল্য। মুখীজনে যাই বলুন, দুর্মুখে কিন্তু বলে যে এই ওঠানামা বন্ধ করার ভেতর বেশ বড় রকমের একটা কারসাজি আছে। কোন একটি ক্লাব যার, খেলার ফলাফল খেলোয়াড়ের কুশলতার ওপর নির্ভর করে না করে আই. এফ. এর দপ্তরে (নেপথ্যে) প্রধান কর্মকর্তার কৌশলের ওপর, সেই ক্লাবের জীবন রক্ষার জন্যেই এই সংশোধিত নিয়ম জারি। তাতে ফুটবল মরুক বা বাঁচুক কিছু এসে-যায় না। জয় আই. এফ. এ, জয় তোমার মহাপ্রভুরা আর জয় তোমার ফুটবল। ফুটবলের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, মড়ার মাথার খুলি দিয়ে ফুটবল খেলা হ'ত। বর্তমানে ফুটবলের অপমৃত্যু ঘটিয়ে তারই খুলি দিয়ে কর্মকর্তারা খেলা দেখাচ্ছেন। এই নাটের গুরু যিনি তিনি একটি অমূল্য রত্ন। এক অসাধারণ পুরুষ। ভারত সরকার কেন যে তাঁকে এখনও ভারতরত্নে ভূষিত করেন নি তাই ভাবি।

একটা সুখের কথা এই যে, ক্লেদের ভেতর থেকেই প্রাণের সঞ্চার হয়। সম্প্রতি যাদবপুরে বাঘা যতীন কলোনীতে 'ফুটবল বাঁচাও' বলে একটি সংস্থা সংগঠিত হয়েছে। যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগ্রাম করে ফুটবলের অপমৃত্যু রোধ করা, এই সংগঠনটিকে একটা স্ফুলিঙ্গ বলা যেতে পারে। একটা স্ফুলিঙ্গের ভেতর যেমন অসীম ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে তা থেকে এক বিশাল দাবানল সৃষ্টি হতে পারে। যথেষ্ট সম্ভাবনা নিয়েই স্ফুলিঙ্গের জন্ম। কখনও তা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে কখনও তা শুধু অমনেই নিভে যায়। আমরা এই সংস্থাটিকে স্বাগত জানাই। আশা করি, তারা ফুটবল জগতে দাবানল এনে সব দহন করে দিক। দহন হোক কুচক্রী কর্মকর্তারা, দহন হোক প্রহসনমূলক ফুটবল। আমরা আমাদের অতি-প্রিয় ফুটবলকে তিলে তিলে মরতে দিতে পারি না।

বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক :—শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত; কনটেমপোরারী পাবলিশার্স, কলিকাতা ৯; পৃঃ ৩০০, মূল্য বার টাকা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পশ্চিম দেশ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয়। এই সময় থেকেই ইউরোপের দেশগুলি থেকে ব্যবসায় বাণিজ্য সূত্রে নানা লোক ভারতে আসতে থাকেন, কিছুদিন যেতে না যেতেই ব্যবসায়ী ছাড়াও অনেকে এদেশে আসতে থাকেন যাদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশে নিজেদের দেশের শাসন বিস্তার অথবা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। ভারতে এসে এঁদের মধ্যে লেখাপড়া-জানা কিছু লোক এদেশের সাহিত্য ও সভ্যতার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে এই দেশীয় প্রচলিত ভাষা ও প্রাচীন ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। এঁদের চেষ্টায় ভারতবর্ষ থেকে বহু প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে—এবং এই সব শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এইগুলি অনুশীলন করতে থাকেন। প্রায় তিনশত বৎসর ধরে এইভাবে ইউরোপীয় এবং তাদের দেখাদেখি মার্কিন দেশের বহু পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং প্রাচীন ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনা করে নিজেদের সাধনালব্ধ জ্ঞান বিশ্ববাসীর কাছে পরিবেশন করেন। এঁরা শুধু প্রাচীন ভারতের মহিমা প্রচারই করেছেন এমন নয়, এঁদের চেষ্টার ফলেই বর্তমান ভারতবাসী তাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে পেরেছে এবং এই ভারত বিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছে। এই প্রসঙ্গে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বহু পরিশ্রম করে এই সব বিদেশী ভারত বিদ্যা সাধক মনীষীর জীবনী ও তাঁদের সাধনার বিবরণ সংগ্রহ করে তা পাঠকের সামনে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। একটি পুস্তকের পরিসরের মধ্যেই তিনি ২৫ জন সাধকের বিস্তৃত ও প্রায় দেড়শত সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কৃতি আলোচনা করেছেন। ভারত বিদ্যাচর্চার ইতিহাসের ধারাটি এই আলোচনাগুলির মধ্যে থেকে বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভারত বিদ্যা সম্বন্ধে যাদের কোন ঔৎসুক্য নেই তারাও এই বইখানি একবার পড়তে আরম্ভ করলে আর ছাড়তে পারবেন না, লেখকের এমনই লিপিকুশলতা। ভারত বিদ্যাচর্চা যাদের পেশা তারাও এই বইখানি পড়ে উপকৃত হবেন, কারণ এটি নানা বিচিত্র ও প্রয়োজনীয় তথ্যের আকর। গবেষক ছাত্ররাও এই বই থেকে বহু গবেষণার উপাদান পাবেন। বস্তুতঃ সকল শ্রেণীর পাঠকেরাই এই বই থেকে জ্ঞান ও চিত্তবিনোদনের [illegible] পাবেন।

বর্তমানে [illegible] লেখকেরা যে শুধু গল্প-উপন্যাস নিয়েই মত্ত নেই, পরিশ্রমসাধ্য অধ্যবসায়ভিত্তিক রচনাতেও বাঙালী তার প্রতিভা ও সময় নিয়োগ করেছে—বর্তমান লেখকের এই রচনাটি তার প্রমাণ বহন করছে। শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের এই সাধু প্রয়াস সর্বতোভাবে বাঙালী পাঠকের সমর্থন লাভ করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বইখানি ইংরাজীতে লেখা হলে বৈষয়িকভাবে লেখক লাভবান হতেন, তবে এটি যে তিনি মাতৃভাষায় লিখেছেন, এটিও খুব প্রশংসার কথা।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভূমিকাটি এবং পরিশিষ্টে প্রদত্ত কয়েকজন ইণ্ডোলজিস্টের দুর্লভ চিত্রগুলি এই বইএর মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে।

এই বইটির বহুল প্রচার হওয়া উচিত বাংলায়। এমন একটি সুলিখিত বইএর অনুবাদ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ও ইংরাজীতে হ'লে ভাল হয়।

শ্রীকালিদাস নাগ

বঙ্গবাসী, কৃষ্ণচন্দ্র—দেশ ও কাল :—হারাধন দত্ত। পুরোগামী প্রকাশনী। ১০০,১, সুরেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলি-৫। দাম-পাঁচ টাকা।

সাময়িক পত্রিকাশ্রয়ী গবেষণামূলক আলোচনা একালের সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ ও যোগেশচন্দ্র বাগলের কথা মনে পড়ে। এ বিষয়ে আলোচনার বিস্তার এখনও অপ্রচুর। গত শতকের সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে সমাজ-ধর্ম-সাহিত্য ও ইতিহাসের বহু উপকরণ বিক্ষিপ্ত আছে। এগুলিকে সংগ্রহ করে বর্তমান সুধী সমাজের কাছে উপস্থিত করা একটা পবিত্র কর্ম। আলোচ্য গ্রন্থের তরুণ লেখক এই পবিত্র কর্মে ব্রতী হয়েছেন দেখা গেল।

বঙ্গবাসী, গত শতকের একখানি বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকা। এ পত্রিকার বহু সম্পাদকগণের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্মরণযোগ্য নাম। আমাদের দেশে তিনিই প্রথম [illegible] অভিজ্ঞ সম্পাদক। কেবল বঙ্গবাসী নয়, দৈনিক হিন্দী বঙ্গবাসী এবং সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক এবং অক্ষয়কুমার সরকারের 'সাধারণীর' সহ-সম্পাদক রূপে তিনি সেকালের বাংলা দেশে সংবাদপত্রসেবার এক বিশিষ্ট আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের অনুগামী। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক মত বর্তমান আলোচনায় কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী প্রসঙ্গে পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। উনিশ শতকের বাংলা দেশে ধর্মান্দোলন ও জাতীয়তাবাদের আলোকে 'বঙ্গবাসীর' ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা এ গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। বাংলা দেশের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে হারাধনবাবুর সঙ্গে সকলেই একমত না হলেও লেখকের চিন্তাবোধ,

মৌলিকতা ও নবীনতার স্বাক্ষর এখানে স্পষ্ট। অজস্র দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত গ্রন্থ ও অসংখ্য রচনার পরিচয়ও তিনি এ গ্রন্থে উপস্থিত করেছেন। তথ্যাদিতে লেখকের শ্রম, যুক্তি ও বিচারবোধের নিদর্শন বিদ্যমান। তবে -ভাষা বিষয়োপযোগী, রচনাশৈলী আকর্ষণীয়। সেদিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থখানি বাংলা গবেষণা সাহিত্যে আর একখানি সংযোজন। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর মূল্যবান ভূমিকা সেই সত্যকেই প্রকাশ করেছে।

গ্রন্থখানির প্রধান দোষ ছাপার ভুল। এরূপ গ্রন্থে ছাপার ভুল বড় দৃষ্ট। গ্রন্থের আঙ্গিক পারিপাট্যের দিকেও আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ছাপা ও কাগজ মোটামুটি। বইয়ের মূল্যও একটু বেশী হয়ে গেছে। এরূপ কতিপয় ত্রুটি সত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থের লেখক নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

উপনিষদ অঞ্জলি—পুষ্পদেবী সরস্বতী, ভক্তিভারতী, ১, ডঃ শরৎ ব্যানার্জী রো, কলিকাতা-১৯। মূল্য ৩ টাকা।

গ্রন্থখানি বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাব্যানুবাদ। গ্রন্থকর্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন, 'আমার মত উদ্যোগ হ'ল। অর্থাৎ উপনিষদগুলির কাব্যানুবাদ তিনি সমাপ্ত করিবেন। আমরাও বলিব, সত্যই তিনি বড় কাজ করিলেন। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের উপনিষদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া কম কথা নয়। এবং সহজে সরল করিয়া বলা কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। তাঁহার এই কৃতিত্বের জন্য 'লীলা পুরস্কার'ই তিনি শুধু প্রাপ্ত হন নাই, বড় বড় পণ্ডিতরাও "সরস্বতী", "ভক্তিভারতী" উপাধি দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

সবচেয়ে বড় কথা, ঐভাবে ভাবিত না হইলে তিনি এই কাব্যে রূপদান করিতে পারিতেন না। ইহা অনুভূতির কথা। নিজস্ব অনুভূতির দ্বারাই তিনি উপনিষদকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও অপরকে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার লেখনী সার্থক হোক।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য ১ টাকা।

রামানন্দ জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রামানন্দের জীবন-চরিত বহু গুলি লেখা হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। এরূপ তথ্যবহুল প্রামাণিক গ্রন্থ ইহার পূর্বে আর দেখা যায় নাই। রামানন্দ নিজে তাঁহার সম্বন্ধে কোথাও কিছু লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁহার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিকে এত উপকরণ ছড়াইয়া আছে যাহা হইতে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে কোথাও কোন কষ্ট হয় না। যোগেশবাবু সেইসব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণগুলি নিপুণ কারিগরের মত সাজাইয়া প্রকৃত মানুষটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ও বংশ পরিচয় হইতে শুরু করিয়া যে অধ্যায়গুলি তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন সেইগুলি দেখিলেই তাঁহার কর্মময় জীবনের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যায়গুলি তিনি এইভাবে ভাগ করিয়াছেন, যেমন, ছাত্রজীবন: বাংলা স্কুল, ছাত্রজীবন: ইংরেজী স্কুল, কলেজে অধ্যয়ন, সিটি কলেজে পূর্বাপর অধ্যাপক ও বিবিধ সমাজসেবামূলক কার্য, ধর্মবন্ধু সম্পাদনা, দাসাশ্রম, দাসী, এলাহাবাদ প্রবাস, প্রদীপ, প্রবাসী: প্রথম যুগ, স্বদেশী আন্দোলন ও প্রবাসী: রবীন্দ্রনাথ, অধ্যক্ষপদত্যাগ: মডার্ণ রিভিয়ু: এলাহাবাদ হইতে বিদায়, নূতন পরিবেশ: নবযুগের সাধনা, কর্মক্ষেত্রে প্রসার: জাতীয় আন্দোলন। লীগ অব নেশন্‌স: প্রবাসী ও ভারতীয় "বৃহত্তর ভারত": ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ, হিন্দু মহাসভা: বিবিধ সম্মেলন: প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, গিরিডি পথে: জাতীয় অনুষ্ঠান, কংগ্রেস জাপানী আক্রমণকালে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ: সমাপন: জীবনাবসান, গ্রন্থাবলী: রচিত, সংকলিত ও সম্পাদিত, রচনার নিদর্শন।

ইহা হইতেই বুঝা যায় তিনি শুধুমাত্র সাংবাদিক ছিলেন না। গ্রন্থকার ভূমিকাতেও এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন :...তিনি ছিলেন একাধারে মানবদরদী স্বদেশপ্রেমিক, দেশীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ঐতিহ্যের একান্ত অনুরক্ত, জাতীয় সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকামী, লোক শিক্ষারত এবং সাহিত্য-প্রতিভা সমন্বিত, তেজোদীপ্ত ব্যক্তি।"

এই গ্রন্থখানি আগাগোড়া পাঠ করিলে ইহাই আমরা দেখিতে পাইব, জাত্যাভিমানবোধ ও মানবতা রামানন্দ-জীবনে মূর্ত হইয়া দেখা দিয়াছিল। এরূপ একটি চরিত্র যে আমাদের দেশে একদা ছিল একথা আজকের দিনে অনেকেই হয়ত জানেন না। সাহিত্য পরিষদ এরূপ একটি মহামূল্য জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া বাংলা দেশের যথার্থই উপকার করিলেন।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফরম্ নং ৪

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান—	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২। কিভাবে প্রকাশিত হয়—	প্রতি মাসে একবার
৩। মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
৪। প্রকাশকের নাম	ঐ
জাতি	ঐ
ঠিকানা	ঐ
৫। সম্পাদকের নাম	শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬

৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম ঠিকানা এবং (খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—

১।	শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, ১, উড, ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
২।	শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
৩।	শ্রীমতী সুনন্দা দাস, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
৪।	শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
৫।	শ্রীমতী নন্দিতা সেন, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
৬।	শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
৭।	শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
৮।	শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়, ৩এ এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
৯।	শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
১০।	শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—১৫।৩।১৯৬৬ ইং

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত